বঙ্গদর্শন

(নবপর্য্যায়)

মাসিকপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ

১৩২০

প্রবন্ধ-লেখকগণ

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺নবীন চন্দ্র সেন, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীশশধর রায়, শ্রীভবানীচরণ ঘোষ, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ শাস্ত্রী, শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী, শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, শ্রীতারকচন্দ্র রায়, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীরাম-লাল সরকার, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীআবদুল করিম শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

ও

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত,

বার্ষিক মূল্য ৩৸০।

বর্ষসূচী, ১৩২০

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জগাই-মাধাই উদ্ধার

একদিন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নিতাই, হরিদাস, আজ হইতে তোমরা বাড়ী বাড়ী যাইয়া কৃষ্ণনাম প্রচার কর। প্রতি গৃহস্থের গৃহে যাইয়া কৃষ্ণ-ভজনা করিতে ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে ও কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা করিতে উপদেশ কর। দিনাবসানে আমার নিকট আসিয়া প্রতি-দিনের সংবাদ দিয়া যাইবে।"

প্রচারের আদেশ শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। দুইজনে ঘরে ঘরে যাইয়া কৃষ্ণনাম বিলাইতে লাগিলেন—

আজ্ঞা পেয়ে দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণের ॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হয়ে একমন ॥"

সন্ন্যাসীদ্বয় গৃহস্থের দ্বারে উপনীত হইলে গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভিক্ষা দিতে আসিত। সন্ন্যাসীদ্বয় বলিতেন, "আমরা আর কিছু চাই না, আমাদের একমাত্র ভিক্ষা তোমরা শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর, শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা কর।" অনেকে প্রীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিতে অঙ্গীকার করিত। কেহ কেহ বলিত, "ইহারা দুইজন পাগল হইয়াছে, আমাদিগকেও পাগল করিতে আসিয়াছে।" যাহারা শ্রীবাসগৃহে কীর্ত্তনকালে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের গৃহে গেলে তাহারা মারিতে আসিত এবং বলিত, "ইহারা চোরের চর। ঘুরিয়া ফিরিয়া চুরির সুবিধা লক্ষ্য করিতেছে। আর একবার আসিলেই ধরিয়া দেয়ানে লইয়া যাইব।"

সে সময়ে নবদ্বীপে দুইজন দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিল। তাহারা ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব, কিন্তু তাহাদের অকার্য্য দুষ্কর্ম্ম কিছুই ছিল না, মদ্যপান, গোমাংসভক্ষণ, গৃহদাহন, চুরিডাকাতি প্রভৃতি তাহাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। সারাদিন

মাতাল অবস্থায় তাহারা রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত এবং পথিক দেখিতে পাইলেই ধরিয়া প্রহার করিত। নিত্যানন্দ ও হরিদাস নামপ্রচারে বহির্গত হইয়া একদিন দস্যু-দ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং পথিপার্শ্বস্থ কয়েকজন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দস্যুদ্বয়ের পরিচয় অবগত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া নিত্যানন্দের হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইল। তিনি মনে মনে তাহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন পাপীর উদ্ধারের জন্যই গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এমন পাতকী আর কোথায় আছে? প্রভু লোকচক্ষুর অন্তরালে মুষ্টিমেয় ভক্তের নিকট আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, কিন্তু বাহিরের লোকে তাঁহার প্রভাবের কোন পরিচয় না পাইয়া উপ-হাস করিতেছে। এই দুই পাপী যদি তাঁহার কৃপায় উদ্ধার হইয়া যায়, তাহা হইলে সকলে তাঁহার প্রভাবের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবে।

তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়ে করে যদি চৈতন্য প্রকাশ ॥
এখনে যে মদে মত্ত আপনা না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥
"মোর প্রভু" বলি যদি কাঁদে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন ॥

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতাই প্রকাশ্যে হরিদাসকে কহিলেন, "হরিদাস, এই হতভাগ্য মানব দুইটার দুর্ভাগ্য দেখিতে পাইয়াছ? ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও ইহারা যেরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত আছে, তাহাতে ইহাদের পরিত্রাণের আর উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। হে কারুণিক, যবন-গণ তোমাকে প্রাণান্তক ভাবে প্রহার করিলেও তুমি তাহাদের ইষ্টচিন্তাই করিয়া-ছিলে; এই দুর্ভাগ্যদ্বয়ের শুভানুসন্ধান করিবে না কি? প্রভু নিজমুখে বলিয়া-ছেন তোমার সঙ্কল্পের তিনি অন্যথা করেন না। তুমি একবার ইচ্ছা করিলেই ইহারা উদ্ধার পায়।" হরিদাস কহিলেন "তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন ইহাদের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই। প্রভুর ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার কখন পরিপন্থী হয় না।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "প্রভুর আদেশ সকলেই কৃষ্ণ-ভজনা করিবে। পাপীদের প্রতি তাঁহার আদেশ বিশেষরূপে প্রযুজ্য। আমরা কৃষ্ণনাম বিলাইবার ভার পাইয়াছি, ফল আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। চল, আমরা গিয়া দস্যুদিগকে কৃষ্ণনাম প্রদান করি। তাহারা যদি সে নাম গ্রহণ না করে তাহাতে আমাদের অপরাধ নাই। অনন্তর উভয়ে দস্যুদ্বয়ের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে দস্যুদিগের নিকট যাইতে দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা বিশেষরূপে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সে নিষেধ উপেক্ষা করিয়া ভক্তদ্বয় দস্যুদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার ॥"

শুনিয়া দস্যুদ্বয় আরক্তলোচনে তাহাদিগের দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে

ধরিবার জন্য ধাবমান হইল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস বেগতিক দেখিয়া পলায়নপর হইলেন। দস্যুদ্বয় বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেল। অবশেষে মদের নেশায় পরস্পর মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইল। দস্যুভয়মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভক্তগণবেষ্টিত গৌরচন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। দস্যুদ্বয়ের পরিচয় পাইয়া গৌর কহিলেন, "বেটারা এখানে আসিলে আমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব।" শুনিয়া নিত্যানন্দ কহিলেন, "তা ইচ্ছা হয়, তুমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড কর, কিন্তু আমি বলিয়া রাখিতেছি, আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। ইহারাই যদি গোবিন্দ না বলিল, তবে তোমার আর বড়াই কিসের? ধার্ম্মিক যে সে ত স্বভাবতঃই কৃষ্ণনাম করে, ইহাদিগকে যদি ভক্তিদান করিয়া উদ্ধার কর, তবে ত বুঝি তুমি বাস্তবিকই পতিতপাবন। আমাকে তারণ করিয়া তোমার মহিমা যতটা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।" গৌর হাসিয়া বলিলেন "তোমার দর্শন যখন তাহারা পাইয়াছে, তখনই তাহাদের উদ্ধার হইয়াছে। তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল বিশেষভাবে কামনা করিতেছ, তখন জানিও কৃষ্ণ অচিরাৎ তাহাদিগের উদ্ধার করিবেন।"

ইহার কয়েক দিন পরে নগর ভ্রমণান্তে নিত্যানন্দ রাত্রিকালে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় "কে রে, কে রে" বলিয়া জগাই মাধাই তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। নিত্যানন্দ পলায়ন করিলেন না। বলিলেন "আমি অবধূত, প্রভুর বাড়ী যাইতেছি।" অমনি মাধাই সক্রোধে সমীপস্থ একখণ্ড কলসীভাঙ্গা মুট্‌কী লইয়া সবলে নিত্যানন্দের মস্তকে নিক্ষেপ করিল। নিত্যানন্দের আহত মস্তক হইতে রক্তধারা ছুটিল। তিনি তখনও পলায়ন করিলেন না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গোবিন্দ-নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। মাধাই এক হস্তে তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া দ্বিতীয় হস্তে তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য আবার মুট্‌কী কুড়াইয়া লইল, কিন্তু অবধূতের মস্তকগলিত অবিরল শোণিতধারা দেখিয়া জগাই শিহরিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব করুণার বেদনায় তাহার হৃদয় পীড়িত হইয়া উঠিল। মাধাইয়ের দুই হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া জগাই বলিল, "আর মারিস না মাধাই, কেন তুই এমন নিষ্ঠুর কাজ করিলি? এই দেশান্তরী অবধূতকে মারিয়া তোর কি লাভ হ'বে?" পথের ধারে লোক ছিল, দৌড়িয়া গিয়া নিত্যানন্দের দুরবস্থার কথা গৌরকে জানাইল। ভক্তগণসহ গৌর আসিয়া দেখিলেন রক্তাক্ত-কলেবর নিত্যানন্দ হাস্য করিতেছেন। নিত্যানন্দের শরীরে রক্ত দেখিয়া গৌরের রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। "চক্র চক্র" বলিয়া তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দিব্য সুদর্শনচক্র তাঁহার হস্তসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাগবতগণ মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ভয়ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "স্থির হও, স্থির হও, প্রভু রোষ সংবরণ কর।

মাধাই আমাকে মারিয়াছে সত্য, কিন্তু জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে। আমার যে রক্তপাত হইয়াছে, তাহাতে আমার কষ্ট হয় নাই। এই দুইজনের শরীর আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। দয়াময় দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।" জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছে শুনিয়া গৌর প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "জগাই, তুমি আমাকে কিনিয়া রাখিলে। কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন। তুমি আজি হইতে প্রেমভক্তি লাভ কর।" জগাই এই কথা শুনিয়া প্রেমাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভক্তগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন—

প্রভু বোলে, "জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম ভক্তি দান দিল তোরে।"

জগাই দেখিতে পাইল, গৌর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হইয়া চতুর্ভুজরূপে বিরাজ করিতেছেন। দেখিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইল। গৌর তাঁহার বক্ষে চরণ অর্পণ করিলেন।

মাধাই নিকটে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল; দেখিতে দেখিতে তাহার চিত্তের মলিনতা ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইয়া গেল। নিত্যানন্দের বসন ত্যাগ করিয়া সে দৌড়িয়া গিয়া গৌরের চরণ ধারণ করিয়া কহিল, "প্রভু দুইজনেই একসঙ্গে পাপ করিয়াছি, জগাইকে তুমি কৃপা করিলে, আমি কি তোমার কৃপায় বঞ্চিত থাকিব।" গৌর কহিলেন, "তুই নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়াছিস্; তোর পরিত্রাণ আমি দেখিতে পাইতেছি না।" মাধাই চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিল এবং কাতরভাবে বার বার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন সদয় হইয়া গৌর কহিলেন, "তুমি নিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।" মাধাই নিত্যানন্দের পাদমূলে পতিত হইল। নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন, "নিতাই, তোমার রক্তপাত করিয়া মাধাই এখন তোমারই চরণে প্রণত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে তুমি মাধাইকে ক্ষমা করিতে পার।" নিতাই কহিলেন, "প্রভু, আমার নিকট মাধাই যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না। তোমার ভৃত্য যে কৃপা করে, সে তোমারই কৃপা। আমার যদি কোন জন্মকৃত কিছুমাত্রও সুকৃতি থাকে সব আমি মাধাইকে দান করিলাম। মাধাই তোমারই। মায়াময়, মায়া ত্যাগ করিয়া এখন মাধাইকে কৃপা কর।" গৌর কহিলেন "যদি ক্ষমাই করিলে, তবে তাহাকে আলিঙ্গন কর।" নিত্যানন্দ প্রেমভরে মাধাইকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। নূতন জন্ম লাভ করিয়া জগাই মাধাই গৌরের স্তব করিতে লাগিল। গৌর কহিলেন, "আর কখন পাপ করিও না। কোটীজন্মে তোমরা যে পাপ করিয়াছ, যদি আর পাপ না কর তবে সে পাপের ভার আমি গ্রহণ করিলাম।" জগাই মাধাই আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌরের আদেশে ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া উভয়কে গৌরের গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় গৌর কহিলেন, "পূর্ব্বে ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে লোকে অশুচিবোধে গঙ্গাস্নান করিত। আমি ইহাদিগকে এত সাধু করিয়া তুলিব

যে ইহাদের স্পর্শে গঙ্গাস্নান-ফল লাভ হইবে। ইহারা আর মদ্যপ নহে, ইহারা আমার সেবক। ভক্তগণ, সকলে ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।" ভক্তগণ জগাই-মাধাইকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তদবধি জগাই-মাধাই পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নান করতঃ দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করিয়া তাহারা "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া অহর্নিশি রোদন করিত। পূর্ব্বের হিংস্র-ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহাদের হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইত। কেবল গৌর ও নিত্যানন্দের কৃপা মনে হইলে তাহাদের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইত। ভোজনে তাহাদিগের রুচি রহিল না। জীবনের লালসা অন্তর্হিত হইল। গৌর নিজে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। অনুতাপ-জর্জ্জরিত মাধাই একদিন নিত্যানন্দকে একাকী দেখিতে পাইয়া তাহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং অশ্রুজলে চরণ ধৌত করিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোমার পবিত্র অঙ্গে আঘাত করিয়াছি। তোমার রক্তপাত করিয়াছি। আমার মার্জ্জনা কর।" নিতাই নানারূপ প্রবোধ-বাক্যে মাধাইকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি গঙ্গার ঘাট সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। লোকে সুখে গঙ্গাস্নান করিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবে। যাহাকে দেখিবে অতি বিনীতভাবে তাহাকেই নমস্কার করিবে।" নিত্যানন্দের উপদেশ মাধাই অতি যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিল। যাহাকে দেখিতে পাইত, তাহাকেই প্রণাম করিয়া মাধাই বলিত, "জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমার নিকট যত অপরাধ করিয়াছি, সকল ক্ষমা কর।" গঙ্গার ঘাট ত্যাগ করিয়া মাধাই কোথাও যাইত না। তাহার স্বহস্তরচিত ঘাট "মাধাইয়ের ঘাট" বলিয়া নবদ্বীপে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। তাহার কঠোর তপস্যায় লোকে তাহাকে ব্রহ্মচারী আখ্যা প্রদান করিল।

জগাই-মাধাইয়ের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন-কাহিনী দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীহন্তা, নরহন্তা, গোব্রাহ্মণহন্তা পরম দুর্ব্বৃত্ত দস্যু গৌরের কৃপায় পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। গৌর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া সকলের ধারণা জন্মিল।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জীবনটা কি ?

প্রবন্ধ-শীর্ষের এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়া পণ্ডিত-মূর্খ, দার্শনিক-অদার্শনিক, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক কত লোকে যে কত কথা বলিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। বোধ হয় যে দিন চিন্তা করিবার শক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই প্রশ্নটির সদুত্তরের জন্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু আজও তাহার উত্তর মিলিল

না। ঘোর দার্শনিক তাঁর পাঁজি পুঁথি খুলিয়া হয় ত গম্ভীরভাবে বলিবেন, এই যে তুমি, আমি, ঘটপট যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই মায়ার রচনা। রসিক কবি হাস্যমুখে বলিবেন,

"নাঃ জীবনা কিছু না,
একটা ইঃ একটা উঃ একটা আঃ"

কিন্তু ইহাতে তো মন বুঝে না। এই সংসারটা না হয় মায়াই হইল, এবং জীবনটা না হয় একটা ইঃ একটা উঃ এবং আর একটা আঃ হইল, সুখে দুঃখে কাটিয়া গেল, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানটুকু দিয়া মনকে তো শান্ত করা যায় না। যে সকল জিনিষ জড়, কি প্রকারে তাহারা চেতনা পায় এবং কি প্রকারে তাহাদের ভিতরে জীবনের নানা অদ্ভুত কার্য্য চলিতে থাকে, মন তাহাই জানিতে চায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া প্রশ্নটা আসিয়া পড়িল বিজ্ঞানে। আধুনিক বিজ্ঞানে ইহার কি প্রকার উত্তর পাওয়া যায় আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আভাস দিব।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট প্রশ্নটির উত্তর চাহিলে তাঁহারা বলেন, দুগ্ধে 'দম্বল' অর্থাৎ দধিবীজ দিলে তাহা যেমন গাঁজিয়া উঠিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার রূপান্তর পাইয়াই জীবনের কার্য্য চলে। দুগ্ধে দধিবীজ দেওয়াই গাঁজানো বা মাতানোর (Fermentation) একমাত্র উদাহরণ নয়। ময়দা বা সুজিতে খামী দিয়া যখন আমরা পাঁউরুটি প্রস্তুত করি, ভাতে জল দিয়া আমরা যখন পান্তাভাত প্রস্তুত করি, তখনো আমরা ঐসব জিনিষকে গাঁজাই। বিজ্ঞানের মতে, আমরা যাহাকে জীবন বলি, তাহা এই প্রকারের নানা গাঁজানো বা মাতানো লইয়াই চলে। কথাটা হঠাৎ শুনিলে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততার এত প্রমাণ আছে যে, ইহাকে সত্য বলিয়া মানিতেই হইতেছে।

কখনই কোন বৃহৎ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা একদিনে এবং এক জনের চেষ্টায় হয় নাই। কেহ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, কেহ সেগুলিকে একত্র করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যুগ-যুগান্তের চেষ্টায় এই প্রকারেই এক একটি সিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়া যায়। আমরা যে সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহারও প্রতিষ্ঠা ঐ প্রকারে ধীরে ধীরে হইতেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বহু শারীর-তত্ত্ববিদের হস্তচিহ্ন ইহাতে ধরা পড়ে। যাঁহারা ইহার গোড়া পত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে, প্রথমেই ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত পাষ্টুরের (Pasteur) কথা মনে আসে। দুগ্ধে দধিবীজ দিলে বা ময়দায় খামী দিলে সেগুলি কেন গাঁজিয়া রূপান্তরিত হয়, ইহা লইয়া তিনি এক সময় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে জানিয়াছিলেন, এক প্রকারের অতিক্ষুদ্র জীব দুগ্ধে বা ময়দায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা যখন দধি প্রস্তুত করিবার দুগ্ধে 'দম্বল' দিই, তখন সেই জীবাণুরই কতকগুলি দুগ্ধে ছাড়িয়া দিই, তার পর সেগুলি বংশ বিস্তার করিয়া সমস্ত দুগ্ধকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে দুগ্ধ দধির মূর্ত্তি

গ্রহণ করে। কেবল ইহাও নহে,—ওলাউঠা ডিপথিরিয়া প্রভৃতি নানা রোগের মূলেও তিনি ঐকার জীবাণুর কার্য্য দেখিয়াছিলেন। ঐ সকল রোগের জীবাণু মানুষ বা অপর প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বংশবিস্তার করিতে থাকিলেই যে, প্রাচীন দেহে ঐ বিশেষ বিশেষ রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। তা ছাড়া প্রাণীর স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখাতেও তিনি বিশেষ বিশেষ জীবাণুর কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পাষ্টুর পরম বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং রসায়নবিদ্যায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, জীবাণু-দ্বারা মানুষের দেহে বা নানা জড়পদার্থে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। কিন্তু এই কথা প্রকাশ করিবার পাপ তিনি নিজস্কন্ধে লইতে সাহস করেন নাই। জীবনের কার্য্যের সঙ্গে যে, রাসায়নিক কার্য্যের কোনও সম্বন্ধ আছে তাহা প্রকাশ করা সত্যই সে সময়ে পাপের বিষয় ছিল। খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণও তখন জীবনের কার্য্যকে একটা সৃষ্টিছাড়া রহস্য-ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন! পরীক্ষাগারে নানা পদার্থের যোগবিয়োগে, আমরা যে সকল ঘটনা ঘটিতে দেখি, এবং যে প্রাকৃতিক নিয়মের সাক্ষাৎ পাই, তাহা জীবশরীরের কার্য্যে কখনই চলে না, এই এক সংস্কার তাৎকালিক বৈজ্ঞানিকদিগের মনে বদ্ধমূল ছিল। কাজেই প্রাণিদেহে জীবাণুর কার্য্য সম্পূর্ণ জৈব কার্য্য বলিয়াই স্থির হইয়া রহিল, ইহার সহিত রাসায়নিক কার্য্যের যে কোন যোগ থাকিতে পারে তাহা আর কাহারও মনে হইল না।

পাষ্টুরের মৃত্যুর পর জর্ম্মাণীতে বুক্‌নার (Buchner) নামক এক অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাঁর স্বাধীন চিত্ত সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে নাই। জীবাণুর কার্য্য, গোড়ায় জৈব কার্য্য হইলেও তাহা যে রাসায়নিক কার্য্য তাহা তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল প্রচার করা নয়, হাতে হাতে তাহা দেখাইতেও লাগিলেন। 'দম্বল' বা অপর কোন খামী (yeast) লইয়া তিনি সেগুলির উপর চাপ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, খামীর কোষগুলি (cells) ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেগুলি হইতে এক-প্রকার রস নির্গত হইতে লাগিল। বুক্‌নার এই রস পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে লাগিলেন, তাজা জীবাণুযুক্ত বীজ নিক্ষেপ করিলে দুগ্ধ বা চিনির রস প্রভৃতিতে যে পরিবর্ত্তন হয়, ঐ সকল জীবকোষের রস দিয়াও অবিকল সেই পরিবর্ত্তনই সুরু হয়। লোকে বুঝিতে লাগিল জীবাণুর কার্য্যে জীবনীশক্তি নামক কোন রহস্য জড়িত নাই। ইহাতে জীবাণুগণ তাহাদের দেহে কি প্রকারে রস প্রস্তুত করে তাহা স্থির হইল না বটে, কিন্তু সেই রসই যে, নানা পদার্থের সহিত মিলিয়া রাসায়নিক ক্রিয়া চালায় তাহাতে আর কাহার সন্দেহ রহিল না। পাষ্টুর সাহেব যে 'জীবনী-শক্তি'র ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন নাই, তাহার ভিত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ইহার অব্যবহিত পরে বার্ট্রাণ্ড (Gabriel Bertrand) নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাতে ইনি যে ফল পাইয়াছিলেন, তাহাতে জীবনের কার্য্য ও রাসায়নিক কার্য্যের একতা আরো সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। জীবনীশক্তি ও রাসায়নিক শক্তির একতার কথা ইতিপূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত লাভোসিয়ার্ দেখাইয়াছিলেন। পরীক্ষাগারে অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে হইলে আমরা যেমন কখন কখন বায়ুর নাইট্রোজেন্‌কে বর্জ্জন করিয়া অক্সিজেন্‌কে গ্রহণ করি, প্রাণীর ফুস্‌ফুস্‌ও যে ঠিক সেই প্রকারেই অক্সিজেন্ সংগ্রহ করিয়া জীবনের কার্য্য চালায়, তাহা বহুপূর্ব্বে এই লাভোসিয়ার সাহেবই প্রচার করিয়াছিলেন। বার্ট্রাণ্ড সাহেব দেখাইতে লাগিলেন, প্রাণীর ফুস্‌ফুসে এমন একটি জিনিষ আছে, বায়ু হইতে অক্সিজেন্ সংগ্রহ করাই যাহার কাজ। তাপপ্রয়োগে তাহা নষ্ট হয়, এসিড্ বা বিষের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার ক্রিয়া লোপ পায়। ইহার প্রত্যেক কার্য্য পাষ্টুরের আবিষ্কৃত সেই খামীর (yeast cells) কার্য্যের সহিত অবিকল মিলিয়া গেল। বার্ট্রাণ্ড সাহেব এই জিনিষটাকে Oxydase নামে অভিহিত করিলেন।

এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ও শারীরবিদ্‌গণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পাষ্টুরের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছিলেন, সদ্য অঙ্কুরিত বীজে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা বীজের শ্বেতসারকে (starch) বিশ্লিষ্ট করিয়া অপর কতকগুলি নূতন পদার্থে রূপান্তরিত করে। প্রাণীর মুখের লালাতেও যে ঐ প্রকার একটা পদার্থ মিশ্রিত আছে তাহাও সকলে জানিয়াছিলেন। তার পর প্রাণীর পাকাশয়ে পেপ্‌সিন্ (pepsin) নামক একটা পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জিনিষটার গুণেই যে প্রাণীরা মাংস বা ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্য আহার করিয়া হজম করিতে পারে তাহাও সকলে দেখিয়াছিলেন। যকৃৎ হইতে প্রাণীর দেহে, যে পিত্ত-রস (bile) নির্গত হয়, তাহা কি প্রকারে তৈলময় খাদ্যকে শরীরের কাজে লাগায় তাহারও আভাস পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পাকাশয়ের অপর রসগুলির কার্য্যের লক্ষণও বৈজ্ঞানিকদিগের জানা ছিল। পাষ্টুরের আবিষ্কার ও বার্ট্রাণ্ডের পরীক্ষার ফল প্রচারিত হইলে কাজেই এই সকল তথ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। জীবদেহের নানারসের কার্য্যের সহিত পাষ্টুরের আবিষ্কৃত 'খামী'র কার্য্যের একতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু, তথাপি খামী'র সজীব জীবাণু ও প্রাণিদেহের নানা রসের মধ্যে পার্থক্য রাখিবার জন্য, দেহ-রসগুলিকে নানা লোকে নানা নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। কেহ সেগুলিকে Euzymes কেহ বা তাহাদিগকে Zymases বলিতে লাগিলেন।

যখন পাষ্টুরের আবিষ্কৃত জীবাণুর কার্য্যের

সহিত নানা শারীরিক কার্য্যের এই প্রকার ঐক্য একে একে ধরা পড়িতেছিল, তখন এক অভাবনীয় বাধা আসিয়া গবেষণার গতি রোধ করিয়া দিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, পাষ্টুরের সেই জীবাণুর কাজ কেবল জিনিষকে ভাঙ্গিয়া ফেলে ব্যতীত আর কিছুই নয়। যখন শর্করায় আমরা বিশেষ জীবাণুযুক্ত খামী নিক্ষেপ করি, তখন তাহা শর্করা ভাঙ্গিয়া মদ্য (Alcohol) এবং অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic Acid) উৎপন্ন করিতে থাকে। পাকাশয়ের পেপ্‌সিন্ নামক রসও ঠিক ঐ প্রকারেই উদরস্থ খাদ্যের মাংস ইত্যাদিকে ভাঙ্গিয়া নানা নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। কিন্তু জীবদেহে ভাঙ্গার সহিত অবিরাম যে গড়ার কাজও চলিতেছে তাহার ব্যাখ্যান কোথায়? কেবল ভাঙ্গা লইয়াই ত জীবন নয়,—ভাঙ্গা ও গড়ার অপূর্ব্ব যোগেই জীবনের কার্য্য। সুতরাং গাঁজানো (Fermentation) লইয়াই জীবন, এই কথা বলিয়া যাঁহারা জয়োল্লাসে উন্মত্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে কিছুদিনের জন্য নীরব থাকিতে হইল।

কিন্তু গবেষণার বিরাম হইল না,—নানা দেশে নানা বৈজ্ঞানিক গাঁজানোর কার্য্যে কোন নূতন জিনিষ গঠিত হয় কি না, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কত জিনিষের কত প্রকার খামী লইয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পরীক্ষাতেই সংগঠন দেখা গেল না। শেষে ইংরাজ রসায়নবিদ্ হিল্ সাহেব (Croft Hill) এক পরীক্ষায় খামী দ্বারা প্রকৃত সংগঠন দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। শ্বেতসারে (Starch) খামী দিলে তাহা চিনি প্রভৃতি পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। যতক্ষণ শ্বেতসারের এক কণিকা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ এই পরিবর্ত্তনের বিরাম হয় না। শ্বেতসার নিঃশেষিত হইলে এই কার্য্যের লোপ ঘটে, এবং নূতন শ্বেতসার দিলে পুনরায় ঐ বিশ্লেষণ সুরু হয়। হিল্ সাহেব একটি পাত্রে শ্বেতসারের সহিত খামী (malt Euzyme) মিশাইয়া, তাহকে নিঃশেষে বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, এবং পরে তাহাতে ধীরে ধীরে চিনি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।—এই প্রকারে দেখা গিয়াছিল, চিনির যোগে শ্বেতসারের আবার পুনর্গঠন আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই পাষ্টুরের গাঁজানোর কার্য্যে যেমন পদার্থের বিশ্লেষণ ঘটে, তাহাতে সেই প্রকারে নূতন পদার্থের যে সংগঠনও হইতে পারে তাহা বুঝা গেল। হিল্ সাহেবের এই আবিষ্কার অতি অল্প দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে, বোধ হয় দশ বারো বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু একমাত্র উদাহরণে বৈজ্ঞানিকগণ সন্তুষ্ট হইলেন না, নানা দেশের পণ্ডিতগণ নূতন উদাহরণ সংগ্রহের জন্য গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জর্ম্মাণীর জনৈক বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ইমারলিঙ্ সাহেব (Emmerling) আর একটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। ইনি বাদামের তৈলে একপ্রকার খামী দিয়া সেটিকে চিনি এবং হাইড্রোসাইনিক্ এসিড্ (Hydrocya-

nic acid) নামক এক বিষ-পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পরেই তাহাতে আর একপ্রকার খামী (malt ferment) দিবা মাত্র সেটি আবার বাদামের তৈলে পুনর্গঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই আবিষ্কারের পর হইতে প্রতি বৎসরেই খামীর যোগে আরো নূতন নূতন জিনিষের উৎপত্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পাষ্টুরের আবিষ্কৃত তত্ত্ব পদার্থের বিশ্লেষণেই যে সীমাবদ্ধ নয়, তাহা আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, এক খামীর যোগে যেমন আমরা শ্বেতসারকে ভাঙ্গিয়া চিনি ইত্যাদিতে বিশ্লিষ্ট করি এবং তার পর কিছুর যোগে তাহাকে আবার শ্বেতসারে পুনর্গঠিত করি, প্রাণিদেহে অবিকল সেই প্রকারেই ভাঙ্গাগড়া অবিরাম চলিতেছে। কোন দেহজ খামী উদরস্থ আমিষ খাদ্যকে ভাঙ্গিতেছে, কেহ তৈলময় খাদ্যকে বিশ্লিষ্ট করিতেছে। তার পরে আর এক নূতন খামী ঐগুলির সঙ্গে মিশিয়া হয় ত এমন কতকগুলি জিনিষের গঠন করিতেছে যাহা স্থায়ীরূপে দেহেরই অংশ হইয়া পড়িতেছে।

এই সকল আবিষ্কার দ্বারা শারীরতত্ত্ব যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে যতই গবেষণা করিতেছেন, নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। আধুনিক শারীর-তত্ত্ববিদ্গণ বলিতেছেন, দেহের সূচ্যগ্র প্রমাণ স্থানে কোটি কোটি জীবকোষ (cells) অবস্থান করিতেছে। ইহাদের এক একটি কোষ এক একটি বৃহৎ বিজ্ঞানাগার বিশেষ। একই বিজ্ঞানাগারে বসিয়া যেমন বহু লোকে নানা পদার্থ প্রস্তুত করেন,—ঐ এক একটি কোষের ভিতরেই দশ বারটি প্রকোষ্ঠে দশ বারো রকম খামী (ferment) আপনা হইতেই প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রয়োজন বুঝিয়া এই সকল রসই ভাঙ্গা-গড়ার কাজে যোগ দেয় এবং জীবনের কার্য্য দেখায়। প্রাণীর যকৃতের এক একটি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম কোষে যে সকল খামী প্রস্তুত হয়, সেগুলির মধ্যে কোনটি চিনি প্রস্তুত করে, কোনটি অম্ল প্রস্তুত করে, কোনটি ইউরিয়া (urea), কোনটি পিত্তরস এবং কোনটি নানাপ্রকার রঙ্ উৎপন্ন করিতে ব্যস্ত থাকে। আবার কতকগুলি দেহস্থ বিষ-পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নষ্ট করিতে থাকে, কতকগুলি হয় ত পাকাশয়ে উৎপন্ন অম্লকে অপর পদার্থের সহিত মিশাইতে ব্যাপৃত থাকে। কেবল যকৃতে নয়, প্লীহা, মূত্রাশয়, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি দেহের সকল অংশেই কোটি কোটি জীবকোষের এই প্রকার কার্য্য নিয়তই চলে। এমন কি মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীতেও এই প্রকার বিশেষ খামী জন্মাইয়া ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া জীবনের কার্য্য দেখায়। সুতরাং দম্বলে দধির উৎপাদন এবং জীবনের কার্য্য একই বলিয়া আমরা প্রবন্ধারম্ভে যে-কথাটার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা যে নিরর্থক নয়, এই সকল পরীক্ষা-দৃষ্ট ব্যাপার হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ জীবদেহের যে

খামীকে জীবনীশক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই সকল Euzymes or Zymases জিনিষটি কি? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। ইহার যথার্থ উত্তর দেওয়াই আজকাল বৈজ্ঞানিকদিগের সাধনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কত দেশে কত বৈজ্ঞানিক যে নীরবে গবেষণা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। কোন্ শুভদিনে ইহাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা ঠিক্ বলা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাসায়নিক প্রথার বিরোধ করিলে সেই হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন এবং অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই ঐ সকল পদার্থে ধরা পড়ে না। কি প্রকারে এই সকল সুপরিচিত পদার্থ সংযুক্ত হইয়া জীবনীশক্তির প্রকাশ করে তাহা বিজ্ঞানের একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রসায়নবিদ্‌গণ যেমন অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্‌কে একত্র করিয়া পরীক্ষাগারে জল প্রস্তুত করিতে পারেন, সেই প্রকারে যে দিন তাঁহারা অঙ্গার, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ইত্যাদিকে মিলাইয়া এক বিন্দু খামী (Ferment) বা একটি জীবকোষ প্রস্তুত করিতে পারিবেন সেই দিনই বিজ্ঞান ধন্য হইবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

চীনে প্রজাতন্ত্র

রাষ্ট্রবিপ্লবকারী সর্দ্দারদিগের সম্মুখে আর এক সমস্যা এই যে, রিপাব্লিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছেন কি না এবং তাহার মাল মসলা সমস্ত সংগ্রহ হইয়াছে কি না?

এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে চীনে প্রজাতন্ত্রশাসনের উপযোগী কি কি মাল-মসলা প্রস্তুত আছে।

প্রজাতন্ত্রের সাপক্ষে চীনের মুদ্রাযন্ত্রের প্রাদুর্ভাব বেশ আছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে চীনে বহু সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে পেকিনে এক গবর্ণমেণ্ট গেজেট ছাড়া অন্য কোন সংবাদপত্র ছিল না, কিন্তু এখন তথায় ষোল খানা দৈনিক কাগজ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একখানি তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পরিচালিত। সমগ্র দেশে বর্ত্তমানে মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজের সংখ্যা মোট ২৭০ খানা।

জাতীয় সমিতি সকল এবং সিনেট স্থাপনের পর বক্তৃতা করার প্রণালী প্রচলিত হইল। পূর্ব্বে বক্তৃতাকারীকে লোকে পাগল বলিত, অথবা তাহার কার্য্যকে অভদ্রতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিত। কিন্তু প্রজাতন্ত্র-শাসনের উপযুক্ত মাল-মসলা চীনে এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

প্রজাতন্ত্রশাসনের আর এক অন্তরায় এই যে, চীনের জনসাধারণের দরিদ্রতা। নিজে নির্ধনী হইয়া জাপানের পক্ষে চীনকে দরিদ্র বলিয়া নিন্দা করাটা ভাল দেখায় না। তথাপিও এ কথা সত্য যে, চীনে লক্ষ লক্ষ লোক অতি কষ্টে দিন

যাপন করে। একজন মজুরের গড়পড়তা দৈনিক আয় তিন পেনি হইতে ছয় পেনি (ছয় আনা)। সমস্ত নিষ্কর্ম্মা লোকের ভাগ্যে যদি ইহাও মিলিয়া যায় তাহাও সৌভাগ্য মনে করা যাইতে পারে।

চীন জাতি পরিশ্রমী, শিল্পনিপুণ এবং বাণিজ্যব্যবসায়ে ইহারা অতি চতুর ও ক্ষমতাশালী। এমতাবস্থায় এই জাতির অধিকাংশ লোক কেন কষ্টে দিন যাপন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, চীন জাতির দরিদ্রতার মূল কারণ তাহাদের পরিবার-গঠন প্রণালী।

প্রত্যেক পুরুষকেই, মূকবধিরকেও পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে হইবে। সে পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হউক আর না হউক; বিবাহের খরচ থাকুক বা না থাকুক, সে উপার্জ্জনক্ষম হউক আর না হউক, তাহার গলায় একটা স্ত্রী দিতেই হইবে। বিবাহ করিয়া কি খাইবে সে ধারণা পূর্ব্বে কখনও করে না। এই অন্ন-কষ্টের উপর আবার প্রতি বৎসর একটী করিয়া সন্তান জন্মিতে থাকিলে সোণায় সোহাগা। চীনাদের বৃহৎ পরিবার সৃষ্টি করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্রতার আর এক কারণ।

৪

এখন বিচার করা কর্ত্তব্য যে, চীনের জনসাধারণ কি পরিমাণে বর্ত্তমান ধরণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে ১৯০৮-০৯ খৃঃ সমস্ত রাজ্যে ৫২৬৫০টী স্কুলের মধ্যে ১৬৬৭১২০ ছাত্র ছিল। এ সকল সাধারণ স্কুলের ছাত্র। এতদ্ব্যতীত ইউরোপে ৫০০ ইউনাইটেড ষ্টেটসে ৭১৭ জাপানে ১৫০০ মোট ২৭১৭ জন ছাত্র বিদেশে শিক্ষা পাইতেছে। চীনা ছাত্রের সংখ্যা জাপানে এখন কমিয়াছে। পূর্ব্বে এক জাপানেই ৮০০০ ছাত্র ছিল।

খুব কড়া-কড়ি হিসাব না করিয়া মোটা-মুটি ধরিলে যত ছাত্র গত বিশ বৎসর বিদেশে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা অড়াই লক্ষ ধরা যাউক। এবং দেশে যত লোক বর্ত্তমান প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা দশ লক্ষ ধরিলাম। ইহা ভিন্ন বিদেশী গ্রন্থ সকল অনুবাদ করিয়া এবং মিশনারি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক সকল ধরিলে ৪০,০০০০০ হইবে। ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত লোক-সংখ্যার তুলনায় চীন দেশে শিক্ষিত লোকের অনুপাত শতকরা একজন হইবে। এই শতকরা একজন শিক্ষিত লোকের দ্বারা কি একটী প্রজাতন্ত্রের কার্য্য চলিতে পারে!

আমার এ কথা বলা উদ্দেশ্য নহে যে, চীনারা অশিক্ষিত বা অজ্ঞ লোক। তাহাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য কোন সভ্য দেশের সাহিত্য অপেক্ষা হীন নহে। আমার বলা উদ্দেশ্য এই যে, বিদেশী ধরণে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এত নগণ্য যে তাহা দ্বারা এই বিস্তীর্ণ দেশে রিপাবলিক গবর্ণমেন্টের কার্য্য চলিতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্য বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্র গবর্ণ-মেন্টের পক্ষে কোনই উপকারে আসিবে না এবং পদে পদে বিঘ্ন জন্মাইবে।

চীনের ভবিষ্যতের প্রতি আমার দৃঢ়

বিশ্বাস আছে। যেমন তাহাদের অতীত ইতিহাস, ভরসা করি, ভবিষ্যৎ ইতিহাসও তাদৃশ উজ্জ্বল হইবে।

বর্ত্তমান য়্যাংগ্লো-স্যাক্‌সন্ জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন বনজঙ্গলে বাস করিত, তখন চীনজাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। তাহাদের ভূরি ভূরি সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি তখন সমুন্নত অবস্থায় ছিল। প্রায় সমস্ত আসিয়ার উপর চীনের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত। এমন কি, ইউরোপে ডানিউব নদী পর্য্যন্ত চীনের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। চীনসম্রাটের দূতদিগকে ইউরোপের রাজাগণ এক সময়ে অবনত জানুতে অভিবাদন করিতেন। বর্ত্তমান রুষজাতির পূর্ব্বপুরুষ শ্ল্যাভগণ অবনতজানু হইয়া চীনকে কর প্রদান করিত। চীনের দীর্ঘ জীবনে একে একে কত শত রাজ্যের অভ্যুদয় হইল এবং যথাক্রমে তাহাদের অধঃপতন হইল; চীনের সমসাময়িক ইজিপ্ট ধূলিধূসরিত হইল। ডেরায়কের রাজ্য কোথায় গেল, গর্ব্বিত গ্রীস বা গৌরবান্বিত রোম এখন কোথায়? তাহাদের কীর্ত্তি এখন ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য!

এই জাতির পর জাতির অধঃপতনের মধ্যে চীন জাতি এখনও জীবিত আছে। এ কথা সত্য যে চীনে বহুবার রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছে এবং এক রাজবংশের পরিবর্ত্তে অন্য রাজবংশ স্থাপিত হইয়াছে। বিদেশীয়গণ আসিয়া চীন জয় করিয়াছে, কিন্তু চীনকে বাহুবলে যেই জয় করুক না কেন, নৈতিক ও ধর্ম্মবলে চীন সমস্ত বিজেতাকে আপনার মধ্যে এমনভাবে মিলাইয়াছে যে শেষে জেতা-বিজেতার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় নাই। এ যাত্রায় চীন কি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, না পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে? কি প্রণালীতে ইহার সংস্কার-কার্য্য সাধিত হয় তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি না করিতে পারিলে ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন।

৫

চীনের উচিত ছিল—অতি সাবধানে ধীরে ধীরে কার্য্য করা। বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে এইভাবে চলা নিতান্তই প্রয়োজন

মাঞ্চুশাসনকর্ত্তাদিগের অদূরদর্শিতা এবং অকর্ম্মণ্যতার ফলে অতি রক্ষণশীল চীনজাতি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বিদেশী শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া এক সঙ্কটপূর্ণ বিষম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যদি এই নূতন শাসনপ্রণালীতে ইহারা কৃতকার্য্য না হয়, তাহা হইলে রাজ্য ছারখার হইবে, অন্তর্বিবাদ ও অরাজকতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সম্ভবতঃ বিদেশীয়গণ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন।

যে অল্প সময়ের মধ্যে চীনে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলন করা হইয়াছে, তাহাতে ইহার সাফল্যের প্রতি গুরুতর সন্দেহ আছে।

চীনের ন্যায় জাপানের শিক্ষা ও পূর্ব্বগৌরব থাকা সত্ত্বেও জাপানকে বিশ বৎসর যাবত নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলনের জন্য শিক্ষানবিশি করিতে হইয়াছিল। এই নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীও রক্ষণশীল রাজার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত

জিনিষ। বর্ত্তমানে যে ইহা সফলকাম হইয়াছে তাহাও কেবল রাজার বিশেষ প্রতিপত্তির দ্বারা। চীনে রাজ্যের কেন্দ্রীভূত রাজশক্তিকে যে কেবলমাত্র নষ্ট করা হইয়াছে, তাহা নহে। চীনের নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর বয়স মাত্র ছয় বৎসর। রুষজাপান-যুদ্ধের পর হইতে চীনে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে চীন গবর্ণমেণ্টের এক কমিসন বা অনুসন্ধানসমিতি গঠিত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। সেই কমিশন নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর স্বপক্ষে মত দেওয়ায় বৃদ্ধা রাণী তাহা মঞ্জুর করেন।

বৃদ্ধা রাণী যে রাষ্ট্রনীতি-অভিজ্ঞা ও দুরদর্শিনী ছিলেন তাহা তাহার আদেশ বা ঘোষণাপত্র দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। যথা "বর্ত্তমান সময়ে কোন্ প্রণালীতে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী গঠিত হইবে তাহা অবধারিত হয় নাই। জনসাধারণের এ বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয় নাই। আমরা যদি তাড়াতাড়ি দেশ-কালের অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কোন একটা নিয়ম খাড়া করি তাহা হইলে তাহা কেবল কাগজে-কলমেই থাকিয়া যাইবে।" সুতরাং নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলনের পূর্ব্বে কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার একটা মোটামুটি অবধারণ তিনি করিয়াছিলেন মাত্র। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে হউন-সি-আই টিন্‌সিনে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-প্রথা দ্বারা মিউনিসিপালিটী গঠন করিয়াছিলেন। এই আদর্শ অনুসারে প্রাদেশিক সমিতি সকল গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার কার্য্য ১৯০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইতি মধ্যে জাতীয় সমিতি গঠনের জন্য দেশে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং ১৯০৮ খৃঃ অব্দে ঘোষণাপত্র দ্বারা জাতীয়-সমিতি স্থাপনের কথা প্রচারিত হইল। ১৯১১ খৃঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টে নিয়ম-তন্ত্র-শাসন-প্রণালীদ্বারা কি কি বিষয় সংস্কারের প্রয়োজন তাহার একটা অবধারণ করা হইয়াছিল, যথা—রাজ্যের আইন-সংস্কার, অর্থনীতির সংস্কার, শিক্ষা-বিভাগ এবং সমস্ত রাজ্যে যাহাতে পুলিশের সুবন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা।

এই সকল বিভাগের সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন হইলে তবে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী স্থাপনের বিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু এই সংস্কার-কার্য্য সমস্তই প্রায় কাগজে কলমে থাকিয়া গেল, ইহা সম্পন্ন করিতে কেহ বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। দেশে কেবল পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপনের জন্য অনবরত আন্দোলন হইতে লাগিল এবং পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপনের জন্য যে নয় বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছিল তাহা কমাইয়া তিন বৎসর ধার্য্য করা হইল। এই জাতীয় পার্লিয়ামেণ্টের ভ্রূণ স্বরূপ টুং চেং ইণ্ডিয়ান নামক সমিতি ২০১ মেম্বর দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। গত বৎসর এই সমিতিতে যখন নানা সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল তখন উঃ চাংএ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

শ্রীরামলাল সরকার।

৺ জগদীশনাথ রায়

ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়া নোয়াখালি যাইবার পূর্ব্বে ৩।৪ বৎসর ধরিয়া জগদীশনাথ রায় কলিকাতায় ছিলেন, কয়েক বৎসর হরি ঘোষের ষ্ট্রীট অধুনা জগদীশ নাথ রায় লেন স্থিত তাঁহার বসত-বাটীটি গণ্যমান্য সাহিত্যসেবী বঙ্গের কৃতী সন্তানগণের সম্মিলনের একটি প্রধান স্থান ছিল; প্রত্যেক শনিবারে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আসিতেন, রবিবার থাকিয়া সোমবার প্রাতে চলিয়া যাইতেন। বঙ্কিম তখন বারুইপুর মহকুমায় ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। যে মহাত্মারা একত্রিত হইতেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি—রাজনারায়ণ বসু, প্যারিচরণ সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামতনু লাহিড়ি, দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ধরণী কথক, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, জষ্টিস্ অনুকূল মুখোপাধ্যায়, তারাপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, জষ্টিস্ দ্বারিকানাথ মিত্র প্রভৃতি; ইংরাজদিগের ভিতর আসিতেন সার্ হেনরি কটন, সার হেনরি হ্যারিসন, জষ্টিস বেভারলি, ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার নরমান প্রভৃতি মহোদয়গণ। কথাবার্ত্তা যাহা হইত তাহা শুনিয়া অনেকেই বিশেষ শিক্ষালাভ করিতন। এই বাড়ীতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকগুলি ছাপাইবার পূর্ব্বে জগদীশনাথ রায়কে পড়িয়া শুনাইতেন এবং তাঁহার মন্তব্য জানিয়া অদল বদল করিতেন, বঙ্কিম এবং জগদীশের মধ্যে যথার্থ সহোদরের ন্যায় ভালবাসা ছিল। বঙ্কিমের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যখন পদতলে ফোড়া হয়, তখন জগদীশনাথ রায়ের ভবনে তিনি ছিলেন, পরে অন্যত্র বাসা বাটী ভাড়া লওয়া হয় সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চ্চা হইত, অনেক বড় গায়ক এবং বাদক এখানে সমবেত হইয়া আনন্দ করিতেন। একদিন মাইকেল জগদীশনাথ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার অমৃতাক্ষর ছন্দ গীত হইতে পারে কি না, জগদীশ তখনই সুর লয় দিয়া প্রমীলার বর্ণনাটি গাহিলেন, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরও গীত হইত, জগদীশ ও মাইকেলে সুরতাল সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে, এমন সময় বঙ্কিম ঐ সম্বন্ধে কি টিকাটিপ্পনি করিলেন, মাইকেল রহস্যচ্ছলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তুই ছোঁড়া চুপ কর, বুড়াদের কথায় আর যোগদান কর্ত্তে হবে না।" এই বাটীতেই জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র (তখন নবীন ছাত্র মাত্র) বঙ্কিম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে স্কটের আইভ্যানহো পড়িয়াছিলেন কি না?" বঙ্কিম উত্তর করিলেন যে ঐ পুস্তক তিনি আদৌ পাঠ করেন নাই।

আর দুই একটি গল্প বলিয়া নোয়াখালি

যাত্রার কথা বলিব। এড়েঁদহে একবার একটি ডাকাতি হয়, ডাকাতেরা বাড়ী-ওয়ালার প্রায় দশ হাজার টাকার দ্রব্য লুট করিয়া লইয়া যায়, স্থানীয় সব ইন্‌স্পেক্টার তদারক করিলেন, কিছু করিতে পারিলেন না, এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলিস্ সাহেব এবং কাপ্তেন বার্ড ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সারে জমিনে গিয়া বিস্তর চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না, বাড়ীওয়ালা হতাশ হইয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিল, তখন হুকুম হইল জনৈক সুযোগ্য কর্ম্মচারীকে পুনরায় তদারকের জন্য পাঠান হয়, তখন জগদীশনাথ রায়ের উপর এ ভার পড়িল, তিনি সপ্তাহ কাল কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন সাহেবেরা বলিলেন "কেন পরিশ্রম করিতেছ, ফল কিছু হইবে না।" জগদীশনাথ উত্তর করিলেন "সপ্তাহ কাল দেখিব, যদি কিছু করিতে না পারি, তবে ছাড়িয়া দিব।" জগদীশনাথ এ কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যত শুণ্ডিকালয়, গুলির আড্ডা, সামান্য বারবনিতাদের ভবন ছিল সর্ব্বত্র ছদ্মবেশে পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে পাঠাইতে লাগিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ বৈকালে আসিয়া রিপোর্ট করিতে লাগিলেন। একদিন এক মুসলমান দারোগা আসিয়া বলিলেন যে "আজ দরমাহাটা কাঠের গোলার নিকট গুলির আড্ডায় গিয়াছিলাম, সেখানে গান-বাজনার চর্চ্চা আছে, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি দেখিলাম, একটা ভগ্ন সেতারও দেখিলাম।" জগদীশনাথ রায় বলিলেন "দেখ, গুলি খাও বা না খাও, ভাণ করিবে, আড্ডাধারীকে দুই আনার জায়গায় চারি আনা দিবে, তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া জানিয়া লইবে, ভাঙ্গা সেতারটা কার? সে তত্ত্ব লইয়া অমনি সেতারের মালিককে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে।" দারোগা চলিয়া গেলেন। গ্রীষ্ম কাল, আমরা সকলে ছাদে বসিয়া আছি, এমন সময় একটা খাঁটমুগরো মানুষকে দারোগা আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তাহাকে দেখিয়া জগদীশনাথ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই কি করিস্?" সে বলিল "হাটখোলায় এক কাঠের গোলায় ছুতরের কর্ম্ম করি।" তখন রায় মহাশয় রাগের ভাণ করিয়া বলিলেন "ব্যাটা হারামজাদ, ছুতরি করবেন আর অবকাশ মত রাত্রে ডাকাতি করবেন, বেটা আমি সব জানি, এখন খুলে বল্, আমি তোকে বাঁচিয়ে দিব ছুতার উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল "হুজুর ঠিক বল্‌ব? আমায় বাঁচান।" এই বলিয়া সে আনুপূর্ব্বিক ডাকাতির কথা জানাইল, কে কে দলে ছিল, কোথায় চোরা মাল রাখা হইয়াছে ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সন্ধান দিল, তখন জগদীশনাথ দারোগাকে হুকুম দিলেন "তুমি আলিপুর লাইনে যাও, সেখানে যত কনষ্টেবল আবশ্যক হইবে, তাহা লইয়া আজই রাত্রে ছুতার যে যে লোকের নাম করিয়াছে, তাহাদের ধৃত করিবে এবং যে স্থান ও উল্লেখ করিয়াছে, সেখান হইতে, চোরাই মাল উদ্ধার করিবে, আমি রিজার্ভ ইন্‌স্পেকটারের

উপর হুকুম দিলাম, তোমার যত লোক আবশ্যক, সে দিবে।” পর দিন বেলা দশটার সময় জগদীশনাথ রায়ের বাটীতে পনর ষোল জন ডাকাতকে ধরিয়া আনিল এবং বামালের স্তূপ আনিয়া জড় করিল। এড়িয়াদহের ডাকাতি ব্যতীত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল ডাকাতি হইয়াছিল তাহারও বামাল বাহির হইল। গবর্ণমেণ্ট জগদীশনাথ রায়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁহার যশও পরিবর্দ্ধিত হইল।

আর একটা ঘটনা উল্লেখ করি। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বারুইপুর মহকুমার ভার, তখন তাঁহার এলাকার মধ্যে একটা ভীষণ ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা ধরা পড়িল, কিন্তু এক ছটাকও বামাল বাহির হইল না, সুতরাং বামালের অভাবে ডাকাতদের সাজা পাইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। বারুইপুরের পুলিস-বিভাগ জগদীশনাথ রায়ের অধীন ছিল, তিনিও বারুইপুর গিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমের সঙ্গে মাল বাহির করিবার জন্য একত্রে নানা স্থানে যান, কিন্তু তঁাহাদের চেষ্টা বিফল হইল, বামালের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; সুতরাং ভগ্নমনোরথ হইয়া দুই জনে বারুইপুরে ফিরিলেন। বঙ্কিমের বাসার নিকট একটা পুকুর ছিল, সেই পুকুর ধারে জগদীশ গাড়ী থামাইলেন। বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করিলেন “শৌচের কি আবশ্যক হয়েছে?” রায় মহাশয় উত্তর করিলেন “তাহা নহে, এই পুকুরের ভিতর ডাকাতির সমস্ত মাল আছে।” উচ্চ হাস্য করিয়া বঙ্কিম বলিলেন “তোমার বয়সের দরুণ বিদ্যা-বুদ্ধি তামাদি হইয়া গিয়াছে, ডাকাতেরা মাল ফেলিবার স্থান পাইল না, তাই আমার বাসার নিকট, আমার বুকের উপর মাল ফেলিয়া গেল!” জগদীশনাথ উত্তর করিলেন—“তোমার নব্য বয়স, তোমার বুদ্ধি পক্কতা লাভ করে নাই, তাই বালকের মতন কথা কহিতেছ, এই পুষ্করিণীতেই মাল আছে, দ্যাখ, আমার কথা সত্য কি না”। এই বলিয়া পুলিসকে ডুবুরী আনিতে বলিলেন। আশ্চর্য্যের কথা, সেই পুকুরের ভিতর হইতে সমস্ত মাল বাহির হইল, বঙ্কিম লজ্জিত হইয়া আর কোন কথা কহিতে সাহসী হইলেন না।

জগদীশ বাবুর সিমুলিয়ার বাটীতে প্রত্যেক শনিবার ও রবিবারে বিস্তর কৃতবিদ্য লোকের সমাগম হইত, সাহিত্য-সূচক নানা কথা-বার্ত্তা চলিত এবং সঙ্গীতেরও আলাপ হইত। মরাদ খাঁ, আহমদ্ খাঁ, নিধুবাবু, টপ্পায় সিদ্ধ মধুবাবু, ধরণী কথক প্রভৃতি সুবিখ্যাত গায়কেরা আসিতেন এবং গুণের পরিচয় দিতেন; বাদকের মধ্যে মুকলি বাবু, কেশব মিত্র, শরৎ ঘোষ, নিতাই বাবু প্রভৃতি আসিতেন এবং নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দিতেন। জগদীশ বাবু সুকণ্ঠ এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রাচার্য্য ছিলেন, তিনি গাহিতেন এবং জষ্টিস্ দ্বারিকানাথ মিত্র তবলা বাজাইতেন। সেই সঙ্গে আমরা ডাক্তার জগবন্ধু বসুকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। একদিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে, এবং জগদীশ বাবুর অনুপস্থিত কালে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি এবং কার্য্যদক্ষতার কথা

সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, এমন সময় কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব—স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌত্র—বলিয়া উঠিলেন "আমার দাদার (ব্রজেন্দ্র জগদীশ বাবুকে দাদা বলিতেন) কথা ছাড়িয়া দাও, উনি দেবতা।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "তোমার দাদা কিসে দেবতা হইলেন, তাহা ব্যাখা করিয়া বল।" ব্রজেন্দ্র উত্তর করিলেন "বাবা, সকলে আপনার বুকে হাত দাও, দিয়ে বল দিকি এ সভায় কে আছ যে দুই লক্ষ পাঁচ লক্ষ নহে, ২০।৩০ লক্ষের প্রলোভন, অম্লান বদনে ত্যাগ করিতে সক্ষম।" সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন তাঁহার আদর্শ-চরিত্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবের কথা; নিমক্ ছুঁইয়া সকলেই বড় মানুষ হইয়াছেন, কিন্তু বিশ বৎসর নিমক্ মহলের হাকিমী করিয়া ইনি কপর্দ্দকশূন্য।

এইবার জগদীশ বাবুর নোয়াখালি যাত্রার কথা বলিব, ইংরাজি ১৮৬৮ সালে ইনি নোয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন, তখন উক্ত জেলায় ৭০।৭৫ নম্বর ডাকাতি প্রতি বৎসর হইত। জগদীশ বাবু ঐস্থানে প্রায় তিন বৎসর ছিলেন, প্রথম বৎসর অতিবাহিত হইলে ডাকাতি ৭০।৭৫ হইতে দশ বারটিতে কমিয়া আসিল।

শ্রী ঃ—

উৎপলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি-চঞ্চলা

প্রাচীন মহারাজ্য মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরের উপকণ্ঠে পাটলীগ্রাম। পাটলীগ্রাম পাটলীপুত্র অপেক্ষাও প্রাচীন। পূর্ব্বে যখন রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল, তখন মহারাজা অজাতশত্রু দুর্দ্ধর্ষ বৃজিবংশীয়দিগকে দমন করিবার জন্য গঙ্গা এবং হিরণ্যবতীর সঙ্গমস্থল এই পাটলীগ্রামের সন্নিকটে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভগবান তথাগত একবার আমন্ত্রিত হইয়া এই পাটলী গ্রামে আগমন করেন এবং এই ক্ষুদ্র গ্রামই কালে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ভূমর রাজধানী হইয়া মহা সমৃদ্ধি এবং প্রসিদ্ধি লাভ করিবে বলিয়া ভবিষ্যৎবাণী প্রচার করেন। এই ক্ষুদ্র দুর্গে মহারাজা অজাতশত্রু এক সেনানিবাস সংস্থাপন করেন। এই ক্ষুদ্র দুর্গ এবং সেনানিবাসই পরিশেষে মহানগর পাটলীপুত্র বলিয়া পরিচিত হইল। মহারাজা অজাশত্রুর পুত্র মহারাজা উদয়েশ্বর রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করেন।

ক্রমবর্দ্ধনশীল সেই বিশাল নগরের উপকণ্ঠে জনকোলাহলের অদূরে তাল-তমাল আম্রকাননের অন্তরালে আপনার ক্ষুদ্র বক্ষে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী উদ্যান সরোবর লইয়া ক্ষুদ্র পাটলী সভয়ে সঙ্কোচে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাতীর হইতে সেই গ্রামের মধ্য দিয়া নগরে যাইবার প্রশস্ত পথ।

ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে একদিন অপরাহ্নে একটী যুবক গ্রাম হইতে বাহির হইয়া সেই রাজপথ দিয়া অশ্বারোহণে নগরের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার সুন্দর অথচ সহজ বেশভূষা। পরিধানে পট্টবাস; শুভ্র ওড়নির অর্দ্ধাংশ দ্বারা মস্তকে জড়ান উষ্ণীষ, অপরাংশ স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। ললাটে চন্দন, কর্ণে মুক্তা-শোভিত বলয়, গলায় ফুলের মালা, পায়ে পাদুকা। যুবকের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, শরীর বলশালী। তেজস্বী বলবান অশ্ব পরিচিত আরোহীকে লইয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছিল। উচ্চ পথের উভয় পার্শ্বে গাছের সারি, নিম্নে স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র, স্থানে স্থানে উদ্যান সরোবরযুক্ত সুন্দর সুন্দর বাড়ী, আম জাম তাল তেঁতুলের উদ্যান।

সূর্য্য অস্তোন্মুখ, সন্ধ্যা আগত হইয়াছে এমন সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল। চারিদিক অন্ধকার; পথের ধুলি, গাছের পাতা ঝড়ের বেগে তাড়িত হইয়া অশ্বারোহীর শরীর প্রহৃত হইতে লাগিল। পথপার্শ্বের একটী বৃহৎ গাছ ঝড়ে ভূমিতে পড়িয়া পথ প্রায় বন্ধ করিয়া ফেলিল। তখন মেঘ ডাকিয়া আসিল, প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেগে অশ্বচালনা বিপজ্জনক, অশ্বারোহী অতি সাবধানে চলিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সম্মুখে অনতিদূর হইতে স্ত্রীকণ্ঠের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। অশ্বারোহী অশ্ব থামাইলেন, বলিলেন;—

"কে কাঁদিতেছ?"

পুনরায় ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। অশ্বারোহী বেগে অশ্ব চালাইয়া অগ্রসর হইলেন, তখন বিদ্যুদালোকে দেখিতে পাইলেন, পথের এক পার্শ্বে একটা গাছের তলায় একখানি শিবিকা, শিবিকার নিকট হইতেই কাতর স্ত্রীকণ্ঠ-ধ্বনি আসিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যুবক উচ্চস্বরে বলিলেন;—

"কে কাঁদিতেছ? কেন কাঁদিতেছ? আর ভয় নাই।"

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যুবক দেখিতে পাইলেন, একটী স্ত্রীলোক অসম্বৃত বেশে শিবিকা ধরিয়া দাঁড়াইল। সেই ক্ষণমাত্র দৃষ্টিতেই যুবক দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী যুবতী এবং অসামান্য রূপবতী। আষাঢ়ের নবীন মেঘমালার ন্যায় তাহার নিবিড়কৃষ্ণ কেশরাশি বায়ুবেগে তাহার কপোল স্কন্ধ পৃষ্ঠ বক্ষে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। যুবক বলিলেন;—

"আমি অপরিচিত, কিন্তু বিপদ সময়ে তাহা মনে রাখিবেন না। নিকটে কাহাকেও দেখিতেছি না, আপনি একাকিনী কেন? লোকজন কোথায় গিয়াছে?—কি হইয়াছে?"

স্ত্রীলোকটী শিবিকার আড়ালে সরিয়া উত্তর করিলেন;—

"আমি বড় বিপন্ন।"

"কি বিপদ?—কি হইয়াছে?"

"গ্রাম হইতে নগরে যাইতেছিলাম। ঝড় বৃষ্টিতে এই গাছের তলায় আশ্রয় লই। এখানে দস্যুরা আমাদিগকে আক্রমণ করে। বাহকগণ কোথায় পালাইয়া গিয়াছে, জানি না। অশ্বারোহণে আপনাকে আসিতে দেখিয়া এবং আপনার স্বর শুনিয়া দস্যুরা সরিয়া পড়িয়াছে।"

"আপনার সঙ্গে আর কেহ ছিল না?"

"এক ভৃত্য ছিল, তাহাকেও দেখিতেছি না।"

"তাহার কি নাম?"

"বাহুক।"

যুবক তখন বাহুকের নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কোন সাড়া পাইলেন না; তখন পুনরায় বলিলেন,—"এখনও বৃষ্টি থামে নাই। আপনি শিবিকার মধ্যে অপেক্ষা করুন।"

"আপনিও ত বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন!"

যুবক হাসিয়া বলিলেন;—"আমার কোন অসুখ করিবে না। আপনি শিবিকার মধ্যে প্রবেশ করুন।"

রমণী শিবিকায় প্রবেশ করিলেন। যুবক বলিলেন;—

"আমি একটুকু খুঁজিয়া দেখি, কাহাকেও পাই কি না।"

"আপনি খুঁজিতে যাইবেন না; আপনি দূরে গেলে আমি পুনরায় নিঃসহায় হইব।"

যুবক তখন চীৎকার করিয়া বাহুককে ডাকিতে লাগিলেন, কোন সাড়া নাই। যুবক মহা বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার ঝড়বৃষ্টিময় রাত্রিকালে প্রায় জনশূন্য নগর প্রবেশপথে একাকী এই অপরিচিতা রমণীর উদ্ধারের কি উপায় বিধান করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। বাহক জুটিলে তিনি নিজে সঙ্গে যাইয়া রমণীকে তাঁহার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু বাহকগণ পালাইয়াছে, রমণীর সঙ্গীয় ভৃত্যটীও নাই। ইঁহাকে এই জনশূন্য স্থানে রাখিয়া বাহক কি অন্য কোন লোকের অনুসন্ধানে যাইতে সাহস হয় না, রমণীও তাহা ইচ্ছা করেন না। কি বিপদ!

এমন সময় যুবক দেখিতে পাইলেন, পথের নীচের দিকে একটি ক্ষুদ্র ঝোপের আড়াল হইতে একটী লোক ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। যুবক ক্ষিপ্র হস্তে শিবিকার একটা বহনদণ্ড খুলিয়া লইয়া অন্য কোনরূপ অস্ত্রাভাবে তাহাই বৃহৎ লগুড়বৎ ঘুরাইয়া বলিলেন;—

"কে আসিতেছ? যদি চোর দস্যু হও, পালাও; নতুবা এক আঘাতে মস্তক চূর্ণ করিব।"

লোকটা থামিল, বলিল;—"আপনি কে?"

"আমার পরিচয়ে আবশ্যক নাই,—তুমি কে?"

"আমি বাহুক; এই শিবিকায় আমার কর্ত্রী আছেন, আমি তাঁহার ভৃত্য।"

রমণীও বলিলেন;—"হাঁ, আমার ভৃত্যের স্বরই বটে।"

যুবক তখন বাহুককে নিকটে ডাকিলেন। বাহুক প্রথমে দস্যুহস্ত হইতে স্বীয় কর্ত্রীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু

বাহুমূলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" ইত্যাদি প্রাজ্ঞ প্রবচনের অনুসরণ করিয়া তথা হইতে পলায়ন করে। শেষে ঘটনাস্থল নিরাপদ দেখিয়া কর্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তখনও তাহার হৃৎকম্প বিদূরিত হয় নাই, সুতরাং তাহাকে সেখানে রাখিয়া বাহকের অনুসন্ধানে যুবকের নগরপ্রবেশের প্রস্তাবে রমণী স্বীকার হইলেন না। তখন তিন জনে হাঁটিয়া নগরে প্রবেশ করার কথাই স্থির হইল। নগরে বাহক এবং শিবিকা সংগ্রহ করিয়া রমণীকে তাঁহার বাটীতে পাঠান হইবে।

অশ্বটী এতক্ষণ পথের একপার্শ্বে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যুবক তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন এবং বলিলেন ;—

"সুন্দর, ঘরে যা।"

শিক্ষিত অশ্ব প্রথমে মৃদু মৃদু পরে দ্রুত বেগে ছুটিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

যুবক তখন রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন ;—

"আর বিলম্ব করা উচিত নহে, রাত্রি অধিক হইতেছে।"

যুবতী শিবিকা হইতে বাহির হইলেন। অস্পষ্টালোকে যুবক দেখিতে পাইলেন, রমণীর দেহে কোন ওড়নি নাই, তিনি শুধু পরিহিত সাটীর অঞ্চল দ্বারাই মস্তক বক্ষ পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়াছেন। এই পরমাসুন্দরী রমণী অবশ্যই বিশেষ কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থা হইবেন, দস্যুকর্ত্তৃক ইহাঁর গাত্রবস্ত্রও অপহৃত হইয়াছে। কিন্তু এ বেশে প্রকাশ্য রাজপথে রমণীর চলা বাঞ্ছনীয় নহে। যুবক বলিলেন ,—

"দস্যুরা শুধু আপনার অলঙ্কারপত্র সরায় নাই। তাহারা আপনার ওড়নি পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। এখনো বৃষ্টি-দুর্য্যোগ আছে, এ বেশে আপনার অত্যন্ত কষ্ট হইবে।"

যুবক আপনার গায়ের ওড়নি খুলিয়া লইয়া বলিলেন ;—

"আপনি এই ওড়নি নিন্। এ বিপদ সময়ে ইতস্ততঃ করিবেন না।"

মুখ নত করিয়া রমণী বলিলেন ;—

"আপনি আমার প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছেন, আজীবন আপনার এ ঋণ অপরিশোধ্য থাকিবে। আমার একটী প্রার্থনা, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন— যদি কোন আপত্তির কারণ না থাকে, তবে আপনি কে, দয়া করিয়া তাহা জানাইলে চিরকাল আপনার পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া জীবন সার্থক করিব।"

"মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য সামান্য একটী কার্য্যকে আপনি অতি মহৎ বলিয়া মনে করিতেছেন। আমার নাম প্রমীত সেন।"

রমণী চমকিত হইলেন, এক পদ পশ্চাৎ সরিয়া একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন ;"—

"কুমুদনিবাস?"—

"আপনি কিরূপে জানিলেন?"

"আপনার নাম নগরে কে না জানে!"

দুই হাত যোড় করিয়া অবনত মস্তকে রমণী প্রমীত সেনকে অভিবাদন করিলেন এবং পুনরায় শিবিকার অন্তরালে যাইয়া

প্রমীতের দত্ত ওড়নি দ্বারা যথাযথ অঙ্গ আবরিত করিলেন।

তখন তিন জনে ধীরপদে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরে পৌঁছিয়া অদূরেই শিবিকা পাওয়া গেল। প্রমীত বলিলেন ;—

"আপনাকে কোথায় পৌঁছাইতে হইবে ?"

"কমলপুরে।"

"আপনি শিবিকায় প্রবেশ করুন। আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ীতে যাইব।"

"আপনি বিস্মিত হইবেন না। আমি পথ চিনি, আমার ভৃত্যও পথ ঘাট জানে। কমলপুর বেশী দূর নয়, কুমুদনিবাসের পথ পৃথক, আপনি এখন গৃহে গমন করুন।"

প্রমীত বিস্মিত হইলেন। নগরের পথ-ঘাট রমণী কেমন করিয়া চিনিলেন ? পরিশেষে রমণীর নিতান্ত আগ্রহাতিশয্যে প্রমীত সেই স্থান হইতেই নিজগৃহে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। বোধ হয় রমণীর ইচ্ছা নহে যে, প্রমীত সঙ্গে যাইয়া তাঁহার ঘর বাড়ী এবং অন্যান্য পরিচয় জানিয়া আসেন, সুতরাং সেই স্থান হইতেই পৃথক পথ অবলম্বন করা প্রমীত শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। শিবিকায় প্রবেশ কালে রমণী পুনরায় প্রমীতকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন ;—

"আপনি নিজ পরিচয় দিয়া আমাকে চির অনুগৃহীত করিয়াছেন, কিন্তু আমি নিজের পরিচয় আপনাকে দিতে পারিলাম না ! আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। স্ত্রীলোকের সাহস কম ; আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যদি আমার সে সৌভাগ্য থাকে, তবে একদিন আপনার নিকট পরিচিত হইয়া জীবন ধন্য করিব।"

যুবতী আর বিলম্ব করিলেন না, শিবিকায় প্রবেশ করিলেন। বাহকগণ শিবিকা লইয়া কমলপুরের দিকে প্রস্থান করিল। প্রমীত সেন দেখিতে পাইলেন, বাহকগণ চলিতে আরম্ভ করিলে রমণী শিবিকার আবরণ একটুকু উন্মুক্ত করিয়া-তাঁহার দিকেই যেন সাগ্রহে চাহিলেন।

প্রমীত সেন সেই খানে দাঁড়াইয়া কিছুকাল অনন্যমনে সেই রমণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। রমণী যুবতী, অপূর্ব্ব সুন্দরী, লাবণ্যবতী, শিক্ষিতা, চতুরা, অবশ্যই কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থা হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু কেমন যেন প্রকৃতি চঞ্চলা, প্রগল্‌ভা ! বাক্যালাপে কেমন যেন যুবতী কুলস্ত্রীসুলভ সঙ্কোচশূন্যা !—কে এ রমণী ?

তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, প্রমীত সেন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্ষণ বিদ্যুৎ স্ফুরণ দৃষ্ট কুন্তলজাল পরিবৃত মনোমুগ্ধকর সেই সুন্দর মুখের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।

উৎপলা পরম রূপবতী, কিন্তু এ রমণী ? না, উৎপলার অপেক্ষা সুন্দরী কি কেহ আছে ? ভাবিতে ভাবিতে প্রমীত সেন নিজগৃহে পৌঁছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবদ্ধ-কুন্তলা

রাজধানীর মধ্যে প্রমীত সেন একজন প্রসিদ্ধ এবং সঙ্গতিপন্ন লোক, রাজাধিরাজ

অশোকদেবের বিশ্বাসভাজন পারিষদ। কুমুদ নিবাসে তাঁহার বৃহৎ বাটী একটী রাজপুরী বিশেষ। অপূর্ব্ব ফল-ফুলের উদ্যান। বহির্ব্বাটী, অন্তঃপুর, পূজাগৃহ, বিলাসগৃহ, অশ্বশালা সমস্ত পাকা। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাঁহার কুমুদ-সরোবর। বাটীর দক্ষিণ ভাগেই এই বৃহৎ পুষ্করিণী, প্রস্তরময় তাহার বাঁধা ঘাট। পুষ্করিণীর মধ্যভাগে মর্ম্মরনির্ম্মিত প্রমীতের বিলাস-ভবন। বিলাস-ভবনের চারিদিকে শতশত কমল কুমুদ কহ্লারের শোভা, সেই জন্যই ইহার নাম কুমুদ-সরোবর এবং পল্লীর নাম কুমুদনিবাস।

অপরাহ্নে উৎপলা অন্তঃপুরে দোতালার বিস্তৃত ছাদে বসিয়া ছিলেন। পরিচারিকা মাধবী তাঁহার কেশ বাঁধিয়া দিতেছিল। নিকটে নানা উপকরণ—সুগন্ধি তৈল, অলক্ত, মুকুর, মধুথ, চিরুণী, দড়ি, হরিদ্রা, অগুরু, চন্দন, গোরোচনা, অঞ্জন, মুক্তাজাল, সীমন্ত-মণি প্রভৃতি কেশ ও অঙ্গরাগের আয়োজন। মাধবী অতি নিপুণ হস্তে উৎপলার দীর্ঘ কোমল কেশরাশি বহুভাগে বিভক্ত করিয়া সরু সরু বেণী রচনা করিতেছিল।

উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"আজ এত বিলম্ব হইতেছে কেন রে ?"

"বিলম্ব আর বেশি কি ? এখনো ত সন্ধ্যা হয় নাই।"

"কথা ছিল, বেলা থাকিতেই ফিরিবেন।"

"পুরুষ মানুষেব কত কাজ ; বোধ হয়, আর কোথাও গিয়া থাকিবেন।"

"ঘর বাড়ী ছাড়িয়া মানুষের বাহিরে অত কাজ কেন ?"

মাধবী হাসিল, বলিল ;—"আমরা কি তাহা বুঝি ?—আমরা ভাবি, আমাদের আঁচল ধরিয়া ঘরে বসিয়া থাকাই পুরুষের এক মাত্র কাজ !"

গুপ্ত স্নেহের সূক্ষ্ম শরাভিঘাতে উৎপলারও হাসি পাইল ; তিনি বলিলেন ;—

"আমি কি অতই স্বার্থপর ?"

"তুমি না হইতে পার, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, ছাড়া হইয়া তিল মাত্র থাকিতে তোমার কষ্ট হয়।"

"তবে আমি অপরাধী।"

"অপরাধ শুধু তোমার নয়, উভয়েরই সমান !"

"দুর, অভাগী !—ও কিরে ?"

ছাদে মেঘের ছায়া পড়িল। আকাশে বড় মেঘের সাজ হইয়াছে। ধবল বলাকার দল সারি দিয়া নীলাকাশে ভাসিয়া উঠিল। দেখিয়া উৎপলার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

"সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এখন ত তাঁর ফিরিবার কথা। বড়ই মেঘ সাজিল।

"ঘোড়ায় আসিবেন, কতক্ষণই বা লাগিবে ? —ভয় কি ?"

তখন ঝড় উঠিয়া আসিল। আম্রকানন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, কুমুদসরোবরের জল তরঙ্গময় হইল। স্ফুট অস্ফুট কমল কুমুদ কহ্লার বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া একবার একদিকে আরবার বিপরীত দিকে জলস্পর্শ করিতে লাগিল। ধুলি, বালু, ছিন্ন গাছের পাতায় আকাশ ছাইয়া ফেলিল। অন্ধকার হইয়া আসিল।

উৎপলা উঠিলেন, মাধবী অঙ্গরাগের সামগ্রীগুলি তুলিয়া লইল। খোলা ছাদে আর তিষ্ঠান যায় না। আরও পরিচারিকা

দৌড়িয়া সেখানে আসিল, ছাদের জিনিসপত্র সরাইতে লাগিল, ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করিতে লাগিল। প্রমীত সেন তখনও বাড়ীতে ফিরেন নাই।

মেঘ ডাকিয়া আসিল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা. শেষে অবিরল ধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। উৎপলা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কিছুকাল পরে বহির্ব্বাটীতে ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রমীতের অশ্ব সুন্দর শূন্যপৃষ্ঠে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু প্রমীতের কোন সংবাদ নাই। সজ্জিত অশ্ব ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আরোহী নাই, অবশ্যই তাহার কোন বিপদ হইয়াছে! ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে পথ দুর্গম হইয়াছে, কোথায়ও তিনি অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবেন। ভিতর বাড়ীতে সংবাদ আসিল, উৎপলা শুনিলেন। সকলে মহা ব্যস্ত-সমস্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তখন লোকজন পরিচারকবর্গ অনুসন্ধানে বাহির হইল। কেহ অশ্ব পৃষ্ঠে ছুটিল, কেহ কেহ আলো জ্বালিয়া চলিল। কতক লোক পাটলীর পথে, কতক রাজপুরী অভিমুখে চলিল।

উৎপলার কেশ বন্ধন শেষ হইল না। সেই বিপুল কেশরাশির কতক বেণীবদ্ধ, কতক আলুলায়িতই রহিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাধবী অনেক অনুরোধ করিয়াছিল. কিন্তু উৎপলা স্বীকার হন নাই; উৎকণ্ঠিত চিত্তে একবার ঘরে, একবার ছাদে যাতায়াত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগে তাড়িত আলুলায়িত কেশজাল উৎপলার মুখ এবং কপোল দেশ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

ক্রমে ঝড় বৃষ্টি থামিল, চন্দ্রোদয় হইল। সিক্তবস্ত্র, লুপ্ত-চন্দন-লেপ প্রমীত সেন গৃহে পৌঁছিলেন। বহির্ব্বাটীতে বিলম্ব না করিয়া প্রমীত একেবারে উৎপলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উৎপলা দ্রুতবেগে স্বামীর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কেন এত বিলম্ব হইল? ঝড় বৃষ্টির সময় কোথায় ছিলে? সুন্দর আগেই ফিরিয়া আসিয়াছে,—কি হইয়াছে?"

প্রমীত ক্ষণকাল কোন কথা বলিলেন না, উৎপলার উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—এ মুখও যে প্রায় সেইরূপ বিস্রস্ত কেশজাল পরিবৃত!

উৎপলা কহিলেন;—

"কিগো, চিনিতে পারিতেছ কি?"

"চিনিতে পারি বটে, কিন্তু দিন দিন মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্তই যে নূতন!"

উৎপলার মুখ স্মিত প্রভাসিত, দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"তোমার ভিজে কাপড়! —মাধবী, কাপড় আন্!—ঝড় বৃষ্টিতে কোথায় ছিলে? ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলে? সুন্দর ত আগেই ফিরিয়া আসিয়াছে!"

"সব বলিতেছি। আজ আকাশের চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল, কিন্তু দেখিতেছি, মর্ত্তলোকের চন্দ্রমাও যে মেঘে ঢাকা!"

প্রমীত উৎপলার ললাটকপোলে বিক্ষিপ্ত কুন্তল-রাশি মৃদু হস্তে সরাইয়া দিলেন। উৎপলা হাসিয়া বলিলেন;—

"মাধবী চুল বাঁধিয়া দিতেছিল; এমন

সময় ঝড় বৃষ্টি আসিল, চুল বাঁধা শেষ হইল না। সুন্দর ফিরিয়া আসিল, তুমি আসিলে না! চুল বাঁধা আর হইল না।"

"সাতরাজার ধন মাণিক ঘরে ফিরিয়াছে, এখন বাঁধ।"

প্রমীত সিক্ত বস্ত্র ছাড়িলেন; হাত পা মুখ ধুইয়া শয্যায় বসিলেন। তখন পাটলী হইতে যাত্রা করার পর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর কাছে বলিলেন।

"স্ত্রীলোকটীর কোন পরিচয় পাইলে না?"

"না।"

"কত বয়স?"

"উনিশ কুড়ি হইবে।"

"দেখিতে কেমন?"

"রূপবতী;—চুলে ঢাকা মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।"

"তবে কেমন করিয়া বুঝিলে রূপবতী?"

"রূপ কি চুলে ঢাকা পড়ে?"

প্রমীত আলুলায়িতকুন্তলা উৎপলার লাবণ্যময় মুখের দিকে অতৃপ্ত লোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এমন সময় কক্ষের বাহির হইতে মাধবী বলিল;—

"রাজপুরী হইতে আবার লোক আসিয়াছে।"

তখন উৎপলা বলিলেন;—

"আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজাধিরাজ তোমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন।"

প্রমীত ব্যস্ততার সহিত বলিলেন:—

"এতক্ষণ আমাকে জানাও নাই! আমাকে এখনি যাইতে হইবে।"

"সে কি! এই মাত্র তুমি গৃহে আসিলে, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এত কষ্ট পাইয়াছ; রাত্রি প্রভাতে গেলে হয় না?"

"না; এখনি যাইতে হইবে। রাজবাড়ীতে অবশ্যই বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়িয়াছে, নতুবা বার বার সংবাদ আসিবে কেন?"

প্রমীত শয্যা হইতে নামিলেন। উৎপলাও নামিলেন; আপনার নবনীত কোমল হস্তে স্বামীর বাহু জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন;—

"রাত্রেই ত ফিরিবে!"

"ফিরিব,—বিদায় পাইলেই ফিরিব।"

উৎপলা স্বামীর বক্ষে কপোল সংন্যস্ত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন;—

"তুমি ফিরিয়া আসিলে আমি চুল বাঁধিব, বিলম্ব করিও না।"

প্রমীত মৃদুহস্তে উৎপলার গণ্ডদেশ হইতে অবাধ্য কেশগুলিকে সরাইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রমীত গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। উৎপলার সুন্দর মুখ ক্ষীণ মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রবিম্বের ন্যায় মলিনাভ হইল।

অবদ্ধকুন্তলা উৎপলা ক্ষুণ্ণচিত্তে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। (ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

চণ্ডীদাস

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে জয়দেব বাঙ্গালা গীতি-কবিতার যে বীজ বঙ্গের উর্ব্বরাভূমিতে ছড়াইয়াছিলেন, সেই বীজের প্রথম ও সতেজ মহীরুহ চণ্ডীদাসের গান। ভালবাসা প্রকাশের জন্যই গানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাই প্রেমিক চণ্ডীদাসের কণ্ঠে গান আপনি ফুটিয়াছিল। যখন প্রাণে একটা আবেগ আসে, তখন সহজ ভাবে কিছু করা চলে না; চণ্ডীদাসের প্রাণে ভগবৎপ্রেমের এমন একটা প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছিল যে তাহা তাঁহার সাদাসিদা পূজারি জীবনের ভাব সকলকে, অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিত্য পরিচিত ছন্দোবন্ধকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, বাঙ্গালা ভাষার এক নূতন ছন্দে ও ভাবে মুখরিত হইয়া,—বঙ্গভূমিতে সুরে সুরে কল্লোলিত হইয়া উঠিল। জয়দেবকে বুঝাইয়া বলিতে হইয়াছিল—"যদি হরিস্মরণে কুতুকং মনঃ শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্;" কিন্তু চণ্ডীদাস নিভৃতে নির্জ্জনে মন্দিরে আত্মগোপন করিয়া নবদীক্ষার তীব্র উল্লাসে, কৃষ্ণপ্রেমিকার যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছেন, সেই প্রথম ক্রন্দন ধ্বনিতে আধ্যাত্মিকতার এত উজ্জ্বল নিদর্শন ফুটিয়া উঠিয়াছে যে কোনও কৈফিয়ৎ না থাকিলেও আমরা শুধু এই গীতি হইতেই চণ্ডীদাসের মূল উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে পারি। যদি অন্য কোনও ভাবে এই গান বুঝিতে চেষ্টা কর বুঝিতে পারিবে না। যে ভগবান্‌কে ভালবাসে, এবং যে কোনও মানুষকে ভালবাসে, দুজনেই এক পথের পথিক সন্দেহ নাই, কিন্তু পার্থিব প্রণয়ে "নামে" প্রেম কেহ ভাবিতেও পারে না। যাহা পার্থিব প্রণয়ে অসম্ভব, তাহাই আবার ভগবৎপ্রেমে অত্যন্ত সম্ভব; শুধু সম্ভব নয়, সে-ই প্রেম লাভের অপরিত্যাজ্য প্রথম সোপান। অতএব—

সখি রে কে শুনাইল শ্যামনাম,
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

এই গানটাই তাঁহার প্রথম কৈফিয়ৎ। শেষে তিনি আরও পরিষ্কার ভাবে আমাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে দিয়াছেন—

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন
গোপ গোয়ালিনী হাম মতিহীনা
না জানি ভজন সাধন॥

এই গোপ গোয়ালিনীর নামে চণ্ডীদাস আপনার উন্মত্তপ্রেমের গৈরিকস্রাব উদ্গীর্ণ করিয়াছেন, নিজের হৃদয়ের অস্তিত্ব ভুলিয়া, প্রেম-পাগলিনীর সঙ্গে এক হইয়া ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস আদৌ সাধক, তার পর প্রেমিক, তাঁহার প্রথম গানেই আমরা সে কথা বুঝিতে পারিয়াছি। এ কথায় অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, কারণ চণ্ডীদাসকে তাঁহারা প্রেমিক ভিন্ন আর কিছু বলিতে চাহেন না। ইহাতেও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু সত্যের অপলাপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। চণ্ডীদাসের

রাগাত্মিক পদাবলী হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে, তিনি একজন উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলিও এই বিষয়েরই সাক্ষ্য প্রদান করে। যাঁহারা মনে করেন যে এই কথা স্বীকার করিলে তাঁহার কবিত্বশক্তিকে খর্ব্ব করা হয়, তাঁহারা

কারণ প্রেম ভগবানের বিষয়েই হৌক অথবা মনুষ্য বিষয়েই হৌক, তাঁহার পদ্ধতির কোনও ব্যতিক্রম হয় না, তাহা সকল বৈষ্ণব দার্শনিকই কহিয়াছেন। বৈষ্ণব মতে ভগবৎসাধনা এক অপূর্ব্ব রহস্য। বাহ্যতঃ ইহা মানুষের প্রেমের সকল অঙ্গে অঙ্গী; কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সমস্বরে কহিয়াছেন যে কামের লেশমাত্র থাকিলে এই সাধন-পদ্ধতি বোঝা তো যাইবেই না, বরং বিষবৎ পরিত্যজ্য। বৈষ্ণব সাধনার মূলমন্ত্র—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু"

যেমন নায়কের চিন্তায় হৃদয় সমর্পণ করে, সেইরূপ—সংসারের সকল কার্য্যের মাঝে থাকিয়া ভগবানের উপর মন সমর্পণ করা। এ পথ অতি কঠিন ও বিষম পথ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে ইহা চরম পথ, ইহার উপরে আর কিছুই নাই। পরকীয়া রতির সাধনা বিষাক্ত সর্পের সহিত ক্রীড়া, তিলমাত্র অসাবধানতায় তীব্রবিষে জর্জ্জরিত হইতে হইবে, আর যদি সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় তবে সাধক অমৃতময় রসের সাগরে স্নান করিবে। চণ্ডীদাসের নিজের কথায়—

যে মত দীপিকা, উজরে অধিকা
ভিতরে অনল শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা।
জগত ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥

আমরাও পাঠকগণকে এই অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি। চণ্ডীদাসে অমৃতের যথেষ্ট প্রাচুর্ভাব, কেহ কখনও পান করিয়া ফুরাইতে পারিবেন না।

চণ্ডীদাস পরকীয়া নায়িকার গান গাহিয়াছেন; তাহাতে শিহরিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ পরকীয়াভাবে ভগবানে প্রেমার্পণে শুধু যে উল্লাস বেশী তাহা নহে ইহার স্বার্থহীনতা ও আত্মসমর্পণও অনেক বেশী মাত্রায় প্রগাঢ় ও সম্পূর্ণ। ইহাতে জোর নাই দাবী নাই, কেবল ভালবাসা দিয়া পরকে আপন করার ভাব আছে, আর অযাচিত ভাবে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া আছে, তাই ইহার মাধুর্য্যের তীক্ষ্ণতা অত্যন্ত প্রখর। ব্রজ গোপীদের সাধনা এই মধুর রসের পুণ্যতম বিকাশ, এই জন্য তাহাদের ভালবাসাকে কেবলা রতি বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লেখ হইয়াছে। এই বিশুদ্ধা কেবলা রতির অবিমিশ্র ভাবে মহাভাবময়ী শ্রীরাধা সেই জন্য বৈষ্ণবের আরাধ্যা, সদা চিন্তনীয়া।

অনেকে ভাবেন ও বলেন যে সমাজকে শাসিত করিবার উদ্দেশ্যে, এবং আমাদের বাঁধা ধরা সামাজিক নিয়মের প্রতিকূলে স্বাধীন প্রণয়ের বিজয় ঘোষণার উদ্দেশ্যে

বৈষ্ণব কবি তাঁহার পদাবলীর সূচনা করিয়াছেন। * আমাদের বিশ্বাস যে এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। যদি বৈষ্ণবকবি নিজে এই ভাবের সূত্রপাত করিতেন, তাহা হইলে আমরা এই ধারণার সারবত্তা মানিতে পারিতাম, কিন্তু ইহার মূল পদাবলীতে নহে, পুরাণে। পুরাণকার যিনিই হৌন, তিনিই ব্রজগোপী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ভগবৎসাধনার এই নূতন পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছেন। অতএব পুরাণকারই মধুর রসের প্রথম পথপ্রদর্শক। জয়দেব প্রথমে এই রসকে আশ্রয় করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং চণ্ডীদাস সেই পথ, সেই ভাব অবলম্বনে তাঁহার অমর পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, কোনও সামাজিক উদ্দেশ্যে নহে।

পুরাণে যাঁহাকে ভগবানের হ্লাদিনী-শক্তি বলে সেই মহাভাবময়ী নায়িকা শ্রীরাধার কথা লইয়া চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলী আরম্ভ করিয়াছেন—তাহা হইতেই বঙ্গে পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি! অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যেন চির-তপস্বী হিমাচলের বক্ষ ভেদ করিয়া প্রমত্ত ধারায় ভক্তি-ভাগীরথী ধরণীর কোলে নামিয়া আসিয়া তাহাকে শান্তিরসে অভিষিক্ত করিয়াছে।

চণ্ডীদাসে কলা-নৈপুণ্য নাই, কথার সাজসজ্জা নাই, ছন্দের পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি নাই; তাঁহার রাধিকার বয়ঃসন্ধি নাই, প্রেমের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি নাই, উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, চাঞ্চল্য নাই, চপলতা নাই। ইঁহার হৃদয়ে একটা নাম শুনিয়া এমন প্রবল ও পরাক্রান্ত ঝড় বহিয়া গিয়াছে যে সে ঝড়ের মুখে বিশ্বসংসার ফুৎকারে তৃণের মত উড়িয়া গিয়াছে। এই অদ্ভুত ভালবাসার সম্মুখে আমরা যেন ভীত, স্তম্ভিত হইয়া যাই। চণ্ডীদাসের রাধার কথা বলিতেও আমাদের ভয় করে, কেবল আরও অনেকে অনেক বার এই কথা ভাল করিয়া বলিয়াছেন বলিয়াই নহে, এ চরিত্রের বিশ্লেষণে কোনও রূপ কষ্ট আছে বলিয়া নহে, বরং এ চরিত্রের বিশ্লেষণ অতি সহজেই হইতে পারে; আগুন জ্বলিয়া উঠিলে তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই যেমন সকলে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠে, আমাদেরও সেই রকম ভয়। সেই দীপ্ত অনল-শিখার কেহ বিশ্লেষণ করিতে বসে না, তাহার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করে না। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার কথাগুলি যেন অগ্নিফুলিঙ্গ, তিনি শ্যামনাম শুনিয়া যে আগুন হৃদয়ে পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই অনল যেন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারের সকল মূল্যবান্ জিনিষ, আমরা যাহাকে মূল্যবান্ ভাবি, সেই সকল বস্তু পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এই একাগ্র, বিক্ষেপহীন ভাব তাঁহার হৃদয়ের সার সামগ্রী, ইহাই তাহার প্রেমের আদ্য, মধ্য ও শেষ। তবে আর ইহার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা কি করিব?

বিশ্লেষণ করিতে হয় বিদ্যাপতির শ্রীরাধা-চরিত্রের, কারণ বিদ্যাপতি ভাল-বাসায় ক্রম পরিপুষ্টি চিত্রিত করিয়াছেন। সকলের হৃদয়েই সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসা প্রথম

* রবি বাবুর গ্রাম্য-সাহিত্য।

হইতেই আসে না, ক্রমে ক্রমে তাহা আসে। তাই তাহার ক্রমাভিব্যক্তি আঁকিতে হইলে কবিকে অনেক রকম ভাবের ছবি তুলিতে হয়, অনেক হাবভাব আঁকিতে হয়, অনেক ছেলেমানুষির কথাও হয় তো বলিতে হয়। কবি বিদ্যাপতিকে এই সকল দৃশ্য আঁকিতে হইয়াছে, কারণ তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভালবাসা কেমন করিয়া আস্তে আস্তে হৃদয়ে প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং ক্রমে ক্রমে কেমন প্রবল হইয়া উঠে। সাধারণতঃ যাহা হয় বিদ্যাপতি তাহাই দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে ভক্তিরাজ্যের নিয়ম ও ভালবাসার রাজ্যের নিয়ম সমতুল; অতএব ভালবাসার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম ঐশ্বরীয় প্রেমের সম্বন্ধেও তাহা সত্য। সকলেই কিছু আপনা ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে না; ইহাও ধাপে ধাপে উঠে। তাই বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি আছে, ও এই সময় হইতে তাঁহার প্রণয় ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া উৎপত্তিস্থলে নদী যেমন ক্ষুদ্রকায়া হয় তেমনি ক্ষীণ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বিশালকায় হইয়াছে, পরে অনন্ত সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। নদী যখন ক্ষীণকায় তখন তাহার গতির পথে অনেক বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয়, অনেক সময় "মার্গাচল ব্যতিকরা কুলিতেব" অবস্থা হয়, —অনেক সময় সে "ন যযৌ ন তস্থৌ" এই দ্বিধাসংকুল অবস্থাপন্ন হয়, এই জন্য প্রলোভন দ্বারা তাহার প্রেমের বেগ বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন হয়; লজ্জা, কলঙ্কভয়, গুরুগঞ্জনার ভয়, সংসার-বাসনা এমনি অনেক বাধা তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়ায়। যে ভক্ত এই সকল অবহেলা করিয়া ভক্তির বলে ভগবান্‌কে পাইতে পারে সেই ধন্য; পক্ষান্তরে, যে প্রেমিকা প্রেমের বেগে এই সকল বাধা অতিক্রম করিতে পারে, তাহারই প্রেম পরিপক্ক, তাহারই প্রেমিক-লাভ হইতে পারে। বিদ্যাপতির রাধিকার শেষে তাহা হইয়াছিল। এইজন্য বিদ্যাপতির স্থান বৈষ্ণবকবি-সমাজে অত্যন্ত গণনীয় ও উচ্চ; কিন্তু তাহা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। যাঁহারা শুধু বাহির হইতে বিদ্যাপতির কাব্য সমালোচনা করেন, তাঁহারা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে সমশ্রেণীভুক্ত করিতে নিতান্ত নারাজ; কিন্তু যাঁহারা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যথার্থ মর্ম্ম জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে বৈষ্ণব কবি হিসাবে উভয়েই বৈষ্ণবসমাজের গুরু। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস একই ভাবের দুই মূর্ত্তি। প্রভেদ এই যে বিদ্যাপতির যেখানে শেষ, চণ্ডীদাসের সেই খানে আরম্ভ।

যে গভীর আত্মবিলোপী প্রেমে বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বিরহ-দশায় দিব্যোন্মাদ, সেই দিব্যোন্মাদ চণ্ডীদাসের রাধার প্রথম হইতেই উপস্থিত। বিদ্যাপতির রাধা বালিকা, তাহার জটিলা, কুটিলা "শাস-ননদী" ভয় আছে, কল্পিত পতি রায়াণের (সংসারের) আকর্ষণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন ও প্রেমের আকর্ষণও আছে, তাই তাহার দেহবুদ্ধিও প্রথমে বিলক্ষণ আছে, সম্ভোগে সুখ আছে, এবং এই জন্যই তাঁহার

বিরহে অত্যন্ত বেদনা-বোধ আছে। চণ্ডীদাসের রাধা প্রথম হইতেই পাগলিনী; প্রথম হইতেই যোগিনী, প্রথম হইতেই তাঁহার কৃষ্ণানুশীলন এত প্রখর যে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় "সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে, যেন যোগিনীর পারা।" প্রথম প্রণয়ের আবেগে বিদ্যাপতির রাধা সখীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদা-কাঁটি করিয়াছিলেন, নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের যে পাগলিনী রাধা তাঁহার মনের ব্যথা ব্যক্ত হইবার নহে; অন্তরঙ্গ যে সখী সেও বুঝিতে পারে না "রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা;" সে এক অকথ্য বেদন—

অকথ্য বেদন সখি বোঝা নাহি যায়।
যে করে কৃষ্ণের নাম পড়ে তার পায়॥

চণ্ডীদাস কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, নচেৎ, একশত বৎসর পরে যে পাগল বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া সকলকে প্রেমের জোয়ারে ভাসাইয়াছিলেন তাঁহার মূর্ত্তি তাঁহার ক্রিয়া কেমন করিয়া লিখিয়া রাখিতে পারিলেন?

চণ্ডীদাসের পাগলিনীর কাছে কে একবার সংসারের কথা পাড়িয়াছিল, কুলের কথা বলিয়াছিল, তাহাতে তাহার যে উত্তর সেই উত্তর হইতেই সে হৃদয়ের প্রেমের উত্তাপ বুঝিতে পারা যায়,—

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন
এ দুটী নয়ন তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলী
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়।
কি আর বুঝাও ধরম করম
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হইয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম কপালে আছিলা
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সি দুর্জ্জন বলে কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।

মর্ম্মজ্ঞ কবি চণ্ডীদাস ভণিতার ছলে বলিতেছেন—

চণ্ডীদাসে কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুলশীল ছাড়া॥

ঠিক্ কথা, তাই ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

চণ্ডীদাসের রাধার চরিত্র এই একটা মাত্র উপাদানে গঠিত—জ্বালাময় প্রেম তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, সেখানে আর কিছুই নাই; তাহার সুখ নাই, কেবল ক্রন্দন আছে, তাহার রস নাই, তাহা এই প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া গিয়াছে; তাহার দেহ নাই, সে এই মনের যজ্ঞে আহুতিস্বরূপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার দেহবুদ্ধির এত অভাব যে প্রিয়তমের অঙ্কশায়িনী হইয়াও সে প্রিয়তমের বিরহে

ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে বসে- "দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" ধরণীর বক্ষে একটা অজ্ঞাত আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া আগ্নেয়গিরির উৎপাতের সৃষ্টি করে, এ হৃদয়টীও ঠিক সেই রকম। ইহার খালি ক্রন্দন আছে, আকাঙ্ক্ষা বাসনা সাধ সকলই কাঁদিবার জন্য; আকুল আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া গিয়া বাঞ্ছিতের বুকে আছড়াইয়া পড়ে, যেন অগাধ অমেয় গভীর সমুদ্রের তরঙ্গরাজী পৃথিবীর বক্ষে আছড়াইয়া পড়িতেছে, আবার তখনি কোমল ক্রন্দনের, অস্ফুট আর্ত্তনাদের সহিত সরিয়া যাইতেছে, যাহা চায় তাহা যেন পাইল না, কাঁদিয়া আকুল হয়। ইহার সুখই বা কিসে, আর দুঃখই বা কিসে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

কিন্তু এই পাগলিনীর সকলই বিচিত্র, সকলই অদ্ভুত। মিলনে ইহার দেহ-বুদ্ধি নাই—আছে বিরহে। যেখানে আসিয়া বিদ্যাপতির রাধিকা পাগলিনী, ঠিক সেইখানে চণ্ডীদাসের পাগলিনীর জাগরণ। এমন কেন হয়? ইহার উত্তর—শুধু প্রণয়ীর দিক্ দিয়া এইরূপে দেওয়া যায়; তুমি ভালবাস, তোমার ভালবাসা খুব প্রগাঢ় হইতে পারে, তোমার মন প্রেমরসে আর্দ্র হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহা বুঝিব কেমন করিয়া? তুমি মনের আবেগে কাঁদিয়াই আকুল হইলে,- আমরা সঙ্গ যে তোমার প্রিয় তাহা আমি বুঝিব কেমন করিয়া? তুমি আমার বুকে স্থান পাইয়াও কাঁদ—ভালবাসার যে সুখ তোমার তাহার অনুভব নাই; তোমার মন যদি আমার জন্য পাগল,তোমার মনে যদি সর্ব্বস্ব-ত্যাগের গর্ব্ব, তবে তোমার দেহ দূরে থাকে কেন? অনুযোগ তো সত্য। তাই বিরহে চণ্ডীদাসের রাধার প্রথম চৈতন্যোদয়। শুধু মনের জোরে প্রেমিককে ধরিয়া রাখা যায় না, দেহের সাহায্যও প্রয়োজন হয়; তখন যে রাধিকা বিচ্ছেদের সম্ভাবনাও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, সেই আবার কাঁদিতে বসে; সেই তখন মনে মনে ধিক্কার দিয়া বলে যে ছি ছি! কি করিলাম, সামান্য মনের অছিলায় প্রাণের গর্ব্বে তাহাকে তো সুখী করিলাম না, নিজেও সুখী হইতে পারিলাম না; কত সাধ করিলাম কিছুই তো মিটিল না। তাহাকে তো ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। তখন আবার সে সখীর হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া বলে, সখি আর একবার তাহাকে ফেরাও, আমার সাধ আহ্লাদ কিছুই হইল না, "তিয়াসে পরাণ যায়", একবার তাহাকে ফেরাও। আমার

ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন
কাচের সমান ভেল।

যাও সখি তোমরা তাহাকে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া আন,

সখি কহবি কানুর পায়।
যে সুখ সাগর দৈবে শুখায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করল বাদ॥

সখি হামসে অবলা তায়।
বিরহ আগুণ হৃদয়ে দ্বিগুণ
সহন নাহিক যায় ॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সেজন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ ॥

চণ্ডীদাসের রাধার এইটুকু বাকী ছিল; বিদ্যাপতির রাধার দৈহিক সম্ভোগ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তাই বিরহে তাহার মনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুমত ব্যাখ্যাও এই ভাবেরই। প্রেমধর্ম্মী বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল মনের দ্বারা কৃষ্ণ-সেবাকে গ্রাহ্য করে না, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ-সেবা ইহার প্রতিপাদ্য। মন, প্রাণ, দেহ ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণচরণে সর্ব্বস্বের অর্পণ ইহার কঠিন নির্দ্দেশ। তাই সাধন-তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত চণ্ডীদাস বিরহে তাঁহার রাধাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন, ভাব সম্বরণ করাইয়াছেন —পূর্ণ মিলনের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, নিবিড় আত্মসমর্পণের জন্য। চণ্ডীদাস বিরহে জাগিয়াছেন—তাই তাঁহার ভাষা সাজিয়াছে, ছন্দ খেলিয়াছে। তাঁহার প্রাণ যেন একটা বড় কাজের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহার প্রেমের, সাধনার চূড়ান্ত ফলপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে সজাগ করিয়া দিয়াছে। বিরহে আগ্নেয়গিরি শান্ত হইয়াছে, হৃদয়ের উত্তপ্ত বাষ্পরাশি অশ্রু হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া পৃথিবী শীতল করিয়াছে, পাগলিনী প্রেমময়ী হইয়াছে। ইহাই বিরহের পরীক্ষার ফল—অমৃতময় ফল।

তাহার পর চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির রাধার নিজের বলিয়া আর কিছু নাই, আমিত্ব বলিয়াই আর কিছুই নাই; মনের জোর নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, আছে কেবল সেই প্রাণাধিকের চরণ দু'খানি। কি নিরাবিল, কি সুন্দর সেই আত্ম-নিবেদন! কি গভীর সেই আত্ম-সমর্পণ,—কি মধুর, কি মহৎ সেই আত্ম-বিলোপন!

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিয়া প্রেমের ফাঁসী
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

পাগলিনীর আজ চরম সুখ—নিজের প্রেমের গৌরব ত্যাগ করিয়া; আমি যে আমার শ্যামকে বড় ভালবাসিতে জানি এই গৌরব এই গর্ব্ব দূরে ফেলিয়া দিয়া আজ সে সুখী। সে বুঝিয়াছে

না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু ॥

তাই আজ সে তাঁহার বঁধুর চরণ দুখানি বুকে ধরিয়া, তৃণের ন্যায় নীচু হইয়া কাঁদিয়া সাধিতেছে :—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥

পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমারি পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ দুখানি॥

আজ নিজের ক্রটি বুঝিয়া রাধা করুণা-ভিখারিণী, 'আমি যে বড় প্রেমিকা' সে ভাব আর তাহার নাই—

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ক্রটি হয় শতকোটী
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি॥

যিনি প্রেমিকের রাজা তিনি কি এমন প্রেমে বাঁধা না পড়িয়া থাকিতে পারেন, তাই তিনিও রাধার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়া যেন কৃতার্থ হইয়াছেন। যদি এমন প্রেম জগতে আবার ফিরিয়া আসে, তবে আমরাও আত্মনিবেদিতা রাধার সহিত ডাকিয়া বলিব—

আজু কৈায়েলা নাথ হি ডাকহু
নাথ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
বিদ্যাপতি।

এখন—কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় করুক চন্দ॥
চণ্ডীদাস।

জানি না আবার কত দিনে, কত বৎসরে, কত যুগযুগান্তর পরে বিশ্বজগৎ চণ্ডীদাসের রাধার মত বিশ্বপতির মধুর বাঁশরীর তান-লহরী শুনিয়া তাঁহার দিকে এইরূপ উন্মাদ-প্রেমে ছুটিয়া যাইবে, এইরূপ আত্মনিবেদন করিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিয়া বলিবে—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

রামাবতী

(৩)

বহু বৎসর পূর্ব্বে 'সেখ শুভোদয়া' নামক হস্তলিখিত পুথিতে 'রামাবতী'র নাম দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল;—প্রথম প্রবন্ধেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার উল্লেখ করিবার কি প্রয়োজন ছিল, এক্ষণে তাহা বলিতেছি।

'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম হলায়ুধ মিশ্র বলিয়া লিখিত ছিল। গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে গদ্যে বিরচিত হইলেও, তাহার রচনায় চ্যুতসংস্কৃতেরই বাহুল্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। গ্রন্থখানি সেখ্‌শাহ জালালুদ্দীন তবরেজি নামক স্বনামখ্যাত মুসলমান সাধুপুরুষের জীবন-কাহিনীরূপে লিখিত। পারসিক ভাষায় এই সাধুপুরুষের একাধিক জীবনকাহিনীর গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা নূতন। রাজা লক্ষ্মণসেন যখন লক্ষ্মণাবতী নগরে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ে 'সেখ' তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন, এবং অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া, লক্ষ্মণসেন দেবের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া পীর সাহেবকে ভূমিদান করেন, তদুপলক্ষে 'সেখ' রামাবতী প্রাপ্ত হন। এই সকল কথা এই গ্রন্থের প্রধান কথা।

এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; কেন,—কোন্ সময়ে কোন্ প্রয়োজনে লিখিত হইয়াছিল,—গ্রন্থকারের নাম হলায়ুধ মিশ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল কেন,—ইহা মুসলমানের দরগায় রক্ষিত হইতেছিল কেন,—এ সকল কথা প্রথমে প্রহেলিকাপূর্ণ বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের এক স্থলে একটি শ্লোকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—"পালান্বয়-মৌলি-মণ্ডনমণিঃ" রামপাল দেব জাহ্নবী-জলমধ্যে অনশনে তনুত্যাগ করেন। তাহার পর, মন্ত্রিবর্গ পরামর্শ করিয়া, শিবোপাসক কাঠুরিয়া বিজয়সেনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। এই সকল কথার মধ্যে কোনরূপ ঐতিহাসিক তথ্য কবিকল্পনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে কি না, তৎকালে তাহার রহস্যভেদ করিবার উপায় না থাকিলেও, ভবিষ্যতের তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টায় ফল লাভ করিবার আশায়, মালদহ-নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া, গ্রন্থখানির আদ্যন্ত নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মূল গ্রন্থ হারাইয়া গিয়াছে; নকলখানিও হারাইয়া গিয়াছিল। দুই বৎসরের অনুসন্ধান-চেষ্টায়, পরম স্নেহাস্পদ পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠজী তাহার উদ্ধারসাধন করিয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের অনুমতিক্রমে নকল গ্রন্থখানি আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মালদহে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবার সময়ে, নকল গ্রন্থখানি প্রদর্শিত করিবার জন্য, শেঠজী

তাহা চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ঐ গ্রন্থ আবার লুপ্ত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বিপিনবিহারী ঘোষকে উহার অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। এখন শ্রীমান্ বিপিনবিহারী কর্ত্তৃক প্রচারিত এক বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি,—ঐ গ্রন্থ "মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতি" কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইবে; তাহার সম্পাদন-ভার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত হইয়া গিয়াছে! এইরূপে গ্রন্থখানি আর একবার দেখিবার সুযোগ হারাইয়া, স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া, তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। 'সেখ শুভোদয়া'গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, উহার সম্পাদন-কার্য্যে উত্তরবঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয়লাভের প্রয়োজন হইবে।

এই গ্রন্থের সহিত একটি জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহা না জানিলে গ্রন্থখানি চিরদিনই প্রহেলিকাপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহার সন্ধানলাভ করিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছিল,—কোন্ সময়ে কিরূপ প্রয়োজনে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল।

শাহ জালাল তব্রেজির

কাহিনীর সহিত মুসলমান-শাসনের প্রথম প্রভাবের অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তখন পুরাতন সাম্রাজ্যবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক দিন হইতেই তাহা ধীরে ধীরে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল। তথাপি মুসলমানের পক্ষে সহসা তাহার সকল গ্রন্থি সহজে উন্মোচন করিবার সুযোগ ঘটিতে পারে নাই। উত্তরবঙ্গেই সর্ব্বপ্রথমে শক্তি-পরীক্ষার সূত্রপাত হয়। কোন কোন স্থান মুসলমানের করতলগত হইলেও, অনেক স্থানের রাজরাজন্য পুনঃপুনঃ স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যে যুগে নূতন-পুরাতনের এইরূপ শক্তি-পরীক্ষার নানা অভিনয়ে উত্তরবঙ্গ আন্দোলিত হইতেছিল, সেই যুগে মুসলমান-সাধুপুরুষদিগের নিকট ভারতবর্ষ একটি প্রচারক্ষেত্র বলিয়া প্রতিভাত হইবামাত্র, সেনাপ্রবাহের অনুবর্ত্তী প্রচারক-প্রবাহও ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করে। দিল্লী তাহার কেন্দ্রস্থল হয়। সেখ-উল্-ইস্লাম উপাধিধারী ধর্ম্মপ্রচারক তাহার নেতৃত্ব লাভ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচারক প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। পারস্যের অন্তর্গত তব্রেজ সহরে জন্মগ্রহণ করিয়া, ফকিরীব্রতধারী শাহ জালাল সাধুপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া, ঈর্ষাপরবশ সেখ-উল-ইস্লাম তাঁহার শত্রুতা সাধন করায়, শাহ জালাল গৌড়ে উপনীত হইয়া, মুসলমান শাসনকর্ত্তার সম্মানভাজন হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে যে বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন, তাহা এখনও "বাইশহাজারী ষ্টেট" নামে মালদহ জেলায় সুপরিচিত। এই সকল সম্পত্তি মুসলমান-শাসন-সময়েই অর্জ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে হিন্দু-সেবাইতের দ্বারা

তাহার রক্ষণাবেক্ষণকার্য্য পরিচালিত হইত। কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে মুসলমানের দরগার ভূসম্পত্তি হিন্দুর করতলগত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মোগল-শাসনসময়ে ঢাকার নবাব-দরবারে ইহার 'তদন্ত' হইয়াছিল। জনশ্রুতিতে জানিতে পারা গিয়াছে, সেই সময়ে 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থ প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া, হিন্দু-সেবাইত প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, "রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়েই এদেশে সেখ শাহ জালালের 'শুভোদয়' হইয়াছিল, এবং রাজা লক্ষ্মণসেনই ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই সময় হইতে পুরুষানুক্রমে তাহা হিন্দুর রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে।" গ্রন্থখানিকে লক্ষ্মণসেন দেবের শাসন-সময়ে রচিত প্রাচীন প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদিত করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণসেন দেবের ধর্ম্মাধিকার [মহামহোপাধ্যায়] হলায়ুধ মিশ্রকে গ্রন্থকাররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; লক্ষ্মণসেনের সভাবর্ণনায় জয়দেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী দেবীরও উপস্থিতি স্থানলাভ করিয়াছে।

গ্রন্থখানি যে মোগল-শাসনসময়েই রচিত হইয়াছিল, এই জনশ্রুতির সাহায্যে তাহারই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের রচনা-রীতির মধ্যেও আধুনিকত্বের পরিচয় সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থের কোনরূপ ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না, থাকিলে, তাহা কিরূপ মূল্য, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য।

মোগল-শাসন-সময় পর্য্যন্ত গৌড়াঞ্চলে পুরাকালের যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, তদবলম্বনেই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। সেই জনশ্রুতি এখন আর প্রচলিত নাই, সুতরাং পুরাতন জনশ্রুতির আধার বলিয়া, এই গ্রন্থের কিছু না কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকা স্বীকার করিতে হইবে।

'রামচরিতম্'-কাব্যে রামপালদেবের বরেন্দ্রী-উদ্ধারের কাহিনী যে ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা সমসাময়িক বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত ছিল। তিনি লোকসমাজে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় যশস্বী ছিলেন। তাঁহার কাহিনী সমসাময়িক সাহিত্যেও স্থান লাভ করিয়াছিল। তাঁহার কথা যে গ্রন্থে লিখিত হইয়াছিল, তাহা 'কলিযুগ-রামায়ণ' নামে পরিচিত হইয়াছিল। যে কবি তাহার রচনাকার্য্যে যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনিও 'কলিকাল-বাল্মীকি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি তৎকালে সুপরিচিত ছিল বলিয়াই, শীলচন্দ্র তাহা 'যথাদৃষ্টং' নকল করিয়াছিলেন; এবং সেই নকল নেপালের ন্যায় দুর্গম প্রদেশেও নীত হইয়াছিল। রামপালের 'বরেন্দ্রী-উদ্ধার-কাহিনী' বৈদ্যদেবের এবং মদনপালদেবের তাম্রশাসনেও ইঙ্গিতে সূচিত হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণে জানিতে পারা যায়, রামপালের কথা গৌড়জনের পক্ষে সহসা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থে রামপালের মৃত্যুকথা যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এ কালের জনসমাজে অশ্রদ্ধেয় অলৌকিক কাহিনী বলিয়া উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা আছে।

এ যুগে 'প্রায়োপবেশনে' তনুত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত অপরিচিত; তাহার জনশ্রুতি বিলুপ্ত; এবং শাস্ত্রে তাহা কলিযুগের পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়াও উল্লিখিত। কিন্তু রামপালদেব সত্য সত্যই এরূপভাবে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া থাকিলে, সে কথা গৌড়জনের পক্ষে সহসা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

'রামচরিতম্'-কাব্যেও [৪।১০] রামপালদেবের গঙ্গাগর্ভে তনুত্যাগ করিবার আখ্যায়িকা উল্লিখিত আছে। তাহা তুল্যকালবর্ত্তী জনসমাজে অধীত হইবার জন্য তুল্যকালবর্ত্তী কবিকর্ত্তৃক উল্লিখিত। সুতরাং তাহাকে কবিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। রামপালের তিরোভাব-কাহিনীর এইরূপ সমসাময়িক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইবার পর, 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থের শ্লোকটি কিয়ৎ পরিমাণে ইতিহাসের মর্য্যাদালাভ করিবার যোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারিবে। এই গ্রন্থোক্ত 'রামাবতী'র নামও যে কাল্পনিক নাম বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না, 'রামচরিতম্'-কাব্যে এবং মদনপালদেবের তাম্রশাসনে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সেখজী কিরূপে 'রামাবতী'-প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইবার আশা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যে লক্ষ্মণসেন দেবের দানক্রমেই 'রামাবতী' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থের এই কাহিনী উত্তরকাল-বিরচিত অলীক কাহিনী;—মুসলমানের দরগার সম্পত্তিতে হিন্দুর অধিকার সংস্থাপনের প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাহা রচিত হইয়াছিল।

প্রকৃত কাহিনী কি, তৎসম্বন্ধে এখন কেবল সমসাময়িক অবস্থার সাহায্যে কতকগুলি আনুমানিক সম্ভাবনার অবধারণা করা যাইতে পারে। 'রামচরিতম্' কাব্যে তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামপালদেবের তিরোভাবে শিবোপাসক কার্ঠুরিয়া বিজয়সেন মন্ত্রিবর্গের সহায়তায় গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। সমসাময়িক লিপিপ্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে, এবং 'রামচরিতম্'কাব্যেও প্রসঙ্গক্রমে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—রামপালদেবের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপালদেবের প্রধান মন্ত্রীর পুত্র বৈদ্যদেব রামপালপুত্রের প্রধান মন্ত্রী হইয়া 'অনুত্তর বঙ্গে' [দক্ষিণবঙ্গে] নৌযুদ্ধে বিজয়লাভের পরে, কামরূপাধিপতির বিদ্রোহবিকার নিরস্ত করিয়া, কামরূপের রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পরে, রামপালদেবের পৌত্র তৃতীয় গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, পরলোকগামী হইলে, রামপালদেবের অপর পুত্র [মদনপালদেব] রাজা হইয়া "রামাবতী নগর-পরিসর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার" হইতে তদীয় বিজয়রাজ্যের অষ্টম সম্বৎসরে ভূমিদান করিয়াছিলেন। মদনপালদেবের চতুর্দ্দশ রাজ্য-সম্বৎসরেরও একখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং রামপালদেবের

তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বরেন্দ্রীমণ্ডল হইতে পাল-সাম্রাজ্যের অধিকার উৎখাত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

সেন-রাজবংশের প্রথম রাজা শিবোপাসক বিজয়সেনদেব বরেন্দ্রীয় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে [রাজসাহীর অন্তর্গত বিজয়-নগরে] রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, সেই স্থানের উপকণ্ঠেই একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়তীরে তাঁহার প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে উমাপতিধর লিখিয়া গিয়াছেন,—বিজয়সেন দেব "গৌড়েন্দ্রং অদ্রবৎ"। সুতরাং বিজয়সেন দেবের শাসন-সময়ে সমগ্র বরেন্দ্রীমণ্ডল তাঁহার অধিকারভুক্ত হয় নাই; তখনও গৌড়েন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিই যে পাল-রাজবংশের বরেন্দ্রী-মণ্ডলের শেষ রাজা, তাহাই প্রতিভাত হয়। তাঁহার নাম এখনও অপরিজ্ঞাত

'রামচরিতম্' কাব্যে [৪। ২৯] দেখিতে পাওয়া যায়, মদনপালদেবের জয়ন্তুতুল্য এক জয়শীল পুত্র ছিলেন। সুতরাং রামাবতী মদনপালদেবের সঙ্গে সঙ্গেই সৌভাগ্যবিচ্যুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বরেন্দ্রীমণ্ডল হইতে কালক্রমে পাল-সাম্রাজ্যের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইলে, 'রামাবতী' মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া থাকিবে। কারণ, সেনরাজগণ তথায় রাজধানী সংস্থাপিত না করায়, তাহার প্রাধান্য এবং বিভবশ্রী অল্পকালেই বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ক্রমে তাহার নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল! এখন আর বরেন্দ্রীমণ্ডলে 'রামাবতী' নামে কোন স্থানই পরিচয় প্রদান করে না।

শাহ জালালের সম্পত্তি লাভের ইতিহাস কিয়দংশে বাহুবলের ইতিহাস। তিনি অনেক পুরাতন পরিত্যক্ত ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন;—অনেক দেবমন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, এবং সময়ে সময়ে বরেন্দ্রী-মণ্ডলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, অনেক ভূসম্পত্তি করতলগত করিয়াছিলেন। মুসলমানশাসনের প্রথম প্রকোপের সময়ে তাহা প্রশংসাযোগ্য কার্য্য বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিল।

এইরূপে শাহ জালাল যাহা অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার অনেক স্থানের পুরাতন স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন নামও দূরীকৃত হইয়াছিল। তাঁহার নিয়ত বাসস্থান পাণ্ডুয়া নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, তাহাই এখনও তাঁহার 'চিল্লাখানা' নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকটি সাময়িক বাসস্থান ছিল। তাহার সাধারণ নাম 'তাকিয়া' বা সাধু-পুরুষের বিশ্রাম স্থান। এই সকল 'তাকিয়া'য় বিশ্রাম লাভ করিয়া, শাহ জালাল তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিকার রক্ষা করিতেন। 'রামাবতী' এইরূপ একটি 'তাকিয়া'র নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। রামাবতী-অঞ্চল যে শাহ জালালের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থের তৎসংক্রান্ত উক্তিতে অনাস্থা স্থাপন করিবার কারণ নাই। সেখজীর 'বাইশ-হাজারী' ষ্টেটের সহিত 'রামাবতী'র সম্পর্ক না

থাকিলে, 'সেখ শুভোদয়া'গ্রন্থে তাহার কথা উল্লিখিত হইত না। 'রামাবতী'র স্থান নির্ণয়ের জন্য অনুসন্ধানচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, [এই সকল কারণে] 'সেখ শুভোদয়া'-গ্রন্থেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই 'সেখ শুভোদয়া' গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য।

যাঁহারা পুস্তকালয়ে বসিয়া, স্বদেশের ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের অপেক্ষাকৃত আনন্দপ্রদ আয়াস স্বীকারকেই যথেষ্ট আয়াস-স্বীকার মনে করিয়া, আত্মতৃপ্ত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদিগের পক্ষে [প্রয়োজনাভাবেই] কাহারও সারথ্যের অভাব অনুভূত হয় না। কিন্তু কেবল পুস্তকালয়ে বসিয়া পুস্তক-নিহিত সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পুস্তক অধ্যয়নের জন্য নানা স্থান পরিদর্শন করিতে হয়; নানা স্থান পরিদর্শনের জন্যও পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হয়। উভয় কার্য্যের প্রয়োজনই পরস্পরের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ। এই সরল সত্যটি অস্বীকার করিয়া, বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলন করিতে বসিলে, আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

'রামচরিতম্'-কাব্যে অনেক সমসাময়িক ঘটনার এবং ঘটনা-স্থানের উল্লেখ আছে;—অনেক সমসাময়িক ঘটনার এবং ঘটনাস্থানের ঐতিহাসিক পাত্রেরও উল্লেখ আছে। প্রধান ঘটনাস্থানে [বরেন্দ্রী-মণ্ডলে] এখনও তাহার অনেক স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কিছুই বর্ত্তমান নাই মনে করিয়া, ভ্রমণক্লেশ পরিহার করিবার চেষ্টা করা, অনুসন্ধানবিমুখ বাঙ্গালীর পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক হইলেও, রামচরিতোক্ত স্থানাদির অনুসন্ধানের জন্য একবার বরেন্দ্রী-মণ্ডলে ভ্রমণক্লেশ স্বীকার করিতে পারিলে, পল্লীবাসীর সারথ্যে অনেক পরিত্যক্ত পুরাতন স্থানের সন্ধান লাভ করিবার এবং 'রামচরিতম্'-কাব্যের অনেক দুর্ব্বোধ্য অংশ হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা আছে।

যাহারা ইতিহাসের এক বর্ণও অধ্যয়ন করে নাই, এবং কোথায় কোন্ প্রাচীন লিপিতে কিরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সন্ধান রাখিবারও শিক্ষা লাভ করে নাই;—যাহারা 'রামচরিতম্'-কাব্যের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিবারও সৌভাগ্য লাভ করে নাই,—তাহারাও দিব্যের নাম অবগত আছে, দিব্যের দীঘি দেখাইয়া দিতে পারে;—ভীমের নাম অবগত আছে, ভীমের ডাইঙ্গ, ভীমের জাঙ্গাল, এবং ভীমের গড় কোথায়, তাহা দেখাইয়া দিতে পারে। তাহারা হরিরাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া দেয়,—চন্দ্রপালের ভিটা, [আশাপালের ?] উষাপালের বাড়ী, এবং রামপাল রাজার সহর কোথায়, তাহাও দেখাইয়া দিতে পারে। পুরুষানুক্রমে দেশের নিরক্ষর লোক এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনাস্থানের ও ঐতিহাসিক পাত্রগণের কথা যে ভাবে শুনিয়া আসিতেছে, সেই ভাবে বিবৃত করিয়া, পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের প্রভূত সহায়তা সাধন করিতে পারে। তাহাদের পল্লীকুটীরে দারিদ্র্যের মধ্যে

সহৃদয়তা আছে, মূর্খতার মধ্যে সরলতা আছে। তাহারা সত্য সত্যই যাহা কিছু কিঞ্চিৎ অবগত আছে, তাহাদের সেই জ্ঞানের মধ্যে জুগুপ্সা নাই,—সমালোচনার মধ্যেও অহমিকার অভাব! বরেন্দ্রীমণ্ডলের নিরক্ষর পল্লীবাসীর অযাচিত সন্ধান-প্রদানে, যেভাবে যেখানে 'রামাবতী'র ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক যথাকালে প্রকাশিত হইবে। তাহার সহিত 'রামচরিতোক্ত' বিবরণের সামঞ্জস্য আছে কি না, সকলেই তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সোরাব ও রোস্তাম *

ভরিল পূরব নব প্রভাতের শ্যামল আলোকে
'অক্ষসা'-প্রবাহ হ'তে উঠিল কুয়াসা। তীরে তীরে
তাতার শিবির সারি সকলি নীরব—নিশি শেষে
যত লোক ঘুমে নিমগন। একেলা সোরাব—নাহি
তার চখে ঘুম। সারা রাতি ছিল জাগি শয্যা'পরে
উলটি পালটি। যখন শিবিরে তার শুভ্র উষা
পশে ধীরে ধীরে—উঠিয়া সে পরিল আপন সাজ
ঝুলাল কটিতে অসি। লয়ে নিজ অশ্বারোহি-বাস
ত্যজিয়া শিবির বাহিরিল হিমসিক্ত কুয়াসায়
আঁধার শিবির বহি' পিরাণু-ইজার ঘর পানে।
তাতার শিবিররাজি কৃষ্ণবর্ণ ছিল বিরচিত
মধুচক্র সম মেশামিশি ছাইয়া সে অক্ষসার
সমতল নিম্ন উপকূল—যথা খর-রবি-তাপে
পামিয়ার চূড়া হ'তে গলিত তুষার বহি' আনে
গ্রীষ্মের প্লাবন। গেল চলি' শ্যামল শিবির বহি'
নিম্ন সেই উপকূল দিয়া। উত্তরিল গিরি' পরে
নদীর সে তীর হতে ঈষৎ পশ্চাতে। যেইখানে
গ্রীষ্মে নদী অতিক্রমি' তরণী প্রথম আসি' লাগে।
আদিম মানবগণ মৃত্তিকার দুর্গ বিরচিয়া
সাজাইয়াছিল তারি ঊর্দ্ধদেশে মুকুটের মত।

* 'ম্যাথিউ আর্নল্ডে'র মূল হইতে অনুবাদিত, চন্দননগর সাহিত্য-সভার বিশেষ অধিবেশনে লেখককর্তৃক পঠিত।

সে দুর্গ হয়েছে ধূলিসাৎ। এখন তাতারগণ
পেরাণ্-ইজার তাঁবু সেইখানে কৈল বিরচন।
কাঠের সে ঘরখানি —শুষ্ক পত্রে ছাউনি তাহার।
সোরাব আসিল সেথা—প্রবেশিয়া তাহে গালিচার
স্তূপ'পরে দাঁড়াইয়া নেহারিল কম্বলশয়নে
পেরাণ-উইজা বৃদ্ধ নিদ্রায় আবিষ্ট হ'য়ে রয়।
অস্ত্র বর্ম্ম আদি তার চারিদিকে রহে ছড়াইয়া।
যদিও পশিল ধীরে—শুনিলেন পেরাণ-উইজা
পদধ্বনি,—আছিলেন বৃদ্ধ সম লঘু নিদ্রাগত,
অমনি বাহুতে ভর করি উঠি' কহিলেন বাণী ;—
"কে তুমি ? এখনো উষা হয় নাই সুস্পষ্ট প্রকাশ,
কহ কহ কি সংবাদ—নিশীথে কি পাইয়াছ ভয় ?"
সোরাব শয্যার কাছে আসি কিন্তু কহিলেন তা'রে
"পেরাণ-উইজা ! চেন মোরে তুমি, আমি আসিয়াছি—
এখনো উঠেনি রবি—ঘুমাইছে অরি। কিন্তু আমি
আছি নিদ্রাহীন —সারা রাত্রি ছিনু জাগি' শয্যা'পরে
উলটি পালটি ;—এখন এসেছি তোমার নিকটে।
অপ্রাশিব নৃপ মোরে দিলেন আদেশ, তব ঠাঁই
আসিয়া সমরকন্দে লইতে মন্ত্রণা—পুত্র সম
পালিতে আদেশ তব সেনা-যাত্রা করিবার আগে।
কহিব তোমারে আমি কি বাসনা জাগে হিয়া মাঝে।
জান তুমি—যে অবধি আসিয়াছি 'আদর-বিজান'
হ'তে তাতারের দলে, অস্ত্র ধরিয়াছি করে আর
তবু 'অপ্রাশিব' নৃপে সেবিয়াছি বহু, দেখায়েছি
বাল্যকালে বীরের বিক্রম। ইহাও ত' জান তুমি
বিজয়ী তাতার ধ্বজা ধরি যবে ফিরি ধরাতল
প্রতি ক্ষেত্রে পার্শীগণে পরাভূত করিয়া খেদাই,
একজনে—একজনে—মাত্র একজনে খুঁজিতেছি
রুস্তাম পিতারে মোর। আশা ছিল মনে, একদিন
একদিন তুমুল সমর মাঝে লবেন সম্ভাষি'
রণভূমে নিজ পুত্রে—যে নহে অযোগ্য পুত্র তাঁর
একান্ত গৌরবহীন ধরা মাঝে নহে যেই জন।

বহুদিন হ'তে আশা অন্তরের মাঝে এমনিই
ছিল মোর। এ অবধি কিন্তু তাঁর পাইনি সাক্ষাৎ।
শুন তবে—শুন তবে দেহ মোরে ভিক্ষা যাহা চাই।
বিশ্রাম করুক আজ উভ সৈন্যদল। রণক্ষেত্রে
আহ্বান করিব আজি দ্বৈরথ সমরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
পারসীক বীরে—একা একা যুদ্ধ করিবারে, যদি
জিনি তাহে—শুনিবেন নিশ্চয় রুস্তাম। যদি মরি
হে প্রবীণ! মৃতজন চাহিবে না কারে, মাগিবে না
কারো কুটুম্বিতা। বিপুল বাহিনী-যুদ্ধে শুনা যায়
ক্ষীণ জনরব, দলে দলে যুদ্ধ হয়—তা'র মাঝে
বহু বীরেন্দ্রের নাম ডুবে যায় একাকার রণে
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কিন্তু কীর্ত্তি অসংশয় বীরত্ব প্রচারে।"

কহিলা সোরাব—পেরাণ-উইজা তার হাতখানি
নিজ হাতে নিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যজি' কহিলেন—
"হে সোরাব! অশান্ত হৃদয় আজি দেখিতেছি তব
তাতার প্রধান মাঝে রহিতে কি নাহি পার তুমি
সাধারণ যুদ্ধ ফল আমাদের সনে পার না কি
লইতে বণ্টন করি'? ভালবাসি তোমারে সবাই।
কেন যেতে চাহ শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি আশে দ্বৈরথ সমরে
প্রাণ করি পণ—খুঁজিতে পিতারে, কভু চোখে যারে
দেখনি কখনো। একই বাসনা এই কিন্তু যদি
জাগে নিরন্তর তোমার অন্তরে—বাহির করিতে
খুঁজি' বীরেন্দ্র রুস্তমে—রণের ভিতরে তবে নাহি
কর তাঁর অন্বেষণ। শান্তির মাঝারে খুঁজি তাঁরে
সোরাব! অক্ষত দেহে পিতার বাহুতে দেও ধরা।
দূরে—বহু দূরে তিনি—সেই খানে কর অন্বেষণ।
আমার শৈশব কালে আছিল যেমন এখন ত'
নাহিক সে দিন তাঁ'র। তখন যতেক হ'ত রণ
ধাইতেন সর্ব্ব অগ্রে দুর্জ্জয় রুস্তাম। পরিহরি'
রণভূমি এখন রহেন তিনি সিস্তানে বসিয়া
বৃদ্ধ পিতা 'জালে'রে সেবিতে শুশ্রূষিতে। আপনার
প্রৌঢ়কাল সমাগত বুঝি' মনে মনে—কিম্বা পার্শী

নৃপ সনে কলহ হইয়া বুঝি থাকিবে তাঁহার।
যাও যাও। যাইবে না? অমঙ্গল চিন্তা আসে মনে—
বিপদ অথবা মৃত্যু মনে হয় ঘটিবে তোমার
রণভূমে। একান্ত কামনা এই—থাক নিরাপদে,
সুখে থাক যেথানেই হোক্—যদিও আমরা বৎস!
দেখা আর না পাই তোমার! অন্তরে জাগিছে সাধ
এই— শান্তি মাঝে অন্বেষণ করিবে পিতারে তব,
মিছামিছি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নাহি কোন কাজ। কিন্তু হায়!
সিংহশিশু যেই তা'রে বিক্রম হইতে কে বা বারে
রুস্তাম-তনয়ে আর কে রাখিবে রুধিয়া? এস বৎস
দিনু অনুমতি কর নিরন্তর চিত্ত যাহা চায়।"

এমনি কহিয়া তিনি ছাড়িলেন সোরাবের হাত,
ত্যাগ করিলেন শয্যা—উত্তপ্ত সে কম্বল—আচ্ছদ
বেষ্টিত ছিলেন যাহে—নিজ শীতল অঙ্গের'পরে
পরিলেন পশমী পোষাক। পরিলেন পদযুগে
চন্দনের থরম জোড়াটি। শুভ্র এক আস্তরণ
জড়াইয়া দেহে—নিলেন দক্ষিণ হস্তে শাসকের
দণ্ড,—দীপ্ত অসি ত্যজি'। মেষলোমে রচিত উষ্ণীষ
পরিলেন শিরে। কুঞ্চিত উজ্জ্বল কৃষ্ণ, কেরাকুল
লোমে বিনির্ম্মিত। তাঁবুর পর্দাটি তুলি' ডাকিলেন
স্তাবকেরে আপনার কাছে—বাহিরি' গেলেন চলি'।

ইতি মধ্যে উঠি' রবি প্রশস্ত অক্ষসা বক্ষ হ'তে
সমুজ্জ্বল তট বালু হ'তে আর কুয়াসারে কৈল
বিদূরিত। তাতার শিবির হ'তে অশ্বারোহীদল
মুক্ত প্রান্তরের'পরে দাঁড়াইল পিছনে পিছনে
সারি বাঁধি'। 'হামান' আদেশ দিল এইমত সবে।
পিরাণ্-ইজার ইনি সহকারী সেনার নায়ক
প্রফুল্ল যৌবন বীরদেহ 'পরে বিরাজে রক্তিম।
দীর্ঘ অশ্বারোহী সারি কৃষ্ণবর্ণ শিবির হইতে
বাহিরিল স্রোতের মতন। অগ্রহায়ণের প্রাতে
পারস্য সাগর তীরে উষ্ণ বায়ু সেবনের আশে
দক্ষিণাভিমুখে যথা দীর্ঘ-গ্রীব সারসের দল

বেগে ধায় পরিহরি' অরালি মোহানা—কিম্বা ঘন
তুষারে আবৃত সেই কশ্যপহ্রদের শরবণ
ধায় দ্রুত কাস্‌বিনে আর এলাব্রজের দক্ষিণে
ঢাল ভূমি ভাগে—সেই মত ছুটিয়া চলিল বেগে
অক্‌সার তাতারীয় সেনা, রাজ-দেহ-রক্ষীদল
চলিল প্রথমে—শিরে কৃষ্ণ শিরস্ত্রাণ মেষ লোমে
যতনে রচিত—প্রকাণ্ড আকার, প্রকাণ্ড অশ্বের
পৃষ্ঠে চড়ি'। বোখারা ও খিভাদেশে তাহাদের বাস
ঘোটকীর দুগ্ধ হ'তে মদ্য তা'রা করে বিরচন।
তা'র পাছে দক্ষিণের শান্তস্বভাবা তুর্কী সেনাদল
তুকাদল—সালরের বর্ষাধারী দল—এসেছিল
এরা সব আত্রেক ও কশ্যপ হ্রদের তীর হ'তে।
খর্ব্ব দেহ, খর্ব্ব অশ্বে চড়ি'। উষ্ট্রীর কদর্য্য দুগ্ধ
কূপের সলিল আর এরা করে পান। তা'র পাছে
এক ঝাঁক অশ্বারোহী যুদ্ধজীবী, জয় পরাজয়ে
তাহাদের এতটুকু নাহি আসে যায়। তার পরে
ফর্গানা তাতার দল—যক্‌যর্তীসার তীরবাসী
অল্প শ্মশ্রু—শিরে আঁটা ক্ষুদ্র শিরস্ত্রাণ। কিপ্‌চক্‌
দেশে আর উত্তরের রিক্ত মরু মাঝে বাস করে
যে সব বর্ব্বর জাতি কাল মুখ, উষ্ক-খুস্ক কেশ
কজাকের ঝাঁক, তা'রা উত্তর মেরুর কাছে কাছে
ঘুরিয়া বেড়ায়,—আর ভ্রাম্যমান খির্গিজির দল,
পামিয়ার হ'তে তারা শ্বেত অশ্ব এসেছিল চড়ি'।
শিবির হইতে সব সারি দিয়া বাহিরি' দাঁড়া'ল
মুক্ত সে প্রান্তর 'পরে। আর দূরে বিপরীত দিকে
পার্শীরা দাঁড়া'ল সারি দিয়া—মনে হয় খণ্ড খণ্ড
লঘু মেঘ বহু অশ্বাকার ধরিয়াছে। হয় জ্ঞান
তাতার তাহারা। খোরাসনবাসী ইলিয়াত আর
তা'র পাছে—পারস্যের রাজ সৈনাগণ অশ্বারোহী
আর পদাতিক—দাঁড়াইয়া আছে কাতারে কাতারে,—
শাণিত ফলক যত রবি-করে করে ঝক্‌ ঝক্‌।
পিরাণ-উইজা কিন্তু এল তা'র দূতের সহিত

তাতার-বাহিনী ঘুরি' পুরোভাগে আসি দাঁড়াইল।
পারসীদলের নেতা ফেরুদ যখন দেখিলেন
পিরাণ-উইজা যত তাতারেবে ঠেলেছে ঠেলিয়া—
বল্লম লইয়া করে পুরোভাগে আসি' সেনাদের
গতি রুধি' আদেশ দিলেন তথা স্থির থাকিবারে,
সে বৃদ্ধ তাতার তবে বালুকার প'রে স্পন্দহীন
উভ সৈন্য মাঝে দাঁড়াইয়া সম্বোধি কহিলা সবে,
"শুন হে ফেরুদ! শুন পারস্য ও তাতার সৈনিক
ক্ষান্ত হোক্ উভ দলে আজিকার মত মহারণ
পারস্য প্রধানগণে দিক্ নির্ব্বাচিয়া এক বীর
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবারে একা একা মোদের পক্ষীয়
বীরবর সোরাবের সনে।"

হেমন্ত প্রভাতে যথা
উজ্জ্বল শিশির বিন্দু শস্যশীর্ষ'পরে যবে করে
ঝক্ ঝক্—আনন্দ হিল্লোল এক বহে মর্ম্মরিয়া
সুগভীর শস্যবন মাঝে—তেমনি শ্রবণ করি
পেরাণ্-ইজার বাণী, তাতার সৈনিক হিয়া মাঝে
প্রিয় সোরাবের লাগি' বহে গর্ব্ব-আনন্দ হিল্লোল।
কিন্তু যথা একদল ফেরিওয়ালা কাবুল হইতে
ভারতীয় ককেশস্-তল দিয়া অতিক্রম করে
তুষারকিরীটী শুভ্র মেঘচুম্বী বিশাল পর্ব্বতে
অবশেষে আরোহিয়া অতি উচ্চে নেহারে যখন
ঝাঁকে ঝাকে পক্ষিকুল শ্বাসরুদ্ধ মৃত আছে পড়ি—
মিষ্ট জম্বুরসে আর নিজকণ্ঠ ভিজাবার আগে
বাঁধিয়া একটি সারি ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে চলে
তুষার খসিয়া পড়ে পাছে পদ চাপে, তেমনিই
পার্সীগণ রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে রয় মহা এক ভয়ে।

(ক্রমশ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

———

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র *

জয়পুরের ঐতিহাসিক কথা

কর্ম্মীর জীবনচরিত বুঝিতে হইলে তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পরিচয় আবশ্যক। বিশেষতঃ মন্ত্রীর জীবনী বুঝিতে, সে রাজ্যের ইতিহাস জানার একান্ত প্রয়োজন। তাই সংসারচন্দ্রের জীবনী লিখিতে বসিয়া সর্ব্ব-প্রথমে জয়পুর রাজ্যের একটা মোটামুটি ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিতেছি।

জয়পুর-রাজ-বংশ ত্রেতাযুগাবতার ভগবান্ রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশোদ্ভূত। এজন্য ইঁহারা "কাছোয়া" রাজপুত নামে অভিহিত। ঠিক কোন্ সময়ে যে এই শাখা অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র রাজ্য স্থাপনের জন্য বহির্গত হন, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, কেননা তাহা লোকশ্রুতির আব্ছায়ার মধ্যে লুকায়িত। ইঁহারা যখন শোণ নদীতীরে রোহতস্-গড় স্থাপন করেন, তখন হইতে 'ঢুঁঢার' (বর্ত্তমান জয়পুর-রাজ্য) জয় পর্য্যন্ত এই কালের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। রোহতস্ গড় হইতে কাছোয়া রাজপুতগণ গোয়ালিয়রের উত্তরে এবং সিন্ধু ও পাহুজ নদের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ জয় করিয়া পরে বর্ত্তমান গোয়ালিয়র নগর হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে 'নারবর' নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে ইঁহারা প্রায় নয়শত বৎসর রাজত্ব করেন এবং এই সময়েই কাছোয়া-রাজ সুরজ সেন কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ৯৬৮ খৃঃ অব্দে কুমার ঢুলে-রাও নারবর হইতে দৌসা রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে তথায় আগমন করেন। আসিবার সময় তাঁহার ভাগিনেয় পরমল দেবকে গোয়ালিয়র শাসনের ভার দিয়া আসেন। কুমার ঢুলেরাও দৌসায় অনেক দিন বাস করায়, পরমলদেব গোয়ালিয়র সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। এদিকে দৌসারাজের পুত্রাদি নাই—কুমার ঢুলেরাওই

---

* যে সকল মহাত্মা সংসার-সমুদ্রের বেলাভূমে পদচিহ্ন রাখিয়া যা'ন, মানুষ স্বভাবতঃ তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতূহলী। কর্ম্মবীরের জীবনী ঘটনা-বহুল, কাজেই তাঁহার জীবনী-লেখক সহজেই তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহ সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু যে নিগূঢ় সাধনার ফলে তিনি আপনার জীবনকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কোনো বিশ্লেষণ-যন্ত্রে প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা তাঁহার সেই সাধনার ফলমাত্র দেখিতে পাই।

জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্বর্গগত রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন, সি, আই, ই, এম, ভি, ও, মহোদয়—সামান্য শিক্ষক হইতে কেমন করিয়া এই বিপুল রাজ্যের মন্ত্রিত্বপদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহা ঘটনা-পরম্পরা গ্রথিত করিয়া দেখান সহজ, কিন্তু এই কর্ম্মযোগী অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে কেমন করিয়া প্রতিদিন এই সফলতার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা কে দেখাইবে?

বাংলা দেশের সুপুত্র সংসারচন্দ্রের জীবনী বাঙ্গালীর আদরের সামগ্রী। তিনি তাঁহার কৃতিত্ববলে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বঙ্গমাতার যে সমস্ত সুসন্তান, বাঙ্গালীর রাজকার্য্য পরিচালনের অক্ষমতার কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন, সংসারচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান গৌরব। জয়পুর রাজ্যের শাসনপ্রণালীতে তিনি যে উদারনীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুদূরগামী; এখনও তাহার প্রকৃত সমালোচনার দিন আসে নাই। কিন্তু এ রাজ্যে তিনি তাঁহার চরিত্রের যে প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অম্বরাধিপতির দীনতম প্রজাও অনুভব করিতেছে।

সে রাজ্যের উত্তরাধিকারী। কুমার দুলে রাও গোয়ালিয়র প্রত্যাবর্ত্তনের সংকল্প ত্যাগ করিয়া দৌসাতেই থাকা শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। ঢুঁটার প্রদেশে এই প্রকারে কাহোয়া রাজবংশের রাজ্য স্থাপিত হইল।

"ওই কালে রাজপুতনার পূর্ব্বাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ ঢুঁটারের আদিম অধিবাসী মিনা-গণের দ্বারা অধিকৃত ছিল। রাজ্য বিস্তারের জন্য কুমার দুলেরাও প্রথমে সিরোবংশীয় মিনাগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া তাহাদের 'মাচ'-নামক এক পার্ব্বত্যদুর্গ আক্রমণ করেন। কথিত আছে, দিবাভাগের যুদ্ধে কুমারের সৈন্যগণ মিনাদিগের নিকট পরাস্ত হয়। সন্ধ্যার সময় কুমার পরদিন কি উপায়ে দুর্গ অধিকার করিবেন চিন্তা করিতেছেন—এমন সময়ে এক রমণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"কুমার, আমি এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জমুয়া দেবী, আমার সাহায্য ব্যতীত তুমি এ দেশ জয় করিতে পারিবে না। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে এই স্থানে তুমি আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আমার পূজার ব্যবস্থা করিবে এবং চিরকাল তোমার বংশের সকলেরই চূড়াকরণ-সংস্কার আমার এই মন্দিরে হইবে—তাহা হইলে আমি তোমাকে জয়লাভের উপায় বলিয়া দিতে পারি।" কুমার দুলেরাও অঙ্গীকার করিলে জমুয়া বা জমবায় মাতা যেখানে মিনাগণ জয়োল্লাসে মদ্যপান করিতেছে, সেই স্থানের সন্ধান বলিয়া দিলেন। কুমার দুলেরাও সেই রাত্রেই মিনাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন—মত্ত অবস্থায় কেহ বিশেষ যুদ্ধ করিতে পারিল না। তাহাদিগের অধিকাংশই হত হইল, বাকী কুমারের বশ্যতা স্বীকার করিল। কুমার এই মাচ দুর্গ ভাঙ্গিয়া রামগড় স্থাপন করিলেন। জমুয়া মাতার মন্দির এখন সেই ভীষণ গিরিবর্ত্মের পার্শ্বে বর্ত্তমান। এখনও কাহোয়া রাজ-বংশের চূড়াকরণ জমুয়া মাতার মন্দিরেই হইয়া থাকে। রামগড় ঢুঁটার প্রদেশে কাহোয়াগণের দ্বিতীয় রাজধানী।

কুমার দুলেরাওএর মৃত্যুর পর তৎপুত্র কাঁকলরাও পিতার ন্যায় ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সে সময় সুখাবত-বংশীয় মিনাগণের অধিপতি ভাটো মিনা রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অম্বর তাঁহার রাজধানী, কাকলরাও ভাটোকে পরাজিত করিয়া সেখানে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। মিনাদিগের এই পার্ব্বত্যদুর্গই ইতিহাসবিশ্রুত অম্বর, যেখানে বহুশতাব্দী ধরিয়া কাহোয়া রাজগণের রাজধানী ছিল এবং যাহার অভ্রভেদি প্রাসাদসমূহ প্রাচ্য-শিল্প-শোভার ভাণ্ডার ও ভারতীয় স্থাপত্য-নৈপুণ্যের আদর্শ-স্থল। অম্বর জয়ের পর বহুকাল ধরিয়া রাজপুত্রগণকে আদিম মিনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এ সময়ের ইতিহাস রাজপুত ও মিনাদিগের বীরত্ব-কাহিনীতে পূর্ণ।

অম্বররাজ পাজন, কুমার দুলেরাও হইতে ষষ্ঠ নরপতি। পাজনের সময়েই অম্বরের ইতি-হাস প্রথম মুসলমান আক্রমণের সহিত জড়িত। তাই সেই সময়ের একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে। এই সময়ে

সাহাবুদ্দিন ঘোরী সমগ্র পাঞ্জাবের অধীশ্বর। ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি এবং মুসলমানদিগের একমাত্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। বংশমর্য্যাদায় ও বীরত্বে, পাজন তখনকার মধ্যে একজন বিশিষ্ট নরপতি—তাই পৃথ্বীরাজ তাঁহার সহিত নিজ ভগ্নীর বিবাহ দিয়া তাঁহাকে একজন প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করেন। এক যুদ্ধে পাজন সাহাবুদ্দিন ঘোরীকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে থাইবার গিরিবর্ত্ম দিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদুরিত করেন।

এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় বিস্তারিত ভাবে জয়পুরের সমগ্র রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত দেওয়া সম্ভব নহে—তাই আমরা অম্বরের প্রধান প্রধান রাজাদিগের উল্লেখ করিব মাত্র। মোগলবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর যখন ভারত আক্রমণ করেন—তখন পৃথ্বীরাজ অম্বরের অধিপতি। পৃথ্বীরাজ হইতে মহারাজ সবাই জয়সিংহ পর্য্যন্ত নরপতিগণ, মোগলসম্রাট বাবর হইতে ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক। এই পৃথ্বীরাজের দ্বাদশ পুত্র, কাওোয়া রাজ-বংশের "বারকোটরীর" প্রবর্ত্তয়িতা। পৃথ্বী-রাজের মৃত্যুর পর, ভারমল্ল অম্বর সিংহাসন অধিকার করেন। ভারমল্ল হুমায়ুন ও আকবরের সমসাময়িক ও উভয়েরই সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। তাঁহারা ইঁহাকে বহু সম্মানে "পঞ্চহাজারী মনসবদার" পদে বৃত করেন।

তৎপরে ভারমল্লের পুত্র ভগবানদাস অম্বরের রাজগদি প্রাপ্ত হন। পিতা জীবিত থাকিতেই ইনি "পঞ্চহাজারী মনসবদার" পদ প্রাপ্ত হন। এই বীরপুরুষ সরণালের যুদ্ধে আকবরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম হোসেন মিরজাকে অনুধাবন করিতে করিতে একদিন আকবর সাহ মাত্র ১৫৬ জন রাজপুতসৈন্য লইয়া ইব্রাহিমের সম্মুখীন হইলেন। ইব্রাহিমের সহিত সহস্রা-ধিক সৈন্য। রাজা ভগবানদাসের পুত্র জগতবিদিত মানসিংহ দ্বিধামাত্র না করিয়া সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। এদিকে আকবরকে একাকী দেখিয়া ইব্রাহিমের তিনজন অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রাজা ভগবানদাস সম্রাটের বিপদ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুর সম্মুখীন হইয়া দুইজনকে নিহত করিলেন—অপর অশ্বারোহী পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

রাজা ভগবানদাসের স্বর্গারোহণের পর, ১৫৯০ খৃঃ অব্দে মহারাজ মানসিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মানসিংহ আদর্শ রাজপুত ছিলেন—যুদ্ধে অপরাজেয়, মন্ত্রণায় বিচক্ষণ, বিপদে ধীর, রাজভক্তি ও বন্ধুত্বে একনিষ্ঠ এবং শাসনকার্য্যে একান্ত ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ সেনা-নায়ক ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারই বীরহস্ত, আসাম হইতে কাবুল কান্দাহার কাস্পিয়ান হ্রদের তট পর্য্যন্ত* আকবরের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়-মান ও রাজ্য দৃঢ়ীভূত করিয়াছিল। তাঁহারই শাসনে কাবুলের দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্যজাতিসমূহ শান্তভাব অবলম্বন করিয়া, মোগলসম্রাটের

*মহারাজ মানসিংহের আনীত পারস্যদেশীয় কার্পেট এখনও জয়পুর রাজ-প্রাসাদে দেখিতে পাওয়া যায়।

অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। মোগলসম্রাট এই বীরের যথোচিত সম্মান করিতেন এবং তাহাকে যথোচ্চ সম্মান—সপ্তহাজারী মনসবদারের পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ মানসিংহের পরবর্ত্তী নরপতি মিরজা রাজা জয়সিংহ, ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক এবং মানসিংহের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তিনি কেমন করিয়া মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীকে মোগল বাদসাহের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এই সন্ধিই তাঁহার কাল হইল। কূটনীতি বিশারদ ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দিল্লীতে বন্দী করিবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু রাজপুত মহারাজ জয়সিংহ নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি শিবাজীর পলায়নের সাহায্য করিলেন। তাহার ফলে তাঁহাকে সম্রাটের ক্রোধে প্রাণ হারাইতে হইল।

অম্বর-রাজধানীর সর্ব্বশেষ নরপতি,—সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ মহারাজ সবাই জয়সিংহ। মহারাজ সবাই জয়সিংহ ঔরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার রাজত্বকালের শেষাংশে দাক্ষিণাত্য-জয়ের সঙ্গী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মোগলসম্রাটের নিকট 'সবাই' * এই বিশিষ্ট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন—এই উপাধি এখনও জয়পুরাধিপতিগণ নিজ নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, যখন দক্ষিণ হইতে দুর্দ্দান্ত মারাঠা-সৈন্য পতঙ্গপালের মত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিল, জাঠেরা যখন মারাঠাদিগের অনুকরণে কেবল লুটপাটকেই জয়ের চরম ফল মনে করিয়া দেশবাসীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল, যখন নব-প্রবুদ্ধ শিখজাতি আপন বীর্য্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল, সেই বিশৃঙ্খলা, আত্মবিচ্ছেদের দিনে অম্বরপতি সবাই জয়সিংহ যে ভাবে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পায়। কঠিন রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াও যে তিনি কেমন করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিবার সময় পাইতেন তাহা বিস্ময়ের কথা। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মান-মন্দির * সকল তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। সে সকল আজও সমস্ত সভ্যজগতের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রে হিন্দুদিগের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। মহারাজ সবাই জয়সিংহই বর্ত্তমান জয়পুর-নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য, মহারাজ মানসিংহের বঙ্গদেশ হইতে আনীত যশোরেশ্বরীর পূজারীবংশে জন্মগ্রহণ করেন—তিনি নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে রাজ্যে পূর্ত্ত বিভাগের কর্ত্তা ও পরে রাজমন্ত্রী হয়েন। এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই মহারাজা জয়সিংহের অনুজ্ঞা-ক্রমে এই অভিনব নগরী নির্ম্মাণ করেন। এরূপ ধরণের নগরনির্ম্মাণপ্রথা ভারতেরই শাস্ত্র-সম্মত †, কিন্তু

* সবাই—বা সওয়া (১¼) অর্থাৎ অনন্যসাধারণ।

* জয়পুর, দিল্লী, বারাণসী, উজ্জয়িনী এবং মথুরায় এই মানমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

† অম্বর-প্রাসাদে, অযোধ্যার যে চিত্র আছে, তাহা

ভারতবর্ষ সে আদর্শ ভুলিয়াছিল—মহারাজ সেই আদর্শকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। আধুনিক সিকাগো প্রভৃতি নগরও এই একই প্ল্যানে নির্ম্মিত হইতেছে।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ সবাই জয়সিংহ, ঔরঙ্গজেবের ভয়ে বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রী ৺গোবিন্দজী ও গোপীনাথজী বিগ্রহদ্বয়কে জয়পুরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রী ৺গোবিন্দজী এখনও রাজভবনের মধ্যে সসম্মানে পূজিত হইতেছেন—এখন জয়পুর রাজ্যের তিনিই মালিক এবং মহারাজগণ তাঁহার দেওয়ান বলিয়া লিখিত হ'ন।

মহারাজ সবাই জয়সিংহের পর ঈশ্বরী (ইসূরা) সিংহ ও তৎপরে সবাই মাধো সিংহ (প্রথম) জয়পুর-সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাধো সিংহ, উদয়রাজ-দুহিতার পুত্র। তিনি উদয়পুর মহারাণার নিকট ভারতের সুবিখ্যাত দুর্গ "রন্থম্ভোর" প্রাপ্ত হন। এই দুর্গই ইতিহাসবিশ্রুত পদ্মিনী দেবীর জন্য মামুদ ঘোরীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। এই দুর্গ যে কত পুরাতন তাহা নির্দ্ধারণ করার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে ইহার আসল নাম—"রণ-স্তম্ভ-ভোর" অর্থাৎ ভোরবংশীয় রাজার রণস্তম্ভ। দুর্গের সম্মুখের পাহাড়ের নাম "রণ-কি-ভুঙ্গর"—এই নাম হইতে পূর্ব্বোক্ত অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হয়। কবে ও কেমন করিয়া যে এই দুর্গ উদয়পুরের মহারাণাদিগের অধীনে আসে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইহারই নিকটে মহারাজ মাধো সিংহ জয়পুরের আদর্শে নিজ নামে 'সবাই মাধোপুর' নগর নির্ম্মাণ করেন।

সবাই মাধো সিংহের পর হইতে ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্তের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সিপাহীবিদ্রোহের সময় মহারাজ সবাই রামসিংহ জয়পুর সিংহাসনে আসীন। এই দুর্দ্দিনে মহারাজ ভারতে শান্তিস্থাপনের জন্য ইংরাজরাজের অনেক সাহায্য করেন, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিবিধ সম্মান ও কোট কাসিম জেলা দান করেন। মহারাজ রামসিংহ শৌর্য্যে বীর্য্যে, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় সে সময়কার ভারতের রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে মহারাজ রামসিংহ স্বর্গারোহণ করিলে, বর্ত্তমান মহারাজ সবাই মাধোসিংহ (দ্বিতীয়) জয়পুরের গদিতে আরূঢ় হইয়াছেন।

বিবিধ বিবরণ

বর্ত্তমান কালে রাজপুতনার মধ্যে জয়পুরই সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী। ইহার বিস্তৃতি প্রায় ১৬ হাজার বর্গ মাইল—লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ২৭ লক্ষ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, জাঠ ও মিনাদিগের সংখ্যা অধিক। রাজপুতের সংখ্যা প্রায় সওয়া লক্ষ—ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক'হোয়া বংশীয়।

জয়পুরে রাজপুত সর্দ্দারের সংখ্যা ১১৮০, তন্মধ্যে তাজমী * বা প্রধান শ্রেণীর সংখ্যা ১৮০। রাজ্যের মধ্যে নগর ও গ্রামের সংখ্যা ৫৭৭২—তন্মধ্যে জয়পুর, সীকর, ফতেপুর,

দেখিলে জয়পুর কি প্ল্যানে নির্ম্মিত বেশ বুঝা যায়। রামায়ণে অযোধ্যার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

* ইহা বিশেষ সম্মান। এ শ্রেণীর সর্দ্দার দরবারে নজর করিবার সময় মহারাজ দাঁড়াইয়া নজর গ্রহণ করেন।

মবনগড়, ঝুনঝুনু, হিন্দোল এবং সবাই মাধোপুর প্রধান। জয়পুর ১১টি জেলায় এবং ৩৩টি তহশীলে বিভক্ত।

জয়পুর রাজ্য রাজপুতনার পূর্ব্বাংশের সমতল ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে আরাবলী গিরিশ্রেণী এবং পার্ব্বত্য নদীসমূহ ইহাকে মরুভূমির মধ্যেও শোভায় এবং শস্যসম্পদে শ্রীসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

বম্বে-বরোদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দুইটি শাখা জয়পুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং নগদা-মথুরা রেল লাইনের ৮৫ মাইল এই রাজ্যের মধ্যে পড়িয়া এই রাজ্যকে সুগম ও ব্যবসা বাণিজ্যের পথ প্রসার করিয়া দিয়াছে।

জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের মধ্যস্থলে সুবিখ্যাত সম্বর লবণ হ্রদ। ইহা দুই রাজার অধিকারভুক্ত এবং উভয়েই গভর্ণমেণ্টের নিকট লবণের জন্য রাজকর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মহাভারতের বিরাট রাজ্য এখন জয়পুরের অন্তর্গত। পুরাতন বিরাট (আধুনিক নাম বৈরাট) নগরীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। জয়পুর বহু পুরাতন হিন্দুরাজ্য—এখানে যে অসংখ্য হিন্দুকীর্ত্তি বর্ত্তমান তাহা বলা বাহুল্য—সে সকলের বিবরণ দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নহে—অভিপ্রায় থাকিলেও তাহা দুঃসাধ্য। রাজপুতনার প্রত্যেক গিরিবর্ত্ম, প্রত্যেক দুর্গ, এমন কি বোধ হয় প্রতি প্রস্তরখণ্ড রাজপুতদিগের বীরত্বের কাহিনীর সহিত বিজড়িত। ঐ সকল কাহিনী ঐতিহাসিকের নিকট বহু মূল্যবান। এক অম্বরের সহিতই ভারত ইতিহাসের কত না স্মৃতি জড়িত আছে! ভারতবর্ষের মধ্যে বর্ত্তমান উদয়পুরের পরই জয়পুর নানা বিপ্লবের মধ্যেও আপন স্বত্বা ও হিন্দুভাব ও পুরাতন প্রথা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। হিন্দুরাজ্যের পুরাতন আচার-ব্যবহার এখনও পর্য্যন্ত এই রাজ্যে যে কতটা পরিমাণে রক্ষিত—তাহা না দেখিলে বুঝা কঠিন।

আমার জীবন

৪র্থ ভাগ

(সমালোচনা)

বহু দিন পূর্ব্বে তৃতীয়ভাগ সমালোচনা করিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম ৪র্থ, ৫ম একবার সমালোচনা করা যাইবে; তাই ৪র্থ ভাগ পাইয়াও সমালোচনা করি নাই। এখন দেখিতেছি, আমরা সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্যসেবী চৈত্র মাসে, নবীনচন্দ্রের জন্মভূমি চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম, এ সময়ে একবার সকলকেই নবীনের কথা শুনাইলে মন্দ হইবে না। বহুপূর্ব্বে বলিয়াছি রায় কালীপ্রসন্ন এবং সেন নবীনচন্দ্র পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সহিত আমাদের বন্ধনের প্রধান রজ্জু ছিলেন; সেই দুইটি রজ্জুই ছিঁড়িয়াছে; তবে এবার চট্টগ্রাম-সম্মিলনী আর একরূপে বন্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন; আমরা

চন্দ্রশেখরাদি দেবদর্শন করিয়া, চট্টলের সাহিত্য-সেবিগণের সহিত সম্মিলন করিয়া ঐহিক, পারত্রিক কার্য্য করিয়া আসিয়াছি।

তৃতীয় খণ্ডের সমালোচনার সময় বলিয়াছিলাম "নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ক্রম-বিকাশের পরিচয় তৃতীয় খণ্ডে পাইব। কিন্তু সে সকল প্রায় কিছুই নাই।" এবার অর্থাৎ ৪র্থ খণ্ড পাইয়া আর আমাদের সে আপশোষ করিবার উপায় নাই। শতপৃষ্ঠারও বেশী রৈবতক কাব্য ও কুরুক্ষেত্র কাব্যের ইতিহাস ও সমালোচনা আছে। এই সুদীর্ঘ সমালোচনা আলোচনা করার পূর্ব্বে গোটা কত গোড়ার কথা মনে করিতে পারিলে ভাল হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙ্গিন কাচখণ্ড ভিতরে দেওয়া কাচের ঠোঙা লইয়া বালক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে, আর প্রতিবার নূতন নূতন সুন্দর চিত্র দেখিতে পাইয়া, কত আনন্দ উপভোগ করে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ঠিক সেই রূপ জিনিষ; দুইবার সমান দেখা যায় না—অথচ প্রত্যেক বারই অতি সুন্দর, নয়নাভিরাম, বৈচিত্র্যময়, শৃঙ্খলাপূর্ণ, শতকোণ-বিশিষ্ট। আবার একটু একটু করিয়া ঘুরাও আর দেখ—উঠিছে, পড়িছে, ভাঙ্গিছে, গড়িছে, অথচ সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা সকল সময়েই ফুটিয়া উঠিতেছে।

বহু পূর্ব্ব হইতে, এই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের নানা রূপ ছিল। রাধা-কৃষ্ণ, কুব্জা-কৃষ্ণ, রুক্মিণী-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ। ভারতবর্ষে বিভিন্ন মূর্ত্তির উপাসক বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহাদের উপাসনার প্রকরণ-পদ্ধতি পৃথক, অঙ্গের চিহ্ন পৃথক্। আজি চারিশত বৎসর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইয়াছে। আমাদের সময়েও চারি জন প্রসিদ্ধ লোকে চারি রূপে কৃষ্ণচরিত্র বিবৃত করিয়াছেন। (১) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, (২) বঙ্কিমচন্দ্র, (৩) নবীনচন্দ্র, (৪) শিশির-কুমার ঘোষ। সকলেই জানেন প্রথম তিন জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং শেষোক্ত ব্যক্তি রাজনীতির ঘুণ। কেদারবাবুর শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা সংস্কৃত গ্রন্থ, অনুবাদ আছে। পুরাণ বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণ-চরিত্র অনুশীলন তত্ত্বের (culture theory) দৃষ্টান্ত। নবীনবাবুর রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নববঙ্গের মহাকাব্য। শ্রীল শিশির-কুমারের কালাচাঁদ-গীতা অভিনব রসমঞ্জরী। এই সকল লইয়া বিচার-বিতণ্ডা করা চলে না। যিনি যে ভাবে যেদিক্ ধরিয়া আমাদিগকে দেখিতে বলিতেছেন, সেই ভাবেই আমরা দেখিব, আর চিত্রের সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিব। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মুষা বা ঈষা, মহম্মদ বা নেপোলিয়ন নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্ব বৈচিত্র্যের, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার। যত বিভিন্নভাবে তাঁহার চরিত্র অনুশীলিত হইবে, ততই তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষিত হইবে। নবীন বাবু বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী; বঙ্কিমবাবু বলেন (There never was a greater champion of it) তিনি ব্রাহ্মণ্য-স্থাপনের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী। নবীন বাবুর গ্রন্থ হইতেই দুইটা উদাহরণ লওয়া যাউক। ধরুন যেন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন-পূজা প্রচলিত করেন।

ইন্দ্র দেবরাজ মহাবর্ষণে ব্রজমণ্ডলের লোকগণকে ব্যতিব্যস্ত করেন, বজ্রপাতে মধ্যে মধ্যে সংহারমূর্ত্তিতে তাহাদের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করেন; আর গোবর্দ্ধন, বিষম বন্যারি জল আটকাইয়া গোকুল রক্ষা করেন, আর মহাপ্লাবনের সময় নিজের উচ্চ সানুদেশে শস্য-সম্ভার রক্ষা করিয়া, গোজাতির পোষণের আয়োজন করিয়া রাখেন—শ্রীকৃষ্ণ যদি ঐ ভাবের পূজা না করিয়া এই রক্ষা-কর্ত্তা পোষণকর্ত্তার পূজার বিধান করিয়া থাকেন —তাহা হইলে তাহাকে কি ব্রাহ্মণ্য বিরোধী বলা যাইবে? তাহার পর, নবীন বাবু বলিতেছেন "যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা ক্ষুধার্ত্ত" কিশোর কৃষ্ণকে এক মুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত ভিক্ষা দেয় নাই—ঠিক, কিন্তু তিনি বলেন নাই আমরা বলিতেছি, তাহাদেরই ব্রাহ্মণীরা অতি যত্নে তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়াছিলেন—তাহাতে কোনরূপ বিরোধ বুঝায়? না বুঝায় যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কঠোর নিয়মপালন-কারী ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণ কোমলহৃদয়া।

বঙ্কিমবাবু বন্ধুভাবে মুরব্বিভাবে নূতন করিয়া কৃষ্ণ গড়িতে নবীনবাবুকে নিষেধ করেন। বলেন, "Krishna preached, if he preached any thing, devotion to the Brahmans. It is against all tradition and written knowledge to set him up against the Brahmans. But the modern poet is of course welcome to give new character to Krishna." অন্যত্র "The old Mahabharat is so grand and has such a deep hold of your readers that only first class execution can make the new acceptable to them." কৃষ্ণ যদি কিছু উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণভক্তিই উপদেশ দিয়াছেন; মহাভারত লোকের মনে এত বসিয়া গিয়াছে যে, তাহার স্থলে আর কিছু বসান একপ্রকার অসাধ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ পরামর্শ পাইয়া নবীনবাবু প্রথমে দমিয়া গিয়াছিলেন বটে, শেষে কিন্তু নূতন কৃষ্ণ খাড়া করিয়া কাব্য প্রকাশ করেন। তাহার ফল কি হইয়াছে, আমি কিছু বলিব না, পাঠক মহাশয়েরা সকলেই জানেন। বিশেষ নবীনচন্দ্র একটি কথা বলিয়া, সকল সমালোচনা বন্ধ করিয়াছেন—সেটি এই—

"'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' আমি কেন লিখিয়াছি, তাহাদের চরিত্রাবলি কেন এরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই বা কেন এরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি যেরূপ লেখাইয়াছেন, আমি সেরূপ লিখিয়াছি। কোন সর্গ লিখিতে বসিলেও যদি কেহ সেই সর্গে কি লিখিব জিজ্ঞাসা করিত, আমি তাহা বলিতে পারিতাম না।" ইহার উপর কোন কথা বলা আর চলে কি? তা কখনই চলে না। এখন ত নবীনচন্দ্র আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ পরলোকগত, তিনি ইহলোকে থাকিলেও আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিতাম না। সময় তাঁহার একমাত্র সমালোচক।

নবীনচন্দ্রের সানুবাদ-গীতা পাওয়ার কিছু

দিন পরে, আমি তাহাকে যাহা লিখিয়াছিলাম, নবীনচন্দ্র তাহাই সার্টিফিকেটের মত এই খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে একটু আমারও সার্টিফিকেট হইয়াছে, সেই জন্য আমিও উদ্ধৃত করিতেছি, "দাদা অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিলেন—'তোমার গীতা তোমার বউঠাকুরাণীর কাছে তোমাপেক্ষাও আদরের বস্তু হইয়াছে। প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের বাঙ্গালা ভাগ অনেক মুখস্থ। শিবপূজার পরে এক বা দুই অধ্যায় প্রত্যহ ঠাকুর ঘরে পাঠ করেন। গীতার প্রচার দিন দিন বাড়িতেছে ; তুমি অর্দ্ধমূল্য করিয়া দিলে, তোমার গীতারই ভূয়ো প্রচার হয়।' তদনুসারে আমি এক টাকা হইতে উহার মূল্য আট আনা করিয়া দিয়াছিলাম।" এই শেষ কথা কয়টিই আমার সার্টিফিকেট।

নবীনচন্দ্র ও তাঁহার গীতানুবাদের কথা উঠিয়াছে, এই অবসরে, তাঁহার অনুবাদে একটি গুরুতর ভ্রমের কথা গীতানুবাদ-প্রকাশকদের নিকট জানাইতেছি। গীতার একাদশ অধ্যায়ের বত্রিশ শ্লোক—

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২।

'ঋতেঽপি ত্বাং' নবীনচন্দ্র অর্থ করিয়াছেন 'বিনা তুমি'' এটি ভুল।

যথা—

বিনা তুমি আর থাকিবে না কেহ
প্রতিসৈন্যস্থিত অন্য যোদ্ধাগণ।

এই অর্থ হইতেই পারে না, তাহা হইলে ভগবান মিথ্যাবাদী হন।

এইরূপ হইবে :—

তুমি নাহি থাকিলেও মরিবে সকলে,
সেনার মণ্ডলীমধ্যে যত যোদ্ধাগণ।

ভাবি সংস্করণে এইটি শোধন করিলে ভাল হয়।

রাণাঘাট অবস্থানকালে কবি নবীনচন্দ্র সাহিত্যতীর্থ সন্দর্শন করিতে যান। অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত, এবং আজুগোঁসাই ইহাদের ভিটার বা সাধন-মন্দিরের দুরবস্থা দেখেন ; অতি ভক্তিভরে সেই সকল বর্ণন করিয়াছেন, এবং হরিদাসের ভিটায় দীনদুঃখী বৈরাগীরা "একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে" তাহাও বলিয়াছেন।

পরিশেষে সাহিত্য-পরিষৎকে লক্ষ্য করিয়া গুটিকত কথা হৃদয় হইতে বলিয়াছেন, আমরা সেই কথাগুলি আমাদের নিজের কথা ভাবে গ্রহণ করিয়া সেই কথা কয়েকটিতেই এই সমালোচনার উপসংহার করিলাম—

"সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের এই তীর্থস্থানগুলির সংরক্ষণে হস্তক্ষেপ করিবেন কি? ইহা অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য তাঁহাদের আর কিছু নাই। * বৎসর বৎসর বঙ্গের এই অমর পুত্রদের পুষ্প-চন্দনে পূজা করিয়া, তাঁহাদের চরণতলে যাঁহার যথার্থ সাধ্য প্রণামী দিলে, এই অর্থের দ্বারা সেই তীর্থগুলি রক্ষিত হইতে পারিবে। বঙ্গসাহিত্যসেবীদের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সম্মিলনের ও বঙ্গসাহিত্যের

* আছে বৈ কি? তাঁহাদের গ্রন্থ রক্ষা করা। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস—কোন গ্রন্থই সমগ্র বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না।—লেখক।

সমালোচনার ক্ষেত্র আর কি হইতে পারে? বৈরাগীদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সাহিত্য-সেবীরা ভারতচন্দ্রের, মুকুন্দরামের, রামপ্রসাদের, কৃত্তিবাসের, কাশীদাসের, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, মধুসূদনের, দীনবন্ধুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান সংরক্ষণ ব্রতে ব্রতী হইলে, কেবল বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত হইবে এমন নহে, আমরাও মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব।"

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

প্রদীপ *

স্বনামধন্য বড়াল কবির নূতন করিয়া পরিচয় দিবার, সমালোচনার শলাকা দিয়া প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা উজ্জ্বলতর করিয়া দিবার আদৌ প্রয়োজন নাই; এবং আমার প্রিয় কবির কাব্য-সৌন্দর্য্য ছানিয়া অমৃত উদ্ধার করিবার শক্তিও আমার নাই। আর, যে প্রতিভা মধ্যাহ্ন-গগন-চারী ভাস্বর' ভাস্করের ন্যায় মৃণ্ময়ী গৌড়লক্ষ্মীর পুষ্পখচিত শ্যামল অঞ্চলে ও চিন্ময়ী দেশমাতৃকার মন্দিরচূড়ার হেমকলসে প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র বঙ্গভূমি বিভাসিত করিতেছে, ক্ষুদ্র appreciation'প্রস্তুতে'র আলো ধরিয়া—বড়াল কবির ভক্তিপূত ঘৃতপ্রদীপ তুলিয়া ধরিয়াও—সে প্রতিভা দেশবাসীকে দেখাইবার চেষ্টাও যে বিড়ম্বনা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কবির সহিত আমার দুই যুগের সম্বন্ধ; 'প্রদীপে'র সহিত আমার পরিচয় তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। তৃতীয় সংস্করণের 'প্রদীপে' সেই সম্বন্ধের—সেই পরিচয়ের একটু চিহ্ন থাকে, উভয় বন্ধুর এই ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করিবার জন্য এই পরিচয়ের 'পিলসুজে'র উপর বড়ালের প্রদীপটিকে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বসাইয়া দিতেছি। ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

যে বয়সে 'প্রাণারাম কিবা নির্ম্মল উজ্জ্বল বিভা' জীবনের চারি দিকে খেলা করিত, সেই বয়সে 'প্রদীপে'র কম্পিত শিখায় নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর অনেক প্রদীপ জ্বলিয়াছে, নিভিয়াছে; কত তখনকার নূতন এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বড়ালের 'প্রদীপ' আমার পক্ষে এখনও নূতন আছে। আমার বিশ্বাস, —এ প্রদীপ ভবিষ্যতেও নূতন থাকিবে। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত বড়ালের 'প্রদীপ'ও—অবশ্য ক্ষুদ্র পরিসরে—সৃষ্টি-কুশলী। জীবনের ও জগতের নানা বৈচিত্র্য 'প্রদীপে'র বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। স্নিগ্ধ, মৃদু, আবেগচঞ্চল দীপশিখার মত এক একটি ক্ষুদ্র কবিতা আলোটুকু ছড়াইয়াই, আপনার বক্তব্যটুকু বলিয়াই নিঃশেষিত—নির্ব্বাপিত হয় না, ভাবুকের মানস-পটে আলোয় ছায়ায় একটু নব ভাবের রেখা আঁকিয়া দিয়া যায়। বড়ালের গীতি-কবিতার ঝঙ্কারে অনেক বিস্মৃত ভাব ফুটিয়া উঠে, অনেক নূতন ভাব মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে। 'প্রদীপে'র খণ্ড-কবিতায় ভাবকে পূর্ণাবয়বে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস নাই।

---

* গীতিকাব্য। তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। মূল্য ৸০

তাহা যতটুকু প্রকাশ করে, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক আভাসে ফুটিয়া উঠে। লীলাময়ী তটিনীর মত স্বচ্ছন্দবাহিনী স্বচ্ছ ভাষায় ভাবের ফুলগুলি ভাসিয়া যায়। যে দেখে, সে মুগ্ধ হয়। কিন্তু যে ভাবে, ভাবিয়া দেখে এবং দেখিয়া ভাবিতে পারে, সে প্রত্যেক ফুলে নূতন সৌন্দর্য্যের আভাস অনুভব করে। ফুলের সৌন্দর্য্য, সৌরভ ও স্ব-রূপের অতিরিক্ত কিছু তাহার মনে ফুটিয়া উঠে। এই শ্রেণীর কবিতায় যে ভাব পাতা-ঢাকা ফুলের মত প্রচ্ছন্ন থাকে, ভাবুকের মনে তাহা রূপে, বর্ণে, গন্ধে সুসম্পূর্ণ হইয়া সার্থকতা লাভ করে। কবিতার যে উপাদানে এই গূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই ব্যঞ্জনা। কবিতা সুন্দর, ব্যঞ্জনা সুন্দরতম। 'প্রদীপে'র অধিকাংশ কবিতা এই ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

'প্রদীপ' কবির প্রথম রচনা। প্রথম বয়সের চিন্তায় 'আপনা'র প্রাধান্যই অধিক থাকে। 'অহম্'ই তাহাতে অধিকমাত্রায় ফুটিয়া উঠে। নবজাগরূক কবি চিত্তবৃত্তির আকস্মিক উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া আপনার সুখের গান, দুঃখের গান গাহিয়া যান। কিন্তু বিশ্বের সুখ-দুঃখের সহিত যাহার সম্বন্ধ অল্প, তাহা কখনও সার্ব্বভৌমিক—সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। সে সঙ্কীর্ণ সুখ-দুঃখের গান নিতান্তই ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে। সে দিন এক জন নিপুণ সমালোচক—স্বয়ং সুকবি—বলিয়াছেন, বড়াল জাত-কবি। সে কথা সত্য। তিনি জাত-কবি, এবং এই কারণেই প্রথম যৌবনেও সেই জাত-কবির স্বধর্ম্ম 'সহজ-বুদ্ধি'টুকুর আলোয় আপনার হৃদয়-বেলাভূমির উপলরাশি হইতে চিন্তামণিগুলি বাছিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার প্রথম রচনাবলীতেও 'ন্যাকামী' নাই বলিলেও চলে। কবি উত্তরকালে 'প্রদীপে'র অল্পবিস্তর সংস্কার করিয়াছেন। তাহাতে 'প্রদীপ' মালিন্যশূন্য—পরিচ্ছন্ন হইয়াছে।

কবি 'কবিতা'য় নিজেই বলিয়াছেন—তিনি প্রথমে কবিতার 'উজ্জ্বল বিভায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক হারাইয়া', 'প্রদীপ' লইয়া সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যক্রমে তিনি লালসার শিখা—আলেয়ার আলোয় মুগ্ধ হন নাই। এই 'প্রদীপ'ই তাহার প্রমাণ। 'প্রদীপে' রক্ত-মাংসের গন্ধ আদৌ নাই, এমন বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা অত্যন্ত অল্প। যাহাও আছে, তাহাও লালসার—কামের ধিক্কারজনক দুর্গন্ধে বীভৎস হইবার অবকাশ পায় নাই। কাঁচা বয়সের প্রবৃত্তির তাড়নায়, মানব-মনের স্বাভাবিক মোহপ্রবণতার প্রেরণায় বড়াল কবির কিশোরী কল্পনা কচিৎ লালসার রাগে রঞ্জিত হইয়াছে; কিন্তু কবি যেন স্বাভাবিক শক্তিবলে সে মোহ অতিক্রম করিয়াছেন। লালসায় যে কবিতার সূচনা, সৌন্দর্য্যের—বহিঃপ্রকৃতির বা অন্তঃপ্রকৃতির উদ্বোধনে তাহার উপসংহার হইয়াছে। মনে হয়, যেন আসারবঞ্চিত শুষ্কপ্রায় জলাশয়ের দুর্গন্ধ পঙ্কবিস্তারে প্রফুল্ল শতদল ঢল ঢল করিতেছে। এই শুচিতাই 'প্রদীপে'র আদিরসাত্মক কবিতাগুলির বিশেষত্ব। 'ভবনেত্রজন্মা বহ্নি' মদনকে 'ভস্মাবশেষ' করিয়াছিল। বড়ালের কিশোরী প্রতিভার শুচি-স্মিত-জ্যোৎস্নায় লালসার মোহিনী

মায়া দগ্ধ হইয়াছে। প্রথম বয়সের কবিতায় এমন সংযম প্রায় দেখা যায় না। উত্তর-কালে কবি স্বীয় রচনায় যে সুরুচি ও সু-নীতির পরিচয় দিয়াছেন, এই 'প্রদীপে'ই তাহার প্রথম সূচনা। বৃক্ষের জীবন ও ধর্ম্ম বীজেই নিহিত থাকে; অল্প পরিসরে তাহারক্রম-বিকাশ-পদ্ধতিরঅনুসরণঅসম্ভব।

নব্য-বঙ্গের সাহিত্যে প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাঙ্গালা কাব্যে বিদেশী ভাবের প্রভাব অল্প নহে। বাঙ্গালীর নূতন গীতিকবিতাতেও প্রতীচ্য দুঃখবাদের ছায়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার অনেক কবি এই দুঃখবাদের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছেন। বড়াল-কবিও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যেও দুঃখবাদ আছে। কিন্তু তাহা গতানুগতিক বা প্রতীচ্য দুঃখবাদের 'হুবহু' প্রতিধ্বনি নহে। তাঁহার কবিতায় 'পেসিমিজম্‌' আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রতীচীর 'নিহিলিজম্‌' নহে।

প্রতীচ্য দুঃখবাদের প্রভাব ভয়ঙ্কর, তাহা মানবকল্যাণের—বিশ্বহিতের পরিপন্থী। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে ও দর্শনে দুঃখবাদ নাই, এমন নহে। কিন্তু প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দুঃখবাদে প্রভেদ আছে। প্রতীচীর দুঃখবাদ অনেক ক্ষেত্রে 'নিহিলিজমে'র—নাশের প্রবর্ত্তক। দুঃখে তাহার উৎপত্তি, কিন্তু দুঃখেই তাহার নিবৃত্তি নহে। সে দুঃখবাদের প্রভাবে মানব অন্ধ হয়; নিরাশায় বেদনায় মানবের মন মথিত হয়; উদ্‌ভ্রান্তের উন্মত্ত তাণ্ডবে মানব-সমাজ বিপর্য্যস্ত হয়; নিরাশ, নিরুপায়, দুঃখপিষ্ট মানব অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া বর্ত্তমানকেই সকল দুঃখের হেতু কল্পনা করিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য দানব-শক্তির আবাহন করে; দুঃখবাদের জ্বালামুখী অগ্নিধারার উদ্গার করে; সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত সে বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। ইহার ফল নাস্তিকতা, ইহার ফল নাশ, মৃত্যু।

প্রাচ্য দুঃখবাদ এত উগ্র, এত ক্ষিপ্ত, এত প্রচণ্ড নহে। আমাদের দুঃখবাদ সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীপারের দুঃখবাদের মত অন্ধও নহে। জগত নিরবচ্ছিন্ন সুখের লীলাভূমি নহে। মৃণ্ময়ী আমাদের জন্য দুঃখের পসরাও সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সেদিনও বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—'সুখ দুখ দুটি ভাই'।' সুখই মানবের কাম্য, দুঃখ নহে। ভারতবাসীও দুঃখে মথিত হইয়াছে, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নূতন দুঃখের সৃষ্টি করে নাই। ভারতের দার্শনিক বলেন,—'দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিঃ পরম-পুরুষার্থঃ'। তাঁহারা দুঃখের মূল-উৎসের সন্ধান করিয়াছেন, এবং মানবকে সেই দুস্তর দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার সেতু দেখাইয়া দিয়াছেন। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই পরম-পুরুষার্থ। তাহাই মানবের কর্ত্তব্য। দুঃখ হইতে দুঃখান্তরের সৃষ্টি ও ধারাবাহিক দুঃখপরম্পরার ভোগ পুরুষার্থ নহে। ভারতের দুঃখবাদে আশা আছে, আশ্বাস আছে, দুঃখনিবৃত্তির উপায় আছে। বেদাদি তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দু দুঃখে অভিভূত হয়, পিষ্ট হয় না; দুঃখ অতিক্রম করিবার চেষ্টাই তাহার পরমপুরুষার্থ। হিন্দুর দুঃখবাদ—আধ্যাত্মিকতার সিংহদ্বার। তাহার পর

সুখবাদের নন্দন। তাহার পর আত্মজ্ঞানের তপোবন। এই তপোবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধক সুখ-দুঃখের অতীত হন, ভূমানন্দ লাভ করেন। এ দুঃখবাদে অবিশ্বাস নাই, নাস্তিকতা নাই। ইহা আত্ম-নাশের প্রবর্ত্তক নহে। দুঃখের স্বরূপ-নির্ণয় ও তাহার অত্যন্ত-নাশে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা,—ইহাই প্রাচ্য দুঃখবাদের প্রতিপাদ্য।

সর্ব্বজয়ী দুঃখ ও তাহার সর্ব্বব্যাপী প্রভাব কবির চিত্তও অধিকার করিবে, ইহা অবশ্য বিচিত্র নহে। প্রাচী ও প্রতীচীর অনেক কবি দুঃখের গান গাহিয়াছেন। কিন্তু উভয় দেশের দুঃখবাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রতীচ্য কবির দুঃখবাদের কবিতায় প্রতীচ্য প্রকৃতির বিকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন প্রাচ্য কবিদের দুঃখবাদে ভারতীয় ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু নব-ভারতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার কারণও অজ্ঞেয় নহে, সুস্পষ্ট। নব-ভারতে সমুদ্র-বেলায় নানা দেশের ভাব ভাসিয়া আসিতেছে। যে দেশের সহিত নব-ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছে, সে দেশের বহু ভাবে আমরা অভিভূত হইয়াছি। সাহিত্যেও সে প্রভাবের আধিপত্য ঘটিয়াছে। আমাদের সোনার বাঙ্গালায় সেই সম্বন্ধ প্রথম বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেই যোগের যুগে বাঙ্গালী প্রতীচ্য ভাবের প্রথম পরিচয় লাভ করে। সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন বাঙ্গালার ভাব-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াও বাঙ্গালী সাগর-পারের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকায় আগন্তুকের পদাঙ্ক বোধ করি সহজেই মুদ্রিত হইয়াছিল। দেশের পুরাতন ভাঙ্গিতে লাগিল; অনেক প্রাচীন ভাব ও আদর্শ কালস্রোতে ভাসিয়া গেল। বাঙ্গালী নবাগত বিজেতার ভাবে মুগ্ধ হইল। শ্বেতদ্বীপের দুঃখবাদের ঝঙ্কারও বাঙ্গালী কবিদের বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ইহা অনুচিকীর্ষা হইতে পারে; পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী, অনতিক্রমণীয় প্রভাবের স্বাভাবিক ফলও হইতে পারে। কারণ যাহাই হউক, বাঙ্গালীর আদর্শ গ্রহণপটু স্বচ্ছ মনে এই বিদেশী দুঃখবাদ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, এবং এখনও হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অক্ষয়কুমারও সাহিত্য-সাধনার প্রথম সোপানে এই ভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায়ও দুঃখবাদের প্রগাঢ় ছায়া আছে। কবির প্রথম রচনা 'প্রদীপে'র নীচেও সে অন্ধকার বিদ্যমান। কিন্তু আমার মনে হয়, বড়ালের দুঃখবাদে একটু বিশেষত্ব আছে। বড়ালের বিষাদ-গাথা—নিরাশার গান হিন্দুর দুঃখবাদ প্রতীচ্য দুঃখবাদের যাহা আদি, মধ্য ও অন্ত, তাহাতেই বড়ালের দুঃখের গানের সূচনা। প্রতীচ্য দুঃখবাদের প্রভাবে তাহার উদ্ভব বটে, কিন্তু হিন্দুর দুঃখবাদে তাহার পুষ্টি ও পরিণতি! দুঃখবাদে তাহাদের সূচনা, সুখবাদে তাহাদের সমাপ্তি। বড়াল কবি দুঃখের গান গাহিয়াছেন,—কিন্তু সেই দুঃখের হলাহলে সুখের সুধা ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি দুঃখে—অমঙ্গলে বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত হন নাই, মঙ্গলের আবাহন

করিয়াছেন। বড়ালের কাব্যে দুঃখবাদের বিষও অমৃতে পরিণত হইয়াছে। তিনি দুঃখদাবদগ্ধ হইয়াও আস্তিক, বিশ্বাসী; বিধাতার মঙ্গলবিধানে তাঁহার একান্ত নির্ভর। এই জন্যই তাঁহার 'পেসিমিজম'ও অনেকটা স্নিগ্ধ, শান্ত, সংযত। এই জন্যই তাঁহার দুঃখবাদও সুখবাদের পারিপোষক ও আনন্দের নির্ঝরে পরিণত হইয়াছে;—

"জগতের দুঃখ, নাথ, যত তুচ্ছ ভাব,
　　তত তুচ্ছ নয়।
কে জানে প্রলয়ে কবে, এ বিশ্ব বিলীন হবে,
　সহিতেছি নিত্য ভবে সে দুর-প্রলয়।

*　　*　　*

পারি না বহিতে আর দুঃখের পসরা,
　　সুপ্রসন্ন হও।
জীবনে আশ্বাস দিয়া মরণে বিশ্বাস দিয়া,
　যেমন গড়িয়াছিলে, পুনঃ গড়ে লও।"

ইহা হিন্দুর কামনা, হিন্দু কবির প্রাণের উচ্ছ্বাস, আস্তিকের আন্তরিক প্রার্থনা।

অক্ষয়কুমার সৌন্দর্য্যের উপাসক, ভক্ত, ভাবুক। এই ভাবুকতার ফলে তাঁহার কবিতা ধন্য হইয়াছে। তিনি সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করেন নাই। কবি বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছেন, এবং পাঠককে তাহা অনুভব করিবার, উপভোগ করিবার অবকাশ দিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি অসাধারণ। আন্তরিকতাই সাহিত্যের প্রাণ। অক্ষয়কুমারের কবিতায় যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি, এই আন্তরিকতাই সেই প্রাণ-বলের অমৃত-উৎস।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় নারী ভোগের উপাদান নহে। কবি নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানস-পুষ্পে অর্ঘ্য দিয়াছেন। এই উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া কবি ভাবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন; তাঁহার কবিতাও পবিত্র হইয়াছে। লালসার অঙ্কুর উদ্গত হইবামাত্র কবি স্বয়ং তাহা পদ-দলিত করেন। তিনি লালসার—বিলাসের ক্রীতদাস নহেন। তিনি রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু বিহ্বল হইয়া পিশিত-পিণ্ডের পূজা করেন না। রূপ অ-রূপের সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যায়। বাসনার তরঙ্গ পূর্ণ প্রেমের বিক্ষোভ-বিহীন পারাবারে মিশিয়া লুপ্ত হইয়া যায়। এই জন্য তাঁহার প্রেমের কবিতায় লালসার রক্তরাগ নাই। সে প্রেম সর্ব্বত্র অগ্নিপূত শুদ্ধ হেম। তাহা ভোগতৃষ্ণার হাহাকার নহে—আত্মবিস্মৃত ভক্তের আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। কবি এই উচ্চ আদর্শের অনুবর্ত্তী হইবার ও সন্নিহিত থাকিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় Human interest—'মানবিকতা' আছে। আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। অক্ষয়কুমার মানুষকে ভালবাসেন, মানবের সুখে দুঃখে তাঁহার প্রাণ হাসে, কাঁদে, তাঁহার কবিতা পড়িয়াই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। এই জন্যই তাঁহার কবিতার ঝঙ্কারে আমাদের প্রাণের তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তাঁহাকে এই বিপুল মানবপরিবারের এক জন,—নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই

মনে হয়;—চন্দ্রলোক-চারী, কমলবিলাসী কবি বলিয়া কল্পনা না করিয়াও তাঁহার কবিতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উপভোগ করিতে পারি। এইরূপ সমবেদনায় সমৃদ্ধ বলিয়াই তিনি বর্ত্তমান কালের বহু হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া, অণু হইতে বিরাট পর্য্যন্ত—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বাঞ্ছিতকে অনুভব করিয়াছেন। আর সেই অনুভূতির প্রসাদে তিনি 'প্রদীপে'র স্নিগ্ধ আলোয় দেখাইয়াছেন,—মানবের অপূর্ণতা প্রেমে পূর্ণ হয়, এবং সৃষ্টির রহস্য দ্বৈতেই চরিতার্থ হইয়া থাকে।

'প্রদীপে'র পাঠক এই সামান্য ইঙ্গিতে 'প্রদীপে'র কবিতাগুলির অনুশীলন করিলে, ক্ষুদ্র 'প্রস্তুতি' সার্থক হইতে পারে

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

বৈদিক সাধনার আভাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঋগ্বেদসংহিতায় বহু দেবতা গীত, স্তুত ও আরাধিত হইয়াছেন। মন্ত্রদ্রষ্টা আর্য্য ঋষিগণ ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়োলাভার্থ নিত্য আরাধনার দ্বারা ও দীর্ঘ সত্রসকলের অনুষ্ঠান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা করিয়াছেন।

"নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ
নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।"

১।২৭।১৩

"বহুগুণবিশিষ্ট দেবগণকে নমস্কার, অল্পগুণবিশিষ্ট দেবগণকে নমস্কার, যুবা দেবগণকে নমস্কার, বৃদ্ধ দেবগণকে নমস্কার।"

অসীম অপরিমেয় শ্রদ্ধার সহিত তেজঃপুঞ্জ নমস্য ঋষিগণ দিবারাত্র এই সকল দেবতার পূজা করিয়াছেন। শ্রদ্ধা তাঁহাদিগের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। অতি যত্নে অতি আদরে অতি আগ্রহে তাঁহারা শ্রদ্ধাকে ধারণ ও পোষণ করিতেন।

"শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্য্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ॥"

১০।১৫১।৫

"শ্রদ্ধাকে প্রাতঃকালে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকে মধ্যাহ্নে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকে সূর্য্যের অস্তগমনকালে আহ্বান করি। হে শ্রদ্ধে, তুমি আমাদিগকে (যজ্ঞ) কর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ কর।"

অমিত অধ্যবসায়, অপরিসীম পরিশ্রম, ও গভীর শ্রদ্ধা সহকারে প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন-সায়ংকালে নিত্য উপাসনা দ্বারা, বহুবর্ষবিস্তৃত দিবারাত্রিব্যাপী অজস্রদ্রব্যসঙ্কুল যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা কি চাহিতেন? কিসের জন্য এত কষ্ট, কিসের জন্য এত সময়ক্ষেপ, কিসের জন্য এত শ্রদ্ধা, কিসের জন্য এত ব্যাকুলতা? অহর্নিশ মনস্বী ঋষিগণ

কিসের জন্য কাঁদিতেন, কিসের অভাব পূরণের জন্য যোড়করে আকুলনেত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন?

"তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি।
স্যাদুত প্ররেচনং॥"

১।৭।৬

হে মিত্রাবরুণ, তোমাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা যেন ধন ভোগ করিতে পারি ও সঞ্চয় করিতে পারি। আমাদিগের ধন যেন ভোগ এবং সঞ্চয়েরও অধিক হয়।

"মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্যস্য
রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে॥" ১।১৮।৩

শত্রুরূপী মর্ত্ত্যের হিংসাকারী অভিসম্পাত আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে। এতদর্থে, হে ব্রহ্মণস্পতি, আমাদিগকে রক্ষা কর।

"উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু চ্ছর্দিঃ প্র দেবি
গোমতীরিষঃ॥"
সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা
সমিলাভিরা।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং
বাজৈর্বাজিনীবতি।"

১-৪৮-১৫,১৬

হে উষা, যেহেতু তুমি অদ্য (প্রভাত কালে) উদিত হইয়া অন্তরীক্ষের দ্বারদ্বয় উদ্ঘাটিত করিতেছ, অতএব আমাদিগকে হিংসক-রহিত বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর এবং, হে দেবি, গোযুক্ত অন্ন প্রদান কর। আমাদিগকে প্রভূত, বহুরূপযুক্ত, বহুগোসমন্বিত ধনদ্বারা সম্যকরূপে সিঞ্চিত কর। হে মহনীয় উষা, আমাদিগকে শত্রুহিংসাকারী বীর্য্যবতী অন্নসহ যশঃদ্বারা সম্যক্ সিঞ্চিত কর।

"ইন্দ্র শ্রেষ্ঠাণি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং
দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং
বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাং॥"

২।২১।৬

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধনসকল প্রদান কর, দক্ষতার খ্যাতি প্রদান কর, সৌভাগ্য প্রদান কর, ধনসকলের সমৃদ্ধি প্রদান কর, অঙ্গসকলের অরিষ্টি প্রদান কর, বাক্যের মিষ্টতা প্রদান কর এবং দিনসকলের শোভনত্ব প্রদান কর

"ত্রিরা দিবঃ সবিতর্বার্য্যাণি দিবেদিব
আ সুব ত্রির্নো অহ্নঃ।
ত্রিধাতু রায় আ সুবা বসূনি ভগ
ত্রাতর্ধিষণে সাতয়ে ধাঃ॥"

৩।৫৬।৬

হে সবিতা, তুমি ভূলোক হইতে বরণীয় ধনসকল প্রতিদিন তিনবার করিয়া প্রেরণ কর। হে ভজনীয় ত্রাতা, তুমি তিনপ্রকার ধন ও গোধন আমাদিগকে দিনের ত্রিভাগে প্রদান কর। হে বাক্, আমরা যেন ধনলাভ করি।

"ওমানমাপো মানুষীরমৃক্তং ধাত তোকায়
তনয়ায় শংযোঃ।
যূয়ং হি ষ্ঠা ভিষজো মাতৃতমা বিশ্বস্য
স্থাতুর্জগতো জনিত্রীঃ॥"

৬।৫০।৭

হে মনুষ্যহিতকারিণী অপ্‌সকল, তোমরা পুত্রপৌত্রাদির জন্য অহিংসিত রক্ষণশীল অন্ন প্রদান কর, উপদ্রবসকলের শান্তি

কর এবং পৃথক্করণোপযোগী পদার্থসকলকে পৃথক কর। কারণ তোমরা সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের জনয়িত্রী অতএব মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভিষক্।

এইরূপে বৈদিক ব্রহ্মবাদিগণ দেবগণের নিকটে ধনৈশ্বর্য্য, অন্ন, গোধন, খ্যাতি, নিরাময় দেহ, শত্রুর নিপাত প্রভৃতি প্রার্থনা করিতেন। ত্রিসন্ধ্যা সবিতৃসকাশে বরণীয় ধন যাচ্ঞা করিতেন। উষঃকালে উষাদেবীর নিকটে বীর্যবতী অন্ন, গৃহ, গো, রত্ন প্রার্থনা করিতেন। তবে কি তাঁহারা অর্থকামলোলুপ বিষয়ী কীটমাত্র ছিলেন? তাঁহাদের বিপুল যাগ যজ্ঞ স্বাধ্যায় তপস্যা কি কেবল ঐহিক সুখপ্রাপ্তির উপায় মাত্র ছিল? সনাতন ব্রহ্মবাণী বেদমাতা সাবিত্রীকে দোহন করিয়া তাঁহারা কি কেবল কতকগুলি গো, অশ্ব, তৈজস, স্বর্ণ, যবব্রীহি সংগ্রহ করিতেন? আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষিত আর্য্যসাধনানভিজ্ঞ কতকগুলি হিন্দুসন্তান বৈদিক ঋষিগণকে এইরূপই অপদার্থ মনে করেন। বেদসংহিতার সর্ব্বত্র এইরূপ প্রার্থনা দেখিয়া, ঋষিগণ গো, অশ্ব পালন করিতেন জানিয়া, অন্ধকার দর্শনে তাঁহারা ব্যাকুল ও আলোক দর্শনে উৎফুল্ল হইতেন বুঝিয়া, এই সকল সমালোচকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, ঋষিগণ পশুপালক সাধারণ কবিশ্রেণীর লোক অর্থাৎ রাখাল কবি ছিলেন। পাছে দস্যুগণ তাঁহাদের ধনাপহরণ করে এইজন্য তাঁহারা অহর্নিশ ব্যাকুল থাকিতেন ও ছড়া কাটিয়া কাটিয়া বিরহী কবির ন্যায় সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বরুণ আকাশ পৃথিবীর নিকট কাতরকণ্ঠে আশ্রয় যাচ্ঞা করিতেন, অন্ধকারে শিহরিয়া উঠিতেন, আলোক দেখিলে আহ্লাদে ফাটিয়া পড়িতেন। বেদাধ্যায়ী ভক্তিমান্ সত্যানুসন্ধী আর্য্যসন্তান কিন্তু বেদসংহিতায় ঋষিগণের ভিন্ন চিত্র দেখিয়া থাকেন। তিনি দেখেন ঋষিগণ "দেবগণমধ্যে প্রকাশবান্" (স্মরণং—১।১৮।১); তিনি দেখেন যজ্ঞশেষে তেজঃপুঞ্জ ঋষি বলিতেছেন, "হে মরণরহিত অগ্নি, এইবার মর্ত্ত্যগণ তোমার এবং আমাদিগের উভয়ের প্রশংসাসূচক বাক্য বলুক" (অধা ন উভয়েষামমৃত মর্ত্ত্যানাং। মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ॥ ১।২৬।৯); তিনি দেখেন ইন্দ্র যখন দস্যুর সহিত যুদ্ধে গমন করিতেছেন তখন "সর্ব্বপ্রথম অথর্বা ঋষি যজ্ঞদ্বারা তাঁহার পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন" (যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে—১।৮৩।৫), "দধ্যঙ্ ঋষির অস্থিসকলদ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র অপরাজেয় হইয়া নবনবতি সংখ্যক বৃত্র বধ করিয়াছেন" (ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব॥ ১।৮৪।১৩); তিনি দেখেন বীর্য্যবান্ ঋষি বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র, আমি যজ্ঞদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে পূত করি" (উভে পুনামি রোদসী ঋতেন—১।১৩৩।১)।

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ঋষিগণ এতই উচ্চদরের লোক ছিলেন, তবে তাঁহারা কেন অন্ন বা ধনৈশ্বর্য্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ, অতি সরল। এক কথায়, বেদ সাধনশাস্ত্র—বেদে যাহা কিছু আছে তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাধকের সাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্নও তাহাই। অন্নের প্রয়োজন ঋষি নিজেই অন্নকে দেবরূপে ভজনা করিয়া গাহিয়াছেন।

পিতুং নু স্তোষং মহো ধর্মাণং তবিষীং।
যস্য ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্বমর্দয়ৎ ॥১
স্বাদো পিতো মধো পিতো বয়ং ত্বা ববৃমহে।
অস্মাকমবিতা ভব ॥ ২
উপ নঃ পিতবা চর শিবঃ শিবাভিরূতিভিঃ।
ময়োভুরদ্বিষেণ্যঃ সখা সুশেবো অদ্বয়াঃ ॥৩
তব ত্যে পিতো রসা রজাংস্যনু বিষ্ঠিতাঃ।
দিবি বাতা ইব শ্রিতাঃ ॥৪
তব ত্যে পিতো দদতস্তব স্বাদিষ্ঠ তে পিতো।
প্র স্বাদ্মানো রসানাং তুবিগ্রীবা ইবেরংতে ॥৫
ত্বে পিতো মহানাং দেবানাং মনো হিতং।
অকারি চারু কেতুনা তবাহিমবসাবধীৎ ॥৬
যদদো পিতো অজগন্বিবস্ব পর্বতানাং।
অত্রা চিন্নো মধো পিতোঽরং ভক্ষায় গম্যাঃ ॥৭
যদপামোষধীনাং পরিশমারিশামহে।
বাতাপে পীব ইদ্ভব ॥৮
যত্তে সোম গবাশিরো যবাশিরো ভজামহে।
বাতাপে পীব ইদ্ভব ॥ ৯
করংভ ওষধে ভব পীবো বৃক্ক উদারথিঃ।
বাতপে পীব ইদ্ভব ॥১০
তং ত্বা বয়ং পিতো বচোভির্গাবো ন হব্যা সুষূদিম
দেবেভ্যস্ত্বা সধমাদমস্মভ্যং ত্বা সধমাদং ॥ ১"
১।১৮৭

আমি (অগস্ত্য) মহৎ লোকের ধারক, বলাত্মক, পালক অন্নকে স্তব করি, যাহার বলে ত্রিত বৃত্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বধ করিয়াছিলেন। ১। হে স্বাদু পালক, হে মাধুর্য্যোপেত পানসাধনান্ন, আমরা তোমাকে সেবা করি ; আমাদিগের রক্ষক হও। ২। হে পালক অন্ন, যেহেতু তুমি মঙ্গল অতএব মঙ্গলযুক্ত রক্ষণ সকলের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন কর ; এবং (আসিয়া) সুখের ভাবয়িতা, অদ্বেষ্যরস, (প্রিয়রস ইত্যর্থ), সখার ন্যায় প্রিয়কারী, সুখকর, দ্বয়রহিত (বিপরীতগুণরহিত ইত্যর্থ) হও। ৩। হে পালক অন্ন, তোমার এই সকল রস লোকসকলে অনুকূলভাবে বিবিধরূপে স্থিত, যেমন দ্যুলোকে আশ্রিত বায়ুসকল স্থিত। ৪। হে পালক অন্ন, ত্বদর্থী নরগণ তোমার (ভোক্তা হয়) ; হে পালক অন্ন, তোমার অনুগ্রহে তাহারা তোমাকে দান করিতে পারে ; তোমার রসসকলের আস্বাদানকারিগণ দৃঢ়স্কন্ধ হইয়া উত্তমরূপে বিচরণ করে ।৫। হে পালক অন্ন, পূজ্য দেবগণের মন তোমাতে নিহিত আছে ; তোমার সমীচিন প্রজ্ঞান-লক্ষণ রক্ষণ দ্বারা ইন্দ্র অহিকে বধ করিয়াছিলেন ।৬। হে পালক অন্ন, প্রকাশবান্ বা ধনবান্ পর্ব্বত সকলের, অর্থাৎ মেঘ সকলের, উদক যখন তোমার নিকটে গমন করে, এই সময়ে, হে মাধুর্য্যোপেত অন্ন, তুমি আমাদিগের সম্পূর্ণ ভক্ষণের জন্য সন্নিহিত হও ।৭। যদ্দারা অপ্ সকলের ওষধিসকলের সম্বন্ধীয় সর্ব্ব-সুখকর অন্ন আস্বাদন করি, হে বাতাপি অর্থাৎ প্রাণধারী শরীর, সেই অন্নোদকসার দ্বারা আপ্যায়িত হও। ৮। হে সোম, গো-বিকারক্ষীরাদ্যাশ্রয়ভূত ও যববিকারাশ্রয়ভূত তোমার যে অংশ আমরা ভজনা করি তদ্দারা, হে বাতাপি, আপ্যায়িত হও। ৯। হে করংভাদিরূপ শক্তুপিণ্ডাত্মক ওষধি, তুমি স্থৌল্যযুক্ত, ব্যাধি বর্জয়িতা, উর্দ্ধগামী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উদ্দীপয়িতা হও ; হে

বাতাপি তুমি আপ্যায়িত হও।১০। হে পালক অন্ন, সেই (সোমরূপী) তোমাকে আমরা গাভী যেরূপ হবি উৎপাদন করে সেইরূপ স্তুতিদ্বারা সোমরস ক্ষারিত করাইব, যে তুমি দেবগণের সহিত মাদয়িতা হও এবং আমাদিগের সহিত মাদয়িতা হও।১১।

ঋষির নিকটে অন্ন ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার উপাদানমাত্র ছিল না। তাঁহার চিত্তে তিনি অন্নের খাদকরূপে প্রতিভাত না হইয়া অন্ন তাঁহার পালকরূপে প্রতিভাত হইত। জীব অন্নহীন হইলে তাহার শরীর নিস্তেজ, মানসিক শক্তি ক্ষীণ, চিত্ত দুর্ব্বল ও বুদ্ধি তমঃদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। ক্ষুধাক্লিষ্ট হীনতেজ ব্যক্তির দ্বারা দুঃসাধ্য সাধনা ত দূরের কথা সামান্য কর্ম্ম পর্য্যন্ত সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। উপনিষদের পাঠক জানেন কিরূপে গুরু শিষ্যকে উপবাসী থাকিতে বলিয়া অন্নের মহত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন (ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬ অধ্যায়)। সাধকের সাধনার সম্বল শরীর, মন, প্রাণ, বুদ্ধি সমস্তই অন্নের দ্বারা পুষ্ট ও অন্নাভাবে ক্ষীণ হয়। এই জন্য সাধককে সর্ব্বাগ্রে গোধনাদি ও ব্রীহিযবাদি সংগ্রহ করিতে হয়। "এষোঽণুরাত্মা চেতনা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ (মুণ্ডকোপনিষৎ, ৫৫)"—যে শরীরে প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে পঞ্চরূপে সম্যক্ প্রবিষ্ট সেই শরীরেই এই সূক্ষ্ম আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা বেদিতব্য। আত্মসাক্ষাৎকারের আশ্রয়ভূত বলিয়াই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন, হে প্রাণধারী শরীর, তুমি অন্নোদকের সার দ্বারা আপ্যায়িত হও। সূক্ষ্মরূপে অন্ন সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীবের পোষণার্থ ব্যাপ্ত; সোমরূপে অন্ন ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক পালন করিতেছেন। "আদিত্যো হবৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ, তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ।" (প্রশ্নোপনিষৎ ৫)—আদিত্যই প্রাণ, রয়ি অর্থাৎ অন্নই চন্দ্রমা, মূর্ত্ত (স্থূল) এবং অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) যে সকল পদার্থ সমস্তই অন্ন, অতএব মূর্ত্তিই অন্ন। এই জন্যই ঋষি বলিয়াছেন গব্যাদি ও যবব্রীহ্যাদি সোমের অংশ, যদ্দ্বারা ভূলোকবাসী জীবের প্রাণ ও শরীর আপ্যায়িত হয়। ইহার অপরাংশ দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণ পুষ্ট হন। অন্নরূপ সোমদ্বারা রক্ষিত হইয়াই দেবগণ অন্ধকার, পাপরূপী বৃত্র, অহি ও দৈত্য সকলকে নিধন করিয়া বিশ্বের পালন ও সাধকের সহায়তা করিতে সমর্থ হন। বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রার্থনা করিলে বরুণদেব তাঁহাকে তপস্যা করিতে বলিলেন। তপস্যা করিয়া ভৃগু সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলেন যে অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন হইতেই পরিদৃশ্যমান ভূতসকল জন্মে, জন্মিয়া অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং অন্নেতেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে (অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নে জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তীতি। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।২)। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রথম সোপান অন্নকে সর্ব্বভূতের জনক, সর্ব্বভূতের পালক ও সর্ব্বভূতের অন্ত বলিয়া জানা। বৈদিক ঋষি ইহা জানিতেন বলিয়াই নিজের ও স্বজনবর্গের জন্য অন্ন প্রার্থনা করিতেন ও দেবগণকে অন্ন নিবেদন করিতেন।

অন্নের প্রয়োজন প্রাণরক্ষার্থ। সাধকের নিকট প্রাণ বড় প্রিয়, বড় আদরের বস্তু, কেননা প্রাণ না থাকিলে সাধনা হয় না, সাধনা না হইলে ভগবৎসান্নিধ্যলাভ হয় না। বৈদিক ঋষি যেমন অন্ন প্রার্থনা করিয়াছেন তেমনি প্রাণ অর্থাৎ দীর্ঘজীবনও প্রার্থনা করিয়াছে।

"অস্মে প্রযংধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো
বিশ্ববারস্য ভূরেঃ।
অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা অস্মে
বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্॥"
— ৩।৩৬।১০

হে মঘবা (ধনবান্) সোমভোগী ইন্দ্র, আমাদিগকে বিশ্ববরণীয় বহু ধন প্রদান কর। আমাদিগকে শতবর্ষ পরমায়ু প্রদান কর। হে শোভনহনু ইন্দ্র, আমাদিগকে বহু পুত্র প্রদান কর।

"ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা
অসুর যে চ মর্ত্তাঃ।
শতং নো রাস্ব শরদো বিচক্ষেঽশ্যামায়ুংষি
সুধিতানি পূর্বা॥"　　২—২৭-১০

হে অসুর বরুণ, তুমি সর্ব্ববিশ্বের, যাহারা দেব ও যাহারা মর্ত্ত, তাহাদিগের রাজা। আমাদিগকে শতবর্ষ দেখিতে দাও। আমরা যেন দেবগণের দ্বারা মঙ্গলময় দীর্ঘজীবন লাভ করি।*　　(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

বর্ণ বা রঙ্

কোন কোন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক আমাদের ছেলেদিগকে বলিয়া থাকেন যে তোমরা রঙ্কাণা। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই চোখের দোষে বিবিধ বর্ণের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারে না। যাহারা রঙ্ লইয়া ব্যবসা করে না, কিংবা যাহারা চিত্র বা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ পরিলক্ষণ করিবার সুবিধা পায় না, তাহারা এক একটি রঙ্গের যত প্রকার প্রকৃতিভেদ আছে, তাহা ঠিক লক্ষ্য করিয়া উঠিতে না পারিলেও, তাহারা রঙ্কাণা নহে। সম্বলপুরের সাধারণ চাষারা তাহাদের সাধারণ বুদ্ধিতে রঙ্গের দুইটিমাত্র শ্রেণী বা বিভাগ করিয়া থাকে; উজ্জ্বল বর্ণমাত্রেই তাহাদের কাছে গোরা বা গুরিয়া; এবং অনুজ্জ্বল বর্ণমাত্রেই কাল বা কালিয়া। এ স্থলেও এই চাষারা যে ঠিক্ রঙ্কাণা নহে, তাহা অল্প পরীক্ষাতেই বুঝিতে পারা যায়। সাদা রঙ্গের এবং লাল, কপিশ প্রভৃতি রঙ্গের গোরুকে সাধারণতঃ গুরিয়া বলিলেও যখন রঙ্বিশেষের জন্য একটি গোরুর রঙ্কে ডুমুরি গুরিয়া বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে পাকা ডুমুরের রঙ্গের মত রঙ্ অন্য রঙ্ হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইয়া থাকে। আমাদের দেশের রঙ্রেজেরা রঙ্গের অতি সাধারণ সাধারণ প্রভেদ চাৎকমর

* পুস্তকের নাম উল্লেখ না করিয়া যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠক ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া জানিবেন।

লক্ষ্য করিতে পারে ; এবং নামের অভাবে অনেক পরিচিত পদার্থের রঙ্গের নাম দিয়া রঙ্গ্ বুঝাইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কালে যখন চিত্রাদির জন্য উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তেমন মনোযোগ করিতেন না, তখন বর্ণবৈচিত্র্যজ্ঞাপক বিভিন্ন শব্দ সৃষ্ট না হইবারই কথা। তথাপি অতি প্রাচীন বৈদিকযুগে যে সকল রঙ্গের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের উল্লেখ হইতে আমাদের প্রাচীন চমৎকার প্রমাণ পাই। সাধারণতঃ শুক্ল বা শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ বলিলে সাদা বা উজ্জ্বল বর্ণ এবং কাল বা মলিন বর্ণ বুঝাইত। কিন্তু দুধের রঙ্গ্কে যেখানে শ্বেত বলা হইয়াছে, সেখানে ঐ বর্ণটি কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। আবার শুক্ল শব্দ জ্যোৎস্নায় এবং তাহার আলোক প্রভৃতিতে যখন প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন শ্বেত শব্দ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই। এই শুক্ল কথাটি হইতেই শুক্র শব্দের উৎপত্তি। অগ্নিকে কুত্রাপি শুক্ল বলা হয় নাই,—শ্বেতও বলা হয় নাই, উহার লোহিত বর্ণ সর্ব্বত্র স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) শ্বেত—ঠিক্ white বা সাদা অর্থে ব্যবহৃত ; gray রঙ্গ্ও শ্বেত সংজ্ঞায় সূচিত হইত।

(২) শুক্ল—বলিলে অগ্নির রঙ্গ্ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তারার আলোক ও জ্যোৎস্না প্রভৃতি বর্ণ সূচিত হইত। পাকা দাড়ির রঙ্গ্কে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বৈদিক ভাষায় শুক্ল বলা হইয়াছে। শুক্ল বৈদিক ভাষায় ঠিক রূপার মত বর্ণ।

(৩) শুভ্র—খাঁটি বৈদিক ভাষায় শুভ্ আছে ; শুভ্র নাই। শুভ্ হইল সৌন্দর্য্য বা উজ্জ্বলতা। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে শুভ্র এবং শুক্ল এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) শ্যাম—শব্দটির ঋগ্বেদে অনুজ্জ্বল শ্বেত অর্থই পাওয়া যায়*; শতপথ ব্রাহ্মণেও (৫ম—১ম, ৩, ৭) শ্যাম শব্দের এই অর্থই সূচিত হয়, পরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃত 'পত্রশ্যাম' প্রভৃতি কথায় শ্যাম বলিতে যে বর্ণ সূচিত হয়, সে বর্ণের কথা বৈদিক যুগে সূচিত হইত না। বরং মানুষের গায়ের যে সাদা রঙ্গ, তাহাই যেন সর্ব্বত্র শ্যাম অর্থে ব্যবহৃত মনে হয়। কোন দেশের মানুষের গায়ের বর্ণই যে ঠিক শুক্ল বা শ্বেত নহে, তাহা আমরা জানি। আমার বিচারে আমরা যে রঙ্গকে ফর্সা রঙ্গ্ বলিয়া বুঝি, অর্থাৎ যাহাকে fair রঙ্গ বলি, বা ইংরেজেরা যাহাকে skin colour বলে, শ্যামবর্ণ যেন ঠিক্ তাহাই। 'পত্রশ্যাম' প্রভৃতি কথায় অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে অন্য অর্থ সূচিত হইলেও বৈদিক প্রাচীন প্রবাদ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল, মনে হয় না। কারণ অলঙ্কারশাস্ত্রে শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা রমণীর গায়ের রঙ্গ্ তপ্ত বা কাঞ্চনের বর্ণের মত বলিয়া সর্ব্বত্রই বর্ণিত হইয়াছে। উহাই যে আমাদের দেশের খুব ভাল ফর্সা রঙ্গের তুলনা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারি।

সাদা রঙ্গের চারিটি নামের কথা বলিয়াছি, এখানে পীত, পাণ্ডু বা yellow রঙ্গের কথা বলিব। এই রঙ্গের সাধারণ নাম হইল—হরি, হরিৎ, হরিত এবং হরিণ, হরিৎ রঙ্গ্ বলিতে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে সবুজবর্ণ

বুঝাইত; এবং ঐ অর্থই এ দেশে এখন চলিয়াছে। বৈদিক ভাষায় 'হরি' শব্দের অর্থে দেবতার ঘোড়া ছাড়া এবং ঐ বর্ণ ছাড়া অন্য অর্থ পাওয়া যায় না; বেদের কোন ঠাকুরই "হরি" নহেন। অনেকে "হরি ওং" উচ্চারণ করিয়া, বৈদিক ভাষা উচ্চারণ করিতেছেন, ভ্রান্তভাবে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। আকাশে সূর্য্য-দেবের ঘোড়া যে সময়ে ঠিক্ অরুণবর্ণ বিশিষ্ট নয়, খাঁটি orange বা কমলা বর্ণযুক্তও নয়; বরং স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট, তখনই হরিকে চিনিতে পারা যাইত বলিয়া উহার রঙ্গে রঙ্গের নাম। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (২য়—৩, ৬) প্রয়োগের পূর্ব্বে হরিৎবর্ণ পীত ও পাণ্ডু অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই হরিৎ বর্ণ হইতেই বৈদিক হরিদ্রু এবং আমাদের হরিদ্রা বা হলুদ নাম হইয়াছে।

লাল রঙ্গের তিনটি নাম পাওয়া যায়, যথা—(১) রুধির, (২) লোহিত বা রোহিত এবং (৩) অরুণ। রুধিরকে scarlet এবং sanguine বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। লোহিত বা রোহিত বর্ণকেও সিঁদুরের রঙ্ (vermilion) বলিয়া চিনিতে গোল হয় না; কিন্তু অরুণকে কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ruddy বলিয়া তর্জ্জমা করিয়াছেন। আমার কিন্তু অরুণের উদয়কালের বর্ণ দেখিয়া উহাকে orange বা কমলাবর্ণ বলিয়া মনে হয়, বৃহদারণ্যক উপনিষদের "মাহারজন"কে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা a garment of saffron colour বলিয়াছেন। আমি উহার যথার্থ অর্থ ধরিতে না পারিয়া কিছু লিখিলাম না। জাফরাণের রঙ্ একটু 'চড়া' রকমের হলুদে; কিন্তু ঐ রঙ্টিকে কিয়ৎ পরিমাণে chocolate বলিয়া মনে হইতেছে। আমার বন্ধু যোগেশচন্দ্র রায় ইহার একটা ফয়সালা করিতে পারেন।

নীল বর্ণটি সেকালে একালে এক ভাবই প্রকাশ করিতেছে; তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি স্থানের নীল শব্দের উল্লেখ (৮ম—৬, ১) যখন কৌষিতকি উপনিষদে (৪—১৯) কৃষ্ণ বলিয়া পরিবর্ত্তিত দেখা যায়, তখন পরবর্ত্তী লেখকের বর্ণ বিচারের দোষ দিতে পারি; কিন্তু নীলের ভিন্নতা অস্বীকার করিতে পারি না। এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দোহাই দেওয়া চলে (ঋ ৮ম—১৯, ৩১) এই খাঁটি blue বর্ণ স্থানে স্থানে green অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়; কিন্তু black বা কৃষ্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই।

কৃষ্ণ এবং শ্যেনী শব্দ সম্পূর্ণরূপে dark এবং black অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুজ্জ্বল বুঝাইতে হইলেও এই শব্দ দুইটি ছাড়া অন্য কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

যাহাকে বিদেশের ভাষায় brown বলে, তাহা বুঝাইতে দুইটি শব্দ পাওয়া যায়; যথা—(১) বভ্রু এবং (২) পিশঙ্গ (৩) পিশঙ্গ রঙ্টি ফুলের পীতপ্রায় রজঃ বা pollernএর রঙ্; কিন্তু বভ্রু ঠিক পোড়া ইঁটের রঙ্। পিঙ্গল বলিতে যে রঙ্ বুঝায়, তাহা brown এবং yellow মিশ্রিত। Geldner এই রঙ্কে tawny বলিয়াছেন। (৪) কপিল বর্ণ কি, তাহা বুঝাইতে হইলে উহার বুৎপত্তি বলিলেই চলিবে। কপি (বানর)

ল হইতে কপিল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কপির গায়ের এই রঙ্ বভ্রু প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া যাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহারা আদপেই রঙ্ কাণা ছিল না।

কল্মাষ অর্থ ছিল spotted বা দাগ দ্বারা চিত্রিত; এবং শিল্প বা কর্ব্বুর বলিলে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বিবিধ বর্ণে চিত্রিত বা "পাথ্‌রা" বুঝাইত।

শুক্ল বর্ণ যে সপ্তবর্ণের সমষ্টি, তাহার মধ্যে (১) রুধির এবং রোহিত বা লোহিত সাধারণ রক্তবর্ণের নামে পাইতেছি; (২) অরুণ বর্ণকেও সম্ভবতঃ কমলাবর্ণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে; (৩) হরিৎ অর্থে পীত বা yellow পাইতেছি! (৪) শ্যেনী indigo অর্থে পাই; (৫) নীল blue অর্থে উল্লিখিত দেখিতেছি। (৬) সবুজ বা green পরবর্ত্তী সময়ে নীলের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া যখন হরিৎ নামে আখ্যাত হইয়াছিল, তখন হরিৎ অর্থে পীত এবং পাণ্ডু বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছিল; কিন্তু কুত্রাপি violet বর্ণের সহিত পরিচয় হয় নাই। রক্তবর্ণের দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর নাম পাই এবং brown নামক মিশ্রিত বর্ণের অনেক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নাম পাই; সাধারণ তামস অবস্থারও কৃষ্ণ নাম পাওয়া যায়; কিন্তু ভায়লেট বর্ণ কি নামে পরিচিত হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই বর্ণটির বিশিষ্টতা কি কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চন্দ্রনাথ

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আমি ভবুয়া হইতে চট্টগ্রাম বদলি হই। তাহার পরের বৎসর শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে "সীতাকুণ্ডের" মেলার ভার প্রাপ্ত হই। এইবারই আমি প্রথম "সীতাকুণ্ড" দেখিলাম। বিদেশীয়েরা ইহাকে "চন্দ্রনাথ তীর্থ" বলেন। চট্টগ্রাম জেলাকে উত্তর দক্ষিণে দ্বিখণ্ড করিয়া যে পর্ব্বতমালা নানা বিচিত্র শৃঙ্গে ও উপশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছে, উহাই 'চন্দ্রনাথ' গিরিশ্রেণী। উহার উত্তরে হিমালয়-সংসৃষ্ট 'আসাম' পর্ব্বতমালা হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় শৈলশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর একটি উচ্চ শৃঙ্গ "চন্দ্রশেখর" বলিয়া পরিচিত। ঐ শৃঙ্গোপরি একটি ক্ষুদ্র মন্দির। তাহাতে যে শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহার নাম 'চন্দ্রনাথ'। মন্দিরটি বহুদূর হইতে অশ্বত্থ পাদপ ছায়ায় উপবিষ্ট একটি কপোতের মত বোধ হয়। চন্দ্রশেখরের পদতলে 'ব্যাসকুণ্ড' ক্রোড়দেশে 'শম্ভুনাথ' বা 'স্বয়ম্ভুনাথের' মন্দির। শম্ভুনাথও শিবলিঙ্গ। উহা পর্ব্বতের সঙ্গে একাঙ্গ। এজন্য ইহার নাম 'স্বয়ম্ভু'। উহা স্বতন্ত্র স্থাপিত শিবলিঙ্গ নহে। এই লিঙ্গের চতুর্দ্দিকের প্রস্তর কাটিয়া আমার পিতামহ ৺ত্রিপুরাশরণ রায় 'অষ্টমূর্ত্তি' অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী স্বাভাবিক শিল্পী (born artist) ছিলেন। তিনি কখনও গৃহের বাহির হন নাই, কাহারও কাছে কখনও

শিক্ষা করেন নাই, অথচ এমন শিল্পবিদ্যা নাই যাহাতে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। সেই শিল্পশক্তি আমার পিতৃদেবে কাব্যপ্রিয়তা ও কবিতাশক্তি সঞ্চারিত করে। আর সেই কবিতাশক্তি হইতেই আমি কবি। যাঁহারা এই অষ্টমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার পিতামহের শিল্প-প্রতিভা বুঝিতে পারিবেন। চন্দ্রশেখরের বক্ষঃস্থলে 'বিরূপাক্ষের' মন্দির। 'বিরূপাক্ষ' স্থাপিত শিবলিঙ্গ। তাহার পর শিখরের সানুদেশে চন্দ্রনাথের মন্দির। তুমি যতই পর্ব্বতারোহণ করিবে ততই তোমার চক্ষে চারিদিকে ইন্দ্রজাল সৃষ্টিবৎ নৈসর্গিক শোভা ভাসিয়া উঠিবে, এবং চন্দ্রশেখরের সানুদেশস্থ মন্দির ও অশ্বত্থ ছায়ায় দাঁড়াইয়া তুমি যে দৃশ্য দেখিবে তাহার তুলনা ভারতবর্ষে নাই! তোমার উত্তরে দক্ষিণে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতমালা তরঙ্গ খেলিয়া যতদূর দেখা যায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার অনন্ত বৃক্ষলতাবৃত শ্যামল শোভায় নয়নে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে কত ফুল ফুটিয়াছে! কতরূপ পাখী উড়িতেছে, বসিতেছে এবং কলকণ্ঠে কাননের নির্জ্জনতার সঙ্গীতলহরী তুলিতেছে! হরিণের কাননভেদী কণ্ঠধ্বনি বনকুক্কুটের মধুর বংশীধ্বনি, শ্রবণে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। তোমার পূর্ব্বে, পশ্চিমে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অনন্ত গ্রামব্যূহ উপবনের মত স্বর্ণপ্রসূ শস্যক্ষেত্র সুরঞ্জিত কোমল গালিচার মত, এবং গো, ছাগ, মহিষাদি ক্ষুদ্র পুষ্পের মত, এবং নদ নদী রজত সর্পের মত শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে দীর্ঘায়ত শস্য-শ্যামল সমতল ক্ষেত্রের পর— মরি! মরি! কি দৃশ্য! অনন্ত পয়োধির অনন্ত লহরীমালা তটাঘাতি কর্দ্দম-ধবল সলিলরাশি ক্রমে কেমন নীল, নীলতর, নীলতম হইয়া আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখরের তিন মাইল দক্ষিণে "বাড়বকুণ্ডের" জল সহিত অগ্নি ক্রীড়া করিতেছে। তাহারও তিন মাইল দক্ষিণে নিবিড় কানন মধ্যে "কুমারীকুণ্ড"। সমস্ত কুণ্ডই পার্ব্বত্য নির্ঝর। আগুন দেখিলেই কুণ্ডসলিল জলিয়া উঠে। চন্দ্রনাথের উত্তরে 'লবণাক্ষ' কুণ্ড। এখানে লবণ, মধুর ও উত্তপ্ত সলিলবাহী বহু নির্ঝর। তাহার পার্শ্বে ক্ষুদ্র গিরি প্রপাত 'সহস্রধারা'। কি নির্ম্মল, সুশীতল সলিল সহস্রধারায় শত হস্ত উর্দ্ধ হইতে পড়িতেছে! এই লবণাক্ষের 'গুরুধ্বনি', তীর্থে, ও চন্দ্রশেখর পাদ-তলে জ্যোতির্ম্ময় তীর্থে, প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া অগ্নিশিখা কি কৌতুকক্রীড়া করিতেছে! এমন সুন্দর ও বিস্ময়কর তীর্থ ভারতে নাই। জগতে আছে কি না জানি না। প্রবাদ এরূপ যে "রামাওত" সম্প্রদায়ের 'গিরি' সন্ন্যাসীরা আগে এই তীর্থের মোহন্ত ছিলেন। 'রামসীতা' নামক এক কুণ্ডের লুপ্ত চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু 'বন' সম্প্রদায় বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া ইহাকে শৈব তীর্থ করিয়াছেন। 'বারাহীতন্ত্র' চন্দ্রশেখর তীর্থের ভূগোল। ইহার মতে এখানের মূল বিগ্রহ 'চন্দ্রশেখর' পর্ব্বত,— "চন্দ্রশেখরমারুহ্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"। চন্দ্রশেখর,—ভৈরব। শক্তি—দক্ষিণা কালী। ত্রিপুরাধিপতি এই কালীকে তাঁহার রাজধানী উদয়পুরে লইয়া যান। তিনি এখনও উদয়পুরে আছেন। প্রবাদ উক্ত ত্রিপুরাপতি শম্ভুনাথকেও লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিগ্রহ পর্ব্বতের অঙ্গমাত্র বলিয়া স্থানান্তর করিতে পারেন নাই। *

✓ নবীনচন্দ্র সেন।

---

* স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের "আমার জীবনী" ৫ম খণ্ডে ইহা ছাপা হইতেছে। এবং প্রকাশক মহাশয়ের তৎপূর্ব্বে সহৃদয়তায় বঙ্গদর্শনে বাহির হইল। বঃ সঃ

অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য-সম্মিলন

চট্টগ্রামের সাহিত্যসম্মিলন অক্ষয়চন্দ্রকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া অতি ভাল কাজই করিয়াছেন। আজ অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্য-জগতে একটা পুণ্যস্মৃতির মতন হইয়া পড়িয়াছেন বটে, আধুনিক বাঙালী পাঠকেরা বা বাংলা লেখকেরা প্রত্যক্ষভাবে অক্ষয়-চন্দ্রের প্রভাব যে অনুভব করিয়া থাকেন, এমন বলা যায় না। কিন্তু ইহা এই জগতেরই চিরন্তন বিধান। পুরাতন সর্ব্বত্রই ক্রমে চলিয়া যায়, তার স্থলে নূতন আসিয়া অভিষিক্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া, প্রকৃত পক্ষে পুরাতনের মর্য্যাদা কোনও মতেই যে কমিয়া যায়, তাহাও নহে। নূতন পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু সমাজের প্রাণের মূলে, ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রীরূপে যে সাক্ষী চৈতন্য বিরাজিত আছে, সে জানে পুরাতনের পুরাতত্ত্বকে আত্মসাৎ করিয়াই নূতনের যাবতীয় শক্তি-সাধ্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই জন্যই ইতিহাস সর্ব্বদা সকল স্থানেই পুরাতনের সমধিক পক্ষপাতী হয়। সম্যকদর্শী সুধীগণ, এই কারণেই, সর্ব্বদা প্রাচীনের প্রতি ভক্ত্যবনত হইয়া থাকেন। চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনী অক্ষয়চন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করিয়া এই সম্যক দর্শন ও এই ভক্তিপ্রবণতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাংলা-সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান কোথায় ও স্থায়িত্ব কতটুকু হইবে, বলা সহজ নহে। অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যে কোনও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন নাই। তাঁর অলোকসামান্য কবি-প্রতিভায় কিম্বা অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতার যে কোনও দাবী আছে, এমনও বলা অসম্ভব। কিন্তু যেমন চূড়াতেই মন্দির নির্ম্মিত হয় না, সেইরূপ কেবল অলোকসামান্য প্রতিভা বা অনন্যসাধারণ চিন্তাশক্তির দ্বারাই কোনও সাহিত্য বা সমাজ-জীবনও গড়িয়া উঠে না। বহু বস্তুর সাহচর্য্যে, বহু শক্তির সমবায়ে, বহু গুণের সম্মিলনে, দুনিয়ার যত কিছু ভাল জিনিষ সকলই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ ছোট বড় বহু সাহিত্যিকের সমবেত চেষ্টা ও শক্তির দ্বারাই সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি সাধিত হয়। যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ একজনই হয়েন। কিন্তু তাঁর অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ থাকেন। এই সকল সাঙ্গোপাঙ্গকে লইয়াই তিনি তাঁর যোগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা একান্তই অঙ্গাঙ্গী, কোনও মতেই আকস্মিক নহে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তিনি বাংলা ভাষাতে, বাঙালীর চিন্তাতে ও ভাবেতে, আদর্শে, ও চরিত্রে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রেরণায় আজ পর্য্যন্ত বাংলার হিন্দুসমাজ আপনার নিয়তি-পথে চলিতেছে। এরূপ শক্তি-সঞ্চার রাজা রামমোহনের পরে, এক কেশবচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ করেন নাই। এ সকল ক্ষেত্রে তুলনায় সমালোচনা করা সর্ব্বদা সঙ্গত নহে। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দু'জনার মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ প্রশ্ন তোলাই অন্যায়। বাঙালী দু'জনার

নিকটেই সমভাবে ঋণী। ইঁহারা মূলে একে অন্যকেই সাহায্য করিয়াছেন। পরস্পরে পরস্পরের আদর্শ ও প্রেরণাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমনই বা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কি কেশবচন্দ্র কি বঙ্কিমচন্দ্র দুই মহাপুরুষের কেহই আপন আপন সাঙ্গোপাঙ্গকে ছাড়িয়া এ কাজটী করিতে পারিতেন না। প্রতাপচন্দ্র, গৌর-গোবিন্দ, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, প্রভৃতিকে একদিকে ও এক সময়ে কেশবচন্দ্র যেমন আপনার অলোকসামান্য প্রতিভার প্রেরণার দ্বারা ফুটাইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ আপন আপন সাধনসম্পত্তি দিয়া কেশব-চন্দ্রের প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। এ জগতে একাকিত্বের মধ্যে মৃত্যুর অবসাদই কেবল পাওয়া যায়, জীবনের প্রেরণা মিলে না। যেমন কেশবচন্দ্র আপনার সাঙ্গোপাঙ্গগণের গুণেই এত বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ, আধুনিক বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে, আপনার সহচর ও সহযোগিগণের শক্তি ও সাধনাকে আশ্রয় ও আত্মসাৎ করিয়াই এমন অনন্য-সাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেন। যে সে লোক আপনার উপযোগী লোক বাছিয়া লইয়া, নিজের পার্শ্বে টানিয়া আনিতে পারে না। আর যে সে লোক আপনার পারিপার্শ্বিক শক্তি ও সাধনাকে এমনভাবে আত্মসাৎ করিয়াও লইতে পারে না। এরূপভাবে যাহারা দুর্লক্ষ্য সূত্রে চারিদিক হইতে উপযোগী সহচরদিগকে আপনার কাছে টানিয়া আনিতে পারেন ও টানিয়া আনিয়া তাহাদের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে তাহাদিগকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে পারেন, তাঁরাই সত্য সত্য মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজটী যেমন ভাবে ও যতটা পরিমাণে করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করিতে পারেন নাই। বোধ হয় এ আকর্ষণী শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে রাজা রামমোহনেরও ছিল। তিনিও কতকগুলি প্রতিভাশালী লোককে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে' কালের ভিতরকার খবর আমরা তেমন জানি না। রাজার প্রখর প্রতিভার আওতায় পড়িয়া তাঁর সমসাময়িক প্রতিভাশালী বাঙালীগণের প্রতিভা লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশের অবসর পায় নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র না কি কতকটা আমাদেরই সময়ের লোক; তাঁকে দেখিয়াছি, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি, তাঁর প্রতিভার স্ফুরণের সমগ্র ইতিহাসটাই একরূপ আমাদের চক্ষের উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদিগের সকলকে না হউক, অনেককে আমরা স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ ভাবেই দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, আর সেই জন্যই বাংলা দেশটা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভার নিকটে ঋণী, সেইরূপ তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, অক্ষয়চন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির নিকটে কতটা পরিমাণে যে ঋণী ছিল, ইহার সংবাদও আমরা কতকটা রাখিয়াছি। আর বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে, অক্ষয়চন্দ্রই যেন, আমার মনে হয়, সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিলেন। তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আর

সকলেই অবসর মত সাহিত্যসেবা করিতেন। একমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্যসেবাকে জীবনের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্য এক সময়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান সহায় হইয়া উঠেন। সে কালের বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের কোন কোন রচনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিয়া সন্দেহ হইত। গ্রন্থসমালোচনার ভার অনেকটা বোধ হয় অক্ষয়চন্দ্রের উপরেই অর্পিত ছিল। সম্ভবত কোন কোন সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ছাপ'ও থাকিত। সেই সব সাহিত্যসমালোচনার মধ্যে তাঁহাদের মত এমন করিয়া প্রখরে মধুরে মিলাইতে এমন করুণ কঠোর কষাঘাত করিতে আর কেহ পারিতেন কি না, সন্দেহ। "মালঞ্চনিবাসিনী মধুসূদন সরকারস্য"কে এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরেও ভুলিতে পারি নাই। আর আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "হেলেনা কাব্যের" ভূমিকায় যে অত্যুক্তি ছিল, তাহার প্রতি বঙ্গদর্শন যে তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিল,—সে বিদ্রূপের মধ্যে কতবিধ রস উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও মনে আছে। ফলতঃ বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন প্রচার বন্ধ হইয়া অবধি বাংলা সাহিত্যে সেরূপ সমালোচনার নিপুণতা আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন সে ধারা রাখিয়াছিলেন, আর মাঝে মাঝে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় সে পুরাতন স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলেন; কিন্তু সচরাচর আজ বাংলাসাহিত্যে সমালোচকের ধর্ম্মাসনে তেমন একটীও যোগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। ইংরাজের আদালতে যেমন মোকদ্দমার সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, ততই সরাসরি বিচারের পদ্ধতিটাও অযথা পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে, বাংলাসাহিত্যেও গ্রন্থকারের সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, ততই সরাসরিভাবে সাহিত্যসমালোচনার প্রবৃত্তি এবং রীতিও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এখন অনেকস্থলে সমালোচকের পদে মোসাহেব অধিষ্ঠিত। এ অবস্থায় সাহিত্যের সম্মান রক্ষা বাস্তবিকই দায় হইয়া পড়িয়াছে। আর চারিদিকের এই অবনতি-ধারা প্রত্যক্ষ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র যে কাজটা এক সময়ে এমন অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে করিতেন, তার মূল্য ও মর্য্যাদা যেন আমার চক্ষে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তার মৌলিকতা না থাকিলেও, ভাষার একটা অনন্যসাধারণ শক্তি ও সরলতা আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর এ বস্তুটী তাঁর নিজস্ব। কবিতা-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শব্দসম্পদের পরিচয় দান করিয়াছেন, গদ্য লেখাতে অক্ষয়চন্দ্র সে সম্পদেরই প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। সুললিত, সহজবোধ্য, বিবিধ রসোদ্দীপক শব্দধারার সৃষ্টি-কুশলতায় বাংলা লেখকদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের নকলনবিশ অনেক হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও হয়েন নাই, সকল সময়ে যে অক্ষয়চন্দ্রের শব্দ প্রবাহ ঠিক সার্থক হয় তাহা নাও বা বলা যাইতে পারে। সে

ধর্ম্ম রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও যে নাই, এমন কথাই কি বলা যায়? কিন্তু শব্দের যে একটা নিজস্ব মোহিনী প্রভাব আছে, সুযোজিত ধ্বনিধারার যে একটা মাদকতা-সঞ্চারিণী শক্তি আছে, এও তো সত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই, রসাত্মক বাক্য যোজনা করিতে যাইয়া, স্বল্পবিস্তর পরিমাণে এই মাদকতা-সঞ্চারিণী শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন। এ অধিকার যাঁর নাই, তিনি চিন্তাশীল হইতে পারেন, বহু জ্ঞানের অধীশ্বর হইতে পারেন, বহু তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তাও হইতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিক হইতে পারেন না। স্বর্ণকারের ব্যবসায় যেমন টাকা কড়ি লইয়া, সাহিত্যিকের ব্যবসায় সেইরূপ শব্দ লইয়া। যার যে পরিমাণে টাকা কড়ি চালাইবার ক্ষমতা থাকে, সেই যেমন স্বর্ণকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাজনপদ বাচ্য হয়; সেইরূপ যে লেখকের শব্দ-সম্পদ যত বিশাল ও সেই শব্দরাশির যথাযোগ্য যোজনায় নিপুণতা যাঁর যত বেশি, সাহিত্যজগতে তিনি তত শ্রেষ্ঠ—সাহিত্যাচার্য্য উপাধি পাইবার উপযুক্ত। এই হিসাবে অক্ষয়চন্দ্রকে ন্যায়তঃই সাহিত্যাচার্য্য বলিতে পারা যায়। বাংলা গদ্যরচনায় এমন তুবরী ফুটাইয়া তুলিতে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।

এ জগতে সকল বস্তুরই উপযোগিতা যত কমিয়া আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে উপকারিতাও ক্রমে কমিয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্রের গদ্যরচনার প্রণালীটী আজ হয় ত ঠিক তেমন ভাবে আর উপযোগী নহে। দেশের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। বস্তুজ্ঞান জন্মুক আর নাই জন্মুক, বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষাটা বেশই জাগিয়া উঠিতেছে। লোকচিত্ত এখন শব্দের মোহিনী মায়া কাটাইয়া গভীরতর ভাবে অর্থের অন্বেষণে ছুটিতেছে। ক্রমে এ ভাবটা বাংলা সাহিত্যেও স্বভাবতঃই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য বাংলা গদ্যের আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে বদলাইয়া যাইতেছে। সাহিত্যের শক্তি এককালে ধ্বনিগত ছিল, এখন ক্রমে ক্রমে চিন্তাকে, গবেষণাকে, যুক্তি-বিচারকে আশ্রয় করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে লেখার অন্তরালে চিন্তার জোর আছে, তাহাই এখন শক্তিশালী লেখা বলিয়া গণ্য হয়। কেবল ভাবের, রসের, শব্দের ফোয়ারার উপরে সাহিত্য-সম্পদ ও সাহিত্যিকের প্রভাব ও প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব নহে। এই কারণে অক্ষয়চন্দ্র যে গদ্যরচনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার মূল্যও আজিকার বাজারে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। আজিকার বাংলা-সাহিত্যে গদ্য-রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগরও বঙ্কিমচন্দ্রের পর অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, কি কালীপ্রসন্ন, ইহাঁরা সকলেই সাহিত্যে মহারথী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা-ভাষায় গদ্য রচনার ক্ষমতাটা যে কত বড়, ইহা রবীন্দ্রনাথ যেমনটা প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাঁদের কেহই তেমনটা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এমন নিরেট গাঁথুনী বাংলা-ভাষার শক্তিতে যে সম্ভব ইহা লোকে

পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সমক্ষে অক্ষয়চন্দ্রের গদ্য-সাহিত্যসৃষ্টি আজ অনেকটা মলিন হইয়া পড়িলেও এক সময়ে তিনিও যে বাংলা শব্দকে লইয়া বিচিত্ররসের খেলা খেলিয়াছিলেন, আর সে খেলাতে বাঙালী চকিত, পুলকিত, স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সে জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টিতে আজিও অক্ষয়চন্দ্র অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য ভোগ করিতেছেন। তবে তাঁর গদ্যের আদর্শটা যে আজি কালি লোকচক্ষে কতকটা হেয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বস্তুতঃ অক্ষয়চন্দ্রেরও দোষ নহে। দোষ তাঁর অনুকরণকারীদের। ইঁহাদের না ছিল অক্ষয়চন্দ্রের ধারণা, না ছিল তাঁর চিন্তার শক্তি বা রসানুভূতির প্রাখর্য্য,—ছিল কেবল কাণ। তাই তাঁহারা কেবল কাণের জোরে অক্ষয়চন্দ্রের গদ্যরচনার প্রণালীর অনুকরণ করিতে যাইয়া, তাহার ভিতরকার শক্তি ও সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। অকৃতি অথচ গুরুমর্য্যাদালোলুপ শিষ্যের হাতে পড়িয়া অনেক গুরুরই যেমন দুর্দ্দশা ঘটে, শিষ্যের আতিশয্য দেখিয়া লোকের গুরুর প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়, অক্ষয়চন্দ্রের অকৃতি অনুকরণকারীদের হাতে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভারও সেই দশা ঘটিয়াছে। এ উৎপাতের আবির্ভাব না হইলে আজি পর্য্যন্তও বাংলা-সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের পূর্ব্ব স্থান বজায় থাকিত।

অন্যান্য দেশে জ্ঞানালোচনার জন্য বড় বড় সভা-সমিতি আছে। আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল রাষ্ট্রীয় কোলাহল লইয়াই বিব্রত ছিলাম। দেশের অন্যান্য অভাব ও আভিযোগের, ভাব ও কর্ম্মচেষ্টার প্রতি দৃকপাত করিবার অবসর ছিল না। এ বিষয়ে বাংলা দেশে যে পরিমাণ অনব-ধানতা দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তাহা দেখা যায় নাই, বোম্বাইএ বহুকাল হইতে, গ্রীষ্মের প্রাক্কালে, একটা করিয়া বিদ্বজ্জন-সমাগম হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে দেশের মনীষীগণ বিবিধ বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার সহায়তা করিবার চেষ্টা করেন। এ সকল সভাতে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ সম-বেত হইয়া বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করেন, মান্দ্রাজেও কিছুকাল হইতে এই পদ্ধতিটী প্রচলিত হইয়াছে। সেখানেও প্রতিবর্ষে বসন্ত সময়ে, কোনও পর্ব্বাহকে আশ্রয় করিয়া এক একটা বিদ্বজ্জন সমাগম হয়। এবারে এই উপলক্ষে অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের এ সকল সভা কতকটা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ এসোসিয়েষণের ছাঁচে গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা এ পর্য্যন্ত এরূপ কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করি নাই। কিন্তু বিগত কতিপয় বৎসর হইতে বাংলাসাহিত্য-সম্মিলন সেরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ এই বার্ষিক সম্মিলনটীকে আমাদের নিজেদের সাহিত্য ও সাধনার একটী বিশেষ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এখানে দেশের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ সমবেত হইয়া বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা

করিবেন, চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে, বিজ্ঞানের রাজ্যে, কাব্যের রাজ্যে, মৌলিক-গবেষণায় ও রসসৃষ্টিব্যাপারে, দর্শনে, ইতিহাসে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে, সমস্ত জীবনের ও স্বজাতির সাধনার বিবিধ বিভাগে, বৎসর কাল মধ্যে আমরা কতটা উন্নতিলাভ করিয়াছি, কোন্ দিকে কতটা নূতন চেষ্টা হইয়াছে, কোন্ দিকে কতটা সংশোধন আবশ্যক, এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবেন। এইরূপে ইংরেজ মনীষীসমাজে ব্রিটিশ এসোসিয়েষণ যে স্থানটা অধিকার করিয়া আছে, বাংলার সুধীমণ্ডলীমধ্যে আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলন ঠিক সেই স্থানটী অধিকার করুক, এই দিকেই এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটীকে ফুটাইয়া ও গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা কেহ কেহ, হয় ত ইতিমধ্যেই, এইভাবে এই সাহিত্য-সম্মিলনকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

আর যাঁরা এই আদর্শ মনে লইয়া চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণের বিচার-আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁরা সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে যে কিয়ৎপরিমাণে নিরাশ হইবেন না, এমন বলিতে পারা যায় না। অক্ষয়চন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের বঙ্কিম যুগের এক জন প্রধান কর্ম্মী। তাঁর চক্ষের উপরে বাংলায় এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি সাক্ষাৎভাবে এ যুগের জন্ম-কর্ম্ম সকলই অবগত আছেন। আমরা তাঁর নিকটে বিগত চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যের ভিতরকার বিকাশের ইতিহাসটী শুনিব, আশা করিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শন প্রথমে বাংলা দেশে ও বাংলাভাষাতে যে নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তোলে, তার পরে ক্রমে সেই ভাব, সেই শক্তি, সেই চিন্তা, পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁর আপনার "নবজীবনে" ও বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রচারে" যে আকার ধারণ করে, কেমন করিয়া বঙ্গদর্শনের প্রথম বয়সের বহির্ম্মুখীনতা ক্রমে আপনাকে খুঁজিতে যাইয়া, আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়া তুলে, এবং ক্রমে পুনরায় আত্মস্থ হইয়া, নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য লালায়িত হয়, কেমন করিয়া একদিকে "নবজীবন" ও অন্য দিকে "প্রচার" এই প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাস রূপে বাংলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তার পর ক্রমে আজ সেই প্রত্যাবর্ত্তনই পূর্ণতর, গভীরতর, বিশদতর আকারে, সমধিক সত্যোপেত হইয়া, এক বিরাট ও সর্ব্বতোমুখী সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে—বাঙালীর প্রাণপণের এই চল্লিশ বৎসরের এই পবিত্র পুরাণ-গাথা অক্ষয়চন্দ্রের মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হইব, ভাবিয়াছিলাম। এ কথার সঞ্জয়-রূপে, বাংলা-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আজ এক অক্ষয়চন্দ্রই বাঁচিয়া আছেন। এই আশা করিয়া যাঁরা তাঁর চট্টগ্রামের অভিভাষণটী পড়িতে বা শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁরা যে হতাশ হইয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কিন্তু এ হতাশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সকলে সকল কাজ করিতে পারে না। বঙ্কিমযুগের সাহিত্য-সমালোচনার কাজ এ বয়সে অক্ষয়চন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব। তবে

তিনি একটা কাজ করিতে পারিতেন। কেবল এবারতের দিক দিয়া চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যের গতি কোন্ দিকে, ভাল কি মন্দ, উন্নত না অবনত হইয়াছে, এ কথাটা অক্ষয় চন্দ্র যেমন ভাবে উপদেশ দিতে পারিতেন, তেমনভাবে উপদেশ দিবার শক্তি ও অধিকার বাংলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আর কাহারও বড় বেশী আছে কি না সন্দেহ। এই এবারতে—ইংরাজীতে ইহাকে style বলে,—অক্ষয়চন্দ্র এক সময়ে অসাধারণ কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন। আজকাল তো, বলিতে গেলে, দু'চার জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখাতে ভিন্ন এবারত বস্তুটাই বাংলা সাহিত্য হইতে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাসাহিত্যের যে অপকার করিতেছেন সাহিত্য-সম্মিলন হইতে তার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল। আর অক্ষয়চন্দ্রের এ বিষয়ের ব্যবস্থা দিবার যতটা অধিকার আছে, আর কোনও জীবিত সাহিত্যিকের সে অধিকার নাই। অক্ষয়চন্দ্র এ বিষয়ে যে একেবারেই কোনও আলোচনা করেন নাই, তাহাও নহে। কিন্তু আলোচনাটা আরো গভীর, আরো পরিস্ফুট হইলে ভাল হইত।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অভিভাষণে এবারতের বা styleএর একটা দিকমাত্র দেখাইয়াছেন। ভাষা প্রাণময়ী হইবে। দেশের, অর্থাৎ দশের প্রাণবস্ত সংস্পর্শে ভাষা আপনার প্রাণশক্তি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং দেশের প্রাণের চাবিটা হাতে লইয়া, সাহিত্যিককে সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কথাটা খুবই সত্য। তোড়ায় বাঁধা ফুলের ক্ষণিক রূপ যতই থাকুক না কেন, প্রাণগত রস যে নাই, ইহা সকলেই জানে। ধার করা কথাও কতকটা এই রূপ। তার রস থাকে না, দুদণ্ড পাঠককে মুগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু চিরদিনের জন্য স্নিগ্ধ করিবার শক্তি তার থাকে না। ইংরেজ ক্লান্ত হইলে, ক্লিষ্ট হইলে, 'ডিয়ার' 'ডিয়ার' বলিয়া হাই তুলেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ডিয়ার কথাটা খুবই মিষ্টি হইতে পারে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা 'মা' বলিয়াই হাই তুলি, গা ভাঙ্গি, দুঃখক্লেশে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি। এই 'মা' কথাই আমাদের প্রাণ জুড়াইবার সঙ্কেত। এখানে প্রিয় বলিলেও চলিবে না, জননী বলিলেও চলিবে না। 'মা'ই বলিতে হইবে। এইরূপ ভাবের রাজ্যে, প্রাণের রাজ্যে, ভিতরকার আদানপ্রদানের ব্যবসায়ে, দেশের ও দশের চিরাভ্যস্ত প্রাণের কথাগুলি ব্যবহার করিতেই হইবে, না করিলে, বাংলাসাহিত্য ও বাংলাভাষা একটা জীবন্ত বস্তু আর থাকিবে না। রস-সাহিত্যে—কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে,—এই প্রাণের ভাষার সেতুকে আশ্রয় করিয়া দেশের প্রাণের সঙ্গে একটা জীবন্ত যোগ রাখিতেই হইবে। এখানে জলধরপটলসংযোগে কোনও রূপ-রসের বর্ণনাতে রসভঙ্গ হইবেই হইবে। নিতান্ত পরের ধনে পোদ্দারি করিয়া যে সকল ভুঁইফোড় লেখক সহসা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা দিগ্গজ খ্যাতি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তাঁরা ছাড়া, আর কোনও কবি, বা ঔপন্যাসিক, বা নাটককার, বোধ হয় এ উদ্ভট চেষ্টাও করেন না।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অভিভাষণে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টীর অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন। এ ছাড়াও যে সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, ইহা যেন তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন, মনে হয়। ভাষা ভাবের বাহন। ভাবে অশেষবিধ বৈচিত্র্য থাকে। কোনও একটা রসকে ধরিয়া সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। কখনও ঐশ্বর্য্য, কখনও মাধুর্য্য; কখনও বীভৎস, কখনও বাৎসল্য; কখনও রুদ্র, কখনও করুণ। এখন প্রশ্ন এই যে দেশের ও সমাজের নিম্নস্তরে এ সকল বিবিধ রসের প্রকাশ যথাযোগ্য ভাবে ভাষায় হয় কি? রসের যন্ত্র ভাষা নহে,—স্নায়ু ও পেশি। অশিক্ষিত চাষী যখন রুদ্রভাবে উন্মত্ত হইয়া পড়ে তখন তার হাতের ও বুকের পেশি সকল ফুলিয়া উঠে, তার চক্ষু জবাফুলের মত হয়, মুখভাব সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করে;—কিন্তু রুদ্ররসের উপযোগী শব্দ-প্রবাহ সে ফুটাইয়া তুলিতে পারে কি? হদ্দমুদ্দ "আর তো শালা" বলিয়া সে বাক্যস্ফোট করিয়া ছুটিয়া যায়। আচ্ছা, এই চিত্রটী সাহিত্যে ফুটাইতে গেলে, নিতান্ত সহজ, গ্রাম্যজন-বোধসুলভ ভাষায় কি তাহা সম্ভব হইবে? সমাজের নিম্নস্তরের অন্তরটা শিশুর মতন; তাদের ভাষাও স্বল্পবিস্তর শিশুরই ভাষা—আধ আধ। তাদের মুখে ঐ ভাষাতে সকল রসই ফুটিয়া উঠে, আর ফুটিয়া উঠে, কেবল শব্দ সহায়ে নয়, কিন্তু মুখের ভাবে, চলনের বা দাঁড়ানর ভঙ্গীতে। পুস্তকে তো আর এই সকল আনুসঙ্গিক রসগুলিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। করিতে গেলে, হয় এ সকলের লিপিচিত্র আঁকিয়া তুলিতে হইবে, না হইলে, যে রস ইহারা কতকটা কথায়, কতকটা হাবেভাবে প্রকাশ করে, সেই রসের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন। অক্ষয় বাবু যে এ সকল কথা জানেন না, বা বুঝেন না, এমন অসঙ্গত ও অবাস্তব কথা কল্পনাও করি না। কিন্তু তিনি এই অভিভাষণে এদিকে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই বলিয়া, এবারতের বা styleএর সমালোচনা হিসাবে তাঁর বক্তৃতাটি অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

আর এবারতের বা styleএর সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র যে দিকটা দেখাইয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও আংশিক সত্য মাত্র, ক্ষেত্র বিশেষেই তাঁর বিধান শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য, সকল ক্ষেত্রে তাঁর কথা মানিয়া চলিতে গেলে ভাষার গতির দিকটা, উন্নতির দিকটা, জটিলতার ভিতর দিয়া যে কলা-কুশলতা প্রকাশিত হয়, সেই প্রাণহারী জটিলতার দিকটা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, এমন কথা বলিতে পারি না; অক্ষয়চন্দ্রের মতন এমন সুকৃতি লেখক নিজেও এ কথা বলিবেন, বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এ ছাড়া এবারতের আর একটা দিক্ও আছে। সে দিক্টার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও অক্ষয়চন্দ্র কোনও উপদেশ করেন নাই। বাংলা ভাষার এবারতটা বাংলায় হইবে, আর কোনও দেশের হইবে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু কথাটা যে কত বড়, সকল বাঙালী সাহিত্যিকও ইহা ভাল করিয়া সর্ব্বদা ধারণা করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ। মানুষের চেহারা যেমন, ভাষার

এবারত সেইরূপ। অর্থাৎ সকল মানুষের রক্তমাংস পেশি অস্থি মজ্জা মেদ, শারীর উপাদান ও শারীর প্রকৃতি মোটের উপরে এক হইলেও, এই সকল উপাদান ও এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেক মানুষের মুখে, ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, বিশেষ এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াতে এমন একটা বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে, যাহা অপর সকল মানুষে ফুটে না। শরীর সম্বন্ধে এই বিশেষত্বটুকুই সে ব্যক্তির নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব। সেইরূপ মনেরও একটা বিশেষত্ব আছে। যে ভাবে সে চিন্তা করে, যে ছাঁচে ফেলিয়া সে জগতের অশেষ বিধ বস্তু ও বিষয়কে আপনার মনের ভিতরে গুছাইয়া রাখে, এবং যে আকারে এ সকল বিষয় সে অন্যের নিকটে প্রকাশ করে, এ সকলের ভিতর দিয়া, তার মনের নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বস্তু ফুটিয়া উঠে। এইটাই তার নিজের 'এবারত' বা style; এই এবারতটা মানুষের মনের, চিন্তার, ভাব-রাজ্যের, অন্তর্জ্জগতের চেহারা। কার চিন্তার ছাঁচটা কিরূপ, কার মনের শক্তি ও গতি কোন্ দিকে, তার এবারতের ভিতর দিয়া তাহা ধরা পড়ে। বাঙালীর একটা মন আছে—অর্থাৎ সমষ্টিগত এই যে বঙ্গ-সমাজ, বহু শতাব্দ সহস্রাব্দ ধরিয়া এই ভারতবর্ষে যে সমাজ অপরাপর ভারতীয় সমাজ হইতে একটু পৃথক্ হইয়া, একটা কিছু অল্পবিস্তর বিশেষত্ব লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ও বাড়িয়া উঠিয়াছে, তার মনের চেহারায় সেটা গাঁথিয়া আছে। বাংলা সাহিত্যে, খাঁটি বাংলা এবারতে বা styleএ বাঙালীর এই মানসিক চেহারাটা ধরা পড়ে। এই চেহারাটা যেখানে নাই, বাংলা এবারত, অর্থাৎ বাঙালীর খাঁটি সাহিত্যের ছাঁচটাও সেখানে নাই। এ ছাঁচটা আধুনিক বাংলাসাহিত্যে খুবই যেন উলট্ পালট্ হইয়া যাইতেছে। বিদ্যা যখন হজম হয় না, তখন সাহিত্যে অজীর্ণ-লক্ষণ সর্ব্বত্রই দেখা গিয়া থাকে। বিদেশের বিদ্যাশিক্ষায় কোনও অপরাধ হয় না। না শিখিলে বরং স্বদেশের প্রাণবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতির সাহিত্যও জীর্ণ ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ বিদ্যা কোনও দেশ বা জাতির নিজস্ব বস্তুও নহে। এই একাদশ ইন্দ্রিয় আর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড,—এই লইয়াই তো সকল প্রকারের লৌকিক বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলিও সকল মানুষেরই আছে, আর এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও সকলেরই ভোগদখলে রহিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাটাও সকলেরই সম্পত্তি। কিন্তু বিদেশের বিদ্যা শিখিলেই তো হয় না, হজম করাও চাই। এই হজমটা যারা করিতে পারে না, তাদের হাতেই বিদেশের বিদ্যাপ্রভাবে স্বদেশের অন্তঃপ্রকৃতি ও স্বদেশী সাহিত্যের এবারত, উভয়ই নষ্ট পাইবার উপক্রম হয়। এ বিপদটা আমাদের বড় বেশী। আমাদের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকেরাও সকল সময়ে, সকল বিষয়ে এ বিপদের হাত এড়াইতে পারেন নাই। বিদেশী ধর্ম্মের প্রভাবে, আমাদের মধ্যে, আধুনিক স্বাদেশিক ধর্ম্মসাহিত্যে, এমন কতকগুলি শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার, লোকপ্রকৃতির

ও সমাজপ্রকৃতির কোনই সঙ্গতি নাই। শব্দ ধার করা যে টাকা ধার করার মতন একটা অতিশয় গুরুতর অন্যায়, এমন কথা বলি না। কিন্তু যখন নিজেদের সাহিত্য ও শাস্ত্রভাণ্ডারে সে অর্থপ্রকাশক শব্দ পাওয়া যায় না, তখনই তো শব্দ ধার করা প্রয়োজন। এ ভাবে ধার করাতে কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে বিষয়ে নিজেদের কোনও দৈন্য নাই, সে বিষয়ে পরের পরিভাষা ধার করিয়া আনিলে, নিজের শব্দসম্পত্তির বৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা, ভাবরাজ্যে এবং জ্ঞানরাজ্যে পর্য্যন্ত একটা অলীকতা আসিয়া পড়ে। শব্দ, বস্তুর বা রসের সঙ্কেত বই তো আর কিছুই নয়! যদি বস্তুই আমাদের না থাকে, যে শব্দ যে রসের সঙ্কেত সে রসের আস্বাদনই যদি আমাদের ভাগ্যে কখনও না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে শব্দ আনিলেই তো চলিবে না। সে শব্দকে সত্যোপেত ও শক্তিশালী করিতে হইলে, সে বস্তুটীকেও লাভ করিতে হইবে, সে রসেরও সাধনা করা আবশ্যক হইবে। আর এইখানেই যত বিপদ উত্ত হইবার আশঙ্কা জাগিয়া উঠে। এ বিপদে পড়িয়া কোনও দিকে কেবল বাংলা এবারত ও বাংলা স্যহিত্য নয়, কিন্তু বাঙালীর চরিত্র পর্য্যন্ত ভিত্তিহীন ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে

দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথাটা বিশদ করিবার চেষ্টা করিতে পারি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বাংলা ভাষাকে নানা দিকে খুবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, যদিও বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতন, কেশবচন্দ্রের সাহিত্যসেবার বড় একটা বেশী উল্লেখ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্য দিকে কেশবচন্দ্র বাংলা ভাষায় এমন দু চারিটা নূতন শব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যাহা খাঁটি বাংলা নয়, যার ভিতরকার বস্তুর বা রসের সঙ্গে আমাদের ভিতরকার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বা ইতিহাসের কোনই সম্পর্কও নাই। "বিবেক-বাণী" এই জাতীয় একটা কথা। আমাদের চিন্তাতে ও সাধনায় বিবেক শব্দের প্রতিষ্ঠা বহুকাল হইতেই হইয়াছে। উপনিষদ যুগে ইহার প্রথম পরিচয় পাই। কিন্তু সে বস্তু আর কেশবচন্দ্র যাকে বিবেক বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ বস্তু, এক নহে। আমাদের বিবেক সাধন-রাজ্যের একটা অতি নিগূঢ় ও প্রত্যক্ষ বস্তু। অনিত্য সংসারকে নিত্য পরমার্থ হইতে পৃথক বলিয়া জানার নাম আমাদের বিবেক। এ বিবেক অতি দুর্ল্লভ বস্তু। লাখের মধ্যে একেরও এ বস্তু লাভ হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু কেশব বাবু "বিবেক" বলিয়া যে বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলেন, সিদ্ধ অসিদ্ধ সকলেই তার দাবী করে। এ বস্তু ইংরেজের কন্‌সিয়ান্স্ (Conscience); আমাদের বিবেক নয়। ইংরেজ যাকে conscience বলে, আমরা তাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া আসিয়াছি। বিবেক ইহার অনেক উপরকার রাজ্যের কথা। আর কেশব বাবু ইংরেজের conscienceকে আমাদের প্রাচীন সাধনার বিবেকের আসনে প্রতিষ্ঠিত

করিয়া, আমাদের আধুনিক ধর্ম্ম-চিন্তার ও ধর্ম্মসাধনার যে একেবারেই কোনও অনিষ্ট করেন নাই, এমনই বা বলা যায় কি? রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বহুবিধ অভিনব শব্দসম্পদে পরিপুষ্ট করিয়াছেন সত্য, এ ঋণ বাঙালী চিরদিন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করিবে। কেশবচন্দ্রের মতন, তিনিও দু একস্থলে বিদেশীয় ভাবের অনুকরণে এরূপ দু একটী শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর বিশ্বমানব কথাটার উল্লেখ করা যায়। ইংরেজের 'হিউম্যানিটি' রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বমানব।" এই হিউম্যানিটি-বস্তু আধুনিক য়ুরোপীয়েরা কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়াছে, সাধনাবলে লাভ করে নাই। ইহা কৃষ্ণত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতির মতন একটা গুণবাচক শব্দ মাত্র, নিজস্ব বস্তুত্ব বা স্বরূপ ইহার কিছুই নাই। অথচ য়ুরোপীয়েরা হিউম্যানিটি বলিয়া যে তত্ত্বকে হাতড়াইতেছে, তাহা আমাদের সাধনাতে বহুকাল হইতে, নারায়ণ নামে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই নারায়ণ গুণবাচক শব্দ নহে, বস্তুবাচক শব্দ। নারায়ণ abstraction নহেন, কিন্তু person. আমাদের এমন নারায়ণ থাকিতে য়ুরোপীয় হিউম্যানিটিকে আমাদের ভাষাতে ও চিন্তাতে "বিশ্ব-মানব"-রূপে প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রয়োজন আছে কি? এইরূপ অকারণে পরের সাধা সুর ভাঁজিতে গিয়া নিজের অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠতর স্বরগ্রামকে ভুলিবার উপায় করিয়া আমরা অলক্ষ্যে ভাষার ও সাহিত্যের কোন অমঙ্গল সাধন করিতেছি কি না ইহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র এদিক্ দিয়া এবারতের (style) আলোচনা করেন নাই। এই সকল দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তিনি আপনিই আপনার সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। ভাষা দেশের লোকের প্রাণসংস্পর্শে, প্রাণময়ী হইবে, কথাটা অতি সত্য। কিন্তু প্রাণবস্তু তো আর জড় নহে। নিয়তই যে এই প্রাণ স্ফুরিত হইতেছে; নিত্য নূতন জ্ঞানে, নিত্য নূতন শক্তিও নিত্য নূতন রস আকর্ষণ করিয়া, দেশের প্রাণবস্তু উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ প্রাণ যে সেই মহাপ্রাণেরই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণের মধ্যেই সেই অনাদি অনন্ত বিশ্ব-প্রাণ, অনাদি অনন্তরূপেই লুকাইয়া আছেন। এই জন্যই এই প্রাণ ক্রমে বাড়িয়া উঠে। এ বিকাশের বিরামও নাই, শেষও নাই। সুতরাং যতটুকু ফুটিয়াছে, তাহাকে ধরিয়াই পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। যা এখনও ফোটে নাই—কিন্তু ফুটিবার উপক্রম করিতেছে, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং কেবল স্থিতির দিক নয়, গতির দিক দেখিয়াও সাহিত্যকে চলিতে হইবে। দশের পুরাভ্যস্ত কথার সাহায্যে, দেশের প্রাণের অন্তঃপুরে সাহিত্যিককে যেমন প্রবেশলাভ করিতে হইবে, সেইরূপ আবার ভিতরের ও বাহিরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের চিত্তে যে সকল নূতন নূতন ভাব ও আদর্শ স্ফুটনোন্মুখ হইতেছে, অভিনব শব্দ সৃষ্টি করিয়া, সে গুলিকেও ফুটাইয়া তুলিতে

হইবে, নতুবা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত রাখা যে অসাধ্য হইয়া পড়িবে। অক্ষয়চন্দ্র এ সকলই জানেন ও বুঝেন; তবে তাঁর অভিভাষণে এদিক্‌টা তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। লোকে কি জানি তাঁহাকে ভুল বুঝে, এই জন্যই এ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হইল। অক্ষয়চন্দ্র যদি নিজে আর একদিন সাহিত্যের এই গতির দিক্‌টা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, আমরা সকলেই কৃতার্থ হইব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অভিভাষণ*

উত্তরে ফেণী নদী, পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গিরিশ্রেণী, দক্ষিণে আরাকান সীমার নাব-নদী এবং বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বঙ্গসমুদ্রের বারিবিস্তার—এই স্বভাব-সীমার মধ্যস্থিত ২৪৯৮ বর্গ মাইল জনপদখণ্ডই আমাদের চট্টলমাতা, কিঞ্চিদধিক ১৫ লক্ষ লোক ইহার জনসংখ্যা।

এদেশে ইংরাজ-অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই ইহা হিন্দু, মুসলমান, পর্ত্তুগীজ ও বৌদ্ধ এই চতুষ্টয় ধর্ম্মশক্তি এবং সমাজসভ্যতার মিলনভূমি হইয়া ছিল। হিন্দুরা প্রধানতঃ ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে, রাঢ়বঙ্গে মুসলমানি-বিপ্লবের সময় এই দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়া এদেশের আশ্রয় গ্রহণ করেন—তাঁহারা আপনাদের ক্ষত্রিয় ও রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দেন।

হিন্দু ও মুসলমানের আগমনের পূর্ব্বে এ প্রদেশ আরাকানের নৃপতির অধিকারে ছিল। পরাজিত মগেরা এখন পার্ব্বত্য আবাস গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু, মগধেশ্বরী এখনও এ স্থানের গ্রাম-দেবতা, এখনও সর্ব্বত্র তাঁহার পীঠস্থানগুলি অক্ষুণ্ণ আছে। হিন্দুর পুরাণ-বিখ্যাত ভৈরব ও চট্টেশ্বরী পীঠ, মুসলমানের বারওয়ালির স্থান, পীরবদরের সমাধি ও ফকির বায়জিদ বোস্তামীর স্মৃতিরক্ষক দরগাহা, আন্দরকেলাস্থ ঔরঙ্গজেব-সহোদর সাহ সুজার মসজিদ, রঙ্গমহাল পর্ব্বতনিম্নে নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধ আমলের ভগ্ন বিহার মন্দির ও সার্দ্ধসহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার বিপুলকায় বুদ্ধমূর্ত্তি, এবং কাকুস্ বাজার, পাহাড়তলী প্রভৃতি স্থানসমূহে বৌদ্ধ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ক্যাং বা তপোবন, প্রভৃতি ইহার অতীত গৌরব এবং কীর্ত্তি-স্মৃতি বহন করিতেছে। এখনও এই প্রদেশ এবং লঙ্কাদ্বীপ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পালিশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

এদেশ বাণিজ্যের জন্য পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীর পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ Porto Piqueous বা ক্ষুদ্র বন্দর সপ্তগ্রামের তুলনায় ইহার নাম দিয়াছিলেন Porto Grando বা বৃহৎ বন্দর। এইস্থানেই বঙ্গে

* চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতার সারাংশ।

ইংরাজ প্রবেশের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজকর্তৃক চুঁচুড়া হইতে বিতাড়িত হইয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, হুগলি বালেশ্বর প্রভৃতির তুলনায় এই চট্টগ্রামকেই শ্রেষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যকর বন্দর বিবেচনা করিয়া কমাণ্ডার হীথ ও চার্ণকের অধীনে এতদ্দেশে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাৎকালিক মুসলমান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক তাহা বিধ্বস্ত না হইলে হয় ত এই চট্টগ্রামই ভারতের রাজধানী হইতে পারিত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক ইংরাজের করে অর্পিত হয়।

১৪০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে চীনসম্রাট কর্ত্তৃক প্রেরিত সচীব চেঙ্গ হো, ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে আরবীয় ভ্রমণকারী ঈবন বতুতা এবং চৈন পরিব্রাজক মাহুন্দের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা এদেশের তাৎকালিক বাণিজ্য-প্রসারের পরিচয় পাই। ভারত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ, চীন, ব্রহ্মদেশ, জাবা, সুমাত্রা এমন কি সুদূর মিশরদেশে পর্য্যন্ত ইহার বাণিজ্য-পোত যাতায়াত করিত। রুমের সম্রাট আলেকজান্দ্রিয়ার (Alexandria) ডক কারখানায় প্রস্তুত জাহাজ অপেক্ষা চট্টগ্রামের নির্ম্মিত জাহাজের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, এবং এইখান হইতে প্রয়োজনানুযায়ী জাহাজ তৈয়ার করাইতেন। ১৮৭৫ (?) খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বেও এক হিন্দু সওদাগরের বরুনও নামক জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া স্কটলণ্ডের টুইড নদী পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিল। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশোপযোগী ৪।৫ শত বৎসরের মত স্থায়ী কাগজ এদেশে এককালে অনেক প্রস্তুত হইত; সমুদ্রোপকূলে যে লবণের কারখানা ছিল, সমস্ত বঙ্গের অভাব তাহাতে মোচন হইতে পারিত। আজ সে সব কোথায়? —আজ আমাদের মস্তিকের প্রসার, বাহুর শক্তি এবং আত্মিক সাহসের সেই পালতোলা মাহাত্ম্য-তরণী অদৃশ্য হইয়াছে।

আমরা এখন শক্তি হারাইয়াছি, শতদলবাসিনী লক্ষ্মী ও সরস্বতীমাতার জন্য হৃদয়মধ্যে মণিমুক্তার শতদল নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই—উভয়েই আজ আমাদের প্রতি বিরূপা। যখন এ দেশ সমুদ্র-কন্যা লক্ষ্মীমাতার পূজা জানিত, তখন ষোড়শোপচারেই সরস্বতীমাতারও পূজা সে করিয়াছে। এই দেশের ইতিহাস ও সাহিত্য হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত ৪৪৩ জন লেখকের বিবরণ ও রচনাদির পরিচয় পাইয়াছি। প্রাচীন বঙ্গের অনেক বিলুপ্ত কবির রচনাও এখানে উদ্ধার হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এখনও সম্পূর্ণ নির্দ্ধারিত হয় নাই, হওয়া সম্ভবপরও নহে এদেশের খাস কবিগণের মধ্যে—৩২৬ বৎসর (নবাবিষ্কৃত হস্তলিখিত পুঁথির প্রমাণে ৬০০ বৎসর) পূর্ব্ববর্ত্তী সুচক্রদণ্ডী নিবাসী দ্বিজ রতিদেব সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত "মৃগলুব্ধ" বঙ্গসাহিত্যে শৈবপ্রভাবের সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন। ঔপনিবেশিক হিন্দু-গণের মধ্যে অধিকাংশই শৈব ছিলেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব পরবর্ত্তী কালের। চন্দ্রশেখরের "ভবানী" পীঠ ও বৈষ্ণবের "সীতাকুণ্ড" এখনও গুপ্ত রহিয়াছে। শ্রুতিবিহিত অনুষ্ঠান বিষয়ে শৈব সেন-

রাজের সভাপণ্ডিত হলায়ুধের মতই বহুকাল প্রচলিত ছিল। নব্যমত নবদ্বীপ শিষ্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক মাত্র ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তিত।

১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত দেবগ্রামনিবাসী মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ২৫০ বৎসর পূর্ব্বের কায়স্থ কবি ভবানীশঙ্করের চণ্ডীকাব্য, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, দ্বাবিংশ কবির সৌভ্রাত্র সমবায় বিরচিত বৃহৎ "মনসার পুঁথি", বঙ্গেশ্বর হোসেন সাহার উজীর সহৃদয় পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নন্দী এবং তৎপুত্র শ্রীকর নন্দী বিরচিত পরাগলী মহাভারত, বৈষ্ণব কবি করমালির রচনা, আলিরাজা ওরফে কালু-ফকিরের জ্ঞানসাগর যোগ কালন্দর ও পদাবলী, কাজী বদিয়ুদ্দিনের চিপ্ত ইমান, ভারতচন্দ্রের তুল্যাসনাধিকারী প্রসিদ্ধ কবি আলাওল প্রণীত সুবৃহৎ উপাখ্যান—কাব্য সপ্তক,—সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্য-গঙ্গার সহিত আপনাদের ধারাস্রোত মিশাইয়া রাখিয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থের ভাষা বিশেষভাবে রাঢ়দেশের ভাষা। রাঢ়-বঙ্গের প্রাচীন ভাষা কি ছিল এই সকল গ্রন্থ হইতেই তাহার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। পর পর বৌদ্ধ, মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের সম্পর্ক-সংঘর্ষের ফলে বঙ্গভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ফলে, ইহা এখন সংস্কৃতবহুল ও অনেক স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে; কিন্তু আমরা এ দেশের লোক, কথাবার্ত্তায় নানা দিকে দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার রাঢ়ীয় ভাষাই প্রচলিত রাখিয়াছি। সমগ্র বঙ্গের কথিত ভাষার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে এখন অনুসন্ধান চলিতেছে—তাই এ কথার উল্লেখ করিলাম।

এখন সাহিত্য জিনিসটা কি তাহাই দেখা যাউক। আমাদের 'সাহিত্য' শব্দ কাব্যের প্রতি-নাম মাত্র, কাব্যও (আমাদের শাস্ত্রে) রসাত্মক বাক্য। পরন্তু "সাহিত্য" শব্দ নিজেই চিরকাল সম্মিলনভাব-মূলক। সুতরাং এই যে সাহিত্যের ভাব ইহা শুধু সম্মিলনের ভাব নহে, রসাত্মকের ভাবও বটে। ইহার মূলে একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। ভারতবর্ষ প্রথম হইতেই জানে যে সাহিত্যের প্রধান নিমিত্তকারণ এই সম্মিলন। ধর্ম্ম-তন্ত্রীর বিভিন্ন সমাজের ভেদের আদর্শ এবং সকল সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে কেবল এই সাহিত্যই তাহার একমাত্র মিলনভূমি হইয়াছে—এই সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সে যাহা কিছু উদারতা, সার্ব্ব-জনীনতা এবং একত্বের রস অনুভব করিতে পারিয়াছে। এখন যদি, ইউরোপের আদর্শে আমাদের "জাতীয়তা" লাভ করিতে হয়, তাহা হইলেও এই সাহিত্যের পথেই তাহা একমাত্র সম্ভবপর হইবে। ভাষাই সম্মিলনের প্রাণ, সুতরাং জাতীয় সম্মিলন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষারও উন্নতি চেষ্টা করিতে হইবে।

বঙ্গদেশে সম্মিলিত ভাবে জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন চেষ্টা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ব্যক্তিগত প্রতিভাশক্তি—নিষ্ঠা, সাধনা প্রভৃতির উপর সাহিত্যের প্রধান উন্নতি নির্ভর করে, এ কথা সত্য; কিন্তু

যদি তাহা জনসাধারণের সম্মিলিত সহানুভূতি বা সাহায্য না পায়, তাহা হইলে তাহার ভিত্তি লাভই হয় না। তাহা কয়দিন টিকিতে পারে? সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিভার অর্থই —একের মধ্যে বহুর সম্মিলন, আপনার অন্তস্তত্বে 'বিশ্বমানবত্বে'র (Humanity) সমাধান। সাহিত্যক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত যে কয়জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের মাহাত্ম্য ব্যক্তিগত ভাবেই অথবা তাঁহাদের অল্পসংখ্যক অনুসরণ-কারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—সমগ্র সাহিত্য-সেবীর মধ্যে তাহা ছড়াইয়া পড়ে নাই। যাহাকে বিশ্বসমতা বলে সে ভাব তাহা পায় নাই। আমাদের শিক্ষাব্যাপার জাতীয় ভাষায় সাধিত হয় না বলিয়াই—আমাদের বাক্-দেবতা ও জ্ঞান-দেবতা এক নহে বলিয়াই হয় ত আমাদের সাহিত্যের এই বিক্লবতা। আমরা ইংরাজীতে দিগ্বিজয়ী অথচ মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া কেবল লজ্জাগ্রস্ত হই। কেন এমন হয়? প্রবেশিকা এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীর উপযোগী বঙ্গ-সাহিত্যের আমাদের এত অভাব কেন? সমবেত চেষ্টায় ভাষার সম্যক অনুশীলন করিয়া তাহাকে যদি আমরা 'উন্নত প্রতিভার সহজ-সিদ্ধ কর্ম্মভূমি' রূপে দাঁড় করাইতে পারি—তবেই ইহার প্রতীকার হয়।

সাহিত্য-পরিষদ্ গত ত্রয়োদশ বৎসর হইতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস সকলের দিকেই আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছে। অবশ্য পরিষদের এই ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী কার্য্যগুলি অকিঞ্চিৎকর নহে। কিন্তু এখন তাহাকে অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যে একটা বিশেষ অভাব আছে,—তাহা ভাবের পুষ্টি ও গভীরতা। মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রতিবৎসরই বাড়িতেছে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের যথার্থ উন্নতি কতটুকু হইতেছে তাহাই বিচার্য্য। আমাদের লোকরুচি এখনও মননকার্য্যে সহিষ্ণুতা লাভ করে নাই। সকল লেখকই প্রায় দেশ-প্রচলিত অভিরুচির পরিপোষণ করিয়া চলিতেছেন, কাজেই সাহিত্য বিশেষভাবে "লৌকিক ও লোকায়ত" হইয়া দাঁড়াইতেছে। সাধারণের রুচি-পরিচর্য্যা হইতে আপনার লেখনীকে স্বাধীন ভাবে চালাইয়া উন্নত ভাব, চিন্তা এবং দেশবিদেশের উন্নত সাহিত্য-আদর্শকে প্রয়োগ করিয়া, বিশ্বসাহিত্যের সহিত আমাদের সাহিত্যকে মিলাইবার শক্তি, চেষ্টা বা সাহস কয়জনের আছে? তাহার উপর আমাদের কবি ও প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র নিজ-হৃদয়ের আনন্দ-প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন—চলিবেনও। ফলে, একালের সভ্য সাহিত্য-সমূহের ভাব, ভাষা ও চিন্তা-পদ্ধতি, উহাদের প্রসার এবং গভীরতা আমাদের চিন্তা-প্রণালীর মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে না। এই বাধা আমাদের দূরীকৃত করিতেই হইবে। ইয়ুরোপের সদ্গ্রন্থ নিচয়ের প্রকৃত শক্তি দ্বারা বঙ্গভাষাকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। অবশ্য, অন্য ভাষার ভাব এবং জ্ঞান-সম্পত্তিকে অক্ষুন্ন ভাবে ভাষান্তরিত করিতে হইলে একশ্রেণীর প্রতিভার আবশ্যক। সেই প্রতিভার উদ্বোধন এবং পুষ্টি করাই

আমাদের সম্মিলিত শক্তির কার্য্য হইবে। প্রাচীন বঙ্গ বা সংস্কৃত-সাহিত্য এখন থাক্,—পরবর্ত্তী লেখকগণের সাহিত্যে আমরা বিশেষ ভাবেই ত তাহা পাইয়াছি; প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার ভাবগতি আমাদের অস্তস্তলে জড়াইয়া আছে। এখন বৈদেশিক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। তাহার সাধনা চাই। সাহিত্য চিরকালই সাধনার সম্পত্তি; কেবল সখনবিশী আলোচনা কিম্বা সৌখিন ও খামখেয়ালি চেষ্টায় তাহার প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব।

নব বর্ষে প্রার্থনা।

গেল বর্ষ;—নব বর্ষে নূতন প্রভাত!
সুপ্তপ্রাণ, মোহনিদ্রা টুটিল কি তার?
কত আশা, কত হর্ষ, বেদনা-আঘাত
লভিয়াছি, করিব না তাহার বিচার।
মুছে দাও আজি সব, হে মোর দেবতা!
পেয়ে যদি থাকি সুখ, যদি কোন মান,
তোমারি প্রসাদ তাহা, নহে গর্ব্বকথা;
পেয়ে যদি থাকি দুঃখ, সে তোমারি দান!

২

জনে-জনে,—ক্ষুদ্র আমি,—মোর নিবেদন,—
করিয়াছি যত ক্রটি, অপরাধ যত;
শত্রু হও, মিত্র হও—যে হও আপন,
চাহি ক্ষমা নতশিরে আজিকার মত!
লহ প্রীতি, লহ প্রেম,—ভুল' বিসংবাদ;
এস কাছে,—অভিমানে যে বা আছ দূর;
এস বক্ষে—যে বঞ্চিত মিলন-আস্বাদ,
নব বরষের দিন কর সুমধুর!

৩

লহ—লহ নব বর্ষে করি' আবাহন;
নব অতিথির নাহি চাহি পরিচয়!
দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, করিয়া বরণ—
লহ সমাদরে,—সে যে সর্ব্ব দেবময়!
গৃহী যদি,—হও তুমি পূর্ণ ধনে-জনে,—
অতিথির আশীর্ব্বাদ হ'বে না বিফল;
হে সন্ন্যাসি, ইষ্টলাভ ধ্যান তব মনে,
লভ' সেই ইষ্ট, যাহে বিশ্বের মঙ্গল!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্যবধান

তুমি ছিলে কত দূরে কোন্ কল্পনার পুরে
অনন্ত ভুবনে,
ভাসিয়া কালের স্রোতে এ জগতে কোথা হ'তে
এসেছি দু'জনে।
দু'জনার শিরোপরি নীলিমা বিস্তার করি'
আছে সীমাহীন এক অখণ্ড আকাশ,
এক ধরণীর বুকে আছি দোঁহে সুখে দুখে
এক সমীরণে মিশে দোঁহার নিশ্বাস।
এক নিশা অন্ধকারে ঢেকে দেয় দু'জনারে
একটি চাঁদের পানে দোঁহে চেয়ে থাকি,
এক উষা—এক রবি— এক নিখিলের ছবি
মুগ্ধ করে আঁখি।

২

হেথা এত কাছাকাছি যদিও দু'জনে আছি,
—এ কি ভাগ্য-ছল!
দু'জনার মাঝে কেন তবু ব্যবধান হেন
কঠিন নিশ্চল!
তুমি ভেসে যাও ধীরে শুভ্র অভ্র গিরিশিরে
আমি লুটি পদমূলে—অশান্ত নির্ঝর,
সহি শত শিলাঘাত দারুণ ঝটিকাবাত
অজ্ঞাত প্রান্তর পানে ছুটি নিরন্তর।
কি যে গাহি কলভাষে— কোন্ ছায়া হৃদে ভাসে
কি আবেগ-আকুলতা—কেহ নাহি জানে।
কখনো কি ঊর্দ্ধ হতে বন্ধুর এ শিলা-পথে
চাহ মোর পানে!

৩

এই ভাল—কাজ নাই, যা পেয়েছি—থাক্ তাই,
চাহি না মিলন,
এমনি তোমার ধ্যানে এমনি প্রেমের গানে
কাটিবে জীবন।
অপ্রত্যাশী অনুরাগ, নিষ্কাম এ প্রেম-যাগ,
এ নহে আঁখির তৃষা—মোহের স্বপন।
চাহে না এ বিনিময় হৃদি-জয়-পরাজয়,
এ যে শুধু আপনার সর্ব্ব-সমর্পণ।
মানস-মন্দির মাঝে তোমার প্রতিমা রাজে,
বিশ্বের শোভায় তব মাধুরী অম্লান;
অন্তরে বাহিরে চাই— তোমারে দেখিতে পাই,
কোথা ব্যবধান!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

উপবাস ও ক্লান্তি *

উপবাস ও ক্লান্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে অনেক ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। বিনা পরিশ্রমে ক্ষুধার সময় প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিতে পাওয়াই কিছুকাল হইতে বাঙ্গালী জীবনের সুখের আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তবে আজকাল সেই আদর্শ পরিবর্ত্তনের জন্য কতকটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে; অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম করাটা ভাল, এ কথা অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং গোলদীঘিতে দুই এক পাক খাইয়া যথেষ্টমাত্রায় ব্যায়াম করা হইয়াছে ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেন। কিন্তু উপবাস সম্বন্ধে লোকের মতের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই; অধিকাংশ লোকেরই ধারণা উপবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। এই ধারণা কতটা সত্য তাহা স্থির করিবার জন্য আমি উপবাস সম্বন্ধে পরীক্ষা, চিন্তা ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই। এই সকলের ফলে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, মাঝে মাঝে উপবাস, অধিকাংশ সাধারণ লোকের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। বিশেষতঃ যাহারা প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া থাকেন, অথচ যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রমে নারাজ, তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপবাস একান্ত প্রয়োজনীয়। তদ্ব্যতীত কোন কোন প্রকার গুরুতর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কালে উপবাস হিতকর। আর মাঝে মাঝে ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নাকে বিদূরিত করিয়া দিবার মত ক্ষমতা রাখাও সামান্য নৈতিক লাভ নহে।

উপবাস সম্বন্ধে অধ্যয়ন সময়ে যে সকল তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি তাহাতে আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, সম্ভবতঃ অনেক পাঠকও হইবেন। গৌহাটী ভ্রমণকালে এক পাণ্ডা বলিয়াছিল যে, সেখানে পাণ্ডাদের পিতামাতার কাহারও মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি অন্নজল ত্যাগ করিয়া থাকিতে হয়। সে কথা তখন মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। প্রাচীনকালে কোন কোনও ব্রতে আট নয় দিন উপবাস করিতে হইত বলিয়া কথিত আছে। সে সকল কথাও অসম্ভব ভাবিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান কালের শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতগণের সমক্ষে অনেক লোক সাত আট দিন উপবাসে কাটাইয়াছে এবং তিন চারিটি ব্যক্তি প্রায় ত্রিশ দিন ব্যাপী উপবাস করিয়াছে। পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে দীর্ঘ উপবাসের পর যথারীতি আহার গ্রহণ করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি শীঘ্রই আবার নিজ নিজ দেহের পূর্ব্ব অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছিল, কাহারও শারীরিক কোন স্থায়ী ক্ষতি হয় নাই।

উপবাসকালে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে আমি নিজের উপর কয়েকবার উপবাস সম্বন্ধীয় পরীক্ষা চালাইয়াছিলাম।

* চট্টগ্রামে গত সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত।

সে পরীক্ষাগুলি প্রতিবারেই চব্বিশঘন্টা ব্যাপী হইয়াছিল। পরীক্ষার সময় উপলব্ধি করিতাম যে ভোজনের নিয়মিত-কাল উপস্থিত হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এবং সময় যতই যায়, উত্তরোত্তর ততই ক্ষুধার জ্বালা বাড়িতে থাকে। ভোজনের নিয়মিতকাল অতিবাহিত হওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যে ক্ষুধার জ্বালা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায়। এই সময় শরীর বড় দুর্ব্বল মনে হয়; অল্প পরিশ্রমেই মাথা ঘুরিয়া উঠে। কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা যায় না। কয়েকবার উপবাস করিলে ক্রমে কিন্তু এই অবস্থার কষ্ট আর বড় বেশী মনে হয় না। যাহারা কোনও কালে উপবাস করে নাই তাহারা ভাবে এই যন্ত্রণাটা বুঝি ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিবে। কিন্তু না; তা বাড়ে না। ঐ সময়ের পর হইতে ক্ষুধার যন্ত্রণা একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে। পরে আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে উহা একপ্রকার বিলুপ্তই হয়। এই সময় ক্ষুধার তাড়না থাকে না, তবে খাইবার ইচ্ছা থাকে। শরীর ক্রমশঃ খুব লঘু ও স্বচ্ছন্দ বোধ হয়। সেই সময়ে দেখিয়াছি যে যথেষ্ট মাত্রায় মানসিক পরিশ্রম করা যায়। মনসংযোগ দিবার শক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি এই সময় খুব তীব্র হইয়া উঠে। কোন বিষয়ে একাগ্র-মনা হইবার পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট সময়। এই মানসিক পরিশ্রমের পর অন্য দিনের মত ভ্রমণাদি শারীরিক পরিশ্রম করা হইয়াছিল; তাহাতে কোনও বাধা জন্মে নাই, তবে শরীর কিছু দুর্ব্বল ছিল।

ঐ সকল ঘটনার শারীরবিধানশাস্ত্র (Physiology) সঙ্গত ব্যাখ্যা এইরূপ—পাকস্থালীতে কিম্বা যকৃৎযন্ত্রে সঞ্চিত খাদ্য যখন ফুরাইয়া যায় তখন ক্ষুধার উদ্রেক হয়। ক্ষুধার প্রথমে শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন কোষগুলি খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাইতে থাকে। শরীর-যন্ত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষসমষ্টির দ্বারা গঠিত। এই সকল কোষ যখন কার্য্য করে তখন কিছু কিছু খাদ্য পুড়াইয়া ফেলে। এক একটী কোষ এক একটী ক্ষুদ্র ইঞ্জিনের মত। ইঞ্জিন যেমন কয়লা খাইয়া কার্য্য করে, শরীর-নির্ম্মাণকারী কোষগুলিও তেমনই কিছু খাদ্য পুড়াইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কোষগুলির যখন যাহা প্রয়োজন হয় রক্ত তখন তাহা পাকযন্ত্র, যকৃৎযন্ত্র প্রভৃতির নিকট হইতে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রদান করে। উপবাসের সময় কিন্তু পাকযন্ত্র যকৃৎযন্ত্র প্রভৃতিতে খাদ্য থাকে না, কাজেই মাংসপেশী প্রভৃতির কোষগুলি খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতে থাকে। উহাই ক্ষুধার তাড়না।

কিন্তু ক্ষুধাটা কিছুক্ষণের মধ্যে পড়িয়া যায়। ইহার কারণ এই যে শরীরের মধ্যে কতকগুলি কোষ আছে, তাহাদিগকে ভাণ্ডারীকোষ এই নাম-দেওয়া যাইতে পারে। এই ভাণ্ডারীকোষগুলি (adepose tissue cells), দেহ যখন প্রচুর খাদ্য পায়, তখন অতিরিক্ত খাদ্যভাগকে চর্ব্বিতে পরিণত করিয়া নিজেদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত রাখে। আবার যখন শরীরে খাদ্যের অভাব হয় তখন তাহারা চর্ব্বিকণাগুলিকে দ্রবীভূত করিয়া রক্তে ঢালিয়া দেয় এবং

রক্ত তাহা লইয়া গিয়া ক্ষুধার্ত্ত মাংসপেশী প্রভৃতিতে দিয়া তাহাদের পোষণ করে। এই ভাণ্ডারীকোষ ঠিক যেন কোন সংসারে সুগৃহিণী, ঘরে চাল,—নাই কয়লার অভাব, বাজার দূরে, অথবা পয়সার অস্বচ্ছলতা, সময়ে হাঁড়ি চড়ে নাই, বালক-বালিকারা ক্ষুধায় অস্থির, রোগী পথ্য বিনা ছটফট করিতেছে, ধমকে চমকে, আশা ভরসায় কিছুতেই তাহারা যখন আর বর্গ মানে না, কান্নাকাটি জুড়িয়া দেয়, তখন সুগৃহিণী আপনার গোপন ভাণ্ডারে সঞ্চিত মুড়ি মুড়কি মিঠাই জলপান মিছরি বাতাসা দিয়া ক্ষুধার্ত্তদের আশু শান্ত করেন! আমরা বুঝিলাম শরীরস্থ ভাণ্ডারীকোষের প্রধান কার্য্য নিজের মধ্যে খাদ্য সঞ্চয় রাখা ও প্রয়োজনমত তাহা বাহির করিয়া দেওয়া। ক্ষুধা যখন পড়িয়া যায় তখন বুঝিতে হইবে ভাণ্ডারীকোষগুলি নিজেদের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা নিজেদের চর্ব্বির সম্ভার লইয়া ক্রমশ রক্তে ঢালিয়া দিতেছে। এই অবস্থায় তাই আর ক্ষুধার বেগ থাকে না।

ভাণ্ডারীকোষের সঞ্চয় করা ও ব্যয় করা এই উভয় কার্য্যই পরম প্রয়োজনীয়। কাহারও কাহারও ভাণ্ডারীকোষ শুধু সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু ব্যয় করিতে শিখে নাই। আমি দেখিয়াছি, স্থূলকলেবর ব্যক্তি, এক সপ্তাহ উপবাস করিলেও যাহার বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা নহে, কেবল জল খাবারটা সময়মত না জুটিলেই, তিনি ক্ষুধায় একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। যাহাদের ভাণ্ডারীকোষ একেবারে ব্যয় করিতে শিখে নাই, তাহাদের বড় দুঃখ! তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত চারি পাঁচ সের চর্ব্বির বোঝা বহন করিতে হইতেছে, যাহা তাহাদের কোন কালেই কোন কাজে লাগিবে না। যাহারা নিয়মিত উপবাস করে তাহাদের ভাণ্ডারীকোষ ব্যয় করিতে শিখে এজন্য উপবাসে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয় না।

শুধু যে উপবাসের দ্বারা ভাণ্ডারী-কোষকে ব্যয় করিতে শিখান যায় এমন নহে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করিয়াও তাহাদিগকে ঐ শিক্ষা দেওয়া যায়। চুপ করিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিয়া একদিন উপবাস করিলেও যে ফল হয় পাঁচঘণ্টা ধরিয়া শিকার করিলে বা পর্ব্বতারোহণ করিলেও সেই ফল লাভ হয়। কেবল প্রভেদ এই যে প্রথম উপায়ে সঞ্চিত খাদ্য ধীরে ধীরে ক্ষয়িত হইয়া যায়, আর দ্বিতীয় উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায়।

কোন কোন প্রকারের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের সময় উপবাসে কেন সুফল হয় তাহা এক্ষণে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। খুব গুরুতর পরিশ্রমের সময় উপবাস হিতকর। আমি মাঝারী-গোছের পরিশ্রমের কথা বলিতেছি না, অত্যধিক পরিশ্রমের কথাই বলিতেছি। মাঝারী পরিশ্রমে ক্ষুধা বেশ উদ্দীপ্ত হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াও যায়। শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে খাদ্য সামগ্রী উদর মধ্যে প্রেরণ করিয়া পরিপাক করিতেও যথেষ্ট পরিশ্রম লাগে। হৃদয়যন্ত্রকে, খুব খানিকটা কোদাল পাড়িবার

সময় যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, এক পেট ভাত হজম করিবার সময়ও সেইরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। যখন কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে তখন শরীরের সমস্ত রক্ত মাংস, পেশী ও মস্তিষ্ক প্রভৃতিতে যাওয়া আবশ্যক—রক্তের পাকযন্ত্রে গিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাকে পঞ্চাশ মাইল পথ চলিতে হইবে কিম্বা উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিতে হইবে সে যদি শরীরে বলাধান হইবে বলিয়া উদরকে উত্তমরূপে পূর্ণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করে তবে সে একেবারে ঠকিবে। গুরু পরিশ্রম আরম্ভ করিবার অল্পক্ষণের মধ্যেই পাকযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইবে। তখন তাহার পক্ষে খাদ্যের বোঝা বহাই সার হইবে। গুরু পরিশ্রম করিবার সময় শরীরকে তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত খাদ্য খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে হইবে। ভাণ্ডারীকোষগুলি যাহাদের ব্যয় করিতে শিখিয়াছে তাহাদেরই এই কার্য্যে সুবিধা হয়।

চরিত-চিত্র

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও স্বাদেশিক কর্ম্মক্ষেত্রে একটা নূতন বস্তুর আমদানী হইয়াছে। ইহার নাম নেতা বা নায়ক বা "লীডার"। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এ কথা আমরা শুনি নাই। কৃষ্ণদাস জমিদার-সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না, মুখপাত্র বা প্রতিনিধি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বা আনন্দমোহন, শিশিরকুমার কি কালীচরণ, ইহাঁদের কেহই সে'কালে নেতা উপাধি লাভ করেন নাই, কিন্তু দেশের নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে ইহাঁদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। আমার মনে হয় যে, সে সময়ে আমরা যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শ ধরিয়া চলিতেছিলাম, তাহা কোনও লোকবিশেষের নেতৃত্বের দাবী সহ্য করিতে পারিত না বলিয়াই, সে যুগে আমাদের মধ্যে নেতার বা নায়কের বা লীডারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। এখন যে বস্তুকে আমরা নেতা বলি সে বস্তু তখনও ছিল। মনের ভাবে তো আর সংসারে কোথাও বস্তু-বিপর্য্যয় ঘটে না। তবে আমরা তখন সে বস্তুকে নেতা বা নায়ক বা লীডার বলিয়া ডাকিতাম না, ইহাই কেবল সত্য।

আর আজ আমরা এই সকল নাম দান করিতেছি বলিয়াই যে নূতন বস্তু লাভ করিতেছি, এমনই কি বলা যায়? সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কর্ম্মী ও মনীষীগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি তখনও ছিলেন, এখনও আছেন। আমরা এখন তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি না বলিয়া নেতা বলিতে বেশি ভালবাসি; কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের কথার জোরে তাঁরা নেতা বা নায়ক হইয়া উঠেন, এমনও বলা যায় না। ফলতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত নায়কত্ব লাভ করা এমন সহজ ব্যাপারও নহে। আমরা

লেখাপড়া জানি কিম্বা না জানিলেও জানি বলিয়া আমাদের যে অভিমান জন্মিয়াছে, তাহার দরুণই কেহ আমাদের প্রকৃত নেতা হইতে পারেন না। আমরা বিচার করি, যুক্তি করি, পরখ করি, লাভালাভ গণনা করি, তার পরে যাঁর কথা আমাদের মনোমত হয়, তাঁহাকে আমাদের মুখ-পাত্র বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু কাহারও কথায় আমরা উঠিতে বসিতে পারি না। কাহারও পশ্চাতে যাইয়া আমরা দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে জানি না। কাহারও মান বা প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি না। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে ক্বচিৎ ধর্ম্মের ব্যাপারে সম্ভব হইলেও, সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই কেবল ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে লোক-প্রতিনিধি বলা যায়, কিন্তু লোক-নায়ক বলা যায় না।

বস্তুতঃ আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মিগণের মধ্যে কেবল একজনমাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত।

অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন; সদ্বক্তা, কিন্তু দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী নহেন। সুললিত বাক্য যোজনা করিয়া তিনি বহু লোককে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু শব্দ ও ভাবের বন্যা ছুটাইয়া তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন না। তিনি সাহিত্যিক,—তাঁর ভক্তিযোগ বাংলাভাষার একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; কিন্তু যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁর নাই। তিনি দরিদ্র নহেন, পিতৃদত্ত সম্পত্তির দ্বারা তাঁর সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদিত হয়; কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে লোকে সমাজপতি হইয়া উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। অশ্বিনীকুমার বি, এল পাশ করিয়া কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণীদলভুক্ত হইতে পারিতেন না যে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিধিমত চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়াও লোক সমাজে যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে, অশ্বিনীকুমার তাহা পান নাই। সরকারী কর্ম্মে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক জাতীয় নেতৃত্বলাভ করা যায়। অশ্বিনীকুমারের পিতা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; ইচ্ছা করিলে অশ্বিনীকুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তাঁর বিদ্যার ও চরিত্রের গুণে রাজকার্য্যে তিনি যে খুবই কৃতিত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই। যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম্ম-ও-কৃতিত্ব-বলে, সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্বলাভ হয়, অশ্বিনীকুমার তার কিছুরই দাবী করিতে

পারেন না। তথাপি, তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চা লোক-নায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্ম্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না।

ফলতঃ আমার মনে হয় যে, আমাদের চিন্তানায়ক অনেক আছেন, কিন্তু লোক-নায়ক নাই। কেহ বক্তা, কেহ (বলিলেও চলে) কবি; কেহ মসীজীবী, কেহ ব্যবহার-জীবী; কেহ বা ধনে, কেহ বা পদে বড়। এই সকল লোকে মিলিয়া দেশের মনের গতি ও কর্ম্মের আদর্শ বদলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। ইহাঁরা না থাকিলে বাংলা আজ যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে যাইতে পারিত না। ইহাঁরা দেশের প্রাণতা বাড়াইয়া দিয়াছেন, লোক-চরিত্রকে উদার ও উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁরা কেহই, সত্য অর্থে, লোকনায়ক নহেন। লোকে ইহাঁদের পুস্তক আনন্দ করিয়া পড়ে, ইহাঁদের বক্তৃতা আগ্রহ করিয়া শোনে, ইহাঁদের গুণগান প্রাণ খুলিয়া করে; ইহাঁদিগকে সভাসমিতিতে উচ্চ আসনে লইয়া গিয়া বসায়, পথে দেখা হইলে সসম্ভ্রমে ইহাঁদিগকে পথ ছাড়িয়া দেয়; দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ইহাঁদিগকে আদর করিয়া পৌরহিত্যে বরণ করে। এ সকলই করে; করে না কেবল, সত্যভাবে, ইহাঁদের অনুবর্ত্তন। যতদিন লোকের মনের সঙ্গে ইহাঁদের কথা মিলিয়া যায়, লোকের ভাবের সঙ্গে ইহাঁদের উপদেশ মিশ খায়, লোকে যাহা আপনা হইতে চাহে যতদিন ইহাঁরা সে পথে নিজেরা চলিতে ও তাহাদিগকে চালাইতে রাজি থাকেন, ততদিন ইহাঁদিগকে সকলে মাথায় করিয়া রাখে। কিন্তু মতভেদ উপস্থিত হইলেই ইহাঁদিগকে অবলীলাক্রমে, সরাসরিভাবে, ছাড়িয়া আসিতেও দ্বিধা-বোধ করে না। ইহাকে প্রকৃত লোকনায়কত্ব বলে না, বা বলা সঙ্গত নহে।

প্রকৃত লোকনায়ক এদেশে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে। এক সময়ে, হিন্দু ও মুসলমান-সমাজে, যে জাতীয় লোকনায়ক স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা আর আজ দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষাতে আমাদিগকে দেশের লোকের প্রাণ হইতে ক্রমশঃই যেন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের পিতৃপিতামহেরা যেভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বাস করিতেন, আমরা আর তাহা করি না। তাঁরাও সময় সময়, বিষয়-কর্ম্মের খাতিরে গ্রাম ছাড়িয়া দূরদূরান্তে বাস করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রেরা গ্রামেই থাকিতেন। যেক্ষেত্রে তাঁহারা পরিবার সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থলে যাইতেন, সেখানেও গ্রামের সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণগত, অন্তরঙ্গ যোগ কখনও নষ্ট হইত না। বিদেশে প্রবাসে তাঁরা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, গ্রামে আসিয়া, আপনার আত্মীয়কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের মধ্যেই সে অর্থ ব্যয় করিতেন। পরোক্ষভাবে দশে তাঁহাদের অর্থের ভাগী ও ভোগী হইত; সাক্ষাৎভাবে তাহারা তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার

যারা সময়ে অসময়ে অনেক সাহায্যলাভ করিত। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে, দোলদুর্গোৎসবাদি নৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বণে, নিত্য দেবসেবা ও অতিথিসেবার ভিতর দিয়া, গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের একটা নিকট সম্বন্ধ জমাট হইয়া যাইত। আর এই জন্য, তাঁরা যেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেন, শত শত লোকে সেখানে যাইয়া তাঁহাদের পৃষ্টপোষক হইয়া দাঁড়াইত। তাঁরা যে কাজ করিতে যাইতেন, সকলে সে কাজে রত হইত। তাঁরা যে পথ দেখাইতেন, সকলে বিনা ওজরে, বিনা বিচারে, সে পথ ধরিয়া চলিত। তখন দেশে সত্যকার লোক-নেতৃত্ব ছিল। ইহাঁরাই সেকালে প্রকৃত লোক-নায়ক ছিলেন।

আর আজ—'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। সে দিনও নাই—সে সমাজও নাই! লোকে লেখাপড়া শিখিয়া, যারা লেখাপড়া জানে না তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিতে'র, 'বিজ্ঞে'র ও 'অজ্ঞে'র মধ্যে এককালে এ সাংঘাতিক ব্যবধান ছিল না। গ্রামের বিদ্যাভূষণ বা তর্কসিদ্ধান্ত বা ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে আপামর সাধারণ সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাঁর চতুষ্পাঠীতে, যখন তিনি শিষ্যমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া ব্যাকরণ বা স্মৃতি বা ন্যায়ের অধ্যাপনা করাইতেন, তখনও গ্রামের চাষী ও ব্যবসায়ীরা তাঁর কাছে যাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত এবং তাঁর তামাকাদি সাজিয়া, তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইত। তাদের সঙ্গে তাঁর বিদ্যার ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, প্রাণের ব্যবধান বড় বেশি ছিল না। আর এই একপ্রাণতা নিবন্ধন, দেশের আপামর সাধারণে এ সকল উদারচরিত ব্রাহ্মণের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়াও, তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে, কথাবার্ত্তার গুণে অনেকটা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিত। এ শিক্ষা স্কুল-পাঠশালায় মিলে না। আমরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া, চিন্তায়, ভাবে, আদর্শে, অভ্যাসে, সকল বিষয়ে দেশের লোক হইতে এতটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাদের কথা আমাদের মিষ্টি লাগে না, আমাদের কথাও তাদের বোধগম্য হয় না। তাদের আমোদপ্রমোদে আমরা গা ঢালিয়া দিতে পারি না; আমাদের উৎসব-ব্যসনাদিতেও তারা আমাদের কাছে ঘেষিতে পারে না। আমাদের বাড়ীতে তারা সাহস করিয়া আসে না, আমরাও আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে তাহাদিগকে আদর করিয়া ডাকি না। ইংরেজকে তারা যে ভাবে দেখে, যেরূপ সম্মান করে, আমাদিগকেও প্রায় সেইরূপই করে। আর এই জন্য দেশের লোকে যেমন ইংরেজের শাসন মানিয়া চলে, কিন্তু আপনা হইতে প্রাণের টানে সরকারের অনুবর্ত্তন করে না, আমাদের আন্দোলন-আলোচনাদিতেও এখন দেশের লোকে ঠিক ঐ ভাবেই আসিয়া যোগদান করে;—খাতিরে করে, ভয়ে করে, বড়লোক ভাবিয়া আমাদের "মাস্‌মিটিংএ" আসিয়া জনতা করে, কিন্তু আপনার জন বলিয়া, অন্তরের

টানে, প্রাণের দায়ে আমাদের কাছে তারা আসে না। এ অবস্থায়, প্রকৃত লোক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভবে না।

তবে অশ্বিনীকুমারের পক্ষে ইহা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরেজি-নবিশদিগের মত জীবনটা কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া, কর্ম্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের দায়ে, আপনার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বহুদিন পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারের একবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রস্তাব হয়, এরূপ শুনিয়াছি। প্রবীণ সাহিত্যিক, ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রায়ই দেওঘরে যাইয়া বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতেন। অশ্বিনীকুমারের কলিকাতায় আসিবার কথা শুনিয়া, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে এমন আত্মঘাতী কর্ম্ম করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করেন। অশ্বিনীকুমার যদি এ নিষেধ না শুনিতেন, আমাদের দশজনের মতন যদি তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেন, তাহা হইলে, বাংলার আধুনিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যে স্থান অধিকার বসিয়াছেন, সে স্থান কিছুতেই পাইতেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

প্রথম যৌবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া অশ্বিনীকুমার বরিশালে যাইয়া স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সে সময়ে লাট রিপন্ প্রবর্ত্তিত স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বা Local Self-governmentএর খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ দেশের ব্যবহারজীবিগণ এই স্বায়ত্বশাসনেতেই দেশের ভবিষ্যতের স্বাধীনতার পত্তন হইল ভাবিয়া উৎসাহ সহকারে মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রীক্‌বোর্ডের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অশ্বিনীকুমারও সেই পথ ধরিয়াই নিজের সহরের এবং জেলার সেবাতে নিযুক্ত হন। এবং ক্রমে ওকালতী পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যতদুর আমার মনে আছে, বোধ হয় তিনি বহুকাল ধরিয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। ক্রমোন্নতি সহকারে অশ্বিনীকুমারের উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়। এবং অশ্বিনীকুমার একজন মনীষাসম্পন্ন স্বার্থত্যাগী লোকশিক্ষকের খ্যাতিলাভ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বিশেষ ভাবে আমাদের মধ্যে অল্প বেতন লইয়া উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। আজিকালি দেশে এ শ্রেণীর অনেকগুলি-বে-সরকারী স্কুল-কলেজ হইয়াছে, কিন্তু এক বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত এই বে-সরকারী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রায় অপর সকলেই, এগুলিকে জীবিকা-উপার্জ্জনের একটা প্রশস্ত উপায় রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা করেন নাই। সে প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। ফলতঃ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে, অশ্বিনীকুমারের মতন আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশীয়-

দিগের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই। এইজন্য আজি পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমারের স্কুল ও কলেজের পরিচালনাকার্য্যে কোনও প্রকারের ব্যবসাদারীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অশ্বিনীকুমার লোকশিক্ষার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন, কখনো তাহার এক কপর্দ্দকেরও প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নাই। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এ দেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের, ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্তযুবকমণ্ডলীর মধ্যে এতটা পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরাই পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চা স্বদেশীর পুরোহিত হইয়া বসিয়া আছেন। স্বদেশী যে পূর্ব্ববঙ্গে এতটা শক্তিশালী হইয়াছিল, এবং এখনো হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র ও শিক্ষা। স্কুল ও কলেজ খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাবলী পড়াইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ শেষ হইল, অশ্বিনীকুমার কখনো এমনটা মনে করেন নাই। শিষ্যদিগের চরিত্রগঠনের জন্যও তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্রগঠনের উপায় কেবলমাত্র উপদেশ নহে, কিন্তু সদনুষ্ঠান। অশ্বিনীকুমার আপনার স্কুল ও কলেজের যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। চরিত্রগঠনের মূলে পরার্থপরতাসাধন। লোকসেবার ভিতর দিয়া যে ভাবে ও যে পরিমাণে এই পরার্থপরতাসাধন করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায়ে তাহা পারা যায় না। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা দল বাঁধিয়া বরিশালের আর্ত্তজনের সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বহু দিন হইতেই বরিশালে মাঝে মাঝে বিসূচিকার নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের স্কুল এবং কলেজের যুবকেরা সে সব সময়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে পল্লীগ্রাম হইতে বহু লোক সর্ব্বদাই বরিশালে যাতায়াত করে। বরিশাল মুসলমানপ্রধান স্থান। সহরের এই সকল অভ্যাগতদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যাই বেশী হয়। ইহারা সহরে আসিয়া মোসাফেরখানায় বা হোটেলে আশ্রয় লইয়া থাকে। এই সকল হোটেলের স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই যে নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র; বিশেষতঃ আপনার পরিবার পরিজন হইতে দূরে আসিয়া এরূপ বন্ধুহীন স্থানে বিসূচিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকের কত না দুর্গতি হয়, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা সর্ব্বদা নিতান্ত আপনার জনের মত এই সকল অসহায় রোগীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ সন্তানেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ইহাদিগের মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ অকাতরে এই সকল বিপন্ন লোকের ঔষধ এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরিশালের এই সেবকদল অনেক বন্ধুহীন লোকের মৃতদেহের সৎকার পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

সহরের বারাঙ্গনাগণ পর্য্যন্ত ইহাদের এই সেবা হইতে কখনো বঞ্চিত হয় নাই। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা বিপন্ন রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া কখনো কোনো দিন কোনো প্রকারের জাতিবর্ণের বিচার করেন নাই। আকালে, অন্নকষ্টে, হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে ইঁহারা দেশের এবং বিদেশের সম্পন্ন লোকদিগের নিকট হইতে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বিপন্ন জনের ক্ষুন্নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের লোক-সেবা কেবল যে সহরে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। বহু দিন হইতে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কতকটা নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, আর কতকটা আপনার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষেও তিনি আপনার জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নৌকাযোগে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। এই সকল সফরের সময় দেশের গরীব লোকেরা সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য এবং সেবা পাইয়া আসিয়াছেন; অশ্বিনীকুমারের নৌকা কোথাও আসিয়াছে, শুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর-মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগী ঔষধ চায়, দরিদ্র অর্থ চায়, জিজ্ঞাসু উপদেশ চায়, আর যাহার চাহিবার কিছুই নাই, সেও তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া কেবল মাত্র কৃতার্থ হইবার জন্য তাঁহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হয়। সকলের অভাব বা প্রার্থনা যে তিনি সর্ব্বদা পূরণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। ভগবানের নিকটেও মানুষ সর্ব্বদা কত কি চায়, কিন্তু যাহা চায় তাহাই যে পায়, এমন নহে; তথাপি ঈপ্সিতলাভ না হইলেও, তাহাদের প্রাণে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের সম্বন্ধেও কতকটা তাই হয়। সকলের প্রার্থনা পূরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত, কোনো মানুষই তাহা পারে না। তবে মিষ্ট কথায়, স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে অন্তরের সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়া সকল মানুষই অপর মানুষের প্রাণটা ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারে। অশ্বিনীকুমার এটী সর্ব্বদাই করিয়াছেন। এই জন্য বরিশালের জনসাধারণের সঙ্গে বহুদিন হইতে তাঁহার একটা গভীর প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কি সহজ উপায়ে, তিনি লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে অনেক সময় তাহা কল্পনা করিয়া উঠাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটী সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে বেশী দিনের কথা নয়; স্বদেশী আন্দোলনের তখন খুব প্রাদুর্ভাব। বরিশালে একটা অতি বিস্তৃত ও স্বল্প-বিত্তর সঙ্গতিসম্পন্ন নমঃশূদ্র-সমাজ আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টীয়ান হইয়া গিয়াছে; কেহ কেহ লেখাপড়াও শিখিয়াছে। এই সকল সূত্রে পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রভাবও কিয়ৎপরিমাণে এই নমঃশূদ্র-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। নমঃশূদ্রেরা কোনও বিষয়েই দেশের অপরাপর শূদ্রগণ অপেক্ষা হীন নহে; অথচ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতর

শ্রেণীর লোকেরা সচ্ছন্দে অপর শূদ্রদের জল গ্রহণ করেন; নমঃশূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। নমঃশূদ্রেরা এ জন্য আপনাদিগকে অযথা অপমানিত মনে করিয়া এই প্রথার বিরুদ্ধে একটী প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশীর মুখে নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনটা বেশই বাড়িয়া উঠে। স্বদেশীদলের আত্মবিরোধ বাধাইবার জন্য স্বদেশীর বিরোধিগণ নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনে নানা ভাবে ইন্ধন প্রদান করিতে আরম্ভ করে। বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান স্বদেশসেবক নমঃ-শূদ্রকে একদিন কেহ বলেন যে, "বাবুরা ত 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া ভাই ভাই একঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুঁকা চলে না, তবুও তোমরা তাদের ভাই; কথাটা মন্দ নয়!" এ কথা শুনিয়া এই ব্যক্তির মনে একটা খটকা বাধিয়া যায়। সে সময়ে অশ্বিনীবাবু সেই অঞ্চলেই উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই নমঃশূদ্র স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়া ছিলেন। শয্যার নিকটেই একটা ফরাশ পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া তাহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তার পর অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটী বলিলেন—"বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিয়াছেন তাহাতেই, বুঝিয়াছি, 'বন্দে মাতরম্' সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।" ঘটনাটী অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে কি সহজ, কি সামান্য ও স্বাভাবিক উপায়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে সর্ব্বসাধারণের চিত্তের উপরে আপনার এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ব্রহ্মবিদ্যা *

Theosophy [গ্রীক Theos (ঈশ্বর) এবং Sophia (জ্ঞান)] বা ব্রহ্মবিদ্যা কোন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা ধর্ম্মমত নহে। ইহা কাহাকেও তাহার চিরানুসৃত ধর্ম্মমত পরিহার করিয়া নূতন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে বলে না। প্রতি ধর্ম্মের অভ্যন্তরে

* চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলন শেষ হইলে পরদিন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম সঙ্কলিত হইল। বঃ সঃ

যে অনুপম সৌন্দর্য্যভাণ্ডার রহিয়াছে, আপন জ্ঞানালোকে তাহারই সহিত ইহা পরিচয়-সাধন করিয়া দেয় মাত্র। ইহার সাহায্যে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অভ্যন্তরে অনেক নিগূঢ় সৌন্দর্য্য ও প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং যে সকল মত এতদিন ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল, তাহাদের সত্যতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ,— 'ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ মরুদ্ব্যোম্' এই মূল পঞ্চভূত লইয়াই আমাদের শাস্ত্রকারগণের মতে জড়জগৎ। পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্‌গণ কিন্তু এ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ-শতাধিক মূল ভূতের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের সে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্মুখে আমাদের সে ঋষি-কথিত 'পঞ্চভূত' ভ্রমাত্মক ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ধারণা জন্মাইতেছিল। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার কল্যাণে আমরা এখন জানিয়াছি- শাস্ত্রকথিত যে পঞ্চভূত তাহা পঞ্চ element নহে; যে যে বিশেষ অবস্থায় জড়পদার্থ অবস্থান করিতে পারে—অর্থাৎ কাঠিন্য, তরলত্ব, উষ্ণত্ব ইত্যাদি "ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ" আদি সংজ্ঞা দ্বারা কেবল তাহাই মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের কাছে এতদিন এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত জড়ের অন্য কোন অবস্থা পরিচিত ছিল না। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে যে Ether (ঈথর) ও সম্প্রতি যে Etherin নামক সূক্ষ্ম পদার্থদ্বয়ের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাদের আমাদের "মরুৎ" ও "ব্যোম" সংজ্ঞার সহিত সমানার্থবাচক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ আধুনিক জড়বিজ্ঞান, বহু চেষ্টা ও চিন্তার ফলে বহুবর্ষ পূর্ব্বেকার আর্য্যঋষি-প্রচারিত সত্যগুলির পুনরাবিষ্কার সাধন করিতেছে মাত্র।

গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা "বস্ব" —ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক এই ত্রিলোকের সন্ধান পাই। প্রাচীন ঋষি-গণের মতে আমরা স্থূলদেহে ভূর্লোকে, সূক্ষ্মতর দেহে ভুবর্লোকে, এবং সূক্ষ্মতম (কারণ) দেহে স্বর্লোকে বিচরণ করি। স্থূলদেহে এই ভূর্লোকে অবস্থান কালেও আমরা অপর দুই লোক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি না। জাগ্রতাবস্থায় এই লোক, স্বপ্নাবস্থায় ভুবর্লোক এবং সুষুপ্তাবস্থায় স্বর্লোকের সহিত আমরা সংযুক্ত থাকি। এতদিন আমরা এই ভূর্লোক (অর্থাৎ) স্থূলজগতকেই একমাত্র বাস্তব লোক বলিয়া মনে করিয়া আসিতাম। সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের মহাকবি Wordsworthএর জীবনীলেখক মায়ারস্ সাহেব (Mr. Myers) এ সম্বন্ধে আড়াই হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী যে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে যুক্তি, তর্ক ও গবেষণার দ্বারা তিনি ঋষি-কথিত এই ত্রিলোকের কথা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এই যে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সকল ইহা ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিদিগের দ্বারাই প্রথম আবিষ্কৃত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ছাড়পত্র না পাইলে আমরা সহজে এ সব কথা বিশ্বাস করিতে চাহি না—কিন্তু যাহা সত্য তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও কালবশে পুনঃ প্রকাশিত হয়—তাহা চিরকাল গুহানিহিত থাকিতে পারে না। Theosophyই ক্রমে ক্রমে

জগতের সকল ধর্ম্মের নিগূঢ়ভাব এবং সত্যতত্ত্বের উদ্ধার-সাধন করিয়া পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য প্রদান করিবে।—সনাতন আর্য্যশাস্ত্রের অন্ধকার-নিহিত তত্ত্বগুলির যথার্থ স্বরূপ এইরূপে একে একে আমাদের উপলব্ধি হইতেছে। হিন্দুশাস্ত্রের সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব থাকিলেও, সর্ব্বলোকমহেশ্বর "সর্ব্বস্য ঈশানঃ" এক ভিন্ন দুই নয় বলিয়া আর্য্যঋষিগণ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বহুদেবপূজক বা কেবল জড়বাদী ছিলেন না; জড়ের মধ্যে সূক্ষ্মকে, বহুর মধ্যে এককে অনুভব করিয়া, সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত সর্ব্বব্যাপী সেই চিন্ময় বিষ্ণুরই তাঁহারা ধ্যান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই দৃশ্যমান গ্রহাদিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলের পশ্চাতে যে অনন্তকোটি গ্রহতারামণ্ডিত অসংখ্য সৌরমণ্ডল রহিয়াছে "সেই সর্ব্বসবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" যিনি তিনিই আমাদের একমাত্র বরেণ্য; তাঁহারই উদ্দেশ্যে ঋষিগণ বলিয়াছেন—"ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

ফলতঃ ব্রহ্মবিদ্যাই একমাত্র পরাবিদ্যা—অপর সকল বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাভূমি। ইহারই প্রভাবে মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়া ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

বিলাতের কথা

ইংরেজ-চরিত্রের একদিক

ইংরেজের অনেক দোষ আছে, আমাদের অনেক গুণ আছে আবার আমাদেরও বিস্তর দোষ আছে, ইংরেজেরও বিস্তর গুণ আছে। দোষে গুণে সকল মানুষ যেমন, সকল জাতিও সেইরূপ মিলিয়া মিশিয়া বিধাতার হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিলাতে যাইয়া অশেষ ব্যাপার দেখিয়া আমাদের ঘৃণা হয়, আবার অনেক ব্যাপার দেখিয়া আমাদের নিজেদের জাতের প্রতি যে একটুও লজ্জার ভাব জাগিয়া উঠে না,এমনও বলিতে পারি না। কিন্তু বহুদিন ইংরেজকে দেখিলে, ঘনিষ্ঠভাবে ইংরেজের সঙ্গে বিবিধ সামাজিক সম্বন্ধে মিলিবার মিশিবার সুযোগ পাইলে, একটা বিষয় কিছুতেই অস্বীকার করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, সেটী এই যে ইংরেজের যা কিছু দোষ, যা কিছু পাপ, যা কিছু ত্রুটী-দুর্ব্বলতা থাক্ না কেন, সে যে নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা নয়, খামাকা খামাকা যে সে লোকের সঙ্গে কলহ-বিবাদ বাধায় না, ক্ষুদ্র বিষয়ে আপনাকে টানিয়া বড় করিতে যে যায় না, ইহা কোনও মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আমরা দেবত্ব কপচাই, সনাতনী ফলাই, ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াই, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বড়াই যাই করি না কেন, মোটের উপরে আমরা ছোট, আর ইংরেজ বড়, এ কথাটা মাঝে মাঝে মনে করা মন্দ নয়।

ইংরেজ স্বার্থপর, আমরাই কি একেবারে

সকলে নিঃস্বার্থ? আমরাও স্বার্থহীন নই। অথচ ইংরেজ, স্বার্থপরতাতেও আমাদের অপেক্ষা বড় বই ছোট নয়। তার স্বার্থপরতার ভিতরেও একটা অদ্ভুত উদারতা আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই—ইংরেজ মাংসাশী জীব, আমাদের যেমন ভাত প্রধান খাদ্য, ইংরেজের মাংস সেইরূপ প্রধান খাদ্য। কিন্তু তথাপি মোটের উপরে ইংরেজের যে জীবে দয়া কার্য্যতঃ আমাদের অপেক্ষা একান্তই অল্প, এমন কথাই কি বলিতে পারা যায়? আমরা ইতর জন্তুকে মারিয়া খাইতে শঙ্কা বোধ করি; মাছ মাংস আহার করিতে আমাদের ভাবুকতায় আঘাত লাগে, এও একটা সংস্কার মাত্র নয় কি? কিন্তু অন্যদিকে ইংরেজ যেমন পশুর সেবা করে, আমাদের এক জৈনেরা ভিন্ন আর কেউ কি সে ভাবে সে মমতা সহকারে, পশুর সঙ্গে সে ভাবের আন্তরিক সখ্য ও সহানুভূতি স্থাপন করিয়া, কখনও পশুকুলের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে? শাস্ত্রে গো ভগবতী—বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের এক পর্য্যায়ভুক্ত; অথচ এই গো-কুলকে আমাদের রাখালেরা, গাড়োয়ানেরা এমন কি কৃষকেরা পর্য্যন্ত কত না অযথা উৎপীড়ন ও অবলীলাক্রমে কতটা অবহেলা করে, ইহাও তো একেবারেই অজানা নয়? পশুর সঙ্গে বান্ধবতা কচিৎ আমাদের মধ্যে কোনও লোকে করেন। সাধুসন্তেরা সর্ব্বদাই এটী করেন, কারণ তাঁদের সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি জন্মিয়াছে। কিন্তু গৃহস্থেরা কি করে? গো-ছাগাদিকে খামাকা তাড়া করে না, বা তাড়না করিতে দেখিলে বেদনা পায় ও তাহাতে বাধা দিতে যায়, এমন ক'টা লোক দেশে দেখিতে পাই? কিন্তু ইংরেজ চাষী তার গরু-ঘোড়া-ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের কি যে যত্ন করে, কি যে নাওয়ায় ধোওয়ায়, কি যে দলাই মলাই করে, কত যত্নে যে তাদের খট্‌খটে ঘরে শীতাতপ হইতে বাঁচাইয়া রাখে, দেখিলে আমাদের 'জীবে দয়া'পর্য্যন্ত লজ্জায় অধোমুখ হইয়া যায়। আমরা মাঝে মাঝে গরুর পা পূজা করি, বৎসরে বিশেষ তিথি উপলক্ষে গোরুর গায়ে রং মাখাইয়া তাকে মালা দিয়া সাজাইয়া থাকি। কিন্তু প্রতিদিন যে তার সেবা প্রয়োজন, তাহা মনে রাখি না। তাই দেশে গোধনের এমন দুর্দ্দশা হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। যেমন গো-সম্বন্ধে সেরূপ সকল পশুসম্বন্ধেই এটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাদের পূজা আছে, আদর নাই; নৈমিত্তিক সম্বর্দ্ধনা আছে, নিত্য সেবা নাই। আমরা তাদের হাতে করিয়া একেবারে বধ করি না। কিন্তু অযত্নে, পীড়নে, ধীরে ধীরে অশেষ ক্লেশ পাইয়া তিলে তিলে মরিতে দেই এবং মারিয়াও থাকি। ইংরেজ এ সব করে না। প্রয়োজন মত, খাদ্যের প্রয়োজনে বা প্রমোদের খাতিরে, সে পশুকুলকে নিজের হাতে বধ করে। কিন্তু যতদিন না প্রয়োজন বা প্রলোভন উপস্থিত হয়, ততদিন তাহাদিগকে কি যে আদর কি যে যত্ন করে, তাদের সঙ্গে কি যে আত্মীয়তা পাতায় দেখিলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। ঘোড়াটীকে চড়িবার আগে চুম খায়। গোরুটীকে কাজে লাগাইবার পূর্ব্বে কত না তার গায়ে মৃদুভাবে হাত বুলায়। যেমন পশু-পক্ষীর সঙ্গে

ব্যবহারে, সেইরূপ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারেও, ইংরেজকে সময় সময় আমাদের অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া যে মনে হয় না, তাহা নহে। আমাদের দেশের চাকর-বাকরের সঙ্গে ইংরেজ মানুষের মত বড় একটা ব্যবহার করে না, ইহা সত্য। এর জন্য কে দায়ী তার বিচারও এখানে করিব না। কিন্তু ইংরেজ তার নিজের দেশে, নিজের জাতের লোকের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে, তাই দেখিতে হইবে। ইংরেজ-সমাজ ঘড়ির কাঁটার মতন চলে। সুতরাং চাকর ও মনিবের সম্বন্ধটার ভিতরেও যে একটা পাকা নিয়মের বাঁধাবাঁধি আছে, ইহা বিচিত্র নহে। চাকর তার কর্ত্তব্য করিবে; কিন্তু সেও মানুষ তো, তারও তো আরাম-বিরামের প্রয়োজন আছে; তারও সখ আছে, সুখ আছে, সৌখিনতা আছে; আমোদ-প্রমোদের প্রবৃত্তি আছে। অতএব ইংরেজ সম্বন্ধে ইংরেজের বাড়ীতে চাকর-মনিবের সম্বন্ধের ভিতরেও এ সকলের একটা বিধি-ব্যবস্থাও আছে। রাত্রি সাড়ে নয়টার পর হইতে বাড়ীর চাকর-চাকরাণীরা স্বাধীন। তার পরে, বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলে, মনিবকে নিজের কাজ নিজে করিয়া লইতে হয়। এ ছাড়া সপ্তাহে এক বেলা তাদের ছুটী আছে। রবিবারে মধ্যাহ্ন আহারের পরে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তারা যেখানে খুসী যাইবে, সে দিনের ঐ সময়টা তার নিজের, মনিবের নয়। তার পর প্রতি মাসে সে একটা দিন পুরা ছুটী পাইবে। খাটিবার সময়, সে চাকর বা চাকরাণীর পোষাক পরিবে। চাকরাণীদের মাথায় এক রকম টুপি আছে, যার দ্বারা তারা যে চাকরাণী ইহা চেনা যায়। এই টুপি ও তার সঙ্গে সঙ্গে একটা এপ্রণ (Apron) থাকে এটী চাকরাণীদের চিহ্ন। যতক্ষণ মনিবের কাজ করে, ততক্ষণ এগুলি পরিয়া থাকিবে, না পরিলে মনিবের অবমাননা হয়। কিন্তু অন্য সময়ে, তার ছুটীর সময় সে সুন্দর জমকাল পোষাক পরিয়া, ভদ্র মেম সাজিয়া বাহির হইবে। তখন সে আর দশজন স্ত্রীলোকের মতন সম্মানও পাইবে। আমাদের দেশের চাকরবাকরের দশা অন্যরূপ। তাদের একটুকুও নিজের সময় নাই। ভোরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তারা মনিবের কাজে লাগে, আর পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, যখন যাহা হুকুম হয়, তাই তামিল করে। তারা মাসের প্রতিদিন, বছরের প্রতিমাস, যতদিন চাকরী করিবে, ততদিন সর্ব্বদাই মনিবের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবে। তাদের ডাকার সময় অসময় নাই। কাজের আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এ বিষয়েও ইংরেজ আমাদের চাইতে বড় নয় কি? ইংরেজ মনিবও আমাদের চাইতে বড়, ইংরেজ চাকরও আমাদের চাকরের চাইতে বড়।

তবে এক সময়ে আমাদের দেশে ভৃত্যে ও পুত্রে আমাদের ভেদবিচার ছিল না। সে আর এক কথা। সে দিন তো আর নাই। আমি আজিকালিকার কথাই বলিতেছি, সে কালের কথা নয়।

তারপর ইংরেজ ব্যবসায়-ও-বিষয়-কর্ম্মে আমাদের চাইতে যে কত বড়, ইহার ইয়ত্তাই হয় না। কেবল বেশি টাকা

উপার্জ্জন করে বলিয়া বড় বলিতেছি না, কিন্তু মানুষের হিসাবেই বিষয়-বাণিজ্যে, ব্যবসাদিতে ইংরেজ কতটা যে বড়ও আমরা কতটা যে ক্ষুদ্র তাহার পরিমাণ হয় না। ইংরেজ ব্যবসাই করিতে চাহে, ব্যবসা করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্যই ব্যস্ত, এবং তার জন্য যা কিছু সবই করিতে প্রস্তুত ও করিয়া থাকে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতন যে ইংরেজ ব্যবসা করে, এ কথাটা বলি না। কথাটা সত্য ও নয়। আর আর দেশের বৈশ্যেরা যেমন লোককে ঠকায়, ইংরেজও তেমনি করে। ভেজাল যেমন আমাদের দেশের ব্যবসাদারেরা চালায়, ইংরেজও সেইরূপই চালায়। পাটকে রেশম বলিয়া, চর্ব্বিকে মাখন বলিয়া, কাচকে কাঞ্চন বলিয়া যতটা কাটাইতে পারা যায়, ইংরেজ সে চেষ্টা করে। কিন্তু তথাপি এর ভিতরেও একটা ভদ্রত্ব আছে, একটা মনুষ্যত্ব আছে। আজ এ সকলের কারণের সন্ধান বা আলোচনা করিব না। বস্তুটা কিরূপ তাই বলিতে ও বুঝাইতে চাই। ব্যবসায়ীরূপে ইংরেজ ঠকাক বা না ঠকাক, সত্য কথাই বলুক আর মিথ্যা ব্যবহারই করুক,—এ সকল অসত্য, অধর্ম্ম প্রায় সকল দেশের ব্যবসায়ীরাই করে,—কিন্তু মানুষ হিসাবে ইংরেজ এখানেও যে বড়, এটাই বলিতে চাই। ইংরেজ ভেজাল চালায়, কিন্তু বলিয়া কহিয়া চালায়, শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকলের উপরই চালায়, এক জনকে ভাল জিনিষ দিয়া আর একজনকে ভেজাল দেয়, অথচ সব ক' জনার নিকট হইতে একই দাম লয়, এটা কদাপি দেখি নাই। রাজার নিকটে যে দামে জিনিষ বেচে, গরিব প্রজার নিকটেও সেই দামই লয়। গলা দু'জনারই হয় ত কাটে; কিন্তু সমানভাবে কাটে। এ সাম্যটাই কি কম জিনিষ?

ইংরেজ কিরূপে যে ব্যবসা করে, বহু বৎসর পূর্ব্বে একদিন, তার অতি সুন্দর নমুনা পাইয়াছিলাম। সেবারে আমি প্রথম বিলাতে গিয়াছিলাম। দু'বৎসর পরে দেশে ফিরিবার সময়, পথে জাহাজে ব্যবহার করিবার জন্য আমার এক জোড়া ডেক্ সু কিনিবার প্রয়োজন হয়। আমি লণ্ডনে এক জুতার দোকানে গেলাম। "ডেক্ সু আছে কি?" জিজ্ঞাসা করিলাম। "আছে বৈ কি? কত দামের দিব বলুন তো?"—সবিনয়ে দোকানী জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—"এই, খুব কমদরের—২ শিলিং ২॥০ শিলিং এর ভিতর।" "বসুন।" আমি বসিলাম। আদর করিয়া আমাকে এ ব্যক্তি বসাইল। আমি যে কত ছোট্ট খরিদদার ইহা সে জানে, কিন্তু "খদ্দের লক্ষ্মী"—এ কথাটাও সে খুবই জানে। ছোট হউক না কেন? "খদ্দের" তো। আর খদ্দের হিসাবে ছোট বড় সবই সমান। তার পর দেখিলাম সে দোকানী একই সঙ্গে ৫ জোড়া জুতা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল। এক জোড়া ২ শিলিং, এক জোড়া ২॥০ শিলিং, এক জোড়া ৩॥০ শিলিং, এক জোড়া ৫ শিলিং, আর এক জোড়া ১১ শিলিং দামের। পাঁচ জোড়াই পাশা-পাশি করিয়া রাখিল। আমি একটা একটা করিয়া সবগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া শেষে ১১ শিলিংএর জুতা জোড়া কিনিয়া লইয়া

আসিলাম। কেমন ব্যবসাদারী আর আমাদের বেণ্টিক ষ্ট্রীটে বা চাঁদনীতে যদি ১৷৹ কি ২৲ টাকার এক জোড়া জুতা চাই— প্রথমে দোকানদার তো গ্রাহ্যই করিবে না। তারপর ৸৹ আনার কি ১৷৹ সিকের জুতা আনিয়া ২৲ কি ২৷৷৹ টাকা চাহিয়া বসিবে। কত বচসা, কত সময়ের, কত শক্তির অপব্যয় করিয়া পরে, এক জোড়া জুতা কেনা শেষ হয়। কোনও দোকানে ভাল জিনিষ কিনিতে গেলে, দোকানী কথনই একেবারে সব চাইতে সেরা জিনিষটী বাহির করিবে না। প্রথমে ৪৲ টাকার জিনিষ বাহির করিয়া ৮৲ ৯৲ টাকা হাঁকিতে আরম্ভ করিবে। যদি বলি,—এ জিনিষ চাই না, তখন তার চাইতে একটু ভাল জিনিষ বাহির করিয়া আনিবে। এইরূপে কত সময় নষ্ট করিয়া পরে যে জিনিষটী চাই তাহা পাইতেও বা পারি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি বলিব না যে ব্যবসায়েতেও ইংরেজ আমাদের অপেক্ষা কত বড়।

তারপর ইংরেজ গ্রাহকের সঙ্গে কি ব্যবহার করে, ইহা দেখিয়াও তাহাকে বড় বলিয়া মনে হয়। গ্রাহকের নিকট হইতে সে টাকা চায়, কিন্তু খামাকা তাকে হয়রাণ বা নষ্ট করিতে চাহে না। কারো কাছে ইংরেজ টাকা পাবে, সে ব্যক্তি টাকা দিতেছে না; ইংরেজ দেখে—তার দিবার শক্তি আছে কি না। যদি থাকে, আর সে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তবে নালিশ করিয়া করিয়া তাকে নাস্তানাবুদ করিতে চাহিবে; কিন্তু যদি বুঝে তার দিবারই শক্তি নাই, তখন অনর্থক নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া, তার উচ্ছেদ করিতে কখনই উদ্যত হইবে না। সে টাকা চায়। সে গ্রাহককে উৎপীড়িত করিতে চায় না। ইংরেজ প্রত্যেক লোককেই একদিন তার গ্রাহক হইতে পারে, এ ভাবে দেখে। একদিন যে গ্রাহক ছিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে আর গ্রাহক রহিল না, কিন্তু দিন ফিরিলে সে আবার গ্রাহক হইতে তো পারে, এজন্য তাকে উৎপীড়ন বা তার সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বিবাদ করে না। নিজের লাভই সে চায়, নিজের লাভ হউক বা না হউক, পরের ক্ষতি করিতে পারিলেই তার বাহাদুরী হইল, এ ভাবটা সে পোষণ করে না। আর আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ভাবটা কত না প্রবল! এ কি ক্ষুদ্রতার, হীনচিত্ততার লক্ষণ নয়?

বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি ও নীতি দেখিয়া এই জন্যই সত্য সত্য ইংরেজের প্রতি ভক্তি হয়।

ইংরেজ পরার্থে এ সকল করে না। স্বার্থই তার লক্ষ্য। আমাদেরও লক্ষ্য তাই। কিন্তু স্বার্থটা থাকে কিসে আর যায় কিসে ইংরেজ অন্ততঃ এটী বেশ বুঝে; আমরা তাও যে বুঝি না। বিলাতে কিছুদিন থাকিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী *

প্রায় দুইশত বৎসরের পূর্ব্বেকার ফ্রান্সদেশের ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকা।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল, সূর্য্যাস্তের তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসানে নাগরিকেরা আপনাপন গৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছিল,—এমন সময় অদ্ভুতবেশ এক পান্থকে তাহাদের ক্ষুদ্র ডি—নগরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার কারণও ছিল; সেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন পান্থ কচিৎ দেখা যায়। লোকটি মধ্যমাকৃতি, মাংসল এবং বলিষ্ঠ; যৌবনের পূর্ণতেজ তাহার শরীরে দেদীপ্যমান। বয়স আনুমানিক ছ'চল্লিশ হইতে আট-চল্লিশের মধ্যে। পরিধানে তাহার বিবর্ণ পীতরঙের একটা ছিটের মোটা কোর্ত্তা,—পৃষ্ঠে একটা নূতন ভারি থলি এবং হস্তে গাঁইটযুক্ত একটা মোটা লাঠি। ছোট রূপার আংটা দ্বারা গলায় আঁটা কোর্ত্তাটির ফাঁক দিয়া তাহার বক্ষের রোমরাজি দেখা যাইতেছিল। রজ্জুর ন্যায় পাকানো একটা গলাবন্ধ তাহার গলায় ঝুলিতেছিল এবং জীর্ণ নীলবর্ণ টিকিনের ছেঁড়া পা-জামাটার ভিতর দিয়া তাহার হাঁটু বাহির হইয়া পড়িতেছিল। কর্ত্তিত ক্ষুদ্র কেশ, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, রৌদ্রদগ্ধ মুখনিসৃত স্বেদধারা এবং আজানুলম্বিত ধূলিরাশি—এ সকল মিশিয়া তাহার আকৃতিকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল।

কেহই তাহাকে চিনিত না। ডি—নগরের মধ্য দিয়া সে আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইতেছিল মাত্র। হয়ত সমস্তদিন তাহার পদব্রজেই কাটিয়াছে—তাহাকে এতই ধূলিধূসরিত ও ক্লান্ত দেখাইতেছিল। আহার্য্যও বোধ হয় তাহার সারাদিন জোটে নাই, তাহা না হইলে সহরে ঢুকিয়া 'গ্যালেণ্ডি বুলিভার্দ' ও বাজারের ফোয়ারা হইতে দুই দুইবার সে আকণ্ঠ জলপান করিবে কেন?

পয়টিভার্ট রাস্তার মোড়ে আসিয়া লোকটি নগরাধ্যক্ষের (Mayor) অফিসের দিকে ফিরিল। মিনিট পনের পরই সে অফিস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, দরজায় প্রহরীকে দেখিয়া টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল। প্রহরী প্রতিনমস্কার না করিয়া স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সে সময় ডি—তে জাকুইন ল্যাবারের ক্রুশচিহ্নিত বেশ ভাল একটা সরাই ছিল। গাইড্ সেনাদলের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং গ্রেনো-বলের "তিন গডল্ফিন" নামক সরাইয়ের অধ্যক্ষ সম্রাটানুগৃহীত অপর এক ল্যাবরের আত্মীয় বলিয়া ডি—তে জাকুইনের বেশ সম্মান ছিল। কাজেই সরাইখানার মর্য্যাদা (good name) রক্ষার প্রতি তার একটু বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

আগন্তুক দরজা ঠেলিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল তখন জাকুইন—সরাইয়ে প্রধান পাচক—গাড়োয়ানদের জন্য কড়াইতে

---

* লে মিজারেবল অবলম্বনে।

মাংস সিদ্ধ করিতেছিল। সমস্ত উনানগুলি জ্বলিতেছিল এবং অগ্নিকুণ্ডে আগুণ গমগম্ করিতেছিল। পার্শ্বের কক্ষে গাড়োয়ানেরা মনের স্ফূর্ত্তিতে গান ধরিয়াছিল।

"কি চান মশায়?"—দরজা খোলার শব্দে জাকুইন নূতন যাত্রী আসিয়াছে বুঝিয়া মাথা না তুলিয়াই তাহার অভ্যস্ত প্রশ্ন করিল।

আগন্তুক উত্তর করিল—"রাত্রিতে খাবার আর থাকবার সুবিধা হবে কি?"

"তা হ'তে পারে"—বলিয়া গৃহস্বামী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। অতিথির সে দীন বেশ দেখিয়া পাওনা গণ্ডা' আদায়ের সম্বন্ধে একটু সন্দিহান হইয়া সে শুধাইল—"খরচ পত্র আছে ত?"

আগন্তুক তাহার কোর্ত্তার জেব হইতে একটা ভারি থলি বাহির করিয়া বলিল "টাকা আমার আছে। আপনার সে চিন্তা নাই।" "আচ্ছা মশায় তবে বসুন" বলিয়া জাকুইন তাহাকে একখানা আসন দেখাইয়া দিল।

তখন লোকটি থলিটা জেবের মধ্যে পুরিয়া, পিঠ হইতে ভারি ব্যাগটা দরজার কাছে মাটির উপর নামাইয়া, রাখিয়া লাঠিটি হাতে করিয়া অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে একটা ছোট টুলের উপর বসিয়া পড়িয়া আগুণ পোহাইতে লাগিল। ডি—সহরটা পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত, অক্টোবর মাসে সন্ধ্যার সময় সেখানে বেশ একটু শীত পড়ে।

রান্নার কাজের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে জাকুইন আগন্তুকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিল।

"খাবার কি শীঘ্র পাব, মশায়?"

পথশ্রমে, আগন্তুক খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই কিয়ৎক্ষণ পরেই সে জিজ্ঞাসা করিল—"খাবার কি শীঘ্র পাব মশায়?"

"এখনি পাবেন।" বলিয়া গৃহস্বামী পুরাতন একখণ্ড খবরের কাগজের টুকরা লইয়া তাহাতে কি লিখিয়া একটা চাকরের হাতে দিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। ছোঁড়াটা সেই কাগজের টুকরা লইয়া নগরাধ্যক্ষের বাটীর দিকে ছুটিয়া গেল। আগন্তুক এ সকলের কিছু লক্ষ্য করে নাই; সে পিছন ফিরিয়া আগুণ পোহাইতেছিল, আর কেবলি খাবারের তাগাদা দিতেছিল। খানিকক্ষণ পরেই ছোঁড়াটা জবাব লইয়া ফিরিল। তাহাতে একটু গোলের কথা ছিল। সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গৃহস্বামী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তার পর, মন স্থির করিয়া আগন্তুকের কাছে গিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"মশায়, এখানে আমি আপনাকে স্থান দিতে পারি না।"

লোকটা তখন কি যেন একটা সুখের ঘোরে মগ্ন ছিল; সহসা সন্ত্রস্ত হইয়া সে ফিরিয়া বসিল।—

"বলেন কি মশায়? আপনি কি ভাবেন আমি আপনাকে ফাঁকি দিব? খরচার টাকা যদি আগামই চান, না হয় দিচ্ছি। আমার কাছে টাকা আছে।"

"কথাটা ঠিক তা নয়।"

"তবে কি?"

"টাকা আপনার আছে, তা জানি।"

"তবে ?"

"খালি ঘর আমার এমন একটাও এখন নাই যেখানে আপনি শুতে পারেন।'

লোকটি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিল—"ঘোড়শাল ত আছে ?"

"সেখানে ত জায়গা নেই।"

"কেন ?"

"ঘোড়াতে ঘর ভর্ত্তি হয়ে গেছে।"

"মাচানের কোণে আমাকে না হয় একটু স্থান আর বিছানার বদলে ২।১ আঁটি খড় দেবেন। তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।—আচ্ছা, সে যা হয়, খাওয়ার পর দেখা যাবে।"

"কিন্তু খাবারও আপনাকে আমি কিছু ত দিতে পার্‌ব না।"—গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর এবার কিছু দৃঢ়তাব্যঞ্জক। আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইল।—

"কি পাগলের মত বলছেন ? ক্ষুধায় আমি মারা যাচ্ছি,—আর আপনি কি না বলেন যে খাবার দিতে পার্‌ব না! সূর্য্যোদয় থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ পথ হেঁটে আসছি, তা জানেন ?—দাম যখন আমি দিচ্ছি তখন খাবার আপনার দিতেই হবে।"

"খাবার আমার নেই।"

"সেই কি রকম? –ও সব গুলা কি ?"—বলিয়া সে পাত্রস্থ মাংস প্রভৃতির প্রতি চাহিল।

"ওসব ফরমাইসী।"

"কাদের ?"

"গাড়োয়ানদের।"

"তারা ক'জন আছে ?"

"বার জন।"

"বিলক্ষণ! যা রয়েছে ও ত অন্ততঃ কুড়ি জনের খোরাক।"

আগন্তুক পুনরায় চাপিয়া বসিল। স্থির স্বরে বলিল—"আমি সরাইখানায় এসেছি; আমি ক্ষুধার্ত্ত;—খাবার না পেলে এখান থেকে আমি এক পাও নড়ব না।"

গৃহস্বামী তখন মুখ নীচু করিয়া কঠোর স্বরে তাহার কাণে কাণে বলিল—"এখান থেকে চলে যাও।"

আগন্তুক ছড়ির অগ্রভাগ দিয়া আপন মনে অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে ইতস্ততঃ উল্‌টাইয়া দিতেছিল। সে গম্ভীর স্বরে চমকিত হইয়া সে কি বলিতে যাইতেছিল, গৃহস্বামী তাহাতে বাধা দিয়া পূর্ব্ববৎ মৃদু অথচ স্থির স্বরে বলিল—"আর ভাঁড়াভাড়িতে কাজ নেই। তুমি কে, তোমার কি বৃত্তান্ত সবই আমি জানি। তোমার নাম জীন ভ্যালজিন। তোমাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাই পুলিস অফিসে লোক পাঠিয়েছিলাম। পড়তে পার কি ?—এই দেখ তারা কি লিখেছে"—বলিয়া সে কাগজের টুকরাটি আগন্তুকের হাতে দিয়া বলিল—"আমি সবারই সঙ্গে ভদ্রব্যবহার করে থাকি, তাই ভদ্রভাবেই বল্‌ছি—তুমি অন্য আশ্রয় দেখ।"

লোকটি আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া ভূমি হইতে আপনার ব্যাগটি উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অপমানিত দীন জীন পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকা সমূহের পার্শ্ব দিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে চলিতে লাগিল—একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল না;—চাহিলে, দেখিতে পাইত—

কলবাস ক্রুশের অধিবাসী তাহার অতিথিবৃন্দ এবং রাস্তার লোকদের লইয়া সরাইখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আগ্রহসহকারে কি সব কথা বলিতেছে; এবং সমবেত জনমণ্ডলীর উৎকণ্ঠা-জড়িত ও ভীতিবিহ্বল মুখ দেখিয়া সহজেই সে অনুমান করিতে পারিত যে সমস্ত সহরে তাহার আগমনবার্ত্তা অচিরেই একটা আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিবে। তাহার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে সে ইহার কিছুই দেখিতেছিল না। নির্য্যাতিত মানব পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহে না, কারণ সে জানে দুর্ভাগ্য অনুক্ষণ তাহার অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে

এই ভাবে অনেকক্ষণ অজানা পথে পথে সে ঘুরিল। দুঃখের সময় শ্রান্তির কথা তত মনে আসে না—তাহারও তাহাই হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ কতক্ষণ যুঝিতে পারে? সহসা সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল; তার উপর, রাত্রিও বেশী হইতেছিল—কাজেই সে একটা আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সহরের বড় সরাইখানার দ্বার ত তাহার কাছে রুদ্ধ—একটা তাড়িখানা বা নিকৃষ্ট কোন স্থানেও একটু আশ্রয় পাইলে যে সে বাঁচে! রাস্তার অপর পার্শ্বে একটা আলো দেখিয়া জীন সেইদিকে অগ্রসর হইল। সেটা একটা মদের দোকান—তাহার শিরোদেশস্থ লোহার শিক হইতে একটা দেবদারুর ডাল গোধূলির আলোকে যেন আকাশ গাত্রে দুলিতেছিল।—জানালার বাতায়ন উন্মুক্ত ছিল—পথ হইতে জীন দেখিল—এখানে একটা টেবিলকে ঘিরিয়া বসিয়া কতকগুলা লোক মদ খাইতেছে; ওখানে আগুণের উপর, লোহার শিক হইতে ঝোলান একটা কড়াইতে কি সিদ্ধ হইতেছে; একটু দূরে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া গৃহস্বামী আগুণ পোহাইতেছে। বুভুক্ষু জীন এ দৃশ্যে লুব্ধ হইল; তবু সদর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে তার সাহসে কুলাইল না; পার্শ্বে সারকুড়ের দিকে যে আর একটা দরজা ছিল সেখানে যাইয়া, কি ভাবিয়া একটু থামিল; তারপর, সন্তর্পণে খিল খুলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল।

"কে তুমি?"

"আমি পথিক। রাত্রিটার মত খাবার ও থাকবার স্থানের প্রার্থী।"

"বেশ, এস। এখানে তা দুইই পাবে।"

ভিতরে আসিয়া আগন্তুক (এখন হইতে আমরা তাহাকে জীন নামেই সম্বোধন করিব) পিঠের থলিটি নামাইয়া একটা কেদারায় বসিয়া পড়িল। মদ্যপায়ীরা ঔৎসুক্যের সহিত তাহার রকম সকম লক্ষ্য করিতেছিল। গৃহস্বামী বলিল—"ওই মাংস ফুট্‌ছে। এস ভাই আগুণের কাছে বসে শরীরটাকে একটু গরম করে নাও।"

সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া জীনের পা দু'টা ফুলিয়া উঠিয়াছিল—অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে পা দু'টাকে ছড়াইয়া দিয়া সে একটু আরাম অনুভব করিল। উনানের উপর কড়াই হইতে একটা মধুর গন্ধ আসিতেছিল। তাহার পাটল মুখের উপর কি যেন একটা আরামের আবেশ ধীরে ধীরে ছাইতেছিল; অবশ্য দুঃখে কষ্টে মানুষের মুখে স্বাভাবিক যে একটা করুণ ভাব আসে তাহাও তাহার

সহিত মিশ্রিত ছিল। সে মুখাবয়ব দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পব্যঞ্জক অথচ দীনতাপূর্ণ,—একটু অদ্ভুত রকমের;—আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহা করুণ কিন্তু ক্রমশঃই কঠোর ও পরুষ বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে; ভ্রূর নিম্নে তাহার প্রোজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় গোধূলিতে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিত। সমবেত লোকগুলির মধ্যে একটী ধীবব ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিনই প্রাতে পথে কোন একস্থানে তাহার সহিত জীনের দেখা হয়। ধীবর ঘোটকারোহণে আসিতেছিল; ক্লান্ত জীন তাহাকে তাহার ঘোটকের উপর তুলিয়া লইতে বলায় ভীত হইয়া, সে বরং আরও জোরে ঘোড়া টাইয়া তাহার কাছ হইতে পলাইয়া আসে। এই লোকটা আধঘণ্টা পূর্ব্বে ল্যাবারের সরাইখানায় ঘোড়া রাখিতে যায় এবং সেখানে আগন্তুকের সম্বন্ধে নানা আলোচনার মধ্যে প্রাতঃকালের এ ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়া আসে। জীনকে এখানে দেখিয়া সে ইসারা করিয়া গৃহস্বামীকে ডাকিল; দুইজনে চুপিচুপি কি পরামর্শ হইল। জীন তখন আপন চিন্তায় তন্ময় হইয়া ছিল।

সহসা পৃষ্ঠদেশে কাহার কঠিন হস্তস্পর্শে জীন চকিত হইয়া উঠিল।

"—দেখ, এখান থেকে তোমার অন্যত্র যেতে হচ্ছে।"

মুখ ফিরাইয়া ধীর স্বরে সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি জান, দেখ্ছি!"

"হাঁ, জানি।"

"সে সরাইখানা থেকে আমি তাড়িত হয়েছি।"

"এখান থেকেও হবে।

"তবে কোথায় এখন যাই?"

"যেথানে ঠাঁই পাও।"

নিঃশব্দে আপন ব্যাগ ও লাঠি লইয়া জীন উঠিয়া পড়িল। কতকগুলা পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলে মেয়ে 'কলবাস ক্রশ' হইতে তাহার পিছু লইয়াছিল, এখন পথে বাহির হইতেই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভীষণ মুখ করিয়া জীন সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল, ছেলের দল অমনি বেগতিক দেখিয়া, পাখীর ঝাঁকের মত, নিমেষে চম্পট দিল।

জীন সম্মুখদিকেই চলিতে লাগিল। হায়, বুভুক্ষু আশ্রয়হীন সমাজ-বিচ্যুত দুর্ভাগা কোথায় সে যাইবে? কোথায় তার আশ্রয়?

(ক্রমশঃ)

রহস্য

দূরে সে মিলায় যত, ধাই তার পানে তত,
এমনি রহস্য-ঘেরা মানব-জীবন;
কাছে আসে যেই দিন—ব্যর্থ সে, বৈচিত্র্যহীন,
তবু, দূরে, তারি পানে পুনঃ ছোটে মন!

শ্রীসুধীর চন্দ্র মজুমদার।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

পঞ্চদশ অধ্যায়

নগর-কীর্ত্তন ও কাজীদমন

রাত্রিকালে রুদ্ধদ্বার গৃহে ভক্তগণ সহ গৌর সংকীর্ত্তন করিতেন—ইচ্ছা থাকিলেও সকলে তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু দিবাভাগে দলে দলে লোক নানাবিধ উপায়ন সহ গৌরের দর্শনার্থ উপস্থিত হইত। গৌর সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তির উপদেশ দিতেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"

এই মন্ত্র জপ করিতে সকলকেই উপদেশ দিয়া গৌর কহিতেন,—"তোমরা দশ পাঁচ জনে মিলিয়া স্বীয় দ্বারে বসিয়া হাততালি দিতে দিতে কীর্ত্তন করিবে

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'

স্বামিস্ত্রী পিতাপুত্র মিলিয়া ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর।" গৌরের উপদেশ-মত পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন আরব্ধ হইল। ঘরে ঘরে দুর্গোৎসবের সময় ব্যবহারার্থ যে সমস্ত মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ ছিল, কীর্ত্তনের সময় তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল।

হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥

সমগ্র নবদ্বীপ কীর্ত্তনের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। একদিন নবদ্বীপের কাজী নগরভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মান্ধ কাজী কীর্ত্তনকারিগণকে ধরিয়া আনিবার জন্য অনুচরগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। নাগরিকগণ ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। তদবধি কাজী প্রত্যহ নগরে বহির্গত হইয়া যেখানে কীর্ত্তন শুনিতে পাইতেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং জোর করিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। বৈষ্ণবদ্বেষিগণ পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ পরিহাস করিতে লাগিলেন। একদিন বহুসংখ্যক লোক গৌরের নিকট গমন করতঃ কাজীর অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ভক্তের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া গৌরের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি নাগরিকগণকে কহিলেন,"যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়া মনের সুখে কীর্ত্তন আরম্ভ কর। আজি সমগ্র নবদ্বীপে আমি কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব, কাজীর

ক্ষমতা থাকে, তাহার প্রতীকার করুক। আজ সন্ধ্যাকালে যেন নবদ্বীপের যাবতীয় গৃহ আলোকমালায় বিভূষিত হয় এবং সকলেই যেন আমার সহিত কীর্ত্তনে বহির্গত হয়।” ভক্তগণ মহোল্লাসে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালে গৌর কীর্ত্তনকারিগণকে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া অদ্বৈত ও শ্রীবাসকে দুই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দান করিলেন এবং নিত্যানন্দ সহ স্বয়ং তৃতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক মশাল হস্তে রাস্তায় বাহির হইল। দীপালোক-সমুজ্জ্বল নবদ্বীপ তখন স্বর্গীয় শোভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। প্রকাশ্য রাজপথে গৌর ও তদীয় ভক্তগণের প্রেমপুলকোজ্জ্বল কান্তি ও নৃত্য দর্শন করিয়া সমগ্র নবদ্বীপ বিমোহিত হইল; কাজীর ভয় আর রহিল না। লক্ষ কণ্ঠের হরিধ্বনি আকাশমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

“তুয়া মন লাগহুঁ রে, শারঙ্গধর,
তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥”

গায়িতে গায়িতে ভক্তগণ গৌরচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইলেন। গৌর বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল জনসঙ্ঘ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবদ্বেষিগণ সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

জনকোলাহল দূর হইতে কাজীর কর্ণে পৌঁছিল। কাজী ভৃত্যমুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। জন-কোলাহল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সেই বিপুল জনশ্রেণী অবশেষে কাজীর দ্বারে সমাগত হইল। কাজী গৃহমধ্যে পলায়ন করিলেন। উন্মত্ত নাগরিকগণ কাজীর পুষ্পোদ্যান ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। গৌর কাজীর দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইয়া জনৈক ভক্ত লোক দ্বারা কাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজী বাহিরে আসিয়া সসম্মানে গৌরকে নমস্কার করিলেন। গৌর তাঁহাকে সম্মানের সহিত নিজ পার্শ্বে বসাইয়া পরিহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—“অভ্যাগত আমাকে দেখিয়া তুমি পলায়ন করিলে, এ তোমার কিরূপ ধর্ম্ম বল দেখি?”

কাজী কহিলেন,—“তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ দেখিয়া তোমাকে শান্ত করিবার জন্য আমি লুকাইয়াছিলাম।”

“গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হইতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥”

তখন বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে নানা কথার আলোচনা হইল। গৌর কহিলেন—“দেখুন, গাভীর দুগ্ধ পান করি বলিয়া তাহাকে মাতা বলা যায়; বৃষ হইতে অন্নের উদ্ভব হয় বলিয়া বৃষ পিতার ন্যায় পূজ্য। আপনারা এতাদৃশ গাভী ও বৃষ সংহার করিয়া ভক্ষণ করেন কেন, বলুন দেখি?”

কাজী কহিলেন—“শাস্ত্রে প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ এই দ্বিবিধমার্গের উল্লেখ আছে। নিবৃত্তিমার্গাবলম্বিগণের পক্ষে জীব-বধ নিষিদ্ধ। প্রবৃত্তিমার্গে গোবধে নিষেধ নাই। কেন, তোমাদের বেদেও ত গোবধের বিধি আছে।”

গৌর কহিলেন—"বেদে গোবধ নিষিদ্ধ। তবে প্রাচীন ঋষিগণ যজ্ঞার্থে বৃদ্ধ গো বধ করিতেন বটে। কিন্তু যজ্ঞান্তে তাঁহারা নিহত স্থবির বৃষদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া নব-যৌবন দান করিতেন। তাহাতে তাহাদের উপকারই হইত।"

তখন কাজী পরাস্ত হইয়া কহিলেন,—

"তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥"

তখন কাজীকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মামা, তোমার আদেশে নবদ্বীপে কত মৃদঙ্গ ভঙ্গ হইয়াছে, তোমার অনুচরগণ কতদিন জোর করিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিয়াছে, আজি তুমি কীর্ত্তনে বাধা দিতেছ না, ইহার কারণ কি বল দেখি?"

তখন কাজী বলিতে লাগিলেন—"সে বড় নিগূঢ় কথা। যে দিন আমি হিন্দুর গৃহে গৃহে মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিয়া কীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছিলাম, সেই দিন রাত্রিতে এক ভয়ঙ্কর নরসিংহ-মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই নরসিংহ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে লম্ফ দিয়া আমার দেহোপরি উপবিষ্ট হইয়া অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিল এবং আমার বক্ষঃস্থলে নখ প্রদান করিয়া বলিতে লাগিল,—'যেমন মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছ, আমিও তেমনি তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিব। তুমি আমার কীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছ—আমি তোমাকে নাশ করিব।' আমি ভয়ে চক্ষু মুদিত করিলাম। আমাকে ভীত দেখিয়া সিংহ কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন,—'তোমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই আমি আবির্ভূত হইয়াছি। বৈষ্ণবগণের উপর তোমার উৎপাত মাত্রাধিক হয় নাই, তাই তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে পুনরায় ওরূপ আচরণ কর, তবে সবংশে নিহত হইবে!' এই দেখ, সিংহের নখচিহ্ন এখনও আমার বুকে রহিয়াছে।" কাজী তখন বক্ষাবরণ উন্মোচিত করিয়া নখচিহ্ন দেখাইলেন; দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

কাজী পুনরায় কহিতে লাগিলেন "আমি এ কথা কাহাকেও বলি নাই। একদিন এক ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, সংকীর্ত্তন নিষেধ করিতে গিয়া হঠাৎ কোথা হইতে অগ্নির উল্কা মুখে লাগিয়া তাহার মুখ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি কীর্ত্তন-নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যাহার করিলাম। তখন দলে দলে মুসলমান আমার নিকট আসিয়া বলিল,—'হিন্দুগণ বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে—তুমি যদি তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব না কর, তাহা হইলে পাতশা তোমার দণ্ডবিধান করিবেন।' আমি বলিয়া কহিয়া সকলকে ঘরে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু অচিরকাল পরেই কয়েক জন বৈষ্ণবদ্বেষী হিন্দু আসিয়া আমাকে বলিল, 'নিমাই পণ্ডিতের অত্যাচারে আমরা রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে পারি না। যত পাষণ্ড মিলিয়া হিন্দুধর্ম্ম নাশ করিতেছে। তুমি নিমাইকে ডাকাইয়া ইহার প্রতিবিধান কর।' আমি সকলকে মিষ্টবাক্যে বিদায় করিলাম। আমি বুঝিতে পারিয়াছি তুমি ঈশ্বর—নারায়ণ।" গৌর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কাজী! তুমি পুণ্যবান্, তাই শ্রীকৃষ্ণে তোমার ভক্তি হইয়াছে।" গৌরের সুন্দর-বচনে কাজীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে

লাগিল। গৌরের চরণ ধারণ করিয়া তিনি নানারূপ স্তব করিতে লাগিলেন। গৌর তখন কাজীকে কহিলেন, "তোমার নিকট আমার এক অনুরোধ আছে। নদীয়ায় যেন সংকীর্ত্তনের প্রতিবন্ধকতা না হয়।"

কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন বাধিতে॥

বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে "হরি" "হরি" করিয়া উঠিলেন। তখন কাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভক্তগণ সহ গৌর বহির্গত হইলেন

ষোড়শ অধ্যায়

লীলা

শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন হইত। গৌরের অনুমতি বিনা কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। শ্রীবাসের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর একদিন কীর্ত্তন শুনিবার ও ভক্তগণের নৃত্য দেখিবার সাধ হইল। নৃত্য ও কীর্ত্তন আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীবাস পরিবারবর্গকে গৃহান্তরে যাইবার আদেশ করিতেন। ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় শ্রীবাসের শাশুড়ী একদিন পূর্ব্বাহ্নে এক ডোলের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিলেন। যথাকালে নৃত্য ও কীর্ত্তন আরব্ধ হইল। কিন্তু নাচিতে নাচিতে গৌর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "আজি নৃত্যে আমার তাদৃশ আনন্দ হইতেছে না কেন? বোধ হয়, কে কোথায় লুকাইয়া আছে।" শ্রীবাস অঙ্গনোপরিস্থ সমস্ত ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কই, বাজে কেহই ত নাই।" গৌর তখন পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ক্ষণিক পরেই বিরত হইয়া বলিলেন,—"না, আজি নৃত্যে সুখ নাই; কৃষ্ণ আজি আমার প্রতি বিরূপ।" গৌরের সুখের ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া শ্রীবাস পরম উদ্বিগ্নচিত্তে তন্ন তন্ন করিয়া ঘর খুঁজিতে লাগিলেন, পরিশেষে স্বীয় শাশুড়ীকে ডোলের পশ্চাতে লুক্কায়িত দেখিতে পাইয়া অন্য একজন দ্বারা সবলে তাঁহাকে বাহিরে আনয়ন করাইলেন। তখন উল্লসিতচিত্তে গৌর নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় গৌর কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না। বরং ভক্ত দেখিলেই সসম্ভ্রমে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। ইহাতে ভক্তগণ মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হইতেন। গৌর যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, তখন মনের সাধে তাঁহারা তাঁহার চরণ-সেবা করিতেন। একদিন নৃত্য করিতে করিতে গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, অদ্বৈত তাঁহার চরণধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। মূর্চ্ছান্তে গৌর পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন—কিন্তু অচিরেই নৃত্য হইতে বিরত হইয়া বলিলেন,—"কেন আজ কৃষ্ণ আমার চিত্তে প্রকাশিত হইতেছেন না? কাহার অপরাধে আমার মনে উল্লাস আসিতেছে না? কোন্ চোরে আমার কি চুরি করিয়াছে? কেহ কি আমার পদধূলি লইয়াছে? সত্য করিয়া বল।" গৌরের বচন শুনিয়া ভক্তগণ ভয়ে মৌন হইয়া রহিলেন। অবশেষে অদ্বৈতাচার্য্য যুক্তকরে কহিলেন,—"লোভের বস্তু প্রকাশ্যে না পাইলেই লোকে চুরি করে। আমি চুরি করিয়াছি—আমায় ক্ষমা কর। তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে আর তোমার পদধূলি লইব না।"

গৌর বিষম রুষ্ট হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন,—"সকল সংসার সংহার করিয়াও তোমার মনে শান্তি নাই; আমিই কেবল অবশিষ্ট আছি, আমাকেও সংহার করিয়া তুমি সুখে থাক। যে তোমার নিকট কৃতার্থ হইতে আসে, তাহার চরণ ধরিয়া তুমি তাহার সর্ব্বনাশ কর। মথুরায় এক বৈষ্ণবের চরণধূলি লইয়া তাহার যাবতীয় শক্তি তুমি হরণ করিয়াছিলে। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ভক্তির অধিকারী হইয়াও তুমি মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির ভক্তির প্রতি লোভ সংবরণ করিতে পার না। ক্ষুদ্রের প্রতি তোমার বিন্দুমাত্রও করুণা নাই। তুমি মহাচোর, মহাদস্যু; তুমি আমার প্রেম-সুখ হরণ করিয়াছ। আমি কিন্তু আজ চোরের উপর বাট্‌পাড়ী করিব।" এই বলিয়া সবলে অদ্বৈতকে ধরিয়া গৌর আপনার মস্তকে তাঁহার চরণ স্থাপন করিলেন। তখন কীর্ত্তন ও নৃত্যে শ্রীবাস-গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

একদিন গৌর নগরভ্রমণে বহির্গত হইলে পথিমধ্যে কয়েকজন পাষণ্ডীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পাষণ্ডিগণ কহিল, "নিমাই পণ্ডিত, নিশাভাগে তুমি লুকাইয়া কীর্ত্তন কর; লোকে দেখিতে পায় না—কিন্তু অনুক্ষণ তোমায় অভিসম্পাত করে। তাহাদের শাপ ফলিয়াছে। তোমাকে ধরিয়া লইবার জন্য সত্বরই রাজার লোক আসিতেছে।" গৌর নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, "রাজদর্শন করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে আমার আছে। অল্পবয়সে সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বালক-বোধে কেহই আমাকে গ্রাহ্য করে না, কেহই আমার খোঁজ করে না। রাজা আমাকে খুঁজিতেছেন—এ সংবাদে আমি প্রীত হইলাম।"

পাষণ্ডিগণ কহিল,—"যবন রাজা পাণ্ডিত্যের ধার ধারে না।"

গৌর অবজ্ঞাভরে আর প্রত্যুত্তর না করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং সমাগত ভক্তগণকে কহিলেন,—"আজি পথে পাষণ্ড-সম্ভাষ হইয়াছে; সংকীর্ত্তন আরম্ভ কর; দুঃখ দূর হউক।"

নৃত্য আরম্ভ হইল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া গৌর বলিতে লাগিলেন—"কই, আজি ত প্রেমানুভব হইতেছে না। পাষণ্ডিসম্ভাষ হইয়াছে বলিয়াই কি আজ প্রেমের প্রকাশ হইতেছে না? অথবা তোমাদের নিকট আমার কিছু অপরাধ হইয়াছে?" তখন অদ্বৈতাচার্য্য ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন,—"প্রেম আসিবে কোথা হইতে? নাড়া সব শুষিয়া লইয়াছে। আমি প্রেম পাই না, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেম পান না, কিন্তু তিলি-মালীর সঙ্গে অনবরত প্রেম-বিলাস চলিতেছে। শ্রীবাস ও আমি কেহই তোমার প্রেমের অধিকারী হইলাম না, আর কোথা হইতে এক অবধূত আসিয়া তোমার প্রেমের ভাণ্ডারী হইয়া দাঁড়াইল। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতেছি, আমাকে প্রেমযোগ দান না করিলে আমি তোমার সকল প্রেম শুষিয়া লইব।"

গৌর কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না—কিন্তু ত্বরিতগমনে দ্বার উন্মোচন করিয়া গঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং "প্রেমহীন শরীর রাখিয়া কি কাজ" বলিয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন। গৌর কহিলেন—"কেন আমাকে টানিয়া তুলিলে?"

নিতাই কহিলেন, "মরিতে চাহ কেন?"

গৌর—তুমি ত সব জান।

নিতাই—প্রভু ক্ষমা কর। যাহাকে স্বহস্তে শাস্তি দিতে পার, তাহার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে চাও? ভৃত্য যদি অভিমানবশতঃ কিছু বলিয়া থাকে, তজ্জন্য প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া কি ভৃত্যের প্রাণদণ্ড করিবে?

বলিয়া নিত্যানন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। তখন গৌর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিলেন,—"আমার কথা কাহাকেও বলিও না; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, আমার সহিত তোমাদের দেখা হয় নাই। আমার আজ্ঞায় এই কথা বলিও। আজি আমি কোথাও লুকাইয়া থাকিব।" তখন নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া গৌর লুকাইয়া রহিলেন। এ দিকে ভক্তগণ প্রভুর সন্ধান না পাইয়া শোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈত মহা অপ্রতিভ হইয়া গৌর-বিরহে উপবাসী রহিলেন।

সমস্ত রাত্রি নন্দনাচার্য্যের গৃহে অতিবাহিত করিয়া প্রত্যুষে গৌর শ্রীবাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রীবাসের নিকট অদ্বৈতের মানসিক অবস্থার সংবাদ পাইয়া কৃপাপরবশ হইয়া গৌর অদ্বৈতের নিকট গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, অদ্বৈত মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত আছেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন "আচার্য্য! উঠিয়া দেখ, আমি আসিয়াছি।" আচার্য্য সংজ্ঞালাভ করিলেন। কিন্তু লজ্জায় তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। গৌর পুনরায় কহিলেন,—"আচার্য্য! কষ্ট করিও না, উঠিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন কর।" তখন

অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বোল মোরে সব প্রভু বাহ্য॥
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি॥
সভারে উত্তম দিয়া আছ দাস্য-ভাব।
মোরে দিয়াছ হ প্রভু, যত কিছু রাগ॥
লওয়াও আপনে দণ্ড করাহ আপনে।
মুখে এক বোল তুমি, কর আর মনে॥
প্রাণ, দেহ, ধন, মন, সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দেহ ঠাকুরালি তোর॥
হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥

তখন গৌর কহিলেন, "আচার্য্য! মহাপাত্র অপরাধ করিলে রাজা স্বহস্তে তাহার দণ্ডবিধান করেন। সকলের হর্ত্তা ও কর্ত্তা রাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও শিবকে সৃষ্টি ও সংহার করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকিলেও, তাঁহারা অপরাধ করিলে তাঁহাদিগের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। অপরাধ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ যাহার শাস্তিবিধান করেন, সে তাঁহার জন্ম জন্ম দাস। এই পরমতত্ত্ব আজি তোমাকে আমি কহিলাম। এখন গাত্রোত্থান করিয়া স্নান ও আরাধনাদি কর। তখন আচার্য্য হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া উঠিলেন এবং "সবই প্রভু তোমার ঠাকুরালি" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

একদিন গৌরের নাট্যাভিনয় করিবার ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা ব্যক্ত হইবামাত্র পরম ভক্ত বুদ্ধিমন্ত খান নাট্যের সাজসজ্জার আয়োজনের ভার গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বিস্তৃত অঙ্গন রঙ্গভূমিস্বরূপে

নিরূপিত হইল। অভিনয়ের আয়োজন সমস্ত শেষ হইলে গৌর বৈষ্ণবদিগকে কহিলেন, "আজি আমি প্রকৃতিরূপে নৃত্য করিব। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সে নৃত্য দেখিবার অধিকার নাই। ইন্দ্রিয়ধারণে যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারাই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবেন।" গৌরের লক্ষ্মীবেশে নৃত্য দর্শনাশায় ভক্তগণ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন; কিন্তু গৌরের কথায় সকলেই চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই আচার্য্য কহিলেন, "ইন্দ্রিয়-ধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমি এখনও লাভ করিতে পারি নাই; আমি রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিব না।" শ্রীবাস পণ্ডিত কহিলেন, "আমারও সেই কথা।" একে একে সকলেই বলিয়া উঠিলেন, 'আমারও ঐ কথা।" তখন গৌর হাসিয়া কহিলেন, "তোমরা না গেলে কাহাকে লইয়া নৃত্য হইবে? কিছু চিন্তা নাই; আজি সকলেই তোমরা মহাযোগেশ্বর হইবে; আমাকে দেখিয়া কেহই মুগ্ধ হইবে না।" অনন্তর ভক্তগণপরিবৃত হইয়া গৌর চন্দ্রশেখর আচার্য্যের অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। শচীদেবী পুত্রবধূসহ পুত্রের নৃত্য দেখিতে আগমন করিলেন। বৈষ্ণবগণের গৃহলক্ষ্মীগণ সকলেই শচীমাতার সহিত তথায় গমন করিলেন।

প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্য বিদূষকবেশে নৃত্য করিলেন। অনন্তর বৈকুণ্ঠের কোটাল-বেশে হরিদাস রঙ্গক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং

আরে আরে ভাই সব হও সাবধান,
নাচিবে লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ।

বলিয়া যষ্টিহস্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন নারদবেশে শ্রীবাস পণ্ডিত রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" নারদবেশী শ্রীবাস উত্তর করিলেন, "আমি নারদ; কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। তথায় শুনিলাম, কৃষ্ণ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাই এখানে আসিয়াছি।"

অতঃপর রুক্মিণীবেশে গৌর সভাস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই রূপ দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ হইলেন। করুণারসে শ্রোতৃবৃন্দকে প্লাবিত করিয়া গৌর কৃষ্ণোদ্দেশে লিখিত রুক্মিণীর পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন।—

শ্রুত্ব গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে,
নিবিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥"

হে ভুবনসুন্দর, তোমার গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিতে করিতে সেই গুণরাশি কর্ণরন্ধ্রযোগে হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জনগণের অঙ্গতাপ হরণ করিতে থাকে। তোমার রূপ দেখিয়া যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাহাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় "আমাদিগের অখিলার্থ লাভ হইল" মনে করে। হে অচ্যুত! আমার চিত্তও তোমার রূপগুণের কাহিনী শ্রবণ করিয়া লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে। আমি তোমার শরণাগত হইলাম আমাকে তোমার দাসী করিয়া লও। তোমার দ্রব্য তুমি গ্রহণ কর, শৃগাল শিশুপাল যেন সিংহের ভাগ গ্রাস না করে।"

রুক্মিণীর আবেশে রুক্মিণীর মানসিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গৌর তাঁহার পাঠ অভিনয় করিয়া রঙ্গভূমি ত্যাগ করিলেন। অনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী পাঠ অভিনীত

হইবার পরে আত্মশক্তিবেশে গৌর-পুনরায় রঙ্গক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন বড়াইর বেশে নিত্যানন্দ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। জগজ্জননীভাবে আবিষ্ট হইয়া গৌর নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনুচরগণ সময়োচিত গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। হঠাৎ নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। গৌর খট্টার উপর উপবেশন করিয়া তদুপরিস্থ গোপীনাথ-বিগ্রহ অঙ্কে ধারণ করিলেন। ভক্তগণ তখন স্তব পড়িতে লাগিলেন। অচিরে রজনী প্রভাত হইল।

গৌর যখন প্রকৃতিস্থ থাকিতেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্যকে বিশেষ সম্মান করিতেন। অদ্বৈত ইহাতে মনে মনে বড় অসুখী ছিলেন। একদিন আচার্য্য মনে মনে চিন্তা করিলেন, "প্রভু আমাকে বড়ই বিড়ম্বিত করিতেছেন; স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া তিনি বলপূর্ব্বক আমার চরণ ধারণ করেন। শারীরিক বলে আমি তাঁহার সমকক্ষ নহি, কিন্তু ভক্তিবল আমার আছে। দেখি, ভক্তির জোরে তাঁহার মায়া আমি চূর্ণ করিতে পারি কি না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য একদিন হরিদাস ঠাকুরের সহিত শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং তথায় স্বীয় আবাসে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ পাঠ ও ভক্তির উপর জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। হরিদাস দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া গৌর অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তখন জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গৌর জিজ্ঞাসিলেন, "নাড়া, বল ত, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কে বড়?" অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "জ্ঞান ত সর্ব্বকালেই গরীয়ান্। যাহার জ্ঞান নাই, ভক্তিতে তার কি করিবে?" অদ্বৈতের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই গৌর তাঁহাকে সবলে ধারণ করিয়া অঙ্গনে টানিয়া আনিলেন, এবং নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতগৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গৌর রোষকম্পিতস্বরে কহিলেন, "এই জন্যই কি আমাকে প্রকাশিত করিয়াছ? আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে টানিয়া আনিয়া এখন জ্ঞানব্যাখ্যা হচ্ছে?" গৌরের প্রহারে কৃতার্থ হইয়া অদ্বৈত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন, 'কেমন, বড় যে আমায় স্তুতি করিয়াছিলে, তাহা এখন কোথায় গেল? আমি দুর্ব্বাসা নহি যে, আমার অবশেষায় অঙ্গে মাখিবে; আমি ভৃগু নহি যে, আমার পদধূলি অঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীবৎসলাঞ্ছন হইবে।

'মোর নাম অদ্বৈত, তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর গ্রাস।'

শাস্তিবিধানই যদি করিলে, তবে এখন পদছায়া দেও।" এই বলিয়া আচার্য্য গৌরের পদ মস্তকে ধারণ করিলেন। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গৌর রোদন করিতে লাগিলেন।

একদিন গৌর ও নিতাই বসিয়া আছেন, এমন সময় মুরারি গুপ্ত আসিয়া প্রথমে গৌরকে তৎপরে নিতাইকে প্রণাম করিলেন। তজ্জন্য গৌর মুকুন্দকে তিরস্কার করিলে মুকুন্দ কহিলেন, "তুমি যাহা করাও, আমি তাই করি, আমার দোষ কি?" তখন গৌর কহিলেন,

"কাল জানিতে পারিবে।" সেই রাত্রিতে মুরারি স্বপ্নে দেখিলেন, "মল্লবেশে নিত্যানন্দ ধাবমান, তাঁহার মস্তকে শেষ নাগ ফণা উত্তোলন করিয়া গর্জ্জন করিতেছেন, হস্তে হল ও মুষল শোভা পাইতেছে। শিখি-পুচ্ছশোভিত বিশ্বম্ভর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। মুরারিকে দর্শন করিয়া গৌর কহিলেন, "মুরারি! নিতাই জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ।" স্বপ্নভঙ্গে মুরারি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যুষে গৌর-নিতাই সমীপে গমন করিয়া অগ্রে নিতাইকে প্রণাম করিলেন। প্রীত হইয়া গৌর মুরারিকে অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। আনন্দে বিহ্বল মুরারি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন ভোজনে বসিলেন, তখন পত্নীপ্রদত্ত যাবতীয় অন্ন ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া কেবল "খাও খাও" বলিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গৌর মুরারির গৃহে গমন করিয়া কহিলেন, "মুরারি! কাল তোমার অন্ন খাইয়া আমার অজীর্ণ হইয়াছে। তোমার জল খাইয়া সেই অজীর্ণ দূর করিতে হইবে।" এই বলিয়া মুরারির জলপাত্র লইয়া গৌর জলপান করিলেন। মুরারি রোদন করিয়া উঠিলেন।

একদিন শ্রীবাসগৃহে গৌর "গরুড়, গরুড়" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। ঠিক সময়ে আবিষ্ট ভাবে মুরারিও তথায় প্রবেশ করিলেন এবং "আমিই তোমার গরুড়" বলিয়া যুক্তকরে গৌর-সমীপে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৌর মুরারির স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করিতে-ছিলেন। ভাগবতের অধ্যাপক বলিয়া দেবানন্দের যথেষ্ট খ্যাতি থাকিলেও, ভক্তির অভাবে ভাগবতের গূঢ়ার্থ তাঁহার বোধগম্য হইত না। গৌর নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া দেবানন্দকে ভাগবত পাঠ করিতে শুনিলেন। শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ও লোকটা কোনও জন্মেই ভাগবতের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, ভাগবতপাঠে উহার অধিকার নাই, আমি উহার পুঁথি ছিঁড়িয়া ফেলিব।" বলিয়া ক্রোধবশে দেবানন্দের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সঙ্গিগণ বহু কষ্টে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।

শ্রীবাসের সহিত গৌর নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। পথিপার্শ্বস্থ মদের দোকান হইতে গন্ধ আসিয়া তাঁহার নাসিকায় প্রবিষ্ট হইল। মদ্যগন্ধে বারুণী স্মরণ হওয়ায় গৌর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং হুঙ্কার করিতে করিতে দোকানের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীবাস চরণে ধরিয়া নিষেধ করিলেন—কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া গৌর কহিলেন,—"আমারও কি বিধি-নিষেধ আছে?" শ্রীবাস কহিলেন,—"জগতের পিতা হইয়া তুমি যদি ধর্ম্মনাশ কর, তবে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? তোমার লীলা কেহ বুঝিতে পারিবে না, অনেকে এই মদের দোকানে প্রবেশ জন্য তোমার নিন্দা করিয়া নাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি যদি এই দোকানে প্রবেশ কর, আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।" গৌর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যাইতে যাইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেবানন্দকে দেখিয়া শ্রীবাসের প্রতি তাহার ও তদীয় শিষ্যগণের ব্যবহার

গৌরের স্মরণ হইল। তিনি কহিলেন,—"ওহে দেবানন্দ, তুমি না কি ভাগবত পড়াও, তবে কোন্ অপরাধে মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতকে শিষ্য দ্বারা টানিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছিলে?" দেবানন্দ লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন।

বিশ্বরূপ যখন সংসার ত্যাগ করিয়া যান, তখন মর্ম্মান্তিক মনোদুঃখে শচীমাতা বলিয়াছিলেন,—"অদ্বৈতাচার্য্যই আমার পুত্রকে গৃহের বাহির করিয়াছিলেন।" গয়া হইতে প্রত্যাগমনান্তে গৌর যখন সংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়িলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া নিরবধি অদ্বৈতাচার্য্যের সহবাসে কাল কাটাইতে লাগিলেন, তখন মাতা আবার বলিয়াছিলেন,—"চন্দ্রের মত আমার এক পুত্রকে আমার কোলছাড়া করিয়াও আচার্য্যের তৃপ্তি হয় নাই। বিশ্বম্ভরকেও ঘরের বাহির করিবার আয়োজন করিতেছেন। অনাথিনী আমার উপর কাহারও দয়া হয় না। জগতের সকলের কাছেই আচার্য্য "অদ্বৈত", কেবল আমারই নিকট দ্বৈত মায়া।"

একদিন আবিষ্টভাবে গৌর বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং সকলকেই অভিমত বর দান করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীবাস কহিলেন, "প্রভু, আইকে ভক্তিদান কর।" গৌর কহিলেন,—"বৈষ্ণবের স্থানে যাঁহার অপরাধ আছে, তাঁহাকে আমি ভক্তি দান করিতে পারি না।" শ্রীবাস কহিলেন,—"যাঁহার পুণ্যগর্ভে তুমি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার ভক্তিযোগে অধিকার নাই, এমন কথা উচ্চারণ করিও না প্রভু! যদিই মাতার কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, তাহার খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ কর।" গৌর কহিলেন,—"বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি শুধু খণ্ডনের উপায় বলিতে পারি। অদ্বৈতের নিকট তাঁহার অপরাধ। অদ্বৈতের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার ক্ষমালাভ করিতে পারিলেই, তিনি প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবেন।" শুনিয়া অদ্বৈত ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন; বিশ্বম্ভরের জননী—যাবতীয় বৈষ্ণবের জননীস্বরূপিণী—শচী দেবীকে পদধূলি দানের কথায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। শচী দেবীর মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে আচার্য্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া শচী দেবী অপরাধমুক্ত হইলেন।

নবদ্বীপে এক পরমসাধু তপস্বী বাস করিতেন। কেবল মাত্র পয়ঃপান করিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন। গৌরের নৃত্য দেখিতে অভিলাষী হইয়া তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে ধরিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শ্রীবাস একদিন তাঁহাকে লইয়া গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। যথাসময়ে বিশ্বম্ভর নাচিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বিরত হইয়া কহিলেন,—"আজি কেন আমার প্রেমোদয় হইতেছে না? অনধিকারী কেহ কি লুকাইয়া আমার নৃত্য দেখিতেছে?" ভীত শ্রীবাস তখন সমস্ত ব্যক্ত করত ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া কহিলেন,—"এহেন নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীর কি তোমার নৃত্য দেখিবার অধিকার নাই প্রভু?"

শুনি ক্রোধাবেশে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ঝাট্ ঝাট্ বাড়ীর বাহির নিঞা কর॥

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি॥
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালে হেয় মোহোর শরণ যদি লয়।
সেহো মোর মুক্তি তার জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে সত্য বলিলুঁ বচন॥

তখন ভীত হইয়া ব্রহ্মচারী বাটীর বাহির হইয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"যাহা কিছু দেখিতে পাইলাম, সেই আমার ভাগ্য; যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার অনুরূপ শাস্তি পাইলাম। অদ্ভুত নৃত্য, অদ্ভুত ক্রন্দনও যেমন দেখিলাম, স্বীয় অপরাধানুরূপ তর্জ্জন গর্জ্জনও তেমনি দেখিয়াছি। আমি তাঁহার সেবক। যে দণ্ড তিনি বিধান করিবেন, তাহা নতশিরে আমি গ্রহণ করিব।" করুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র তাঁহার তদানীন্তন মানসিক ভাব জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার মস্তকে চরণার্পণ করিয়া কহিলেন,—"তপস্যা করিয়া অহঙ্কার করিও না। বিষ্ণুভক্তি সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ।" ব্রহ্মচারী সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জলপান

জল জীবদেহের একটি প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ্ দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, নানা পুষ্টিকর খাদ্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে এবং ইহাই উদ্ভিদ্দিগকে সজীব রাখিতেছে। প্রাণি-দেহের ভিতরের খবর লইলেও ইহাই দেখা যায়; এখানেও এক জলের প্রবাহই অবিরাম সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া প্রাণীদিগকে জীবিত রাখিতেছে। জলের প্রবাহ রোধ কর, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কার্য্যও রোধ হইয়া যাইবে। শুষ্ক বীজে জলের প্রবাহ থাকে না বলিয়া তাহাতে জীবনের লক্ষণও প্রকাশ পায় না। বীজ জলসিক্ত কর, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া জীবনের কার্য্য দেখাইতে থাকিবে। জীবাণুকে (microbes) প্রাণীর কোঠায় ফেলিব, কি উদ্ভিদের মধ্যে গণ্য করিব, জানি না; কিন্তু এই আণুবীক্ষণিক জীবগুলিকে জলই সজীব রাখে। জলবর্জ্জিত শীতল স্থানে রাখিলে জীবাণুর জীবনের ক্রিয়া লোপ পাইয়া যায়। এই অবস্থায় ইহারা বংশ বিস্তার করে না এবং চলাফেরাও করে না; কিন্তু পরে আর্দ্র-স্থানে লইয়া গেলেই জীবনের লক্ষণ দেখাইতে থাকে। শীত-প্রধান দেশের মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণীর জীবনেও এই প্রকার দেখা যায়। শীতকালে যখন সমগ্র জল বরফ হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়, মৎস্যগুলির দেহস্থ জলও

জমিয়া যায়। কাজেই এই অবস্থায় মৎস্যদেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা যায় না। তার পরে বরফ গলিতে আরম্ভ করিলেই মৎস্যগণও জীবন্ত হইয়া পড়ে

উদ্ভিদ্‌গণ শিকড় দিয়া জল শোষণ করে এবং তাহাই উর্দ্ধে উঠাইয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিচালন করে; কিন্তু প্রাণিগণ সাধারণতঃ মুখ দিয়া জল গ্রহণ করে এবং তাহাই নিম্নগামী হইয়া উদরস্থ হইলে নানা প্রক্রিয়ায় সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। অনেকের বিশ্বাস আছে, স্নানের সময় রোমকূপ দিয়া জল দেহপ্রবিষ্ট হয়, কিন্তু শারীরবিদ্‌গণ এই কথার অনুমোদন করেন না। শরীরে জল প্রবেশ করাইবার একমাত্র পথ আমাদের মুখ। নানাপ্রকার রোগে যখন আমাদের জলপান করিবার শক্তি লয় প্রাপ্ত হয়, তখন চিকিৎসকেরা চিন্তিত হইয়া পড়েন; এই অবস্থায় নানা কৃত্রিম উপায়ে দেহের চর্ম্ম ভেদ করিয়া জল প্রবেশ করাইতে হয়। আমরা নিশ্বাসের সহিত কিঞ্চিৎ জলীয় বাষ্প দেহস্থ করি সত্য, কিন্তু প্রাণীর নাসিকা কখনই জলপানের যন্ত্র নয়, কারণ প্রত্যেক প্রশ্বাসের সহিত প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়তই আমাদের দেহচ্যুত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ করিলে নাসিকাকে জলনির্গমনের পথই বলিতে হয়।

চিকিৎসাকালে ডাক্তারগণ প্রাণিশরীরে যে জল প্রবেশ করাইয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ লবণাক্ত করিয়া দেওয়া হয়। লবণ-জলই দেহ-রক্ষার উপযোগী। জীবন্ত ভেকের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিলে, ইহা কিছুক্ষণ বেশ তালে তালে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং জলে সিক্ত রাখিলে এই স্পন্দন দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। কিন্তু জল বিশুদ্ধ হইলে স্পন্দন কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; এই জন্য ভেকের হৃৎপিণ্ডের কার্য্য পরীক্ষা করার সময় তাঁহাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লবণ-জলে সিক্ত রাখা হয়। প্রাণীমাত্রেরই হৃৎপিণ্ড কোন এক প্রকার তরল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এই তরল পদার্থের অভাব হইলেই অনেক সময়ে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য লোপ পায় এবং প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, অকস্মাৎ রক্তপাতে প্রাণীর যে মৃত্যু হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের শূন্যতাই তাহার মূল কারণ। কাহারও হঠাৎ রক্ত ক্ষয় হইলে প্রাচীন চিকিৎসকেরা ইতর প্রাণীর দেহ হইতে তাজা রক্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা রোগীর শিরা উপশিরায় প্রবেশ করাইয়া দিতেন। আজকাল এই চিকিৎসা-পদ্ধতির আর প্রচলন নাই। দেহ হইতে অধিক রক্ত ক্ষয় হইলেই এখন চিকিৎসকেরা কেবল লবণ-জল পিচ্‌কারির সাহায্যে শিরায় প্রবেশ করাইয়া দেন; ইহা শূন্য হৃদ্‌যন্ত্রকে পূর্ণ করিয়া রোগীকে বহুক্ষণ জীবিত রাখে।

জ্বরের সময়ে রোগী প্রায়ই ভয়ানক পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে। দেহ-রক্ষার জন্য জলের প্রয়োজনের ব্যাপার ইহা হইতেও বুঝিয়া লওয়া যায়। রোগীর পিপাসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শারীরবিদ্‌গণ বলেন, রোগ দেখা দিলেই নানাপ্রকার বিষ-পদার্থ দেহে জন্মিতে আরম্ভ করে। এই বিষ দীর্ঘকাল দেহে থাকিলে প্রাণীর মৃত্যু অনিবার্য্য; এই কারণে দেহের সকল ইন্দ্রিয়ই ইহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গ হইতে জল সংগ্রহ করিতে

আরম্ভ করে এবং সেই জলে বিষ ধৌত করিয়া দেহচ্যুত করিবার চেষ্টা করে। বিষ নষ্ট করিবার জন্য এই প্রকারে দেহের জলীয় অংশের যে ব্যয় হয়, তাহার পূরণ আবশ্যক। এই জন্যই রোগীর পিপাসার উদ্রেক হয়। মদ্যপায়ীদের পিপাসারও ইহাই কারণ। মদ খাইলেই কয়েক জাতীয় ভয়ানক বিষ শরীরে উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে বিকল করিতে উদ্যত হয়। এই বিষের অনিষ্টকারিতা লোপ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গুলি হইতে স্বতঃই জল নির্গত হয়, কাজেই এই জলক্ষয়ের নিবারণের জন্য পিপাসার উদ্রেক হইয়া পড়ে। মূত্রাশয়ের বিকার উপস্থিত হইলে বা ত্বকের কার্য্য ভাল করিয়া না চলিলে, চিকিৎসকগণ পূর্ব্বে নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতেন; আজকাল ইঁহারা বুঝিয়াছেন, জলই এই প্রকার ব্যাধির মহৌষধ। জল প্রয়োগ করিলে দেহের অনেক পীড়ার বিষ ধৌত হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়, আমরা যখন জ্বরে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে পিপাসাতুর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকি, তখন এই লক্ষণটা জ্বরের লক্ষণ নয়। রোগের আক্রমণে শরীরে যে বিষ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার জন্যই আমাদের পিপাসার উদ্রেক হয়। প্রাচীন চিকিৎসকেরা জলের এই কার্য্যের সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাঁহারা পিপাসা দেখিলেই ভয় পাইতেন এবং জলপান অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন. কিন্তু এখন চিকিৎসকগণ পিপাসাকে দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করেন না, এবং অধিক জ্বর আছে, কিন্তু পিপাসা নাই, এই প্রকার অবস্থাকেই তাঁহারা ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। রোগীর ক্ষুধা নাই, তথাপি জোর করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইবে; পিপাসা আছে, অতএব জলপান বন্ধ করিতে হইবে, এ প্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতির এখন আর প্রচলন নাই। প্রকৃতিই পরম চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রকৃতিই আমাদের দেহে যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন; আধুনিক চিকিৎসকগণ ধীরে ধীরে এই সকল সত্যকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু রোগীর আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ আজও ইহা বুঝিতেছেন না। জ্বরের রোগীর গায়ে লেপ বা কম্বল জড়াইয়া আবদ্ধ ঘরে রাখিবার রীতি আজও দেখা যায়। ইহাতে রোগীর ব্যাধি প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা বাড়িয়াই চলিতে থাকে। বাহির হইতে গৃহে ভাল বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না; প্রবেশ করিলেও রোগীর দেহ স্পর্শ করিতে পারে না; কাজেই রোগীর দেহ হইতে ঘর্ম্মের আকারে বা জলীয় বাষ্পের আকারে যে বিষ নির্গত হইতে আরম্ভ করে, তাহা দেহচ্যুত হইতে পারে না। আজকাল জ্বররোগীর চিকিৎসার জন্য যে সকল হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাহাতে রোগীদিগকে ইচ্ছানুরূপ জলপান করিতে দেওয়া হয় এবং সেখানে গায়ে কম্বল চাপানো বা ঘরের দরজা-জানালা রুদ্ধ করা হয় না। পাতলা কাপড়ে রোগীর দেহ আবৃত করা হয়; বাহির হইতে শুষ্ক বাতাস আসিয়া দেহের তাপ ও জলীয় অংশ শোষণ করিয়া রোগীকে সুস্থ করিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় জ্বররোগে মৃত্যুর পরিমাণ অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আধুনিক চিকিৎ-

সকগণ প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন, ঠাণ্ডা লাগার জন্য পূর্ব্বে আমাদের যে একটা আশঙ্কা ছিল, তাহা একটা ঘোর কুসংস্কার মাত্র। নিউ-মোনিয়া, ব্রন্‌কাইটিস্ প্রভৃতি পীড়ার মূলে চিকিৎসকগণ এখন আর ঠাণ্ডা লাগা দেখিতে পাইতেছেন না। এই সকল ব্যাধি এক এক প্রকার জীবাণু (microbe) হইতে উৎপন্ন হয়; অরও জীবাণুর কার্য্য। সুতরাং ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আবৃত না করিয়া, যদি লোকে ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখিয়া, জীবাণুদিগের বাসা ভাঙ্গিতে পারেন, তাহা হইলে ব্যাধির আক্রমণের আর ভয় থাকে না। কেবল এইটুকু দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সুস্থ মানুষের গায়ে সর্ব্বদাই যে তাপ থাকে, শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আমাদের দেহের সেই তাপটা যেন অক্ষুন্ন থাকে। দেহের উষ্ণতা সেই সাড়ে আটা-নব্বুই ডিগ্রির কম হইলে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় নানা ব্যাধির জীবাণু দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বংশবিস্তারের সুবিধা পাইয়া যায়, কাজেই তখন লোকে পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে নানা পদার্থের কোন্‌টি খাদ্য এবং কোন্‌টিই বা অখাদ্য, তাহা মানুষ স্থির করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা খাদ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া আমরা প্রতিদিন গলাধঃকরণ করি, তাহার মধ্যে যে, কোন অখাদ্য ও অস্বাস্থ্যকর জিনিষ থাকে না, এ কথা কোনক্রমে বলা যায় না। অখাদ্য বস্তু নিয়তই খাদ্যের ছদ্ম-বেশ গ্রহণ করিয়া আমাদের পাকাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই বিষগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য মানুষকে বিশেষ কিছুই করিতে হয় না; আমাদের পাকাশয় এবং যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্র তাহাদের অনিষ্টকারিতা নষ্ট করিয়া বিষকে অমৃতে পরিণত করে। তবে খাদ্যের সহিত মিশ্রিত বিষ যদি অতি উগ্র হয়, তাহা হইলে অবশ্যই মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। জীবনের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং পেশী প্রভৃতির কোষ হইতে যে বিষ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহাই আমাদের সকল প্রকার ব্যাধির মূল কারণ। মানুষের অকালবৃদ্ধত্ব ও জরার উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই দেহজ বিষগুলিকেই অনিষ্টের মূল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শরীরের ক্রিয়ার সহিত স্বভাবতই যেমন বিষ উৎপন্ন হয়, তেমনি নানা শারীরযন্ত্র এই বিষগুলিকে নষ্ট করিয়া বা দেহচ্যুত করিয়া দেয়। শরীরে এই কার্য্যটির একটু হ্রাস হইলেই মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং দিনে দিনে, মাসে মাসে সেই সকল বিষ দেহে সঞ্চিত হইয়া মানুষকে জরা-গ্রস্ত করে। মনে করা যাউক, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত নিয়তই যে জলীয় বাষ্প ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হইতেছে, তাহা বন্ধ হইয়া গেল বা রক্ত হইতে যে জলীয় অংশ মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়, তাহা কোনপ্রকারে বন্ধ হইল। এই অবস্থায় মানুষ কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না; দেহের বিষ বাহির হইবার পথ পায় না, কাজেই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং শেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। যাহা হউক, দেহজ বিষের বহিষ্করণ ব্যাপারে জলের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। ঘর্ম্মের

সহিত, মলমূত্রাদির সহিত নিয়তই আমাদের দেহের নানা আবর্জ্জনা ধৌত হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এবং আমরা জলপান করিয়া এই জলক্ষয়ের নিবারণ করিতেছি।

আমাদের চতুর্দ্দিকের বায়ুরাশিতে যখন অধিক জলীয় বাষ্প থাকে, তখন আমাদের শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ হইয়া পড়ে। মেঘলা দিনে মন কি প্রকার অপ্রফুল্ল হয় এবং শরীরে কি প্রকার জড়তা আসে, তাহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে ইহার একটা ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। চারিদিকের বাতাস জলভারাক্রান্ত, কাজেই তখন শরীর হইতে আর ঘর্ম্ম নির্গত হয় না, এবং শরীরে আর নূতন জল প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন হয় না। ইহার ফলে শারীরিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন বিষগুলি দেহে উৎপন্ন হইয়া দেহেই থাকিয়া যায় এবং শরীরকে অসুস্থ করিয়া তোলে।

তৃষ্ণাতুর হইলেই পরিমিত জলপান করা যেমন স্বাস্থ্যকর, পিপাসাহীন অবস্থায় অপরিমিত জলপান সেই প্রকার বিশেষ স্বাস্থ্যহানিকর। কয়েকজাতীয় ইতর প্রাণীর দেহে জলস্থালী সংযোজিত থাকে। তাহারা অপরিমিত জলপান করিয়া তাহা জলস্থালীতে সঞ্চিত রাখে এবং প্রয়োজন-মত তাহা পাকাশয়াদিতে প্রবেশ করায়। মানুষের দেহে এই ব্যবস্থা নাই, কাজেই অধিক জল পান করিলে তাহা পাকাশয়েই আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পাকাশয়ের উপরিস্থিত হৃদ্‌যন্ত্রে চাপ দিতে থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হইলে বিশেষ আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাজি রাখিয়া অনেকে আকণ্ঠ জল বা সরবৎ পান করে, ইহাতে কাহাকেও কাহাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, জলে স্ফীত পাকাশয়ের চাপে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ালোপই এই সকল অপমৃত্যুর কারণ।

রোগী পিপাসায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, এই অবস্থায় সুচিকিৎসক জলপান নিষেধ করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনই একসঙ্গে এক গ্লাস জল পান করিতে বলেন না। অল্প পরিমাণে বহুবার জল পান করাই সুচিকিৎসকের পরামর্শ।

আমাদের অধিকাংশ খাদ্যেই প্রচুর জল থাকে। অনেক খাদ্যের শতকরা সত্তর হইতে নব্বুই ভাগ কেবল জল। সুতরাং খাদ্যের সঙ্গে অনেকটা জল আমাদের দেহস্থ হয়, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুপক্ব ফলের অধিকাংশই জলময়। এজন্য ফলভক্ষণ অনেক সময়েই জলপানের কার্য্য করে। ফলের জলীয় অংশ নিছক্ জল নয়, ইহাতে অনেক অম্ল ও লবণপদার্থ মিশ্রিত থাকে। আমরা দেহের বহির্ভাগ পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যেমন ক্ষারময় সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করি, ফলমূলের লবণ ও অম্লমিশ্রিত জল পাকাশয়ে গিয়া সেই প্রকার সাবানের কার্য্য করে। পাকাশয়াদির যত অনিষ্টকর আবর্জ্জনা ঐ জলে ধৌত হইয়া দেহ হইতে নির্গত হয়। এই কারণেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ফলভক্ষণ বিশেষ আবশ্যক।

জলপানের সহিত স্বাস্থ্যের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও, শারীরবিদ্‌গণ আহারের সময় অধিক জলপান করিতে নিষেধ করেন। এই নিষেধবিধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন,

আমাদের পাকাশয়স্থ খাদ্য যদি অধিক জলে মিশ্রিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পাকাশয়ের পাকরসগুলি নির্গত হয় না, কাজেই অজীর্ণ রোগ দেখা যায়। অজীর্ণরোগীর পক্ষে আহারের সহিত জলপান বিশেষ অনিষ্টকর; শুষ্ক খাদ্য মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে এই রোগীদের উপকার হয়। অত্যন্ত শীতল জলপানও চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন। সুস্থ লোকের শরীরে যে উত্তাপ দেখা যায়, তাহাই পরিপাক-ক্রিয়ার বিশেষ উপযোগী। বাহিরের শীতল জল পাকাশয়ে সঞ্চিত হইলে, এই তাপের ক্ষয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-কার্য্যও মন্দীভূত হইয়া আসে।

জলপান সম্বন্ধে আধুনিক শারীরবিদ্‌গণের এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, স্রোতস্বতী নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম ও নগরাদির স্বাস্থ্য যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই প্রকার প্রাণি-শরীরের ভিতর দিয়া নিয়ত জলের প্রবাহ চলিলেই দেহ-রক্ষা হয়। প্রবাহবর্জ্জিত নদী বা খালের জল দেশে নানা ব্যাধিই উৎপন্ন করে। যে দেহে জল কেবল সঞ্চিতই হইতে পায়, তাহাও স্থিরসলিলা জলাশয়ের ন্যায় নানাপ্রকার ব্যাধির আকর হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

হিন্দীভাষা

গত বড়দিনের ছুটির সময়ে কলিকাতায় হিন্দী সাহিত্যসম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। মির্জ্জাপুরবাসী প্রাচীন সাহিত্যসেবী এবং সুকবি বাবু বদরী-নারায়ণ চৌধুরী এই সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী অতি সুন্দর ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি এই অভিভাষণে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-কথার আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমরা তাহারই গোটা কয়েক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া হিন্দী সাহিত্যের পরিচয় দিতেছি।

বহু পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে মোটের উপর আঠার রকমের ভাষা প্রচলিত ছিল। যথা —(১) সংস্কৃত, (২) প্রাকৃত, (৩) উদীচী, (৪) মহারাষ্ট্রী, (৫) মাগধী, (৬) সিদ্ধার্দ্ধ—মাগধী, (৭) শকাভীরী, (৮) শ্রবন্তী, (৯) দ্রাবিড়ী, (১০) ওড়িয়া, (১১) পাশ্চাত্যা, (১২) প্রাচ্যা, (১৩) বাহ্লিকা, (১৪) রন্তিকা, (১৫) দাক্ষিণাত্যা, (১৬) পৈশাচী, (১৭) আবন্তী, (১৮) শৌরসেনী। ইহা ছাড়া যে অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। বৌদ্ধযুগে পালিভাষার আদর একটু অতিমাত্রায় বাড়িয়াছিল। হিন্দী ভাষার

আদিরূপ শৌরসেনী বা অর্দ্ধ মাগধী ; উহার দ্বিতীয় রূপ নাগর বা এক অপভ্রংশ ভাষা ; তৃতীয় রূপ পুরাতন ভাখা বা ভাষা। ভাষার এই তৃতীয়রূপ চন্দবর্‌দাইয়ের "পৃথ্বীরাজ রাসো" মহাকাব্যে প্রকট হইয়াছে। ইহাই হিন্দীর আদি গ্রন্থ। হিন্দুস্থানে এই মহা-কাব্যের ব্যাখ্যাতা সুপণ্ডিত খুব অল্প থাকিলেও উহাই যে পরবর্ত্তী হিন্দী কবিগণের আদর্শ গ্রন্থ হইয়াছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। চন্দবর্‌দাইয়ের ভাষা হইতেই ব্রজভাষার উৎ-পত্তি। ব্রজভাষাও মিশ্রিত ভাষা, নানাবিধ বিদেশী শব্দে পরিপূর্ণ। এই ব্রজভাষার প্রধান কবি ছিলেন—দর্শন, কবীর, সুরদাস, কেশব, খুস্‌রো, জায়সী, তুলসীদাস, বিহারী, দ্বিজদেব প্রভৃতি। মোগলপ্রাধান্যকালে এই ব্রজ-ভাষার আদর ভারতব্যাপী হইয়াছিল। বাদ-শাহের দরবারে উপস্থিত হইতে হইলে রাজ-ভাষা ফারসী ত জানিতেই হইত, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজভাষা জানা থাকিলে বিদ্বজ্জন-সমাজে সমাদর লাভ অনায়াসেই হইত। আকবর বাদশাহ এই ব্রজভাষার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

রাজা ও রাজধানীর প্রভাবে ভাষা এক একটা আকার ধারণ করিয়া থাকে। যখন মথুরা কুষাণবংশের সম্রাট্‌গণের রাজধানী ছিল, তখন শৌরসেনী ভাষার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। পাটলীপুত্র নগরে সম্রাট্ অশোকের রাজধানী ছিল, তাই মাগধী ও পালী ভাষার আদর বাড়িয়াছিল ; যখন অবন্তী বা উজ্জয়িনী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ-ধানী ছিল, তখন আবন্তী ভাষার প্রচলন হইয়াছিল। দিল্লীর পাঠান-রাজগণ এ দেশের লোকের সহিত মেলা-মেশা করিতেন না। তাঁহারা বাহুবলে দেশ জয় করিয়াছিলেন, বাহুবলে বিজিত রাজ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন, বাহুবলে হিন্দুদিগের মধ্যে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচার করিতেন ; মন্দির, মঠ, বিহার, চৈত্যসকল ধূলিসাৎ করিতেন। আকবর বাদশাহ এ নীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বাহুবলে দেশ জয় করা যায় বটে, পরন্তু উহা দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না। দেশজয় অপেক্ষাকৃত সহজ, বিজিত দেশকে দীর্ঘকাল করামলকবৎ রক্ষা করা সহজ নহে—দুশ্চর তপস্যাসাধ্য, কঠোর পুরুষকারসাপেক্ষ। তাই তিনি হিন্দুদিগের সহিত মিলিতে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজপুতগণ ভারতের রণবীর এবং রণধীর জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজ-পুতগণ ব্রজভাষার সমাদর করিতেন, ব্রজভাষার কবিসকলকে রক্ষা করিতেন। আকবর মোগলেরাজপুতে সদ্ভাব-স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেমন রাজপুতের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, যেমন রাজপুতের দরবারী বা রাজসভার রীতিপদ্ধতি, বসন-ভূষণ, সভ্যতা ভব্যতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তেমনি ব্রজভাষার কবিগণের সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্-সমাদরে এই ব্রজভাষার যথেষ্ট পুষ্টি হইয়াছিল, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফার্‌সী শব্দও ব্রজভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তবে কুলের বৈষ্ণব কবিগণ এই ব্রজভাষায় বিষ্ণু-পদ বা হরিকীর্ত্তন রচনা করিয়া গান করিতেন। এই কীর্ত্তনের অতিপ্রচার হইয়াছিল, তাই ব্রজভাষার মূল সংস্কৃতই

ছিল, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আকবর-প্রভাবেও কমে নাই। আকবর স্বয়ং ব্রজভাষায় এক-জন সুকবি ছিলেন; রাজা বীরবল, আবদুর রহিম, খান্‌খানান প্রভৃতি সম্রাট-পারিষদ্‌-গণের মধ্যে অনেকে সুকবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

একা আকবর নহেন, জাহাঙ্গীর ও শাজাহান বাদশাহ-যুগলও ব্রজভাষায় সুকবি ছিলেন। এমন কি, আলমগীর বাদশাহ গোঁড়া মুসলমান হইলেও ব্রজভাষার অনুরাগ ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই। কাজেই বলিতে হয় যে, মোগল-প্রাধান্যকালে ব্রজ-ভাষার অতি উন্নতি ঘটিয়াছিল। এই ব্রজ-ভাষা এখনও হিন্দী কবিতার ভাষা হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজের আমলে দেবস্বামী, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, বাবু প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, বাবু বদরিনারায়ণ চৌধুরী, পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, শ্রীনিবাস দাস এবং শ্রীধর পাঠক প্রভৃতি অধুনা ব্রজভাষাতেই কবিতা রচনা করিয়া কবি-পদবী লাভ করিয়া-ছেন। ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে কোন প্রাদেশিক ভাষার উন্নত সাহিত্যে গদ্য আসন পান নাই। ইংরেজের প্রভাবেই ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষায় গদ্য-রচনা আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলে অনেক বাঙ্গালী পাঠক নিশ্চয় বিস্মিত হইবেন যে, এই কলিকাতা সহরেই সর্ব্ব প্রথমে হিন্দীর শ্রেষ্ঠ গদ্য পুস্তকের রচনা হয়। প্রেমসাগর হিন্দীর প্রধান গদ্য-পুস্তক; লল্লুজী লাল কলিকাতা সহরে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ বাঙ্গলা গদ্যের পদ্ধতি নির্ণয় করিয়া বঙ্গভাষায় গদ্য পুস্তক সকল রচনা করিয়াছিলেন, যখন বিদ্যাসাগরের বাঙ্গলা গদ্য বালারুণের ন্যায় বঙ্গের সাহিত্যা-কাশে উদিত হইতেছিল, তখনই বাঙ্গলা গদ্যের লিখন ভঙ্গী অনুসরণ করিয়া লল্লুজী-লাল প্রেমসাগর রচনা করেন। রাজা শিবপ্রসাদ হিন্দী গদ্যের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় লেখক। তিনি প্রেম-সাগরের ভাষাকে মার্জ্জিত, উন্নত ও শ্রুতিমধুর করিয়া গিয়াছেন। প্রেমসাগরের গদ্যের উপর উর্দ্দু গদ্যের উপযোগিতা মিশাইয়া রাজা শিব-প্রসাদ হিন্দী গদ্যকে একটা নূতন আকার দিয়া গিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে বাঙ্গলা গদ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, অনেকটা সেই ভাবে কবি হরিশ্চন্দ্র ও রাজা শিবপ্রসাদ হিন্দী গদ্যের প্রসাধন করিয়াছেন। এখন হিন্দু-স্থানে বাঙ্গলা গদ্যের অনুকারী এক মিশ্রগদ্য সাময়িক পত্রাদিতে প্রচলিত হইয়াছে। যে ব্যঞ্জনা অনুসারে বাঙ্গালী লেখকগণ সংস্কৃত শব্দসকল ব্যবহার করিয়া থাকেন, হিন্দুস্থানের অনেক নবীন লেখক সেই ব্যঞ্জনা অনুসারে হিন্দী গদ্যে সংস্কৃত বহু শব্দের ব্যবহার করিতে-ছেন। রাজা শিবপ্রসাদ এবং কবি হরিশ্চন্দ্রের আদর্শ হইতে হিন্দী গদ্যলেখকগণের মধ্যে অনেকেই ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইংরেজি ধাঁজ, ইংরেজি ভাঁজ, অনেক হিন্দী-লেখকের গদ্য-সন্দর্ভে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজধানীর প্রভাব এড়ান যায় না। কলিকাতা যখন রাজধানী ছিল, তখন জ্ঞান, বিদ্যা, ভাব, রস কলিকাতা হইতে প্রসারিত হইয়া হিন্দুস্থানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। মোগল আমলে দিল্লী ও

আগ্রা যখন রাজধানী ছিল, তখন বাঙ্গলার কবি ব্রজভাষার ভাব ও ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া নিজেদের কাব্যগাথা সুপুষ্ট করিতেন। কবিকঙ্কণ হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সকল বড় কবি ব্রজভাষা হইতে অনেক সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এমন কি, বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে নরোত্তম দাস, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি মহাজন ব্রজভাষার কবি সুরদাস, শ্যামদাস, কেবলদাস প্রভৃতির রচিত অনেক পুরাতন গীত হু-ব-হু বাঙ্গলায় আমদানী করিয়াছিলেন। বল্লভ-সম্প্রদায়ের অনেক কীর্ত্তন, অনেক বিষ্ণুপদ বাঙ্গলায় কিঞ্চিৎ আকারান্তরিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা রাজধানীর প্রভাব। তেমনি কলিকাতা যখন ইংরেজের রাজধানী ছিল, তখন কবি হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গলার হেমচন্দ্রের ও মধুসূদনের অনেক কবিতা হিন্দীতে ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস বিহারী চক্রবর্ত্তীর ও রবীন্দ্রনাথের অনেক খণ্ড কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র; রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বাঙ্গলার কবি ও লেখকগণ দিল্লীর পুরাতন ঋণ অনেকটা পরিশোধ করিয়াছেন।

চন্দবরদইয়ের পৃথ্বীরাজ রাসোর হিন্দী আর এখনকার হিন্দীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তখনও প্রাকৃত ও সংস্কৃতের ছায়া ভাষার উপর হইতে অপসারিত হয় নাই, তখনকার হিন্দী সংস্কৃতপ্রধান প্রাকৃতের নিগড়ে সংবদ্ধ। কবি চন্দ তাঁহার মহাকাব্যে দশাবতারের প্রণাম কেমন ভাষায় করিয়াছেন, শুনুন—

মচ্ছ কচ্ছ বারাহ প্রণম্মিয়
নারসিংহ বামন করসম্মিয়।
সুয় দশরথ হলধর নম্মিয়
বুদ্ধ কলক্ নমো দহ নম্মিয়॥

আবার স্থানে স্থানে চন্দ কবির ভাষা আধুনিক ব্রজভাষার মতন সরল এবং সহজবোধ্য।

অনঙ্গপালের দিল্লীপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে কবি বলিতেছেন,—

"অনঙ্গপাল তুয়র তঁহা দিল্লী বসাই আনি।
রাজ-প্রজা নরনারী সব, বসে সকল মনমানি॥"

আবার ঐ কবি লিখিতেছেন—

মধুরিপু মধুরিত মধুর সুপ
মধু-সম্মত মধু গোপ।
মধুরিত মধুপুর মহিল-সুখ
মধুরিত নয়ন স ওপ্।

চৌহান-বীরদিগের যুদ্ধের বর্ণনায় কবি সংস্কৃত ছন্দের ও বিভক্তির লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। যথা—

বঢ়ে বান চহুয়ান চালুক্য বেতম্।
মহামন্ত্র বিদ্যা গুরুং শুক্রজেতম্॥
ঘন ঘোর নীসান গজ্জে সহারম্।
উঠে যানি প্রাসাদ বর্ষা প্রহারম্॥
বজী ভেরি ভঙ্কার নফেফ্রি নাদম্।
ছড়ক্কত বিজ্জু করপ্পাল সাদম্॥

চন্দ কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কবীর, কমাল, বিদ্যাপতি, নানক, দাদূ, নাভাজী প্রভৃতি কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা চন্দের ভাষার উপর নিজেদের জন্মস্থানের প্রাদেশিক ভাষার রীতি-পদ্ধতি এবং শব্দসকল সাজাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি; তাঁহার অভ্যুদয়কালে মিথিলায় প্রাচ্য-

ভাষার ছায়া বিদ্যমান ছিল। তাই বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রাদেশিকতার ভঙ্গী পরিস্ফুট রহিয়াছে। তথাপি কবি বিদ্যাপতির শব্দ-যোজনা ও বচনবিন্যাস দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি চন্দ কবির পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আবার অন্য পক্ষে মীরা বাই, সুরদাস, আদি অষ্টসখা, নাগরী দাস, তানসেন প্রভৃতি বিষ্ণু-পদ ও কীর্ত্তন-রচয়িতৃগণ চন্দ কবির সংস্কৃত ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া কবিতা ও পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের ভাষায় প্রাদেশিক শব্দবাহুল্য নাই, দেশীয় ছন্দাদির বিন্যাসও নাই। এইখানে বলা উচিত যে, বিষ্ণু-পদকর্ত্তা-দিগের আদর্শ পুরুষ ছিলেন গীতগোবিন্দের জয়দেব। বাঙ্গলার কোন কবিরই এমন ভারতব্যাপী প্রভাব হয় নাই। ভারতের যেখানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার আছে, যেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তন হয়, সেইখানেই জয়দেবের গীত শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সুরসাগর পড়িয়াছেন, যাহারা সুরদাসের রচিত গান গীত হইতে শুনিয়াছেন, তাঁহারাই একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিবেন, সুরদাসাদি অষ্টসখার বিষ্ণু-কীর্ত্তনে একদিকে যেমন চন্দবরদইয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, অন্য দিকে তেমনি জয়দেবের প্রভাব পরিস্ফুট দেখা যায়। আবার চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস আদি বাঙ্গলার পর-বর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তা সকল সুরদাস নাগরী-দাস আদির পদ ও কীর্ত্তন-গাথা বাঙ্গলায় আমদানী করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া-ছেন। বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস লেখা হইয়াছে বটে, পরন্তু বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তি-কথা এখনও কেহ লিখিতে পারেন নাই। পুরাতন ব্রজ-ভাষার সহিত পুরাতন বাঙ্গলাভাষার যে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা এখনও কোন বাঙ্গালী লেখকই উভয় ভাষার তুলনায় সমালোচনা করিয়া ফুটাইয়া দেখান নাই। পুরাতন বাঙ্গালীকে চিনিতে হইলে, পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তকে চিনিতে হইবে। যুগে যুগে বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত-ধর্ম্মপ্রচারের প্লাবন-তরঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের তথা বঙ্গদেশের যে ভাষা ও ভাবের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হইবে, শৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী ও প্রাচ্যভাষা মথুরা হইতে রাঢ় ও পঞ্চকোট পর্য্যন্ত কি ভাবে ও কতটুকু পর্য্যন্ত আধুনিক নানাবিধ প্রাদেশিক ভাষাসৃষ্টির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে, তবে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও বিস্তৃতির ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হইবে। যিনি ব্রজভাষার কবিগণের সহিত সুপরিচিত নহেন, যিনি শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর বল্লভকুলের ও শ্রীসম্প্র-দায়ের ভক্ত ও কবিগণের প্রভাবের সমাচার রাখেন না, তিনি বঙ্গভাষার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন না। বাঙ্গলা দেশের সহিত আর্য্যা-বর্ত্তের সহস্রাধিক বৎসরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সহস্রাধিক বৎসরকাল বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা বুঝিত, আর্য্যাবর্ত্তের নিকট হইতে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিত। বাঙ্গলার গৌড়-ব্রাহ্মণ আর্য্যাবর্ত্তময় ছড়াইয়া পড়িল, রাজপুতানায় প্রাধান্য লাভ করিল, পক্ষান্তরে মিথিলার ও কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ আসিয়া বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠা করিল। বাঙ্গলার সহিত আর্য্যাবর্ত্তের এই আদান-প্রদানের সমাচার যিনি রাখেন না, তিনি বাঙ্গলাভাষার আংশিক ইতিহাস বলিতে পারেন, পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন না। আজ বাঙ্গলা আর্য্যাবর্ত্ত বা হিন্দুস্থান হইতে অনেকটা

স্বতন্ত্র হইয়াছে বটে, পরন্তু মুসলমানের আমলের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ও মহাকবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের—আর্য্যাবর্ত্তের অঙ্গীভূত ছিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই হিন্দী, উর্দ্দু বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। ইংরেজের আমল হইতে, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার অতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে চ্যুত হইয়াছে। বাঙ্গালী বাবু এখন আর তুলসীকৃত রামায়ণ বুঝিতে পারেন না, ব্রজভাষার দোঁহা চৌপাই আবৃত্তি করেন না, সুরদাসের সঙ্গীতে আর মুগ্ধ হন না। এখন আর আমাদের ধারণাই নাই যে, বঙ্গভাষার সহিত ব্রজভাষার ও সাধারণ হিন্দী ভাষার কতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই আমরা বঙ্গভাষাকে হিন্দীভাষা হইতে এবং হিন্দুস্থান হইতে পৃথক্ করিয়া বিচার করি। ইহা ঠিক নহে।

আমাদের বঙ্গদেশে, বাঙ্গালাভাষায় কবিতা রচনা করিয়া যেমন জন কয়েক মুসলমান কবি ও ভক্ত-আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানেও তেমনি অনেকগুলি মুসলমান লেখক ব্রজভাষায় সুকবি এবং ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জনকয়েকের নাম করিব, যথা, জায়সী, মোবারক, রহিম, নবী, রসখান্, এবং নেবাজ। রসখান্ সাহেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন; লোকে বলিত রসখান্ হরিভক্তিতে কোটি হিন্দু হরিভক্তকে পরাজয় করিতে পারিতেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা অবলম্বন করিয়াই এই সকল মুসলমান-কবি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তির হিসাবে ইঁহারা কোন অংশে হিন্দু কবিগণ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। শাহজাঁহা বাদশাহ ব্রজভাষায় সুকবি ছিলেন। যখন আওরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন শাহজাঁহা ব্যথিতচিত্তে ব্রজভাষায় এই কবিতা রচনা করিয়া পুত্রের নিকট দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—

"জন্মতহী লখ্ দান দিয়ো
হৰু নাম ধরো নবরঙ্গবিহারী।
বালহি সোঁ প্রতিপাল কিয়ো,
অরু দেশ মুলুক্ দিয়ো দল ভারী॥
সো সুত বৈর বুঝ্যা মন্ সে ধরি,
হায় দিয়ো বন্ধ সারি মেরঁ ভারী।
শাহজাঁহা বিনবায় হরি সোঁ বলি,
রাজীব নয়ন রহায় তিহারী॥

অর্থাৎ যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে আমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলাম, আদর করিয়া যাহার নাম রাখিয়াছিলাম নবরঙ্গবিহারী, যাহাকে বালককাল হইতে প্রতিপালন করিয়া তুলিয়া, রাজ্য, ধন, সম্পদ ও সেনা দিয়া মানুষ করিয়াছিলাম—সেই পুত্র আমার সহিত শত্রুতা করিয়া আমায় মর্ম্মাহত করিয়াছে, আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাই শাহজঁহা শ্রীহরির নিকট বিনয়বচনে প্রার্থনা করিতেছে যেন তাঁহার রাজীবনয়ন এই হতভাগ্যের উপর স্থির থাকে! মোগলদিগের প্রাধান্য কালে ব্রজভাষার কবিদিগের প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টি কম ছিল না। রাজা বীরবল কেশবদাসকে একটা শ্লোকের জন্য লক্ষমুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন। কেশবদাস তেমনি তেজস্বী কবি, সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। অম্বরপতি মহারাজ মানসিংহ একটা কবিতা তিনবার শুনিয়া কবিকে তিনলক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। মহারাজ জয়সিংহ কবি বিহারী দাসকে প্রত্যেক

দোঁহার জন্য দুই সহস্র মুদ্রা দিয়াছিলেন। মহারাজ শিবাজী ভূষণ কবির একটা শ্লোক চৌষট্টিবার শুনিয়া চৌষট্টিটা হাতী এবং চৌষট্টি তোড়া টাকা দিয়াছিলেন। কেবলই ভক্তির ভাব লইয়া হিন্দী কবিগণ কাব্য রচনা করিতেন না। বীররসের—দেশহিতৈষণার কথায় পূর্ণ কবিতার অসদ্ভাব ছিল না। মহারাণা প্রতাপ ও মহারাজ শিবাজীর দরবারে বীররসপ্রধান কবিগণ প্রতিপালিত হইতেন। বাদশাহদরবারে যে সকল কবি প্রতিপালিত হইতেন, তাঁহাদের তেজও বড় অল্প ছিল না। আওরঙ্গজেব যখন হিন্দুদের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেছিলেন তখন তাঁহার দরবারের হিন্দু কবি বাদশাহকে শত ধিক্কার দিয়া বাদশাহের প্রতি নিষ্ঠীবন বর্জ্জন করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মতন বাদশাহের সাহসে কুলায় নাই যে এমন দুরন্ত কবির শিরশ্ছেদের হুকুম দেন। তখন কবিদিগের ও সুপণ্ডিতের প্রতাপ ও প্রভাব এতই ছিল। বড় বড় রাজামহারাজা এবং নবাববাদশাহ, কবি ও শায়েরগণকে প্রতিপালন করিবার অধিকার পাইলে নিজেদের জীবন সার্থক হইল মনে করিতেন। ধনীদিগের এতটা পোষকতা ছিল বলিয়াই ব্রজভাষার এমন অত্যুন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল।

মুসলমান কবিগণের এবং মোগল বাদশাহদিগের প্রাধান্য ব্রজভাষায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ফল এই হইয়াছিল যে, ব্রজভাষায় ও হিন্দী ভাষায় অসংখ্য আরবী ও পারসী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। চন্দ বরদইয়ের মহাকাব্যে অনেকগুলি আরবী ও পেন্দুবী ফারসীর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে জায়সী, নাগরী দাস, কবীর, খোসরো, রহিম, খান্‌খান'ন্ প্রভৃতি কবিগণ অবাধে ফারসী ও আরবী শব্দ সকল ব্রজভাষায় চালাইয়াছিলেন আমরা যেমন আজকাল চলিত বাঙ্গলাভাষায় শতকরা নব্বইটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, তখনও তেমনি মুসলমানশিক্ষা প্রভাবে সুশিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রেই বহু ফারসী ও আরবী শব্দ কথায় কথায় ব্যবহার করিতেন। নাগরীদাস প্রেমের ব্যাখ্যান কেমন ভাষায় করিয়াছেন একবার শ্রবণ করুন—

"প্রেম উসীকী ঝলক্ হায়,
জেঁ্যা সুরজ কী ধুপ।
যাঁহা প্রেম তাঁহা আপ হায় ;
কাদির-নাদির রূপ ॥
ইস্ক চমন্ মহবুব কা
উহাঁ ন জায়ে কোয়।
যায় সো জীয়ে নহিঁ,
জীয়ে তো বৌরা হোয় ॥"

অর্থাৎ সূর্য্যের যেমন রৌদ্রই তেজোব্যঞ্জক, প্রেম তেমনই ভগবানের প্রকাশক। যেমন যেখানে রৌদ্র দেখিবে সেইখানেই অনুমান করিবে যে উপরে সূর্য্যের প্রকাশ আছে, তেমনি যাহাতে প্রেমের বিকাশ দেখিবে, তাহার মাথার উপর শ্রীভগবানের অবস্থিতির অনুমান করিতে হইবে। যে দেশে ভগবৎপ্রেমের দামিনীদীপ্তি নিত্য স্থির থাকে সে দেশে কেহ যাইতে পারে না, যে যায় সে মরে, যদি না মরে—বাঁচিয়া থাকে, তবে সে পাগল হয়। উহাই ভগবানের রূপসাগর। সিদ্ধান্ত কথাটা ষোল আনা ভক্তি শাস্ত্রের অনুকূল, অথচ বলা হইল এক বিষম জারজ ভাষায়। আমাদের কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র,

রামপ্রসাদও এই ফারসীর প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাদের রচিত আধা ফার্সী এবং আধা বাঙ্গলা শ্লোকের এখন তেমন প্রচলন নাই; কেননা আমরা যে একেবারেই ফারসীটা মুছিয়া ফেলিয়াছি।

মুসলমান প্রভাবের এই বহিষ্করণ বাঙ্গালী এক পুরুষেই সাধন করিয়াছিলেন। ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফার্সীদাঁ বাঙ্গালী ছিলেন; আর বঙ্কিমচন্দ্র উর্দ্দু ফারসীর বড় ধার ধারিতেন না। তাঁহার রচিত কপালকুণ্ডলায়, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসে তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় বাঙ্গালীর মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ মুন্সী ছিলেন; আর তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটা ফারসী বা উর্দ্দু বাক্য শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সুন্দর ফারসী বলিতে পারিতেন; তাঁহার আবৃত্তি নির্দ্দোষ ছিল; আর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে একজনও তাঁহার মতন হিন্দী ফারসীতে ব্যুৎপন্ন হইলেন না। এই কথাটা এমন করিয়া, বার বার বলিবার হেতু এই যে, ব্রজভাষা এবং হিন্দী ও উর্দ্দুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে, ঈশ্বরগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত যে বাঙ্গলাভাষা বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, আমাদের পক্ষে তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। আধুনিক বাঙ্গলাভাষার দুইটি বেদী;—এক বেদীর দেবতা কবিকঙ্কণ, জয়ানন্দ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, অন্য বেদীর দেবতা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি। এই দুই বেদীর সম্যক্ পরিচয় রাখিতে হইলে হিন্দী, উর্দ্দু, ব্রজভাষা জানিয়া রাখা অত্যাবশ্যক। হিন্দুস্থানের কবি ও লেখকগণের মধ্যে এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র খুব ভাল ফারসী জানিতেন; রাজা শিবপ্রসাদ ভারত গবর্ণমেণ্টের পর-রাষ্ট্রবিভাগের মীর মুন্সী ছিলেন। ফারসী ভাষায় কবিতা লিখিতে তাঁহার তুল্য সে সময়ে ভারতবর্ষে খুব কম হিন্দু বা মুসলমান ছিল। হিন্দুস্থানের আধুনিক হিন্দী লেখক ও কবিগণ প্রায় সবাই প্রাচীন হিন্দী, ব্রজভাষা, ফারসী ও উর্দ্দু জানেন। সুতরাং তাঁহারা যেভাবে ভাষার ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া কাজ করিতে পারিবেন, বাঙ্গলার আধুনিক লেখকগণ তাহা পারেন না—জানেন না। ফলে, এক হিসাবে আধুনিক হিন্দী ভাষার বনীয়াদ মজবুত হইয়াছে; ভাষার পারম্পর্য্য সুরক্ষিত হইতেছে। বুঝি বা অচিরে আধুনিক হিন্দী গদ্য পদ্য বাঙ্গলা অপেক্ষা প্রশস্ততর ও প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিবে। হিন্দী ভাষায় হিন্দু ধাতু রক্ষা করিবার জন্য কাশীর পণ্ডিতগণ সদৈব চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত ছোটুলাল, পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি লেখকগণ কাশীর প্রাধান্য হিন্দী ভাষার উপর বজায় রাখিয়াছেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রভাব আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। মদনমোহন, রামগতি, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত লেখকগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার উপর যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বড় সাধ করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ইংরেজের প্রচলনা-

ধিক্য ঘটাইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজের ইংরেজিনবীশ ছাত্রগণ পরে বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন; কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়া আর কেহই বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিতে পারেন নাই। হিন্দুস্থানের বড় বড় হিন্দী লেখক ও কবিগণ আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষার গদ্য ও পদ্য, যতদিন হিন্দী, গুজরাটী, মারহাটী প্রভৃতি আধুনিক উন্নত প্রাদেশিক ভাষার সহিত সমসূত্রে সংবদ্ধ থাকিবে, ততদিন উহার প্রভাব আমরা অনুভব করিতে পারিব, উহা দ্বারায় যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারিব; পরন্তু বাঙ্গলা যদি ভারতবর্ষের সংস্রব ছাড়িয়া ইউরোপের আদর্শে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমরা সদ্য সদ্য উহার দ্বারা লাভবান্ হইতে পারিব না। এ কথাটা আমাদের ভাবিবার বিষয়। সে ভাবনাটা যাহাতে প্রগাঢ় হয়, সেই আশায় বাবু বদরীনারায়ণের অভিভাষণ অবলম্বনে আপাততঃ গোটাকয়েক কথা বলিয়া রাখিলাম।

আধুনিক হিন্দী গদ্যের যে গতি হইয়াছে আধুনিক বাঙ্গলা গদ্যেরও প্রায় সেই গতি হইয়াছে। আধুনিক হিন্দী গদ্য রাজদ্বারের, রাজসভার, বিচারালয়ের, এবং ভদ্রসমাজের সুপ্রচলিত ভাষা নহে। উর্দ্দূ এখনও সে সকল স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। জন কয়েক সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত, জন কয়েক ধর্ম্মপ্রচারক বক্তা, জন কয়েক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সাময়িকপত্রের লেখক, জন কয়েক গ্রন্থকার এই আধুনিক হিন্দী ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে হিন্দী ভাগলপুর হইতে লাহোর পর্য্যন্ত প্রচলিত সে হিন্দী একটা ভাষা নহে; অগণ্য প্রাদেশিক ভাষার সমষ্টি মাত্র। এক এক জেলার এক একটা স্বতন্ত্র ভাষা। এই প্রাদেশিক ভাষা লোকসমাজে প্রচলিত; ঘরে বাহিরে ব্যবহৃত। সজ্জনসমাজে, বিদ্বজ্জনমণ্ডলী মধ্যে উর্দ্দূর প্রচলন অধিক; এখন আবার ইংরেজির চলন ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের সাধু ভাষারও ঐ একই গতি হইয়াছে। খবরের কাগজে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, হেম-নবীনের কাব্যে যে বাঙ্গলা পড়িতে পাও, বক্তার মুখে, ধর্ম্ম প্রচারকের মুখে যে বাঙ্গলা শুনিতে পাও, তাহা বাঙ্গলার লোক সাধারণের ভাষা নহে; তাহাদের বোধগম্য ভাষাও নহে। হিন্দীর মত বাঙ্গলার অগণ্য প্রাদেশিক ভাষা না থাকিলেও উচ্চারণবৈষম্যে ময়মনসিংহের বাঙ্গালী বাঁকুড়ার বাঙ্গালীর কথা এক বর্ণও বুঝিতে পারে না। অথচ বাঙ্গলার যাহা সাধু ভাষা তাহা এখনও সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই। বাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগে এই সাধুভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক সকলের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা এতদিন স্থির থাকাতে বাঙ্গলার সর্ব্বজেলাতেই ভাষার একটা সমতা ঘটিয়াছে বটে; পরন্তু ইংরেজিনবিশ প্রতিভাশালী লেখক যদি খোস্ মেজাজে একটা স্বতন্ত্র গদ্যের সৃষ্টি করেন, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ যদি মুসলমানদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র বাঙ্গলা ভাষার উদ্ভাবনে কৃত-সঙ্কল্প হন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট বাঙ্গলা গদ্যের পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য হেতুই আধুনিক বাঙ্গলা গদ্যের

এতটা প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে; সে আনুকূল্যে বঞ্চিত হইলে প্রমাদ ঘটিতে পারে। হিন্দীও কতকটা সরকারী অনুগ্রহে পরিপুষ্ট, সে অনুগ্রহে বঞ্চিত হইলে হিন্দীর দশাও বিষম হইতে পারে। মুসলমানযুগের হিন্দী ও বাঙ্গলা রাজ-আদরে সুরক্ষিত ছিল। ইংরেজের আমলের নবীন হিন্দী ও বাঙ্গলাও রাজ-আদরে উৎপন্ন হয়। পরন্তু মুসলমানের আমলের হিন্দী ও বাঙ্গলা ধর্ম্মের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে। তুলসীকৃত রামায়ণ, বেদ-বাইবেল কোরাণের মত এখনও হিন্দুস্থানের গ্রামে গ্রামে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। এখনও বাঙ্গলার প্রতি গ্রামে প্রতি মুদীখানার দোকানে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পঠিত হয়—ধর্ম্মপুস্তকের হিসাবে পঠিত এবং অর্চ্চিত হয়। মুসলমানের আমলের হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষা ধর্ম্মপ্রচার কল্পে ধর্ম্মব্যাখ্যা কল্পে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই সে ভাষা অল্পায়াসে লোকসাধারণের গ্রাহ্য ও মান্য হইয়াছিল; কেন না সে যে লোকসাধারণের নিজস্ব ভাষা ছিল। আর এখনকার নবীন হিন্দী ও বাঙ্গলা সাহিত্য ও ভাষা কতকটা টবের ফুলের মতন, যাহার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে উহার কেয়ারী করিতেছে, কাট-ছাঁট করিতেছে। দেশের লোকসাধারণ কেবল উহা দূর হইতে দেখিতেছে, ভয়ে উহাকে অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। লোকসাধারণের এই সঙ্কোচ এবং ইংরেজি-নবীশ বাঙ্গলা লেখকদিগের খোস্ মেজাজ, আর পরোক্ষে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য এই তিন বাধা উত্তীর্ণ হইয়া আধুনিক নানাবিধ প্রাদেশিক সাহিত্য যে কোন্ পথে পুষ্ট হইবে, তাহা বলা কঠিন। বলা কঠিন জানিয়াই, হিন্দীর পরিচয় একটু দিলাম। ভবিষ্যৎ ভাবিবার সময় আসিয়াছে জানিয়াও হিন্দীর কথা ভুলিয়াছি।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌন্দর্য্য-বোধ

সৌন্দর্য্যবোধকে মানবের বিশেষত্ব বলা হইয়া থাকে। কোন কোন বর্ণে, মূর্ত্তিতে ও শব্দে সুখবোধ হয়, ইহাকেই সৌন্দর্য্য-বোধ বলিতেছি। শিক্ষিত ব্যক্তির এই বোধের সহিত নানা জটিল ভাব এবং চিন্তাপরম্পরা ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত থাকে। যখন দেখি যে, পুংজাতীয় পক্ষী স্ত্রীজাতীয়গণের সমক্ষে স্বীয় সুন্দর পক্ষ অথবা উজ্জ্বল বর্ণ প্রদর্শন করিতেছে এবং যাহাদিগের ঐ সকল শোভা নাই, তাহারা বিস্তার করে না, তখন বিবেচনা করিতেই হয় যে, পুংগণের সৌন্দর্য্য স্ত্রীগণ ভাল বলিয়া মনে করে; ইহাতে সন্দেহ করা যায় না। নারীগণ এই সকল পক্ষ দ্বারা বেশ-বিন্যাস করে, সুতরাং এ সকল যে শোভন পদার্থ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরে দেখাইব, হামিং*

* আমেরিকার ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।

পক্ষীর বাসা এবং বাওয়ার পক্ষীর খেলা করিবার পক্ষ নানারূপ রঙ্গিন পদার্থে রুচিপূর্ব্বক অলঙ্কৃত, ইহাতে বোধ হয়, ঐ সমস্ত পদার্থ দেখিয়া উহাদিগের চক্ষের সুখ হয়। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে অধিকাংশ জন্তুরই সৌন্দর্য্য-বোধ স্ত্রী-পুরুষের সৌন্দর্য্যে এবং দাম্পত্য আকর্ষণেই সীমাবদ্ধ। পুংজাতীয় পক্ষিগণ কাম-কালে যে সকল সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি করে, তাহা স্ত্রীজাতীয়গণ নিশ্চয়ই ভাল-বাসে, ইহা আমরা পরে প্রমাণ করিব। স্ত্রীগণ যদি পুংপক্ষিগণের সুন্দর বর্ণ, অলঙ্কার ও স্বরলহরী না ভালবাসিত, তাহা হইলে পুংগণের আগ্রহ ও ক্লেশ স্বীকার করত ঐ সকল স্ত্রী-গণের সমক্ষে প্রদর্শন করা বৃথাই হইত; কিন্তু উহা যে বৃথা, এ কথা স্বীকার করা অসম্ভব। কোন কোন উজ্জ্বল বর্ণ দেখিয়া সুখ হয় কেন তাহা বলা যায় না; তেমনই কোন কোন গন্ধ এবং আস্বাদ ভাল লাগে কেন তাহাও বলা যায় না। কিন্তু ইহার সহিত অভ্যাসের কিছু-না-কিছু যোগ আছে; কারণ, যে গন্ধ, স্বাদ কিংবা দৃশ্য প্রথমে অপ্রিয় বোধ হয়, তাহাও অব-শেষে ভাল লাগিতে পারে; অভ্যাস বংশগত * কোন কোন স্বরসংযোগ মিষ্ট লাগে কেন, তাহা শারীরতত্ত্বের বিধান অনুসারেই হেল্‌ম্‌ হোল্‌টস্‌ বুঝাইয়া দিয়াছেন। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও অসম কালব্যবধানে † পুনঃ পুনঃ ধ্বনি করিলে বড়ই অপ্রীতিকর হয়; জাহাজের দড়ি অসমকাল পর পর [বায়ুভরে] যেরূপ শব্দ করে, তাহা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই এ কথা স্বীকার করিবেন। দৃষ্টি সম্বন্ধেও এই-রূপই হয়, কারণ, সমকাল পরে পরে যে দৃশ্য চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হয়, অথবা যে দৃশ্যের আকৃতি সর্ব্বত্র সম-অনুপাতে মিল আছে, তাহাই চক্ষু সুখজনক বোধ করে। এইপ্রকার চিত্র নিতান্ত অনুন্নত অসভ্যগণও অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহার করে; পুংজাতীয় জন্তুগণের শোভা-বর্দ্ধনার্থ দাম্পত্য নির্ব্বাচন-বিধান অনুসারে ইহা পুষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দৃশ্য দর্শনে ও ধ্বনি শ্রবণে সুখ হয় কেন, তাহার কারণ বলিতে পারি অথবা না পারি, কিন্তু একই প্রকার ধ্বনি, একই প্রকার বর্ণ, আলো ও ছায়াপাত, একই প্রকার মূর্ত্তি মানুষ এবং অনেকানেক জন্তুতে ভালবাসে, [ইহা সত্য]।

সৌন্দর্য্যবোধ, বিশেষতঃ স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্যা-নুভূতি, মানব-মনের একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকারের বৃত্তি নহে; কারণ বিভিন্নজাতীয় মানবের সৌন্দর্য্য-বোধ বিভিন্ন, এবং একজাতীয় মানব মধ্যেও বিভিন্ন শাখার সৌন্দর্য্য-বোধ সমান নহে। অধিকাংশ অসভ্য মানব যে প্রকার জঘন্য অলঙ্কার ব্যবহার এবং বীভৎস সঙ্গীত করিয়া থাকে তদ্দৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে, পক্ষী প্রভৃতি কতিপয় ইতর প্রাণীর অপেক্ষাও উহাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধ নিম্নশ্রেণীর। রাত্রি-কালের আকাশের শোভা, অথবা ধরাপৃষ্ঠের কোন সুন্দর চিত্র কিংবা পরিমার্জ্জিত সঙ্গীত কোন ইতর জন্তুই উপভোগ করিতে সমর্থ নহে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এ সকল উচ্চ-শ্রেণীর রুচি অনুশীলনলব্ধ এবং নানাবিধ জটিল ভাব-সমবায়ের উপর নির্ভর করে; উহা অসভ্যগণ অথবা অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও উপ-ভোগ করিতে পারে না।

কল্পনা-শক্তি বিস্ময়, কৌতূহল, সাধারণ

* ইহা এক্ষণে স্বীকৃত হইতেছে না।

† অর্থাৎ মাত্রা ঠিক রাখিয়া।

সৌন্দর্য্য-বোধ, অনুকরণেচ্ছা, উত্তেজনা, নূতনত্বাসক্তি ইত্যাদি যে সকল বৃত্তি মানবের উত্তরোত্তর উন্নতির অশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাহারা আচার-ব্যবহার এবং রীতি বিষয়েও খাম্‌খেয়ালি অব্যবস্থিত পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া পারে নাই। একজন সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, যদৃচ্ছা অথবা খাম্‌-খেয়ালী পশুর সহিত অসভ্য মানবের অতিশয় উল্লেখ-যোগ্য সাধারণ প্রভেদ, এই নিমিত্তই এ কথার উল্লেখ করিলাম। কেবল যে মানুষই নানা কারণে অব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে, পরে দেখাইব যে, ইতর জন্তুগণও স্নেহ, বিদ্বেষ অথবা সৌন্দর্য্য-বোধ সম্বন্ধে অব্যবস্থিতচিত্ত ;—ইহার কারণ আমরা অংশতঃ বুঝিতে পারি। নূতনকে নূতনত্ববশতই উহারাও ভালবাসে, এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মবোধ। মানুষ যে প্রথম হইতেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এ বিশ্বাস মানবকে উন্নত করে। পক্ষান্তরে যাঁহারা তাড়াতাড়ি একটা দেশ ভ্রমণ করিয়া ফেলেন, শুধু তাঁহারা নহে, যাঁহারা দীর্ঘকাল অসভ্য মানবের সহিত বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বলেন যে, অনেক অসভ্য জাতি পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, যাহাদিগের এক অথবা একাধিক ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই, এবং তাহাদিগের ভাষায় ঐ ধারণা প্রকাশ করিবার কোন শব্দও নাই। ঐ ধারণা এবং জগৎস্রষ্টা বিশ্বশাসনকারী কেহ আছেন কি না এ কথা সম্পূর্ণ পৃথক্। কতিপয় উচ্চতম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্রষ্টা ও শাস্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু যদি "ধর্ম্মবোধ" বলিতে অতীন্দ্রিয় প্রেতাত্মায় বিশ্বাস বুঝিয়া লই, তবে কথাটা ভিন্নরূপ হইয়া উঠে। কারণ, ঐ সকলে বিশ্বাস অনুন্নত জাতিগণের সর্ব্বত্রই আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিরূপে তাহাদিগের ঐ সকল বিশ্বাস জাত হইল, তাহা বুঝা কঠিন নহে। যে মুহূর্ত্তে কল্পনা, বিস্ময়, কৌতূহল এবং কিয়ৎপরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তি মানব-মনে আংশিক-রূপেও বিকশিত হইয়াছিল, তখন হইতে মানবের স্বভাবতই চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলী বুঝিতে ইচ্ছুক হওয়া এবং নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অস্পষ্টভাবে চিন্তা করা সম্ভব। মিঃ ম্যাক্‌লেনান্ বলিয়াছেন, "জীবন পদার্থটা কি, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত একটা কিছু সে কল্পনা করিয়া ফেলিবে ; এবং সর্ব্বত্রই যেরূপ দেখা যায় তাহা হইতে বোধ হয় যে, উদ্ভিদ জন্তু এবং যাবতীয় পদার্থে ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহে নিজের ন্যায় আত্মা আরোপ করাই মানব-মনের প্রথম কল্পনা।" মিঃ টাইলার বলেন স্বপ্নদর্শন হইতেই আত্মার ধারণা প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল ; ইহাই সম্ভব, কারণ অসভ্যগণ নিজের আত্ম-বোধ হইতে বহির্জ্জগতের বোধকে পৃথক্ মনে করে না। অসভ্য যখন স্বপ্ন দেখে তখন সে বিশ্বাস করে যে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি-গুলি কোন দূরদেশ হইতে আসিয়া তাহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে ; অথবা স্বপ্নদর্শকের আত্মা দেহ হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্র গিয়া যাহা দেখিয়াছে তাহার স্মৃতি সহ দেহ মধ্যে পুনরাগত হইয়াছে। * কিন্তু যে

* এই বিশ্বাস অসভ্যতার লক্ষণ নহে। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ঘটনা; এবং অতি উন্নত আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিণাম অনুবাদক।

পর্য্যন্ত মানবমনে কল্পনা, কৌতূহল বুদ্ধি ইত্যাদি একটু ভালমত বিকশিত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত মানব স্বপ্নদর্শন হইতে আত্মবিশ্বাস করিতে সক্ষম হয় নাই। কুকুরগণ স্বপ্নদর্শন হইতে ঐরূপ বিশ্বাস করিতে পারে না।

আমি একবার এক সামান্য ঘটনা দেখিয়াছিলাম তাহা হইতে বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে অসভ্য মানবের মনেও প্রাকৃতিক বস্তু এবং প্রাকৃতিক কারণসমূহে আত্মা অথবা চেতনা আরোপ করিবার প্রবৃত্তি আছে। আমার এক প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান্ কুকুর একদিন বিস্তৃত ঘাসের প্রাঙ্গণে শুইয়াছিল; সে দিনটী গরম ও নিস্তব্ধ ছিল। কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বায়ুতে একটী খোলা ছাতা নড়িতেছিল; যদি কোন মানুষ ঐ ছাতার নিকট থাকিত, তবে কুকুর ঐ ছাতা নড়া গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু প্রত্যেকবার ছাতাটী একটু নড়িলেই কুকুর ভয়ঙ্কর স্বরে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে ও ডাকিতে লাগিল। আমার বিবেচনা হয়, কুকুর তাড়াতাড়ি নিজের অজ্ঞাতসারে মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল যে, 'ছাতা নড়ে অথচ কোন কারণ দেখা যায় না, সুতরাং কোন অপরিচিত চেতনাযুক্ত কর্ত্তা ঐ কর্ম্ম করিতেছে, এবং তাহার দখলী সীমার মধ্যে কোন অপরিচিতের আসিবার অধিকার নাই।'

অদৃশ্য চৈতন্যময় কর্ত্তাতে বিশ্বাস হইলে এক অথবা একাধিক ঈশ্বর বিশ্বাস করা সহজ হয়। ঐ বিশ্বাস সহজেই এই বিশ্বাসে পরিণত হয়। অসভ্যগণ নিজে যে সকল ভাবে উত্তেজিত হয়, যেরূপ বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা করে, অথবা বিচারপদ্ধতির যে প্রকার সরল ধারণা করিয়া থাকে, অদৃশ্য চৈতন্যময় কারণেও তাহাই আরোপ করে। ফিউজিয়ানগণ এ বিষয়ে যেন মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় আছে; কারণ বিগল্ নামক জাহাজের উপর ডাক্তার সাহেব নমুনা রাখিবার জন্য কতিপয় ছোট হংসশাবককে গুলি করিয়া মারিলে ইয়র্ক মিনষ্টার* অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "ও! মিষ্টার বিনো, খুব বৃষ্টি, খুব বরফ, খুব হাওয়া †।" সে স্পষ্টই ভাবিয়াছিল, মানবের আহার্য নষ্ট করায় দণ্ড স্বরূপ ঐ সকল হইবে। আর একবার সে বলিয়াছিল, যখন তাহার ভ্রাতা একজন জঙ্গলী লোককে হত্যা করিয়াছিল তখন দীর্ঘকাল ঝড় হইয়াছিল, অনেক বৃষ্টি ও বরফ পড়িয়াছিল। এরূপ কথা বলা সত্ত্বেও, ফিউজিয়ানগণের ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকার, অথবা কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করার কিছুমাত্র চিহ্ন আমরা পাই নাই। জেমি বাটন্ দৃঢ়ভাবে দর্প করিয়া বলিত, (দর্প সত্যই), তাহার দেশে শয়তান (Devil) নাই। এই কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ অসভ্যগণ সদ্ভাববিশিষ্ট আত্মা অপেক্ষা অসৎ প্রেতাত্মাতে অধিক স্থলেই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

ধর্ম্মপ্রাণতা অতিশয় জটিল মিশ্রভাব। ভালবাসা অত্যুন্নত দুর্ব্বোধ্য কোন গুরুতর পুরুষে আত্ম-সমর্পণ; অতিমাত্র অধীনতা, ভয়, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, ভবিষ্যৎ ফল-কামনা এবং সম্ভবতঃ আরও অনেক ভাব মিশ্রিত হইয়া ঐ ভাব গঠিত হইয়াছে। বুদ্ধি ও নীতি বোধ কতক পরিমাণে উন্নত না হইলে কোন জীবই

* জাহাজের একজন ফিউজিয়ান অসভ্য।

† অর্থাৎ এ সকল হইবে।

এরূপ জটিল ভাবের অধিকারী হইতে পারে না। তথাপি, প্রভুর উপর কুকুরের গভীর ভালবাসা, সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, ও কিয়ৎপরিমাণ ভয় এবং অন্যান্য ভাব দেখিয়া উপরোক্ত ভাবের সুদূর আভাস পাওয়া যায়। কিছুদিন অনুপস্থিত থাকিবার পর কুকুর যখন তাহার প্রভুর নিকট প্রথম উপস্থিত হয়, অথবা যখন বানর ঐরূপ অনুপস্থিতির পর তাহার প্রীতিভাজন রক্ষকের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করে, তখন উহাদিগের ব্যবহার একরূপ হয়; আর উহাদিগের স্বজাতীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ব্যবহার অন্যরূপ দেখা যায়। উহাদিগের স্বজাতীয় মিলনে আনন্দোচ্ছ্বাস কিছু কম হওয়া বোধ হয়, এবং তখন পরস্পরের সহিত ব্যবহারে, প্রত্যেক কর্ম্মেই এরূপ দেখায় যেন সকলেই সমান।

যে সকল উন্নত মনোবৃত্তি মানবকে প্রথমে অদৃশ্য প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী করিয়াছিল, পরে জড়পূজায়, বহু দেব-বাদে এবং পরিণামে একেশ্বর বাদে বিশ্বাসী করিয়াছে, তাহা হইতেই (যতদিন বুদ্ধির বিকাশ অল্প থাকে) ততদিন নানাবিধ অদ্ভুত কুসংস্কার ও আচারব্যবহার উৎপন্ন হয়, সে সকলের অনেকগুলি চিন্তা করিতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে রক্তপিপাসু দেবতার নিকট নরবলি; বিষপ্রয়োগ অথবা অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির বিচার, ভূত প্রেত লইয়া যাদুগিরি ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সকল কুসংস্কারের কথা সময় সময় স্মরণ করা ভাল; কারণ তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, বুদ্ধির উন্নতির নিকট, বিজ্ঞানের নিকট এবং [বংশপরম্পরায়] জ্ঞানবৃদ্ধির নিকট আমরা কতদূর অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। সার জন লবক্ ভালই বলিয়াছেন, "অজ্ঞাত বিপদ্ পাত হইবার ভয়ানক আতঙ্ক অসভ্যের জীবনকে যেন গভীর মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখে; তাহার সমস্ত আনন্দই তিক্ত হইয়া যায়। এ সকল আমাদিগের উচ্চতম বৃত্তি সকলের শোচনীয় গৌণ ফল; তেমনই ইতর জীবগণেরও সহজাতবৃত্তিসকল সময় সময় আকস্মিক ভ্রমে পতিত হয়; উভয়ই তুল্য। *

শ্রীশশধর রায়।

---

* মানবের জন্ম কথার এক অংশ।

উৎপলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃগয়া-বাহিনী

প্রভাতে নগর মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কুমুদ-নিবাসের নিকট দিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ, নগরের লোকজন সেই পথের দিকে ছুটিয়াছে। বালক বালিকা, যুবক বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক পুরুষ, ধনী দরিদ্র সকলের মুখেই কৌতূহলের চিহ্ন। এত লোকের সমাগম যে, সে রাজপথের পাশে দাঁড়াইবার স্থান নাই। উদ্যান, পুকুর-পার, নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশাখা পর্য্যন্ত—যে কোন স্থান হইতে পথ দৃষ্ট হইতে পারে, সেখানেই লোক। গৃহের ছাদে, অলিন্দে, দ্বারে, গবাক্ষপাশে অসংখ্য স্ত্রীলোক উৎগ্রীব হইয়া পথের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতেছে!

রাজাধিরাজ অশোকদেব মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সেই পথ দিয়া সজ্জিত মৃগয়া-বাহিনী নগর অতিক্রম করিয়া যাইবে। প্রথমতঃ বাদ্যকরের দল দেখা দিল। তুরি, ভেরী, সিঙ্গা, দামামা, জয়ঢাক, খরতাল বাজাইতে বাজাইতে বাদকদল অগ্রসর হইল। তাহার পর শকটশ্রেণী—কোনটি দ্বিচক্র, কোনটির চারিচক্র, কোনটিতে দুই, কোনটীতে চারি অশ্ব সজ্জিত। প্রতিশকটে অস্ত্রধারী যোদ্ধা। তাহার পরে গজবাহিনী। প্রতিগজে চালক এবং দুই কি তিনজন ধনুর্ব্বাণ ভল্ল-ধারী যোদ্ধা। তাহার পর অশ্বারোহীর দল, তাহার পর পদাতিকের দল, তাহার পর আবার হস্তীশ্রেণী, অশ্বের দল। এই সকল হস্তী এবং অশ্বারোহণে দৃঢ়গঠিত বলিষ্ঠকায় আরক্তনেত্র যুবতী যোদ্ধা। ইহাদের পরেই পথের উভয় পার্শ্ব দিয়া দুই দল প্রহরী দীর্ঘ স্থূল রজ্জু আবক্ষ উচ্চ করিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দর্শকবৃন্দকে এই রজ্জু-সীমার দূরে সরাইয়া দিতে লাগিল। সেই রজ্জু সীমার ভিতরে প্রবেশ দূরে থাকুক, কেহ তাহা স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইত। এই সীমার ভিতর দিয়া তখন বহু-সংখ্যক যুবতী প্রহরিণী পদব্রজে আগমন করিতে লাগিল। রাজাধিরাজ অশোক দেবের শরীররক্ষক এই সকল স্ত্রীপ্রহরীদিগের অপূর্ব্ব বেশ। কাহারও বদ্ধকুন্তলে দীর্ঘ কঙ্কতি, কাহারও বা পুষ্পগুচ্ছ; কাহারও দীর্ঘ কেশ-পাশ স্থূল একবেণীবদ্ধ, বেণীমূল বিচিত্র কৌশেয় বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ; কর্ণে কুণ্ডল অথবা বলয়; আরক্ত নয়নে কজ্জল-লেখা; বক্ষ স্কন্ধ পৃষ্ঠদেশ চর্ম্মে আচ্ছাদিত, হস্তে শাণিত বর্শা, ভল্ল; কটিতে অসি। কাহারও হস্তে ধনু, পৃষ্ঠে তূণপূর্ণ শর, কটিতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা।

এই রমণীদলের মধ্যভাগে হস্তী-আরোহণে রাজাধিরাজ অশোকদেব। তাঁহার রাজবেশ, মৃগয়াস্থলে উপস্থিত হইলে এ বেশের পরিবর্ত্তন হইবে। মস্তকে মণিমাণিক্য মুকুট, গাত্রে

স্বর্ণখচিত বহুমূল্য অঙ্গরক্ষিণী, কর্ণে মুক্তাময় বলয়, ললাটে চন্দনলেখা, গলে মুক্তাহার, পদে শুভ্র পাদুকা। হস্তীরও অপূর্ব্ববেশ। তাহার বিশাল দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ স্বর্ণ-কোষে আবৃত, মধ্যভাগে স্বর্ণবলয়, পদচতুষ্টয়ে রৌপ্য নির্ম্মিত স্থূল "খাঁড়ুয়া," ললাট- হইতে শুণ্ডের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এবং দুই কর্ণে গোরোচনা-চর্চ্চা। পৃষ্ঠ হইতে উভয় পার্শ্বে জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত মণিমুক্তার ঝালরযুক্ত বিচিত্র পুরু আস্তরণ। তদুপরি আসীন রাজাধিরাজের শিরে পার্শ্বস্থ পরিচারকধৃত বৃহৎ রাজছত্র; রবিরশ্মিপাতে ছত্রসংসক্ত মণিমুক্তাজাল দীপ্তি পাইতেছিল।

সেই বিরাট বাহিনীর পদভরে এবং দর্শক-বৃন্দের উচ্চ জয়ধ্বনিতে ভূমিতল কম্পিত হইতেছিল। বাহিনী কুমুদ-নিবাসে প্রমীত-সেনের গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রমীতসেন সবন্ধুবান্ধবে পথপার্শ্বে অবনত মস্তকে রাজাধি-রাজের অভিবন্দনা করিলেন। অশোকদেব স্মিতমুখে সকলের প্রতি সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত করিলেন। বাহিনী পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল।

এমন সময় আজানুলম্বিত পীতবাসপরিহিত মুণ্ডিতমস্তক স্থিরনেত্র শীর্ণদেহ এক দীর্ঘকায় পুরুষ প্রহরীধৃত সেই সূত্রসীমার অতি নিকট-বর্ত্তী হইয়া যুক্ত করে উচ্চ গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল;—

"মহারাজ, নগরে গ্রামে লক্ষ লক্ষ প্রজা তোমার রাজ্যে নিরাপদে পরমসুখে বাস করিতেছে; বনের পশুও তোমার প্রজা—"

তাহার বক্তব্য আর শেষ হইল না। অখণ্ড-প্রতাপশালী রাজাধিরাজ অশোকদেবকে কে এমন ভাবে সম্বোধন করিল, দেখিবার জন্য পার্শ্বস্থ লোক সমুৎসুক হইয়া অগ্রসর হইল। লোকের ঠেলাঠেলিতে বক্তার শরীরই রজ্জুর উপর হেলিয়া পড়িল। অমনি ভল্ল-ধারিণী এক ভীমাঙ্গী যুবতী প্রহরিণী ছুটিয়া আসিল, ভল্লদ্বারা বক্তাকে বিদ্ধ করিবার জন্য আঘাত করিল। আঘাত তাহার শরীরে লাগিল না, কিন্তু তাহার পরিহিত পীতবাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বোধ হয়, অতিরিক্ত মৈরেয় পানে প্রমত্তা প্রহরিণী লক্ষ্য স্থির করিতে পারে নাই; সে পুনরায় ভল্ল উত্তোলন করিল। প্রমীতসেন ঘটনা দেখিয়া ক্ষিপ্র-গতিতে অগ্রসর হইলেন এবং বক্তাকে বাহু-বলে পশ্চাতে সরাইয়া নিজে প্রহরিণীর লক্ষ্য হইলেন।

অসম্ভব অতর্কিত সম্বোধনে রাজাধিরাজের দৃষ্টি সেই ভিক্ষুবেশধারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া-ছিল। তিনি প্রহরিণীকে বিরত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, বলিলেন;—

"নগরে ফিরিয়া বিচার করিব।"

তখন সেই বিপুল জনবাহিনী পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রহরিণী রমণীদলের পশ্চাতে আবার পদাতিকের দল, অশ্বারোহীর দল, ভারবাহী অশ্ব শকট এবং গোযান এবং তাহার রক্ষীদল। পরিশেষে দর্শকের দল সেই বাহিনীর অনুসরণ করিয়া চলিল।

এদিকে নগরপালের লোক আসিয়া ভিক্ষু-বেশধারীর হাত ধরিল। চারিদিগের লোক শিহরিয়া উঠিল। ভিক্ষু বন্দী হইলেন, তাঁহাকে ধর্ম্মপালের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। প্রমীতসেন প্রহরিণীর কার্য্যে বাধা দিয়া

ছিলেন, তাঁহাকেও যাইতে হইবে। তখন সেখানে বড় জনতা হইল।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রমীতের প্রতিভূ হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নগরপালের লোক স্বীকার হইল না। ধর্ম্মপালের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

দ্বিতলের গবাক্ষ হইতে উৎপলা এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া অতর্কিতে কাতর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উপস্থিত আত্মীয়া, বয়স্যা, পরিচারিকা, দাসীবর্গ, কোলাহল করিয়া উঠিল। সে চীৎকারধ্বনি প্রমীতের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া গবাক্ষের দিকে চাহিলেন না, কিন্তু হাত উঁচু করিয়া নিষেধ-সঙ্কেত করিলেন। ভিতর-বাড়ী হইতে দাসদাসী অনুচর পরিজন ব্যাকুল-চিত্তে সেখানে ছুটিয়া আসিল।

প্রমীতসেন বলিলেন ;—

"অসঙ্গ, উৎপলার কাছে যাও। উৎপলাকে বুঝাইয়া বল, চিন্তার কোন কারণ নাই। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে, তাঁহাকে বলিয়া আমি এখনি গৃহে ফিরিব।"

অসঙ্গ বলিলেন ;—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব, মৈত্রেয় ভিতরে যাইয়া দেবীকে শান্ত করুন।"

মৈত্রেয় উৎপলার নিকট গেলেন। এ দিকে অসঙ্গ প্রমীতকে বলিলেন ;—

"এই ভিক্ষু কে, চিনিতে পার ?"

"না ইহাঁকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

"আমার সন্দেহ হইতেছে ; না, ইনিই তিনি।"

"কে ?"

"ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ উপগুপ্ত দেব।"

ভিক্ষু উপগুপ্তের নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত। প্রমীত, অসঙ্গ এবং আরও অনেকে তাঁহাকে অভিবন্দনা করিলেন। কিন্তু নগরপালের লোক আর বিলম্ব করিল না তখন উপগুপ্ত, প্রমীত, অসঙ্গ এবং প্রমীতের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে নগরপালের লোকের সঙ্গে ধর্ম্মপালের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরও অনেক লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই নগরে প্রচারিত হইল, ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং কুমুদনিবাসের প্রমীত সেন ধৃত হইয়া ধর্ম্মপালের নিকট নীত হইয়াছেন। উপগুপ্ত যে বিষম অপরাধের কার্য্য করিয়াছেন, সদ্য প্রাণদণ্ডই তাহার নির্দ্দিষ্ট শাস্তি। প্রমীতসেন উপগুপ্তকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজেও অপরাধী হইয়াছেন।

রাজাধিরাজ অশোকদেবের নির্ম্মম শাসন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নগরের লোক ভীত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঋণী না মুগ্ধা ?

পরদিন অপরাহ্নে রাজপুরীর অন্তঃপুর দ্বারে দুইটী যুবতীর সঙ্গে দ্বাররক্ষিণী প্রহরিণী-গণের কথা হইতেছিল। যুবতীদ্বয়ের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা তাঁহার বয়স বিংশ বর্ষের অধিক হইবে না। দ্বিতীয়াও যুবতী, সম্ভবতঃ প্রথমার পরিচারিকা।

অন্তঃপুরের দ্বার খোলা, কিন্তু সেখানে

তিন চারিটী ভীমাঙ্গী যুবতী প্রহরিণীর কার্য্য করিতেছিল। তাহাদের মদবিহ্বল আরক্ত চক্ষে কজ্জল, কর্ণে কুণ্ডল, বদ্ধ কুন্তলে পুষ্প-গুচ্ছ; বক্ষ পৃষ্ঠ বাহুমূল পর্য্যন্ত অশিথিল আংরাখায় আচ্ছাদিত। পরিধানের সাড়ী জানুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত, সাড়ীর অপর অংশ কটি হইতে অতি শিথিল রজ্জু আকারে বক্ষ বাম অংশ এবং পৃষ্ঠদেশ ঘিরিয়া পুনরায় কটিতটে দৃঢ় বেষ্টিত। কটিবন্ধে কোষবদ্ধ অসি। নিকটে প্রাচীরগাত্রে লগ্ন শাণিত ভল্ল এবং বর্শা।

প্রহরিণীদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল;—

"কি প্রয়োজন কাহার সঙ্গে দেখা করিবে?"

বয়ঃকনিষ্ঠা বলিলেন;—

"মহাদেবী কারুবকীর চরণদর্শন জন্য আসিয়াছি।"

"তাঁহার সঙ্গে এখন দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, তিনি প্রমোদ-কক্ষে আছেন।"

'দেবী সংবাদ পাইলে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে পারেন, তোমরা কেহ অনুগ্রহ করিয়া সংবাদ দাও।"

"আমাদের কাহারও অবসর নাই।"

পরিচারিকা কহিল;—"রাজ্ঞীর কৃপায় সময় সময় আমরা তাঁহার চরণদর্শন লাভ করিয়া থাকি। তোমরা কেহ দয়া করিলেই আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়।"

"তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে, আমাদের কি লাভ?"

বয়ঃকনিষ্ঠা সুন্দরী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে তখন প্রহরিণীকে কি যেন বলিলেন। প্রহরিণী কিছু মৃদুভাব ধারণ করিল এবং রমণীদ্বয়কে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রহরিণী ফিরিয়া আসিয়া রমণীদ্বয়কে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

রাজাধিরাজ অশোকের বহু স্ত্রী, বহু পুত্র-কন্যা। অন্তঃপুর মধ্যে রাজ্ঞীদিগের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, পরিচারিকা, দাসী ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রহরিণী রাজ্ঞী কারুবকীর গৃহাভিমুখে যুবতীদ্বয়কে লইয়া চলিল, পথেই দেবীর প্রিয় পরিচারিকা লীলার সঙ্গে দেখা হইল। তখন প্রহরিণী রমণীদ্বয়কে তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। পরিচারিকা যুবতীদিগকে চিনিত, বয়ঃকনিষ্ঠাকে বলিল;—

"অনেক দিন পরে যে!"

"অনেকদিন পরেই এসেছি। দ্বারে কয়েকটী অপরিচিত প্রহরিণী, ভিতরে প্রবেশে বিলম্ব হইল। দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?"

"উজ্জয়িনী হইতে এক বীণাবাদিনী গায়িকা আসিয়াছে, দেবী প্রমোদকক্ষে তাহার গীত শুনিতেছেন। চল, তুমি আসিয়াছ, সোনায় সোহাগা!"

"গীত কখন আরম্ভ হইয়াছে?"

"অনেকক্ষণ, এখন শেষ হইয়া আসিল।"

"শেষ হইলেই ভাল।"

"কেন? তুমি আসিয়াছ, দেবী কি তোমাকে ছাড়িবেন?"

"আজ চিত্তে সুখ নাই, গাহিতে না হইলেই বাঁচি।"

"কি হইয়াছে?—চল, তোমার প্রতি দেবীর অসীম দয়া।"

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সম্মুখের কক্ষ

হইতে বীণার স্বরলয়যুক্ত মধুর গীতধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। পরিচারিকা যুবতীদ্বয়কে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

সুসজ্জিত বৃহৎ কক্ষ। তলদেশ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে আচ্ছাদিত। প্রাচীরে নানা বর্ণের প্রস্তর-বিন্যাসে গ্রথিত বিচিত্র ফল-ফুল পত্র পল্লবের চিত্র, ময়ূরময়ূরী হংস কারণ্ডবের চিত্র, সশাবক মৃগমিথুনের চিত্র। স্থানে স্থানে প্রাচীরগাত্রে খোদিত ছোট ছোট ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ গহ্বরে ছোট ছোট হস্তী, অশ্ব, সবৎসা গাভীর প্রস্তরময় সুদৃশ্য প্রতি-মূর্ত্তি। আর কীলকে কীলকে বিলম্বিত সুরভি ফুলের মালা। মেঝের একপার্শ্বে একখানি আসনে বসিয়া একটী যুবতী বীণার স্বর-লয়ে গান করিতেছিল। নিকটে পৃথক্ আসনে আরও কয়েকটী রমণী। কক্ষের প্রায় মধ্যস্থলে একখানি পালঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় বসিয়া রাজাধিরাজ অশোকদেবের প্রিয়তমা রাজ্ঞী দেবী কারুবকী গান শুনিতেছিলেন। রাজ্ঞীসুলভ অলঙ্কার-সজ্জা তাঁহার কিছুই ছিল না। একমাত্র শিথিল বদ্ধবেণী তাঁহার নিবিড় বিপুল কেশরাশি পার্শ্বস্থ উপাধানের উপর দিয়া শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। শিরোদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা, কর্ণে মতিময় কুণ্ডল, কপোলে চন্দন-লেপ, আর গলদেশে মুক্তাহার। যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিবয়স্কা রাজ্ঞী কারুবকীর স্থির সৌম্যমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব কোমলতা প্রতিভাত হইতেছিল। দেবীর উজ্জ্বল, কোমল নয়নদ্বয় আনত, আর্দ্রপক্ষ্ম— গায়িকা অবশ্যই কোন করুণ গাথা গাহিতেছিল।

গীত শেষ হইল। এমন সময় রমণীদ্বয় পরিচারিকা লীলার সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেবী তাহাদিগকে দেখিয়াই বয়ঃকনিষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা!"

মঞ্জুলা সসম্ভ্রমে মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া দেবীর চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল এবং কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া নতমস্তকে বলিল ;—

"দাসী শ্রীচরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছে।"

"মঞ্জুলা, এবার অনেক দিন পরে তোমাকে দেখিলাম, ভাল আছ ত ?"

"দেবীর আশীর্ব্বাদে ভালই আছি—"

বলিয়া মঞ্জুলা থামিয়া গেল।

"কি বলিতেছিলে, থামিলে কেন ?"

দেবী চাহিয়া দেখিলেন, মঞ্জুলার পরিচিত প্রফুল্ল মুখ আজ যেন কেমন উদ্বেগময়, তাহার নিত্য হাসিময় চঞ্চল চক্ষু আজ যেন কেমন স্থির, কেমন যেন বিষণ্ণ। দেবী বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কি হইয়াছে ? আজ তোমার এ ভাব কেন ?"

মঞ্জুলা মস্তক নত করিয়া রহিল। পরিচারিকার ইঙ্গিতে গায়িকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল ; অন্য রমণীরাও ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দেবী বলিলেন ;—

"কি বলিতে আসিয়াছ ? কাছে এস, বল

মঞ্জুলা দেবীর নিকটে আসিল। দেবী তাহাকে বসিতে বলিলেন। মঞ্জুলা আসন ছাড়িয়া দেবীর পদমূলে ভূমিতে বসিল।

"কি বলিতেছিলে, বল।"

"শ্রীচরণে এক প্রার্থনা আছে।"

"কি প্রার্থনা?"

"রাজাধিরাজ কাল্য গয়ায় গিয়াছেন—"

"তা ত জানি। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তোমার কোন অশুভ

"না।"

"তবে কি?"

"মহাত্মা ভিক্ষু উপগুপ্ত দেব বন্দী হইয়াছেন।"

"তা ও জানি।"

"যদি জান, মা, তবে এখন তাঁহার রক্ষার উপায় কর।"

"ভিক্ষু অপরাধ করিয়াছেন, রাজাধিরাজ তাহার বিচার করিবেন। আমার কাছে কেন?"

মঞ্জুলা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। বড় আশা করিয়া মঞ্জুলা আসিয়াছে, দেবী অবশ্যই একটা উপায় করিবেন। কিন্তু সকল আশা মিছা হইতে চলিল!

মঞ্জুলা বলিল ;—

"আমি শুনিয়াছি, ভিক্ষুদেবকে আপনি ভক্তি করেন।"

"তুমি তাঁহাকে চেন?"

"তাঁহাকে কে না চেনে? আমিও দু-একবার তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

দেবীর আয়ত চক্ষু স্থির নিস্পন্দ হইল। মঞ্জুলা বলিতে লাগিল ;—

"অভাগিনীর আমন্ত্রণে একদিন ভিক্ষুদেব আমার পাপগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।"

দেবী গদগদকণ্ঠে বলিলেন ;—

"তোমার গৃহ পাপগৃহ নহে, মঞ্জুলা।"

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া রহিল।

দেবী বলিলেন—"দেবতার আশীর্ব্বাদে তোমার গৃহে পুণ্যাত্মার সমাগম হইয়াছিল।"

উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই হাতে দেবীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া তাহাতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল। দেবী তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন ;—

"ভিক্ষুদেবের অপরাধ অতি গুরুতর, বিশেষতঃ বৌদ্ধ অপরাধীরা কেহই সহজে রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তথাপি আমার পিতৃদেবের উপদেষ্টাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা আমি করিব। কাজ বড় কঠিন, কিন্তু তুমি নিরাশ হইও না।"

মঞ্জুলা তখন দেবীর পাদমূলে ভূমিতলে পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিল।

"মঞ্জুলা, ভিক্ষুদেবকে কি নগরে অনেকেই চিনে?"

"গৃহে গৃহে তাঁহার নাম, তাঁহার প্রসঙ্গ। সংসারত্যাগী মোহমুক্ত দয়ামায়ার মূর্ত্তি ভিক্ষুদেবকে ত সকলেই পূজা করে।"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেবী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন।

সন্ধ্যা হইল। গন্ধ-তৈলপূর্ণ স্বর্ণ প্রদীপের আলোকে কক্ষ আলোকিত হইল, গুগ্‌গুলের সুগন্ধে সমস্ত অন্তঃপুর সুরভিত হইল, পূজাগৃহে সান্ধ্যবন্দনা-সূচক শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। দেবী বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা একাকিনী আসিয়াছ? কেমন করিয়া যাইবে?"

"আমার সঙ্গে চঞ্চলা আসিয়াছে, বহির্দ্বারে শিবিকা সহ ভৃত্য বাহক অপেক্ষা করিতেছে।"

"উত্তম। ভিক্ষুদেবকে রক্ষার উপায় আমি করিব। সন্ধ্যা হইয়াছে, তুমি আর বিলম্ব করিও না।"

মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আরও যেন কি বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না। দেবী বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন—

"আর কি?"

মঞ্জুলা ইতস্ততঃ করিল, মুখ নত করিল শেষে বলিল—

"আরও এক জনকে নগরপালের লোক বন্দী করিয়াছে।"

"তাহাও জানি। প্রমীতসেনকে আবদ্ধ করিয়াছে।"

"তাঁহার কি উপায় হইবে?

দেবী বিস্মিত হইলেন, প্রমীতের সঙ্গে মঞ্জুলার কি সম্বন্ধ? তিনি বলিলেন;—

"প্রমীতসেনের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে? তিনি তোমার কে?

মঞ্জুলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, দেবী এ কিরূপ প্রশ্ন করিতেছেন!

"তিনি আমার—আমার কেহ নহেন। একদিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

"অপরিচিত এক জনকে একদিন মাত্র দেখিয়াছ, তাহার জন্য এত ব্যস্ততা কেন?"

মঞ্জুলা অতি মৃদুস্বরে বলিল;—

"তাঁহাকে একদিন মাত্র দেখিয়াছি, কিন্তু সেই একদিন তিনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি চিরজীবন তাঁহার নিকট ঋণী।"

"কি হইয়াছিল?"

মঞ্জুলা তখন ধীরে ধীরে সেই ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগের সন্ধ্যাকালে নগরোপকণ্ঠে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রমণ এবং প্রমীতসেন কর্ত্তৃক নিজের উদ্ধার বিবরণ দেবীর নিকট বিবৃত করিল।

নগর জুড়িয়া প্রমীতসেনের প্রশংসা। রাজাধিরাজের মুখে প্রমীতসেনের কথা দেবী ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। প্রমীতসেন মৃত অমাত্য শূরসেনের পুত্র, অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী; রূপগুণে মান-মর্য্যাদায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে নগরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ যুবক, রাজাধিরাজের প্রিয় সভাসদ।

দেবীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা, না—তরুণ হৃদয়ে অচিরজাত প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি কোন নবীন ভাবের মোহকর প্রভাব? চির ঋণী না প্রেম মুগ্ধা? হঠাৎ একদিনে, এক নিমেষে ত কত অজেয় দুর্গ বিজিত হইয়া থাকে! এ যদি তাহাই হয়! দেবীর অনুসন্ধায়ী দৃষ্টিতে আরক্ত মুখ অবনত করিল।

"তাহার পর আর কোন দিন তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই?"

"না।"

"তিনিও সে রাত্রির পর আর তোমার কোন তত্ত্ব করেন নাই।"

"না; আমি যে কে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। আমি নিজ পরিচয় তাঁহাকে দিই নাই।"

"তাঁহার পরিচয় কেমন করিয়া পাইলে?'

"আমি—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

দেবী কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—

"মঞ্জুলা, শুনিয়াছি, তোমার গৃহে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পণ্ডিত লোকের সমাগম হইয়া থাকে, প্রমীত সেন কোন দিন সেখানে যান নাই?"

"না।"

"যিনি তোমার এত উপকার করিয়াছেন, একটি দিন তুমি তাঁহাকে আমন্ত্রণ কর নাই!"

"সাহস পাই নাই; তিনি কি আসিবেন?"

"কেন সন্দেহ কর?"

মঞ্জুলা নীরব হইয়া রহিল। মহারাজ্ঞী বলিলেন;—"দেখ, রূপে গুণে ধনসম্পদে তুমি যে দুর্লভা, তাহা তুমি জান না।—রাজাধিরাজ বলিয়াছেন, তোমার বিবাহে স্বয়ং তিনি উপস্থিত থাকিবেন।"

মঞ্জুলার মুখ আকর্ণ, রক্তাভ; শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহার বক্ষ বিকম্পিত হইল। দেবী ত কোন দিন তাহার সঙ্গে এভাবের আলাপ করেন নাই!

রাজ্ঞী পুনরায় বলিলেন;—

"মঞ্জুলা, আজ অনেক কথা বলিলাম। তুমি এখন আর বালিকা নও, তুমি ভিক্ষুণীও নও; সংসারে আছ, সংসারী হও। রাজাধিরাজেরও তাহাই ইচ্ছা। প্রমীত সেন কোন অপরাধের কার্য্য করেন নাই, তাঁহার জন্য কোন আশঙ্কা করিও না; রাত্রি প্রভাতে তিনি মুক্ত হইয়া গৃহে যাইবেন। রাত্রি হইল, তুমি এখন গৃহে যাও।"

রাজ্ঞী মঞ্জুলাকে কাছে আনিয়া স্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিলেন। অবনমিত মস্তকে, থরকম্পিত হৃদয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া মঞ্জুলা বিদায় হইল। রাজ-পরিচারিকা লীলা অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বহির্দ্বারে তাহাকে শিবিকায় উঠাইয়া দিবার জন্য প্রহরিণীকে আদেশ জানাইয়া ফিরিয়া গেল।

(ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

-:*:-

বিষ্ণুপুরাণ।

এই পুরাণে শান্তনু হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, তাহার সহিত মহাভারতের কোন অনৈক্য নাই। ঐ পুরাণের ৪র্থ অংশ ২০ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়া পরীক্ষিতের উল্লেখকালে পরাশর বলিয়াছেন—

"যোঽয়ং সাম্প্রতং এতদ্ ভূমণ্ডলং ধর্ম্মেণ পালয়তি"

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত বংশাবলী বিষ্ণুপুরাণে পরীক্ষিতের সময়েই লেখা হয়। বিষ্ণুপুরাণের বক্তা ব্যাসের পিতা পরাশর, সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের বংশাবলীর প্রথম সংস্করণ পরীক্ষিতের সময় হওয়া অসম্ভব নহে। প্রাগুক্ত ৪র্থ অংশের ২১ হইতে ২৩ পর্য্যন্ত অধ্যায়ে ভবিষ্য বংশাবলী দেওয়া আছে। ২১ অধ্যায় যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইতে

বেশ বুঝা যায় যে ভবিষ্যবংশ পরে ভিন্ন সময়ে পুরাণে প্রবিষ্ট। পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত বংশাবলী শুনিয়া মৈত্রেয়ের কৌতূহল মিটিল না, তিনি ভবিষ্যবংশ বলিতে লাগিলেন। ২১ অধ্যায়ের প্রারম্ভেও বলা হইয়াছে যে সম্প্রতি পরীক্ষিৎ রাজা এবং জনমেজয় প্রভৃতি তাঁহার চারি পুত্র ভাবিকালে হইবে। মগধের ভবিষ্যবংশও যে ক্রমশঃ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন ঐ পুরাণে পাওয়া যায়। আধুনিক সময়ে যেমন পুস্তকাদির সংস্করণ হইয়া থাকে ও পর-পরবর্ত্তী সংস্করণে পুস্তকের আকার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ পুরাকালে পুরাণাদিরও ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ হইয়াছিল এবং সেই সেই সংস্করণে ভবিষ্যবংশ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিক ও প্রাচীন সংস্করণে প্রভেদ এই যে, আধুনিক সংস্কর্ত্তা যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থকার অপেক্ষা আপনাকে অধিক প্রকটিত করেন; আর প্রাচীন সংস্কর্ত্তা নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া গ্রন্থকারকেই ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া ফেলেন। সেই জন্যই প্রাচীন পুস্তকের বয়স নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। পুরাণের ভবিষ্যবংশে যবন তুখার প্রভৃতি নাম দেখিয়া পণ্ডিত H. H. Wilson পুরাণগুলিকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়াছিলেন। কিন্তু Alberuni প্রভৃতি মহম্মদীয়গণ পুরাণের উল্লেখ করায় বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণও পুরাণগুলিকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পুরাণ শব্দের উল্লেখ ভর্তৃহরি, মহাভাষ্য, পাণিনি প্রভৃতি সকল প্রাচীন গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিরোধের সমন্বয় এই রূপে করা যাইতে পারে যে, পুরাণগুলির পঞ্চম সংস্করণ বহু প্রাচীন এবং ক্রমশঃ অজ্ঞাতনামা সংস্কর্ত্তা কর্ত্তৃক তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ খৃষ্টের জন্মের পরও হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের চন্দ্রবংশের আদি সংস্করণ পরীক্ষিতের সময় হয় ও পরপরবর্ত্তী সংস্করণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত হইয়াছিল বলিলে ঐ পুরাণের উক্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের বিরোধী হয় না। সুতরাং তাহা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত। একারণ আমরা বলিতে পারি যে মহাভারতের ইতিবৃত্ত, পরীক্ষিতের সময় হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত মূল গ্রন্থকার ও পর-পরবর্ত্তী অজ্ঞাতনামা প্রচ্ছন্ন সংস্কর্ত্তৃগণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন।

(খ) ব্রহ্মাণ্ড।

এই পুরাণেও পাণ্ডবগণের ইতিবৃত্ত আছে। ইহার প্রথম সংস্করণ যে পরীক্ষিতের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র অধিসীম কৃষ্ণের সময় হয় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে। অনুষঙ্গপাদে অভিমন্যুর পর পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র জনমেজয় ও পৌত্র শতানীক ও প্রপৌত্র অশ্বমেধ দত্ত ও বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পরপুরঞ্জয় বা অধিসীম কৃষ্ণ পর্য্যন্তের উল্লেখ করিয়া সূত বলিতেছেন—

অধিসীমঃ কৃষ্ণো ধর্ম্মাত্মা সাম্প্রতোঽয়ং মহাযশাঃ।
যস্মিন্ প্রশাসতি মহীং যুষ্মাভিরিদমাহৃতম্॥
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রীণি বর্ষাণি দুশ্চরম্।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ॥

হে দ্বিজোত্তমগণ এক্ষণে ধর্ম্মাত্মা মহাযশা অধিসীম কৃষ্ণই রাজা। তাঁহার রাজ্যকালে আপনারা এই দুর্লভ দুশ্চর দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ ৫ বৎসর কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বতীতীরে করিতেছেন।

সূত এইরূপ অধিসীম কৃষ্ণ পর্য্যন্ত পরিচয় দিবার পর ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন--

শ্রোতুং ভবিষ্যমিচ্ছামঃ প্রজানাং বৈ মহামতে।
সূতসার্দ্ধং নৃপৈর্ভাবং ব্যতীতং কীর্ত্তিতং ত্বয়া ॥

হে মহামতে সূত! আপনি যে সকল অতীত নৃপতিগণের কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহাদের সহিত ভবিষ্য নৃপগণের কীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ গৌরচন্দ্রিকার পর সূত ভবিষ্যবংশ আরম্ভ করিলেন এবং নিচক্ষুঃ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত নাম করিলেন। মগধের ভবিষ্যবংশও এইরূপ গৌরচন্দ্রিকার পর আরব্ধ। জরাসন্ধ-সুত সহদেব ভারতসংগ্রামে নিহত হন উল্লেখ করিয়া ক্ষোমাধি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বাইদ্রথ নৃপগণের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ প্রণালী হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভবিষ্যবংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কর্ত্তা প্রচ্ছন্নভাবে পুরাণে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় অস্তিত্ব ডুবাইতে চেষ্টা করিলেও অস্তিত্বের কিছু কিছু নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। এই জন্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের আদি সংস্করণ অধিসীম কৃষ্ণের সময় হইয়াছে ও ভবিষ্যবংশ ক্রমশঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত সত্য। সুতরাং অধিসীম কৃষ্ণের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য এবং তাঁহার সময় হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্ব বিশ্বস্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

বায়ু পুরাণ

বায়ু পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুযায়ী বংশাবলী দেওয়া আছে। উহারও প্রথম সংস্করণ যে অধিসীম কৃষ্ণের সময়ে হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেখান যাইতে পারে। ঐ পুরাণের শেষ সংস্করণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হইয়া থাকিলে উহা হইতেও প্রকাশ পায় যে অধিসীম কৃষ্ণের সময় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্রন্থকার ও সংস্কর্ত্তা সকলেই যুধিষ্ঠিরাদিকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মৎস্য পুরাণ

মৎস্য পুরাণের চন্দ্রবংশ যে অধিসীম কৃষ্ণের সময় প্রথম লিখিত এবং ভবিষ্য-বংশাবলী তৎপরে ক্রমশঃ অন্তর্নিবিষ্ট হয় তাহা পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে প্রকাশ। ৬৫,৬৬ ও ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে সূত বলিতেছেন—

জনমেজয়াচ্ছতানীক স্তস্মাজ্জজ্ঞে সবীর্য্যবান্।
জনমেজয়ঃ শতানীকং পুত্রং রাজ্যেঽভিষিক্তবান্ ॥
অথাশ্বমেধত্রয়েণ শতানীকাৎ সবীর্য্যবান্।
জজ্ঞেঽশ্বমেধদত্তাখ্যঃ যুতস্তস্মাৎ সবীর্য্যবান্ ॥
জজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ।
তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রন্তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতম্ ॥
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রীণি বর্ষাণি দুশ্চরম্।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বত্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥

জনমেজয় হইতে বীর্য্যবান্ শতানীক জন্মে। জনমেজয় পুত্র শতানীককে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করায় শতানীকের প্রবল পরাক্রান্ত অশ্বমেধ দত্ত নামক পুত্র হয়। শতানীক-নন্দন অশ্বমেধ দত্তের অধিসীম কৃষ্ণ নামক পুত্র জন্মে, সেই মহাযশাই সম্প্রতি রাজা। তাঁহার রাজ্যকালেই হে দ্বিজোত্তমগণ আপনারা এই দুরাপ, দুশ্চর, দীর্ঘসত্র যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বতীতীরে পঞ্চ বর্ষ ধরিয়া করিতেছেন। সূত এইরূপে অধিসীম কৃষ্ণ পর্য্যন্ত বংশ উল্লেখ করিবার পর মুনিগণ তাঁহাকে

ভবিষ্যবংশ বলিতে অনুরোধ করিলেন। শৌতি তদনুসারে নিচক্ষুঃ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত পাণ্ডু-বংশ বর্ণনা করিলেন। মগধের ভবিষ্যবংশও ঐরূপ গৌরচন্দ্রিকার পর ২৭১ অধ্যায়ে বিবৃত। সুতরাং মৎস্য পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিসীম কৃষ্ণ হইতে অন্ধ্রবংশ পর্য্যন্ত যত সংকর্ত্তা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া বংশাবলীর সংস্করণ করিয়াছেন সকলেই যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত্

ভাগবতের প্রথম সংস্করণ যে পরীক্ষিতের সময় হয় তাহা ভাগবতেই প্রকাশ। ব্যাসপুত্র শুকদেব ভাগবতের বক্তা ও পরীক্ষিৎ শ্রোতা। শুকদেব যে কল্পিত পুরুষ নহেন তাহা পতঞ্জলি, শাকটায়ন প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণ মহাশয়দের কৃপায় জানা যায়। সুতরাং ভাগবতের সারাংশ যে পরীক্ষিতের নিকট কথিত হয় তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ভাগবতের বর্ত্তমান আকার যে সংকর্ত্তারই কৃত হউক না কেন, উপরোক্ত যুক্তিবলে ইহাদ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে পরীক্ষিতের কাল হইতে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরাদির ঐতিহাসিকতা স্বীকৃত।

ব্যাকরণ

শকটায়ন

মহাভারতের ঐতিহাসিকতার দ্বিতীয় প্রমাণ ব্যাকরণ। পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন শকটায়নও যে স্বীয় ব্যাকরণে ব্যাস, বাসুদেব, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাভারতের চরিত্রগুলি, যে প্রকৃত জীব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন তাহা মহাভারতের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখান হইবে।

পাণিনি

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এবং গণসূত্রে আমরা মহাভারতের যাবতীয় চরিত্রেরই নাম পাই। ইহা মহাভারতের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখান গিয়াছে।

কাত্যায়ন

বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ব্যাসদেবের ও তৎপুত্রের ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ও প্রশিষ্য কঠ এবং চরকগণের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতের অন্যান্য চরিত্রও যে কাত্যায়নের বিদিত ছিল, তাহা পরে দেখান হইবে।

পতঞ্জলি

মহাভাষ্যে ভীম, নকুল, সহদেব প্রভৃতি কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের, শুকের, বৈশম্পায়নের এবং তচ্ছিষ্য কঠের ও কঠশিষ্য খাড়ায়নের নামও আছে।

ভর্ত্তৃহরি

ভর্ত্তৃহরিও স্বীয় কারিকায় কংসাদির উল্লেখ করিয়াছেন।

(ক্রমশ)

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন পুরাতন মোগল রাজধানী আগ্রানগরী ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়, সেই সময় স্বর্গীয় নীলাম্বর সেন মহাশয় চাকরী উপলক্ষে আগ্রায় আগমন করেন; ইঁহার মাতামহ, মাতুল প্রভৃতি তখন আগ্রায় কমিসেরিয়েটএজেণ্টের কার্য্য করিতেন।

স্বর্গীয় নীলাম্বর সেনের জন্মভূমি ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী নাটাগড় গ্রাম। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন—নাটাগড় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ইঁহাদের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। নীলাম্বর বাবুর পিতামহ রামকান্ত সেন তদানীন্তন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবিরাজ ছিলেন—আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'লক্ষণ' চিকিৎসায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তদীয় পুত্রগণও পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ-পুত্র রামানন্দের টোল ছিল—তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন এবং স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। মধ্যম গঙ্গানারায়ণ মুর্শিদাবাদে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন। নীলাম্বর বাবুর পিতা রাজনারায়ণও পাণ্ডিত্যে পিতার উপ-যুক্ত পুত্র ছিলেন।

সেকালে বাংলাদেশ হইতে যাহারা আগ্রায় আসিতে পারিত—তাহারা অর্থ উপার্জ্জনেও কৃতকার্য্য হইত। পুঁথিগত বিদ্যা সামান্য থাকিলেও নীলাম্বর বাবু, কর্ম্মনিষ্ঠা পরিশ্রম ও সততার গুণে ক্রমে ক্রমে আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হয়েন এবং বহুকাল ধরিয়া প্রশংসা ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬১ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নীলাম্বর বাবু যে প্রকার সর্ব্ব-জনপ্রিয় ছিলেন—তাহা তখনকার কালেও দুর্লভ ছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের জজ প্রভৃতি উচ্চ ইংরাজরাজকর্ম্মচারী হইতে আগ্রার জনসাধারণ সকলেই ইঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। চরিত্রবলে এবং অমায়িক ব্যব-হারে তিনি সকলের প্রীতি ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার জীবনের এক সময়ের ঘটনা হইতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝা যাইবে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন সর্দ্দার হরিসিং তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ জাঠসৈন্য লইয়া আগ্রা আক্রমণ করিলেন—তখন সকল ইংরাজ কর্ম্ম-চারীকেই সপরিবারে আগ্রাদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। বাঙ্গালীরা ইংরাজভক্ত বলিয়া তাহাদের উপর বিদ্রোহীদিগের বিশেষ আক্রোশ—তাই জজ সাহেব প্রভৃতি নীলাম্বর বাবুকেও সপরিবারে দুর্গে থাকিবার জন্য বলিলেন, কিন্তু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নীলাম্বর বাবু তাহাতে রাজী হইলেন না—সাহেবেরা তাঁহার এ প্রকার নির্ভীকতায় বিস্মিত হইলেন। নীলাম্বর বাবু আদালতের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজাদি বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজ গৃহে আনাইয়া রাখিলেন। জজ সাহেব,

আদালত-ট্রেজারির দশহাজার টাকা দিয়া বলিলেন—ইহার মধ্যে যাহা দরকার হইবে খরচ করিয়া যেন তিনি আদালতের কাগজাত প্রভৃতি রক্ষা করেন। বিদ্রোহ শান্ত হইলে নীলাম্বর বাবু এই টাকা ও কাগজাদি আদালতে জমা করিয়া দিলেন। বিদ্রোহ দমন হইয়া যখন পুনরায় ইংরাজরাজ্য স্থাপিত হইল, তখন যে কেহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে বা লুটপাটে যোগদান করিয়াছিল সন্দেহ মাত্রেই তাহাদের ফাঁসী কিম্বা কারাবাসের হুকুম হইতে লাগিল—অপরাধী নিরপরাধী বিচারে তখন সময় বা প্রবৃত্তি ছিল না। সে সময় নীলাম্বর বাবু অনেকের ধন, মান এবং প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত এবং প্রতিবেশী সকলকেই তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন —তিনি যাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়াছেন, তাহার গায়ে আঁচও লাগে নাই; তাঁহার উপর জজদিগের এমনি একান্ত বিশ্বাস ছিল।

নীলাম্বর বাবুর অতিথিসেবা তখনকার দিনে সুপরিচিত ছিল। আগ্রায় যে কেহ বাঙ্গালী আসিতেন—সকলেই তাঁহার গৃহে অতিথি হইতেন—একবারে অধিকসংখ্যক হইলে অন্যান্য বাঙ্গালীর বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দিতেন। নিজের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না, অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হইয়াও তিনি অতিথিসেবা করিতেন। পুত্রদিগকে সর্ব্বদা বলিতেন যে যতদিন নিজে খাইতে পাইবে ততদিন যেন গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ না করা হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসারচন্দ্র এবং তৃতীয় পুত্র দিল্লীর সুবিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গগত হেমচন্দ্র কেমন করিয়া পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান-কালের বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন।

নীলাম্বর বাবুর পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা। পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সংসারচন্দ্র, দ্বিতীয় নবীনচন্দ্র, তৃতীয় স্বনামধন্য স্বর্গীয় ডাক্তার হেমচন্দ্র, চতুর্থ স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র,—ইনি জয়পুর মিউনিসিপালিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন; পঞ্চম কলিকাতার বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার শরৎচন্দ্র (S. C. Sen)।

সংসারচন্দ্র ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১২ এপ্রেল আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। সেইখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া একাদশ বৎসর বয়সে তথাকার গভর্ণমেণ্ট কলিজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে আগ্রা সেণ্টজন কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। পাঠাবস্থায় সংসারচন্দ্র তাঁহার ধীরবুদ্ধি, প্রখর-স্মরণশক্তি, পাঠে অভিনিবেশ এবং অমায়িক ব্যবহারে শিক্ষক এবং সহাধ্যায়িগণের প্রীতি আকর্ষণ করেন। প্রবীণ বয়সে তাঁহার সতীর্থগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বা তাহাদের কথা আলোচনা করিবার সময়, সংসারচন্দ্র যেন আবার বালক হইতেন—কৈশোরের ভালবাসায় তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত।

প্রবেশিকা পাশের পর ফার্ষ্ট আর্টস পড়িবার জন্য সংসারচন্দ্র কলিকাতায় প্রেরিত হ'ন এবং তথায় কেথিড্রেল মিশন কলেজে ভর্ত্তি হ'ন—কিন্তু কলিকাতায় গিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাকে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া পুনরায় আগ্রায় আসিতে হয়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্ব-

প্রথম পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট, সাহিত্যানুরাগী, সুপণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা হেরম্বজননীর সহিত শুভ বিবাহ হইল। বিবাহের পর তিনি আগ্রার তদানীন্তন প্রধান উকীল ৺প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আইন শিক্ষা করিয়া ওকালতি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্যারীমোহন বাবু পূর্ব্বে মুন্সেফ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিজে এক সেনাদল গঠন করিয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের হস্ত হইতে অনেকের প্রাণ ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করেন—এজন্য তিনি (Fighting Munsiff) বা যোদ্ধা মুন্সেফ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। পেন্‌সন্‌ লইয়া তিনি আগ্রায় ওকালতি করিতেন।

ভারতে তখন সর্ব্বত্র রেল হয় নাই—বাংলা দেশ হইতে যাঁহারা মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থে আসিতেন, তাঁহাদের আগ্রার পথে যাইতে হইত। জয়পুর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় স্বনামধন্য স্বর্গীয় হরিমোহন সেন মহাশয়কে প্রায়ই জয়পুর আসিতে হইত, পথে তিনি আগ্রায় নীলাম্বর বাবুর অতিথি হইতেন। সংসারচন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়া তিনি নীলাম্বর বাবুকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন সংসারচন্দ্রকে জয়পুরে পাঠান, সেখানে তিনি তাঁহার চাকরী করিয়া দিবেন।

স্বর্গীয় হরিমোহন সেন পূর্ব্বে বেঙ্গলব্যাঙ্কে মিণ্ট ও কারেন্সি বিভাগের দেওয়ান ছিলেন—বিদ্যা, বুদ্ধি এবং তেজস্বিতায় তিনি তৎকালের গভর্ণর জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা, সম্মান ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে হরিমোহন বাবু তীর্থপর্য্যটনকালে জয়পুর আসিয়া নগরের সাঙ্গানের দরওয়াজায় কোন এক ধর্ম্মশালায় অবস্থান করেন। সেখানে তাঁহার দ্রব্যাদি চুরি যায়। থানেদার সে বিষয়ে মনোযোগ না করায় তিনি মহারাজ রামসিংহের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করিতে মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ করেন। গুণগ্রাহী মহারাজ রামসিংহ তাঁহার সহিত আলাপে তাঁর জ্ঞান, বহুদর্শিতা এবং যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে জয়পুরে রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। নানা কারণে হরিমোহন বাবু তখন মহারাজের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত সিউদীনের মৃত্যুর পর মহারাজ পুনরায় হরিমোহন বাবুকে জয়পুরে আনিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে জয়পুরে অবস্থান করিয়া রাজকার্য্যে পরামর্শাদি দেওয়া ব্যতীত হরিমোহন বাবু সে সময়েও স্থায়ী ভাবে কার্য্যগ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার তিন বৎসর পরে মহারাজ, হরিমোহন বাবুকে নবপ্রতিষ্ঠিত "জয়পুর রয়েল কৌন্সিলের" সেক্রেটারী ও অন্যতম সদস্যের পদে নিযুক্ত করেন।

হরিমোহন বাবু অসাধারণ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ এবং কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে মহারাজ রামসিংহ জয়পুর রাজ্যের শাসনপ্রণালীর নানাবিধ সংস্কার এবং বিবিধ নূতন বিধিব্যবস্থার প্রচলন করেন। জয়পুরের মন্ত্রীসভা (Royal Council) সংস্থাপনের মূলে হরিমোহন বাবু। সেকালের দেশীয় রাজ্যের কুসংস্কার এবং কুচক্র ভেদ করিয়া

তিনি জয়পুর রাজ্যে যে সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন এবং উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহাই তাঁর দক্ষতা এবং দূর-দর্শিতার পরিচায়ক। হরিমোহন বাবু ইংরাজী, সংস্কৃত, ফার্সি এবং উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভাষায় তাঁর এমন দখল ছিল এবং স্মরণশক্তি এত প্রখর ছিল যে, তিনি একই কালে ৪।৫ জনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাষায় ৪।৫ খানি পৃথক্ পত্র লেখাইতেন—লেখার সময় কখনও কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেন না যে, কোন্ পর্য্যন্ত তাহাকে বলিয়াছেন। জয়পুরের স্বর্গীয় মন্ত্রীবর কান্তিচন্দ্র, সংসারচন্দ্র, এবং নিজপুত্রগণের মধ্যে যদুনাথ এবং মহেন্দ্রনাথ (ইঁহারা পরে জয়পুর কৌন্সিলের মেম্বর হন) — ইঁহারা হরিমোহন বাবুর সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেন। ইঁহাদের সকলেরই রাজকার্য্যের প্রথম শিক্ষা হরিমোহন বাবুর নিকট।

প্রধানতঃ হরিমোহন বাবুর পরামর্শেই মহারাজ রামসিংহ গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে কলিকাতায় গমন করেন। কলিকাতায় গিয়া হরিমোহন বাবু মহারাজকে তথাকার কৌন্সিল-হল, কলেজ, হাঁসপাতাল, মিউজিয়াম, পশুশালা, জলের ও গ্যাসের কল, সাধারণ পুস্তকালয়, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সকল বিশেষ করিয়া দেখান। তাহার ফলে বর্ত্তমান জয়পুরের গৌরবস্থল রাজ কৌন্সিল, আলবার্ট হল, মিউজিয়াম, মেয়ো হাঁসপাতাল, কলেজ, সাধারণ পুস্তকালয়, গ্যাস এবং জলের কল স্থাপিত হইয়াছিল। এবং তাহারই ফলে দেশীয় রাজ্যের রাজধানীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম জয়পুরে মিউনিসিপ্যালিটির প্রবর্ত্তন। হরিমোহন বাবুই এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহারাজের সহিত গভর্ণমেণ্টের এবং বহির্জ্জগতের পরিচয়ের মূল। জয়পুরের কি রাজা, কি সর্দ্দার, কি সাধারণ প্রজা সকলেই পুরাতনের পক্ষপাতী;—সংস্কারকে তাঁহারা অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী হরিমোহন হইতেই জয়পুররাজ্যে পুরাতনের সহিত নূতনের এই শুভ সংমিলন সংঘটিত হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সার জন লরেন্সের দরবার উপলক্ষে যখন মহারাজ রামসিংহ আগ্রায় ছিলেন, সেই সময় পিতার আজ্ঞানুসারে সংসারচন্দ্র মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজের সহিত সেই তাঁর প্রথম আলাপ। মহারাজ সংসারচন্দ্রের কথাবার্ত্তায় বিশেষ বাঙ্গালী যুবকের মুখে বিশুদ্ধ উর্দ্দু শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহার পরিচয়াদি গ্রহণ করেন।

সংসারচন্দ্র যখন (১৮৬৬) আগ্রায় আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় হরিমোহন বাবু তাঁহাকে জয়পুর রাজ-স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া নীলাম্বর বাবুকে পত্র দেন। তখন গরুর গাড়ীতে দুর্গম পথে জয়পুরে যাইতে হইত। পিতার মত হইলেও স্নেহময়ী জননীর অনুমতি পাওয়া সংসারচন্দ্রের নিতান্ত সহজ হয় নাই; অবশেষে একজন পুরাতন চাকরকে তাঁর সঙ্গে পাঠান হইল। আগ্রা হইতে জয়পুর প্রায় দশদিনের পথ। সংসারচন্দ্রের জননী প্রতিদিনের প্রতিবেলার চাউল আটা আলু প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ পুঁটলীতে বাঁধিয়া দিলেন—পথে সংসারচন্দ্র স্বহস্তে রন্ধন করিবেন। এমনি করিয়া বহুকষ্টে যে দিন তিনি জয়পুর পৌঁছলেন—সে দিন 'তীজের' পর্ব্ব

সমগ্র রাজপুতানায় "তীজ" বা শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়ায় গৌরী পূজার বিশেষ সমারোহ। রাজশুদ্ধান্তঃপুরে জয়পুরের মহারাণীগণ গৌরী পূজা করেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহাসমারোহে দেবী প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়। প্রাসাদের জেনানা দেউড়ী হইতে শোভাযাত্রা আরম্ভ হইল, সঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার আস্তরণ শোভিত হস্তী, অশ্ব, জয়পুর রাজের 'পাঁচরঙ্গা' পতাকা-শ্রেণী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল। জয়পুরের সুবিস্তৃত রাজপথ লোকারণ্য, হস্তীর বৃংহিতি, অশ্বের হ্রেষারব, জনসংঘের মহান্ কলধ্বনি সর্ব্বোপরি সেনাদলের দুন্দুভি নিনাদ। তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে বীরবেশধারী রাজপুতগণ, নানাবর্ণ-রঞ্জিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদধারী নাগরিকগণ, কেহ গজপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বযানে, কেহ রথে, কেহ বা পদব্রজে রাজপথের শোভা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। যুবক সংসারচন্দ্রের চক্ষে সে দৃশ্য সুদূর অতীতের স্বপ্নের মত প্রতিভাত হইল। এমনি করিয়া সে মিছিল রাজ-পথ বাহিয়া প্রাসাদের উত্তরদিকে 'তাল কটুরা' নামক এক সুবিস্তৃত হ্রদের ধারে উপস্থিত হইল। পথে একস্থানে প্রাসাদপ্রাকারে মঞ্চের উপর অমাত্যগণ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দার পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ গৌরী প্রতিমা দর্শন করেন। তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সুশিক্ষিত হস্তী ও অশ্বসমূহের নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশল দেখান হয় এবং সৈন্যদিগের কাওয়াজ করা হয়। তারপর এই গৌরী প্রতিমা তাল কটুরা হইতে প্রত্যানীত হইয়া মন্দিরে রক্ষিত হইয়া থাকে।

এই শুভ শুক্লা তৃতীয়ার সায়াহ্নে সংসার-চন্দ্র জয়পুরে প্রবেশ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর কাল জয়পুরে অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন, কিন্তু প্রথম দিনের এই আনন্দোৎসবের স্মৃতি চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে নবীন ছিল, প্রতি বৎসর 'তীজ' আসিলে তিনি জয়পুরে অবস্থিতির হিসাব করিয়া সে দিনের উল্লেখ করিতেন।

শ্রীঃ——

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ ধর্ম্মসাধনের এক মহা-তপোবন। এই পবিত্র ভূমি অসংখ্য সাধু ভক্তের জন্মভূমি বলিয়া বিদিত। মর্ত্ত্য জগতের এই ধর্ম্মক্ষেত্রের ধূলিকণা সকল ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের বিচরণে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। তাই পৃথিবীর নানাস্থানের বিশ্বাসী ও ভক্তসন্তানগণের সাগ্রহ দৃষ্টিপাতে, আজ আমরা নিত্য নূতন শক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতেছি। সুতরাং আমাদের বাসভূমি এই ভারতবর্ষ ধর্ম্মধনে কিরূপ গৌরবান্বিত, তাহার নিত্য আলোচনা জাতীয় কল্যাণের পক্ষে ও জগতের মূলধন বৃদ্ধির পক্ষে যে এক বিশাল শক্তিকেন্দ্র, সে বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন—অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় তপস্যা ও সাধনার সংবাদ লইবার জন্য ভিন্ন দেশীয় সাধু-

সজ্জনগণ ভারতে পদার্পণ করিতেন। ইংরাজ ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী সাত শত বৎসর ধরিয়া ভারতের অবনতির অবস্থায় বহির্জ্জগতের সঙ্গে আমাদের প্রায় সর্ব্ববিধ আদান প্রদান লোপ পাইতে বসিয়াছিল। শুভক্ষণে ইংরাজের পদার্পণে ও রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সভ্য জগতে আমাদের জন্মভূমি একটা বিষয়ে সমগ্র জগদ্ব্যাপী প্রাধান্য লাভের সুযোগ অর্জ্জন করিয়াছে। রাজার বিলাত-যাত্রা যে সেই শুভক্ষণের জনয়িত্রী সে বিষয় কাহারও সন্দেহ নাই রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত নবযুগের নূতন সাধনাক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাধক আমাদের পরম পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

এই জ্যৈষ্ঠ মাস দেবেন্দ্রনাথের জন্মমাস, তিনি আজ মর্ত্ত্যলোকে থাকিলে তাঁহার বয়ঃক্রম পঁচানব্বই বৎসর হইত। নবযুগের সাধনার দিক্‌ দিয়া বর্ত্তমান সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জ্যৈষ্ঠ মাস অতি পবিত্র মাস; কারণ, এই বর্ত্তমান সময়ের তীব্র বিষয়-বাসনার কোলাহলের মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করিয়া যে মহাত্মা ব্রহ্ম সাধন করিয়া অমরধামের যাত্রী হইয়াছেন, তাঁহার সেই জীবনব্যাপী মহা আদর্শের স্মৃতিকাগার এই পুণ্যমাস, তাই আজ আমরা দেবেন্দ্রনাথের জীবনীগত বিশেষত্বের আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যসম্পদ্‌ অর্জ্জন ও ভোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে, তাঁহাদের অধিকাংশই, অধিকাংশই বা কেন বলি, প্রায় পনের আনা পনের গণ্ডা মানুষই সেই অর্জ্জন ও ভোগের ভিতরে ডুবিয়া আত্মহারা হন। বিষয়-বাসনা-বারিধির উপরিভাগে তৈলকণার ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে ভাসিয়া আছেন এরূপ ব্যক্তি বিরল, নাই বলিলেও দোষ হয় না। এই বিষয়-বাসনার তাড়না হইতে উদ্ধার লাভের জন্য অনেকানেক সাধু ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্যমার্গ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, মানবের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। নবম অবতার বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলী এই বৈরাগ্যপথের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বর্ত্তমান।

'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর; সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হয় না; ত্বরায় পুত্র-কলত্র, ধন-সম্পদ্‌ সম্বলিত এই সংসারবাস ত্যাগ কর, কৌপীন সম্বল লইয়া ত্বরায় "কামিনী কাঞ্চনে" দাবানল জ্বালিয়া দিয়া অরণ্যযাত্রা কর, নতুবা তোমার উদ্ধার নাই, মুক্তি নাই। সংসারকে রাখিয়া সংসারে বাস করিয়া, সংসারের সেবা করিয়া তুমি যে কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেছ, উহা ধর্ম্ম নহে, ভারতের ধর্ম্ম ত্যাগ—পুনঃ-পুনঃ এই কথা বলিয়া তাঁহারা অরণ্যকে ধর্ম্মময় ও সংসারকে ধর্ম্মশূন্য করিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন।

এই দেশব্যাপী ত্যাগধর্ম্মের প্রবল প্রবাহে মানব-সংসারের কত যে অমূল্য রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সে সকলের সংখ্যা কে করিবে? সুদূর অতীতকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কর, রাজর্ষি জনকের আদর্শ কই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস ত' দেখিতে পাওয়া যায় না। জনক রাজা হইয়া ঋষির ন্যায় জীবনধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন-বিবরণে শুকদেবের শিক্ষালাভের উপাখ্যানভাগে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়

যে, অত্যুচ্চ সাধন ও অত্যুত্তম ধর্ম্ম রাজা জনকের জীবনশোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু সে উচ্চ আদর্শ-পথের পথিক কই? শুনিয়াছি রাজা বিক্রমাদিত্যে সে আদর্শ কিছু পরিমাণে ফুটিয়াছিল। কিন্তু সে মহাজনোচিত পন্থার উত্তরসাধক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলে, এই সংসারই কি স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত না! মানব-সন্তান মনুষ্যের মত না হইয়া ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় দর্শনেন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া সংসারবহ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন, মানব-সন্তানের পতঙ্গত্ব-প্রাপ্তি অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? ধর্ম্মরাজ প্রশ্নের উত্তরে তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই বিষম বিষয়-বাসনার চরিতার্থতার যুগে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার ঠাকুর পরিবারে সে সময়ের বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে দেবেন্দ্রনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে, কলিকাতার ঠাকুর পরিবার, বাঙ্গালা দেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে; কেন ধন্য হইয়াছে, তাহাই এখন বলিতেছি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে সুখ-সম্পদ্, মান-সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য-বিভব ও তজ্জাত সমাজ-সম্মান বলিলে যাহা বুঝা যায়, সংসার-জীবনের সেই মহামূল্য বস্তুগুলি প্রিন্স দ্বারকানাথকে আশ্রয় করিবার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইত। সে সম্ভ্রম ও সম্মান-সম্ভোগ সে সময়ে এ দেশে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। কেবল দ্বারকানাথেই ঘটিয়াছিল, এমন রাজজনোচিত মান-সম্ভ্রম, সুখ-সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য-বিভব-বেষ্টিত সংসারে শুভক্ষণে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সে আজ প্রায় শতবর্ষের কথা।

বালক দেবেন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষা অপর দশজনের ন্যায় সূচিত ও পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। প্রিন্সের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বড় ঘরের বাবু ছেলে হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার বাবুগিরি করিবার সখ, সুসিদ্ধ করিবার উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা সাঙ্গোপাঙ্গ কিছুরই অভাব ছিল না। ক্রমে ক্রমে সকল আয়োজন ও অনুষ্ঠান তাঁহার নিকটতর হইবার জন্য পা বাড়াইতেছে, এবং তিনিও সে গুলিকে সাদরে বরণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, ঠিক এমন সময়ে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার প্রাকালে বন্ধুবর দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া বালক দেবেন্দ্রনাথকেও একবার দেখিতে চাহিলেন। তদনুসারে দ্বারকানাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। রাজা বালক দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক সস্নেহে বলিলেন— "আমি তোমার জন্য আমার আসন রাখিয়া গেলাম, তুমিই আমার উত্তরসাধক হইবে।" *

তখনও দেবেন্দ্রনাথ নিষ্ঠাবান্ ও দেব-দেবী-পরায়ণ বালক। তিনি প্রতিদিন বিদ্যালয় যাইবার সময় ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। আশৈশব দেবেন্দ্রনাথ

* I leave my guddy to you.

পিতামহী দেবীর অত্যধিক স্নেহসূত্রে তাঁহারই ধর্ম্মভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এই সরল-স্বভাব ও সুপ্রকৃতিসম্পন্ন বালকের চিত্তপটে একদিন অসংখ্য কোটী নক্ষত্র-খচিত সুবিমল সান্ধ্য-গগনের অনন্ত প্রশান্ত প্রসারণ প্রতিবিম্বিত হইল। সেই সীমাহীন স্নিগ্ধ স্থির আকাশতল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া তাঁহার সমগ্র হৃদয়মন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তিনি সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে আত্ম-হারা হইয়া ডুবিয়া গেলেন। এই শুভক্ষণে তাঁহার "শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ সুন্দরম্' এর সহিত ক্ষণিক পরিচয় হইল। এই ক্ষণিক পরিচয়ে তাঁহার হৃদয়ে অনন্তকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল,' দ্বারকানাথের অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ ত্বরায় সে আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিল, দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় এক বিশাল সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইল। একদিকে বিশ্ববিভূতি ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে অগ্রসর, অপর দিকে সুখৈশ্বর্য্য পূর্ণ সংসার-বাসনা শত প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে হতচেতন সুরা সেবীর ন্যায় সংসার-সংগ্রামক্ষেত্রে শয়ন করাইতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু ভগবানের স্পর্শ কখন ব্যর্থ হয় না। এই মানবশিশু সিংহবিক্রমে সে উচ্চ আদর্শের পুনর্দর্শনমানসে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বিধাতার স্পর্শ কখন ব্যর্থ হয় না সত্য, কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে, তিনি অনাদি কাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন "যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্ব্বনাশ, তবুও যে না ছাড়ে আমার আশ, আমি হই তার দাসের দাস।" এ তত্ত্ব বৈষ্ণব ধর্ম্ম-জীবন ও সাহিত্যে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইলেও ইহা প্রাচীন তত্ত্ব, ইহা বিধাতার প্রথম বাণী ; তাই কিশোরবয়স্ক দেবেন্দ্রনাথের সরল হৃদয় বিষম সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। পদে পদে সংগ্রামে পরাজয় ঘটিতে লাগিল। বিষয়-বিষ, সংসারের বৈদ্যগণের ব্যবস্থায় ঠিক সূচিকাভরণ রূপ ধারণ করিয়া ভাগবতী কৃপাজাত জ্ঞান-কণাকে ধ্বংস করিতে সদা ব্যস্ত। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরের সকল বিশ্বাসী সন্তানগণের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি উচ্চ সাধকগণের যে দুর্দ্দশা ও পরে রণজয়ে পরম সম্পদ্ লাভ ঘটিয়াছে, দেবেন্দ্র-নাথেরও তাহাই হইল।

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দারুণ অবসাদের সঞ্চার হইল। তিনি এই অবসাদ-ভার বহন করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার চিরপ্রিয় পিতা-মহীদেবীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। সেই বৃদ্ধা হিন্দু রমণীকে তীরস্থ করা হয়। গঙ্গার ঘাটে তিনি যে দুই চারি দিন মর্ত্ত্যজীবন ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ অনেক সময়ে পিতামহী দেবীর নিকটে থাকিতেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অবসাদপূর্ণ হৃদয়ে সংসারের অনিত্যতা বৈরাগ্যের সঞ্চার করিতেছিল। এই সময়ে পিতামহী দেবীর সঙ্গচ্যুত হইবার আশঙ্কা সর্ব্বোপরি নিমতলার দৃশ্য তাঁহাকে অধিকতর অভিভূত করিত। এক্ষণে এ বৈরাগ্য শ্মশান বৈরাগ্য হইলেও, ইহাও অল্পকালব্যাপী হইলেও, ইহা দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়কে মথিত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

বিধাতার অযাচিত প্রেমস্পর্শ, বিষয়বিভবের আশু প্রীতিকর প্রলোভন, তদুপরি অনিত্যতার ছায়াপাত এ সকল লইয়া যেন কোন নিপুণ

শিল্পী তুলিকা ধারণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের চিত্রপট অঙ্কনে নিযুক্ত। সকলে দেখে না, অনুভব করে না, তাই সকলের ভাগ্যে ঘটে না, নতুবা বিধাতা যে এই অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কেবল কয়েকজনের হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহার তুলিস্পর্শ-সুখ বিতরণ করেন তাহা নহে; তোমার আমার সকলের জন্যই ঐ ইঙ্গিতাহ্বান বর্ত্তমান। কেহ বলিতে পার কি, জীবনে কখনও কি সে নিমন্ত্রণ শ্রবণ কর নাই? যদি না করিয়া থাক, তবে প্রস্তুত হইয়া কাতর হৃদয়ে অপেক্ষা কর, আমাদের লালা বাবুর ন্যায় অপেক্ষা কর, ঐ নিমন্ত্রণ আসিবে এবং সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলে তুমিও লালা বাবুর ন্যায় ধন্য হইবে, তোমার মানবজন্মলাভ সার্থক হইবে। কিন্তু হায়, গভীর আক্ষেপের কথা এই যে, আমার ন্যায় কত হতভাগ্য জীব ঐ আহ্বান শুনিয়া ঐ প্রেমময়ের মধুর স্পর্শ অনুভব করিয়াও বিষয়-বাসনার বন্ধন ছেদন করিতে ও তাঁহার দিকে ছুটিতে পারে নাই, "আছাড়িয়া পড়ি পুনঃ উঠিয়া দাঁড়ায়; নেত্রনীরে দৃষ্টিহীন, তবু চারি ভিতে চায়।" এ অবস্থা-সংঘটন যাহার হইয়াছে, আর যে সে সুযোগ ত্যাগ করিয়াছে, আমার মত সেই সকল কৃপাপাত্রগণের স্থান কোথায় বলিতে পারি না। তবে আশা এই যে, তিনি কখনও কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না।

আমাদের ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথে প্রাক্তন ও পুরুষকারের মিলন সাধনের অপূর্ব্ব উপকরণ বর্ত্তমান ছিল, তাই তিনি ভগবানের অঙ্গুলি-স্পর্শ অনুভব করিয়া বিষয়-বাসনার তাড়নার সঙ্গে সংগ্রামে যখন অবসাদ অনুভব করিতেছিলেন, তখন বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার জীবন-সংগ্রামে জয়-পরাজয়ের অঙ্কপাত করিতে চাহিল; তিনি তখনও সন্দেহের ক্রোড়ে শায়িত, কোন্ পথ শ্রেয় ও প্রেয় তাহা উত্তমরূপে অনুভব করিতে পারেন নাই। জীবনে সংগ্রামই চলিয়াছে। ভগবানের স্পর্শ যিনি অনুভব করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তাঁহার সে ভক্ত ও বিশ্বাসী সন্তানকে কখনই ত্যাগ করেন না। তিনি কৃপা করিয়া সেই সাধু সন্তানকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের সৌভাগ্যবশে বিধাতার কৃপা দিন দিন স্পষ্টতর হইতেছে, এমন সময়ে একদিন তিনি জোড়াসাঁকোর ত্রিতলের ছাদের উপর একাকী বসিয়া আত্মচিন্তা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ পুস্তক বিশেষের একখানি ছিন্নপত্র বায়ুভরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তিনি তাহা উঠাইয়া লইলেন। পড়িয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তাহা সংস্কৃতে লিখিত ছিল; গৃহে যে পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাকে ডাকাইয়া উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, উহা উপনিষদের ছিন্ন পত্র, তাঁহার দ্বারা ঠিক অর্থ হইবে না। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকাইয়া উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ তখনই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকাইয়া উপনিষদের ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। তিনি সেই অপূর্ব্ব দৈব-সংগ্রহের ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিলেন। শ্লোকটি এই:—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥"

অর্থাৎ "জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান

রহিয়াছে, সে সমস্তই পরমেশ্বরের প্রভাব দ্বারা সম্যক্‌রূপে আচ্ছন্ন, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময়, এই জ্ঞান দ্বারা বিষয়-বাসনা ত্যাগ কর, আর সেই ত্যাগ দ্বারা পরমাত্মাকে ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রভাবপূর্ণ জগৎকে ভোগ কর. আর কাহারও ধনসম্পদ্ পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিও না।” এই তৃতীয় শুভক্ষণে উপনিষদের ছিন্নপত্রের দৈব সমাগম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপযুক্ত ব্যাখ্যার ফলে দেবেন্দ্রনাথের সকল সংশয় ছিন্ন হইল। তাঁহার দৃষ্টিতে আজ সমগ্র জগৎ ব্রহ্ম-সত্ত্বাপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনিই সর্ব্বময়, তাঁহাকে পাইলে কিছুরই অভাব থাকে না, আর সকলই পাওয়া যায়। আজ দেবেন্দ্রনাথ দিব্যজ্ঞান অনুভব করিলেন, সর্ব্বাগ্রে সেই ব্রহ্মবস্তু লাভ করিতে হইবে, তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে কিছুরই অভাব থাকে না। দেবেন্দ্রনাথ সেই পরম বস্তু লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। আজ তাঁহার দর্শনে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় অনুভব করিল:—“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ।” আজ দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের বাসনার বন্ধন ছিন্ন হইয়া সকল সংশয় দূরীভূত হইল। পরব্রহ্মের পূর্ণসত্ত্বা তাঁহার হৃদয়-মন অধিকার করিল, আজ তাঁহার নূতন জ্ঞান লাভে নূতন জীবন লাভে আনন্দ ধরে না। সেই পরব্রহ্ম আজ দেবেন্দ্রনাথের নিকট “আনন্দরূপমমৃতম্,” আজ—স্বয়ং পরমেশ্বর দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগুরু হইয়া তাঁহাকে বেদান্তবাগীশ সমক্ষে ব্রহ্ম-সাধনের পথ দেখাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সেই নূতন জীবনের নূতন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি শান্ত ও সমাহিত চিত্তে জগতের এই দুর্লভ ধন, মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অধিকার অর্জ্জনে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন।

এখন দেবেন্দ্রনাথ কেবল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নহেন, এখন তিনি কেবল জোড়াসাঁকোর অতুল ঐশ্বর্য্য বিভবপূর্ণ রাজভবনের প্রধান ব্যক্তি নহেন, নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ-বাসনা এখন আর তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে না। তিনি এখন আপনাকে অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের প্রিয় সন্তান বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাঁহার অপার করুণার ধারা সিক্ত হইয়া সংসার নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বন্ধু ও মোসাহেবগণ তাঁহার এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে মর্ম্মাহত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মময় জীবন যাপনের রীতিপদ্ধতি পরিদর্শনে সংসারের লোকও তাঁহার অনুরক্ত হইতে আরম্ভ করিল। তিনি আপন মনে আপনার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে দীক্ষার জন্য কেশব ভারতীর সম্মুখীন হইয়া দীক্ষা দিতে বলিলে পর, ভারতী বলিয়াছিলেন, “তোমাকে দীক্ষা দেওয়া আমার কর্ম্ম নহে।” তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, “আমি আপনারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিব।” ভারতী বলিয়াছিলেন “তোমাকে দীক্ষা দিবার মন্ত্র আমার নিকট নাই।” চৈতন্যদেব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, “আমাকে দীক্ষা দিবার মন্ত্র আমিই বলিয়া দিতেছি, আপনি কেবল সেই মন্ত্র আমার কর্ণে শুনাইয়া দিন।” দেবেন্দ্রনাথেরও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল। তিনি দীক্ষার মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে সেই মন্ত্র অব-

লম্বন পূর্ব্বক দীক্ষা দিতে বলেন, তদনুসারে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য দীক্ষার অনুষ্ঠান করিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে দীক্ষা দিবার দিন সেই প্রবীণ আচার্য্যের হর্ষ বিষাদ-বিজড়িত এক অপূর্ব্ব হৃদয়প্লাবন দেখা দিয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা অসামান্য গুণবান্ পুরুষ-সিংহ রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী বিদ্যা-বাগীশ আজ প্রিন্সের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করাইবার সময় স্বর্গমর্ত্ত্যের মিলন সন্দর্শনে আকুল হইয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে করিতে রাজার ভবিষ্যৎ বাণীর পরিপূরণ করিলেন। আজ দেবেন্দ্রনাথ রাজানুরোধে বিশ্বপাতার আদেশে রাজার আসন গ্রহণ করিলেন; রামমোহনের স্বর্গীয় অমর আত্মা আনন্দে বিহ্বল হইয়া অবশ্যই আশীর্ব্বাদ সহ পুষ্পবর্ষণ করিয়া-ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব-পদ গ্রহণ করিলেন।

এই মহাব্রত গ্রহণপূর্ব্বক দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সহ রাশীকৃত ঋণভার দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে নিপতিত হয়। সে অসীম ঋণভার হইতে সম্পত্তি মুক্ত করা যেমন তেমন লোকের কর্ম্ম ছিল না। বিষয়ী লোকের বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে তিনি অতি সহজ উপায়ে সেই পিতৃকৃত ঋণ অস্বীকার করিয়া সুখে সম্পদ্ ও তজ্জাত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে ও আত্মীয় স্বজনগণকে সুখে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা উত্তমর্ণের প্রাপ্য ঋণ প্রত্যা-খ্যানে বাধা প্রদান করিল। তিনি উপনিষদের প্রাচীন ঋষিবাক্যে জানিয়াছেন "আর কাহারও ধনসম্পদ্ পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিও না।" আজ দেবেন্দ্রনাথের পরীক্ষার দিন উপস্থিত, আজ তিনি জনসমাজ সমক্ষে, সাধিত ধর্ম্ম-জীবনের পরীক্ষা দানে আহূত হইলেন। আজ তিনি পিতৃঋণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেই ঋণদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে যে ভাবে স্পর্শ করিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার আর সত্যের পথ পরি-ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই, তিনি বুঝিলেন "যে করে তাঁর আশ, তিনি করেন তার সর্ব্বনাশ," তিনি বিধাতার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া এই "সর্ব্বনাশের" পথেই পদার্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে, বিষয়বিভব ত্যাগ করিয়া সুখ সুবিধা সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া পথের পথিক হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সেদিন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পোষ্যবর্গ চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন-হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ঋণ-পরিশোধের পণ কোনও মতে ভঙ্গ হইল না। বহু লোকের সাধ্য সাধনায়ও তিনি একবিন্দু বিচলিত হইলেন না, বরং পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিকে তখন অন্যের সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করিলেন, তাই তদ্ভোগের বাসনা তাঁর হৃদয়ে স্থান পাইল না।

দ্বারকানাথের উত্তমর্ণেরা দেবেন্দ্রনাথের এই মহদ্ভাবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা আদায়ের ব্যবস্থার ভার তাঁহারই উপর

অর্পণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সুব্যবস্থা সহকারে ঋণ পরিশোধের উপায় অবলম্বন করিলেন। অপরের সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিলে কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তি যেরূপ ভাবে গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি নিজে সপরিবারে দারিদ্র্যের শতবিধ ক্লেশভোগ করিয়া বিস্তৃত জমিদারীর আয় হইতে ঋণপরিশোধ করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি এই সময়ে প্রিন্সের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ছিন্ন পাদুকা ও পরিধেয় মেরামত করাইয়া পরিধান করিয়াছেন। গৃহের পরিজনগণেরও এই সময়ে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই অপরিমেয় ক্লেশভোগে তিনি কেবল কাতর হয়েন নাই এমন নহে, তিনি সদা প্রফুল্ল চিত্তে এই অসীম দুঃখ কষ্ট বহন করিয়া জনসমাজ সমক্ষে অপূর্ব্ব উচ্চ চরিত্রের পরিচয় দান করিয়া সংসারে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

এই অসামান্য ত্যাগ স্বীকারে সাধু দেবেন্দ্র নাথের ধর্ম্ম জীবন উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিল। তিনি এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই "মহর্ষি" পদবাচ্য হইলেন। বর্ত্তমান যুগে আমাদের সৌভাগ্যবশে আমরা দুইজন মহর্ষি পদবাচ্য মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গসুখ সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছি। দানে দাতাকর্ণ সদৃশ বিদ্যাসাগর সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া, আর সংসারে বাস করিয়া দেবেন্দ্রনাথ, ত্যাগ-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমান যুগের বিষয়-বাসনার বিরুদ্ধে মহৎ জীবন ধারণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সে মহাচিত্র অক্ষয়, কখনও তাহাতে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিবে না। ইহা বাঙ্গালীর পরম গৌরবের কথা। এ মহা চরিত্রের স্পর্শ— ইহার আস্বাদন অমৃত সদৃশ মিষ্ট।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দীর্ঘকাল আমাদের সম্মুখে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যখনই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়াছে তখনই মনে হইয়াছে, সংসারে বাস করিয়া, রক্তমাংসময় দেহ ধারণ করিয়াও যে ব্রহ্ম-সঙ্গসুখ সম্ভোগ করা যায়, একালে এ শিক্ষা দেবেন্দ্রনাথের স্বোপার্জ্জিত, ইহাতে অন্যের দাবি দাওয়া নাই। প্রসঙ্গক্রমে যখনই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছে, অমনই দেখিয়াছি, "সত্যং" বলিতে সেই পবিত্র সুন্দর ঋষির মুখমণ্ডলে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার মস্তকের কেশ সকল নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছে; তাঁহার অন্তরঙ্গ সখার প্রসঙ্গ তাঁহাকে এমনই আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিত যে, সে সুন্দর সহজ ও স্বাভাবিক ভাব দর্শকরূপে ভোগ করিতে পাওয়াও পরম লাভ বলিয়া মনে হয়। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন মহর্ষির ব্রহ্মসাধন আমাদের জীবন যাত্রার মূলধনে পরিণত হউক। আমরা ধন্য হইব। মহর্ষির মহর্ষিত্বই তাঁহার বিশেষত্ব। ইহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পদ্।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিশাপ

(১)

সুবৃহৎ আম্র-কাননের শীতল ছায়ায় পুলিশ সাহেবের তাঁবু পড়িয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস; বাহিরে রৌদ্রের প্রচণ্ড তেজ, কিন্তু বাগানের ভিতর প্রদোষের তরল অন্ধকার। পত্রান্তরালে সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে বিচিত্র আলোক-মালার সৃষ্টি করিয়াছে। শুভ্র তাঁবু-গুলি দূর হইতে সুনীল সমুদ্রবক্ষে সাদা পাল তোলা নৌকার মত দেখাইতেছিল। দূরে গ্রামের কুটীরগুলির মৃৎ-প্রাচীরের উপর এবং বিবিধ বৃক্ষলতাদির উপর রৌদ্র পড়িয়া উজ্জ্বল বর্ণের ছবির মত মনে হইতেছিল। দূরে গ্রামের রাস্তার উপর উলঙ্গ শিশুর দল ধুলা মাখিয়া গ্রাম্য কুকুরদের সঙ্গে সানন্দে খেলা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে তাহাদের আনন্দ কোলাহল শুনা যাইতেছিল।

খানসামাদের তাঁবু হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিয়া বৃক্ষ অন্তরাল ভেদ করিয়া বাহিরের গরম হাওয়ার সঙ্গে মিশিতেছিল। সে তাঁবুতে মহা ব্যস্ততা ও কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে—কেননা সাহেব প্রাতে 'চা-পান' করিয়া বাহির হইয়াছেন, এখনি আসিয়া 'ছোট-হাজরী' খাইবেন—সিপাহী পারমন্ আসিয়া খবর দিল দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলা দেখা যাইতেছে।

খবরটা শুনিয়া বড় খানসামা তাঁবুর বাহিরে আসিল—তার মাদ্রাজ প্রদেশ সুলভ গোলা-কার বদনমণ্ডল, মসী-বিনিন্দিত বর্ণ অগ্নির উত্তাপে তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। পাতলা কামিজ ঘামে গায়ের সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া গাত্রবর্ণের আভা প্রকাশ পাইতেছে। খানসামাজি বাহিরে আসিয়া দেখে এক কাক তার বড় কষ্টে প্রস্তুত একখান কাট্‌লেট লইয়া পলাইতেছে, আর তার পিছনে সে রাজ্যের তার সমগ্র স্বজাতিবৃন্দ ছুটিয়াছে। একে গরম তাতে আবার সেদিন খানসামাজীর মেজাজটা বেশ প্রসন্ন ছিল না, কেননা সাহেবের আবার একজন বন্ধু সঙ্গে লইয়া ফিরিবার কথা। এ দৃশ্যে তার ভীষণ মুখমণ্ডল ভীষণতর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কাকজাতির ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইতে লাগিল। সে রাগের ফল ভোগ করিল কিন্তু তাঁবুর খোঁটায় বাধা এক আধমরা মুরগী—হৃত কাট্‌লেটের স্থান পূরণের জন্য তৎক্ষণাৎ সে বেচারার প্রাণবিয়োগ ঘটিল। এমন সময় 'বয়' আসিয়া খবর দিল, সাহেব পৌঁছিয়াছেন—সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

(২)

ঘোড়া হইতে নামিয়াই পুলিশ সাহেব ক্রাইটন হুকুম দিলেন—"বয়, দো গ্লাস হুইস্কি-সোডা বরফ দেকে লাও।" বলিয়া তিনি এবং ইঞ্জিনিয়ার জর্ডন সাহেব দু'খানা আরাম কুর্সির উপর বসিয়া পড়িলেন। হুইস্কি সোডা পান করিতে করিতে পুলিশ সাহেব বলিয়া উঠি-লেন—"দেখ, আজ হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, সে আজ তিন বৎসরের কথা—

সাম্‌নে ঐ যে গ্রাম দেখিতেছ ঐ খানে সে ঘটনা ঘটে।”

বলিতে বলিতে ক্রাইটন সাহেবের স্বর গম্ভীর হইয়া আসিল—বদনে চিন্তার রেখা পড়িল। তিনি অন্যমনস্কভাবে পাশের টেবিল হইতে একটা চুরুট লইয়া ধরাইলেন। কয়েক মিনিট পরে বলিয়া উঠিলেন—“তোমার কাপ্তেন কার্টারকে মনে আছে?”

জর্ডন বলিলেন, “হাঁ, বেশ মনে আছে,—বেচারা কাশ্মীরে শিকার খেলতে গিয়ে মারা যায়। আমি চিঠাপুর থাকিতে সে দুই তিনবার মাছ ধরিবার জন্য আমার কাছে আসিয়াছিল—তোমার ত মনে আছে সেখানে আমার বাংলো ছিল নদীর ধারে। আমি কাগজে তার মৃত্যুসংবাদ পড়ি নাই!—গত বড়দিনের সময় আমি তাকে নিমন্ত্রণ করি—কিছু দিন পরে তার রেজিমেণ্টের অফিসরের পত্র পাইয়া তার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিলাম কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু!”

ক্রাইটন অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে বলিলেন—“হাঁ।”

তাঁহার ভাব দেখিয়া জর্ডনের কৌতূহল হইল—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, তুমি তিন বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটা ঘটনার কথা বলিলে, তার সঙ্গে কার্টারের সম্বন্ধ কি? ব্যাপার কি?”

ধীরে ধীরে মুখ হইতে চুরুট নামাইয়া ক্রাইটন বলিলেন, “সে অনেক কথা, হলেও আজ তোমাকে সব বলিতেছি! কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে এতদিন পরে আজ ঠিক সেই দিনেই আমরা এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। সে ব্যাপারটা কি বলি শোন—

“সে আজ তিন বৎসরের কথা। কাপ্তেন কার্টার, আমি এবং মিঃ জে তিনজনের এইখানে শিকার খেলিতে আসার প্রস্তাব হয়। আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বে চাকর বাকর এবং তাঁবু খাটান হইয়াছিল। আসিবার সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে গ্রামের বাহিরে ডান ধারে একটা পুকুর আছে—তাহারই উচু পাড়ের উপর একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ—চাকরেরা সেইখানে আমাদের তাঁবু খাটাইয়াছিল। আমরা পৌঁছিয়া গ্রামের গাটেলকে ডাকাইয়া পর দিনের শিকারের জন্য লোকের বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময় সেই গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে একজন সন্ন্যাসী আমাদের নিকট আসিল। গ্রামবাসীরা সসম্ভ্রমে তাঁহার জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া আভূমি প্রণত হইল। আমি এমন অদ্ভুত সন্ন্যাসী কখন দেখি নাই। লোকটা ভয়ঙ্কর শীর্ণ, পরিধানে একখণ্ড জীর্ণ গেরুয়া রঙ্গের কাপড়, গায়ে আগাগোড়া ছাই মাখা, চোক দুটো রক্তবর্ণ, যেন জ্বলিতেছে; কপালে তিলক আর তার চুল—আমি যেন এখনও সেই শণের দড়ার মত জটা পাকান পা-পর্য্যন্ত লম্বা চুল চোকের সাম্‌নে দেখিতে পাইতেছি। বেশ বুঝিলাম গ্রামবাসীরা অদ্ভুত জীবটাকে অত্যন্ত ভয় করে, কেননা সেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা একে একে অদৃশ্য হইল, সমস্ত দিন আর তাহাদের দেখা পাওয়া গেল না।

“গ্রামের লোক সব চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী আমাকে ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল,—সাহেব তোমরা এজায়গা ছাড়িয়া দাও, এস্থানে হনুমানজীর মন্দির ছিল। তোমার চাকররা এই পবিত্র স্থান কলুষিত করিয়াছে—কিন্তু আমি

বলিতেছি তোমরা এখনও এ জায়গা ছাড়িয়া যাও—হাজার হাজার বছর ধরিয়া এখানে হনুমানজীর মূর্ত্তি পূজা পাইয়াছে—এখানে তোমরা থাকিতে পাইরে না। আমি তোমার চাকরদের বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা ছোট লোক, আমার কথা মানে নাই – আমাকে অপমান করিয়াছে—বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর চোক্ দুটো যেন জ্বলিয়া উঠিল সে রাগে ঘৃণায় ভীষণ হইয়া উঠিল এবং নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া গালি দিয়া থু-থু করিয়া থুথু ফেলিতে লাগিল। একটা কালা আদমীর—তা হউক না কেন সে যোগী সন্ন্যাসী—তার এতটা ধৃষ্টতা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না—একজন কনেষ্টবলকে ডাকিয়া হুকুম দিলাম—এ জানোয়ারটাকে ধরিয়া যেন বাগানের বাহির করিয়া দেয়।

কনেষ্টবলট সন্ন্যাসীর হাত ধরিবা মাত্র সে জোরে হাত-ছাড়াইয়া লইয়া আমাদের দিকে হাত বাড়াইয়া শাপ দিতে লাগিল, তাহার গালাগালিতে কাপ্তান কার্টার আর রাগ সামলাইতে পারিল না। সজোরে সন্ন্যাসীর নাকে এক প্রচণ্ড ঘুশা লাগাইয়া দিল, সন্ন্যাসী মাটিতে পড়িয়া গেল -তার নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এ ব্যাপারে আমি মনে মনে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইলাম, কেননা এই সন্ন্যাসী মারা লইয়া গ্রামবাসীরা হয়ত ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তার চোক দুটা তখন যেন জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ডের মত জ্বলিতেছিল! সে বলিয়া উঠিল—হনুমানজীর এই অপমানের জন্য আজ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে তোমাদের তিন জনকেই মরিতে হইবে।" —তারপর কাপ্তেন কার্টারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "তুমি মরিবে সব প্রথমে।" —বলিয়া সন্ন্যাসী সে স্থান ত্যাগ করিল।"

গর্ডন ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন —"তার পর।"

"তারপর আর কি? সন্ন্যাসী চলিয়া গেল আমরা খুব খানিকটা হাসিয়া লইলাম—তারপর দু'দিন শিকার খেলিয়া আমরাও সে স্থান ছাড়িলাম—গ্রামবাসীরা কোন গোল করিল না। এই ঘটনার ঠিক এক বৎসর পরে কার্টারের মৃত্যু হইল—'

গর্ডন বলিল,—"তুমি কি বলিতে চাও যে কার্টারের মৃত্যুর সহিত এই পাগলের প্রলাপের কোন সম্বন্ধ আছে।"

"সাধারণত আমারও সে কথা মনে আসিত না—কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না যে সন্ন্যাসীর অভিশাপ দেওয়ার ঠিক এক বৎসর পরে সেই দিনে কার্টার মৃত্যুমুখে পতিত হয়;—আরো শোন—মিঃ জে—তার সপ্তাহের মধ্যে জলে ডুবিয়া মারা যায়। তিন জনের মধ্যে এখন কেবল এক আমি বাকী—তুমি হয় ত মনে করছ সরকারী কাজের ভাবনায় আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে—তা' মোটেই না। অদৃষ্টচক্রে দেখ না তিন বৎসর পরে আমি আজ ঠিক সেই দিনে ঠিক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—তুমি ত আমাকে বেশ জান, ভয় জিনিষটা আমার বেশী নেই—কিন্তু কেন জানি না আজ আমাকে বড় বিচলিত করেছে। আমার একান্ত অনুরোধ আজ রাত্রে তুমি এখানে আমার কাছে থাক।"

"তা বেশ ত,—আমার ডেরায় ওভারসিয়ারকে খবর দিয়া পাঠাও আজ রাত-টা দুজনে গল্প করিয়া কাটান যাইবে।"

রাত্রে ডিনার লইয়া দুই বন্ধুতে তাঁবুর বাহিরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে গল্প করিতেছিল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; বাতাসের নাম মাত্র নাই, ভয়ানক গুমট করিয়া রহিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম গাছগুলা দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। পাতার অন্ধকারে জোনাকী পোকার আলো কালো পোষাকের উপর সল্‌মা চুমকীর কাজের মত দেখাইতেছে।

গর্ডন বলিয়া উঠিলেন—ভারতবর্ষের সব চেনা যায় কিন্তু প্রকৃতি দেবীকে চেনা বড় দুঃসাধ্য—সমস্ত দিন বেশ থাকিয়া এখন দেখ না ব্যাপার! যে রকম আয়োজন তাতে রাত্রে খুব ঝড় বৃষ্টি হবে; দু-চার বছর এদেশে থাকিলে নিজের দেশের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে। আমি ত মাস তিনেক পরে 'ফার্লো' লইয়া দেশে ফিরিব—আর বছর হয় ত এমন দিনে আমাদের শান্ত পল্লীগ্রামের নিভৃত নদী-তীরে মাছ ধরিয়া বেড়াইব।" বলিয়া জর্ডন মেঘাবৃত আকাশের দিকে চাহিয়া অন্য-মনস্কভাবে চুরুট টানিতে লাগিল। অন্ধকারে তাঁর লক্ষ্য হইল না যে, ক্রিটনের মুখে অজ্ঞাত আসন্ন বিপদের ভয়ের কালিমা পড়িয়াছে —অনেকক্ষণ পরে ক্রিটান বলিয়া উঠিলেন— "এক বৎসর পরে—আস্‌ছে বছর এমন দিনে—আমি—আমি কোথায় থাকব কে বলতে পারে।"

জর্ডন বন্ধুর কথার ভাব বুঝিলেন—বুঝি-লেন যে সন্ন্যাসীর অভিশাপের কথা তাঁর মাথা হইতে এখনও যায় নাই। তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন—"দেখ তোমার গতিক ভাল নয়, মাথা বিগড়ে গেছে! আর রাত জেগো না —অনেক রাত হয়েছে—চল শুতে যাই— শোবার আগে এক ডোস্ ব্রাণ্ডি ও কুইনিন বাড়াইয়া দিও।" বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন।

ঘণ্টা দুই পরে ভীষণ বজ্রনিনাদে জর্ডনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল—তাঁহার মনে হইল নিকটে কোন বৃক্ষের উপর বজ্রপাত হইয়াছে। —সঙ্গে সঙ্গে বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জর্ডন বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন—তাঁবুর উপর ঝর-ঝর শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং দরজা দিয়া বাদলা হাওয়া আসিয়া তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত দেহ শীতল করিয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরে আবার একবার কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল—সে শব্দ ধীরে ধীরে দূর দিক্‌বলয়ে মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে মনুষ্য-কণ্ঠের ভীষণ কাতর ধ্বনি শোনা গেল—সে ধ্বনি সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া আরো ভীষণ মনে হইল—জর্ডন ভীত হইয়া রিভল-ভার হস্তে তাঁবুর বাহির হইলেন। সেই সময় আবার সেই কাতর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল—জর্ডনের মনে হইল ক্রিটনের তাঁবু হইতে এ শব্দ আসিল।

এই শব্দে তাঁবুর চাকর বাকর, কনেষ্টবল সকলেরই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তাহারাও অন্ধকারে ভূতের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে-ছিল। জর্ডন চীৎকার করিয়া বলিলেন— "ডেরায় যতগুলি আলো আছে সব জ্বালিয়া

ফেল" এবং নিজের তাঁবুর আলো লইয়া বেগে ক্রিটনের তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন —সে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর! তাঁবুর আসবাব চারিদিকে বিক্ষিপ্ত—সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্ত বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, তার উপর রক্তাক্ত কলেবর ক্রিটনের প্রাণ-হীন দেহ পড়িয়া আছে, কে যেন নখ দিয়া তার গল-নালী ছিঁড়িয়া দিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। আর তাঁর শিয়রের কাছে বিপুলকায় এক হনুমান দুই হাত উঁচু করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে —তারও সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত—তার কালো মুখের মধ্যে সাদা সাদা দাঁতগুলো দেখা যাইতেছে। —সে পৈশাচিক দৃশ্যে জর্ডন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জর্ডনকে দেখিয়া হনুমান তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল—কিন্তু জর্ডন তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। সেই একই গুলিতে হনুমান গতাসু হইয়া ক্রিটনের মৃত দেহের উপর পড়িয়া গেল।

জর্ডন তাঁবুর বাহিরে আসিলেন। ভীত খানসামারা এবং কনেষ্টবলগণ আলোক লইয়া তখনও চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে—কেহ কেহ বা কৌতূহলপরবশ হইয়া ক্রিটন সাহেবের তাঁবুর মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল। জর্ডন কঠোর কণ্ঠে বলিলেন—"তোমাদের সাহেবকে কে খুন করিয়াছে—এখন এ ঘরে আসিও না—যে আসিবে আমি তাহাকে গুলি করিব।" একজন কনেষ্টবল দৌড়িয়া গিয়া গ্রামের পাটেলকে ডাকিয়া আন, আর বাকী সব ঐ খানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক।"

*　*　*　*　*

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গ্রামের পাটেল ও আরো কয়েকজন মাতব্বর প্রজা আসিয়া উপস্থিত হইল—জর্ডন তাহাদিগকে ব্যাপার সব বুঝাইয়া দিলেন, বৃদ্ধ পাটেল তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া সেই মৃত হনুমান দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"হে স্বামীজী,—হে হনুমানজী তুমি!"

জর্ডন পাটেলের কথা ঠিক বুঝিলেন না—জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কার হনুমান?"

পাটেল বলিল—"আমাদের গ্রামে হনুমানজীর যে মন্দির আছে—ইনি সেখানকার।"

পাটেল আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু জর্ডন তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওঃ বুঝেছি! জমাদার, এই খুনের জন্য সেই সন্ন্যাসী দায়ী—আমার হুকুম ক্রিটন সাহেবকে খুন করায় তুমি এখনি সেই সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার কর, বিলম্বমাত্র করিও না।"

পাটেল বিস্মিত হইয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিল—"ধর্ম্মাবতার, কোন্ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করার কথা বলিতেছেন?"

"কেন, তোমাদের গ্রামের হনুমানজীর মন্দিরের সেই বুড়া সন্ন্যাসী।"

"তাঁকে গ্রেপ্তার! তিনি ত আজ ছয় মাস হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন!"

জর্ডন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—তাঁর মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল—তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"এ অভিশাপ, না অদৃষ্ট চক্র!" *

শ্রীসু———।

* ইংরাজি হইতে অনূদিত।

মনসার ভাসান

"মনসার ভাসান" একটি সরল উপন্যাস, ইহাকে কবি জীবনচরিত্র কহিয়াছেন ; এবং এক হিসাবে এই আখ্যা সত্য। এই কাব্যে প্রধানতঃ তিনটি ব্যক্তির জীবনী-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সেই তিন ব্যক্তির মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী। আনুষঙ্গিকভাবে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনার ও চরিত্রের বিবরণও অবশ্য ইহাতে আছে, সেগুলির বিষয় আমরা পরে বলিব। কিন্তু ইহার প্রধান চরিত্র তিনটি ; চাঁদবেণে, যিনি আধুনিক নাটকে গম্ভীর চন্দ্রধর নামে আসর জমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, লখিন্দর এবং তাহার পত্নী বেহুলা।

মনসার ভাসান অনেকাংশে কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের অনুরূপ—অর্থাৎ ইহাদের উদ্দেশ্য অনেকটা এক ভাবের। শক্তির পূজাপ্রতিষ্ঠা উভয় কাব্যেরই প্রতিপাদ্য ; বোধ হয় এই জন্যই ইহাদের গঠন-প্রণালীতে একটা বিশেষ সাম্য আসিয়া পড়িয়াছে, এবং চরিত্র সম্বন্ধে এক কাব্যের ছায়া অপরে আসিয়া পড়িয়াছে। মনসার ভাসানের চাঁদবেণে, চণ্ডীকাব্যের ধনপতি সওদাগরের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ। আমরা ইতিপূর্ব্বে ধনপতির চরিত্র বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি, অতএব চাঁদবেণের চরিত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিবার ইচ্ছা নাই। দুই চরিত্রের তুলনায় এই বুঝা যায় যে, চণ্ডীকাব্যের ধনপতির অপেক্ষা আলোচ্য কাব্যের চরিত্রটি অনেক পরিমাণে হাল্কা হইয়াছে, কারণ কবি এই চরিত্রের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে পারেন নাই, এবং শক্তিবিরোধী চাঁদের প্রতি একটু মানসিক আক্রোশ বশতঃ তাহাকে লইয়া রঙ্গরস করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দৃঢ়ভক্ত চাঁদবেণেকে লইয়া হাস্য পরিহাসে হাস্য রসের বিকাশ হইলেও, সে হাস্যরস আধুনিক নাটকে ষণ্ডামার্ককে লইয়া হাস্যরসের অবতারণার ন্যায়, অনেকটা ছেলেহাসান গোছেরই হইয়াছে, রসের পরিপক্বতা হয় নাই, এবং কিছু বিকৃত রুচিরও পরিচায়ক হইয়াছে। মনসার ভাসান একখানি গ্রাম্য-কাব্য ইহাতে কোনও জটিল দার্শনিক বা পৌরাণিক সমস্যার মীমাংসা নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে ভাবে চন্দ্রধরের চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি এই উপাখ্যানে পাওয়া যাইবে না। বলা বাহুল্য, অন্য কোনও গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মনসার ভাসান একটি গ্রাম্য-কাহিনী, একটা সরল ও সত্য গ্রাম্য-কাহিনী। কবি নিরক্ষর নহেন, তাহা তাঁহার স্তুব-বন্দনাদি পাঠে বেশ বুঝা যায়, কিন্তু গল্পের মধ্যে আসিয়া তিনি গল্পই বলিয়া গিয়াছেন, এবং বলিবার কালে তাঁহার বিদ্যাকে দূরে রাখিয়া তাঁহার গ্রাম্য শ্রোতৃবর্গের বোধগম্য প্রাদেশিক সহজ কথার সাহায্য লইয়াছেন আর বোধ হয় এই প্রাদেশিক কথার জোয়ারে কবির গাম্ভীর্য্যও ভাসিয়া গিয়া তাঁহাকে গ্রাম্য

জনোপভোগ্য কাব্যের সার্থক স্বরূপে পরিণত করিয়াছে। প্রাচীন কবিদের কাছে দেবতারাও নিছক মানুষ হইয়া দাঁড়ান; এই কাব্যখানিতে তাংার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইবার খাতিরে যখনি কবিকে তাঁহার—

ত্রিজগৎ ধাত্রীমাতা
যোগরাঢ়া হরের নন্দিনী;

মনসাকে চাঁদবেণের মুখ দিয়া "চেঙ্গমুড়ি-কাণি" বলিয়া গালি দেওয়াইতে হইয়াছে তখনি মায়াস্বরূপিনী শিবনন্দিনীকেও রবি বাবুর ব্যঙ্গ চিত্রের চরিত্র স্বরূপে নামাইয়া আনিতে হইয়াছে। মনসার ভাসানে বহ্বাড়ম্বরে পূজিত হইলেও মনসা দেবী বেশ কোন্দল-পটু গ্রাম্য রমণী-রূপেই ফুটিয়াছেন, তাঁহার কথা-বার্ত্তায়, কাজকর্ম্মে কোথাও দেবীত্ব বিকশিত হইতে পারে নাই। তাহা না হইলেও কিন্তু এই মনসা দেবী চাঁদবেণে ও তৎসময়ের সকলের কাছেই জীবন্ত; এবং সকলে তাঁহার দেবত্বে বিশ্বাসী না হইলেও তাঁহার অস্তিত্বে সম্পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী ছিল। চাঁদবেণে তাঁহার দেবীত্বে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই ও চাহে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাকে যে "হেথালের" বাড়ি মারা যায়—এ কথা বিশ্বাস করিত, এবং দেবীও এই হেথালের কিছু ভয় রাখিতেন। দেবতা এত বেশী আত্মীয় ও নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আমরা স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের নিজের পছন্দসই করিয়া গড়িয়া লইয়াছিলাম; কাজেই বিরাট গাম্ভীর্য্য বা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব তাঁহাদের কাছ হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। যখন দেবতারই এই অবস্থা তখন মানুষের তো কথাই নাই।

আমরা দেখিতে পাই যে দেবচরিত্র চি েে সকল দেশের কাব্যে প্রায় দুই প্রকার দোষ আসিয়া পড়ে,—প্রথম দোষ—দেবতা একটি ভাব মাত্রে পরিণত হইয়া যান, সেই দেব-চরিত্রে human interest অর্থাৎ মনুষ্যের অনুভবনীয় ভাব কিছুই থাকে না, যেমন বেহুলা নাটকের মনসা-চরিত্র; সে চরিত্র একটা চিন্তা মাত্র, আর কিছুই নহে। দ্বিতীয় দোষ—দেবচরিত্র অত্যধিক মাত্রায় মনুষ্য-স্বভাবাপন্ন হইয়া দেবত্ব হারাইয়া বসে, যেমন মনসার ভাসান প্রভৃতি কাব্যের দেবচরিত্র, এবং মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্ট" কাব্যের ঈশ্বরচরিত্র। কালিদাসের কুমারসম্ভবে, গেটের ফউষ্টে এই উভয় দোষ বর্জ্জিত হইতে পারিয়াছে—বলিয়া, ঐ কাব্য সকলের দেবচরিত্র গাম্ভীর্য্য ও ভাব-বর্জ্জিত নহে এবং ভাবমাত্রও (abstraction) নহে।

চাঁদবেণের চরিত্র ও মনসার চরিত্র এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া "মনসার ভাসানে" উভয় চরিত্রেরই ক্ষতি হইয়াছে, উভয় চরিত্রের গাম্ভীর্য্য ও উদারতা নষ্ট হইয়াছে। মনসা দেবী এখানে একেবারে দেবীত্ববিহীনা; সামান্য "খুনসুটী" লইয়াই ব্যস্ত, সামান্য কলহপ্রিয় বা প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীর মত প্রতিহিংসা সাধিতে পারিলেই বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে "জব্দ" করিতে পারিলেই খুসী। মনসা-চরিত্রের এই প্রকার লঘুত্ব অনুভব করিয়াই আধুনিক নাটককার সেই চরিত্রের দেবত্ব উদ্ধার করিবার প্রয়াস করিয়াছেন; ইংার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ সন্দেহ

নাই, কিন্তু দেবচরিত্রের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি না থাকায় তাহাকে একটা abstractionএ পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন। নাটকে সে রকম সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতামাত্র যেন খাপ খায় না; সমগ্র নাটক হইতে উহা যেন বাহিরে পড়িয়া থাকে।

মনসার ভাসানে মনসার চরিত্র অত্যন্ত লঘুভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু সে চরিত্র কাব্যের মধ্যে সজীব ভাবে কার্য্য করিতেছে; যেমন চন্দ্রধরের মনসা-বিদ্বেষ আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি, মনসারও প্রতিশোধ দিবার প্রবৃত্তিটাও আমরা সেই রকমই পরিষ্কার বুঝিতে পারি। ফলতঃ মনসা দেবীকে শক্তিশালিনী স্ত্রী বলিয়া ধরিয়া লইলেই গোল মিটিয়া যায়। এই কাব্যের মনসা-চরিত্র দেখিয়া আমাদের এখনকার সফ্রেজেটদিগকে মনে পড়ে। ইহারা যেমন সাংসারিক প্রতিপত্তি ও অধিকার লাভ করিবার জন্য পুরুষগুলাকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, শেষ হত্যারও আশ্রয় লইতে বিরত হইতেছে না; মনসাও তেমনি চন্দ্রধরের কাছে পূজা পাইবার জন্য তাহাকে নানাবিধ বিপদে ফেলিয়া তাহাকে জব্দ করিতেছিলেন। কিন্তু বিপদে ফেলিয়া মনসা চাঁদবেণের কিছুই করিতে পারেন নাই, তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারেন নাই; এমন কি তাহার নয়নের মণি সোণারচাঁদ পুত্র লখিন্দরকে খাইয়াও তাঁহাকে দমাইতে পারেন নাই। ধনে পুত্রে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। বলিবার ভঙ্গী সুসজ্জা না হইলেও মনসার ভাসান কাব্য হইতে চাঁদবেণের চরিত্রের দৃঢ়তা ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাঁদবেণে সদর্পে নিজ সবল পুরুষকার লইয়া নিয়তির বিপক্ষে শক্তির বিরোধে দণ্ডায়মান—চাঁদবেণের চরিত্র হইতে আমরা এইটুকু শিখিবার মত পাই। যখন লক্ষ্মীন্দরের শোকে সনকা কাঁদিয়া আকুল, বেহুলা আছাড় খাইয়া হাহুতাশ করিতেছে, য়, কুটুম্ব, বন্ধু, এমন কি গ্রামের সকলেই শোকাভিভূত, তখনও চাঁদবেণে অটল অচল পুত্রশোকে তাহার বুকে দাবানল জ্বলিলেও সে স্থির—বিপদে অস্থির হইয়া সে তাহার বদ্ধপরিকরতা পরিত্যাগ করে নাই। ধনপতির চরিত্রে যে গাম্ভীর্য্য আছে তাহা চাঁদবেণের চরিত্রে নাই বটে, কিন্তু ধনপতির অপেক্ষা তাহার পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল; সে পরীক্ষাতেও যখন সে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিল, তখন তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা অধিক প্রশংসনীয়। চাঁদবেণে সংসারে তিলমাত্র সুখী হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহাতেও সে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই; তাহার চরিত্রে অনেকটা Jobএর মত সহিষ্ণুতা দেখা যায়। চন্দ্রধরের অথবা চাঁদবেণের চরিত্রের এইটুকু বিশেষত্ব।

কবি ক্ষেমানন্দ কিন্তু চাঁদবেণের চরিত্র সমুজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই, অথবা বোধ হয় সে চরিত্রের প্রতি ততটা দৃষ্টি রাখেন নাই, এবং সে চরিত্র ফুটাইবার প্রবৃত্তিও তাঁহার বড় বেশী ছিল না। মনসার ভাসান স্ত্রীপ্রধান কাব্য এবং ইহাতে স্ত্রীচরিত্রগুলি যেমন ফুটিয়াছে পুরুষ চরিত্রগুলি তেমন ফুটে নাই। লখিন্দরের চরিত্র চিত্রিত করিবার কোনও প্রয়াস এই কাব্যে দেখিতে পাই না; অবশ্য তাহার জীবনের ঘটনার উল্লেখ

আছে—যতটকু আছে তাহা কেবল কবির যে চরম উদ্দেশ্য বেহুলার চরিত্র বিকশিত করা—তাহা সাধন করিবার প্রয়োজনে। স্ত্রীচরিত্রগুলিও মুকুন্দরামের স্ত্রীচরিত্রের মত জটিল নহে, ইহারা সবই রেখাচিত্র—রেখাগুলি সরল ও সতেজ এবং চিত্রগুলিও মনোজ্ঞ ও স্বাভাবিক। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বেহুলার চরিত্রই কবির প্রধান অবলম্বন, কিন্তু সনকা ও অমলার চরিত্রও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বেহুলার চরিত্র অবলম্বনে কবি যেমন সতীত্বের মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, অমলা ও সনকার চরিত্রে তিনি কোমল মাতৃত্ব প্রতিফলিত করিয়াছেন। এই দুই চরিত্রে যে ভাবটা প্রকটিত হইয়াছে তাহা বড় স্নিগ্ধ বড় মধুর, এবং এখনও আমাদের নিত্য পরিচিত। বড় পরিতাপের বিষয় যে আমাদের সাহিত্য হইতে মধুর মাতৃ চিত্রগুলি তিরোহিত হইতে বসিয়াছে, আমরা মাতৃভাবের মহিমা ভুলিয়া যাইতেছি।

অমলা ও সনকা দুই-ই দুঃখিনী, তাই, ইহাদের চরিত্র গঠনে করুণরস উথলিয়া পড়িয়াছে। আমরা এখন শুনিতে পাই যে, প্রাচীন বাঙ্গালী কবিরা কেবল কাম-রস লইয়াই থাকিতেন। আমাদের যে কতক পরিমাণে এই দোষ ঘটিয়াছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন এরূপ মত প্রকটিত হয় তখন আমাদের মনে স্বতঃই এই কথার উদয় হয় যে, উহা প্রাচীন বঙ্গকাব্যের নিতান্ত একদেশদর্শী সমালোচনা। যাহাকে বাঙ্গালীর সাহিত্য বলা যাইতে পারে তাহাতে এই কাম-কলা ছাড়া আরও যে কিছু ছিল তাহা অমলা ও সনকার চরিত্র চর্চ্চা করিলেই বুঝা যাইবে। বরঞ্চ ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না অথবা যথার্থ কথাই বলা হয় যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য বা ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান প্রভৃতি কাব্যে—কাম-কলার প্রভাব আদৌ নাই, অন্যান্য বিবিধ রসের প্রাদুর্ভাবই অধিক। মনসার ভাসান কাব্য-খানি পবিত্রতার আকর বলিলেও অন্যায় বলা হয় না, কারণ ইহাতে পবিত্র দাম্পত্য-কর্ত্তব্যের সুবিমল স্নেহের ও ভক্তির চিত্র ব্যতীত হেয় ভাবের চিত্র একেবারে নাই। যে সময় মনসার ভাসান বিরচিত হয়, তখন বাঙ্গালী একেবারে অধঃপাতে যায় নাই, মনসার ভাসান গাম্ভীর্য্যহীন হউক, বিরাট ভাবের একখানা কাব্য না হউক, কিন্তু নির্ভয়ে এ কথা বলা চলে যে, ইহাতে কোথাও একটিও জঘন্য ভাবের অবতারণা নাই; বেহুলা-চরিত্র উজ্জ্বলতর করিবার জন্য তাহার আশে পাশে যে দু-একটা কুৎসিত চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাহাদিগকে আমরা কোনও ক্রমেই কুৎসিৎচিত্র বলিতে পারি না, অন্ততঃ সেই চিত্র থাকার জন্য মনসার ভাসান কাব্যকে কামোৎফুল্ল কাব্য বলা যায় না। বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে যে এ অধোগতি পরে হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সে যাহাহউক এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে প্রাচীন কবি ক্ষেমানন্দ রসাবতরণ বিষয়ে বিশেষ পটু। শুধু সনকা ও অমলার চরিত্রে অথবা বেহুলার চরিত্রেই যে আমরা ইহার পরিচয় পাই তাহা নহে; এই গ্রাম্য-কাব্যের সকল ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও এক একটি রসের সাহায্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে স্নেহ-রসটাই অধিক ফুটিয়াছে এবং মনোজ্ঞ-রূপেই ফুটিয়াছে। মনসার ভাসানের মানুষ-

গুলার হৃদয় আছে, তাহারা পরের জন্য কাঁদিতে জানে ; বেহুলার দুঃখে গ্রামশুদ্ধ লোক কাঁদিয়া পৃথিবী সিক্ত করিয়াছিল :—

'নগরের যত লোকে, হাহাকার করে শোকে,'

কেবল এই শোক-সমুদ্রের মাঝে স্থির ছিল—সে একজন চাঁদবেণে ;—

চাঁদবেণে নাহি কাঁদে পায়ে পুত্র শোক।
নখাইরের তরে কাঁদে নগরের লোক॥

আমাদের প্রাণটা আজ কালক্রমে এত অসাড় হইয়া পড়িতেছে যে, আমরা পরের জন্য তো "চুলোয়" যাক, নিজের জন্যও কাঁদিতে ভুলিতেছি ; চন্দ্রধরের মত স্থিরতা বা ধৈর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া যে কাঁদিতে ভুলিয়াছি তাহা নহে, কাঁদাটাকে অসভ্যতার ভিতর গণ্য করি বলিয়া। আমাদের হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছে, আমরা এখন "মাথা" লইয়া মাথা ব্যথায় অস্থির হইয়া পড়িতেছি। তাই এখানকার সাহিত্যে 'রস" উপিয়া গিয়াছে—সারল্য তিরোহিত হইতে বসিয়াছে। সে দিন কোনও এক বিলাতী সমালোচনার মত দেখিলাম যে আধুনিক সাহিত্যে আর রসের স্থান নাই, এখন ইহার ভিতর হৃদয়ের স্থানে মস্তিষ্ককে খুঁজিতে হইবে। ভাল কথা, কিন্তু মস্তিষ্কের সাহায্যে কি সাহিত্য গঠিত হয়—না এখন তাহা হইতেছে ? ইউরোপে কি এখন সেক্ষপীয়র মিলটনের জন্ম হইতেছে ? তাহা হয় না বলিয়া ইউরোপ এবং তদনুকরণে আমরাও নীরস হইয়া পড়িয়াছি ; এখন পিতার সহিত পুত্রের সম্পর্ক শিথিল হইতেছে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতে উৎসুক হইয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাবে সমষ্টির অনিষ্ট সাধিতে কেহ পশ্চাদ্‌পদ হইতেছে না। সাহিত্যে গৃহচিত্র, পারিবারিক চিত্র স্নেহের ছবি বড় একটা স্থান পায় না, তাহার পরিবর্ত্তে বড় বড় সমস্যা (problem) আসর জুড়িয়া বসে। কিন্তু মনুষ্যের মস্তিষ্ক পরিচালক আপাতঃ প্রয়োজনীয় অথবা সাময়িক মূল্য সম্বলিত মত-সমষ্টি বা ঘটনাবলী অপেক্ষা মনুষ্যের অপরিবর্ত্তনীয় হৃদয়-বৃত্তিগুলি—যাহারা চিরপুরাতন হইয়াও চিরনূতন এবং রসের অবলম্বন—সাহিত্যের যথার্থ উপাদান, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সেই উপাদান আমরা আজকালকার সাহিত্য অপেক্ষা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বেশী দেখিতে পাই—সেখানে দেখিতে পাই যে মানুষের স্নেহ প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি শুখাইয়া যায় নাই, মনুষ্যের চরিত্র-বল অন্তর্হিত হয় নাই, মানুষ স্বার্থান্ধ হয় নাই।

মনসার ভাসানে শুধু মাতৃ-হৃদয় বা পিতৃ-হৃদয় উন্মুক্ত হয় নাই, স্নেহের আরও অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে ; একটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বেহুলার ভাইয়েরা বেহুলাকে লইতে আসিয়াছে, আসিয়া তাহারা নিদারুণ সংবাদ শুনিল, বেহুলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনিল—শুনিল ও দেখিল বেহুলা মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করিতে কৃতসংকল্পা হইয়া স্বামীর শবসহ "কলার মান্দাসে" ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা স্নেহের ভগিনীকে ফিরাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছে, এবং তদুত্তরে বেহুলাও যে যে উত্তর দিয়াছে, কবি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমরা সেই টুকু উঠাইয়া দিতেছি :—

'সুবল সুন্দর বলে ভগিনী-গো শুন।
মড়াটা লইয়া কোলে জলে ভাস কেন॥
বাহুড়িয়া আইস ঘরে ফিরাও মান্দাস।

মাতা পিতা নাহি জীবে গণিও হুতাশ ॥
ভাইয়ের করুণায় তবে রামা বলে শুন।
কূলে দাঁড়াইয়া ভাই আর কান্দ কেন ॥
তিন ভাই বলে ভগ্নী তোর অল্প জ্ঞান।
সর্পাঘাতে মরিলে কি পায় প্রাণ দান ॥
ছাওয়াল ভগিনী তুমি বুঝ বিপরীত।
তোর পতি প্রাণ দান পাবে কদাচিত ॥

* * * *

কূলে দাঁড়াইয়া কাঁদে বেহুলার ভাই।
বাহুড় বাহুড় দিদি চল ঘরে যাই ॥
সাত নাহি পাঁচ নাহি একা ভগ্নী তুমি।
তোমার শোকেতে নাহি জীবেক জননী ॥
আমা সবাকারে তুমি কেমনে ছাড়িবে।
মড়াটা লইয়া কেন জলে ভেসে যাবে ॥
ঘরের প্রধান তুমি মায়ের জীবন।
মড়ার সহিত কেন মর অকারণ ॥
আগে তুমি খাবে পিছু আমরা খাইব।
ঘরের প্রধান তুমি মোরা কি বলিব ॥
শুনিয়া বেহুলা বলে শুন সহোদর।
পুনর্ব্বার প্রাণ যদি পায় প্রাণেশ্বর ॥
তোমা সবাকার ঘরে আর নাহি সাজে।
সকল ভাজের সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে ॥
দারুণ বিধাতা মোরে কৈল কোড়ে রাঁড়ী।
কত বা ফেলিব নিত্য নিরামিষ হাঁড়ী ॥
কহিও মায়েরে মোরে আশীর্ব্বাদ করিতে।
পরিশ্রমে পারি যদি কান্ত জীয়াইতে ॥
বেহুলা বলেন দাদা না কাঁদিহ আর।
চাঁপাতলায় পুঁতি রাখ মেলানির ভার ॥
প্রভুরে জীয়াতে পারি তবে সে আসিব।
খাইয়া মেলানি তবে মায়েরে দেখিব ॥
অকারণ কান্দ ভাই কূলে দাঁড়াইয়া।
কান্ত যদি জীয়ে পুনঃ আসিব ফিরিয়া ॥
আর কেন কান্দ ভাই দাঁড়াইয়া কূলে।
পাইবে আমার দেখা প্রাণনাথ জীলে ॥

মনসার ভাসানে এইরূপ সুন্দর সুন্দর খণ্ড চিত্র অনেকগুলি আছে। কতকগুলি চিত্র কবিকঙ্কণের কাব্য হইতে অনুকৃত হইয়াছে, যেমন বাঙ্গাল মাঝির ক্রন্দন, ঘটকের ঘটকালী প্রভৃতি। বিবাহাদি সামাজিক ঘটনা বর্ণনাও অনেক পরিমাণে এই ধরণের। আলোচ্য কাব্যখানিকে বস্তুনিবন্ধ (matter of fact) কাব্য বলা যায়। ইহার মধ্যে অবান্তর প্রস্তাব বড় কম, এমন কি ইহার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণন একেবারে নাই বলিলেই চলে। লোক যেমন গল্প বলিয়া যাইবার সময় শুধু গল্পই বলিয়া যায়, তাহার ভিতর প্রাকৃতিক শোভার বর্ণন করিতে বসে না, ক্ষেমানন্দও তাহাই করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি বেহুলার জীবনচরিত গল্পের ছলে বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে চরিত্র বিকাশ যতটুকু হইবার, তাহা হইয়াছে, তিনি কোথাও এই আখ্যানটিকে অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা করেন নাই। এক হিসাবে ইহাতে তাঁহার কাব্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ অলঙ্কার সুবিন্যস্ত হইলে কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আর এক হিসাবে ইহাদ্বারা কবির উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছে—তাঁহার একাগ্রতা ভাল করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কবির উদ্দেশ্য বেহুলার চরিত্র ফুটাইয়া তোলা—এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমাবধি তাঁহার সকল কৌশল প্রয়োগ করিতেছিলেন। তাঁহার মন আর কোনও দিকে যায় নাই, তাঁহার কল্পনা অপর কোনও বিষয় লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই, তাঁহার

চক্ষে জগতের সকল শোভা উপেক্ষিত হইয়া এই অপূর্ব্ব সতী-চরিত্ররূপে সার শোভাটিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বুঝিতেন, তাই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা তাহাদের মনকে একটি বিষয়ে বাঁধিয়া রাখা। এমন কি বেহুলার বাহ্য-শোভা, তাঁহার রূপবর্ণনেও, কবি অধিক সময়ক্ষেপ করেন নাই, দু একটি উপমায় তাহাও সারিয়া লইয়াছেন। বেহুলার অলৌকিক ব্রত-উদ্‌যাপনার্থ যে যে বিষয়ে তাঁহার যে যে গুণ প্রয়োজনীয় তাহারই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, এই চরিত্রের প্রস্ফুটনার্থ যে যে ঘটনা যে যে চরিত্র চিত্রিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাই তিনি আঁকিয়াছেন। মহাকবি কবিকঙ্কণ যে কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, ক্ষেমানন্দের সে প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তাঁহার একনিষ্ঠতা তাঁহার সেই দোষ অনেকাংশে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বেহুলাকে লইয়াই তাঁহার কাব্য, বেহুলাকে লইয়াই তাঁহার আখ্যান। যাহা বেহুলা সম্পর্কিত নয় তাহাতে তাঁহার উৎসাহ নাই, দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। বেহুলাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার সমগ্র চিত্রাবলী। মনসা বেহুলার আরাধ্যা, বেহুলা তাঁহার পূজা প্রচার করিবে, এবং সেই পূজা প্রচার করিবে চাঁদবেণের সাহায্যে—তাই চাঁদবেণের মনসা-বিদ্বেষ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার মনসা পূজা পর্য্যন্ত চিত্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীজীতেন্দ্রলাল বসু।

প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে স্বাস্থ্যলাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ইংরাজি ভাষায় বড় লেখক বা বাগ্মী বলিয়া এ দেশে তাঁহাকে কেহ জানিত না, অতএব বিলাতে তাঁহার যশ প্রচারিত হইবার কোন কথা ছিল না। অথচ এক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে, ইয়োরোপে ও আমেরিকায় তাঁহার যশ যেরূপ ঘোষিত হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় কোন বাঙ্গালী অথবা ভারতবাসীর সেরূপ হয় নাই। বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় মনে পড়ে। যখন শিকাগো ধর্ম্ম-মহাসঙ্ঘে বিবেকানন্দের ভেরী-কণ্ঠ প্রতীচ্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল তখন তাঁহাকে কে চিনিত? তিনি বেগবতী ওজস্বিনী ইংরাজি ভাষায় ভারতের আধ্যাত্মিক মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ কখন ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন নাই, ইংরাজি লেখা প্রকাশ করেন নাই, তবে কোন্ মোহিনী শক্তিতে তিনি ইয়োরোপ ও আমেরিকাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন? সে কথা কাহারও অবিদিত নাই। দূর প্রবাসে বসিয়া তিনি স্বরচিত কতকগুলি কবিতা ইংরাজি পদ্যে অনুবাদ করেন। সে গুলি কয়েক জন ইংরাজ কবি ও সমালোচককে দেখান এবং

তাঁহাদের প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া 'গীতাঞ্জলি" প্রকাশিত করিয়াছেন। মূল রচনা তাঁহার, অনুবাদও তাঁহার। ইহাতেই তাঁহার যশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। সে দিন তিনি 'চিত্রাঙ্গদা'র ইংরাজি অনুবাদ সভায় পাঠ করিবার পর ভারতের অন্যতর সচিব মিষ্টার ই. এস, মণ্টো যেরূপ করিয়া তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন তাহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?

প্রবাসে রবীন্দ্রনাথের যেরূপ সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, স্বদেশেও তাহার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা টাউন হলে তাঁহাকে যেরূপে অভিনন্দন করা হয়, তাহা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। সে সম্মান রবীন্দ্রনাথের নয়, বাঙ্গালী জাতির। তাঁহার সম্মান করিয়া বাঙ্গালী আপনাকে সম্মানিত করিয়াছে। সকল দেশেই একটা কথা আছে যে, স্বদেশে গুণবানের আদর হয় না। রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করিয়া বাঙ্গালী কর্ম্মক্ষেত্রে সে কথার প্রতিবাদ করিয়াছে। বিদেশে তাঁহার যে সম্মান হইয়াছে তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালীর আরও গৌরব অনুভব করা উচিত, কিন্তু দুই চারিজন বাঙ্গালীর পক্ষে ঘটিয়াছে তাহার বিপরীত। কোন বাঙ্গলা কাগজপত্রে সে কথার বড় উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং কতক বিদ্রূপ, কতক শ্লেষের আমেজ দেখা যায়। সে সকল ইঙ্গিত-কটাক্ষে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের এতটা সম্মান তাঁহাদের তেমন প্রীতিকর হয় নাই, তাঁহাদের মনের ভাবটা যেন তাঁর যতটা খ্যাতি হইয়াছে তিনি তাহার যোগ্য নহেন। ঠারে ঠোরে যেন বলা হইয়াছে যে ইংরাজ জাতি কিছু বোকা, নহিলে রবীন্দ্রনাথের কি এত বড় প্রতিভা যে তাহারা তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি বলে ? তাঁহারা চতুর, ইংরাজের অতিবাদে ভুলিবার পাত্র নন, রবীন্দ্রনাথকে আকাশে তুলিলে তাঁহারা আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত বিবেচনা করিবেন না। কতকটা ঝাঁঝালো (Smart) লেখার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া, কতকটা নির্ভীক সমালোচকের পদ কামনায় কাহারো কাহারো এই রকম মত হয়, কিন্তু জাতির পক্ষে এ লক্ষণ ভাল নয়। কৃষ্ণদাস পাল যখন বঙ্গদেশে প্রধান ব্যক্তি, তখন তাহার নামে একটা ছড়া উঠিয়াছিল—

> কেলি.
> হাত পিছ্‌লে গেলি,
> অনরেবল হলি !

রবীন্দ্রনাথের নামে কেহ কেহ বা সেরূপ কোন ছড়া তুলিলে অবশ্য কিছু বলা চলিত না, কারণ রসিকতার যে কোন দোষ আছে তা নয়, পৃথিবীতে এমন লোকই নাই যাহার সম্বন্ধে দুইটা হাসির কথা বলা বা লেখা যায় না, কিন্তু ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের গৌরব আমাদের দেশের, আমাদের জাতির গৌরব, এ কথা যদি আমরা না বুঝি বা অপরকে না বুঝাই ত আমাদের মন্দ ভাগ্য। ইংলণ্ডে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহারা স্বয়ং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, কবি ও সমালোচক। শুধু যে হুজুগ করিবার জন্য তাঁহারা বাঙ্গালী কবিকে বাড়াইয়াছেন এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই, এবং তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা হয়। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সকলেই বাঙ্গালী, ইয়ো-

য়োপে ইঁহাদের সকলেরই প্রশংসা এবং সম্মান হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের সম্মানেও আমরা গৌরব ও আনন্দ অনুভব না করিব কেন?

ইহার মূলে জাতীয় চরিত্রের একটা বড় কথা আছে। গুণগ্রাহিতা হৃদয়বানের লক্ষণ। নিন্দা করা মানুষের সহজে আইসে কিন্তু ক্রমাগত নিন্দাপ্রবণ হইলে মানুষের প্রকৃতি নীচ হইয়া যায়। সমালোচকের কথা বলিতেছি না, সাধারণ লোকের কথা হইতেছে। যদি জননী জন্মভূমির প্রতি যথার্থ ভালবাসা থাকে ত বাঙ্গালী যে ভাই ভাই এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই কেন? একজন বাঙ্গালীর গৌরবে সমগ্র জাতির গৌরব সে কথা স্মরণ করি না কেন? আমরাই প্রথমে কবিকে জয়মাল্য দিয়া বরণ করি, এখন যদি তাঁহার যশ সুদূর প্রবাসে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে যে আমরা যথার্থ গুণের সমাদর করিতে জানি এই কথা মনে করিয়া আমাদের প্রীতি লাভ করা উচিত। ইয়োরোপে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ললাটে কবির রাজতিলক দিয়াছেন তাঁহারা ধন্য, তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। আজ বাঙ্গালার কবি জগতের কবি এ কথা মনে করিয়া কোন্ বাঙ্গালী হর্ষ গৌরবে আপনাকে ধন্য মনে না করিবে?

আর একটি কথা। মানুষের চরিত্র ও মানুষের প্রতিভা ও শক্তি দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস। চরিত্রশূন্য ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হয় এমন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাহারও চরিত্রে কোন দোষ থাকিলে তাহার কীর্ত্তি ম্লান বা হ্রাস হয় না। প্রাচীন মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তিই আছে, তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। ফরাসী বিপ্লবের প্রধান নেতা কাউণ্ট মিরাবো যেমন শক্তিশালী ছিলেন তেমনি তাঁহার চরিত্রদোষ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে কার্লাইল লিখিয়াছেন যিনি তাঁহার স্রষ্টা তিনি তাঁহার বিচারক, তুমি আমি বিচার করিবার কে? এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে প্রশংসায় বা নিন্দায় বড় একটা আসিয়া যায় না, যাহার যে শক্তি থাকে সেই শক্তির বিকাশে সে স্মরণীয় হয়। কিন্তু যদি প্রতিভা ও চরিত্রের সমবায় একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে গৌরবের বিশেষ কারণ হয়। রবীন্দ্রনাথের ঋষিতুল্য চরিত্র, তাঁহার বিনয়, তাঁহার উদারতা ও সৌজন্য কাহার অবিদিত আছে? তাঁহার স্বদেশ-প্রেম বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কণ্ঠে কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে। বোলপুরে তাঁহার পাঠশালা ও ছাত্রনিবাস যে দেখিয়াছে সে-ই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার মহৎ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিয়াছে। দিল্লীর সেণ্ট ষ্টীফন্‌স কলেজের আচার্য্য এণ্ড্রুজের নাম সকলে শুনিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে কয়েক সপ্তাহ রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে বাস করেন। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তিনি অনেক লিখিয়াছেন এবং রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিংএর সাক্ষাতে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। দিল্লীতে এণ্ড্রুজ সাহেব সর্ব্বদাই আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্প করিতেন। তিনি আমাকে বলেন, "I have never seen a greater personality in my life." এ কথা ব্যক্তিগত, কবির প্রতিভা সম্বন্ধে নহে। রবীন্দ্রনাথের সম্মানে বাঙ্গালী জাতির যেরূপ সম্মান ও গৌরব হইয়াছে অনেক কাল সেরূপ হয় নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বৈদিক সাধনার আভাস

এইরূপে ঋষিগণ শতবর্ষ পরমায়ু প্রার্থনা করিতেন। কেন? মরণের ভয়ে কি? না, দীর্ঘকালব্যাপী বিষয়-ভোগের লালসায়? এ প্রশ্নের উত্তর ঋষি নিজেই দিয়াছেন :—

"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং
পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং
যদায়ুঃ ॥
শতমিন্নু শরদো অংতি দেবা যত্রা নশ্চক্রা
জরসং তনূনাং।
পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা
রীরিষতায়ুর্গংতোঃ ॥"

২।৮৯।৮,৯

হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বারা কল্যাণময় বাক্য সকল শুনিতে পাই; হে যষ্টব্য দেবগণ, আমরা যেন চক্ষু দ্বারা কল্যাণময় বিষয় সকল দেখিতে পাই। আমরা যেন দৃঢ় অবয়ব ও শরীরযুক্ত হইয়া তোমাদিগের স্তুতি করিতে করিতে দেব-নির্দ্দিষ্ট যে আয়ু তাহা ভোগ করিতে পারি। হে দেবগণ, মনুষ্যদিগের জন্য শত বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব এই আয়ুঃকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে নাশ করিও না, যে কালের মধ্যে আমাদিগের শরীর তোমরা জরাগ্রস্ত করিবে ও আমাদিগের পুত্রেরা আমাদিগের পালক হইবে।

"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম" প্রভৃতি ঋক্‌টি মুণ্ডকোপনিষদের মূল শ্লোক; সুতরাং শুধু যে আমাদের মত তাহা নহে, জ্ঞানমার্গের দ্বার-প্রদর্শক ঔপনিষদিক ঋষিরও এই মত যে বৈদিক ঋষি পারমার্থিক শ্রেয়োলাভের জন্যই দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেন। কর্ম্মমার্গের অধিকারী সাধক ইহ জগতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে করিতে শত বর্ষ জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবেন, ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের মত।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"
—ঈশোপনিষৎ ২

"অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥"

প্রশ্নোপনিষৎ ২।৬

রথচক্রের নাভিতে অরসকলের ন্যায় সমস্তই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে; ঋক্ সকল, যজুঃ সকল ও সাম সকল এবং যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণও প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে।

তাই বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন :—

"বি মচ্ছ্রথায় রশনামিবাগ ঋধ্যাম তে বরুণ
খামৃতস্য।
মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা
শার্যপসঃ পুর ঋতোঃ ॥"

২।২৮।৫

হে বরুণ, রজ্জুর ন্যায় পাপের বন্ধন আমা হইতে শিথিল কর, যাহাতে আমি তৎসম্বন্ধীয় ঋতের বা সত্যের পূর্ণা নদীকে লাভ করিতে পারি। কর্ম্ম করিতেছি যে আমি আমার কর্ম্মসন্ততি ছিন্ন করিও না, ঋত সমাপ্তি কালের পূর্ব্বে কর্ম্মের শরীর নষ্ট করিও না।

বৈদিক ঋষির নিকট আয়ু কেবল স্থূল দেহের জীবিতসংহতাবস্থাব্যাপক কাল ছিল

না। ঋক্ সংহিতার একাধিক স্থলে বায়ু দেবতা আয়ু নামে অভিহিত হইয়া পুজিত হইয়াছেন। যেমন পরমাত্মা ও জীবাত্মায় বস্তুগত ভেদ নাই, সেইরূপ বিশ্ববায়ুতে ও প্রাণবায়ুতে কোন বস্তুগত ভেদ নাই। জীবাত্মা যেমন অবিদ্যোপহিত পরমাত্মপদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাণবায়ুও সেইরূপ শরীরোপহিত বিশ্ববায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই ঋষি বায়ুদেবতার স্তুতিগান করিতে করিতে বলিয়াছেন, হে বায়ু, তুমি দেবগণের আত্মস্বরূপ ও ভূতজাতের অন্তর্নিহিত প্রাণস্বরূপ ("আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভঃ।" ১০।১৬৮।৪)। প্রাণবায়ু দ্বিবিধ—স্থূল-শরীরান্তর্গত ও সূক্ষ্ম-শরীরান্তর্গত; কারণ জীবের শরীর দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত; সুতরাং স্থূল শরীরান্তর্গত প্রাণবায়ু স্থূলবায়ু মাত্র। স্থূল শরীরের নাশে স্থূল প্রাণবায়ু স্থূল বিশ্ববায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। সূক্ষ্মশরীর সূক্ষ্মপঞ্চতন্মাত্র দ্বারা গঠিত, সুতরাং সূক্ষ্মশরীরান্তর্গত প্রাণবায়ুর উপাদান সূক্ষ্ম বায়ুতন্মাত্র। সূক্ষ্মশরীর নষ্ট হইলে সূক্ষ্মপ্রাণবায়ু সূক্ষ্মবিশ্ববায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জীব সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অনবরত সেই সঙ্গমের দিকে ছুটিতেছে। কিন্তু যে অনাদিভূত সংস্কার সকলের বশে জীব দেহধারী জীব, সেই সকল সংস্কারের নাশ না হইলে সূক্ষ্ম দেহের নাশ হয় না ও জীবের বিদেহ-কৈবল্যও প্রাপ্তি হয় না। এই সকল সংস্কারের নাশের জন্য জীবকে এক অবিচ্ছিন্নরূপী সূক্ষ্মদেহ ভিন্ন বহু স্থূল শরীর ধারণ করিতে ও ত্যাগ করিতে হয়। এই জন্যই স্থূল শরীরের প্রয়োজনীয়তা এবং এই জন্যই স্থূল শরীরের দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়। নতুবা, জ্ঞানীর নিকটে জীবের প্রাণ তাহার সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত। যাহারা অজ্ঞানী, যাহাদের দৃষ্টি স্থূলদেহের অতিরিক্ত কোন পদার্থের উপলব্ধিকরণে অসমর্থ, তাহারাই কেবল স্থূলশরীরের নাশে জীবের প্রাণনাশ দেখে। জীবের সূক্ষ্মদেহ একবার ভিন্ন মরে না, সূক্ষ্মদেহের প্রাণ সূক্ষ্ম দেহকে কখনও ছাড়িয়া যায় না, যখন যায় তখন জীব আর জীব থাকে না। সূক্ষ্মদেহের এই সূক্ষ্ম প্রাণই জীবের যথার্থ আয়ু। এই জন্য বৈদিক ঋষি স্থূলদেহাবসানের পর জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

"আয়ুর্বিশ্বায়ুঃ পরিপাসতি ত্বা পূষা ত্বা পাতু
প্রপথে পুরস্তাৎ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেবঃ
সবিতা দধাতু॥" ১০।১৭।৪

আয়ুরূপী বিশ্বায়ু তোমাকে পালন করুক; প্রথমে পূষা তোমাকে প্রকৃষ্ট পথে রক্ষা করুন। সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি সকল যেখানে অবস্থিত আছেন ও গমন করেন সেই স্থানে দেব সবিতা তোমাকে স্থাপন করুন।

ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দ্বিতীয় সোপান, অদ্বৈত জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর। বিরাটত্বের প্রথম জ্ঞান প্রথমে অন্নে হয়, পরে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রাণে হয়। আত্মা অন্নময় এই ধারণার পর আত্মা প্রাণময় এই সূক্ষ্মতর ধারণা হয়। ভৃগু ঋষি দ্বিতীয়বার তপস্যা করিয়া "প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ" প্রাণ ব্রহ্ম ইহা জানিয়াছিলেন (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ" ৩।৩)।

"প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি
মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।

প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্ব্বমেব আয়ুর্যন্তি।
যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে।"

যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বায়ুষ্ব প্রাপ্ত হন। সাধকের বুদ্ধি অন্নময়কোষ হইতে প্রাণময়কোষে স্থির হইলে তাঁহার অমরত্ব প্রাপ্তি হয়। স্থূল-শরীররূপ অন্নময়কোষে আর তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। দেব সবিতা তাঁহাকে স্বর্গে দেবলোকে অমরত্বপদে স্থাপনা করেন। মৃত্যু আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন :—

"পরং মৃত্যো অনু পরেহি পথাং যস্তে স্ব
ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং
রীরিষো মোত বীরান॥
মৃত্যো পদং চোপযংতো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ
প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত
যজ্ঞিয়াসঃ॥" ১০।১৮।১,২

হে মৃত্যু, দেবযান পথ হইতে ভিন্ন তোমার যে স্বভূত অন্য পথ আছে সেই পথে এ স্থান হইতে গমন কর; চক্ষুষ্মান্ শ্রোত্রবান্ তোমাকে বলিতেছি, আমাদিগের সন্ততি ও পুত্রাদিকে হিংসা করিও না। ১। হে মৃত্যুর পথ (পিতৃযান পথ) পরিবর্জ্জনকারিগণ, যেহেতু তোমরা (দেবযানপথে) আগমন করিয়াছ, অতএব তোমরা দীর্ঘতর ও প্রকৃষ্টতর আয়ু ধারণ কর। হে যজ্ঞসম্পাদনকারী যজমানগণ, তোমরা সন্ততি ও ধন দ্বারা বর্দ্ধিত হও, (জন্মান্তর-সঞ্চিত দুরিত-ক্ষয়-হেতু) শুদ্ধ হও ও (ইহ জন্মোপচিত দুরিত ক্ষয়হেতু) পবিত্র হও। ২।

দেখা গেল বৈদিক ঋষি যে অর্থ, পশু, পুত্র, দীর্ঘজীবন প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা করিতেন তাহা ঐহিক ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, পরন্তু পারলৌকিক ও পারমার্থিক শ্রেয়ের জন্য। পারলৌকিক ও পারমার্থিক শ্রেয় কি তাহা ঋষিবাক্য দ্বারাই দেখাইতেছি। ঋষি বলিতেছেন.—

"ঊর্দ্ধো নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং
সমত্রিণং দহ।" ১ ৩৬।১৪

(হে যূপ,) তুমি উন্নত হইয়া আমাদিগকে জ্ঞান দ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর; সর্ব্ব-ধ্বংসকারীকে দহন কর।

"ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্ত্যং।
দক্ষিণা পাত্বংহসঃ॥
সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং।
মণিং মেধাময়াশিষং॥
যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।
স ধীনাং যোগমিন্বতি॥" ১।১৮।৫,৬,৭

হে ব্রহ্মণস্পতি, ইন্দ্র, সোম ও দক্ষিণাদেবী, মর্ত্ত্যকে পাপ হইতে রক্ষা কর। আমি মেধা লাভ করিবার জন্য সদসস্পতিকে পাইয়াছি যিনি অদ্ভুত, ইন্দ্রের প্রিয়, কমনীয় ও ধনদাতা; যাঁহাকে ছাড়িয়া বিদ্বানের যজ্ঞও সিদ্ধ হয় না। তিনি ধীসকলের যোগ (সম্বন্ধ) স্থাপনা করেন।

"ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিংচ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং॥

অপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা॥

১।২৩।২২-২৩

হে অপ্ সকল আমাতে যাহা কিছু (অজ্ঞানকৃত) দুরিত আছে, অথবা আমি সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানপূর্ব্বক যে দ্রোহ করিয়াছি, কিম্বা (সাধুজনকে) যে অভিসম্পাত করিয়াছি, কিম্বা যে মিথ্যা বলিয়াছি তাহা বহন করিয়া লইয়া যাও। অদ্য অপ্ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া সম্যক্‌রূপে রসসিক্ত হইয়াছি; হে অগ্নি পয়োযুক্ত তুমি আগমন কর ও এতদ্রূপ আমাকে তেজঃসম্পন্ন কর॥

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিঃ বিধেম॥

—১।১৮৯।১

হে সর্ব্বজ্ঞাতব্যবিষয়ে বিদ্বান্ দেব অগ্নি, আমাদিগকে শোভন পথে (স্বর্গাদি) ধন প্রতি লইয়া যাও। কুটিলকারী পাপকে আমাদিগের হইতে পৃথক্ কর। আমরা তোমার ভূয়িষ্ঠ নমস্কার বিধান করিতেছি।

"অপো সুম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসংরাড়ৃতাবোঽনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্ধ্যংহো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে॥"

২-২৮ ৬

হে বরুণ, আমা হইতে ভয় দূরীভূত কর। হে সম্রাট্ (সম্যক্ রাজমান্), হে ঋতবন্ (সত্যবন্), আমাকে অনুগ্রহ কর। গো-বৎস হইতে দোগ্ধা যেমন রজ্জু বিমোচন করে, সেইরূপ আমা হইতে পাপ বিমোচন কর। এক নিমেষের জন্যও তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও চাহি না।

"প্র ব একো ভূর্যাগো যন্মা পিতেব কিতবং শশাস।
আরে পাশা আরে অঘানি দেবা মা মাধি পুত্রে বিমিব গ্রভীষ্ট॥ ২।২৯।৪

হে দেবগণ, আমি একাকী তোমাদিগের বিরুদ্ধে অনেক পাপ করিয়াছি এবং তজ্জন্য তোমরা আমাকে পিতা যেমন পুত্রকে শাসন করে সেইরূপ শাসন করিয়াছ। হে দেবগণ, পাশ সকল বিদূরিত হউক, পুত্রের সম্মুখে পক্ষী-পিতাকে ব্যাধ যেরূপ গ্রহণ করে সেইরূপ ভাবে আমাকে গ্রহণ করিও না।

"অস্মাকমগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহসঃ সুনো ত্রিষধস্থ হব্যং।
বয়ং দেবেষু সুকৃতঃ স্যাম শর্ম্মণা নস্ত্রিবরূথেন পাহি॥" ৫।৪।৮

হে অগ্নি, আমাদিগের যজ্ঞ সেবন কর; হে বলের পুত্র, হে ত্রিস্থানস্থ দেব, হব্য সেবন কর। আমরা যেন দেবগণের মধ্যে সুকৃতি সম্পন্ন হইতে পারি। বরণীয় ত্রিবিধ (বাচিকাদি) সুখের দ্বারা আমাদিগকে পালন কর।

"আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং দিদৃক্ষেণ্যং সূর্যস্যেব চক্ষণং।
উতো অস্মাঁ অমৃতত্বে দধাতন * *॥ ৫।৫৫।৪

হে মরুদ্গণ, তোমাদিগের মহত্ব স্তুতিযোগ্য, তোমাদিগের সূর্য্যের ন্যায় রূপ দর্শনীয়। আমাদিগকে অমৃতত্বে স্থাপন কর।

"ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ॥" ১০।২০।১

হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে শুভযুক্ত মন প্রেরণ কর।

এইরূপে কাতর কণ্ঠে ঋষি চিত্তশুদ্ধির জন্য অহরহঃ প্রার্থনা করিয়াছেন। হে দেব, আমি জ্ঞানহীন আমাকে জ্ঞান দাও; আমি দীন হীন মূঢ় পাপী, আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর, আমার সর্ব্বনাশী অবিদ্যাকে নাশ কর; জ্ঞানে ও অজ্ঞানে আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর; আমি মোহান্ধকারে নিমগ্ন, আমাকে তেজঃসম্পন্ন কর; আমাকে যেন বিভীষিকাপূর্ণ নরকের পথে ভ্রমণ করিতে না হয়। সংসারের তাপ স্মরণ করিয়া আর্য্য ঋষি অশ্রুসিক্ত লোচনে দেবচরণে জানাইয়াছেন, প্রভো, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম; আমি বড় পাপী, কিন্তু তজ্জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী পিতার ন্যায় তুমি আমাকে শাসন করিয়াছ; হে দয়াময়, আর যেন আমাকে পাপ স্পর্শ করিতে না পারে; আর যেন আমি ব্যাধহস্তে ক্ষুদ্র পক্ষীটির মত দুষ্কর্ম্মের হস্তে নিগৃহীত না হই; আমার চিত্তের মল বিধৌত কর। যজ্ঞভূমিতে লুটাইয়া আকুল প্রাণে ঋষি বলিয়াছেন, প্রভো, নাথ, দয়াময়, আমি এক নিমেষের জন্যও তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও চাহি না; তোমার বিরহ আমার অসহ্য।

এইরূপ ভক্তির সাহায্যে ঋষি বিমল বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী হইতেন, ঊর্দ্ধমুখী কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বপিতাকে আরাধনা করিয়া অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিতেন এবং চির আলোকময় সবিতৃরাজ্য স্বর্গধামে বাস করিবার উপযুক্ত হইতেন। ইহারই নাম ধর্ম্মানুষ্ঠান।

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥

সাংখ্যকারিকা, ৪৪।

ধর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধে স্বর্গাদিলোকে গমন হয়, অধর্ম্মের দ্বারা নিম্নে সুতলাদি নরকে গমন হয়, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হয়, ও অজ্ঞানের দ্বারা সংসার বন্ধন হয়।

যজ্ঞাদি উপাসনামূলক ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তাই সোম-যজ্ঞের অন্তে বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন;—

"যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিঁল্লোকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো
পরিস্রব॥" —৯-১১৩-৭,৮

হে পবমান, যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ বর্ত্তমান, যে লোকে স্বঃ অর্থাৎ আদিত্যাখ্য জ্যোতিঃ নিহিত আছে সেই মরণধর্ম্মরহিত অতএব অক্ষীণলোকে আমাকে স্থাপন কর; হে ইন্দু, ইন্দ্রের জন্য পরিস্রুত হও। যে লোকে বৈবস্বত রাজা, যে লোকে আদিত্য অবরুদ্ধ (অর্থাৎ ভূতবর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট) এবং যে লোকে এই সকল (গঙ্গাদি) মহতী অপ্‌-সকল বর্ত্তমান, সেই লোকে আমাকে মরণ ধর্ম্মরহিত কর; হে ইন্দু, ইন্দ্রের জন্য পরিস্রুত হও। ৮। (ক্রমশ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে বাঙ্গলার একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে। তিনি একাধারে কবি, নাটককার, সঙ্গীতকার, পরিহাস-রসিক ও একজন প্রধান সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলার সাহিত্য ও সমাজে যে স্থান শূন্য হইয়াছে—তাহা শীঘ্র পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে বংশের সন্তান ছিলেন তাহা বাঙ্গলার একটী অতি সম্ভ্রান্ত বংশ। কৃষ্ণনগরের দেওয়ান-বংশকে বাঙ্গলার কে না চিনে? এই বংশ সাহিত্য-চর্চ্চার জন্যও বাঙ্গলায় বিখ্যাত। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা স্বর্গগত দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। অন্য প্রকারেও তিনি সেকালের বঙ্গসমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং সাহিত্য-সেবা দ্বিজেন্দ্রলালের পৈতৃক অধিকার ছিল বলা যায়। এই পৈতৃক অধিকারের তিনি যে সর্ব্বপ্রকারেই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও বিলাতের সাইরেনসেষ্টার্ কলেজে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রথম যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের দরবারে দেখা দেন, তখন সে হাসির পসরা লইয়া। প্রাচীন বাঙ্গলায় হাস্যরস ছিল বটে—কিন্তু তাহা অল্পবিস্তর অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট ছিল; বিশুদ্ধ হাস্যরসের একপ্রকার অভাব ছিল বলিলেই হয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী-প্রসঙ্গে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। সেকালের রসিকতাকে তিনি মোটা লাঠির ঘায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই অস্ত্র লইয়া যে আঘাত করিত সে হাসিত বটে; কিন্তু যাহার লাগিত তাহার হাসি অপেক্ষা ক্রন্দনের সম্ভাবনাই বেশী থাকিত। একালের রসিকতাকে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন ডাক্তারের ল্যান্সেট্। ইহা কুচ্ করিয়া কাটিয়া দেয়—রক্তও বাহির হয়, কিন্তু রোগী সহজে বুঝিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্রও প্রাচীন রসিকতার সংক্রামক স্পর্শ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে এই বিশুদ্ধ হাস্যরসের আমদানী করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আসরে নামিয়াই এই বিশুদ্ধ হাস্যরসে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। বাঙ্গলার লোক তাঁহার আমদানী করা নূতন জিনিষে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া গেল।

বিশুদ্ধ হাস্য যেমন ব্যক্তির পক্ষে তেমনি সমাজের পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কবি বলিয়াছেন, যে মানুষ প্রাণ ভরিয়া হাসে না, সে খুন পর্য্যন্ত করিতে পারে। খুন করুক আর নাই করুক, তাহার যে মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এ কথা নিশ্চিত। জাতির পক্ষেও তাহাই। হাসি আনন্দের বাহ্যরূপ। যে জাতি হাসিতে জানে না—যাহার প্রাণে আনন্দ নাই, সে যে সুস্থ দেহে নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ অল্প। সে জাতি হয় ত কুশাগ্র বুদ্ধি, গম্ভীর-স্বভাব দার্শনিক হইতে পারে, কিন্তু প্রাণময়, লীলাময়, জীবন্ত জাতি নহে;

—কঠোর নীতি-প্রবণ হইতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের মাধুর্য্য হারাইয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং হাসির সাহিত্য জাতীয় প্রাণেরই পরিচয় দেয় ;—আর যিনি হাসাইতে পারেন তিনি লোকসমাজের পরম বন্ধু। দ্বিজেন্দ্রলাল এই হিসাবে বাঙ্গালী জাতির পরম বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। এই অবসাদ-গ্রস্ত, দারিদ্র্যভার-পীড়িত জাতিকে তিনি হাসাইতে পারিয়াছিলেন ;—এই অনাহার ক্লিষ্ট, রুগ্ন, নিরাশপ্রাণ জনগণের হৃদয়ে তিনি আনন্দধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার কম সৌভাগ্যের কথা নহে। "ডি, এল, রায়ের" হাসির গান ও কবিতা না জানে বাঙ্গলাদেশে এমন লোক কমই আছে। শিক্ষিত ব্যক্তির ত কথাই নাই ; হাটে মাঠে ঘাটে নিরক্ষর কৃষকদিগের মুখেও তাঁহার গান শুনিয়া পুলকিত হইয়াছি। আর এইটীই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। যে কাব্য বা কবিতা, চিন্তা বা ভাব সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বদ্ধ থাকে তাহা মূল্যবান্ হইলেও সাধারণের সম্পত্তি বলা যায় না। যাহা অশিক্ষিত জনগণের হৃদয়েও প্রবেশ করে সেই চিন্তা বা ভাবই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বসাধারণের বস্তু।

হাসির কবিতাকে 'রঙ্গাত্মক' ও 'বিদ্রূপাত্মক'—এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। রঙ্গাত্মক কবিতায় কেবল বিশুদ্ধ হাসি—সরল, প্রাণখোলা, নির্দ্দোষ উচ্চহাস্য। এ হাসি অকারণ, ইহা আনন্দের আতিশয্যের ফল। ইহাতে মনের মেঘ কাটিয়া যায়—প্রাণকে হাল্‌কা করিয়া দেয়। কিন্তু বিদ্রূপাত্মক কবিতা ততটা অকারণ বা উদ্দেশ্য-হীন নহে। ইহা হাসির অন্তরালে তীব্র ভৎর্সনা,—অনেক সময় হৃদয়ের গভীর বেদনা-ভরা অশ্রু। ইহা লোক-সমাজকে হাসায় বটে—কিন্তু তাহার ব্যাধির প্রতিকারই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার মিষ্ট কষাঘাতে একদিকে যেমন আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারি না—অন্যদিকে তেমনই আমাদের হৃদয়ে আবার রক্তের রেখা পড়িয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির বাজারে এই দুই প্রকারের জিনিষই আছে। "পারো যদি জন্মো না কেউ বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলা," "বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাক্‌তো," "হ'তে পার্‌তেম্ আমি কিন্তু মস্ত একটা বীর" ; "তান্‌সেনের গান", "চাষার প্রেম" প্রভৃতি এই শ্রেণীর রঙ্গাত্মক কবিতা। "বিরহে"র অধিকাংশই এই শ্রেণীর। এই সকল গান ও কবিতায়, নির্দ্দোষ অকারণ উচ্চহাস্য ছাড়া আর কিছুই নাই। "আমরা বিলাতফেরত ক'ভাই", "We are reformed Hindus," "একদিন নন্দলাল করিল ভীষণ একটা পণ," "এমন অবস্থাতে পণে সবারই মত বদলায়", "প্রায়শ্চিত্ত," "ত্র্যহস্পর্শ" প্রভৃতি গান ও প্রহসন বিদ্রূপাত্মক শ্রেণীর। ইহাদের তীব্র কষাঘাতে যে বাঙ্গলার অনেক গাধা মানুষ হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ "আষাঢ়ে" নামক হাস্যকাব্যেও এইরূপ দুইশ্রেণীর কবিতাই আছে। "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা", "নসীরাম পালের বক্তৃতা" প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

কিন্তু হাস্যরস-রচনায় অদ্বিতীয় হইলেও দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষমতা এইখানেই সীমাবদ্ধ

থাকে নাই। তিনি সুপ্রসিদ্ধ নাটককারও ছিলেন। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ব্যতীত তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী নাট্যকার বাঙ্গলায় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। বাঙ্গলার নাট্য-সাহিত্য একেই নিতান্ত দরিদ্র। দ্বিজেন্দ্রলালের মত কৃতী ব্যক্তির অভাবে তাহার যে সমূহ ক্ষতি হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য। এমন এক সময় ছিল যে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের ২।১ খানি নাটক ছাড়া—বাঙ্গলায়, উন্নত বিশুদ্ধরুচির নাটক ছিল না বলিলেই হয়। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ এমন কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার রসপ্রবাহ এমন পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল যে, ভদ্রব্যক্তিরা সেখানে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। তাহাতে সামাজিক শিক্ষার পরিবর্ত্তে, তাহার রীতিনীতি দূষিত করিয়া অধঃপতনের পথ আরো প্রশস্ত করিয়া দিতেছিল। এখনও যে এই অধঃপতনের স্রোত একেবারে কমিয়াছে এমন কথা বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের এই হাওয়া যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নাট্য যে অতি উচ্চশিল্প, তাহা তাঁহার রচনায় আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। উন্নত ও বিশুদ্ধ রুচির বহু নাটক রচনা করিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চকে ভদ্রলোকের উপভোগের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাঁহারা বাঙ্গলা 'থিয়েটারে' যাইতে ঘৃণাবোধ করিতেন, এমন অনেক ব্যক্তিও ডি, এল, রায়ের নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, জানি।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কোন কথা বলা, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। তবে এ কথা বলিতে পারি যে তাঁহার অনেক নাটকই বাঙ্গলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার নাটকগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক। "পাষাণী" ও "সীতা" এই দুইখানি পৌরাণিক। ইহাদিগকে নাট্যকাব্য বলিলেই ভাল হয়। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'রাণাপ্রতাপ', 'দুর্গাদাস,' 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' এই গুলিই প্রধান। 'রাণাপ্রতাপ' বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। ইহা হৃদয়ে তাড়িত সঞ্চার করিয়া দেয়—হতাশের প্রাণে বল আনয়ন করে। 'দুর্গাদাস' ও 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। 'দুর্গাদাসে' তিনি এমন একটী বীর চরিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বাঙ্গলা সাহিত্যে দুর্ল্লভ। 'সাজাহান'কে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়াও আমাদের তৃপ্তি হয় না। জগতের সমক্ষে দেখাইবার মত বাঙ্গলা সাহিত্যের যে দুই একটী বস্তু আছে, তাহার মধ্যে এই একটী।

'পরপারে' দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র সামাজিক নাটক—আর ইহাই তাঁহার জীবিত কালে প্রকাশিত শেষ নাটক। এখন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বর্গগত। তাই এই নাটকের নামের সঙ্গে বাঙ্গালীর মনে চিরকাল একটা করুণস্মৃতি জড়িত হইয়া থাকিবে। এই নাটকে 'পরপারে'র ইঙ্গিত করিয়াই তিনি সেই পথে বিদায় লইলেন। এপারের দিন যে শেষ হইয়া আসিয়াছিল তিনি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? এই করুণ বিয়োগান্ত নাটকে তিনি মাতৃভক্তি-হীনতা ও রূপলালসার যে কুফল অঙ্কিত করিয়াছেন,

তাহাতে নিশ্চয়ই বঙ্গসমাজের অনেক উপকার হইবে।

'গীতিকাব্য' ও 'সঙ্গীত' রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত আমার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে কবিতা ও গান রচনা দ্বিজেন্দ্রলালের অবসর কাটাইবার উপায়স্বরূপ ছিল। তাঁহার গীতিকাব্য 'মন্দ্রে'র নাম অনেকেই জানেন। এই "বঙ্গদর্শন' পত্রেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই 'মন্দ্রে'র কবিতার নূতন ভঙ্গী, ছন্দের লীলাময়ী গতি বঙ্গসাহিত্যে অভিনব জিনিষ। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীতও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ন্যায়ই বাঙ্গলার লোক ভালবাসে। 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি', 'সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে জয় গৌরব জিনি", প্রভৃতি গান বাঙ্গলার ঘরে ঘরে গীত হয়। আমার ত মনে হয় এগুলি 'Inspired' বা কবির মনে দৈবানুপ্রেরিত। নহিলে এত শক্তি গানে আসিতে পারে না। আর কিছু না লিখিলেও শুধু এই কয়েকটী গানেই তিনি বাঙ্গলা দেশে অমর হইয়া থাকিতেন।

কবিহিসাবে বাঙ্গলাসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায়—তাঁহার কবিত্ব কত উচ্চ শ্রেণীর, তাহা বলিবার স্থান এ নহে। এই মাত্র বলিতে পারি যে, বাঙ্গলায় দ্বিজেন্দ্রলালের পুরুষোচিত ভৈরব রব আমাদের বড় ভাল লাগিত। মিহি ও মেয়েলী সুর, অসুস্থ রুগ্ন মনেরই লক্ষণ; সবল, সুস্থ মন হইতেই পুরুষোচিত কবিত্ব জন্মে। দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টান্তে বাঙ্গলার কাব্য-জগৎ হইতে এই 'মানসিক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা' যত দূর হয় ততই ভাল। আর একটী অমূল্য খাঁটী জিনিষ আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট পাই; তাহা স্বদেশপ্রেম, তাঁহার প্রতি গ্রন্থের পত্রে পত্রে, প্রতি কবিতা ও গানের ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার হৃদয় বোধ হয় স্বদেশপ্রেমেই ভরা ছিল। তাই, কি রঙ্গরসে, কি করুণ ক্রন্দনে, কি বীরত্বের উত্তেজনায়—কোন স্থলেই তিনি স্বদেশকে ভুলিতে পারেন নাই। এমন মাতৃভক্ত সন্তান হারাইয়া বঙ্গভূমি আজ সত্যই রত্নহীনা হইলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের যাইবার বয়স মোটেই হয় নাই। তাঁহাকে আমরা অকালেই হারাইয়াছি, যে সময়ে তাঁহার প্রতিভার কেবল মধ্যাহ্ন সূর্য্য;—যে সময়ে তাঁহার নিকট আমরা আরো অনেক উৎকৃষ্ট জিনিষের আশা করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়েই তিনি যে চলিয়া গেলেন, ইহা বাঙ্গলার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আধুনিক কালে বাঙ্গলায় অনেক কৃতী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির অকাল-মৃত্যু হইয়াছে। সে কালেও বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মধুসূদন, কৃষ্ণদাস পাল, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণেরও অপেক্ষাকৃত এইরূপ অল্প বয়সেই মৃত্যু হইয়াছিল। যে সময়ে তাঁহাদের জীবনের অর্জ্জিত বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশের ও সমাজের উপকার হইবে, ঠিক সেই সময়েই যে তাঁহাদের অভাব হইয়াছে, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, যে দেশে প্রতিভাশালী ও

উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের অভাব হয়, সেই দেশই ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে জানিতে হইবে। আমাদের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের অকাল-মৃত্যু যে আশাপ্রদ নয় তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। শিক্ষার কুব্যবস্থা, সামাজিক কুপ্রথা, মানসিক অশান্তি অথবা অন্য কি যে ইহার কারণ তাহা কে বলিবে? এই কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া আমাদের মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তাহার নিবারণের পথ নির্দ্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে। নহিলে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

চরিত-চিত্র

অশ্বিনীকুমার

(২)

কৈশোরে অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; এমন কি এক সময়, বুঝি বা তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন বলিয়া, অনেকের ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু সে সমাজের আধ্যাত্মিক এবং হেতুবাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও, তৎকালীন সে সামাজিক বিপ্লবে যোগদান করিবার মত তাঁহার সাহস ছিল না। তাই পিতৃ-আদেশে, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, নিতান্ত ভালমানুষটির মত, আপন সমাজের রীত্যনুযায়ী খাঁটি হিন্দু ধরণে বিবাহ করেন। আমি যতদূর জানি, অশ্বিনীকুমার সে অবধি এ পর্য্যন্ত সমাজের অননুমোদিত কোন কার্য্যই করেন নাই। আসল কথা, যে উপাদানে বিদ্রোহি-চরিত্র গঠিত হয়, তাঁহার চরিত্রে সে সকল উপাদান বর্ত্তমান নাই। তাঁহার শত্রুরা বলিয়া থাকে যে, সাধারণ প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; বন্ধুরা বলেন, বিবেকবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়াই তিনি সমাজের বিরুদ্ধে হাত তুলিতে চান না।

কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, এবং স্বকীয় চরিত্রগঠনের জন্য যে অনুশাসন তিনি এ পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন—তাহার পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার মীমাংসা হয়। ইংরাজী শিক্ষার ফলে, তাঁহার সমসাময়িক যুবকবৃন্দের ন্যায়, গত শতাব্দীর য়ুরোপীয় হেতুবাদের প্রভাব তাঁহার চিত্তে কতকটা প্রতিফলিত হইয়াছিল, এবং আপনাপন বিচার-বুদ্ধিকেই সদসদের পরিমাপক বলিয়া তিনি এক সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাটা আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমাদের আপনাপন বিচারবুদ্ধি বা বিবেক, সামাজিক বিচারবুদ্ধি এবং সামাজিক বিবেকসাপেক্ষ এবং তাহাদের প্রভাবধর্ম্মী। আমাদের চিন্তাগত বিশ্বাস এবং নৈতিক সংস্কার, আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার সূত্র এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের ফলপ্রসূত। ইহা আমরা স্পষ্ট

বুঝি বা না বুঝি, ইহাকে অস্বীকার করিবার যো নাই। বিভিন্ন জাতির দেহ-মন একই শারীরিক ও মানসিক নিয়মে গঠিত হইলেও, পরস্পরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক জাতির চিন্তা ও ভাব অপর জাতির চিন্তা ও ভাবের সহিত সম্পূর্ণ মিল খায় না। আমাদের যা বিশ্বাস অপর কোন জাতির ঠিক সে বিশ্বাস নয়, আমরা যা ভাবি তারা তা ভাবে না, আমাদের কাছে যেটা সত্য তাহাদের কাছে হয়ত সেটা মিথ্যার রূপান্তর মাত্র। এই জন্যই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্রের উদ্ভব, এবং এমন কি একই দেশে বিভিন্ন চিন্তাশীলের মধ্যেও মতবৈষম্য ঘটে। নৈতিক আচার-ব্যবহারেরও প্রভেদ দেখা যায়—এক সম্প্রদায়ে যাহা নীতি, অপর সম্প্রদায়ে তাহা দুর্নীতি। জগতে নৈতিক আদর্শের একত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অতএব ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের বিচার এবং বিবেক বিষয়ে যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা আমরা বলিয়া থাকি, সেটা বস্তুতঃ সমাজেরই প্রভাবধর্ম্মী; নৈতিক বিষয়েও তাই। ইহারই বলে, গত দুই শতাব্দীর ব্যক্তিগত হেতুবাদ (individualistic Rationalism) কতক খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে, এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক তত্ত্বজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধ হইতেছে। অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের এই দীনতাটুকু সহজেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে রাজা রামমোহন রায়ের পর হইতে ব্রাহ্মসমাজ যে ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, সেটা তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচার (philosophical anarchism) ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতেই একটা নিজের creed খাড়া করিয়া ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতাকেই বড় করিতে চাহিয়াছে,—কিন্তু সেটা যতটা গায়ের জোরে ততটা যুক্তিবাদের অনুসরণে নয়। সমাজ-সমষ্টির মত-সমবায় লইয়াই তাহার ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সমাজের অধিকাংশ লোক যেটা মানিয়া চলে সেইটাকেই সমাজ বড় বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। রস্কিন্ বলেন—"দশটা নির্ব্বোধ থেকে কখনও একটা জ্ঞানীর উদ্ভব হয় না।" কিন্তু ব্যক্তিগত হেতুবাদের এই creed যখন ধর্ম্মবিশেষে রূপান্তরিত হইয়া, বিধি অনুশাসন এবং নৈয়মিক ক্রিয়া-সংস্কারাদির সৃষ্টি করে, তখন তাহা হইতে ইহাই মাত্র প্রমাণিত হয় যে, দশজন মূর্খ—যেহেতু তাহারা দশজন, আট জন নয়—ন' জন বুদ্ধিমানের অপেক্ষাও বেশী বুদ্ধিমান্! অশ্বিনীকুমার সময়ে এটুকু বুঝিয়া ধর্ম্মের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিচারানুমোদিত আরও গভীর ভিত্তির অনুসন্ধিৎসু হইয়াছিলেন। হিন্দুর গুরুবাদে তিনি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন, গুরুর প্রতি তাঁহার অবিচলিত অনুরাগ এবং গুরুর নিকট হইতে তিনি যে গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা (inspiration) লাভ করিয়াছেন, তাহারই ফলে তাঁহার চরিত্রের যত কিছু আপাতঃ অসঙ্গতি।

জাগতিক অপর তত্ত্বজ্ঞানসমূহের কাছে হিন্দুর গুরুবাদ অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। ম্যাকসেল ও ম্যাককস্ প্রমুখ Intuitionist Schoolএর মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত খৃষ্টবাদ, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের ছায়া মাত্র। তাঁহাদের মতে, খৃষ্টের দুইটি বিভিন্ন মূর্ত্তি,-

এক ঐতিহাসিক খৃষ্ট, অপরটি জ্ঞানময় খৃষ্ট। প্রথমটি বিষয়াশ্রিত (objective), দ্বিতীয়টি অধিকরণনিষ্ঠ (subjective); দুই-ই এক পরমপিতার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। খৃষ্টীয়ান মতে,—জ্ঞানময় খৃষ্ট নিয়তই আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন, তাঁর প্রকাশ অখণ্ড অব্যাহত, তাঁহার পূর্ণতাও নাই, শেষও নাই; কিন্তু যিনি ঐতিহাসিক খৃষ্ট তিনি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জুডিয়া দেশে অনন্তকালের মত একবার মাত্র আবির্ভূত হইয়া, ক্যালভেরীতে (Calvery) ভগবানের কাছে সমগ্র মানবজাতির পাপের জন্য আপনাকে উৎসর্গিত করিয়াছিলেন। হিন্দু গুরুবাদের সহিত তাহার প্রভেদ এই শেষটুকু লইয়াই। খৃষ্টানের জ্ঞানময় গুরুই হিন্দুর চৈত্য-গুরু; কিন্তু যিনি objective বা মহান্ত-গুরু—মানবের দেহের মধ্য দিয়াই যাঁহার প্রকাশ—তাঁহার আবির্ভাব একযুগে একবার মাত্র নয়। হিন্দু বুঝে যে মানবের সহজ জ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং পরিপুষ্টির জন্য বাহ্যিক প্ররোচনার বিশেষ আবশ্যক; অথচ এই সহজজ্ঞান সকল মানবের পক্ষে সমান নহে, কাজেই তাহাদের বাহ্যিক প্ররোচনাও সকল ক্ষেত্রে সমান হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। একজনকে যে জিনিষ উদ্বোধিত করে, তাহা যে আর একজনকেও ঠিক সেই ভাবেই করিবে এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। অতএব, ঠিক দেখিতে গেলে, প্রত্যেক মানবের জন্য এক একটি ঐতিহাসিক খৃষ্টের আবশ্যক হইয়া পড়ে; অন্ততঃ প্রতি যুগে, প্রতি দেশে এবং সভ্যতানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে, একজন করিয়া ঐতিহাসিক অবতারের আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হয়,নহিলে তাহার কোন মূল্য থাকে না। হিন্দু ইহা বুঝিয়াই নানা অবতার-বাদ এবং গুরু-বাদ গ্রহণ করিয়াছে,—কিন্তু এই সকল বিভিন্ন বাদের মধ্যেও অখণ্ড অব্যয় একমাত্র মহাসত্ত্ব যে একজন আছেন, সে কথা সে ভুলে নাই। গুরু এবং শিষ্যের যে সম্বন্ধ তাহা একটা দৃঢ়বদ্ধ পারস্পরিক সম্বন্ধ। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্রই তাহার কাছে গুরু আপনাকে প্রকাশিত করেন। গুরু ভগবানের অভিব্যক্তিস্বরূপ, সুতরাং সেটা কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক না হইয়া, রক্তমাংসময় মানব-দেহ লইয়া তাহার প্রকাশ থাকা আবশ্যক; বিশেষতঃ যাহারা দেহবিযুক্ত আত্মার কথা কল্পনা করিতে পারে না, এবং বহুদিনব্যাপী শারীরিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশাসন দ্বারা আত্মা ও দেহের পারস্পরিক বিভিন্নতা যাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে এটা বিশেষরূপই প্রয়োজনীয়। এইখানেই খৃষ্টীয় অবতারবাদ অপেক্ষা ইহা পূর্ণতর এবং অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ—কারণ ইহার মধ্যে অবিরুদ্ধ বা অসদৃশ কোন ভাবই নাই। ইহারই উপর অশ্বিনীকুমার আপন ধর্ম্মজীবনের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গুরুর সহিত এক হইবার আকাঙ্ক্ষাই অশ্বিনীকুমারের জীবনের লক্ষ্য—ইহারই জন্য তাঁহার জীবনের যা কিছু সংগ্রাম, তাঁহার চরিত্রের যা কিছু দুর্ব্বলতা। স্বভাবতঃই তিনি ভাবপ্রবণ, ভাবের বশে কোন কার্য্যে হঠাৎ অগ্রসর হইয়া, পরক্ষণেই 'গুরু কি ভাবিবেন,' 'গুরু এ অবস্থায় কি করিতেন' ইত্যাদি ভাবিয়া দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া

ইতস্ততঃ করিতে থাকেন; ফলে, সময়ে সময়ে তিনি দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। শিষ্য যে গুরু নয় সে কথা তিনি ভুলিয়া যান; এবং তীব্র বিবেকানুভূতি লইয়া গুরুর কার্য্য এবং দায়িত্বের সহিত আপনার কার্য্যের পরিমাপ করিতে যান। হিন্দুর বেদপুরাণের শিক্ষা সে চরিত্রের মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত হইলেও, হিন্দুর সংস্কার জ্ঞান বুদ্ধি লইয়াও, এ সব ক্ষেত্রে তাঁহাকে উচ্চদরের হিন্দু শিষ্য অপেক্ষা বরং একজন যথার্থ খৃষ্টীয় ভক্ত বলিয়াই মনে হয়। খৃষ্টভক্তের কাছে, খৃষ্টের প্রায়শ্চিত্ত এবং আত্মাহুতি বাহিক ধর্ম্মবিশেষ এবং অনুষ্ঠান মাত্র নয়, তাহা আধ্যাত্মিক পরিজ্ঞানেরই স্ফুট বিকাশ; তিনি প্রভুর পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া পাপ বা পুণ্য কিছুরই ভাবনা ভাবেন না,—তাঁহার মনের মধ্যে দৃঢ় ধারণা থাকে যে তাঁহার জ্ঞানজ বা অজ্ঞানকৃত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ যীশুর রক্তে ক্ষালিত হইয়া গিয়াছে ও যাইবে। যথার্থ হিন্দু-শিষ্যও আপন গুরুকে সেই চক্ষে দেখে। তাহার আদর্শ বাক্যই হইতেছে—

> জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
> জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
> ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
> যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

অশ্বিনীকুমারকে বুঝিতে হইলে তাঁহার গুরুর চরিত্রও বুঝা আবশ্যক। স্বভাবের শিশুর ন্যায়ই সে চরিত্র—এই কোমল, পরক্ষণেই প্রচণ্ড; মুহূর্ত্তে হাস্যস্নিগ্ধ, মুহূর্ত্তেই আবার অশ্রুপ্লুত; মুহূর্ত্তে আশাদীপ্ত, পরমুহূর্ত্তে আবার নিরাশদিগ্ধ; এই সাধারণ নিন্দিত সর্ব্বাপেক্ষা দূষণীয় কার্য্যের সমাদর-রত, এই আবার সামান্য ক্রটীর প্রতি খড়্গহস্ত; এই কালাপাহাড়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, এই আবার প্রচলিত রীতি-নীতির বাধ্যতম সাধক এবং পরিপোষক। কিন্তু Universal যিনি তিনি অসংখ্য ভাবের সমষ্টিমাত্র, ভগবান্ পরস্পরবিরুদ্ধ অনন্ত ভাব-সংঘাতের লীলাভূমি। ভাগবত শক্তির লীলাক্ষেত্র মানববিশেষের চরিত্রে এ বিরোধ দোষের নহে, বরং স্বাভাবিক; এই সকল নানা বিরোধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সেই এক অনন্ত মহাপুরুষের সহিত তিনি আপনার সংযোগ স্থির রাখেন। নীতি-শাস্ত্রের মাপকাঠী দ্বারা এ সকল লোকের কার্য্যের বিচার করা চলে না; সাধারণ নীতির আইন বন্ধনে তাঁহারা বাঁধা পড়েন না, তাঁহারাই সে সব আইনের স্রষ্টিকর্ত্তা। সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সাধারণ কার্য্য-পরম্পরার বিচার করিয়া থাকি, কাজেই পদে পদে আমাদের ক্রটী পরিলক্ষিত হয়; তাঁহাদের যথার্থ স্বরূপ, বিশ্বকার্য্য-কারণ-পারম্পর্য্যের সহিত তাঁহাদের কোথায় এবং কিসে সামঞ্জস্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁহারা অনন্তের মধ্যে আপনাদের সান্তত্বকে ডুবাইয়া দিয়া, একটা universal stand-point হইতে সে সকল দেখেন এবং বিশ্ব জগতের সৃষ্টি-নিয়মের কোন্ উদ্দেশ্য তাহারা সাধন করিতেছে তাহা বুঝিয়া তাহাদের বিচার করেন। গুরুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, আমিত্বকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, যে ভাবে তিনি চালান সেই ভাবে চলিয়া, ভাবে চিন্তায় এবং জীবনের বাহিক ঘটনাচক্রের ফলস্বরূপ আমাদের দৈহিক

মানসিক প্রবৃত্তি বিষয়ে নিতান্ত সহজ ভাবে তাঁহাদের শক্তি এবং প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, আমরা চলিতে পারি। তাহা অনধিকার-চর্চ্চা নহে, সেই টুকুই শিষ্যত্বের বিশেষাধিকার। কিন্তু যতদিন না আমরা সম্পূর্ণরূপে সে চরিত্রের অনুযায়ী আপনাপন চরিত্র-গঠন করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত হুবহু তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদের মত সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ধৃষ্টতা। এবং সেই চেষ্টার ফলেই অশ্বিনীকুমারের চরিত্রের দুর্ব্বলতা।

বস্তুতঃ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র খৃষ্টীয় ও হিন্দু তত্ত্ববাদের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ। আমাদেরও সকলেরই কম বেশ তাই। তাঁহার নম্রতা, স্থৈর্য্য, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব, কর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্তের পরিবর্ত্তে শান্ত প্রাকৃত কার্য্যাবলীর প্রতি অনুরাগ, প্রচলিত রীতি-নীতির অসামঞ্জস্য দেখিয়াও তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব, ন্যায় অপেক্ষা কর্ত্তব্যের প্রতি অধিকতর আসক্তি, বিরোধ অপেক্ষা বশ্যতা-স্বীকারের ইচ্ছা, বিদ্রোহের পরিবর্ত্তে তিতিক্ষার ভাব,—এ সকলই হিন্দুর অন্তরতম ভাব; অশ্বিনীকুমারে ইহা অতি সুন্দর রূপেই ফুটিয়াছে। অপর পক্ষে,—তাঁহার সূক্ষ্ম নৈতিক জ্ঞান, সমাজ-সংস্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের ইচ্ছা—এ সকল পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চরিত্রগত ভাব; অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে এ সকলেরও পূর্ণ বিকাশ রহিয়াছে।

অশ্বিনীকুমার নূতন ভাবের ভাবুক (Original thinker) নহেন, কোন একটা পদ্ধতি (System) গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই; সেই জন্যই এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার চরিত্রের এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের একটা যুক্তিযুক্ত অন্বয় করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যের দিক্ দিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত প্রাচ্যকে দেখেন নাই, বা প্রাচ্যের দৃষ্টি দিয়া পাশ্চাত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের বিশিষ্ট প্রভাব তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যামন্দিরে, যুবক-বৃন্দের শিক্ষাগুরুরূপে সংযম এবং পবিত্রতার প্রচারকরূপে, শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্বাধিকাররক্ষিরূপে তাঁহার চরিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাবের নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। অপরপক্ষে, বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ বন্ধু কতিপয়ের কাছে, ভগবানের নামসংকীর্ত্তনে, ভাগবতাবৃত্তিতে, এবং ভক্তি-যোগ বা কর্ম্ম-যোগের ব্যাখ্যানে—তাঁর চরিত্রে প্রাচ্য ভাবটুকু ফুটিয়া উঠে। সে সব সময়ে বাস্তবিকই মনে হয় যে, আজীবন যে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার অন্তরে এ ভক্তির উচ্ছ্বাস, এ গোঁড়া হিন্দুত্বের ভাব কি সম্ভবপর?

এই খাঁটি হিন্দুত্বের ভাব লইয়াই আজ অশ্বিনীকুমার অনন্যসহজলভ্য আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবল মাত্র একজন শিক্ষাগুরু এবং আধুনিক জন-নায়ক হইলে তাঁহার প্রতিপত্তি ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত। যদিও সে হিসাবে তাঁর ভক্ত সংখ্যা কম নহে। পরন্তু, আমার বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গে—যশোহর হইতে সুদূর শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত—তাঁহার প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার বরিশালস্থ কলেজে,

তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, গিয়া থাকে। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের এবং শিক্ষার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। তত্রাচ, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, অশিক্ষিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার প্রভাবই তাঁহাকে এতটা বড় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার হিন্দুত্বের ভাবই তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণব প্রভাব অধিকতর প্রকাশমান। বৈষ্ণব আদর্শে এমন একটা মানবিকতার ভাব আছে যাহা সম্পূর্ণ আধুনিকতাময়। মানবে নারায়ণের প্রতিষ্ঠা দর্শন করাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র। অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাহার মত স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে মানবের ঈশ্বরত্বের কথা প্রচার করে নাই। মানবের দেহ এবং চিত্তবৃত্তিকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া, পিতা-পুত্র, প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধবী প্রভৃতির সম্বন্ধকে ভগবানের সৃষ্টি-পরম্পরার উদ্দেশ্যভূত লীলাবৈচিত্র্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া, বৈষ্ণব আদর্শ এবং অনুশীলনের বিশেষত্ব। মানবের এবং তাহার চিত্তবৃত্তির বিনাশে বা বিরোধে নহে, কিন্তু আত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে একটা চরম আধ্যাত্মিক আদর্শের ভাবে অনুপ্রাণিত করাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এই ভাব অশ্বিনীকুমারের সামাজিক আচার ব্যবহারে বিশেষরূপেই পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ অশ্বিনীকুমার হিন্দু সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধের পরিপোষক; কিন্তু কর্ত্তব্যের দায়ে তিনি সকল সংস্কারের গণ্ডী কাটাইয়া উঠেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও বক্তৃতা দেন নাই, কিন্তু সামাজিক কর্ত্তব্য এবং মানবের কল্যাণের জন্য অনেক স্থলেই তিনি জাতিভেদ প্রথার গ্রন্থি শিথিল করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে, কলেরা বা অন্য মহামারীর প্রকোপের সময়, তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, উচ্চনীচ জাতি-নির্ব্বিচারে, পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। হতভাগিনী পতিতারাও তাহাদের সে সেবা হইতে বঞ্চিত হয় না। এমন অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানেরা, বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া, স্বহস্তে নীচজাতীয় রোগীর বিছানাদি, মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত, পরিষ্কৃত করিতেছে; এমন কি সময়ে সময়ে, লোকাভাব ঘটিলে, অস্পৃশ্য চণ্ডালাদির মৃতদেহও আপন স্কন্ধে বহিয়া সৎকার করিয়া আসিয়াছে। দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরের সময়, হিন্দু ও মুসলমান দুঃস্থ ব্যক্তিগণ তুল্যভাবে অশ্বিনীকুমারের সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে। বহুবৎসরের নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের কাছে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহচর বা কমিশনের বিশ্বস্ত বন্ধু নহেন; তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্দ্দিনের সহায়, এবং দুঃখে কষ্টে একান্ত সহানুভাবক প্রিয়জন বলিয়াই জানে। অগাধ অর্থ নহে, বাগ্মিত্বের অপূর্ব্ব স্ফুরণ নহে, জ্ঞানের চরম বিকাশও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায় ভাবে ও কার্য্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। একমাত্র অশ্বিনীকুমারে আমরা এদেশে অধুনা তাহার কতকটা আভাস পাই। তত্রাচ, এ

ভাব এ দেশে নূতন নহে, ইহা বহু পুরাতন; হইয়া নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে—এই দেশকাল-পাত্রোচিতভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত মাত্র! *

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী বন্ধু বিলাতের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে রবীন্দ্র নাথকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এ'পারের পাখী ও'পারে যাইয়া কি গান গাহিবে? এই ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে যাইতে রাজী হন নাই। এ'পারের পাখীর কলকণ্ঠও যে ও'পারের বনস্থলীকে কাঁপাইয়া, নাচাইয়া তুলিতে পারে,—এখন রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এটী ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। এ'পার ও'পার কেবল আমরাই মায়ার প্রভাবে নিজেদের মনের মাঝে গড়িয়া তুলি। বিশেষতঃ যে কেবলই ভাগ বাটোয়ারা করিতে বসে, সে সত্য কবি হয় না। কবি এ'পার ও'পার জানেন না; অপারের সুরই সাধিয়া থাকেন। কবি-প্রতিভা সান্তকে ধরিয়া পড়িয়া থাকে না, অনন্তেতেই প্রতিক্ষণে যাইয়া উঠে। তিনি যে ভাষাতেই আপনার মানসপট অঙ্কিত রঞ্জিত করুন না কেন, ভাব তাঁর সকল ভাষার বাঁধন ছাড়াইয়া যায়। দুনিয়ার ভাষা অনেক, কিন্তু রস এক। ধরণ অনেক কিন্তু ধারণ এক। একটা স্থান আছে, যেখানে সকল মানুষ এক হইয়া যায়। শীতোষ্ণাদি বোধ যেমন সকলেরই হয়, রোগ-শোক পরিতাপাদি যেমন সকলেই ভোগে, হাস্যোদ্ভূত করুণ রুদ্র শৃঙ্গারাদি রসও সেইরূপ সকলেই আস্বাদন ও সম্ভোগ করিয়া থাকে। আর এই রস-জগৎই কবির সত্য জগৎ। এই জগতের বরণ কিরণ গন্ধ লইয়াই কবি আপনার অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি সকল রচনা করেন। এ রসের রাজ্যে দেব মানবে ভেদ নাই; এখানে আবার এ'পার ও'পার কি? রবীন্দ্রনাথ এ'পারকে যেমন মাতাইতে ছিলেন, ও'পারকেও তেমনি মাতাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হই নাই; তবে যখন ডাকিয়াছিলাম তখন যে যান নাই, এখন দেখিতেছি তাহা ভালই হইয়াছিল।

সত্য বলিতে কি, গেলবছর যখন রবীন্দ্রনাথ বিলাতে যাইবার সংকল্প করেন, তখন সে কথাটা ভাল লাগে নাই, তাঁর নিজের

---

* গত বৈশাখের বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অশ্বিনী বাবুর যে চরিত্র-চিত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অশ্বিনী বাবুর ধর্ম্মজীবনের দিক দিয়া কোন কথা বলেন নাই। পরে তাঁহার ইংরাজি মাসিক পত্র হিন্দু রিভিউয়ে সে চিত্র দিয়াছেন। অশ্বিনী বাবুর চরিত্র চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্ত বঙ্গদর্শনে সে চিত্র বাঙ্গলায় প্রকাশ করা হইল। বঃ সঃ।

ধর্ম্মজীবন ও অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে এ বিলাত-যাত্রা যে বড় ভাল হইয়াছে, এখনও এমনটা বুঝিতে পারি নাই ও পারিতেছি না। তবে, আমরা যে ভাল মন্দের কথা বলি, ভাবিয়া দেখিতে গেলে, তাহা অনেক সময় অতি বাহিরের কথা। আমরা কার ভিতরকার খবর কি রাখি, কার অন্তঃপ্রকৃতির অবস্থা কিই বা জানি কার জন্য কখন কি ভাল আর কি মন্দ, তার কিই বা বুঝি। আমরা নিজেদের ছোট্ট দাঁড়িপাল্লা লইয়া বিশাল বিশ্বটাকে ওজন করিতে যাই ; বিঘত প্রমাণ সোজা ফুটরুলের টুকরা লইয়া সকলের জটিল জীবনের ভালমন্দের কালি কষিতে চাই। কাজেই আমাদের ভাল মন্দের অনেক সময়েই কোনও সত্য অর্থ থাকে না। দুনিয়ার মালিক তো আমরা নই। যিনি মালিক তিনিই আমাদের সমুদায় বিচার আব্দার, কলহ কোলাহলকে উপেক্ষা করিয়া তাঁর দুনিয়াকে আপনার নিয়তি-পথে নিত্য চালাইতেছেন। কিন্তু সে পথের আলোক চক্ষে পড়ে নাই বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের এই বিলাত-যাত্রাটা প্রথমে ভাল লাগে নাই।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অতি আদরের বস্তু। দেশের লোকে তাঁর নিকটে বিস্তর আশা করে। দেশের অশেষ কাজও পড়িয়া আছে। স্বদেশীর প্রথম কর্ম্মচেষ্টা নির্ম্মম রাষ্ট্রনীতির অনভ্যস্ত পথে যাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে সে পথ ছাড়িয়া সংযত সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত হইতেছিল। বাংলা সাহিত্যে যে রবীন্দ্রনাথের অনন্ত সাধারণ শক্তি ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না, অস্বীকার করিতেও কেহ চাহে না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে, রবীন্দ্রনাথই সে সাহিত্য-সাম্রাজ্যকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন বাংলা সাহিত্যের একজন যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যরথী বলিয়া ধরা যায়, রবীন্দ্রনাথকেও অনেকটা সেইরূপই ধরিতে হয়। রবীন্দ্রনাথও বাংলা কাব্যে ও গদ্যে এক নূতন ভাব, এক নূতন আদর্শ, এক নূতন এবারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যুগ-প্রবর্ত্তক সাহিত্যিককে এমন সময় আপনার চিরাভ্যস্ত কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখিয়া আমরা অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। তাঁর অভাবে আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনগুলি কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথের এ বিলাত-যাত্রা নিষ্ফল হয় নাই। এ'ও বিধাতারই এক অদ্ভুত চাল। তিনিই এ'পারের পক্ষীকে ও'পারে লইয়া গিয়াছেন। সকলে হয়ত ইহাতে ভগবানের হাত এখনও দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু বিলাত যাইয়াও রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশেরই সেবা করিতেছেন, তাঁর এই সদ্যোলব্ধ যশের দ্বারা, বিদেশীর সমাজে তাঁর এই নূতন প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা, যে আমাদের মুখই উজ্জ্বল করিতেছেন, আমাদের গৌরবই বাড়াইতেছেন, আমাদের দেশাত্মাভিমানকে ও স্বজাতি-চেতনাকে জাগাইয়া তুলিতেছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় কি? এই দিক্ দিয়া স্বদেশের এমন সেবা এ পর্য্যন্ত আর কোনও বাঙ্গালী বা ভারতবাসী করেন নাই ও করিতে পারেন নাই।

রাজা রামমোহনের কাল অনেক দূরে

পড়িয়া গিয়াছে। তখনকার সময়ের বিলাতের কথাও প্রত্যক্ষ ভাবে জানি না, ভারতের কথাও চাক্ষুষভাবে জানি না। তিনি মোটের উপরে ইংরেজের নিকটে হিন্দুর প্রতিভা ও হিন্দুর শাস্ত্র ও সাধনার অনেকটা গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন, সত্য। কিন্তু এমন সময় আইসে নাই, রাজার উদার শিক্ষা গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকার ইংরাজ তখনও লাভ করে নাই। রাজার যুক্তির দিক্‌টাই তারা ধরিতে পারিয়াছিল। তাঁর প্রতিবাদের বা protest এরই কথঞ্চিৎ মর্ম্ম গ্রহণে তারা সমর্থ ছিল। কিন্তু তাঁর সম্যক্ দর্শন, তাঁর সামঞ্জস্য বা Synthesis এর বিশ্বজনীন ঔদার্য্য তারা ধারণ করিতে পারে নাই। তাই কেহ বা রাজাকে যুক্তিবাদী, কেহবা একেশ্বরবাদী বা ইউনিটারিয়ান্, আর কেহ বা একরূপ খৃষ্টীয়ান্ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। রাজার সাধনার হিন্দু দিক্‌টা তারা আদৌ ধারণা করিতে পারে নাই। রাজার চরিত্রে তাঁর বিদ্যায়, তাঁর বুদ্ধিমত্তায়, তাঁর প্রতিই তারা অতিশয় শ্রদ্ধাশীল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাঁর স্বজাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয় নাই।

রাজার পরে কেশবচন্দ্র বিলাত যাইয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচারে বাঙালীর সাধনার বা ভারতের ধর্ম্মের প্রভাব বিলাতে বিস্তৃত হয় নাই। কেশবচন্দ্র সেখানে একরূপ খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদই প্রচার করেন। অন্যদিকে স্বদেশের, সমাজের ও ধর্ম্মের অনেক দোষের কথা বলিয়া স্বজাতিকে ইংরেজের চক্ষে যে একটু আধটু হেয় করেন নাই, এমনও বলা যায় না। কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে নিজেই বড় হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন, সেখানে স্বদেশ ও স্বজাতিকে বাড়াইয়া দিয়া আসিতে পারেন নাই। তাঁর পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-প্রচারকেরাও তাহাই করেন। এখনও অনেকে তাহাই করিতেছেন। ইংরেজের নিকট নিজেদের দেশের ভ্রম কুসংস্কারের অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া, কার যে কি উপকার হয়, দেশের লোকে ইহা বোঝে না। অথচ অনেক ব্রাহ্ম সমাজের বক্তাই বিলাতে ও আমেরিকায় যাইয়া সর্ব্বদাই নিজেদের নিন্দা কুৎসা প্রচার করিয়া আইসেন।

কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের পরে বিবেকানন্দ বিলাত ও আমেরিকায় যাইয়া, একটা নূতন সুর জাগাইয়া তোলেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশ্য ভাবে পশ্চিমের প্রাধান্য অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া, ভারতের সাধনাকে সভ্য জগতের আচার্য্যের আসনে বরণ করিয়া থাকেন। তাঁর পূর্ব্বে আমরা শিষ্য হইয়াই বিদেশে যাইতাম, তিনিই প্রথমে শিক্ষক হইয়া বিদেশীয়দিগের মাঝখানে দণ্ডায়মান হন। এতটা বুকের পাটা আর কারও হয় নাই। বিবেকানন্দ কত বড় কাজটা যে করিয়া গিয়াছেন, দেশের লোকে এখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই। এ জাতটা যদি কখনও আবার মাথা তুলিয়া জগতের মাঝখানে যাইয়া দাঁড়াইতে পারে, তবে তিন জন বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সাধনা বলেই তার এই মহোচ্চপদলাভ হইবে। প্রথম—রাজা রামমোহন; দ্বিতীয়—বঙ্কিমচন্দ্র, আর তৃতীয়—বিবেকানন্দ। এই তিন মহাস্তম্ভের উপরে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার আশা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ এই তিন জনার প্রভাব স্বদেশের উপরেই বেশী পড়িয়াছে। বিবেকানন্দ বিলাতে ও আমেরিকায় বেদান্ত ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন বটে, এখনও তাঁর লোকেরা মার্কিণে মঠ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু এ সত্বেও সেখানে অতি অল্প লোকেই তাঁর শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে বা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। বিবেকানন্দ সেখানে স্বদেশের একটা শ্রেষ্ঠ মত ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন ; ধর্ম্মের ও কর্ম্মের একটা অভিনব পন্থা প্রচার করিয়াছেন। এ পথে বিরোধ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথাই বাধিয়া উঠে। আর এই বিরোধের মধ্যে যিনিই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে যান না কেন, কিছুতেই তিনি সকলের বা অধিকাংশ লোকের চিত্তকে অধিকার করিতে পারেন না। সুতরাং বিলাত ও আমেরিকার শিক্ষিত সমাজও অকৈতবে বিবেকানন্দের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই। আর এই জন্যই বিবেকানন্দের তেজে, সাহসে, স্পর্দ্ধাতে, আমাদের আত্মচৈতন্যকে ও স্বদেশাভিমানকেই জাগাইয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু বিদেশীয় সমাজে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, এমন কি সমকক্ষতা পর্য্যন্তও প্রতিপন্ন বা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই।

এই কাজটী রবীন্দ্রনাথ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও বাঙালী বা ভারতবাসী ইহা করিতে পারিতেন না।

একদিন ছিল যখন আমরা সভ্যতাভিমানী বিদেশীয়দিগের নিন্দাস্তুতিতে নিতান্ত বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত হইয়া পড়িতাম। সে দিন আর নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই সে অবস্থা অনেকটা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা আমাদের স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশাভিমান বাড়াইয়া দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। যাঁরা দেশের শিক্ষিত সমাজকে ক্রমে ক্রমে আত্মস্থ করিয়া তুলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অগ্রণী দলভুক্ত। আর তিনি এ কাজটা করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আজ বিদেশীয়দের নিকটে তিনি এতটা পরিমাণে সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন দেখিয়া তাঁর স্বদেশবাসিগণ উল্লাসে একেবারে আত্মহারা হইয়া যায় নাই। অনেকেই কতকটা ঔদাসীন্য সহকারে তাঁর বিলাতী কীর্ত্তি-কাহিনী শ্রবণ বা পাঠ করিয়া থাকে। বিদেশীয়দের প্রশংসাপত্রের যে মূল্য ত্রিশ, বিশ এমন কি দশ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল, স্বদেশীয় কল্যাণে আজ আর তাহা নাই। এই ভাবে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান কর্ম্মচেষ্টার ওজন ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইবেন, তাঁরা তার ঠিক মাপ ও দাম কষিতে পারিবেন না। কথাটা এখানে প্রশংসার নয়, প্রভাবের। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের, শিক্ষার, সাধনার, প্রতিভার প্রশংসা কে কতটা করিতেছে বা না করিতেছে, ইহা অতি হেয় কথা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে যা ছিলেন, তাহাই আছেন, বিলাতী সার্টিফিকেটে তাঁর প্রতিভার বা কাব্যের, শিক্ষার বা কার্য্যের মূল্য ও মর্য্যাদা এক রতিও বাড়িবে না। আর তাঁর "গীতাঞ্জলি" যদি ইংরেজের নিকটে হেয়ও হইত, তথাপি আমাদের চক্ষে রবীন্দ্র-প্রতিভার গৌরবের এক কণাও কম হইত না। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের স্তুতিতে বড়ও হইবেন না ; ইংরেজের নিন্দাবাদে ছোটও হইবেন না। ইংরেজ যদি আজ তাঁর এমন প্রশংসা

না করিয়া নিন্দাই করিত—তাহা হইলেও আমরা হাসিতাম। কথাটাই তাহা নয়। কিন্তু তারা রবীন্দ্রনাথকে যে বুঝিতে পারিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির রস আস্বাদন যে করিতে পারিয়াছে ইহাই আসল কথা, এই কথাটাই আমাদের নিকটে সব চাইতে বড় কথা।

ইংরেজের রসনায় যখন এ রস মিষ্টি লাগিয়াছে, তখন রসটা অবশ্যই অতি উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইল বলিয়া যে এই কথাটাকে এত বড় ভাবি তাহাও নহে। এতদিনে আমরা দুনিয়ার মাঝখানে একটা কেউ কেটা হইলাম ভাবিয়া যে আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িতেছি, তাহাও নহে। এতদিনে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের একটা রসের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিল, এই জন্যই এই কথাটাকে এতটা বড় ভাবিতেছি। এতাবৎকাল ইংরেজ তাদের নিজের যা কিছু ভাল তাহা আমাদের দিবার জন্যই ব্যস্ত ছিল। এরূপ দানে কোথাও কল্যাণ হয় না। ইহার ফলে কেবলই উত্তরোত্তর দাতার অভিমান ও অহমিকা এবং গ্রহীতার অপমান ও অসন্তোষই বাড়িয়া যায়। এরূপ দানে মানুষকে মানুষের কাছে লয় না, বরং আরো দূরেই ঠেলিয়া ফেলে। মানুষে মানুষে সত্য সম্বন্ধ গড়ে কেবল দানে নয়, কিন্তু যথাযথ আদানপ্রদানে। এতাবৎকাল ইংরেজের সঙ্গে আমাদের প্রাণের বস্তুর আদানপ্রদান হয় নাই। ইংরেজ এত দিন আমাদিগকে তার সভ্যতা, তার শিক্ষা, তার বিদ্যা, তার ধর্ম্ম—এ সকলই দিতে চাহিয়াছে, কখনও প্রাণ খুলিয়া, সত্যভাবে, আগ্রহ করিয়া, লোলুপ হইয়া, আমাদের ধান চাল ও ধন রত্ন ভিন্ন আর কোনও কিছু আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে চায় নাই। আমাদের চিন্তা বা ভাব, চরিত্র বা সিদ্ধান্ত,—আন্তরিক কোনও বস্তুর প্রতি তার কখনও লোভ জন্মায় নাই। আর এই লোভ যেখানে নাই, প্রাণের টানও সেখানে হয় না, সত্যিকার হৃদয়ের গ্রন্থি সেখানে বাঁধে না, মানুষে মানুষে সত্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা সেখানে হয় না। অথচ যতদিন না এই মানুষী সম্বন্ধটা গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ততদিন কিছুতেই ইংরেজের ভারতবর্ষে আসা সার্থক হইবে না। ততদিন আধুনিক ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মূল লক্ষ্যটী সাধিত হইবে না। রবীন্দ্রনাথই বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজের প্রাণে আমাদের সভ্যতার ও সাধনার, ভাষার ও সাহিত্যের রস আস্বাদনের লোভটা জাগাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান প্রবাস-যজ্ঞের ইহাই সকলের চাইতে বড় কথা ও বড় ফল। আর রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মনের বর্ত্তমান অবস্থাতে, ইহাই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। কেবল তিনিই এ কর্ম্মের অধিকারী। আর কেউ নাই যিনি এ কাজটা করিতে পারিতেন বা করিতে পারেন।

কিছুকাল হইতে তাঁর আপনার দেশে ও আপনার সমাজে যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে কমিয়া যাইতেছিল, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব এবং অস্বীকার করা অনাবশ্যক। আমরা সকলেই এইজন্য মনে মনে ক্লেশ পাইতেছিলাম। কিছুকাল হইতে তিনি স্বদেশের প্রাণ-স্রোত হইতে যেন কতকটা সরিয়া পড়িতেছেন, এমনই মনে হইতেছিল। ইহাতে তাঁর নিজের অকল্যাণ ও দেশের

গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কায় আমরা উদ্বিগ্ন হইয়াই উঠিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতাপুরুষ এমন অপূর্ব্ব চতুরতা সহকারে যে রবীন্দ্রনাথকে আর এক কাজের জন্য অল্পে অল্পে প্রস্তুত করিতেছিলেন, ইহা বুঝিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন রচনাদি পড়িয়া সময়ে সময়ে এমনও মনে হইয়াছে যে বুঝিবা তাঁর অন্তরের উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাঁর জীবনের কাজ ফুরাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এসকলের ভিতরে বিধাতাপুরুষ যে গোপনে গোপনে এ'পারের পাখীকে ও'পারের সুর সাধাইতেছিলেন, ইহা বুঝি নাই ও ধরিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি তাহাই সত্য কথা।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে যাইয়া আজ যে কাজটা করিতেছেন, তারই জন্য তাঁহাকে স্বল্পবিস্তর পরিমাণে স্বদেশের সেই চিন্তাস্রোত ও প্রবলতার স্রোত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়া প্রয়োজন ছিল। এক সময়ে তিনি এই স্রোতের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমাদের প্রাণের উপরে সে সময়েই রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন স্বদেশের ও স্বজাতির প্রাণের সঙ্গে ও তাহাদের সনাতন সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার যে ঘনিষ্ট যোগ ছিল, আজ আর তাহা নাই। তখন রবীন্দ্রনাথ বাংলার শিক্ষিত সমাজের চিন্তানায়ক ছিলেন। কিন্তু ক্রমে দেশের চিন্তার গতি তাঁহার চিন্তা-স্রোতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে। ইহাতেই তাঁর সঙ্গে দেশের অনেকের ক্রমে একটা মত-ভেদ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। তাঁর বিলাতযাত্রার কিছু পূর্ব্বে এই ভাবটা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। ইহাতে কেহ কেহ বিস্মিত, কেহ কেহ দুঃখিত ও ব্যথিত হইতেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি কিয়ৎ পরিমাণে ইহা হইতে ফিরিয়া না দাঁড়াইতেন, তবে আজ বিলাতে যাইয়া তিনি যে কাজটী করিতেছেন কিছুতেই তাহা পারিতেন না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(উপন্যাস)

(২)

সদর রাস্তার উপরেই জেলখানা। জীন নিরুপায় হইয়া বাহিরের ঘণ্টার দড়িটা ধরিয়া টান দিল—আশা, যদি সেখানে কোন আশ্রয় মেলে!

সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট দ্বার খুলিয়া গেল। —"কে তুমি? কি চাও?"

"মশাই গো আজ রাত্রের মত এর মধ্যে আমাকে আশ্রয় দিতে পারেন?"

ভিতর হইতে উত্তর হইল—"এটা জেলখানা, সরাইখানা নয়। পুলিশের হাতে বন্দী হও, তখন অবশ্য তোমায় ঠাঁই দিব"—সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে জীন এক অপ্রশস্ত রাস্তায় আসিয়া পড়িল।—উভয় পার্শ্বেই পথের শোভাসম্বর্দ্ধনকারী উদ্যানসমূহ; কেবল মাত্র লতাপাতার বেড়া রাস্তা হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

এমনি এক উদ্যানে এক শ্বেত-অট্টালিকার অভ্যন্তরে একটি কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। জীন সেই দিকে ফিরিল। স্বচ্ছ সার্সির ভিতর দিয়া কক্ষের মধ্যস্থ সব জিনিষই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল—সুপ্রশস্ত চূণকামকরা কক্ষ,—আসবাবের মধ্যে ছিটের মশারিযুক্ত বিছানা, একপাশে একটা দোল্না, খানকতক চেয়ার এবং দেওয়ালে ঠেসানো একটা দোনলা বন্দুক; মাঝখানে মোটা পরিষ্কার একখান চাদরে ঢাকা তৈরী খাবার; একটা পিতলের আলোকদানে আলো জ্বলিতেছে—টেবিলের উপরে মদ্যপরিপূর্ণ টিনের পাত্রটা সে আলোতে ঝক্মক্ করিতেছে, পার্শ্বেই অপর একটা পাত্রে গরম ঝোল হইতে ভাপ উঠিতেছে।

টেবিলের কাছে আনুমানিক চল্লিশবর্ষ বয়স্ক সরলাকৃতি একটি লোক কোলের উপর শিশুপুত্রকে নাচাইতেছিল, তাহার পার্শ্বে বসিয়া একটি যুবতী অপর এক শিশুকে স্তন্যদান করিতেছিলেন। ছেলেরা হাসিতেছিল, পিতাও হাসিতেছিলেন, জননীও মৃদুহাস্যে সে আনন্দে যোগদান করিতেছিলেন। জীন কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধ হইয়া এই মধুর বাৎসল্য অভিনয় দেখিতে লাগিল। তাহার মনে কি ভাব উঠিতেছিল কি করিয়া বলিব? বুঝি বা সে ভাবিতেছিল,—এই আনন্দপূর্ণ গৃহে হয়ত অতিথির আশ্রয় মিলিতে পারে; যেখানে এত আনন্দ, সেখানে হয়ত একটু করুণার অভাব হইবে না!

উৎকণ্ঠা-পীড়িত জীন সার্সিতে মৃদু আঘাত করিল—কেহ শুনিতে পাইল না। দ্বিতীয়বার আঘাত পড়িল।—

"দেখত বাইরে কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে না?"

"কই না।"

সাহসে নির্ভর করিয়া জীন তৃতীয়বার আঘাত করিল। সে শব্দ স্পষ্ট ভিতরে শ্রুত হইল—গৃহস্বামী টেবিলের উপর হইতে বাতিদানটা লইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।—এইখানে গৃহস্বামীর একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অর্দ্ধ মজুর—অর্দ্ধ কৃষকের মত তার চেহারা, তখন সে সবে কাজ হইতে ফিরিতেছে তাই তখনও সম্মুখভাগে একটা প্রকাণ্ড চামড়ার আস্তরণ তার কাঁধ পর্য্যন্ত আঁটা—তাহাতে একটা হাতুড়ি, একখানা লাল রুমাল, একটা বারুদের টিন—তা ছাড়া কোমরবন্ধে আরও কত কি জিনিষ ছিল। ডবল ভাঁজকরা কলারের মধ্য দিয়া তার খোলা এবং ধবধবে গলা দেখা যাইতেছিল। মোটা ভ্রূযুগ, কৃষ্ণবর্ণ প্রচুর গুম্ফ, অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষুর্দ্বয় এবং উচ্চ চোয়াল তাহার আকৃতির বিশেষত্ব;—আপাতঃ দৃষ্টিতে লোকটিকে ধীর এবং অচঞ্চল বলিয়া বোধ হয়।

তাহাকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া জীন একটু থতমত খাইয়া বলিল—"মাপ করবেন মশায়। অর্থের বিনিময়ে কি আপনি আমাকে এক ডিস্ ঝোল, আর আপনার বাইরের ঘরের এক কোণে আজকার রাত্রিটার মত একটু স্থান দিতে পারেন?"

"কে তুমি?"

"আমি বিদেশী পথিক। পঁয়তিয়ার্স থেকে সমস্তটা পথ আজ হেঁটে এসেছি। আমার টাকা আছে—যা বল্‌লাম, দিতে পারেন ?"

"কোন ভদ্রলোককে অর্থের বিনিময়ে আশ্রয় দিতে আমি অনিচ্ছুক নই।—কিন্তু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সরাইখানায় গেলে না কেন ?"

"সেখানে জায়গা নেই।"

"জায়গা নেই! এ হতেই পারে না। বিশেষতঃ আজ হাটবার কি মেলার দিনও নয়—যে তেমন ভীড় হবে। তুমি ল্যাবারদের ওখানে গিয়েছিলে ত ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"তারা কি বল্লে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া জীন বলিল—"কেন জানি না, তারা আমাকে সেখানে থাকতে দিলে না।"

"ভাল, সকেট রাস্তায় কি—নাম ভাল, তাদের ওখানে গিয়েছিলে ?"

জীন এ প্রশ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিল, ঢোক গিলিয়া বলিল—"তারাও জায়গা দিলে না।"

কৃষকের মুখে হঠাৎ সন্দেহের ছায়াপাত হইল,—সে জীনের আপাদমস্তক বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"তুমিই কি সেই লোক ?"—জীনের আগমনবার্ত্তা শাখা-পল্লবিত হইয়া ইতিমধ্যেই সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

স্বামীর সে শেষ প্রশ্ন শুনিয়া, যুবতী তাড়াতাড়ি শিশু পুত্র দুটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, স্বামীর পিছনে যাইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।—পার্শ্বস্থ দেওয়াল হইতে চকিতের মধ্যে বন্দুকটি উঠাইয়া লইয়া, আর এক বার জীনের প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কৃষক হাঁকিল—"বেরোও—"

"দয়া করুন,—শুধু এক গ্লাস জল—

"ছিটে ভরা একটা গুলি"!—বলিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া কৃষক তাহাতে ডবল খিল লাগাইয়া দিল। মুহূর্ত্তপরেই জানালার ঝিলমিলিগুলাও বন্ধ হইয়া গেল,—বাহির হইতে লৌহ-অর্গল বন্ধ করার সে শব্দ জীনের কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় যাইয়া পশিল।

রাত্রি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল—আল্‌স্ পর্ব্বতের হিমবায়ু শরীর কাঁপাইয়া দিতেছিল। বাগানের একপাশে একটা মৃৎকুটীর দেখিতে পাইয়া জীন অবশেষে সেই দিকে অগ্রসর হইল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তখন তাহার শরীর অবসন্ন, রাত্রিটা উপবাসে কাটাইতে হইলেও, বাহিরের দারুণ হিমের হস্ত হইতে এখানে সে তবু কতকটা পরিত্রাণ পাইতে পারে! রাস্তা মেরামতের সময় রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে যেমন ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর তৈরী হয়—এটাও অনেকটা সেই ধরণের, প্রবেশ-পথ অতি সঙ্কীর্ণ। হামাগুড়ি দিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল—ভিতরটা বেশ গরম, খড়ও যথেষ্ট ছিল।—এত কষ্টের পর আপাতঃ আরামের সম্ভাবনায় ভিতরে প্রবেশ করিয়া জীন হাত পা ছড়াইয়া দিল, তার পর পিঠের থলিটাকে উপাধান করিয়া শুইবার মতলবে ব্যাগটাকে খুলিতে আরম্ভ করিল। সহসা বহির্দ্দেশে একটা গুরু গম্ভীর শব্দ হইল। সর্ব্বনাশ! বাহিরে যে ভীষণ দর্শন একটা কুকুর! লোকটা কি তবে না

জানিয়া কুকুরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে! তাড়াতাড়ি ছড়িটা তুলিয়া লইয়া, আত্মরক্ষার্থ থলিটাকে ঢালের মতন করিয়া, চকিতে সেস্থান হইতে সে সরিয়া পড়িল।—তাড়াতাড়িতে তার ছেঁড়া পোষাকটা আরও খানিক ছিঁড়িয়া গেল। পিছু হটিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কুকুরটাকে দূরে দূরে রাখিয়া, অবশেষে, অতি কষ্টে বেড়া পার হইয়া পুনরায় সে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। সঙ্গি-হীন—গৃহ-হীন—আশ্রয়-বিহীন, তৃণ-শয্যা হইতেও বিতাড়িত হতভাগ্য জীন পাথপার্শ্বে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায়, আমি একটা কুকুরের সমানও নই! একটা কুকুরের যে আশ্রয় আছে, তাও আমার নাই!"

আবার সে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এবার সহর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে যাইয়া পড়িল—আশা, যদি কোন বৃক্ষতলে বা মাঠের মধ্যে কলকারখানায় কোন আশ্রয় মেলে!

অবনত মস্তকে কতক্ষণ সে এইভাবে চলিল। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হইলে সে একবার মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল।—চতুর্দ্দিকে জনশূন্য প্রান্তর; সম্মুখে হ্রস্বকেশ-শিরোদেশের ন্যায় ক্ষুদ্র লতাগুল্মাদি মণ্ডিত এক পর্ব্বতখণ্ড; তাহার গাত্র এবং সমস্ত আকাশ মণ্ডল ছাইয়া মেঘের জমাট বাঁধিতেছিল; রজনীর অন্ধকার ক্রমশঃ দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিতেছিল।—তবু তখনো গোধূলির আলো সম্পূর্ণ মিলায় নাই, চন্দ্রও সবে উঠিতেছিল, ঊর্দ্ধে গগনগাত্রে জ্যোৎস্নাবিমণ্ডিত দু'একটি মেঘখণ্ড হইতে পৃথিবীর উপর একটা অস্পষ্ট আলোক প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িতেছিল। অন্ধকার দিক্‌চক্রবালে অসম পর্ব্বতখণ্ড একটা ক্ষীণ ছায়া রেখা টানিয়া দিতেছিল। সমস্ত প্রান্তরের মধ্যে কয়েক পদ মাত্র ব্যবধানে একটী মাত্র স্কন্ধহীন বৃক্ষকাণ্ড দাঁড়াইয়াছিল।

হৃদয় ও মনের যে সূক্ষ্মতম অনুভবশক্তি থাকিলে, মানুষ প্রকৃতির গূঢ় রহস্যটুকুর সন্ধান পাইতে পারে—জীনের তার কিছুই ছিল না; তত্রাচ সেই আকাশ, সেই পর্ব্বতখণ্ড, সেই প্রান্তর এবং পল্লবশূন্য নগ্ন বৃক্ষকাণ্ডে এমন একটা নিঃসঙ্গ এবং নিঃসহায় ভাব জাগিতেছিল যে, নিশ্চল ভাবে কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সহসা চকিত হইয়া সে বড় রাস্তার দিকে ফিরিল। সময়ে সময়ে প্রকৃতিকে শক্রর ন্যায়ই ভীষণ বলিয়া মনে হয়।

ডি—সহরটি বহু পুরাতন, পূর্ব্বে প্রাকার-বেষ্টনী প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত হইলেও, ধর্ম্মবিপ্লবের পর হইতে তাহা অনেকটা জখম হইয়া গিয়াছিল। সেই ভগ্ন প্রাচীরের একাংশ দিয়া জীন সহরে পুনঃ প্রবেশ করিল।

তখন রাত্রি প্রায় ৮টা, পথঘাট তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত; অনুদ্দেশ ভাবে, সংশোধনাগার স্কুল প্রভৃতির পার্শ্ব দিয়া চলিতে চলিতে বড় গির্জ্জার সম্মুখে আসিয়া সে পড়িল, গির্জ্জার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া ভ্রুকুটি করিল।

গির্জ্জার বেষ্টনী-পথের একাংশে একটা ছাপাখানা ছিল—এই খানেই এল্‌বাদ্বীপ হইতে আনীত ও স্বয়ং সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জবানী হইতে লিখিত, সৈনিক সমূহের

প্রতি সম্রাট্ ও ইম্পিরিয়েল গার্ডের ঘোষণা-বলী প্রথম মুদ্রিত হয়। শ্রান্ত ক্লান্ত জীন সেই ছাপাখানার সম্মুখে একটা পাথরের বেঞ্চে শুইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে জনৈক বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। জীনকে অন্ধকারে সেথানে শয়ন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়, এখানে আপনি এসময় শুয়ে কেন?

"দেখ্‌তে পাচ্ছেন না যে ঘুমাব বলে শুয়েছি?"—জীনের স্বর বিরক্তিপূর্ণ, কর্কশ।

স্ত্রীলোকটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া, তাঁহার অন্তঃ-করণটি করুণা ও মমতায় পূর্ণ ছিল। বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি? ঐ বেঞ্চের উপর?"

"ক্ষতি কি? উনিশ বছর ধরে কাঠের শয্যায় কাটিয়ে এসেছি, আজ না হয় পাথরের বেঞ্চেই শুলাম।"

"ওঃ, তুমি একজন সৈনিক ছিলে বুঝি?"

"আজ্ঞা, হাঁ।"

"আচ্ছা, সরাইখানায় গেলে না কেন?"

"কাছে পয়সা নেই বলে।"

"তাই ত, আমার কাছে যে মোটে চার ফ্রাঙ্কের বেশী এখন আর কিছু নেই।"

"আচ্ছা তাই না হয় দিন,"—বলিয়া জীন হাত পাতিল।

স্ত্রীলোকটি অর্থ দিয়া বলিলেন—"সামান্য এই পয়সা নিয়ে কোন সরাইখানায় অবশ্য তোমায় স্থান দেবে না। কিন্তু তা বলে ত তুমি এ ভাবে রাত্রি কাটাতে পার না। তোমাকে যে রকম ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত দেখ্‌ছি, তাতে অন্ততঃ করুণার খাতিরেও, তোমাকে বিনা খরচায় তাদের আশ্রয় দেওয়া উচিত। কোথাও চেষ্টা করে দেখেছ কি?"

"চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি!"

"কি হ'ল তাতে?"

"সবাই তাড়িয়ে দিয়েছে।"

স্ত্রীলোকটী তাহার স্কন্ধে মৃদু করস্পর্শ করিয়া পথের অপর দিকে ধর্ম্মযাজকীয় প্রাসাদের পার্শ্বে একটি ছোট বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"সব বাড়ীতেই গিয়েছিলে?"

"হাঁ"

"ও বাড়ীটায় গিয়েছিলে কি?"

"না"

"তবে ওখানে গিয়ে দেখ দেখি।"

(৩)

মহিলাটি যে ক্ষুদ্র বাড়িটী জীনকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলেন—তাহা সে প্রদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক চার্লস ফ্রান্সিস বিয়েভুঁ মিরিয়েলের আবাসবাটী।—এইখানে তাঁহার সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা না বলিলে এ আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; কারণ, প্রত্যক্ষভাবে ইহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, পরোক্ষভাবে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব ইহার মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ধর্ম্ম-যাজক মিরিয়েলের বয়ঃক্রম পঁচাত্তর বৎসর। সরল ধার্ম্মিক উদার তিনি সকলেরই চিত্ত জয় করিয়াছিলেন; দরিদ্র আর্ত্ত কখনও তাঁহার সহানুভূতির ফল হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগটা সম্বন্ধে লোক-পরম্পরা হইতে এইটুকু জানা যায় যে তিনি এইকস পার্লামেণ্টের অন্যতম এক সদস্যের পুত্র ছিলেন, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয় এবং ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের প্রাক্কালে তদানীন্তন রাষ্ট্রনীতির পরিপোষকগণ যখন একে একে নির্য্যাতিত হইতে থাকেন, তখন মিরিয়েল স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ইটালিতে যাত্রা করেন,—তাঁহার স্ত্রী বহুদিন হইতে শ্বাসরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, সেখানে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিপত্নীক অপুত্রক মিরিয়েলের জীবনের গতি অতঃপর কি ভাবে চালিত হইয়াছিল ? পুরাতন ফরাসী-সমাজের পতন, নিজ বংশের ভাগ্যবিপর্য্যয়, রাষ্ট্রবিপ্লবের ভীষণ ঘটনাবলি হয়ত তাঁহার মনে একটা গভীর নির্জ্জনতা এবং বৈরাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দিয়াছিল, এবং সাধারণ দুঃখবাধায় অচল অটল তাঁহার চিত্তে একটা গভীর রেখা টানিয়া দিয়াছিল।—যাই হউক্, যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন লোকে দেখিল তাঁহার অঙ্গে ধর্ম্মযাজকের বেশ।

সহরে,—যেখানে যথার্থ চিন্তাশীলের অপেক্ষা বক্তা এবং পরচর্চ্চাকারীর সংখ্যা বেশী—সেখানে, কোন নূতন আসিলে যে অসু-বিধা ভোগ করিতে হয় ডি-তে আসিয়া মিরি-য়েলকে প্রথম প্রথম কতকটা সে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে কিছু-কাল পরে নিষ্কর্ম্মা নিন্দকদের সে সব মিথ্যা রটনা ক্রমশঃ চাপা পড়িয়া গেল।

মিরিয়েলের পরিবারবর্গের মধ্যে কেবলমাত্র ভগ্নী ব্যাপ্টিস্তাইন ও বৃদ্ধা পরিচারিকা ম্যাগ-লোয়ার। ব্যাপ্টিস্তাইন ক্ষীণা দীর্ঘদেহা রুগ্না এবং নিতান্ত ভালমানুষগোছের স্ত্রীলোক ;—মিরিয়েল অপেক্ষা তিনি প্রায় দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। সুন্দরী তিনি কখনো ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবন, পুণ্যকার্য্যের সমষ্টিমাত্র ছিল—তাহাই তাঁহার জীবনে একটা শুভ্রতার আবরণ টানিয়া দিয়াছিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ক্রমশঃ মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। যৌবনে যেটা ক্ষীণতা মাত্র ছিল, বার্দ্ধক্যে তাহাই স্বচ্ছতারূপে অনুমিত হইত এবং সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া তাঁর অন্তরের দেবী মূর্ত্তি খানি প্রকাশ পাইত। তাঁহার সে ক্ষীণ দেহ বুঝি জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে,—তাহা যেন প্রভাময় বিন্দুপরিমাণ জড় পদার্থ, পৃথিবীতে আত্মার অবস্থিতির একটা উপলক্ষ্যমাত্র। বৃদ্ধা ম্যাগলোয়ার ঠিক তাঁর বিপরীত—সুন্দরী, মোটাসোটা, কার্য্যক্ষমা এবং চঞ্চলা, সর্ব্বদাই হাঁপাইতেছে,—কতকটা পরিশ্রমের জন্য, কতকটা তার শ্বাসরোগের ফলে।

স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মিরিয়েল বাসের জন্য ধর্ম্মযাজকীয় প্রাসাদ পাইলেন। সে প্রাসাদ যথার্থই সার্থকনামা ছিল। ধর্ম্মযাজকীয় কক্ষ-সমূহ, অভ্যর্থনা কক্ষগুলি, শয্যাগৃহশ্রেণী, পুরাতন ফ্লোরেন্সের ফ্যাসনের ন্যায় খিলানযুক্ত সুবিস্তৃত দরবার হল, বৃক্ষশ্রেণী শোভিত তৎসংশ্লিষ্ট সুন্দর উদ্যান যথার্থই পরম রমণীয় ছিল।

প্রাসাদের পার্শ্বেই হাঁসপাতাল ;—ছোট খাট দ্বিতল বাটী, তাহার সহিত খানিকটা বাগানও ছিল। ডি—তে আসার তিন দিন পরে মিরিয়েল হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে গিয়া রোগীদের নানা অসুবিধা এবং স্থানাভাব লক্ষ্য করিয়া আসেন। ফলে, পরদিন হাঁস-

পাতাল প্রাসাদ স্থানান্তরিত হইল, এবং মিরিয়েল হাঁসপাতালের ক্ষুদ্র বাটীতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। বিস্মিত অধ্যক্ষের কোন আপত্তি টিকিল না। মিরিয়েল বলিলেন—"সে কি কথা? আপনার ছাব্বিশজন রোগীর জন্য ওই ছোট বাড়ী, আর আমাদের এই তিনটি প্রাণীর জন্য এত বড় একটা প্রাসাদ?—এমন একটা ভুলের প্রশ্রয় দেওয়া হতেই পারে না।"

প্রধান ধর্ম্মযাজকের বৃত্তি হিসাবে বাৎসরিক যে ১৫,০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক তিনি পাইতেন, ডি—তে আসিয়া তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যয়-তালিকা করিয়া ফেলিয়াছিলেন।—স্কুল, খৃষ্টীয় প্রচারসমিতি, কারাগার সমূহের সংস্কার সাধন, কয়েদীগণের সাহায্য ও উদ্ধার, দুঃস্থ শিক্ষকগণের বারতি বেতন, ঋণদায়ে কারাগ্রস্ত গৃহস্বামীদের মুক্তি, শস্য বিতরণ, দরিদ্র-বালকবালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা হিসাবে ও দরিদ্রের জন্য মোট ১৪০০০; এবং নিজের খরচপত্র হিসাবে অবশিষ্ট এক হাজার ফ্রাঙ্ক মাত্র।—বৃদ্ধা ব্যাপ্টিস্তাইন হাসিমুখে এ ব্যয় স্বীকার করিয়া লইলেন—কারণ, মিরিয়েল তাঁহার কাছে একাধারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ধর্ম্ম-গুরু, স্বভাবতঃ স্নেহের এবং ধর্ম্মতঃ তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্র; বিনাবিচারে তিনি ভ্রাতার সকল কথাই মানিয়া লইতেন।—বৃদ্ধা ম্যাগলোয়ার কিন্তু এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; ডি—তে মিরিয়েল যতদিন ছিলেন, ততদিন ঐ ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

গাড়ী ঘোড়ার খরচ বলিয়া ডি-র ধর্ম্ম-যাজকের বার্ষিক ৩০০০ ফ্রাঙ্কের একটা পৃথক্ বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এর জন্য তাঁকে একটু লেখালেখি করিতে হয়;—ছিদ্রান্বেষীরা সে বিষয় লইয়া অনেক পরিহাস ও আন্দোলন করে। শেষে কিন্তু মিরিয়েলেরই জয় হইল। সে অর্থের সমস্তই তিনি অনাথভাণ্ডারাদিতে দান করিলেন, আপনার জন্য এক পয়সাও রাখিলেন না; বলিলেন—"গরীবরা ত খেয়ে বাঁচুক, আমার পা থাকলেই যথেষ্ট।"

গাড়ী ঘোড়া না রাখিলেও তাঁহার পরিদর্শন-কার্য্যে কোন দিন তিনি অবহেলা করেন নাই। কখনো পদব্রজে, কখনো ডুলিতে, কখনো গর্দ্দভপৃষ্ঠে যখন যাহাতে সুবিধা এবং ব্যয়সংক্ষেপ হইত তাহাতেই যাইতেন।

তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা মাধুর্য্য এবং মোহিনী শক্তি ছিল যে তাহা শ্রোতার অন্তস্তল পর্য্যন্ত যাইয়া স্পর্শ করিত। সাধারণতঃ তাঁহার টীকা-টিপ্পনীগুলি বেশ একটু গভীর এবং মর্ম্মস্পর্শী হইত। একবার তাঁহার দূরসম্পর্কীয়া এক ধনাঢ্যা আত্মীয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন, এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে নিজেই 'মূল গায়েন' হইয়া, তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে, উত্তরাধিকারসূত্রে নিকট বা দূর জ্ঞাতিবর্গের নিকট হইতে কাহার কত অর্থলাভের সম্ভাবনা তাহারই বিশেষ আলোচনা করিতে থাকেন। বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া শুনিয়া বলিলেন—"দেখ, আমার মতে, যার কাছে উত্তরাধিকারিত্ব বলে কিছু নেই, সেই ভগবানের উপরই ভরসার যা কিছু সব থাকা উচিত।"

আর একবার কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, নিমন্ত্রণের চিঠিপত্রাদিতেও তাঁহার গুণগাথা এবং এমন কি তাঁহার আত্মীয়গণের পদবী পর্য্যন্ত ছাপা হয়। তাহা দেখিয়া মিরিয়েল বলেন—"মৃত্যুর পিঠটা খুবই চওড়

বল্‌তে হবে—দেখ দেখি কত পদবীর ভার সে হাসিমুখে বহন করে। ধন্য মানুষ, যে আপনার জাঁক প্রচারের জন্য কবরকে নিয়েও টানাটানি করে।"

দুঃস্থের সাহায্যের জন্য হাত পাতিয়া, কখনও কাহাকে তিনি 'না' বলিতে দেন নাই। একবার এক মার্কুয়িসের নিকটে তিনি সাহায্যপ্রার্থী হন। ভদ্রলোকটি কিছুতেই তাঁহাকে এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন—"মশায়, আমার নিজেরই এলাকায় কত দরিদ্র রয়েছে।" "বেশ ত, সে দরিদ্রদের ভারও আমার উপরেই দিন।" অবশেষে মার্কুয়িস চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু সাহায্য করিতে বাধ্য হন।

ঘটনা পারম্পর্য্য না দেখিয়া, ঝোঁকের মুখে কোন জিনিষেরই তিনি ভালমন্দ বিচার করিতেন না। তিনি বলিতেন—'মানুষের এই দেহ—তার বোঝা এবং প্রলোভন। সর্ব্বদা একে চোখে চোখে রাখতে হয়, নিতান্ত নিরুপায় না হলে এর বশ্যতা স্বীকার করতে নেই। সে বশ্যতা স্বীকার করাও হয়ত দোষের—কিন্তু সেটা তত মারাত্মক নয়; সেটা পতন বটে—কিন্তু রসাতলে নয়, তাতে মানুষকে কেবলমাত্র নতজানুই করে—তা থেকে পরিণামে তার ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সম্ভব। যথার্থ সাধু ২।৪ জনই হয়; কিন্তু ন্যায়পরায়ণ হওয়াটা তত শক্ত নয়। ভুল কর, সন্দেহ-দোলায়িত হও, পাপে পড়—তবু ন্যায়পরায়ণ থেকো।

"সর্ব্বাপেক্ষা কম পাপ করাই মানুষের ধর্ম্ম। একেবারে নিষ্পাপ জীবন যাপন করা একমাত্র দেবতাদের পক্ষেই সম্ভব। মর্ত্ত্য জীবন মাত্রেই পাপশঙ্কী, কারণ পাপ জিনিষটাই মাধ্যা-

তাঁহার একথার উত্তরে যাহারা 'কি ভ্রান্তি!' 'কি দুর্ভাগ্য!' বলিয়া ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিত, তাহাদের উদ্দেশে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন—"পাপ মাত্রেই কি তবে এত ভয়ানক? অথচ এরা সবাই-ই ত পাপী। ভণ্ডামি জিনিসটা দেখ কেমন করে আপনাকে বাঁচাতে চায়—কেমন করে আপনাকে ঢেকে ফেল্‌বার চেষ্টা করে।"

স্ত্রীলোক এবং দরিদ্র—সমাজের উৎপীড়ন যাদের বিশেষ ভাবেই সহ্য কর্‌তে হয়—তাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার বিশেষ করুণ ও সহানুভূতি-পূর্ণ ছিল। তিনি বলিতেন—"দেখ, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা, ঝি চাকর, দুর্ব্বল, অজ্ঞ এবং ছুতার মজুরদের দোষ ততটা তাদের নয় যতটা তাদের স্বামী, বাপ মা, প্রভু, প্রবল, শিক্ষিত-সম্প্রদায় এবং ধনবানদের। অজ্ঞ যারা আছে, তাদের শিক্ষিত কর; এত যে পাপের অনুষ্ঠান এ কেবল সমাজের শিক্ষা নেই বলেই। যে জীবনে অনুশীলন আদৌ হয় নি, সে জীবন ত পাপের আকর হবেই। যে পাপ করে তারই উপর কেন সব দোষ চাপাও? অন্ধকার যে সৃষ্টি করে সেই সমাজই কি মূলতঃ এজন্য দায়ী নয়?"

একবার একটা লোক টাকা জাল করার অপরাধে ধৃত হয়। স্ত্রী পুত্রের অন্ন সংস্থানের কোন সুবিধা না করিতে পারিয়া, লোকটা অবশেষে এই উপায় অবলম্বন করে। যন্ত্রাদি তাহার কাছে কিছু পাওয়া যায় নাই—একমাত্র স্ত্রীর কথার উপরেই তাহার বিচারফল নির্ভর

করিতেছিল। কিছুতেই যখন স্ত্রী তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিল না, তখন সরকারী পক্ষের উকীল এক চাল চালিলেন। জাল চিঠি পত্রাদি এবং অর্থপুষ্ট সাক্ষী সাবুদের দ্বারা তিনি স্ত্রীলোকটির কাছে সপ্রমাণ করিলেন যে তার স্বামী দুশ্চরিত্র এবং অন্য রমণীর প্রণয়াসক্ত। হিংসায় অভিমানে তখন স্ত্রী সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিল। সকলেই সরকারী উকীলের বুদ্ধির ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। সব শুনিয়া মিরিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ লোকটার কোথায় বিচার হবে?"

"সেসনে।"

"আর এই সরকারী উকীলের?—"

আর একবার তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন হতভাগ্যের মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে, তাহার মর্ত্ত্য-জীবনের শেষ কয়দণ্ডের জন্য তাহার কারাকক্ষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে যান।—আজীবন সে হতভাগ্য ধর্ম্মের আলোক দেখে নাই—মৃত্যুর তীরে আসিয়া সম্মুখে অনন্তবিস্তৃত জমাট অন্ধকারই সে দেখিতেছিল এবং সেই রসাতলের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে বিশ্বাসের বর্ত্তিকা লইয়া আসিয়া মিরিয়েল তাহাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিলেন। প্রভাতে, যখন বালারুণ নিশার অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মায়ালোক সৃজন করিতেছিল, তখন সেই হতভাগ্যের সহিত বধ্যমঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর করুণ স্বরে মিরিয়েল বলিলেন—'মানুষ যাহাকে মৃত্যুর গহ্বরে নিক্ষেপ করে; ভগবানই তাকে নবজীবন দেন; সমাজ যাকে দূর করে দেয়, তিনিই তাকে কোলে তুলে নেন; তাঁর শরণাপন্ন হও, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখ, নবজীবন পাইবে। ওই দেখ, বিশ্বপিতা তোমারই জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

এ ঘটনা কিন্তু মিরিয়েলের মনে একটা গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। অপরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার প্রতি আমরা যতই উদাসীন হই না কেন—মৃত্যুর পুরোহিত-স্বরূপ গিলটিন-যন্ত্র * দেখিয়া কেহই অচঞ্চল থাকিতে পারে না। সেটা যেন শুধু নির্জ্জীব কাষ্ঠ এবং শাণিত ছুরিকামাত্র নয়; সে যেন তার কাষ্ঠ ছুরিকা এবং যন্ত্র দিয়া সবই দেখে, জানে, শোনে, বোঝে;—যত জীবন সে এ পর্য্যন্ত হনন করিয়াছে, সেই সমস্ত প্রাণ লইয়া যেন সে অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে। এ ঘটনার পর হইতে মিরিয়েলের চিত্তের প্রশান্তি কতকটা লুপ্ত হইয়াছিল,—সমাজের বিচার, প্রেতের ন্যায় তাঁহার মনশ্চক্ষে জাগিতে থাকিত। এক একদিন আপন মনে তিনি বলিতেন—"মৃত্যুতে ভগবানেরই অধিকার। কোন্ অধিকারে মানুষ সে দুর্জ্ঞেয় জিনিসের উপর আপন প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়?"

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

---

* 'গিলটিন'—হনন যন্ত্র বিশেষ; ফাঁসির পরিবর্ত্তে ফ্রান্সে তখন গিলটিনেরই প্রচলন ছিল।

সোরাব রোস্তাম

ফেরুদের কাছে তবে এল যত যোধ মন্ত্রণায়,
জোয়াব।,গুডার্জ্জ, আর ফেরাবর্জ্জ—যিনিপার্সীদের
দ্বিতীয় নায়ক আর খুল্লতাত নৃপতির। কয়জনে
একত্রে মিলিলা পরামর্শে। গুডার্জ্জ কহিলা তবে
"ফেরুদ্! এরণের আহ্বান স্বীকারি' লইতে-হবে,
তা না হ'লে পাব বড় লাজ। কিন্তু যোধ নাহি হেরি
যুঝিবে যে এ যুবার সনে—বন্য-কুরঙ্গের গতি,
সিংহের হৃদয় আর রয়েছে ইহার। আসিয়াছে
রুস্তাম হেথায় কালিরাতে। ভারি ভারি মন তার
তাই সে একাকী আছে বহুদূরে শিবির পাতিয়া।
তারি কাছে যাব, আর তাতারের এ যুদ্ধ-আহ্বান
যুবকের নাম সনে তুলিব তাহার শ্রুতিমাঝে।
হয়ত ভুলিয়া ক্রোধ যুদ্ধযাত্রা করিবে রুস্তাম;
সবে মিলি ইতিমধ্যে লহ মানি' এই আবাহন।"
গুডার্জ্জ কহিলে কথা ফেরুদ্ দাঁড়ায়ে উচ্চে কয়
"বৃদ্ধবীর! যেমনি বলিছ তুমি তেমনই হোক্
সোরাব করুন সজ্জা—নির্ব্বাচিয়া দিব মোরা যোধ।"
'কথা শেষ হ'লে তার পেরাণ উইজা এল ফিরি'
অশ্বারোহি-মধ্য দিয়া আপন শিবিরে। সমুৎসুক
পার্সী মধ্যে ছুটিয়া গুডার্জ্জ কিন্তু গেল অতিক্রমি'
পশ্চাৎ শিবির—ধীরে ধীরে উত্তরিল বালুচরে
রুস্তামের আবাস শিবিরে। হেরিলা রুস্তামে তথা,
প্রাতরাশ হইয়াছে শেষ—কিন্তু তথনো তাহার
সম্মুখে রয়েছে খাদ্য আস্তরণে সাজানো যতনে।
সিদ্ধ মেষ-মাংস-খণ্ড, রুটি ও পিষ্টক, নানা ফল।
আনমনা আছে বসি' রুস্তাম তথায়; হাতে লয়ে
একটি পাখীরে খেলিছে তা'সনে। অগ্রসরি তথা
পুরোভাগে দাঁড়াল গুডার্জ্জ। রুস্তাম হেরিয়া তারে
মহানন্দে চিৎকারি' দাঁড়া'ল—পাখীটিরে দিলফেলি'
গুডার্জ্জের হাতধরি' দুই হাতে কহিল তাহারে
"আরে বন্ধু এস, এস—আজি বড় সুপ্রভাত মোর—
কিসংবাদ? আচ্ছা থাক্ ব'স খাও দাও আগে তুমি।"
গুডার্জ্জ শিবির দ্বারে দাঁড়াইয়া কহে—"এখন না,
পানাহার করিবার পাইব সময় এর পরে,
কিন্তু আজ নয়। আজ আসিয়াছি গুরুতর কাজে,
উভসৈন্য বাহিরি' দাঁড়ায়ে আছে—দেখা যায়
পরস্পর। সুদূর তাতার হ'তে এসেছে আহ্বান
পারস্য প্রধান হ'তে যোদ্ধা এক নির্ব্বাচিত করি'
দিতে হবে যুদ্ধ তরে তাহাদের এক যোধ সনে।
নাম তুমি জান' তা'র—সোরাব বলিয়া ডাকে তারে,
কার-পুত্র কিন্তু কেহনাহি জানে তাহা। হে রুস্তাম!
তোমারি সমান বুঝি এই যুবা মহাশক্তিধর,
কুরঙ্গ সমান গতি সিংহ সম হৃদয় তাহার।
যুবা সেইজন—আর ইরাণের যত যোধ, বৃদ্ধ
হইয়াছে—দুর্ব্বল সকলে তা'র কাছে। তাই বন্ধু
যত আঁখিতোমাপানে চাহে আজি একান্ত আশায়;
এস বাহিরিয়া আজি; যুদ্ধ কর—নহে মান যায়।"
গুডার্জ্জ কহিলে কথা উত্তরিলা হাসিয়া রুস্তাম—
"ইরাণের বীরগণে বুড়া যদি বল—তা' হ'লেত'
আরো বুড়া আমি। যুবা যদি হয় বলহীন, তবে
কায়খশ্রু নরপতি পড়েছেন মহাভ্রমে। নিজে
তিনি যুবা—তাই তাঁর কাছে যত যুবারি আদর
বুড়ারা কবরে গিয়ে লউক বিশ্রাম—এই মানি
তাঁ'র মত। রুস্তামের পরে তাঁ'র পূর্ব্বপ্রীতি নাই
যুবজনে এখন বিশেষ সমাদর। সোরাবের
আস্ফালন হেরি,' যুবাদল উঠিবে কোমর বাঁধি,
আমি নয়। বীরত্বের কীর্ত্তি তা'র গাহে জনে জনে
কিন্তু কহ কি তাহে আমার আসে যায়। যদি মোর
সেই অসহায় শিশু একমাত্র কন্যার বদলে
বীরপুত্র থাকিত অমনি—অমনই কীর্ত্তিশালী,

তাহ'লে তাহারে রণে পাঠাইয়া আমি সেই মোর
তুষার ধবল ক্লেশ পিতা "জাল" সনে থাকিতাম
ঘরে;—আফগান-দস্যুগণ উত্যক্ত করিছে তাঁরে,
কাড়িয়া লইছে ভূমি—পশুপাল করিছে হরণ;—
নিঃসহায় এ দশায় কেহ নাহি দেখিতে তাঁহারে।
সেইখানে যাইতাম, রণসজ্জা রাখিতাম তুলি',
শুধু মোর সুবিখ্যাত নাম দিয়া বৃদ্ধ পিতাটিরে
গণ্ডী দিয়া রাখিতাম ঘেরি'। অর্জ্জন করেছি আমি
ধনরাশি যত, করিতাম ব্যয়—আর শুনিতাম
সোরাবের দিব্য যশোগাথা—আর এই অকৃতজ্ঞ
নৃপগণে মরণের মাঝখানে করিতাম ত্যাগ—
তার পর এই হস্তে আর নাহি ধরিতাম অসি।"
কহিয়া হাসিল বৃদ্ধ। গুডার্জ্জ উত্তরে কহে "লোকে
কি বলিবে তবে হে রুস্তাম,এ কথা শুনিলে পরে—
সোরাব ডাকিছে রণে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোধে,
ডাকিছে তোমারে বিশেষতঃ—আর তুমি(একান্ত সে
তোমারেই চায়) মুখ লুকাইয়া র'বে গৃহ কোণে
ব'সি? অবহিত হও বন্ধু—লোকে নাহি বলে পাছে
'বুড়া কৃপণের মত রুস্তাম আপন কীর্ত্তিটিরে
সযতনে সঙ্গোপনে রেখেছে লুকায়ে—নাহি চায়
বিপন্ন করিতে তা'রে বুঝি যুবাসনে।" সে কথায়
অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হ'য়ে গর্জ্জিল রুস্তাম—"হে গুডার্জ্জ
হেন কথা কি হেতু কহিছ বল? মানি ইহা হ'তে
প্রিয়তর বাক্য তুমি জান' বীরবর! হোক্ বৃদ্ধ,
হোক্ যুবা,হোক্ বীর কিম্বা ভীরু—অল্প কীর্ত্তিশালী
কিম্বা বহুকীর্ত্তিশালী; হোক্ না যে কোনো যোধবীর
আমা সনে তুলনা কাহার? তারা ত' মানুষ মাত্র,
আমি না রুস্তাম? কিন্তু কহ শুনি কেন নগণ্যতরে
বিপুলবীরত্ব গর্ব্ব প্রকাশিতে চায়? এস তবে
দেখিবে রুস্তাম নিজকীর্ত্তি কি করিয়া সযতনে
সঙ্গোপনে রেখেছে সঞ্চিত। কিন্তু কহিতেছি শুন
"অজ্ঞাত যুঝিব আমি ধরিয়া সামান্য অস্ত্র হাতে।
লোকে নাহি কহে যেন রুস্তামের কথা—যুঝিয়াছে
মর্ত্ত্যের মানব সনে একা সেই দ্বৈরথ সমরে॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

৩

জগদীশ বাবুর ১৮৬৮ সালে নোয়াখালিতে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হওয়ার পর প্রথম বৎসরেই সে অঞ্চলের ডাকাতি ৭০।৭৫ হইতে যে দশ বারটীতে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার কার্য্য-কালের দ্বিতীয় বৎসরে আর ডাকাতির নামগন্ধও রহিল না। তৃতীয় বৎসরে জগদীশ বাবু কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট রিপোর্ট করিলেন "এখন এ জেলায় ডাকাতি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, নূতন ডাকাত-দলের সৃষ্টি না হইলে, এখানে ডাকাতি হওয়া অসম্ভব।" বিড্লেন বলিয়া এক কর্ম্মচারীর হস্তে ইনি চার্জ্জ দিয়া আসেন। ঐ সাহেব চট্টগ্রামে লর্ড ইউলিক ব্রাউন ডিভি-সনাল কমিসনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান এবং নোয়াখালি পুলিসের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, লর্ড ইউলিক ব্রাউন (যিনি সে দিন

মারকুইস অফ্ শ্লীপো হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন) বলিলেন "নোয়াখালির অবস্থা খট্ খট্ করিতেছে; কথা হইতেছে, তুমি সে রকম রাখিতে পারিবে কি না"। একটা কথা পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি,—যখন ইং ১৮৬৬তে ভূটান লড়াই হয় তখন জগদীশনাথ রায়কে লড়ায়ের কোন কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করা হয়, রায় মহাশয়ও যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার যাওয়া হইল না, কি কারণে তাহা বলিতে পারি না। রায় মহাশয় সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সাহসের কথা ক্রমান্বয়ে বলিব। নোয়াখালির দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিব মাত্র। একদিন গভীর রাত্রে তিনি একখানা ভাড়াটিয়া শকটে আরোহণ করিয়া মফঃস্বল হইতে সদরে আসিতেছিলেন, সঙ্গে আর্দ্দালি কিম্বা অপর কোন কনেষ্টবল ছিল না; একাকীই ছিলেন, সহসা গাড়ির গতি কে থামাইল। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুই, কেন গাড়ি থামাইলি?" উত্তর প্রদত্ত হইল, "আমি কয়েদ খালাসি ডাকাত, তোমাকে খুন করিব বলিয়া গাড়ি থামাইয়াছি।" জগদীশনাথ রায় অম্লান বদনে বলিলেন, "ব্যাটা, তুই বোধ হয়, খেতে পাসনি তাই এত লম্ফ ঝম্ফ করিতেছিস্, হাতের ছোরা খানা আমায় দে, আর গাড়োয়ানের কাছে গিয়া বোস।" ডাকাত দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল। তাহাকে সদরে লইয়া আসিয়া রায় মহাশয় আপনার আর্দ্দালির কনেষ্টবলীতে ভর্ত্তি করিলেন এবং সে আর্দ্দালি হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। আর একবার সংবাদ আসিল একটা মানুষ খুন হইয়া মাঠে পড়িয়া আছে। রায় মহাশয় অকুস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। লাসটি যে অবস্থায় ছিল তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইল যে মানুষটি সেখানে মারা পড়ে নাই, স্থানান্তর হইতে মৃত দেহ লইয়া গিয়া সেখানে ফেলা হইয়াছে। দেহটিতে সড়কির খোঁচা দাগও দৃষ্ট হইল। মনুষ্যের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, এক মাইল দূরে গ্রাম দৃষ্ট হইল; গ্রামের ভিতর একটা বাড়ীতে পোড়া মসাল, নূতন হুঁকা কলিকা প্রভৃতির চিহ্ন পাইয়া, রায় মহাশয় বুঝিলেন সম্ভবতঃ এই বাড়ীতেই পূর্ব্বরাত্রে ডাকাত পড়িয়াছিল, মৃত মানুষটি এই বাড়ীরই লোক; খুব সবল ও হৃষ্ট পুষ্ট। ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিতে এই লোক মারা পড়িয়াছে। রায় মহাশয় যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাই সত্যে পরিণত হইল। বাড়ীতে "কে আছ" বলিয়া ডাক দেওয়া হইলে মৃত ব্যক্তির বাটী হইতে ছয়জন সুস্থকায় সবল লোক বাহির হইল, তাহাদের দেখিয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "তোরা ডাকাত তাড়াইয়াছিস্, সম্ভবতঃ দু'টা একটা খুনও হইয়াছে, আর মৃত লোকটির চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, এ তোদের ভাই, একে ডাকাতেরা মারিয়া গিয়াছে, কেমন, এ সব কথা সত্য নয়?" ছয় ভাই গোপনে কি পরামর্শ করিল, এবং একজন বলিয়া উঠিল—"হাঁ, আমরা দু'টা ডাকাতকে মারিয়া ফেলিয়াছি, তোকেও মারিব, সাবধান।" জগদীশনাথ রায় তাহাদের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং এমন তীব্র দৃষ্টিতে উহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যে তাহারা ভয় পাইল এবং বলিয়া উঠিল "দোহাই তোমার, আমাদের রক্ষা কর, আমরা সব

বলিতেছি এবং সমস্ত দেখাইয়া দিব।” তাহারা বলিল—“তোমার কথা সত্য, গতকল্য রাত্রে আমাদের বাটীতে ডাকাত পড়ে, আমরা বলিলাম, কি আমরা সাত ভাই থাকিতে আমাদের বাড়ীতে ডাকাতি? দস্যুদের সড়কি ও বল্লম লইয়া আক্রমণ করিলাম, দুইজনকে বাঁধিয়া ফেলিলাম, যখন ডাকাতেরা প্রাণভয়ে পলাইল, যাইবার সময় আমাদের ভাইকে বল্লমের দুটা খোঁচা মারে, তাহাতে তার মৃত্যু হইল, ভাইকে লইয়া মাঠে ফেলিয়া আসিলাম, আর ডাকাতদের লাস দুটা, পাড়ার পুষ্করিণীর ভিতর গাড়িয়া রাখিলাম, এখন আমাদের বাঁচাও, খুন হইতে রক্ষা কর।” আপনার জীবন, সম্পত্তি ও খ্যাতি রক্ষার জন্য যদি মানুষ মারা পড়ে, তাহা খুন নহে, এ কথা তাহারা জানে না; রায় মহাশয় এ কথা তাহাদের বুঝাইয়া দিলে, তাহারা বড় আনন্দিত হইল। দুইটি মৃতদেহ পুকুর হইতে তুলিয়া আনিয়া উঁহাকে দেখাইল এবং যাহা যাহা তাহাদের করিতে বলিলেন সেই মত তাহারা করিল। উঁহার রিপোর্ট পাইয়া সরকার হইতে তাহাদের ইনাম প্রদত্ত হইল। তিন বৎসর নোয়াখালিতে থাকিয়া রায় মহাশয় বালেশ্বরে বদলি হইলেন। এই বদলির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। স্যার উইলিয়াম গ্রে লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর, জগদীশ বাবুকে বীরভূমে বদলি করিলেন। মেজার বটন্‌সা নামধারী একজন পল্‌টনিয়া সাহেব বীরভূমে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডের পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহাকে বীরভূমে রাখিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করা হইল, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট হইল যে জগদীশ বাবু চিরদিন যে যে স্থানে নিমক্ পোক্তান হয়, সেই সেই স্থানে চাকুরি করিয়াছেন, সুতরাং যে জেলায় নিমক্ এখনও প্রস্তুত হয় সেইখানে তাঁহাকে পাঠান কর্ত্তব্য।” এ দিকে জগদীশ বাবু এক পত্র পাইলেন যে তিনি বালেশ্বরে যাইতে পারেন কি না। বালেশ্বর স্বাস্থ্যকর স্থান, সুতরাং সেইখানে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সেই পত্র গ্রে সাহেব লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট পাঠান হইল, গ্রে সাহেব জগদীশ বাবুকে বালেশ্বরে বদলি করিলেন।

জগদীশনাথ রায় সেরেস্তাদারী অবস্থায় যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখনকার একটা কথা বলিতে স্মরণ হয় নাই, সে কথাটা এই খানে বলি। জগদীশ বাবুর নিকট অনেক ভদ্রসন্তান ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলাম; একজনের নাম শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার, ইহাঁর নিবাস বৰ্দ্ধমান জেলার সাতসইকার এলাকাধীন নপাড়া গ্রামে, ইনি জাতিতে বৈদ্য, মহাকুলীন এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়। প্রসন্ন বাবু পাঠ সমাপনান্তে পুঁটিয়ার বিখ্যাত মহারাণী শরৎসুন্দরীর দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাঁর কার্য্যক্ষমতা, জ্ঞান, ন্যায়ানুবর্ত্তিতা, দয়া এত উচ্চভাবের ছিল যে, সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিত। ইহাঁর এক পুত্র প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তাঁর আর এক পুত্র বঙ্গদর্শনের বর্ত্তমান সম্পাদক। অপর ভদ্রলোকটির নাম শ্রীযুক্ত রূপনারায়ণ মজুমদার। রূপনারায়ণ বাবুও বৈদ্য, উচ্চকুলসম্ভূত এবং আদর্শচরিত্রের লোক ছিলেন। ইনি জগদীশ বাবুর ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করেন। জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষা পাস করিয়া

সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। জুনিয়ার স্কলারসিপ্ পরীক্ষা পাস করিয়াই ইনি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইংরাজি শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাঁর শিক্ষকতায় বড় তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। রূপনারায়ণ বাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র মজুমদার আজও জীবিত আছেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট পেন্সন পাইয়া থাকেন। ইনি পিতার ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও প্রেমিক।

জগদীশ বাবু যখন বালেশ্বরে বদলি হন, তখন তাঁহার অধীনে তিন জন সাহেব আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। দুই জন, বাঙ্গালীর তাঁবেদারী করিতে হইবে বলিয়া, বহু চেষ্টা করিয়া অন্যান্য স্থানে বদলি হন। তৃতীয় ব্যক্তি—লেফ্‌টেনেণ্ট রাউটান বড় উদারচরিত্র ছিলেন। তিনি বালেশ্বরে রহিলেন এবং সর্ব্বদাই বলিতেন যে "জগদীশ বাবুর মতন সুযোগ্য, শিক্ষিত, কার্য্যদক্ষ ভদ্রলোকের অধীনে কার্য্য করা তিনি সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করেন।" পরে গ্রেভস্ বলিয়া আর একজন সাহেব ইহাঁর অধীনে ছিলেন। নোয়াখালিতে রায় ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত গদাধর খাঁ ইহাঁর আসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ ওহাবীদলকে কারারুদ্ধ করেন এবং পুলিশের কার্য্য ছাড়িয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হন। কেন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইলেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "জগদীশ বাবুর মতন নিখুঁত লোককে বহুবেগ দিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করিয়াছে, আমার মতন লোককে এ পদ কখনই দিবে না।"

নিমক বিভাগে হাকিমী করিবার সময় জগদীশ বাবু প্রথমতঃ বালেশ্বরে যান, সেখান হইতে মেদিনীপুরে বদলি হন, মেদিনীপুর হইতে তমলুকে আসেন, তমলুকে প্রায় ৭।৮ বৎসর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় তখন মহকুমার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, তজ্জন্য বঙ্কিম বাবু ও সঞ্জীব বাবু প্রায়ই পূজার বন্ধে তমলুকে যাইতেন। তখন জগদীশের বাটীতে বড়ই আনন্দস্রোত চলিত; প্রত্যেক দিন বৈকাল বেলায় সঙ্গীতাদির চর্চ্চা, ভোজনাদি এবং নানা সাহিত্য বিষয়ক কথা হইত। এই দলে আর একজন যোগ দিতেন, তাঁহার নাম ছিল রাজা শ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র। ইনি ময়নাগড়ের রাজা; নানাপ্রকার ক্রীড়ায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সঙ্গীতও জানিতেন এবং বড়ই আমোদপ্রিয় ছিলেন। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত সরকারী ডাক্তার ছিলেন, ইনিও আসিয়া জুটিতেন। তমলুক অতি প্রাচীন স্থান, ইহা পূর্ব্বে তাম্রলিপ্ত বলিয়া খ্যাত ছিল এবং বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান ছিল। দেবী বর্গভীমা তমলুকে বিরাজ করিতেছেন, ইনিও সতীর অঙ্গসম্ভূত। বর্গভীমার মন্দিরে একটি কুণ্ড আছে। কথিত আছে ইহার জল স্পর্শে মৃত জীব সজীব হইত। তমলুকের জনৈক রাজা ছিলেন, তিনি এক মেছুনীর নিকট মৎস্য লইতেন, মৃত মৎস্য গ্রহণ করিতেন না; মৃত মৎস্য আনিলে মেছুনীকে শাস্তি দিতেন। কথিত আছে, এক দিন কতকগুলি জীবন্ত মৎস্য তমলুকে পৌঁছিয়া মরিয়া গেল, মেছুনী ভয়ে আকুল; কুণ্ডে মৎস্য ধৌত করিতে গেল, তখন মৃত মৎস্যগুলি সজীব হইল। মেছুনী আহ্লাদিত

হইয়া অকুতোভয়ে মৎস্য যোগাইতে লাগিল। একদিন অনেক লোক এ রহস্য দেখিয়া রাজাকে গিয়া বলে, রাজা পরীক্ষা করিয়া এর সত্যতা জানিতে পারিলেন ; ক্রমে এ কথা রটিয়া গেল, দুঃখের বিষয় সাধারণের জ্ঞান লাভের সঙ্গে কুণ্ডের মহিমা চলিয়া গেল। তমলুকে ১৭০০ ঘর জহুরী বাস করিতেন, এখনও অনেকে রূপনারায়ণ নদের ধারে পুরাতন মোহর পান। তমলুকে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, তাহার জল কখন কমে না। একজন পাগ্‌লা সল্ট এজেণ্ট কলিকাতা হইতে এন্‌জিন লইয়া গিয়া জল ছেঁচিতে লাগিলেন, দিন ভোর যদ দুই ইঞ্চি কমিত, তবে প্রাতে চারি ইঞ্চি বাড়িত। শ্যামাচরণ বাবুর বাসাবাটী রূপনারায়ণের ধারে ছিল, বিজয়া দশমীর দিন নদীতীরে চাঁদমারি হইত, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি সকলেই যোগদান করিতেন। তমলুক হইতে জগদীশ বাবু কলিকাতায় বদ্‌লি হন এবং এখানে কিছুদিন কর্ম্ম করিয়া নিমক বিভাগ উঠাইয়া দেন। কলিকাতার বেকার মহলে একটা কথা ছিল যে, জগদীশনাথ রায়ের নিকট সুপারিস লইয়া গেলেই চাকরী হয়, এইজন্য প্রাতঃকালে তাঁহার বাটীতে বিস্তর লোকের সমাগম হইত। একটি ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি, ইনি সর্ব্বদাই জগদীশ বাবুর নিকট আসিতেন, ইহাঁর নাম ছিল ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে, ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম এম্. ডি উপাধি পান। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আসতেন, তাঁহার কন্যা "লীলার" বিবাহের সময় কৃষ্ণনগরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রস্তাব নানা কারণে কার্য্যে পরিণত হইল না। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র জগদীশ বাবুর সহপাঠী, ইনি অবসর লইয়া সর্ব্বদাই সিমুলিয়া বাটীতে আসিতেন। মুর্শিদাবাদের ডাক্তার রামদাস সেনকেও আমরা আসিতে দেখিয়াছি। মুসলমানদের ভিতর নবাব আবদুল লতিফ্ মধ্যে মধ্যে আসিতেন।

তমলুকে বন্য বরাহের বড় উপদ্রব ছিল। একদিন জগদীশ বাবুর বৈঠকখানায় অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে, এমন সময় চাষারা আসিয়া জানাইল "হুজুর বরাহের দৌরাত্ম্যে, আমাদের ফসল বাঁচান দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আপনারা একটা উপায় করুন।" বঙ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ বাবু প্রস্তাব করিলেন "চল, আমরা এখনই যাই।" জগদীশ বাবু বলিলেন "দেখ, আমি ছাড়া এখানে শিকারী কেহ উপস্থিত নাই, তা আমি এখনি যাইতে প্রস্তুত, যদি তোমরা পিছনে থাকিয়া গাদা বন্দুকগুলি আমার হাতে দিতে পার।" শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন, "তা আর পারব না কেন ?" তখন পদব্রজে সকলেই গমন করিলেন, মাঠে প্রবেশ করিয়া জগদীশ বাবু বলিলেন "দেখ, তামাসগির লোক, এই রাস্তায় অপেক্ষা কর, মাঠের মধ্যে জঙ্গলে আমি যাইব এবং আমাকে গাদা বন্দুক এগাইয়া দিবার জন্য, শ্যামাচরণ, মহিম (রায় মহাশয়ের জামাতা) এবং আহেদ আর্দ্দালি চলুক।" সেই মত কার্য্য হইল, জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চাপ্‌রাসিটা বলিয়া উঠিল "হুজুর ঐ"। একটা নালার ধারে বরাহ মহাশয়েরা ছিলেন, শব্দ শুনিয়া তাদের চাঁই সকলকার অপেক্ষা বৃহৎ একটা বরাহ

দাঁড়াইয়া উঠিল, যেমন দাঁড়াইয়াছে, জগদীশ বাবু বন্দুক ছুড়িলেন, জন্তুটার এক কাণের ভিতর লাগিয়া আর এক কাণ দিয়া গুলি বাহির হইয়া গেল, যন্ত্রণায় জন্তুটা একটা শঙ্খধ্বনির মতন শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। শব্দটা দশটা শাঁখ একত্রে বাজাইলে যেমন তীব্র এবং গম্ভীর হয়, সেই মত হইল। শব্দ শুনিয়া রাস্তায় যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা কে কোথায় পলায়ন করিলেন, তাহার আর ঠিকানা পাওয়া গেল না, চাপ্‌রাসী ভায়া দৌড় দিয়া পলায়ন করিল, শ্যামাচরণ বাবু গাছে উঠিতে না পারিয়া ঝুলিতেছেন, মহিমচন্দ্র কাপড় পায়ে জড়াইয়া জমিতে শয়ন করিয়াছেন, একক জগদীশ বাবু দণ্ডায়মান। তখন শ্যামাচরণকে নামাইয়া, মহিমকে তুলিয়া, বলিলেন, "তোমরা আমাকে বন্দুক বেশ যোগাইয়াছ, বরাহটা আক্রমণ করিলে, আমাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিত, ভগবানের ইচ্ছায় দলপতিটা এক গুলিতেই মরিয়াছে।" ভয়ে দলটা অপর দিকে ছুটিয়া গিয়াছে। তখন বরাহটাকে গরুর গাড়ি করিয়া তমলুকে লইয়া যাওয়া হইল; মাঠ হইতে তমলুক আড়াই ক্রোশ অন্তরে স্থিত, সেখানেও ঐ শঙ্খধ্বনি পৌঁছিয়াছিল। বালেশ্বরে জগদীশ বাবু যখন প্রথম যান, তখন ওখানে মাজিষ্ট্রেট-কলেক্‌টার ছিলেন বিখ্যাত বীমস্‌ সাহেব, ইনি বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিলেন এবং বাঙ্গালীদের বড় পছন্দ করিতেন না। জগদীশ বাবুর বালেশ্বরে বদলির কথা শুনিয়া বীমস্‌ সাহেব গবর্ণমেণ্টকে লিখেন যে বালেশ্বরের এলাকায় অনেক গড়জাতি রাজা আছেন, সে দিন কেঁওঝড়ে ইংরাজের সঙ্গে গড়জাতীদের লড়াই হইয়া গিয়াছে, এমত অবস্থায় এ স্থানে একজন পল্‌টুনে কর্ম্মচারী, অন্ততঃ একজন সাহেব পুলিসের কর্ত্তা হওয়া আবশ্যক। গ্রে সাহেব (ছোট লাট) তাহার উত্তরে বলিলেন—"গবর্ণমেণ্ট যেখানে যাহাকে পাঠাইতে হইবে তাহা জানেন, উপযুক্ত লোককেই বালেশ্বরে পাঠান হইয়াছে; ইহাতে বীমস্‌ সাহেবের অমত হইলে তিনি বেলভিডিয়ার গদিতে আসিয়া বসুন এবং আমি বালেশ্বরে যাই।" বীমস্‌ সাহেব লজ্জা পাইয়া অধোবদন হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেটকাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌—৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিমাই-চরিত্র।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভক্ত-বৎসল

শুক্লাম্বরনামা এক নিষ্ঠাবান সুশান্ত ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে বাস করিতেন। সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি যে কিছু তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেন সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিয়া নিজে গ্রহণ করিতেন। কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারে অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িত। গৌর তাহাকে শ্রীবাস গৃহে নিজ নৃত্য দেখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। একদিন গৌরের নৃত্য দেখিতে দেখিতে শুক্লাম্বর ঝুলি কাঁধে নিজেও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে গৌরের ঈশ্বরাবেশ হইল। তখন শুক্লাম্বরকে ডাকিয়া গৌর কহিলেন—"হে আমার জন্মজন্মান্তরের দরিদ্র সেবক, তুমি তোমার সমস্ত আমাকে অর্পণ করিয়া নিজে ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ। অনুক্ষণ তোমার দ্রব্য আমি কামনা করি, তুমি না দিলেও বলপূর্ব্বক আমি তাহা গ্রহণ করি। হে ভক্ত! দ্বারকায় আমি তোমার খুদ কাড়িয়া খাইয়াছিলাম, তাহা তোমার স্মরণ হয় কি?" এই বলিয়া শুক্লাম্বরের ঝুলির মধ্যে হস্ত নিবেশিত করিয়া মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া গৌর চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন "আমার তণ্ডুলে বিস্তর খুদকণা আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চাও প্রভু!" গৌর কহিলেন—"তোর খুদকণাই আমি চাই। ভক্তিহীন অমৃত দান করিলেও আমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাই না। হে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর! সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে আমি বিরাজমান আছি। তোমার ভোজনেই আমার ভোজন, তোমার পর্য্যটনেই আমার পর্য্যটন। জন্মে জন্মে তুমি আমার সেবা করিয়াছ, তোমাকে আমি প্রেমভক্তি দান করিলাম।" ভক্তপ্রতি প্রভুর অপার করুণার পরিচয় পাইয়া ভক্তগণ রোদন করিতে লাগিলেন।

মুরারি একদিন মনে মনে চিন্তা করিলেন—"ঈশ্বরলীলা মানববুদ্ধির অগম্য। যে সীতার জন্য রামচন্দ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিলেন, তাহাকে পাইয়াই আবার বর্জ্জন করিলেন।

যে যাদবগণকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রাণের মত দেখিতেন, তাঁহারই সম্মুখে সেই যাদবগণ নিহত হইল। গৌরও কখন অন্তর্হিত হইবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব তিনি পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই আমাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে।" মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই রাত্রিতেই দেহত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে এক শাণিত ছুরিকা আনিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু অচিরেই গৌর তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"মুরারি, আমার একটী কথা রক্ষা করিতে হইবে।" মুরারি কহিলেন—"কি আদেশ প্রভু? আমার এ দেহ তোমারই।" গৌর কহিলেন—"সত্য বলিতেছ?" মুরারি বলিলেন—"নিশ্চয়।" তখন গৌর কহিলেন—"মুরারি, ছুরিকাখানি আমাকে দান কর।" অনন্তর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গৌর নিজেই গুপ্তস্থান হইতে ছুরিকাখানি বাহির করিয়া আনিলেন।

প্রভু বলে "গুপ্ত এই তোমার ব্যভার।
কোন্ দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥

* * * * *

মোর মাথা খাও গুরু মোর মাথা খাও।
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও॥"

মুরারি প্রেমাশ্রুতে গৌরের চরণ অভিষিক্ত করিলেন।

একদিন শ্রীধরের কুটীরে উপস্থিত হইয়া গৌর দেখিলেন, জীর্ণ কুটীরের দ্বারদেশে এক অতি পুরাতন বহুতালিযুক্ত জলপূর্ণ ঘটী রহিয়াছে। ঘটী হস্তে লইয়া গৌর জলপান করিলেন। 'মরিলাম, মরিলাম' বলিয়া শ্রীধর চীৎকার করিয়া উঠিল এবং "আমার সর্ব্বনাশ করিতে আমার ঘরে আসিয়াছ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌর কহিলেন—"শ্রীধরের জলপান করিয়া আমার কলেবর শুদ্ধ হইল, আজি আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ করিলাম"; বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

নৃত্য করিতে করিতে আচার্য্য হঠাৎ ভূলুণ্ঠিত হইলেন। ভক্তগণ কিছুতেই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না। গৌর তাঁহার হস্ত ধরিয়া বিষ্ণুগৃহে লইয়া গেলেন এবং দ্বাররুদ্ধ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচার্য্য, তোমার অভিলাষ আমায় খুলিয়া বল।" আচার্য্য কহিলেন—"তোমাকেই চাই, আর কি চাহিব?" গৌর কহিলেন "আমি ত তোমার সম্মুখেই আছি।" তখন অদ্বৈত কহিলেন—"পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে যে রূপ দেখাইয়াছিলে, তাহাই আমাকে দেখাইতে হইবে!"

বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিকে সৈন্য দেখে মহাযুদ্ধপথ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে॥
কোটী চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন॥

ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া অদ্বৈত নমস্কার করিলেন। এমন সময় দ্বার-সমীপে ভয়ানক গর্জ্জন শ্রুত হইল। দ্বার উন্মুক্ত হইল। নিত্যানন্দ প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া

যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল।

নৃত্যান্তে গৌর প্রত্যহ স্নান করিতেন। শ্রীবাসের দুঃখী নাম্নী দাসী তাঁহার স্নানার্থ গঙ্গাজল লইয়া আসিত। গৌর যখন নৃত্য করিতেন, দুঃখী মুগ্ধনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত; পরক্ষণই জল আনিতে ছুটিত। স্নানকালে প্রত্যহই গৌর দেখিতে পাইতেন, সারি সারি পূর্ণকুম্ভ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। একদিন শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে প্রত্যহ আমার জন্য গঙ্গাজল বহিয়া আনে!" শ্রীবাস দুঃখীর নাম করিলে, গৌর কহিলেন—"আর তাহাকে দুঃখী বলিও না। আজি হইতে তাহার নাম হইল সুখী।"

শ্রীবাসগৃহে নৃত্য হইতেছে—এমন সময় তাঁহার অন্তঃপুরে আকুল-ক্রন্দন শ্রুত হইল। দ্রুতগতিতে গমন করিয়া শ্রীবাস দেখিলেন, তাঁহার ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীবাস স্ত্রীলোকদিগকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া কহিলেন—"অন্তিমকালে যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলে অতি-বড় পাতকীও বৈকুণ্ঠলাভ করে, স্বয়ং তিনি এখন আমার গৃহে নৃত্য করিতেছেন। আমার পুত্র ভাগ্যবান্ তাই এমন সময়ে পরলোক গমন করিয়াছে। তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে। যদি একান্তই শোক সংবরণ করিতে তোমরা সক্ষম না হও, তাহা হইলে প্রভুর নৃত্য শেষ হইলে রোদন করিও। তোমাদের ক্রন্দনে যদি তাঁহার নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।" স্ত্রীগণ শান্ত হইলেন। শ্রীবাস গৃহবহির্ভাগে গমন করিয়া সংকীর্ত্তনে রত হইলেন। অচিরেই শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগসংবাদ ভক্তগণের কর্ণগোচর হইল, কিন্তু গৌরের নৃত্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই তাহা তাঁহাকে জানাইলেন না। নৃত্যান্তে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে? পণ্ডিতের গৃহে কি কোনও অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে?" ভক্তগণ তখন সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। গৌর কহিলেন—"কখন পুত্র পরলোক গমন করিয়াছে?" ভক্তগণ কহিলেন—"চারি দণ্ড রাত্রিকালে। তোমার আনন্দ-ভঙ্গভয়ে এই আড়াই প্রহর শ্রীবাস কাহারও কাছে সে কথা প্রকাশ করেন নাই!" গোবিন্দ স্মরণ করিয়া গৌর কহিলেন—"হায় এমন ভক্তের সঙ্গ আমি কিরূপে ত্যাগ করিব? আমার প্রেমে যে পুত্রশোকের তীব্রতা জানিল না, তাহাকে কিরূপে ছাড়িয়া যাইব?" গৌর কাঁদিতে লাগিলেন। "ত্যাগ" শব্দ শুনিয়া ভক্তগণ ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় আকুল হইলেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাষ সূচিত হইল।

মৃত শিশুর সৎকারের জন্য তাহাকে বাহিরে আনা হইল। মৃত শিশুকে সম্বোধন করিয়া গৌর জিজ্ঞাসিলেন—"শিশু, শ্রীবাসের গৃহ কেন ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?" মৃত শিশু উত্তর করিল—"প্রভু, তোমার নির্ব্বন্ধ অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যত দিন নির্ব্বন্ধ ছিল, ততদিন এ দেহের রস ভোগ করিয়াছি; নির্ব্বন্ধ ঘুচিয়াছে, আর এখানে থাকিবার সাধ্যও নাই। তাই অন্য নির্ব্বন্ধিত পুরে গমন করিতেছি। কেহ কাহারও পিতা নহে, কেহ কাহারও পুত্র

নহে; সকলেই আপনার কর্ম্মফল ভোগ করে। তোমার চরণে নমস্কার করিতেছি—এখন বিদায়”—বলিয়া শিশু নীরব হইল। মৃত পুত্রের কথা শুনিয়া শ্রীবাস ও ভক্তগণ শোক বিস্মৃত হইলেন।

একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে গৌর কহিলেন—“শুক্লাম্বর! আজি মধ্যাহ্নে আমি তোমার অন্ন ভোজন করিব।” শুক্লাম্বর ত্বরিত গৃহে গমন করিয়া পরম যত্নে রন্ধন করিলেন। মনে বড় সন্দেহ হইতে লাগিল—পাছে ভিক্ষুকের অন্নে গৌরের তৃপ্তি না হয়। যথাসময়ে গৌর আসিয়া ভোজন করিলেন; ভোজনান্তে কহিলেন—“আমার জীবনে এমন সুস্বাদু অন্ন কখনও খাই নাই।” কিয়ৎকাল কৃষ্ণ-কথালাপ করিয়া গৌর শুক্লাম্বরের গৃহে শয়ন করিলেন। ভক্তগণ তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন। বিজয় দাস নামক গ্রন্থ-লিখনব্যবসায়ী এক ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত পরিপাটী ছিল এবং সাধারণের নিকট তিনি “আঁখরিয়া বিজয়”নামে পরিচিত ছিলেন। গৌর তাহাকে দিয়া অনেক পুঁথি লিখাইয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। বিজয় গৌরের পাশেই শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল গৌরের হস্তস্পর্শে বিজয় চাহিয়া দেখিলেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই জ্যোতির মধ্যে নানারত্নমণ্ডিত হেমস্তম্ভসদৃশ সুগঠিত এক হস্ত, তাহার অঙ্গুলিনিচয়ের মূলদেশ শ্রীরত্ন-মুদ্রিকা-শোভিত। বিজয় বিস্মিত ও ভীত হইয়া চীৎকার করিতে উদ্যত হইলেন। গৌর তাঁহার মুখে হস্তার্পণ করিয়া নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন—“যতদিন আমি এখানে থাকিব, ততদিন এ কথা কাহাকেও বলিও না।” বিজয় হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—ভক্তগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাঁহারা দেখিলেন, বিজয় উন্মাদের মত উল্লম্ফন করিতেছে। ক্ষণকাল পরে বিজয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছান্তে সাতদিন আহার ও নিদ্রা-শূন্য হইয়া বিজয় জড়ের মত নবদ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস

হরিনাম যতই প্রচারিত হইতে লাগিল, যতই নবদ্বীপের পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র হরিধ্বনি উঠিতে লাগিল, ততই গৌরের ভক্তিবিহ্বলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবা নিশি তাঁহার নয়ন বহিয়া অবিরল অশ্রুধার পড়িতে লাগিল,হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিলেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এক মহাকম্পের উদ্ভব হইত, সময়ে সময়ে তাহার প্রাবল্যে গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। ক্রমে এমন হইল যে, তিনি কি বলিতেছেন কি করিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কখনো বলিতেন—“আমি মদন গোপাল,” কখনও বলিতেন—“আমি চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের দাস।” কখনও বা সমস্ত দিন ভরিয়া “গোপী-নাম” জপ করিতেন, আবার সময়ে সময়ে কৃষ্ণ-নাম শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন এবং বলিতেন—“কৃষ্ণ শঠ, কৃষ্ণ দস্যু ও কিতব, কে তাহাকে ভজনা করিবে?” ক্ষণে ক্ষণে “গোকুল গোকুল”, কখনও বা “বৃন্দাবন বৃন্দাবন,” আবার সময়ে সময়ে “মথুরা

মথুরা” বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। কখনও ভূমিতলে ত্রিভঙ্গিম বংশীবাদন-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া নয়নজলে তাহাকে অভিষিঞ্চিত করিতেন। কখনও কখনও রাত্রিকে দিন ও দিনকে রাত্রি বলিয়া ভুল করিতেন। জননীর সন্তোষ বিধানের জন্য সময় সময় বাহ্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকিতেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, এই প্রেম-বিহ্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কালে এমন হইল যে, বিষ্ণুপূজা করিতেও গৌর অপারক হইয়া পড়িলেন। স্নানান্তে যখন বিষ্ণুপূজার্থ গৌর উপবেশন করিতেন, তখন অবিরল ধারে অশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় বসন সিক্ত করিত। সিক্ত বসন ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধান করতঃ আবার যখন পূজা করিতে বসিতেন অমনি দ্বিগুণ বেগে অশ্রু গলিত হইয়া সে বসনও ভিজিয়া যাইত। এইরূপ কিছুক্ষণ ধরিয়া কেবল বস্ত্রপরিবর্ত্তনই চলিতে থাকিত। পূজা আর হইয়া উঠিত না। পরিশেষে গদাধরকে ডাকিয়া একদিন গৌর কহিলেন—“গদাধর, আজ অবধি তুমিই বিষ্ণুপূজা কর, আমার সে সৌভাগ্য নাই।”

একদিন গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া গৌর অনবরত “বৃন্দাবন” “গোপী” এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় এক টোলের ছাত্র উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“নিমাইপণ্ডিত! গোপীনাম-জপে কি ফল হইবে, কৃষ্ণনাম জপ কর।” গৌর ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর করিলেন—“কৃষ্ণ ত দস্যু, কে তাহার ভজনা করে? যে বিনাপরাধে বালীকে বধ করিয়াছিল, বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে পাতালে পাঠাইয়াছিল, তাহার নাম লইলে কি ফল হইবে?”—এই বলিয়া এক স্থূল বংশদণ্ড লইয়া গৌর ছাত্রকে তাড়া করিলেন। ছাত্র পলায়ন করিয়া সহাধ্যায়ীদিগকে গৌরের আচরণের বিষয় জানাইল। সকলে মহাকুপিত হইয়া উঠিল এবং আর কাহাকেও মারিতে আসিলে তাহারা গৌরকে প্রহার করিবে—এইরূপ ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা বলিতে লাগিল—

রাজা ত নহেন তেহোঁ মারিবেন কেনে।
আমরাও সমবায় হও সর্ব্বজনে॥
যদি তেহোঁ মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকল তবে না সহিব আর॥
হের সভে পড়িলাম কালি তার সনে।
আজি তিঁহো গোসাঞি বা হইলা কেমনে॥

ছাত্রগণের ষড়যন্ত্রের কথা গৌরের কর্ণগত হইল, এবং ইহার কয়েকদিন পরে এক দিন পারিষদদিগের সমক্ষে, তিনি বলিলেন,—

‘করিল পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া কফ আরো বাড়িল দেহেতে॥

বলিয়া গৌর খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ভিন্ন কেহই এই প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দের বদন বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল। ক্ষণকাল পরে নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া গৌর কহিলেন, “নিতাই, মনের কথা তোমাকে খুলিয়া বলি। আমি আসিলাম জগতের উদ্ধারের জন্য, কিন্তু দেখিতেছি, আমা দ্বারা লোকের সংহারের পথই প্রসারিত হইতেছে। কোথায় মানবের বন্ধন ছেদন করিব, না, আমা দ্বারা তাহাদের বন্ধন দৃঢ়তর

হইয়া উঠিতেছে। আমাকে মারিবার জন্য লোকে ষড়যন্ত্র করিতেছে; বৈষ্ণবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সমগ্র নবদ্বীপে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিতে চাহিতেছে; ইহাতে ত তাহাদের বন্ধন বাড়িবে। শোন নিতাই, আমি স্থির করিয়াছি, শিখাসূত্রে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। যাহারা আমাকে মারিতে চাহিতেছে, কালি তাহাদের দ্বারেই আমি ভিক্ষুকবেশে উপস্থিত হইব। তখনও কি আমার প্রতি তাহাদের রাগ থাকিবে? সমাজ সন্ন্যাসীকে ভক্তি করে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, লোকে ভক্তির সহিত আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। তাই নিতাই, গৃহস্থাশ্রম বর্জ্জন করিতে আমি কৃতসংকল্প হইয়াছি; তুমি অনুমতি দাও।" নিতাই বিষাদিত হইয়া বলিলেন—"আমি কি বলিব? তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তোমার সকল ভক্তগণকে তোমার অভিপ্রায় জানাও। তাঁহারা কি বলেন, শোন।" তখন নিত্যানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৌর মুকুন্দের আবাসে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে স্বীয় সংকল্পের কথা বলিলেন। মুকুন্দ মর্ম্মাহত হইলেন এবং বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর বলিলেন—"যদি একান্তই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, তবে অন্ততঃ দিনকতক থাকিয়া পূর্ব্বের মত কীর্ত্তন করিয়া যাও।" মুকুন্দের নিকট হইতে গৌর গদাধরের নিকট গমন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া—

অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর।
যতেক অদ্ভুত সেই তোমার উত্তর॥
শিখাসূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥
মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি হরে।
তোমার সে মত এ বেদের মত নহে॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমনে ছাড়িবে।
প্রথমে ত জননীবধের ভাগী হবে॥

গদাধরের নিকট হইতে গৌর একে একে যাবতীয় বৈষ্ণবের গৃহে গমন করিয়া স্বীয় সংকল্পের কথা সকলকে অবগত করিলেন।

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা স্মঙরি কাঁদে সর্ব্বভক্তগণ॥
কেহো বলে "সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে॥
কেহো বলে "না দেখিয়া সে কেশবন্ধন।
কেমতে রহিব এ না পাপিষ্ঠ জীবন॥
সে কেশের দিব্যগন্ধ না লইব আর।"
এত বলি শিরে কর হানে আপনার॥
কেহো বলে "সে সুন্দর কেশ আরবার।
আমলক দিয়া কি না করিব সংস্কার॥"
হরি হরি বলি কেহ কাঁদে উচ্চস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥

বিচ্ছেদশঙ্কাকুল ভক্তগণকে প্রবোধ দিয়া গৌর কহিলেন—"লোকরক্ষার জন্য আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ। অন্তরে কখনও আমি তোমাদের সঙ্গছাড়া হইব না।

সর্ব্বকাল তোমরা সকল মোর অঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি আমা সবা সঙ্গে।
নিরবধি আছে সঙ্কীর্ত্তনসুখরঙ্গে॥
এই মত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহারেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥

গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্পের কথা

ক্রমে জননীর কর্ণগোচর হইল। শুনিয়া, শচীমাতা মূর্চ্ছিত হইলেন। বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের পর হইতেই যে আশঙ্কায় তাঁহার মন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিত, গৌরের গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতে তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া যে আশঙ্কায় তাঁহার মন অনবরত আলোড়িত হইতেছিল—সে আশঙ্কা সত্য হইতে চলিল। আজ বিশ্বরূপের শোক ও স্বামিশোক বিধবার হৃদয়ে নূতন হইয়া উঠিল। বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুত্রের নিকট গমন করিয়া শচী কহিলেন—"বাপ নিমাই, আমাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না। তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমি বাঁচিব না। জননীকে কষ্ট দিলে কি তোমার ধর্ম্ম হইবে? নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি বান্ধবগণের সহিত গৃহে থাকিয়াই কীর্ত্তন কর। ধর্ম্মময় তুমি, আমাকে ত্যাগ করিয়া জগৎকে কি শিখাইবে বাপ?"

জননীর আকুল ক্রন্দনে গৌরের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল; তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—কোনও বাক্য নিঃসরণ হইল না। উত্তর না পাইয়া জননী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার আহারনিদ্রা বন্ধ হইল—শরীর কঙ্কালসার হইল। দেখিয়া, একদিন জননীকে নিভৃতে লইয়া গৌর কহিলেন—"মা, মন স্থির কর। তুমি কি কেবল আমার এই জন্মেরই মা? তুমি পৃশ্নিনামে এই ধরাধামে বিরাজ করিতে; তখনও তোমারই পুত্ররূপে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তোমারই গর্ভ আশ্রয় করিয়া আমি শ্রীরামরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। দেবহুতিরূপে কপিলরূপী আমাকে তুমিই প্রসব করিয়াছিলে। দেবকীরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে তুমিই স্তন্য দান করিয়াছিলে। আরও দুইবার আমাকে তোমার পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইতে হইবে। সংসার ত্যাগ না করিলে আমার জন্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। জগতের মঙ্গলার্থে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দেও মা।" পুত্রের কথা শুনিয়া শচীর মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

গৌর স্বীয় সংকল্পের কথা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু সাধ্বী লোকমুখে সমস্তই শুনিয়াছিলেন। রজনীতে গৌর শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় দেবী শয্যায় গমন করিয়া দুই হস্তে স্বামীর চরণদ্বয় ধারণ করিলেন। অশ্রুতে গৌরের চরণ প্লাবিত হইল। গৌর নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিয়া সাদরে প্রিয়াকে আলিঙ্গন করতঃ গৌর কহিলেন—"কাঁদিতেছ কেন প্রিয়ে?" বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বক্ষোদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। উত্তর না পাইয়া গৌর আবার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বিষ্ণু প্রিয়া কহিলেন "কেন কাঁদিতেছি, জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কি কিছুই শুনি নাই? তোমার সন্ন্যাসের সংকল্পের কথা কি আমি জানি না? হায়! তোমাকে পতি পাইয়া ভাবিতাম, আমার মত ভাগ্যবতী আর কেহ নাই। তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব। তুমি গেলে কি লইয়া আমি গৃহে থাকিব? কেমন করিয়া কণ্টকময় অরণ্যে তুমি বেড়াইবে? তোমার কুসুমকোমল শরীরে কেমন করিয়া তুমি শীতাতপ সহ্য

করিবে? আর কেমন করিয়াই বা বৃদ্ধা পুত্রবৎসলা জননীর কাতর ক্রন্দন আমি প্রতিদিন সহ্য করিব? আমার উপরই যেন তোমার মমতা নাই; কিন্তু তোমার প্রাণাধিক মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতিকে কোন্ অপরাধে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? তাঁরা যে তোমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিবে? সংসার ত্যাগ করিতে চাও? তোমার সংসার ত আমি। তবে আমারই জন্য তুমি দেশ ত্যাগী হইতে চাহিতেছ? বেশ, তুমি দেশান্তরে যাইও না—আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

আদরে বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নজল মুছাইয়া গৌর বলিলেন—"প্রিয়ে! অনর্থক গোল করিও না। কে তোমাকে বলিল আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব? যদি সন্ন্যাস করি, তৎপূর্ব্বেই তোমাকে বলিব।" বলিয়া অসংখ্য চুম্বন দানে বিষ্ণুপ্রিয়ার মানসিক ভার লঘু করিবার চেষ্টা করিলেন। সমস্ত রজনী প্রণয়ালাপে অতিবাহিত হইল। শেষ রজনীতে সাধ্বী পুনরায় ব্যাকুলভাবে কহিলেন—"আমার ভয়ে মিথ্যা কথা বলিও না। বড় ভয় হইতেছে—তুমি আমার অগোচরে পলায়ন করিবে। আমার সাধ্য নাই, তোমার কার্য্যের প্রতিরোধ করি। আমাকে প্রবঞ্চনা করিও না—নিশ্চয় করিয়া বল—তুমি সংসার ত্যাগ করিবে কি না।"

তখন হাসিতে হাসিতে গৌর কহিলেন—"প্রিয়তমে, মন দিয়া আমার কথা শোন। পিতামাতা পতি পত্নী প্রভৃতি জাগতিক সম্বন্ধ সমস্তই মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভিন্ন মানবের প্রকৃত আত্মীয় কেহ নাই। দৃশ্যমান সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মায়া; তিনিই এক পরমাত্মা, সর্ব্বত্র তিনিই প্রকাশিত। তাঁহাকে ভজনা করিবার জন্য জীব সংসারে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়াই আপনাকে ভুলিয়া যায়—ফলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমার নাম, প্রিয়ে তোমার নাম সার্থক হউক, তুমি শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণ কর—অনর্থক শোক পরিত্যাগ কর।"

তখন দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিলেন—বিশ্বম্ভর চতুর্ভুজরূপে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। স্বামীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া দেবী কহিলেন—"আমার পরম সৌভাগ্য পরমেশ্বররূপী তুমি আমাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। কিন্তু কোন্ পাপে তোমার সেবা হইতে আমি বঞ্চিত হইব?" দেবী রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া গৌর কহিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি, যেখানেই আমি থাকি, তোমার সঙ্গ কদাচও ত্যাগ করিব না।" বিষ্ণুপ্রিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

কয়েকদিন গত হইলে গৌর নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কহিলেন—"আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। ইন্দ্রাণীর নিকটস্থ কাটোয়া গ্রামে কেশব ভারতী নামে এক শুদ্ধসত্ত্ব সন্ন্যাসী আছেন; তাঁহারই নিকট আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। আমার জননীকে আর গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য ও মুকুন্দকে এই সংবাদ তোমাকে দিতে হইবে।" নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

গমনের দিন স্থির হইল। শচীদেবী নিত্যানন্দ, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও

মুকুন্দ ভিন্ন কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বদিন সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে গৌর নিজ গৃহে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। গৌরের অভিপ্রায় অবগত না হইয়াও সেদিন সকল বৈষ্ণবই তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সকলকেই পরম স্নেহে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দিয়া গৌর বিদায় দিলেন। অবশেষে খোলাবেচা শ্রীধর একটী লাউ লইয়া প্রভুর দর্শনে আসিলেন। সযত্নে ভক্তের উপহার গ্রহণ করিয়া গৌর সেই রাত্রিতেই তাহা রন্ধন করিতে জননীকে অনুরোধ করিলেন। দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে সমাগত সকলকে বিদায় দিয়া গৌর ভোজন সমাধা করতঃ শয়ন করিলেন। হরিদাস ও গদাধর তাঁহার নিকট শয়ন করিয়া রহিলেন। শচীমাতার চক্ষুতে নিদ্রা নাই—কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে গৌর শয্যাত্যাগ করিলেন। গদাধর ও হরিদাসও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। গদাধর সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, গৌর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। শচীমাতা দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া জননীর হস্তধারণ করতঃ গৌর কহিলেন "মা, তোমার জন্যই আমার সব হইয়াছে; তোমার ঋণ আমি শোধিতে পারিব না। কি করিব মা, জগৎ ঈশ্বরের অধীন; কেহই স্বতন্ত্র নহে। সংযোগ বিয়োগ সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন। আমি চলিলাম মা, আমার জন্য চিন্তা করিও না। তোমার ব্যবহার ও পরমার্থ—সমস্ত ভারই আমার রহিল।

বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বারবার।
তোমার সকল ভার আমার আমার ॥

শচী বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। জননীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া গৌর গৃহত্যাগ করিলেন। আর পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া?—তিনি স্বামীর গৃহত্যাগের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না।

রজনী প্রভাত হইল। প্রিয় ভক্তগণ অভ্যাস মত প্রভুকে দেখিবার জন্য একে একে তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলেন—মৃতার ন্যায় শচীমাতা গৃহদ্বারে পড়িয়া আছেন—তাঁহার নয়ন বিগলিত অশ্রুধারায় ভূমিতল সিক্ত হইতেছে। ভক্তগণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলে আকুলস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে গৌরের সংসারত্যাগসংবাদ সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক গৌরের গৃহে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আসিয়া দেখিল --গৃহ শূন্য, গৃহদেবতা অন্তর্হিত। আবালবৃদ্ধবনিতা বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এতদিন যাহারা বৈষ্ণবদিগের প্রতি কঠোর বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহারাও অনুতাপ ও শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। তাহারা কাতরভাবে বলিতে লাগিল—"পাপিষ্ঠ আমরা, এমন লোক চিনিতে পারি নাই।" নিন্দা থামিল, বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত হইল।

ভাগীরথী ও অজয়নদের সঙ্গমস্থলে কণ্টক নগরী (কাঁটোয়া) অবস্থিত। ক্ষুদ্র নগর, কিন্তু

অদূরে ইন্দ্রাণী বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির গৌরবে দণ্ডায়মান। নগরের জনকোলাহল হইতে দূরে গঙ্গাতীরে এক পর্ণকুটীরে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী কেশব ভারতী অবস্থান করিতেছিলেন। সমস্ত দিন পথ অতিবাহিত করিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দ সহ সায়ংকালে গৌর তথায় উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। ভারতী দেখিলেন, গৌরের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারা বহিতেছে। যুক্তকরে গৌর কহিলেন—"প্রভু! আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পাইবার উপায় তুমিই কেবল আমাকে বলিয়া দিতে পার। দয়া করিয়া আমাকে কৃষ্ণপ্রেম দান কর।" বলিতে বলিতে গৌর অধীর হইয়া পড়িলেন। দ্বিগুণ বেগে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সমগ্র শরীর প্লাবিত করিয়া দিল, ভাবের আবেগে তিনি উন্মত্তভাবে নাচিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভারতী বিমুগ্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে এই অদ্ভুত কাহিনী সমগ্র নগরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কাটোয়ার যাবতীয় নরনারী গঙ্গাতীরে ভারতীর কুটীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌর তখনও প্রেমে বিহ্বল। সকলে মুগ্ধনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহার প্রেম সেই বিশাল জনসঙ্ঘে সংক্রমিত হইল। মুহুর্মুহুঃ বিপুল হরিধ্বনি উত্থিত হইয়া ভাগীরথী তীর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সমাগত নারীগণ সেই নবীন সন্ন্যাসীর কান্তি দেখিয়া মাতৃহৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হায়! এই তরুণ যুবক সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে, কিরূপে ইহার জননী প্রাণধারণে সক্ষম হইবে?"

ভারতী এতক্ষণ অনিমেষ-লোচনে গৌরের দেহকান্তি ও তাঁহার প্রেম পুলকিত অবস্থা অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি গৌরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার প্রতীতি হইতেছে—তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। তোমার গুরু হইবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে মনে হইতেছে, লোকশিক্ষার জন্য তুমি এই অকিঞ্চনকেই গুরুপদে বরণ করিবে।" গৌর কহিলেন—"আমাকে ছলনা করিও না, প্রভু! অবিলম্বে আমাকে দীক্ষা দান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের পন্থা দেখাইয়া দেও।" সমস্ত রজনী কৃষ্ণ-কথালাপে অতিবাহিত হইল। প্রত্যুষে গৌর চন্দ্রশেখরকে সন্ন্যাসের আয়োজন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। আয়োজন অচিরেই সম্পন্ন হইল। গৌর শিখা মুণ্ডন করিতে বসিলেন।

তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিলা তখনে॥
খুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
হাত নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারী লোক।
তাহারাও কাঁদিতে লাগিলা করি শোক॥
কেহ বলে কোন্ বিধি সৃজিলা সন্ন্যাস।
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস॥

নাপিত কিছুতেই শিখা মুণ্ডন করিতে

পারে না, সমস্ত দিনের পর সায়ংকালে তাহার ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ হইল। ক্ষৌরান্তে স্নান করিয়া গৌর কহিলেন—"আমি স্বপ্নে কোনও মহাজনের নিকট হইতে এই মন্ত্রটী প্রাপ্ত হইয়াছি।" বলিয়া স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্রটী ভারতীর কাণে কাণে কহিলেন। ভারতী বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এই মন্ত্রই ত বটে—তুমি আমার মু দিয়া মন্ত্রটী বাহির করিতে চাও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া গৌরের কর্ণমূলে কথিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেন। সমাগত জনগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন অরুণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া গৌরের দেহ স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আপাদমস্তক চন্দনচর্চ্চিত দিব্যমাল্যশোভিত দণ্ডকমণ্ডলু-কর প্রেমপুলকিতাশ্রু সেই গৌর সন্ন্যাসীকে যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইল। গৌরের বক্ষোদেশে হস্তার্পণ করিয়া ভারতী কহিলেন—"জগৎবাসী জনগণকে কৃষ্ণনাম দিয়া তুমি তাহাদিগের চৈতন্য বিধান করিয়াছ—সেজন্য আজি হইতে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইল।"

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

চলিত ভাষার অপ্রচলিত ব্যাকরণ

কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিচারে এ পৃথিবীটা "সর্ব্বৈব মায়া"; তবে এ বেজায় ভুলের মধ্যে পণ্ডিতের "সর্ব্বৈব মায়া" কথাটি অবশ্য খাঁটি সত্য। কোন কোন মুগ্ধবোধওয়ালার বিচারে আমাদের বাঙ্গলা ভাষাটাই ভুল। যদি বৈদিক পিতৃলোক হইতে অঙ্গিরা ঋষি এ কালের কোন mediumএর ঘাড়ে চাপিয়া সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলা পর্য্যন্ত সকল ভাষার সমালোচনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক—সকল যুগের সকল ভাষাকেই ভুল বলিতে পারিতেন। রামী যখন রাগে গর্ গর্ করিয়া নথ-নাড়া দিতে দিতে পাড়ার পোড়ারমুখোদিগকে গোল্লায় যাইতে বলে, তখন যে তাহার গালি খায়, সে যদি বোপদেবের শিষ্যও হয়, তবুও সে ব্যক্তি মর্ম্মে মর্ম্মে ঐ গালির তীব্রতা অনুভব করে। কিন্তু বেচারা যদি গাল্ খাইয়াই ব্যাকরণ খুলিয়া বসে, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে যে, সবটাই ভুল। চণ্ডীদাসের প্রিয় "রামী"ও ভুল, ক্রোধ অর্থে "রাগ" শব্দটাও ভুল, "গর্ গর্"ও ভুল, বৈদিক অবৈদিক সকল অলঙ্কারের পর্য্যায়েই "নথ" ভুল, "পোড়ার" সঙ্গে "মুখোর" সমাস ভুল এবং "গোল্লায়"ও ভুল। পণ্ডিতটি ব্যাকরণ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহার "খোকার মা" একেবারে "নীলাম্বরী" শাড়ীর আঁচলটি "কোমর"এ জড়াইয়া "খেঙ্গরা" হাতে লইয়া "হন্-হন্" করিয়া ছুটিবেন।

বাঙ্গলা ভাষাটাকে সাধু করিবার চেষ্টায় (সাধ্বী লিখিলাম না) আমাদের খাঁটি বাঙ্গলা-

দেশী "কাণ্ডারী" শব্দটাকে "কাণ্ডারিন্" করিয়া কেহ কেহ উহাকে সংস্কৃত রচনায় জুড়িয়াছেন; সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কশূন্য দেশী "প্রজাপতি"কে কেহ কেহ, কেবল বর্ণের মহিমায় ভুলিয়া, সংস্কৃত পতঙ্গ বলিয়া ত ভাবিয়াছেনই, তাহা ছাড়া আবার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের মাথায় উহাকে ব্রহ্মার আসনে বসাইয়া নমস্কার করিতেও ছাড়েন না। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা লোকদিগকে দেশী কথায় "আইবুড়" বলিয়া থাকি; এবং বিবাহের পূর্ব্বে "আইবুড়ভাত" দিয়া থাকি। আয়ুর জন্য অন্নের প্রয়োজন হইলেও, কোন স্মৃতিপুরাণে আয়ুবৃদ্ধির অনুষ্ঠানে এইরূপ অন্ন দিবার ব্যবস্থা নাই; তবুও টানিয়া-হেঁচড়াইয়া "আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন" নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের "এত বড় আইবুড় ঝি"কে সংস্কৃত নাম দিতে গেলে তিনি "আয়ুর্ব্বৃদ্ধা দুহিতা" হইয়া উঠেন। কি চমৎকার অর্থই হয়! একবার একজন লোকের ফোড়া দিয়া "গল্ গল্" করিয়া পূঁয বাহির হইতেছিল দেখিয়া, একজন পণ্ডিত "গল্ গল্" কথাটিকে ভাল ভাষায় ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলেন; এবং শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া যঙন্তপ্রকরণের আশ্রয় লইয়া বলিলেন যে—স্ফোটকটা "জঙ্গল্যতে"।

ব্যাকরণের এ জঙ্গলে মাথা দিবার সাহস আমাদের নাই; কিন্তু আমাদের মাঝখানে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ মহাশয়ের বিলক্ষণ আছে। তিনি এক দিকে টোলের পণ্ডিতদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন; অন্য দিকে আবার বুক ফুলাইয়া সকল পাশ-করা শিক্ষিতেরই পাশে দাঁড়াইতে পারেন। তিনি পরিহাস করিতেছেন না বলিয়াও, যে নিগূঢ় পরিহাসে "ব্যাকরণ-বিভীষিকা" নাম দিয়া বাঙ্গলা প্রয়োগের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক বোপদেবের শিষ্যকেই সংযত হইতে হইবে। সংস্কৃত না জানিয়া যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত কথা ভুল প্রয়োগে জুড়িয়া থাকেন, তিনি তাঁহাদিগকেও কশাঘাত করিতে ছাড়েন নাই। আমরা ইংরেজিওয়ালারা সকলেই পিঠে হাত দিয়া অল্প বিস্তর জ্বালা অনুভব করিতেছি। ললিত বাবুর সমালোচনার সাধারণ রীতি এবং উদ্দেশ্যের কথা লইয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এ প্রবন্ধে মুখ্যতঃ তাঁহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত অবলম্বনে গোটাকতক শব্দের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা এবং ব্যুৎপত্তির বিচার করিব।

(১) পুত্তলিকা, পুত্তলঃ এবং পুত্তলী অন্যান্য অনেক সংস্কৃত শব্দের মত খাঁটি দেশী পুতুল বা পুত্লির (হিন্দী) ঘষা মাজা সংস্করণ হইবারই সম্ভাবনা; কারণ, কোন বৈদিক শব্দেই উহার কোন মূল নাই। কিন্তু আমাদের ঘোড়া যদি "ঘোটক" হইতে পারিয়াছে, এবং বিলেই বা বিল্লী যদি দ্রাবিড়ের গৃহ হইতে আসিয়া "বিড়াল"রূপে বৈদিক মার্জ্জারকে তাড়াইতে পারিয়াছে, মৎস্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাণ্ড্যদিগের "মীন" যখন আমাদের উপভোগ্য হইতে পারিয়াছে, তখন যে "পুত্তলঃ" ও "পুত্তলী" বঙ্গ হইতে বহু দূরদেশেও অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার প্রয়োগ দোষযুক্ত হইবে কেন? কেহ বিদেশে মরিয়া গেলে, স্বদেশে (স্বগৃহে) তাহার "পুত্তল-দহন"-কার্য্যের

ব্যবস্থা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্মৃতি-গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঠাকুর গড়িবার জন্য পুত্তলী-বিধি পাওয়া যায়! বঙ্গভাষার সহিত অপরিচিত মহারাষ্ট্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থ (যথা— আপ্তের কোষ-গ্রন্থ) দেখিতে পারেন। যখন অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের পুত্তল-পূজা শব্দ দ্বারা idolatry বুঝায়, তখন "পৌত্তলিকতা" শব্দের জন্য রাজা রামমোহনকে কেহ দোষী করিতে পারেন না,—কৃষ্ণকমলের মত সুপণ্ডিত ব্যক্তিও পারেন না। "পুত্তলিকা" এবং "পৌত্তলিকতা" শুদ্ধ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) পণ্ডিতকুলগৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয় "উভচর" কথা চালাইয়া বরং পাণ্ডিত্যই দেখাইয়াছেন। "উভ" ধাতু বৈদিক ভাষায় যে ভাবে আছে, তাহা হইতে পরবর্ত্তী সংস্কৃতের "উভৌ" কিংবা "উভয়" বড় সহজে করা যায় না; তবুও সুবিধার জন্য তাহা হইয়াছিল। বৈদিক "উভ" ইরাণের ভাষায় বা জেন্দ ভাষায় খাঁটি adverb "উব" রূপে পাওয়া যায়; উহা প্রাচীন প্রয়োগের উত্তম দৃষ্টান্ত। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক এবং ইরাণী প্রয়োগ দেখিয়া "উভ" এবং "উব"কে গ্রীক amphi এবং লাটিন ambo'র সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ স্থলে নূতন শব্দ গড়িবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি অতি প্রাচীন ভাষা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাতে দোষের কথা হয় নাই। প্রাচীন ভাষা হইতে যখন আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, তখন কি কেবল জয়দেবের আমলের কিংবা কালিদাসের আমলের সংস্কৃতকেই শুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া তাহা হইতেই শব্দ সংগ্রহ করিতে হইবে? আমাদের কাছে সকল প্রাচীনই সমান; নূতন ব্যবহারের সময় যাহা অধিক উপযোগী মনে হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বৈদিক ভাষার অনেক শব্দ সুন্দর ভাবপ্রকাশক, অথচ সেরূপ ভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দ সংস্কৃতে নাই; সেরূপ স্থলে বৈদিক শব্দ অগ্রাহ্য হইবে কেন?

(৩) অক্ষয়কীর্ত্তি অক্ষয়কুমার দত্ত "সৃজন" কথা ব্যবহার করিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় রচিত প্রাচীন পুঁথি ও ছাপা গ্রন্থে গ্রন্থারম্ভে বন্দনা বা দেবস্তুতিতে অনেক "সৃজন পালন" ব্যবহৃত ছিল। ললিত বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমাদের ভাষায় যে সকল অপভ্রংশ শব্দ প্রচলিত আছে, সেগুলিকে কদাচ অশুদ্ধ বলা চলে না। সকল প্রাচীন প্রাকৃত এবং এ কালের প্রচলিত ভাষাগুলি অপভ্রংশ শব্দ লইয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাজেই অপভ্রংশ দূর করিতে গেলে একেবারে কম্বলের লোম বাছা হইবে। পণ্ডিতেরা এই অসার উৎপাটন-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অপভ্রংশ শব্দগুলিকে রেহাই দিলে বাঁচা যায়।

(৪) বাঙ্গলায় "আত্মা"ই হইল শব্দ,— "আত্মন্" নয়; "পিতা"ই শব্দ,—"পিতৃ" নয়; কাজেই পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক ব্যবহৃত "আত্মাপুরুষ" ও "পিতাস্বরূপ" ভুল বাঙ্গলা নয়। তাঁহার "দুরাচারিণী"র কথা লিঙ্গবিচারের সময় বলিব। বাঙ্গলায় ছেঁচা বা সেঁচা কথা প্রচলিত আছে; উহাকে ভদ্র আকার দিতে গিয়া একেবারে একটা

নূতন শব্দ ব্যবহারের বেলায়, "সিঞ্চন" চালাইতে পারা যায় না। 'সক্ষম" শব্দটিও একটা অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি। এ সকল প্রয়োগ বড়লোকের হাতে হইলেও, উহা ভুল প্রয়োগ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইংরেজি ভাষাতেও বড় লোকের ভুল প্রয়োগগুলি ভুল বলিয়াই বালকদিগকে শিখাইয়া দেওয়া হয়; এবং বিদ্যালয়ের বালকেরা ঐ ভুল প্রয়োগ কোথায় আছে, তাহা শিক্ষা করে; কিন্তু ভাষায় ঐ ভুল চালাইতে উপদিষ্ট হয় না। আমাদিগকেও ঠিক তাহাই করিতে হইবে। বায়ু যে পথে আসে, তাহাকে বাতায়ন বলিতে পারি বলিয়া, কোনরূপেই "জালায়ন" ব্যবহার করা চলে না। এরূপ অদ্ভুত প্রয়োগ কিন্তু আমার চোখে পড়ে নাই। জানালায় গরাদে না থাকিলে বরং উহাকে "চোরায়ন" বলা চলে; কিন্তু "জালায়ন" একেবারে উৎকটরূপে মৌলিক; আমাদের খাঁটি বাঙ্গলার "মর্চ্চিভঙ্গ" কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা ধরিতে না পারিয়া উহাকে উৎকট সংস্কৃত আকারে "মূর্চ্ছাভঙ্গ" করিলে যথার্থই উপহাসাস্পদ হইতে হয়, আমাদের প্রাচীনকালের দেশরীতিতে দেবর ভাসুরে প্রভেদ ছিল না; সম্ভবতঃ প্রতিবেশী কোন আর্য্যেতর জাতির ব্যবহার হইতে ভাসুর-ভাদ্রবধূর নূতন শিষ্টাচারের প্রচলন হইয়া, ঐ দুইটি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে "ভাসুর" শব্দটির যে ব্যুৎপাদক শব্দ আছে, উহা একটি নূতন গড়া শব্দ। "জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য" কথা হইতে "ভ্রাতৃশ্বশুর" শব্দের সৃষ্টি করিয়া উহার অপভ্রংশে "ভাসুর" চালান হইয়াছে। সম্বলপুর অঞ্চলের ভাষায় স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে "দেড়শুর" বলে; ঐ শব্দটি "জ্যেষ্ঠ" এবং "শ্বশুর" এই দুই শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন। ঐরূপ "ভ্রাতৃবধূ" হইতেও "ভাদ্রবধূ" হইতে পারে; কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। বধূবর্গের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী কল্যাণ-কামনার পাত্রী বলিয়া, হয় ত বধূর পূর্ব্বে "ভদ্র" কথাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই ভাবের সূচনার জন্য অনেক শব্দের পূর্ব্বে "ভদ্র" পদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমানের কথাটা অনুমান বলিয়াই পাঠকেরা গ্রহণ করিবেন।

আমাদের অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে যখন "মমতা" চলিতে পারিয়াছে, তখন উত্তম ভাব প্রকাশক "আমিত্ব" প্রভৃতি শব্দ দোষযুক্ত নহে। যোগশাস্ত্রে "অস্মিতা" ব্যবহৃত আছে। সর্ব্বনাম শব্দের বিভিন্ন বিভক্তির পদের সহিত সমাস করিয়া, অথবা ঐ পদে নূতন তদ্ধিত যোগ করিয়া শব্দ গড়িবার প্রথা বৈদিক যুগেও যখন ছিল, তখন এ প্রথা সনাতন। "ম-বস্থ" (আমার মত), "যুষ্মা-দত্ত" (তোমা কর্ত্তৃক দত্ত), "অস্মৎ-সখি" (আমাদের সহচর), "অস্মে-হিতি" (আমাদের জন্য সংবাদ) প্রভৃতি শব্দ খাঁটি বৈদিক। ক্ষুব্ধ শব্দটির একটা অশ্লীল পারিভাষিক অর্থ আছে বটে, কিন্তু উহাই একমাত্র অর্থ নয়; "ক্ষুভিত" এবং "ক্ষুব্ধ" তুল্য মূল্যে সমর্থিত হইতে পারে। তাহা নূতন ব্যবহারের "মর্ম্মন্তুদ" কিংবা "সজ্জ" স্থলে 'সজ্জিত" অন্যান্য ভুলের মত নিশ্চয়ই পরিহার করিতে হইবে; কিন্তু বাঙ্গলার খাঁটি "কৃষক"কে

তাড়াইলে চলিবে না! প্রায় সর্ব্বত্রই ললিত বাবুর বিচারের সহিত আমার একমত বলিয়া, কেবল যে সকল স্থলে অল্পবিস্তর মতভেদ আছে, সেই সকল স্থলেরই উল্লেখ করিলাম।

আমাদের দেশে, আমরা যাহাদের নাম না ধরিয়া "ইনি", "উনি" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, তাঁহাদের জাতিবাচী হইলে অনেক স্থলে "ইনী" প্রত্যয়ই চলিয়া থাকে। যে সকল শব্দ একেবারে বাঙ্গলা হইয়া গিয়াছে, তাহারা বংশগৌরবে এই "ইনী" প্রত্যয়কে উপেক্ষা করিতে পারে না। তবে যেখানে সংস্কৃত হইতে আস্ত একটা শব্দ আনিতে হয়, সেখানে বাঙ্গলা প্রত্যয় ব্যবহার করা চলে না; কিন্তু প্রাচীনরূপ বজায় রাখিতে গেলে যেখানে খট-মট হইয়া উঠে, সেখানে সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দও অপভ্রংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য কিন্নরীর পাশে "অপ্সরী" বেশ শোভা পায়। বালা শব্দটি ওড়িয়াতে "বালী" হইয়া গিয়াছে, যথা—"সে 'চতুরী বালী' সার বাছি নেলা হলদি কালি," চাঁড়াল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "চাঁড়ালনী" করিতেই হইবে। কিন্তু সংস্কৃত করিয়া চণ্ডাল লিখিলে, "চণ্ডালনী" চলিবে না।

বাঙ্গলা ছাড়িয়া যেখানেই আমরা সংস্কৃত ধরিতে চাই, আমরা যে কেবল সেখানে অনেক ভুল করিয়া বসি, তাহাই নয়; ভাষাকেও বেজায় জটিল কুটিল করিয়া তুলি। ভাষা হইল কেবল ব্যাকরণ লইয়া—শব্দ লইয়া নয়; এবং ব্যাকরণের খাঁটি মূল হইল সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদ। কোন প্রকারেই বাঙ্গলা সর্ব্বনামগুলিকে উহার পিতৃপুরুষদের মত চেহারায় খাড়া করা চলে না; এবং খাঁটি বাঙ্গলা ক্রিয়া পরিত্যাগ করিতে গেলেও মহা বিভ্রাট্ উপস্থিত হয়। আমরা শুইতেছি, চলিতেছি, খাইতেছি বেশ অবাধে এবং সহজ নিয়মে; কিন্তু শোয়ায় খাওয়ায় যাঁহারা সন্তুষ্ট না হইয়া শয়ন করেন, কিংবা ভোজন করেন, সেখানে করা, হওয়া প্রভৃতি বাঙ্গলা ক্রিয়াপদ লাগাইয়া কোনরূপে তাঁহারা শব্দগুলিকে দাঁড় করাইয়া রাখেন। বাঙ্গলা যখন স্বতন্ত্র ভাষা, তখন উহার প্রাকৃতিক ক্রিয়াপদ পরিত্যাগ করিলে ভাষাকে খোঁড়া করিতে হইবে। অযথা অতিরিক্ত 'করা' 'হওয়া' দিয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা বড়ই জটিল পন্থা; যথা-সাধ্য ঐ পন্থা ছাড়িতেই হইবে। যেখানে শ্রুতিমধুর করিয়া নামধাতু গড়া চলে, সেখানে সংস্কৃতকে বাঙ্গলা করা যায়। আমি শয়ন, ভোজন প্রভৃতি একেবারে তুলিয়া দিতে বলিতেছি না; কেবল উহার পরিমিত ব্যবহার চাই, এই কথাই বলিয়াছি।

ললিত বাবু যেরূপ ক্ষমতা এবং যোগ্যতা দেখাইয়া আমাদের শব্দসিন্ধু মথিতেছেন, এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার ব্যাকরণ এবং কোষ-গ্রন্থে যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রচলিত প্রয়োগ বুঝাইতেছেন, তাহাতে আমাদের এ কালের উচ্ছৃঙ্খলতা বেশী দিন টিকিবে না, মনে হইতেছে। আমার এ সমালোচনা বহু বিলম্বে হইল; কিন্তু অবস্থার বিচারে নিত্যই যাহার প্রয়োজন, সে কার্য্যে বিলম্বের কথা হয় ত বড় উঠিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

উৎপলা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্দিগ্ধচিত্তা

রাজপুরী হইতে গৃহে ফিরিয়া সে রাত্রিতে মঞ্জুলা আর বিলম্ব করিল না, একেবারে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। মাতা অলোকা আসিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কোনরূপ অসুখ করিয়াছে ?"

মঞ্জুলা মাথা নাড়িয়া অসুখের কথা অস্বীকার করিল।

"তবে আসিয়াই কেন শুইয়া পড়িলে ?"

"বড় পরিশ্রম হইয়াছে।"

অলোকা বুঝিতে পারিলেন, মঞ্জুলা অধিক কথা বলিতে চাহে না ; তিনি কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। বলিলেন ;—

"মহাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে ?"

"হইয়াছে।"

"ভিক্ষু মুক্ত হইবেন ?"

"দেবী আশা দিয়াছেন।"

"কবে মুক্ত হইবেন ?"

"রাজাধিরাজ ফিরিয়া আসিলে দেবী তাহার নিকট ভিক্ষুদেবের জন্য অনুরোধ করিবেন। রাজাধিরাজ অবশ্যই দেবীর কথা রাখিবেন।"

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

"চিত্রা আসিয়া তোমার গা টিপিয়া দিবে ?"

"না, মা ; একবার চঞ্চলাকে ডাকিয়া দিও।"

অলোকা উঠিলেন, কি ভাবিয়া পুনরায় বসিলেন ; বলিলেন—

"তুমি চলিয়া গেলে সোমদত্ত আসিয়াছিলেন, তোমার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।"

মঞ্জুলা কোন কথা বলিল না।

"তিনি তোমার জন্য মুক্তা-বসান একটা কেয়ূর রাখিয়া গিয়াছেন।"

মঞ্জুলা অতি বিরক্তির সহিত বলিল ;—

"মা, আমি তোমাকে একদিন বলিয়াছি, কাহারও কোন উপহার গ্রহণ করিব না!"

অলোকা অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন ;—

"তিনি কোন মতেই ছাড়িলেন না, রাখিয়া গিয়াছেন।"

"কালই তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিও।"

"তিনি কি মনে করিবেন ? অসম্মান বোধ করিবেন না ?"

"কেয়ূর গ্রহণ করিলে আমাদের সম্মান বাড়িবে ?"

"হয়ত তিনি আর এখানে আসিবেন না।"

"মা, আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি।"

অলোকা কন্যাকে চিনিতেন, সোমদত্তের কথা ছাড়িয়া দিলেন ; কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ;—

"তাহার পর অসঙ্গ সেন আসিয়াছিলেন।"

মঞ্জুলা মুখ উঁচু করিয়া চাহিল।

"প্রমীত সেনের বন্ধু অসঙ্গ সেন ?—কেন আসিয়াছিলেন ? কিছু বলিলেন ?"

"তাঁহাদের ভারী বিপদ। প্রমীত সেন আজও ফিরিয়া আসেন নাই। শুনা যায়, তাঁহারও দণ্ড হইবে। তাঁহার স্ত্রী চিন্তায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসঙ্গ সেন আরও অনেক কথা বলিলেন।"

মঞ্জুলা শয্যায় উঠিয়া বসিল, একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল ;—

"দেবীকে তাঁহার কথাও বলিয়াছি।"

"কোন ফল হয় নাই ?"

"দেবী অভয় দিয়াছেন, প্রমীতসেন মহাশয় রাত্রি প্রভাতে মুক্ত হইবেন। কিন্তু—"

"কি মঞ্জুলা ?"

মঞ্জুলার মুখ আরক্ত হইল। মঞ্জুলা বলিল ;—

"কোন দিন তাঁহার সহিত পরিচয় নাই ; এক দিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার জন্য অনুরোধ করাতে দেবী যেন কেমন বিস্মিত হইলেন।"

"বটে ? এক কথা, সেদিন তিনি অমন বিপদ হইতে তোমাকে রক্ষা করিলেন, কত কষ্টে শিবিকা সংগ্রহ করিয়া তোমাকে গৃহে পাঠাইলেন ; কিন্তু তুমি একটী দিনও তাঁহাকে গৃহে আমন্ত্রণ কর নাই ! অমন উপকারীর সঙ্গে আর একটী দিন ও দেখা কর নাই ! তিনি কি মনে করিতেছেন ?"

"সে দিনের কথা কি, মা, তুমি কাহাকেও বলিয়াছ ?

"না। তুমি ত নিষেধ করিয়াছিলে।"

"সে ঘটনা কাহাকেও জানাইও না। কয়েকটা দিন যাক্, তাঁহাকে একবার সংবাদ দিব।—তিনি আসিবেন কি ?"

"কেন আসিবেন না ?"

"কি করিয়া বলিব ?"

"সংবাদ পাইলে তিনি অবশ্যই আসিবেন। আজ তোমার শরীর অসুস্থ ; আমি এখন যাই, তুমি বিশ্রাম কর।"

অলোকা সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

প্রমীত সেনের বন্ধু অসঙ্গ সেন কোন কোন দিন মঞ্জুলার গৃহে আসিয়া থাকেন। তিনি অবশ্যই মঞ্জুলার কথা তাঁহার নিকট বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রমীত সেন ত মঞ্জুলার গৃহে আসেন নাই। মঞ্জুলার নাম নগরে সম্ভ্রান্ত-সমাজে একেবারে অপরিচিত নহে। মঞ্জুলা প্রসিদ্ধ গায়িকা, ব্যবসায়ী গায়িকা নহে। পরিচিত সম্ভ্রান্ত পুরস্ত্রী-গৃহে সাদর আমন্ত্রণে মঞ্জুলা কখনো কখনো গীত শুনাইয়া থাকে। কোন কোন বিশেষ দিনে তাহার নিজগৃহে সমাগত আত্মীয় সুহৃদ্ বন্ধু-বান্ধবকে মঞ্জুলা গীতবাদ্যে আপ্যায়িত করিত। মঞ্জুলা ধনশালিনী, অপূর্ব্ব রূপবতী, বিদুষী যুবতী। তাহার সঙ্গে দেখা এবং বাক্যালাপের জন্য নগরের ধনী মানী বিদ্বান্ অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু প্রমীত সেন ত কোন দিন তার গৃহে যান নাই !

শয্যায় শুইয়া পড়িয়া মঞ্জুলা ভাবিতে লাগিল, আসিবেন কি ? তাঁহার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ? কিছু না !

চঞ্চলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া মঞ্জুলার পায়ের কাছে বসিল এবং ধীরে ধীরে তাহার পা টিপিয়া দিতে লাগিল। মঞ্জুলাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন, আজ তোমার কি হইয়াছে ?"

"কিছুই ত হয় নাই !"

"রাজপুরী হইতে আসিবার সময় তুমি একটী কথাও বল নাই, ঘরে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছ, তোমার সে স্ফূর্ত্তি নাই ! ঠাকরুণ বলিলেন, তোমার অসুখ হইয়াছে।"

"অসুখ কিছুই না, পরিশ্রমে গা-টা অলস বোধ হইতেছে।"

"ভাল, তুমি বলিলে, দেবী ভরসা দিয়াছেন, ভিক্ষু মুক্তি পাইবেন। প্রমীত সেন মহাশয়ের কি হইবে ?"

"তাঁহার জন্যও কি আমরা ভাবিব ? তিনি আমাদের কে ?"

"তোমার কেহ নহেন, কিন্তু তিনি দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের আশ্রয়। তুমি কোন দিন তাঁহাকে দেখ নাই, কিন্তু নগরের দীন দরিদ্র, অন্ধ আতুর সকলে তাঁহাকে চিনে। পরের জন্য প্রাণ দিতে যাইয়া এমন লোকের প্রাণদণ্ড হইবে ?"

ক্ষণকালের জন্য মঞ্জুলা নীরব হইয়া রহিল, শেষে বলিল ;—

"এমন পুণ্যাত্মাকে দেবতা রক্ষা করিবেন ! আচ্ছা, আজ দেবীর সঙ্গে যে যে কথা হইল, তুই কি তাহা শুনিতে পাস্ নাই ?"

"আমি কেমন করিয়া শুনিব ? আমি ত কক্ষের বাহিরে ছিলাম !"

"চঞ্চল, প্রমীত সেন মহাশয়ের গৃহসংসারের কথা তুই কিছু জানিস্ ? তাঁহার স্ত্রীকে তুই দেখিয়াছিস্ ?"

"প্রমীত সেন মহাশয়ের স্ত্রী উৎপলা দেবীর পিত্রালয় আমাদের গ্রামের নিকট। ছেলেবেলায় অনেকবার তাঁহাকে দেখিয়াছি ! তাঁহার বিবাহের পরও তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

"দেখিতে কেমন ?"

"পরমা সুন্দরী ; অমন সুন্দরী আমার চক্ষে—"

"কি বল্লি ?"

"অমন সুন্দরী আমি কমই দেখিয়াছি।"

"তবে অমন সুন্দরী আরও দেখিয়াছিস্ !"

চঞ্চলা হাসিয়া বলিল,—"প্রতিদিনই দেখি।"

"প্রতিদিনই দেখিস্ ? তবে ত অমন সুন্দরী বড় দুর্ল্ভ !—তোষামোদ রাখ্। কত বয়স ?"

"তোমার চেয়ে দু এক বৎসর বড় হইতে পারেন।"

"ভালবাসা কেমন ?"

"অতি বেশী।"

"অতি বেশী কিরে ?"

"বন্ধন বড়ই দৃঢ়। গণ্ডীর বাহিরে এক পা বাড়াইবার সাধ্য প্রমীত সেন মহাশয়ের নাই। এত লোক তোমার এখানে আসেন, তিনি ত কোনদিন আসেন নাই !"

"কেন আসেন না, কি করিয়া জানিব ?"

"তুমি জান না, আমরা জানি।"

"কি জানিস্ ?"

"দৃঢ় বন্ধন। উৎপলা দেবীর অনুমতি না পাইলে তাঁহার এক পা চলা কঠিন।"

"এখানে আসিতে কিসের ভয় ?"

"সন্দেহের নিকট কোন্ স্থান নিরাপদ ?"

"কিসের সন্দেহ ?"

"বলিব ?—তোমার রূপগুণের খ্যাতি

নগরময় রাষ্ট্র ; বোধ করি, উৎপলা দেবীও তাহা শুনিয়াছেন ; তাই তাঁহার ভয়—”

“দূর্, অভাগী ! তবে উৎপলা দেবী ভাল বাসে না। ভাল বাসিলে কি সন্দেহ আসিতে পারে ?”

“তুমি তা কি করিয়া জানিবে ? তুমি ত কোন দিন ভালবাস নাই !”

“বেশ আছি ; পরের অধীন হইব ?”

“উৎপলা দেবী কি পরের অধীন ?”

“তাঁহার মত দিবারাত্রি সন্দেহে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব ?”

“তা উৎপলা দেবীর বাড়াবাড়ি বড় বেশী।”

“ছেলে মেয়ে ক’টি ?”

“তাঁহার সন্তান হয় নাই।”

“সন্তান হয় নাই ?”

“না। তাঁহার সুখের রাজ্যে সেই এক অভাব।”

“এ অভাবে কার দুঃখ অধিক ?—স্বামীর, না স্ত্রীর ?”

“আশা আছে, সুতরাং দুঃখের অবস্থা এখনো আসে নাই। কিন্তু উৎপলা দেবীর চিত্তে চিন্তার ছায়া দেখা দিয়াছে !”

“তা বুঝিলি কিসে ?”

“যাগ যজ্ঞ পূজা বলির বাহুল্য হইয়াছে। শুনিয়াছি, কাশী হইতে এক মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সিদ্ধ মাদুলী গোপনে আনান হইয়াছে !”

“তুই এত কথা কেমন করিয়া জানিস্ ?”

“ও পাড়ায় আমার জানা শুনা লোক আছে, তাহাদের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছি।”

“কি কি কথা ?”

“সে অনেক কথা, আর একদিন বলিব। অনেক রাত হইল, তুমি আহার করিবে না ? আমি এখন যাই, তাহার ব্যবস্থা করি গিয়া।”

চঞ্চলা সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। মঞ্জুলা পুনরায় শয্যায় শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, আসিবেন কি ? আমি যে কে, তাহা ত তিনি জানেন না! উপকৃতার আমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করিবেন ? তখন সেইঝড়-বৃষ্টি-দুর্য্যোগময় রাত্রিকালে অস্পষ্টালোকে দৃষ্ট প্রমীতসেনের তেজোময় দীপ্ত চক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাট, বলশালী শৌরলাবণ্যময় বাহু এবং বিশাল বক্ষের চিত্র বারংবার মঞ্জুলার চিত্তপটে উদিত হইতে লাগিল।

আর, দেবী আজ এ কি কথা বলিলেন ?—বালিকা নও, ভিক্ষুণী নও, সংসারী হও !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রমীতের মুক্তি।

ধর্ম্মপাল মহাশয় প্রমীত সেনকে চিনিতেন। সামান্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে প্রমীত সেন অতি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। কিন্তু ভিক্ষুর অপরাধ অতি গুরুতর ; প্রমীত সেনও তাহাতে সংসৃষ্ট। বিশেষতঃ রাজাধিরাজ স্বয়ং বিচার করিবেন, বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় অনেক ইতস্ততের পর প্রমীত সেনকে গৃহে ফিরিবার অনুমতি ধর্ম্মপাল দেন নাই। কিন্তু প্রমীত সেন রাজাধিরাজের অনুগৃহীত, ধর্ম্মপাল তাহা জানিতেন। সেইজন্যই তাঁহাকে রীতিমত কারারুদ্ধ হইতে হয় নাই। কারাগারের যে অংশে কারাধ্যক্ষের বাস, প্রমীত সেন দুই দিন সসম্মানে সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

তৃতীয় দিন প্রভাতে কারাধ্যক্ষ প্রমীত সেনকে বলিলেন,—

"আপনার মুক্তির আদেশ আসিয়াছে, আপনি যথাস্থানে যাইতে পারেন।"

প্রমীত সেন বিস্মিত হইলেন, বলিলেন ;—

"রাজাধিরাজ মৃগয়া হইতে ফিরিয়াছেন কি ?"

"না।"

"তবে বিচারের পূর্ব্বে কেমন করিয়া আমার মুক্তিলাভ হইল ?"

"তাহা আমি জানি না। আমি আদেশ পাইয়াছি, আপনি স্বচ্ছন্দে গৃহে যাইতে পারেন।"

"কাহার আদেশে মুক্তি পাইলাম ?"

"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের আদেশে।"

প্রমীত সেন আরও বিস্মিত হইলেন। অনেক অনুরোধেও প্রথম দিন ধর্ম্মপাল মহাশয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন নাই ; রাজাধিরাজও নগরে ফিরিয়া আসেন নাই ; তবে কেমন করিয়া কাহার অনুরোধে এই অকস্মাৎ মুক্তি ?

কারাধ্যক্ষ হাসিয়া বলিলেন—

"গৃহে ফিরিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে নাকি ?"

"আপনার অনুগ্রহে এরূপ কারাবাসে আমার কোন কষ্ট হয় নাই ; তবে গৃহে ফিরিয়া যাইতে কাহার সাধ না হয় ? আমার মুক্তির আদেশ কখন আসিয়াছে ?"

"রাত্রি-শেষে।"

"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের আদেশ ?"

"হাঁ।"

"রহস্য কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি ?"

"না।"

"ভিক্ষু মহাশয়েরও মুক্তির আদেশ আসিয়াছে ?"

"না, তেমন কোন আদেশ পাই নাই।"

"তিনি কি অবস্থায় আছেন ?"

"নিভৃত কারাগারে।"

"তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে পারি ?"

"ক্ষমা করিবেন। সেখানে অন্য লোকের যাওয়া নিষেধ ; নাস্তিক বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণগণের সম্বন্ধে রাজাধিরাজের নির্ম্মম শাসন। সহজে তাহাদের অব্যাহতি নাই,—আপনি তাহা জানেন।"

"তাঁহাকে রক্ষার কি উপায় ?"

"দেবতার অনুগ্রহ।"

"দেবতা প্রসন্ন হউন ; ভিক্ষু নিরপরাধী। তিনি যেন মুক্তি লাভ করেন।"

প্রমীত সেন বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন বেলা হইয়াছে। রাজ-পথে লোক-চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। প্রমীত সেন কতকদূর অগ্রসর হইলে, ভিক্ষুকবেশধারী এক-জন লোকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। লোকটী ভিখারী বটে, সম্ভবতঃ অন্ধ,—যষ্টি অবলম্বনে ধীরে ধীরে পথ নির্ণয় করিয়া চলিতেছিল। প্রমীতের পদশব্দ পাইয়া বলিল ;—

"মহাশয়, কুমুদনিবাস কতদূর ?"

প্রমীত বলিলেন—

"অনেক দূর। তুমি সেখানে যাইবে ?"

"হাঁ।"

"তুমি কি অন্ধ ? চোখে দেখিতে পাওনা ?"

"দৃষ্টি প্রায় নাই।"

"সেখানে তোমার আত্মীয়, আপনা কেহ আছে ?"

"সংসারে এক ভগ্নী ব্যতীত আমার আর কেহ নাই ; কিন্তু দুই জনের অন্নের সংস্থান নাই। শুনিয়াছি, কুমুদনিবাসে প্রমীত সেন মহাশয় আছেন।"

"প্রমীত সেনের নিকট কেন যাইতেছ ?"

"আপনি এই নগরে বাস করেন ?"

"হাঁ, এই নগরেই আমার বাস।"

"তবে কি আপনি জানেন না যে, প্রমীত সেন দীন-দরিদ্রের বন্ধু। আমি ত বহুদূর হইতে তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

প্রমীত সেনের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"তুমি এ নগরে এই নূতন আসিয়াছ ?"

"গত সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়াছি।"

"রাত্রিকালে কোথায় ছিলে ?"

"পথের নিকটেই এক গাছের তলায়।"

"প্রমীত সেনের নাম কোথায় শুনিলে ?"

"গ্রামে থাকিতেই শুনিয়াছি।"

"তোমার কি নাম ?"

"বাদল।"

"তোমাদের গ্রাম কতদূর ?"

"তিন দিনে আমি সেখান হইতে আসিয়াছি ; আমি চোখে ভাল দেখিতে পাই না।"

"আমার সঙ্গে চল, আমি সেই দিকেই যাইতেছি।"

প্রমীত ধীরে ধীরে চলিলেন। ভিখারী তাঁহার পদশব্দানুসরণ করিয়া চলিল।

কিছু দূর চলিতেই প্রমীত দেখিতে পাইলেন, অশ্বারোহণে সোমদত্ত সেই দিকেই আসিতেছেন। রাজধানীতে সোমদত্ত একজন প্রসিদ্ধ লোক। ধনী মানী বিলাসী সমাজে তাঁহার বিশেষ নাম। অমন সৌখীন, অমন ব্যয়ী লোক নগরে আর ছিল না। কিন্তু অতিব্যয়ে পিতৃপিতামহ-সঞ্চিত প্রভূত সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল ; তথাপি ব্যয়ের লাঘব ছিল না। কেহ কেহ বলিত, দ্যূত-গৃহে উপার্জ্জিত অর্থসাহায্যে সোমদত্ত এখন ব্যয়-লালসা চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রমীতের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। প্রমীত বলিলেন—

"নমস্কার, মহাশয়, এত সকালে কোথায় যাইতেছেন ?"

"সে কি ! আপনি যে ! কখন মুক্ত হইলেন ?"

"এই কিছু কাল হইল।"

"রাজাধিরাজ ত এখনো নগরে ফিরেন নাই। কেমন করিয়া আপনার মুক্তিলাভ

"আমিও তাহা জানিতে পারি নাই। অবশ্যই কেহ আমার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া থাকিবেন।"

"কে ?"

"বলিতে পারি না।"

"আপনার মুক্তিতে নগরবাসী সকলেই আনন্দিত হইবে। ভিক্ষু উপগুপ্তও মুক্তিলাভ করিয়াছেন ?"

"না, এখনো সেরূপ কোন আদেশ হয় নাই। আপনি কোথায় যাইতেছেন ?"

"গ্রামে, বিশেষ প্রয়োজনে যাইতেছি। ক্ষমা করিবেন ; আপনার সঙ্গে কুমুদনিবাসে

যাইয়া আনন্দোৎসব করিতে পারিলাম না। শীঘ্রই দেখা হইবে।”

পরস্পর বিদায়সূচক অভিবাদন করিয়া যে যাঁহার গন্তব্য পথে চলিলেন। নগরে সকলেই প্রমীত সেনকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার মুক্তিতে সোমদত্ত যে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কে এমন অনুরোধ করিল! প্রথম দিনেই ত বহুলোকে ধর্ম্মপালকে ধরিয়াছিল, তিনি কাহারও কথা রাখেন নাই। তখন সোমদত্তের মনে পড়িল, গত পরশ্ব মৃগয়া যাত্রার দিনেই ত ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং প্রমীতসেন কারাগারে নীত হইয়াছিলেন। তাহার পরদিন—গত কল্যই ত তিনি মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ম কমলপুরে গিয়াছিলেন। দেখা হয় নাই, মঞ্জুলা রাজ্ঞী কারুবকীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। মঞ্জুলাই কি দেবীকে অনুরোধ করিয়াছিল? যাহার তাহার কথায় ধর্ম্মপাল কখনই প্রমীত সেনকে ছাড়িয়া দেন নাই। সোমদত্ত পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন, মঞ্জুলাই কি রাজ্ঞীকে ধরিয়াছিল? রাজ্ঞীই কি ধর্ম্মপালকে বলিয়া দিয়াছেন? মঞ্জুলা কি প্রমীত সেনকে চিনে? কবে, কোথায় দেখা হইল? প্রমীত ত কোন দিন মঞ্জুলার গৃহে যান নাই। মঞ্জুলা কেয়ূর ফিরাইয়া দিয়াছে, উপহার গ্রহণ করে নাই। সোমদত্তের চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি অশ্ব চালাইয়া গ্রামাভিমুখে দ্রুতবেগে চলিলেন।

এদিকে প্রমীত সেনও কুমুদনিবাসে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। আত্মীয় কুটুম্ব দাস দাসী পরিজনবর্গের আনন্দ-কোলাহলে, হুলুধ্বনি ও মঙ্গল শঙ্খরবে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। কি সুযোগে, কি উপায়ে, কাহার অনুরোধে তাঁহার মুক্তিলাভ হইল, তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল, কিন্তু তাহার মীমাংসা হইল না। প্রমীত অন্তঃপুরে পৌঁছিলে উৎপলা সহর্ষ-গদগদ-নেত্রে স্বামীকে প্রণাম করিয়া এবং আলিঙ্গিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“কি উপায়ে আসিলে?”

“তোমার পুণ্যবলে!”

“আমার পুণ্যবল ত আছেই, নতুবা তোমার দাসী হইতে পারিয়াছি কেমন করিয়া?”

“দাসী? আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গলময়ী দেবী তুমি! আজ কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, সে কি বড় বেশী কথা?”

“তুমি কি বলিতেছ?”

“বলিতেছি—সুকৃতিবলে যদি কোন দিন স্বর্গবাসের অনুমতি পাইয়া প্রবেশপথেও উপস্থিত হই, আর তোমার স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি আমাকে ইঙ্গিত করে, আমি স্বর্গবাস তুচ্ছ করিয়া তোমার কাছে ফিরিয়া আসি! তুমি যে শত স্বর্গ হইতেও আমার প্রিয়; আর এমনই তোমার শক্তি!”

কম্পিত-কলেবরা উৎপলার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। একান্ত নির্ভরে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন;—

“মাধবী, জল আন্, পা ধুইয়া দিব। কাপড় আন্, পাখা আন্। মালতীকে ডাক্, পূজার ঘরে ষোড়শ উপচারের আয়োজন করিতে হইবে।”

অন্ধ বাদল প্রমীতের সঙ্গে সঙ্গেই সেই

পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সে কতকক্ষণ বিস্মিত হত-বুদ্ধি হইয়া রহিল; শেষে একজন দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল;—

"এ কাহার বাড়ী?"

"কাহার বাড়ী তুমি জান না?"

"না। আমি আজ এই প্রথম নগরে আসিয়াছি।"

"তুমি কোন্ বাড়ী খুঁজিতেছ?"

"প্রমীত সেন মহাশয়ের বাড়ী।"

"তুমি কি অন্ধ?"

"প্রায় অন্ধই বটে, দৃষ্টি খুব কম।"

"বধির?"

"না।"

"এই ত প্রমীতসেন মহাশয়ের বাড়ী!"

"এই বাড়ী! তিনি কোথায়?"

"এই মাত্র অন্তঃপুরে গেলেন।"

"অন্ধ অতুরে কি তাঁহার দেখা পায়?"

"তোমাকে ত তাঁহার সঙ্গেই আসিতে দেখিয়াছি!"

"তিনি প্রমীত সেন?"

"হাঁ, তিনিই ত হাত ধরিয়া তোমাকে এখানে আনিয়া বসাইয়াছেন!"

বাদলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মস্তক নত করিয়া বাদল ভূমিতে প্রণাম করিল। যে প্রমীত সেনের নাম শুনিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর নগরে যাত্রা করিয়া-ছিল, তিনি স্বয়ং পথ দেখাইয়া হাতে ধরিয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে আনিয়াছেন!

কিছুকাল পরেই ভৃত্য দারুক আসিয়া বাদলকে ভিতরে লইয়া গেল এবং তাহার স্নান পরিধান, আহার অবস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিল। [ক্রমশ।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

কলিকাতা কায়স্থ-প্রধান স্থান হইলেও স্থানীয় আদিমবাসীদিগের বিবরণে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ইংরাজের ব্যবসায়-সূত্রে স্থানীয় তন্তুবায়-সমাজই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় প্রাধান্য লাভ করেন। ইংরাজ বণিক্‌গণের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ ইঁহারাই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ দেশের প্রস্তুত সূতার ক্রয়-বিক্রয় সূত্রেই ব্যবসায় হিসাবে বঙ্গের নানাস্থানের তন্তুবায়-পরিবার পল্লীবাস উঠাইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন; সে আজ দেড়শত বৎসরের কথা। এই দেড় শত বৎসরে কলিকাতা তন্তুবায়-প্রধান স্থান হইয়া উঠে, এবং এখনও এই কলিকাতা রাজধানীর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-প্রাধান্যের মাঝখানেও শিক্ষা, সম্পদ্, পদমর্য্যাদা হিসাবে ইঁহাদের স্থান প্রধান জাতি সকলের মধ্যে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে।

খৃঃ ১৮৩৮ অব্দে কলিকাতায় হরীতকী-বাগানে স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ শীল জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ের ছাত্র-মণ্ডলী মধ্যে মহেন্দ্রনাথ প্রধানগণের অন্যতম ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এম্ এ, ও বি এল্ পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণীরূপে মহেন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি, অধুনা লোকান্তরিত চন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়গণের সমসাময়িক ও ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সতীর্থ; বিদ্যাবত্তায় ও আচার-আচরণে তিনি কোম্‌টের শিষ্য ছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে বিচারকগণের নিকট তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্রবিষয়ক গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পায়। সে সময়ের উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ তাঁহাকে দার্শনিক ব্যবহারজীব (Philosopher Pleader) বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। তাহার অনেকগুলি কারণও বর্ত্তমান ছিল; তিনি যে কেবল ইংরাজী-সাহিত্যে উত্তম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, ফরাসি, জার্ম্মান্ ও আরও কোন কোন পাশ্চাত্য-ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। এরূপ বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞতার কারণ এই যে, তিনি অতিশয় জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন। ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেও তিনি কখনই যে সে মাম্‌লা গ্রহণ করিতেন না। আদালতের ন্যায়-বিচারে যাহা টিকিবে, কেবল সেইগুলি লইতেন। উকীল বলিয়া নিজের বুদ্ধিবলে বিচারালয়ে "হয় কে নয়" ও "নয় কে হয়" করিতে কখনও প্রয়াস পাইতেন না; এজন্য বিচারকগণ তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একদা আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, এত অল্প বয়সে মহেন্দ্রনাথের জীবনলীলা শেষ হওয়াতে দেশের আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে আইনের মর্য্যাদা-জ্ঞান অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু এক আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। যে মহাত্মার কেবল ৩২ বৎসর বয়সের সময়ে এরূপ উচ্চ প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হইয়াছিল, জানি না, তিনি দীর্ঘজীবী হইলে, বঙ্গদেশ কতই না অমৃতফলের অধিকারী হইত।

ব্রজেন্দ্রনাথ এমনই উচ্চ-স্বভাব-সম্পন্ন-পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নয় বৎসর বয়সে সাত বৎসর বয়সের কনিষ্ঠ সহোদর ব্রজেন্দ্রনাথকে লইয়া পিতৃহীন হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই ইঁহাদের জননীর লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এক্ষণে এই উভয় ভ্রাতা মায়ের এক স্বজাতীয়া পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মায়ের 'পরিচারিকা' কথাটা ব্যবহার করা অন্যায় হইল; এই মহিলাই জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা মায়ের স্থান অধিকার করিয়া বালকদ্বয়ের বাল্য-সুখ-সুবিধা ও আরাম-বিরামের এক মাত্র অবলম্বন হইয়া রহিলেন। এই বৃদ্ধা আজিও জীবিত থাকিয়া গৃহের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ত্তমান।

মাতুলালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক দুই ভ্রাতার লেখাপড়া চলিতে লাগিল। সেখানে অবস্থানকালে, ইঁহাদের ক্লেশে দিনপাত ও বিদ্যার্জ্জন করিতে হইত। অবশ্য সে অসুবিধার জন্য কাহাকেও কোন দোষ দিবার কারণ ঘটে নাই, সে বাটীর তখনকার সাংসারিক অবস্থা-নিবন্ধনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন, "ছোট ভাইটিকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্যই সেই অল্পবয়সে আমাকে বাধ্য হইয়া সজ্জনের পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; আমি বেশ জানিতাম যে, আমার

আচার-আচরণ ও ব্যবহার-দোষে ছোট ভাইটির অনিষ্ট হইতে পারে।” আশ্চর্য্য, একজনকে বাঁচাইতে ও ‘মানুষ’ করিতে আর একজন—কেবলমাত্র দুই বৎসরের বড় বালক—আত্ম-সংযম ও আত্মরক্ষার পথে ধীর ও স্থির পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দুটি ভাই, উভয়ে উভয়ের সখা, সুহৃদ্, মা-বাপ হইয়া পরস্পরকে রক্ষা করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুঃখদারিদ্র্য ও অসুবিধা নিবারণ জন্য বড় ভাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহু উপাধিলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া চাকরি গ্রহণ করিলেন, বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন করিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্স্, এল্-এ ও বি-এ পরীক্ষা-গুলি এক এক করিয়া শেষ করিলেন। এম্ এ পরীক্ষার সময়ে অধুনা-লোকান্তরিত গৌরী-শঙ্কর ও অসাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত হেষ্টি সাহেবের মধ্যে ছাত্র ব্রজেন্দ্রনাথকে লইয়া একটু ছোটখাট বিবাদ বাধিয়া গেল। গৌরী শঙ্করের ইচ্ছা—ব্রজেন্দ্রনাথ গণিতশাস্ত্রে এম্ এ পরীক্ষা দেন, হেষ্টির ইচ্ছা—ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শন-শাস্ত্রে এম্ এ পরীক্ষা দেন। এই ছাত্র-যুদ্ধে শেষে হেষ্টি সাহেবেরই জয় হয়, গৌরী-শঙ্করের ক্ষোভের সীমা রহিল না। তবে উত্তরকালে ব্রজেন্দ্রনাথ, গৌরীশঙ্কর ও হেষ্টি সাহেব উভয়েরই যে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই গৌরবের বিষয়। তাঁহার গণিতের গবেষণা দর্শনশাস্ত্র হইতে কোন অংশে অল্প নহে; গৌরীশঙ্কর এই আনন্দ সম্ভোগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয়ে চতুর্থ-শ্রেণীর বালক, তখনই তিনি বীজগণিত (Algebra) ও জ্যামিতি অধ্যয়নে উচ্চ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বীজগণিতের বাইনোমিয়াল্ থিয়োরেম্ ও সংখ্যাতত্ত্ব (Theory of Numbers) শিখিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে এই সকল উচ্চ গণিত-তত্ত্বের আলোচনায় অসামান্য দক্ষতা-দর্শনে গৌরীশঙ্কর বালকের উচ্চ পরীক্ষাদানের সময়ের অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। আর জেনারেল এসেম্বিলীর অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবও আর একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় বালক ব্রজেন্দ্রনাথের উপর নিয়ত স্নেহ-দৃষ্টি রাখিতেন। সে ঘটনাটি এই:—একদা প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে, ব্রজেন্দ্র-নাথ অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের নিকট পাঠের জন্য তর্কশাস্ত্রের একখানি অতি কঠিন পুস্তক চাহিয়া বসিলেন। সাহেবশিক্ষক সে পুস্তক দুর্ব্বোধ্য বলিয়া দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ছাত্রের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া পুস্তক দিয়া বলিয়াছিলেন, “নাও, কিন্তু কিছুই বুঝিবে না।” ছাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ তৃতীয় কি চতুর্থ দিবসে পুস্তক ফিরাইয়া দিবার সময়ে শিক্ষক বলেন, “কেমন, যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা ঠিক ত?” ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আমি বুঝিয়াছি।” শিক্ষকসাহেব দর্শন-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি বালক ব্রজেন্দ্রনাথের এই উত্তর শুনিয়া অসম্ভববোধে একটু অপ্রস্তুত হইয়া, পুস্তকান্তর্গত বহু তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া উপযুক্ত উত্তর পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া অপরিমেয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই ব্রজেন্দ্রনাথকে লইয়া

গৌরীশঙ্করে ও সাহেব অধ্যক্ষে ছাত্রযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এরূপ দ্বন্দ্ব যে ছাত্রের পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এরূপ ঘটনা ঘটেও অল্প।

ব্রজেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের বিবরণ আমাদের দেশে অধুনা লোক-বিরল ঘটনা বলিয়া মনে হয়। বিশ্বসংসারের সকল বিভাগের জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ একাধারে একটি মানুষে মেলে ইহা কল্পনা করা সহজ হইতে পারে; কিন্তু কোন দিন কোন কালে সহজসাধ্য বলিয়া স্বীকৃত ও পরিগৃহীত হয় নাই। জগতের জ্ঞানচর্চ্চাপ্রিয় বিদ্বজ্জন-সমাজেও ব্রজেন্দ্রনাথের ন্যায় অসামান্য পণ্ডিত ও মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি বিরল বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠক-মণ্ডলীর কৌতূহল কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, তাই আমরা অতি অল্প কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। নিম্নলিখিত ঘটনার অনেকগুলিই আমাদের বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের যে গ্রন্থে জগদ্ব্যাপী যশোপার্জ্জন, সেই গ্রন্থের মূল উপকরণগুলির অধিকাংশ ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণাজাত সংগ্রহের ফল। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক সংবাদ, তথ্য ও মীমাংসা, ব্রজেন্দ্রনাথের করতলগত আমলকের ন্যায় বিরাজ করে। ইঁহার পাঠ-শক্তি এত অল্পবয়সে এরূপ অসাধারণত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল যে, ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময়ের মধ্যে ইংরাজী গদ্য-সাহিত্য পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। এল্‌ এ পরীক্ষার পাঠ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যের পদ্যাংশ কাব্য-গ্রন্থ সকল শেষ করেন। কোন্ গ্রন্থে কি কি বিষয়ের আলোচনা আছে, সে সকলের উদ্দেশ্য ও মীমাংসা সবই তাঁর কণ্ঠস্থ। কোন্ বিষয়ের আলোচনা সম্বন্ধে কোন্ কোন্ গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হইবে, সে বিষয় পরামর্শ-প্রার্থীকে তৎক্ষণাৎ গ্রন্থ ও গ্রন্থাংশ এক এক করিয়া বলিয়া দেন, সে বিষয়ে একটুও ভাবিবার প্রয়োজন হয় না।

পল্লব-গ্রাহিতা দোষে, দীর্ঘকাল হইতে এ দেশের শিক্ষিত-সমাজ হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কোনও বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করিলেই, তিনি পণ্ডিত-পদ-বাচ্য হইয়া উঠেন। তাই আজ কাল অনেক উপাধি-শোভিত বিদ্যাশূন্য ব্যক্তির স্বাধীন বিচরণ সহজ হইয়াছে। এমন দিনে একটি বহুবিদ্যার, প্রভূত জ্ঞানের ও সারতত্ত্বের উপাসক দেখিলে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। বঙ্গজননীর তপস্যার ফলে, ভারতের ভাগ্যবলে আমরা ব্রজেন্দ্রনাথে সেই উচ্চ আদর্শের আভাস পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ব্রজেন্দ্রনাথ একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক।

অধ্যাপক মহালানবিশ শারীরতত্ত্ব-বিষয়ক শাস্ত্রে বিচক্ষণ ব্যক্তি। একদা তিনি দার্জিলিং যাত্রা কালে কুচবিহার যাত্রী অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্র-নাথের সহিত শিয়ালদহ হইতে একত্র এক গাড়ীতে যাত্রা করেন। প্রফেসর মহালানবিশ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান হিসাবে শারীর তত্ত্বের মূল বিষয়গুলি অবশ্যই উচ্চ দার্শনিকের জানা আবশ্যক; কিন্তু যে সকল খুঁটিনাটি সংবাদ কেবল শারীর-তত্ত্ববিদেরই জানা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়, অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্র নাথ সেগুলিরও পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখিয়া

থাকেন। এটা তাঁহার পক্ষে অসামান্য গুণপণার পরিচয় বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। এরূপ পূর্ণাঙ্গ সংবাদ সংগ্রহ অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমরা ব্রজেন্দ্রনাথকে সিটী-কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে আসীন দেখিতে পাই। তিনি তথা হইতে মধ্য-প্রদেশের নাগপুর মরিশ-কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। সেখান হইতে তিনি পুণ্যশ্লোকা মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-নাথ কলেজে অধ্যক্ষ হইয়া স্বদেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। তৎপরে মহারাজ কুচবিহারাধি-পতি-প্রতিষ্ঠিত কলেজে অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিয়া এতাবৎকাল কার্য্য করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ নামীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে ব্রতী হইলেন।

বহরমপুরে অবস্থানকালে স্থানীয় পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয়ের নিকট ব্রজেন্দ্র-নাথ উচ্চ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র-শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই পণ্ডিত মহাশয়কে আমরা দেখিয়াছি। ইনি ভারতবিখ্যাত কাশীপ্রবাসী অসামান্য পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন; আর সে সময়ে কাশীপ্রবাসী বঙ্গীয় পণ্ডিতকুলের শিরোভূষণ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয় বলিয়াছেন,—"ছাত্র অনেক দেখিয়াছি ও পড়াইয়াছি, কিন্তু ছাত্রকে পড়াইতে গিয়া পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য অর্জ্জন ও ছাত্রের নিকট পদে পদে ভ্রম-সংশোধনের প্রয়োজন ইতিপূর্ব্বে আর কখন ঘটে নাই। ব্রজেন্দ্রনাথকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি ও তজ্জাত শ্লাঘাই আমার পরম পুরস্কার।" অধুনা-স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে অতি আগ্রহের সহিত বেদবিষয়ে ও উপনিষদের অতি উচ্চ-তত্ত্ব সকলের আলোচনায় ব্রজেন্দ্রবাবুর গৃহে নিবিষ্টচিত্তে নিযুক্ত দেখিয়াছি। বেদপাঠের শিক্ষা স্বতন্ত্র। আমরা ভাগ্যবশে সময়ে সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে বেদপাঠ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু বলিতে কি, ব্রজেন্দ্রবাবুর মন্ত্রোচ্চারণ ও পাঠ-সৌন্দর্য্য এতই হৃদয়কে মাতাইয়া তুলে, সে পাঠের স্বরলহরী এতই মত্ততা আনয়ন করে, যে, তাহা না শুনিলে, বর্ণনায় ব্যাখ্যাত হইবে না। কেহ যদি কোন সুযোগে তাঁহার বেদপাঠ শ্রবণের ব্যবস্থা করিতে ও দশজনকে শুনাইতে পারেন, তাহা হইলেই কেবল আমাদের এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইঁহাকে বিদ্যার জাহাজ বলিলে, মনের ভাব ঠিক প্রকাশ পায় না; সাগর বলিলেও, মনের ভাব ঠিক প্রকাশ পাইল বলিয়া অনুভব করি না। দৈবক্রমে বিদ্যার একটা অনন্ত পারাবারের সম্মুখে পড়িয়াছি বলিয়া অনুভব করিলেই, যেন ঠিক মনের ভাব প্রকাশ পাইল বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানের অনন্ত পারাবার কেন বলি, তাহা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। ব্রজেন্দ্রনাথ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইলেও তিনি বোডলিয়ান লাইব্রেরী (Bodleian Library) মাত্র নহেন, তিনি বিদ্যা ও জ্ঞানের রত্নাকর। পাকা ডুবুরিরা রত্নাকরে রত্নলাভ করে, সমুদ্রবারিই

মানব-সংসারের ধনধান্য বৃদ্ধির হেতুরূপে বর্ত্তমান। ব্রজেন্দ্রনাথও বহু বহু বিদ্বান্ ব্যক্তির জ্ঞান-ভাণ্ডার নিত্য পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। তিনি বিদ্যাবিতরণে কল্পতরু। আর তাঁহার জ্ঞানালোচনার পদ্ধতি তাঁহার ব্যক্তি-গত উচ্চ জ্ঞানের পোষণকার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত, এই বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান সঞ্চয়ের ফলে তিনি নিজে পরিপুষ্ট ও প্রবল। তিনি প্রশ্ন-জিজ্ঞাসুকে কেবল হিগেল বা ক্যাণ্ট, গ্রিণ বা হ্যামিল্টন্ কি বলিয়াছেন, কিং বা সাংখ্য কি বলেন, পাতঞ্জল মীমাংসার সমাধান কি, ইহাই বলিয়া দিয়া প্রশ্ন শেষ করেন না। সে বিষয়ে নিজের বক্তব্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন, শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও অর্জ্জনের বিশেষত্ব ইহাই। এই বিশেষত্বে ব্রজেন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ।

ব্রজেন্দ্রনাথের সবই ভাল। এক এক করিয়া তিন চারি বার তাঁহার পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতার্জ্জন ঘটিয়াছে, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ যে নিরীহ বাঙ্গালী, সেই নিরীহ বাঙ্গালীই আছেন; জীবনের চাল-চলন, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ দেশের লোকের সঙ্গে বেশ খাপ্ খায়। কেবল তাই কি? কিছু দিন একত্র বাস করিলে দেখা যাইবে, স্বভাব-সারল্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বালক সদৃশ, নিতান্ত ভাল মানুষ। আজ কাল ভাল মানুষ বলিলে গালাগালি হয়। হয় হউক, তবুও ব্রজেন্দ্র-নাথ নিরীহ ভাল মানুষ। চরিত্র, বিদ্যা, পদমর্য্যাদা, আত্মসম্মানি-বোধে জাতি হিসাবে কেহ কোন প্রকারে আক্রমণ করিলেই কেবল বাঞ্ছনীয় মর্য্যাদা-রক্ষায় ব্রজেন্দ্রনাথ বিনয়-শিষ্টাচার কিঞ্চিৎ অতিক্রম করিতে বাধ্য হন, নতুবা সর্ব্বত্র তিনি সে কালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণের ন্যায় শান্ত ও আত্মস্থ ব্যক্তি; কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে, কখনও নিজ হইতে পঠিত ও অর্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন না। সহজ কথায় সহজ ভাবে সকলের সঙ্গে আদরালাপ করিবেন, কিন্তু অকারণ কখনও কোন প্রশ্ন উঠাইবেন না। কিন্তু তাঁহার স্বভাব-সারল্য তাঁহাকে সকল সময় নীরব থাকিতে দেয় না। যখনই তাঁহার গৃহে গিয়াছি, কেহ না কেহ তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সে সময় তাঁহার স্নানাহারের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান থাকে না। আর মাতৃ-দেবী-সদৃশ জ্যেষ্ঠ সহোদর ক্ষুণ্ণ ও কাতর হইয়া অধীর পাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন রোম নগরীতে প্রাচ্য সাহিত্য, শাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা-সভা (Oriental Congress) আহূত হইয়াছিল। কুচ্‌বিহারাধিপতির প্রতিনিধি-রূপে তদীয় কলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় রাজব্যয়ে রোমের প্রাচ্য সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সভার জন্য তাঁহার লিখিত "বৈষ্ণবধর্ম্ম বনাম খৃষ্টীয় ধর্ম্ম" নামক নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও তথায় পঠিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধের মৌলিকতা, গবেষণা ও তুলনায় বিচার-পদ্ধতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। রোমের বৈঠকে যে সকল পণ্ডিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ডাক্তার শীলের বিষয়সকলের আলোচনা-পদ্ধতি, গভীরতা, সারবত্তা ইত্যাদির ভূরি ভূরি পরিচয় পাইয়া এরূপ চমৎকৃত হইয়া-

ছিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে নানা আকারে তাঁহার বহু প্রশংসা প্রকাশিত হয় এবং সেইজন্য বহু লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সমক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার বিস্তৃতি বহুদূরব্যাপী হইতেছে বলিয়া রাজা প্রজা উভয়েরই বিশ্বাস হইলেও, তাহা ভ্রান্ত-ধারণা-প্রসূত। তিনি সেই কমিটির সম্মুখে লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মুসলমান আমলে ও তৎপূর্ব্বে এদেশে শিক্ষার প্রসারতা ও গভীরতা—উভয় বিষয়ই শ্রেষ্ঠ ছিল। তুলনায় এখনকার শিক্ষা এখনও অনেক অল্প।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-বিধি বিধিবদ্ধ হইলে পর, লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের গভর্ণমেণ্ট ইহার পরিস্ফুটন ও পোষণ জন্য অপর এক কমিটি নিযুক্ত করেন। সে কমিটিতে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্র-নাথ শীল এই তিন জন বাঙ্গালী সদস্য ও অপর তিন জন ইংরাজ সদস্যের স্থান হইয়াছিল। সিমলা শৈলে সে কমিটির অধিবেশন হয়। সেখানে এই ছয়জনে মিলিত হইয়া বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ব্যবস্থার পাণ্ডু-লিপি প্রস্তুত করিলে পর, গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ ও মঞ্জুর করেন। স্যর্ আশুতোষ ও ডাঃ শীলের মধ্যে বিশিষ্ট পরিচয় পূর্ব্ব হইতে সূচিত ও পরিপুষ্ট হইলেও, এই সিমলা শৈলেই একত্র কর্ম্মসূত্রে উভয়ে উভয়ের অত্যধিক গুণানুরাগী হইয়া পড়েন। এই ক্ষেত্রেই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির এক প্রশস্ততর দ্বার উদ্‌ঘাটনের সুযোগ ও সুবিধা-সাধনে ঐ দুই মহাত্মা মিলিত হইয়াছিলেন। আজ সেই মণিকাঞ্চনযোগের শুভ ফল দেশবাসী নানা আকারে উপভোগ করিতেছে। ইহা আমাদের উচ্চ শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লণ্ডন নগরীতে এক বিশ্বমানব-সভা আহূত হইয়াছিল। সে সভায় ডাঃ শীলের আসন অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুটি কারণে তাঁহার প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। প্রথম কারণ—তাঁহার উপর মর্ত্ত্যজগতের মানবসমষ্টির দৈহিক গঠনগত জাতীয়তার আলোচনার ভার অর্পিত হয়। অপরাপর অংশ ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রবন্ধ একত্র করিয়া যে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতেছে, সেই গ্রন্থের মূলাংশ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গভীর গবেষণার ফলরূপে গ্রন্থের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। তাহার পর প্রথম দিন সভাধি-বেশনের সময়ে সভার দ্বারোদ্‌ঘাটনভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। যে সভার অনুষ্ঠান পাশ্চাত্য জগতের শক্তিপুঞ্জের পৃষ্ঠ-পোষিত, এবং যে সভার পরিচালকদলে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন, লর্ড মর্লি সদৃশ অসংখ্য পদস্থ ব্যক্তি, সেই সভার প্রথম দ্বারোদ্‌ঘাটন-ভার আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত, ইহা কি জাতীয় হিসাবে আমাদের অল্প শ্লাঘার বিষয়? এই অনুষ্ঠানক্ষেত্রে

তিনি আমাদের জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ডাক্তার শীল রোমের প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে এবং লণ্ডনের বিশ্বমানব-মিলনকেন্দ্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর নানা মতের খণ্ডন-প্রয়াসে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার মতের অনুমোদন ও পোষণ করিয়াছেন, ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের অনেক বিষয়ে পূর্ব্ব পোষিত মত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ কাণ্ট্, হিগেল্, মিল্, স্পেন্সার, মার্টিনিউ যাহা বলেন, তাহাই বেদবাক্য বলিয়া ধরিয়া রাখিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদেরই স্বদেশীয় একজনের সাধনার ফলে সেই সকল মত অনেক স্থলে সংশোধনোপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সে বিষয়ের সংবাদ অল্প লোকই রাখেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় কথা যে বিধাতা কৃপা করিয়া এই মহাত্মাকে দীর্ঘজীবী করিলে, এতাদৃশ অসাধারণ-শক্তিশালী পুরুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চায় এখনকার সভ্য জগৎ যে অতীত ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবে, শ্রদ্ধাবনত-দৃষ্টিতে ভারত-রত্নাকরে দৃষ্টিপাত করিবে, এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহাকে উচ্চ জ্ঞান-তত্ত্বের আশ্রয়স্থল বলিয়া স্বীকার করিবে, ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের এক ব্রজেন্দ্রনাথে এক জগদীশচন্দ্রে, এক প্রফুল্লচন্দ্রে ও এক রবীন্দ্রনাথে তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। পারস্পর্য্য রক্ষা করিবার লোক চাই। উপযুক্ত উত্তর-সাধকের অভাবে দেশ সর্ব্বদাই উঠিতে গিয়া পড়িয়া যায়। আর আমরা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" নিমজ্জিত হই। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, এই সকল অধীত বিদ্যার প্রবল বন্যার বারিপ্রবাহ ধরিয়া রাখিবার উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন। আক্ষেপের বিষয়, পল্লবগ্রাহিতা দোষ নিবন্ধন কেহ এক রতি, কেহ এক কণা লইয়া, তাহাকেই মূলধন করিয়া নানা আকারে প্রলাপের ন্যায় প্রচার করিতে ব্যস্ত হন। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞান ও শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা ও উপদেশ দুর্ব্বোধ্য, সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। এই কথা যে একেবারে ভুল, ইহার যে কোন অর্থ নাই, তাহা নহে, অর্থ আছে। তাঁহার আলোচনা ও মীমাংসা বুঝিবার প্রয়োজন-বোধই বড় অল্প। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, সহরের ও দেশ-দেশান্তরের জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার ভবনে, তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন তবে যাঁহারা কণায় তুষ্ট, রত্তিতেই রতি মতি রাখিয়া আনন্দিত, তাঁহাদের নিকট ডাঃ শীল দুর্ব্বোধ্য সন্দেহ নাই। তবে কলেজে ছাত্র পড়াইতে তিনি দুর্ব্বোধ্য নহেন। এ দেশের ও পাশ্চাত্য-দেশের সুধী-মণ্ডলীর সমক্ষেও তিনি দুর্ব্বোধ্য নহেন। আর আমরা মূর্খ হইলেও এবং তাঁহার সকল কথা সুন্দররূপে বুঝিতে না পারিলেও যে একেবারে বুঝি না, তাহাও নহে; তাঁহার অভিব্যক্ত অনেক তত্ত্ব—অনেক আলোচনা বেশ বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি বলিয়াই তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও

সাধু ব্যক্তির সঙ্গলাভ মহামূল্য সম্পদ্ বলিয়াই মনে করি।

দীর্ঘ-সুদীর্ঘ কালের পরিচয় ও সঙ্গ-সূত্রে এই মহাত্মার বিষয়ে এত কথাই আজ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টার আলোচনা অগ্রে করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মানুষটিকে জ্ঞান ও বিদ্যার এক অনন্ত পারাবার বলিয়া মনে হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা হইয়া ঐ সজীব জ্ঞান-রত্নাকরে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দুঃখ এই যে, শক্তি ও সময় এই উভয় শত্রুর বিপক্ষতায় আমাদের ভাগ্যে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ জুটিল না। অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায় কেবল আংশিক ভোগ করিলাম মাত্র। এই অসামান্য গুণবান্ মানব-সন্তানের বিষয়ে বহু তথ্যের আলোচনা করিবার আছে। ইঁহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-যাপন এরূপ ভাবে তাঁহার কর্ম্মগত জীবনের সহিত মিলিত মিশ্রিত যে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা অতি কঠিন। তাঁহার চরিত্রশোভা, তাঁহার কর্ম্মশীলতাকে এরূপ সুন্দরভাবে আশ্রয় করিয়াছে যে, কোন্‌টা ব্যক্তিগত আর কোনটা সমাজগত, কোনটা চরিত্রগত, আর কোনটা কর্ম্মগত, তাহার বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। তাঁহার ব্যক্তি ও সমাজ, তাঁহার চরিত্র ও কর্ম্ম—একস্থানে একীভূত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, সেইটাই ফুটাইয়া দেখাইবার বস্তু। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এক্ষণে একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কথায় বলে "টাকায় টাকা আনে, জলেই জল মিশিয়া থাকে, জ্ঞানই জ্ঞানের সমাদর করে।" স্যর আশুতোষ জ্ঞানী ও গুণী, শুনিতে পাই বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সমকক্ষ বাঙ্গালী নাই, সত্যমিথ্যা ভগবানই জানেন, আমরা সামান্য বুদ্ধিতে আশুতোষকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করি; কেন করি, সুযোগ সুবিধা হইলে পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। এখনকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার হাতে এক অত্যাশ্চর্য্য শ্রীসম্পদে সুশোভিত হইয়াছে। যেন বাজীকরের যাদু-বিদ্যাবলে, দেখিতে দেখিতে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশাল শক্তি-কেন্দ্রে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে; এমনই একটা অবস্থার সংঘটন হইয়াছে যে, ভারতীয় অন্যান্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই স্যর্ আশুতোষের সাধিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষতায় সক্ষম নহে। আর তিনি যেরূপ ভাবে ইহার পরিস্ফুটন প্রয়াসী, আজ অন্য কোনও বাঙ্গালী বা ইংরাজ সেই উচ্চ-প্রয়াসের উপযুক্ত উত্তরসাধক হইয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। সেই আশুতোষের বুদ্ধিপ্রসূত বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ঠাভরণরূপ কয়েকটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাভাবে ও আয়োজনের শক্তির অভাবে একাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী যাহা কল্পনাও করিতে সাহসী হয় নাই, আশুতোষের অসাধ্য সাধনার ফলে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল আচার্য্য পদের শ্রেষ্ঠ আসন আজ আশু-তোষ এই স্বদেশীয় সুধী ও বিদ্যাবিশারদকে (Sauant) অর্পণ করিয়া অসামান্য গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; এজন্য আজ বঙ্গদেশ—কেবল বঙ্গদেশ কেন—সমগ্র

ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ অনুভব করিবে। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন এবং সে মর্য্যাদার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেশে অক্ষয়-কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। কারণ এই উচ্চপদের উপযুক্ত সুফল যখন দেশ বিদেশের শিক্ষিত সমাজের নয়নে অঞ্জনরূপে পরিগৃহীত হইবে, তখন তাঁহার এই মহানির্ব্বাচনের মূল্য তাঁহার স্বদেশবাসী উত্তমরূপে অনুভব করিবে। আজ ব্রজেন্দ্রনাথের বিদ্যাবত্তা ও আশুতোষের গুণ-গ্রাহিতার যে মিলন সাধিত হইল, অতি ত্বরায় আমাদের দেশ তাহার অমৃতফল ভোগ করিয়া গৌরবান্বিত হইবে। অন্যকথা বারান্তরে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লণ্ডনে নন্দনলাল।

নন্দনলাল যখন লণ্ডনে গিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ ছাইয়া আছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। ষ্টেশন ধূঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথম পরিচয়ে বিলাতটা তার আদৌ ভাল লাগিল না।

সে ভাবিয়াছিল কেউ না কেউ আসিয়া তাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবে। তার বাবা বড় চাকু'রে। লাট বেলাটের দরবার করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে খুব খাতির। সাহেব তাঁর অনেক বিলাতী বন্ধুকে চিঠি লিখিয়াছেন। একজন বৃদ্ধ পেন্সনপ্রাপ্ত সিভিলিয়নকে তিনি নন্দনের অভিভাবক পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছেন। নন্দন ভাবিয়া ছিল অন্ততঃ তিনি তাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবেন। কিন্তু কেহই আসে নাই, সেই লোকারণ্যের ভিতর, সেই কোলাহল ও ব্যস্ততার মধ্যে, নন্দন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রাণটা তার কাঁদিয়া উঠিল। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, বিধাতা যদি পাখা দিতেন, তবে তখনি উড়িয়া আবার আপনার জনের মাঝ-খানে যাইয়া পড়ে।

"গুড্ ইভনিং। আপনি কি এই এই গাড়ীতে, এই মাত্র দেশ হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন?"—সুললিত বামাকণ্ঠনিঃসৃত স্বাগত সম্ভাষণ নন্দনের নিস্পন্দ ধমনীতে প্রবলবেগে রক্তস্রোত ছুটাইয়া দিল। সে চাহিয়া দেখিল এক অনিন্দ্যরূপবতী উদ্ভিন্ন-যৌবনা রমণী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। রমণী তাহারই প্রতি চাহিয়া তাহাকেই সম্ভাষণ করিতেছেন। কিন্তু নন্দন তো তাকে চিনে না। নন্দনকে সে চিনিল কেমন করিয়া? এ স্বপ্ন না সত্য? নন্দনকে নির্ব্বাকে দেখিয়া রমণী বলিল—"আপনার জিনিষ পত্র কোথায়? গাড়ীর ভিতরে তো কিছু প'ড়ে নাই?" এই বলিয়া গাড়ীটা খুঁজিতে গেল। নন্দন আপনার ছোট হাত ব্যাগটা গাড়ীতেই ফেলিয়া আসিয়াছিল। রমণী সেটা আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ ব্যাগ তো আপনারই?"

তখন নন্দনের চমক ভাঙ্গিল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সে বলিল—"এ্যাঁ—এ্যাঁ—আপনি আমায় চিন্‌লেন কেমন করিয়া?"

"তা কি বড় একটা আশ্চর্য্যের কথা? আমি আপনার দেশের অনেক লোককে চিনি। অনেকেই আমার বন্ধু। আপনাকে কেউ নিতে আসে নি দেখে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।" রমণী ঈষৎ হাসিয়া দন্তরুচি-কৌমুদী বিস্তার করিয়া, নন্দনের মনের ধোঁকা দূর করিবার প্রয়াস পাইলেন।

'আপনার আরো বাক্সটাক্স তো আছে? এদিকে আসুন, সেগুলি কষ্টম্ থেকে খালাস করে নেওয়া যাক্ গে।"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নন্দন তাঁহার পশ্চাতে চলিল। রমণী বলিলেন—"বাক্সের চাবি-গুলো তো চাই; ডিউটিএব্‌ল্ (Dutiable) কোনও কিছু বাক্সে নাই তো?"

"তা তো জানি না।"

"সোনারূপার অলঙ্কার বা প্লেট, তামাক কি চা"—এ সকল থাকলেই খুলে দেখাতে হবে।"

"না—ও সব আমার বাক্সে কিছুই নাই।" এই বলিয়া নন্দন রমণীর হাতে চাবির গোছা তুলিয়া দিল।

"তা হ'লে আর চাবির দরকার হবে না। আমাদের এখানে কষ্টমের এমন কড়াকড়ি নাই।" রমণী ক্রমে নন্দনের তৈজসপত্র সংগ্রহ করিয়া, মুটের জিম্মা করিয়া, গাড়ী ডাকিতে লাগিলেন। জিনিষগুলো গাড়ীতে তোলা হইলে, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাবেন কোথায়, ঠিক আছে কি? কেউ তো আপনাকে নিতে আসে নি দেখ্‌ছি।"

"তাইতো দেখ্‌ছি। কোথায় যাব বুঝতে পাচ্ছি না।"

"তবে আমাদের ওখানে আসুন। সেখানে আপনার স্বদেশী লোক অনেক আছেন নিজের বাড়ীর মতন থাক্‌তে পাবেন।"

নন্দন কি জানি, কি হয়, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

"এই যে মিঃ দাস আস্‌ছেন?" বলিয়া রমণী একজন আগন্তুক ভারতবাসীকে ডাকিলেন।

"হা গো! দাস, তুমি তো আচ্ছা লোক। তোমার দেশের একটী ভদ্রলোক এই লণ্ডনের মরুভূমে একা পড়েছিল, কোথায় যাবেন জানেন না, কেউ তাঁকে নিতে আসে নি। আর তুমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছ।" আগন্তুক টুপি খুলিয়া রমণীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"মাপ করবেন। আমি আন্‌মনে যাচ্ছিলাম। তা, আপনি কি এই গাড়ীথেকে নামলেন?"

স্বদেশীর মুখ দেখিয়া নন্দনের ধড়ে প্রাণ আসিল। বলিল—"হঁা, এই আজকের বোট্‌ট্রেণে এসে পৌঁছেছি।"

কোথাও যাবার ঠিকানা আছে কি?"

"আপাততঃ তো দেখছি নাই, স্যার জেমস্ ম্যাকিণ্টসের নিকট চিঠি লেখা হয়ে-ছিল। টেলিগ্রামও করেছিলাম। ভাব ছিলাম তিনি বুঝি কোনও ব্যবস্থা করিবেন।"

দাস একটু বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিল—"তা বৃষ্টি তো এত পড়ছে না যে ম্যাকিণ্টসের দরকার হবে। আপনি আমার সঙ্গেই চলুন। আমার বাড়ীতেই থাক্‌বেন।"

রমণী বলিল—"দাস, তুমি পাগ্‌লামো করো না। তোমার ওখানে নিয়ে গিয়ে বেচারীর পেছুনে এখন থেকেই পুলিশ লাগাবে কেন? দুদিন সবুর কর না; তোমাদের দলে তো মিশবেই। তবে স্যার জেমস্ ম্যাকিণ্টস কি ব্যবস্থা করেন, তাই দেখ না?" তারপর নন্দনের দিকে চাহিয়া বলিল—'স্যার জেমস্ ম্যাকিণ্টসের সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'ল কি করে?"

"আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, আমার বাবার সঙ্গে খুবই আছে।"

"আপনার বাবা করেন কি?"

"সদরালার কাজ করেন।"

"সদরালা!—দাস, সদরালা কাকে বলে?'

"সদরালা একজন বড় জুডিসিয়াল অফিসার।"

"আর তুমি তাঁর ছেলেকে তোমার ওখানে নিতে চাও? বাপ বেটা দুজনার সর্ব্বনাশটা কেন কর্ব্বে, দাস?"

"আপনি কোথায় থাকেন, দাস মহাশয়?"

""হাইগেটে ইণ্ডিয়া হাউসে—শ্যামাজি কৃষ্ণবর্ম্মার আড্ডা—কথাটা খুলেই বল না কেন, দাস!"

নন্দনের বাবা তাহাকে ইণ্ডিয়া হাউসের ছায়া মাড়াইতে দু'শ বার বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তার মুখ শুকাইয়া গেল। দাসও বেচারীর মনোভাব বুঝিতে পারিলেন; ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তা আপনি এঁরই সঙ্গে যান। সেখানেও অনেক বাঙালী, বেহারী, পঞ্জাবী ছেলে আছে। তার পরে যা' পাকা বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়, করিয়া লইবেন। আবার দেখা হবে।"

দাসের কথায় নন্দনের ভয় কমিয়া গেল। রমণীর সঙ্গে যাইয়া "ভারতকুঞ্জে" লণ্ডন প্রবাসের প্রথম রাত্রি কাটাইলেন।

২

"মেরী, আমায় এখান থেকে যেতে হলো দেখ্‌ছি।"

"কেন নন্দন, এখানে কি তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে?"—নন্দনের দুই কাঁধে হাত দু'খানি রাখিয়া মেরী কাতর নয়নে জিজ্ঞাসা করিল।

"তা নয়, মেরী। লণ্ডনে পৌছিয়া অবধি তুমি যে স্নেহমমতা দিয়াছ, তাতে আমার এ প্রবাস তো একদিনও প্রবাস বলে ঠেকে নি। কিন্তু কি করি বাবা যে তাড়া দিচ্ছেন।"

"এটা তো আর ইণ্ডিয়া হাউস নয়, এখানে সব বড় বড় সাহেব সুবোরা আসেন, এখানে থাক্‌তে তোমার বাবার এত আপত্তি হবে কেন? স্যার জেমস্‌ও তো তোমাকে এখানে দেখে গেছেন।"

"কথাটা তা ত নয়। বাবা বলছেন একটা ফ্যামিলিতে গিয়ে থাক্‌তে। আর স্যার জেমস্ সে পরিবারটা ঠিক করে দিবেন।"

"যদি তুমি তাতে রাজি না হও?"

"রসদ বন্ধ হবে।"

মেরীর মুখখানি ভারি হইয়া গেল! এই ক'মাসে নন্দনের সঙ্গে তার কি যেন একটা কেমনতর সম্বন্ধ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। আজ থিয়েটার, কাল মিউজিক হ'ল, পরশু আর্লস্ কোর্টের এক্‌জিবিষণ, আর এক দিন

সেপার্ডসবুশের জাপানী মেলা, এই রকমে আমোদ আহ্লাদে, খাইয়া দাইয়া, ঘুরিয়া বেড়াইয়া, দু'জনার দিনটা কাটিয়া যাইতেছিল। নন্দন এক আধ খানি অলঙ্কারও মেরীকে উপহার দিয়াছে। একদিন হয়ত নন্দনের সঙ্গে একটা পাকাপাকি সম্বন্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, মেরী এ কথাটাও কখনও কখনও হয়ত ভাবিতেছিল, মেরীর মা বাপেরও তাহাতে আপত্তি হইত না। তারা বড় গরিব। অনেক গুলি ছেলেপিলে, ডাইনে আনিতে বাঁয়ে কুলাইত না; আর ভারতবাসীরা তাদের কল্পনায় এক একটী ছোট বড় ধনকুবের। নন্দনকে মেরী দু'চার দিন তার নিজের বাড়ীতেও লইয়া গিয়াছে। নন্দনের বড় মানুষী চালচলন দেখিয়া বুড়াবুড়ির একটু চটকও লাগিয়াছিল। মেরীর সকল আশা গড়িতে না গড়িতে যেন সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

নন্দন মেরীর ডান হাতখানি আপনার হাতে লইয়া আপনার আঙ্গুল দিয়া তার তর্জ্জনীর অগ্রভাগ ধীরে ধীরে খুঁটিতে খুঁটিতে মাথা নীচু করিয়া বলিল—"মেরী, আমায় কালই যেতে হবে যে। ম্যানেজারকে নোটিস দেই নাই বলিয়া, এক সপ্তাহের বিল আগাম চুকাইয়া দিয়াছি। আমি চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে মেরী?" নন্দন একটু আদর বাড়াইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল।

মেরী আর আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিল না। নন্দনের বুকে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নন্দনও আপনাকে সামলাইতে পারিল না! এই দু' মাস কাল যা করে নাই, আজ তাই করিয়া ফেলিল। মেরীকে বুকে টানিয়া ধরিয়া তার ঠোঁটে, চোখে, কপোলে ঘন ঘন চুম্বন-বৃষ্টি করিতে লাগিল!

সহসা নন্দনের ঘরের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল। স্যার জেমস্ ম্যাকিণ্টস্ ঘরে ঢুকিয়া এই উন্মাদ অভিনয় দেখিলেন।

নন্দন ও মেরী সন্ত্রস্ত হইয়া উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া অধোমুখে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণিক পরে স্যার জেমস্ বলিলেন—"নন্দন, তুমি কি আমায় বস্‌তে বলবে না?" "বস্‌বেন বৈ কি? বস্‌তে আজ্ঞে হয়, আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন, স্যার জেমস্। বড় অপরাধ হয়েছে!" "তুমিও বস। আমার কথা আছে।" এই বলিয়া স্যার জেমস্ মেরীর দিকে চাহিলেন। মেরী তাঁহার চাহনির অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না; স্যার জেমস্ অগত্যা মুখ ফুটিয়া বলিলেন—"মিস্, নন্দনের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" তথাপি মেরীর মুখে কথা নাই। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্যার জেমস্ তখন মেরীর কাছে যাইয়া, তাহার দুই বাহু ধরিয়া খুব জোরে তাহাকে ঝাঁকুনি দিয়া, মুখের কাছে মুখ দিয়া বলিলেন—"ইয়ং উওম্যান" (young woman!) শুনতে পাচ্ছ না? নন্দনের সঙ্গে আমার কথা আছে! তোমার এখন এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।"

মেরী পূর্ব্বের ন্যায় নির্ণিমেষ শূন্য দৃষ্টিতে স্যার জেমসের মুখের দিকে তাকাইয়া ক্ষণিক হঠাৎ হোঃ হোঃ করিয়া অট্ট হাসি হাসিয়া হাততালি দিয়া দ্রুতবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

স্যার জেমস্ দরজা বন্ধ করিয়া আপনার আসনে আসিয়া বসিলেন। একটু পরে বলিলেন—"নন্দন, ব্যাপারখানা কি বল দেখি? এ সবের জন্যই কি তোমার বাপ তোমায় বিলাত পাঠিয়েছে। লণ্ডন সহরের অনেক কুলটা বাসাড়ে বাড়ীতে বাড়ীওয়ালী ও চাকরাণী বেশে বাস করে। তুমি শেষটা তাদেরই খপ্পরে পড়লে?"

নন্দনের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল! একটু উত্তেজিত হইয়া সে উত্তর করিল—"অমন কথা বলবেন না, স্যার জেমস্। আপনি আমার বাবার বন্ধু, পিতৃ-স্থানীয়। কিন্তু আপনার মুখেও আমি এই ভদ্রমহিলার অযথা নিন্দাবাদ সহিতে পারিব না।"

স্যার জেমস্ একটু নরম হইলেন। "তবে কি তুমি তার নিকটে বিবাহ প্রস্তাব করেছ?"

"করিনি। কিন্তু ভবিষ্যতে করিতে পারি।"

"তোমার নিজের স্থান ভুলে যেও না, নন্দন। যেখানকার লোক তুমি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য। ভু'ল না তুমি নেটিভ্, সে ইংরেজ।"

"আপনিও ভুলে যাচ্ছেন, স্যার জেমস্ এটা বেহার নয় বিলাত। আপনাকে আমার এ সব কথা বলা সাজে না। কিন্তু আপনি বল্‌ছেন। আমি ইংরেজ কুলটার খপ্পরে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হই, ইয়ং রাস্‌কেল বলে তা উপেক্ষা কর্ত্তে পারেন, কিন্তু ইংরেজ ভদ্র-কন্যার পাণি গ্রহণ করি ইহা সহ্য কর্ত্তে পারেন না! আর আমরাই কেবল জাত মানি!"

স্যার জেমসের কর্ণমূল পর্য্যন্ত সান্ধ্যগগনের সিন্দুরে মেঘের মত আরক্তিম হইয়া উঠিল। —"দুদিনেই তুমি এতটা বেয়াদব হয়ে উঠেছ, তা ভাবি নাই। ভাব্‌লে তোমার এখানে আসতাম না। তুমি গোল্লায় যাবে, যদি পণ করে থাক, তবে তোমাকে বাঁচানো আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।"

"বেয়াদবি হয়ে থাক্‌লে মাপ কর্ব্বেন, স্যার জেমস্, বেয়াদব হতে চাইনি, বিশেষ আপনি আমার ঘরে এসেছেন একে গুরু স্থানীয়, তায় অতিথি। আমার ক্রটী মার্জ্জনা করুন।"

স্যার জেমস্ একটু ঠাণ্ডা হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"ইহার সঙ্গে তোমার বিয়ে যদি ঠিক না হয়ে থাকে, তবে এরূপ স্বাধীনতা নেওয়া তো ভদ্রলোকের রীতি নয়। তুমিই নেও কি করিয়া, সেই বা নিতে দেয় কেমন করিয়া, বুঝি না।"

"ভুল বুঝবেন না, মহাশয়; আমি বাবার কাছে একদিনও একটা মিছা কথা কইনি। আপনার কাছেও বলব না। যা দেখলেন, তা একটা আকস্মিক উন্মাদলক্ষণ মাত্র। আমি এর আগে কখনও তাঁর গা ছুঁই নাই। কাল আমি এ বাড়ী থেকে চলে যাব, তার কথা হচ্ছিল। তার পর কি করিয়া কি যে হইল বলিতে পারি না। জেনে শুনে, ভেবে চিন্তে, কোনও অভদ্রতা করি নাই। তবে মুখ ফুটে আমরা একে অন্যকে কোনও কথা না বল্লেও, দু'জনার প্রাণটা আপনা হতেই দু'জনার কাছে আজ খুলে গেছে। আমি মেরীকে বিয়ে কর্ব্বো স্যার জেমস্! আমাদের সুখের অন্তরায় হবেন না।

"সে যা হয় পরে হবে। তার ঢের সময় আছে। আমি তোমায় তোমার নূতন বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি। এক্ষনি তোমায় তল্পি তাল্পা নিয়ে যেতে হবে।"

"এই রাত্রে? কাল দুপুরের পরে গেলে হয় না? বাড়ী তো আমি দেখে এসেছি, নিজেই যেতে পার্ব্বো এখন।"

কিন্তু স্যার জেমস্ ছাড়িলেন না। সেই রাত্রেই নন্দনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে বলিলেন—"তোমার জন্য যে বাড়ী ঠিক করেছিলাম্ সেখানে আপাততঃ যাওয়া হবে না। কিছু দিন তোমাকে আমার সঙ্গেই থাকৃতে হবে। এখন তিন মাস তো কলেজ বন্ধ। তার পর নূতন ব্যবস্থা করা যাবে। আমি 'সাউথ সিতে' সমুদ্রের ধারে বাড়ী করেছি। সেখানেই যাওয়া যাক।" স্যার জেমসের সঙ্গে নন্দন সেই রাত্রেই চলিয়া গেল

৩

"হাগো, নন্দন! তুমি কোথায় এমন করে ডুব মেরেছিলে বল দিকি? আমরা ভাবছিলাম তুমি হয় মরেছ, নয় দেশে ফিরে গেছ?"

"কেন বল দেখি? ছুটিতে তো সবাই বাহিরে যায়। আমি সাউথ সিতে ছিলাম।"

"কিন্তু সবাই কি চিঠি-পত্র বন্ধ করে?"

"কেন? আমি তো কত চিঠি কত লোককে দিয়েছি। দু'এক জন ছাড়া কেউ তার খবরও নেয় নাই। আমি ভাবছিলাম তারাও বুঝি লণ্ডন ছেড়ে চলে গেছে। কেন, তুমি কোথায় ছিলে? তোমাকেও তো ক'খানা চিঠি লিখেছি। এক খানারও উত্তর পাই নাই।"

"ছেড়ে দাও তোমার ও সব কাব্যসৃষ্টি। আমি লণ্ডন ছেড়ে এক পা যাই নি। আমি তোমার চিঠি পেলে তার জবাব দেই নি, এও কি কথা?"

"সত্য বলছি, তোমায় অনেক চিঠি লিখেছি।"

"আমিও তোমায় বড় জরুরি দু'খানা চিঠি দেই। একখানারও জবাব পাইনি।"

"বল কি?" জরুরি ব্যাপারটা কি ছিল বলই না।"

"আর কিছু নয়, 'ভারতকুঞ্জে'র লোকেরা তোমার খোঁজ নিবার জন্য আমায় বড় ধরেছিল। আমি শুনেছিলাম তুমি স্যার জেমসের ওখানে আছ, তাই তোমায় দু'বার লিখি

"যাক্, লণ্ডনের খবর কি বল দেখি।"

"দুনিয়ার তো চিরন্তন খবর কেবল তিন —জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু। লণ্ডনেরও খবর তাই।"

"তোমার ফিলজফি রাখ। সোজা সত্যি কথাটা বল না।"

"যা বলছি সবই সত্যি। এক জন্ম, এক বিবাহ, এক মৃত্যু। সবই সত্যি। এক বাড়ীতে। তবে বিয়েটা জন্মের একটু আগে, পরে নয়। আর মৃত্যু সকলের শেষে।"

"এক বাড়ীতে? কোথায়?"

"ভারতকুঞ্জে।"

"জন্মটা কার?"

"কিষণের ছেলের।"

"দূর হও। তামাসা রাখ না। কিষণের বিয়ে হলো কবে যে এর মধ্যেই ছেলে হবে।"

"বিয়ে হলো আগষ্টে। ছেলে হলো সেপ্টেম্বরে।

"কিষণ সত্যি না কি বে' করেছে ; কাকে কল্লে ?"

"লিজিকে– সাধুভাষায় যাঁকে এলিজেবেথ বলা হয়, বুনেদি নামটা বটে, ঘরটা যাই হোক্ না কেন ? লিজিকে তুমি চিন্‌তে না ? 'ভারতকুঞ্জে'র চাকরাণী ছুড়িটাকে এর মধ্যেই ভুলে গেছ।

"মলো কে ?"

"তাও জান না ? বে'টাই যেন গোপনে সেরেছিল। মরাটা তো আর বেমালুম হজম করা যায় না। সে খবরটাও পাওনি, আশ্চর্য্যের কথা। ঐ সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না ভাই। ঐ আমার বাস্ এলো, আমি পালাই। 'বাই,' 'বাই,' নন্দন।"

"অত কথা বল্লে। মলো কে বল্লে না। ছাই নামটা বলেই যাও না ?"

"মেরী ; মরেছে মেরী। তারও না কি শুনেছি একটা ভারি রোমান্স্ আছে।"

এই বলিয়া সে ব্যক্তি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া বা'সে চড়িয়া, নন্দনের দিকে লক্ষ্য করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

নন্দন তড়িতাহতের ন্যায় নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

বছর ঘুরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নন্দনলালের নষ্ট স্বাস্থ্য এখনও পূরা মাত্রায় ফিরিয়া আইসে নাই। তিনমাস এক নর্শিং হোমে কাটাইয়াছে। তার পর ব্রাইটনে, হ্যারোগেটে, ও অপরাপর স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রায় ছয়মাস কাল ঘুরিয়া ফিরিয়া, শেষ তিন মাস স্যার জেমসের বাড়ীতে বাস করিয়া, আবার লণ্ডনে বাসা বাড়ীর আশ্রয় লইয়াছে। তার নাম করিতে করিতে মেরী মরিয়াছিল। বিকারে "নন্দন, আমার নন্দন, পেয়ারে আমার, সর্ব্বস্ব আমার" বলিয়া চীৎকার করিত। মাঝে মাঝে একটু চৈতন্যের উদয় হইলে, "একবার আমার নন্দনকে ডেকে আন। একবার তাকে দেখে নি" বলিয়া কত কাকুতি মিনতি করিয়াছিল। প্রতিদিন লিজি এ সকল কথা নন্দনকে লিখিয়া জানাইয়াছিল। কিন্তু স্যার জেমস্ সে সব গাপ করিয়াছিলেন। ক্রমে সকল ইতিহাসই নন্দনের নিকটে প্রকাশিত হইল। কিন্তু নন্দনের প্রাণ তখন অসাড় হইয়া গিয়াছে। ভাল মন্দ কোনও কথাই সে বলিল না। স্যার জেমস্ মাপ চাহিলেন। তাতেও হাঁ, না, কিছুই বলিল না। জীবনের সে এক পৃষ্ঠা যেন তার ছিড়িয়া, উড়িয়া, উধাও হইয়া গিয়াছে। এমনি মনে হইল। আশা নাই, তেজ নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, দেবত্ব নাই, মনুষ্যত্ব নাই, পশুত্ব পর্য্যন্তও নাই—এমনি নির্জীব জড়ভরতের ন্যায় নন্দন আবার আসিয়া লণ্ডনের বাসা-বাড়ীতে আশ্রয় লইল।

স্যার জেমস্ ভয় পাইলেন। নন্দনের বাবাকে লিখিলেন, ছেলের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাকে দেশে লইয়া যাও। নন্দনের বাবা তাহাকে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য বাড়ী ফিরিয়া যাইতে লিখিলেন। নন্দন রাজি হইল না।

এই বাড়ীটা স্যার জেমস্‌ই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। বাড়ীওয়ালীকে বলিয়া গেলেন

—"এ ছোঁড়ার যাতে জীবনে কোনও একটা আনন্দ ও আগ্রহ হয়, তার চেষ্টা করো। এর জন্য যা উপরি খরচ-পত্র হয় আমি দেব।"

"স্যার জেমস্. 'রিচার্ড ফেবারেল' অবশ্যি পড়েছেন। ঐ তার ব্যবস্থা।"

"তা সে তুমি জান। ছেলেটা আমার অতিশয় বন্ধুলোকের পুত্র। আমার নিজের ছেলের মতন ভালবাসি। তাকে আমার মানষের মত করে যদি দিতে পার, আমি চির দিনের জন্য তোমার নিকটে কেনা থাকিব। তোমার হাতে তাকে দিলাম।"

স্যার জেমস্ চলিয়া গেলেন। যাবার বেলা বলে গেলেন—"আর যাই কর না কেন, সাদায় কালোয় বে' হয় এটী আমি চাই না। এইটা বাঁচিয়ে চলো।"

৫

নন্দনের বাড়ীওয়ালী তার পরিচর্য্যার জন্য একটী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী চাকরাণী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সে নন্দনের খাবার দাবার তার ঘরে লইয়া যায়। সেখানে তার কাছে দাঁড়াইয়া তাকে সার্ভ করে। একদিন নন্দনের খাবারের সঙ্গে এক বোতল শ্যাম্পেন লইয়া গেল। অসুখের পরে, ডাক্তারের ব্যবস্থামত নন্দন কিছুদিন পোর্ট খাইয়াছিল বটে; কিন্তু জন্মে কখনও শ্যাম্পেন খায় নাই। আজ চাকরাণী এক গ্লাস ঢালিয়া তাহাকে খাইতে দিল। নন্দন যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহা পান করিল। এইরূপ প্রতিদিন চলিতে লাগিল। ক্রমে নন্দনের মুখে হাসি ফুটিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে চাকরাণীর সঙ্গে একটু কষ্টিনাষ্টিও সুরু হইল। একদিন খাইতে খাইতে নন্দন লুসিকে বলিল—"তুমি অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? আমি খাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ বস। যে খাটুনী তোমার, কখনও ত একটু বসিতে পাও না।" সে দিন হইতে লুসি প্রায়ই নন্দনের ঘরে নানা ছুতানাতা করিয়া আসিয়া তার কাছে বসিয়া গল্পগাছা করিতে আরম্ভ করিল। আর একদিন নন্দন ডিনার খাইতে খাইতে বোতল হইতে একগ্লাস পোর্ট ঢালিয়া লুসিকে দিল। লুসি সে গ্লাস নিঃশেষ করিয়া একগ্লাস ঢালিয়া নন্দনকে আদর করিয়া দিল। নন্দন আবার লুসিকে দিল। লুসিও আবার নন্দনকে দিল। এইরূপে দু'জনে মিলিয়া বোতলটি খালি করিয়া ফেলিল। লুসির মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে! চোক ঢল ঢল করিতেছে। নন্দন তাহার গলা ধরিয়া চুম খাইল। লুসি নীরবে —রোগী করত যৈছে ঔষধ পান—সে আদর গ্রহণ করিল। সেই হইতে এই চুম্বনটি নন্দনের নিত্যপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। একদিন নন্দন লুসির নিকটে একটী চুম্বন ভিক্ষা করিল। লুসি অনেক সাধ্যিসাধনার পরে সে প্রার্থনা পূর্ণ করিল। ক্রমে এমন দাঁড়াইল যে, লুসিকে ছাড়িয়া নন্দন ঘরের বাহির হয় না। সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যায় লুসি ছুটী পাইত। নন্দনও তখন বাহিরে বেড়াইতে যাইত। ক্রমে নন্দন লুসিকে থিয়েটারে, মিউজিক হলে, এক্‌জিবিষণে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রিচার্ড ফেভারেলের শিক্ষা পূর্ণতা পাইতে লাগিল। লুসি নন্দনের নিকট হইতে আজ হাফ ক্রাউন, কাল হাফ সভারেইন্, ক্রমে মাঝে মাঝে জিনিসটা পত্তরটা আদায় করিতে লাগিল।

৬

নন্দন ক্রমে ক্রমে আবার পড়াশুনায় মন দিয়াছে। বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে একদিন একটু বচসা হওয়াতে সে বাড়ী ছাড়িয়া, সে পাড়া ছাড়িয়া, একেবারে আরলস্ কোর্টে গিয়া বাসা করিয়া আছে। আট নয় মাস লুসির সঙ্গেও আর দেখা সাক্ষাৎ নাই তবে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র ব্যবহার চলিত বটে।

৭

"একটী ভদ্রযুবতী আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।" চাকরাণী আসিয়া নন্দনকে খবর দিল। নন্দন একেলা বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। এ সময় কোথেকে এক স্ত্রীলোক আসিয়া হাজির হইল, ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিল না। নন্দন জিজ্ঞাসা করিল; —"তার কার্ড এনেছ? নাম কি?"

"সে কার্ড দিলে না। বল্লে যে আপনি তাকে চিনেন না, বিশেষ দরকারে এসেছে।"

"আচ্ছা। নিয়ে এস।" বলিয়া নন্দন আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

চাকরাণী অভ্যাগতাকে সঙ্গে লইয়া আসিল। নন্দন দেখিল লুসি।

"হ্যালো লুসি! তুমি কোথেকে উড়ে এলে। কত যুগ যে তোমায় দেখি নি।"

"দেখবে কি করে? চখের বাহির, মনের বাহির। তোমাদের ত ধর্ম্মই নাই।"

"একটু চা খাবে?"

"তোমার বাড়ীওয়ালী ভাব্‌বে কি? আমায় ঢুকতেই দিচ্ছিল না।"

"ভাববে আবার কি? এখানে তুমি আমার বন্ধু ব'লেই তো এসেছ?"

চা খাওয়া শেষ হইল। চাকরাণী চা'র বাসনকোসন সরাতে আসিলে, লুসিও উঠিয়া দাঁড়াইল। নন্দনকে বলিল;—"তবে আজ আমি আসি, ডিয়ার।" আর চাকরাণী দরজার বাহিরে যাওয়া মাত্র নন্দনকে সশব্দ চুম্বন দিয়া লুসিও বিদায় হইল।

সে দিন হইতে প্রথমে চাকরাণী তার পর বাড়ীওয়ালী সকলেই লুসিকে মিঃ লালের ইয়ং লেডি বলিয়া চিনিয়া রাখিল।

লুসিও প্রায়ই যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে সে নন্দনের বাড়ীতেই তার ঘরে তার সঙ্গে ডিনারও খাইতে লাগিল। কখনও বা নন্দন তাহাকে সঙ্গে করিয়া থিয়েটারেও যাইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে আবার পুরাণ ইয়ারকিটা একটু জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

তার পর পাঁচ সাত মাস লুসি আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

হঠাৎ একদিন এক অপোগণ্ড শিশু কোলে লইয়া লুসি নন্দনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া চাকরাণীর চখের উপরেই লুসি নন্দনকে চুম্বন করিয়া, নিজের কোলের ছেলেটী তার কোলে তুলিয়া দিল। নন্দন কায়ক্লেশে ছেলেটীকে কোলে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ আবার পেলে কোথায়?"

"হা ভাগ্য! এখনও চিন্‌লে না?"

"চিনব কেমন করিয়া, কখনও তো আগে দেখি নাই। কাদের ছেলে বলই না?"

লুসি চোকে হাত দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নন্দন তার কাছে গিয়া, গায়ে হাত

আদর করিয়া তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যত জিজ্ঞাসা করে, ততই লুসি আরো ফুঁপাইয়া কাঁদে। নন্দন তখন ছেলেটাকে আপনার বিছানায় শোওয়াইয়া রাখিয়া, লুসির কাছে আসিয়া বসিল। তার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ক্রমে তার মুখ খানি তুলিয়া চুম্বন করিল ও আপনার রুমাল দিয়া তার চখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

লুসি শেষটা সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া,—ছেলেটীকে বুকে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

৯

এই ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরে এক রুদ্রমূর্ত্তি ইংরেজ নন্দনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। ঘরে ঢুকিয়াই বলিল :—"আমি লুসির ভাই। শুনিলাম তুমি তার সর্ব্বনাশ করেছ। এর প্রতিশোধ আমি না দিয়ে ছাড়বো না।"

"আমি লুসির উপকারই সর্ব্বদা করেছি, অনিষ্ট তো কখনও করি নাই। এমন কথা তুমি কেন বল্‌ছ, বল দেখি ?"

"তোমার নিজের মনকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। আর তোমার যদি কোনও কালে ঈশ্বর থাকে তাকে জিজ্ঞাসা কর। সেদিন তার ছেলেটাকে দেখেও তোমার একটু মমতা বা অনুতাপ কিছুই হলো না। তুমি মানুষ না পশু ? লুসির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ছিল, এ বাড়ীর সকলেই তা জানে। আর ছেলের বাপ যে তুমি ইহাও আর কারো জান্‌তে বাকি নাই।"

নন্দনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। লোক চক্ষে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা কত যে কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে, ইহা ক্রমশঃই তার উপলব্ধি হইতে লাগিল। কি উপায়ে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নন্দন এই অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে বসিয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

নন্দনের ভীতি-কাতর-ভাব দেখিয়া, তার সাহস আরো বাড়িয়া গেল। "এখন তুমি করবে কি বল ? লুসি ও তার ছেলের ভরণ-পোষণের ভার তোমায় নিতে হবে, নইলে ছাড়্‌ছি না। একশ' পাউণ্ডের একখানা চেক্ আপাততঃ আজই চাই।" নন্দনের মুখে রা নাই। এমন বিপদে সে জন্মে পড়ে নাই, কেউ যে কখনও পড়তে পারে, এও তার কল্পনায় আগে আসে নাই। নন্দন নিতান্ত নিরপরাধী তা সে জান্‌তো, আর তার দেবতাও জান্‌তেন। কিন্তু তা বল্লেই তো লোকে বিশ্বাস কর্‌বে না—আদালত সে কথা শুন্‌বে কেন ?

"কথা কচ্ছ না যে ? তুমি এটা তোমার নিজের দেশ পাওনি বাবা, তা বোঝ তো। আইন আদালত তো দূরের কথা ; তার আগেই তোমার দফা আমি নিকাশ করিব।"

"ত্যাখ, তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, ঈশ্বর জানেন আর লুসিও জানে, আমি তাকে একটু আদর যত্ন, তার সঙ্গে একটু নির্দ্দোষ ফষ্টিনষ্টি করা ভিন্ন আর কোনও অপরাধ কখনও করি নাই। তবে যদি নিতান্তই টাকার দরকার হয়ে থাকে, কিছু টাকা দিতে

নারাজ নই। কিন্তু তার এ বিপদের জন্য আমি দায়ী নই।”

“কিছু টাকা নয়। একশটী পাউণ্ড ছাড়তে হবে। দয়া করে দিচ্ছ না কি? আদালতে গেলে জেলে যাবে জান? লুসি চাকরীর খাতিরে কুমারী সেজেছে। দেশে তার স্বামী আছে, সে কথাও তোমায় বলে রাখ্‌ছি। সে যদি এ টের পায় তবে লুসির তো সর্ব্বনাশ হবেই, তোমারও বাঁচাও নাই।

“একশ পাউণ্ড তো আমার নাই।”

“জোগাড় কর। ধার কর, চুরি কর, ডাকাতি কর, যা খুসী কর, কিন্তু আমার এ টাকা চাই।”

“আমার মোট ত্রিশটী পাউণ্ড আছে তাই দিতে পারি আর পার্ব্বো না।”

“আচ্ছা এখন তাই দাও। তার পরে বাকিটা না হয় দিও। লুসিকে এখনি ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। নইলে আমরা মুখ দেখাতে পার্ব্বো না।

নন্দন ধীরে ধীরে তার চেক বহি বাহির করিল। অভ্যাগত বলিল—দুখানা চেক দাও। একখানা নিজের নামে লিখে বেয়ারাকে দিতে বল, আর একখানা লুসির নামে দাও।”

নন্দন অগত্যা তাহাই করিলেন। অভ্যাগত চেক্ দু'খানা পকেটে পুরিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে মাসে মাসে, দশ পনের কুড়ি পাউণ্ড করিয়া খসিতে আরম্ভ করিল নন্দন নানা ছলে, কত কৌশলে বাবার নিকট হ'তে রাশ রাশ টাকা আনায়, কিন্তু লুসির দেনা আর শোধ যায় না। প্রতি মাসেই তার ভাই আসিয়া ধমক ধামক দিয়া তার তহবিল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। শেষে নন্দন বারিষ্টারী পড়িবার জন্য যে টাকা জমা দিয়াছিল, তাহাও তুলিয়া আনিয়া লুসির জন্য বিসর্জ্জন করিল। এইরূপে মাস ছয়েক কাটিয়া গেল। তখন এ জ্বালা অসহ্য হইতেছে দেখিয়া, দেশে ফিরিয়া যাওয়াই সে শ্রেয়ঃ মনে করিল।

১০

নন্দন দেশে ফিরিবার সংকল্প করিয়া, প্যাশেজ ট্যাশেজ সব ঠিক করিয়া, সাউথসিতে স্যার জেমসের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইতে গেল। স্যার জেমস্ সে দিন কর্ম্মোপলক্ষে লণ্ডনে গিয়াছেন, নন্দনকে সে দিন কাজেই তাঁর বাড়ীতে থাকিতে হইল। সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরে আনমনে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ লুসির সঙ্গে তার চোখোচোখি হইল। লুসির মাথায় চাকরাণীর টুপি, গায়ে চাকরাণীর "এপ্রণ", একখানা পেরেমবুলাটারে একটী হৃষ্টপুষ্ট শিশু শুইয়া আছে। লুসি তাহাকে হাওয়া খাওইয়া বেড়াইতেছে উভয়ে উভয়কে দেখিতে পাইল। নন্দন পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছিল, লুসি তাহাকে ডাকিয়া অভিবাদন করিল।

“গুড মর্ণিং মিষ্টার লাল, পুরাণো পরিচিতদের কি অমনি করে "কাট" করা ভাল?”

নন্দন লজ্জিত হইল। বলিল—“মাপ কর লুসি আমি আনমনে বেড়াচ্ছিলাম, "কাট" কত্তে চাইনি। যাক্, ভাল আছ তো? কতকাল তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।”

“ভাল আছি, মিষ্টার লাল! এখন তো

লণ্ডনে থাকি না যে মাসে মাসে গিয়া দেখা কর্‌ব। এখন এখানেই চাকরি করি। ভাল কথা, মিষ্টার লাল, তুমি যে আমায় পনেরটা পাউণ্ড পাঠাইয়াছিলে, তার জন্য তোমার অসংখ্য ধন্যবাদ দেই। কি বিপদের সময়ই যে তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে, বল্‌তে পারি না। তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে, অবশ্যি।" "চিঠি? কি চিঠি? তোমার কোনও চিঠি তো কখনও পাই নাই। তবে তোমার ভাই আমার সঙ্গে হামেসাই দেখা করে।"

লুসি আকাশ থেকে পড়িল।—"আমার ভাই? আমার ভাই আবার কে? আমার তো ভাই টাই কেউ নাই?"

"বাঃ, তামাসা কর কেন, লুসি? সে যে তোমার নাম করে আমার কাছ থেকে প্রতি মাসেই দশ পনের পাউণ্ড লইয়া আসিতেছে।"

"মিষ্টার লাল, আমি সত্যি বলছি, এর কোনও কথাই আমি জানি না। আমার মা মর্ত্তে বসেছিল, তুমি তখন পনরটা পাউণ্ড পাঠিয়ে তাকে বাঁচিয়েছ। তোমার এ ঋণ আমি জন্মে শোধ দিতে পার্‌ব না। আর আমি কি খামকা খামকা তোমাকে এমনি করে শোষণ কর্ব্বো? আর আমার তো এখন কোনও অভাব নাই। আমি এই ছেলেটির সেবা করি। আমার মনিব বড় ভাল লোক, ছেলেটীকে আমি বড় ভালবাসি দেখে, আমার বছরে খাওয়া পড়া ছাড়া পঞ্চাশ পাউণ্ড করে দিচ্ছেন। তুমি তো জানই মিঃ লাল, আমার মত অন্য চাকরানীরা পঁচিশ ত্রিশ পাউণ্ডের বেশী কখনও পায় না। কিন্তু তুমি আমায় টাকা দিচ্ছ, সে কি কথা?"

"তোমার নিজের ছেলে কোথায় লুসি? তার খরচ তো তোমার জোগাতে হয়।"

"আমার নিজের ছেলে? তুমি বলছ কি মিঃ নন্দন! আমার যে বে'ই হয়নি, তা ছেলে পাব কোথায়?"

"একদিন তো তুমি তাকে নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিলে।"

"ওঃ তাই বুঝি তুমি মনে করে রেখেছ? সে যে এই ছেলে, আমার মনিবের ছেলে। তখন তারা লণ্ডনে তোমাদের বাড়ীর কাছেই থাকৃতো। আমি কেমন অ্যাকৃট কত্তে পারি, তাই তোমায় দেখাতে গেছিলুম।"

"এই ছেলের জন্যই তো তোমার ভাই আমার কাছ থেকে মাস মাস দশ পনর পাউণ্ড করে নিচ্ছে?"

"কে তোমায় ঠকিয়েছে, মিঃ লাল, কে তোমায় ঠকিয়েছে!—হাঁ; আমি ব্যাপারখানা এখন বুঝতে পার্‌ছি। যে দিন আমি তোমার কাছে গিয়াছিলাম, সে দিন একটী লোক আমার সঙ্গে ছিল, তখন সে আমার সঙ্গে ঘুরতো ফিরতো। তাকে আমি তোমায় কেমন ভয় দেখিয়ে এসেছি তা বলি। সে-ই পনের পাউণ্ডের চেক্ আমায় এনে দেয়। সে লোক ভাল নয় দেখে অল্পদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। সেই তোমায় শোষণ কচ্ছে। একটা তামাসার ফল এতটা গড়াবে স্বপ্নেও ভাবি নাই মিঃ লাল। আমায় মাপ কর। না জেনে বড় অন্যায় করেছি।"

নন্দন লুসিকে ক্ষমা করিল বটে কিন্তু তার

বারিষ্টার হওয়া আর হইল না। সেদেশের ক্ষুরে দণ্ডবৎ করিয়া, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

বাপকে বল্লে—সে দেশের হাওয়া তার সহিল না! দেশের লোকেও তাই বুঝে গেল, কিন্তু নন্দন মনে জানে সভ্যতাটাই তার সইল না।

শ্রীঃ—

মনসার ভাসান।

(২)

বেহুলা এক অপার্থিব চরিত্র। স্ত্রীজাতির মহত্বের ও তেজের এমন উজ্জ্বল নিদর্শন, এমন বিরাট আদর্শ বঙ্গ-সাহিত্যে দ্বিতীয় আছে কি না তাহা আমরা জানি না। পৌরাণিক সাহিত্যেও বড় বেশী নাই। সাবিত্রী যেমন ভারতবর্ষের সতীত্বের আদর্শ, তেমনি বহুদিন যাবৎ বেহুলা বঙ্গদেশের সতীত্বের আদর্শ স্বরূপ আদৃত ও পূজিত হইয়াছিল এখন কি আর তাহা আছে? বেহুলার সে আদর এখন আর আমরা দেখিতে পাই না, কারণ প্রাচীন কাব্যগুলি ক্রমশঃ বিস্মৃতির কবলে যাইতেছে। কিন্তু বেহুলার চরিত্র হিন্দুস্ত্রী মাত্রেরই অবগত হওয়া উচিত, ও সেই চরিত্র দ্বারা প্রত্যেক হিন্দুনারীর অনুপ্রাণিত হওয়ারও প্রয়োজন যথেষ্ট হইয়াছে। যদি সংসারে সুখের প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনা থাকে তো বেহুলার মত স্ত্রীরত্নের যত আদর হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। বেহুলার চরিত্রে পাতিব্রত্যের যে তীক্ষ্ণতা, স্বাধীনতার যে পবিত্র প্রকাশ রহিয়াছে তাহা আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান স্বরূপ। বেহুলার চরিত্রের অপ্রাকৃত মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য আমাদের মনে জাগরুক থাকুক!

বেহুলা একটা গ্রাম্য বালিকা—কিন্তু ইহার এমন অনেকগুলি গুণের কথা কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা স্ত্রীজাতিতে আমরা এখন হারাইয়াছি এবং হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ক্ষেমানন্দ লিখিয়াছেন—

শিশুকাল হইতে রাম শিখে নৃত্যগীত।

* * * *

মা বাপের বাটীতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার গানেতে অমলা মোহ যায়॥

এই নৃত্যগীত শিক্ষার জন্য যে সমাজে তাহার কোনও রূপ নিন্দা বা গঞ্জনা ছিল মনসার ভাসানে তাহা প্রকাশ নাই, অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে স্ত্রীজাতির নৃত্যগীতশিক্ষা সমাজে একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। কবে এবং কেন যে এই সুন্দর প্রথা রহিত হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই জানি না, সম্ভবতঃ মুসলমানদের আমলে হইয়া থাকিবে; যে কারণেই হউক ঐ প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালী-জীবনের অর্দ্ধেক পবিত্র আমোদের অবসান হইয়াছে তাহাতে ভুল নাই। আমাদের পদ্মিনীগণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রমণীগণ "নৃত্যগীতানুরক্তা" বলিয়া বিশেষিত হইতেন; কিন্তু এখন আমাদের

রমণীগণ গান গাহিতে জানেন না, কারণ গান গাহিলে সমাজে নিন্দা হয়; নৃত্যের তো কথাই নাই। সুসঙ্গীত শ্রবণ ও সুনৃত্য দর্শনের পিপাসা মনুষ্য-হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু এখন আমাদের সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, এবং সে সুখ উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইলে তাহার চরিতার্থ সম্পাদন করিবার স্থান সকল সময় সকলের পক্ষে নিরাপদ নহে। চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে নৃত্য ও গীত দুইটী প্রধান কলা। ভদ্রঘরের স্ত্রী মাত্রকেই এই চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইত, ইহাই আমরা প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। কবি ক্ষেমানন্দ এই নৃত্যগীতের সাহায্যে বেহুলা দ্বারা কত বড় কার্য্য সাধিত করাইয়া লইয়াছেন তাহা মনে করুন দেখি। গানের মত নির্ম্মল আনন্দ আর কিছুতেই নাই! সেই নির্ম্মল আনন্দ নির্ম্মল স্থান হইতে পাইলে কত সুখের হয়।

বেহুলার চরিত্র হইতে আমরা আর একটা সামাজিক তথ্যের পরিচয় পাই—তাহা স্ত্রী-স্বাধীনতা। এখনকার দিনে আমাদের স্ত্রীজাতি যে ভাবে অবরোধান্তর্গত হইয়াছেন তখন তেমন ছিল না, তাহা বেহুলার একাকিনী নৌকাযাত্রা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। অন্যান্য প্রাচীন কাব্য হইতেও এ বিষয়ের অল্পবিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু বেহুলার এই কীর্ত্তি ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এখনও নগরে যে ভাবে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, আমাদের পল্লীগ্রামগুলিতে তাহা সে ভাবে প্রচলিত নাই, সেখানে গ্রাম্যবধূরা কতকটা স্বাধীন জীবনযাপন করিবার অবসর পান, এবং বরাবর তাহা পাইয়া আসিয়াছেন। মনসার ভাসান কাব্যে ইহারও প্রমাণ আছে! অনেক বিষয়ে হিন্দুরা যতটা স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে পারেন, অন্য কোনও জাতি তেমন পারেন কি না সন্দেহ। তীর্থক্ষেত্রে যাও এ কথার প্রমাণ যথেষ্ট মিলিবে। তবে হিন্দুর স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্থে সংযমহীনতা নহে, বিলাস প্রিয়তাও নহে। স্ত্রীস্বাধীনতার দোহাই দিয়া লজ্জাহীনতার প্রশ্রয় দেওয়া অথবা ভারতস্ত্রীর চরিত্রের চির কল্যাণময়ী শালীনতার হানি করা, কিম্বা মাতৃত্ব ও পত্নীত্বের মহিমার হানিকর ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপুষ্টি সাধন আমাদের সমাজে মঙ্গলকর নহে।

বলা বাহুল্য যে পত্নীত্বের গৌরব সংস্থাপনই বেহুলার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার। পত্নীত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে সকল গুণের আবশ্যক কবি প্রাণ ভরিয়া বেহুলাতে সেই সকল গুণ অর্পণ করিয়াছেন। মনুষ্যত্বের সর্ব্বোত্তম সহচর চরিত্রের দৃঢ়তা, পাতিব্রত্য স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্টতম মহত্ত্ব, সেইজন্য পাতিব্রত্য ধর্ম্মের চরম সাধনার জন্য দৃঢ়তা বিশেষরূপে আবশ্যক। গ্রাম্যকবি ক্ষেমানন্দ তাঁহার বেহুলার চরিত্রে যে দৃঢ়তা অর্পণ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের সাবিত্রীর চরিত্রের দৃঢ়তা মনে পড়িয়া যায়। বালিকাকাল হইতেই বেহুলার চরিত্রে এই দৃঢ়সংকল্পতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম হইতেই কবি তাঁহাকে মনসার অর্থাৎ মহাশক্তির শক্তিশালিনী সেবিকারূপে দেখাইয়াছেন; তাহার ভক্তি সর্ব্বাবস্থাতেই অচলা। এই ভক্তির অঙ্গটুকু আমাদের রমণীরা এখনও হারায় নাই, এখনও তাই আমাদের ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ বজায় আছে। ভক্তির

বলে বেহুলা অসাধ্য সাধন করিয়াছে, শক্তিরও প্রতিজ্ঞা টলাইয়াছে, কারণ শক্ত বা শক্তি চির দিন ভক্তের ভক্তির কাছে পরাজিত; এ পরাজয়ে ভগবানের বা তাঁহার শক্তির আনন্দ। দেব-চরিত্রের চিত্রণে কবি কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি. কিন্তু এই তথ্যটুকু কোথাও লুকান নাই। বেহুলা মনসার "ব্রতদাসী," তাই শিবনন্দিনী তাহার প্রতি সর্ব্বদা করুণাময়ী; ছলনা-করিতেও যত মজবুত, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতেও তেমনি প্রস্তুত। তবে একটু বাঁকা পথ অবলম্বন করিতেও পেছপাও নন। বেহুলার সহিত মনসার এই কপট ছলনা গুলিতে কবি একটু রসের ছিটা ফোঁটা দিয়াছেন, এবং প্রকারান্তরে নারী-চরিত্রের একাংশ সরলভাবে উন্মুক্ত করিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি যে, প্রাচীন কবিগণের কাছে দেব-চরিত্রে ও মনুষ্য-চরিত্রে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না; তাঁহারা দেব-চরিত্র অব-লম্বনে মনুষ্য-চরিত্রই প্রকটিত করিয়াছেন।

ছলিতে আপন দাসী জগাতী কমলা।
প্রাচীন ব্রাহ্মণী বেশে ঘাটেতে বসিলা॥
ছদ্মবেশে দেবী তখন রহিল একধারে।
বেহুলা নাচনী আইল তথা ধীরে ধীরে॥
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী।
মনসার গায়ে পড়ে গোড়ালীর পানি॥
বুড়ী বলে আলো তুই গেলি ছারখারে।
চক্ষে নাহি দেখ তুমি কোন্ অহঙ্কারে॥
বেহুলা বলেন আমি সায় বেণের ঝি।
বাপের পুকুরে নাই তোরে লাগে কি॥
বুড়ী বলে আমারে দেখিয়া ক্ষীণ বল।
সে কারণে দিলি বুঝি গোড়ালির জল॥
বেহুলা বলেন বুড়ী তুমি নাহি ভাল
না দেখে আপন দোষ পরে মন্দ বল॥
তুমি যে বসেছ ঘাটে আমি নাহি জানি।
কেমনে লাগিল গায়ে গোড়ালির পানি॥

এই রকম ছলনা ও বাক্‌চাতুরি কবি আরও লিখিয়াছেন।

স্বর্গপুরে বেহুলার নৃত্যগীতে মুগ্ধ হইয়া দেবগণ মনসাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং মনসা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বেহুলার সহিত তাঁহার বাদানুবাদ বেশ অভিমান-ব্যঞ্জক এবং এ প্রকার বাক্‌চাতুরির চূড়ান্ত। কবি বেহুলাকে দিয়া মনসাকে বড়ই জব্দ করাইয়াছেন, দেবসভায় তাঁহাকে নাকাল করিয়া একটু হাসিয়া লইয়াছেন। পরাজিত হইয়াও যে পরাজিত হইতে চাহে না, তাহার মুখে যে রকম কথা বাহির হয়—মনসার মুখেও কবি সেই প্রকার ন্যায়সঙ্গত কথাই বসাইয়াছেন :—

"শুনহ বেণীর বেটী বেহুলা নাচনী।
তোর শ্বশুর বলে মোরে চেঙ্গমুড়ি কানি॥
আমার সনে বাদ করে রাখিয়াছে দাড়ী।
হাতে করে লইয়া ফেরে হেন্তালের বাড়ী॥
* * *
না করে আমার পূজা চাঁদ সদাগর।
* * *
অবশেষে খাইলাম পুত্র লখিন্দর॥
কেমনে আইলি তুই দেবতা সভায়।
তোর তরে আমি এত পড়িলাম লজ্জায়॥

নির্জ্জলা মানুষের ছবি। যাহা হোক্ বেহুলার ভক্তির কাছে মনসার অভিমান টিকিল না, তাঁহাকে বেহুলার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইল।

বেহুলা কোনও কার্য্যে পশ্চাদ্‌পদ নহে; তাহা কবি গোড়া হইতেই বলিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের স্ত্রীচরিত্রগুলির চর্চ্চা করিলে মনে হয় যে, বাঙ্গালী রমণীর চরিত্রে তখন দৃঢ়তা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। শুধু মনসার ভাসানে নহে, অন্যান্য প্রাচীন কাব্যেও ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালী-রমণী বলিলে এখন যেমন মানসপটে একটী প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে স্ত্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তখনকার বঙ্গললনা এখনকার মত লজ্জা-কুলিতা কোমলতাময়ী হইলেও আজকালকার মত দীপ্তি ও তেজোহীনা ছিলেন না—মনসার ভাসান কাব্যের বেহুলা-চরিত্রের অসম-সাহসিকতা স্পষ্টাক্ষরে সেই গৌরব নির্দ্দেশিত করিতেছে। যে কোনও বড় কাজ করে, তাহার সংকল্পের স্থৈর্য্য এবং সাহসের প্রাচুর্য্য দুই-ই থাকা চাই। বেহুলার এই দুইটি মহা-গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাইবার জন্য কেনা চেষ্টা করিয়াছিল? শ্বশ্রূ সনকা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সকল লোকে এবং শেষে তাহার ভ্রাতারা কাতর-বাক্যে তাহাকে তাহার দুষ্কর ব্রত হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তপস্যায় বদ্ধপরিকরা উমাকে যেমন কেহই ফিরাইতে পারে নাই, তেমনি বেহুলাকেও কেহ ফিরাইতে পারে নাই। সৎকার্য্যের জন্য স্ত্রীহৃদয়ে এমনি প্রখর বলবত্তা থাকা জগতের অশেষ শুভকর। ক্ষুদ্র গ্রাম্যকবির কাছে যদি আমরা এই সুশিক্ষাটুকু পাই, তাহা হইলে কি আমরা অনেকটা উচ্চে উঠিতে পারিলাম না?

রমণীহৃদয়ের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও স্বার্থহীনতা এই দুইটি গুণের উপর সংসারের প্রতিষ্ঠা—সংসারের যাবতীয় মঙ্গল ও সুখ। ভারত-রমণী চির-দিন এই দুই গুণে ও নির্ম্মল পাতিব্রত্যের আদর্শ সংস্থাপন দ্বারা জগৎকে পবিত্র করিয়া আসিতেছেন; যদি আমাদের পতন গভীরতম না হইতে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রমণী হৃদয়ের এই সকল মহতী বৃত্তিগুলিকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। সেই সঙ্গে নিজেদের উন্নতিসাধন করিতে পারিলে দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে, অন্ধানু-করণ দ্বারা কখনই তাহা হইবে না। দুঃখের বিষয় স্ত্রী চরিত্রের এই মহতী অভিব্যক্তি সজীব চিত্রের সাহায্যে আধুনিক কবিরা বড় একটা দেখাইতে প্রয়াস করেন না। গ্রাম্য কবি ক্ষেমানন্দ কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব মানসী বেহুলার চরিত্রে এই সদ্‌গুণ গুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বেহুলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা আমরা বলিয়াছি, এখন তাহার অপরাপর গুণের কথাও কিছু বলিব। বেহুলা কখনও নিজের সুখের মোহে কর্ত্তব্য ভোলে না; যখন তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে পারিল তখন তাহার কত আনন্দ? যে মহাব্রতের অনুষ্ঠানে কত কষ্ট--কত যন্ত্রণা—কত বিপদ্ মাথার উপর দিয়া গিয়াছে; সেই ব্রতের উদ্‌যাপনে, সেই ব্রতের সার্থকতায় তাহার কত গভীর আনন্দ, তাহা বেহুলার মত পতি-ব্রতার হৃদয় বুঝিতে পারিলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু এত আনন্দেও সে আত্মহারা হয় নাই; তাহার শ্বশুরের অপর ছয় পুত্রের প্রাণ ও ধনরত্নের ভিক্ষা করিয়া লইতে ভুলে নাই। নিজের সুখে নিমগ্ন হইয়া অপর ছয়টী দুঃখিনীর কথা সে ভুলিয়া যায় নাই। ইহাই প্রকৃত

মহত্ত্ব, প্রকৃত হিন্দু স্ত্রীত্ব। হিন্দু স্ত্রী স্বামীর সেবায় রত থাকিয়াও সংসারের মঙ্গল দেখে, সংসারের আর পাঁচজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য খোঁজে; শুধু স্বামী নহে, স্বামীর সংসার তাহার নিজের হয়। ইহাই হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ।

তার পর বেহুলার কর্ত্তব্য নিষ্ঠা—হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির উপরে নিজের আন্তরিক প্রবৃত্তি, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এ সকলি সেই কর্ত্তব্য নিষ্ঠার কাছে পরাজিত। শুধু পতির জীবন দান করিয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই, পতির ছয় সহোদরকে বাঁচাইয়াও তাহার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই; শ্বশুরের নষ্ট ধন উদ্ধার করিয়াও সে তাহার কর্ত্তব্যের শেষ মনে করে নাই; শ্বশুরের আত্মার উদ্ধার করাই তাহার শেষ কর্ত্তব্য ইহা সে জানিত, তাই যখন মৃত পতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া—যোগীনীর বেশে সে পিতা মাতার দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের পরিচয় পাইয়া যখন পিতা মাতা ও ভ্রাতারা এবং আত্মীয় স্বজন আসিয়া সেখানে অন্ততঃ এক দিনও থাকিবার জন্য কত অনুনয় করিলেন, তখন সে তাহার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া অনায়াসে সেই অনুনয় উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

অমলা বলে বেহুলা আইস নিজঘরে।
বেহুলা বলেন আমি যাব কোথাকারে॥
শুন শুন জন্মদাতা শুনগো জননী।
মোর কান্তে খেয়েছিল দেবীর কালফণী॥
আমার শ্বশুর তাঁর করে অপমান।
এত দিনে পূজিবেন হইয়ে সাবধান॥
আর কিছু মোর তরে না কর জিজ্ঞাসা।
পরিচয় শেষ আছে পূজিলে মনসা॥
যাত্রাকালে প্রণাম করিল বাপ মায়।
হায় হায় বলি রামা ধূলায় লুটায়॥
কাতর হইয়া ক্রান্দে নগরের লোক।
কেন কেন তবে আইলে জাগাইতে শোক॥
বিনয়ে প্রণতি কৈল পিতার চরণে।
বিদায় হইল পুরী কান্দয়ে সঘনে॥

বহু দিন অদর্শনের পর, আজ সে পিতা-মাতার স্নেহময় কোল পাইয়াছে, কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা, কত বিপদ সহ্য করিয়া আজ কত দিনের পরে সে পিতামাতার কাছে আসিয়াছে, কোথায় দুদিন সেখানে আনন্দে কাটাইবে, সকলকে আনন্দ বিলাইবে, তা নয়, সে সেই সুখ সেই আনন্দ অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া নিজের কর্ত্তব্যের পথে ছুটিয়া চলিল। সেও কি কম উৎসাহ! যে পরের জন্য ভাবিতে পারে, যে পরের সুখ দুঃখ বুঝিতে পারে, তাহার হৃদয়ে সেই সুখ বিতরণ করিবার কল্পনায় কি কম আনন্দ! বেহুলা আজ চিরদুঃখিনী শ্বশ্রূকে সাতটী পুত্র উপহার দিবে, ছয়টী বিধবাকে পতি উপহার দিবে, শ্বশুরকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণতা সাধন করিবে, একি কম উৎসাহের কম আনন্দের কথা! আর এক দিন যেমন সে সকলের অনুরোধ বিনয় অবহেলা করিয়া নিজ নির্ব্বাচিত মহা কর্ত্তব্যের পথে ধাবিত হইয়াছিল, আজও তেমনি সেই আনন্দময় মুহূর্ত্তের হৃদয়-ভরা আবাহন উপেক্ষা করিয়া সে নিজের গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। কি সুন্দর এই কর্ত্তব্য বুদ্ধি! কি মহান্ তাঁহার আত্ম সংযম! এমন আত্ম-সংযম, এমন কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, এমন পতিভক্তি যে কাব্যে তাহা গ্রাম্য

কাব্য হউক বা আধুনিক কাব্য হউক সে কাব্য ঘরে ঘরে আদৃত হউলে—দেশের মঙ্গল হইবে। আধুনিক কবি কেহ এইরূপ কাব্য লিখিতে চেষ্টা করিবেন কি ?

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংসারচন্দ্র যখন জয়পুর স্কুলে নিযুক্ত হইলেন, যদিও তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি তখন পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যপরিচালন-প্রণালী শৃঙ্খলা-বদ্ধ হয় নাই। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে হরিমোহন বাবুর যত্নে স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। জয়পুরে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের সেই প্রথম চেষ্টা। তখনকার দিনে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংগ্রহ এবং নানা উপায়ে ছাত্রদিগকে ইংরাজী শিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং তাহাদের মনোরঞ্জন করা এক প্রধান কাজ ছিল। উৎসাহী যুবক সংসার-চন্দ্রকে সহকারীরূপে পাইয়া কান্তি বাবু বিদ্যালয়ের গঠন ও উন্নতি-কার্য্যে মনোযোগ দিলেন, নিজের উৎসাহ এবং উদ্যম অন্যের মনে সঞ্চারিত করা কান্তি বাবুর এক অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা ছিল। এ দিকে সংসারচন্দ্রও অসাধারণ পরিশ্রমী,—শ্রমে কখন তাঁহার ক্লান্তি ছিল না।

সে সময় অধ্যাপনার বিষয়-বিভাগ ছিল না—যিনি যে শ্রেণীর শিক্ষক তাঁহাকে সে শ্রেণীতে সকল বিষয়েই অধ্যাপনা করিতে হইত। তাই শিক্ষাদান বেশ শৃঙ্খলার সহিত হইতে পারিত না। অনতিকালের মধ্যে উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্কুলের কর্ম্মপ্রণালী নিয়মবদ্ধ হইল এবং প্রাথমিক শ্রেণী হইতে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত গঠিত হইল।

সে সময়ে সংসারচন্দ্রের দৈনন্দিন লিপিতে দেখা যায় যে তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রাতে নিজে অধ্যাপনার জন্য প্রস্তুত হইতেন; বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে পড়াইয়া বৈকালে ছাত্রদিগকে 'রাম-নিবাস' বাগানে ব্যায়াম ও ক্রিকেট প্রভৃতি ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতেন এবং নিজে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। সন্ধ্যার পর আবার স্কুলে গিয়া ছাত্রদিগকে পরদিনের পাঠ প্রস্তুতের সাহায্য করিতেন।

আজ-কালকার এই বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের দিনে শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে কেবল একটা সময়ের সীমার দ্বারা বদ্ধ নিয়মের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। গুরু-শিষ্যের যে স্নেহ-মধুর সম্বন্ধ ভারতবর্ষের আদর্শ তাহা এই দশটা-চারিটার স্কুল মাষ্টারীর দিনে আমরা হারাইয়াছি। শিক্ষার্থীদিগকে সংসারচন্দ্র

কথনও এই স্কুলমাষ্টারের চক্ষে দেখেন নাই। তিনি একাধারে তাহাদের শিক্ষক, বন্ধু, উপদেষ্টা এবং খেলার সাথী ছিলেন। কোন ছাত্র স্কুলে অনুপস্থিত হইলে, তিনি তাহার গৃহে গিয়া সংবাদ লইতেন, বিপথে গেলে তাহাকে সদুপদেশের দ্বারা সংশোধন করিতেন এবং বিপদে তিনি তাহাদের একান্ত বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পুরাতন ছাত্রেরা এখনও সে দিনের কথা বর্ণনা করিয়া থাকেন। তিনিও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পুত্রের স্থায় স্নেহ করিতেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার ছাত্রগণের উৎসাহে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন—সে সভায় সংসারচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'Standing here among you in the evening of my life, I recall the time when many of you, who are now grown-up men, were boys whom I loved so well and whose career I watched with so much fond interest."— জীবনের প্রদোষকালে আজ তোমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমার সেই সময়ের কথা মনে পড়িতেছে, যখন, আজ তোমাদের মধ্যে যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাহারা আমার একান্ত স্নেহভাজন বালক মাত্র ছিলে। তখন হইতে চিরদিনই আমি তোমাদের কার্য্যকলাপ ও উন্নতি বিশেষ আগ্রহের সহিত ও সস্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি।) বাস্তবিকই পুরাতন ছাত্রদিগের সহিত কথা কহিবার সময় তাঁহার মুখে যে স্নেহের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত, তাহা অনন্যসুলভ।

সংসারচন্দ্র যদিও দিবসের অধিকাংশ সময়ই ছাত্রদিগের সহিত কাটাইতেন এবং তাহাদের সকল প্রকার খেলার সাথী ছিলেন—তথাপি তাঁহার শাসন কথনও শিথিল হইত না। বেত্রদণ্ডের অপেক্ষা তিনি ছাত্রদিগের সমক্ষে উচ্চ আদর্শ স্থাপনেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন—দোষীকে শারীরিক দণ্ডবিধান না করিয়া তিনি ছাত্রদিগের মনে আত্মসম্মান উদ্বোধনের দ্বারা তাহাদিগকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন

স্কুলে সংসারচন্দ্র নানা উপায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহারাজ-কলেজে 'গ্যালারী-ক্লাশ' প্রবর্ত্তনের তিনি প্রধান উদ্যোগী। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য কলেজের হলে পরিচিত উদ্ভিদ, পশু এবং ধাতু সকলের আদর্শ বা মডেল (model) শ্রেণী বা পর্য্যায় হিসাবে রক্ষিত হইত। প্রত্যেক বিভাগে প্রতি মডেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত থাকিত। সংসারচন্দ্র এক একটি মডেল অবলম্বনে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা করিতেন কঠিন বিষয়কে মনোজ্ঞ করিয়া বলিবার তাঁহার এমন একটা ক্ষমতা ছিল যে, বালকগণ সহজে এবং আনন্দের সহিত এ সকল বুঝিতে ও শিখিতে পারিত। সংসারচন্দ্রের যত্নে অতি অল্পদিনের মধ্যে এই গ্যালারী-ক্লাশ ছাত্রদিগের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। সপ্তাহে একদিন করিয়া এই ক্লাশ বসিত। শিক্ষা ও আনন্দের এই অপূর্ব্ব সংমিলনের দিনের জন্য ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত। তখন এ প্রদেশে শিক্ষকগণ Kinder-garten প্রণালীর নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না এবং

শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার উপকারিতা সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন নাই—সেই সময়ে সংসারচন্দ্র জয়পুর-স্কুলে এই শিক্ষা-প্রণালীর প্রচলন করেন।

অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে সময় জয়পুর কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল এবং ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিবার জন্য আগ্রায় যাইতে হইত। সংসারচন্দ্র বহুকাল আগ্রায় ছিলেন এবং তিনি ছাত্রগণের বিশেষ প্রিয়, এজন্য পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের সহিত কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকেই আগ্রায় পাঠাইতেন। পরীক্ষাশেষে সংসারচন্দ্র ছাত্রদিগকে আগ্রার কেল্লা, তাজমহল, ইতমাদ্-উদ্দৌলা, সেকেন্দ্রা প্রভৃতি পুরাতন কীর্ত্তি সকল দেখাইতেন এবং সে সকলের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া তাহাদের হৃদয়ে অতীতগৌরবস্মৃতি জাগরিত করিয়া শিক্ষার কঠোরতাকে আনন্দে পরিণত করিতেন।

সংসারচন্দ্র নিজে একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন—জীবনের নানা কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চা কখনও বন্ধ হয় নাই। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহাতে সাহিত্যচর্চ্চা হয় সেজন্য তিনি কলেজে এক তর্কসভা (Debating Club) স্থাপন করেন। তিনি এ সভার সভাপতি হইতেন এবং উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা ও তর্কে যোগদান করিয়া ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। নিজের ছাত্রজীবনে সুবিখ্যাত ডাইটন-প্রমুখ অধ্যাপক ও ইংরাজ-মিশনরী এবং ইংরাজ-সহপাঠীদিগের সাহচর্য্যে সংসারচন্দ্র ইংরাজীতে কথোপকথন করা এবং বক্তৃতা দেওয়া সুন্দররূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল যে, তাঁহার ছাত্রগণের শিক্ষাতেও যেন এ বিষয়ে ত্রুটি না হয়।

বাল্যকালে সংসারচন্দ্রের শরীর বড় দুর্ব্বল ছিল; সেজন্য সহপাঠী বিশেষতঃ ইংরাজ বালকদিগের নিকট তিনি প্রায়ই নিগৃহীত হইতেন। ইহার ফলে সংসারচন্দ্র শারীরিক উন্নতি সাধনে মনোযোগ দিলেন। প্রতিদিন নিয়মমত ব্যায়াম করা, পাঞ্জা লড়া, অশ্বারোহণে বা পদব্রজে ভ্রমণ এবং ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহার শরীর দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হইল এবং ক্রিকেট ও অশ্বারোহণে পারদর্শী বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিলেন। কৈশোর ও যৌবনের একান্ত চেষ্টাতেই উত্তরকালে তাঁহার স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত উন্নত বলিষ্ঠ দেহ সকলের কামনার বিষয় হইয়াছিল। অল্প বয়সেই তাঁহার কব্জি এত শক্ত হইয়াছিল যে, অনেক অধিকবয়স্ক লোকের সহিত পাঞ্জা লড়িবার সময় তাহারা তাঁহাকে পাঞ্জা ধরিয়া শূন্যে উঠাইয়া লইয়াও তাঁহার হাত বাঁকাইতে পারিত না আঙ্গুলের দ্বারা চুলের নির্ম্মিত 'জালি' তিনি অনায়াসে ভাঙ্গিতে পারিতেন। সংসারচন্দ্রের শারীরিক বলের সম্বন্ধে এত কথা বলা হয় ত অবান্তর হইল—কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী বুঝিতে ইহা নিতান্ত অবান্তর নহে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—সংসারচন্দ্র এ মহাজনবাক্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন—তাই শিক্ষকতাকালে তিনি বালকদিগের শারীরিক উন্নতি বিধানে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে জয়পুরে "Boys'

Sports" নাম দিয়া বিদ্যালয়ের বালকদিগের ক্রীড়াপ্রদর্শনের বাৎসরিক অধিবেশনের আরম্ভ হয়। রামনিবাস বাগানে এই উৎসবের অধিবেশন হইত। মহারাজ রামসিংহ স্বয়ং পারিষদবর্গের সহিত ইহাতে যোগদান করিতেন, রেসিডেণ্ট প্রভৃতি ইংরাজেরাও উপস্থিত থাকিতেন। তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া কলেজের ও স্কুলের ছাত্রদিগের নানাবিধ ক্রীড়া এবং ব্যায়াম-কৌশল দেখান হইত। সমস্ত বন্দোবস্তের ভার সংসারচন্দ্র গ্রহণ করিতেন এবং সর্ব্বশেষে ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বালকদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

স্বর্গীয় রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় যখন মহারাজ-কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস্ শ্রেণী খোলা হইল, তখন কলেজে ইতিহাস এবং তর্কশাস্ত্র (Logic) পড়াইবার ভার সংসারচন্দ্রের উপর অর্পিত হইল। সংসারচন্দ্র যখন যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতেন, সামান্যই হউক আর বৃহৎই হউক, তিনি তাহা সম্পূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন—তাঁহার চরিত্রের ইহা এক প্রধান উপাদান ছিল। ক্রিকেট খেলা হইতে জটিল রাজকার্য্য পর্য্যন্ত তিনি নিখুঁতভাবে শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেন– কোন কাজের সামান্য ত্রুটিও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ইতিহাস ও লজিক পড়াইবার ভার লইয়া তিনি যে অধ্যবসায়ের সহিত নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে ফার্ষ্ট আর্টস্ কেন, কঠিনতর পরীক্ষার জন্য অধ্যাপনা অনায়াসে করিতে পারিতেন।

মহারাজ-কলেজের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের রাজপুত্র ও সর্দ্দারদিগের পুত্রগণের শিক্ষার জন্য 'রাজপুত নোবল্‌স্ স্কুল' (Rajput Nobles' School) স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় যদিও নামে কলেজের অধ্যক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল, তথাপি অন্যত্র বসিত বলিয়া এবং ইহার কার্য্যপ্রণালীর উপর প্রিন্সিপালের বিশেষ কোন হাত ছিল না বলিয়া—সে সময়ে এই বিদ্যালয়ের কোন প্রকার উন্নতি হওয়ার উপায় ছিল না এখন দিনকাল বদলাইয়াছে,—অনেক রাজপুত সর্দ্দার তাঁহাদের পুত্র প্রভৃতিকে ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিতেছেন। তখনকার দিনে এই যোদ্ধৃজাতিকে শিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, ইঁহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। দূরদর্শী মহারাজ রামসিংহ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তদানীন্তন রেসিডেণ্টগণও এদিকে লক্ষ্য রাখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে এই রাজপুত-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইতেন। এইরূপ পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে শাসন ও শিক্ষার নিতান্ত অভাব দেখিয়া তদানীন্তন রেসিডেণ্টের পরামর্শে মহারাজ সংসারচন্দ্রকে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সংসারচন্দ্র এই নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার শিক্ষাদানের এবং শাসনপ্রণালীর খ্যাতি সকলেরই পরিচিত ছিল—তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হওয়ায়, অনেক রাজপুত-সর্দ্দার আগ্রহ করিয়া আপন আপন পুত্র প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। সংসারচন্দ্রও তাঁহার স্বাভাবিক একাগ্রতার সহিত রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ এই সর্দ্দারদিগের উত্তরাধিকারীদিগের শিক্ষার

গুরুভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় অচিরেই এই বিদ্যালয় নূতন শ্রী ধারণ করিল।

রাজপুত-বিদ্যালয়েরএই শিক্ষকতা সংসার-চন্দ্রের জীবনে এক শুভ সুযোগ। এই খানেই তিনি বর্ত্তমান অম্বরাধিপতি মহারাজ মাধোসিংহকে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভবিষ্যতে যে জীবন-ব্যাপী সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, এইখানেই তাহার সূত্রপাত। মহারাজ মাধোসিংহ তখন ইসরদার ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার কায়েম সিংহ মাত্র। তখন কে জানিত যে, অদৃষ্টচক্রের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে এই চঞ্চলপ্রকৃতি বুদ্ধিমান্ যুবক ভবিষ্যতে জয়পুরের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন—কিন্তু সে কথা পরে।

এই সময়ের কথা এখনও মহারাজ আনন্দের সহিত স্মরণ করেন এবং চিরদিন সংসারচন্দ্রের নিকট ছাত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং বালকের ন্যায় আবদার-অভিমান করিতেন। ছাত্রজীবনের কথা বলিতে বলিতে একদিন মহারাজ, সংসারচন্দ্রের ভ্রাতা স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্রকে হাস্যচ্ছলে বলিলেন—"তোমার এই যে দাদাটিকে দেখিতেছ. ইনি বড় সহজ পাত্র নহেন—ইনি এক স্কুলে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমাকে মারিবার জন্য বলিতেন, 'কায়েম সিং, হাত লা'ও' মা'র খাইবার জন্য কে কবে হাত বাড়াইয়া দেয়? আমি প্রাণান্তে হাত বাড়াইতাম না। উনি মারিতে আসিলে, আমি টেবিলের চারিদিকে ঘুরিতাম। আর এখন—আমার সমক্ষে করযোড়ে বসিয়া আছেন। কি মারটাই আমাকে মারিয়াছেন!" সকলে হাসিতে লাগিল। সংসারচন্দ্রও হাসিয়া উত্তর দিলেন—"মহারাজ, তখন যদি জানিতাম যে, আপনি জয়পুরের মহারাজ হইবেন—তাহা হইলে আপনাকে আরো ভাল করিয়া শিক্ষা দিতাম।"

১৮৬৬ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংসার-চন্দ্র শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল তাঁহার কর্ম্মচেষ্টা কেবল মাত্র অধ্যাপনার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি সে সময়ে যে সকল সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন, এবং তৎসময়ে যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ সৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি।

মহারাজ রামসিংহ নাট্যকলার বিশেষ রসজ্ঞ এবং উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রধানত তাঁহারই উৎসাহে সাধারণের জন্য তখন মধ্যে মধ্যে মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটক সকল প্রাসাদে অভিনীত হইত। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী এবং কলেজের শিক্ষকগণ অভিনয় করিতেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ সেন এবং সংসারচন্দ্র এই সকল অভিনয়ের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন, থিয়েটারের সমগ্র বন্দো-বস্তের ভার ইঁহাদের উপরেই ন্যস্ত হইত। অভিনয়ে সংসারচন্দ্রের অসামান্য দক্ষতা ছিল,—তাঁহার বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ এবং অভিনয়-কৌশলে উপস্থিত ইংরাজ এবং দেশীয় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইতেন। এই সকল অভি-নয়ের ফলে মহারাজ রামসিংহ বহু অর্থব্যয় করিয়া 'রামপ্রকাশ থিয়েটার-ভবন' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেখানে মহাকবি সেক্স-

পীয়রের নাটকের অনুবাদ এবং পৌরাণিক নাটক সকল উর্দ্দূ ভাষায় অভিনীত হইত; বলা বাহুল্য যে, সর্ব্বসাধারণে এ সকল অভিনয় বিনামূল্যে দেখিতে পাইত।

তৎকালে যে সকল বাঙ্গালী পরিবার কর্ম্মোপলক্ষে জয়পুরে বাস করিতেন, তাঁহাদের মহিলাবৃন্দকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে "স্ত্রী-উন্নতি-বিধায়িনী" সভা স্থাপিত হয়। জয়পুর মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী (পরে প্রেসিডেন্ট) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই সভার সম্পাদক ছিলেন। সংসারচন্দ্র এই শুভকার্য্যে তাঁহার একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন এবং নানা চেষ্টায় এই সভার উন্নতির সহায়তা করিয়াছিলেন। মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তখনকার ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করিয়া মহিলাদিগকে পড়িতে দেওয়া এবং নিয়মিত পাঠে উৎসাহ দেওয়া হইত। পণ্ডিত-বর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মাসিক-পত্রিকা 'রহস্য-সন্দর্ভ' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ-দর্শন' সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া প্রতিগৃহে পর্য্যায়ক্রমে প্রেরিত হইত।

জয়পুর-প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে মিতব্যয়িতা অভ্যাসের উদ্দেশ্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সংসারচন্দ্র "Mutual Savings Deposit Bank"নাম দিয়া এক সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। তখনকার দিনে ইহা এক নূতন ব্যাপার। ইহার বহুদিন পরে সাধারণের হিতার্থে গভর্ণমেণ্ট পোষ্ট আফিসের সংসৃষ্ট সেভিংস্ ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তন করেন। এই ধনভাণ্ডারে সকল বাঙ্গালীই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে টাকা জমা দিতেন;—ফলে বিশেষ প্রয়োজনের সময় ঋণগ্রস্ত হইতে হইত না। দরকারমত এই ব্যাঙ্ক হইতে সামান্য সুদে ধারও দেওয়া হইত। সংসারচন্দ্র এই ব্যাঙ্কের ধনরক্ষক ছিলেন। স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্ত, যিনি প্রথমে মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী, এবং সংসারচন্দ্র মন্ত্রী হওয়ার পর প্রাইভেট সেক্রেটারী হ'ন, তিনি এই ব্যাঙ্কের সহকারী ধনরক্ষক ছিলেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সে সময় বাঙ্গলায় রাজা রামমোহন রায়ের যুগ। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচারিত "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা" এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বাঙ্গলাদেশে এক নূতন যুগ এবং ধর্ম্মরাজ্যে নবীন আলোক আনয়ন করিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী কেহই সে শিক্ষার প্রভাব না মানিয়া থাকিতে পারে নাই। জয়পুর-প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকগণও নিজেদের মধ্যে উপাসনাদি প্রচলন করিয়া-ছিলেন। সংসারচন্দ্র বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মানু-রাগী। শৈশবে ও বাল্যে তাঁহার পিতামহী ও পিতৃদেবের আদর্শে এবং কৈশোরে মিশনারী কলেজের শিক্ষায়—তিনি ধর্ম্মে ভক্তি-মান্। তিনিও অতি আগ্রহের সহিত এই সমাজে যোগদান করিলেন। জয়পুর নগরের পুরাতন প্রবেশদ্বার "ঘাটের" বাগানে প্রতি সপ্তাহে এই সমাজের অধিবেশন হইত। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র যখন কলেজ হইতে মন্ত্রিসভায় উন্নীত হইলেন, তাহার কিছুকাল পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা স্বর্গগত পণ্ডিতবর কৃষ্ণবিহারী সেন এম্, এ মহোদয় জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া এই প্রার্থনা-সমাজের বিশেষ বললাভ হইল—কিন্তু

এই সময়েই ইহার শেষ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে অধিবেশন হয়, তাহার রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায়, কৃষ্ণবিহারী বাবুর সহিত কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য হইল—তাহার ফলে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনচেতা ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণবিহারী জয়পুরের কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে 'সমাজ'ও বন্ধ হইল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জয়পুর-রাজের সরকারী পত্রিকা "জয়পুর গেজেট" প্রথম প্রকাশিত হয়। পর বৎসর হইতে স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ সেন এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েন। সংসারচন্দ্র বিদ্যালয়ের কর্ম্ম ব্যতীত এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া বহুকাল ইহার সম্পাদনকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবুর সম্পাদকতায় জয়পুর গেজেটের সঙ্গে সঙ্গে "জয়পুর ডাইরেক্টারী"ও প্রকাশিত হইল। সংসারচন্দ্রের কাজ বাড়িল। তিনি বহু পরিশ্রমে এই 'ডাইরেক্টারী'র উপাদান সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করিলেন; ইহাতে জয়পুরের ইতিহাস ও বিবরণ এবং নানাপ্রকার অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় ও দিনলিপি থাকিত। সংসারচন্দ্রের চরিত্রে আলস্যপরায়ণতার লেশমাত্র ছিল না। শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার পরিশ্রমে তিনি কাতর বা বিমুখ হইতেন না। •এই সময়ে তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। প্রাইভেট সেক্রেটারী হওয়ার পর তিনি আর এ সকল কার্য্য করিবার অবসর পান নাই।

বৈদিক সাধনার আভাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাঠক দেখিয়াছেন, বৈদিক ঋষি কিরূপে শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া, আজীবন কাতরকণ্ঠে দেবপদে প্রার্থনা করিয়া পাপাপনোদন করিতেন, বিশুদ্ধা ধীশক্তি লাভ করিতেন এবং অন্তিমে নির্ম্মলচিত্তে সবিতৃলোকের অধিকারী হইতেন। সে লোকে অজস্র আদিত্যাখ্য জ্যোতিঃ নিত্য বিরাজমান, সেখানে গেলে জীবকে আর তামস মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। জরামরণরহিত হইয়া জীব সেখানে অমরত্ব-পদে স্থাপিত হয়।

"ত্রিনাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং,
ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।" কঠোপনিষৎ ১,১৭।

যিনি ত্রিবিধ উপায়ে (অধ্যয়ন, হৃদয়ঙ্গম ও অনুষ্ঠান দ্বারা) নাচিকেতা নামক অগ্নির সেবা করিয়াছেন, (পিতা, মাতা ও আচার্য্য এই) তিনের নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছেন এবং (যাগ, অধ্যয়ন দান এই) তিন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য ইহাই কি জীবের চরমোৎ-

কর্ষ? নিরন্তর সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই কি জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়? না, স্বর্গলোকপ্রাপ্তির পরেও জীবের গত্যন্তর আছে? এই প্রশ্নের উত্তর বৈদিক ঋষি উপাখ্যানচ্ছলে দিতেছেন :—

ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন
জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনে তন্বশ্চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং
পরমে জনিত্রে ॥১
তনূষ্টে বাজিন্তন্বং নয়ংতী বামমস্মভ্যং ধাতু
শর্ম তুভ্যং।
অহ্রুতো মহো ধরুনায় দেবান্দিবীব জ্যোতিঃ
স্বমা মিমীয়াঃ ॥২॥
বাজাসি বাজিনেনা সুবেনীঃ. সুবিতঃ স্তোমং
সুবিতো দিবং গাঃ।
সুবিতো ধর্ম্ম প্রথমানু সত্যা সুবিতো দেবান্ত্-
সুবিতোহনু পত্ম ॥৩॥
মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবা দেবেষ্বদ
ধুরপি ক্রতুং।
সমবিব্যচুরূত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নি বিবিশুঃ
পুনঃ ॥৪॥
সহোভিবিশ্বং পরি চক্রমু রজঃ পূর্বা ধামান্য-
মিতা মিমানাঃ।
তনূষু বিশ্বা ভুবনা নি যেমিরে প্রাসারয়ংত
পুরুধ প্রজা অনু ॥৫॥"১০।৫৬

বাজী নামক মৃতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া ঋষি বৃহদুক্‌থ বলিতেছেন :—

(হে মৃতপুত্র) তোমার (অগ্ন্যাখ্য) জ্যোতিরূপ এই এক অংশ (এই অংশে তুমি বাহ্যাগ্নিতে প্রবেশ কর), (তোমার প্রাণবায়ুরূপ অংশ) তোমার দ্বিতীয় জ্যোতিঃ (এই অংশে তুমি বায়ুতে প্রবেশ কর), তোমার তৃতীয় (আদিত্যাখ্য) জ্যোতির্দ্বারা (আদিত্যে) প্রবেশ কর। দেবগণের (আদিত্যরূপ) পরমজনকে প্রবেশ করিয়া প্রিয়রূপে তোমার মঙ্গল হউক।১। হে বাজী, তোমার শরীরকে প্রাপ্ত হইয়াছে যে পৃথিবী সেই পৃথিবী আমাদিগকে ধন ও তোমাকে সুখ দান করুক। তুমি অনবপতিত হইয়া (তোমার কারণভূত) মহৎ দেবগণে ও দ্যু-লোকে বর্ত্তমান সূর্য্যে নিজেকে প্রবিষ্ট কর।২। শোভন দর্শন তুমি বলদ্বারা বলবান্! তুমি সুখে (পূর্ব্বে ত্বৎকৃত) স্তোত্রের অনুগমন কর, সুখে দ্যুলোকের অনুগমন কর, সুখে [ত্বৎসম্পাদিত] মুখ্য সত্যফলযুক্ত ধর্ম্ম-সকলের অনুগমন কর, সুখে আদিত্যাখ্য জ্যোতির অনুগমন কর।৩। (আমাদিগের) পিতৃগণ এই দেবগণের মহত্বের অধিকারী হন। কিন্তু দেব হইয়াও তাঁহারা দেবগণে ক্রতু অর্থাৎ সংকল্প স্থাপন করেন। এইরূপে তাঁহারা পুনরায় সমস্ত দীপ্তমান্ পদার্থে সঙ্গত হইয়া দেবগণের শরীরে প্রবেশ করেন।৪। পিতৃগণ স্বীয় বল-দ্বারা, পূর্ব্ববর্ত্তী অমিত ধামসকল পরিচ্ছিন্ন করিয়া, সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। এইরূপ দেহ সকলে তাঁহারা বিশ্বভুবন শাসন করেন এবং বহুপ্রকার প্রজা ও জ্যোতিঃ সকল বিস্তারিত করেন।৫॥

এই সূক্তে ঋষি ঊর্দ্ধমুখী জীবের স্থূল দেহাবসানের পর ক্রমোন্নতির আভাস দিয়া-ছেন। স্থূলদেহ প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত—প্রাণবায়ু হইতে ভিন্ন শবদেহ, ও প্রাণবায়ু। এই দুই অংশই সূক্তের প্রথম ঋকের অন্তর্গত প্রথম দুই জ্যোতিরংশ। মৃত্যুর পর শবদেহ অগ্নিতে প্রবেশ করে ও প্রাণবায়ু বিশ্ববায়ুতে

মিশিয়া যায়। ভাষ্যকার শবদেহকে অগ্ন্যাখ্য অংশ বলিয়াছেন, কেন? আত্মীয় স্বজন দ্বারা উহা দগ্ধ হয় বলিয়া কি? তাহা হইতে পারে না; কারণ, উহা দগ্ধ না হইয়া প্রোথিত বা শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষিতও হইতে পারে। পঞ্চভূতের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্‌ ও তেজঃ, এই তিনের সহিতই অগ্নিবীজরূপ তন্মাত্রের সম্বন্ধ এবং এই তিনই অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া তেজঃজগতের তেজাংশের সহিত, জলজগতের জলাংশের সহিত ও ক্ষিতিজগতের ক্ষিতি অংশের সহিতে মিশিয়া যাইতে পারে। এই জন্যই প্রাণরহিত শবদেহকে অগ্ন্যাত্মক বলা হইয়াছে। শবদেহ ও বাহ্যপ্রাণের সহিত বিযুক্ত হইয়া জীব সূক্ষ্মশরীরমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক পরলোকে গমন করে। এই সূক্ষ্ম-শরীরই ঋগুক্ত তৃতীয় জ্যোতিঃ। ভাষ্যকার ইহাকে আদিত্যাখ্যজ্যোতিঃ বলিয়াছেন, কারণ, সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম প্রাণাত্মক এবং আদিত্যই প্রাণ। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, সূক্ষ্ম প্রাণই জীবের যথার্থ প্রাণ, যাহা হইতে বিমুক্ত হইলে জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যায়। ইহা আত্মা হইতে জাত, আত্মার ছায়াস্বরূপ এবং আত্মাতে অনুগত; মনঃসম্পাদিত কর্ম্মানুসারে ইহা এই স্থূলশরীরে আগমন করে।

"আত্মন এব প্রাণজায়তে। যথৈষা পুরুষে-চ্ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং; মনোকৃতেনায়া-ত্যস্মিঞ্চরীরে।" প্রশ্নোপনিষৎ ৩,৩।

স্থূলপ্রাণ স্থূলদেহে জীবের কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত স্থূলবায়ুর অবলম্বনে স্থূলরূপে এই সূক্ষ্মপ্রাণের অভিব্যক্তি মাত্র। স্থূলদেহে জীবের ভোগ ফুরাইলেই স্থূলদেহের প্রয়োজনীয়তা লোপ পায়, এবং প্রাণ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া উৎক্রান্ত হয়।

স্থূলদেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া জীব কোন্‌ পথে কোথায় যায়? বৈদিক ঋষি নির্দ্দেশ করিতেছেন; পথ দুই, পিতৃগণ ও দেবগণের এক পথ ও মর্ত্ত্যগণের এক পথ ("দ্বে শ্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্‌।" ১০।৮৮।১৫)। অর্থাৎ, যাহারা স্থূলদেহের বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন করিয়া, অন্নময় কোষে ভোগের কর্ম্মসূত্র দগ্ধ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারে, প্রাণময় হইতে পারে, তাহাদিগের এক পথ, আর তাহা যাহারা পারে না, যাহাদিগকে পুনরায় এই মরণশীল জগতে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তাহাদিগের আর এক পথ। যাহারা জীবিতকালে ভক্তি-ভরে দেবগণের স্তুতি করে ও অসত্য পার্থিব কামনা সকল পরিহারপূর্ব্বক সত্যফলযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাই অন্তে অমরত্ব লাভ করিয়া সূর্য্যলোকে দেবগণের সহিত মিলিত হয়। যাহারা নশ্বর মর জগতে আগমন করিয়া ও ভগবৎকৃপায় মানবদেহ ধারণ করিয়া পার্থিব ভোগ্যবস্তুর লালসায় নিবৃত্ত হয় ও ধর্ম্ম আচরণ করতঃ ভোক্তার বা আত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের আর পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করিতে হয় না; কারণ, জীবের পার্থিব ভোগে আত্যন্তিক বিরাগ জন্মিলে পার্থিবভোগায়তন স্থূলশরীরে আর তাহার প্রয়োজন থাকে না। সে তখন চিরতরে অন্নময় কোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণময় আদিত্যলোকে দেবগণের সহিত অব-স্থিত হয়। ইহাই উক্ত সূক্তের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে সূচিত হইয়াছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকে ঋষি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, প্রাণময় কোষের প্রথম সাধক স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে উত্তরোত্তর সাধনা দ্বারা ক্রমোন্নতি লাভ করেন, কিরূপে প্রথমে দেবগণের মহত্বমাত্রের অধিকারী হইয়া পরে সাধনা দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত হন ও ক্রমে প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া বিশ্বভুবন শাসন ও জগৎ সৃষ্টি করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিতত্ব

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বেদ-নির্দ্দিষ্ট ক্রমমুক্তি বিষয়ে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই ক্রমমুক্তি কিরূপে সাধিত হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, অগ্রে সৃষ্টিতত্ব বুঝা আবশ্যক। সাধনতত্ব বুঝাইতে যাইয়া সৃষ্টিতত্বের অবতারণা প্রথম দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক উহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। সৃষ্টিতত্ব না বুঝিলে, সাধনতত্ব বুঝা যায় না। সৃষ্টির পর্য্যায় অনুসারে সাধনের পর্য্যায় নির্দ্ধারিত হয়। আনন্দময় কোষ হইতে অন্নময় কোষ পর্য্যন্ত আবরণ সকল কি এবং কিরূপে সৃষ্ট হইল, তাহা জানা সাধকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা সাধনা লক্ষ্যহীন হয়। ফলতঃ ভক্তি-পূর্ব্বক সৃষ্টিতত্বের অনুধ্যান সাধনার প্রধান অঙ্গ। আমি কি? কোথা হইতে আসিয়াছি? কেন আসিয়াছি? কোথায় যাইতেছি? কেন যাইতেছি? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান না হইলে, সাধনার আরম্ভই হয় না এবং সাধনার উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মে না।

বায়ুর তাড়নে সমুদ্রে যেমন স্পন্দনের সৃষ্টি হয় জীবের অনাদিকর্ম্মসংস্কারের তাড়নে এক অদ্বিতীয় অনাদ্যনন্ত ব্রহ্মপদার্থে তেমনি সিসৃক্ষারূপ স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রবক্ষে স্পন্দনের ফলে যেমন বীচি সকল উত্থিত হয়, ব্রহ্মপদার্থে স্পন্দনের ফলে সেইরূপ জীব সকল উত্থিত হয়। তাহা হইলে জীবের স্বরূপ কি হইল? প্রথমতঃ, বীচিতে ও সমুদ্রে যেমন বাস্তব ভেদ নাই, সেইরূপ জীবে ও ব্রহ্মে বাস্তব ভেদ নাই। বীচি যেমন সমুদ্রবক্ষে, সমুদ্র-অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, সমুদ্রের সহিত একাঙ্গ হইয়া সমুদ্রশরীরে বিচরণ করে, জীবও তেমনি ব্রহ্মে লীন থাকিয়া ব্রহ্মময় হইয়া ব্রহ্মে বিচরণ করে। কোন সমুদ্রের কথা বলিলে যেমন উহার বীচিও বুঝায়, তেমনি ব্রহ্ম বলিলে জীবকেও বুঝায়। যেমন বীচিকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম হইতে জীবকে পৃথক্ করা যায় না। ইহা হইল জীব-ব্রহ্মে একত্বভাব। দ্বিতীয়তঃ, বীচিতে ও সমুদ্রে বাস্তব ভেদ না থাকিলেও, উহাদের মধ্যে রূপগত ভেদ আছে; সমুদ্র বিশাল, বীচি ক্ষুদ্র; সমুদ্র অতলস্পর্শ, বীচি অল্পগভীর। সেইরূপ ব্রহ্মে ও জীবে বাস্তব ভেদ না থাকিলেও, উহাদের মধ্যে রূপগত ভেদ আছে; ব্রহ্ম বিরাট, জীব ক্ষুদ্র; ব্রহ্ম অসীম, জীব সসীম, ব্রহ্ম অনবচ্ছিন্ন, জীব অবচ্ছিন্ন; ব্রহ্ম রূপহীন, জীব রূপবান্। ইহা হইল জীব-ব্রহ্মে দ্বৈতভাব। ব্রহ্মশরীর অনাদি অনন্ত, উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোতভাবে আত্যন্তিকরূপে ব্যাপিয়া আছে। ইহার মধ্যে জীবের বিশিষ্ট অস্তিত্বের অবসর কোথা হইতে কিরূপে আসিল? পূর্ব্বে যে অনাদি-কর্ম্মসংস্কার-জনিত স্পন্দনের কথা বলিয়াছি, তাহাই জীবের জীবস্বরূপ বিশিষ্ট অস্তিত্বের

কারণ। কর্ম্মতত্ত্ব অতি নিগূঢ়, অনির্ব্বচনীয়। ইহারই তাড়নে মায়াশক্তি বা প্রকৃতি প্রবুদ্ধ হয়। ইহা ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্ম হইতে ইহাকে পৃথক্ করা যায় না. ব্রহ্ম ব্যতিরেকে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই মায়া বা প্রকৃতি জীবের রূপ বিধান করে, শরীররূপে জীবকে অবচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্ম হইতে তাহার ভেদ জন্মায়। কর্ম্মসংস্কার দ্বারা ব্রহ্মশরীরে যে স্পন্দন উত্থিত হয়, তাহা ইহারই বিকার। পাঠক স্থিরচিত্তে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করুন। মায়া বা প্রকৃতি নিত্য ব্রহ্মে অবস্থিত, ব্রহ্ম হইতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, ইহা ব্রহ্মই; অথচ, ইহা জীবরূপ ভেদ উৎপন্ন করে। এই-জন্যই ইহার নাম মায়া বা অবিদ্যা। প্রকৃতি যখন সুপ্ত থাকেন, কর্ম্মসংস্কারজনিত স্পন্দন যখন স্থির হয়, মায়া যখন যোগনিদ্রারূপে ব্রহ্ম-দেহে বিলীন থাকে, জীবত্ব ও ব্রহ্মত্বে তখন ভেদ থাকে না; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ-ভূত ব্যক্ত প্রকৃতি তখন অব্যক্ত হইয়া যায়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি জীবসঙ্ঘের জননী তখন নিবৃত্তপ্রসবা হন। পুনরায় যখন তিনি জাগরিতা হন, কর্ম্মসংস্কাররূপ ব্রহ্মার আবাহনে যখন তিনি ব্রহ্মশরীরের অভেদত্ব ছাড়িয়া ভেদ-রূপে উত্থিতা হন, তখন ব্রহ্মশরীরে স্পন্দন আরম্ভ হয়,সংসারলীলা প্রকটিত হইতে থাকে। এই যে মায়াশক্তির প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, স্পন্দনের সুপ্ত ও জাগরিত অবস্থা, বিশ্বের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাব, এই দ্বন্দ্বের কারণ কর্ম্মসংস্কার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কর্ম্মতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়, কর্ম্ম ও কর্ম্মসংস্কারের মূল অনির্দ্দেশ্য। দ্বৈত, পরিচ্ছিন্ন, বিকারভাবাপন্ন জ্ঞান দ্বারা অদ্বৈত, অপরি-চ্ছিন্ন, অবিকারী ব্রহ্মপদার্থের বিকারের নির্ব্বচন করা যায় না। অদ্বৈতভূমিতে উত্থিত হইলেও, এ বিকার বিকাররূপে প্রতি-ভাত হয় না; কারণ, অদ্বৈতজ্ঞানীর চক্ষে এ বিকারের অস্তিত্ব নাই, শুদ্ধ, বুদ্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন তত্ত্বের উপলব্ধি নাই। এইজন্যই কর্ম্মতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়। কি দ্বৈতজ্ঞানী, কি অদ্বৈতজ্ঞানী, কাহারও নিকট ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। মায়ার স্পন্দন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ জীবরূপে তাহার নিষ্পেষণ ভোগ করিতে থাক; মায়ার স্পন্দন যখন মিটিবে, তখন শিবরূপে মায়ার আর স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিবে না। সংক্ষেপতঃ দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই স্থূল সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বজ্ঞানপ্রসবিনী বেদ-মাতার বাক্য হইতে আর্য্যগণ প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব অতি সুন্দর, অতি বিশদ, অতি সরলভাবে বুঝান আছে। সুতরাং আমরা বেদ হইতেই এ তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিব। সৃষ্টি বুঝিতে হইলে, প্রথমে প্রলয় বুঝিতে হয়; কারণ, প্রলয়ের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধ বীজের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধের ন্যায়। যেমন বীজ না বুঝিলে বৃক্ষ বুঝা যায় না, তেমনি প্রলয় না বুঝিলে সৃষ্টি বুঝা যায় না। প্রলয় কি, এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রথম উন্মেষ কিরূপে হইল, তাহা বৈদিক ঋষি নিম্নলিখিত সূক্তে বুঝাইয়াছেন। এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতি পরমেষ্ঠী, ইহার দেবতা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা পরমাত্মা।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো
ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নভঃ কিমাসীদ্-
গহনং গভীরং ॥১॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥২॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা—জায়তৈকং ॥৩॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।'
সতো বংধুমসতি নিরবিন্দন্হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসী-দুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥৫॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥

—ঋ স ১০।১২৯

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

এষা *

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল বাংলার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁর নাম বহুদিনই জানিতাম; কিন্তু "এষা" পড়িবার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। তাঁর অন্য কোনও গ্রন্থও ইতিপূর্ব্বে আদ্যোপান্ত পড়ি নাই। সাময়িক পত্রে কথনও কথনও তাঁর দু'একটী কবিতা পড়িয়া থাকিতে পারি; কিন্তু সে সকলে তাঁর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে ভালমন্দ কোনই বিশেষ সংস্কার জন্মে নাই। সুতরাং সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত হইয়াই এই বইখানি পড়িতে বসি। "এষা" নামটা কেমন উদ্ভট ঠেকিয়াছিল, কোনই অর্থবোধ হয় নাই। আর অমূল্য বাবুর ভূমিকায় এই নামের প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা দেখিয়া যে, বইখানি পড়িবার জন্য কোনও লোভ হইয়াছিল, এমনও বলিতে পারি না। এ কৈফিয়ৎ না দিলেই, মনে হয়, ভাল হইত। ফলতঃ এই প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার পরে, বইখানা আদৌ পড়িতে পারিতাম কি না, সন্দেহ। কিন্তু অক্ষয়বাবুর একটী বন্ধুলোকের নিকটে বইখানি পড়িয়া দেখিব

* "এষা" গীতিকাব্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই সত্য রক্ষা করিতে না হইলে, বইখানা আমার ভাগ্যে আজি পর্য্যন্ত পড়া হইত কি না, সন্দেহ।

কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, একাধিকবার পড়িলাম। বন্ধুবান্ধবদিগকে অনেকবার ইহার বাছা বাছা কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইলাম। সকলেই এই কবিতাগুলির মৌলিকতা, বস্তুতন্ত্রতা ও সর্ব্বোপরি এ সকলেতে সর্ব্বপ্রকারের কষ্টকল্পনার বা নাটুকে ছলাকলার গন্ধমাত্র নাই দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়াছেন। আমার মনে হয়, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তাঁর এই শোকাত্মক গীতিকাব্যে অক্ষয়বাবু এক অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন কি, এই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে অক্ষয়বাবুর এই 'এষা' খানি বিশ্বসাহিত্যেও অতি উচ্চস্থান পাইতে পারে। ইহাতে বিন্দুমাত্রও অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

কাব্যের লক্ষণ

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন। রসাত্মকতা যে কাব্যের একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। যে বাক্যে কোনও না কোনও রস উথলিয়া উঠে, তাহা আদৌ কাব্য নহে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। যাহা মিষ্টি লাগে, অর্থাৎ যে বাক্যের ঝঙ্কার আছে, সচরাচর লোকে তাহাকেই রসাত্মক বলিয়া ভাবিয়া থাকে। কিন্তু রস বলিতে, কেবল মিষ্টত্ব বোঝায় না। হাস্যাদ্ভুতকরুণ-রুদ্রাদিকে এখানে রস বলা হইয়াছে। এ সকল রস যে বাক্যে ফোটে না, তাহা রসাত্মক নয়, তাহা কাব্য হইতেই পারে না। যে বাক্যে কেবল ঝঙ্কারই তোলে, কাণেই মধু ঢালিয়া দেয়, এবং আপনার স্বরলালিত্যের দ্বারা চিত্তকে নাচাইয়া, ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা বাক্যহীন সঙ্গীতের তানলয়ের মতন বিবিধ ভাবের দ্যোতক হইলেও, প্রকৃত কাব্য হয় না। কাব্য কেবল ধ্বনি নহে, কাব্য বাক্য। বাক্য অর্থযুক্ত শব্দ। সুতরাং কাব্যের রস কেবল ঝঙ্কারে ফুটিলেই চলে না, সার্থক শব্দেতেও তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবে। যে বাক্য আপনার অর্থের দ্বারা হাস্যাদ্ভুতকরুণরুদ্রাদি রসকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাই কাব্য। কিন্তু কাব্যালোচনার ইহাই শেষ কথা নহে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলিয়া—যাহা না হইলে কাব্য হয় না, আলঙ্কারিকেরা তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোনও না কোনও একটা রসের উদ্রেক যাহাতে না হয়, তাহা কাব্য নহে, কাব্য হইতেই পারে না। কিন্তু কেবল রসবিশেষের উদ্রেক করিতে পারিলেই যে, যে কোনও রচনা কাব্যত্বের দাবী করিতে পারে, এমনও নহে। তাহা হইলে কালিদাস-কিংবদন্তীর—

দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ
চ বৈ তু হি চ বৈ তু হি—

ইহাও কাব্য-পদবী প্রাপ্ত হইতে পারিত। ইহাতে রস (যথা দুগ্ধ) আছে, ও চারি চরণও আছে (যথা বিড়ালের); আর পাদপূরণার্থে চ, বৈ, তু, হি প্রভৃতিও আছে। দুগ্ধের রস না হইয়া, কেবল হাস্যাদ্ভুতাদি রসের কথা হইলেও কাব্য হয় না। রাম হাসিতেছে, যদু মুখ ব্যাদান করিতেছে, কেশব রাগে হাত পা ছুড়িতেছে, কুন্দ

কাঁদিতেছে ;—এই বাক্যগুলির সকলই রসাত্মক। কিন্তু তাই বলিয়া কি কাব্য হইয়াছে ?

এ জগতের সর্ব্বত্রই এ সকল রস ছড়াইয়া আছে। এমন বিষয় বা বস্তু, অবস্থা বা ব্যবস্থা কিছু নাই, যার ভিতরে কোনও না কোন একটা রস স্বল্পবিস্তর ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া এ সকলই যে কাব্যের উপাদান হয়, এমন নহে। হাসিকান্না সংসার জুড়িয়া আছে ; কিন্তু সকল হাসি-কান্নাতেই কাব্য গড়িয়া উঠে না। শৃঙ্গারাদি স্থায়ী রসও জনসমাজকে নিয়ত চঞ্চল ও সরস করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ সকলের সকলগুলিতেই যে কাব্য সৃষ্টি হয় বা হইতে পারে, তাহা নহে। সন্তানবতী রমণী সংসারে অসংখ্য। সন্তানবাৎসল্যও স্বল্পাধিক সকল মাতার মধ্যেই ফুটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল মাকে দেখিয়াই গণেশজননীর বা ম্যাডোনার ভিতরে দৈবী প্রতিভাশালী শিল্পী যে অদ্ভুত রস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তার আস্বাদন পাই না। পথে ঘাটে কত-শতবার কত শত শত রমণীকে আপনার সন্তানের মুখে স্তন দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায় ; কিন্তু র‍্যাফেল্‌ তাঁর ম্যাডোনাতে যে অপূর্ব্ব বাৎসল্যরসটী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, পথে-ঘাটের এই সকল মায়ের ভিতরে তো তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না। ইহার কারণ এই যে, এ সকল পথে-ঘাটের মাতৃ-মূর্ত্তিতে বাৎসল্যরসের বিশ্বজনীনত্বটুকু পরি-স্ফুট হয় নাই। এ সকল রস বিশিষ্ট, বিশ্ব-জনীন নহে। র‍্যাফেল্‌ বিশাল বিশ্বের বাৎসল্যকে ছাঁকিয়া আনিয়া, সেই রসে এই অমৃতময়ী জননীমূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। মা-বস্তু রসময়ী, রসাত্মিকা। ম্যাডোনা এই রসের মূর্ত্তি। ম্যাডোনা সকলের মা। বাৎসল্যরস যেমন বিশ্বজনীন, সেই রসের সত্য মূর্ত্তিও সেইরূপই বিশ্বজনীন হওয়া চাই। এই রসের যে মূর্ত্তি, তাহা শ্বেতকৃষ্ণ, হিন্দুম্লেচ্ছ—সকলেরই প্রকৃত জননীমূর্ত্তি। ম্যাডোনার মাহাত্ম্যই এই যে, ইহা বাৎসল্যের বিশ্ব-মূর্ত্তি। ম্যাডোনা বিশ্বজননী। আর ম্যাডোনার কোলে যে অনিন্দ্যরূপ শিশু প্রভাত-অরুণের আভা অঙ্গে মাখিয়া মাতৃবাহুলীন হইয়া আছে, সেও কোনও ব্যক্তিবিশেষের সন্তান নহে, কিন্তু বিশ্বের সন্তান। বিশাল বিশ্বে অগণ্যকোটী জীবের শরীর-মনের ভিতর দিয়া যে বাৎসল্য নিয়ত প্রবাহিত হইয়া, অনন্তজীবপ্রবাহকে রক্ষা করিতেছে, ম্যাডোনা সেই নিখিলবিশ্বের মাতৃশক্তিরই প্রতিচ্ছবি। আর তাঁর কোলের এই শিশুটী বিশ্ববাৎসল্যের উপজীব্য ও উদ্দীপনা—সন্তানাবতার। এই বিশ্ব সম্বন্ধটীকে বিশদ করিয়াই ম্যাডোনা রসমূর্ত্তি হইয়াছে।

এই বিশ্বসম্বন্ধটীও কাব্যের একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ। বাক্য একদিকে যেমন রসাত্মক হইবে, অন্যদিকে সে রসটাও আবার বিশ্বজনীন হওয়া আবশ্যক। রসাত্মকতা যেমন, সেইরূপ এই বিশ্বজনীনত্বও কাব্যের বিশেষ লক্ষণ, ইহার একটীকে ছাড়িয়া দিলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না। ফলতঃ যে কাব্য কোনও না কোনও রসের বিশ্বজনীনত্বকে ফুটাইয়া তোলে না, তাহা যতই কেন শ্রুতি-মধুর বা চিত্তোন্মাদকর হউক না, সে কাব্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা তো দূরের কথা, আদৌ কাব্যত্বেরই দাবী করিতে পারে না। লোককে হাসান, কাঁদান, নাচান, মাতান—

এ সকল যে বড় একটা বেশি কথা, তাহা নয়। যাত্রাওয়ালার সং যারা দেয়, তারা সামান্য মুখবিকৃতি করিয়াই বালকের দলকে হাসাইয়া অস্থির করিয়া তোলে। কিন্তু হাস্য-রসের অবতারণা করে বলিয়া সেই মুখ-বিকৃতিকে কেহ কাব্যসৃষ্টি বলিবে না। আর ইহা কাব্যসৃষ্টি নয় এইজন্য যে, হাস্যরসের যে একটা বিশ্বজনীনতা আছে, সে গুণটী এখানে ফুটিয়া উঠে না। সেইরূপ লোককে কাঁদানও সহজ, কিন্তু সেই কান্নার ভিতরে বিশ্বব্যাপী যে ক্রন্দনরোল দিবানিশি প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে, তার সুর জাগাইয়া তোলা কঠিন। আর যতক্ষণ না সে সুর বাজিয়াছে, ততক্ষণ ক্রন্দনের মধ্যে কারুণ্য জাগে না, আর সে কান্নাতে কাব্যসৃষ্টিও হয় না। দুটো লোককে বাহ্বাস্ফোট করিয়া, পর-স্পরকে মারিতে যাইতে দেখিলেই, দর্শক-গণের শরীর মনেও একটা ঘুষোঘুষি করিবার উদ্দীপনা আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। এই মারামারি ব্যাপারটা যে রসাত্মক ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ছবি বা বর্ণনাকে কি কেউ কখনও কাব্য বলিবে? বার বৎসর পূর্ব্বে, ব্রিটিশ-বুয়র যুদ্ধের সময় রুড্‌ইয়ার্ড কিপ্‌লিং এরূপ কবিতা ও গান লিখিয়া ইংরেজ জাতটাকে একেবারে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু কিপ্‌লিং-এর আর কোনও কবিতা সাহিত্যের স্মৃতি-মন্দিরে রক্ষিত হইবে কি না, জানি না; এগুলি যে স্থান পাইবে না, ইহা স্থিরনিশ্চিত। ইতিমধ্যেই, সে সাময়িক ও সামরিক উত্তেজনার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কিপ্‌লিংএর সে সকল কবিতাও লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। আমাদের নিজেদের ঘরেই তার বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। স্বদেশীর উত্তেজনার ও উদ্দীপনার মুখে ছোট-বড়, নূতন-পুরাতন, কত বাঙালী কবিই তো কত গান রচনা করিয়া-ছিলেন। সে সময়ে সেগুলি কতই না প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু সে সকলই তো আর কাব্য হয় নাই। এমন কি বাংলার কবীন্দ্র-শিরোমণি রবীন্দ্রনাথও সে সময় যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তার কয়টী সঙ্গীতই বা প্রকৃত কাব্যরসের দাবী করিতে পারে? রবীন্দ্রনাথের—

"বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি এমন শক্তিমান্‌!"
"একলা চলো রে।"—

প্রভৃতি অনেক গানে সে সময় দেশের ছেলে বুড় সকলকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কিপ্‌লিংএর প্যাট্রিয়টিক্ গানের মতন রবীন্দ্রনাথের এ সকল গানেতেও কোনও বিশ্বসুর বাজিয়া উঠে নাই। যে উত্তেজনার জোয়ারের মুখে এগুলি ভাসিয়া আসিয়াছিল, আবার অবসাদের ভাঁটার মুখে আপনি তারা সরিয়া গিয়াছে। এগুলি জাতীয়জীবনের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য হইলেও জাতীয় সাহিত্যের স্মৃতি-মন্দিরে কখনওই প্রতিষ্ঠালাভ করিবে না; আবার এই স্বদেশীর মুখেই এমন দু'চারিটী সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার ভিতরে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজিয়াছে, আর সেই জন্য এইগুলি আমাদের জীবনের ও সাহিত্যের চিরন্তন উদ্দীপনারূপে চিরদিন জাগিয়া রহিবে। রবীন্দ্রনাথের "সোনার বাংলা," এই একটী। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহা-শয়ের "আমার দেশ" বোধ হয় এ সকলের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দুইটী সঙ্গীতই প্রকৃত কাব্য। রসাত্মকতা ও বিশ্বজনীনতা এই দুই লক্ষণই ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সোণার বাংলা" ও 'আমার দেশ" উভয়েরই দেবতা এই বঙ্গভূমি সত্য। কিন্তু বঙ্গমাতৃকাকে আশ্রয় করিয়া ইঁহাদের কবিপ্রতিভা যে রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বঙ্গের ভৌগোলিক সীমাতে আবদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ রসমাত্রেই বিশিষ্ট আধারেতে ফুটিয়া উঠে। বিশেষ দাসেতে দাস্য, বিশেষ সখাতে সখ্য, বিশেষ পিতা কি মাতাতে বাৎসল্য, নায়ক বা নায়িকা বিশেষেই মধুর রস ফুটিয়া উঠে। এই সকল বিশিষ্ট আধার বর্জ্জিত হইয়া কোনও নিরাধার নিরাকার নির্ব্বিশেষ ও সার্ব্বজনীন দাস্য বা সখ্য বা বাৎসল্য বা মাধুর্য্য রস জগতে কোথাও নাই। এই সকল বিশিষ্টের মধ্যেই বিশ্বজনীন রসমূর্ত্তি প্রকট হয়, তাহাদের বাহিরে হয় না। সুতরাং "সোণার বাংলার" কিম্বা "আমার দেশের" অভিধেয় বঙ্গভূমি বলিয়া ইহাদের মধ্যে দেশভক্তির সার্ব্বজনীন সুরটী বাজিয়া উঠে নাই, বা উঠিতে পারে না, এমন বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর "বন্দে মাতরম্"এতে কেবল বাংলার কথাই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মা'র বন্দনা করিয়াছেন, তিনি এই সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্য শ্যামলা, সপ্তকোটীসন্তানজননী বঙ্গভূমি। তথাপি এই বিশাল ভারতভূমির যে যেখানে এই গান শুনিয়াছে ও তার অর্থবোধ করিতে পারিয়াছে সেই ইহাকে আপনার দেশমাতার বন্দনা বলিয়া অমনি গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ সপ্তকোটী কাটিয়া ত্রিংশৎকোটী করিয়াছেন, জানি। কিন্তু এরূপ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই 'বন্দে মাতরম্' এতে কবি যে সুরটা বাজাইয়াছেন, তাহা কেবল বাংলার দেশমাতার বন্দনাগীতি নহে, কেবল ভারতের দেশমাতার বন্দনাগীতিও নহে, তাহা বিশ্বজনীন দেশভক্তির নিত্যসাধ্য ও নিত্যসিদ্ধ সুর। এ সুর যে যে গ্রামেই গাউক না কেন, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই নিত্যকাল বাজিয়াছে ও বাজিতেছে। ফলতঃ কোনও কাব্যের দেশকালপাত্রাদিতে বিশেষত্ব কদাপি তার বিশ্বাত্মকতা বা বিশ্বজননীতা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করে না। এই সকল বিশেষত্ব বা বিশিষ্টকে লইয়াই তো এই বিশাল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। এ সকল বিশিষ্টের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। বিশ্ব অঙ্গী, বিশিষ্ট যাহা কিছু তারা এই অঙ্গীর অঙ্গ। অঙ্গীতে অঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠিত। আবার অঙ্গেতেও অঙ্গী, অঙ্গের কর্ম্মের প্রেরণা রূপে, নিগূঢ় ভাবে নিত্য বিরাজিত। অঙ্গী অঙ্গকে ছাড়িয়া থাকে না, অঙ্গও অঙ্গীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তবে অঙ্গ কখনও কখনও মোহ-বশতঃ আপনাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবিয়া অঙ্গীকে উপেক্ষা করিতে পারে বটে। আর তখনই অঙ্গেতে অঙ্গীর সুরটা বাজিয়া উঠিতে পারে না। তানপুরার কোনও একটা তার যদি যন্ত্রের অপর তারগুলির সঙ্গে সঙ্গত্ না বাঁধিয়া আপনি আপনার একটা নিজস্ব ঝঙ্কার তুলিতে আরম্ভ করে, তখন সে যেমন বেসুরা হইয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষও যখন বিশ্বসঙ্গীতের অপরাপর তারের সঙ্গে সঙ্গত্ না করিয়া, কেবল আপনার ক্ষুদ্র, বিশিষ্ট, বিচ্ছিন্ন সুরটা ভাজিতে থাকে, তখন সেও বিশ্বজনীন জ্ঞান

ও রসের ধারা হইতে সরিয়া গিয়া অজ্ঞান ও অরসিক হইয়া পড়িয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরং" বলিয়া বঙ্গমাতারই বন্দনা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তাঁর সম্মুখের দেবপ্রতিমা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্না হইলেও যে সুরে তিনি এই দেবতার ভজনা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বের, বিশিষ্ট দেশের বা কালের নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" সম্বন্ধেও সেই কথা। এই সঙ্গীতে কবি বাংলার জীবনেতিহাসটী গাঁথিয়া দিয়া, বাঙালীর নিকটে ইহাকে অদ্ভুত সত্যোপেত, বস্তুতন্ত্র, ও শক্তিশালী করিয়াছেন বটে; কিন্তু এগুলি মূল রসের আলম্বন ও উদ্দীপনা মাত্র। সেই রস ফুটিয়াছে

কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ,
কিসের লজ্জা কিসের ভয়?—

এই অপূর্ব্ব ভক্তির এই অপূর্ব্ব ত্যাগ ও স্পর্দ্ধাতে। আর ফুটিয়াছে শেষ পদে যেখানে কবি দেশমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার আমার দেশ!

এ ভাব ও ভক্তি কোনও দেশেতে বা কালেতে আবদ্ধ নহে। ইহা স্বদেশপ্রেমিকের সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ভাব। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসঙ্গীত অনেক আছে। তার কোনও কোনওটাতে যে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজে নাই, তাহাও নহে। কিন্তু যে তেজ, যে গর্ব্ব, যে স্পর্দ্ধা, যে ভক্তি, যে নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা ও নিঃশেষ আত্মদান দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই গানে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলা ভাষায় আর কোথাও জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সঙ্গীতের মধ্যে "নববর্ষের গান"

—হে ভারত আজি নবীন বর্ষে,
শুন এ কবির গান!

এবং "অয়ি ভুবনমনমোহিনী" এই দুইটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট! এই দুইটীতেই স্বল্পবিস্তর একটা বিশ্বজনীনতার ভাব রহিয়াছে! কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশে" এই সুরটা যতটা পঞ্চমে চড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কোনও সঙ্গীতে ততটা উঠে নাই। আর এই বিশ্বজনীনতার জন্যই দ্বিজেন্দ্রলালের এই সঙ্গীতের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য।

"এষার বিশেষত্ব"

যে কারণে বাংলা ভাষার স্বদেশ-সঙ্গীতের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" এরূপ অনন্যলব্ধ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই, কেবল বাংলার নহে, কিন্তু সম্ভবতঃ সমগ্র সভ্যজগতের আধুনিক সাহিত্যে অক্ষয়-কুমারের এই 'এষা' খানি, শোকসঙ্গীতের মধ্যে একটা অনন্যলব্ধ সত্য এবং সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ জগতে বিরহ-বিষাদ নিতান্ত বিরল নহে। অপিচ সৃষ্টির অনাদি আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবন ও মরণ আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়াই রহিয়াছে।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং—

মর্ত্ত্যের ইহা চিরন্তন অভিজ্ঞতা। আর সেই জন্য শোকও মানুষের সাধারণ নিয়তি। যেখানে আলোক সেইখানেই যেমন ছায়া, যেখানে জীবন সেইখানেই যেমন মৃত্যু; সেইরূপ যেইখানেই ভালবাসা সেইখানেই বিরহ ও শোক। যেই খানেই এ সংসারের দুটী প্রাণীতে কোনও প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে

সেই খানেই, বরুণের ন্যায়, মৃত্যুর ছায়া ও শোকের নিঃশ্বাস, তৃতীয় হইয়া তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ায়। জীবনের মাঝখানেও আমরা মৃত্যুকে ভুলিতে পারি না। মিলনের গভীরতম আনন্দালোকের মাঝখানেও বিরহের কৃষ্ণমেঘ সকল সর্ব্বদা উড়িয়া বেড়ায়।

সুমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

এই বিরহ-ভীতি প্রেমের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। জননী সন্তান বুকে ধরিয়া যখন এক চক্ষে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তখনও আর এক চক্ষু বিরহাশঙ্কায় শোকজলে ভরিয়া আসে, এবং অমঙ্গল চিহ্ন ভাবিয়া তিনি তখন জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া রাখেন! অন্ধকার রজনীতে পেচকের ধ্বনি শুনিলে কুলকামিনীরা যেমন দূর দূর করিয়া উঠেন, সেইরূপ মানুষ মাত্রেই প্রিয়জনসঙ্গসুখমাঝেও এক একবার মৃত্যুর সাড়া পাইয়া, দূর দূর করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহে। প্রেম যেখানে যত বেশি, শোকভীতিও সেইখানে তত বেশি। জীবনবস্তু যেমন বিশ্বজনীন, মৃত্যুব্যাপারও সেইরূপ বিশ্বজনীন। শোকও সেই জন্য একটা বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা। পুত্রশোকাতুরা জননী ভগবান বুদ্ধদেবের নিকটে পুত্রের প্রাণ চাহিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে বলেন, যে বাড়ীতে কখনও কেউ মরে নাই, সে বাড়ী হইতে এক মুষ্টি শস্য ভিক্ষা করিয়া লইয়া আইস, তোমার পুত্রকে বাঁচাইয়া দিব। দেশময় ঘুরিয়া অবোধ রমণী এমন ভিক্ষা কোথাও পাইল না। তখন বুদ্ধদেবের কৃপায় তার বিবেক জাগিয়া উঠিল। শোক কে না পাইয়াছে? মৃত্যুর হাহাকার কার প্রাণে না উঠিয়াছে? এমন কে আছে যে এ সংসারে স্নেহপ্রেমাদির আস্বাদন করিয়াছে, অথচ মৃত্যুর তীব্র বিষাক্ত হুল যার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া যায় নাই? অক্ষয়কুমারের এই গীতিকাব্যের উৎপত্তি শোকে, ইহার বিষয় জীবনমৃত্যুর নিত্য সমস্যা। এ অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন। এ সমস্যা সার্ব্বজনীন। আর সেই জন্যই ইহা কাব্যসৃষ্টির উৎকৃষ্ট উপকরণ।

অনেক লোকে এই সামান্য কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তারা ভাবে, শোকটা শোকার্ত্তের অন্তরঙ্গ বস্তু, তার নিজস্ব জিনিষ। যুন দম্পতির নববাসর-প্রকোষ্ঠ যেমন অপরের দেখিবার নয়; সে প্রকোষ্ঠের কবাট খুলিয়া দিলে মাধুর্য্যের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়; শোক এবং বিরহও সেইরূপ তুনিয়াকে দেখাইবার বা জগতে জাহির করিবার বস্তু নহে, বহিঃপ্রকাশে তার গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। সত্য ও গভীর শোক আপনার চাপে আপনি প্রাণের ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠে, চোকের ভিতর দিয়া পর্য্যন্ত গলিয়া বাহির হয় না, মুখে ব্যক্ত হওয়া তো দূরের কথা। শোকের প্রথম প্রকোপে তাহাই হয় বটে। কিন্তু এই জমাট, নীরব, নিরশ্রু শোক তখন কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তিবিশেষের অনুপ্রমাণ প্রাণের মধ্যে নিষ্পিষ্ট ও নিবদ্ধ। শোকার্ত্ত তখন আপনি আপনাতেই নিমগ্ন। আপনার মায়ায় আপনি দৃষ্টিহীন। আপনার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের ভাবে ও ভাবনায় আপনি আচ্ছন্ন। শোকবস্তু যে কেবল তার নিজের নয়, সকলের,

জগতের, বিশ্বের,—বিধান ; এ কথা তখন সে ভুলিয়া গিয়াছে, মনে করাইয়া দিলেও তার বিপরীত অর্থ করিয়া দেয় ; বলে—"তাতে আমার কি হইল ? আরও দশজনের প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইয়াছে বলিয়া, পোড়ার যাতনাটা যে আমার হবে না, বা কমিবে, তার তো কথা নাই।" সহৃদয় স্বজনবর্গ যত তাহাকে নিজের আলোহীন, বায়ুহীন, শব্দ-হীন, স্পন্দহীন, নিরেট, নিঠোল আমিত্বের সূচ্যগ্রপ্রমাণ ছিদ্র হইতে টানিয়া বাহিরে আনিতে চান, ততই সে জোর করিয়া সেই বিবরেই আরও ঢুকিয়া যাইতে চাহে। শোকটা এইরূপে যে আমারই ভাবে, সে কদাপি তার বিশ্বজনীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই শোক তামসিক। ইহা ভ্রমপ্রমাদাদি-প্রসূত। এ শোক দেহসর্ব্বস্ব ও অহংসর্ব্বস্ব। এই স্থূল, জড়, কঠোর বস্তু লইয়া কোমল কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

কিন্তু শোকের আর একটা দিক্‌ও আছে। শোকের আঘাতে মানুষ যেমন কখনও কখনও দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ কখনও কখনও দিব্যদৃষ্টিও লাভ করিয়া থাকে। যে স্নেহ, যে প্রেম, যে সেবা জীবনে এক আধারেতে নিবদ্ধ হইয়াছিল, মৃত্যু যখন সে আধার হরিয়া লইয়া যায়, তখন প্রথমে নিরাশ্রয় প্রেম কিছুকাল হাহাকার করে, কিন্তু ক্রমে বিশ্বময় ছড়াইয়াও পড়ে ?—কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও তো দেখা গিয়াছে। ফলতঃ ইহাই বিশ্ববিধানে শোক ও বিরহের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট নিয়তি। এই নিয়তি লাভ না করিলে, শোক ও বিরহ কদাপি সম্যক্ সফলতা লাভে সমর্থ হয় না। আর শোক যখন শোকার্ত্তের ক্ষুদ্রজীবনের সংকীর্ণ পরিধিকে ছাড়াইয়া গিয়া, বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়, তার দুঃখ যখন জগতের দুঃখ, তার বেদনা যখন বিশ্বের বেদনা, তার সমস্যা যখন বিশ্বসমস্যা হইয়া পড়ে, তখনই সে শোককাব্যের উপ-যোগী উপাদান হইয়া উঠে। শোকে তখন আমার তোমার এ ভেদাভেদ থাকে না। তখন ইহা বিশ্বের হইয়া যায়।

শোক যখন এই বিশ্বজনীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা প্রকৃত কাব্যসৃষ্টির উপকরণ হইয়া থাকে। অক্ষয়কুমার তাঁর 'এষা'কে যে শোকের উপরে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে। এই জন্যই তাঁর নিতান্ত নিজের কথা ও ব্যথা যাহা, তাহাও তোমার আমার সকলেরই কথা ও ব্যথা হইয়া পড়িয়াছে। 'এষা'র শ্রেষ্ঠত্বের মূল তত্বটা এই। কবি এখানে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া, সমগ্র মানব প্রাণের সঙ্গে সঙ্গত মিলাইয়া, তবে আপনার শোকগাথা গান করিয়াছেন। তাই তাঁর 'এষা'র মধ্যে প্রত্যেক শোকার্ত্ত পাঠক আপনাকে দেখিতে পাইয়া, এবং আপনার অন্তরের শোকের বা শোকস্মৃতির বিশ্বজনীনত্বটুকু উপলব্ধি করিয়া, চকিত, স্তম্ভিত, পুলকিত হইয়া উঠে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

৩। কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও স্তোত্র

কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও স্তোত্র যে দ্বিসহস্র বৎসরেরও অধিককাল যুধিষ্ঠিরাদির স্মৃতিরক্ষা করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। কি কালিদাসের শকুন্তলায়, কি ভারবির কিরাতার্জুনীয়ে, কি মাঘের শিশুপালবধে, কি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে, কি ভট্টনারায়ণের বেণীসংহারে, কি শঙ্করাচার্য্যের অচ্যুতাষ্টকাদি স্তোত্রে, কি অস্মৎকালীন রামনাথ তর্করত্নের বাসুদেববিজয়ে ও চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের চন্দ্রবংশে মহাভারতের কোন না কোন চরিত্র বর্ণিত। বাণভট্ট প্রভৃতি গদ্যলেখকও অর্জ্জুনাদির উল্লেখ করিয়াছেন। দণ্ডী, বামন, ভোজরাজ, মম্মঠ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও মহাভারতের নিখিল চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি বলেন যে Homer ও Vergil-এর কল্পিত চরিত্রগুলিও ঐরূপ প্রতীচ্য সাহিত্যে বহুল প্রচলিত আছে; সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখ দ্বারা পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ হয় না। তাহার উত্তর এই যে Illiad বা Aniedএর চরিত্রগুলির সত্যতাপোষক কোন প্রমাণ নাই, যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্ব প্রবাদ, পুরাণ ও তাম্রশাসন প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত। অতএব কাব্য প্রভৃতিতে তাঁহাদের উল্লেখ তাঁহাদের সত্বার পরিপোষক প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

৪। ঐতিহাসিক গ্রন্থ

(ক) কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী

কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী প্রধানতঃ কাশ্মীরের ইতিহাস হইলেও উহাতে ভারতের অন্যান্য দেশের ঘটনার উল্লেখ আছে। উহার মতে যুধিষ্ঠির কাশ্মীররাজ প্রথম গোনর্দ্দের সমসাময়িক এবং কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে আবির্ভূত হন, এই বিষয় মহাভারতের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে বিশদরূপে বিবৃত হওয়ায় এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হর্ষচরিতাদির ন্যায় সংস্কৃতজীবনীগ্রন্থেও ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরাদির উল্লেখ আছে।

(খ) রাজপুতানার রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি অনুবংশ গ্রন্থ

রাজপুতানার রাজতরঙ্গিণীতে যুধিষ্ঠিরের অব্দ প্রচলন থাকা উল্লিখিত আছে। যুধিষ্ঠিরাদি ঐতিহাসিক পুরুষ, তাহা রাজপুতানার সকল চারণ, কবি আবহমান বিশ্বাস করিয়াছেন। রাজপুতানার বংশসংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থে কুরুপাণ্ডবগণ ঐতিহাসিক পুরুষ বলা আছে। পরীক্ষিৎ হইতে রাজপাল পর্য্যন্ত চারিটি শাখার ৬৬ জন নৃপতি রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত। রাজপাল বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত ১০০ জন রাজা চৌহান বংশাবলী সংক্রান্ত গ্রন্থনিচয়ে দেওয়া আছে। এই সমস্ত

নিদর্শন দেখিয়া Todd সাহেব যুধিষ্ঠিরাদির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

৫। তাম্রশাসনাদি

সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে হিন্দু প্রাচীন নৃপতিগণের দানপত্র, প্রশস্তি প্রভৃতি নানাবিধ তাম্রশাসন শিলালেখ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রত্নতত্ত্বগণের অধ্যবসায়ে আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রামাণিক প্রাচীন লেখমালাও মহাভারতের ঐতিহাসিকতার সাক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ, বিদুর, রুক্মিণী প্রভৃতি মহাভারতের যাবতীয় পুরুষ ও নারী উপমানস্বরূপ ঐ সমস্ত লেখ্যে বার বার উল্লিখিত হইয়াছেন। শক ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত উঁহাদের উল্লেখ দেখাইবার জন্য নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের ১৬ খানি দানপত্র ও প্রশস্তি হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

১। ভোজরাজ বংশীয় অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের দানপত্র—১২৭২ শক, ১৫ভাদ্রপদ, বুধবার।

এই দানপত্রে ভীম, যুধিষ্ঠির ও কংসজিৎ কৃষ্ণের উল্লেখ নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকে পাওয়া যায়।

ভীমেনাপি ধৃতা মূর্ধ্নি যৎপাদা স যুধিষ্ঠিরঃ।
বংশাস্তেনেন্দুনা জীয়াৎ স্বতুল্য ইব নির্ম্মিতঃ॥
পরমারকুলোত্তংসঃ কংসজিন্মহিমা নৃপঃ।
শ্রীভোজদেব ইত্যাসীন্নাসীরাক্রান্তভূতলঃ॥

২। পদ্মনাথ দেবালয়ে সমুৎকীর্ণ প্রশস্তি ১১৫৪ সম্বৎ। এই প্রশস্তিতে রাজা দেবপালকে কর্ণ, পার্থ ও ধর্ম্মরাজের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; যথা—

ত্যাগেন কর্ণমজয়ৎ পার্থং কোদণ্ডবিদ্যয়া।
ধর্ম্মরাজঞ্চ সত্যেন স যুবা বিনয়াশ্রয়ঃ॥১৫শ্লোক

এই প্রশস্তির ৪৯ শ্লোকে চতুর্থ চরণে বৃকোদরের নাম আছে; যথা—

কস্ত্বং কবীন্দ্রকৃতমোদ বৃকোদরস্য।

৫০ শ্লোকে অর্জ্জুনের গন্ধর্ব্বরাজজয়ের কথা আছে, যথা—

একস্ত্বমীশ ভুবি ধন্বভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
সস্বামিকারিগণ-দর্পহরস্ত্বমাজৌ।
গন্ধর্ব্ব রাজপৃতনা বিজয়াপ্তকীর্ত্তি—
স্ত্বং কোঽসি সুন্দর পুরন্দরনন্দনস্য॥

৫১ শ্লোকে দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন ও বিকর্ত্তন অর্থাৎ কর্ণের নাম আছে, যথা—

দুর্য্যোধনারিবলদর্পহৃতস্তবেশ
যত্নঃ পরার্জ্জুনযশঃপ্রসরং নিরোদ্ধুম্।
স্বং কোঽসি সূর্য্যজনিতপ্রমদার্থিসার্থ-
দৌর্গত্যকর্ত্তনবিকর্ত্তনসম্ভবস্য॥

নিম্নে ৬১ শ্লোকে পুনরায় পার্থ ও ব্যাসদেবের নাম উল্লেখ হইয়াছে এবং উত্তর-গোগৃহ যুদ্ধের ব্যাপার বলা হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে শ্লোক দেওয়া হইল না।

৩। নেপালক্ষিতিপাল বংশাবলী—নেপাল সংবৎ ৭৮৭, এই প্রশস্তিতে যক্ষ মল্লকে কর্ণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

তৎপুত্রো যক্ষমল্লঃ প্রবল রিপুহরঃ কর্ণতুল্যোঽবনীশঃ।

তৎপুত্র রত্নমল্লকে পার্থতুল্য বলা হইয়াছে।

৪। নেপাল মহীপাল সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের প্রশস্তি নেপাল সং ৭৫৭। ইহাতে হরিহর সিংহকে কর্ণোপম বলা হইয়াছে।

তনয়োঽস্য বিনয়পূর্ণো বভূব
কর্ণোপমো ভূমৌ—

হরিহরসিংহনরেন্দ্রো বসুধাচন্দ্রো
বভুবাহসৌ—

সিদ্ধি নৃসিংহ মল্লকে (ভীমানুজঃ সাহসে) বলা হইয়াছে এবং তিনি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা প্রতিষ্ঠাশালী, ও তাহার বাকৃপটুতা ব্যাসতুল্য বলা আছে। পুনরায় তাঁহার যুদ্ধশক্তি বর্ণনা কালে তাঁহাকে পার্থিবঃ পার্থতুল্যঃ বলা হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞেরও উল্লেখ দেখা যায় ; যথা—

রাজসূয় ইবারন্ধো মধ্যস্থেন মহীভুজা।

তাঁহার উপাধ্যায় বিশ্বনাথ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

যো ব্যাসবদ্বিবিধবৈদিকমন্ত্রপাঠে।

৫। যাদববংশোদ্ভব বীর বল্লালদেব মহীপতির দানপত্র, ১১১৪ শক। এই দানপত্রে শ্রীহরি যে কৃষ্ণরূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে।

৬। কাটদণ্ডনাথের দানপত্র, কুল নিকট মনায়ক ১০৫৬ শক। এই দানপত্রে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে

যো ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্রপ্রতিনিধিরবনিত্রাণনে
হি কার্ত্তবীর্য্যঃ
প্রায়ঃ শৌর্য্যে কিরীটীস্ফুটমহিমরুচা
তুল্য এব প্রতাপে।
ঔদার্য্যে কর্ণকল্পঃ স্মরইব বপুষি-
স্মাসদৃক্ষঃ ক্ষমায়াং
সৌজন্যে যস্য লোকে কথমপি সদৃশো
বিক্রমাদিত্যএব ॥

৭। চালুক্যবংশীয় চোড়নৃপতির দানপত্র ১০০১ শক। এই দানপত্রে ব্রহ্মা হইতে জনমেজয়ের পৌত্র পর্যন্ত চন্দ্রবংশ মহাভারতের অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে। শান্তনু হইতে এইরূপে বংশাবলী আছে—

শান্তনু
বিচিত্রবীর্য্য
পাণ্ডুরাজ
অর্জ্জুন
অভিমন্যু
পরীক্ষিৎ
জনমেজয়
ক্ষেমুক
নরবাহন
শতানীক
উদয়ন

অর্জ্জুনের খাণ্ডবদাহ পাশুপতাস্ত্র লাভ, কালকেয়াদি-দৈত্যবিনাশ প্রভৃতি অবদানেরও উল্লেখ আছে।

৮। শিলাহার বংশোদ্ভব শ্রীছিত্তরাজ দেবের দানপত্র ৯৪৮ শক। ইহাতে অপরাজিত রাজা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

কর্ণস্ত্যাগেন যঃ সাক্ষাৎ সত্যেন চ যুধিষ্ঠিরঃ।

৯। চালুক্যবংশীয় রাজরাজাপরনামা শ্রীবিষ্ণুবর্দ্ধনের দানপত্র, ৯৪৪ শক।

এই দানপত্রেও চন্দ্রবংশের আমূল পরিচয় আছে। শান্তনু, বিচিত্রবীর্য্য, পাণ্ডু, পাণ্ডব, অর্জ্জুন, অভিমন্যু, পরীক্ষিৎ, জনমেজয় প্রভৃতি সকলেরই নাম আছে এবং তাঁহাদের বংশধর বলিয়া বিষ্ণুবর্দ্ধন আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

১০। শ্রীধরণী বরাহাখ্য নৃপতির দানপত্র ৮৩৬ শক। ইহাতে ধরণী বরাহ নৃপতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে

যস্ত্যাগশৌর্য্য সৌভাগ্যগর্ব্বিতঃ কর্ণ পার্থ
কুসুমশরান্।
হ্রেপয়তীবাধিকতর নিজচরিতৈর্লীলয়ৈব নৃপঃ॥

১১। রাষ্ট্রকূট বংশোদ্ভব শ্রীধ্রুবরাজের দানপত্র, ৭৮৯ শক। এই দানপত্রে শ্রীকর্ক্করাজ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

পার্থঃ সদৈব ধুরুষি প্রথমঃ শুচীনাম্।

১২। রাষ্ট্রকুট বংশীয় কর্করাজের দানপত্র ৭৩৪ শক। কর্করাজের পিতৃব্য গোবিন্দরাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধে পার্থ অর্জ্জুন উল্লিখিত—

চক্রে তথাহি ন তথাস্ত বধং পরেষাং
পার্থোঽপি নাম ভুবনত্রিতয়ৈকবীরঃ ॥

১৩। সূর্য্যবংশীয় প্রতাপমল্ল নৃপতির প্রাসাদ প্রশস্তি—সংবৎ ৭৬৯। প্রতাপমল্লের পত্নী রূপমতীকে "সাক্ষাৎপরা রুক্মিণী" বলা হইয়াছে।

১৪। মন্দসোরকূপস্থিত প্রশস্তি— সংবৎ ৫৮৯। ইহাতে ভগবদ্দোষকে বিদুরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; যথা "বহুনয়-বিধিবেধা গহ্বরেঽপ্যর্থমার্গে বিদুর ইব বিদুরং প্রেক্ষয়া প্রেক্ষমাণঃ"।

১৫। মন্দসোরের সূর্য্যমন্দির প্রশস্তি —সং ৫২৯। ইহা সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তবংশীয় কুমার গুপ্তের কালীন। কুমার গুপ্তের সামন্ত নৃপ বিশ্ববর্ম্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

"রণেষু যঃ পার্থসমানকর্ম্মা বভূব
গোপ্তা নৃপবিশ্ববর্ম্মা"

১৬। কোটাপ্রান্তস্থবিহার প্রশস্তি, সংবৎ ৭। মাঘশুদি ইহাতে ও সর্ব্বনাগের পত্নীর গুণ বর্ণনা কালে কৃষ্ণ ও শ্রীর উল্লেখ হইয়াছে।

তস্যাভূদ্দয়িতা বিশুদ্ধযশসঃ শ্রীরিত্যুরঃ-
শায়িনী
কৃষ্ণস্যেব মহোদয়া চ শশিনো জ্যোৎস্নেব
বিশ্বংভরা। ইত্যাদি।

উক্ত ষোড়শ দানপত্র ও প্রশস্তি হইতেই দেখা গেল যে, মহাভারতকার ও মহাভারতের যাবতীয় পুরুষের উল্লেখ আছে। এইরূপ উল্লেখ অন্যান্য তাম্রশাসনাদিতেও পাওয়া যাইবে। ইহাদের দ্বারা প্রমাণ হয় যে গত দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কুরুপাণ্ডবগণ যথার্থ জীব বলিয়া বিশ্বস্ত। যদি ঐরূপ পরম্পরিত প্রমাণে সন্তোষ না হন, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ

১৭। তদ্ভাতৃপ্রপৌত্র জনমেজয়ের দানপত্র দেখুন।

এই দানপত্র Indian Antiquiryর চতুর্থভাগে ৩৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। Bombay নির্ণয়সাগরপ্রেসের প্রাচীন লেখমালায় পুনর্মুদ্রিত। ইহার কাল যুধিষ্ঠিরাব্দ ৮৯।

ইহার দাতা মহারাজাধিরাজ বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্র জনমেজয়। তর্পণে ভীষ্মের প্রণামে জানা যায় যে ভীষ্মদেব বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্র, সুতরাং জনমেজয়ও সেই গোত্র সন্দেহ নাই। অতএব এই দানপত্রে "বৈয়াগ্রনীপাদগোত্রজঃ" শব্দ বৈয়াঘ্রপাদগোত্রজঃ শব্দের লিপিকর প্রমাদ সন্দেহ নাই। পশ্চিমদেশস্থ সীতাপুর বৃকোদরক্ষেত্রে তত্রত্য মুনিবৃন্দ মঠের সীতা-রামের পূজার জন্য এক ক্ষেত্র যতিগণের হস্তে দেওয়া হয়। সেই ক্ষেত্রের চতুঃসীমা এইরূপ—

উত্তরবাহিনী তুঙ্গ ভদ্রার পশ্চিমে, অগস্ত্য-শ্রমের উত্তরে, পাষাণ নদীর পূর্ব্বে, ভিন্না নদীর দক্ষিণে—

এই দানপত্রের জনমেজয় যে যুধিষ্ঠিরের বংশীয় তাহার পরিচয়

"অস্মৎপ্রপিতামহ যুধিষ্ঠিরাধিষ্ঠিত
"মুনিবৃন্দক্ষেত্রে"

ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট জানা যায়।—

কিষ্কিন্ধ্যানগরী হইতে এই দানপত্র হওয়ায় ইহা অবিশ্বাস্য নহে। রাজা জনমে-

জয় তক্ষশিলা প্রভৃতি জয় করেন, ইহা মহাভারতে লেখা আছে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত একচ্ছত্রাধিপ ছিলেন। দাক্ষিণাত্য বিজয়ও তাঁহার সম্ভব। সেইকালে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে সিংহাসনস্থ হইয়া উপরোক্ত ক্ষেত্র ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য যতিহস্তে দান সম্ভবপর। সীতাপুর নামে অযোধ্যায় এক জেলা আছে তাহা উক্ত দানপত্রের সীতাপুর কি না বলা কঠিন। তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার শাখা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উঠিয়াছে। ইহা অনেকদূর ভিন্না পর্য্যন্ত উত্তরবাহিনীও বটে। পাষাণ নদী ও ভিন্না নদীর নাম আজিকালি মানচিত্রে নাই। Wards বলিয়া তুঙ্গভদ্রার শাখা আছে তাহা কি ভিন্না? ভিন্না যদি কৃষ্ণার লিপিকর প্রমাদ হয় তাহা হইলে জনমেজয়ের প্রদত্ত ক্ষেত্রের নির্ণয় হইতে পারে। এই বিষয়ের মীমাংসা প্রত্নকত্ত্বগণের উপর ন্যস্ত হইল।

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ধর্ম্মপ্রচারক ও সাহিত্যিক

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১) ব্রাহ্মসমাজে নগেন্দ্রনাথ

একদিন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষিত বাঙালী সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এক কেশবচন্দ্র ছাড়া, তাঁর মতন অত বড় বক্তা বাংলাদেশে ছিল না, বলিলেও চলে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তখনও ততটা খ্যাতি লাভ করেন নাই। শিবনাথ বাবুর মতন শক্তিশালী বক্তা আজিও বাংলাদেশে আছে কি না সন্দেহ। একদিন এই শিবনাথ শাস্ত্রীও নগেন্দ্রনাথের নীচে ছিলেন। কোন্ দিন তিনি নগেন্দ্রনাথকে ছাড়াইয়া যান, নগেন্দ্রনাথ নিজেই সে গল্প করিতেন। ১৮৮৩—৮৪ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে "জাতিভেদ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতা বোধ হয় পুস্তকাকারে প্রকাশিতও হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে শিবনাথ বাবু অমন ওজস্বিনী বক্তৃতা আর কখনও করেন নাই। হাস্য, করুণ, রুদ্র প্রভৃতি রসের আশ্চর্য্য সমাবেশে এই বক্তৃতাটী অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। এই বক্তৃতার পরেই, মন্দির হইতে বাহির হইয়া, নগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "এতদিন আমি শিবনাথের উপরে ছিলাম, আজ শিবনাথ আমার উপরে চলিয়া গেলেন।"

নগেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যাহা আজ পর্য্যন্ত আর কোনও বাঙালী বক্তার মধ্যে দেখিতে পাই নাই। হাস্যকৌতুকের অবতারণায় নগেন্দ্রনাথের অদ্ভুত শক্তি ছিল। তিনি লোককে এতই হাসাইতেন যে বক্তৃতা করিতে উঠিবা মাত্রই

তাঁহাকে দেখিয়া, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে হাসির তরঙ্গ ছুটিয়া যাইত। অথচ তাঁর রসিকতায় কোনও কুরুচি কিম্বা তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে কখনও কোনও ঈর্ষাদ্বেষের গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত না। তাঁর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এমনই সরল, উদার, সুনিপুণ ছিল যে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এ সকল বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তারা পর্য্যন্ত তাহাতে ব্যথা পাওয়া দূরে থাক, আমোদই অনুভব করিত। কেবল কথার কৌশলে এটী কোথাও হয় না। প্রাণের নির্ম্মল দ্বেষহিংসাদিশূন্য ভাবেই কেবল লোকে বিপক্ষের মত খণ্ডন করিতে যাইয়াও তার প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে। এই নির্ম্মল ভাবটী নগেন্দ্র বাবুর ভিতরে চিরদিনই দেখিয়াছি।

নগেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার আর একটা বিশেষত্ব ছিল—তাঁর যুক্তি ও বিচারের সূক্ষ্মতা। ফলতঃ এ বিষয়ে নগেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা, বোধ হয়, কেশবচন্দ্রের দৈবী প্রতিভাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্দ্র ভাবুক লোক ছিলেন। তিনি ভাবরাজ্যেরই রাজা ছিলেন। ভাবকে জাগাইয়াই তিনি জনমণ্ডলীকে চকিত, পুলকিত, আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিতেন। সে মাদকতা নগেন্দ্রনাথের বা বাংলার আর কোনও বক্তার বক্তৃতাতে কখনও ছিল না, এখনও নাই। কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করিতে উঠিয়া অপূর্ব্ব ভোজের বাজি খেলিতেন। লাগ্ ভেলকী লাগ্ বলিয়া, সত্য সত্যই লোকের মনে অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া দিতেন। তাঁর কথার কৌশলে ও ভাবের বন্যায় অবস্তু বস্তু হইয়া উঠিত, শূন্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, ছাই মুঠো সোণাদানা হইয়া পড়িত। এ অদ্ভুত যোগসিদ্ধি তাঁর ছিল। ভাবের রাজ্যে বাঙালী যা পারে না, ভারত তাহা পারে না, জগৎ তাহা পারে না। আর কেশবচন্দ্র ভাবের ঘরে ঢুকিয়া এমন সব খেলা খেলিয়া গিয়াছেন, যাহাতে জন্মজন্মান্তরসিদ্ধ বাঙালী ভাবুকের দল পর্য্যন্ত বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা বড় বেশি একটা যুক্তি-প্রতিষ্ঠ হইত না। তর্কযুক্তির দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করা প্রবক্তাদিগের ধর্ম্মও নহে। প্রবক্তা ও কবি—একই বস্তু। এঁরা উভয়েই সত্যের সাক্ষ্য দান করেন, 'যে হেতু' 'অতএব'এর দ্বারা যুক্তিপরম্পরার উপরে আপনাদের শিক্ষা বা আদর্শকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন না। নগেন্দ্রনাথ প্রবক্তাও ছিলেন না, কবিও ছিলেন না, কিন্তু অতি উচ্চ দরের বাগ্মী মাত্র ছিলেন। আর তাঁর বক্তৃতার যুক্তিযুক্ততা নগেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার একটা বিশেষ ধর্ম্ম ছিল। তিনি লোককে মাতাইতেন না, কিন্তু সমজাইতেন। ভাবের আবেশে তাহাদিগকে আপনার পক্ষে টানিয়া আনিতেন না, কিন্তু যুক্তি ও তর্কের দ্বারা স্বমতের প্রতিষ্ঠা ও পরমত খণ্ডন করিতেন। আর এই পথে তিনি যাহাদিগকে সমজাইয়া শিখাইয়া কোনও বিশেষ তত্ত্বের সন্ধান দিতেন, তারা সেই তত্ত্বের উপরে স্থির ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিত।

নগেন্দ্রনাথ যে ভাবুক ছিলেন না, তাহা নহে। তাঁর মতন প্রকৃত ভাবুক লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁর ভাব সর্ব্বদা জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ ছিল। ভাবের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে, নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই, তাহার সত্যাসত্য পরখ করিয়া

লইতেন। সেণ্ট্ পলের উপদেশে আছে সকল বস্তুকে প্রমাণ প্রয়োগে আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, তার পর যাহা সত্য তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। (Prove all things and hold fast to that which is true)। নগেন্দ্রনাথ যেরূপ ভাবে এইটী সাধন করিয়াছিলেন, এমনভাবে আর কোনও ব্রাহ্ম করিয়াছেন কি না সন্দেহ। Prove all things—সর্ব্ববিধ বিষয়কে আগে পরখ করিবে, বড় কঠিন কথা। লোকের এই পরখ করিবার প্রবৃত্তিই সাধারণতঃ বড় কম। আর ধর্ম্মসমাজে এ প্রবৃত্তি সকলের চাইতে দুর্ল্লভ। যারা ধর্ম্মের দল বাঁধে, তারা সত্যকে তো লাভ করিয়াই বসিয়াছে; কোনও বিষয় পরখ করিবার প্রয়োজন-বোধ তাদের বড় থাকে না। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াও, সত্যলাভের এই সনাতন পন্থা কখনওই পরিত্যাগ করেন নাই। যে ভাব লইয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে আইসেন, সেই ভাব লইয়াই, এই সমাজে আপনার দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এমন মুক্ত মন ও বুদ্ধি, কি ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কি তার বাহিরে, কোথাও বেশী দেখি নাই। নগেন্দ্রনাথের প্রাণের দরজা জানালা সর্ব্বদাই যেন খোলা থাকিত। এক প্রভুপাদ বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্যতীত, আর কাহাকেও সত্যের এমন মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দেখি নাই। সত্য বস্তু যে নগেন্দ্রনাথের নিকটে কেবল প্রাচীন সমাজের শাস্ত্রাদি অপেক্ষাই বড় ছিল, তাহা নহে; আপনার দলের ও সম্প্রদায়ের মতামত, সিদ্ধান্ত ও সংস্কার অপেক্ষাও সত্য বস্তু তাঁর চক্ষে সর্ব্বদাই বড় হইয়া ছিল। আর সত্যের সংখ্যানাই যে তিনি বা তাঁর সম্প্রদায় নিঃশেষ করিয়া জানিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের মতের ও অভিজ্ঞতার বাহিরে,—এমন কি এ সকলের সঙ্গে সঙ্গতি খায় না, এমন সত্য যে দুনিয়ায় নাই বা থাকিতে পারে না,—নগেন্দ্রনাথ আমরণ একদিনও এমনটী ভাবিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর এই জন্যই তিনি সকল সাধনা ও সকল সম্প্রদায়কেই অতি উদার ভাবে দেখিতেন। থিয়সফি যখন এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণের মধ্যে এক নগেন্দ্র-নাথই, বোধ হয়, আগ্রহাতিশয় সহকারে, থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সভ্যপদ গ্রহণ করেন। এই জন্য তাঁহাকে তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুগণের হস্তে অনেকটা লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তো আর ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের কুড়ি বছরের সংস্কারকে সনাতন ও অনন্ত সত্যের আসনে কখনও প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সত্যের অন্বেষণেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের খাতিরে সত্যের সন্ধান করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের লোকে ইহা মানে কি না,—ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে কি না, নগেন্দ্রনাথ কোনও নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইলে, কদাপি এই সংকীর্ণ ও অনুদার প্রশ্ন তুলিতেন না। ইহা সত্য কি না, সেই প্রশ্নই তাঁর নিকটে সকলের চাইতে বড় প্রশ্ন ছিল। ব্রাহ্মেরা থিয়সফি মানে কি না, এ কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। থিয়-সফিতে কোনও সত্য আছে কি না, তারই বিচার করিলেন। আর থাকা অসম্ভব নহে দেখিয়া, সেই সত্যের সন্ধানেই তিনি থিয়সফির

দলভুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মেরা এই জন্য তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ এই নির্য্যাতনের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ব্রাহ্মদিগের খাতিরে তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসেন নাই, সত্যের খাতিরেই আসিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজও ছাড়িয়া গেলেন না; আর তারা পছন্দ করে না বলিয়া যতক্ষণ না আপনি থিয়সফির দোষ পাইয়াছেন, ততক্ষণ থিয়সফিকেও ছাড়িলেন না। কতটা সত্যানুরাগ ও মানসিক তেজ থাকিলে মানুষ এমনভাবে অটল হইয়া থাকিতে পারে! এই সত্যানুরাগ ও এই মানসিক তেজেই একদিন ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে অনুরাগ ও সে তেজের অভাবেই আজ তাহা এমন শক্তিহীন ও তেজহীন হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মফল খণ্ডাইবে কে?

যাঁরা প্রথম যৌবনে—'সত্যং শাস্ত্রং অনশ্বরং' বলিয়া সকল শাস্ত্রের উপরে নিজেদের স্বাভিমতকে বসাইয়াছিলেন, তাঁদের অনেকেই বয়োবৃদ্ধি সহকারে, আপনাদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অসংস্কৃত লোকমতকে অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতসারে, জগতের শাস্ত্রাদির ও আপনাপন স্বাভিমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে এখন "ইহা সত্য কি না?"—এ প্রশ্ন বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। "ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি না?" এই প্রশ্নটাই সর্ব্বদা তোলা হয়। "ইহা সত্য কি না?"—স্বাভিমতের কথা। "ইহা অমুক ধর্ম্ম কি না?"—এ স্মৃতির কথা। হিন্দু যখন কোনও সমস্যা উঠিলে, ইহা হিন্দুধর্ম্ম কি না জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি এই সমস্যাকে হিন্দু-স্মৃতির সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে মিলাইয়া লইতে চান। বেদের সঙ্গেও নহে আর স্বাভিমতের সঙ্গেও নহে।

বেদস্মৃতি সদাচার স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।

ধর্ম্মের এই তিন লক্ষণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে। কিন্তু দুনিয়ার সর্ব্বত্রই বেদ ও স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ যাহাকে স্বাভিমত বলা হয়, এই দুই লক্ষণের চাইতে স্মৃতিকে বলবত্তর করিয়া তুলিয়াছে। গতানুগতিকতার প্রতিষ্ঠা স্মৃতিতে। আর গতানুগতিক ধর্ম্মে স্মার্ত্তেরাই প্রবক্তা ও সদ্‌গুরুর আসন দখল করিয়া বসেন। গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্মেও ইহা দেখিতে পাই। গতানুগতিক খৃষ্টীয়ান্ বা মোহম্মদীয়ান্ ধর্ম্মেও তাহাই দেখিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মই যে কেবল গতানুগতিক হয় তাহা নহে। যেখানেই ধর্ম্ম সাধন ছাড়িয়া মতে ও আচার-মাত্রে যাইয়া পর্য্যবসিত হয়; যেখানেই ধর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অন্তরঙ্গ সাধনের ব্যাপার না হইয়া, কেবল কতকগুলি সামাজিক সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদিতে পরিণত হয়; যেখানে ধর্ম্মের নিত্য ভজনার দিক্ মলিন হইয়া, নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের দিক প্রবল হইয়া পড়ে; সেইখানেই তাহা গতানুগতিক হইয়া যায়। নূতন ধর্ম্মও এরূপ গতানুগতিকতা প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মও এই অত্যল্পকাল মধ্যেই এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্য এখানেও স্মৃতি বেদ ও স্বাভিমত উভয়কেই অতিক্রম করিয়া, একমাত্র ধর্ম্মের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে কি বুঝিতেন, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে কি বস্তুকে বুঝিয়া-

ছিলেন, অথবা ব্রাহ্মসাধারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে কি জানেন ও বোঝেন, এখন তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। আর এই জন্য মত বা সাধনবিশেষ সত্য কি না, এ প্রশ্নের পরিবর্ত্তে এখন ব্রাহ্মসমাজেও "ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি না?" এই প্রশ্নই সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। "যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম" বলিয়া মনকে চোক ঠার দিবার চেষ্টাতে এই গতানুগতিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ঢাকিয়া বা মুছিয়া যায় না। ইংরেজি ন্যায়শাস্ত্র বোধ হয় এই প্রকারের যুক্তিকেই arguing in a circle বলে। এই যুক্তির বিশেষত্ব এই যে, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া নিয়া, সেই স্বতঃসিদ্ধতার উপরেই আবার তার প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নগেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি এই গতানুগতিকতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁর সমাজের বা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতকে তিনি কদাপি সত্যের উপরেও বসান নাই, সত্যের নিদর্শন এবং প্রামাণ্য বলিয়াও গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে তিনি যাহা বুঝিতেন, তার কোনও অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কোনও ধর্ম্মেরই অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র-প্রামাণ্যে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ধর্ম্ম মাত্রেই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি ও সহজ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য ধর্ম্মমাত্রেই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ। আর জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও যুক্তির প্রতিষ্ঠা এ দু'এতে যে আকাশপাতাল প্রভেদ রহিয়াছে, ইহাও তিনি সর্ব্বদাই জানিতেন ও মানিতেন। জ্ঞান বস্তুর বা তত্ত্বের সমগ্রকে গ্রহণ করে, যুক্তি তার অংশবিশেষ মাত্রে পৌঁছায়। এই সমগ্র জ্ঞানবস্তুকে তিনি বিশ্বাস বলিতেন। এইজন্য কঠোর যুক্তিবাদী হইয়াও, নগেন্দ্র বাবু পরমবস্তু তর্কের দ্বারা লাভ করা যায়, কদাপি এমনটা বিশ্বাস করিতেন না।

"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

এই কথা অনেকবার তাঁর মুখে শুনিয়াছি। তবে বিশ্বাসেরও একটা জ্ঞানের ভূমি এবং ভিত্তিও যে আছে, ইহাও তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন এইজন্য যে, তাঁর নিকটে এই ধর্ম্মটী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি ধর্ম্মবিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে করিতেন, এইজন্যই তিনি ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁর নিকটে চিরদিনই সত্য আগে ছিল, লোকে যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলে, তাহা তার পরে স্থান পাইত। আর এই গভীর সত্যানুরাগ এবং ধর্ম্মানুরাগের জন্যই নগেন্দ্রনাথ, এমন অসাধারণ শক্তিসাধ্য থাকিতেও, মামুলী ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে কথনই তেমন প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

নগেন্দ্রনাথ সকল বস্তুই পরখ করিয়া দেখিতেন বলিয়া, প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজচ্যুত ও হৃতসম্পত্তি হইয়াও, কেশব বাবুর দলে উপযুক্ত মর্য্যাদা ও আপনার শক্তি ও সাধনার উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হন নাই। সে সময়ের ব্রাহ্মমাত্রেই non-conformist (ননকনফর্মিষ্ট) ছিলেন। সমাজ

বা সম্প্রদায়ের আনুগত্যকেই conformity (কনফর্মিটি) কহে: যাঁরা এরূপ আনুগত্য স্বীকার করেন না, তাঁরাই নন্‌কনফর্মিষ্ট। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, সকলেই আদিতে এই ভাবাপন্ন ছিলেন নতুবা তাঁরা একটা স্বতন্ত্র দল গড়িয়া তুলিতে পারিতেন না। কিন্তু আপন আপন দলটী পাকিয়া উঠিলে, ইঁহারা নিজেরাই সম্প্রদায়ানুগত্যকে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের অনভিমত সিদ্ধান্ত বা আচার-আচরণাদিকে অধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সকল সম্প্রদায়েই এই সকল সম্প্রদায়দ্রোহীদের নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। কেশবচন্দ্রের সকল কথা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতেন না বলিয়া, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ কখনও এ সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, ধর্ম্মবন্ধুদিগের নির্য্যাতন, আপনার স্বাভাবিকীশক্তি ও প্রতিভার নিষ্ঠুর সঙ্কোচন, এ সকলের কিছুতেই তাঁর সত্যানুরাগের কণামাত্র নষ্ট করিতে পারে নাই। কুচবিহার-বিবাহোপলক্ষে কেশবচন্দ্রের দল ভাঙ্গিয়া গিয়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইলে, শিবনাথ এই নিষ্পেষণ ও নির্য্যাতনের হাত এড়াইলেন বটে, কিন্তু নগেন্দ্রনাথের সত্যানুরাগ তাঁহার এই নূতন [illegible] একান্ত আনুগত্য গ্রহণের অন্তরায় হইয়া রহিল। এখানে তিনি কতকটা কর্ম্মক্ষেত্র পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁর শক্তি ও চরিত্রের যথাযথ মর্য্যাদা পাইলেন না। আর তাঁর নন্‌কনফর্মিটী (non-conformity)ই ইহার প্রধান এবং একমাত্র কারণ।

নগেন্দ্রনাথের মনোরাজ্যে দুইটী শক্তি চিরদিন সমভাবে প্রবল হইয়া ছিল। একটী তাঁর যুক্তিপ্রবণতা, অপরটি তাঁর আস্তিক্যবুদ্ধি। সচরাচর এই দুইটী বস্তু এক সঙ্গে থাকে না। যুক্তিপ্রবণ চিত্তে বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি বড় দেখা যায় না; আর শ্রদ্ধাপ্রবণ চিত্তে যুক্তিপ্রবণতাও বেশি দেখা যায় না। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুইটী বিরুদ্ধ গুণের আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখিয়াছি। এই অপূর্ব্ব সমাবেশ, আরো বিশদ ও গভীর রূপে দেখিয়াছি আর একজন সাধুপুরুষে। তিনি নগেন্দ্র বাবুর আজীবন বন্ধু ও সমসাধক ৺কালিনাথ দত্ত। কেবল যদি তাঁর বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধিই থাকিত, তবে যে অবস্থাধীনে নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে দিন কাটাইয়া গিয়াছেন, সে অবস্থায় কখনওই আমরণ এ যোগ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য দিকে যদি তাঁর এই আস্তিক্যবুদ্ধি না থাকিত, অথবা এতটা প্রবল না থাকিত, তাঁর কেবল যুক্তিপ্রবণতাই যদি থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে এতটা কোনঠাসা হইয়া পড়িয়াও থাকিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিকী যুক্তিপ্রবণতা নগেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া রাখিয়াছিল। তাঁর প্রকৃতিগত বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি অন্যদিকে সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্রাহ্মগণ্ডীর বাহিরে, সাধু ও সাধকমণ্ডলীর মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া যাইত। যুক্তিপ্রবণ নগেন্দ্রনাথের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত অনেকটা মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মেরই সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু আস্তিক্যবুদ্ধিপ্রবণ নগেন্দ্রনাথের ধর্ম্মসাধন মামুলী

ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত গুরুমুখী কর্ত্তাভজাদিগের পন্থা আশ্রয় করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, ইঁহারা নিজেরাই স্বল্প-বিস্তর গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কদাপি গুরু-আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা তিন জনেই স্বয়ংকৃত গুরু হইয়াছিলেন এ বিষয়ে, 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়' ইঁহাদের তিন জনের কেহই এই পথ অবলম্বন করেন নাই। আর এই জন্য মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মে গুরু-আনুগত্যের প্রতিষ্ঠাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। গুরুতত্ত্বটী পর্য্যন্ত তাহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্ম গুরুবিরোধী। অতএব গুরুপন্থী নগেন্দ্রনাথ যে এখানে কোনঠ্যাসা হইয়াছিলেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

এখন তো ব্রাহ্মসমাজ ধনে মানে ভোগে বিলাসে ফাপিয়া উঠিয়াছে। এখন কেহ কেহ সংসারের লোভেও ব্রাহ্মসমাজে আসিতে পারে, আসিতেছে যে না, ইহাও বলিতে পারি না। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তখন ব্রাহ্মেরা একটা মুষ্টিমেয়, নগণ্য, দারিদ্র্যপীড়িত দল ছিলেন। কিন্তু সেই দারিদ্র্য ও নগণ্যতার মধ্যেই যে তেজ ও শক্তি ফুটিয়াছিল, তাহই কিম্বদন্তীমাত্র আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মচরিত্র আজিও বাঁচিয়া আছে। তখন লোকে ব্রাহ্ম হইতেন শুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য, শুদ্ধ মোক্ষের লালসায়। ধর্ম্মের জন্য পাগল হইয়া যাঁরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, তাঁরা সেই ধর্ম্মের কিছুমাত্র সন্ধান পাইলে যে সেই পরম বস্তুর লালসায় ব্রাহ্মগণ্ডী ছাড়াইয়া যাইবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকুমার বিদ্যারত্ন (আনন্দস্বামী), প্যারীলাল ঘোষ (মৌনী বাবা), ইঁহারা ধর্ম্মের লালসায় ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। এখানে যা পাবার তাহা নিঃশেষ আয়ত্ত করিয়া, সেই পিপাসার প্রেরণাতেই নিগূঢ়তর সাধন অবলম্বন করেন। নগেন্দ্রনাথও এই দলেরই লোক ছিলেন। তিনিও আস্তিক্যবুদ্ধিপ্রবণ ছিলেন। তিনিও কেবল সত্যের ও মোক্ষের সন্ধানে প্রাচীন সমাজ, আপনার দায়াধিকার ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। সংসারের লোভে আসেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াও, বিধাতার কৃপায় দলপতি হইয়া যশমানাদির নূতন সংসার পাতিয়া বসেন নাই বা তার অবসর পান নাই। সুতরাং আমরণ কেবল ধর্ম্মের ভিখারী হইয়াই বেড়াইয়াছেন। থিয়সফির দল যদি কিছু নিগূঢ় ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্মের তত্ত্ব শিখাইতে পারে, এই লোভে তিনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সভ্য হন। গুরুপন্থী কর্ত্তাভজাগণ ধর্ম্মের কোনও নিগূঢ় সাধনপথ দেখাইতে পারেন কি না, সে লোভে তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্মবস্তুর লোভেই তিনি সর্ব্বদা সাধু ভক্তদের সঙ্গ করিতেন। পরমহংস মহাশয়ের নিকটে তাঁর গতিবিধি কতটা ছিল জানি না। কিন্তু প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে যখন ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিল, তখনও নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গলোভে তাঁর কাছে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের মতের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের সকল মতই যে মিশিয়া যাইত এমন নহে। কোনও

বিষয়ে হয় ত উভয়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদও বা ছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ নিজের মতের মর্য্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও সর্ব্বদাই এই সকল মতামতের বাক্‌বিতণ্ডার অনেক উপরে যেন বাস করিতেন। বিরোধী সিদ্ধান্তের খণ্ডনে ব্রাহ্মসমাজে নগেন্দ্রনাথের মত এমন সিদ্ধহস্ত লেখক এবং বক্তা আর জন্মায় নাই। কিন্তু তথাপি অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে বিরোধী মতটা যে কি ইহা বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টাটা তাঁর মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, মহর্ষি হইতে আরম্ভ করিয়া, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পর্য্যন্ত আর কোনও ব্রাহ্মেতে তাহা দেখা যায় নাই। এই ধৈর্য্যও নগেন্দ্রনাথের গভীর সত্যানুরাগ ও সত্যসন্ধিৎসারই প্রমাণ প্রদান করিত।

ব্রাহ্মসমাজে নগেন্দ্রনাথ যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। তাঁর পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজের একটা বড় নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

উপহার

১

উষা দেয় শিরে ঢালি' কনক-কিরণ,
ফুল-গন্ধ দেয় উপবন ;
পাখী দেয় কল-গান,
সুধাস্পর্শ করি' দান
বহে' যায় প্রভাত-পবন।
অয়ি মহীয়সী রাণী,
দীন আমি—নাহি জানি
কি আছে আমার—তব যোগ্য উপায়ন!

২

অনন্ত আকাশ খুলি' রতন-ভাণ্ডার,
গ্রহ-তারকায় গাঁথা হার—
বিশ্বমাঝে অতুলন
জ্যোতির্ম্ময় আভরণ—
রজনীরে দেয় উপহার।
ক্ষুদ্র সে খদ্যোত, তা'রে
আর কি সঁপিতে পারে—
দেয় ক্ষীণ জ্যোতিটুকু—সর্ব্বস্ব তাহার।

৩

আমি আনিয়াছি তাই—বিকশিত-দল
আমার এ হৃদয়-কমল।
শুধু তুলে' লও করে,
ফেলে দিও হেলাভরে
নাহি যদি শোভা পরিমল।
ক্ষণিক পরশে তব
লভিয়া গৌরব নব
ধন্য হবে চিরতরে জীবন বিফল!—
লহ এই হৃদি শতদল।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

জীবন-বর্ষা

১

আমার সাধের বীণা
প'ড়েছিল গীত-হীনা,
হে বন্ধু, দিয়েছ তুলে' আজি মোর করে!
যতনে শিথিল তার
বাঁধিলাম আরবার,
আজি কি মিলিবে সুর মোর কণ্ঠস্বরে—
এত দিন পরে?

২

অঙ্গুলির সে তাড়না,
তারে তারে সে ঝঞ্জনা,
তুলিবে কি সে মূর্চ্ছনা—সে আবেগ প্রাণ!
আজি কোথা মত্ত আশা,
উচ্ছ্বসিত ভালবাসা,
বসন্তের সে রাগিণী বাজিবে কি গানে—
আজি কে বা জানে?

৩

নাহি সে চাঁদিনী রাতি—
জোছনার শুভ্র ভাতি,
নাহি আর কণ্ঠে মোর—প্রিয়া-বাহু-ডোর!
ফুলের সুবাস নাই,
কাছে নাই—যারে চাই,
কে দিবে বীণায় সুর—প্রাণে গীতি মোর;—
সুখ-নিশি ভোর।

৪

বরষার এ দুর্দ্দিনে—
বাদল-রাগিণী বিনে
আর কোন্ সুর প্রিয়, বাজিবে বীণায়?
দিবানিশি জল ঝরে,
বিরহিণী কেঁদে মরে—
শূন্য পথ-পানে চাহি—হেন বরষায়—
দয়িত কোথায়!

৫

কত না আগ্রহ-ভরে
দেছ বীণা মোর করে!
সে দিন ত নাহি মোর—এসেছে বরষা!
বুকভরা অন্ধকার,
চক্ষে ঝরে বারিধার,
কি বাজাব হেন দিনে?—মল্লার ভরসা!
এসেছে বরষা!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রিণ্টার্—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
৭৬নং বলরাম দের ষ্ট্রীট,—মেট্‌কাফ্ প্রেস, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

ঊনবিংশ অধ্যায়

শান্তিপুরে প্রত্যাগমন ও পুরুষোত্তম যাত্রা

১৪৩১ শকে মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে গৌর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল। প্রেমোদ্‌ভ্রান্ত সন্ন্যাসী প্রেমের লীলাভূমি বৃন্দাবন অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। কোথায় সুদূর যমুনাতীরে বৃন্দাবন, আর কোথায় ভাগীরথীতীরে কটক নগর। পথের ভাবনাহীন সন্ন্যাসী আত্মবিস্মৃত ভাবে তিন দিন রাঢ়দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন।

এতাং সমাস্থায় পরাত্মা নিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।

প্রাচীন মহর্ষিবৃন্দ কর্তৃক অবলম্বিত সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ বেশ স্বীকার করিয়া মুকুন্দের চরণ-সেবা প্রভাবেই আমি অপার সংসারের পারে গমন করিব।

ভিক্ষুকপ্রোক্ত ভাগবতের এই শ্লোক অনবরত উচ্চারণ করিতে করিতে সন্ন্যাসানন্দ-বিহ্বল গৌর ছুটিয়া চলিয়াছেন। দিবারাত্রি দিগ্বিদিক্ কিছুই জ্ঞান নাই। নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ কাটোয়া হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন; কিন্তু গৌরের তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। একস্থানে কতিপয় ক্রীড়াপর গোপবালক গৌরের প্রেম-বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া আপনা হইতেই হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কাটোয়া ত্যাগের পর গৌরের কর্ণে হরিনাম প্রবিষ্ট হয় নাই। গোপ-বালকগণের মুখোচ্চরিত হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৌর পুলকিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহা-দিগের হস্ত ধারণ করত পুনরায় হরিধ্বনি করিতে অনুরোধ করিলেন। হরিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনন্তর গৌর গোপবালকদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্যানন্দ পূর্ব্বেই তাহাদিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে তাহারা গৌরকে গঙ্গা-তীরের পথ দেখাইয়া দিল। গৌর সেই পথে ধাবিত হইলেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্যকে সংবাদ দিবার জন্য আচার্য্যরত্ন শান্তিপুরে গমন করিলেন। আচার্য্যরত্ন প্রস্থান করিলে নিত্যানন্দ গৌরের সম্মুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ আপনি কোথায় যাইবেন?"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন "তোমার

সহিত বৃন্দাবন যাইব।" গৌর কহিলেন "বৃন্দাবন আর কত দূর?"

"এই ত সম্মুখেই যমুনা" বলিয়া নিত্যানন্দ গৌরকে গঙ্গাতীরে লইয়া আসিলেন। গঙ্গা-দর্শনে যমুনাভ্রমে গৌরের ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি যমুনার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আচার্য্যরত্নের নিকট সংবাদ পাইয়া অদ্বৈতাচার্য্য নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া গৌর কহিলেন "আচার্য্য আমি যে বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তাহা তুমি জানিলে কি প্রকারে?" আচার্য্য কহিলেন "যে স্থানে তোমার অধিষ্ঠান সেই বৃন্দাবন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ গঙ্গাতীরে তোমার আগমন হইয়াছে।" তখন গৌর নিতাইর ছলনা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু রুষ্ট হইলেন না। অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দ ও গৌরকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। আচার্য্য-গৃহিণী সীতা দেবী পরম যত্নে রন্ধন করিলেন। ভোজনকালে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও গৌরের মধ্যে নানাবিধ রহস্যালাপ হইল। ভোজনান্তে গৌর শয়ন করিলে আচার্য্য তাঁহার পাদ-সংবাহনের অনুমতি চাহিলেন। তখন—

"সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন
বহুত নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন।"

আচার্য্য ক্ষুণ্ণ হইলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। দলে দলে লোক গৌরকে দর্শন করিবার জন্য অদ্বৈতগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সংকীর্ত্তন আরব্ধ হইল। আচার্য্য—

কি কহবরে সখি আজুক আনন্দওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

এই পদ গাহিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন-কালে গৌরকৃষ্ণ-বিরহ-জ্বালা তীব্র ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। জ্বালা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অবশেষে গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে গৌর "বোল বোল" বলিয়া গর্জ্জন করত নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক প্রহর রাত্রি কালে কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল।

অদ্বৈতকে গৌরের আগমন-সংবাদ দিয়া আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। পরদিন শচীমাতা ভক্তগণ সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর মাতৃ-চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন, জননী পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক দেখিয়া তিনি শোকে বিহ্বল হইলেন—অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া গেল, মনের সাধে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করা ঘটিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা কহিলেন "বাপ নিমাই, যদি বিশ্বরূপের মত আমার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ কর, যদি আমাকে দর্শন না দেও, তাহা হইলে আমার মৃত্যু হইবে।" রোদন করিতে করিতে গৌর কহিলেন "মা. বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কখনও ঔদাস্য অবলম্বন করিতে পারিব না। তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই করিব; তুমি যেখানে বলিবে, আমি সেখানেই থাকিব।" পুত্রের মধুর বাক্যে জননী প্রীতা হইলেন।

সংকীর্ত্তনানন্দে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। একদিন গৌর ভক্তগণকে একত্র করিয়া কহিলেন "আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি

বটে, কিন্তু মাতাকে ও তোমাদিগকে আমি কখনও ত্যাগ করিতে পারিব না। পরন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে জন্মস্থানে কুটুম্ব-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করা অবিধেয়। তোমরা সকলে যুক্তি করিয়া এমন ব্যবস্থা কর, যাহাতে তোমাদিগকেও ত্যাগ করিতে না হয়, অথচ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম রক্ষাও হয়।" তখন অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তগণ শচীদেবীর নিকট গমন করত সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। শচী-দেবী চিন্তা করিয়া কহিলেন "নিমাই এখানে থাকিলেই আমি সুখী হই। কিন্তু লোকে যদি তাহার নিন্দা করে তাহা অসহ্য হইবে। আমার মনে হয় নিমাই যদি নীলাচলে বাস করে, তাহা হইলে দুই দিক্ রক্ষা হয়। নবদ্বীপ হইতে প্রায়ই লোক নীলাচলে যাইতেছে। তাহাদের নিকট আমি বাছার সংবাদ পাইব। তোমরাও তথায় যাতায়াত করিতে পারিবে। মাঝে মাঝে নিমাইও গঙ্গাস্নানোপলক্ষে এখানে আসিতে পারিবে।"

তাহাই স্থির হইল। গৌর ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাস কহিলেন "তুমি নীলাচলে গেলে আমার গতি কি হইবে? পাপিষ্ঠ যবন আমি, আমার নীলা-চলে স্থান নাই—কিন্তু তোমাকে না দেখিয়া আমি বাঁচিব কিরূপে?" গৌর সদয়ভাবে কহিলেন 'জগন্নাথ দেবের অনুমতি লইয়া আমি তোমাকে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইব"

বিদায়ের দিন সমাগত হইল। জননী ও ভক্তগণকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া গৌর নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ দত্ত সহ শান্তিপুর ত্যাগ করিলেন।

শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া গৌর সঙ্গিগণ সহ দক্ষিণাভিমুখ হইয়া চলিতে লাগিলেন। আঠিসার নগরে অনন্ত পণ্ডিত নামক এক সাধু ব্রাহ্মণের গৃহে এক রাত্রি অবস্থান করিয়া গঙ্গাতীর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে তাঁহারা ছত্রভোগে উপনীত হইলেন। ছত্র-ভোগে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিতা ছিলেন এবং তথায় জলময় এক শিবলিঙ্গ বিরাজিত ছিলেন। লিঙ্গের নাম অম্বুলিঙ্গ। ভগীরথের গঙ্গানয়নকালে গঙ্গা-বিরহ-বিধুর শঙ্কর গঙ্গান্বেষণে বহির্গত হইয়া ছত্রভোগে তাঁহার দর্শনলাভ করেন। অনু-রাগ বিহ্বল শঙ্কর গঙ্গার দর্শন প্রাপ্তি মাত্রই ভন্মধ্যে পতিত হন এবং অনুরাগে বিগলিত হইয়া জলরূপে গঙ্গার সহিত মিশিয়া যান। তদবধি সেই স্থান অম্বুলিঙ্গ-ঘাট নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। গৌর অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার স্নানকালে ছত্রভোগের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ চতুর্দ্দোলায় সেই পথে গমন করিতেছিলেন। রামচন্দ্র গৌরের তেজঃপূর্ণ কান্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং চতুর্দ্দোলা হইতে অবতরণ করিয়া কৃতস্নান গৌরের চরণে প্রণিপাত করিলেন। গৌর তখন গঙ্গাদর্শনে ভাবাবিষ্ট। রামচন্দ্র যখন তাঁহার চরণ-মূলে প্রণত, তখন "হা হা জগন্নাথ" বলিয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি নীলা-চলে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য রামচন্দ্র খাঁকে অনুরোধ করিলেন। রামচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন "প্রভুর আজ্ঞা দাস যথাসাধ্য পালন করিবে। কিন্তু বড় বিষম সময় পড়িয়াছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিয়াছে, এখন পুরীর পথে কেহ যাইতে সাহস করে

না। অনুগ্রহপূর্ব্বক এ দীনের গৃহে আজি অবস্থান করুন। আজ রাত্রিতেই আমি আপনাকে নীলাচলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিব।"

রামচন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সকলে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন; রামচন্দ্র সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া রাত্রিকালে নৌকাযোগে পুরুষোত্তমাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। নৌকায় নিরবধি সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কতিপয় দিবসান্তে নৌকা উৎকল দেশে প্রয়াগঘাটে উপস্থিত হইল। সকলে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনান্তর তাঁহারা সুবর্ণরেখা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণরেখা অতিক্রান্ত হইয়া নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ কিছু পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। গৌর সকলের অগ্রে যাইতেছিলেন। পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়া জগদানন্দের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। গৌরের সন্ন্যাসের দণ্ড জগদানন্দের নিকট ছিল। জগদানন্দ দণ্ড নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া কহিলেন "নিতাই, তুমি অগ্রসর হও, আমি প্রভুর জন্য কিছু ভিক্ষা করিয়া আনি।" দণ্ড হস্তে লইয়া নিতাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া দণ্ডখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জগদানন্দ ফিরিয়া আসিয়া ভগ্নদণ্ড দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। উভয়ে অগ্রসর হইয়া গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। দণ্ড ভগ্ন দেখিয়া গৌর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিতাই কহিলেন "একখানা বাঁশ ভাঙ্গিয়াছি, যদি ক্ষমা করিতে না পার দণ্ডবিধান কর।" গৌর কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "আমার সম্বলের মধ্যে ছিল এক দণ্ড, তাহাও তোমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। আমার সঙ্গে তোমরা কেহই যাইতে পাইবে না। হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।" মুকুন্দ কহিলেন "তুমিই আগে যাও।" গৌর একাকী অগ্রসর হইলেন। জলেশ্বরে শিববিগ্রহ দর্শন করিয়া গৌর ক্রোধ বিস্মৃত হইলেন এবং শিবপ্রেমে বিহ্বল হইয়া ভক্তগণ সহ বিগ্রহ-সমীপে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন। জলেশ্বর হইতে ভক্তগণসহ একত্র বহির্গত হইয়া গৌর রেমুণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গোপীনাথ বিগ্রহকে প্রণামকালে গোপীনাথের শিরস্থ পুষ্পচূড়া স্খলিত হইয়া গৌরের মস্তকে পতিত হইল। গৌর হৃষ্টমনে বহুক্ষণ গোপীনাথ-সম্মুখে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন। গোপীনাথের সেবকগণ বিস্মিত হইল।

রেমুণার গোপীনাথ "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" নামে বিখ্যাত। কীর্ত্তনান্তে গৌর ভক্তগণ-সমীপে গোপীনাথের ক্ষীরচুরীর উপাখ্যান বিবৃত করিয়া গোপীনাথের ক্ষীর-প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন এবং ভোজনান্তে পুরুষোত্তম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। *

* ভক্তচূড়ামণি মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিভাগে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক গোপালক দুগ্ধভাণ্ডহস্তে হাসিতে হাসিতে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বলিল "পুরী, ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ, লও এই দুগ্ধ পান কর।" ক্ষুধার্ত্ত পুরী বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বালক কহিল "আমি এই গ্রামের অধিবাসী, আমার গ্রামে কেহ অনাহারী

অনন্তর সকলে যাজপুরে উপনীত হইয়া বৈতরণী নদীতে স্নান করিলেন। যাজপুরে বহু-সংখ্যক দেবমন্দির বিরাজমান। গৌর একাকী সমস্ত দেবালয় পরিদর্শন করিয়া ভক্তগণসহ পুনর্ম্মিলিত হইলেন। যাজপুর হইতে কটক হইয়া সকলে সাক্ষিগোপালে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষিগোপাল প্রকট দেবতা। নিত্যানন্দ সাক্ষিগোপালের ইতিহাস গৌরের নিকট বিবৃত করিলেন। * সাক্ষি-

---

থাকিতে পারে না। যাহারা যাচ্ঞা করে না, আমি তাহাদিগকে আহার দেই।" বলিয়া বালক প্রস্থান করিল—কিন্তু দুগ্ধ-ভাণ্ড লইতে আর ফিরিয়া আসিল না। রাত্রিকালে বালক স্বপ্নে মাধবেন্দ্রের সমীপে আবির্ভূত হইল এবং তাঁহাকে এক কুঞ্জমধ্যে লইয়া গিয়া কহিল "পুরী, বহুদিন যাবৎ আমি এই কুঞ্জমধ্যে তোমার অপেক্ষায় আছি। আমার নাম শ্রীগোপাল। বজ্র আমাকে শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার সেবক ম্লেচ্ছভয়ে আমাকে এই কুঞ্জমধ্যে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। তুমি আমাকে পুনরায় পর্ব্বতের উপরে লইয়া যাও।" প্রাতঃকালে পুরী গ্রামের লোকজন ডাকিয়া সেই কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় মৃত্তিকা ও তৃণে আচ্ছন্ন এক বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। পুরী বিগ্রহ লইয়া গিয়া শৈলোপরি তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুদিন পরে মাধবেন্দ্র পুরী পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন—গোপাল তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিতেছেন "পুরী, তুমি নানা তীর্থের জলে আমার স্নান করাইয়াছ—কিন্তু আমার শরীরের তাপ যাইতেছে না। তুমি নীলাচলে যাইয়া স্বয়ং আমার জন্য মলয়জ চন্দন সংগ্রহ করিয়া আন।" মাধবেন্দ্র দেবাদেশে ওড্রদেশে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রেমুণায় উপস্থিত হইয়া গোপীনাথ দর্শন করিলেন। গোপীনাথের সেবকের নিকট গোপীনাথের ভোগ অমৃতকেলি নামক ক্ষীরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুরী ভাবিলেন "যদি অযাচিতভাবে একটু ক্ষীর প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার স্বাদ জানিয়া আমার গোপালের জন্য তদ্রূপ ক্ষীরভোগের ব্যবস্থা করি।" রাত্রিকালে গোপীনাথের পূজারী স্বপ্নে দেখিল, গোপীনাথ তাহাকে বলিতেছেন—"আমার ভক্ত মাধব পুরী হাটে বসিয়া আছে। আমার ভোগ হইতে একটু ক্ষীর লইয়া আমি তাহার জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমার ধড়ার অঞ্চলে সেই ক্ষীর আছে। তুমি তাহা লইয়া সত্বর গিয়া মাধবেন্দ্রকে দান কর।" গভীর রজনীতে উঠিয়া পূজারী গোপীনাথের অঞ্চলে ক্ষীর প্রাপ্ত হইলেন এবং ত্বরিতপদে মাধবেন্দ্রসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষীর প্রদান করিলেন এবং তাঁহার প্রতি গোপীনাথের অপার স্নেহের কথা বিবৃত করিলেন। প্রেমপুলকিত পুরী ক্ষীর ভক্ষণ করিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহোদ্দেশে পুরুষোত্তম গমন করিলেন। চন্দন সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবন প্রত্যাগমনকালে পুনরায় রেমুণায় উপস্থিত হইলে রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, গোপাল তাঁহাকে কহিতেছেন "পুরী, চন্দন আমি প্রাপ্ত হইলাম। গোপীনাথ ও আমার একই অঙ্গ, তোমার চন্দন তুমি গোপীনাথকে দান কর। তাহাতেই আমার গাত্রতাপ বিদূরিত হইবে।" মাধবচন্দ্র সংগৃহীত সমস্ত চন্দন গোপীনাথকে প্রদান করিলেন।

* পূর্ব্বকালে বিদ্যানগরের অধিবাসী এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও এক হীনবংশীয় ব্রাহ্মণযুবক একত্র তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। বিদেশে যুবক বৃদ্ধের বহু শুশ্রূষা করে, বৃন্দাবনে বৃদ্ধ তাহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। যুবক বৃদ্ধের কথায় প্রত্যয় না করিয়া কহিলেন "আপনি সম্ভ্রান্ত কুলীন, আমার মত হীনবংশীয় লোককে আপনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে যদি আপনি গোপালদেবের সমক্ষে শপথ করিতে পারেন—তাহা হইলে আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি। কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ বৃন্দাবনে গোপালের সম্মুখে যুবককে কন্যা দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দেশে প্রত্যাগত হইয়া বৃদ্ধ পুত্রগণের নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা বিবৃত করিলে

গোপালকে প্রণাম করিয়া পরদিন প্রত্যূষে সকলে ভুবনেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। * ভুবনেশ্বরকে প্রণাম করিয়া গৌর ভক্তগণসহ কমলপুরে উপনীত হইলেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখিতে পাইয়া গৌর প্রেমপুলকিত হইয়া উঠিলেন। কখনও ভীষণ রবে বারংবার হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, কখনও ধ্বজার দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
রামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ।"

প্রাসাদের অগ্রমূলে শ্রীবালগোপাল আমাকে দেখিয়া হাসিতেছেন। অবশেষে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে উন্মত্তের মত মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কতবার স্খলিত পদে পথিমধ্যে ধরাশায়ী হইলেন—দৃক্‌পাত নাই। গৌর ছুটিয়া চলিলেন। পরিশেষে আঠারনালায় উপস্থিত হইয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভক্তগণকে কহিলেন "বন্ধুগণ, তোমাদের কৃপাতেই আমি জগন্নাথ দর্শন করিতে পাইলাম। এখন হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।" মুকুন্দ কহিলেন "তুমিই আগে যাও।" গৌর একাকী মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

গৌর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে আরাধ্য দেবতাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্ম দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা সঞ্জাত হইল। গৌর বিগ্রহাভিমুখে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উদ্বেল অশ্রু চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু লম্ফপ্রদান মাত্র গৌরের সংজ্ঞা লোপ হইল। এদিকে মন্দিরের পরিহারিগণ তাঁহাকে জগন্নাথের অভিমুখে লম্ফপ্রদান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্ম ছুটিয়া আসিল

পুত্রগণ মহারুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা হীনবংশে ভগিনীদান করিতে স্বীকৃত হইল না। যুবক বৃদ্ধকে স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, তাঁহার পুত্রগণ যুবককে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। এবং বৃদ্ধ কহিলেন "কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আমার স্মরণ নাই।" ক্রুদ্ধ যুবক বলিয়া ফেলিলেন "যদি গোপাল নিজে সাক্ষ্য দেন, তবে স্মরণ হইবে?" বৃদ্ধের পুত্রগণ কহিলেন "যদি গোপাল নিজে সাক্ষ্য দেন, তবে তাঁহার নিকট ভগিনী সম্প্রদানে আমাদের আপত্তি হইবে না।' নিরুপায় যুবক বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং একমনে গোপালের আরাধনা করিতে লাগিলেন। গোপাল তুষ্ট হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্ম যুবকের সহিত বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। কথা ছিল, যুবক ফিরিয়া চাহিবেন না; চাইলে গোপাল পথিমধ্যে আর অগ্রসর হইবেন না। বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়া যুবক ভ্রমক্রমে পশ্চাতের দিকে চাহিলেন—গোপাল-বিগ্রহ পথিমধ্যে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরদিন সমগ্র নগরবাসীর সম্মুখে গোপাল বৃদ্ধের প্রতিজ্ঞার সাক্ষ্য দিলেন। বৃদ্ধের পুত্রগণ তখন বিনা আপত্তিতে যুবকের সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিল। বৃদ্ধ ও যুবকের প্রার্থনায় গোপাল বিদ্যানগরেই রহিয়া যান। তথা হইতে উৎকলরাজ পুরুষোত্তম তাঁহাকে কটকে স্থানান্তরিত করেন।

* শিব এক সময়ে কাশীরাজ নামক বারাণসীর এক রাজার তপস্যায় প্রীত হইয়া বর প্রদান করেন যে তিনি যুদ্ধে কৃষ্ণকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। বরদান করিয়া শিব সদলবলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকালে সমস্ত অবগত হইয়া সুদর্শনচক্র ত্যাগ করিলেন। চক্র কাশীরাজের মস্তক খণ্ডিত করিয়া শিবের পশ্চাৎ ছুটিল। শিব তখন শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ওড্রদেশে "একাম্রকবন" নামক স্থান দান করিলেন। তাহাই ভুবনেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পুরীর অধিপতির সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম তখন জগন্নাথদর্শন করিতেছিলেন। তিনি গৌরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পরিহারীদিগকে নিষেধ করিলেন—এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিশ্চেষ্ট-বপুঃ স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। গৌরের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। সার্ব্বভৌম পরিহারিগণের সহায়তায় সেই সংজ্ঞাহীন সন্ন্যাসীদেহ স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ও মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া গৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। সার্ব্বভৌম সকলকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সকলের শুশ্রূষায় গৌর সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং সার্ব্বভৌমকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "আজি হইতে আমি আর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিব না, গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতেই ঠাকুর দর্শন করিব। আজি যদি আমি লম্ফদিয়া জগন্নাথ-বিগ্রহ ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি শঙ্কটই না হইত?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপলা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বসন্তোৎসবে।

মধুমাস, শুক্লা চতুর্দ্দশী। নগরোপকণ্ঠে পাটলীগ্রামে সুরক্ষিত সুন্দর রাজোদ্যান। সেই উদ্যানে আজ বড় ঘটা—বসন্তোৎসব, মদনদেবের অভিবন্দনা। মধ্যাহ্নের পর হইতেই নিকটবর্ত্তী গ্রাম, পল্লী, বসতি হইতে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বালক বালিকা সেখানে সমাগত হইতেছিল। সম্পন্ন পরিবারের যুবতী বালক বালিকারা গোযানে, অশ্বযানে অথবা শিবিকায়, পুরুষগণ সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণে অথবা পদব্রজে আসিয়াছেন। আর, যাঁহাদের তেমন সঙ্গতি ছিল না, তাঁহারা স্ত্রীলোক বালক বালিকাদিগকে সঙ্গে করিয়া মহোৎসাহে পদব্রজেই আসিয়াছেন। সকলেরই প্রফুল্ল মুখ, বিচিত্র বেশ।

পথের উভয় পার্শ্বে প্রতিগৃহ-দ্বারে মঙ্গল-ঘট, আম্রপল্লব; গৃহের দেয়ালে হংস কারণ্ডব অথবা ময়ূর ময়ূরীর বিচিত্র চিত্র, দেহলীতে পুষ্পমালা, গৃহচূড়ে পতাকা।

উদ্যানে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। অশোক, তমাল, কিংশুক, কাঞ্চন, চূত-বৃক্ষমূলে রক্তিমগন্ধ-চূর্ণোৎক্ষেপে রঞ্জিতকায় দলে দলে স্ত্রীলোক পুরুষ বালক-বালিকা হাস্য কৌতুকোৎসবে উন্মত্ত। উদ্যানের এক অংশে বিপণীশ্রেণী বসিয়াছে। মৃন্ময় কাষ্ঠময় প্রস্তরময় নানাপ্রকার খেলানা, নানাবিধ

মিষ্টান্ন, কর্পূরপূগ সুবাসিত সজ্জিত তাম্বুল ক্রয়ের জন্য বালকবালিকা যুবতীরা পর্য্যন্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন। বসন্তোৎসবে ধনী মানী, দীন দরিদ্র, যুবক যুবতী সকলেরই মুক্তপ্রাণ, স্মিতমুখ। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অনেকে গৃহাভিমুখে ফিরিতে লাগিল।

উদ্যানের মধ্যস্থলে অতিবৃহৎ পট্টাবাস। সেখানেই অত্যন্ত জনতা। শত শত পত্র-পল্লবে, পুষ্পগুচ্ছে, মহাসুরভি পুষ্পমালায়, চিত্র বিচিত্র চীনাংশুকে পটমণ্ডপ সজ্জিত হইয়াছে। সুগন্ধী তৈলযুক্ত শত শত প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিতে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। রাজাধিরাজ মৃগয়ায় গিয়াছেন আজিও রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন নাই, সুতরাং সু উচ্চ সুশোভন রাজসিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে কাষ্ঠাসন, বেত্রাসন, ভূমিতলে বিন্যস্ত বৃহৎ কম্বলাসন, পট্টাসনে বহু লোক সমাসীন।

এক প্রান্তে শুধু বালকবালিকা যুবতীগণেরই সমাবেশ। নানাবিধ স্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তার অলঙ্কার, মূল্যবান্ বিচিত্র কৌশেয়সাড়ী, ওড়নি, চন্দন ও গোরোচনা চর্চ্চা, কজ্জললেপ, চিত্রলেখা এবং অলক্তকরাগে সজ্জিতা রঞ্জিতা যুবতীগণ স্মিত-প্রভাসিত মুখে মণ্ডপ জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত অল্প-সঙ্গতিসম্পন্না যুবতীরা কিঞ্চিৎ দূরে তাম্র, কাংস্য অথবা পুষ্পালঙ্কারে, হরিদ্রা কুঙ্কুম রঞ্জিত অথবা কাষায় বিচিত্র বস্ত্রে বিভূষিতা হইয়া মণ্ডপগৃহ সুশোভিত করিয়াছেন। অনেকেরই গলে পুষ্পমালা, কুন্তলে পুষ্পস্তবক, কর্ণে পুষ্প-কুণ্ডল; সকলের মুখেই হাসি, নয়নে স্ফুরৎবিদ্যুৎ।

এমন সময় প্রমীত সেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে স্ফীত বাউরী চুল ঘিরিয়া ফুলের মালা, গৌর ললাট কপোলে চন্দনচর্চ্চা, কর্ণে মুক্তাবলয়, গলায় ফুলের মালা, পরিধানে শুভ্র কৌশেয় ধুতি, দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বাম বাহুমূল-বেষ্টিত সূক্ষ্ম কৌশেয় ওড়নি, পায়ে শ্বেত চর্ম্মপাদুকা। প্রমীতের আগমনে বন্ধুবান্ধবগণ হর্ষধ্বনি করিলেন। অসঙ্গ সেন বলিলেন ;—

"কি হে, প্রমীত সেন নাকি? এস, এস। উৎসবে, আনন্দ-ঘটায় তোমার সমাগম?"

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন ;—

"বসন্তে শুষ্ক শাখায়ও যে নূতন মঞ্জরী দেখা দেয়, আমি ত মানুষ।"

অসঙ্গ প্রমীতকে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন, বলিলেন,—

"তুমি মানুষ, দেবতা, কি পাষাণমূর্ত্তি-বিশেষ, তা কে বলিতে পারে?"—অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন ;—"উৎপলা দেবী জানিতে পারেন।"

"তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।"

"একদিন জিজ্ঞাসা করিব।—তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? তিনি আসেন নাই?"

"আসিবার কথা ছিল, সেই জন্যই বিলম্ব; শেষে আসা হইল না। আমাকে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে।"

'কেন, ফিরিবার সময়, দণ্ড প্রহর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন নাকি? না—নবীন বসন্তাগমে অরক্ষিত অসতর্ক তুমি, এই উৎসব-ঘটায় চিত্তটা হারাইয়া ফেলিবে বলিয়া?"

প্রমীত সেন যেন কি উত্তর দিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

পটমণ্ডপের যে অংশে প্রমীত এবং তাঁহার বন্ধুগণ আসীন ছিলেন, তাহার সম্মুখে অদূরেই ভদ্র সম্ভ্রান্ত গায়ক গায়িকাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কতকটা স্থান ছিল। ইতিপূর্ব্বে সেখানে বসিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ গীত গাহিয়াছেন।

এমন সময় মৃদুগমনে একটী যুবতী সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে বহু-সুন্দরী-সুন্দর-সমাবৃত সেই সভাস্থল যেন অধিক-তর শোভাযুক্ত হইল। যুবতীর বয়স বিংশবর্ষের অধিক হইবে না, কিন্তু অসামান্য রূপ। পরিহিত স্বর্ণসূত্রগ্রথিত উজ্জ্বল অঞ্চলযুক্ত সূক্ষ্ম নীল কৌশেয় সাড়ীর অন্তরাল হইতেও স্থানে স্থানে তাঁহার গৌরদেহের স্ফুরৎ লাবণ্য বিকীরিত হইতেছিল। এক-বেণীবদ্ধ মুক্তাজাল-পরিবৃত দীর্ঘ কেশরাশি নিবিড় নিতম্ববিম্ব পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গে অনতি বিস্রস্ত সূক্ষ্ম রঙ্গিম ক্ষৌম ওড়নি, বক্ষে রত্নখচিত কঞ্চুলিকা, শিরোবেষ্টিত পুষ্পমালা, সীমন্তে মণি, আর সেই মণির সহিত সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে সংসক্ত উজ্জ্বল বৈদূর্য্যখণ্ড তাঁহার ললাটদেশে বিলম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছিল।

হঠাৎ এই রমণীর দিকে দৃষ্টি পড়াতে অসঙ্গের তীব্র পরিহাসোক্তির প্রত্যুত্তর আর প্রমীত সেনের মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি মুগ্ধনেত্রে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কখনো কি ইহাঁকে দেখিয়াছি? না, মনে পড়ে না।

অসঙ্গ বলিলেন ;—

"কিহে, সত্য সত্যই কি চিত্ত হারাইলে নাকি!"

প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কে এ রমণী?"

"ইহাঁর কথা ত অনেক দিন তোমাকে বলিয়াছি।"

"কে ইনি?"

"রূপসীই বটে, অপূর্ব্ব রূপসী!"

প্রমীত নিস্পন্দনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

নতমস্তকে সমাগত জনমণ্ডলীর অভি-বন্দনা করিয়া সেইখানে বসিল। একজন পরিচারিকা একটী বীণা আনিয়া দিল। মঞ্জুলা তাহাতে মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। সমাগত সমস্ত নরনারী তাহার গীত শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠ হইল। প্রমীত স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলা গীত আরম্ভ করিল।

আগত মধুঋতু নিকুঞ্জে।
(প্রিয় হে, প্রিয় হে, প্রিয় হে!)
পুষ্পিত, সুরভিত, পল্লবিত তরু কুঞ্জে কুঞ্জে।
বো'ল না বেদনাময় জীবন,
বো'ল না বিয়োগভরা মিলন।
সজ্জিত ধরণী রূপ-রস-গন্ধ-পরশ পুঞ্জে।
পরাণভরা কত বাসনা,
অঙ্গে অঙ্গে কত কামনা!
ভ্রমর ভ্রমরী মুখে মুখ রাখি গুঞ্জে।

ঘাটে ঘাটে দ্রুত মধ্য বিলম্বিত সঞ্চরমাণ মঞ্জুলার অঙ্গুলিদামের কি অপূর্ব্ব শোভা! গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অধিরোহণ অথবা অবরোহণ জনিত সুবলিত ললিত বাহুর কি মধুর মন্থর অথবা চকিত ক্ষিপ্রগতি! ক্ষুদ্র মস্তকের মৃদু সঞ্চলনে ললাটবিলম্বী বৈদূর্য্য-খণ্ডের কি ঝলমলায়মান্ কম্পন!

গীত শেষ হইল। তখন সেই সুবৃহৎ

পটমণ্ডপের চারিদিক্ হইতে গায়িকার প্রশংসাধ্বনি সমুত্থিত হইল। মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল, মস্তক নত করিয়া শ্রোতৃবর্গের অভিবন্দনা করিল। ফুল্লনেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শেষে যেখানে প্রমীত এবং তাঁহার বন্ধুগণ বসিয়া ছিলেন, সেদিকে চাহিয়াই যেন চমকিত হইয়া থামিল। তাহার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ আরক্তিম, হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। উৎসবের শেষ ব্যাপার মঞ্জুলার গীত শেষ হইলে পুরুষগণের উচ্চারিত মদন দেবের জয়শব্দে এবং যুবতীগণের মঙ্গল হুলুধ্বনিতে সেই বিরাট্ পটমণ্ডপ কম্পিত হইয়া উঠিল।

মঞ্জুলা তখন পুনরায় সেইদিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নতমস্তকে মৃদুপদে মণ্ডপ হইতে বাহির হইল। বাহিরে শিবিকা প্রস্তুত ছিল। প্রহরী পরিজন পরিরক্ষিত মঞ্জুলা নগরে নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

উৎসবসভা ভঙ্গ হইলে প্রমীত এবং অসঙ্গ সেনও আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমীত বলিলেন ;—

"ইনি যে এত রূপবতী, এমন সুগায়িকা, তাহা ত তুমি কোন দিন আমাকে বল নাই!"

"আমি অনেক দিন বলিয়াছি ; কিন্তু তোমার অন্তঃপুরের বাহিরে যে রূপবতী কেহ আছে, এ বিশ্বাস যে তোমার নাই!"

"মানুষের ভ্রম ক্রমে দূর হয়।—মঞ্জুলা বিদুষীও বটে?"

"নগরের অনেক বিদ্বান্ পণ্ডিত লোক ত আলাপ করিবার জন্ত মঞ্জুলার গৃহে যাইয়া থাকেন।"

প্রমীত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনিই কি তিনি! অসঙ্গ বলিলেন ;—

"কি ভাবিতেছ? ফিরিবার নির্দ্দিষ্ট দণ্ড অতীত হইয়াছে?—বিলম্বের হেতু উৎপলাদেবীকে বলিব কি?"

তখন হাসিতে হাসিতে দুইজনে পটমণ্ডপ হইতে বাহির হইলেন।

স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকাগণ মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া যার যার গম্যস্থানাভিমুখে চলিল। জ্যোৎস্না রাত্রি, আলোর অভাব ছিল না ; তথাপি বহুসংখ্যক প্রহরী দৌবারিক শান্তিরক্ষক আলো জ্বালিয়া লোক যাতায়াতের সুশৃঙ্খলা এবং চোর দস্যু দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে লোকদিগের রক্ষার সুবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। নগর-মুখের পথ লোকপ্রবাহে পূর্ণ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুঞ্জভ্রমণ।

বসন্তোৎসবের পরদিন অপরাহ্ণে প্রমীত সেন অন্তঃপুরে উৎপলার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। প্রমীত একখানি অনতি-উচ্চ কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিলেন, উৎপলা নিকটে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কি নাম?"

"মঞ্জুলা"

"নাম জানিলে কেমন করিয়া?"

"অসঙ্গ তাঁহাকে চিনেন, অসঙ্গের কাছে শুনিয়াছি।"

"অতি মিষ্টস্বর?"

"অমন মধুর স্বর আমি ত কখনো শুনি নাই।"

"অমন রূপ আর দেখিয়াছ কি?"

"মঞ্জুলার অপূর্ব্ব রূপ, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"অমন রূপবতী একেবারে দুর্লভ নহে।"

"আরও আছে?"

"আছে।"

"কোথায় দেখিয়াছ?"

"আমার নিজ গৃহে।"

প্রমীতের মুখ স্মিতময়; উৎপলাও হাসিয়া বলিলেন;—"বটে?—তবুও রক্ষা! নতুবা দেখিতেছি, আমি ত ভাসিয়া যাইতাম!"

এমন সময় মাধবী কক্ষদ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল,—"একজন লোক একখানি পত্র আনিয়াছে।"

প্রমীত বলিলেন;—"কোথায় পত্র?—এখানে আন।"

মাধবী কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি পত্র প্রমীতের হাতে দিল। পত্রখানি সুদৃশ্য আরক্ত কৌশেয় বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। মূল্যবান্ স্বর্ণ সূত্রে বদ্ধ, বন্ধনসন্ধি লাক্ষামুদ্রাঙ্কিত। প্রমীত সেন বিস্মিত হইলেন। কাহার এ পত্র? বন্ধন খুলিয়া বস্ত্রখণ্ড অপসারিত করিয়া পাঠ করিলেন;—

"যদি বিস্মৃত না হইয়া থাকেন এবং আপত্তি না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার অধিনীর গৃহে পদার্পণ করিয়া তাহাকে চরিতার্থ করিবেন। অবলার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। পত্রবাহক পথ প্রদর্শন করিবে, ইতি।

চির-উপকৃতা।"

পত্র পাঠ করিয়া প্রমীত মাধবীকে বলিলেন;—

"পত্র কে আনিল?"

"দারুক আমাকে দিয়াছে। একজন লোক পত্র লইয়া আসিয়াছে; লোকটী কোন পরিচয় দেয় নাই।"

"তাহাকে বসিতে বল।" মাধবী চলিয়া গেল।

পত্রের বহিরাবরণের বৈচিত্র্য দেখিয়া এবং বাহক যে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক তাহা শুনিয়া উৎপলাও বিস্মিত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। মাধবী চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কাহার পত্র?"

"পড়িয়া দেখ।"

উৎপলা স্বামীর আরও নিকটে আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং নিজের বামবাহু তাঁহার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে পত্র গ্রহণ করিবার জন্য যেমন মস্তক নত করিলেন, অমনি অঞ্চলের প্রান্তে ঠেকিয়া হঠাৎ তাঁহার কাণের কুণ্ডল খুলিয়া গেল। স্খলিত কুণ্ডল পত্রখানির উপর পড়িয়া পত্রসহ ভূমিতে পড়িয়া গেল!

ক্ষণকালের জন্য উৎপলার মুখ বিরস বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কুলবধূর কুণ্ডল স্খলন যে অশুভসূচক!

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন;—

"অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন?—এখানে ব'স, আমি কুণ্ডল পরাইয়া দিতেছি।"

উৎপলা স্বামীর পার্শ্বে সেই অনতিবৃহৎ কাষ্ঠাসনেই বসিলেন। প্রমীত ভূমি হইতে কুণ্ডল তুলিয়া লইয়া অতি যত্নে স্ত্রীর কাণে পরাইয়া দিলেন, পরাইতে অযথা দীর্ঘ সময় ব্যয় করিলেন। তখন উভয়েরই বড় হাসি

পাইল। পত্রখানি তুলিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া প্রমীত বলিলেন ;—

"দেখ পড়িয়া।—কে লিখিয়াছে, বুঝিতে পার কি ?"

উৎপলা পত্র পাঠ করিলেন।

"কে এই চির-উপকৃতা ?"

"বুঝিতে পারিলে না ?"

"না।"

"আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সে দিন ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ সময়ে যে রমণী বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, এ তাঁহারই পত্র !"

"তিনি কে ? তাঁহার কি কোন সন্ধান আর পাও নাই ?"

"না। কেমন করিয়া সন্ধান পাইব ? তিনি ত কোন পরিচয় দেন নাই !"

"তাঁহার কি স্বামী, ভ্রাতা কি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কেহ নাই ? আত্মগোপন করিয়া স্বয়ংই তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন !"

"আমিও তাহাই ভাবিতেছি।—কে এ রমণী !"

"গৃহস্থ কুলবধূ ?"

"কেমন করিয়া বলিব ?"

"চতুরা নগর-শোভিনী ?"

"অসম্ভব কি !"

"যাইবে কি ?"

"তুমি কি বল ?—তোমার অমত হইলে যাইব না।"

"যাবে বৈ কি।" উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—"এযে 'চির-উপকৃতা' রমণীর আহ্বান ! —কত দূর, কিছু জান কি ?"

"তিনি সে দিন বলিয়াছিলেন, কমলপুরে তাঁহার গৃহ, কমলপুর খানিকটা দূরই বটে।"

"বেলা অপরাহ্ণ হইল ; কাহাকে সঙ্গে লইবে ?"

"একাই যাইব। বোধ হয় রমণীরও তাহাই ইচ্ছা।"

"ফিরিতে রাত্রি হইতে পারে।"

"হইলেই বা ভয় কি ?"

"ভয় কিছুই না ;—তবে দেখিও, ঘর বাড়ীর কথা ভুলিয়া যাইও না !"

প্রমীত হাসিলেন। উৎপলাও হাসিলেন, তাঁহার হর্ষপ্রফুল্ল আয়তনয়ন-প্রান্তে অসীম বিশ্বাস, অপরিমেয় প্রীতি এবং স্ফুরদধরে পূর্ণ আত্মসমর্পণের চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীর মুখ পরিচুম্বিত করিয়া প্রমীত সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(১)

রসের রূপের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব প্রবন্ধে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য, এই তিন রসের কথাই কিছু বলিয়াছি। এ সকল অন্তরঙ্গ রসের সঙ্গে আমাদের শরীরের স্নায়ু-মণ্ডলীর অতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া, যখনই এই সকলের কোনও একটী বিশেষ রস আমাদের চিত্তে ফুটিয়া গাঢ় হইয়া উঠে, তখনই তাহার বিশেষ রূপও আমাদের স্নায়ু-মণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে প্রকট হয়। এ সকল কথার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য রসের উল্লেখ করি-নাই। অথচ রসের যত রূপ আছে, মাধুর্য্যের রূপই তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আর এ পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের রূপের আলোচনা করি নাই এই জন্য যে, এই উন্নত, গভীর জটিল রসের কথা বলিতে বড়ই শঙ্কা হয়। এ রসের তত্ত্ব জানেন কেবল সুরসিক ভক্ত। আমরা তার কি-ই বা জানি? কি-ই বা বুঝি?

একে এই রস সকল রসের সেরা। তাতে আবার ইহার সঙ্গে আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটীর অতি নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। এ রস-সাধনের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। এখানে বিষধর কাল সাপের সঙ্গে তার দাঁত না ভাঙ্গিয়াই খেলিতে হয়। আর তেমন খেলোয়ার দুনিয়ায় ক'জনই বা মিলে? এ রসের উপজীব্য মদনারি মহাদেব নহেন, মদন-মোহন বংশীধারী। অনঙ্গকে ভস্ম করিয়া এ রসের সম্ভোগ বা সাধনা হয় না; তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া মুগ্ধ করিতে হয়। কেবল ভগবদ্-পক্ষেই যে ইহা করিতে হয়, তাহা নহে; নায়ক-নায়িকা পক্ষেও ইহাই এই রসের মুখ্য সাধন। যে নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলায় নিতি নিতি নূতন রস উথলিয়া না উঠে; যেখানে পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের রূপলাবণ্য অজর অক্ষয় হইয়া, স্থির সৌদামিনীর মতন চিরবিরাজ না করে; যেখানে সম্ভোগে অনব-সাদ ও সান্নিধ্যে অতৃপ্তি না থাকে; যেখানে ইহাঁদের প্রতি অঙ্গ প্রিয়জনের প্রতি অঙ্গের জন্য নিত্যলোলুপ হইয়া না রহে, অথচ প্রতি অঙ্গপ্রাপ্তিতেও তৃপ্তিলাভ না করিয়া, অঙ্গের ভিতর দিয়াই অনঙ্গকে ও অনঙ্গের প্রেরণায় ও সন্ধানে অঙ্গকে আশ্রয় না করে;—সেই নায়ক-নায়িকার ভাগ্যে মাধুর্য্যরস-আস্বাদন ঘটে না। তাদের কেবল কাদা মাখাই সার হয় এই জন্যই এ রসের কথা বলিতে শঙ্কা হয়, ভয় হয়। বলিতে পারিব কি না সন্দেহ হয়। বলিতে পারিলেও অরসিকে কি বুঝিতে কি বুঝিয়া বসিবে, এই আশঙ্কা হয়। তাই রস-রূপ আলোচনা করিতে যাইয়া, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের কথা বলিয়াই, থামিয়া গিয়াছিলাম।

মাধুর্য্য-রস সকল রসের সেরা। রসতত্ত্ব-বিদেরা রসের পর্য্যায় নির্ণয় করিতে যাইয়া, মাধুর্য্যকে সকলের শেষে বসাইয়াছেন।

প্রথমে শান্ত, তার পরে দাস্য, তার পরে সখ্য, তার পরে বাৎসল্য ও সকলের শেষে মাধুর্য্য। এই পর্য্যায়টা অহেতুক বা অনর্থক নহে। ইহার অন্তরালে একটা সার্ব্বজনীন রসতত্ত্ব রহিয়াছে। সেই তত্ত্বটী এই :—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥

এই পর্য্যায়ে শান্তের গুণ দাস্যে, সখ্যে, বাৎসল্যে ও মধুরেতে বসে; কিন্তু দাস্যাদির গুণ শান্তেতে নাই বলিয়া, এই শান্তরস সকলের আগে বসিয়াছে। সেইরূপ দাস্যের গুণ সখ্যে, বাৎসল্যে ও মধুরে; সখ্যের বাৎসল্যে ও মধুরে; বাৎসল্যের গুণ মধুরে বসে। ক্রমেই প্রত্যেক রস এই জন্য রস অপেক্ষা বড় ও জটিলতর হইয়া উঠে। মধুর সকলের শেষে এই জন্য স্থান পাইয়াছে, কারণ এ রস সকল রস অপেক্ষা বড়, সকলাপেক্ষা জটিল। অপর সকল রসের বিশিষ্টগুণ এই রসেতে আছে; কিন্তু ইহার বি অপর কোনও রসে নাই।

শান্ত সকলের প্রথমে। কারণ শান্তের গুণ অপর সকল রসেতে আছে, অপর কোনও রসের গুণ শান্তেতে নাই। ফলতঃ কোনও কোনও লোকে শান্তকে রস বলিতেই কুণ্ঠিত হন। শান্ত রসের গুণ সমতা এই রসের প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় চিত্তের ঐকান্তিকী একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে। এই একাগ্রতা ব্যতীত দাস্যাদি কোনও রসই ফুটিয়া উঠে না। এ সংসারে লোকে চাকুরীও করে, বন্ধুতাও করে, সন্তানোৎপাদনও করে, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ও নানাভাবে পাতিয়া থাকে। দুনিয়ার অধিকাংশ লোক এ সবগুলিই করে। কিন্তু দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্যাদির রসাস্বাদন কয় জনারই বা ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? ঘটে না কেবল এই জন্য যে ইহাদের চিত্তে ও চরিত্রে শান্তগুণ ফুটিয়া উঠিয়া এ সকল রসের জমিটা প্রস্তুত করিয়া দিবার অবসর পায় না।

চঞ্চল দর্পণে যেমন কোনও বস্তুর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিতে পারে না, সকলই কেবল ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও টুক্‌রা টুক্‌রা দেখায়; সেইরূপ আমাদের চঞ্চল চিত্তেতেও কোনও রসের স্থির প্রকাশ হয় না ও হইতে পারে না। রস সেখানে থিতোয় না; গাঢ় হইতে পারে না; কেবলই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যে ভৃত্য প্রভুর সেবা করিতে করিতে সেই সেবার অতিরিক্ত আর দশটা কথা ভাবিয়া চঞ্চল হয়, আর কিছু না ভাবিলেও, কেবল তার দেনা পাওনার হিসাব ভাবে, নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা লইয়া মনে মনে তোলপাড় করিতে থাকে,—তার ভাগ্যে দাসত্বের বন্ধনই থাকে, দাস্য-রসের বিমল সম্ভোগ সম্ভবে না। দাস্যরসের স্ফূর্ত্তির ও চরিতার্থতার জন্য দাসকে সর্ব্বকালে ও সর্ব্ববিষয়ে কেবল প্রভুগতপ্রাণ হইয়া থাকিতে হয়। প্রভু ভিন্ন সে যখন আর কাউকে, কিছু কে জানে না; তার হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা, সকল অনুরাগ, জীবনের সকল উদ্যম ও আনন্দ যখন সেই প্রভুকে আশ্রয় করিয়া, তাঁরই সেবার উদ্দেশে ফুটিয়া উঠে; তখন সেই সেবাই তার পরম পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়ায়। সেই এক প্রভুকে আশ্রয় করিয়া তার চিত্ত তখন অনন্তেতে যাইয়া পড়ে।

সেই একের সেবা হইতে সকলের সেবা তখন তাহার সাধন ও সাধ্য হইয়া উঠে। ঘটে ঘটে তখন সে তার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করে। জীব-সেবা তখন তার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম হইয়া যায়। রসের ধর্ম্মই এই। রসমাত্রেই আদিতে বিন্দুরূপে জন্মিয়া পরিণামে সিন্ধুতে যাইয়া মিলিয়া মিশিয়া যায়। রসমাত্রেই অনন্তের অভিসারে ছুটিয়া থাকে। আর রসমাত্রেই, এইজন্য আদিতে একান্ত একাগ্রতা লাভ করে। আগে বিশ্বকে বর্জ্জন করিয়া পরে বিশ্বকে আলিঙ্গন করে। প্রথমে রসের পন্থা ও সাধনা ব্যতিরেকী, পরে অন্বয়ী; আগে নেতি নেতি, পরে ও পরিণামে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই ব্যতিরেকী, এই নেতি সাধনের সিদ্ধি শান্তেতে। এই শান্ত, এই সমতা, এই ঐকান্তিকী একাগ্রতা ও একনিষ্ঠা যেমন দাস্যের জমি, সেইরূপ সখ্যাদিরও জমি। চিত্রকরকে যেমন চিত্রবিশেষকে আপনার চিত্রপটে চিত্রিত করিবার পূর্ব্বে, সেই পটখানির উপরে সাদা বা ধূসর বা অন্য কোনও একটা উপযোগী রং মাখাইয়া দিতে হয়, এবং তার পরে সেই রংএর জমির উপরেই বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করিয়া উজ্জ্বল চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হয়; সেইরূপ আমাদের চিত্তপটেও প্রথমে শান্তরসের শুভ্র রং যখন সর্ব্বতোভাবে বসিয়া যায়, তখনই কেবল সেই জমির উপরে দাস্যাদি রসের নিজ নিজ মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে ও উঠিতে পারে। এইজন্যই "শান্তের গুণ পরে পরে সখ্যাদিতে হয়।" শান্তসমাহিত যে নয়, তার পক্ষে কোনও রস-সাধন বা আস্বাদন সম্ভবে না। জ্ঞানসাধনও ইহা ব্যতীত হয় না। এইজন্য শান্ত-গুণ জ্ঞান ও রস উভয়েরই সাধারণ ভূমি।

কিন্তু রসরাজ্যে যাহাকে শান্তসমাহিত বলা যায় জ্ঞানাধিকারে ঠিক তাহাই শান্ত-সমাহিতের লক্ষণ নহে। জ্ঞানাধিকারের সমতা ও একাগ্রতা নিবৃত্তিমূলক। আর এই নিবৃত্তি ঐকান্তিকী হওয়া আবশ্যক।

> দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
> বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

দুঃখেতে যাঁর উদ্বেগ জন্মায় না, সুখেতে যাঁর স্পৃহা নাই, আসক্তি ভয় ক্রোধ এ সকল যাঁর বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকেই স্থিতধী মুনি বলা যায়। গীতা সমতা বা শান্তির এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ শান্তি বা সমতা, জ্ঞানাধিকারের। রসের রাজ্যে আসক্তি, স্পৃহা, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ সকলই থাকে। জ্ঞানাধিকারে পরমপুরুষার্থ মোক্ষ। রসাধিকারে মোক্ষ পর্য্যন্ত উপেক্ষিত। রসাধিকারের শান্তি নিবৃত্তি নয়, রতি। কিন্তু এখানে স্পৃহা, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধাদির রং বদলাইয়া যায়। এ সকলে মমতাগন্ধ থাকে না। নিজের সুখের স্পৃহা থাকে না, নিজের ভোগের বাসনা-জনিত উদ্বেগও থাকে না, আত্মসুখব্যাঘাত-জনিত ক্রোধও থাকে না। জ্ঞানাধিকারের ও রসাধিকারের এই সমতার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন:—

> বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
> আত্মনঃ কথ্যতে সোহত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ॥

যাহা হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যক্ত হইয়া মনের নিজানন্দে অবস্থিতি হয়, তাহাকে শম বলে। ইহা জ্ঞানাধিকারের শান্তভাব। রসাধিকারে, ভগবৎপক্ষে ইহার অন্য লক্ষণ ফুটিয়া উঠে।

প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তিরতির্মতা॥

শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা এই জ্ঞানেতে, তাঁহাতে যে মমতাগন্ধরহিত রতি তাহাই রসাধিকারের শান্তরতি। নায়ক-নায়িকা বা দাস-প্রভু, সখা-সখী পক্ষেও শান্তরতির এই একই ধর্ম্ম। অন্যসম্পর্কবিহীনা ঐকান্তিকী একনিষ্ঠাই এই শান্তভাব। এ রাজ্যে সুখ, দুঃখ, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধাদি সকলই আছে। কিন্তু এ সকলই মমতাগন্ধবর্জ্জিত। দাস নিজের জন্য উদ্বিগ্ন বা ভীত বা ক্রুদ্ধ হয় না, প্রভুর জন্যই তার যত উদ্বেগাদি ভোগ হইয়া থাকে। সখারও উদ্বেগাদি সখার জন্য। পিতা বা মাতার উদ্বেগাদি পুত্র বা কন্যার জন্য নায়ক-নায়িকার বা পতি ও সতীর উদ্বেগাদি সেইরূপ তাহাদের নিজেদের সুখ-দুঃখের জন্য নহে, কিন্তু শুদ্ধ আপনার প্রিয়জনের জন্যই হয়। সামান্য বিষয়-লালসা হইতে, যে উদ্বেগাদির উদয় হয়, তাহা বহুমুখী। তাহা নিয়ত চঞ্চল হইয়া রহে। এক মুহূর্ত্তে এক বিষয়কে ধরিয়া ফুটিয়া উঠে, আবার পর মুহূর্ত্তেই বিষয়ান্তরের প্রেরণায় ভাবান্তরে পরিণত হয়। এই জন্যই বিষয়লালসাজনিত উদ্বেগাদি চিত্তের সমতার ও একাগ্রতার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। এই জন্যই এ সকল যোগের অন্তরায়। যেখানে যোগ নাই, সেখানে রস পাকিয়া উঠিতে পায় না। জ্ঞান-যোগী উদ্বেগাদির একান্ত নিরসন করিয়া চিত্তের সমতা লাভ করিবার চেষ্টা করেন। রসাধিকারে এ সকলের বহুমুখীত্বই নষ্ট করিতে হয়, এ সকলের নির্ম্মূল সাধন এক্ষেত্রে অবিহিত ও অনাবশ্যক। বৈরাগ্যের ঔদাসিন্য নহে, কিন্তু অনুরাগের যে ঐকান্তিকী একাগ্রতা তাহাই রসাধিকারের সমতা বা শান্তগুণ। যে গুণ থাকিলে দাস প্রভুগত প্রাণ হন, সখা সখাগত প্রাণ হন, পিতামাতা সন্তানগত প্রাণ হন, আর নায়ক নায়িকা একে অন্যকেত অন্য-কাম হইয়া নিমগ্ন হইয়া যাইতে পারেন,—রসাধিকারে তাহাকেই শান্ত বলে।

শান্তের গুণ যেমন দাস্যে, সখ্যে, বাৎসল্যে ও মাধুর্য্যে থাকে, সেইরূপ দাস্যের গুণ আবার সখ্যে, বাৎসল্যে ও মাধুর্য্যে; বাৎসল্যের গুণ মাধুর্য্যে থাকে। শান্তের গুণ যেমন ঐকান্তিকী রতি, আর এই রতি যেমন সকল রসেরই সাধারণ ধর্ম্ম, দাস্যের গুণ সেইরূপ সেবা ও আপনাকে হীনবোধ ও আপনার প্রভুকে সর্ব্ব-শক্তি ও সম্পদের আধার বলিয়া মনে করা। এই সেবা সখ্যে, বাৎসল্যে, মাধুর্য্যে সকলেতেই আছে। কিন্তু এই হীনতাবোধ ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাহাতে নাই। এই ঐশ্বর্য্যবোধের অভাবই সখ্যের প্রধান গুণ ও বিশিষ্ট লক্ষণ। সখা কখনও আপনাকে সখার সমান, কখনও বা সখা হইতে বড়, কখনও বা সখা হইতে আপনাকে ছোটও ভাবেন। কখনও বা সখার কাঁধে চড়েন, কখনও বা তাহাকে কাঁধে তুলিয়া নাচেন। কখনও বা তাহার গায়ে পা তুলিয়া দেন, কখনও বা তাহার পা বুকে ধরিয়া সংবাহন করেন। কখনও তার মুখের খাদ্য কাড়িয়া খান, কখনও বা আপনি অভুক্ত থাকিয়া তাহাকে আপনার মুখের অন্ন তুলিয়া দেন। কিন্তু এ সকলের মধ্যে দাস্যের সেবা ও আনুগত্য-ধর্ম্মের কোনও অভাব বা ব্যতি-ক্রম হয় না। সখ্যের নিজস্ব লক্ষণ বা গুণকে একান্ত নিঃসঙ্কোচ বলা যাইতে পারে। ভগবৎ

পক্ষে সখ্যরতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া রসামৃত-সিন্ধুকর্ত্তা বলিয়াছেন :—

যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ।
সা স্বাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।
পরিহাস-প্রহাসাদিকারিণী রসযন্ত্রণা॥

যাঁহারা মুকুন্দের তুল্য বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে সখা বলে। এই সকল সখার বিশ্বাসময়ী রতিকে সখ্য বলে। অসঙ্কোচে পরিহাস ও উচ্চহাস্যাদি ইহার কার্য্য। সখ্যের এই গুণ দাস্যেতে পাওয়া যায় না। দাস্যরতি যতই গাঢ় ও গভীর হউক না কেন, আপনার উপজীব্য যে প্রভু তাঁহা হইতে দাসকে সর্ব্বদাই সসম্মানব্যবধানে রাখিবেই রাখিবে। দাসের প্রভু সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ক্ষীণতা বা লোপ কখনই হইবে না, হইতেই পারে না। দাস্য-রতির পূর্ণতার জন্য এই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের বিলোপ অনাবশ্যক। কিন্তু সখ্যেতে এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আদৌ থাকে না। ঐশ্বর্য্যবোধ জাগিবা মাত্রই সখ্যরস উভিয়া যায়। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া অর্জ্জুনের এই দশাই ঘটিয়া-ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুনের আর তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহস হইল না। এতকাল যে সখা বলিয়া, কৃষ্ণ বলিয়া, যাদব বলিয়া, নাম ধরিয়া ডাকিয়া-ছিলেন,তাহা স্মরণ করিয়াই নিজেকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

আশৈশব-সখা শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মহিমা ও অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া অর্জ্জুন ভয় পাইলেন। শ্রীভগবানের অপরিসীম মর্য্যাদাজ্ঞান আসিয়া তাঁর সখ্যরতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এই মহামহিমময় অনন্ত পুরুষকে সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলিয়া শতবার সম্বোধন করিয়া তাঁর যে অমর্য্যাদা করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া অর্জ্জুন আকুল হইয়া উঠিলেন। শুতে যেতে খেতে বস্‌তে তাঁর সঙ্গে মাখামাখি গলাগলি হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি যে করিয়াছেন, সে সকলই এখন অপরাধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন তার জন্য এখন প্রণত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অর্জ্জুনের সখ্যরতিকে নষ্ট করিয়া দিল। দাস্যেতে ঐশ্বর্য্যবোধ আছে বটে, কিন্তু রতি-প্রভাবে ক্রমে যেন মরিয়া আসিতেছে। আসন্নপরিচর্য্যা, শুশ্রূষা, এ সকলই দাস্যের নিগূঢ়, নিজস্ব ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। এ ধর্ম্ম শান্তরতিতে নাই। অথচ শান্তের একনিষ্ঠা দাস্যাদিতে আছে। সেইরূপ সখ্যের যে এই সাম্যাভি-মান ;—সখা আমার সমান, আমি সখার সমান, আর কখনও বা সখা আমার বড়, আবার কখনও বা আমি সখার বড়,—এই ভাবও সখ্যাভিমানেরই অন্তর্গত ;—এ সকল দাস্যে নাই, অথচ দাস্যের সেবাপরায়ণতা সখ্যেতে আছে।

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞানপ্রবীণ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ॥
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক, দুই, তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

শান্তের একগুণ—একনিষ্ঠা; দাস্যের দুই—একনিষ্ঠা ও সেবা। সখ্যের তিন—একনিষ্ঠা, সেবা ও অসঙ্কোচ। বাৎসল্যের চারি—একনিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ এবং কারুণ্য।

মমতা আধিক্যে তাড়নভর্ৎসন ব্যবহার
আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান—

এ সকলই কারুণ্যধর্ম্ম। আমার উপরে সে নির্ভর করে, এই যে ভাব ইহাই কারুণ্যের প্রাণ। আর এই ভাবই বাৎসল্যের সার। মাধুর্য্যের পাঁচগুণ—একনিষ্ঠা, সেবা অসঙ্কোচ, কারুণ্য এবং তার উপরে তার নিজস্ব গুণ, কান্তভাবে নিজাঙ্গ দান করিয়া প্রিয়জনের সেবা করা। আর সকল রসে যা আছে, মাধুর্য্যে তাহা তো আছেই; কিন্তু আর কোনও রসে যাহা নাই, সেইটীও এ রসে আছে। এইজন্য মাধুর্য্যরস সকলের সেরা, সকলাপেক্ষা জটিল। এইজন্য একাধারে এখানে অশেষ উৎকর্ষ, অসীম উচ্ছ্বাস ও অপরিমেয় জটিলতা দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহাতে বহুবিধ বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ ও সংগ্রাম হয় বলিয়া, মাধুর্য্যের রূপও এক নহে, কিন্তু বহু, অসংখ্য। এ রূপ কখনও বা শিরীষ পুষ্পাধিক সুকুমার, কখনও বা বজ্রাদপি কঠোর। তাহাতে কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ; কখনও দৈন্য, কখনও গর্ব্ব; কখনও উদার দান, কখনও কঠিন কার্পণ্য; কখনও ক্রোধ, কখনও ক্ষমা; কখনও দুর্জ্জয় মান, কখনও অকৈতব আত্ম-নিবেদন;—এ সকলই ফুটিয়া উঠে। কখনও বা এ সকল যুগপৎ প্রকাশিতও হয়। এই বহুরূপী রসের রূপের কথা কেমন করিয়া কহিব?

শান্তদাস্যাদি রসপঞ্চকের আলোচনায়

একটা সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যার প্রতি পণ্ডিতেরাও আজি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া জানি না। সে সত্যটী এই যে যে রস যত উন্নত ও জটিল, সেই রসের আমাদের শরীরের ও শারীরিক ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সম্বন্ধ তত নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ। শান্তে শরীর-গন্ধ নাই বলিলেও হয়। দাস্যেতেও মনেরই তৃপ্তি ও আত্মারই প্রসাদ জন্মায়, কিন্তু শরীরকে বড় একটা স্পর্শ করে না। সখ্যে প্রথমে শরীরটা রসের আশ্রয়ীভূত হয়। আসঙ্গলিপ্সা সখ্যের ধর্ম্ম। সখা সখাকে দেখিয়া কেবল সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁর কাছে ছুটিয়া যান, তাঁকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করেন, গলাগলি কোলাকুলি করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। তথাপি সখ্যেতেও মুখের ভাব ও চক্ষের চাহনি আর কখনও সখ্যরসের অতিবৃদ্ধিতে পুলক পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। বাৎসল্যের শরীরের সঙ্গে যোগ সখ্য অপেক্ষা বিস্তর বেশি। সন্তান কোলে লইয়া, তাহাকে স্তন্যদান করিতে করিতে সন্তানবতী রমণীর সর্ব্বাঙ্গে বাৎসল্যের প্রভাব ছাইয়া পড়ে। স্তন-যুগল ক্ষীরস্রাবে স্ফীত হইয়া উঠে, প্রতিলোম-কূপে পুলক সঞ্চারিত হয়, মুখ আরক্তিম হইয়া পড়ে, চক্ষে কারুণ্যজ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয়। দেহের অণুতে অণুতে যেন এই বাৎসল্যরস সঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে এই বক্ষস্থ সন্তানের পালন ও পরিচর্য্যার জন্য সজাগ ও সতেজ করিয়া তুলে। মায়ের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি ও প্রাণতা যেন গলিয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইয়া, তাঁর স্তনযুগলের ভিতর দিয়া আসিয়া শিশুজীবনকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। শান্তে দেহ নির্ব্বিকার ভাব প্রাপ্ত হয়। দাস্যে দেহের বিকার হয় না, সেবাব্রতে কার্য্যমাত্র হইয়া থাকে। সেবার শুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধনের ঐকান্তিক আগ্রহা-তিশয়বশতঃ উৎকণ্ঠাদির নিবন্ধন, এখানে অতি অল্প পরিমাণে স্নায়ুমণ্ডলীতে যাইয়া সাড়া পড়ে বটে, কিন্তু সে সাড়া অতি ক্ষীণ। সখ্যে তার চাইতে বেশি। বাৎসল্যে দেহসম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠতর। মাধুর্য্যে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। এখানে শরীরটা উপেক্ষণীয় নহে। এখানে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি অঙ্গ পরস্পরের প্রতি অঙ্গের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া, প্রতি অঙ্গের বিকার উৎপাদন করে। এ রস সকল অঙ্গকে অধিকার করিয়া উথলিয়া উঠে।

> সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা প্রবোধো নিদ্রা বা
> কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
> তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণঃ
> বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রাময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

অনন্তোপাশ্রিত রামচন্দ্রের বাহুকে উপাধান করিয়া গুরুগর্ভভারক্ষীণা জানকী শয়ন করিয়া-ছেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন প্রিয়া-অঙ্গ-স্পর্শ লাভ করিয়া বলিতেছেন, এ কি সুখ না দুঃখ; এ কি জাগ্রতাবস্থা না নিদ্রা; এ কি বিষসঞ্চারিত হইতেছে না সুরা; তোমার প্রতি স্পর্শে আমার পরিমূঢ় ইন্দ্রিয়গণ একবার করিয়া চেতনা হারাইতেছে, আবার তখনই সচেতন হইতেছে। রাম-সীতার প্রেম যে বিশুদ্ধ, তার তো কোনও কথাই নাই। ভবভূতিও যে সুরুচিসম্পন্ন কবি, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু এখানেও, রসমধুরের ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্বন্ধটাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না।

যেমন শরীরের সঙ্গে, সেইরূপ রসের

সঙ্গেও মাধুর্য্যের একটা অতি নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এ কথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। শরীরই যখন মাধুর্য্যের প্রধান ও ঘনিষ্ঠ আশ্রয় ও অবলম্বন, তখন শরীরের অবস্থাবিশেষ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে এ রসের উদ্ভব সম্ভবে না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যৌবন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে, কিম্বা যৌবন নিতান্ত শেষ হইয়া গেলে, কাহারো পক্ষে প্রকৃত মাধুর্য্য সাধন বা আস্বাদন সম্ভব হয় না। ভরা জোয়ারের গঙ্গার মতন, যৌবনপ্রভাবে যখন দেহমন আতট পরিপূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখনই তাহাতে মাধুর্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয় সতেজ থাকিবে, শুদ্ধ থাকিবে, অনাঘ্রাত দেবভোগ্য পুষ্পের মতন অনন্যস্পৃষ্ট ও অন-ভুক্ত থাকিবে, তবে তাহা মাধুর্য্যসাধনের ও আস্বাদনের উপযোগী হয়। ব্রহ্মবর্চ্চস-সম্পন্ন ব্রহ্মচারি-দেহই মধুরলীলার যোগ্য ক্ষেত্র। উদ্ভিন্ন-যৌবনা, সংযতবাক্কায়মনা, রূপলাবণ্য-সম্পন্না, সুলক্ষণা, সম্ভাবিত-মাতৃকা, স্বাস্থ্যশক্তি-শ্রীযুক্তা কামিনীই এ রসলীলার উপযুক্তা সহায়। অতএব শরীরের সঙ্গে এ রসের নিরতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া, ইহাকে উপেক্ষা করিবার কোনও হেতু নাই। যে সে শরীরে মাধুর্য্যের রূপ ফুটে না। সে দেহ শুদ্ধ হওয়া চাই, সুস্থ হওয়া চাই, সবল হওয়া চাই, সুন্দর হওয়া চাই। সে দেহের সঙ্গে মনের, ভাবের, সহ সঙ্গত থাকা চাই। সে দেহ, তার প্রত্যেক পেশী, প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক স্নায়ুকেন্দ্র বা nerve-centre সতেজ ও ভাবদ্যোতনের উপযোগী হওয়া চাই। অনাচারে অত্যাচারে যে শরীর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কামের পৈশাচিক-নৃত্য দেখা যাইতে পারে, বিশুদ্ধ মাধুর্য্যমূর্ত্তি কখনই ফুটিয়া উঠিতে পারে না। মাধুর্য্যের মূর্ত্তি ফুটাইতে হইলে, সিদ্ধদেহ লাভ করা আবশ্যক। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফল ব্যতিরেকে সে দেহ কেহ লাভ করিতে পারে না। যে বস্তু যত উৎকৃষ্ট, সে বস্তু এ সংসারে তত বিরল। মাধুর্য্য সকল রসের সেরা বলিয়া, তার মূর্ত্তিও সচরাচর চক্ষুগোচর হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

মহাভারতের কাল

প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ায় মহা-ভারতের কাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতে বাধ্য হইলাম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ মহা-ভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন কেহ বা নবীন বলেন। আবার তাঁহাদের কাহারও মত যে মহাভারত বুদ্ধদেবের কিছু পূর্ব্বে, কাহারও বা মতে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম শতাব্দীতে উহা লেখা হয়, মহাভারতে স্থলে স্থলে প্রক্ষিপ্ত পাঠ আছে সত্য এবং সেই অংশ-গুলি আধুনিক ইহাও সত্য। কিন্তু মহা-ভারতের অধিকাংশ যে ৪০০০ সহস্র বৎসরের প্রাচীন ইহা প্রমাণ করা দুষ্কর নহে।

১। মহাভারত ভট্টনারায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন।

মহাভারত যে ভট্টনারায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেণীসংহারে কেবল যে মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণিত তাহা নহে, ব্যাসের নামও স্পষ্ট আছে। ভট্টনারায়ণ ঘটকদের কারিকা মতে ৯৯৯ সংবতে বঙ্গদেশে আসেন। তখন তিনি কৃতী অর্থাৎ নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুতরাং সহস্র বৎসরের অপেক্ষাও মহাভারত প্রাচীন স্থির হইল।

২। শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা প্রাচীন

মহাভারত যে শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা শঙ্করাচার্য্যের গীতার ভাষ্য হইতে সুস্পষ্ট। শঙ্করাচার্য্যের বয়স লইয়া মতভেদ থাকিলেও তিনি যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অধস্তন নহেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং মহাভারত খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে প্রাচীন।

৩। বাণভট্ট অপেক্ষা প্রাচীন

হর্ষচরিতে বাণভট্ট ব্যাসকে প্রণাম করিয়াছেন

"নমঃ সর্ব্ববিদে তস্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে।
চক্রে পুণ্যং সরস্বত্যা যো বর্ষমিব ভারতম্॥"

কাদম্বরীতে উপমাচ্ছলে মহাভারতের নিখিল চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ আছে। বাণভট্টকে Peterson প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কবি বলিয়াছেন। কারণ তাঁহার উপজীব্য হর্ষবর্দ্ধন ঐ সময়ের রাজা। হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনও বাহির হইয়াছে। তাহারাও সপ্তম শতাব্দীর।

সুতরাং মহাভারত ১২০০ বৎসরেরও প্রাচীন।

৪। ভারবি অপেক্ষা প্রাচীন

ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় যে মহাভারত অবলম্বনে লিখিত তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। চালুক্যরাজচক্রবর্ত্তী সত্যাশ্রয় বল্লভ বা পুলকেশরীর ৫৫৬ শকের প্রশস্তিতে ভারবির নাম থাকায় ভারবি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন ইহা স্থির। শ্রীমৎ পৃথ্বী কোঙ্গনী মহারাজের ৬৯৮ শকের দানপত্রের দাতা পৃথ্বী কোঙ্গনীর পিতামহ নবকামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূরিক্রমের প্রপিতামহ দুর্ব্বিণীতকেও কিরাতার্জ্জুনীয় পঞ্চদশসর্গাদি কোঙ্কার বলা হইয়াছে। ঐ শব্দের যদি এরূপ অর্থ হয় যে দুর্ব্বিণীত ভারবিকে কিরাতার্জ্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গ লিখিতে প্রবৃত্ত করেন, তাহা হইলে ভারবি দুর্ব্বিণীতের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। ঐ দুর্ব্বিণীতের এক দানপত্র বাহির হইয়াছে। তাহার কাল ৪৩৫ শক। সুতরাং ভারবিকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগের কবি বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই মহাভারত ১৫০০ বৎসরেরও প্রাচীন হয়।

৫। পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন

পঞ্চতন্ত্রের প্রথমেই সসুতপরাশরকে প্রণাম করা হইয়াছে। যথা :—

মানবে বাচস্পতয়ে শুক্রায় পরাশরায় সসুতায়।
চাণক্যায় চ বিদুষে নমোঽস্তু নয়শাস্ত্র-কর্ত্তৃভ্যঃ॥

মহাভারত হইতে পঞ্চতন্ত্রকার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা "অশোচ্যান্

অঘশোচযম্‌" ইত্যাদি। সুতরাং মহাভারতের গীতাও যহাকে প্রতীচ্যগণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন তাহাও পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। পঞ্চতন্ত্র খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে Anushirvan নামক পারস্য সম্রাটের প্রধান বৈদ্য বুজার চুম্বির কর্তৃক অনূদিত হয়. সুতরাং পঞ্চতন্ত্র ষষ্ঠ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। মহাভারত তদপেক্ষা বহু প্রাচীন।

৬। কালিদাস ও ভর্তৃহরি অপেক্ষা প্রাচীন।

মেঘদূতে গাণ্ডিবী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভর্তৃহরি শৃঙ্গারশতকের ৯৫ শ্লোকে পরাশরের নাম যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বুঝায় যে সত্যবতী দর্শনে বৃদ্ধের ধৈর্য্যচ্যুতি কবির বর্ণনীয়। আরও ভর্তৃহরি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির পরবর্ত্তী হওয়ায় এবং পতঞ্জলি ব্যাসদেব ও তৎশিষ্য বৈশম্পায়নাদির এবং যুধিষ্ঠিরাদির নাম করায় ভর্তৃহরি অপেক্ষা মহাভারত প্রাচীন। ভর্তৃহরির কারিকাতেও কংসাদি মহাভারতোক্ত চরিত্রের উল্লেখ আছে; যথা—

শব্দোপহিতরূপাংস্ত বুদ্ধেবির্ষতাং গতান্।
প্রত্যর্থমিব কংসাদীন্ সাধনত্বেন মন্যতে॥

ভর্তৃহরির বয়স প্রবাদ মতে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম শতাব্দীতে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। সুতরাং বেদব্যাস ২০০০ হাজার বৎসরের ও প্রাচীন।

৭। Weber মতে মহাভারত ২০০০ বৎসর প্রাচীন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Weber প্রভৃতি স্বীকার করেন যে মহাভারত খৃষ্ট জন্মের কিছু পূর্ব্বে Chrysoosun নামক খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ইউরোপীয় নাবিক মহাভারত নামক হিন্দুদের উপাখ্যানের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ মহাভারতকে উহার পর আনিতে পারেন না। উহার পূর্ব্বে অন্য কোন বিদেশী কর্তৃক মহাভারত উল্লিখিত না হওয়ায় মহাভারত ২০০০ বৎসর অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিতে চান না। ধন্য যুক্তি!

৮। মহাভারত মহাভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও পাতঞ্জল দর্শনের পাতঞ্জল এক ব্যক্তি নহেন। মহাভাষ্যকার চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের নাম করিয়াছেন, ও শকগণ কর্তৃক সাকেতাবরোধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে পণ্ডিত Gold Stucker খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মহাভাষ্যে মহাভারতের সকল চরিত্রেরই উল্লেখ পাওয়া যায় "বৃষ্ণ্যন্ধক, বৃষ্ণি, কুরুভ্যশ্চ" (৪।১।১১৭। পা ১১৭ সি) এই সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি উগ্রসেন নামক অন্ধকবংশীয় রাজা, বাসুদেব কৃষ্ণ এবং কুরুবংশীয় ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের নাম করিয়াছেন; যথা—

উগ্রসেনো নামান্ধকঃ তস্মাৎ
উভয়ং প্রাপ্নোতি।

বাসুদেব বলদেবঃ।
অন্য স এব। বিষক্সেনো নাম বৃষ্ণিঃ।
তস্মাৎ উভয়ং প্রাপ্নোতি।
অ্যো ভবতি বিপ্রতিষেধেন। বৈষ্যক্সেনঃ।
কুর্বণোরবকাশ। নকুলঃ সহদেবঃ।
অন্য স এব। ভীমসেনো নাম
কুরুস্তস্মাদুভয়ং প্রাপ্নোতি।

ভ্যো ভবতি বিপ্রতিষেধেন। ভীমসেনঃ। উক্ত উগ্রসেন প্রভৃতি যে রক্তমাংসের জীব তাহা ঐ ঐ শব্দের উত্তর অপত্যার্থ প্রত্যয় অন্ বা ণ্য হয় বলায় প্রকাশ পাইতেছে।

'জনপদ শব্দাৎ ক্ষত্রিয়াদঞ্"
(৪।১।১৬৮ পা ১১৮৬ সি)

এই সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি পঞ্চালানাং রাজা পাঞ্চালঃ বলায় পাঞ্চালগণ তাঁহার বিদিত ছিল বলিতে হইবে। ঐ সূত্রের পুরোরণ্ বক্তব্যঃ এই বার্ত্তিক তুলিয়া তিনি পৌরবঃ এই উদাহরণ দিয়াছেন এবং "পাণ্ডোর্ড্যণ্ বক্তব্যঃ" এই বার্ত্তিক ধরিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পুরু ও পাণ্ডু তাঁহার অবিদিত ছিল না। কুন্তীর পুত্র বুঝাইতে কৌন্তেয় শব্দ হয় বলায় মহাভাষ্যকার কুন্তীনন্দনগণকে জানিতেন বলিতে হইবে। বিশেষতঃ "গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ" (৮।৩ ৫) এই সূত্র দ্বারা যুধিষ্ঠির শব্দ সাধিত হওয়ায় কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের সহিত পাণিনিরও পরিচয় ছিল বলা যাইতে পারে। "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুণ্" পাণিনির এই সূত্রে যে বসুদেব পুত্র ক্ষত্রিয় বাসুদেব এবং তৎসখা অর্জ্জুনকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ভাষ্যে প্রকাশ। সুতরাং পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুনও ভাষ্যকারের পূর্ব্ব পরিচিত জানা গেল। কংসকে যে শ্রীকৃষ্ণ মারিয়াছিলেন তাহা ভাষ্যকার পাণিনির তৃতীয় অধ্যায়ে ১ম পাদের ব্যাখ্যার প্রথম আহ্নিকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা—

ইহ তু কথং বর্ত্তমানকালতা কংসং ঘাতয়তি, বলিং বন্ধয়তীতি, চিরহতে চ কংসে, চিরবদ্ধে বলৌ? তত্রাপি যুক্তা। কথম্? যে তাবদেতে শোভিকা নাম এতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়ন্তি, প্রত্যক্ষং চ বলিং বন্ধয়ন্তি ইতি। চিত্রেষু কথম্? চিত্রেষ্বপি উদ্গূর্ণা নিপততাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসস্য কৃষ্ণস্য চ।

অনুবাদ—কংস যখন বহুদিন হত হইয়াছে ও বলি বহুদিন বদ্ধ হইয়াছে, তখন কংসং ঘাতয়তি, বলিং বন্ধয়তি এইস্থলে কেন বর্ত্তমান কাল হইল? এইখানেও বর্ত্তমানকাল যুক্তিযুক্ত। কেন? যে সমস্ত নট আছে তাহারা এখনও কংসের হত্যা প্রত্যক্ষ দেখান এবং বলির বন্ধনও প্রত্যক্ষ দেখান। চিত্র সম্বন্ধে কেন কংসং ঘাতয়তি এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগান্বিত বাক্য-যুক্তিযুক্ত? চিত্রেও কংস এবং কৃষ্ণের প্রহার ও উদ্গূরণ ও পতন দেখান হয়, ইহা হইতে জানা যায় যে কৃষ্ণ তখন এত প্রাচীন ও উপাস্য যে, তাঁহার চরিত্র লইয়া নাটকাদি ও চিত্রাদি ভাষ্যকারের সময় বহুল প্রচলিত ছিল। ভাষ্যকার সুধাতুরকঙ্ চ (৪।১।৯৭ পা ১০৯৭ সি) সূত্রের ভাষ্য 'সুধাতৃব্যাসয়োরিতি বাচ্যম্" ও "ব্যাসবরুড়নিষাদচণ্ডালবিম্বানামিতিবক্তব্যম্" এই দুইটী বার্ত্তিক তুলিয়া বৈয়াসকিঃ শুকঃ দুইবার বলিয়াছেন "কালাপি বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ" (৪।৩।১০৪ পা ১৪৮৪ সি) সূত্রের ভাষ্যে তিনি বৈশম্পায়ন ও বৈশম্পায়নের শিষ্য কঠ এবং প্রশিষ্য খাড়ায়নেরও নাম করিয়াছেন। এইরূপে ভারতোক্ত যাবতীয় চরিত্র ও ভারতেরও রচয়িতা এবং বক্তার নাম করায় তিনি যে মহাভারতের পর তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ভাষ্যকারের বয়স ১৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইলে মহাভারত ২১০০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বলা যাইতে পারে।

৯। মহাভারত বার্ত্তিককার কাত্যায়ন অপেক্ষা প্রাচীন।

বার্ত্তিককার ব্যাসদেবের নাম "সুধাতুর-কঙ্‌ চ" (৪।১।৯৭ পা ১০৯ সি) এই সূত্রের "ব্যাসবরুড়নিষাদচণ্ডালবিম্বানাং চেতিবক্তব্যম্" বার্ত্তিকে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ব্যাস শব্দে যে মনুষ্য বুঝাইতেছে তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না, কারণ ব্যাসের পুত্র বুঝাইতে অকঙ্‌ প্রত্যয় হওয়া উচিত বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার যে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, বাসুদেব, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন শাম্ব, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রুপদ, দ্রোণ, দ্রৌণি প্রভৃতি সকল মহাভারতের স্ত্রী ও পুরুষগণকে জানিতেন তাহাও তাঁহার বার্ত্তিকে স্পষ্ট। বাসুদেব পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা অব্যবহিত পরেই সিদ্ধান্ত করায় বাহুল্যভয়ে বার্ত্তিককার সম্বন্ধে অধিক বলা হইল না। কাত্যায়নের সময় ঠিক জানা নাই। তবে বোধ হয় তিনি বুদ্ধদেব অপেক্ষা নবীন নহেন, সুতরাং মহাভারত ২৫০০ বৎসর প্রাচীন বটে।

১০। মহাভারত পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন।

পাণিনিতে যুধিষ্ঠিরাদির আভাস পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির শব্দের বিশেষত্ব থাকায় পাণিনি "গবিযুধিভ্যাংস্থিরঃ" (৮।৩।৯৫ পা ৯৬৭ সি) সূত্র করিতে বাধ্য হন। অন্ধক, বৃষ্ণি ও কুরুর নাম "ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ" (৪।১।১৬৪ পা ১১১১ সি) সূত্রে প্রকাশ। অর্জ্জুনের নাম "রাজদন্তাদিষু পরম্" (২।৩।৩১ পা ৯০২ সি) এই সূত্রের গণে বিম্বক্সেনার্জ্জুনৌ উদাহরণে ও "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাম্" ৪।৩।৯৮ পা ১৪৭৮সি) সূত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, অর্জ্জুন প্রভৃতি নাম "বাহ্বাদিভ্যশ্চ" (৪।১।৯৬ পা ১০৯৬ সি, সূত্রের বাহ্বাদিগণে প্রদত্ত। বাহু প্রভৃতি ব্যক্তির অপত্য বুঝাইতে ইঞ্‌ প্রত্যয় হয় বলায় পাণিনির যুধিষ্ঠিরাদি যে ব্যক্তিবিশেষ তাহা বুঝা যায়। কর্ণ, দ্রুপদ, অর্জ্জুন ও কুন্তী "বুঞ্ছ্‌-লুঠজিলসেনিরঢঞ্‌"—ইত্যাদি (৪।২।৮০ পা ১২৯২ সি) সূত্রের গণপাঠে উল্লিখিত। রুক্মিণী, রোহিণী, ও শকুনি এই তিন নামও "শুভ্রাদিভ্যশ্চ" (৪।১।১২৬ পা ১১২৬ সি) সূত্রের গণপাঠে ব্যক্ত। উহারা যে ব্যক্তিবিশেষ তাহা ঐ ঐ শব্দের উত্তর অপত্যার্থ প্রত্যয় ঢক্‌ হইবে বলা বুঝা যাইতেছে। "স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তিকুরুভ্যশ্চ" (৪।১।১৭৬ পা ১১৯৫ সি) সূত্রে কুন্তী, কুরু ও অবন্তি নামক ব্যক্তিগণ কথিত। গান্ধারী সাল্বেয়ের নামক ব্যক্তি "সাল্বেয়গান্ধারিভ্যাং চ" (৪।১।১৬৯ পা ১১৮৭ সি) সূত্রে প্রকাশ। "কুরুনাদিভ্যোণ্যঃ" (৪।১।১৭২ পা ১১৯০ সি) সূত্রে কুরু নামক ব্যক্তি আবার উল্লিখিত ও তাঁহার বংশধরেরা কৌরব্য বলা হইয়াছে। "সাল্বাবয়ব প্রত্যগ্রথ কলকূটাশ্মকাদিঞ্‌" (৪।১।১৭৬ পা ১১৯১ সি) সূত্রে অশ্মকের অপত্য এই অর্থে আশ্মকির উল্লেখ আছে। আমরা দেখিয়াছি যে এক অশ্মকী পুরুবংশীয় সংযাতির জননী। "দ্রোণপর্ব্বতজীবন্তাদন্যতরস্যাম্" (৪।১।১০৩ পাঃ ১১০৫ সিঃ) সূত্রে দ্রোণ নামক ব্যক্তি ও তৎপুত্র দ্রৌণি উল্লিখিত। অর্জ্জুনের ধনু গাণ্ডীব ও পাণিনির সূত্রে স্থান পাইয়াছে,—যথা "গাণ্ড্যজগাৎসংজ্ঞায়াম্"-(৫।২।১১০ পা ১৭ সি) পরাশরের নামে "গর্গাদিভ্যো যঞ্‌" (৪।১।১০৫ পা ১১০৭ সি,) সূত্রের গণপাঠে আছে। ব্যাসের নাম তিনি স্পষ্ট করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বার্ত্তিককার "সুধাতুর-

কণ্ডুচ" (৪.১।৯৭ পা ১০৯৭ সি,) সূত্রের বার্ত্তিকে ব্যাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী শাকটায়নও ব্যাসের নাম করায় পাণিনি অপেক্ষা ব্যাস যে প্রাচীন বুঝা যাইতেছে "নভ্রাজ নপাৎ" ইত্যাদি সূত্রে নকুল শব্দ আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যবাচী কি পশুবাচী বুঝা যায় না। সুতরাং ঐ সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া পাণ্ডুনন্দন নকুলের কথা পাণিনির বিদিত বলা যায় না। পাণিনি শাকল্যনামক শাব্দিকের নাম করিয়াছেন এবং তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা "লোপঃ শাকল্যস্য" (৮।৩ পা ৬৭ সি) সূত্রে প্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অনুষঙ্গ পাদে দেখিতে পাই যে বেদব্যাসের জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, পৈল ও লোমহর্ষণ নামে পঞ্চশিষ্য থাকে। ব্যাসদেব জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, পৈলকে ঋগ্বেদ এবং লোমহর্ষণকে পুরাণ শিক্ষা দেন। পৈলের শিষ্যধারা ঐ পুরাণে এইরূপ দেওয়া

ব্যাস
|
পৈল
|
ইন্দ্রপ্রমতি
|
মার্কণ্ডেয়
|
সত্যশ্রবা
|
সত্যহিত
|
সত্যতর
|
সত্যশ্রী

শাকল্য রথান্তর বাকলি ভরদ্বাজ

মুদ্গল গোলক খালীয় মৎস্য শৈশিরেয় আছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে শাকল্য ব্যাসদেবের প্রশিষ্যের প্রশিষ্যের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য এই শাকল্যকে পদবিত্তম বলা হইয়াছে। তিনি ঋগ্বেদের উপর কতকগুলি সংহিতা ও এক খানি নিরুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের বোধ হয় এই শাকল্যই পাণিনির "নলোপঃ শাকল্যস্য" সূত্রের শাকল্য। পাণিনি অপেক্ষা ব্যাস বহু প্রাচীন, ইহা অন্য দিক্ হইতেও দেখান যায়, পাণিনি "কলাপি বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ" (৪।৩।১০৪ পা ১৪৮৪ সি) সূত্রে বৈশম্পায়নের এবং "কঠচরকাল্লুক্" (৪।৩।১০৭ পা ১৪৮৭ সি) সূত্রে কঠের ও চরকের এবং "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাম্ ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" (৪।৩।১৫০ পা ১৪১০ সি) সূত্রে পারাশর্য্য ও শিলালির নাম করিয়াছেন। কঠ যে বৈশম্পায়নের শিষ্য তাহা মহাভাষ্য হইতে জানিতে পারি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও দেখিতে পাই যে বৈশম্পায়নের এক শিষ্যসম্প্রদায় চরক নামে অভিহিত হন। "কঠচরকাল্লুক্" এই সূত্রের কঠ ও চরক বৈশম্পায়নশিষ্য বলিয়া বোধ হয়। পারাশর্য্য একজন কৌথুম হওয়ায় কুথুমির শিষ্যধারা বটে। কুথুমির গুরু পৌষঞ্জী, তাঁহার গুরু সুকর্ম্মা, তাঁহার গুরু সুত্বা, তাঁহার গুরু সুমন্ত, তাঁহার গুরু জৈমিনি ও জৈমিনির গুরু বেদব্যাস, সুতরাং ব্যাসদেব কুথুমির অপেক্ষাও প্রাচীন। কৈমুতিকন্যায়ে তিনি পাণিনির বহুপ্রাচীন। পাণিনির উল্লিখিত বৈশম্পায়ন যে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, ও চরক বৈশম্পায়নের শিষ্য তাহা ভাষ্য হইতে বুঝা যায়। অতএব মহাভারতের যাবতীয় পুরুষ রচয়িতা ও বক্তা পাণিনি কর্ত্তৃক উল্লিখিত বলা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন যে পাণিনির উল্লিখিত

যে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরাদি তদ্বিষয়ে প্রমাণ কোথায়? তাহার উত্তর "বাসুদেবার্জ্জনাভ্যাং বুণ্" এই সূত্র। ইহার অর্থ এই যে বাসুদেব ও অর্জ্জুন শব্দের উত্তর তাঁহাদের ভক্ত বুঝাইতে বুণ্ প্রত্যয় হয়। এই সূত্রের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনই বুঝাইতেছে। প্রথমতঃ সাহচর্য্য বশতঃ ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য অর্জ্জন বুঝাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় পাণ্ডবই নারায়ণের সখা নর ঋষির অবতার বলিয়া শাস্ত্রে বিদিত। তিনি ভিন্ন অন্য কোন অর্জ্জুন উপাস্য হন নাই। ঐ সূত্রে উপাস্য অর্জ্জুনেরই উল্লেখ হওয়ার পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনই উল্লিখিত। মহাভাষ্যকার প্রভৃতি সকলেই অর্জ্জুন শব্দে তাই বুঝিয়াছেন। ইহার উপর যদি দেখি যে পাণিনি মহাভারতশব্দও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। সেই উল্লেখ "মহান্‌ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাস-বা জালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু" (৬।২।৩৮ পা ৩৭৭২ সি) সূত্রে আছে। অতএব ইহা স্থির যে পাণিনি মহাভারতের পর। পাণিনির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক Gold Stucker যে বলিয়াছেন, তিনি বেদান্ত ন্যায় মীমাংসা পাতঞ্জল সাংখ্য প্রভৃতির প্রাচীন, তাহা কেবল প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। পাণিনি শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী বটে, বোম্বাই অঞ্চলের অধ্যাপকগণ তাঁহাকে খৃষ্ট জন্মের ৮০০ শত বৎসরের প্রাচীন বলেন। আমরাও যেরূপ প্রমাণ পাইলাম তাহাতে তিনি ঐরূপ কালেরই লোক হইবেন। যাহা হউক পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন হওয়ায় মহাভারত অন্ততঃ ২৮০০ বৎসরের প্রাচীনগ্রন্থ প্রমাণিত হইল।

শাস্ত্রী শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সাগরের ঋণ-পরিশোধ

যে সকল মহাত্মা স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পদ্ ব্যয় করিয়া মানব-সমাজের দুঃখ হরণ ও সুখ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই অপব্যয়-বিমুখ। ভাসাভাসা ভাবে তাঁহাদের আচার-আচরণ অবলোকন করিলে তাঁহাদিগকে ব্যয়-কুণ্ঠ, এমন কি কৃপণস্বভাবের লোক বলিয়া মনে হইতে পারে।

আমাদের চিরপূজনীয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ ধাতুর লোক ছিলেন। তিনি নানাস্থান হইতে যে সকল পত্র পাইতেন, সেই সকল পত্রের ব্যবহারযোগ্য অংশ, পত্রপাঠান্তে, কাটিয়া লইতেন এবং সেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতেন। একদা স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়কে ঐরূপভাবে পত্রাংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখিতে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তুমি এরূপ চুরি-বিদ্যা কোথায় শিখিলে?" উত্তরে দুর্গামোহন বাবু প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "এ বিদ্যা আমি আপনায় দেখিয়া শিখি নাই,

এটা আমার নিজেরই বিদ্যা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তুমি অত বড় উকিল হইয়া এক কথায় ধরা দিলে. জেরার সুযোগটাও দিলে না। আমার দেখিয়া শিখিয়াছ কি না, আমি ত তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই." দুর্গামোহন বাবু সহাস্যে উত্তর করিলেন, "সত্যই এ চুরি-বিদ্যা; আপনার দেখিয়া ইহা শিখিয়াছি, এ বিষয়ে আপনিই আমার গুরু।"

গৃহে পরিচারিকা বাট্‌না বাটিয়া শিল ধোয়া জলটা ফেলিয়া দিতেছে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "কল্লে কি? অতটা বাট্‌নার জল ফেলিয়া দিলে, ওটা তরকারিতে দিলে ত লোকসান হইত না। দেখ, এমন করে অপব্যয় করিও না।" পরিচারিকা সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, "দাদা মশাইয়ের কত টাকা অপব্যয় হয়, আর শিল ধোয়া জলে নজর পড়েছে, বাট্‌নার জল আর ফেল্‌বো না।" দয়ারসাগর পরিচারিকাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমার একটি পয়সাও অপব্যয় হয় না। মানুষকে হাতে তুলে দিলে কি অপব্যয় হয়? যে দেয় তারও সুখ, আবার যে পায়, তারও সুখ। এ যে তুমি ফেলে দিলে।" যাহারা নিকটে ছিল, তাহারা সে দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন।

দোকান হইতে কোন দ্রব্য কাগজ বাঁধিয়া আনা হইলে, ঐ কাগজ ও দড়িগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়া নিজের শয়নকক্ষে আলমারির উপর রাখিয়া দিতেন, বাড়ীর সকলে বিশেষভাবে সে সময়ে বালক দৌহিত্র-দ্বয় সুরেশচন্দ্র ও জ্যোতিশ্চন্দ্র ঐ বাজে কাগজ ও দড়ি মজুত করা দেখিয়া সর্ব্বদাই পরিহাসের স্বরে দু'এক কথা বলিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর কোন বিশেষ প্রয়োজনে জ্যোতিশ্চন্দ্রের ঐ বাজে কাগজ ও দড়ির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শয়নকক্ষে আল্‌মারির মাথা হইতে ঐ বাজে কাগজ ও দড়ি আনিতে গিয়া তিনি ধরা পড়িয়া যান। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে সম্বন্ধ-সঙ্গত গালি দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঐগুলি কুড়াইয়া জড় করার সময়ে যে বড় ইয়ারকি হয়, তখন হেসে কুটিকুটি, আর এখন যে বড় সেই ছেঁড়া মাল চুরি করিতে এসেছিস্? থাম্ থাম্. আমি দিচ্ছি।" এইরূপ বহু বহু ঘটনায় দেখা যায়, আহারান্তে পাতে অন্নব্যঞ্জন পড়িয়া থাকা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। তাই অর্জ্জিত অর্থের উপযুক্ত ব্যবহারের জ্ঞানও তাঁহার জীবনে অতি উচ্চভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনার সারভাগ এই যে, জনসমাজে বাস করিতে হইলে, জনসমাজের সুখ সুবিধা সর্ব্বাগ্রে সাধন করিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণোচিত উচ্চনীতি অতি সহজভাবে তাঁহার জীবনকে আশ্রয় করিয়াছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ ও বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। সেই প্রথম অনুষ্ঠান কালে কলিকাতার ও বঙ্গের নানাস্থানের সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি বিধবা-বিবাহ-সমিতির কার্য্য পরিচালন জন্য প্রচুর সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে অগ্রসর হন, তখন স্বর্গীয় মতিলাল শীল মহোদয় প্রথম বিধবাবিবাহ অনু-

ঠানে লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম বিধবা-বিবাহের সময়ে তিনি লোকান্তর গমন করেন। তিনি জীবিত থাকিলে অবশ্যই লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় কখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নাই। কলিকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে হীরালাল শীলের এবং তদীয় সহোদরগণের সাহায্যদানের অঙ্গীকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় কার্য্যকালে তাঁহারা এক পয়সাও সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। এইরূপ অনেকেই আপন আপন প্রতিশ্রুতি পালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায়, অল্পদিনের মধ্যে মহামনা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্থসাহায্য-প্রাপ্তির আশায় ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। একের পর এক, এইরূপে বিধবা-বিবাহের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋণের পরিমাণও অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সকল প্রাথমিক অনুষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিতে তিনি নিজেই বহু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও পাঁচ শত টাকা বেতন পান, সুতরাং নির্ভয়ে নিজের মনের মত করিয়া বিবাহানুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে ১৮৫৮খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত মনোমালিন্য নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ করিলেন। বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা স্যর ফ্রেডারিক্ হ্যালিডে মহোদয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। ছোট লাট অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই পণ্ডিতের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। বিধবা-বিবাহ ব্যাপার স্মরণ করাইয়া ছোট লাট ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "এরূপ অবস্থায় চলিবে কেমন করিয়া?" উত্তরে পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "আপনি যখন ভয় দেখাইতেছেন, তখন আর ও পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কিছুই ভাবিব না। আমি অধ্যাপক বংশের লোক, এক পোয়া চাউল আর একটা কাঁচকলা হইলেই আমার দিন চলিবে। আমি ইজ্জৎ হারাইয়া চাকরি করিব না।" চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

উপার্জ্জন বন্ধ হইল, অপর দিকে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন বন্ধুবান্ধবেরা বুঝিলেন এ ঋণ হইতে তাঁহার অব্যাহতি লাভ একেবারে অসম্ভব, তখন তাঁহার সহোদরতুল্য সুহৃদ্ প্যারিচরণ সরকার মহাশয় এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক। তিনি বিধবা-বিবাহ-নিবন্ধন ঋণের পরিমাণ ও তজ্জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপদ্‌বার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া অর্থ-সংগ্রহের আয়োজন করিলেন। বোধ হয় দু'একটা বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদ অবগত হইবা মাত্র তাহা বন্ধ করাইয়া দেন এবং বলেন, "যে দেশে লোক বিধবা-বিবাহ-ফণ্ডে অর্থ-সাহায্য অঙ্গীকার ও স্বাক্ষর করিয়া পরে টাকা দিবার সময় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সে দেশে আমার ব্যক্তিগত বিপদ্-বার্ত্তা জানাইয়া অর্থ সংগ্রহ করার ন্যায় ঘৃণিত কাজ আর কি হইতে পারে? আমার ঋণ আমিই পরিশোধ করিব। বিজ্ঞাপন উঠাইয়া দেও।" পরে উল্টা বিজ্ঞাপনও বাহির হইয়াছিল। ঋণের পরিমাণ যেমন একদিকে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বিধবা-বিবাহ-অনুষ্ঠানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইতে

লাগিল। ক্রমে এমন দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল যে, দশটা টাকাও কোন কোন দিন বিদ্যাসাগরের পক্ষে মূল্যবান্ বস্তু হইয়া পড়িল। এই সময় তাঁহার ঋণের পরিমাণ ৭০।৮০ হাজার টাকা; এ কথা তিনি নিজেই আমাদের নিকট প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন।

এইরূপে ঋণজালে জড়িত বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ও পর বৎসরের প্রথম ভাগে বিদেশবাসী অমর কবি মধুসূদনের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে তিনি অর্থাভাবে বিদেশে বিপন্ন। অর্থ সাহায্য না পাইলে শীঘ্রই তাঁকে কারাগারে যাইতে হইবে। মধুসূদনের এই বিপদ্‌বার্ত্তা অবগত হইয়া অগ্রে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সদুপায় অবলম্বনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেখানে ব্যর্থচেষ্ট হইয়া পরিশেষে উপর্য্যুপরি দুই বারে, প্রথমবারে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট ১৫০০৲ টাকা ও পরের মেলে জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট ২৫০০৲ টাকা, মোট চারি হাজার টাকা নিজ দায়িত্বে ঋণ করিয়া পাঠাইয়া দেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তখনকার অবস্থায় এই প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে করা যে সুবিবেচনার কাজ হইয়াছিল, সংসারে ইহা সকলে অবশ্য বলিবে না এবং তাঁহার হৃদয়ের মহত্বও সকলে বুঝিবে না, কিন্তু বঙ্গীয় বহু ধনী বন্ধু পরিবেষ্টিত মধুসূদন ও তাঁহার ন্যায় আরও বহু বিপন্ন ব্যক্তিই কেবল বিদ্যাসাগরের হৃদয়-শক্তির অপরিমেয়তা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাই বঙ্গের মধুসূদন,—বিদেশে বিপন্ন মধুসূদন,—সাগরসদনে উপকৃত মধুসূদন তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে নিজ হৃদয়ের গম্ভীর কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে!
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে—
গিরীশ * * * ।" ইত্যাদি।

মধুসূদন এই চারি সহস্র মুদ্রার ঋণ কোনও দিন পরিশোধ করিতে পারেন নাই। সুদসহ ঐ ঋণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও সেই অসামান্য শক্তিশালী মহাকবি মধুসূদন বিদ্যাসাগর-সদনে বহু অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। শেষে সময়ে সময়ে সাগরের রত্নোত্তোলনের ন্যায় লুটপাট করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। উত্তমর্ণের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া এবং মধুসূদনের নিকট টাকা আদায়ের কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, বিপন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত প্রেসের অর্দ্ধাংশ বিক্রয় করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করেন।

যে সময়ে অর্থবিষয়ে তাঁহার কেবল সুবিধার সূত্রপাত হইতেছিল এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বকৃত বহুঋণ পরিশোধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদা তাঁহার পূর্ব্বতন হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও এডিশনাল ইন্‌স্‌পেক্টরের পদে অবস্থিতি কালে

তাঁহার হাতে সরকারি টাকা কিছু থাকিয়া গিয়াছে। হিসাব দৃষ্টে, তাহা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বঙ্গদেশীয় শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়কে প্রাচীন হিসাব দৃষ্টে, তাঁহার নিকট প্রাপ্য টাকার পরিমাণ স্থির করিতে ও তাঁহাকে জানাইতে লিখিলেন। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সেই পত্রখানি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের হিসাব-দপ্তরে (Office of the Accountant General) পাঠাইয়া প্রাপ্য স্থির করিতে বলিলেন। সেখান হইতে সংবাদ আসিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এক পয়সাও পাওনা নাই। তাঁহার হিসাবে দেনাপাওনা ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। ডাইরেক্টর মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রোত্তরে ঠিক তাহাই জানাইলেন। পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক লোক এতেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু সৃষ্টিছাড়া বিদ্যাসাগর এতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার হিসাবে ৪৯১১।৴৫ টাকা, গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। এ টাকা তিনি কোথায় কাহার নিকট পাঠাইবেন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তসহ তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে তাঁহার নিকট কোনও পাওনা নাই, তথাপি তিনি যখন ঋণ স্বীকার করিয়া টাকা পাঠাইতে চাহিতেছেন, তখন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট ঐ টাকা পাঠাইলেই হইবে। তদনুসারে তিনি ঐ টাকা পাঠাইয়া পরস্ববিষয়ে অতি উচ্চ ন্যায়নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

এখনকার দিনে ইংরাজ-বাঙ্গালীতে একটা মৌখিক আত্মীয়তা দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে কালের ইংরাজ-সরকারের বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত বাঙ্গালী প্রধানগণের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আর আজ কাল দেখা যায় না। আজকাল দয়া ও অনুকম্পার সম্বন্ধই স্থলবিশেষে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সমানে সমানে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা আজ কাল আর নাই। সে কালের হ্যালিডে সাহেবের সহিত এবং অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষদের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেইরূপ সম্বন্ধই স্থাপিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় গভর্ণমেণ্টের হিসাব-দপ্তরে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিসাবে পাই পয়সা ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল, ইহার তলদেশে কোন গোপন তত্ত্ব লুকাইয়া আছে। আমাদের বোধ হয় তদানীন্তন ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে এই প্রাপ্যের সম্বন্ধে এরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে হিসাব ঠিক ঠিক মিলিয়াছিল! নতুবা ৪৯১১।৴৫ টাকা হিসাব মিলিয়া যাওয়া সহজ কথা নহে। এরূপ কোন ঘটনা ইহার অন্তরালে লুকাইয়া থাকুক আর না'ই থাকুক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ-বিষয়ক উচ্চ নীতিজ্ঞান যে মানব-সংসারের আদর্শ দৃষ্টান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নিকট সরকারের এক পয়সা পাওনা নাই, এ কথায় তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি সায় দিল না; এ চরিত্র এত মহৎ বলিয়াই আজ দেশের সমগ্র লোকের পূজার বস্তু হইয়াছে।

সে কালের এডুকেশন গেজেটে পূর্ব্ব-কথিত যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, সেই বিজ্ঞাপন-সংবাদ পুণ্যশীলা ও পরদুঃখকাতরা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার কর্ণগোচর হয়।

তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপদ্‌বার্ত্তায় ব্যথিত হইয়া সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার তদানীন্তন প্রধান কর্ম্মচারী রাজীব-লোচন রায় মহাশয় দ্বারা এক পত্র লিখাইয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পত্রোত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহারাণীর এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সে পত্রে আরও বলিয়াছিলেন যে বিধবা-বিবাহ-অনুষ্ঠানে তিনি ঋণ-জড়িত হইয়াছেন, অনেকে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। এ ঋণ পরিশোধের জন্য বিধবা-বিবাহ ফণ্ডে কেহ কিছু দিলে লইতে পারি, কিন্তু মহারাণী মহোদয়া হিন্দু-বিধবা, তাঁহার পক্ষে বিধবা বিবাহ-ফণ্ডে অর্থ সাহায্য করা সঙ্গত নহে, ইহাও আমি বেশ বুঝি ; তবে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় মহারাণীর প্রদত্ত সাহায্য ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। এ সময়ে ঋণের আকারে ঐ টাকা পাইলে আমার বিশেষ উপকার হইবে। দেওয়ানজী রাজীবলোচন রায় মহারাণীর আদেশমত ৭৫০০৲ টাকা কাশীমবাজার-হিসাব-দপ্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দান বলিয়া খরচ লিখাইয়া পাঠাইলেন, তৎসহ লিখিয়া দিলেন যে উহা ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। মহারাণী জানিলেন সাহায্য করা হইল।

পরবর্ত্তিকালে, রাজীবলোচনের লোকান্তর গমনের পর এবং রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের পর্য্যবেক্ষণকালে ১২৮৯ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক পত্র সহ ঐ ৭৫০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। ঐ পত্রের কিয়দংশ এখানে দেওয়া গেল :—"বহুদিন হইল অধুনা লোকান্তরবাসী রাজীবলোচন রায় শ্রীমতীর অনুমতি অনুসারে রাজধানীর ধনাগার হইতে আমাকে ৭৫০০৲ দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, এ টাকার সুদ দিতে হইবেক না, যখন সুবিধা হইবেক পরিশোধ করিবেন।" বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সদাশয় ও উদারচেতা রাজীবলোচন বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে সুদের দায়ে অব্যাহতি দিয়া এবং সময়ের অনির্দ্দিষ্টতা জানাইয়া ঐ টাকা একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গছাইতে পারিলেই উহা মহারাণীর সাহায্যদানে পরিণত হইবে। তিনি বিষয়বুদ্ধির দৃষ্টিতে বিষয়টার বিচার করিয়া রাখিয়াছিলেন। বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়নিষ্ঠার জ্ঞানের গভীরতা ততটা অনুভব করিতে পারেন নাই, আর তাহা না পারিবারই কথা, কারণ তাঁহার আমলেও এই বর্ত্তমান মহামান্য মহারাজ বাহাদুরের আমলে কতশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সামান্য কিছু প্রাপ্তির আশায় কতই না ছুটাছুটি করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত রচনাকালে কৃষ্ণনাথ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সমভিব্যাহারে রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন সে দরবারে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বাৎসরিক প্রাপ্য বিদায়ের জন্য যেরূপ দরবার করিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সেরূপ স্থলে রাজীবলোচন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যদি টাকার পরিমাণের হিসাবে একটু ভুল বুঝিয়াছিলেন, এরূপ হয়, তাহাতে তাঁহাকে দোষারোপ করা চলে না। কারণ অর্থবিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোভশূন্যতার

উচ্চ আদর্শ কয়টা লোকই বা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে ?

রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর সেই দিন পরিচয়ের পর আমার নিকট ঐ পত্রের প্রতিলিপি দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে ঐ ৭৫০০৲ টাকা আমাকেই গ্রহণ করিতে ও উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রায় বাহাদুর আরও বলিয়াছিলেন "ঐ টাকা লইয়া সে দিন বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল ৭৫০০৲ টাকা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্যদান বলিয়াই খরচ লেখা হইয়াছিল, এখন মহারাণী দান করা টাকা পুনর্গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া মহাসঙ্কটে পড়িয়া গেলেন। উপায় কি ? বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ টাকা ফিরাইয়া দিলে, তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন, বিরক্তও হইতে পারেন ; এইরূপ অনেক তর্ক বিতর্কের পর টাকা রাখা এবং তাঁহাকে তাঁহার অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রার্থনা জানাইয়া পত্র লেখা হয়।" সে পত্রও তিনিই লিখিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই যে মধুসূদনের যে ঋণ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিয়াছিলেন, আজ সেই ঋণটা জাতীয় ঋণ বলিয়া স্বীকার করা বাঙ্গালীর অবশ্য কর্ত্তব্য। আর তাহাই যদি নীতিধর্ম্মের দৃষ্টিতে ন্যায়ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসভবনখানি যাহা কর্ত্তৃপক্ষগণের সুব্যবস্থার অভাবে ঋণদায়ে বিক্রয় হইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালী জাতির সেই মহাতীর্থস্থান, সেই মহাপুরুষের বাসস্থানটি অন্যের হস্তে চলিয়া যাওয়া কি বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্কের কথা নহে ? বাঙ্গালীর জাতীয় ধন ভাণ্ডারের অবস্থা কি, ঠিক জানি না, সম্ভব হইলে এখন সেই অর্থের দ্বারা অথবা বঙ্গের বর্ত্তমান কোন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ব্যক্তির যত্ন চেষ্টায় নূতন অর্থ সংগ্রহ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসভবন খানি তাঁহারই স্মৃতিমন্দির রূপে সুরক্ষিত হয় না ? ঐ শোভন দৃশ্য অট্টালিকা খানি অন্যের সম্পত্তি হইতে যাইতেছে, কিন্তু উহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণ সময়ে অসামান্য শক্তিশালী রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের সুবিবেচনার ফলে, তাঁহারই আদেশে ভারত গভর্ণমেণ্টের চিহ্নিত অট্টালিকা। ঐ অট্টালিকার দ্বারে মেমোরিয়াল টেব্‌লেট্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ গৃহ উনবিংশ শতাব্দীর পুণ্যতীর্থ, ও অনেকগুলি সুন্দর প্রতিকৃতি ঐ গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে কালের উদারহৃদয় ইংরাজ বন্ধুগণের মহামূল্য চিত্রপট সকল এখনও ঐ গৃহে বর্ত্তমান। প্রতিকৃতিগুলি সমেত ঐ গৃহে তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাকে তাঁহার "স্মৃতিমন্দির"রূপে বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করায় আমাদের জাতীয় সম্মান শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের কেবল কোন আপত্তি হইবে না, তাহা নহে তাঁহারা সাহ্লাদে এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। এরূপ স্থলে এরূপ অনুষ্ঠানে বাঙ্গালীর প্রধানগণ অগ্রসর না হইলে, বাঙ্গালী জাতির চিরকলঙ্ক অর্জ্জন, ও মজ্জাগত অযোগ্যতার পরিচয় দান ভিন্ন গতি নাই। তাই আজ আমি দেশের প্রধানগণের নিকট বিনীতভাবে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানের আয়োজন

করুন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিজনবর্গ উহাতে বাস করিতে পান, আর না পান, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু উহা অন্যের ব্যক্তিগত ভোগের সম্পত্তি হইবে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না, মনের এ ক্ষোভ মরিলেও যাইবে না। এইজন্য বাঙ্গালীর প্রাণরূপ ও গুণগৌরব-সম্পন্ন প্রধানগণের দ্বারে এই কাতর প্রার্থনা লইয়া, উপস্থিত হইতেছি। জাতীয় অর্থে ঐ অট্টালিকা জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত ও চিহ্নিত হইলে, এবং ঐ অট্টালিকা তাঁহার "স্মৃতিমন্দির"রূপে ব্যবহৃত হইলে, আমাদের জাতীয় গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

এই শ্রাবণ মাস তাঁহার স্বর্গারোহণ-মাস, জাতীয় জীবনের পক্ষে শ্রাবণ মাস আমাদের তর্পণ-মাস, তাই তাঁহার লোকান্তর-গমন-মাসে তাঁহার ঋণ-পরিশোধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র জীবন অনুধ্যান করিলে, মনে হয় যেন তিনি বিধাতার রাজদরবার হইতে বিপন্ন বাঙ্গালী জাতির ঋণ-পরিশোধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিজ চরিত্র, কার্য্য এবং বাক্যের দ্বারা বাঙ্গালীকে এই ঋণ-পরিশোধের মহাতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। অসংখ্য কর্ম্মঠ গণ্য মান্য ও পদস্থ ব্যক্তির বর্ত্তমান সুখ-সৌভাগ্য-সম্ভোগের সুবিধা সাধনের জন্য তিনি বঙ্গে বাঙ্গালীর পিতৃদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এমন লোক এখনও অনেকে জীবিত আছেন, যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন আজকার উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইতেন না। বাঙ্গালীর সে সেবা ও প্রতিপালনের তুলনায় তাঁহার নিজের ঋণ-পরিশোধ ও মধুসূদনের ঋণ-পরিশোধ তুচ্ছ কথা, এমন মহাপুরুষের বাসভবন অন্যের সম্পত্তি হইবে, আর আমরা দেশের লোক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পঙ্গুর ন্যায় কি বসিয়া দেখিব?

আজ বাঙ্গালা দেশে ঐশ্বর্য্যসম্পদসম্পন্ন কৃতী পুরুষের অভাব নাই। অনেকেই আছেন, কিন্তু স্বদেশের নানাবিধ হিতসাধনে উৎসর্গীকৃতজীবন মহৎ ব্যক্তির সংখ্যা করিতে গেলে তাহা অঙ্গুলির অগ্রভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বিরলসংখ্যক হৃদয়বান্ ও লোকসেবা-ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণের পুরোভাগে আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ লোকবৎসল মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের কার্য্যকলাপ সর্ব্বাগ্রে স্মরণপথে উদিত হয়। বহুপদস্থ বন্ধু-পরিবেষ্টিত বিপন্ন মধুসূদন যেমন সকলকে ত্যাগ করিয়া বিপন্ন বিদ্যাসাগরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, আমিও ঠিক সেইরূপ "খানা ডোবা, বিল খাল, নদী নালা," ত্যাগ করিয়া বহুসদনুষ্ঠানে লিপ্ত সাগরসদৃশ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতেছি। আমার কাতর প্রার্থনা যদি তাঁহার কোমল হৃদয়ে চঞ্চলতার সৃষ্টি করিতে পারে, সে হৃদয়ে যদি একটা তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহা হইলে, এই বহুপুণ্যপূর্ণ সদনুষ্ঠান সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

আমার তাঁহার নিকট প্রার্থনা ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী। সে অনুষ্ঠানের যশোরাশি দীর্ঘ দীর্ঘ ভবিষ্যতে কীর্ত্তিত ও বন্দিত হইবে। আমার প্রার্থনা বা আব্দার এই যে তিনিই কর্ণধার হইয়া অর্থ-সংগ্রহে অগ্রসর

হইলে, চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ হওয়া কঠিন হইবে না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসভবনের বর্ত্তমান মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। সে অট্টালিকার ও উদ্যানের পুনঃসংস্কার-কার্য্যেও কিছু ব্যয় হইবে। এই জন্ম মোট চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। মাননীয় মহারাজা বাহাদুর এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্‌যোগীদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইলেই, এ অনুষ্ঠান সহজেই সুসিদ্ধ হইবে। আশা করি, বিধাতার কৃপায় আমাদের প্রার্থনা অরণ্যরোদনে পরিণত হইবে না।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জমাল জমিল

শিখ রাজ্যের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, কারণ মহারাজা রণজিৎ সিংহ প্রকৃত পক্ষে পঞ্জাবের প্রথম ও শেষ শিখ রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর যে কয় জন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ক্ষমতাশালী ছিলেন না এবং কেহই দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করেন নাই। কিন্তু সেই সময় অপর কয়েক জন লোক নানাবিধ কৌশলে ক্ষমতাবান্ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারাও দীর্ঘকাল প্রতাপশালী হইতে পারে নাই; কারণ, এক জন পদস্থ হইলেই তাহার অনেক শত্রু হইত এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে হত্যা করিত। কিন্তু অর্থের ও ক্ষমতার এমনই প্রলোভন যে, এত আশঙ্কা থাকিলেও কেহ ভীত বা বিরত হইত না, প্রাণের ভয় না করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিত।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের আমলে লাহোরের প্রসিদ্ধ ফকীরবংশীয়গণ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। রণজিৎ সিংহ দেশের লোককে বা আত্মীয়-স্বজনকে বড় বিশ্বাস করিতেন না, বাহিরের লোক আনিয়া প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। বহুকাল নির্য্যাতন সহ্য করিয়া শিখেরা ঘোর মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি মহারাজা রণজিৎ সিংহ কয়েক জন মুসলমানকে কয়েকটী প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখনও হিন্দু রাজার মুসলমান মন্ত্রী ও মুসলমান রাজার হিন্দু মন্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ হয়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী হিন্দু ছিলেন; জয়পুরের মহারাজা নিষ্ঠাবান্ পরম হিন্দু; তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এখন একজন মুসলমান। যাঁহারা হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ লইয়া সর্ব্বদা জল্পনা করেন, তাঁহারা এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

ফকীর নূরউদ্দীনের অনুচরবর্গের মধ্যে জমাল ও জমিল দুই ভাই ছিল। তাহারা যমজ, দেখিতে অনেকটা এক রকম; কিন্তু প্রভেদ ছিল। জমাল, জমিলের ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, অতএব সে বড়। জমালের মুখে একটা বড় আঁচিল, জমিলের তা ছিল না। জমাল মোটা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, জমিল কৃশ। কিন্তু দুই জনে বড় মনের মিল, আর দুই জনের প্রকৃতি এক রকম। দুই জনের চটকদার পোষাকও এক রকম। দুই জনই ধূর্ত্ত, ক্রূর,

সাহসী, লোভী। বয়স হইবে চব্বিশ পঁচিশ বৎসর। তবে জমালের অপেক্ষা জমিল অধিক চতুর; জমাল কোন সংশয়ে পড়িলে জমিলের পরামর্শ লইত। একটা ফন্দী জমিলের যত শীঘ্র যোগাইত, জমালের তত শীঘ্র যোগাইত না; জমিলের সাহস অদম্য, জমালের সকল সময় সাহস কুলাইয়া উঠিত না। অথচ কোন কর্ম্মে জমিল প্রকাশ্যে অগ্রণী হইত না, জমালকে আগে রাখিত; বড় ভাই বলিয়া তাহাকে সম্মান করিত। সেই জন্য দুই ভাইয়ের কথা উঠিলে লোকে বলিত 'বড়ে মিঞা তো বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা তো সুভানল্লা!'

২

জমাল বলিল, "সাওয়ল সিং আমাদের ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে।"

জমিল বলিল, "ভাই সাহেব, সে ত বড় আজব কথা। তাহাতে তাহার কি লাভ হইবে?"

"শুনিতেছি যে সে লছমী কওরের সঙ্গে গোপনে ষড় করিতেছে, যাহাতে ফকীর সাহেব মশীর মাল (খাজাঞ্চি) না থাকিতে পান। তাহা হইলেই ত আমাদের মুস্কিল!"

জমিল গোঁফ পাকাইয়া কহিল, "এ কথা তোমাকে কে বলিল?"

"রামদীন বলিয়াছে। লছমীর সঙ্গে তার আশ্‌নাই আছে জান ত?"

'হাঁ, সে নিজে তাহাই বলে। কথা সত্য কি না জানি না।"

"সত্য না হইলে বলিয়া তার কি লাভ? রাণী সাহেবা ত লছমীর হাতে, সে যাহা বলে তিনি তাহাই করেন।"

"সে কথা ঠিক। রামদীনের কথা সত্য কি না জানিতে হইবে। আর যদি লছমী কাহারও জন্য চেষ্টা করে ত রামদীনের জন্যই করিবে, সাওয়ল সিংহের জন্য কেন?"

"সাওয়ল সিং সদর তহশীলদার, তার একটা পদ আছে, রামদীনকে কে চেনে? সাওয়ল সিং নামে খাজাঞ্চি হইবে, কিন্তু রামদীন আর লছমীর হাতে সব ক্ষমতা থাকিবে।"

জমিল ভাবিতে লাগিল। মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর কাহারও পদের স্থিরতা ছিল না। ফকীর নূরউদ্দীনের যথেষ্ট সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি, কিন্তু শত্রুতে তাঁহার অনিষ্ট করিতে কত ক্ষণ? রাণী মীরা সাহেবা সর্ব্বেসর্ব্বা। লোকে মনে করিত লছমী তাঁহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইতে পারে। জমাল জমিল ফকীর সাহেবের বদৌলত যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের আশা ছিল যে তাহারা দরবারে বড় পদ পাইবে। ফকীর সাহেব পদচ্যুত হইলে, তাহাদের সকল আশা যায়। ভাবিয়া জমিল কহিল, "আসল কথা জানিয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।"

জমাল কহিল, "সে কাজ তোমাকে দিয়াই হইবে।"

৩

লছমী রাণী সাহেবার ঠিক দাসী বা পরিচারিকা ছিল না। নিজের বাড়ীতে থাকিত, রাণীর মহলে নিত্য যাতায়াত করিত। লছমী যুবতী, কিন্তু বিশেষ সুন্দরী নয়। তবে তাহার একটা আচ্‌কা শ্রী ছিল, আর

মুখের হাসি বড় মধুর ; তাহার উপর বড় বুদ্ধিমতী। লছমী কওরের ঘরে চাকর বাকর ছাড়া অন্য পুরুষ ছিল না। সে বিধবা, ইচ্ছা করিলেই সগাই করিতে পারিত; কারণ জাতিতে জাট। জাটেদের মধ্যে সগাই ও চাদর ঢাকা দুই রকম সগাই আছে, কিন্তু লছমী সগাই করে নাই। রাণী তাহার বশীভূত জানিয়া লছমীর কাছে অনেক উমেদার ও অনুগ্রহপ্রার্থী আসিত। লছমী দরজার আড়াল হইতে তাহাদের সহিত কথা কহিত। কথা-বার্ত্তা রামদীনকে দিয়া হইত। লোকে বলিত রামদীন লছমীর জার, রামদীনও কথার ভাবে তাহা স্বীকার করিত।

অপরাহ্ণ কালে মুক্ত বাতায়নের নিকট বসিয়া লছমী সূচ সূতা দিয়া ফুলকারির কাজ করিতেছিল। এমন সময় রামদীন সেই গৃহে প্রবেশ করিল। রামদীনের বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে, শরীর বলিষ্ঠ, মাঝারি গড়ন, দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু মুখ দেখিলে বিশেষ বুদ্ধিমান্ মনে হয় না। সে আসিয়া লছমীর নিকটে দাঁড়াইল। লছমী তাহাকে দেখিয়া, সূচ সূতা রাখিয়া, মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিল। তাহার হস্তের ও বক্ষের গঠন লাবণ্যপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। রামদীনের দিকে চাহিয়া সে কটাক্ষে প্রশ্ন করিল।

রামদীন ঘনাইয়া আর একটু কাছে আসিল, কিন্তু সহসা লছমীকে স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। সে মনে করিত, লছমী তাহাকে ভালবাসে এবং লোকের কাছে সেই কথা বলিত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে ভালবাসার কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই। লছমীর বড় তেজ, হঠাৎ যদি রাগিয়া উঠে, তাহা হইলে রামদীনের বিপদ্। সে একবার এগাইত, আবার পিছাইত।

রামদীন কহিল, "সাওয়ল সিংহের সেই কথাটা বলিতে আসিয়াছিলাম।"

লছমী কহিল, "কি কথা?"

"কেন, তোমাকে ত বলিয়াছি!"

লছমী মট্ মট্ করিয়া দুইটা আঙ্গুল মটকাইল। অলস ভাবে কহিল, "কত লোকে আমাকে কত কথা বলে, সব কি আমার মনে থাকে?"

রামদীন বুঝিল—লক্ষণ ভাল নয়। লছমী কখন কোন কথা ভুলে না, কিন্তু যখন ভুলিবার ভাণ করে, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়! রামদীন আর এক দিক্ দিয়া কথাটা পাড়িল।

"সাওয়ল সিং তোমার বিশেষ অনুগত।"

লছমী ভ্রূ তুলিল, "ওয়সা বহুত হয়!"

রামদীন কহিল, "সে ত সত্য কথা। তোমার মত ক্ষমতা কাহার আছে? তবে একটা কথা তোমাকে বলি নাই। সাওয়ল সিং মন্ত্রীর মাল হইলে তোমাকে লক্ষ টাকা নজর দিবে।"

লছমী মুখে বলিল, "আমি কি টাকার কাঙ্গাল?" কিন্তু লোভে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রামদীন বলিল, "তোমার টাকার ভাবনা কি? কিন্তু ফকীর নুরউদ্দীন তোমাকে গ্রাহ্য করে না, তোমার আশ্রিত একজন লোকের হাতে খাজানা থাকিলে ক্ষতি কি?"

লছমী অল্প হাসিল, কহিল, "তা ত

বুঝিলাম, কিন্তু ইহাতে তোমার স্বার্থ কি ?"

"সাওয়ল সিং মণীর মাল হইলে আমি নায়েব খাজাঞ্চি হইব।"

"এইবার কথাটা স্পষ্ট হইল। তাহা হইলে আমার কাছে কে থাকিবে ? লোক জনের সহিত আমি কেমন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিব ?"

"আমি সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিব। খাজানা দেখিতে কতক্ষণ লাগিবে ?"

লছমী কওর বলিল, "তবে পাকা চাকরী এখানেই থাকিবে। দোসরা লোক বাহাল করিবার আবশ্যক নাই ?"

রামদীন হাত তুলিয়া কহিল, "আমি থাকিতে আর কাহারও প্রয়োজন কি ?"

লছমী রামদীনের দিকে চাহিয়া কুটিল হাসি হাসিল। কহিল, "সাওয়ল সিং ত লাখ টাকা নজর দিবে, তুমি কত দিবে ?"

"টাকা কি ছার ? আমি তোমার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত।" রামদীন সাহস করিয়া লছমীর হস্ত ধারণ করিল।

উচ্চ হাস্য করিয়া লছমী হাত সরাইয়া লইল। কহিল, "শুনিতে পাই তুমি বলিয়া বেড়াও যে তোমার সঙ্গে আমার আশনাই আছে। এখন কি কাজেও তাই করিবে না কি ?"

রামদীন লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। লছমীর দিকে না চাহিয়া কহিল, "মিথ্যা কথা। আমার কি এমন স্পর্দ্ধা যে তোমার দিকে নজর তুলিব। তুমি ইচ্ছা করিলে বড় বড় সর্দ্দারেরা তোমার পদানত হয়।"

লছমী উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘৃণাপূর্ব্বক কহিল, "সে কথা মনে রাখিও। গোলামের অবস্থা গোলামের মত থাকে, সে কখন মনিব হয় না।"

লছমী চলিয়া গেল। রামদীন লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে অস্থির হইয়া বাহিরে গেল।

লছমী কাজটা ভাল করিল না। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শত্রুসংখ্যা বাড়াইতে নাই।

৪

পাগড়ী মাথায় বুক ফুলাইয়া রামদীন ডব্বী বাজারে বেড়াইতেছিল, এমন সময় জমিলের সঙ্গে দেখা। জমিল ঝুঁকিয়া সেলাম করিল, "আদাব জনাব মিজাজ তো অচ্ছা হয় ?"

রামদীন একটু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "বন্দিগী, মেহেরবান। মিজাজ মোবারক ?"

দুই চারিটা কথা হইতে রামদীনের লছমীকৃত অপমানের কথা সহসা মনে পড়িয়া গেল। বলিল, "আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। কখন ফুরসৎ হবে ?"

জমিল কহিল, "আমি হাজির আছি। আমার গরিবখানা নিকটে। আমার সঙ্গে আসুন।"

বাজারের ভিতর দিয়া একটা গলি দিয়া জমিল রামদীনকে আপনার বাড়ী লইয়া গেল। দিব্য সাজান পরিষ্কার বাড়ী, ঘরে মসলিন পাতা, রামদীনকে খুব সমাদর করিয়া বসাইল। জমাল ও জমিল দুই জনে স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিত, একত্রে বাস করিত না। দুই জনের কেহই এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই।

জমিল কহিল, "আমার বড় খুশ নসীব

যে আমার বাড়ীতে আপনার কদম মোবারক আসিল।"

রামদীন কহিল, "বলেন কি সাহেব। আমার ত পরম সৌভাগ্য। কোন দিন আশা করি আমার গরিবখানায় আপনি তশরীফ আনিবেন।"

জমিল কহিল, "আমি আপনার তাবেদার, যখন হুকুম করিবেন, তখনি হাজির হইব।"

কিছুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর জমিল আসল কথা পাড়িল। কহিল, "লালাজি, আমাদের খোলাখুলি কথা হওয়া উচিত। গোপন করিলে কাহারও লাভ নাই।"

রামদীন এ কথায় সায় দিল, বলিল, 'তা বটেই ত!"

"দেখুন, আমরা বরাবর জানি যে সর্দ্দার সাওয়ল সিংহ ও আপনি আমাদের দোস্ত, আমরা সব কাজ পরামর্শ করিয়া করিব। এখন যে আপনারা ফকীর সাহেবের বিরুদ্ধে কাররওয়াই করিতেছেন, সেটা কি ভাল হইতেছে?"

রামদীন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কহিল "এ কথা আপনাদিগকে কে বলিল?"

"সে কথায় কাজ কি? কথাটা সত্য আপনারা তাহা বেশ জানেন। ফকীর সাহেবের পদ যাইলে আমাদের রুটী মারা যায়। আপনাদের কোন অভাব নাই, তবে আমাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করিতেছেন কেন?"

"শেখ সাহেব, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন হইতে আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করিব না। বরং আমরা আপনাদের সাহায্য চাই।"

"কি কাজে?"

"আপনারা মনে করেন যে লছমী কওর আমাদের পক্ষে ও আমাদের সহায়তা করিতেছে?"

"সে ত জানা কথা। লছমী কওরও আপনার হাতে।" জমিল চোক টিপিয়া একটু হাসিল।

রামদীন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আপনারা সে সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন মিথ্যা। আমারও ভুল হইয়াছিল। লছমীর বড় অহঙ্কার, আমার প্রতি দৃক্‌পাতও করে না।"

"বলেন কি, লালাজি, এ কথা ত সহজে বিশ্বাস হয় না। আপনার মত তাহার খয়েরখাঁ কে আছে?"

"সে কিছু পরোয়া করে না, আমাকে চাকরের চেয়ে অধম মনে করে। এই সে দিন আমাকে অত্যন্ত অপমান করেছিল।"

"আপনাকে? এ ত বড় অসম্ভব কথা!"

"আমি কি আপনাকে মিথ্যা বলিতেছি? সে অপমান আমি কখন ভুলিব না, নিশ্চয় তাহার প্রতিশোধ লইব।"

"অলবৎ, আপনি কি একটা যে সে লোক!"

"আমি ভাবিতেছি তাহাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিব। তখন সে বুঝিতে পারিবে আমি কে।"

"এই ত কথার মত কথা! যদি আমাকে দিয়া কিছু হয় ত আমি সব সময় হাজির আছি।"

"আপনার মত ত অবশ্য চাই। কিন্তু এ কথা প্রকাশ হইলে আমাদের দু'জনেরই

বিপদ্। রাণী সাহেবা লছমীর উপর বড় মেহেরবান।”

“তোবা! আপনি আমাকে মনে করিয়াছেন কি? আমাকে দিয়া কোন কথা প্রকাশ হইতেই পারে না।”

“লছমীকে জব্দ করিলে সে আমাদের শত্রু হইবে। এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে সে আমাদের কোন অপকার না করিতে পারে। যাহাতে রাণী সাহেবা তাহার উপর নারাজ হইয়া যান, এমন কোন কৌশল করিতে হইবে।”

‘কেয়া বাৎ লালাজি, এই ত বুদ্ধির কথা! আপনার মত বুদ্ধিমান্ কয়জন আছে?”

রামদীন খুসী হইয়া সগর্ব্বে গোঁফে চাড়া দিতে লাগিল। জমিল জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কিছু হিকমৎ বাহির করিয়াছেন?”

“না, তাই ভাবিতেছি। আপনিও খুব হুসিয়ার লোক, আপনার মাথায় কিছু খেলিতেছে?”

জমিল স্বর নীচু করিয়া, রামদীনের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কয়েকটা কথা বলিল। শুনিয়া রামদীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া জমিলের পিঠ চাপড়াইতে লাগিল। “কেয়া খুব, শেখ সাহেব, এ হিকমৎ বহুত আচ্ছা! কেমন করিয়া বন্দোবস্ত করিবেন?”

জমিল কহিল, “এখনি গিয়া তাহার উপায় করিতেছি। বন্দোবস্ত করিয়া আপনাকে জানাইব।”

জমিল উঠিলে রামদীন তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে খুব খাতির করিয়া বিদায় দিল।

৫

লাহোরের কেল্লায় শীশ মহলে রাণী মীরা সাহেবা বাস করিতেন। শীশ মহলের এখন জীর্ণাবস্থা, তখন খুব সৌষ্ঠব ছিল। শীশ মহলের ছাদে উঠিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। মহলের ভিতর হমাম, তয়খানা, নদী দেখিবার ঝরোখা। প্রবেশ করিবার দুই পথ; এক সদর ফটক দিয়া, আর এক নদীর দিক্ দিয়া। সদরে সান্ত্রীর পাহারা। নদীর দিকে দরজায়ও সিপাহী থাকিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা সচরাচর রাণীর কাছে যাইত, তাহারা এই পথে যাইত। সিপাহীদের সঙ্গে এক জন খোজা থাকিত, সে পাল্কীর ভিতর দেখিয়া লইত। পরিচিত স্ত্রীলোক হইলে পাল্কী মহলে প্রবেশ করিত, নহিলে খবর দিতে হইত। দাসীরাও পাল্কীতে যাতায়াত করিত। কেল্লায় প্রবেশ করিলে চারিদিকে পরিখা। পুল পার হইয়া অনেক ঘুরিয়া মহলের প্রবেশদ্বার। সেই দ্বারের পাশে সুসজ্জিত গৃহে খোজাদের সর্দ্দার ফকীরা বসিয়া থাকিত। ফকীরার প্রবল প্রতাপ। রাণীর কাছে তাহার পথ অবারিত, পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়া রাণী সাহেবা অনেক সময় তাহার কথা শুনিতেন। সকল বিষয়ে সে তাঁহার পরামর্শদাতা। রাণীর কাছে কোন আরজি করিতে হইলে, প্রথমে ফকীরার শরণাগত হইতে হইত। ফকীরা যখন ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তায় চলিত, তখন পথের দুই পাশে লোকে তাহাকে ঝুঁকিয়া সেলাম করিত। ফকীরা দেখিতে নপুংসকের মত কুৎসিত নয়। গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মুখে গুম্ফ শ্মশ্রু না থাকিলেও মুখের ভাব প্রসন্ন গম্ভীর, কুটিলতার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই।

কেল্লার বাহিরেই ফকীরার নিজের বাড়ী। রাত্রি দশটার সময় সে মহল হইতে বাহির

হইয়া বাড়ী যাইত। রাত্রে কোন সময় ডাক পড়িলে তৎক্ষণাৎ আবার আসিত।

এক রাত্রে ফকীরা বাড়ীতে আসিয়া দেখে জমিল বসিয়া আছে। কহিল, "সেলাম শেখ সাহেব, এত রাত্রে এত তক্‌লিফ করিলেন কেন?"

জমিল কহিল, "সে কি কথা, উজীর সাহেব! আপনার দর্শন পাওয়া ত আমাদের সৌভাগ্য। আমি আপনার কাছে জরুরি কাজে আসিয়াছি।"

ফকীরা বসিয়া বলিল, "কি বলুন?"

"আপনার কাছে কোন কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, বলিলেও কোন ফল নাই। ফকীর নূরউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হইতেছে, যাহাতে তাহা সফল না হয়, সেই জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি।"

"ফকীর সাহেব ত বড় অশরাফ লোক, তাঁহার শত্রু কেন?"

"ভাল লোকেরই ত আজকাল জিয়াদা মুস্কিল, কারণ তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না।"

"কে ফকীর সাহেবের শত্রুতা করিতেছে?"

"সাওয়ল সিং ফকীর সাহেবের পদ চায় লছমী কওর তাহার সহায়তা করিতেছে।"

"কেন?"

"সাওয়ল সিং তাহাকে লক্ষ মুদ্রা নজর দিবে।"

"বটে? রাণী সাহেবা লছমীর মেহেরবান, কিন্তু তাহার কথায় কি তিনি এমন অন্যায় কর্ম্ম করিবেন?"

"কি জানি! অওরতের কথা কিছু বলা যায় না।"

"সত্য কথা। যাহাতে ফকীর সাহেবের অনিষ্ট না হয়, আমি সে চেষ্টা করিব, কিন্তু লছমীকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় নাই?"

"আমরা সে চেষ্টাও করিতেছি। আপনার কথায় বড় আশ্বস্ত হইলাম।" আর কিছুক্ষণ কথোপকথন করিয়া জমিল উঠিয়া গেল।

নিশীথের অন্ধকারে রাবী তর তর রবে বহিয়া যাইতেছিল। তীরে গাছতলায় বসিয়া এক জন ফকীর গান করিতেছিল,—

কইসে বেড়া হোওয়ে পার।
পনিয়া গহিরী লইয়া মেরি পুরাণী,
মওলা করে পার!

আকাশে চাহিয়া জমিল দেখিল, মাথার উপর চঞ্চলরশ্মি নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে। নৈশ পবন সর্ব্বত্র সমীরিত, বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতেছে। মানুষের কূট বুদ্ধিতেই কি সব হয়, মানুষের উপর কেহ নাই?

৬

আনারকলি বাজারে আলিজান নামে এক প্রসিদ্ধা গায়িকা বাস করিত। আলিজান প্রবীণা, দেখিতেও তেমন সুন্দরী নয়। নাচ মোজরায় সে বড় একটা যাইত না। প্রথম বয়সে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইদানীং সে বাইজীর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহার বাড়ীতে কখন কখন মোজরা হইত, সেখানে বাছা বাছা লোক উপস্থিত থাকিত। আলিজান বুদ্ধিমতী; তাহার চরিত্রও সাধারণ বাইজীদের মত নয়, সেরূপ ধরণ-ধারণও ছিল না।

একদিন সন্ধ্যার পর ভৃত্য আসিয়া আলিজানকে খবর দিল, "শেখ জমিল সাহেব আপনার সহিত মুলাকাত করিতে আসিয়াছেন।"

আলিজান কহিল, "তাঁহাকে ডাকিয়া আন।"

জমিল আসিয়া আলিজানকে সম্ভাষণ করিল, "সেলাম ওয়ালেকুম!"

"ওয়ালেকুম সেলাম! শেখ সাহেবের বড় মেহেরবানি। বসুন"

জমিল উপক্রমণিকার বাহুল্য না করিয়া কহিল, "আমি তোমার কাছে নিজের গরজে আসিয়াছি। ইচ্ছা করিলে তুমি ফকীর নূর-উদ্দীন সাহেবের বিশেষ উপকার করিতে পার।"

"ফকীর সাহেব সাধুপুরুষ ও পদস্থ ব্যক্তি। আমার মত লোককে দিয়া তাঁহার কি উপকার হইতে পারে?"

"লছমী কুওর রাণী সাহেবাকে বলিয়া তাঁহার পদে সাওয়ল সিংহকে নিযুক্ত করাই-বার চেষ্টায় আছে। ফকীর সাহেব পদচ্যুত হইলে আমরা নিরুপায় হইব।"

"রাণী সাহেবার মহলে লছমীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি। আমি এ বিষয়ে কি করিতে পারি?"

"ফকীরা আমাদের পক্ষে, সে আমাদের সাহায্য করিতেছে। রাণী সাহেবা যাহাতে লছমীর প্রতি নারাজ হন, সেই উপায় করিতে হইবে।"

"কেমন করিয়া?"

"তোমাকে বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। তোমার পাশের বাড়ী কাহার?"

"আমার বাড়ী। উহাতে আমার সম্পর্কে এক বহিন থাকে।"

"ঐ বাড়ীটা কিছুদিনের জন্য আমার চাই।"

"কি হইবে?"

জমিল অনুচ্চস্বরে আলিজানকে কয়েকটা কথা বলিল। শুনিয়া আলিজান হাসিতে লাগিল। কহিল, "শেখ সাহেব, আপনার যেমন বুদ্ধি, তাহাতে সময়ে আপনি এই রেয়াসতে উচ্চপদ লাভ করিবেন। আমি হুকুম তামিল করিতে প্রস্তুত, কিন্তু দেখিবেন শেষে যেন আমার গর্দন না যায়।"

"তোমার কোন আশঙ্কা নাই। আমরা যেরূপ বন্দোবস্ত করিতেছি, তাহাতে আশা আছে যে আমাদের কাহারও কোন বিপদ্ হইবে না।"

"বহুত খুব। বাড়ী আপনার কবে চাই?"

"যত শীঘ্র সুবিধা হয়।"

"আমার বহিনকে কালই গাঁয়ে পাঠাইয়া দিব। বাড়ী কাল হইতেই আপনার হাতে রহিল।"

জমিল অনেক ধন্যবাদ দিয়া, সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

৭

অপরাহ্নকালে শীশ মহলে রাণী মীরা বসিয়াছিলেন। সম্মুখে লছমী কওর বসিয়াছিল। ঘর খিলান করা, উপরে কড়িকাঠ ছিল না। ঘরের উপরে দেখিতে গুম্বজের মত, তাহাতে অসংখ্য ছোট ছোট পারামাখা কাচ বসান। সায়ং-সূর্য্যকিরণ গবাক্ষ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সহস্র কিরণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।

মীরা প্রৌঢ়া, বিধবা, বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গ স্থূল, মুখ সুশ্রী, মুখের ভাব গম্ভীর। লছমীকে ভাল বাসিতেন বলিয়া সে তাঁহার কাছে একটু আধটু আবদার করিত।

লছমী বলিল, "আমার আরজীর কি হইল ?"

রাণী কহিলেন, "এ রকম মামলা এক কথায় হয় না। ফকীর নূরউদ্দিন পুরাতন বিশ্বাসী লোক, বংশক্রমে রেয়াসতে কাজ করিয়া আসিতেছে, বিনা অপরাধে তাহাকে বিদায় করিয়া তাহার স্থানে আর একজন লোক বাহাল করিলে অনেক কথা উঠিবে।"

"আপনি মল্‌কা, আপনার উপর আবার কথা কি !"

"সেই জন্যই আমাকে অনেক দিক্ ভাবিতে হয়।"

লছমী মুখ ভার করিয়া কহিল, "তবে কি আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল ?"

"আমি তাহা ত বলি নাই, তবে আমাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ফকীর সাহেবের বিরুদ্ধে তুমি কিছু শুনিয়াছ ?"

"রাণী সাহেবা, মুসলমানেরা ত সকলেই আপনার বিপক্ষে, তাহাদের উপর বিশ্বাস কি ?"

"ফকির নূরউদ্দিন নিমকহারাম নন। তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলে মুসলমান-শত্রু বাড়িবে।"

"মুসলমানের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। খালসার বিরুদ্ধে তাহারা কি করিবে ?"

এমন সময় কেল্লার সদর দরজায় ডঙ্কা বাজিল। মীরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "আজ অমাবস্যা, রাবীতে স্নান করিতে যাইব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবে ?"

"যেমন হুকুম হয়।"

রাণী সাহেবা যখন বাহিরে যাইতেন, তখন কেল্লার সিংহদ্বারে ও সহরের সকল চৌমাথায় ডঙ্কা বাজিত। অমনি যে পথে রাণীর যাইবার কথা, সে পথ পরিষ্কার হইয়া যাইত; পথে বড় একটা লোক থাকিত না। রাণীর শিবিকা কিন্‌খাবের ঘেরাটোপ দিয়া মোড়া, আগে অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত, পশ্চাতে পরিচারিকা-দিগের পাল্কী, তাহার পিছনে সৈন্য। ফকীরা অশ্বারোহণে রাণী সাহেবার পাল্কীর পাশে থাকিত।

শীশ মহলে যাইবার সময় লছমী রাম-দীনকে দিয়া পাল্কী ডাকাইয়াছিল। পাল্কীর বেহারারা যে নূতন, পাল্কীতে উঠিবার সময় লছমী তাহা লক্ষ্য করে নাই।

কেল্লা হইতে যখন রাণী সাহেবার পাল্কী বাহির হইল, তখন লছমীর শিবিকা রাণীর পাল্কীর ঠিক পশ্চাতে। নদীতীরে রাণীর স্নানের স্বতন্ত্র স্থান ছিল, চারিদিকে কানাত দিয়া ঘেরা। স্নানাদি সমাপন করিয়া মীরা আবার পাল্কীতে উঠিলেন।

বাজারের ভিতর দিয়া ফিরিবার সময় এক স্থানে পথ সঙ্কীর্ণ। পথের পাশ দিয়া কয়েকটা গলি।

সহসা যে সকল সৈন্যেরা রাণী সাহেবার শিবিকার অগ্রে যাইতেছিল, তাহাদের সম্মুখে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হইল। তোপের আওয়াজ হইলে যেমন শব্দ হয়, প্রায় সেইরূপ শব্দ। মাটী কাঁপিয়া উঠিল, অশ্বসমূহ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, পথে লোক ছুটিয়া আসিল, পশ্চাতে যে সকল সৈনিক ছিল কি হইয়াছে জানিবার জন্য ধাবিত হইল। কেবল ফকীরা অশ্বপৃষ্ঠে রাণীর শিবিকার পাশে অবিচলিত রহিল।

গলির ভিতর একজন লোক প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়াছিল। গোলমালে যখন লোকেরা

শঙ্কিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, সেই সময় সে অগ্রসর হইয়া লছমীর পাল্কীর বাহকদিগকে সঙ্কেত করিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ পাল্কী লইয়া সেই গলিতে প্রবেশ করিল। আর কেহ ততটা দেখিল না, কিন্তু ফকীরার সকল দিকে নজর ছিল। সে চিনিল যে, যে ব্যক্তি বাহকদিগকে সঙ্কেত করিল সে আর কেহ নহে, রামদীন। ফকীরা একজন খোজাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া, অশ্বের স্কন্ধের পাশে মস্তক অবনত করিয়া, চুপিচুপি কি আদেশ করিল। আদেশ মত সে অলক্ষিতে লছমীর শিবিকার অনুগামী হইল।

কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই জানিয়া ফকীরা রাণীর শিবিকাবাহকদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। সৈন্যেরা রাণীর পাল্কী ঘিরিয়া চলিল। সে স্থানে পাহারা বসিল ও সহরকোতওয়াল আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিলেন।

গলিতে প্রবেশ করিয়া লছমীর পাল্কী চলিয়া যাইতেছে, আগে আগে রামদীন। এমন সময় একজন আসিয়া রামদীনের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "এ সওয়ারি কোথায় যাইবে?"

রামদীন রাগিয়া বলিল, "সে খোঁজে তোমার কাজ কি? কে তুমি?"

সেই সময় আর এক ব্যক্তি আসিয়া, যে রামদীনের পথ রোধ করিয়াছিল তাহার পৃষ্ঠে হস্ত অর্পণ করিল। সে ফিরিয়া, বিস্মিত হইয়া কহিল, "জমিল!"

"জমাল!"

জমিল কহিল, "তুমি এখনি একটা গোল বাধাইবে। পথ ছাড়িয়া দাও।"

জমাল কহিল "কি হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না।"

জমিল বিরক্ত হইয়া কহিল, "যেমন তোমার শরীর তেমনি তোমার বুদ্ধি! আমার সঙ্গে আইস, বলিতেছি।"

জমিল জমালের হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল। শিবিকা রামদীনের প্রদর্শিত পথে চলিয়া গেল।

বাহকেরা শিবিকা লইয়া একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। শিবিকা প্রাঙ্গণে রাখিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল। রামদীনও তাহাদের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া, বাহির হইতে সদর দরজার শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

শিবিকা ঘেরাটোপে ঢাকা ছিল, বাহিরে কি হইতেছিল লছমী জানিতে পায় নাই। কেল্লার ভিতর মহলে পাল্কী আসিয়াছে মনে করিয়া, পাল্কীর দরজা খুলিয়া, ঘেরাটোপ তুলিয়া লছমী দেখিল অপরিচিত বাড়ী কেহ কোথাও নাই। তখন ভীত হইয়া লছমী পাল্কীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল। লছমীকে দেখিয়া, সেলাম করিয়া বলিল, "আসুন, বিবিসাহেব, ভিতরে আসুন।"

লছমী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার বাড়ী?"

দাসীও বিস্মিতা হইয়া কহিল, "কেন, আপনার বাড়ী, আবার কাহার বাড়ী হইবে?"

"কেন, আমার কি বাড়ী নাই যে আমি পরের বাড়ীতে আসিব ?"

দাসী আরও বিস্মিত হইল, কহিল, "আপনি কি বলিতেছেন ? এ বাড়ী আপনার জন্য ভাড়া করা হইয়াছে, আমি আপনার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি। আপনি বিস্মিত হইতেছেন কেন ?"

লছমী বুঝিল, ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে, ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে কোন ফল নাই। স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এ বাড়ী ভাড়া করিয়াছে ?"

"আমি তাঁহার নাম জানি না। দেখিতে বিদেশী লোকের মত, আমাকে নিযুক্ত করিয়া জিনিসপত্র আনিয়া দিয়াছেন।"

"কাহার জন্য বাড়ী ভাড়া হইয়াছে ?"

"আপনার জন্য। আপনার নাম কি লছমী কওর নয় ?"

লছমী দেখিল ভিতরে কোন গভীর অভিসন্ধি আছে, এই দাসী তাহার কিছু জানে না। এমন স্থলে ভয় পাওয়া নির্ব্বোধের কাজ।

লছমী কহিল, "তবে আমারই ভুল হইয়া থাকিবে। বাহিরের দরজা খোল।"

দাসী দরজা টানিয়া দেখিল বাহির হইতে বন্ধ। ফিরিয়া লছমীকে কহিল, "যিনি বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় আসিয়া এখনি খুলিয়া দিবেন।"

আর কোন কথা না কহিয়া লছমী বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সকল ঘর দেখিয়া ছাদে উঠিল। ছাদের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। আপাততঃ এই গৃহে লছমী বন্দিনী।

কাহার এ কাজ ? লছমী ভাবিতে বসিল।

সন্ধ্যা হইলে দাসী ঘরে আলো জ্বালিল। সেই সময় সদর দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল। তাহার পর বাড়ীর ভিতরে গিয়া যে ঘরে লছমী বসিয়াছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া লছমী সরিয়া দরজার আড়ালে গেল। আড়াল হইতে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল।

তাহার বেশ মুসলমানের মত। লম্বা দাড়ী, চক্ষে সুরমা, পরিধানে ঢিলা পায়জামা, চাপকানের উপর কাবা, পায়ে রাওয়ালপিণ্ডীর জুতা। কহিল, "বিবি সাহেব, তসলীম !"

লছমী তাহার সম্মুখে না আসিয়া, দরজার পাশ হইতে কহিল, "আমার উপর এ অত্যাচার কেন ? আমি কে, জান ?"

"আপনি লছমী কওর, রাণী সাহেবার বিশেষ অনুগৃহীতা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।"

"আমি কে জানিয়াও আমার উপর এ জুলুম কেন ? রাণী সাহেবা জানিতে পারিলে তোমার মাথা থাকিবে ?"

"আমার আশা আছে যে তাহার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার নিকা হইয়া যাইবে। কাল সকাল বেলা কাজি ও সাক্ষী ডাকিব। তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর।"

"তুমি কে ?"

"আমি শেখ নিজামুদ্দীন, অটারীর জমিদার।"

লছমী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "তুমি শেখ রামদীন, আমার নিমকহারাম জাতিভ্রষ্ট গোলাম !"

রামদীন থ হইয়া গেল কিছু পরে ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমি সত্য সত্যই মুসলমান হই নাই। তুমি আমাকে ঘৃণা করিয়া অপমান করিয়াছিলে, মনে পড়ে? আমি সে কথা ভুলিয়া যাইব, কিন্তু তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। তুমি আমাকে আনন্দ মনে বিবাহ কর, আমি সমস্ত আয়োজন করিয়াছি।"

'কবে বিবাহ হইবে?"

"তুমি যবে বল। আজই রাত্রে হইতে পারে।"

লছমী মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি এই ছিলে শেখ, তাহার পর সৈয়দ হবার কথা, তাহা না হইয়া হইতে চাও শিখ। তোমার কেশ ও হাতের কড়া কোথায়?"

রামদীন লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। কহিল, "আমাকে বিদ্রূপ করিয়া তোমার কি কোন লাভ হইবে?"

"আমি ভাবিতেছি, তুমি যে আমার খসম হইবে আমি এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি।"

রামদীন রাগিয়া উঠিল। "এখন তুমি আমার হাতে পড়িয়াছ, তুমি রাজি না হও আমি তোমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিব।"

লছমী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে রামদীনকে দেখিতেছিল। ধীরে ধীরে কহিল, "এই কাজে তোমার পিছনে কে আছে বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়, ফকীর নূরউদ্দীনের লোক হইবে। তোমার ঘটে এত বুদ্ধি নাই।"

কোথায় লছমী ভয় পাইয়া রামদীনের শরণাপন্ন হইবে, না তাহাকে এইরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল। রামদীন কহিল, "তুমি মনে কর আমার নিজের কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই। তোমার বুদ্ধির কত দৌড় এই বার দেখা যাইবে।"

লছমী কহিল, "তোমার যদি বুদ্ধিই থাকিবে ত আমার সঙ্গে এমন নিমকহারামি করিবে কেন? আমি যাহাই করিয়া থাকি, তোমার ত কোন অনিষ্ট করি নাই?"

লছমী ভিতরের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। রামদীন রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া কুলুপ দিয়া গেল

শীশ মহলে উপনীত হইয়া রাণী ফকীরাকে ডাকাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথে কি হইয়াছিল?"

ফকীরা কহিল, "বোধ হয় কোন দুষ্ট বালক আতসবাজি ছুড়িয়াছিল। কোতওয়াল তদারক করিতেছেন।"

লছমীকে দেখিতে না পাইয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ' লছমী কোথায় গেল?"

একজন পরিচারিকা কহিল, 'হয় ত বাড়ী গিয়া থাকিবে।"

ফকীরা কহিল, "বাড়ী গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তাহার পাল্কী হীরা-মণ্ডির একটা গলিতে গেল। তাহার বাড়া সে দিকে নয়।"

"কোথায় গিয়াছে, জান?"

"না। জানিবার জন্য আমি এক জন খোজাকে পাঠাইয়াছি।"

"সংবাদ পাইলে আমাকে জানাইও।"

"যো হুকুম," বলিয়া ফকীরা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রাণী নিভৃতে বসিয়াছিলেন,

ফকীরা আসিয়া সেলাম করিল রাণী কহিলেন, 'কি সংবাদ?"

ফকীরা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সংবাদ বড় বিস্ময়জনক।"

"কি রকম?"

"লছমী পাল্কী করিয়া হীরামণ্ডি দিয়া বরাবর আনারকলি চলিয়া গিয়াছে। সেখানে একজন মুসলমানের বাড়ীতে গিয়াছে. পাল্কী সেই বাড়ীতেই আছে। পাড়াও ভাল নয়।"

ক্রোধে রাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "মিথ্যা কথা!"

ফকীরা হাত জোড় করিয়া, মাথা নোয়াইয়া কহিল, "যে খোজাকে পাঠাইয়াছিলাম সে এই কথা বলিতেছে।"

"তুমি নিজে গিয়া জানিয়া আইস।"

ফকীরা ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, পিছু হটিয়া, ঘরের বাহিরে গেল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফকীরা ফিরিয়া আসিল। রাণী সেই স্থানে, সেই ভাবে বসিয়া ছিলেন, ফকীরার প্রতি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিপাত করিলেন।

ফকীরা বলিল, "খোজার কথা সত্য।"

রাণীর চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইল। কঠোর স্বরে কহিলেন, "তাহাকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দাও।"

"কেন?"

"তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব।"

"সে কি অপরাধ করিয়াছে?"

"আমার অপমান করিয়াছে। যাহার এমন স্বভাব সে কোন্ সাহসে আমার মহলে আসে?"

ফকীরা যুক্ত করে কহিল, "লছমী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার মত কোন অপরাধ করে নাই। আপনি তাহাকে মহল হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে প্রকাশ্য রূপে কোন শাস্তি দিলে লোকে আপনার নামে নানা কথা রটাইতে পারে।"

রাণী ভাবিয়া কহিলেন, "তবে কি করা কর্ত্তব্য?"

"তাহাকে মহলে প্রবেশ করিতে না দিলেই তাহার যথেষ্ট শাস্তি হইবে।"

"সেই কথা ভাল। সেই রূপ আদেশ দাও।"

"তাহাই হইবে," বলিয়া রাণীকে অভিবাদন করিয়া ফকীরা চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে যখন জমিল ফকীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন ফকীরা তাহাকে বলিল, 'সেখ সাহেব, মোবারক! তোমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।"

"কি হইয়াছে?"

"লছমীর মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে তোমাদের আর কোন আশঙ্কা নাই।"

জমিল সকল কথা শুনিয়া, ফকীরার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

১০

প্রভাতে উঠিয়া লছমী দেখিল বাড়ীর সদর দরজা মুক্ত, বাড়ীতে কেহ কোথাও নাই, দাসীও চলিয়া গিয়াছে। পাল্কীর কাছে চার জন বাহক দাঁড়াইয়া আছে।

লছমীর সংশয় হইল যে হয় ত কোন নূতন বিপদ্ উপস্থিত। ভাল করিয়া দেখিল, বেহারারা তাহার পরিচিত। তাহাদিগকে

ডাকিয়া কহিল, "তোরা কাল আমাকে এ বাড়ীতে আনিয়াছিলি কেন?"

তাহারা এক বাক্যে বলিল, "আমরা কেন আনিব? কাল ত আমরা পাল্কী লইয়া যাই নাই।"

"আজ কেমন করিয়া আসিলি?"

"এক জন লোক বলিয়া দিল।"

"কে সে?"

"তা জানি না।"

পাল্কীতে উঠিয়া লছমী নিজের বাড়ী গেল। আহারাদি করিয়া মধ্যাহ্নের পর শীশ মহলে গমন করিল। দস্তুরমত প্রহরী ফটকে পাল্কীর পথ রোধ করিল, 'কিস্‌কি সওয়ারি?"

"লছমী কওর কি।"

প্রহরী খোজাকে ডাকিল। সে পাল্কীর পরদা তুলিয়া লছমীকে দেখিল। বলিল, "মহলে যাইবার হুকুম নাই।"

লছমী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু লোহিত বর্ণ করিয়া কহিল, "কি! আমি কে জানিস্?"

খোজা কহিল, "তা আর জানি না, তোমাকে নিত্য দেখিতেছি?"

"তবে আমার পাল্কী আট্‌কাস্ কোন্ সাহসে?"

"তেউড়ীর হুকুম।"

লছমী কহিল, "ফকীরা সর্দ্দার কোথায়?"

"আপনার ঘরে।"

'তাহাকে ডাক।"

"রাণী সাহেবা ছাড়া তাঁহাকে আর কেহ ডাকিতে পারে না।"

"বল, একবার আমি দেখা করিতে চাই।"

খোজা চলিয়া গেল। একটু পরে ফকীরা পাল্কীর কাছে আসিয়া পরদা তুলিল। খোজা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাগ সম্বরণ করিয়া লছমী কহিল, 'আমার এ অপমান কেন? আমি কি করিয়াছি?"

"নিজে বুঝিয়া দেখ।"

"আমি ত কিছুই করি নাই।"

"তোমাকে রাণী সাহেবা অনুগ্রহ করিতেন, কিন্তু দরবারের অহল্‌কারেরা অন্দর মহলের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। সে বিষয়ে তুমি কেন হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছিলে?"

"সে কথা রাণী সাহেবা আমাকে বলিলেই ত আমি নিরস্ত হইতাম।"

"সে কথা যাক্। কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?"

লছমী মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া শপথ করিল। "আমার সহিত কেহ শত্রুতা করিয়া আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল। আমাকে যে শপথ করিতে বল আমি করিতেছি, কেহ আমার অঙ্গস্পর্শ করে নাই।"

"সে কথা তুমি জান আর তোমার ধর্ম্ম জানে। আমরা কোন কৈফিয়ৎ চাহি না।" বাহকদিগকে আদেশ করিল, "সওয়ারি ফিরাইয়া লইয়া যাও।"

লছমী কাঁদিতে লাগিল, "একবার রাণী সাহেবার কাছে যাইতে দাও, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি।"

"হুকুম নাই," বলিয়া গম্ভীর পদ ক্ষেপে ফকীরা চলিয়া গেল। লছমী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। শীশ মহলে প্রবেশ আর তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না।

১১

জমাল জলিম দুই ভাই একত্রে বসিয়া। জমিলের বুদ্ধি-কৌশল দেখিয়া জমাল এখন তাহাকে সমীহা করিত, জমিল মুখে জমালের সম্মান করিত, কিন্তু এখন তাহার কথাতেই সব হইত।

রামদীন আসিয়া সেলাম করিয়া একটু দূরে বসিল। জমিল অল্প মাথা নাড়িয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাকে সেলাম করিল।

রামদীন দুই একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কহিল, "আমার প্রতি কি হুকুম হয়?"

জমিল কহিল, "কি বিষয়ে?"

"একটা ভাল কর্ম্ম-কাজের?"

"কেন?"

"আমি আপনাদের উপকার করিয়াছি। আমি আপনাদের পক্ষে না থাকিলে ফকীর সাহেবের কর্ম্ম লইয়া গোল বাধিত।"

"তোমার প্রধান উদ্দেশ্য লছমীর অপকার করা। তাহার নিমক খাইয়া নিমকহারামি করিয়াছ, সে তোমাকে বিশ্বাস করিত, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ। তাহারই পুরস্কার চাও?"

রামদীনের চক্ষু বাহির হইল, মুখ খুলিয়া গেল। "এ কি রকম কথা?"

"এই ত ঠিক কথা! তুমি লছমীর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, দুই দিন পরে যে আমাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবে না, তাহাই বা কে জানে? তুমি কিছু টাকা চাও লইয়া যাও, কিন্তু কাজ-কর্ম্ম পাইবে না।"

"লছমীর কাছে যাইলে সে বাড়ী ঢুকিতে দেয় না, আপনারা এই রকম বলিতেছেন। তবে আমি যাই কোথা?"

"যেখানে নিমকহারামেরা যায়—দোজখে।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(৩)

পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষাকেই মিরিয়েল তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁর মত এমন প্রাণস্পর্শী সহানুভূতি বুঝি আর কেহ দিতে পারিত না। তাঁর নীরব সহানুভূতিটুকু ব্যথিতের প্রাণে একটা যথার্থ সান্ত্বনার প্রলেপ দান করিত। বাজে বাঁধিগতের কথা তিনি কহিতেন না, শোককে ভুলিতেও তিনি কথনো বলিতেন না। তিনি জানিতেন, নিরাশ শোকই বড় তীব্র, তাই শোকার্ত্তের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া, শোককে তিনি বরং মহিমামণ্ডিত করিয়াই তুলিতেন। তিনি বলিতেন—"ব্যর্থ শোকে মৃতের স্মৃতিকে দীন কোরো না। যা হতে পারুত, মৃত্যুর

জন্য যা ঘটল না—তার কথা ভেবো না। মনের মধ্যে আশা আন, বিশ্বাস রাখ, স্থির-ভাবে সম্মুখদিকে চেয়ে দেখ—মরণের পর-তীরে, স্বর্গলোকে, প্রিয়তমের মহিমা-সমুজ্জ্বল ছবিখানি দেখতে পাবে।”

জনসাধারণের উপর মিরিয়েলের প্রভাব কতখানি বিস্তৃত ছিল, একটা সামান্য ঘটনা দ্বারাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এক সময় পরিদর্শন-কার্য্য উপলক্ষে, দুর্গম পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া তাঁহাকে কোন এক স্থানে যাইতে হয়। সে সময় সে অঞ্চলে ক্রাভাট নামক এক দুর্দ্দান্ত দস্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল। সঙ্গে রক্ষী লইয়াও সে প্রদেশে গমনাগমন তখন নিরাপদ্ ছিল না। মিরিয়েল, সকলের নিষেধ অনুজ্ঞা অনুনয় উপেক্ষা করিয়া, নিঃসঙ্গ সেই পথে যাত্রা করিলেন, বলিলেন—“বহুদিন সেখানে যাইনি, আমি না গেলে ভগবানের নাম-গান আর তাদের কে শুনাবে?”

“আপনার সবই যে তারা লুটে নেবে।”

“লুটে নেবার মত ত আমার কিছুই নেই।”

“আর যদি তারা আপনাকে হত্যা করে?”

“আমাকে? আমার মত সামান্য এক জন ধর্ম্মযাজককে হত্যা করে তাদের লাভ?”

“আপনি বিপদ্ বুঝ্ছেন না। পথে যদি আপনাকে তারা আটকায়?—”

“ভালই ত।—দরিদ্রদের জন্য ভিক্ষা চেয়ে নেবো।”

যথাসময়ে নিরাপদে মিরিয়েল গন্তব্য-স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রত্যা-বর্ত্তনের দু’একদিন পূর্ব্বে, দুইজন অজানা অশ্বারোহী একটা বড় কাঠের সিন্দুক বহিয়া আনিয়া গির্জ্জার ফটকের কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রধান গির্জ্জা হইতে অপহৃত বহুমূল্য সমস্ত দ্রব্যাদিই তাহার মধ্যে পাওয়া গেল; সিন্দুকের ভিতরে এক টুকরা কাগজে কেবলমাত্র দুইটি কথা লেখা ছিল—“ক্রাভাট—মিরিয়েলকে।” সে সব বহুমূল্য দ্রব্যাদি গির্জ্জায় প্রত্যর্পিত হইয়াছিল কি না আমরা জানি না। তবে মিরিয়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার খাতাপত্রের মধ্যে এক স্থানে একটা লেখা পাওয়া যায়—সম্ভবতঃ তাহা এই ঘটনার উল্লেখেই লিখিত। “এখন কথা এই, এ সব জিনিস গির্জ্জায় না হাঁসপাতালে—কোথায় দেওয়া যায়?”

আর একবার কোন এক কাউণ্টের সহিত নিমন্ত্রণোপলক্ষে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় কাউণ্টটি আধুনিক সভ্যতাপ্রসূ অদ্ভুত একটি জীব, ঘোরতর জড়বাদী; মিরিয়েলের কাছে এই ভাবে তিনি তাঁহার মনোবিজ্ঞানের সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন—

“আচ্ছা, এই যে এত বড় পৃথিবী, এটা কি? এক চামচ ময়দার উপর বিন্দু পরিমাণ ছিট্কা মাত্র; মানুষই তার পর তাকে গড়ে তোলে। তবে—সৃষ্টিকর্ত্তা আবার কে? অনাদ্যনন্ত কালের বিশ্বপিতাই বা কে? জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ, তার একটা সাধারণ বুদ্ধি, তার নিজের একটা বুদ্ধি-বিচার আছে। যে শুধু আত্মোৎসর্গ এবং বৈরাগ্যের উপদেশ দেয়, তাকে ত্রাণকর্ত্তা ব’লে লোকে তার কথা মেনে চল্‌বে কেন? জীবন ক’দিনের? যতদিন বেঁচে আছ হেসে খেলে নাও। আত্মোৎসর্গ কার জন্য?

বৈরাগ্য কিসের? পাপ-পুণ্যের বিচার? —হায়রে ভ্রান্তি, মৃত্যুর পর যদি অস্তিত্ব থাকে, তবেই না পাপ-পুণ্য! সে অস্তিত্ব মরীচিকা মাত্র। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেউ দিতে পারে? মৃত্যুর পর বুঝি মানুষ দেবদূত হয়, তার ঘাড়ের ওপর দুটো সবুজ পাখা বেরোয়, আর সেই পাখা নিয়ে ফড়িঙের মত হুপ হাপ্ করে এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রে লাফিয়ে লাফিয়ে সে শেষে ভগবানের কাছে যায়। এমন আজগুবি কথাও আজকাল লোকে বিশ্বাস করে! আমি ত বুঝি, পৃথিবীই সব; পৃথিবীর সুখ ছেড়ে যে স্বর্গের পানে চায়, তার পক্ষে 'যো ধ্রুবাণি'র ব্যাপারই ঘটে। আমি কে? কিছুই নই,—জন্মের পূর্ব্বেও কিছু ছিলাম না, পরেও কিছু থাক্‌ব না। এ জন্মেই আমার আরম্ভ, মৃত্যুতেই আমার শেষ। তবে সুখ ছেড়ে আমি দুঃখকে বরণ কর্‌ব কেন? সুখের পরিণাম কি?—কিছুই না; দুঃখের?—কিছুই না। তবে স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝাটা ঘাড়ে নিই কেন? ভক্ষ্য কেন হতে যাব? হই ত ভক্ষকই হব। এই আমার মনোবিজ্ঞানের মূল-সূত্র। মৃত্যুর পর জুজুর ভয় দেখাতে পার, কিন্তু সে সবই কল্পনা; মৃত্যুর পর জীবন নেই, এটা স্থির জেনো। তবে হাঁ, সাধারণলোক—যাদের চিন্তা এবং বিচার-বৃত্তি তেমন উৎকর্ষ লাভ করেনি, তাদের পক্ষে আত্মা, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, স্বর্গলোক প্রভৃতি কথাগুলা কতকটা কার্য্যকরী হয় বটে। সেই সব অজ্ঞ বেচারাদের জন্যই বেচারা ভগবানের কল্পনা—আমাদের জন্য নয়।'

মিরিয়েল শেষ পর্য্যন্ত ধীরভাবে কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন—"এ জড়বিজ্ঞান মন্দ নয়। এতে আর কিছু হোক্ না হোক্, মানুষকে নির্ব্বিবাদে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন করে দেয়—কোন কিছুর জন্য মনে আদৌ গ্লানি জন্মাতে দেয় না। তবে এ ধর্ম্ম আপনাদের মতই শিক্ষিত, উন্নত এবং অর্থবান্ লোক—যাঁরা জীবনের স্ফূর্ত্তির পথে কোন বাধাই রাখ্‌তে চান না—তাঁদের পক্ষেই পোষায়। কিন্তু আপনাদের এ তত্ত্ব গভীর গুহায় নিহিত, অনেক অনুসন্ধান করে বা'র কর্‌তে হয়। যা হোক্ ভগবানের প্রতি নির্ভর করা যে অন্ততঃ সাধারণ লোকেদের পক্ষেও প্রয়োজনীয়, এ কথাটাও যে আপনারা মানেন, সে আপনাদের উদারতা!"

(৪)

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা মিরিয়েলের চরিত্র-বর্ণনার উপসংহার করিব।

ডি—সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে নির্জ্জন এক অধিত্যকায় একটি বৃদ্ধ বাস করিত। লোকটা রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় সাধারণতন্ত্র-দলভুক্ত ছিল; এবং সাক্ষাৎভাবে তৎকালীন সম্রাটের মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে ভোট না দিলেও, সে যে একজন চরমপন্থী ছিল, সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ ছিল না। তার উপর নাস্তিক বলিয়াও তার আর একটা অখ্যাতি ছিল; ফলে বহুবৎসর ধরিয়া সে অধিত্যকায় বাস করিলেও একমাত্র ভৃত্য ব্যতীত একদিনও অন্য কোন মনুষ্যের সাক্ষাৎ লাভ সেখানে সে পায় নাই। কিন্তু মিরিয়েল প্রায়ই সুদূর

দিক্-চক্রবালে বিটপিঘনচ্ছায় সে অধিত্যকার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কি সুযোগে তাহার সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়, তাহাই ভাবিতেন। তত্রাচ, সত্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, বৃদ্ধের প্রতি জনসাধারণের ন্যায় তাঁহারও কতকটা বিতৃষ্ণা ছিল—তাই, সুযোগ ঘটিলেও, কতদিন মিরিয়েল অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সহসা একদিন বৃদ্ধের সাংঘাতিক পীড়ার কথা সহরময় রাষ্ট্র হইল—তাহার একমাত্র ভৃত্যই ডাক্তার ডাকিতে আসিয়া এ সংবাদ দিয়াছিল। মিরিয়েল তৎক্ষণাৎ গায়ে একটা মোটা কোর্ত্তা জড়াইয়া, ছড়ি হাতে করিয়া, বৃদ্ধের বাসস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সূর্য্য তখন ডুবুডুবু, বৃদ্ধের জরাজীর্ণ কুটীরখানি দূর হইতে মিরিয়েলের নয়নপথে পতিত হইল। তাঁহার ধমনীস্রোত দ্রুততর প্রবাহিত হইতেছিল;—এক লম্ফে নালা অতিক্রম করিয়া, বেড়া ডিঙ্গাইয়া, কাঁটা-গুল্মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মিরিয়েল একটা অযত্নরক্ষিত পুরাতন বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন; তারপর নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হইয়া সহসা বৃদ্ধের সম্মুখীন হইলেন। বৃদ্ধ তখন দরজার সম্মুখে চাকাওয়ালা একখানা পুরাতন চেয়ারের উপর বসিয়া অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি চাহিয়াছিল—তাহার চক্ষে একটি শান্ত আনন্দলেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পার্শ্বে ভৃত্যটি একবাটি দুধ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল; বৃদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া, ধন্যবাদ দিয়া, পাত্রটি তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিল। সহসা মিরিয়েলকে সম্মুখে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া উঠিল; কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বলিল—"আমার এ নির্জ্জন কুটীরে আজ সর্ব্ব প্রথম বাইরের লোকের দেখা পেলাম। কে আপনি মশায়?—কি চান?"

"আমি বিয়েঁভু মিরিয়েল।"

সে নাম বৃদ্ধের নির্জ্জনাবাসেও প্রবেশ করিয়াছিল।—"ওঃ, তা হলে আপনি আমার ধর্ম্মদেষ্টা?"

"হয় ত, বটি।"

"আসুন, ভিতরে আসুন"—বলিয়া বৃদ্ধ করমর্দ্দনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। মিরিয়েল সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন—"যাক্, ভাল; যা শুনেছিলাম তা নয়, আপনাকে দেখে ত তেমন পীড়িত বলে মনে হচ্ছে না।"

"আমার পরমায়ু আর তিন ঘণ্টা মাত্র।" বলিয়া বৃদ্ধ একটু থামিয়া বলিল—"চিকিৎসাশাস্ত্রে মোটামুটি আমার অভিজ্ঞতা আছে। কাল পা ঠাণ্ডা হয়েছিল, আজ কোমর পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, বুক পর্য্যন্ত উঠ্‌তে যেটুকু দেরী। জন্মের মত একবার শেষবার প্রকৃতিজননীকে ভাল করে দেখ্‌ব বলে চেয়ারখানা বাইরে টানিয়ে এনেছি। সূর্য্যাস্ত বড় মনোরম না? আর একটা উষা দেখে মর্‌বার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা ঘট্‌বে না। যাক্, উষার অরুণ, না হয় নক্ষত্রপুঞ্জের আলো—একই কথা।"

বৃদ্ধ ভৃত্যটিকে বিদায় দিল; বলিল—"সে দিন রাত্রি জেগেছ, আজ এখন ঘুমাওগে যাও।" তারপর মৃদুস্বরে বলিল—"তার ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমিও মর্‌ব। তার ক্ষণ-নিদ্রা আর আমার মহা-নিদ্রা—দু'য়েতে মিল্‌বে ভাল।"

মিরিয়েল যাহা আশা করিয়া আসিয়া-

ছিলেন, তাহা পাইলেন না—এ ত সাধুর মৃত্যু-শয্যা নয়! আর একটা কথা,—ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যাপার লইয়াই চরিত্রের সমষ্টি মিরিয়েল যে সর্ব্ববিষয়ে দেবচরিত্র ছিলেন, এমন কথা আমরা বলি না; তাই সকলের নিকটে বিশেষ সম্মানসূচক সম্বোধনে অভ্যস্ত মিরিয়েল, বৃদ্ধের কাছে এ সাধারণ ব্যবহার পাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণই হইলেন; এবং তাহার সহিত একটু রূঢ় ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার জন্মাইল। বিশেষতঃ বৃদ্ধ রাজদ্রোহী—বিপ্লব-সম্প্রদায়ভুক্ত।

কিন্তু আশ্চর্য্য সে আকৃতি—সে সমুন্নত দেহাবয়ব, স্থিরগম্ভীর স্বর, এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখভাব! অশীতিবর্ষ বয়সেও, মৃত্যুর দ্বারে আসিয়াও, তাহার সর্ব্বদেহে পূর্ণস্বাস্থ্যের লক্ষণ জাগিতেছিল। তার এ মৃত্যু যেন স্বেচ্ছামৃত্যুমাত্র, মৃত্যু-যন্ত্রণায় তাহাকে বিন্দুমাত্র কাতর করিতে পারে নাই। তাহার আকটি পদদ্বয় শীতল এবং অসাড় হইলেও, আরব্যোপন্যাসবর্ণিত নৃপতির ন্যায়, তখনও তাহার মস্তকে পূর্ণতেজ বিরাজমান ছিল

মিরিয়েল সহসা বলিলেন—"যা হোক্, আপনি যে রাজ-হত্যায় মত দেন নি, সেটা খুবই ভাল করেছেন।"

"আপনি ভুল বুঝছেন—আমি সত্যই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলাম।"

"সত্য কথা?"

"হাঁ, সত্য। তবে সে অত্যাচারী, রাজা নিজে নন—তাঁর অজ্ঞানতা। আমি সেই অজ্ঞানতাকেই দূর করতে চেয়েছিলাম। অজ্ঞানতা থেকে যে রাজশক্তির উদ্ভব এবং প্রভাব সে শক্তি মিথ্যা শক্তি। যথার্থ শক্তি বিজ্ঞানের—কারণ, সত্য থেকেই বিজ্ঞানের বিকাশ। মানুষের এই বিজ্ঞানের পথই অবলম্বন করা উচিত।"

"বিবেকের পথও বটে।"

"একই কথা। বিবেক অর্থে যে জ্ঞান আমাদের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে।"

মিরিয়েলের কাছে কথাটা একটু নূতন;—বিস্মিত হইয়া তিনি বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ বলিতে লাগিল,—"সেই অজ্ঞানতার বিরুদ্ধেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, সম্রাট্ ষোড়শলুইয়ের বিরুদ্ধে নয়। মানুষ হয়ে মানুষকে হনন করবার আমার কি অধিকার আছে? কিন্তু যেটা পাপ, সেটা দূর করা সবারই কর্ত্তব্য। সাধারণতন্ত্রের স্বপক্ষে ভোট দেবার সময় আমি শুধু স্ত্রীলোকের দৈন্য, পুরুষের হীনতা এবং বালক-বালিকার জীবনের অন্ধকারই দূর করতে চেয়েছিলাম; পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সামঞ্জস্য এবং জ্ঞানের মহিমাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম; দুর্নীতিপূর্ণ অন্ধকারময় পুরাতন আচারব্যবহার ধুয়ে মুছে ফেলে মানুষকে তার যথার্থ মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম। তবে আমাদের আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয়নি; দুর্নীতির বাহ্যাবরণই আমরা ভেঙেছিলাম—কিন্তু ভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারিনি। দুর্নীতি দূর করাটাই সব নয়—লোকের স্বভাবচরিত্র মতিগতিরও পরিবর্ত্তন সংসাধন করা চাই—নইলে কোন সংস্কারই চিরস্থায়ী হয় না, তার যথার্থ ফললাভ হয় না। শুধু হাওয়ার যন্ত্রটাকে ভেঙে কি লাভ? হাওয়া ত তবু সে-ই বইতে থাকে!"

"কিন্তু আপনাদের এ সংস্কার ত সংস্কার

নয়, এ যে একেবারে চুরমার করা! রাগের মুখে যা করা যায়, তার পরিণাম সম্বন্ধে আমার তেমন ভরসা হয় না।''

"কিন্তু ন্যায় বিচারেও ক্রোধের বশবর্ত্তিতা একটু থাকেই—সেটা দোষের নয়, সেটা সমাজকে বরং অগ্রসর করেই দেয়। এই যে ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লব,—এটা অসম্পূর্ণ হোক্ তাতে ক্ষতি নেই,—কিন্তু এমন একটা মহান্ জিনিস পৃথিবীতে আর ঘটেনি. খৃষ্টের অভ্যুদয়ের পর মানুষ আপন উন্নতির জন্য এর চেয়ে বড় চেষ্টা আর একদিনও করেনি। এর ফলে সমাজের গুপ্তবন্ধন অত্যাচার সব শিথিল হয়ে গেছে, এ বিপ্লব মানুষকে করুণার্দ্র করেছে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর ক'রে একটা শান্তির শৃঙ্খলা এনে মানুষকে উন্নত ক'রে, সমগ্র পৃথিবীর উপর যথার্থ সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত ক'রে দিয়েছে;—মানবত্বের চরম পরিণতির আভাষ দেখিয়ে দিয়েছে। পনের শ' বছর ধরে যে মেঘ জড় হচ্ছিল, পনের শ' বছরের শেষে তা' থেকে বজ্রপতন হয়েছে—সে বজ্রের দোষ কি?"

"মানি বটে; তবে, বিচারক ন্যায়ধর্ম্মের নজীর দেখায়, আর ধর্ম্মযাজক করুণার দোহাই দেয়। আচ্ছা, বালক সপ্তদশ লুইয়ের কি অপরাধ ছিল?"

"কার্ত্তুসের শিশুভ্রাতারই বা কি অপরাধ ছিল? শুধু কার্ত্তুসের ভ্রাতা বলেই বা সে নৃশংসভাবে হত হল কেন? কথাটা দুই পক্ষ থেকেই দেখা উচিত। এ বিচারে উচ্চ-নীচ, ধনাঢ্য-গরীব, রাজা প্রজার প্রভেদ করলে চলে না। আমার সঙ্গে নির্য্যাতিত দরিদ্রদের জন্য আপনি কাঁদুন, আমিও আপনার সঙ্গে অত্যাচারিত রাজবংশীয়দের জন্য কাঁদব—নইলে নয়।"

"আমি সবারই জন্য কাঁদি"

"সবারই জন্য সমানভাবে কাঁদতে হবে। করুণাটা বরং দরিদ্রের জন্যই বেশী থাকা দরকার—কারণ নির্য্যাতিত তাহারাই বেশী হয়েছে। শুধু তাই নয়"—বলিয়া, থামিয়া, বৃদ্ধ সহসা বলিয়া উঠিল—"কিন্তু আপনি কে মশায়, যে এ সময় এ সব প্রশ্ন করেন? আগে পাছে চোপদার, বাসের জন্য প্রাসাদ, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে, যে যীশু পদব্রজেই ঘুরতেন, তাঁর নামের দোহাই দিয়ে ঘুড়ি হাঁকিয়ে বেড়ান—এই ত আপনার পরিচয়?—আপনার যথার্থ স্বরূপ কি, আপনার মহত্ত্ব কোন্‌খানে যে আপনি আমাকে জ্ঞানের উপদেশ দিতে আসেন?"

"আমি সামান্য কীট মাত্র।"

"কীট মাত্র! কীট আবার গাড়ীতে চড়ে না কি?"

মিরিয়েলের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন—'মানি, না হয় যে আমি খুব ভাল খাই দাই পরি, আমার প্রাসাদ চোপদার কিছুরই অভাব নেই, ফটকের ওপাশে বাগানের ভেতর না হয় আমার ঘুড়িগাড়ীখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে—এ সবই না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু করুণা যে একটা ধর্ম্ম নয়, জীবে দয়া যে একটা কর্ত্তব্য নয়, '৯৩ খৃষ্টাব্দের সে বিপ্লবটা যে নির্ম্মায়িকতার প্রতিমূর্ত্তি নয়—এ কথা তা থেকে কি ক'রে প্রমাণিত হয়?''

"এ কথার উত্তর দেবার পূর্ব্বে, আমি আমার অসৌজন্যতার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আপনি আমার অতিথি—

আপনার অর্থ, সমাজ, সম্মান প্রভৃতি নিয়ে কোনরূপ কথা বলা আমার ভাল হয় না। বিপ্লবটাকে তবে আপনি নির্ম্মম ঘটনাচক্রের ফলমাত্র বলেন ?"

"নিশ্চয়ই। 'গিলটিন' দেখে মারাটের সে আনন্দোচ্ছ্বাসটা কি ?"

"আর রাজ-সৈন্য যখন জনসাধারণকে দ'লে পিষে মারছিল, তখন বসুয়েত যে নাম-সংকীর্ত্তন বা'র করেছিল—সেটা ?"

উত্তরটা রূঢ় হইয়াছিল—শাণিত ছুরিকার ন্যায় তাহা মিরিয়েলকে যাইয়া বিদ্ধ করিল। মিরিয়েল পরাজিত নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

সহসা বৃদ্ধের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল, তবু সে বলিতে লাগিল—"বিপ্লবটা যদি এতই নির্ম্মম হয়, রাজতন্ত্রটা তবে কি ? দু'দিকেই সমান অত্যাচার আছে। আপনি সম্রাজ্ঞী মেরী আণ্টয়নেটের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছেন কিন্তু মহানুভব লুইয়ের সময়ে যে স্তন্যদান-নিরতা জননী ধাত্রীকে, উন্মুক্তবক্ষা করিয়া কাষ্ঠদণ্ডের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া, বুভুক্ষু শিশুকে জননীর দুগ্ধস্রাবী পূর্ণ স্তনদ্বয় দেখাইয়া,—হয় দেহের না হয় আত্মার বিনাশ এ দু'য়ের মধ্যে একটাকে বরণ করিয়া লইতে বলিয়াছিল,—তার বিষয়ে আপনি কি বলেন ? এই যে টাণ্টালাসের দাহ—এর মত রূঢ় কঠোর আর কিছু কোথাও খুঁজিয়া পান কি ?—ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের বিচার করবার সময় এ কথাটা মনে রাখ্‌বেন। ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা এর ভীষণতাকে ক্ষমা করবে ;—এর তীব্রতম আঘাত থেকে মানবজাতির কল্যাণই হবে।"

"কিন্তু সকল উন্নতির মূলেই ভগবানের প্রতি নির্ভর থাকা চাই। যে নাস্তিক—সে মানুষকে শুধু বিপথেই নিয়ে যায়।"

বৃদ্ধের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।—দূর আকাশগাত্রে, যেখানে সন্ধ্যার অন্ধকার এবং গোধূলির পাটলরাগ মিশিতেছিল—বৃদ্ধ তৎ-প্রতি চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল,—দুই বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পতিত হইয়া ভূমিতল সিক্ত করিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় মৃদু কম্পিত হইয়া উঠিল,—"প্রভু, স্বামি, আমার জীবনের আদর্শস্থল ! একমাত্র তুমিই আছ !"

তার পর সুদূর আকাশগাত্রে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, মিরিয়েলকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"কালাতীত কিছু আছেই ; —আছে, ওইখানে। সেই অনন্তের মধ্যে যদি 'আমি' না থাকি, তবে, অন্ততঃ আমার কাছে, 'আমাতে'ই সে অনন্তের পর্য্যবসান হ'ত ; অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর আর তার অস্তিত্ব থাক্‌ত না। কিন্তু তা ত নয়। 'আমি' যে ওর মধ্যে আছি। এই যে আমার বড় বড় স্বরূপ যা' অনন্তের মধ্যে অভিন্ন হয়ে রয়েছে—তাই-ই ভগবান্।"

মিরিয়েল ক্রমশঃই বৃদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তাহার তুষার-শীতল দক্ষিণ হস্তখানি আপন হস্তের উপর তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"ভাই, এ মুহূর্ত্ত ভগবানের নিজস্ব। তাঁর নাম-গান না করে এ মুহূর্ত্ত বাজে কথায় কাটাব ?"

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ চক্ষুরুন্মীলন করিল। সে মুখের উপর শান্তির ছায়া ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।—

"অধ্যয়ন, চিন্তা এবং ধ্যানধারণায় আমি

আমার সারাজীবন অতিবাহিত করে এসেছি। ষাট বৎসর বয়সে স্বদেশের আহ্বানে আমি প্রথম স্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত হই। আমার যথাসাধ্য আমি সে বিষয়ে আমার কর্ত্তব্যপালন করেছি। সত্য বটে, আমি একদিন পূজাবেদী থেকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি লুণ্ঠন করেছি,— কিন্তু সেটা নিজের স্বার্থের জন্য নয়, সে বস্ত্র দিয়ে দেশেরই ধারাশোণিতস্রাবী ক্ষতমুখ ঢেকেছি। নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে আমি, যতদূর সম্ভব, বরাবর দাঁড়িয়েছি—মানুষকে চিরদিনই আলোকের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছি।—কিন্তু আজ ?—যাদের জন্য কলঙ্কের পসরা মাথায় করেছি—আজ আমি তাদেরই উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছি ; নির্জ্জিত, ঘৃণিত, নিঃসঙ্গ হয়ে এ নির্জ্জন অধিত্যকায় বাস করছি। কিন্তু সেজন্য আমি দুঃখিত নই।—আমার জীবনের এখন শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত ; এ সময় আপনি আমার কাছে কি চান ?"

মিরিয়েল নতজানু হইয়া আনতমস্তকে উত্তর করিলেন—"শুধু আপনার আশীর্ব্বাদটুকু ভিক্ষা করি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন মিরিয়েল বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিলেন—বৃদ্ধের আত্মা তখন মহাযাত্রার পথিক হইয়াছে !

চিন্তাভারমনে ধীরে ধীরে মিরিয়েল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বৃদ্ধের কথা উঠিলেই অতঃপর তিনি শুধু ঊর্দ্ধে স্বর্গের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেন। ইহার পর হইতে দুর্ব্বল এবং নির্য্যাতের প্রতি তাঁহার করুণা এবং যত্ন আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।—তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে সে আত্মার মহাপ্রয়াণের দৃশ্য, এবং সে মহান্ চরিত্রের প্রতিবিম্ব যে তাঁহার চরিত্রের উপর পতিত হইয়া, তাঁহাকে পূর্ণতর করিয়া তোলে নাই—এ কথা কেহ বলিতে পারে না।

এ সংসারে দরিদ্রের আদর নাই, ত্যাগী সন্ন্যাসীরও তেমন আমল নাই ; লোকে তাকে দূরে দূরেই রাখিতে চায়—পাছে তার সহবাসে এবং স্পর্শদোষে দারিদ্র্যের বোঝা চিরকালের মত ঘাড়ে চাপে, পাছে তার ত্যাগের আদর্শ জীবনের ত্যাগের মাত্রাটা বৃদ্ধি করিয়া দেয় ! মানুষ তাই এই 'ছোঁয়াচে সাধুতা' থেকে যত পারে দূরে দূরে থাকে। মিরিয়েলেরও সেই জন্য ধর্ম্মযাজক মহলে তত খাতির ছিল না ; অন্য বিশপদিগের ন্যায় তাই তাঁর চারিধারে গ্রহ-বেষ্টনী উপগ্রহের ন্যায়, অধস্তন ধর্ম্মযাজকদিগের তেমন সমাগম হইত না। এই আমাদের সমাজ ! 'যেন তেন প্রকারেণ' সাংসারিক সাফল্যলাভ কর—এই তাহার শিক্ষা !

কিন্তু সে সাফল্য কি ? সে ত মেকি জিনিস ;—ভ্রান্ত মানবের চক্ষে ধূলা দিবার ছল মাত্র ! সাধারণ মানুষ এই সাফল্য লইয়াই মানবের সকল উন্নতি-অবনতির বিচার করে ; তাহাদের চক্ষে অর্থসৌভাগ্যই মানুষের কার্য্যকরী শক্তির পরিচায়ক, মহত্ত্বের মাপকাঠি। গিল্টিকেই তাহারা সোণা বলিয়া দেখে, সাফল্য মাত্রকেই—(সে যেরূপ সাফল্য হউক না কেন)—প্রতিভা নামে অভিহিত করে। নক্ষত্রের দীপ্তি এবং খদ্যোতের আলো এ দুয়ের মধ্যে তাহারা বড় একটা প্রভেদ করিতে পারে না।

এরূপ ভাবে কতকটা উপেক্ষিত হইয়াও কিন্তু মিরিয়েলের মনে কোন দিন ক্ষোভ

আসে নাই। আপনার সচ্চিন্তা এবং সৎকার্য্যপ্রসূত যে আনন্দ, তাহাতেই তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া থাকিত। উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতই সে চরিত্র, তাহাতে নকলতা কিছু ছিল না; লোকব্যবহারে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁর কোন বুজরুকী ছিল না। সে চরিত্র শিশুরই মত নির্ম্মল, পবিত্র উদার,—বিশ্বকে আপন করিতে সমুৎসুক।

তত্রাচ, প্রতিভা যাহাকে বলে, মিরিয়েলের তাহা ছিল না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংশয়-প্রশ্নাদি লইয়া তিনি বড় একটা মাথা ঘামাইতে চাহিতেন না। তাঁর ধর্ম্ম যতটা হৃদয়ের, ততটা তাঁর মস্তিষ্কের নয়; সেটা বিশ্বাসের ধর্ম্ম, তর্ক-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম নয়। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কখনও তিনি তর্কবিতর্ক করিতে চাহিতেন না; তাঁর অস্তিত্বানুভূতি, তাঁর শান্ত মাধুরীটুকুই মিরিয়েলের জীবনখানিকে ভরিয়া রাখিত। ভবিষ্যৎ?—সে ত রহস্যাচ্ছন্ন; অতীত?—সে যে আরও রহস্যময়; বিশ্বের সকল জিনিসই এক মহারহস্যাবৃত!—সে দুর্জ্ঞেয় রহস্য তিনি ভেদ করিতে চাহিতেন না;—প্রশান্তভাবে চাহিয়া চাহিয়া শুধু তাহার লীলা-বৈচিত্র্য দেখিতেন। এই যে প্রকৃতির বুকে চঞ্চল অণু-পরমাণু প্রতিনিয়ত কোন্ এক অদৃশ্য শক্তিতে চালিত হইয়া, একই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া, এত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতেছে,—একের মধ্যে বহু, বহুর মধ্যে একের সমাবেশ করিতেছে;—তার কোথাও একটু ভুলচুক নাই, কোথাও কিছুর অভাব পড়ে না; এই যে অনন্ত হইতে সান্তের উদ্ভব, আলোক হইতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি; এই যে প্রতিদিনের নিত্যনূতন ভাঙ্গাগড়া, মৃত্যু ও জীবনের বিকাশ;—বিস্মিত বিমুগ্ধ মিরিয়েলের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ইহা এক অপূর্ব্ব চিত্ররেখা অঙ্কিত করিয়া দিত।

এমন লোক অনেক আছে, যাহারা বিশ্লেষণের অতলস্পর্শ গহ্বরে এবং খাঁটি কল্পনার দ্বারে, সকল গোঁড়ামি বর্জ্জিত হইয়া, ভগবানের কাছে একটা মীমাংসার জন্য আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের প্রার্থনা, ভক্তের আত্মনিবেদন নয়—তাহাতে তর্ক করিবার একটা ধৃষ্টতা জাগিয়া থাকে, ভগবানকে তাহারা শুধু প্রশ্নই করিতে থাকে। এ ধর্ম্ম—মুখ্য ধর্ম্ম, ইহার উদ্বেগ এবং দায়িত্ব খুবই বেশী।—মানবের কল্পনা সীমাবদ্ধ নহে, আপন উদ্দাম কল্পনাশক্তি দ্বারা প্রকৃতিতে সে মোহের সৃজন করে, এবং প্রকৃতিতে আবার সে প্রতিফলিত মোহ-মাধুরী দেখিয়া নিজেই আত্মহারা হয়। কিন্তু এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা সাধনবলে সৃষ্টির রহস্যলীলার মূলমন্ত্রের সন্ধান পান,—কল্পনার দিক্-চক্রবালে সীমাহীন অনন্ত-শৈলের ভীষণ ছবির দর্শন-লাভ করেন।—সে সাধনপথ বড় বন্ধুর, বিপজ্জালজড়িত,—সুইডেনবর্গ পাস্কেলের মত অতি বড় সাধকবৃন্দও সে মার্গ অবলম্বন করিয়া উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে, মানি বটে যে, এই তীব্র চিন্তাশক্তির একটা নৈতিক লাভ আছে; এই বন্ধুর পথের অবসানে একটা শ্রেষ্ঠ উন্নতির আদর্শ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বিয়েঁভু মিরিয়েল চিরদিন এ মার্গকে ভয় করিয়া চলিতেন; যেটা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ, তাহাই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন—সেটা তাঁর ধর্ম্ম-গ্রন্থোক্ত ঈশ্বরের আদেশ-বিধান পালন।

সমস্ত পৃথিবীময় এই যে আধিব্যাধি

পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—ইহার রহস্যানুসন্ধিৎসু না হইয়া কিসে তাহার মোচন হয়, তাহারই চেষ্টা তিনি করিতেন। সৃষ্টির যত কিছু কঠোরতা ভীষণতা তাঁর মনে শুধু করুণারই উদ্রেক করিত; আর্ত্ত পৃথিবী যেন চিরদিন বেদনা-ছলছল নেত্রে সান্ত্বনার ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাই ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিত; সান্ত্বনা এবং সহানুভূতি দিবার জন্য তাই তিনি এত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন।

লোকে যেমন খনি হইতে স্বর্ণ খুঁড়িয়া বাহির করে, তিনি তেমনি বিশ্বের দুঃখ-যন্ত্রণারূপ খনি হইতে মঙ্গলময়ের ছবিখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেন! তিনি বলিতেন—"পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস—তাতেই জীবনের চরম সার্থকতা।" একবার কোন ব্যক্তি তাঁহার এ উক্তি লইয়া পরিহাস করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"যদিই এটা বোকামি হয়, তা হলেও আত্মাকে, শুক্তির ভিতর মুক্তার ন্যায়, এর অভ্যন্তরে নিবদ্ধ করে রাখাই যুক্তি।" আপন জীবন সম্বন্ধে তিনি চিরদিন এইভাবে চলিয়াছিলেন, এবং ইহা হইতেই তাঁহার চিত্তের সে মহান্ গাম্ভীর্য্য এবং শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। যে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সকল মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে, অথচ নিরাশ করিয়া দেয়; abstractionএর অতলস্পর্শ গহ্বর, metaphysicsএর গগনচুম্বী শিখরদেশ, রহস্যাচ্ছন্ন গভীরতম ভাবসমূহ, অবতারবাদ, নাস্তিকতার নির্ব্বাণবাদ, অদৃষ্টবাদ, সদসতের বিচার, জৈবসংগ্রাম, মানবের বিবেকবুদ্ধি, মানবেতর জীবসমূহের চৈতন্যবোধক স্বপ্ন, মৃত্যুর রূপান্তর, মৃতের পুনর্জ্জীবন, নানা আঘাত-সংঘাত এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আত্মার একতানুভূতি, সৃষ্টির মূলভূত কারণ, 'অস্তি' এবং নাস্তি', আত্মা, প্রকৃতি এবং স্বাধীনতা, দুঃসাধ্য সমস্যাবলী—দান্তে, লুক্রেসিয়াস, সেণ্টপল প্রভৃতি যাহার মীমাংসার জন্য আপনাপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন—সে সকল লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া, মুগ্ধ হইয়া তিনি শুধু তাহার লীলা-বৈচিত্র্যই দেখিতেন।

(৫)

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার দিন মিরিয়েল আপন অভ্যস্ত সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া আসিয়া, অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত আপন কক্ষে বসিয়া, কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। ভগবানের প্রতি, আপনার প্রতি, মানবের প্রতি এবং মানবেতর জান্তব পদার্থের প্রতি—এই চতুর্ব্বিধ কর্ত্তব্য এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। দুঃখের বিষয় মিরিয়েল তাঁহার সে পুস্তক সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বৃদ্ধা ম্যাগলোয়ার যখন তাঁহার শয্যাশিয়রস্থ দেওয়াল-আলমারি হইতে রূপার বাসনাদি লইতে আসিল, তখনও তিনি নিবিষ্ট চিত্তে লিখনরত।

সহসা মিরিয়েলের চমক ভাঙ্গিল; হয় ত বা ভগ্নী খাবার আগলাইয়া বসিয়া আছে ভাবিয়া, কাগজ-পত্র তুলিয়া রাখিয়া, ভোজন-কক্ষের প্রতি অগ্রসর হইলেন।

এইখানে মিরিয়েলের বাস-ভবনের একটু বর্ণনার আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, —বাড়ীটি ছোট, দ্বিতল এবং তাহার পশ্চাদ্দিকে ফুল-ফলের একখণ্ড বাগান ছিল। একতালায় লম্বালম্বি ধরণের সারিসারি তিনটি

কক্ষ; কক্ষের মধ্য দিয়াই কক্ষান্তরে যাইতে হইত, পার্শ্বদিকে অন্য কোন দরজা ছিল না। সদর রাস্তার উপরেই প্রথম কক্ষটি অতিথি-অভ্যাগতের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্যাপ্তিস্তাইন ও ম্যাগলোয়ার দ্বিতলে থাকিতেন।

ভোজনে বসিয়া, তাহার পূর্ব্ব হইতেই, সদর দ্বার বন্ধ রাখার বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল। মিরিয়েল এ নূতন বাটীতে আসিয়াই বহির্দ্বারের খিল খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন; ম্যাগলোয়ারের প্রতিবাদের উত্তরে বলিয়াছিলেন— "দেখ, ডাক্তারের আর ধর্ম্মযাজকের বাড়ীর মধ্যে এইটুকু মাত্র প্রভেদ—ডাক্তারের বাড়ীর দ্বার কখনো বন্ধ রাখা উচিত নয়, আর ধর্ম্মযাজকের বাড়ীর দরজা সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকা উচিত।" তাঁহার সচরাচর ব্যবহৃত কোন এক পুস্তকের একস্থানে তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—'অতিথির পরিচয় জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কোরো না—নিজের নামটা যার পক্ষে দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হয়ে পড়েছে, সাধারণতঃ সেই রকম লোকই তোমার দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করতে আসে।"

আজ কিন্তু ম্যাগলোয়ার না-ছোড়-বান্দা হইয়া মিরিয়েলকে এ বিষয়ে ধরিয়া বসিল। তার কারণও ছিল। সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে যাইয়া সে একটা গুজব শুনিয়া আসিয়াছিল যে, একটা দুর্দ্দান্ত ফেরার আসামী সেই দিন রাত্রে সহরে প্রবেশ করিয়া কোথায় লুকাইয়া আছে, রাত্রে যেন সবাই সাবধানে চলাফেরা করে, প্রধান শাসনকর্ত্তা ও সহর-কোটালের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় পুলিস এখন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছে, কাজেই ধনপ্রাণ রক্ষার ভার এখন নিজেদের উপর; প্রাণের মায়া যার আছে সে যেন সর্ব্বদা সদর দরজা তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখে ইত্যাদি। শুনিয়া আসিয়া অবধি বৃদ্ধা ভয়ে কাঁপিতেছিল। মিরিয়েল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—

"এত ভয় কিসের বাছা?"

"ভয় কিসের? আ, আমার কপাল! তবে এতক্ষণ কর্ত্রীকে বলছিলাম কি?" বলিয়া ম্যাগলোয়ার রঞ্জিত করিয়া গুজবটার পুনরাবৃত্তি করিল।

"তবেই ত!" বলিয়া মিরিয়েল গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

বৃদ্ধা জো পাইয়া গেল; বলিল—"সহরের অবস্থাই দেখুন দেখি, কি ভয়ানক! এমন একটা পার্ব্বত্য সহরে, পথে কি না একটা আলো নেই! রাস্তাও আবার তেমনি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তাই বলছি, কর্ত্রী ঠাকরুণ ত বল্‌ছিলেন যে—

"আমি?" অনুচ্চ অথচ গম্ভীর স্বরে ব্যাপ্তিস্তাইন বলিলেন—"আমি কিছুই বলিনি, দাদা যা করবেন তাই ঠিক।"

ম্যাগলোয়ার তবু দমিবার পাত্রী নয়, সে বলিয়া চলিল—"কিন্তু বাড়ীটা যে একেবারে খোলা পড়ে রয়েছে, সে কথা ত মানেন? দোহাই কর্ত্তামশাই, বলুন আমি এখনি মুসবুয়া তালাওয়ালাকে ডেকে পুরাণো খিলগুলো সদর দরজায় আঁটিয়ে নিই। অন্ততঃ আজকের রাত্রিটার মত তাই করুন। ভেবে দেখুন দেখি, সামান্য একটা ছিটকিনি (তাও বাইরে থেকে খোলা যায়) যে কেউ এসে খুললেই হল—এমন অবস্থায় বাড়ীতে বাস করা দায় না? আর আপনি ত, দিনই বা কে জানে, রাত্ত দুপুরই বা কে জানে, দরজা

ঠেললেই অমনি 'আসুন মশাই' বলতেই আছেন!—তাও আবার না আছে অনুমতির অপেক্ষা, না আছে—"

অকস্মাৎ বহির্দ্দেশে দরজার উপর প্রচণ্ড এক আঘাত পড়িল।

"কে মশায়? ভিতরে আসুন।"

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয়পুরের রাজবংশ ত্রেতাযুগাবতার ভগবান্ রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশসম্ভূত। এ জন্য ইঁহারা 'কাছোয়া রাজপুত' নামে পরিচিত। অম্বরাধিপতি ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজ মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎসিংহের নাম বঙ্কিমচন্দ্রের অমর-লেখনী আজ বঙ্গদেশে সর্ব্বজনবিদিত করিয়াছে। কুমার জগৎসিংহ পিতার পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ মহাসিংহ ১৬৭১ সংবতে সিংহাসনে উপবেশন করেন। দ্বিতীয় পুত্র ঝুঝরসিংহের তিন পুত্র। এই ঝুঝরসিংহের বংশাবলী "জগৎসিংহোত রাজাবত" নামে অভিহিত। এই তিন পুত্র তিনটি পৃথক্ পৃথক্ জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। ঝালায়ার, সেওয়াড় ইসরদা এবং বারওয়াড়ার ঠাকুরগণ উক্ত তিন পুত্রের বংশসম্ভূত। এই রাজাবত-বংশীয় ঠাকুরগণ বর্ত্তমান কালে টোঙ্ক প্রভৃতি স্থানেও বাস করিতেছেন। জয়পুরের মহারাজ কেহ অপুত্রক হইলে এই রাজাবতগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া দত্তক লওয়া হইয়া থাকে।

ইসরদার ঠাকুরগণ রাজাবত-বংশের একটি বিশিষ্ট শাখা। বর্ত্তমান জয়পুরাধিপতি মহারাজ সবাই মাধোসিংহ ইসরদার স্বর্গীয় ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র,—ইঁহার পূর্ব্বের নাম কুমার কায়েমসিংহ'; ইহার মাতা ছিলেন পরলোকগত ইসরদার ঠাকুরের দ্বিতীয় 'ঠুকরাণী'। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিষয়-বিভাগ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। মাতামহ ও মাতার সহিত কুমার কায়েমসিংহও এই বিবাদে যোগ দিলেন। বাল্য ও কৈশোরে কায়েমসিংহ অত্যন্ত সাহসী ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মাতামহের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিয়া একটা কেল্লা দখল করিয়া বসিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরাজিত হইয়া জয়পুররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, কায়েমসিংহকে শাসন করিবার জন্য রাজ-সৈন্য প্রেরিত হইল। কায়েমসিংহ পরাজিত হইয়া আপন মাতা সহ বন্দী অবস্থায় জয়পুরে প্রেরিত হইলেন। মহারাজ রামসিংহের নিকট নীত হইয়া, কায়েমসিংহ বিচার প্রার্থনা করিলেন। লোকচরিত্রাভিজ্ঞ মহারাজ রামসিংহ এই তেজস্বী বুদ্ধিমান্ বালককে প্রশংসমান চক্ষে দেখিলেন—হুকুম হইল

নজরবন্দী অবস্থায় কায়েমসিংহকে তদীয় মাতা সহ জয়পুরে বাস করিতে হইবে। শিক্ষার জন্য ইহাকে 'রাজপুত-বিদ্যালয়ে' ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল এবং তদীয় মাতাকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে জয়পুরে রাখা হইল।

কিছুকাল পরে কুমার কায়েমসিংহ কয়েক জন সহচরসহ জয়পুর হইতে পলায়ন করিলেন এবং বৃন্দাবনে তদীয় মাতৃদেবীর গুরুদেব ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পলায়নকালে মহারাজ যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ণনা করেন। জয়পুর হইতে বৃন্দাবন—এই সুদূর পথ তিনি অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। অনেক সময় অনাহারেই কাটিত। যখন আহার্য্য জুটিত, তখন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই আহার করিতে হইত—কেননা পশ্চাতে জয়পুরের অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাদের ধরিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে। এমনও অনেকবার ঘটিয়াছে যে, তাঁহারা আগুন জ্বালাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বর্ষার অগ্রে বিদ্ধ মাংস আহারের জন্য ঝলসাইয়া লইতেছেন—এমন সময় সংবাদ পাইলেন, জয়পুর-সৈন্য নিকটবর্ত্তী। অর্দ্ধদগ্ধ মাংস বর্ষার অগ্রেই রহিল—তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ ঘোড়া ছুটাইয়া পলায়ন করিলেন। এমনি করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন—গুরুদেব আশ্রয় দিলেন, কিছুকাল পরে তাঁহার মাতাও বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসজীর উদ্যোগে যদুবংশীয় রাজপুত অমরগড়ের ঠাকুরের কন্যার সহিত কুমার কায়েমসিংহের বিবাহ হইল। বিবাহের সমস্ত খরচ বহন করিলেন অমরগড়ের ঠাকুর। এই অমরগড়-কন্যাই ভবিষ্যতের প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা মহারাণী যাদোনজী। মহারাণী যাদোনজীর মহামত দরিদ্র রাজপুত—তাঁহারই পর্ণকুটিরে আলিগড়ের সন্নিহিত কোরাগ্রামে অম্বরাধীশ্বরীর জন্ম হয়। শুনা যায়, মহারাণীর কুষ্ঠী দেখিয়া ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাস বলেন যে ইনি ভবিষ্যতে রাণী হইবেন,—এদিকে কুমার কায়েমসিংহের কুষ্ঠীতেও রাজগদি প্রাপ্তির যোগ আছে—তাই গুরুদেবের চেষ্টা ও আগ্রহে এই বিবাহ সংঘটিত হয়।

গুরু গিরিধারী দাস ব্রহ্মচারী একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে তিনি সে সময়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজপুতানার এবং অন্যত্র অন্যান্য হিন্দুরাজ্যের মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল এবং তখনকার এতৎস্থানের রাজন্যবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন—ভয়ও যে না করিতেন এমন বলা যায় না। সকলেই নতশিরে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। অন্যায় করিয়া তাঁহার নিকট কাহারো নিস্তার ছিল না,—উপদেশে ক্ষান্ত না হইলে, বিশেষ রূপে ভর্ৎসিত হইতে হইত। রাজা বা ধনী বলিয়া তিনি কাহাকেও কখনো খাতির করিতেন না। উত্তরকালে যে নরপতি অম্বরাধিপতি হইয়া সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মে পরমভক্তিমান্ এবং রাজ্যশাসনে বিবেচক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাস তাঁহার উপযুক্ত গুরু ছিলেন। তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষার যে ফল তাহা বর্ত্তমানে মহারাজ মাধোসিংহের চরিত্রে ও প্রতি কার্য্যে প্রকাশিত। মহারাজ গুরুকে

যে প্রকার ভক্তি ও সম্মান করিতেন, গুরু-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের এই অধঃপতনের দিনে তাহা বাস্তবিকই পুরাকালের বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিবাহের পর কুমার কায়েমসিংহ বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারী কুমারের জন্য তাঁহার শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া বুধসিংহ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন ;—ইংরাজী শিখাইবার জন্য সহকারী রাখিলেন এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, নিমাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কুমার কায়েমসিংহ তখন যুবক। তাঁহার মত উৎসাহী কর্ম্মিষ্ঠ যুবকের পক্ষে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা অসম্ভব। তাই রাজপুত যুবক তথা হইতে টোঙ্কে গিয়া নবাবের নিকট তাঁহার রেসালায় কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন।

তাঁহার টোঙ্কে অবস্থানকালে জয়পুরাধিপতি মহারাজ রামসিংহ সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইলেন। মহারাজ রামসিংহ জীবনের শেষাংশে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। তিনি শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রাসাদের যে অংশে তিনি বাস করিতেন, তাহার পার্শ্বেই তিনি "রাজরাজেশ্বর" শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ সময় সেইখানেই কাটাইতেন, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে মহারাজ অন্ত্ররোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথারীতি ঔষধ দেওয়া সত্বেও মহারাজ কোন বিধি-নিষেধ মানিতেন না বলিয়া রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেল। শরীর দুর্ব্বল হইলেও তাঁহার মানসিক বলের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তিনি নিজের অবস্থা বুঝিয়া তুলাদানাদি সম্পন্ন করিলেন। এই সময় তদানীন্তনের প্রধানামাত্য ঠাকুর ফতেসিংহ কথা উঠাইলেন যে, মহারাজের স্বর্গলোক প্রাপ্তির পর কাহাকে তিনি রাজগদির উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিতে চাহেন? মহারাজ কেবলমাত্র উপযুক্ত পাত্রের একটা লিষ্ট করিয়া পেশ করিবার আদেশ দিলেন—কেহই তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিল না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে সন্ধ্যা হইতে মহারাজের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল। অন্তিমকাল সন্নিকট বুঝিয়া মহারাজ বলিলেন যে তাঁহাকে খাট হইতে নামাইয়া নীচের বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়া হউক। আজ্ঞা অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল। তখন তিনি যথারীতি সংকল্প করিয়া স্বহস্তে দুইলক্ষ টাকা দান করিলেন। তৎপরে পুনরায় যখন দত্তক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল, তখন মহারাজ অস্থায়ী পলিটিকেল এজেণ্ট ডাক্তার হেণ্ডলি এবং অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারী এবং উপস্থিত সর্দ্দারদিগের সমক্ষে ইসরদার কুমার কায়েমসিংহের নাম করিলেন। কর্ণেল হেণ্ডলি তৎক্ষণাৎ কাগজে ইহা লিখিয়া লইয়া উপস্থিত সকলের দস্তখত করাইয়া লইলেন। তারপর অষ্টমহাদান সম্পন্ন করা হইল। রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় মহারাজ অন্যের সাহায্য ব্যতীত উঠিয়া পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। রাত্রি ১২টার সময় তৎকালের দেশীয় রাজন্যবর্গের আদর্শ-স্বরূপ মহারাজ রামসিংহ যোগীর ন্যায় স্বর্গারোহণ করিলেন।

রাত্রিতে আর অন্দর-মহলে কাহাকেও কোন সংবাদ দেওয়া হইল না। প্রত্যুষে

মহারাণীদিগের নিকট বিশ্বস্ত দাসী ও খোজা পাঠাইয়া এই দুঃসংবাদ প্রকাশ করা হইল। ক্রমে সমস্ত সহরময় এ সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল—নগরে হাহাকার উঠিল। প্রাতে স্বর্গীয় মহারাজের দেহ "গেটোরে"* লইয়া যাওয়া হইল—সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত প্রধান, অপ্রধান সর্দ্দার, রাজ-কর্ম্মচারী এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ। পশ্চাতে সমগ্র সহরবাসী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে—নগর জনশূন্য। রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম্ম, আনন্দ-উৎসব বন্ধ হইয়া গেল।

কুমার কায়েমসিংহকে আনিবার জন্য টোঙ্কে লোক পাঠান হইল। এদিকে স্বর্গীয় মহারাজের মাতৃগণ ও মহারাণীদিগের দ্বারায় কুমারকে দত্তকগ্রহণের কাগজে দস্তখত করান হইল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় কুমার কায়েমসিংহ তাঁহার শিক্ষক বুধসিংহ সহ জয়পুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। মহারাজ রামসিংহের শ্যালক যোধপুরের রাজভ্রাতা মহারাজ স্যার প্রতাপসিংহ পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলেন—কুমারকে তাঁহার নিকট রাখা হইল।

মহারাজ রামসিংহের স্বর্গারোহণ-সংবাদ ও কুমার কায়েমসিংহকে দত্তকগ্রহণ সংবাদ পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট তার যোগে দেওয়া হইয়াছিল—ইতি মধ্যে তাহারও উত্তর আসিল যে গভর্ণমেণ্টের রাজপুতানাস্থিত প্রতিনিধি (Agent to the Governor-General for Rajputana) স্বয়ং আসিয়া কুমার কায়েমসিংহের অভিষেকে যোগদান করিবেন। স্থির হইল যে তিনি মহারাজ সবাই মাধোসিংহ নাম গ্রহণ করিবেন।

কুমার যথারীতি স্বর্গীয় মহারাজের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা করিলেন। বৃন্দাবন হইতে তাঁহার মাতৃদেবী এবং সহধর্ম্মিণীকে জয়পুরে আনার বন্দোবস্ত করা হইল।

স্বর্গীয় মহারাজের শ্রাদ্ধোপলক্ষে দ্বাদশ দিনে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা। জয়পুরের চন্দ্রাতপ-আবৃত বিস্তৃত রাজপথে এবং সুবৃহৎ রাজবাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এবং অন্যান্য মহলে জাতি হিসাবে আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বেলা ১২টার সময় কেল্লা হইতে তোপধ্বনি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়পুরের লক্ষাধিক নর-নারী একত্রে আহার করিতে বসিল। মন্ত্রী, রাজ-কৌন্সিলের মেম্বর প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারিগণ এক এক বিভাগের পরিদর্শক—তাঁহাদের সুব্যবস্থায় বেলা ২টার মধ্যে এই লক্ষাধিক লোকের ভোজন সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ইহা ব্যতীত সে দিন জয়পুর দিয়া যত ট্রেণ গিয়াছিল, তাহার সমস্ত আরোহিগণ এবং রবাহুত, অনাহুত, প্রজা বা বিদেশী—উপস্থিত সকলকেই ভোজন করান হইল।

সেইদিন বেলা তিনটার সময় কুমার কায়েমসিংহ চন্দ্রমহলে রাজ-পোষাক ধারণ করিয়া সর্দ্দার, অমাত্য এবং রাজ-কর্ম্মচারিগণ বেষ্টিত হইয়া দেওয়ান-ই-খাসে আগমন করিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্যার এড্‌বার্ড ব্রাডফোর্ড (Sir Edward Bradford) দরবারে আসিয়া যথারীতি নবীন মহা-

---

* সহরের বাহিরে প্রাচীরবেষ্টিত একস্থানে জয়পুরের মৃত মহারাজগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তার পর যেখানে দাহক্রিয়া হয় তাহার উপর ছত্রি বা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানের নাম "গেটোর।" ইহা জয়পুরের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

রাজের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে, ১৮৮০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে মহারাজ সবাই মাধো-সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

মহারাজ মাধোসিংহ তখন নাবালক বলিয়া Council of Regency নামক মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। রাওল বিজয়সিংহ নামক এক-জন সর্দ্দার মহারাজের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন।

১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসর সংসারচন্দ্র অধ্যাপন-কৃতিত্বে এবং চরিত্রবলে সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন, তৎকালীন রেসিডেণ্ট ও রাজ-কর্ম্ম-চারী সকলেই তাঁহাকে সচ্চরিত্র, বিবেচক এবং কর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া জানিতেন। তাহার ফলে রেসিডেণ্ট কর্ণেল বেনন্ এবং স্যার এডবার্ড ব্রাড্‌ফোর্ড-এর পরামর্শমতে মন্ত্রিসভা সংসার-চন্দ্রকে নবীন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং সেই বৎসরের বড় দিনে কর্ণেল বেনন্ "বড় দিনের উপহার" বলিয়া সংসারচন্দ্রকে নিয়োগ-পত্র প্রদান করিলেন। (ক্রমশঃ)

সৌন্দর্য্য

সেদিন কথোপকথনের মধ্যে * * মহাশয় বলিলেন "আমাদের দেশে দিন দিন দুধ দই কমে যাচ্ছে; লোকে যতই কোন খাদ্যাদি না পাইতেছে, ততই তাহারা গাদা গাদা সাবান মুখে মাখিতেছে।" তিনি যদি স্পেন্সার না পড়িয়া থাকেন এবং তাহার যদি originalityর (নূতন তথ্যের আবিষ্কারকের) অভিমান থাকে, তাহা হইলে তিনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে স্পেন্সারও ঠিক ঐ কথাটাই বলিয়া গিয়াছেন। এ সংসারে লোকে আসল প্রয়োজনীয় জিনিষটা অপেক্ষা যে সকল জিনিষ অলঙ্কার-ভাবে প্রয়োজনীয় তাহাদিগকেই অধিক মান্য করিয়া থাকে।*

সৌন্দর্য্যের নশ্বরতা সম্বন্ধে জ্ঞানিগণ যতই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করুন না কেন, পৃথিবীর সাধারণ লোকে তাহাতে কোন কালেই বিশেষরূপ আস্থা প্রদর্শন করে নাই এবং কোনও কালে করিবে কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। মানুষের এই দুর্ব্বলতার জন্য পৃথিবীতে পমেড প্রভৃতি সৌন্দর্য্য-পদার্থের এত আদর। সভ্যদেশসমূহে সৌন্দর্য্যের বিশেষজ্ঞেরও (Beauty specialist) যথেষ্ট খাতির। এ দেশেও তাহার আবির্ভাবের বেশী দেরী আছে, তাহা বোধ হয় না।

অঙ্গহীনের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধিপক্ষে বর্ত্তমান যুগের শিল্প ও বিজ্ঞান অনেক করিয়াছে। কাণার নষ্ট চক্ষুতে এমন বেমালুম কৃত্রিম চক্ষু বসান যায় যে তাহা দেখিলে অকৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। কৃত্রিম-দন্তের কথা সকলেরই জানা আছে। কৃত্রিম পা ও চুল প্রভৃতির দ্বারা লোককে বেমালুম সাজান যাইতে পারে।

* Spencer's Education, Chap. I.

তদ্ব্যতীত স্বাভাবিক অঙ্গের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। মোটা নাককে যন্ত্র দ্বারা বাঁকাইয়া সরু ও লম্বা করা হইয়াছে। চামড়াও এক ব্যক্তির অঙ্গ হইতে অন্য ব্যক্তির অঙ্গে বসান যাইতে পারে।

তবুও কোনও ব্যক্তির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বেশী বৃদ্ধি করিবার উপায় পূর্ব্বের অপেক্ষা যে অধিক ভাল হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। সাবানের বিজ্ঞাপন যতই চটকদার হউক, উহা কালো ব্যক্তিকে ফর্সা করিতে পারে না। কলপ, পমেড প্রভৃতি অধিকাংশই অনিষ্টকর পদার্থে প্রস্তুত। বর্ণহীন ও গন্ধহীন কেরোসিন তৈলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে নারিকেল তৈল পাওয়া ভার। প্যারাফিন তৈল অত্যন্ত সস্তা হওয়ায় উহা বর্ণহীন নারিকেল তৈল বলিয়া বিক্রীত হইতেছে এবং বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ গন্ধতৈল উহার দ্বারা প্রস্তুত। নারিকেল তৈলের যে পুষ্টিকারিতা আছে, উহার তাহা কিছুই নাই। তবে উহা অধিকাংশ স্থলেই অধিক অপকারী নহে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক সৌন্দর্য্যের মূল আদর্শের যে বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে, তাহা বোধ হয় না। চুল মাথার পশ্চাদ্ভাগে খুব বেশীই থাক, কিম্বা নাই থাক, তাহাতে আসল সৌন্দর্য্যের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। গহনার ও পোষাকের চাকচিক্য কদাকার ব্যক্তির কুৎসিতত্বকে আরও পরিস্ফুট করে মাত্র। আসল সুন্দরের সৌন্দর্য্যকে সাজ-পোষাকের জৌলুসে আরও একটু ভাল দেখাইতে পারে বটে। বর্ণের আদর্শ সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক মতের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। প্রাচীন ভারতের দুই মহাকবি শ্যাম বর্ণের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ; কিন্তু আমরা এক্ষণে গৌরবর্ণেরই পক্ষপাতী। তবে সৌন্দর্য্যের অন্য আদর্শের বিশেষ পার্থক্য হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে এক সুন্দরের বর্ণনা এইরূপ:—

"তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ-
করোরুবাহ্বংসকপোলগাত্রং।
চার্ব্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ-
সুভ্র্বাননং কম্বুসুজাত কণ্ঠং ॥ ১।১৯।২৪ ॥
নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষ-
সমাবর্ত্তনাভিং বলিবল্গূদরঞ্চ।
দিগম্বরং চক্রবিকীর্ণকেশং
প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভং ॥ ২৫ ॥
শ্যামং সদাপীব্যবয়োঙ্গলক্ষ্ম্যা
স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন।

* * * *

"তাহাকে ষোড়শবর্ষ বয়স্কের মত দেখিতে। তাহার চরণ, কর, উরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল ও গাত্রাবয়ব অতি সুকুমার; আকর্ণায়ত লোচন, সুদীর্ঘ নাসিকা, সুন্দর কর্ণদ্বয়, সুন্দর ভ্রূযুক্ত তাহার আনন। তাহার রেখাত্রয়াঙ্কিত কণ্ঠদেশ সুন্দর। তাহার কণ্ঠদেশের অধোভাগস্থ অস্থিদ্বয় মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত। বক্ষঃস্থল অতি বিস্তীর্ণ ও উন্নত। নাভিস্থল আবর্ত্তের ন্যায় গভীর ও মনোহর। তাহার উদর ঈষদ্বক্র তিনটী রেখাযুক্ত সুন্দর। তাহার বাহুযুগল দীর্ঘ, দেহ উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট এবং মুখ হাস্যময়। * ইত্যাদি—

* ভাগবতোক্ত শুকদেবের বর্ণনা ভারতবর্ষের নূতন শিল্পকলার বিশেষ সমর্থন করে। শুকদেবের উদরে

সুন্দর বর্ণ, নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতির সামঞ্জস্য ও সুগঠন প্রাপ্তি মানুষের নিজের ইচ্ছায় হয় না। কিন্তু শরীরের সৌকুমার্য্য সাধন অনেকটা নিজের চেষ্টায় হইতে পারে। চরক ও সুশ্রুতের মতে সূর্য্যতাপে অতিরিক্ত পরিশ্রম বর্ণের পক্ষে অনিষ্টকর। এ কথার যাথার্থ্যও আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। শরীরের সৌকুমার্য্যের পক্ষে অতিস্থূলত্ব এবং অতিকৃশত্ব হানিকর। অতএব এজন্য অতি স্থূলকে তাহার স্থূলত্ব কমাইতে হইবে এবং অতিকৃশকে স্থূল হইতে হইবে। চেষ্টার দ্বারা এই উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে। অতি স্থূল ব্যক্তি উপবাস, কঠোর পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণের দ্বারা কৃশত্ব পাইতে পারে। * এই গ্রীষ্মের দিনে স্থূলকলেবর ব্যক্তিগণের পক্ষে অধিক পরিশ্রম করা প্রায়ই হইয়া উঠে না। পরিশ্রম করিতে এতই কষ্ট হয় যে তাঁহারা আদৌ কোনও রূপ শ্রম করে না। অথচ গ্রীষ্মকালই স্থূলতা-বৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ। আমার, বিবেচনায় স্থূলকলেবর ব্যক্তিগণের পক্ষে স্থৌল্যনিবারণের জন্য সন্তরণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। উহাতে দেহ শীতল জলের সংস্পর্শে থাকে বলিয়া পরিশ্রমজনিত কষ্ট অধিক বোধ হয় না।

তিনটী খাঁজ ছিল, উহাতে প্রমাণ হয় তাঁহার ভুঁড়ি ছিল না। নাভির বর্ণনাও ইহার পোষকতা করে। তাঁহার গলার হাঁড় (collar bone) লুক্কায়িত ছিল, ইহাতে প্রমাণ হয় তিনি রোগা ছিলেন না। অতএব যোগী ঋষিগণের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় তাঁহাদিগকে শুষ্ক কাষ্ঠের মত করিয়া চিত্রিত করা সমীচীন বোধ হয় না। শুকদেবের মত যাঁহারা অল্প বয়সেই যোগসিদ্ধ, তাঁহারা এবং দেবগণ ষোড়শবর্ষ বয়স্কের মত চিরযৌবনসম্পন্ন। যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত নহেন এবং তাঁহার ভুঁড়ি থাকিতে পারে না। তবে রজতগিরি উপমা হইতে তিনি যে প্রকাণ্ডকায় ছিলেন তাহা বলা যায়। প্রাচীন গুহা ও মন্দিরে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলিকে বর্ত্তমান কালের শিল্পের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করায় একটা বিপদ্ আছে। মন্দির-গুহার ভিতরের আলোক অতি অল্প। প্রাচীন শিল্পিগণ সেই আলোকের সাহায্যে তাঁদের মূর্ত্তি কেমন দেখাইবে, তাহা ভাবিয়া অনেক মূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন গুণকে অতিরিক্ত ভাবে দেখাইয়াছেন। হাত-পা একটু বেশী লম্বা করিতে হইয়াছে, কটী একটু বেশী ক্ষীণ করিতে হইয়াছে, ইত্যাদি। উজ্জ্বল আলোকে যে সকল চিত্র দেখা যায়, সে গুলিকে ক্ষীণ আলোকে যাহাদের দেখা হইত তাহাদের আদর্শে গড়িলে অনেকটা বেখাপ যে দেখাইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কৃশদিগকে স্থূল করিবার পক্ষে প্রচুর আহার, অল্প ব্যায়াম, ইন্দ্রিয় সংযম ও সুনিদ্রা উত্তম ব্যবস্থা। শরীরের যাহাতে ক্ষয় হয় তাহাই রোধ করিতে হইবে। †

ব্যায়াম শরীরকে সুন্দর করিবার এক শ্রেষ্ঠ উপায়। অবশ্য অত্যধিক পরিশ্রমে শরীরের আবার ক্ষতি হয়। ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত অঙ্গের গঠন যথাযথরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নৃত্য এক উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ভুঁড়ি কমা-

* প্রজাগরং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাভিপ্রবর্দ্ধয়েৎ ॥
১৬।২১ অ, সূত্রস্থান, চরক।

"Less food and more exercise, and specially the latter is the one and only remedy for fat people."—Recent Advances in Physiology, p. 310.

† "Fat may be put on (1) by increased food, (2) by lessened expenditure of energy, (3) by those two causes acting together."—Recent Advances in Physiology, p. 306.

হইবার পক্ষেও উহা পরম প্রয়োজনীয়। চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্শ্বদগণের সঙ্কীর্ত্তন কালীন নৃত্যের দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য সাতিশয় বিকশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালের সভ্যদেশসমূহের অধিকাংশ নরনারীই নৃত্য করিতে শিখেন। ইংরাজদিগের বল-নাচ একটী দৃষ্টান্ত। আমাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাচীনকালের ব্রত ও গৃহকর্ম্মাদিতে যে সকল পরিশ্রম করিতে হইত তাহা বিসর্জ্জন করিতেছেন, অথচ কোন প্রকার ব্যায়াম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কাজেই তাঁহাদের শরীরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে

দুশ্চিন্তা সৌন্দর্য্যের এক প্রধান ক্ষতিকারক। উহাতে শীঘ্র লোককে বৃদ্ধ করিয়া ফেলে। এক ফরাসী অভিনেত্রী বহুকাল নিজের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। তাহার কৃতকার্য্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত যে, 'আমি মনোমধ্যে দুশ্চিন্তাকে স্থান দিই না; তাহাই আমার সৌন্দর্য্য অটুট রাখিবার প্রধান কারণ।' ঈশ্বরবিশ্বাসী বা অদৃষ্টবিশ্বাসীর এইখানে একটা বিশেষ সুবিধা আছে। ঈশ্বর বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া তাহার অনেক দুশ্চিন্তার বোঝা কমিয়া যায়। ভারতবর্ষে যদি অদৃষ্ট না থাকিত, তবে এখানে আত্মহত্যার সংখ্যা কতই না বেশী হইত? *

এ পর্য্যন্ত আমরা শুধু শারীরিক সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণ করিতে পারে না। মানসিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্যের অভাবে উহা একেবারেই দাঁড়াইতে পারে না। এমন কত দেখা যায় শারীরিক গঠন, নাক, মুখ, চোখ আদি সকলই নিখুঁত, কিন্তু হয় ত কেমন একটা নির্ব্বুদ্ধিতা মুখখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হয়ত উহাতে কেমন একটা নৃশংসতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির ভাব রহিয়াছে, যাহাতে উহা লোককে আকর্ষণ করা দূরে থাকুক, বিপ্রকর্ষণই করিয়া থাকে অবিনয়, গর্ব্ব বা সৌন্দর্য্যের অভিমান অনেকের সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করিয়াছে। সরলতা, সহানুভূতি, বিনয় প্রভৃতি গুণ লোককে এমন জোরে আকর্ষণ করে যে, যাহাদের ঐ সকল গুণ স্বভাবতঃই নাই, তাহারা অন্ততঃ উহার ভাণও করে। আমি এক সুশিক্ষিতা ইউরোপীয় মহিলাকে দেখিয়াছিলাম, তিনি এক অল্পবুদ্ধি লোকের কতকগুলি অতি সাধারণ গল্পকে এমন ভাবে শুনিতেছিলেন, যেন তিনি সেরূপ জিনিস জীবনে কখনও শুনেন নাই। তাঁহার এ বিনয় তাঁহাকে বড় মানাইয়াছিল।

মানসিক বা অন্যান্য সদ্‌গুণ অনেক রূপহীনকেও সুরূপে পরিণত করে। এ কথা বোধ হয় অনেকেই নিজ নিজ জীবনে অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমার একটা অনুভূতির কথা বলিতেছি। সে একজন বক্তার বক্তৃতা শুনিতেছিলাম। তিনি যে সুন্দর ছিলেন এমন বলা যায় না। কণ্ঠস্বর প্রথম প্রথম বড় কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার হাঁটা যেন বড় প্রকাণ্ড। দাঁতগুলি যেন কোদাল কোদাল। কিন্তু সেই লোক আর খানিকক্ষণ বক্তৃতার পর যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার কণ্ঠস্বর আর কর্কশ নহে, হৃদয়স্পর্শী।

---

* Saleeby's "Worry" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উহা সর্ব্বতোভাবে মনকে আকর্ষণ করিয়াছে —তাহাকে Hypnotise করিয়াছে। নাক, চোখের আয়তন ও সামঞ্জস্য লইয়া তাহার বিচার করিবার চেষ্টাও নাই, সামর্থ্যও নাই, বক্তার সবই তাহার পক্ষে মধুময়।

আমাদের মনের ভাবনাগুলির ছায়া মুখের উপর পড়িয়া থাকে। মুখের কাঠামটা বহুসংখ্যক হাড়ের দ্বারা গঠিত। সেগুলি আবার বহুসংখ্যক মাংশপেশীর দ্বারা ঢাকা। সর্ব্বোপরি ত্বকের আচ্ছাদন। চক্ষুর চারিদিকে অনেকগুলি মাংসপেশী আছে। নাকেও সামান্যসংখ্যক মাংশপেশী আছে। গালে, ঠোটে, দাড়িতে, চোয়ালের উপর ও অধোভাগে বহুসংখ্যক মাংশপেশী আছে। এইগুলি হইতেই মুখের ভাব প্রস্তুত হয়। মনে যেরূপ সব ভাবনা হয়, তদনুসারে ঐ সকল মাংসপেশীর কতকগুলি আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়। ঐ সকলের আকুঞ্চন বা প্রসারণ সাধারণ লোকের স্ববশানুযায়ী (voluntary control) নহে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি (প্রায় রাজনীতিজ্ঞগণ) তীব্র ইচ্ছাশক্তির বশে উহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন। তাঁহাদের মনের ভিতর ঝড় বহিয়া গেলেও মুখে তাহার কিছু প্রকাশ নাই, অথবা যাহা আছে, তাহা অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারে না। মুখের মাংসপেশীগুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণের ফলে মুখের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চামড়াও ভিন্নভাবে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। একই ভাবে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া চামড়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানাবিধ দাগ থাকে। এই সকল দাগ দেখিয়া বুদ্ধিমান্ লোকে কাহার কিরূপ চরিত্র, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন। কোন লোকের কোন বিধ চরিত্র বদ্ধমূল হইবার পর অর্থাৎ পরিণত বয়সে ঐ সকল দাগগুলি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখ দেখিয়া উহাদের মধ্যে কে চিন্তাশীল, কে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত, কোপনস্বভাব, লম্পট, স্বার্থপর, দয়ালু, উদারস্বভাব ইত্যাদি আমরা অনেকটা ঠিক করিয়া বলিতে পারি। *

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে মুখের ভাব বা রেখা সৌন্দর্য্যের এক প্রধান কারণ। যাহার মনে সতত অপকৃষ্ট ভাবনা সকল বিরাজ করে, তাহার মুখের ভাবও ক্রমে ক্রমে কদর্য্য হইয়া উঠে। আর যাহার মনে উৎকৃষ্ট ভাবনা সকল সতত বিরাজ করে, তাহার মুখের ভাবও ক্রমশঃ সুন্দর হইয়া পড়ে।

তবে সকলেই ইচ্ছামাত্রে নিজের মনের ভাবনা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে কি না সন্দেহ। যে লাম্পট্যের চিন্তায় বা হিংসায় সুখ পাইয়াছে, সে তাহা ছাড়িবে কেন? বিষ্ঠার কীটকে যদি বলা যায় "ওহে তুমি ওখানে কি করিতেছ? এখানে আইস, আমরা তোমাকে রসগোল্লা খাইতে দিব" তবে সে বক্তৃতায় কি কোনও ফল হয়?

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই নিজের নিজের ভাবনাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। তাহাদিগকে নিজ

---

* The most controlled of us cannot conceal the movements of the facial muscles under the influence of strong emotions. Thus we read what is passing in a man's mind, and tell his character by the lines of his face.—Leonard Hill's Manual of Physiology, Chap. XXX.

নিজ সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনজন্য গুণসমূহকে ভাবনা করিতে হইবে। গুণ ভাবনার নিয়ম এই :—ভাবিতে হইবে "আমি নির্ভীক, আমি ন্যায়পর, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সদ্‌গুণের একটী তালিকা গীতায় দেওয়া আছে ; সেটী অতি সুন্দর :—*

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৺জগদীশনাথ রায়

বঙ্কিম বাবু এবং জগদীশ বাবু এক দিন সিমুলিয়ার বাটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন গরিব ভদ্রলোক আসিয়া রায় মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি কত দিনে চাকুরিটি পাইতে পারি?" রায় মহাশয় উত্তর করিলেন, "৩।৪ দিন পরে আসিলে, তুমি নিয়োগপত্রখানি পাইবে এবং তোমাকে কর্ম্মস্থলে যাইতে হইবে। রেলের পুলিস সাহেব তোমাকে বর্দ্ধমানে কর্ম্ম দিয়াছেন। দেখ, ধর্ম্মপথে থেকে কাজ করো, তুমি আমার লোক, আমায় কোন কথা না শুনিতে হয়।" লোকটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমার বড় অন্যায়, এই মূর্খ লোকগুলাকে কেন চাকরি দেও।" জগদীশ বলিলেন "লোকটা মূর্খ আমি স্বীকার করি, যদি ওর বিদ্যার জোর থাকিত, তা হলে আমার উপাসনা করিত না, আপনার বিদ্যাবলে চাকরি পাইত, মূর্খ বলিয়াই আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, এমন লোককে বিদায় করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কত মূর্খ লোক ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পাইবার জন্য বড় বড় সাহেবদের নিয়ত পূজা করিতেছে?" বঙ্কিম নিরুত্তর রহিলেন। এক দিন ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র জগদীশ বাবুর বৈঠকখানায় পৌঁছিয়া অনেক গরিব লোকের সমাগম দেখিলেন, তখন জগদীশ বাবুকে বলিলেন, "দেখ তুমি যার তার সঙ্গে মিলিত হও, এ ভাল নহে! বাজে লোককে তফাতে রাখিতে হয়।" জগদীশ উত্তর করিলেন "ঈশ্বর, তুমি এই রকম পরামর্শ দিতে সাহসী হইলে! ছি, ছি, আপনাকে কি ভাব, এই মনুষ্যগুলির মধ্যে এমন গুণ আছে যে তোমার আমার নাই, ওরা মনুষ্য, পশু নহে ; তোমার এ রকম দম্ভ থাকা বড়ই দুঃখের কথা। তুমি যা, তারাও তাই ; বিভিন্নতা এই, ওরা তোমার মতন ইংরাজি শিক্ষা করে নাই, আর ধরাকে সরা বলিয়া ভাবে না।" ঈশ্বর বাবু বড়ই লজ্জিত হইলেন।

* This eloquent epitome of virtue is alone sufficient to show how little the East has to learn from the West in regard to the essential ideas of religion. We know of no other passage in the sacred books of any religion which more beautifully expresses the union of man's finer qualities.—The Ethics of the great Religion, R. P. A, Extra series, p. 30.

জগদীশ বাবু উচ্চদরের শিকারী ছিলেন। অনেক কুম্ভীর, বন্য মহিষ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি তিনি শিকার করিয়াছেন। ইংরাজেরা তাঁহার নানা গুণ দেখিয়া তাঁহাকে বড় সম্মান করিতেন। এক জন সাহেবের কথা বলি, ইঁহার নাম এ-ডি, ল্যারিমোর, ইনি জেলের ইন্‌স্পেকটার জেনারেল ছিলেন, ইনি বলিতেন, "ইংরাজ বাঙ্গালী বন্ধুদের ভিতর আমি জগদীশকেই বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতাম, he was nature's nobleman." একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, যে কোন বিষয় হউক না কেন, জগদীশ বাবুকে প্রশ্ন করিলে সদুত্তর পাওয়া যাইত। এই সম্বন্ধে একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যখন স্যার রিচার্ড টেম্‌পেল শিল্পপ্রদর্শনী (Art Exhibition) প্রদর্শন করেন, জগদীশ বাবু তাঁহার পুত্র দুইটিকে লইয়া প্রদর্শনী দেখিতে যান, প্রত্যেক ছবি ছেলেদের বুঝাইয়া দিতেছেন, এমন সময় চিফ্ জষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র এবং সরকারী উকিল অন্নদা বাবু প্রদর্শনী দেখিয়া ফিরিতেছিলেন। জগদীশ বাবুকে তাঁহারা অভিবাদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, জগদীশ বাবু বলিলেন "অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, ছেলেদের এই ছবিটা বুঝাইয়া দিয়া আপনাদের সঙ্গে কথা কহিব।" ছেলেদের বলিলেন, "দেখ, এ ছবিটা বাইবেল ঘটিত, এডিথ হলো ফারনেসের মুণ্ড ছেদন করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা র‍্যাফেল কর্ত্তৃক অঙ্কিত। দেখ কি সুন্দর প্রাতঃকালীন আলোক এই মুণ্ডের উপর পড়িয়াছে।" তার পর বলিলেন, "এ ছবিখানা স্যালভেটার রোপার ইটি টিসিয়ানের"। এমন করিয়া ছবিগুলি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। রমেশ বাবু নমস্কার করিয়া বলিলেন "মহাশয়, আমরা অন্ধ হইয়া সব দেখিয়াছি, আপনার সঙ্গে পুনরায় ঘুরিব এবং সকল ব্যাখ্যা শুনিব; কথা কি, আপনার সংগ্রহকে ধন্য, এ সব বিষয় কেমন করিয়া জানিলেন?" রমেশ বাবু ও অন্নদা বাবু পুনরায় জগদীশ বাবুর সঙ্গে প্রত্যেক ছবি দেখিলেন ও তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিলেন। জগদীশ বাবু "কলেজ রি-উনিয়ানের" সৃষ্টিকর্ত্তা, রি-উনিয়ান সমগ্র শিক্ষিত লোকের হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানে এবং পরে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার বাগানে রি-উনিয়ান হয় এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায় সকলে যোগদান করেন। একদিন কেশবচন্দ্র সেনকে বলিলেন, 'বাবাজি, টাউনহল্ ব্যতীত এমন একটা স্থান নাই যে আমরা সকলে কোন কার্য্যের জন্য সমবেত হইতে পারি, বাঙ্গালীটোলায় আমাদের একটা স্থান হওয়া আবশ্যক, যেখানে আমরা ইচ্ছামত একত্রিত হইতে পারি। এই কথোপকথনের ফল লাভ হইয়াছিল, কেশব বাবু আলবার্টহল্ করিলেন এবং একটা অত্যাবশ্যকীয় অভাব দূর করিলেন। আর একটা কথা শুনিয়াছিলাম, যাহার ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই। জগদীশ বাবু কেশব বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বলিতেন—"বাবাজি, সে বিষয়টা কি করিলে?" কি বিষয়, তাহা জানা নাই, তবে কেশব বাবু উত্তর করিলেন "দেখুন, ওটা হইবার উপায় নাই। তা হইলে কুকাদের মতন আমাকে পা পূজা করিতে দিতে হয়।"

বঙ্কিম বাবুর "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ

করিবার, ইনি একজন প্রধান পরামর্শদাতা এবং বঙ্গদর্শন বাহির হইলে জগদীশ বাবু "সঙ্গীত"-শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন, বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইলে বঙ্কিম বাবু ইহাঁর নিকট, মাসিকপত্রিকা বাহির করিবার জন্য যে বিশেষ ঋণী, তাহা বলিয়াছেন। মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরকে রাগরাগিণীর এবং নবরসের "ট্যাব্লো-ভিভাণ্ট" দেখাইতে জগদীশবাবু অনুরোধ করেন. মহারাজ বাহাদুর তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার রাজভবনে এই সমস্ত ট্যাব্লো দেখান।

আর একটি গল্প বলিয়া তাঁহার বালেশ্বর যাইবার কথা লিখিব। যখন জগদীশ বাবু ২৪ পরগণার স্পেসিয়াল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তখন মেজার পারসনস্ নামধেয় একজন কর্ম্মচারী ঐ জেলার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, পার-সনস্ এবং জগদীশ বাবু উভয়ে পুলিশ বোট্ করিয়া বসিরহাট অঞ্চলে তদারকে যান। বোটে একটিমাত্র গোসলখানা ছিল, জগদীশবাবুর স্নান করিতে অধিক বিলম্ব হয় বলিয়া মেজার সাহেব উহাঁকে অগ্রে স্নান সম্পন্ন করিয়া লইতে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। একদিন জগদীশ বাবু মাথায় সাবান মাখিয়া নিজের ভৃত্য নারায়ণকে মস্তকে জল ঢালিয়া দিবার জন্য ডাকিতে-ছিলেন, দুইবার ডাকার পর উত্তর না পাইয়া উনি বিরক্ত হইয়া "নারাণে, নারাণে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সাহেব তাড়া-তাড়ি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, জোর করিয়া মেঝেতে পদাঘাতের শব্দ করিলেন। পায়ে বুট ছিল এবং তাহার কাষ্ঠের উপর জোর আঘাতের খুব শব্দ হইল। সাহেব অমনি বলিয়া উঠিলেন "তোমার চাকরকে ডাকিবার প্রয়োজন নাই,আমি কার্য্য সমাধা করিয়াছি।" তখন জগদীশ বাবু চক্ষু দুটি জলে ধুইয়া দেখিলেন, সাহেব একটা বড় গোখ্রো সর্পকে পদদলিত করিতেছেন, তখন জানিলেন সাপটি জগদীশ বাবুর পার্শ্বে দুলিতেছিল, তাঁহার হস্ত ঘুরিতেছিল, সর্পটিও দুলিতেছিল, হস্ত চাপ না থামিলেই আঘাত করিত। সর্প খেলাইবার সময় যতক্ষণ হাঁটু নাড়ে ততক্ষণ দোলে, হাঁটু চালান থামিলেই আঘাত করে, এও তাই হইয়াছিল. সাহেবের হাঁটুপর্য্যন্ত পরা বুট ছিল, সুতরাং গোসল ঘরে আসিয়াই উহার মস্তকে বুটের আঘাত করিয়া উহাকে পদদলিত করিতেছিলেন, হাসিয়া বলিলেন "এই জন্যই ত চাকরকে ডাকিতেছিলে?" উনি উত্তর করি-লেন—"না, আমার মস্তকে জল ঢালিবার জন্য ডাকিতেছিলাম।" যদি সাহেব না যাইয়া, চাকরটা যাইত এবং কোন ভয়সূচকধ্বনি করিত, তাহা হইলে সর্পটা নিশ্চয়ই জগদীশ বাবুকে আঘাত করিত। ভগবান্ যখন রক্ষা করেন, কি সুন্দর উপায়ে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করেন! ধন্য তাঁহার নাম, ধন্য তাঁহার দয়া!

ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার জগদীশ বাবু একজন সদস্য ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল ইহাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অনেক কার্য্য করিতেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতিমহাত্মারা ইহাঁকে বহু সম্মানের

চক্ষে দেখিতেন এবং অনেক বিষয়েই ইঁহার পরামর্শ লইতেন। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল; রামগোপাল বাবু এবং তাঁহার হাউসের অংশীদার উমেশচন্দ্র মিত্র এবং মাধব মিত্র সিমুলিয়ার বাটীতে সর্ব্বদা আসিতেন। গবর্ণমেণ্টও অনেক বিষয়ে ইঁহার পরামর্শ লইতেন। বিখ্যাত সিভিলিয়ান মন্রো সাহেব ইঁহার পরামর্শমত পুলিশবিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্যার সিসিল বিডন ইঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন "দেখ জগদীশ, তোমরা কেন কার্ডে বাবু লিখ না? তোমরাই প্রকৃত বাবু? কারণ গবর্ণমেণ্ট ও উপাধি গ্রাহ্য করেন, সুতরাং তোমরা এখন কার্ডে বাবু লিখিবে। জগদীশবাবু হাস্য করিয়া বলিলেন "সাহেব, এইবার হইতে আমাদের একটি ল্যাজ করিতে বল, সেটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" বিডন্ সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন "দেখ, আমার রহস্য তুমি ভেদ করিয়াছ, কিন্তু একজন বড় ঘরের ছেলে, ইনি ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, ইনি আমার বাক্যের ভাবার্থনা বুঝিয়া অতঃপর কার্ডে বাবু লিখিবেন স্বীকার করিয়া গেলেন। সকল লেফ্টনাণ্ট গবরণর ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু বিডন্, গ্রে ও ইডেন ইহাঁকে বড়ই মান্য করিতেন, ইডেন সাহেবের সময় জগদীশবাবু পেন্সান লইয়া অবসর গ্রহণ করেন, ইডেন সাহেব উঁহাকে সারভিসে রাখিবার জন্য অনেক যত্ন করেন। বলিয়াছিলেন "তোমাকে আমি হাবড়া জেলায় দিব, পরে কলিকাতাতেও আনিতে পারি, তুমি অবসর লইও না।" জগদীশ বাবু বলেন "আপনাদের কৃপাতেই এই ৩০ বৎসর চাকুরি করিলাম, আর সাজ পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয় না।" ইডেন সাহেবের আমলে কিছুদিনের জন্য ইনি ত্রিপুরা জেলার পুলিশের ভার পান। ত্রিপুরা থাকিবার কালীন এক ঘটনা হইল, ঢাকা হইতে শ্রীহট্ট পর্যান্ত নদীতে প্রত্যহই ডাকাতি হইতে লাগিল, স্থানীয় পুলিশের কর্ত্তারা বদ্মায়েসদের আটকাইয়া রাখিলেন, কিন্তু ডাকাতি কোনমতে বন্ধ হইল না, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব রাগান্বিত হইয়া মন্তব্য লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলই হয় না। একদিন ত্রিপুরা জেলার জজ গেভিস্ সাহেবকে জগদীশ বাবু বলিলেন "দেখুন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—কাহারা ডাকাতি করিতেছে, শীঘ্র তাহাদের গ্রেপ্তার করিব।" গেভিস্ সাহেব বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন, জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "তুমি জজ, তোমার নিকট বিচার হইবে, তোমাকে অধিক কিছু বলিব না।" এই কথোপকথনের পর জনৈক ইনস্‌পেক্টারকে ডাকাইয়া জগদীশবাবু বলিলেন 'তোমার নৌকায় চারিটি দাঁড় আছে, তুমি আর চারিটি বসাইয়া লও, তৎপরে ঢাকায় গিয়া যখন সরকারী মেল-বোট্ ছাড়িবে, তুমি তাহার পিছন নিবে, আমার বিশ্বাস ইহারাই ডাকাতি করে এবং আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তুমি ইহাদের ডাকাতি করিতে দেখিয়া হাতে নাতে ধরিতে পারিবে। এখন যাও, যাহা বলিলাম তাহা কর।" বড় দারোগাবাবু হাসিয়া আমাদের বাহিরে আসিয়া বলিলেন "পুলিশ সাহেব ভুল বুঝিয়াছেন, সরকারী লোকে কি ডাকাতি করিতে পারে। যাহা হউক, আমায় হুকুম তামিল করিতে হইবে, আমি চলিলাম।" সত্য সত্যই

দিনকয়েক পরে মেল-বোটওয়ালারা একখানা কাপড়ের নৌকা লুট করিতেছে, এমন সময়, বড় দারোগা সেখানে পৌছিয়া উঁহাদের গ্রেপ্তার করিলেন। সব সাজা পাইল, হৈ হৈ পড়িয়া গেল, ইডেন সাহেব জগদীশবাবুকে ধন্যবাদ-লিপি পাঠাইলেন বালেশ্বর পুলিশের ভার যখন জগদীশ বাবু লয়েন. তখন সাল-তমামি রিপোর্ট লিখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছিল. ইনি কোর্ট ইন্‌স্পেকটারকে সমস্ত আঞ্জাম করিতে বলিলেন। কোর্টবাবু বলিলেন, কলেক্টার বীমস্ সাহেব, বাৎসরিক পুলিশ রিপোর্ট লিখিবেন বলিয়াছেন। জগদীশবাবু বলিলেন "তিনি দশখানা লিখুন তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমার কর্ত্তব্য আমি সাধন করিব। সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার হুকুম তামিল কর।" কোর্টবাবু সমস্ত কাগজ দাখিল করিলেন, জগদীশবাবু রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইবার হুকুম দিলেন। এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে জগদীশ বাবু ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবার পূর্ব্বে ৫২টা জিলা হইতে ৫২ রকম বাৎসরিক রিপোর্ট আসিত, ইনি ১৮৬৮ সালে যেমত রিপোর্ট পাঠাইলেন, সেই মত আদর্শ হইয়া রিপোর্ট লিখিবার সারকুলার জারি হইল। বীমস্ সাহেব মফঃস্বলে ছিলেন, বালেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কোর্টবাবুর নিকট কাগজপত্র চাহিলেন। কোর্টবাবু বলিলেন পুলিশ সাহেব রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আগ্রহের সহিত রিপোর্ট দেখিতে চাহিলেন, রিপোর্ট ২।৩ বার পড়িলেন, তখন বলিয়া উঠিলেন "আমি কি ভুলই করিতে বসিয়াছিলাম! ইনি এমন সুলেখক, তাহা আমি জানি না। আমি এখনই গিয়া আলাপ করিব এবং নিজের ভুল বুঝাইয়া দিয়া মাপ চাহিব।" যেমত বলা, সেইমত করা; তখনই জগদীশবাবুর আফিস কামড়ায় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমাকে মার্জ্জনা করুন। আপনি যে একজন উচ্চদরের স্কলার তাহা আমি জানিতাম না, ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট দল যেমন হন, আমি আপনাকে সেইমত শিক্ষা প্রাপ্ত ভাবিয়াছিলাম, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; আপনার বাৎসরিক রিপোর্ট অন্তই মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়া দিব।" সেই পর্য্যন্ত বীমস্ সাহেব জগদীশবাবুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু করিতেন না. এমন কি লেখাপড়ার সম্বন্ধে ইঁহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন। বোম্বায়ের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী মাসিকপত্রে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ফুট নোটে লিখিয়া দিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে তত্ত্ব, তাহার জন্য তিনি জগদীশবাবুর নিকট ঋণী। তিনি যে কম্পারেটিভ গ্রামার লেখেন, তাহাতেও জগদীশবাবুর নিকট সহায়তা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যা সম্বন্ধে কোন পুস্তক, কোন সাহেব কৃত বলিয়া সমাজে প্রকাশ, কিন্তু জগদীশ বাবুর ইহাতেও হাত ছিল। গল্পচ্ছলে বালেশ্বরের পোষ্টমাষ্টার প্রফুল্লবাবু (যিনি পরে ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারল হন) বাবুকে রামায়ণের কথা বলেন, তিনি তাহা প্রত্যহ শুনিয়া এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বাল্মীকি এবং তৎসমসাময়িক বৃত্তান্ত Valmiki and his times বলিয়া বাঙ্গালায় এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থখানি জগদীশবাবুকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তমলুকের ইতিহাস একজন অধিকারিবংশীয় যুবক লেখেন, তিনিও পুস্তকখানি জগদীশবাবুকে উৎসর্গ করিয়াছেন। "তারাসুন্দরী" নামক একটি গল্পের পুস্তক তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন এবং পুস্তকখানি জগদীশবাবুকে উৎসর্গ করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থ "বিষবৃক্ষ" জগদীশবাবুকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছেন—

কাব্যপ্রিয়
পণ্ডিতাগ্রগণ্য
শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায়
সুহৃদ্‌বরকে

এই গ্রন্থ বন্ধুত্ব এবং স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল।

বঙ্গদর্শন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

অবতরণিকা

বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বলেন। বিশাল বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া মানুষের অন্তরে যে সকল গভীর ও জটিল জিজ্ঞাসার উদয় হয়,—যে সত্যে বা সিদ্ধান্তে তাহার চরম মীমাংসা ও নিবৃত্তি হয়, তাহারই নাম তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুভূতিগ্রাহ্য, জ্ঞানগম্য—জ্ঞানবস্তু,—কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এ বস্তুকে ধরিতে পারা যায় না। যে সত্যেতে বিশ্বজিজ্ঞাসার এবং বিশ্ববাসনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি ও শান্তি হয়, তাহাই পরম-তত্ত্ব। বৈষ্ণবেরা বলেন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমতত্ত্ব।

ভাগবত অদ্বয়-জ্ঞানকে তত্ত্বনামে অভিহিত করিয়াছেন।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ং

ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে।

উপনিষদ্‌ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, যোগিজনেরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া থাকেন, ভাগবতেরা যাঁহাকে ভগবান্‌ বলেন, সেই অদ্বয়জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্বজ্ঞানিগণ তত্ত্ব-নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই ভগবান্‌ই শ্রীকৃষ্ণ।

আমরা সচরাচর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ এই তিন নামেতেই জগতের ইষ্টদেবতাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই তিন শব্দের মধ্যে যে বিশাল বিভেদ আছে, ইহা তলাইয়া দেখি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম শব্দে তত্ত্ববস্তুর একদিক্‌মাত্র ব্যক্ত করে। পরমাত্মা শব্দে তার আর একদিক্‌মাত্র নির্দ্দেশ করে। আর বৈষ্ণবেরা বলেন যে, ভগবান্‌ই কেবল এই সমগ্র তত্ত্ব-বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবান্‌ই পূর্ণতত্ত্ব। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা সেই পূর্ণতত্ত্বের অংশকলা মাত্র।

আধুনিক বাংলাভাষাতে, ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের প্রভাবে, ব্রহ্মশব্দ একটা ব্যাপক ও অভিনব অর্থ লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মকে ভগবান্‌ বলিয়াও ডাকেন, পরমাত্মাও বলিয়া থাকেন। আর মূলে বস্তু যখন এক ও অদ্বয়, তখন তার ভিন্ন ভিন্ন নাম সমভাবে এবং যুগপৎই সে অদ্বয়বস্তুতে প্রযুক্তও হইতে পারে। বৈষ্ণবেরাও এরূপ করিয়াছেন। যিনি সকল নামরূপের অতীত, তাঁহাকে যে কোনও নামেই ডাকি না কেন, মনের ভাব ও অন্তরের রসটা যদি খাঁটি থাকে, তাহাতে বড় বেশী কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু তথাপি এই সকল নামের উৎপত্তির ও ইতি-

হাসের আলোচনা করিলে, পরস্পরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ প্রত্যক্ষ করা যায়।

ব্রহ্ম শব্দ উপনিষদের; আর উপনিষদে তার একটা বিশেষ অর্থও আছে। সে অর্থের সঙ্গে ভগবানের অর্থের আকাশপাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। পরমাত্মা সম্বন্ধেও সেই কথা। যে আন্তরিক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ব্রহ্মভাব বা পরমাত্মভাব বা ভগবদ্ভাব প্রথমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই অর্থে, ব্রহ্ম বলিতে যাহা বোঝায়, পরমাত্মা বলিতে তাহা বোঝায় না; পরমাত্মা বলিতে যাহা বোঝায়, ভগবান্ বলিতে তার চাইতে বিস্তর বেশী বুঝাইয়া থাকে।

উপনিষদের সার নিষ্কাশিত করিয়া, বেদান্তসূত্র জগতের জন্ম-আদি যাহা হইতে হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। উপনিষদ্ ভৃগুবারুণী-সংবাদে ব্রহ্ম-শব্দের এই সংজ্ঞাই দিয়াছেন। বরুণপুত্র ভৃগু সর্ব্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া, সর্ব্বশেষে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য, আপনার পিতার নিকটে যাইয়া বলিলেন—হে ভগবন! আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করুন। বরুণ বলিলেন—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা কর। তপস্যা অর্থে ধ্যান, গভীরভাবে মনন ও নিদিধ্যাসন। কিন্তু শূন্যকে ধ্যান করিয়া বস্তু-লাভ করা যায় না। ধ্যানেরও মন্ত্র বা সূত্রের প্রয়োজন হয়। বরুণ ভৃগুকে ব্রহ্মধ্যানের এই মন্ত্র দান করিলেন:—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব,
তদ্ব্রহ্ম।

যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা ভূত সকল স্থিতি করে, যাহার প্রতি ভূত সকল গমন করে এবং যাহাতে অস্তিমে প্রবেশ করে, তাহাই ব্রহ্ম। তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর।

উপনিষদ্ এখানে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাহা হইতে হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আর উপনিষদ্ এখানে পরমতত্ত্বকে বাহির হইতেই দেখিয়াছেন। কার্য্য দেখিয়া, সেই কার্য্যের যে একটা অবশ্যম্ভাবী কারণ আছে, সেই কারণকে, তার নিজের স্বরূপে নয়, কিন্তু শুদ্ধ এই কার্য্যের কর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ফলতঃ আধুনিক অজ্ঞেয়তা-বাদ বা agnosticism যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে এবং যাহাকে অজ্ঞাত (unknown) এবং জ্ঞানাতীত (unknowable) বলে, উপনিষদ্ ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা সেই তত্ত্বকেই এখানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই তত্ত্ব শুদ্ধ সত্তামাত্রজ্ঞেয়; "আছেন" এইমাত্র বলা যায়; কিন্তু স্বরূপতঃ ইহা বস্তু যে কি, তাহা বলা যায় না। এই ব্রহ্মবস্তুকে ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না। সূর্য্যের তেজমাত্র যেমন আমরা চর্ম্মচক্ষু দিয়া দেখি, কিন্তু স্বরূপতঃ সূর্য্য-বস্তু যে কি, ইহা দেখিতে পাই না ও পারি না; সেইরূপ ব্রহ্ম বলিয়া উপনিষদ্ যে তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, আমরা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা তাহার বাহিরের আভামাত্রই অতি দূর হইতে প্রত্যক্ষ করি, স্বরূপতঃ সে তত্ত্ববস্তু যে কি, তাহা ধরিতে পারি না। এ বস্তুর অনুমান করিতে পারা যায়। ক্রিয়া দেখিয়া কর্ত্তার স্বরূপ ও প্রকৃতির কতকটা অনুমান করা যেমন সম্ভব, সেইরূপ এই ব্রহ্মবস্তুরও প্রকৃতির এবং স্বরূপের

কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া লইতে পারি, কিন্তু তার ধারণা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। এমন কি, এই তত্ত্ব সৎ কি অসৎ, ইহাও দৃঢ় করিয়া বলা যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া, জগৎরূপ কার্য্যের যে কারণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহাই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব। এই তত্ত্ব নির্গুণ ও নিরাকার।

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের বিচার মনের ধর্ম্ম। মন ভেদ-বিচারেই পটু, অভেদ প্রতিষ্ঠা করা তার অধিকারের বাহিরের কথা। "হাঁ" ও "না" এই দুই সংজ্ঞার ভিতরে মন সর্ব্বদা চলাফেরা করে। সমতা ও বৈষম্য—identity এবং difference—এই দুইটাই মনের মুখ্য তত্ত্ব। যাহা কার্য্য তাহা কারণ নয়, যাহা কারণ তাহা কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্,—মন এই কথাই কেবল ধারণা করিতে পারে। কার্য্য দৃষ্ট, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সাকার, সবিশেষ। সুতরাং কারণ অদৃষ্ট, ইন্দ্রিয়াতীত, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। মন এইটুকু পর্য্যন্ত বুঝিতে ও ধরিতে পারে। সৃষ্টি—কার্য্য; সৃষ্টি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণ সৃষ্টিকার্য্যে পরিব্যক্ত ও পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্রষ্টা—এই কার্য্যের কারণ, এই সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন, পৃথক্; সুতরাং তিনি নির্গুণ ও নিরাকার। মন এই সিদ্ধান্ত পর্য্যন্তই পৌছিতে পারে। এর উপরে উঠিবার তার শক্তি নাই। ব্রহ্ম-বস্তুকে এইজন্য মন কেবল "নেতি" "নেতি" বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত করে। তত্ত্ববস্তু "ইহা নহে" "উহা নহে"—মন এই মাত্রই বলিতে পারে, সে বস্তুটা স্বরূপতঃ যে কি, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। নিরাকারবাদ ও নির্গুণবাদ প্রকৃতপক্ষে কেবল মনোময় কোষেরই কথা। যতক্ষণ না মনোময় কোষ ভেদ হইয়াছে, ততক্ষণ মানুষ নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা মনকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন;—"মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ।" এই ব্রহ্ম মনোময় ব্রহ্ম, মানস-সৃষ্ট। আর আমাদের মন বস্তুর অংশ মাত্র গ্রহণ করে। এবং এইজন্যই বৈষ্ণবেরা এই মানস-ব্রহ্মবস্তুকে পরমতত্ত্বের "অঙ্গ-আভা মাত্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু উপনিষদ্‌ই এই সাধারণী ব্রহ্মতত্ত্বের আরো অনেক উপরে উঠিয়াছেন। যিনি জগৎকারণ, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় যাঁহা হইতে হয়, সেই বস্তুই আবার "আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং"—জীবের আত্মা, তার অন্তরস্থিত নিভৃত গুহাতে বাস করেন। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-মুখে আমরা ব্রহ্মকে কারণ-রূপেই দেখি। কিন্তু আমাদের নিজেদের অন্তরে, আমাদের জীবনের বিবিধ অবস্থার ও অশেষ পরিবর্ত্তনের অন্তরালে, সেই তত্ত্বকেই আমরা সাক্ষিচৈতন্যরূপে প্রত্যক্ষ করি। পরিবর্ত্তন জগতের নিত্য ধর্ম্ম সত্য; কিন্তু বহির্জগতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তার একত্ব কোথায়, ইহা আমরা মানসচক্ষে ধরিয়া উঠিতে পারি না। ফলতঃ জগৎটা আমাদের মানসচক্ষে এক নয়, কিন্তু অসংখ্য। আমরা ইহাকে স্থির করিয়া ধরিতে পারি না বলিয়াই ইহার জগৎ নাম দিয়াছি। যাহা কেবলি চলিতেছে, যাহা নিয়তই চঞ্চল, যার গতির বিরাম নাই, তাহাই জগৎ। আর এই যে

প্রবাহ অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, ইহার সূত্র কি ও কোথায়? কে ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, পূর্ব্বের সঙ্গে পরের যোগ কে সাধন বা রক্ষা করিতেছে,—বহির্জগতে তার সন্ধান পাই না। সে সন্ধান পাই আমাদের নিজেদের ভিতরে, আমাদের চৈতন্যের মাঝে। জগৎ যেমন চঞ্চল, জীবনও সেইরূপ চঞ্চল। ইন্দ্রিয় সকল বিষয়প্রবাহে পড়িয়া নিয়ত কাঁপিতেছে। চক্ষের তারকার উপরে একটার পর আর একটা করিয়া ক্রমাগত দৃশ্য-বস্তুর ছায়া পড়িতেছে আর সরিয়া যাইতেছে। কর্ণ-পটহে সেইরূপ একের পর আর একটা করিয়া ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি আহত হইয়া অমনি আবার আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রত্যেকটী ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে কাণের পটহে যাইয়া আঘাত করে, আর আঘাত করিয়া অমনি যেন সরিয়া যাইতেছে, এবং তার পশ্চাতে আর একটা ধ্বনি আসিয়া সেই পটহে আঘাত করে। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়ের উপরেই তাহাদের নিজ নিজ বিষয়গুলি নদীতরঙ্গের ন্যায় আসিয়া পড়িতেছে আবার অমনি সরিয়া যাইতেছে। অথচ এই খণ্ড খণ্ড দৃশ্য, ধ্বনি, রস ও গন্ধকে কে যেন ধরিয়া রাখিয়া, বিশিষ্ট বস্তুর-রূপ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও রসের সম্পূর্ণ ও গোটা জ্ঞানটা ফুটাইয়া তুলিতেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞানের উদয় হয়—আস্তিক নাস্তিক সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আর এই যে সংস্পর্শ ইহা অতি চঞ্চল, কেবলই আসে আর যায়—"মাত্রাস্পর্শ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যে বিষয়ের সংস্পর্শ, তাহা—সর্ব্বদাই "আগমাপায়িনো" আসে আর যায়। অথচ পূর্ব্বে যা এসেছিল, আর তার পরে যা আসে, এই সকলের সঙ্গে যদি যোগরক্ষা না হয়, যা এসেছিল তার অনুভূতিটুকু যদি কেউ ধরিয়া রাখিয়া, পরবর্ত্তী বিষয়সংস্পর্শের অনুভূতির সঙ্গে জুড়িয়া না দেয়, তবে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি কোনও ইন্দ্রিয়ানুভূতিই পূর্ণ হইয়া, বিষয়-জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। আমাদের ভিতরের যে বস্তু বা যে তত্ত্ব এই চলন্ত মাত্রাস্পর্শের ক্ষণিক অনুভূতিগুলিকে ধরিয়া রাখিয়া বিষয়জ্ঞান সম্ভব করিতেছে, তাহাকেই সাক্ষিচৈতন্য বলে। তাহাই পরমাত্মা। ইহাকেই উপনিষদ্

আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং

বলিয়াছেন। ভাগবত এই সাক্ষিচৈতন্যকেই—

পরমাত্মেতি শব্দ্যতে

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর উপনিষদের শুদ্ধ-সত্তামাত্র-জ্ঞেয়, অজ্ঞাত ও জ্ঞানাতীত, মনোময়কোষস্থ ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন পূর্ণতত্ত্ব নহে, তার এক দিক্ মাত্র; সেইরূপ এই বিজ্ঞানময়-কোষস্থিত পরমাত্মা-তত্ত্বও পূর্ণতত্ত্ব নহে ইহা সেই পরমতত্ত্বের এক দিক্ মাত্র।

কেবল ভগবত্তত্ত্বই সেই পূর্ণ তত্ত্ব সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমগ্র যোগ-বৈরাগ্য, সমগ্র রস ও সমগ্র কর্ম্ম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ভগবান্। আর বৈষ্ণবেরা বলেন

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব॥
প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সে ব্রহ্ম গোবিন্দের প্রভা হয় অঙ্গকান্তি॥
আত্মা অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

এইজন্যই বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণবস্তুকে সকল তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

আত্ম-কথা

এ সকল নিগূঢ় কথা কেউ কাউকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। কোনও তত্ত্বই কথায় বোঝান যায় না। তত্ত্বমাত্রেই সাক্ষাৎ অনুভূতিগ্রাহ্য। তর্কযুক্তি করিয়া কোনও তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নহে। তর্কযুক্তির দ্বারা শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিতে পারা যায়; কিন্তু আপনা হইতে যার শ্রদ্ধালাভ হয় নাই, তার অন্তরে অনুকূল বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না। এইজন্যই সাধুভক্তেরা বলেন, কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন, বহুপুণ্যফলে বহুভাগ্যবলে, সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত হইয়া, কেবল সেই ব্যক্তিই কৃষ্ণবিষয়িণী শ্রদ্ধা ও মতি লাভ করিতে পারেন। এইরূপ কৃপাসিদ্ধ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির চিত্তেই কেবল এই পরমতত্ত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিবার কোনও অধিকার জন্মিয়াছে, এমন কল্পনা করি না। কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিয়াছি, এমন বলিতে পারি না। কৃষ্ণতত্ত্ব একেবারেই জানি নাই, এমনও বলিতে পারি না। তবে কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝি বা না বুঝি, বহুদিন হইতে কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে আনন্দ পাইয়া থাকি, ইহা অস্বীকার করিলে কৃপাপরাধ হয় বলিয়া মনে করি। আর কৃষ্ণ কথার আলোচনা মিষ্টি লাগে বলিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বহুদিন পরে এদেশে কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনার সময় ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়াও মনে হয়। প্রথম প্রথম ইংরেজি শিখিয়া য়ুরোপীয় জড়বাদ ও যুক্তিবাদের হেঁপায় পড়িয়া, আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও ধর্ম্মকে যে ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। এ দেশের নব্যশিক্ষিতসমাজেও যে কারণেই এবং যে দিক্ দিয়াই হউক না কেন, কৃষ্ণতত্ত্বের ও কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় যেন একটু লোভ জন্মিতেছে। বৈষ্ণব ভাবের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেই দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলতঃ বিশ্বময় যেন একটা রসের বাণ ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর এই বাণের মুখে, আধুনিক সভ্যতার সামাজিক ও নৈতিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-সম্বন্ধিনী জটিল সমস্যা সকলে মিলিয়া অজ্ঞাতসারে যেন বৈষ্ণব মীমাংসার দিকেই ছুটিতেছে। মানুষ বহুদিন স্বভাবকে উপেক্ষা ও উৎপীড়িত করিয়া, একটা অতিমানুষিক কল্পিত সাধনার ও আদর্শের সন্ধানে ছুটোছুটি করিয়াছে। বিষয়কে ছাড়িয়া বিষয়ীকে, ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া রসকে, সংসারকে ছাড়িয়া ধর্ম্মকে, মানুষকে ছাড়িয়া মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। এইজন্য তার সভ্যতা ও সাধনা, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, সর্ব্ব প্রকারের উন্নততর আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা

বিমানচারিণী হইয়া, শূন্যগর্ভা নিষ্ফলতা মাত্র আহরণ করিয়াছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ফল প্রয়াসের প্রতিকূলে অভিনব প্রতিক্রিয়ার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে, মানব-মন ক্রমে বিপরীত পথ ধরিয়া, বিষয়ীকে ছাড়িয়া বিষয়কে, রসকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সংসারকে, মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করিয়া মানুষকে, আদর্শকে বর্জ্জন করিয়া কেবল নিরেট বাস্তবকে আঁকড়াইয়া ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার ফলে জড়বাদ, সুখবাদ, ইহসর্ব্বস্বভোগলিপ্সা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বিভ্রান্ত আত্মম্ভরিতা, এ সকলে আধুনিক সভ্য সমাজের চিন্তা ও ভাব, উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা, সর্ব্ববিধ সংকল্প ও কর্ম্মচেষ্টাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। এই বিষম ও জটিল যুগসমস্যার মীমাংসা যে কোথায়, এ পর্য্যন্ত লোকে তাহার সন্ধান পায় নাই। যাঁরা ইঙ্গিতেও এ সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁরা বুঝিয়াছেন যে, এক ভারতের বৈষ্ণব-তত্ত্বে ও বৈষ্ণব-সাধনাতে, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যে মহাপ্রভু এবং তাঁহার অনুচর ও পার্ষদগণ যে তত্ত্বের প্রচার ও যে সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, কেবল সেখানেই এই কঠিন বিশ্বসমস্যার সম্যক্ মীমাংসার পথ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় বা মোহম্মদীয়, জগতের আর কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধনাতে এ পথের সন্ধান পাওয়া যায় নাই ও পাওয়া যাইবে না। অতএব যুগ-প্রয়োজনেই আমাদের মধ্যে বৈষ্ণবী সাধনার প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ভাবের গতিবেগ ক্রমে বাড়িবে বই আর কমিবে না। আর এই ভাবকে সতেজ ও বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা ও কৃষ্ণকথার আন্দোলন যত হয়, ততই মঙ্গল।

একদিন ছিল, যখন কৃষ্ণতত্ত্ব কাহাকে বলে, তার কোনও কিছুই জানিতাম না। কৃষ্ণ নামে খ্যাত এক অবতারের ভজনা বৈষ্ণবেরা করেন, তাঁর দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীবিগ্রহ আছে, বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় সে বিগ্রহের ভোগ-রাগাদি হয়, এ সকল জানা ছিল বটে। কিন্তু এই কৃষ্ণ যে তত্ত্ববস্তু, অধিকাংশ বৈষ্ণবেরাই এ কথা জানিতেন কি না সন্দেহ, অন্যে পরে কা কথা! বৈষ্ণব সাহিত্যে,—ভাগবতে ও বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে, এ সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সত্য। কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গতানুগতিক বৈষ্ণবসমাজেই এ সকল কথার সংবাদ কে রাখিত? সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বের কথা অল্প লোকেই জানিত। এই কৃষ্ণতত্ত্বই যে পরম তত্ত্ব, এই তত্ত্বেই যে বিশ্বজিজ্ঞাসার চরম নিবৃত্তি ও বিশ্ববাসনার পরম তৃপ্তি, ইহা লোকে না জানিত এক। যাত্রায়, কীর্ত্তনে, পুরাণে, কথায়, কৃষ্ণাবতারের আখ্যায়িকা মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়াছিল বটে। কিন্তু প্রখর যুক্তিবাদের মুখে এই কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণাবতার যে নব্যশিক্ষিতসমাজে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কিন্তু কৃষ্ণাবতারের কথাটা মন হইতে উড়াইয়া দেওয়া যত সহজ, বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়া, কৃষ্ণলীলার রসের আস্বাদনটুকুকে রসনা হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলা তত সহজ নহে। এ রস বাঙ্গালীর সাধনার সঙ্গে, বাঙ্গালীর চিন্তার, ভাবের, ভজনার,

সংসারের, সম্ভোগের—সকলের সঙ্গে শিরায় শিরায় জড়াইয়া গিয়াছে। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও অবতারত্বকে তত্ত্ববিরোধী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের ভজনাকে যাঁরা নীতিবিগর্হিত বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারাও এই বাংলার মাটিতে জন্মিয়া, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সাহায্যে সাধন ভজন করিতে যাইয়া, বৈষ্ণবী ভাষা ও বৈষ্ণবী সাধনার রসটুকুকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। নিরাকারবাদী, কৃষ্ণ-বৈমুখী ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ভজনসঙ্গীতগুলি অজীর্ণ বৈষ্ণব-রসেতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ফলতঃ কৃষ্ণাবতারকে অসত্য, কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াও, কৃষ্ণপ্রেমের অলৌকিক মিষ্টত্বটুকু নষ্ট করা যায় না। অবতার একটা আকস্মিক ঘটনা। সত্য হইলেও, যুগে যুগেই অর্থাৎ দীর্ঘকাল-ব্যবধানেই কেবল এ ঘটনা ঘটে; কিন্তু এই কৃষ্ণপ্রেম যে নিত্য-বস্তু। যদিই বা কৃষ্ণাবতার একটা অবতার অতি-প্রাকৃত তত্ত্বই হয়; তথাপি এই অদ্ভুত, অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমকাহিনীতে অতিপ্রাকৃত বা অতি-মানুষিক তো কিছুই নাই। মাধুর্য্যাদি রস বিশ্বজনীন, সার্ব্বজনীন। তাই বলার মতন করিয়া বলিতে পারিলে, এ সকল রসের কথায় জগৎ চকিত, বিস্মিত, পুলকিত, স্তব্ধ, মুগ্ধ হইয়া যায়। আর কৃষ্ণলীলার মতন জগতের আর আর কোন্ লীলাতে এ সকল রস এমন করিয়া উথলিয়া উঠিয়াছে? এই কৃষ্ণলীলা-কাহিনীতে চৌষট্টি রস যেমন করিয়া উদ্বর্ত্তিত হইয়া, ঘন হইয়া, সুমিষ্ট সার ক্ষীরখণ্ডে পরিণত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। সর্ব্বে-ন্দ্রিয়কে জাগাইয়া, নাচাইয়া, মুগ্ধ স্তব্ধ করিয়া, দেহ হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে পরমবস্তু আত্মবস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া, এ সকল রস যেরূপ ভাবে কৃষ্ণ-লীলার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন জগতের আর কোনও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। রসিকশেখর নাগর-বর শ্রীকৃষ্ণ; নায়িকার শিরোমণি রসবতী শ্রীরাধিকা—ইচ্ছা হয়, ইহাকে না হয় কেবল কবি-কল্পনাই বল, কিন্তু এমন কল্পনাই বা জগতের আর কোন্ কাব্যে আছে? এমন নায়ক-নায়িকা আর কি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়? পার যদি, ইহাকে তত্ত্ব বল,—এমন তত্ত্বের সাক্ষাৎকারই বা জগতের কোন্ জ্ঞানী কোথায় পাইয়াছেন, জানি না। সাধনের দিক্ দিয়া যদি দেখিতে হয়, সেদিকেই ইহার বিচার কর,—ভগবদারাধনার নিগূঢ় রহস্য আর কোন্ কাব্যে এমন করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে? ভক্তির অভিব্যক্তি বল,—এমন বিচিত্র ভাবলহরীময়ী ভক্তিই বা জগতে আর কোথায় পাইবে? যার যেমন অধিকার, যে যে দিক্ দিয়া পার, সেইরূপ, সেই দিক্ দিয়াই পরখ করিয়া দেখ, রাধাকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলারসের তুলনা জগতে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না।

কৃষ্ণতত্ত্বের যখন কোনও কিছুই সন্ধান পাই নাই, তখনও কৃষ্ণলীলার কাব্যরস চাকিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, রাধাকৃষ্ণের লীলাকে শুদ্ধ নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিনয়রূপে দেখিয়া—"প্রচারে" যখন কৃষ্ণচরিত্র ও "নবজীবনে" যখন আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছিল, তখন "আলোচনা" নামক মাসিক পত্রে

"রাধিকার প্রেম" লিখিয়াছিলাম। প্রথম যৌবনে শ্রীরাধিকার প্রেমমাহাত্ম্য যথাবুদ্ধি একটু কীর্ত্তন করিয়াছিলাম বলিয়াই, বুঝি বা আজ এই শেষ বয়সে,—বুঝিতে পারি আর না পারি, কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে এমন মিষ্টি লাগিতেছে। সেই লোভেই কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিজ্ঞানে সূক্ষ্মগণনা

সূর্য্যের অতি নিকটে যে বুধ নামক গ্রহটি রহিয়াছে, তাহার তুলনায় সূর্য্যের গুরুত্ব একাত্তর লক্ষ গুণ অধিক কি বাহাত্তর লক্ষ গুণ অধিক, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের কিছুই যায় আসে না, এই প্রকার অভিযোগ 'অবৈজ্ঞানিক' বন্ধুগণের নিকট হইতে অনেক সময়ে শুনিয়াছি। তাঁহারা বলেন, বিজ্ঞানে এত চুলচেরা হিসাব কেন? পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি আটাশ লক্ষ আশী হাজার মাইল, এই কথাটা শুনিলে, তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলেন "হাঁ, সূর্য্যটা খুব দূরে আছে বটে।" কিন্তু যখন বলা যায়, আধুনিক গবেষণায় সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তখন এই কথাটা তাঁদের মনে একটুও বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। তাঁহারা হয় ত বলিয়া ফেলেন, এই এক লক্ষ কুড়ি হাজার মাইলের ন্যূনাধিক্যে আমাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি হইল কোথায়! এই চুলচেরা হিসাবের ত কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না।

বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম গণনার প্রয়োজন এই অভিযোগকারীদিগকে এক কথায় বুঝান কঠিন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি উদাহরণ দিয়া ঐ প্রয়োজনের বিষয় পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের কথাই আলোচনা করা যাউক; প্রাচীনত্বে বিজ্ঞানের কোন শাখাই ইহার সমকক্ষ নয়। অতি প্রাচীন যুগের সভ্য মানবগণ চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ও উদয়াস্তের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিয়া যে কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। কিন্তু প্রাচীন জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ ও গ্রহগণের উদয়াস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিতেন, তাহাই বোধ হয় 'অবৈজ্ঞানিক' জনসাধারণকে বিস্মিত করিত। আজও ইংরাজি নৌপঞ্জিকা (Nautical Almanac) এবং আমাদের দেশীয় পঞ্জিকায় গ্রহণাদি সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা মিলিয়া গেলে, জনসাধারণকে কম বিস্মিত করে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই মোহিনী শক্তিটির উৎপত্তি কোথায়? বিজ্ঞ পাঠককে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জ্যোতিষিক ব্যাপারগুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের সামর্থ্য মানব কখনই একদিনে পায় নাই। বৎসরের

পর বৎসর বহু অনুসন্ধিৎসুকে রাত্রি জাগিয়া জ্যোতিষ্কদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে, কত গণনায় সময় ক্ষেপ করিতে হইয়াছে, কত পরিমাপ করিতে হইয়াছে, তবে তাঁহারা জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন, কিছু কাল ভাল করিয়া জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষণে আমরা তাহাদের গতিবিধির মধ্যে যে নিয়ম দেখিতে পাই, ভবিষ্যতে গ্রহ-নক্ষত্রেরা বুঝি সেই নিয়মেই চলে, কাজেই জ্যোতিঃশাস্ত্রটা চরমে জ্যোতিষীদের হাত হইতে গণিতবিশারদদিগের হাতে পড়াই উচিত। এই অবস্থায় গণিতজ্ঞেরাই কেবল কাগজ-কলমের হিসাবে জ্যোতিষিক ঘটনার কথা বলিয়া দিতে পারিবেন। যাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ জ্যোতিষিক আবিষ্কারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অবশ্যই এই প্রকার উক্তি আশা করা যায় না। দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণের উপরেই ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জ্যোতিষিক নিয়মই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যতই সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক না কেন, যন্ত্রের দোষে বা পর্য্যবেক্ষণের অসতর্কতায় একটু আধটু ভ্রম হিসাবের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রারম্ভের এই অবশ্যম্ভাবী ক্ষুদ্র ভ্রম কালক্রমে জমিতে জমিতে এত বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায় যে, পূর্ব্বেকার গণনায় যে ফল পাওয়া যাইত, তখন আর তাহা পাওয়া যায় না। গ্রহণের বা অপর কোন ঘটনার কাল-নিরূপণের জন্ত হিসাবে বসিয়া জ্যোতিষিগণ যে ফল লাভ করেন, তখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জ্যোতিষিক ব্যাপারের সহিত তাহার মিল দেখা যায় না। ভুল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিয়ম আবিষ্কার করার পরে, নিয়মের এইপ্রকার স্খলন প্রাচীন জ্যোতিষিগণ পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহা হইতে জ্যোতিষিক গণনায় চুলচেরা হিসাবের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। গণনার সহিত প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার মিল দেখানোর উপরেই জ্যোতিঃশাস্ত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠিত। প্রথম পর্য্যবেক্ষণে ভুল হইলে, এই মিল রক্ষা করিয়া গণনা করা একেবারে অসম্ভব। কাজেই মোটামুটি পর্য্যবেক্ষণের ফলে কোন নিয়মের সন্ধান পাইয়াও জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; বংশের পর বংশ, বৎসরের পর বৎসর এবং রাত্রির পর রাত্রি ইঁহাদিগকে বার বার জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষণ ও বড় বড় হিসাবের খাতা লিখিয়া জীবন কাটাইতে হয়; আমাদের ন্যায় 'অবৈজ্ঞানিক'দিগের নিকটে এই প্রকার চুল-চেরা হিসাবপত্র বাড়াবাড়ি ঠেকিতে পারে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের মহিমাটুকু এই বাড়াবাড়ি এবং চুল-চেরা হিসাবের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

একটা উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্যটা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। পাঠক অবশ্যই কেপ্‌লার সাহেবের আবিষ্কৃত জ্যোতিষিক নিয়মাবলীর কথা শুনিয়াছেন; সাধারণতঃ এগুলি কেপ্‌লারের নিয়ম (Kepler's Laws) নামে সুপরিচিত। যখন নিয়মগুলির প্রথম প্রচার হইয়াছিল, তখন সে গুলিকে অভ্রান্ত বলিয়াই পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, কেপ্‌লারের নিয়মে অনেক গলদ বর্ত্তমান। তাঁহার স্থূল-পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ নিয়মাবলী অনু-

সারে কয়েক বৎসর গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ঠিকই দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে তাঁহার প্রথম পর্য্যবেক্ষণের ভ্রম যখন বৎসরে বৎসরে পুঞ্জীভূত হইয়া বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন আর গ্রহ-নক্ষত্র কেপ্‌লারের নিয়ম মানিয়া চলে নাই। কাজেই নিয়মের সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত নিউটন্ সাহেব তাঁহার মহাকর্ষণের নিয়মাবলী দ্বারা কেপ্‌লারের নিয়মের সংশোধনে লাগিয়া গেলেন, খুব সূক্ষ্ম হিসাবপত্র চলিতে লাগিল এবং শেষে জানা গেল, কেপ্‌লার যে সকল নিয়ম কেবল পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাদের মূল মহাকর্ষণের নিয়মাবলীতেই প্রোথিত। পৃথিবী যে নিয়মের অনুগত হইয়া আতা-ফলকে মাটিতে ফেলে, সৌরজগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কই যে, সেই নিয়মেরই অধীন হইয়া মহাকাশে পরিভ্রমণ করে, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল। এই সকল ছাড়া, চন্দ্রের গতির উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জোয়ারভাটা প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা জ্যোতিষীদিগের নিকটে মহা প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, একে একে সেগুলিরও কারণ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। ধূমকেতু যখন সৌরজগতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করে, এবং অতি দূর প্রদেশে যুগ্মতারকাগণ যখন পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে, তখনও যে তলে তলে জ্যোতিষ্কগণ মহাকর্ষণেরই নিয়মাধীন থাকে, তাহাও সকলে জানিতে পারিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিউটন্ সাহেব খাতাপত্র লইয়া ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবে নিযুক্ত থাকিয়া যে সময়টা ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার অপব্যবহার হয় নাই। তাঁহার সূক্ষ্ম হিসাবই এখন গ্রহ-নক্ষত্রের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গতিবিধি আমাদিগকে সূক্ষ্মরূপে জানাইতেছে, এবং সৌরজগৎ ছাড়িয়া অতিদূর নক্ষত্রলোকের সংবাদও আমাদিগের নিকটে বহিয়া আনিতেছে। আমরা যে পৃথিবীখানির উপরে বাস করিতেছি, তাঁহার জন্মতত্ত্ব এবং শৈশবের ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা কাহার না হয়? নিউটন্ সাহেবের সূক্ষ্ম গণনাই এখন আমাদের সেই সকল ইচ্ছারও পূরণ করিতেছে। নিউটনের হিসাবপত্র খুব সূক্ষ্ম হইলেও ইহা একেবারে অভ্রান্ত নয়। হয় ত বহু শতাব্দী ধরিয়া এই নিয়মে হিসাব করিলে আমরা ভুল পাইব না, কিন্তু অতিদূর ভবিষ্যতে ঠিক্ এই নিয়মে গ্রহ-নক্ষত্রেরা চলাফেরা করিবে কি না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। বরং এ প্রকার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যাহাতে বহু যুগ পরে কেপ্‌লারের নিয়মের ন্যায় নিউটনের নিয়মেরও সংশোধন প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয়। দুই হাজার বৎসর পরে যে দিন নিউটনের নিয়ম না মানিয়া জ্যোতিষ্কদিগকে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইবে, সেই দিনই কোন সূক্ষ্মতর গণনা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। সুতরাং এখন হইতেই যদি পণ্ডিতগণ জ্যোতিষ্কদের গতিবিধি লইয়া খুব সূক্ষ্ম গণনায় কালক্ষেপ করেন, তবে তাহাকে সময়ের অপব্যবহার বলা যায় না।

আমরা এ পর্য্যন্ত সৌরজগতের কথা লইয়াই আলোচনা করিলাম, যে অনন্ত নক্ষত্রলোক আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত হইয়াছে, এখন তাহার কথা স্মরণ করা

যাউক। হার্সেল সাহেবের পর বহু জ্যোতিষী বহু অনিদ্র রজনী নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণে কাটাইতেছেন; ইহাতে যে,কত সূক্ষ্ম হিসাবপত্র এবং তর্ক কোলাহলের উৎপত্তি করিতেছে, আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের নিকটে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এগুলিও নিষ্কর্ম্মার সময়-ক্ষেপণের উপায় নয়। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহগণের উদয়াস্ত এবং তাহাদের চলাফেরা-সংক্রান্ত যে সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা দেখিয়া অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ অবাক্ হইয়া যান, তাহাদের মূলও উক্ত হিসাবপত্রের মধ্যে প্রোথিত। পাঠকের বোধ হয় অজ্ঞাত নাই, আমরা যখন জমি-জমা জরিপ করিতে আরম্ভ করি তখন প্রাচীন বৃক্ষ বা অপর কোন স্থায়ী বস্তুকে কেন্দ্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই স্থায়ী চিহ্ন হইতে পার্শ্বস্থ জমির দূরত্ব কত, তাহাই জরিপি চিঠাপত্রে লেখা থাকে। সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির চলা-ফেরা লিপিবদ্ধ রাখিতে হইলেও, ঐ প্রকার এক একটা স্থায়ী চিহ্নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনন্ত আকাশে সে প্রকার চিহ্ন কোথায়! জ্যোতিষীরা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্থির নক্ষত্রগণকে চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিয়া হিসাব করেন। চিহ্নের (station) গোলযোগ হইলে জমিদারকে জমিজমার হিসাবপত্র লইয়া ভবিষ্যতে অশেষ হাঙ্গামায় পড়িতে হয়। যে সকল নক্ষত্রকে স্থায়ী চিহ্নরূপে গ্রহণ করিয়া জ্যোতিষীরা হিসাবপত্র করেন, তাহাতেও এক চুল নড়চড় হইলে, গণনায় মহা বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হয়। কাজেই চিহ্নস্বরূপে গৃহীত নক্ষত্রগুলির উপরে জ্যোতিষীদের নিয়তই খরদৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। প্রাচীন জ্যোতিষীরা নক্ষত্রগুলিকে নিশ্চল বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন আর কোন নক্ষত্রকেই নিশ্চল বলা যায় না। এক একটি নক্ষত্র এক একটি মহাসূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ; কত গ্রহ-উপগ্রহ ধূমকেতু নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং ইহারা প্রত্যেকেই এই প্রকার জ্যোতিষ্ক-পরিবারে পরিবৃত হইয়া এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আধুনিক জ্যোতিষীদিগকে নক্ষত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই একবাক্যে এই কথাই বলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, যে সকল নক্ষত্র নিশ্চল বলিয়া স্থির ছিল, সেই গুলিরও স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত হওয়ায় জ্যোতিষীদের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। নিয়তই ইঁহাদিগকে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, এবং তাহাদের অধিকৃত স্থানের একটু নড়চড় দেখিলে, তাহা লিপিবদ্ধ রাখিয়া ভবিষ্যৎ গণনার পথ সুগম করিতে হয়। সুতরাং নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণের জন্য জ্যোতিষিগণ যে শ্রম করেন এবং যে সূক্ষ্ম হিসাবপত্র খাড়া করেন, তাহারও মধ্যে একটুও বাহুল্য নাই বলিয়াই মানিতে হয়।

আঠারো কোটি বাইট্ লক্ষ মাইল ব্যাস-বিশিষ্ট এক মহাবৃত্তাকার-পথে পৃথিবী সূর্য্যকে এক বৎসরকালে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। অর্থাৎ বলিতে হয়, পৃথিবী আজ আকাশের যে অংশে আছে, ছয় মাস পরে তাহা আঠারো কোটি বাইট্ লক্ষ মাইল দূরে গিয়া দাঁড়াইবে। আমরা যখন গাড়ীতে বা ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে থাকি, তখন পথের পার্শ্বের বৃক্ষগুলিকেও

স্থানচ্যুত হইতে দেখি। যে গাছটি একটু পূর্ব্বে আমাদের সম্মুখে ছিল, গাড়ি অগ্রসর হইলে তাহা পিছাইয়া পড়ে। সুতরাং এই পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র বুকে লইয়া আমাদের এই পৃথিবী যখন ছয়মাসে আঠারো কোটি ষাইট্ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে, তখন পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ন্যায় আকাশের নক্ষত্রগুলিকেও একটু আগাইতে বা পিছাইতে দেখারই সম্ভাবনা। নক্ষত্রগুলি পৃথিবীর গতিতে প্রকৃতই এই প্রকার নড়াচড়া করে কি না; জ্যোতিষিগণ বহু দিন হইতে ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন এবং কতকগুলি স্থির নক্ষত্রের এই প্রকার স্থানচ্যুতিও লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন এই শ্রেণীর নিকট নক্ষত্রের সংখ্যা বহু জ্যোতির্ব্বিদের চেষ্টায় প্রায় চারি শত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে কেবল চারি শতটিই সৌরজগতের নিকটবর্ত্তী এবং তাহাদেরই কেবল দূরত্ব পরিমাপের উপায় আছে; তদ্ব্যতীত সকল নক্ষত্র এত দূরে অবস্থিত যে, আমরা সাড়ে আঠারো কোটি মাইল পরিভ্রমণ করিয়াও তাহাদের একটুও বিচলন লক্ষ্য করিতে পারি না। সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতিষিগণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এই যে একটু আভাস প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা জনসাধারণকে কম লাভবান করে নাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রদিগের সংবাদ জানিতে না পারিয়া জ্যোতিষিগণ হতাশ হন নাই। উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া আরো সূক্ষ্মতর হিসাবের সাহায্যে দূর নক্ষত্রের সংবাদ আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক নক্ষত্রই এক একটি মহাসূর্য্য, এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি স্বকীয় গতি আছে। যেগুলি অতি দূরে অবস্থিত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে তাহাদের গতি দুই চারি শত বৎসরেও ধরা পড়ে না; কেবল নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রেরাই একটু দীর্ঘকালে একটুমাত্র বিচলন দেখাইয়া স্বকীয় গতির পরিচয় প্রদান করে। নক্ষত্রদিগের এই গতির পরিচয় পাইয়া হার্সেল্ সাহেবের মনে হইয়াছিল, আমাদের সূর্য্যটি যখন নক্ষত্রজাতীয় জ্যোতিষ্ক, তখন ইহারও একটা গতি থাকার সম্ভাবনা। হার্সেল দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিষয়টি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং শেষে দেখাইয়াছিলেন বুধ বৃহস্পতি শনি এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহে পরিবৃত হইয়া আমাদের সূর্য্যটি সত্যই হারকিউলিস্ রাশির দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ হার্সেল সাহেবের প্রদর্শিত পন্থায় নানাপ্রকার উন্নত যন্ত্রাদি সাহায্যে সৌরজগতের গতির পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন এবং এই গতির পরিমাণ বৎসরে অন্ততঃ চল্লিশ কোটি মাইল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাজেই পৃথিবীর যাণ্মাসিক সাড়ে আঠারো কোটি মাইল পরিভ্রমণেও যে সকল নক্ষত্র বিচলন দেখাইয়া আত্মপরিচয় দেয় নাই, সৌরজগতে বার্ষিক চল্লিশ কোটি মাইল ভ্রমণে তাহাদেরই পরিচয়-গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দূর নক্ষত্রদিগের পরিচয়-সংগ্রহের জন্য জ্যোতিষিগণের এই যে অক্লান্ত শ্রম, ইহার কি সার্থকতা নাই? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য বুঝিয়া মানবজাতি কি ইহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না?

যাঁহারা আধুনিক জ্যোতিষিক আবিষ্কারের সংবাদ রাখেন তাঁহাদের নিকটে গ্রনিন্‌জেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ক্যাপ্টেন্‌ (Kaptyen) সাহেবের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইনি সম্প্রতি নাক্ষত্রিক জগৎ-সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা প্রচার করিয়াছেন যে, তাহা শুনিলে প্রকৃতই বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ক্যাপ্টেন্‌ সাহেব বলিতেছেন মহাকাশে এই যে অসংখ্য তারকাগুলি কোটি কোটি মাইল বিচ্ছিন্ন থাকিয়া মিটি মিটি জ্বলিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অতি গূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। ইঁহার মতে সমগ্র বিশ্বের নক্ষত্রগুলির মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাগ রহিয়াছে; বিশৃঙ্খলভাবে আকাশে সজ্জিত থাকিয়াও ইহাদের প্রত্যেকটি ঐ দুই দলের মধ্যে কোন একটির অন্তর্ভূক্ত হইয়া আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে। একটা উদাহরণ দিলে ক্যাপ্টেন্‌ সাহেবের এই আবিষ্কারটি সহজে বুঝিবার সুবিধা হইবে। মনে করা যাউক, যেন আকাশে দুই ঝাঁক পাখী উড়িয়া চলিয়াছে; এক ঝাঁক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ছুটিতেছে, আর এক ঝাঁক যেন দক্ষিণ হইতে উত্তরে চলিয়াছে। দুই ঝাঁকের কোন পাখীরই বিশ্রাম নাই, সকলেই উড়িয়া চলিয়াছে। আকাশের নক্ষত্রগণ এই পাখীর ঝাঁকের মতই দুই দলে বিভক্ত হইয়া ছুটিতেছে বলিয়া ক্যাপ্টেন্‌ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে। তাহারা কোন্‌ দিক্‌ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। যে সকল নক্ষত্রকে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ চিরস্থির বলিয়া অনুমান করিতেন, তাহাদেরই এই প্রকার সুশৃঙ্খলিত গতি আবিষ্কার করা আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের কম গৌরবের কথা নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের এই বৃহৎ আবিষ্কারটির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতদিগের চুলচেরা সূক্ষ্ম গণনাই ইহাকে পূর্ণতা প্রদান করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতির্বিদ্‌ ব্রাড্‌লি (Bradley) সাহেব প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীন্‌উইচ্‌ মানমন্দিরে বসিয়া যখন আকাশের নক্ষত্রদের মানচিত্র অঙ্কনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এই নক্ষত্রগণনাকে নদীতীরে বসিয়া জলস্রোতের গণনার ন্যায় একটা অনাবশ্যক কার্য্য বলিয়াই অনেকে মনে করিতেন। কিন্তু আজ ক্যাপ্টেন্‌ সাহেব এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ নক্ষত্র-জগতের যে সকল সংবাদ প্রচার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেছেন, তাহা সেই ব্রাড্‌লি সাহেবেরই নক্ষত্র-পরিচয়ের সহিত বর্ত্তমান-কালে নক্ষত্রদিগের অবস্থানাদি মিলাইয়াই জানা যাইতেছে।

সূক্ষ্ম গণনায় জ্যোতিঃশাস্ত্র কত উন্নত হইয়াছে এবং মানবের জ্ঞানও ইহাতে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার অতি অল্পই পরিচয় প্রদান করা হইল। দূর জ্যোতিষ্কদিগের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া আজকাল নক্ষত্র-লোকের যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সেগুলির কথাও আলোচনা করিলে দেখা যায় বৈজ্ঞানিকদিগের সূক্ষ্ম গণনাই এখানে জয়যুক্ত হইয়াছে। কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রে নয়, রসায়নীবিদ্যা,

পদার্থবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের চুলচেরা সূক্ষ্ম গণনাকেই সেগুলির উন্নতির মূলকারণস্বরূপ দেখা গিয়া থাকে।

জগদানন্দ রায়

নিমাই-চরিত্র

বিংশ অধ্যায়

সার্ব্বভৌম-মিলন

বাসুদেব সার্ব্বভৌম উৎকলরাজের সভা-পণ্ডিত। তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। গৌর-ভক্ত গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহার ভগিনীপতি। দৈবযোগে গোপীনাথ আচার্য্য এই সময়ে পুরী ধামে উপনীত হইলেন। সার্ব্বভৌম গোপী-নাথের নিকট গৌরের সমস্ত পরিচয় অবগত হইয়া গৌরকে কহিলেন—"নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতার সহাধ্যায়ী ছিলেন; মিশ্র-পুরন্দরও আমার পরম পূজনীয়। আপনি সম্পর্কে আমার পূজনীয়, তাহার উপর সন্ন্যাসী, আমাকে আপনি ভৃত্যের মত জ্ঞান করিবেন।" গৌর কহিলেন—"আপনি বেদান্তের অধ্যাপক, আমি বালক সন্ন্যাসী, গুরু বলিয়া আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, আপনার জন্যই আমি পুরী আসিয়াছি, আপনাকে আমায় সর্ব্বথা পালন করিতে হইবে।" সার্ব্বভৌম নিজের মাতৃস্বসার গৃহ গৌরের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌম শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈত-বাদী ছিলেন। একদিন গোপীনাথের নিকট শুনিলেন গৌর ভারতীসম্প্রদায়ভুক্ত কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শুনিয়া কহিলেন "ভারতীরাও সর্ব্বোচ্চ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় নহে।" গোপীনাথ কহিলেন "ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই বলিয়াই বড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছেন।" তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন "এই তরুণ বয়সে ইনি সন্ন্যাস রক্ষা করিতে পারিবেন কি! ভাল, আমি ইঁহাকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইয়া সত্বরই অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইয়া দিব। যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উত্তম সম্প্রদায়ভুক্ত মহা-পুরুষের নিকট পুনঃসংস্কৃত হইয়া মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতেও পারিবেন।"

গোপীনাথ দুঃখিত হইয়া কহিলেন "সার্ব্ব-ভৌম, তুমি এখনও ইঁহাকে চিনিতে পার নাই, যদি ঈশ্বরের কৃপা হয়—তাহা হইলে জানিতে পারিবে, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অব-তার।" সার্ব্বভৌম কহিলেন, "তোমার চৈতন্য মহাভাগবত, সন্দেহ নাই; কিন্তু কলিকালে বিষ্ণুর অবতারের কথা শাস্ত্রে নাই।" গোপী-নাথ কহিলেন "কৃষ্ণ প্রতিযুগেই অবতার গ্রহণ করেন, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে (১৮৮০)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

গর্গঋষি নন্দকে বলিয়াছিলেন, "তোমার

পুত্র প্রতিযুগেই তনু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। অন্য তিন যুগে ইঁহার শুক্ল, লোহিত ও পীত, এই ত্রিবিধ বর্ণ; অধুনা কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তী জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

১১।৯।২৮

হে রাজন্, এই প্রকারে দ্বাপর যুগে জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। সম্প্রতি নানাতন্ত্র বিধান দ্বারা কলিকালের পূজাবিধি অবধান কর। যাঁহার মুখে কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ নিরন্তর ধ্বনিত হয়, যাঁহার কান্তি গৌর এবং যিনি অঙ্গ,উপাঙ্গ ও অস্ত্রপার্ষদ সমন্বিত, সুবেধাগণ নামকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

মহাভারতে ভগবানের এই সমস্ত নামের উল্লেখ আছে:—

সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ॥

কিন্তু তোমার সহিত এ সমস্ত আলোচনায় লাভ নাই। উষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। তোমার উপর যখন ঈশ্বর-কৃপা হইবে তখন আপনা হইতেই তুমি এ সমস্ত বুঝিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ,
বিবাদ সংবাদ ভুবো ভবন্তি॥
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং।
তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূম্নে॥" ৬।৪।২৬

যাহার মায়াশক্তি বাদী ও প্রতিবাদিগণের বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তির হেতু এবং তাহাদিগের আত্মবিষয়ে মোহযুক্ত করে— আমি সেই অনন্তগুণের আধার ভূমাকে নমস্কার করি।

গৌর গোপীনাথের নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্যের আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ। আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, তিনি তাহার বিধান করিতে চাহেন—ইহাতে আর দোষ কি ?"

একদিন সার্ব্বভৌম শিষ্যগণকে বেদান্ত অধ্যাপনা করিতেছেন—গৌর পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সার্ব্বভৌম গৌরকে কহিলেন "বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তুমি নিরন্তর আমার বেদান্ত শ্রবণ করিও।"

গৌর কহিলেন "আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব।" সাতদিন ধরিয়া গৌর সার্ব্বভৌমের বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন, কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম কহিলেন "তুমি ত মৌন হইয়াই আছ, বুঝিতে পারিতেছ কি না আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" গৌর কহিলেন "আপনার আদেশমত কেবল শুনিয়া যাইতেছি—কিন্তু আপনার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। সূত্রের অর্থ আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনার কৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সূত্রের অর্থ প্রকাশ করাই ভাষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনার ভাষ্যে সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে—সূত্রের মুখ্যার্থ না করিয়া আপনি কল্পিত অর্থ করিতেছেন। উপনিষদের অর্থ ব্যাসসূত্রে প্রকাশিত। আপনি ব্যাসসূত্রের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছেন, শব্দের অভিধাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। লক্ষণার্থ করিলে

বৈদিক বচনের স্বতঃপ্রামাণ্যহানি হয়। ব্রহ্মনিরূপণ বেদ ও পুরাণের লক্ষ্য। 'ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ।" যে ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যের আধার, তাঁহাকে আপনি নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেকগুলি শ্রুতিতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সত্য। কিন্তু সেই সমস্ত শ্রুতিতেই আবার ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে। যে শ্রুতিতে ব্রহ্ম অপাণি ও অপাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহাতেই আবার তাঁহাকে জবন ও গৃহীতা বলা হইয়াছে। যিনি শীঘ্র চলেন, যিনি সর্ব্ব গ্রহণ করেন, তাঁহাকে সবিশেষ বলিতেই হইবে। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব উদ্ভূত, এবং ব্রহ্মেই লীন হয়। ব্রহ্ম জগতের অপাদান, করণ ও অধিকরণ—এই তিন কারক। ব্রহ্ম অর্থে স্বয়ং ভগবান। শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। সৎ চিৎ আনন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ। একই চিৎ-শক্তি ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত। আনন্দরূপে তাঁহাকে হ্লাদিনী বলে, সৎরূপে সন্ধিনী ও চিৎরূপে সংবিৎ বলে। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াবশ। এহেন ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ নাই বলা অসম সাহসের পরিচায়ক। ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। বিগ্রহ যে মানে না, সে পাষণ্ড। পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের অভিমত। স্পর্শমণি অবিকৃত থাকিয়াও যেমন তাহা হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি হয়, ঈশ্বরও নিজে অবিকৃত থাকিয়া জগৎরূপে পরিণত হয়েন। বিবর্ত্তবাদ কখনও ব্যাসের অভিমত ছিল না। জীবের দেহাত্ম-বুদ্ধিই মিথ্যা, জগৎ কখনও মিথ্যা নহে। প্রণব-বাক্যই মহাবাক্য; "তত্ত্বমসি" প্রাদেশিক বাক্য মাত্র।

গৌরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মুখ হইতে আর বচন নিস্সৃত হইল না। গৌর পুনরায় বলিতে লাগিলেন "ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। শ্রীহরির এমনি অনির্ব্বচনীয় গুণ যে আত্মারাম মুনিগণ বিধিনিষেধের অতীত হইয়াও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।"

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ

ভাগবত ।১।৭।১০

সার্ব্বভৌম গৌরকে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। গৌর শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বোপচিত বাৎসল্যভাব স্মরণ করতঃ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। অতি বিনীতভাবে গৌরের নিকট সার্ব্বভৌম নিজের হীনতা স্বীকার করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া প্রথমে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন, তৎপরে বংশীবাদন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সার্ব্বভৌমের মনঃপ্রাণ হরণ করিলেন।

কতিপয় দিবস গত হইল অরুণোদয়কালে গৌর হঠাৎ সার্ব্বভৌমগৃহে উপনীত হইলেন—সার্ব্বভৌম ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। গৌর সার্ব্বভৌমকে মহাপ্রসাদ দান করিলেন। তখন

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥

বলিয়াই অধৌতমুখ অস্নাত অকৃতসন্ধ্যা-

বন্দনাদি সার্ব্বভৌম তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

সার্ব্বভৌম একদিন নিম্নলিখিত বন্দনা-শ্লোক দুইটি জগদানন্দ দ্বারা গৌরসমীপে প্রেরণ করিলেন।

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুম্ কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ২

মুকুন্দদত্ত গৌরের নিকট পত্রী পৌঁছিবার পূর্ব্বে ভিত্তি-গাত্রে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই শ্লোক দুইটি আজিও ভক্তের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতেছে। গৌর শ্লোক দুইটি পাইয়াই ছিড়িয়া ফেলিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

নক্ষত্র-পূজা

অতি প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় কি আর্য্য কি তুর্ক কি য়িহুদি কি চীনেম্যান মানবমাত্রেই নক্ষত্র * পূজা করিত। ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

নিশার ঘোর অন্ধকারে ভয়াকুল, হিংস্র জন্তুর গর্জ্জনে কম্পবান বনবাসী আদিপুরুষগণের ভয়ত্রাতা পিতা সূর্য্য ভিন্ন আর কে ছিল? শীতে কাতর বনবাসীর দেহে তাপ-সঞ্চার করিতে "প্রাচীন নক্ষত্র" ব্যতীত কে সক্ষম ছিল? চন্দ্র ও তারাগণের বিমল জ্যোতি মানবের শ্রান্তচিত্ত দিনান্তে যেমন স্নিগ্ধ করিতে পারে, তেমন স্নিগ্ধকর মোহিনীশক্তি আর কাহারও নাই। "সবিতা সত্যধর্ম্মা" উদিত হইলেই বনবাসীর ভয় দূর হইত, দেহে তাপের সঞ্চার হইত। বনবাসী আহার-সংগ্রহে সাহসী হইতেন। দৈনিক পর্য্যটন অন্তে নৈশ নভোমণ্ডলের সুবিমল জ্যোৎস্নায় বনবাসী শ্রান্ত চিত্ত, ক্লান্ত দেহ সুস্নিগ্ধ করিতেন।

কাজেই তিনি কৃতজ্ঞতার বশে ভক্তির চক্ষে নক্ষত্র দর্শন করিতেন। ক্রমে নক্ষত্র তাহার ভয়হর্ত্তা পিতা ও শান্তিদাত্রী মাতা হইলেন।

প্রাণ ও রয়ি আদি বনবাসীর পিতা মাতা হইলেন। সবিতা জগতের প্রাণ, চন্দ্রমা জগতের রয়ি। উভয়ে কৃতজ্ঞ বনবাসীর চিত্ত-পুত্তলিকা হইলেন। সবিতা ঈগল পক্ষী, শকুনি, রক্তবর্ণ চক্রবাক, হংসাদির ন্যায় বিমানে উড্ডীন হয় বলিয়া গরুত্মান্, শকুনি, লোহিত পক্ষী ও হংস উপাধি পাইলেন। সবিতা প্রকাণ্ড মহিষের বীরদর্পে বরাহের অটলবিক্রমে অগাধ পারাবার-বারি হইতে উত্থিত হয়। সবিতা ঘনঘটা-গর্জ্জন সহ সিংহের লম্ফে লম্ফে উদয়-গিরি আরোহণ করে। সিংহের চক্ষুর মত সবিতা মুহূর্ত্তের জন্যও মুদিত হয় না। তাই

* চন্দ্রসূর্য্যাদি নক্ষত্র।

সবিতা 'মহিষ' 'বরাহ' 'সিংহ' ও 'হরি' নাম উপহার পাইলেন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ—চন্দ্রের এই দুই পক্ষ। আবার চন্দ্র মিনিটে ৪০ মাইল চলে। বনবাসী চন্দ্রকে দ্বিজরাজ খেতাব দিলেন। বনবাসী দেখিলেন শুভ্র শশকের ন্যায়, শুভ্র বিড়ালের ন্যায় লক্ষ্মময় চন্দ্রমা বিমানে বিচরণ করেন। চন্দ্রমা 'শশ', বিড়াল, ও লক্ষ্মী নাম উপহার পাইলেন।

সবিতা ও চন্দ্রমার উদয়ে ভক্তিরসে ডুবিয়া আনন্দে মগ্ন আদিমানব মূর্ত্তিমান্ 'বাউরা আদ্‌মী'র তানে বাউলের সুরে গীত ধরিলেন—

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ
তোমার সনে
তুমি হবে কেউ আমার
আপনা হতে আপনার
আপনা হতে নইলে
মন কি টানে
তোমার পানে—
আপনা হতে নইলে
প্রাণ কি টানে
ওহে জনক কি জননী
ভাই কি ভগিনী
প্রণয়িনী স্ত্রী কি
পুত্র কন্যে
এ নয় তোমাতে সম্ভব
এ কি অসম্ভব
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।"

আদি বাউলের সংজ্ঞালাভ হইল, বাউল বিস্মিত লজ্জিত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন এবং তিনি দিন দিন ভাবিতে লাগিলেন। অগ্নিময় হইলেও সবিতা জড়বস্তু, জ্যোৎস্নাময় হইলেও "লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মিঃ" জড়বস্তু। বনবাসী বাউলের মনে ক্রমে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন জড়বস্তু ত আমার ভক্তি গ্রহণ করিতে পারে না, আমার দেবতা "সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" চিন্ময় বিষ্ণু, কাজেই সিদ্ধান্ত হইল "দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি"। বনবাসী বাউলের নক্ষত্র-পূজা বহাল রহিল এবং তিনি সত্যের পথে অগ্রসর হইয়া 'সবিতা সত্য-ধর্ম্মার' উপাসনায় ব্রতী হইলেন।

সুমেরুস্থিত বনবাসী দেখিলেন ছয়মাস কাল জলময় পাতালে অলক্ষিত বাসের অব-সানে সবিতা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণে তারাবৃষের ককুদ-আরোহণে রৌদ্রবিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রুদ্রদেবের বাহন বৃষরাশি হইল। ককুৎস্থ সূর্য্য নারায়ণের বাহন মহান্ উক্ষা হইল। তাই সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রকে "কাকুৎস্থং করুণাময়ং" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়।

তিনি দেখিলেন—আদিম কালের আদিত্য-পথ (ছায়া-পথ) ভেদ করিয়া উদিত সূর্য্য নারায়ণ নিশার অন্ধকার বিনাশ করিলেন। ছায়া-পথ স্ফটিক শুভ্র আকৃতি। ইতিহে নারায়ণ নৃসিংহ আদিত্য-পথ স্ফটিকস্তম্ভ এবং নিশা হিরণ্যকশিপু (নক্ষত্র যাহার বস্ত্র) নাম ধারণ করিলেন।

বনবাসী কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে দেখিলেন—অমৃতস্রাবী চান্দ্র বিড়ালের পৃষ্ঠে ষট্‌কৃত্তিকা নক্ষত্র "শিশুনাম্ পালয়িত্রী" ষষ্ঠী (ষট্‌মাতৃকা) রূপে আসীন আছেন। বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন হইল। প্রাতঃসূর্য্য ব্রহ্মা নামে সৌর হংসে আসীন থাকেন। হংস

ব্রহ্মার বাহন হইল। মধ্যাহ্নসূর্য্য জগৎব্যাপী বিষ্ণু। সূর্য্য-নারায়ণ মধ্যাহ্নে সৌর গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন থাকেন। গরুড় নারায়ণের বাহন হইল। সায়াহ্ন-সূর্য্য তেজ সঙ্কোচ করিয়া "যম" নাম গ্রহণ করেন।

সুমেরুস্থ বনবাসী দেখিলেন; 'যম' দেব ছয় মাসের পর তারা বৃশ্চিকের কবলে পতিত হইলে অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইতে থাকেন, কালান্তক বৃশ্চিক সর্প—'যম' 'মহা-কাল' রুদ্রদেবের অঙ্গভূষণ হইল। এবং সৌর মহিষ 'যম' দেবের বাহন হইল। এই রূপে সৌর হংস পৃষ্ঠে ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিত, সৌর গরুড় পৃষ্ঠে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত, সৌর মহিষ পৃষ্ঠে রুদ্র যম প্রতিষ্ঠিত হইলেন। একে তিন, তিনে এক। এই হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি—সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে ভূষিত এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা। পাশ্চাত্যের ত্রিনীতি—ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্রভূত (যম) এই হইল ত্রিনীতি (Trinity)। কাজের বেলা মিল নেই। ময়না পড়ে বেশ কিন্তু বুঝে না। মহাকাল রুদ্রদেব নারীবেশে মহাকালী হইলেন। জংঘায় বৃশ্চিক ভূষণ হইলেন। এবার মূর্ত্তিমান্ রুদ্রদেব বাহন। পদ-দলনে মৃত্যুঞ্জয় মরিবার নহে। "কালীর চেলা" (গ্রীক-চেলাই) হিন্দুর অবধ্য। সন্ন্যাসীর চেলা কি বস্তু!

বনবাসী জানিতেন যে বৃশ্চিক সর্পের কবলে পড়িলে সূর্য্যের তেজ অপহৃত হয়। তিনি এক দিন দেখেন দিনে দুপুরে অন্ধকার উপস্থিত, সূর্য্য অদৃশ্য। তিনি তখনই স্থির করিলেন বৃশ্চিক সর্প অলক্ষিত ভাবে আসিয়া সূর্য্য গ্রাস করিয়াছে। বৃশ্চিক সর্প লুক্কায়িত (রহসি-স্থিত) বলিয়া "রাহু" নাম পাইল, আবার গ্রহণকালে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় ছটা (Corona) বাহির হয়। বনবাসী মনে করিলেন বিমানস্থ কোন ভানুর ছটা হইবে। জ্যোতির্ম্ময় ভানু সূর্য্যের তেজ হরণ করিল। যথা—সূর্য্যের উদয়ে গগনের তারা অদৃশ্যভাবে থাকে। তাই অমর সিংহ বলেন—"তমস্তু রাহুঃ 'স্বর্ভানুঃ'।" চিন্তাশীল পাঠক বুঝিবেন —পদার্থ তিনটী পৃথক্, কিন্তু তাহাদের ব্যবসা এক। তাই অভিধানে তুল্যমূল্য হইয়াছে। একটী শব্দ অপর শব্দদ্বয়ের প্রতি-শব্দ হইতে পারে না। তমঃ=স্বর্ভানু? বনবাসীর হৃদয় নিশার সহচর হুতুমের স্বরে কম্পিত হইত। ফলিত জ্যোতিষের আশী-র্ব্বাদে হিন্দুর হৃদয় ফের বনবাসে গিয়াছে। টিক্‌টিকীর ডাকে রক্ষা নেই। তা ত হুতুম। তার নাম শুনিলেই "অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়ে থাকিয়ে।" এ সব অপূর্ব্ব মনুষ্যত্বের পরিচয়। কিন্তু হিন্দু মনে করেন না যে মূষিক ভক্ষণের গুণে ঐ হুতুম মা লক্ষ্মীর বাহন হইয়াছে। গৃহে আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করা হিন্দুর হিতজনক। মূষিক ঝড় গুণা-পড়া করিতে বেশ দৈবজ্ঞ। ভাবী ঝড়ের পূর্ব্বে জাহাজের নৌ-নিগড় তুলিলে মূষিক-দল জাহাজ হইতে লাফাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের জলে পড়ে এবং সাঁতার দিয়া কিনারা লয়। জাহাজের বিলাতী কাণ্ডারী ঠেকে শিখিয়াছেন যে, মূষিক চম্পট দিলে জাহাজ ভাসাইতে নাই। সেই মূষিক মনোজব বৃহস্পতির বাহন। বেদে "ত্বং গণানাং গণ-পতিঃ" বলায় দেবগুরু বৃহস্পতি গণেশ নামে সকলের আগে পূজা লইতেছেন। আবার

দিক্‌হস্তিগণ পৃথিবীতে জল ঢালে। আবার "বারিপূর্ণাং মহীং কৃত্বা পশ্চাৎ সঞ্চরতে শুরুঃ।" সঙ্কেত-তত্ত্বে হাতী বৃহস্পতির প্রতিকৃতি। তাই বলে "গণেশং পেটডগরং হাতীশুড়ং" নমোঽস্তু তে।

পুরাণের আকাশগঙ্গা বেদের (আকাশ) সরস্বতী ছিলেন, কারণ উভয়েই ছায়াপথে অধিষ্ঠিত।

ছায়াপথ-তলে মকর রাশি অধিষ্ঠিত আছে এবং তাহার উত্তরে তারাহংস ও পার্শ্বে বীণা-মণ্ডল (Lyra) অবস্থিত আছে। তাই আকাশ-গঙ্গাকে ধ্যান করি :—

"সিতমকরনিষণ্ণাং"।

আর সরস্বতীকে নমস্কার করি—"বীণারঞ্জিত পুস্তক-হস্তে।" তারা-হংস আকাশ-গঙ্গার দূত। ভীষ্মদেবের নিকটে সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন। আবার তারাহংস সরস্বতীর বাহন।

দেবরাজ ইন্দ্র "বৃহৎ রথে" আরোহণ করেন।

"যত্র রথস্য বৃহতঃ বিধানম্" (ঋক্) সর্প নহুষরাজ শচীলাভের দুরাশায় ব্রহ্মর্ষিগণ-বাহিত "শিবিকা" আরোহণ করিলেন। এই "বৃহৎ রথ" বা "শিবিকা" সপ্তর্ষিগণ গঠন করেন। বেবিলন নগরে এই বৃহৎ রথ "মার্গিড্ডা" নাম পাইয়াছিল। তর্জ্জামা-রাজ য়ুরোপে সপ্তর্ষি-মণ্ডল Long Chariot নাম পাইয়াছে। কেহই মার্গিড্ডা বা Long Chariot কাহার সে খবর রাখেন না। ইন্দ্রের বৃহৎরথ বা শিবিকা সামান্য বস্তু নহে। দু'দিনের জন্য স্বর্গ-সিংহাসনে বসিয়া, ইন্দ্রের বৃহৎরথে নহুষরাজ উঠিলেন। অগস্ত্যের শাপে পরমব্যোম হইতে নহুষ "পপাত ধরণী-তলে"। তবে মণিপুরের রাজবংশ অদ্যাপি এই স্বর্গরাজকে নিত্য দুধকলা দিয়া পূজা করিতেছেন। এবং চীনসম্রাট এই সর্প-রাজকে রাজপতাকায় উড়াইতেছেন।

ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋষিরেখা কন্যা রাশিতে ছিল। তখন তারা কন্যা রাশি-চক্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করিত। সিংহ রাশি কন্যার তলদেশে ছিল। প্রকাণ্ড জল-সর্প (Hydra) তারা কন্যার কর (হস্তা-নক্ষত্র) শোভিত করে।

সিংহবাহিনী তারা কন্যা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ও সৌম্যমূর্ত্তি এই উভয় মূর্ত্তিতে পূজিত। তারা সর্প একের করে এবং অন্যের স্কন্ধে বিরাজিত। পাঠক বুঝিয়া লইবেন। তারা কন্যার মাথার উপর ভূতেশ মণ্ডলে (Bootes) রুদ্রদেব বসিয়া আছেন।

বনবাসী দেখিতেন যে সর্প ও ব্যাঘ্র জীবের বিনাশক। তাই তিনি মহাকাল রুদ্রদেবের দেহ "ব্যাঘ্রকৃত্তিবসানং" এবং সর্পশোভিত করিলেন। তারা ব্যাঘ্র (Lupus) বৃশ্চিক সর্পের তলে বসিয়া আছে। "সেই বুড় বলদ আছে পুঁজি" বুড় বলদ ছাড়িবে না। কাজেই ব্যাঘ্র বাহন হইতে পারিল না। ব্যাঘ্রচর্ম্ম বসন হইল। সুমেরুস্থিত বনবাসী দেখিলেন যে ছয়মাস স্থায়ী নিশার অবসানে রৌদ্রহীন বাল-সূর্য্য বলির (Orion the Giant) শিরোদেশে উদিত হইতেছেন। ঘটনাটী দুই হাজার বর্ষের পূর্ব্বেকার। বাল-সূর্য্য উঠিয়াও উঠে না। আপন খেয়ালে বসিয়া থাকিল। বনবাসী Parallanএর অধ্যায় ত পড়েন নাই, কাজেই অবাক্ হইলেন। তিনি দেখিলেন

বলির দ্বারে (Equinox) হরি বদ্ধ হইলেন। ক্রমে হরি-সূর্য্য বলির মস্তকোপরে উঠিয়া সৌম্য ধ্রুব হইতে যাম্য ধ্রুব পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করিয়া বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বনবাসী "নমস্তে বামন!" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে বাল-সূর্য্যকে প্রণিপাত করিলেন। বলি বামনের বাহন হইলেন এবং "বলির দ্বারে বামন বদ্ধ" প্রবাদ রটিল।

ভক্তিশূন্য সফোক্লিস্ দেখিলেন অন্ধ বলি বামন স্কন্ধে লইয়া পথ দেখিতে পাইলেন। গ্রীসদেশ হইতে ইয়ুরোপে "Dwarf on the Giant" প্রবাদ ভাসিল। বনবাসী দেখিলেন যে কালপুরুষ-মণ্ডলে (Orion) সুন্দর ময়ূর-পৃষ্ঠে স্কন্দদেব বসিয়া আছেন। স্কন্দদেবের শিরোদেশে তারা কুক্কুট অবস্থিত রহিয়াছে। ময়ূর ও কুক্কুট উভয়েই রণদুর্ম্মদ, উভয়েই পরম রূপবান্। স্কন্দদেব চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত রণবীর কুমার খ্যাতি পাইলেন। যোদ্ধৃ-তারা (Bellatrix) তাহার সাক্ষী। গ্রীসদেশে কুমার Kanda-on [=the Prince] খ্যাতি পাইলেন। Scandinavia তাহার রাজ্য হইল। আবার নারীবেশে কুমারী ময়ূর-পৃষ্ঠে উঠিতে রাজি কি না সন্দেহ। তাই পড়ি—

"ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থে চ নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥"
(চণ্ডী)

গ্রীসদেশে কুমার (Orion) "Cock's fort উপাধিমাত্র পাইয়াছিলেন। ময়ূর বুঝি গ্রীসদেশে নাই?

তারাস্তবক মধুচক্র (Bee-hive) মাদ্রাজে পুষ্যা নক্ষত্র। পুষ্যরথে হরি উঠিলেই বর্ষা আরম্ভ হইত এবং নববর্ষের আগমন হইত। রথযাত্রার দিনে হরির বাহন পুষ্য রথ, গরুড় নহে। অয়নাংশের গতির ফলে উত্তর-অয়নান্ত বিন্দু (Summer Solstice) কর্কট-রাশিস্থ পুষ্য-নক্ষত্র ছাড়িয়া মিথুনরাশিস্থ আর্দ্রা নক্ষত্রে আসিয়াছে। রথযাত্রার দিনে গোল বাধিল। সুচতুর মন্ত্রজীবী ঠকিবার নহে। "আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্য-সংযুতা", বচনের বলে হরির রথ আরোহণ চলিত হইল। "মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" বচনের নজীরে মিথুন-রাশিস্থ হরি রথে উঠিলেন এবং রাশিচক্র পরিভ্রমণ উল্‌টা রথে দেখাই-লেন। দুঃখ এইমাত্র যে দক্ষিণ-অয়নগামী হরির রথ দক্ষিণে যাইবে। উত্তর অয়ন-গামী হরির রথ উত্তর-অভিমুখে চলিবে। মূল অভিনয় কেহ দেখেও না—বুঝেও না। যিনি উপদেশ দিবেন তিনি দক্ষিণা গাঁটে বাঁধিয়া প্রস্থান করেন। হাটুরেরা যে দিকে রাস্তা পায় সেই দিকে রথ টানে আর রথে গোল বাধায়। হরির কি বিড়ম্বনা দেখ।

বর্ষারম্ভে রুদ্র সূর্য্য মহান্ শ্বা নক্ষত্রে (Dog Star) উপনীত হইয়া থাকেন। তখন য়ুরোপে "কুকুর দিন" (Dog days) উপস্থিত হয়। ভারতে রুদ্রদেব বলদ ছাড়িয়া কুকুরের পৃষ্ঠে চড়েন। তাহার নাম হইল "শ্বাশ্ব"। সেকালে হরি-সূর্য্য পুষ্যানক্ষত্রে উঠিলে তৎপরদিন তিনি তারা-জলসর্পের (Hydra) পৃষ্ঠে ভর করিতেন। হরির শয়ন আরম্ভ হইত। জলসর্প কর্কট হইতে বৃশ্চিক পর্য্যন্ত লম্ববান রহিয়াছে। তারা চিত্র দেখ, সত্য কি মিথ্যা।

জলসর্প অনন্তসর্প নাম ধারণ করিয়া সূর্য্য-হরিকে বৃশ্চিক রাশিতে লইয়া হাজির করিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে উত্থান একাদশীর

দিনে হরির দক্ষিণ অয়নজাত নিদ্রার অবসান হইল। সম্মুখে গরুড় (Aquila) উপস্থিত। অনন্ত সর্পকে বিদায় দিয়া হরি-তারা গরুড়-পৃষ্ঠে উঠিলেন। সমুদ্র-শয্যা পরিত্যক্ত হইল। য়ুরোপের কুকুর দিন ভারতের অম্বু-বাচি (বর্ষাবন্যা)। অম্বুবাচি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত হরি সূর্য্যের নিদ্রাকালে সূর্য্য-অগ্নিকে সচেতন করিতে নাই। তাই সূর্য্য-পক্ক অন্ন ও ফল-মূল আহারে মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ দক্ষিণ অয়ন অতি-বাহিত করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মাছের ঝোল ব্যবস্থা। তবে হিন্দু বিধবা অম্বু-বাচি পালনে ও চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণে দক্ষিণ অয়ন যাপন করেন বলিয়া বাঙ্গালায় হিন্দুয়ানী চলিতেছে।

কামাগ্নি ছাগে প্রবল। তাই অগ্নিব্রহ্মের বাহন ছাগ এবং ব্রহ্মমণ্ডলের (Auriga) প্রধান তারার নাম অজ (Capilla)। অজ (গ্রীক Aiz) ইত্যাদি। য়ুরোপ বলেন অজ তারা এখানে কেন? রুদ্রদেব পবন-মূর্ত্তিতে ভূতেশমণ্ডলস্থ স্বাতি (সু-অতি) নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত।

"রোহিত" তারায় স্বাতি নক্ষত্র গঠিত হইয়াছে। বেদমতে রোহিত (মৃগবিশেষ), মরুৎগণের 'পৃষতী" রথ বহন করে। * রোহিত (Areturus) মৃগ পবনের বাহন হইল। তাই দেখি মনোজব হরিণ মনোজব পবনের বাহন হইয়াছে। পবন দেব রক্তবর্ণ, রোহিত তারাও রক্ত বর্ণ।

তাই বলি

রূপে গুণে তুল্য যেই।
দেবের বাহন ভূষণ সেই॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং
তথা ভূষণ বাহনম্।

এ বচন কাণা করিব?

তারাদর্শক।

উৎপলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভ্যাগতের পূজা

পথে চলিতে চলিতে সঙ্গীয় ভৃত্যটিকে প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"তোমাকে কি আর কোন দিন দেখিয়াছি?"

"আর এক দিন দেখিয়াছিলেন।"

"তোমার নাম বাহক?"

"হাঁ। একদিন সন্ধ্যা বেলায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন।"

"তোমার কর্ত্রী কেমন আছেন? সেদিন নিরাপদে ঘরে পৌছিয়াছিলেন?"

---

*......পৃষতীরথে
পার্ক্ষিঃ বহতি রোহিতঃ।
(ঋক্)

"আমাদের আর কোন বিপদ হয় নাই। কর্ত্রী ভালই আছেন।"

"তোমরা সেদিন কোথা হইতে আসিতেছিলে?"

"ঠাকুরাণী কোন প্রয়োজনে পাটলী গ্রামে গিয়াছিলেন।"

প্রমীত দেখিলেন বাহুক অধিক কথা কহিতে চায় না। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার কর্ত্রীর কোন পরিচয় পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাও তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। বাহুক নীরবে পথ দেখাইয়া চলিল।

নগরের যে অংশ দিয়া প্রমীত যাইতেছিলেন, তাহাতে অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরই বাস। পথের উভয়পার্শ্বে সুশোভন অট্টালিকার সারি। মধ্যে মধ্যে ফুলের বাগান, ফলের বাগান। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। গৃহে গৃহে গৃহ-বিগ্রহের আরতি, সান্ধ্যস্তুতি আরম্ভ হইল। শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে পল্লী মুখরিত হইল। ধূপ-ধূনা-গুগ্গুল-গন্ধে সন্ধ্যার সুখদ মৃদুবায়ু সুরভিত হইয়া উঠিল। রাজপথে আলো ছিল না, কিন্তু উভয় পার্শ্বের পুরীপ্রবেশ-পথেএবং মুক্তবাতায়ন-পথে গৃহমধ্যস্থ দীপরশ্মি রাজপথে পড়িয়াছিল, সুতরাং পথ নিতান্ত অন্ধকারময় ছিল না।

বসন্তকাল; শীত নাই, গ্রীষ্মের আতিশয্যও হয় নাই। রাজ-পথে লোকচলাচলের অভাব নাই। পুষ্পমালাধারী, চন্দনচর্চ্চিত-দেহ সৌখীন যুবক, ব্যস্তসমস্ত ব্যবসায়ী, ভিক্ষার্থী খঞ্জ অন্ধ আতুর, দ্যূতকারী, সভিক, নট, বৈণিক, বৈণবিক, চঞ্চলা নগর-শোভিনী, চকিতনেত্রা অভিসারিকা, ভারিক, মালিক, বার্ত্তাবহ—রাজপথে অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল। অনেকে প্রমীত-সেনকে দেখিয়া নমস্কার অভিবাদন করিল, কিন্তু প্রমীত দ্রুতপদে চলিলেন। পরিচিত কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। পথের এক পার্শ্বে একটুকু জনতা হইয়াছিল। একজন মালী নানাবিধ সুগন্ধি ফুল, ফুলের মালা, মুকুট, বলয়, কুণ্ডল ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছিল। কয়েক জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য নির্ব্বাচন করিতেছিল। প্রমীতসেন পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু সোমদত্ত সেখানে ছিলেন, তিনি প্রমীত এবং তৎসহচর বাহুককে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রমীত জানিতে পারিলেন না। কিন্তু সোমদত্ত মালা-ক্রয় পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষ্যে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

বাহুক অবশেষে প্রমীতসেনের অপরিচিত এক পল্লীতে একটী বৃহৎ বাটীর নিকট উপস্থিত হইল। দ্বারবান দ্বার খুলিয়া দিল। প্রহরীরা নমস্কার-অভিবাদন করিল। আলোকিত প্রবেশ-পথ অতিক্রম করিয়াই ফুলের উদ্যান, অদূরেই উচ্চ দ্বিতল গৃহ, গৃহের কক্ষে কক্ষে দীপালোক। প্রমীত সিঁড়ির নিকট পৌঁছিতেই দুই তিন জন পরিচারিকা প্রণাম করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গেল। প্রথম কক্ষেই একটী প্রৌঢ়বয়স্কা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি প্রমীতসেনকে অভিবাদন করিলেন, প্রমীতসেনও প্রৌঢ়াকে নমস্কার করিলেন। প্রৌঢ়া বলিলেন;—

"আমাদের আজ কত সৌভাগ্য! আপনি আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমা-

দিগকে চরিতার্থ করিলেন। আমার কন্যাকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আপনি আমাদিগকে চির-অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার কন্যা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। চঞ্চলা, ইঁহাকে লইয়া যা।"

চঞ্চলা প্রমীতসেনকে লইয়া এক সুসজ্জিত দীর্ঘ-বারান্দা দিয়া চলিল। বাম পার্শ্বে কক্ষের পর কক্ষ, দক্ষিণ পার্শ্বে মর্ম্মরে আচ্ছাদিত প্রশস্ত অঙ্গন, তাহার অপর তিন দিকে দ্বিতল পর্য্যন্ত সারি সারি আলোকিত কক্ষ। এই 'উপকৃতা' কে, কি নাম, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী?—প্রমীত কিছুই জানেন না। কিন্তু সেই পুরীর বিশালত্ব এবং সজ্জিত মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, 'উপকৃতা' যিনিই হউন, তিনি প্রভূত-সম্পত্তিশালিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই দুর্দ্দিনে অন্ধকারে অস্পষ্ট-আলোকদৃষ্টা, বাক্‌চতুরা, আলুলায়িতকুন্তলা অপূর্ব্বসুন্দরী তরুণীর মূর্ত্তি বারবার তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। আজ তাঁহারই গৃহে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে। প্রমীতসেনের চিত্ত কৌতূহলে উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

চঞ্চলা পরিশেষে একটী কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রমীতসেনকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল:—

"আমার কর্ত্রী এই কক্ষে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

প্রমীত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহাসুগন্ধি তৈলপূর্ণ প্রদীপে প্রদীপে সমগ্র কক্ষ আলোকিত। একটী সুন্দরী যুবতী মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অতি বিনীত নমস্কার করিল। সমীপস্থা অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর প্রতি স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিক্ষেপ অসম্ভব। নিমেষমাত্র প্রথম দৃষ্টিতে প্রমীত যাহা দেখিলেন তাহাতেই তিনি অতি বিস্মিত হইলেন, ক্ষণকাল নীরব স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ইনি সেই নগর-প্রবেশ-পথের আকুল-কুন্তলা 'উপকৃতা'ই বটেন! কিন্তু আরও কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছি! কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই, তাঁহাকেই প্রথমে কথা কহিতে হইল।

"আপনি আমাকে পত্র পাঠাইয়াছিলেন?"

মস্তক নত করিয়া রমণী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন;—

"অধিনীই এই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে।"

রমণীর বিনীত নির্দ্দেশে কক্ষ মধ্যে অনতি-উচ্চ বিস্তৃত পালঙ্কে সুশোভন আসনে প্রমীত উপবেশন করিলেন। আসনের চারিপার্শ্বে, কক্ষের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিপদীর উপর থালে থালে সুগন্ধি ফুল, ফুলদানে ফুলের স্তবক। শ্বেতরক্তনীলপীত নানাবর্ণের মূল্যবান প্রস্তরে গ্রথিত চিত্রিতবৎ অতি সুন্দর ফুল-ফল-তরুলতার ছবিতে কক্ষের দেয়াল ও মেঝে সুশোভিত। একপার্শ্বে অতিপুরু সুখ-স্পর্শ কম্বলাসন, তাহার উপর ধৌত পট্টবস্ত্রের আচ্ছাদন। কক্ষের সমস্ত তৈজসপত্র মূল্যবান এবং সুদৃশ্য। গৃহের বৈভব-শ্রী দেখিয়া প্রমীত অতি বিস্মিত হইলেন।

রমণী নিকটেই দেয়ালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন:—

"আমার প্রার্থনা, আমাকে 'আপনি' বলিবেন না।"

"আমাকে 'আপনি' বলিতেছেন, আমি কেন বলিব না ?"

"আমি তদুপযুক্ত লোক নহি। আপনি আমার কোন পরিচয় পান নাই। আমি—"

"আপনাকে কি কাল বসন্তোৎসবে দেখিয়াছি ?"

"অসম্ভব নহে ; উৎসবে আমি গীত গাহিয়াছিলাম।"

ইনিই সেই ! বেশভূষার সে উৎসবোচিত পারিপাট্য নাই, মণি-মাণিক্য-খচিত সে অলঙ্কার-সমাবেশ নাই। কিন্তু গৌরদেহের কি অপূর্ব্ব লাবণ্য-ছটা ! শ্বেতকুসুম-মাল্যবিজড়িত দীর্ঘ কেশরাশির কি তরঙ্গায়িত লীলা ! বিদ্যুদ্গর্ভ স্থির আরক্ত চক্ষুর কি বিনম্র মধুর দৃষ্টি ! প্রমীতসেন আর সময় পাইলেন না, বলিলেন ;—

"আপনি—আপনার—"

"আমি অতি সামান্য স্ত্রীলোক।"

"আপনার—"

মঞ্জুলা অতি বিনীত স্বরে বলিল ;—

"আমাকে 'আপনি' বলিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

"আমার বন্ধু অসঙ্গ সেন মহাশয় আপনার পরিচয়—"

"আমার প্রার্থনা !

"তাহাই হউক।—তোমার পরিচয়, গুণ-কাহিনী আমাকে বলিয়াছেন। আপনি প্রসিদ্ধ বিদুষী এবং গুণবতী। আমার দুর্ভাগ্য, আমি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন আপনার—তোমার গৃহে আসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার সুখের অধিকারী হই নাই। সে দিন মানুষের অবশ্যকর্ত্তব্য অতি সামান্য কাজ করিয়া যদি তোমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া থাকি, তবে আমি বড়ই ভাগ্যবান।"

"সে দিন আপনি উপস্থিত না হইলে আমার যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা মনে করিতে ভয় হয়. আপনি চিরকালের জন্য আমাকে ঋণী করিয়াছেন। সে দিন আমি নিজ পরিচয় দিতে সাহস পাই নাই, আমার সে অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।"

"অপরিচিত পথিকের নিকট আত্মপ্রকাশ না করিলে কি কোন রমণীর অপরাধ হয় ?"

"আমাকে হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। এতদিন আমি কোন সুযোগ পাই নাই। তাহার পর রাজাধিরাজের মৃগয়া-যাত্রার দিন ভিক্ষু উপগুপ্তের কৃত অপরাধের জন্য নগরপাল আপনাকেও বন্দী করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত নগরবাসী আপনার বিপদে অতি দুঃখিত হইয়াছিল। আপনার সুকৃতি বলে আপনি রক্ষা পাইয়াছেন।"

"আমি যে কেমন করিয়া কাহার অনু-রোধে অব্যাহতি পাইয়াছি, তাহা এখনো জানিতে পারি নাই। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়, তিনি আমাকে সর্ব্বদা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক অনুনয়ে, অনেকের অনুরোধেও প্রথম দিন তিনি আমাকে মুক্তি দেন নাই। তৃতীয় দিন কেন যে হঠাৎ আমার মুক্তিলাভ হইল, আমি তাহা এখনো জানিতে পারি নাই।"

"আপনি নিরপরাধী, ধর্ম্মপাল মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় শেষে আপনাকে মুক্তি দিয়াছেন। আপনার মুক্তিতে আমরা কত আনন্দিত হইয়াছি !—অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শেষে আজ অতি সাহসে

পত্র পাঠাইয়াছিলাম আমার সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।”

“ধৃষ্টতা!—তোমার মত গুণবতীর সদয় অনুগ্রহ। আমারও এক প্রার্থনা আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমি যে পরমসুখে বঞ্চিত ছিলাম, আজ হইতে যেন তাহার অধিকারী হইতে পারি। তোমার গৃহে অনেক জ্ঞানী এবং সুধী লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আমার মত অকিঞ্চিৎকর লোককেও তুমি তোমার গৃহে সময় সময় আসিবার অনুমতি দিয়া আমাকে আনন্দিত করিবে ?”

“আপনি আমার পরিচয় পাইয়াছেন, আমার সকল কথা শুনিয়াছেন ?”

“শুনিয়াছি।”

“কেহ কেহ এখানে আসিয়া থাকেন, আপনিও কি ভবিষ্যতে আসিবেন ?”

“আসিবার অনুমতি পাইলে পরম সুখী হইব।”

“এ গৃহের দ্বার আপনার নিকট সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে, যখন আপনার ইচ্ছা হইবে, আসিলে আমি নিজেকে অতি সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিব।”

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন ;—

“দেখিতেছি. সে দিনের সেই ঝড়বৃষ্টি-দুর্য্যোগেই আমার এই সৌভাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল।”

“সৌভাগ্য ত আমার!”

“উৎসবে তোমাকে দেখিয়া তুমিই যে সেই দুর্য্যোগ-রাত্রির বিপন্ন রমণী, তাহা বুঝিতে পারি নাই।”

মঞ্জুলার মুখও স্মিত প্রভাসিত হইয়া উঠিল। চিত্রা এবং চঞ্চলা কক্ষের একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চঞ্চলা পাশের ঘর হইতে একখানি থালা লইয়া আসিল। থালাখানি ফুল, ফুলের মালা, অগুরু-চন্দন এবং গন্ধচূর্ণে পরিপূর্ণ। মঞ্জুলা সেই থালা প্রমীতের পদপ্রান্তে রাখিয়া যুক্ত করে বলিল :—

“আমার এই সামান্য পূজা গ্রহণ করুন।”

প্রমীতসেন তরুণীর বাক্‌পটুতায় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন — “আপনি—তুমি এই অকিঞ্চিতের সম্মান শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছ।”

প্রমীতসেন সেই থালা হইতে চন্দন গ্রহণ করিলেন এবং একটী সুরভি মালা লইয়া তাহা মস্তক বেষ্টন করিয়া পরিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, রাত্রি হইল। প্রমীতের গৃহে ফিরিবার সময় হইয়াছে। মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চঞ্চলা আর একখানি থালা আনিল। থালার উপর সূক্ষ্ম ধৌত বস্ত্রের আচ্ছাদন, তাহার উপর অতি সুগন্ধি ফুল. ফুলের মালা ও চন্দন প্রক্ষেপ। চঞ্চলার হাত হইতে সেই থালা লইয়া মঞ্জুলা বলিল ;—

“সে রাত্রিতে আপনার গায়ের যে ওড়নি আমাকে দিয়া আমার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন, এই সেই খানি।”

আবরণ উন্মুক্ত করিয়া পুষ্পচন্দনসুরভি সেই ওড়নিসহ থালাখানি মঞ্জুলা প্রমীতের সম্মুখে স্থাপন করিল।

“একদিন ব্যবহার করিয়া আমি এই মহার্ঘ ওড়নির অবমাননা করিয়াছি, আপনি সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বাহক আজ ইহা আপনার গৃহে দিয়া আসিবে।”

“এই সামান্য বস্ত্র আপনার—তোমার

গাত্রস্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছে, আমি আর এ ওড়নি ব্যবহার করিবার অধিকারী নই। এখানি আপনার গৃহেই থাকুক।"

"আমার গৃহে থাকিবে অনুমতি করিতেছেন!—আমার গৃহে ইহা চিরদিন পুজিত হইবে।"

মঞ্জুলা তখন অতিনমিত মস্তকে প্রমীতকে নমস্কার করিল। তখন প্রমীত উঠিলেন। অপরকক্ষে মঞ্জুলার মাতাকে নমস্কার অভিবাদন করিয়া প্রমীতসেন বিদায় হইলেন। বাহক আলো জালিয়া তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া সঙ্গে চলিল।

প্রমীতসেন চলিয়া গেলে মঞ্জুলা পুনরায় সেই দ্বিতল কক্ষে প্রবেশ করিল। গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া গ্রহচন্দ্রতারকাখচিত নীলাকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন কেমন উন্মনা, মুখ যেন কেমন উচ্ছ্বসিত। মঞ্জুলা তারপর গৃহস্থ উজ্জ্বল দীপের নিকট দাঁড়াইয়া মুকুরে নিজের মুখচ্ছবি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। মুকুর রাখিয়া দিয়া পুষ্পদামে শ্লথ জড়িত সেই দীর্ঘ কৃষ্ণকুঞ্চিত কুন্তলরাশি অংসের উপর দিয়া বক্ষের দিকে আনিয়া হস্তদ্বারা যেন তাহার মসৃণ কোমলত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কেশরাশি পৃষ্ঠে সরাইয়া দিয়া আপনার অঙ্গুলিদাম, প্রকোষ্ঠ, বাহু, অংস—সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিল। শেষে নিঃসহ শরীরে শয্যায় শুইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিল, "অত কথা বলিয়াছি, তিনি আমাকে মুখরা মনে করিবেন

চঞ্চলা নীরবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, বিস্মিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল,—

"শুইয়া পড়িয়াছ! কেন, তোমার কোন অসুখ হইয়াছে?"

মঞ্জুলা চমকিত হইল, বলিল,—

"না, কিছুই হয় নাই!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রক্ষা-কবচ

এই স্থানে আমরা পূর্ব্ব কথা কিছু বলিব। পাঠক, মঞ্জুলা অথবা অলোকার বিশেষ পরিচয় এতক কিছুই পান নাই।

অলোকা এক ধনাঢ্য ভদ্র পরিবারের কন্যা। প্রথম বয়সেই তিনি বিধবা হন। তাঁহার চরিত্রও মন্দ হইয়া যায়। শ্বশুরকুল পরিত্যাগ করিয়া অলোকা তৎকাল-প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ধনী রাজকুটুম্ব বিশাখদত্তের গৃহে আসিয়া বাস করেন। এইখানেই তাঁহার কন্যা মঞ্জুলার জন্ম হয়। বিশাখদত্ত বিপত্নীক ছিলেন, মঞ্জুলাকে তিনি কন্যানির্ব্বিশেষে লালন পালন করেন। বিশাখদত্তের মৃত্যু হইলে অলোকা ও মঞ্জুলা অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু তাঁহাদের অভিভাবক কেহ ছিল না। বিশাখদত্তের পিতৃব্য-পুত্রী রাজ্ঞী কারুবকী বালিকাকে কাছে আনিয়া তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হন এবং প্রচ্ছন্ন রক্তসম্বন্ধে স্নেহার্দ্র হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। মঞ্জুলা জনকের গৃহে মাতার নিকটেই রহিল, কিন্তু মহারাজ্ঞীর স্নেহ এবং অনুগ্রহের পাত্রী বলিয়া সংসারে তাহার কোন অভাব রহিল না। উপযুক্ত গুরুর নিকট বালিকা লেখাপড়া, নৃত্যগীত এবং নানাবিধ ললিতকলায় সুশিক্ষিতা হইতে

লাগিল। রাজ্ঞী সময় সময় মঞ্জুলাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া লইয়া তাহার শিক্ষা এবং ব্যবহারের পরীক্ষা করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলোকার চরিত্রও সংশোধিত হইয়াছিল। সেকালে আর একালে অনেক প্রভেদ। একালের রূপজীবিনীরা সমাজে যেরূপ হীন, সেকালে সর্ব্বথা সেরূপ ছিল না। সেকালের কোন কোন নগর-শোভিনী উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া অটুট মানসম্ভ্রমের সহিত দিন কাটাইতে পারিত। শিক্ষিতা এবং ধনসম্পন্না হইলে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়েও তাহার মর্য্যাদা স্বীকৃত হইত। তাহার আমন্ত্রণে সমাজের অগ্রণীরাও তাহার গৃহে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এরূপ নগরশোভিনীরা গীতবাদ্য, নানাবিধ সুকুমার কলাবিদ্যা এবং বাক্‌চাতুর্য্যে ধনী মানী শিক্ষিত সমাজের চিত্ত বিনোদন করিত। অনেক সময় ইহাদের পুত্রকন্যা ভদ্রসমাজে বিবাহিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সমাজভুক্ত হইত। অলোকাও কালে সমাজে এইরূপ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

যৌবনোদ্গমে মঞ্জুলা অসামান্য রূপবতী হইয়া উঠিল। তাহার পাণিগ্রহণার্থীর অভাব ছিল না। তাহার শিক্ষা, চরিত্র, ব্যবহার, রূপলাবণ্য, ধনসম্পত্তি অনেকের চিত্ত প্রলুব্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অভিভাবিকা রাজ্ঞী তাহার বিবাহে করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিবেচনায় স্নেহ-পালিতা, রূপসী, ধনশালিনী মঞ্জুলার অনুরূপ বর মিলিয়া উঠিল না।

প্রমীতসেন বন্ধু অসঙ্গের মুখে অলোকা এবং মঞ্জুলার অনেক কথা শুনিয়াছিলেন।

সে দিন বাড়ীতে পৌঁছিতে প্রমীতসেনের অনেক রাত্রি হইল। এদিকে উৎপলা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কি আশঙ্কা, কেন আশঙ্কা, উৎপলা তাহা বিচার করেন নাই, তথাপি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। রাত্রিকালে একা একা নগরপথে চলা যদিও সকল সময় নিরাপদ নহে, তথাপি চোর-দস্যু প্রভৃতি দ্বারা যে স্বামীর কোন বিপদ ঘটিতে পারে, উৎপলার সে বিশ্বাস ছিল না। নগরে তিনি সুপরিচিত, বিশেষতঃ তিনি অপরিমিত শারীরিক বলশালী; হঠাৎ কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সাহস পাইবে না। সঙ্গে প্রলোভনের বস্তু কিছুই নাই, সুতরাং চোর-দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও কম। পথ-ঘাটও তাঁহার অপরিচিত নহে। কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, সঙ্গী প্রহরী অথবা বাহক কি অশ্ব সংগ্রহ তাঁহার পক্ষে অতি সহজ। তবে এই জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্তী রজনীতে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর আমন্ত্রণ, একাকী গমন, স্বচ্ছন্দ আলাপের অবসর—মনে করিতে উৎপলার মুখ লজ্জা-অভিমানে রক্তিমাভ হইল। না; সেরূপ কোন আশঙ্কা আসিতেই পারে না। স্বামীর প্রতি উৎপলার ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অসীম এবং অচল। কিন্তু মহার্ঘ মণিরত্ন অরক্ষিত অবস্থায় পথে ঘাটে ছড়াইয়া চোরদস্যুকে প্রলোভিত করা কি উচিত? অথবা প্রাণপ্রিয় আত্মীয় অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর—ডাকিনী কি মায়াবিনীর!—আহ্বানে একক পাঠাইয়া গভীর বিশ্বাস এবং অচলা শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে যাওয়াই কি সঙ্গত?—কি আশঙ্কা, কেনই বা আশঙ্কা, উৎপলা তাহার

বিচার করেন নাই, তথাপি তিনি বিষম উদ্বিগ্না হইলেন। এত বিলম্ব কেন?

বাড়ীতে পৌছিতে সে রাত্রিতে প্রমীতসেনের অনেক বিলম্ব হইল। প্রমীত অন্তঃপুরে পৌছিলে উৎপলা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কিগো, ঘর বাড়ী ভুলিয়া গিয়াছিলে না কি?"

"তাই ত! ঘর বাড়ী ভুলিয়া, কোন্ পথে, কোথায়, কাহার কাছে আসিয়া পৌছিলাম?"

"বটে?"—স্বামীর হাত ধরিয়া উৎপলা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"'উপকৃতা'র সঙ্গে দেখা হইল?"

"হইয়াছে।"

"কেমন লোক?"

"অপূর্ব্ব সুন্দরী।"

"তাহা ত অনেক দিন হইতেই জানি। কি নাম, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী?"

"শুনিবে?"

উৎপলা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"উপকৃতা—মঞ্জুলা!"

মঞ্জুলা! উৎপলা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

"মঞ্জুলা!—কেমন করিয়া জানিলে?"

"দেখিয়াই চিনিলাম। বৃষ্টি-দুর্য্যোগের দিন ইঁহাকেই দেখি, গতকল্য উৎসবে ইঁহাকেই দেখিয়াছি। ইনিই সেখানে গীত গাহিয়াছিলেন।"

উৎপলা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন;—

"তুমি কি জানিতে যে, মঞ্জুলাই 'উপকৃতা'?"

"আগে আর কেমন করিয়া জানিব?—মঞ্জুলাকে উৎসবে দেখিয়াছি, মঞ্জুলাই যে সে দিনের সেই উপকৃতা, তাহা ত আজ এই মাত্র জানিয়া আসিলাম।"

কে, কাহার কন্যা—তাহা শুনিয়াছ?"

"শুনিয়াছি।"

"কাহার নিকট শুনিলে?"

"অসঙ্গের নিকট শুনিয়াছি।"

"কি শুনিয়াছ?"

প্রমীত তখন অসঙ্গের নিকট শ্রুত মঞ্জুলার পরিচয়-সূচক অনেক কথা উৎপলাকে বলিলেন। শুনিয়া উৎপলার বিস্ময় বৃদ্ধি পাইল।

প্রমীত নিজ মস্তকে জড়ান সেই ফুলের মালা খুলিয়া তাহার লহর বিস্তার করিয়া অতি আদরে উৎপলার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। মহাসুরভি ফুলের মালা, কৌশলময় তাহার গাঁথনি। স্বামীর প্রণয়োপহারে উৎপলার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কোথায় পাইলে?"

"মঞ্জুলার পূজোপহার।"

উৎপলার শরীর শিহরিয়া উঠিল। নগরশোভিনীর ছদ্ম প্রেমোপহার! অথবা মন্ত্রসিদ্ধ গুপ্ত মোহনাস্ত্র? কিন্তু তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে সন্দেহ স্থান পাইল না। উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—

"অমন সুন্দরী, অমন মিষ্ট গায়িকার পূজায় ত চিত্ত হারাইয়া এস নাই?"

"এ চিত্ত হারাইবার ভয় নাই।—দিবা রাত্রি সুরক্ষিত!"

"এমন নিত্যজাগ্রত রক্ষাকবচ তোমার কি আছে?"

"তোমার পবিত্র মুখ।"

প্রমীত স্ত্রীর হর্ষ-প্রফুল্ল মুখ চুম্বন করিলেন।

"—তোমার স্ফুরদুজ্জ্বল চক্ষু!"

প্রমীত স্ত্রীর সত্তনিমীলিত মৃদু কম্পিত চক্ষু চুম্বিত করিলেন।

"—এ হৃদয়ে স্থির প্রতিষ্ঠিত প্রেমোজ্জ্বল তোমার মধুর মূর্ত্তি!"

উৎপলা উচ্ছ্বসিত গাত্রে স্বামীর বাহু বেষ্টন হইতে ছুটিয়া পলাইয়া কক্ষদ্বারের নিকট গিয়া বলিলেন;—

"মাধবী, মাধবী, আজ কি আমাদের আহারাদি হইবে না?"

সেদিন গভীর রাত্রিতে কি যেন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রমীত হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন;—

"অপূর্ব্ব সুন্দরী!"

পার্শ্বে শয়ানা উৎপলা সে শব্দে অর্দ্ধ-জাগরিত হইয়া নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কি বলিতেছ?"

প্রমীত নিদ্রিত!

উৎপলাও পুনরায় সুষুপ্তি লাভ করিলেন

(ক্রমশ।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

বৈদিক সাধনার আভাস

ইহার অনুবাদ ও তাৎপর্য্য

১। তৎকালে অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না; রজঃ অর্থাৎ পাতালাদি পৃথিব্যন্ত লোক সকল ছিল না, ব্যোমোপরি বিস্তৃত যাহা (অর্থাৎ দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত) তাহাও ছিল না। কি আবরণ করিবে? কোথায়? কাহার সুখদুঃখহেতু? গহন, গভীর অম্বুই কি ছিল?

তাৎপর্য্য:—তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে অসৎ ছিল না, কারণ জগতের মূলকারণ ছিল। প্রলয়কালে জগতের মূলকারণ না থাকিলে, পরে জগতের উৎপত্তি সম্ভবে না। সৎও ছিল না, কারণ সদ্রূপে অর্থাৎ পৃথক্‌সত্তাভাবে জগতের অস্তিত্ব ছিল না। এইরূপে জগতের সত্তা ও অসত্তা উভয়ই অঙ্গীকৃত হইল। সৎ ও অসৎ, ভাব ও অভাব, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, ইহারা বিপরীত পদার্থ, ভেদমূলক। ইহাদের একত্র অবস্থান পর্য্যন্ত সম্ভবে, যেমন—যেখানে একের সত্তা, সেখানে অন্যের অসত্তা। কিন্তু ইহাদের একত্ব কিরূপে সম্ভবে? একই পদার্থের নির্ব্যূঢ় সত্তা ও অসত্তা কিরূপে হইতে পারে? প্রলয়কালে হইতে পারে; কারণ, সদসদাত্মক ভেদ তখন ছিল না; ভেদ না থাকায় সত্তা বা অসত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। "অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না" বলিবার

ইহাই তাৎপর্য্য। সৎ ছিল না এই কথায় আশঙ্কা হইতে পারে যে,পারমার্থিকসত্তা ব্রহ্মও ছিল না। দ্বিতীয় ঋকের "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং," এই বাক্যদ্বারা এই আশঙ্কা নিরাকৃত হইতেছে। মায়ার পরিশেষ অর্থাৎ লয় হেতু তাহারই অনস্তিত্ব "সৎ ছিল না" এই বাক্যদ্বারা সূচিত হইয়াছে। বলিতে পার যে, ব্যবহারদশাতেও পরমার্থতঃ মায়ার অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা নাই, সুতরাং "তৎকালে" এই বিশেষণ অনর্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্যবহারদশায় পৃথিব্যাদি ব্যবহারিক সৎ পদার্থের অস্তিত্ব আছে। অতএব "সৎ ছিল না" এই নিষেধ পৃথিব্যাদির বর্ত্তমানকালে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেই জন্য ঋষি পুনরায় বলিয়াছেন যে, ...দি চতুর্দ্দশ ভুবনঃ ছিল না। অর্থাৎ ব্যবহার দশায় মায়ার পারমার্থিকসত্তা না থাকিলেও, পৃথিব্যাদিরূপে ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু তৎকালে প্রলয়কালে, মায়ার পারমার্থিকসত্তা ব্যবহারিক সত্তা উভয় সত্তাই ছিল না। ভাল, ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ডের আবরক আকাশাদি কি ছিল? না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডকে আবরণ করিয়া থাকে (বিষ্ণুপুরাণ, ১,২,৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য)। ঋষি প্রশ্নচ্ছলে এই সকল আবরকেরও অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছেন। কি আবরণ করিবে? আবার্য্য পদার্থ থাকিলে, তবেই ত তাহার আবরক থাকিতে পারে? যেখানে আবার্য্য ব্রহ্মাণ্ডই নাই, সেখানে আবরক বিয়দাদি থাকিবে কিসের জন্য? আবার, কোথায় আবরণ করিবে? কোন্ প্রদেশে অবস্থান করিয়া আবরক আবরণ করিবে? প্রলয়কালে আধারভূত এরূপ কোন দেশও ছিল না। আবার, কাহার সুখদুঃখ হেতু আবরণ করিবে? জীবগণের উপভোগার্থই সৃষ্টি। সৃষ্টি থাকিলেই ব্রহ্মাণ্ডের আবরক থাকে। সৃষ্টি না থাকিলে ভোক্তা জীবসকল লয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং কোন পদার্থের কেহ ভোক্তা থাকে না। এইরূপে আবরণের প্রয়োজনীয়তা লোপ পাইলে, আবরক থাকে না। সংক্ষেপতঃ, ঋষি বলিলেন যে প্রলয়কালে ভোগ্যপ্রপঞ্চ ও ভোক্তৃপ্রপঞ্চ—উভয়ই ছিল না। পুনশ্চ, আবরণসহ ব্রহ্মাণ্ডের অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে, অম্ভ অর্থাৎ জলেরও অনস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তথাপি ঋষি পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন, অম্ভই কি ছিল? ইহার কারণ কি? যে প্রলয়ের কথা বলা হইতেছে, ইহা ছাড়া অপর আর একরূপ প্রলয় আছে। প্রতি কল্পান্তে ব্রহ্মা নিদ্রিত হইয়া, এক কল্প পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন। ব্রহ্মার এই নিদ্রাকালে ভূ, ভুব, স্ব এই তিনলোক দগ্ধ হইয়া একার্ণব হইয়া যায়। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।৫।১; বিষ্ণুপুরাণ ১৩.২০-২৩ দ্রষ্টব্য।) এই প্রলয়কে নিষিদ্ধ করিবার জন্যই উক্ত প্রশ্ন। বর্ত্তমান সূত্রে ঋষি নির্দ্দিষ্ট প্রলয় এরূপ আংশিক একার্ণবী প্রলয় নহে। ইহাতে জলের অস্তিত্ব নাই।

২। সেই সময়ে মৃত্যু ছিল না, অমৃত অর্থাৎ অমরণও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রজ্ঞান ছিল না। স্বধার অর্থাৎ মায়ার সহিত এক সেই (ব্রহ্মঃস্ব) অবাতপ্রাণিত ছিল; তাহা হইতে অন্য পরকালীন কিছুই ছিল না।

তাৎপর্য্য :—প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া যে তাহার বিনাশক মৃত্যু ছিল, তাহা নহে; আর মৃত্যু ছিল না বলিয়া যে অমরণ ছিল, তাহাও নহে। অর্থাৎ সেই ভেদরহিত অবস্থায় মৃত্যু ও অমৃত্যু—ভেদমূলক এই দুই বস্তুই ছিল না। সর্ব্বজীবের পরিপক্ক কর্ম্মসকলের যখন ভোগ হইয়া যায়, তখন ভোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সেই সময়ে পরমেশ্বরের মনে জগৎ-সংহারের ইচ্ছা হয়। অনন্তর তিনিই মৃত্যুরূপে জগৎ সংহার করেন। অতএব প্রলয়কালে মৃত্যুরই বা স্থান কোথায় এবং তদভাবভূত অমৃত্যুরই বা স্থান কোথায়? জীবের ভোগের জন্যই মৃত্যু ও অমরণরূপ পরিবর্ত্তনের লীলা। ভোগ ফুরাইলে এই লীলাও ফুরায়। তখন রাত্রিও থাকে না, দিনও থাকে না, অর্থাৎ, অহোরাত্র, মাস, দিন, সংবৎসর প্রভৃতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কাল থাকে না। কালের কোলে জীব ক্রীড়া করে। কালে সে সুখী হয়, কালে দুঃখী হয়, কালে জন্মে, কালে মরে। এইরূপে জীবের সুখদুঃখহেতু কালের প্রয়োজন ও অস্তিত্ব। পুনশ্চ, সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়ই কালের হেতু। প্রলয়ে এই সকল হেতুর অভাবে কালের অভাব হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি কাল ছিল না, তাহা হইলে "তৎকালে সৎ ছিল না" এই কাল নির্দ্দেশ কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে, উপচারহেতু অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বা মায়াহেতু এই কালের নির্দ্দেশ। মানুষ যখন কোন বিষয়ের নিষেধ করে, তখন কাল সেই নিষেধের অবচ্ছেদক হইলেও মায়া ঐ অবচ্ছেদের হেতু। মায়ার অধীন জীব মায়ারহিত অবস্থার যথাযথ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, এবং জৈব ভাষাও মায়াজনিত কালকে বাদ দিয়া ঐ অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না। এইজন্য অবচ্ছেদকত্ব-রহিত অকাল-অবস্থাকেও কালবাচক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হয়। এইরূপে প্রলয়কালে আবরণসহ ব্রহ্মাণ্ড, মৃত্যু, অমৃত্যু ও কাল অর্থাৎ ভেদমূলক ও ভেদরূপী সমস্ত পদার্থই নিষিদ্ধ হইল। তাহা হইলে তৎকালে কি ছিল? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—সেই সকল বেদান্তপ্রসিদ্ধ এক ব্রহ্মতত্ত্ব ছিল। জীবের নিকট প্রাণই অস্তিত্বের নিদর্শন এবং প্রাণ বায়ুমূলক। ব্রহ্ম কি এইরূপ বায়ুমূলক প্রাণদ্বারা প্রাণিত ছিলেন? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—ব্রহ্মের অস্তিত্ব বায়ুর উপর নির্ভর করে না, তাঁহার প্রাণ অবাত অর্থাৎ বায়ুর অপেক্ষা রহিত। যদি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই ছিল, তবে জগৎকারণ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা মায়া কোথায় গেল? (স্বধা—মায়া। স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ত্ততে ইতি স্বধা। নিজেতে ধারণ বা আশ্রয় করিয়া যে থাকে সেই স্বধা বা মায়া বা প্রকৃতি।) মায়া সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত এক হইয়া অবিভক্তরূপে ছিল। ঋষির এই বাক্য দ্বারা মায়া বা প্রকৃতির সদ্রূপত্ব অর্থাৎ পারমার্থিক নির্ব্যূঢ় সত্তা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। বলিতে পার, মায়া যদি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াছিল, তাহা হইলে ব্রহ্মসত্তাকে অবাত-প্রাণিত বলিলে কিরূপে, এবং ব্রহ্মসত্তায় যখন মায়াসত্তা ছিল, তখন "সৎ ছিল না" এ কথাই বা বলিলে কিরূপে? এরূপ আশঙ্কা অমূলক; কারণ, ব্রহ্ম ও মায়াকে ভিন্নরূপে দর্শন-হেতুই

তাহাদের ঐক্যাবভাস হয়, একরূপে দর্শন করিলে মায়াংশের বিভিন্ন সত্তা থাকে না এবং ব্রহ্মেরই সত্তা প্রতিপাদিত হয়।

৩। তমঃ ছিল, এই সর্ব্ব (জগৎ) অগ্রে, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্‌কালে প্রলয়াবস্থায়, তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অনির্দ্দেশ্যরূপে লীন হইয়াছিল। তুচ্ছ তমঃ দ্বারা যাহা সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত ও তাহার সহিত একীভূত ছিল, তাহা তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য্য :—যদি প্রলয়কালে জগৎ না ছিল, তাহা হইলে পরে তাহা আসিল কিরূপে? কারক না থাকিলে ক্রিয়া হয় না, সুতরাং জায়মান জগতের জন্মক্রিয়ার কারক অবশ্যই ছিল। পুনশ্চ, কারক কারণের রূপান্তর মাত্র। অতএব জগৎসৃষ্টির প্রাক্‌কালে জগতের কারক বা কারণ থাকা অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ঋষি বলিতেছেন যে, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তমঃ ছিল এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ ঐ তমঃদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অপ্রকেত বা অনির্দ্দেশ্য বা অনির্বাচ্যরূপে তাহাতে লীন হইয়া ছিল। তমঃ অর্থে ভাবরূপ, অর্থাৎ সংস্কাররূপ, অজ্ঞান, আত্মতত্ত্বের আবরক অপর মায়া বা অবিদ্যা। ইহাই জগতের মূল কারণ, ইহার দ্বারাই জগৎ গঠিত এবং ইহাই জগৎ। প্রলয়কালে জগৎ নামরূপের দ্বারা বিস্পষ্ট ছিল না। পরন্তু তৎকারণ যে অজ্ঞান, তাহাতে তদ্রূপে লীন হইয়া ছিল। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্যক। দ্বিতীয় ঋকে বলা হইয়াছে যে প্রলয় কালে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব ছিল, মায়া সেই ব্রহ্ম-তত্ত্বের সহিত অভিন্নরূপে ছিল, এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ ছিল না। এতদ্দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, মায়া ও ব্রহ্মে ভেদ উৎপন্ন হইলে, পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হয়। মায়া ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি। এই শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকে তখন সৃষ্টি থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান্ পরমার্থতঃ এক হইলেও, শক্তি যখন ক্রিয়াশীল হয়, তখন উহাদের মধ্যে ব্যবহারতঃ ভেদ জন্মে। এইরূপে মায়া বা সৃষ্টিশক্তি বা প্রকৃতি যখন ক্রিয়াশীল হয়, তখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া উহা ব্যবহারতঃ প্রতীয়মান হয়। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন শক্তিমান্ হইতে তাহার ব্যবহারিক ভেদও থাকে না, কিন্তু সক্রিয় হইলে শক্তিমানের দেহে ব্যবহারিক ভেদ উৎপন্ন করে। এইরূপে শক্তিমানের দেহে যে সকল ভেদমূলক ভাব জন্মে, তাহা শক্তিমান্ হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন না হইলেও, ব্যবহারতঃ ভিন্ন বোধ হয়; যেমন—সমুদ্র ও বীচি। এইরূপে ভেদমূলক পদার্থের দুইটি সত্তা থাকে—একটি পারমার্থিক, অপরটি ব্যবহারিক। পারমার্থিক সত্তার উপাদান সেই শক্তিমান্, আর ব্যবহারিক সত্তার উপাদান শক্তি। পরিদৃশ্যমান জগতের পারমার্থিক সত্তার উপাদান ব্রহ্ম ও ব্যবহারিক সত্তার উপাদান মায়া বা প্রকৃতি। নামরূপাত্মক ভেদ উৎপন্ন করিয়া মায়া বা প্রকৃতি জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখায়। পঞ্চভূতাত্মক জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু ব্রহ্মপদার্থে এই যে পঞ্চভূতরূপ ভেদাত্মক উপলব্ধি ইহার উপাদান মায়া বা প্রকৃতি। এই ভেদাত্মক উপলব্ধি আবার প্রকৃতপক্ষে রূপের উপলব্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং রূপ আবরণ মাত্র। অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী এক

ব্রহ্মসত্ত্বই রূপ-রূপ আবরণ দ্বারা আবৃত হইয়া জগদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং মায়াই আবরণরূপে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভূত ব্যবহারিক জগতের উপাদান। এইজন্য ঋষি বলিয়াছেন যে, প্রলয়কালে তমঃ অর্থাৎ আবরণতত্ত্ব ছিল এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহাতে লীন হইয়া ছিল। পুনশ্চ, ব্রহ্মকে জগদ্রূপে দেখা, সৎপদার্থকে অসৎ বলিয়া ধারণা করা, অবিদ্যা বা অজ্ঞানজন্য হয়। সুতরাং এই অবিদ্যাই জগতের মূলকারণ ও উপরোক্ত আবরণতত্ত্ব। মায়াশক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া তাহার ভাবরূপ অবিদ্যাংশ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থের আবরক হয় ও জগদ্রূপ প্রকাশিত করে। মায়া বা প্রকৃতির এই যে অবিদ্যারূপ, ইহাকে অপরা মায়া বা অপরা প্রকৃতি বলে। মায়া বা প্রকৃতির অন্য রূপের নাম পরা মায়া বা পরা প্রকৃতি। ইহা বিদ্যা বা জ্ঞান। ইহার দ্বারা জীবের জগদ্রূপ ভ্রমের নাশ হয়, অবিদ্যা দগ্ধ হয় ও তৎফলে জগৎ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। অবিদ্যা যেমন তমঃ বা আবরণতত্ত্ব, বিদ্যা তেমনি সত্ত্ব বা প্রকাশতত্ত্ব। এই বিদ্যা ও অবিদ্যার লীলাই জগৎ-লীলা। পরস্পর বিবদমান হইয়া এই দুই তত্ত্ব লীলা করে। অবিদ্যা বিদ্যাকে পরাভূত করিলে ব্রহ্ম জগদ্রূপে প্রতীয়মান হয় ও বিদ্যা অবিদ্যাকে পরাভূত করিলে, জগৎ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মকে জগদ্রূপে উপলব্ধির নাম বন্ধন ও জগৎকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধির নাম মুক্তি। এইরূপে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে তমঃ বা অবিদ্যা বা আবরণতত্ত্ব জগতের ব্যবহারিক উপাদান ও জীবের বন্ধনস্বরূপ। ঋষি ইহাকে তুচ্ছ বলিয়াছেন; কারণ, ইহা ভ্রম উৎপাদন করে। যাহা ভ্রম উৎপাদন করে, তাহা কখনও মহৎ হইতে পারে না; কারণ, ভ্রমের নাশ অবশ্যম্ভাবী। অবিদ্যার তুলনায় বিদ্যা মহৎ; কারণ, পরিণামে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার পরাভব অনিবার্য্য কিন্তু অবিদ্যা তুচ্ছ হইলেও উহা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড এইরূপে তমঃ দ্বারা আবরিত হইয়া তাহার সহিত একীভূত অবস্থায় থাকে। এ কথা অগ্রেই বুঝাইয়াছি। অতঃপর ঋষি বলিতেছেন যে, এই কারণের সহিত একীভূত জগৎ-কার্য্য সৃষ্টিকালে তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। মায়াশক্তি ক্রিয়াশীল হইলে, জগৎ সৃষ্ট হয়। তমোরূপ কারণাকারে পরিণত, তমঃ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত জগৎ সত্ত্ব দ্বারা প্রকাশিত হইলে, তবে কার্য্যরূপে আবির্ভূত হয়। সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ করা—তমকে দগ্ধ করা; এইজন্য ঋষি ইহাকে 'তপঃ' আখ্যা দিয়াছেন। জ্বলনার্থক তপ্‌ ধাতুর উত্তর অস্‌ প্রত্যয় করিয়া তপস্‌ শব্দ হইয়াছে। যাহার দ্বারা অবিদ্যা বা তমঃ দগ্ধ হয়, তাহাই তপঃ। ভৌতিক অন্ধকার নাশ করে বলিয়া সূর্য্যের নাম তপন। মানসিক অন্ধকার বা অজ্ঞান নাশ করে বলিয়া সত্ত্বপ্রধান মানসিক ক্রিয়া বা পর্য্যালোচনার নাম তপঃ। তপঃ জ্ঞানময় (মুণ্ডকোপনিষৎ—১।১।৯), প্রকাশ-ধর্ম্মী সত্ত্বই জ্ঞান। অতএব তপঃ দ্বারা এখানে ক্রিয়াশীল সত্ত্বই উপলক্ষিত হইতেছে, যাহা আবরিত জগৎকে প্রকাশ করে। অতএব সত্ত্বকে এখানে 'তপঃ' আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টিকার্য্য স্রষ্টব্য পর্য্যা-

লোচনারূপ ক্রিয়াশীল সত্ত্ব দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই কথাই মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে; যথা,—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" (১।১।৮) অর্থাৎ ব্রহ্ম তপঃ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টিসমুন্মুখ হন। তুচ্ছ তমের তুলনায় ঋষি সক্রিয় সত্ত্ব বা তপকে মহৎ বলিয়াছেন। এই মহত্ত্ব-হেতু দর্শনশাস্ত্রে সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিতত্ত্বকে মহৎ নামে অভিহিত করা হয়।

৪। যেহেতু মনের সম্বন্ধী রেত, অর্থাৎ ভাবী প্রপঞ্চের বীজ, প্রথমে ছিল, সেই হেতু অগ্রে, অর্থাৎ বিকারজাত সৃষ্টির প্রাগবস্থায়, (পরমেশ্বরের মনে) কাম, অর্থাৎ সিসৃক্ষা, সঞ্জাত হইয়াছিল। সতের, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের, বন্ধুকে অর্থাৎ হেতুভূত কর্ম্মসকলকে, কবিগণ, অর্থাৎ ক্রান্তদর্শন অতীতানাগতবর্ত্তমানাভিজ্ঞ যোগিগণ, হৃদয়ে বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া অসতে, অর্থাৎ সদ্বিলক্ষণ অব্যাকৃত কারণে, নিষ্কর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ পৃথগ্‌রূপে, জানেন।

তাৎপর্য্যঃ—বুঝিলাম—তপ অর্থাৎ স্রষ্টব্য-পর্য্যালোচনা-রূপ সক্রিয় সত্ত্বদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়, কিন্তু সত্ত্ব জগৎসৃষ্ট্যর্থ কি জন্য সক্রিয় হয়? প্রলয়কালীন নিষ্ক্রিয় সত্ত্বকে সৃষ্টির প্রারম্ভে কে সক্রিয় করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন,—সৃষ্টির প্রারম্ভে কাম সঞ্জাত হইয়াছিল। কাম অর্থে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি রজোগুণের ক্রিয়া। এইরূপে মায়াশক্তিতে তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ ভিন্ন রজোগুণ অঙ্গীকৃত হইল। ফলতঃ দ্বিতীয় ঋকে ঋষি প্রলয়কালে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন মায়াশক্তির অঙ্গীকার করিলেন; তৃতীয় ঋকে পরিদৃশ্যমান জগতের কারণভূত আবরণতত্ত্ব তমোগুণের ও তমঃপরিপন্থী, প্রকাশধর্ম্মী, সৃষ্টিমুক্তির হেতুভূত সত্ত্বগুণের অঙ্গীকার করিলেন; এবং চতুর্থ ঋকে এই দুই গুণের প্রবর্ত্তক রজোগুণের অঙ্গীকার করিলেন। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃতিতত্ত্ব। অতঃপর পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে,—কাম সঞ্জাত হইল কেন? প্রলয়কালে রজোগুণ সুপ্ত ছিল, তমোগুণদ্বারা গূঢ় জগৎ তদ্রূপে লীন হইয়াছিল, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে রজোগুণ কেন জাগরিত হইল, কে তাহাকে জাগ্রত করিয়া সত্ত্বকে ক্রিয়াশীল করিতে প্রবৃত্ত করিল? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—প্রলয়ের পূর্ব্বকালীন সৃষ্টিবীজ প্রথমে প্রলয়কালেও ছিল বলিয়া প্রলয়ান্তে উহা রজোগুণকে জাগ্রত করে। দ্বিতীয় ঋকের তাৎপর্য্যে বলিয়াছি, সর্ব্বজীবের পরিপক কর্ম্মসকল যখন ভোগ হইয়া যায়, তখন ভোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়তা থাকে না বলিয়া প্রলয় হয়। আলোচ্য ঋকে উক্ত হইতেছে যে, প্রলয়কালে জগতের বীজ থাকে। এই বীজ জীবের সঞ্চিত অপরিপক কর্ম্ম। এই অপরিপক কর্ম্ম পরিপক হইলে, তাহার ভোগার্থ জগতের প্রয়োজন হয়, সুতরাং প্রলয়ান্তে সৃষ্টি হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে—এই বীজ কাহার এবং কোথায় অবস্থান করে? উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, ইহা মনের, এবং মনে অবস্থান করে। প্রলয়কালে মানস সংস্কাররূপে পরিণত এই বীজ বাসনা-শেষহেতু মায়ায় বিলীন সর্ব্বজীবান্তঃকরণে অবস্থান করে। তৎকালে জীবের ভোগ না থাকায় কাম বা বাসনা থাকে না, সুতরাং কর্ম্মসংস্কার সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় থাকে; কর্ম্মসংস্কার নিষ্ক্রিয় থাকায় মনের করণীয় কিছু

থাকে না, সুতরাং মন পরকালীন সৃষ্টির বীজস্বরূপ কর্ম্মসংস্কারসকলকে সংগ্রহ করিয়া মায়ায় লীন হয়। পরে যখন কর্ম্ম পরিপক্ক হওয়ায় সংস্কার জাগরিত হয়, মনে তখন বাসনা বা কামের উদ্রেক হয়—অর্থাৎ রজোগুণের ক্রিয়া হয়। অতঃপর রজোগুণ সক্রিয় হইয়া সত্বকে ক্রিয়াশীল করে। সত্ব ক্রিয়াশীল হইয়া স্রষ্টব্যপর্য্যালোচনাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করে। এইরূপে আত্মার গুণাধারত্ব প্রত্যাখ্যাত ও নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইল। জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম পরিপক্ক হইলে, ব্রহ্ম-তত্ত্বের মায়াশক্তি তাঁহারই বিধানানুসারে স্পন্দিত বা ক্রিয়াশীল হয়, প্রবুদ্ধ কর্ম্মসংস্কার সকল মনস্তত্ত্বকে ক্ষোভিত করিয়া বাসনা বা কামের উদ্রেক করে এবং কাম উদ্রিক্ত হইলে অর্থাৎ ভোগের প্রয়োজন হইলে ভোগ্য জগৎ সৃষ্ট হয়। এই যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া ইহার বিধাতা সেই সকলবেদান্তবেদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব পর-মাত্মা যিনি এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ। পরমেশ্বর-রূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্যময় পরমাত্মা জীবের কর্ম্মফল প্রদান করেন এবং তদ্ধেতু জগৎ সৃষ্টি করেন। সাধারণ দেহী যেমন ইচ্ছামত নিজের দেহগত শক্তিসকলকে চালনা করে, সেইরূপ পরমেশ্বর মায়াকে পরিচালন করিয়া জীবের ভুক্তি-মুক্তি বিধান করেন। জগৎ কর্ম্মানুসারে মায়ার অধীন সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম। মায়া পরমে-শ্বরের অধীন, সুতরাং পরমেশ্বর সৃষ্টি-কার্য্যে অক্ষম। প্রলয়ান্তে যখন সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন এই সর্ব্বসাক্ষী চৈতন্যময় পরমাত্মা নিজেকে স্রষ্টারূপে কল্পনা করিয়া, মায়াকে আত্মদেহে প্রবুদ্ধ করিয়া, ভোগ্য-প্রপঞ্চ ও ভোক্তৃপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বর দেহে পরমেশ্বরের অধীনে এই যে মায়ার প্রবোধন, ইহাকেই বলে পরমেশ্বরের সিসৃক্ষা। সাধারণ বদ্ধজীবের ইচ্ছা যেমন তাহার নিজের কর্ম্মানুগত, পরমেশ্বরের এই ইচ্ছা তেমন তাঁহার নিজের কর্ম্মানুগত নহে; কারণ, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন নাই। পরন্তু এই ইচ্ছা নিখিল জীবের কর্ম্মানুগত; নিখিল জীবের কর্ম্ম তাঁহার বিধানানুসারে ক্রিয়াশীল হইয়া মায়াশক্তিতে মনস্তত্ত্বে যে ক্ষোভ উৎপন্ন করে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। নিখিল জীবের মনের সমষ্টিই তাঁহার মন এবং নিখিল জীবের মনে যে সকল কামের উদয় হয়, তাহার সমষ্টিই তাঁহার কাম। প্রভেদ এই যে, জীব মনের ও কামের অধীন, তিনি মনের ও কামের ঈশ্বর। জীব স্বীয় কর্ম্মদ্বারা সৃষ্টি করিলেও তাহার স্বরূপ অবগত নহে; পরমেশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন এবং একমাত্র তিনিই ইহার স্বরূপ অবগত আছেন। সূক্তের শেষ ঋকে ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

সৃষ্টিব্যাপারে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া ঋষি দেখাইলেন যে কর্ম্মই সৃষ্টির মূল কারণ। অতঃপর প্রশ্ন হইতে পারে, কর্ম্মের মূল কি? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, কর্ম্মের মূল অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয়, বুদ্ধির—তথা বিচারের—অনধিগম্য। কিন্তু এই জগৎ-কারণের কারণান্তর বুদ্ধির অগোচর হওয়ার দরুণ যে উহা শশবিষাণবৎ অসত্য, তাহা নহে। কর্ম্মের জগৎকারণত্ব অর্থাৎ কর্ম্ম যে সৃষ্টির বীজরূপে মায়াতে অবস্থান করে, ইহা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। এই শ্রুতিপ্রমাণ যথেষ্ট হইলেও ঋষি তদতিরিক্ত

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন, পাছে কোন নাস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রুতিপ্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ম্মের জগৎকারণত্বে অবিশ্বাসী হয়। যথা,—ত্রিকালদর্শী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিগ্রহপূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি সম্যক্ জাগরিত করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে অব্যাকৃত কারণে, অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে, প্রকৃতির বিকৃতিস্বরূপ দৃশ্যমান জগতের হেতুভূত কর্ম্মসকলকে বিশুদ্ধ সত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। উপনিষদে এই মূলপ্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য অব্যক্তের লক্ষণ করিয়াছেন, "সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতং অব্যাকৃতনামরূপং সতত্ত্বং সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তিসমাহাররূপং অব্যক্তং" (কঠ ৩।১১ ভাষ্য), অর্থাৎ সমস্ত জগতের বীজভূত সমস্ততত্ত্বময় অনভিব্যক্ত নামরূপাত্মক সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তির সমষ্টিস্বরূপ পদার্থ অব্যক্ত। ঔপনিষদিক এই অব্যক্ত শব্দটি আকৃতিতে ও অর্থে ঋকের অসৎ শব্দেরই অনুরূপ। সৎ শব্দে নামরূপাত্মক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক পদার্থ বুঝায়, সুতরাং অসৎ শব্দে অব্যাকৃত মূলপ্রকৃতি বুঝায়। সত্তা ও ব্যক্ততা সমানার্থবাচক, সুতরাং অসৎ ও অব্যক্তও একার্থবাচক।

৫। এই সকলের, অর্থাৎ সৃষ্টির অবিদ্যাকামকর্ম্মরূপ হেতুসকলের, রশ্মি কি (প্রথমে) তির্য্যগ্‌ভাবে, অর্থাৎ মধ্যে, বিস্তৃত হইয়াছিল, অথবা অধোদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, অথবা উপরে বিস্তৃত হইয়াছিল? রেতোধাসকল, অর্থাৎ বীজভূত কর্ম্মের বিধাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব সকল, হইয়াছিল এবং মহৎ সকল, বিয়দাদি ভোগ্যসকল হইয়াছিল। স্বধা, অর্থাৎ ভোগ্যপ্রপঞ্চ, নিকৃষ্ট এবং প্রযতিতা, অর্থাৎ ভোক্তা, উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ ভোগ্যপ্রপঞ্চ ভোক্তৃপ্রপঞ্চের পরে সৃষ্ট হইয়াছিল।

তাৎপর্য্য :—"অসৎ ছিল না" এতদ্দ্বারা প্রলয়কালে অবিদ্যার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে; "অগ্রে কাম সঞ্জাত হইয়াছিল," এতদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে কামের উদ্ভব উক্ত হইয়াছে; এবং "মনের সম্বন্ধি রেত প্রথমে ছিল", এতদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বিয়দাদি ভূত সকল এই অবিদ্যাকামকর্ম্মরূপ হেতুসকল হইতে সৃষ্টিকালে উদ্ভূত হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে ইহারা কিরূপ পর্য্যায়ে, কত সময়ে, কোন্ দেশের পর কোন্ দেশ অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়? ইহার উত্তরে ঋষি প্রশ্নচ্ছলে বলিতেছেন—বিয়দাদি ভূতসকল সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অতি শীঘ্র নিমিষের মধ্যে একেবারে সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত করিয়া উৎপন্ন হয়। গুণানুসারে ভূতসকল পর পর পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভূত হয়; যথা,—আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। কিন্তু এই ক্রমানুযায়ী উৎপত্তি বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হওয়ায়, প্রথমে কোন্ ভূত কোন্ দেশে উৎপন্ন হইল, তাহার নির্দ্দেশ হয় না। এইরূপে অতিশীঘ্র সর্ব্বদিকে ভূতসৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়। এখন দেখা যাউক, এ পর্য্যন্ত সৃষ্টিকার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল। প্রলয়কালে মূলপ্রকৃতি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন অবস্থায় ছিল। অতঃপর সৃষ্টির প্রাক্কালে "তপের মাহাত্ম্যদ্বারা জগৎ উৎপন্ন হয়" এই

বাক্যদ্বারা প্রকৃতির ব্রহ্ম হইতে দ্বৈতভাবে সত্ত্বরজস্তমের ক্রিয়াশীল অসাম্য অবস্থার উৎপত্তি সূচিত হইয়াছে। তৎকালে মূলপ্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপত্ব ছাড়িয়া জগতের আদিকারণ অসৎ বা অব্যক্তরূপে আবির্ভূতা হন। এইরূপে অব্যক্তের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়া ঋষি ব্যক্ত বিয়দাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। অতঃপর ঋষি বলিতেছেন—ভোক্তা জীবসকল ও ভোগ্য বিয়দাদি সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ভোগ্যের অগ্রে ভোক্তার সৃজন হইয়াছিল। সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন আত্মাই কর্ম্মের বিধাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব। এই সূক্ষ্মদেহ মহত্তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পর্য্যন্ত তত্ত্বদ্বারা গঠিত। অতএব সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের সৃষ্টি হইতে পারে না; এবং জীবের সৃষ্টি না হইলে ভোগ্য স্থূল পঞ্চভূতের অপ্রয়োজন বিধায় সৃষ্টি হইতে পারে না। আলোচ্য ঋকে ঋষি সৃষ্টির এই পর্য্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—অগ্রে সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি, তৎপরে জীবের সৃষ্টি, তৎপরে স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি। সূক্ষ্মভূতসকলকে ঋষি রশ্মি বলিয়া তাহাদের সূক্ষ্মত্ব সূচিত করিয়াছেন এবং স্থূলভূতসকলকে মহৎ বলিয়া তাহাদের স্থূলত্ব সূচিত করিয়াছেন। স্বধা প্রকৃতির নাম। প্রকৃতি জীবের ভোগ্যরূপে আবির্ভূত হন বলিয়া স্বধা শব্দে ভোগ্য প্রপঞ্চ বুঝায়।

৬। এই পরিদৃশ্যমান বহুপ্রকারের সৃষ্টি কি উপাদানকারণ হইতে ও কি নিমিত্তকারণ হইতে জাত, তাহা কে যথাযথভাবে জানে এবং এখানে, অর্থাৎ এই জগতে, কেই বা তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিতে পারে? দেবগণ এই জগতের বিবিধ সৃষ্টির পশ্চাজ্জাত। অতএব যাহা হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা কে জানে?

তাৎপর্য্য:—উপরে ঋষি ভোক্তৃভোগ্যরূপে নিখিল সৃষ্টির ক্রম সংক্ষেপে দেখাইলেন। অতঃপর ঋষি প্রশ্নচ্ছলে বলিতেছেন যে, এই বিশাল ও বিচিত্র জগতের সৃষ্টির কার্য্যকারণসম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কেহই জানে না ও জানিতে পারে না। ভূত-ভৌতিক-ভোক্তৃ-ভোগ্যাদিরূপে এই বহুপ্রকার সৃষ্টির উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এমন কি, দেবতারাও এই কার্য্যকারণসম্বন্ধবিষয়ে অনভিজ্ঞ; কারণ, তাঁহারা সৃষ্টির আদিতে ছিলেন না; পরন্তু ভূতসৃষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছেন। বেদসংহিতায় দেবগণকে দ্যাবাপৃথিবীর অর্থাৎ দ্যুলোক ও পৃথিবীর সন্তান বলা হইয়াছে। ["যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হবং।" (১০-৬৩-২)। অর্থাৎ যে সকল দেবতা দ্যুলোকে অপ্‌সকল অর্থাৎ অন্তরীক্ষ হইতে জন্মিয়াছেন, এবং যাঁহারা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।] সুতরাং দ্যাবাপৃথিবীর যাঁহারা সন্তান, তাঁহারা দ্যাবাপৃথিবীর—তথা সমগ্র বিচিত্র সৃষ্টির—বিস্তারিত কারণ কিরূপে যথাযথভাবে অবগত হইবেন? আর দেবগণই যদি অবগত না হইলেন তাহা হইলে আর কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? কেহই পারে না।

৭। যাঁহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি জন্মিয়াছে, তিনিই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন অথবা যদি না করিয়া থাকেন। যিনি ইহার

অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত তিনিই যদি জানেন অথবা যদি না জানেন।

পূর্ব্ব প্রশ্নের অনুবর্ত্তন করিয়া ঋষি বলিতেছেন,—সৃষ্টির কারণ জীব যে কিছুতেই যথাযথভাবে জানিতে পারে না, তাহার হেতু এই যে, যে পরমাত্মা হইতে জগৎ জন্মিয়াছে, অর্থাৎ যে পরমাত্মা জগতের উপাদানকারণ, এবং যে পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ যে পরমাত্মা জগতের নিমিত্তকারণ, সেই পরমাত্মাকে কেহই জানিতে পারে না। তবে একজন আছেন, যিনি এই জগতের কারণ পরমাত্মা বিষয়ে অবগত আছেন। ঈশ্বর যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, ও ব্যোমে অধিষ্ঠিত তিনিই এই বিশিষ্ট জ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন জগৎকারণের জ্ঞাতা আর কেহই নাই। এই ঋকে ঋষি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণের একত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (ক্রমশ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজকালকার দিনে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ বেতনভোগীর কর্ত্তব্য কর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অফিসের কাজের সঙ্গে হৃদয়ের কোন যোগ নাই। বরঞ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমরা বুঝিয়াছি যে, কার্য্যের মধ্যে হৃদয়কে আনিলে কাজের ব্যাঘাত হয় মাত্র। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাজের সম্বন্ধ প্রেমভক্তির দ্বারা মধুর ও সজীব হইয়া উঠিত; আজ আমরা তাহা হারাইয়া ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি, সে বিচারের দিন এখনও আসে নাই। তবে এখন আমরা মানুষকে ভুলিয়া প্রণালীকে, প্রীতিকে ছাড়িয়া বিধিকে গ্রহণ করিয়াছি, তাই চাকরীর দীনতার কলঙ্কই আমাদের ভূষণ হইয়াছে।

সংসারচন্দ্র যখন নবীন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন, তখন দিনকাল অন্যরূপ ছিল। তিনি একাধারে মহারাজের শিক্ষক, মন্ত্রী, বন্ধু এবং রক্ষক হইলেন। তিনি প্রত্যূষে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সমস্ত দিন তাঁহার সকল কর্ম্মে সহায়তা করিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর আহারাদিও একত্রে হইত, তার পর রাত্রে আহারাদির পর মহারাজ শয়ন করিলে, সংসারচন্দ্র গৃহে ফিরিতেন। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সংসারচন্দ্র মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি যে কেমন করিয়া এই রাজপুত যুবককে তখনকার কুসংস্কার এবং প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়া হিন্দুর পুরাতন ধর্ম্ম, আচার, প্রথা ও কীর্ত্তি বজায় রাখিয়াও তাঁহাকে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন, কেমন করিয়া নিজের চরিত্রবলে ধীরে ধীরে এই নবীন নরপতির চরিত্র গঠন করিয়া এই সুবৃহৎ রাজ্যের প্রজাপালন, সুবিচার এবং উন্নতির জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন—তাহা এখন কেবলমাত্র মহারাজের কার্য্যকলাপ আলোচনার দ্বারাই বুঝিতে

পারা সম্ভব। জয়পুরের মত বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্যের অধিপতির প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ যে কত কঠিন, কত দায়িত্বপূর্ণ এবং কতটা জটিল, তাহা যাঁহারা দেশীয় রাজ্যের সংস্রবে না আসিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। যিনি বিশেষভাবে রাজার চরিত্র, মনের গতি এবং কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব নহে। নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রাখিয়া যিনি রাজা ও রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজাকে নিয়মিত করিতে পারেন, যিনি নিজের স্বার্থকে রাজ্যের স্বার্থে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করিতে পারেন, যিনি লোকচরিত্রজ্ঞ, দূরদর্শী এবং ধৈর্য্য ও কৌশলের সহিত প্রভুর হিতসাধনপ্রয়াসী, তিনিই আদর্শ প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। সংসারচন্দ্র বিশ বৎসর ধরিয়া বিবিধ স্বার্থসংঘাতের মধ্য দিয়া আপনা ভুলিয়া ছায়ার ন্যায় মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন, এই বিশ বৎসরে মহারাজ যে সকল রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—তার সঙ্গে সংসারচন্দ্রের যোগ লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে—তিনি এমনি করিয়াই আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিদিনের জলবায়ু যেমন করিয়া মনুষ্যশরীরকে গঠন করে, তেমনি করিয়া তিনি নিজ চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই জন্য এ সময়ে আমরা রাজকার্য্যে প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। মানবজীবনে বিশ বৎসরকাল সামান্য বলিতে পারা যায় না। সংসারচন্দ্র যৌবনের উত্তম এবং সৎসাহস লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বিশ বৎসর তাঁহার জীবনের তপস্যার কাল, যাহার ফলে তিনি ভবিষ্যতে রাজাপ্রজা সকলের হিতসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রাজপুতানা এবং রাজপুতগণের ইতিবৃত্তের সহিত, তাঁহাদের আচারব্যবহার, তাঁহাদের প্রকৃতি এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যে সকল প্রথা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে সকলের সহিত সংসারচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও অভিজ্ঞতা তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে লোককে আশ্চর্য্য করিত, তাহাও তাঁহার জীবনের এই সাধনার সময়ে উপার্জ্জিত। তিনি শুধু শিক্ষা দেন নাই, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসের সংস্রবে এবং উপদেশে মহারাজ মাধোসিংহ হিন্দুধর্ম্মে পরম আস্থাবান্। মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা এবং তীর্থভ্রমণ, মহারাজ হিন্দুর জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। সংসারচন্দ্র এই সকল ধর্ম্মকার্য্যে প্রধান সহায়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গঙ্গোত্রী ও গোমুখী তীর্থ দর্শন করিতে মনস্থ করিয়া সংসারচন্দ্রকে উক্ত তীর্থে যাইবার রাস্তা প্রভৃতি দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংসারচন্দ্র যে কষ্ট তুচ্ছ করে প্রথম গঙ্গোত্রী গমন করেন—তাহার বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার নিজ লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মুসৌরী হইতে ঘোড়া, ঝাম্পি এবং কুলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা গঙ্গোত্রী যাত্রা করেন। পথে স্থানে স্থানে কোথাও বা ধর্ম্মশালায়, কোথাও বা পাহাড়িয়াদিগের কুটীরে এবং অধিকাংশ সময়ে অনাবৃত স্থানে কাটাইতে হইত। সংসারচন্দ্র যখন যে বিষয়ের ভার লইতেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারে সুসম্পন্ন করিতে ঐকান্তিক যত্ন করিতেন,

সে বিষয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। গঙ্গোত্রীর পথে যেখানে যেখানে থাকিবার সুবিধা এবং পথে কি কি প্রয়োজন হইতে পারে, আহার্য্যদ্রব্যের মূল্যাদি, কুলী-ভাড়া, পথের বিবরণ, গ্রাম, নদী, পাহাড় প্রভৃতির নাম—সমস্তই তাঁহার দিনলিপিতে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীর কোন জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিন মাস পরে তিনি জয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। যে বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর নানাপ্রকার পরিশ্রম করিয়াও অটুট ছিল, এই গঙ্গোত্রী যাত্রাতে তাহাতে রোগ প্রবেশ করিল। সঙ্গের লোকেরা তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং নির্ভীকতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত; মহারাজের কাজে তাঁহাকে যে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কদাচ মুখে আনিতেন না। কর্ত্তব্যকর্ম্মে আত্মত্যাগ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, নিজের কোন সুবিধা অসুবিধা তিনি কখন গণনা করেন নাই। কি রাজ্যের হিতকর কার্য্যে, কি ধর্ম্মকর্ম্মে, কি আনন্দ-উৎসবে বা শিকারে, সংসারচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে বিশ বৎসরকাল মহারাজের সাহচর্য্যে কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু কখনও নিজের কর্ত্তব্যপথ হইতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হ'ন নাই, মহারাজের হিতচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য তিনি মনে স্থান দেন নাই। তাই মহারাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শুধু কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। একদিকে শ্রদ্ধা, নির্ভরতা ও হৃদয়ের আকর্ষণ এবং অন্য দিকে স্নেহ, প্রীতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—এই মণিকাঞ্চন-সংযোগে এ সম্বন্ধ পরম আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। তাই উত্তরকালে অম্বরাধিপতির মহিষী মহারাণী যাদোনজী সংসারচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীকে মাতৃ-সম্বন্ধে সম্মানিত করিয়া "রাখী" বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

মহারাজ সবাই মাধোসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করার তিন মাস পরে সংসারচন্দ্র প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মন্ত্রিপদে বৃত হয়েন। তাঁহার জীবনী বুঝিতে হইলে, এই বিশ বৎসরের জয়পুররাজ্যের একটা মোটামুটি বিবরণ জানা আবশ্যক। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ইহা সুবিখ্যাত সচিবপ্রবর স্বর্গীয় রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের মন্ত্রিত্বকাল। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এ জীবনবৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র প্রথমে জয়পুর স্কুলের প্রধানশিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া আসেন; পরে যখন উক্ত স্কুল 'মহারাজ-কলেজে' পরিণত হইল—তখন তিনি তাহার অধ্যক্ষ হয়েন।

গবর্ণমেণ্টের সহিত যখন সম্বরহ্রদের স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব চলিতেছিল, সেই সময় ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও নির্ভীকতা স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাজ রামসিংহ বরোদাধিপতি মহারাজ সয়াজী গায়কোয়াড়ের মোকদ্দমায় অন্যতম বিচারকের পদে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৃত হ'ন, তখন তাঁহার রায় প্রকাশকালে তাঁহার তদানীন্তন প্রাইভেট সেক্রেটারীকৃত অনুবাদ মহারাজের

মনোমত না হওয়ায়, তিনি কান্তিবাবুকে অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই সময়েই মহারাজ তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ দক্ষতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হ'ন। তাহার ফলে জয়পুরে ফিরিয়া তিনি কান্তিবাবুকে কৌন্সিলের অন্যতম সদস্যের পদে নিযুক্ত করেন।

মহারাজ রামসিংহের স্বর্গারোহণের এবং বর্ত্তমান মহারাজের সিংহাসন প্রাপ্তির পরেও কিছুকাল কান্তিবাবু মন্ত্রিসভার সাধারণ সদস্যের পদেই নিযুক্ত থাকেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাজ দ্বাবিংশবর্ষে পদার্পণ করেন এবং রাজত্বের পূর্ণ শাসনভার প্রাপ্ত হ'ন, তাহার পর হইতেই কান্তিবাবু ক্রমে ক্রমে প্রধানমন্ত্রিপদে উন্নীত হ'ন এবং ১৯০১ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত অসাধারণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। বর্ত্তমান মহারাজের রাজত্বকালের বিবরণের মধ্যে এই সুদক্ষ মন্ত্রীর কৃতকার্য্যের ইতিবৃত্ত পাওয়া যাইবে বিবেচনায়, পৃথক্ ভাবে দেওয়া বাহুল্য মনে করি। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র যখন মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন, তখন শাসনপ্রণালীর মধ্যে যে প্রকার বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অবিচার এবং স্বার্থ-প্রণোদিত চক্রান্ত বর্ত্তমান ছিল, তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম স্থাপন করিয়া যে সকল প্রজাহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং দেশীয় রাজ্য সকলের মধ্যে জয়পুরকে যে প্রকারে উন্নতির পথে অগ্রণী করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র নিজের প্রতিভা ও দক্ষতায় যেমন রাজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, জয়পুরাধিপতি এবং গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান শ্রেণীর তাজিমী সর্দ্দার মধ্যে গণ্য করিয়া জায়গীর প্রদান করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধি দান করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ এই প্রতিভাশালী কর্ম্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে "বিদ্যাগুরু" পদে বরণ করিয়া যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সিংহাসনপ্রাপ্তির পর মহারাজ মাধো সিংহের কিষণগড় ও রাংধাড়া এই দুই রাজ্যের রাজকুমারীর সহিত শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর ১৮৮১ সালে মহারাজ বোম্বাই, কলিকাতা, গয়া প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসেন। এই বৎসর আগষ্ট মাসে জয়পুরে ইকনমিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়ম্ (Economic and Industrial Museum) নাম দিয়া এক শিল্পশালা স্থাপিত হয়। ইহারই অনুবৃত্তি ও পোষকতায় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে জয়পুর-শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইল। দেশীয় রাজ্যে ইহা এক অভিনব অনুষ্ঠান। "রাজ্যমধ্যে এবং রাজ্যসীমান্ত প্রদেশে কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কি কি শিল্প প্রচলিত আছে, তাহা জানা এবং তৎসমুদয় একত্র করিয়া শিল্পীদিগকে উৎসাহ দিয়া স্থানীয় শিল্পের উন্নতিবিধান এবং জনসাধারণের শিক্ষাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।" কান্তিচন্দ্র ও সংসারচন্দ্র উভয়েই জয়পুর মিউজিয়ম্ সমিতির সভ্য ছিলেন

এবং ইঁহাদের বহু পরিশ্রমের ফলে এই শিল্প-সমিতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শিল্পপ্রদর্শনীর দ্রব্যাদি পরে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) নবনির্ম্মিত এলবার্ট হলে রক্ষিত হয়।

স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহ রাজ্যের ও প্রজার হিতকল্পে যে সকল সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মহারাজ মাধোসিংহ সে সকল সযত্নে রক্ষা এবং তৎসমুদয়ের উন্নতিবিধান করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে জয়পুর বর্ত্তমানে রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুর কলেজে এফ্ এ শ্রেণী খোলা হয়; তারপর ১৮৮৮ সালে ইহাতে বি এ এবং ১৮৯৬ সাল হইতে এম্ এ, বি, এস্ সি, এম্ এস্ সি পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইতেছে। সংস্কৃত কলেজেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে বহু ছাত্র এই কলেজ হইতে কাশী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। কলেজের সংস্রবে আরবিক ও পারসিক ভাষা শিক্ষার জন্য পৃথক্ বিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত জয়পুরে শিল্প-বিদ্যালয় এবং রাজ্যের নানা স্থানে প্রাথমিক ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

রাজপুতানার ন্যায় প্রদেশে কেবল মাত্র বৃষ্টির জলই কৃষকের ভরসা। অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইলে প্রজার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। প্রজাপালক মহারাজ জয়পুরের এই দুঃখ নিবারণের জন্য প্রায় অর্দ্ধকোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাজ্যের নানা স্থানে সুবৃহৎ বাঁধ বাঁধিয়া তাহা হইতে জলপ্রণালী কাটাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধা এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯৮ সালে জয়পুর রাজ্যে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়; সে সময় মহারাজ প্রজারক্ষার্থে অকাতরে রাজকোষ খুলিয়া দিয়াছিলেন। রাজ্যের নানাস্থানে বুভুক্ষু প্রজার জন্য অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল। সে সময় মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্র হইতে নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই কেবলমাত্র ক্ষুধার্ত্তের আহার দান এবং পীড়িতের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—রাজ্যের অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া প্রজাবৎসল মহারাজ এই দুর্দ্দিনে তাঁর পুত্রোপম প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের উৎসাহ অন্যের মনে সঞ্চারিত করা কান্তিচন্দ্রের এক প্রধান শক্তি ছিল—তাই সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই দুর্ভিক্ষ-নিবারণ-ব্যবস্থা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কান্তিবাবুকে "দুর্ভিক্ষ কমিশনের" সদস্য নিযুক্ত করেন। নিজ রাজ্যে দুর্ভিক্ষে প্রজার অবস্থা দেখিয়াই করুণহৃদয় মহারাজ সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এক ধনভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রথমে ষোল লক্ষ টাকা দান করেন এবং ক্রমে ক্রমে আরও ১০।১২ লক্ষ টাকা এই ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

মোগলসম্রাটদিগের সময় হইতে কি ভারতে কি বিদেশে জয়পুরের রাজগণ বরাবর সম্রাট্দিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ ভগবান দাস, মহারাজ মানসিংহ ও জয়সিংহের কীর্ত্তি ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে প্রচার করিতেছে।

মহারাজ রামসিংহও সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজভক্ত মহারাজও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণে নিজরাজ্যে Imperial Service Transport Corps স্থাপন করিয়াছিলেন। এই Transport Corps ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে টিরা প্রভৃতি অভিযানে ভারত-গভর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া ইহার কার্য্যকারিতার পরিচয় দিয়াছে।

সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্বকালে সম্যক্ বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান মহারাজের ও তদীয় রাজত্বকালের একটা ধারাবাহিক বিবরণ জানা দরকার, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের অবতারণা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ সন পর্য্যন্তের ইতিহাস মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্রের সহিত জড়িত। তাই সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব-প্রাপ্তি পর্য্যন্তের একটা মোটামুটি বিবরণ এ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হইল মাত্র; বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়া এ স্থানে সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

"এষা"

(২)

জীবন-মরণের সমস্যা মানব সমাজে নূতন নয়। চিরদিনই মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দিশাহারা হইয়াছে। জীবনের প্রহেলিকাও ভেদ করিতে পারে নাই, মৃত্যুর মর্ম্মও উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই। বর্ব্বর সাধনার শৈশব-কল্পনা এ পারের ছবিগুলিকে পরপারে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা পরলোক রচনা করিয়া লইত, এবং সে লোকের যাত্রীদের সঙ্গে তাহাদের নিত্যব্যবহার্য্য অস্ত্র শস্ত্রাদি, ক্রমে গোমেষাদি এবং পরে তাহাদের দাসদাসী, এমন কি জীবন সঙ্গিনীদিগকেও পাঠাইয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইত। আমরা আর এ সকল করি না বটে, কিন্তু এখনও অনেকেই যে একটা কল্পিত পরলোকের সৃষ্টি করিয়া, শোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ করে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। তাহারা একটা স্থূল, সাকার পরজগৎ কল্পনা করিত; আমরা একটা সূক্ষ্ম, নিরাকার পরলোক গড়িয়া সেখানে সর্ব্ববিধ আনন্দের ও ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি—বেশ কম এই মাত্র। ফলতঃ পরলোকতত্ত্বটা পূর্ব্বে যেমন, আজিও সেইরূপই অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু সমস্যাটা অত্যন্ত পুরাতন হইলেও, যুগে যুগে মৃত্যু মানুষকে নূতন নূতন ভাবে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। বর্ব্বর সাধনার অঙ্গ অপূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, বর্ব্বর সমাজের শ্রদ্ধা অত্যন্ত কোমল, ও কল্পনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিধাতাপুরুষ যেন এই শ্রদ্ধা ও কল্পনার দ্বারাই বর্ব্বর সমাজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার ক্ষতিটা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যাহাকে জড়

বলিয়া এখন উপেক্ষা করিয়া থাকি, তাহা তারই ভিতরে চৈতন্যের অধ্যাস করিয়া, বিশ্বসংসারকে সচেতন করিয়া রাখিত। জড়ে ও জীবে তখন এমন একটা মাখামাখি ছিল, এমন একটা আলাপ-আত্মীয়তার আদান-প্রদানের ভাব ছিল, যাহা এখন আমরা কেবল কবি-কল্পনার মায়িক সৃষ্টিতেই দেখিতে পাই, দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করিতে পারি না। আমরা আর প্রাচীন দেবতাদের দ্বারা নৈসর্গিক বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমাদের জড়বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ পুরাতন দেবতাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। আমরা এখন বিশ্ববিবর্ত্তনের অন্তরালে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করি না, কিন্তু এক ভীষণ ও বিরাট শক্তি-পুঞ্জের লক্ষ্যহীন সংঘর্ষ এবং সংগ্রামই প্রতিষ্ঠিত করি। আর প্রাচীন দেবতাদের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের পরলোক-বিষয়িণী কোমল শ্রদ্ধা-টুকুও হারাইয়াছি। তাঁহারা মৃতদিগের জন্য সুশোভন চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোকাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। এ সকলে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা শোকে অশেষ সান্ত্বনালাভ করিতেন। আমাদের সে বিশ্বাস নাই। সুতরাং মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া আমরা আজ যত অধীর হইয়া পড়ি, মৃত্যু আমাদিগকে যতটা নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়, প্রাচীনেরা সেরূপ হইতেন না, কাল তাঁহাদিগকে এতটা কার্পণ্যোপহত করিতে পারিত না। প্রাচীনেরা যেমন পরলোক কল্পনা করিতেন, আমরা যে তাহা একেবারেই করি না, এমনও নয়। কিন্তু তাঁহাদের সে কল্পনার সঙ্গে তাঁহাদের সমসাময়িক সাধনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ও সঙ্গতি ছিল, আমাদের পরলোক-কল্পনার মধ্যে সে যোগ ও সঙ্গতি থাকে না। এই জন্য অনেক সময় আমাদের শোক লঘু ও সান্ত্বনা অলীক হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা মৃতদিগের জন্য আপন আপন কর্ম্মোচিত লোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সাধু-অসাধু, ভক্ত-অভক্ত নির্ব্বিশেষে সকলেই যে ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইত, এমন অদ্ভুত কল্পনা তাঁহারা করিতেন না। এইজন্য, তাঁহাদের পর-লোক-রচনা কল্পিত হইলেও, সেই কল্পনার অন্তরালেও একটা সত্য ও সংযম বিদ্যমান ছিল। শ্রদ্ধা যেখানে—সংযম সেখানে আপনা হইতেই আইসে। আর ইহলোকের বস্তুর ধারণা যেখানে সহজ ও সরল অথচ দৃঢ় থাকে, সেখানে পরলোকের কল্পনাও নিতান্ত সত্য-ভ্রষ্ট হয় না। আমাদের দৃষ্টের ধৃতি যেমন দুর্ব্বল, অদৃষ্টের কল্পনাও সেইরূপ অলীক হইয়া পড়ে। আধুনিক কবিদিগের পরলোক-চিত্রে এইজন্য অনেক সময় বস্তুতন্ত্রতার লেশমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা জীবিতকে তেমন সমগ্র প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরি না বলিয়াই, তাহাদের প্রজ্বলিত-চিতালোকে দাঁড়াইয়া, গলা ছাড়িয়া গান করিতে পারি—

যাও রে অনন্তধামে মোহমায়া পাসরি.
দুঃখ আঁধার যথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে
কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।
যাও রে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।

দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে,
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাও রে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির-বিমল পুণ্য-কিরণে।
যায় যথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান্,
যাও বৎস যাও সেই দেব-সদনে॥

অক্ষয়বাবুর শোকগাথাতে কোথাও এই-রূপ কোনও অলীক কল্পনার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অক্ষয়কুমার তত্ত্বদর্শী সিদ্ধপুরুষ নহেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্যে যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, অক্ষয়কুমার এ পর্য্যন্ত তার সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। করিলে, কবিতাগুলি তিনি লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু সে তত্ত্ব কয়জনার ভাগ্যেই বা প্রকাশিত হইয়া থাকে? সে তত্ত্বের উপদেষ্টা অতিশয় দুর্ল্লভ; উপযুক্ত অধিকারী শ্রোতাও অতিশয় দুর্ল্লভ। "দেবৈরত্রাপি পুনঃ বিচি-কিৎসিতা পুরা"—অতি প্রাচীনকাল হইতে দেবতারাও এ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। "ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ"—এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব মনুষ্যদিগের পক্ষে সুবিজ্ঞেয় নহে। অক্ষয়-কুমার এই দেবদুর্ল্লভ তত্ত্ব আয়ত্ত করেন নাই, এ কথা বলিলে এই তত্ত্বেরই কেবল মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমারের কবি-প্রতিভার বা মনীষার কোনও অবমাননা করা হয় না। অক্ষয়কুমার, ইদানীন্তন কালে সভ্যজগতে যে শিক্ষাদীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই লাভ করিয়াছেন। তিনি একালেরই কবি ও মনীষী। এ কালটা যুক্তিপ্রধান; অতিশয় প্রত্যক্ষবাদী। এ কালের শিক্ষা ও সাধনার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ,—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরেই বিশেষভাবে এই যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধনা আপনাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তর্কের দ্বারা যে তত্ত্ব লাভ করা যায় না, অক্ষয়কুমার সে তত্ত্ব লাভ করেন নাই বলিয়া, কোনও নিন্দার কথাও হয় না। তবে অক্ষয়কুমার এই অতর্কপ্রতিষ্ঠ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার না পাইয়াও যে ইহার কল্পিত উপদেশ দিতে যান নাই, ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রশংসার কথা। এই জন্যই এই গ্রন্থে কোনও অলীক কল্পনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থে এক দিকে যেমন কোনও গভীর তত্ত্বদর্শিতার প্রমাণ-পরিচয় নাই, অন্য দিকে সেইরূপ কোনও প্রকারের লঘু-চিত্ততারও নামগন্ধ নাই। লঘুচিত্ত লোকেই কেবল মায়িক কল্পনার গোলাপী নেশা করিয়া, নানাবিধ জল্পনার সাহায্যে, আপনার গভীর শোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ ও লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ লঘুচিত্তের উপরে, শোকের দাগ কখনও গভীরভাবে পড়ে না। তাহার প্রেম যেমন হাল্‌কা, শোকও সেইরূপই হাল্‌কা হইয়া থাকে। রোজা যেমন তিলার্দ্ধমাত্র একটা মন্ত্রার্দ্ধ পাঠ করিয়া, অপস্মার-রোগীর কল্পিত রোগযন্ত্রণার উপশম করিতে পারে; লঘুচিত্তের শোকবেদনাও সেইরূপ একবার চক্ষু বুঝিয়া, নষ্ট করিতে পারা যায়। লঘুচিত্ত বিরহীর শোক কদাপি সর্ব্বগ্রাসী হয় না। সে শোকে মর্ম্মের অন্তস্তলকে আলোড়িত করিয়া তোলে না। তাহাদের হাল্‌কা প্রেমের হাল্‌কা বিচ্ছেদে, হাল্‌কা শোকই জাগিয়া উঠে। আর সে শোকের আঘাতে জীবন-মৃত্যুর গভীর ও জটিল সমস্যাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না। অক্ষয়কুমারের প্রেম

গাঢ়, বিচ্ছেদ দুর্ব্বিবহ, শোক সর্ব্বগ্রাসী; তাই এই শোকের আঘাতে তাঁহার পুরাভ্যস্ত জগৎটা চুরমার হইয়া গিয়া, সমগ্র বিশ্ব সমস্যাকে নূতন ও বিকট আকারে, তাঁহার চক্ষের উপরে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কোনও রস যতক্ষণ না গাঢ় হইয়া উঠে, ততক্ষণ তাহার নিজস্ব রূপটা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে না। অক্ষয়কুমারের শোক অতিশয় গভীর; তাঁহার বিরহ-আগুনে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া এ শোক যেন নিরেট হইয়া উঠিয়াছে। আর এইজন্যই তাঁহার এই শোকগাথাতে সে গভীর শোকের বিচিত্র রূপগুলি এরূপ বিশদভাবে ফুটিয়াছে। যেখানেই কোনও বিশেষ রস, কোনও ক্ষেত্রবিশেষে, তাহার আপনার নিজস্ব রূপগুলিকে ফুটাইয়া তোলে, সেখানেই তাহা আপনার বিশিষ্ট আধারের সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করিয়া, সার্ব্বজনীন ও বিশ্বজনীন হইয়া উঠে। একের রস তখন সকলের রস, একের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা,—তখন বিশ্বের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা হইয়া পড়ে। দর্পণে লোকে যেমন আপন আপন মুখ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রস-চিত্রের মধ্যে বিশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব রসের রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, বিস্মিত, পুলকিত, মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইয়া উঠে। এই লক্ষণাক্রান্ত রস-পটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই-রূপ কাব্যসৃষ্টিই রসবিচারে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়। শোকচিত্রের মধ্যে, এই গুণেই, অক্ষয়কুমারের 'এষা'খানি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

'এষার' প্রথম ও প্রধান গুণ—ইহার অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা। কবি আপনার জীবনের বাহিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার উপরে এই কবিতাগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন। যে যেমন দেখে, সে তেমনি আঁকে। চিত্রের অস্পষ্টতা চিত্রকরের দৃষ্টির অক্ষমতাই প্রমাণ করে। 'এষার' চিত্রগুলিতে কোথাও এরূপ অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না। ইহার মধ্যে কোথাও কিছুই দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য নাই। অক্ষয়কুমার সুকুমার গোধূলীলগ্নে তাঁহার কবিতাসুন্দরীর অবগুণ্ঠনখানি ঈষদপসৃত করিয়া, সেই আলো-আঁধারের ইন্দ্রজাল-প্রভাবের মধ্যে, তাহার অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন না। তিনি কাব্যই সৃষ্টি করেন, সুললিত শব্দ যোজনা করিয়া, ইন্দ্রসভার অনিন্দ্য সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া, কবিতার নামে কেবল মোহিনী হেঁয়ালি রচনা করেন না। এই বিষয়ে অক্ষয়কুমার আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের আদর্শের অনুকরণ করেন নাই, প্রাচীন কবিকুলশিরোমণিদিগেরই পদাঙ্কানুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম কি ভারতচন্দ্র, ইঁহাদের কেহই কাব্যের ছল করিয়া হেঁয়ালি গড়েন নাই। সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের মতন, কেবল শব্দহীন রাগরাগিণীর আলাপও করেন নাই। হেঁয়ালি জিনিষটা হেয় নহে; উৎকৃষ্ট, সুনিপুণ হেঁয়ালি সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নবিশেষ সন্দেহ নাই। রাগিণীর অনর্থক আলাপও নিষ্ফল হয়

না। কিন্তু সে সকল কবিতা নহে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সার্থক অথচ সহজবোধ্য, সুললিত অথচ গভীরভাবদ্যোতক শব্দ যোজনা করিয়া গভীর রসের ছবি সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতাগুলি পড়িলেই বোঝা যায়, তাহাতে অস্পষ্ট বা দুর্ব্বোধ্য কিছুই নাই। আর বৈষ্ণব-কবিগণের রসানুভূতি সত্য ও গভীর ছিল বলিয়া, তাঁহাদের এই সকল অনুপম রসচিত্রও এমন অদ্ভুতভাবে এতটা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন সকল আন্তরিক রসানুভূতি আছে, সত্য, যাহাকে কোনও ভাষায় ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় না। সে সকলকে কেবল ঠারে-ঠোরে ব্যক্ত করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিগণ এ সকল গভীরতম রসের রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহা কেমন সরল ও সুষ্ঠু, কেমন সুন্দর অথচ রসিকজনের নিকটে কেমন সহজবোধ্য হইয়া আছে! শরীরের যেমন একটা যৌবন আছে, প্রাণেরও সেইরূপ একটা যৌবন আছে। এই প্রাণের যৌবন অতিশয় অন্তরঙ্গ বস্তু; ভাষার এমন শক্তি নাই যে, সে যৌবনের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারে। অথচ চণ্ডীদাস এক কথায় কেমন সুন্দর ও সহজ ভাবে সে বস্তুটাকে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"তব্‌ যৌবন যব্‌ সুপুরুখ সঙ্গ।"

অথবা অতৃপ্ত, জ্বলন্ত রূপ-লালসার এমন চিত্রই বা আর কোথায় দেখিতে পাই?—

কি পেখলু ব্রজরাজকুলনন্দন
রূপে হরল পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি, আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান।

অথবা অন্যত্র শ্যামরূপ-দর্শন-মুগ্ধা শ্রীরাধিকা পাগল-পারা হইয়া ইচ্ছা করিতেছেন—এ ভুবনমোহনরূপ—

এমতি করিয়া যদি, বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই।

এইরূপে বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ গভীরতম রসানুভূতিকে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা কথায় বলা যায় না—যে গভীর অভিজ্ঞতার প্রকাশে 'বুদ্ধি-বচন হারে'—তাহাকেও সহজভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কোথাও কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া আপনাদের রসচিত্রগুলিকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখেন নাই। তাঁহাদের অন্তরের অনুভূতিগুলি অতিশয় গভীর ও সুস্পষ্ট ছিল বলিয়া, সে সকল অনুভূতি যতই গভীর ও অবাঙ্‌মনসগোচর হউক না কেন, তাহার অভিব্যক্তি কখনই অস্পষ্ট বা কুজ্ঝাটিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই।

অক্ষয় বাবুর কবিতায় বৈষ্ণবকবিদিগের গভীর রসানুভূতি আছে, এমন কথা বলি না। বৈষ্ণবকবিগণ যে গভীর, নিদারুণ বিরহের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কোনও কিছু জগতের আর কোনও সাহিত্যে আছে বলিয়া শুনি নাই। সুরার সঙ্গে যেমন জলের তুলনা হয় না, বৈষ্ণব কবিগণের বিরহ-চিত্রের সঙ্গে অক্ষয়বাবুর এই শোকগাথারও সেইরূপ কোনই তুলনা হয় না। অক্ষয়কুমারের বিরহ কেবল বিরহ; ইহার মধ্যে নিগূঢ়তম মিলনের অনুপম আনন্দটুকু লুকাইয়া নাই। বিরহের দশ-দশার সন্ধান অক্ষয়কুমার এখনও পান নাই; তাহার তন্ময়ভাব এখনও আস্বাদন করেন নাই। অক্ষয়কুমারের কাব্যে বৈষ্ণব-কবিদের

নিগূঢ় রসানুভূতি ফুটিয়াছে, তাই এমন কথা বলি না। এ'কালে সে বস্তু ফুটিতে পারে না। আবার যদি সে সহজ সাধনা ও সহজ প্রেম কখন জাগিয়া উঠে, তবে হয় ত কখনও পুনরায় বাংলা-সাহিত্যে বৈষ্ণবকবিকুল-গুরুদিগের শূন্য আসন কোনও ভাগ্যবান্ সাধক-কবি-শিরোমণির দ্বারা পূর্ণ হইতেও বা পারে। কিন্তু বৈষ্ণবকবিদিগের রসানুভূতি ও সাধনসম্পদ্ লাভ না করিয়াও, আপনার অধিকারে, অক্ষয়কুমারের কাব্য-সৃষ্টি, সত্যে ও সারল্যে, প্রাচীন কবিকুল-গুরুদিগের কাব্য-সৃষ্টি অপেক্ষা বড় বেশী হীন হইয়া আছে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের নিজেদের সময়ের ও নিজেদের সমাজের বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ়তম ও সার্ব্বজনীন তত্ত্ব এবং ভাবগুলিকে আপনাদের কবিতাতে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারও তাঁর কাব্যে আমাদের সমসাময়িক বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ় ও সার্ব্বজনীন সমস্যা ও ভাবগুলিকে অতি বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁর কাব্যসৃষ্টির বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মৃত্যুকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা ঠিক সে চক্ষে দেখিতে পারি না। একদিকে তাঁদের অন্তরে পরলোক-সম্বন্ধিনী একটা কোমল শ্রদ্ধা ছিল, অন্যদিকে একান্তভাবে বিষয়ভোগে লিপ্ত হইয়াও, তাঁহাদের চরিত্রের ভিতরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের যম-নিয়মাদির সাধনে, একটা অদ্ভুত যোগশক্তি প্রায়ই লুকাইয়া থাকিত। এইজন্য অনেক সময় তাঁহারা নিতান্ত নির্ভীকভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিতেন, প্রিয়জনকেও ধীর-স্থির চিত্তে মৃত্যুর হস্তে অর্পণ করিতেন। আমরা হিন্দুর গঙ্গাযাত্রা-অনুষ্ঠানটাকে, একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম রীতি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। শবদাহ-প্রথাটাকেও যে সর্ব্বদা ভাল মনে করি, এমনও বলা যায় না। কিন্তু মুমূর্ষু প্রিয়জনকে যারা গঙ্গাতীরস্থ করিয়া, গঙ্গাস্রোতে আকণ্ঠ ডুবাইয়া, সেই স্রোত-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনপ্রবাহকে নিঃশেষ মিশাইয়া দিতে পারিত; আর যারা মৃত প্রিয়জনের দেহে স্বহস্তে অগ্নিসংযোগ করিয়া, ভস্মসাৎ হইতে দেখিতে পারে, তারা মৃত্যুটাকে কত যে অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়,—এ কথাটা তলাইয়াও দেখি না। শোক করিও না—এ উপদেশ সকল ধর্ম্মেই আছে। শোকে ভগবানের মঙ্গলবিধানের মুখ চাহিয়া, তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া, সান্ত্বনালাভ করিবে—এ কথাও সকল উন্নত ধর্ম্মেই বলে। The Lord gave, the Lord hath taken away, Blessed be the name of the Lord!—খৃষ্টীয়ান-সাধনা এইভাবেই শোকার্ত্তের সান্ত্বনা দান করে। কিন্তু হিন্দু কেবল ভগবানের মঙ্গলবিধানের দিকে চাহিয়াই, বৃথা শোক করিবে না, এ কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মৃতব্যক্তির কল্যাণের মুখ চাহিয়া,—যাকে এতই ভালবাস, তার সুখশান্তির জন্য শোক হইতে বিরত হও,—কেবল হিন্দুই এ কথা বলেন। ইহলোকে তোমাদের অশ্রুজল ও আর্ত্তনাদ যেমন তাহাকে তোমাদের কাছে টানিয়া আনিত, মৃত্যুর পরেও সেইরূপ, সেই মায়া-মমতার

বন্ধনই তাঁর প্রেতাত্মাকে এই নিরীন্দ্রিয় অবস্থায় এই ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য জগতে টানিয়া রাখে। এ উপদেশ আর কোনও ধর্ম্মে শুনি নাই। এই সকল কারণে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মৃত্যুকে যে ভাবে দেখিতেন, তাঁদের সে শ্রদ্ধা হারাইয়া ও যে সকল আচার-ব্যবহার ও রাজনীতির ভিতর দিয়া তাঁদের ইহজীবনটা গড়িয়া উঠিত, সেই সকল আচার-ব্যবহার ও রাজনীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, চলিতে আরম্ভ করিয়া,—আর সে ভাবে আমরা মৃত্যুকে দেখিতে পারি না। তাঁদের শ্রদ্ধা কোমল ছিল, সহজ ছিল, গতানুগতিককে আশ্রয় করিয়াই সে শ্রদ্ধা বাঁচিয়া থাকিত। তাঁরা বিনা বিচারে, বিনা যুক্তিতর্ক করিয়াই, প্রচলিত মতামতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া জীবন-যাপন করিতেন। আমরা তাঁদের সে কোমল শ্রদ্ধা হারাইয়াছি; অথচ শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসকে সংশোধিত ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধারও অধিকারী হই নাই। আমাদের চিত্ত সংশয়প্রবণ। আমাদের অধ্যাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ। তত্ত্বদৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে আমরা যে কেবলই প্রত্যক্ষবাদী ও নিতান্তই জড়বুদ্ধি এবং ইহসর্ব্বস্ব, এমনও নহে। ইন্দ্রিয়ভোগেও আমরা একান্ত তৃপ্ত নাই। শুদ্ধ পশুবৃত্তিতেও আমাদের মন উঠে না। কেবল ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগেতে হৃদয়ের যে নিম্নমতা ও কাঠিন্য জন্মে, আমাদের তাহাও জন্মে না। এ আসুরী সম্পদও আমরা লাভ করি না। কলাবিদ্যার অনুশীলনে, ললিতকলার উৎকর্ষ-সাধনে, আমাদের মধ্যে একান্ত ইন্দ্রিয়সুখ-লালসার ভিতরেও একটা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সামাজিক জীবনের ঔদার্য্যে ও বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায়, আমাদের হৃদয় একটা অভূতপূর্ব্ব কোমলতা লাভ করিয়াছে। জীবনের পরিসর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সুখদুঃখানু-ভূতির শক্তিটাও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে জীবন-মৃত্যুর সমস্যাটা আমাদের নিকটে নিতান্তই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের কলারস-সরস বিষয়প্রবণ কোমল চিত্তকে মৃত্যু যেরূপভাবে অভিভূত করে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিত্তকে সেরূপ অভিভূত করিতে পারিত না। প্রাচীনেরা আবার আমাদের অপেক্ষা অশেষগুণে সমধিক শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। বীর্য্যবান্ লোকের কষ্টসহিষ্ণুতা, হীনবীর্য্য বা নির্ব্বীর্য্য লোকের অপেক্ষা অশেষগুণে বেশী। কষ্টসহিষ্ণুতা তিতিক্ষার একটা মুখ্য অঙ্গ ও উপাদান; আর মৃত্যুর আঘাতও তিতিক্ষু লোককে একেবারে বিচলিত বা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের এই সকল অনায়াস-লব্ধ সাধনসম্পদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, জীবন-মৃত্যুর সমস্যাটা আমাদের নিকটে এক নূতন ভাবে, নূতন অর্থে, নূতন শক্তিতে উপস্থিত হইতেছে। আমরা সহজে পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারিও না, আবার বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি একপ্রকারের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু আমাদের প্রাণ সে সিদ্ধান্তকে ধরিয়া সান্ত্বনা পায় না বলিয়া, তাহার বিরোধী বিশ্বাসকেও আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র হয়। এই টানাটানিতে পড়িয়া, আমরা কখনও একদিকে,

কখনও বা অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। ইহাই আধুনিক সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। বর্ত্তমান যুগের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ ট্রেজেডি (tragedy)। অক্ষয়বাবু তাঁর 'এষা'তে এই ট্রেজেডিটাকেই অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

আধুনিক সাহিত্যে লর্ড টেনিসন্ তাঁর 'ইন্ মেমোরিয়ামে'ও (In Memorium) এই আধুনিক ট্রেজেডির চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। এই আধুনিক সাধনার এই বিশ্বসমস্যাটাকে আশ্রয় করিয়াই, টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম'—বিশ্বসাহিত্যে এতটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের 'এষা'খানি ও টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম' একই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি। অক্ষয়কুমার টেনিসন্ জানেন, ভাল করিয়াই পড়িয়াছেন তাঁর কবিকল্পনায় কোনও কোনও রস, এমন কি তার অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত, এই আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালী কবি একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। এইজন্য 'এষা'তে কোথাও কোথাও 'ইন্ মেমোরিয়ামে'র ছায়া পড়িয়াছে, এমনও বা মনে হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও 'এষা'খানি অক্ষয়কুমারের, টেনিসনের নহে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে বাঙালী কবির প্রাণের ছাপ, হিন্দু কবির যুগযুগান্তবাহী বিচিত্র জাতীয় সাধনার সহিমোহর অঙ্কিত হইয়া আছে। আমরা ইংরেজি শিখিয়া টেনিসন না কি বহুবার পড়িয়াছি। টেনিসনের কতকগুলি কথা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদবাক্যের মতন প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজি পড়িতে ও লিখিতে, শুনিতে ও বলিতে, এই সকল ভাব ও ভাষা আমাদের চিন্তার সঙ্গে একেবারে জড়াইয়া গিয়াছে। তাই টেনিসনের সঙ্গে সামান্য বাঙালী কবির নাম করিতে আমাদের শঙ্কা হয়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, 'এষা'তে টেনিসনের অনুকরণের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ামে'র এখন যেটা সর্ব্বপ্রথম কবিতা, তাহাই বস্তুতঃ তার শেষ কবিতা। ইহার সঙ্গে 'এষা'র শেষ কবিতাটীর তুলনা করিয়া দেখিলেই, অক্ষয়কুমার টেনিসনের নিকটে কতটা ঋণী, আর কতটাই বা এ কবিতাগুলি তাঁর কবিপ্রতিভার মৌলিক-সৃষ্টি, ইহা পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারা যায়। টেনিসনের প্রথম কবিতাটী এই :—

Strong Son of God, immortal Love,
Whom we, that have not seen thy face,
By faith, and faith alone, embrace,
Believing where we cannot prove ;

Thine are these orbs of light and shade ;
Thou madest Life in man and brute ;
Thou madest Death : and lo, thy foot
Is on the skull which thou hast made.

Thou wilt not leave us in the dust :
Thou madest man, he knows not why,
He thinks he was not made to die ;
And thou hast made him : thou art just.

Thou seemest human and divine,
Thou highest, holiest manhood, thou ;
Our wills are ours we know not how ;
Our wills are ours, to make them thine.

Our little systems have their day ;
They have their day and cease to be :
They are but broken lights of thee,
And thou O Lord, art more than they.

We have but faith : we cannot know ;
For knowledge is of things we see ;
And yet we trust it comes from thee,
A beam in darkness : let it grow.

Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell ;
That mind and soul, according well,
May make one music as before

But vaster. We are fools and slight ;
We mock thee when we do not fear :
But help thy foolish ones to bear ;
Help thy vain worlds to bear thy light.

Forgive what seem'd my sin in me ;
What seem'd my worth since I began ;
For merit lives from man to man,
And not from man, O Lord, to thee.

Forgive my grief for one removed,
Thy creature, whom I found so fair.
I trust he lives in thee and there
I find him worthier to be loved.

Forgive these wild and wandering cries,
Confusions of a wasted youth ;
Forgive them where they fail in truth,
And in thy wisdom make me wise.

অক্ষয়কুমারের 'এষা'র শেষ কবিতাটী এই :—

হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ !
ত্যজিয়াছ মর্ত্তভূমি,
তবু আছ—আছ তুমি !
তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।
এত রূপ গুণ ভক্তি,
এত প্রীতি অনুরক্তি—
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ !
নয়—এ মরণ নয়, দু'দিন বিরহ !
আলোকে সু-বর্ণ ফুটে,
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে ;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম—যত্ন অনাগ্রহ।
বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—
সেই জপ তপঃ ধ্যান,
সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ।
প্রতি কর্ম্মে—প্রতি ধর্ম্মে—উঠেছিলে সতী,
উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে !
নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি।
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হ'লে অন্তর্দ্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি !
হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান !
তোমারে হেরিনি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্ব্বজীবে সর্ব্বকালে দাও পদে স্থান।

তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
আলো—অন্ধকার—বৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক তোমারি প্রদান !
ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময় !
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় !
শোকে ধূ ধূ হৃদি-মরু
আছে তার কল্পতরু !
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয় !
তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ তোমারি ধরণী ;
তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতিজনা,
শোকে দুঃখে ভ্রমে কেন পরমাদ গণি ?
ব্যাপি' সর্ব্ব কাল-স্থান
তব প্রভা দীপ্যমান,
ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কণ্ঠধ্বনি !
দুরন্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন,
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে যায় না বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি বাঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন !
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার !
নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,
তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভালমন্দ করিতে বিচার !

মজিয়া আপন জ্ঞানে আপনা বাখানি।
রোগে শোকে ভাবি ডরে
জন্মি নাই মৃত্যু তরে—
যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি!

জানি—মনঃ প্রাণ দেহ
নহে আপনার কেহ—
তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী!

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!

জীবন-মরণ-পানে
ব'হে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!

ক্ষম' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ!
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া!
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ!

এখনো সে যুক্তকরে
মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা-স্নেহ শুভ-আশীর্ব্বাদ।

এই দুইটী কবিতাই একরূপ একই বিষয়ে, একই উপলক্ষে রচিত। দুইটীতেই মানব-প্রাণের একটা গভীর প্রার্থনা, মানবমনের একটা গভীর সমস্যা, মানবহৃদয়ের কতকগুলি গভীর ও জটিল রসকে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। টেনিসনের কবিতাটী পূর্ব্বে রচিত, অক্ষয়বাবুরটী পরের লেখা। অক্ষয়বাবুর কবিতার দু'একটি স্থানে মনে হয় যেন টেনিসনের একটু ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান!
তোমারে হেরিনি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু—
সর্ব্বজীবে, সর্ব্বকালে দাও পদে স্থান।

তোমারি এ বিশ্বসৃষ্টি,
আলো—অন্ধকার—বৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক তোমারি প্রদান।

এখানে কেহ বা এমন মনেও করিতে পারেন যে, টেনিসনের—

Strong son of God, immortal love,
Whom we, that have not seen thy face,
By faith, and faith alone, embrace,
Believing where we cannot prove;
Thine are these orbs of light and shade;
Thou madest life in man and brute;
Thou madest Death: and lo, thy foot
Is on the skull which thou hast made.

এই কবিতাংশের একটু ছায়া পড়িয়াছে। আবার—

তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতি জনা—

এখানে টেনিসনের

They are but broken lights of thee,

এই উক্তির গন্ধ পাওয়া যায়। আর—

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চিরপ্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!
জীবন-মরণ-পানে
বহে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!

এখানে টেনিসনের—

Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell;
That mind and soul, according well
May make one music as before
But vaster.

এই পঙক্তির একটু আভাষ যেন পাওয়া যায়। এবং সর্ব্বশেষে—

Forgive my grief for one removed,
Thy creature, whom I found so fair.
I trust he lives in thee, and there
I find him worthier to be loved.

এই ভাবটা যেন অক্ষয় বাবুর—

ক্ষম' এ ক্রন্দনগীতি—শোক-অবসাদ !
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া !

এই পদগুলিতে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই সকল ভাবের আংশিক ঐক্য, দু'এক স্থলে, এমন কি, কোনও কোনও শব্দের অনুবাদ সত্বেও, কিছুতেই অক্ষয়কুমারের এই কবিতাটীকে টেনিসনের অনুকরণ বলা যায় না। অক্ষয়কুমার হিন্দুর ভাষায়, হিন্দুর ভাবে, হিন্দুর তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া, তাঁর এই কবিতাটি লিখিয়াছেন। টেনিসন সেইরূপ খৃষ্টীয়ানী ভাষায়, খৃষ্টীয়ানী ভাবে, খৃষ্টীয়ানী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁর কবিতা গড়িয়াছেন। টেনিসনের কবিতাটী যতই সুন্দর ও সুমিষ্ট হউক না কেন, অক্ষয়কুমারের কবিতার তুলনায় অত্যন্ত লঘু—হাল্‌কা।

দুরন্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন,
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে যায় না বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন !
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার !
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
করি কত সত্যমিথ্যা নিত্য-আবিষ্কার।
নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,
তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভালমন্দ করিতে বিচার !

অক্ষয়কুমারের এই পদ দুইটীর সঙ্গে টেনিসনের—

Forgive these wild and wandering cries,
Confusions of a wasted youth ;

Forgive them, where they fail in truth,
And in thy wisdom make me wise.

এই পদের কোনই তুলনা হয় না। আর—

তার স্মৃতি সনে আজ তোমারি আস্বাদ !

টেনিসন কোথাও এই গভীর যোগের সন্ধান পান নাই ইহার কাছে

I find him worthier to be loved—

নিতান্তই ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। আর এই দু'খানি কাব্যের শেষের এই দুই আত্মনিবেদনে যে বৈষম্য, যে পার্থক্য, যে উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষিত হয়. "এষা" এবং "In Memorium"তেও প্রায় আদ্যোপান্তই তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অক্ষয়কুমারের কবিপ্রতিভা সর্ব্ব বিষয়ে টেনিসনের কবিপ্রতিভার সমকক্ষ, এত বড় কথাটা বলিতে চাহি না। সে বিচারেও আজ প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু একটু ধীরভাবে সর্ব্ব প্রকারের পূর্ব্বসংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব-শূন্য হইয়া বিচার করিলে, বাংলা ভাষার এই সামান্য "এষা"খানি ইংরেজি "In Memorium" অপেক্ষা মূল বিষয়ের আলোচনায় ও মূল রসের অভিব্যক্তিতে যে কোনও অংশে হীন নহে. বরং অনেক বিষয়েই গভীরতর ও শ্রেষ্ঠতর, এ কথা কতকটা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি। কথাটা প্রতিপন্ন করিতে হইলে যেমন টেনিসনের ও অক্ষয়কুমারের কাব্যের শেষ কবিতাটি পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলাম, সেইরূপই প্রত্যেক কবিতাটির তুলনায় সমালোচনা করিতে হয়। সে বিচার বিস্তর সময়সাপেক্ষ। কোনও দিন সে চেষ্টা করিতেও বা পারি। In Memorium বহু বহু বার পড়িয়াছি ; তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছি ; শোকার্ত্ত হৃদয়ে, মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া দিবানিশি পড়িয়াছি কিন্তু তাহাতে জীবন-মৃত্যুর সমস্যাটীকে যে এষার মতন এমন তন্ন তন্ন করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছে, এমনটা কখনও অনুভব করি নাই। টেনিসনের ইন্ মেমোরিয়ামে অতি সুন্দর, অতি প্রাণোদ্দীপক, অতি মধুর কথা অনেক আছে। কিন্তু ভাবের ঐক্য, রসের সঙ্গতি, রচনার ঘননিবিষ্টতা বড় বেশী নাই। কবি বহুদিন ধরিয়া ঐ কাব্যখানি লিখিয়াছিলেন। বিবিধ বিষয়কর্ম্মের বিক্ষেপের মাঝখানে, এক একবার ছুটিয়া গিয়া এক একটী অংশ রচনা করিয়াছেন। যোগস্থ হইয়া, একৈকরসানুভূতিতে বিভোর হইয়া, লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার এই কাব্যে অনেক অবান্তর কথা আছে। একটা রসের অভিব্যক্তি, স্তরে স্তরে একটা ভাব মানুষের মনে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, শোকার্ত্তের চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কিরূপ, আর বিরহরসটারই বা প্রকৃতি কি, ইহা একেবারেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের "এষা" টেনিসনের "In Memorium অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। "In Memorium-এর বুলবুলী আলগা, 'এষা'র বুলবুলী ঠাসা। তারপর শোক-

গাথার মূল লক্ষ্যই করুণরসের অভিব্যক্তি। টেনিসনের কাব্যে যে গভীর কারুণ্য কোথায়? অক্ষয়কুমারের এই কাব্যখানির প্রতিছত্রে নিদারুণ, মর্ম্মস্পর্শী কারুণ্য-অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(উপন্যাস)

(৬)

প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা 'হাট' হইয়া খুলিয়া গেল।—দরজার সম্মুখে ভীষণ দর্শন এক মনুষ্যমূর্ত্তি! পাঠক, এ মূর্ত্তির সহিত পূর্ব্বেই আমাদের পরিচয় হইয়াছে।

জীন কক্ষমধ্যে দু' এক পদ অগ্রসর হইয়াই থামিয়া গেল। তাহার পৃষ্ঠের থলি, হস্তের গাঁইটযুক্ত যষ্টি, এবং তীব্র কঠোর দৃষ্টি—প্রেত-ছবির ন্যায়ই ভীষণ। ম্যাগ্‌লোয়ারের চীৎকার করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইল; সে শুধু ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ব্যাপ্টিস্তাইন প্রথমতঃ তাহাকে দেখিয়া ভয়ে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, তার পর ভ্রাতার দিকে দৃষ্টি পড়িতে, পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন। মিরিয়েল শান্ত-দৃষ্টিতে আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া ছিলেন।

জীন, মিরিয়েলকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই উচ্চকণ্ঠে ঝড়ের মত বলিয়া চলিল—

"শুনুন আমার নাম জীন ভ্যাল্‌জিন। আমি একজন দাগী আসামী, ১৯ বৎসর গ্যালিতে কাটিয়েছি। চার দিন আগে জাল থেকে কারামুক্তি পেয়ে পঁরতারলিয়ায়ের দিকে বরাবর হাঁটা পথে চ'লে আসছি। আজও আঠারো ক্রোশ পথ হেঁটেছি। সন্ধ্যার সময় এ সহরে এসে পৌছেছি—এ পর্য্যন্ত যে হোটেলে বা বাড়ীতে গিয়েছি, সবাই আমার হ'লদে ছাড়পত্র দেখে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। জেলখানায় গেলাম—তারাও ঠাঁই দিলে না। মাঠে গেলাম—আকাশ জুড়ে মেঘ উঠ্‌ল, তারা নিভে গেল, ভাব্‌লাম—বৃষ্টি হয় ত কোথায় দাঁড়াব! ভগবান্ নেই, বৃষ্টি থামাবেই বা কে? কাজেই ফিরে এসে বাগানের সাম্‌নে পাথরের বেঞ্চে শুয়ে ছিলাম;—এক বৃদ্ধা এই বাড়ী দেখিয়ে দিলে। এটা কি রকম বাড়ী? সরাইখানা কি? ভয় নেই, আমার পয়সা আছে। উনিশ বছর ধ'রে কয়েদ খেটে আমি ১০৯ ফ্র্যাঙ্ক ১৫ স্যুস জমিয়েছি। ক্ষুধায় আর চল্‌তে পারিনে। আপনাদের এখানে জায়গা হবে?"

"ম্যাগ্‌লোয়ার, আর্ একখানা থালা আন।"

লোকটা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া মিরিয়েলের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"করেন কি?—শুনুন, শুনুন—বুঝেছেন আমি কে?—আমি কি? আমি গ্যালির কয়েদী, সবে মাত্র ছাড়া পেয়েছি। এই দেখুন—"

বলিয়া সে কোর্ত্তার জেব হইতে একখানা ছাড়পত্র বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখুন, এতে কি লিখ্ছে।—'জীন ভ্যাল্‌জীন, সাং—, ১৯ বৎসর ধরিয়া গ্যালির কয়েদী। পাঁচ বৎসর ডাকাতির জন্ম, এবং চারিবার পলায়ন-চেষ্টার অপরাধে বাকী চৌদ্দ বৎসর। লোকটার প্রকৃতি বড় ভয়ঙ্কর।' এ দেখেও আপনারা আমাকে খেতে দেবেন?—শোবার জায়গা দেবেন? এটা কি একটা সরাই?—আপনাদের ঘোঁড়শাল আছে ত?"

"ম্যাগ্‌লোয়ার, কোণের ঘরের বিছানায় একটা ফরসা চাদর পেতে দিয়ো।"—তার পর আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া মিরিয়েল বলিলেন—"আসুন মশায়, এই আগুনের দিক্‌টায় এগিয়ে এসে বসুন। খাবার হ'ল বলে; খেতে খেতে আপনার বিছানাও হ'য়ে যাবে এখন।"

লোকটা যেন ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল—কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এ ব্যবহার তাহার পক্ষে অপ্রত্যাশিত, অপূর্ব্ব! তাহার ভীষণ-কঠোর সে মুখের উপর একে একে বিস্ময়, সন্দেহ এবং আনন্দের লেখা ফুটিয়া উঠিল! সে ছবি—নানাভাবসংঘাতের সে অপূর্ব্ব মিশ্রণ—বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ! লোকটা উন্মাদের ন্যায় অসংবদ্ধ ভাষায় বলিতে লাগিল—"সত্যি? মিথ্যা নয়? 'দূর হ, কুকুর' ব'লে আর সবারই মত আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না? আমি জান্‌তাম—আমাকে দূর ক'রে দেবেন, তাই আগে থেকেই পরিচয়টা দিয়েছিলাম। আমায় খেতে দেবেন?—গদি-চাদর-ওয়ালা বিছানায় শুতে দেবেন?—বিছানা! হায়, উনিশ বছর ধ'রে বিছানায় আর শুইনি। আপনার নাম? আপনি যা চান, তাই দেবো। আপনি খুব ভাল লোক। আপনারই এ সরাই বুঝি?"

"আমি একজন ধর্ম্মযাজক। এই বাড়ীতে বাস ক'রে থাকি।"

"ধর্ম্মযাজক!—ওঃ, তা হ'লে আর আমাকে টাকাকড়ি কিছু দিতে হবে না, কেমন? আপনি ঐ বড় গির্জ্জাটার পাদরী বুঝি? কি বোকা! এতক্ষণ আপনার টুপির দিকে চা'ই-ই নি—" বলিয়া, যষ্টি ও থলিটা সে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিল। "আপনার খুব দয়া! কই আমাকে ত ঘৃণা কর্‌লেন না—তা হ'লে আমার কাছ থেকে আপনি টাকা চান না, কেমন?"

"না, টাকা আপনি রেখে দিন্। কতদিনে আপনি টাকা ক'টি উপার্জ্জন করেছেন?"

"উনিশ বছরে।"

"উনিশ বছরে!" মিরিয়েল দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

জীন বলিতে লাগিল—"আমার সে টাকা সবই জমা আছে। পথে আস্‌তে আস্‌তে মজুরী খেটে কিছু পেয়েছিলাম, তাতেই এ চার দিনের খরচ চ'লে গেছে। আপনি একজন পাদরী না?—তবে একটা কথা বলি শুনুন—আমাদের জেলখানায় একদিন সর্দ্দার পাদরী উপদেশ দিতে এসেছিলেন। আমরা যত কয়েদী তিন দিকে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়ালাম; পাছে আমরা কেউ কিছু করি ব'লে আমাদের ঠিক সাম্‌নে গোলন্দাজেরা গোলাভরা কামান নিয়ে পল্‌তে জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর সুমুখের সেই ফাঁকা দিক্‌টায় অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সেই সর্দ্দার পাদরী বক্তৃতা করতে লাগ্‌লেন। তাঁর সে বক্তৃতা শুন্‌তে পাওয়া

ত দূরের কথা, ভাল ক'রে তাঁকে দেখ্‌তেই পাচ্ছিলাম না। খালি তাঁর মাথার উপর কি একটা সোণার জিনিষ চক্‌মক্ করছিল, তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। এই হ'ল সর্দ্দার পাদরী, আর এই তাঁর ধর্ম্মের উপদেশ!"

দরজাটা খোলা ছিল; মিরিয়েল নিজেই যাইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলেন।—বলিলেন "রাত্রিটা বড় কন্‌কনে। আপনার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।—ম্যাগ্‌লোয়ার্ এঁর খাবারের জায়গাটা আগুনের দিকে ক'রে দিয়ো।"

যতবার মিরিয়েল তাহাকে 'আপনি' 'মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, ততবারই আগন্তুকের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কয়েদী, বিশেষতঃ গ্যালির আসামীর পক্ষে সে সম্মানলাভ, মরুভূমে তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ জীবের পক্ষে সুশীতল বারিপূর্ণ পাত্রের ন্যায়ই লোভনীয়। হীনতা সম্মানের জন্য এমনই লালায়িত হয়!

মিরিয়েল অকস্মাৎ বাতিদানের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"তাই ত, আলোটা বড় মিট্‌মিট্ করছে যে!"

ম্যাগ্‌লোয়ার্ তাহার অর্থ বুঝিল। মিরিয়েলের শয়নকক্ষের আলমারী হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত দুইটি বাতিদান আনিয়া, জ্বালাইয়া, টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল।

জীন উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। বলিল—"এত দয়া আপনার! আমায় ঘৃণা না ক'রে গৃহে ঠাঁই দিলেন; আমি কে, তা জেনে শুনেও আমার জন্য এত সম্মান দেখাচ্ছেন!"

মিরিয়েল পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন; মৃদুভাবে তাহার করস্পর্শ করিয়া বলিলেন—"আপনি কে, সে কথায় আমার প্রয়োজন নেই। এ গৃহ আমার নয়—ভগবানের। এখানে অতিথির নাম কেউ জান্‌তে চায় না, তার কোন দুঃখ আছে কি না, সেইটুকুতেই তার প্রয়োজন। আপনি দুঃস্থ, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, এখানে আপনার অবারিত দ্বার। না, ধন্যবাদ দেবেন না; আমি যে আপনাকে আমার বাড়ীতে আশ্রয় দিচ্ছি—এ কথা ভাব্‌বেন না। এ বাড়ীতে আমার যা অধিকার—আপনারও তাই,—বরঞ্চ বেশী। আপনার নাম আমি জান্‌তে চাই না,—আপনি বলবার আগেই তা জেনেছি।"

লোকটা বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে মিরিয়েলের প্রতি চাহিয়া বলিল—"সে কি?—কিসে জান্‌লেন?" গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে মিরিয়েল উত্তর করিলেন—"কেন, আপনি যে আমার ভাই।"

লোকটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল—"আপনি মানুষ নন, দেবতা। কি বল্‌ব—ভাষা জানি না। আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই—সব ভুলে গেছি।"

"আপনি কি জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন?"

"দুঃখ কষ্ট! উঃ, সে কথা আর কেন বলেন? সেই লালকোর্ত্তা, লোহার শিকল আর গোলা, কাঠের তক্তার শয্যা, অসহ্য গ্রীষ্ম, তীব্র শীত, কারণে অকারণে কশাঘাত আর নির্য্যাতন, কথায় কথায় অন্ধকারময় নির্জ্জন কারাগারে নির্ব্বাসন, রোগশয্যায় প'ড়েও শৃঙ্খলের হাত হ'তে নিস্তার নেই—উঃ, কুকুরেরাও এর চেয়ে সুখে থাকে!

উনিশ বছর এইভাবে কেটেছে। এখন আমার বয়স ছ'চল্লিশ। এতদিনে ছাড়া পেয়েছি, তবু এখনও তার জের চল্‌ছে এই হল্‌দে ছাড়পত্রই তার প্রমাণ।"

"সত্য বটে, আপনি অসহ্য দুঃখযন্ত্রণা সহ্য ক'রেছেন কিন্তু এটা স্থির জান্‌বেন স্বর্গে একজন মাত্র যথার্থ অনুতাপীর অশ্রুতে যে আনন্দোচ্ছ্বাস জাগে শতজন সাধুপুরুষের আগমনেও তা জাগে না। সে দুঃখের কারা থেকে যদি মানবের প্রতি শুধু ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে বাহির হ'য়ে এসে থাকেন—তবে আপনি করুণার পাত্র; আর যদি সে দুর্দ্দিনের শিক্ষা থেকে মহানুভাবকতা, চিত্তের প্রশান্তি এবং সাধু-সংকল্প লাভ ক'রে থাকেন—তা হ'লে আপনি আমাদের মত সাধারণ যে কোন লোকের চেয়ে অনেক বড়।"

ম্যাগ্‌লোয়ার্ ইতিমধ্যে খাবার লইয়া আসিয়াছিল,—নিতান্ত সাদাসিদা রকমের আহার্য্য; তবে ম্যাগ্‌লোয়ার, কি বুঝিয়া, আপনা হইতে এক পাত্র ভাল পানীয়ও আনিয়াছিল।

"ব'সে পড়ুন, আর কি?"—বলিয়া মিরিয়েল নিজেই আহার্য্য বণ্টন করিতে আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। সহসা মিরিয়েল বলিয়া উঠিলেন —"তাই ত, টেবিলটা খালি খালি লাগ্‌ছে কেন?" আসল কথা, অতিথি অভ্যাগত আসিলে, রূপার ছয়খানা থালাই টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখার তাঁর নিয়ম ছিল। ম্যাগ্‌লোয়ার্ তিন জনের উপযোগী তিনখানি মাত্র থালা বাহির করিয়াছিল।—মিরিয়েলের 'বড়মানুষি'র মধ্যে এইটুকুই ছিল। এই যে কৃত্রিম বড়মানুষির ভাব, ইহাতে এমন একটা শিশুসুলভ সরলতা মিশ্রিত ছিল, যাহা তাঁহার সাংসারিক দারিদ্র্যকে মহিমামণ্ডিত করিয়াই তুলিত! আজ সে লোকও নাই, সে মহত্ত্ব-গৌরবও আর দৃষ্টিপথে বড় পড়ে না।

ম্যাগলোয়ার বাকী তিনখানা রূপার থালা আনিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। লোকটা তখন কোন দিকে না চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া খাইয়া যাইতেছিল। আহারাদির পর সে ব'লল—"মহাশয়, আমার পক্ষে এ খাবার আশার অতিরিক্ত। কিন্তু তবু সত্য কথা বলিতে কি—সে গাড়োয়ানগুলাও আপনার চেয়ে ভাল খায়।"

অন্য কেহ হইলে হয় ত এ কথায় ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু মিরিয়েল সহজভাবে উত্তর করিলেন "তা হবে, হয় ত আমাদের চাইতে তাদের বেশী পরিশ্রম করতে হয়।"

"তা নয়। তারা আপনার মত এত গরীব নয়। আমি যা ভাব্‌ছিলাম, আপনি বুঝি তাও নন। ভগবান্ যদি ন্যায়বিচারক হন, তবে একদিন আপনি ক্যুরে হবেন।"

"ভগবান্ খুবই ন্যায়বান্।" বলিয়া একটু থামিয়া মিরিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, তা হলে পঁয়তারলিয়ারেই যাবেন?"

"হাঁ, আর কোথায় যাব? কাল প্রত্যুষেই রওনা হ'তে হবে। অনেকটা পথ। এ অঞ্চলে রাত্রিটা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাটলেও দিনমানটা বেশই গরম্ থাকে দেখ্‌ছি।"

"তা, পঁয়তারলিয়ার বেশ জায়গা। কাজেরও সেখানে অভাব নেই। কাগজের কল, তেলের কল, চামড়ার কারবার, ঘড়ির কারখানা, ইস্পাতের তামার কারখানা, আরও

অসংখ্য ছোট বড় কারবার সেখানে আছে। আমাদের জানাশুনা লোকও সেখানে আছেন। তবে দুধের কারবারটাই সেখানে খুব বড়—কত শত মণ দুধ ছানা দই ক্ষীর সেখান থেকে প্রতিদিন বিদেশে চালান হয়।" বলিয়া মিরিয়েল বিস্তারিতভাবে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সে যেন অপর দশজনের মতই সাধারণ একজন মানুষ—তার জীবনের কোনখানটাই যেন কলঙ্কমণ্ডিত নয়! বক্তৃতার এমন একটা সুন্দর সুযোগ, পাপীর প্রতি সাধুর উপদেশ-চেষ্টা, নির্মমভাবে ছুরিকা চালাইয়া পাপের ক্লেদপরিপূর্ণ শোষণ-নালা উন্মুক্ত করিয়া পাপের প্রতি পাপীর যাহাতে যথার্থ ঘৃণা জন্মে, তাহার প্রয়াস—এ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া বরং তিনি তাহার অতীত জীবনটাকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবাইতেই চাহিতেছিলেন। যথার্থ করুণা এইখানেই নয় কি? অতীতের ভারে যে প্রতিনিয়তই প্রপীড়িত হইতেছে—তাহাকে মুহূর্তের জন্যও সে কথা ভোলানই কি যথার্থ করুণা নহে?—এই যে মহাপ্রাণতা, যাহা সকল বক্তৃতা উপদেশ দূরে রাখিয়া, হতভাগ্যের জীবনের ক্ষত স্থানে হস্তস্পর্শ করিয়া তাহার যন্ত্রণা আর বৃদ্ধি করিতে চায় না;—এই যে সঙ্কোচের ভাব,—ইহাতে কি যথার্থ দেবত্বের ছায়াপাত নাই?

আহারান্তে উপাসনাদির পর মিরিয়েল বলিলেন—"চলুন মশায়, আপনার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি।"

একতালায় সবশেষের কক্ষটি অতিথির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মিরিয়েলের শয়নকক্ষের মধ্য দিয়াই তাহার একমাত্র প্রবেশ-পথ। অতিথির সঙ্গে মিরিয়েল যখন আপন কক্ষ দিয়া যান, তখন ম্যাগ্‌লোয়ার্ তাঁহার শয্যা-শিয়রস্থ দেওয়াল-আলমারিতে রূপার পাত্রগুলা তুলিয়া রাখিতেছিল; শয়নের পূর্ব্বে এটা তাহার প্রতিদিনের কাজ ছিল।

শয্যা প্রস্তুত ছিল। মিরিয়েল বলিলেন—"তা হ'লে আপনি এখন শু'ন। সুনিদ্রা হোক্। কাল সকালে রওনা হবার আগে একবাটি গরম দুধ খেয়ে তবে যাবেন।"

"সে আপনার অনুগ্রহ।"—বলিয়া সহসা লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। সতর্ক করিবার জন্য, না ভয় দেখাইবার জন্য, না তাহার সহজাত-বুদ্ধির বশবর্ত্তিতায়—কে জানে কিসের জন্য। সে সহসা উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিল—"সে কি মশায়? আপনার এত কাছে আমাকে শুতে দিচ্ছেন? আপনি পাগল না কি? আমি যে একজন খুনী নই, আপনাকে কে বল্‌লে?"

মিরিয়েল ধীরস্বরে উত্তর করিলেন—"সে ভাবনা ভগবানের—আমার নয়।" বলিয়া বৃদ্ধ আগন্তুকের দিকে ধীরে ধীরে আপন দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোলন করিয়া নীরবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তার পর নিঃশব্দে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তখনও তাঁহার শয়নের সময় হয় নাই। বাগানে আসিয়া তিনি পায়চারি করিতে লাগিলেন, এবং ভগবানের যে রহস্যময় অপূর্ব্ব লীলাবৈচিত্র্য গভীর রজনীতে ভাবময় মানব-চক্ষে ফুটিয়া ওঠে, তাহারই ধ্যানধারণায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

এদিকে, লোকটা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে জামাজুতা না ছাড়িয়াই—ফুঁ দিয়া

বাতিটা নিভাইয়া দিয়া, একেবারে বিছানায় গিয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তপরেই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইল।

মিরিয়েল অনেকক্ষণ পর ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষণপরেই সে ক্ষুদ্র বাড়ীটি গভীর সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

সুখ-স্মৃতি

১

চির-সাথী বীণাখানি ছিল মোর করে!
প্রভাতে গাহিত পাখী,
ফুলে ছেয়ে যেত শাখী,
জাগিত হৃদয় মোর কি পুলক ভরে।
আকাশ-বাতাস-ভরা—
কি যেন আকুল-করা—
হরষ-প্লাবন আসি' পড়িত অন্তরে—
আজি মনে পড়ে।

২

গগনে প্রখর রবি,
শ্যামল প্রান্তর-ছবি,
অলস মধ্যাহ্ন-বেলা—পতঙ্গ-গুঞ্জন;
নিবিড় প্রচ্ছায় বট,
জনহীন নদীতট,
বদ্ধ-তরী দুলে স্রোতে—ব্যর্থ আকিঞ্চন—
টুটিতে বন্ধন।

৩

পাখী উড়ে নীলাকাশে,
কৃষ্ণ বিন্দু যেন ভাসে,—
আঁখি দুটি তারি পানে—সে যেন আপন!
স্নেহ তপ্ত সুনিবিড়
কোথা' তার আছে নীড়,
ক্ষুদ্র সুখ দুখ তার—গৃহীর মতন
কলহ-মিলন!

৪

ফুটিত সন্ধ্যায় তারা,
শুভ্র জ্যোৎস্নারধারা
ঢালিত আকাশে চাঁদ—হাসি' সুধাহাসি;
বসিতাম বীণা নিয়া,
তৃপ্তিরূপা কাছে প্রিয়া,
ভাবিতাম—প্রিয়ার সে ফুল্লরূপরাশি—
কত ভালবাসি!

৫

বীণায় কাঁপিত সুর,
প্রেমস্বপ্নে পরিপূর—
চাহিতাম প্রিয়ামুখ—সুষমার সার!
এই স্বর্গ—এই সুখ,
জানি না কোথায় দুখ,
কোন শূন্য কোন দৈন্য নাহি প্রাণে আর—
এত সুখ কার!

৬

হেরি' নিদ্রালস-ভরে—
আঁখি-পাতা ঢুলে পড়ে
প্রিয়ার আমার—বীণা রাখিতাম পাশে!
ঘুমঘোরে বাহু তার
বাঁধিত গলায় হার!
হায়! সে সুখের নিশি যদি ফিরে আসে—
এ বিরহ নাশে!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

পাথরের সন্দেশ

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগে প্রস্তর কত কথাই বলিতেছে, কত সংবাদই দিতেছে, অতীতের কত গৌরবকাহিনী বিবৃত করিতেছে। যে ইতিহাস মানুষ লিপিবদ্ধ করে নাই, অথবা লিপিবদ্ধ করিলেও জলবায়ুর দৌরাত্ম্যে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, পাষাণ সে ইতিহাসও বক্ষে ধারণ করিয়া যুগযুগান্তের পর মানুষের ঘরে আসিয়া হাজির হইতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকিয়া আত্ম রক্ষা করতঃ যে কাহিনী সে এত দিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছে, কত কুসংস্কারের মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেছে। কি উড়িষ্যায়, কি দাক্ষিণাত্যে, কি পাঞ্জাবে, সর্ব্বত্রই পাষাণ-স্থপতি ও ভাস্করগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি সকল ঘোষণা করিতেছে। খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, পুরী, ভুবনেশ্বর বা কণার্ক, ইলোর, এলিফ্যাণ্টা, অজন্তা বা পাণ্ডবগুম্ফা, দিল্লী, আগ্রা বা কুতব—যেখানে যাওয়া যাক্, সকলেই নীরবে জাতীয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এই সকল দেখিয়া কেবল মাত্র বাঙ্গালীই একটা আক্ষেপ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে—তাহার দেখাইবার কিছু নাই। হৃদয়ের এই সন্তাপ নিবারণের জন্ত তাহার একমাত্র বাঞ্জনা ছিল এই যে, এই প্রস্তরবিহীন প্রদেশে তখনও ভাস্কর-শিল্পের স্থান নাই। যাহাও বা ছিল, তাহাও আর হাওয়ায় প্রতিকূলতায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। একবার একজন বাঙ্গালী ডেপুটীর মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি প্রমাণ পাইয়াছেন যে, উড়িষ্যায় অনেক কীর্ত্তি বাঙ্গালী শিল্পীর রচিত। যে বাঙ্গালী নিজের দেশে কিছুই করিতে পারে নাই, সে বাহিরে যাইয়া কৃতিত্ব দেখাইতেছে, ইহার পক্ষে যুক্তি এই যে, দেশে প্রস্তরের অভাব। দেশে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা নাই বলিয়া বিদেশ হইতে ব্যাখ্যাকার আনিয়াছিল বলিয়া যে জাতির প্রবাদ, তাহারা কি বিদেশ হইতে প্রস্তর আনিয়া আপনাদের কীর্ত্তি স্বদেশেই চিরস্থায়ী করিতে পারিত না? এই সন্দেহ মনে জাগিলেও, খোস্ খবরের ঝুটাও ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া গিয়াছিল। সময়ে সময়ে শিল্পচাতুর্য্যের দুই একটী নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিদেশ হইতে আনীত বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্ধারিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে এমন একটী ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে বাঙ্গালীকে আর মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে না। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে এমন বৃহদাকার প্রস্তর-খণ্ড সকল পাওয়া গিয়াছে যাহা তক্ষণ-কার্য্যের উপযোগী করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, কোনও দৈব-দুর্বিপাকে কার্য্যশেষ হয় নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রস্তর বিদেশ হইতে আনীত হইলেও, শিল্পী দেশীয়। বিষয়টী এখন আর কেবল মাত্র অনুমানের অন্তর্ভূত নহে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি বাঙ্গালী জাতির এই বিষয়ক কৃতিত্ব প্রত্যক্ষীভূত করাইয়া সমগ্র জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আরও গৌরবের বিষয় এই যে, এই সমিতি সম্পূর্ণরূপেই বাঙ্গালীর

কীর্ত্তি—ইহার জন্মদাতা বাঙ্গালী, ইহার পরিচালক বাঙ্গালী।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি নানা দিকে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে তোলপাড় কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাস যে লক্ষ্মণসেনের পলায়নের ইতিহাস নয়, কিন্তু যে সময়ে উত্তর ভারত বিদেশীর আক্রমণে বিধ্বস্ত, সেই সময়ে বাঙ্গালীই সগর্ব্বে সাম্রাজ্য-স্থাপনের জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান—এই ইতিহাস সেই গৌরবজনক ইতিহাস. বাঙ্গালী কোনও কালেই যে ষষ্ঠাংশ দিয়াই আপনার রাষ্ট্রবিষয়ক কর্ত্তব্য শেষ করে না, কিন্তু সেই অন্ধকার-যুগেও অরাজকতার সময়ে স্বনির্ব্বাচিত রাজা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল এবং যুরোপ যে সময়ে ধর্ম্ম লইয়া কাটাকাটি করিতেছিল, বাঙ্গালী সেই সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা দিয়া রাষ্ট্র চালাইতেছিল—আমরা সেই ইতিহাস শুনিতে পাইতেছি। অন্যদিকে সমিতি যে সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা দ্বারা ভারতের ধর্ম্মবিকাশের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন কোঠা আলোকিত হইবে। কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস তন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু সে কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। আজ কেবলমাত্র তক্ষণ ও ভাস্কর-শিল্প-বিষয়ক সংগ্রহের কথাই বলিব এবং তাহাও অতি সংক্ষেপে। বিশেষ বিবরণ, বাঙ্গালী পাঠক ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্যে' প্রাপ্ত হইবেন।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি রাজসাহীতে যে সংগ্রহাগার স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। কৌতূহলবশতঃ দেখিতে গিয়াছিলাম, হৃদয়ের চিরদিনের পোষিত আকাঙ্ক্ষা মিটিবে—এ ধারণাই তখন ছিল না। কত দুর্লভ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, কত শিলালিপি, কত প্রস্তর-মূর্ত্তি! ধাতু ও দারুনির্ম্মিত সংগ্রহও আছে। কিন্তু প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যবদ্বীপে কতকগুলি মূর্ত্তি পাইয়া পণ্ডিতগণ মহাসমস্যায় পড়িয়াছিলেন—এগুলির আদর্শ কোথা হইতে আসিল? কিন্তু ভরসা হয়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সে সমস্যার মীমাংসার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছেন। সূর্য্যমূর্ত্তি, অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের কত কথা যে খোদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। আমি মাত্র একটী মূর্ত্তির কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মূর্ত্তিটী বিষ্ণুর বাহন গরুড়। ইহা যে বাঙ্গালীর হস্তরচিত, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ঐ মূর্ত্তিটীর মধ্যেই রহিয়াছে। বিষ্ণু যেন স্বীয় বাহনের উপর ইচ্ছা করিয়াই একটু চাপ দিয়া বসিয়াছেন, গরুড় সে চাপ অগ্রাহ্য করিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে, ইহাই মূর্ত্তিটীর বাহ্যদৃশ্য। কিন্তু শিল্পীর সমস্ত শিল্প-চাতুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে গরুড়ের মুখে। শিল্পী আপনার প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া তন্ময়ভাবে একটী মহান্ আধ্যাত্মিক ভাবকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ সর্ব্বদাই

পরীক্ষার ফেলিয়া অনল-দগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তোলেন।—

"যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ ;
তবু যদি না ছাড়ে পাশ, হই তার দাসের দাস।"

ইহা ভক্তি-শাস্ত্রের কথা। ভক্ত সর্ব্বদাই আনন্দ-হৃদয়ে ভগবানের সকল ভার বহনে প্রস্তুত। মৃত্যুতেও তিনি আনন্দ-চিত্ত। ভগবান্, তুমি যত ভারই চাপাও না কেন, তোমার প্রসাদে আমি সকল ভারই অতিক্রম করিতে সমর্থ—গরুড়মূর্ত্তি যেন দিব্যকণ্ঠে এই কথা বলিতেছে। প্রস্তরখানিতে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, নির্ভরের আনন্দ এবং সর্ব্বোপরি ভগবদ্ভক্তের সদানন্দ হাসিমুখ যেন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে। ভক্তিকে এমন প্রকট মূর্ত্তি দিবার ক্ষমতা বাঙ্গালী ভিন্ন জগতে আর কাহারও নাই। মূর্ত্তিখানিতে বাঙ্গালিত্ব যেন দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সমিতির তোষাখানায় আমি যতক্ষণ ছিলাম, অধিকাংশ সময় এই রত্নটির নিকটেই ক্ষেপণ করিয়াছি, ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহারই নিকটে আসিয়াছি এবং এই আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান-সমিতির যিনি মেরুদণ্ড, তাঁহাকে মনে মনে শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। মনে মনে এইজন্য যে, ধন্যবাদ লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হওয়া এক কঠিন কার্য্য। তিনি আদর্শ-কর্ম্মী। অন্যে যে স্থানে এক গুণ কার্য্য করিয়া দশ গুণ প্রশংসার জন্য লালায়িত, তিনি সে স্থানে আত্মগোপন করিবার জন্যই ব্যস্ত। অথচ অকাতরে তিনি এই কার্য্যের জন্য সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া স্থানান্তরে দুই কথা লিখিয়াছিলাম, প্রুফ্ দেখিবার সময় তিনি স্বহস্তে তাহা কাটিয়া দিলেন। বঙ্গের জমিদারগণ ঘরে বাহিরে অনেকেরই চক্ষুঃ শূল কিন্তু তাঁহারা যদি কুমার শরৎকুমারের অনুকরণে দেশের মঙ্গলে আপনাদিগকে নিয়োজিত করেন, তবে জনসাধারণের শুভাকাঙ্ক্ষার উপর তাঁহাদিগের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং সে শূল তাঁহাদিগের গাত্রও স্পর্শ করিবে না, কেবলমাত্র প্রতিপক্ষেরই চক্ষের বেদনা জন্মাইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

যখন জগদীশবাবু বালেশ্বর জেলার পুলিশের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন সেই সময়ের পুলিশের ইন্স্পেক্টার জেনারেল্ কর্ণেল্ পিউ সাহেব উক্ত জেলার পুলিশের কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তথায় যান; গিয়া জগদীশ বাবুকে বলিলেন—"আমি আপনার পুলিশের কর্ম্ম দেখিতে চাহি না; আমি জানি, উহা উত্তম; বীমস্ সাহেবও আমাকে ঐরূপ বলিয়াছেন। আমি আপনার মিলিটারী সম্বন্ধীয় কার্য্য দেখিতে চাহি।" জগদীশবাবু উত্তর

করিলেন—"আপনি ঐ কর্ম্ম দেখিবেন বলিয়া আমি প্রায় তিন শত কনষ্টবল রিজার্ভে আনিয়া রাখিয়াছি; তাহাদের অস্ত্র লইয়া সজ্জিত হইয়া এখনই আসাইতেছি।" কনষ্টবলেরা লাইনের মাঠে সমবেত হইলে, পিউ সাহেব স্বয়ং স্থানে স্থানে নিশান গাড়িলেন এবং বলিলেন—এইটী জঙ্গল, এইটী নদী, এইখানে শত্রুরা আছে; আপনি স্বয়ং হুকুম দিয়া আপনার ফৌজকে লইয়া যান, যাইবার সময় সমস্ত ম্যানুয়েল ও প্লাটুন এক্সারসাইজ্ দেখাইয়া যা'ন।" জগদীশবাবু তাহাই করিলেন এবং এমন সুচারুরূপে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন যে, পিউ সাহেব ছুটিয়া আসিয়া হস্তমর্দ্দন করিয়া উঁহাকে জয়যুক্ত ঘোষণা করিলেন; বলিলেন—"দেখুন, আপনি বাঙ্গালী, এই কর্ম্মে আপনার দোষ আমি নিশ্চয় পাইব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিতেছি যে, আমার পল্টনে কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা আপনি ভাল কাজ করিয়াছেন, আমি গবর্ণমেণ্টে আপনার সম্বন্ধে স্পেসিয়াল্ রিপোর্ট করিব। আশ্চর্য্যের কথা, আপনি শিখিলেন কেমন করিয়া? বিউগল ধ্বনি করিবার সময় ভুল করিয়াছিল; তাহাও আপনি জানিতে পারিয়া ভুল ধরিয়া তাহার দুই টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ধন্য আপনার অধ্যবসায়!" বালেশ্বরে থাকিবার সময় স্যার্ রিচার্ড টেম্পল্ ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিবার জন্য বড়লাটকে লেখেন। জগদীশ বাবু এ সংবাদ পাইয়া, তখনই ছোটলাটকে লিখিলেন এবং রায় বাহাদুর লিষ্ট হইতে আপনার নাম কাটাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। টেম্পল্ সাহেব বড় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু উঁহার অনুরোধও উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

বালেশ্বরে একজন পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ জগদীশবাবুর আর্দ্দালী ছিল; এ লোকটি সাত হাত লম্বা এবং গৌরবর্ণ, ভাল লোক বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পুলিশ সাহেবেরাও ইহাকে আর্দ্দালীর পদে রাখিয়াছিলেন; এই লোকটার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা উড়িয়া যুবতীকে দেখিয়া তাহার প্রেমাসক্তি হইল। গভীর রাত্রে পুলিশ সাহেবের বাটী ত্যাগ করিয়া সে বুড়াবলং নদীর ধারে সেই স্ত্রীলোকটার ঘরে যায় এবং প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই স্ত্রীলোকটা অপর একটা ধনী ব্যবসায়ী মাইতি কায়স্থকে আপনার নিকট আসিতে দিত। কনষ্টবল এ কথা জানিতে পারিয়া ইহাকে বলে—'দেখ, তোমার জন্য আমি জাত্ দিয়াছি এবং তোমার প্রেমে আমি পাগল, তুমি আর কাহাকে আসিতে দিও না।' স্ত্রীলোকটা সে কথা শুনিবে কেন? মাইতি যথেষ্ট পয়সা দিত, সুতরাং সে তাহাকে আসিতে নিবারণ করিত না। একদিন রাত্রে কনষ্টবল যেমন উহার ঘরে যাইতেছে, সেই সময়ে মাইতিও ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। যেমন তাহাকে দেখা, অমনি কোমর হইতে তলোয়ার খুলিয়া আর্দ্দালি এক কোপে তাহাকে কাটিয়া, নদীর জলে কাপড়, তলোয়ার ধৌত করিয়া, পুলিশ সাহেবের বাটী আসিয়া শয়ন করিল। প্রাতঃকালে যখন জেল ও ট্রেজারীর গার্ড এবং লাইনের সুবাদার রিপোর্ট করিতে আসে, তখন কনষ্টবলও সেলাম করিয়া (স্যালুট) দাঁড়াইয়াছিল। সকলে লাইনে গ্রাউণ্ড্ বে জোড় দিয়া ফিরিতে লাগিল, কনষ্টবল মাঠে

মাঠে চলিল ! ইত্যবসরে সিনিয়ার টাউন্ ইন্‌স্পেক্টার সারদাপ্রসাদ বসু আসিয়া রিপোর্ট করিলেন—"সহরে একটা খুন হইয়াছে।" জগদীশ বাবু উত্তর করিলেন—"তদারক করগে।" সারদাবাবু অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া চলিয়া গেলেন; লাইনে পৌঁছিয়া, কনষ্টবল, হেড্ কনষ্টবল প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাপড়ওয়ালা মাইতি কায়স্থটি যে খুন হইয়াছে, তাহাকে কি তোমরা কেহ চেন ? যদি জান, তবে বলিতে পার, বুড়াবলং নদী তীরে সে অত রাত্রে কেন গিয়াছিল।" জনৈক কনষ্টবল বলিল—"হুজুর, ওখানে একটা বেশ্যা আছে, তাহারই নিকট রাত্রে ঐ মাইতি যাইত।" সারদাবাবু বলিলেন—'সে বেশ্যাটার কাছে আর কেহ যাইত, তাহা কি জান ?"কেহ সঠিক বলিতে পারিল না। একজন বলিল—"পুলিশ সাহেবের আর্দ্দালী শোভন সিংহকে ঐ স্ত্রীলোকটার বাটীতে যাইতে দেখিয়াছি।" তখন সারদা বাবু বলিলেন—"শোভন সিংহের চরিত্র খুব উত্তম, সে ২।৩ টা গুড্ কন্‌ডাক্‌ট্ ষ্ট্রাইপ্ পাইয়াছে, সকল পুলিশ সাহেবদের সে প্রিয়; অমন লোক বেশ্যাবাড়ী কেন যাইত ? যাহাই হউক, তাহাকে ডাকাইয়া এ বিষয়ের কিছু জানে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষতি কি, একজন কনষ্টবল গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আন।' কনষ্টবলটি ডাকিতে চলিল এবং লাইনের মাঠের উপর দিয়া চলিল, পুলিশ সাহেবের বাটী এবং লাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, এক বৃক্ষের তলায়, শোভন সিংহকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাইল; কাছে গিয়া তার মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, মুখখানায় যেন হিঙ্গুলের সিন্দুর মাখাইয়া দিয়াছে; আরক্তিম মুখ এবং চক্ষু দুটিও ঘোর লাল হইয়াছে এবং ঘুরিতেছে। তবুও সাহসে ভর করিয়া কনষ্টবল বলিল—"শোভন সিংহ, তোমকো সারদা বাবু বোলাওতা হ্যায়; নদী-কিনারে ক্যা খুন হুয়া, উস্কা বাত্ তোমকো কেয়া পুছেগা।" যেমন ঐ কথা শুনা, শোভন সিংহ অমনি তলোয়ার খাপ হইতে খুলিল এবং বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিল—"যাও, তোমারা ইন্‌স্পেক্টার শালাকো কহো মেয়্ নেহি আয়েঙ্গা, মেয়্ খুন্ কিয়া, মেয়্ ফাঁসি জায়েঙ্গা।" কনষ্টবল আর দিরুক্তি না করিয়া লাইন অভিমুখে ছুটিল এবং সমস্ত সংবাদ জানাইল। সারদা বাবু, সাহেব রিজার্ভ ইন্‌স্পেক্টার, সাহেব হেড কনষ্টবল, পঞ্জাবী সুবেদার এবং নানাদেশীয়, নানাজাতীয় কনষ্টবলগণ ছুটিল। কনষ্টবলদের ভিতর উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, গুর্‌খা, পাঠান, আফগান প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকই ছিল; লাঠী, শোটা, তলোয়ার, বন্দুক, বেওনেট্ লইয়া সকলে ছুটিল। গাছতলার নিকট পৌঁছিলে শোভনসিংহ বলিল—"দেখো, হামারা নগিচ্ কই মৎ আও, আনেসে যেয়্সা উস্কা কাটা, তেয়্সা তোম্ লোককো বি কাটেগা, হাম বোল্‌তা হ্যায়্ মেয় খুন্ কিয়া, মেয়্ ফাঁসি যায়েঙ্গা।" কেহই অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল না, ছর্‌রা দিয়া বন্দুক ভরিয়া রাখা হইল। শেষে সাব্যস্ত হইল—পুলিশসাহেবকে খবর দাও। জগদীশবাবু সংবাদ পাইয়া, যে বেশে ছিলেন, সেই বেশেই চলিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটা ফ্লিন্‌পাও ইজের, একজোড়া মোজা ও চটি জুতা, একটা জামা, তার উপর একটা আলখাল্লার

মতন। দ্রুতপদে তিনি চলিলেন এবং শীঘ্র গাছতলার নিকট পৌঁছিলেন। তাঁর পৌঁছিবার পূর্ব্বে সকলে বলিতেছিল "যদি পুলিশসাহেবের উপর চড়াও করে, তবে আমরা ছর্‌রা-গাদা বন্দুক উহার গায়ে মারিব।" জগদীশবাবু কাহাকে কিছু না বলিয়া কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, একেবারে খুনে শোভন-সিংহের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "তলোয়ার ফেঁকো,আবি তলোয়ার ফেঁকো।" এই হুকুম দিবার সময় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; শোভনসিংহ তাঁহার মুখের দিকে দুই একবার তাকাইয়া তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল। তখন জগদীশবাবু হুকুম দিলেন—"ইহার হাতে হাতকড়ি দাও।" কেহ অগ্রসর হয় না; তখন তাহার জামার আস্তিন ধরিয়া বলিলেন "লাগাও হাতকড়ি।" সুবেদার দৌড়িয়া গিয়া হাতকড়ি লাগাইয়া দিলেন। তখন জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোম্ এ খুন কিয়া?" "হাঁ হুজুর" উত্তর আসিল। তখন "লে যাও" বলিয়া জগদীশবাবু দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। সকলে চিত্রপুত্তলিকাবৎ রহিল এবং একবাক্যে বলিতে লাগিল—"কি সাহস, কি বীরত্ব!" কতকগুলি লোক যারা পূর্ব্বে পল্‌টনে কাজ করিত এবং যুদ্ধ বিগ্রহ দেখিয়াছে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"এ রকম বিক্রম আমরা যুদ্ধে কিম্বা অপর কোন কার্য্যে দেখি নাই।"

বালেশ্বরে চাঁদবালী বন্দর খুলিবার জন্য জগদীশবাবু বিস্তৃত করিয়া রিপোর্ট করেন। তাঁহারই রিপোর্ট পাইয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ বন্দর খুলিলেন। বালেশ্বরে সমুদ্রের কিনারে নিমকের পোক্তান এখনও হয়। সমুদ্রকিনারা জঙ্গলপূর্ণ, নানা হিংস্রক জন্তুতে পরিপূর্ণ, সুতরাং চোরাই পোক্তানি খুব চলে, গবর্ণমেণ্টের ইহাতে বহু ক্ষতি হয়। চৌকি পাহারা করিবার জন্য ছয়মাসের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োজিত হয়। তাহাদের ঠিকা চাকরি, সুতরাং অতিরিক্ত রোজগারের আশায় তাহারা পোক্তানকারীদের সহায়তা করে; সরকারের নিয়মিত লোক্‌সান হয়। কাপ্তেন্ চেম্বার্স নামক জনৈক ডিপুটি ইন্‌স্পেক্‌টার জেনারেল্ চুরি বন্ধ করিবার জন্য জঙ্গলের ভিতর হস্তিপৃষ্ঠে পুলিশ বসিয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করেন; ব্যয়াধিক্য হয় বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। জগদীশবাবু এক সুকৌশল করিয়া চুরি বন্ধ করেন, নিমকের অস্থায়ী পুলিশকে তিনি স্থায়ী পুলিশের কর্ম্ম করিতে দিলেন এবং স্থায়ী পুলিশকে নিমক মহলে কার্য্য করিতে পাঠাইলেন, স্থায়ী দলকে বলিলেন—"দেখ, তোমাদের চিরদিনের রুটি, লোভে পড়িয়া তাহা হারাইও না, এক ছটাক অতিরিক্ত লবণ যেন পোক্তান না হয়। ভাল কাজ করিলে আমি তোমাদের শীঘ্র পদোন্নতি করিয়া দিব।" অস্থায়ী পুলিশকে বলিলেন,—"তোমাদের ছয় মাসের জন্য ঠিকা কর্ম্ম। যদি স্থায়ী পুলিশে আসিতে চাও, চোরাই লবণ ধরিতে চেষ্টা কর; এক ছটাক ধরিলেও তোমাদের মঙ্গল হইবে।" এই রকম উভয় পুলিশদিগকে উত্তেজিত করায় অতিরিক্ত আইনবিরুদ্ধ পোক্তান একেবারে বন্ধ হইল। অতিরিক্ত পোক্তানিটা কি, তাহা বুঝাইয়া বলি। ব্যবসায়ীরা কেহ ত্রিশ হাজার মণ, কেহ পঞ্চাশ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে সরকারকে

মাশুল প্রদান করেন। লবণ প্রস্তুত করিতে গেলে, সমুদ্রের জল চাই; সুতরাং সকল গোলাই (লবণ তৈয়ার করা) সমুদ্রের কিনারে হয়। এখন এ সব স্থান জঙ্গলপূর্ণ, হিংস্রকজন্তুর আবাসভূমি; ঐ সামান্য অতিরিক্ত পুলিশদল ব্যতীত পাহারা দিবার অপর কেহ নাই, এই দলকে টাকায় বশীভূত করিয়া ত্রিশ হাজার মণ করিব বলিয়া পঞ্চাশ হাজার মণ 'তৈয়ার' করিয়া লইলে, কে আমার প্রতিরোধ করিবে? সরকারকে বিশ হাজার মণ তৈয়ার করিবার জন্য মাশুল ফাঁকি দিলাম, অনেক টাকার সুবিধা হইয়া গেল।

জগদীশবাবুর বাঙ্গালী নামের উপর কি যত্ন ছিল এবং কেমন করিয়া তিনি পুলিশদলের উপর ডিসিপ্লিন্ (discipline) রক্ষা করিতেন, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি—নীলগিরি জঙ্গলের ভিতর, গড়জাত এলাকার একটা পুলিশ ষ্টেশনে ঘর নির্ম্মাণ হইতেছিল, জগদীশবাবু ঐ ঘরটী দেখিতে যান। ঘরটীর দরজা জানালা তখন কিছুই বন্ধ নাই, চতুর্দ্দিক্ খোলা ছিল। জগদীশবাবুকে এ ঘরে রাত্রে বাস করিতে হয়। সামান্য একটা খাটিয়ায়, তিনি শয্যা করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি যখন গভীর হইল, চতুর্দ্দিকে, ব্যাঘ্র, ভল্লুক এবং অপরাপর জন্তুর ভীষণ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। জগদীশ বাবুর নারায়ণ বলিয়া একটা বাঙ্গালী খান্‌সামা, ভীষণ শব্দ শুনিয়া ভয়ে সেই প্রভুর খাটিয়ার নিম্নে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রহরী বলিয়া উঠিল— "দেখো, বাঙ্গালিকা কাম্, পুলিস সাহেব নিদ্ যাতা হ্যায়, এ বাঙ্গালি উন্‌কো খাটিয়াকা তলেমে যাকে ঘুসা।" এ কথাগুলি, জগদীশ বাবুর কর্ণে গেল, তখন তিনি সহসা উঠিয়া, সে অন্ধকারে একাকী ষ্টেশন-ঘরের চারি পার্শ্বে অকুতোভয়ে বেড়াইয়া আসিলেন এত নিকটে জন্তুগুলা চিৎকার করিতেছিল যে, প্রদক্ষিণের সময় কোন না কোন একটা জন্তু তাঁহার সম্মুখে আসিতে পারিত, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ অকারণ বিপদ আহ্বান করা কেন? তিনি বাঙ্গালী, পাহারাওয়ালা বাঙ্গালী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী নামের গৌরব-রক্ষার্থে এবং তাঁহার অধীনস্থ ফোর্সের (force) ঠিক চাল বজায় রাখিবার জন্য, তিনি বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া, নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন।

বালেশ্বরে একটী দৈব ঘটনার কথা উল্লেখ করি, মেজিষ্ট্রেট-কলেক্টার নরম্যান্ সাহেবের বাটীতে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া জগদীশ বাবু যা'ন। যাইবার সময় কাথবরটান হারপারের বাড়ীর তৈয়ারি একজোড়া জুতা (shoes) পরিতেছিলেন, সহসা তাহা খুলিয়া ফেলিয়া মণ্টিন কোম্পানীর প্রস্তুত একজোড়া ব্যাল্‌মোরাল বুট (Balmoral boot) পরিলেন। পরিবার সময় তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—"দেখ, রাত্রে আসিব, 'সু'র পরিবর্ত্তে একজোড়া বুট পরা ভাল।" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, আনিতে গাড়ি যাইবে না?" তিনি বলিলেন—"দিবসে দু'টা ঘোড়া অধিক খাটিয়াছে, রাত্রে জুতিবার আবশ্যক নাই, বরং সর্দ্দার বেহারাটা একটা লণ্ঠন লইয়া যেন যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিও।" রাত্রি দুইটার সময় যখন মজলিস ভাঙ্গিয়াছে, তখন জগদীশ বাবু বেহারার তত্ত্ব লইলেন। সে খ্যাটা সুখে স্বচ্ছন্দে সাহেবের বেহারার ঘরে

নাসিকার রব করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল; সাহেবের চাকরদের ভিতর কেহই তাহার থাকিবার স্থানের কথা অবগত ছিল না, কোন সন্ধান না পাইয়া জগদীশবাবু পদব্রজে চলিয়া গেলেন। একটা খ্রীষ্টানপাড়ার ভিতর দিয়া যেমন যাইতেছেন, পথ জুড়িয়া একটা গোখুরা সর্প শয়ন করিয়াছিল, জগদীশ বাবু তাহার মধ্যস্থলে যেমন পা দিয়াছেন, অমনি সে বিষধরটা তাঁর পায়ে ৩৪ ছোবল মারিল; কামড়গুলা বুটের উপর পড়িল, তাঁহার কিছু হইল না, বাঁচিয়া গেলেন, জুতা জোড়াটি পরা থাকিলে, কি অনর্থই ঘটিত, কে যেন তাঁহাকে জুতা ছাড়িয়া বুট পরিতে বলিল, ভগবান এই প্রকারে তাঁহার ভক্তদের বাঁচাইয়া থাকেন। রাত্রে বাটী পৌঁছিয়া জগদীশ বাবু আর্দালীকে লণ্ঠন আনিতে হুকুম দেন। লণ্ঠন আনিলে, তাহার আলোকে দেখিলেন বুটের উপর তখনও বিষ রহিয়াছে, সর্পটা ছুটিয়া আসিয়া পাছে কামড়ায়, এই আশঙ্কায় জগদীশবাবু তাহার মাথা পদদলিত করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, কনষ্টবলদের সেই সর্পটাকে তুলিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন, তাহারা সেটাকে আনিলে, দেখিলেন—তখনও সে গর্জন করিতেছে, এক 'বাঁও' অপেক্ষাও লম্বা, কনষ্টবলরা তখন সেটাকে লগুড়াঘাতে সংহার করিয়া অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিল।

(ক্রমশ)

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(২)

রস দুই জাতীয়,—এক স্থায়ী, অপর অস্থায়ী। রসতত্ত্ববিদেরা হাস্যাদ্ভুতাদিকে অস্থায়ী বা আগন্তুক, আর দাস্যাদিকেই স্থায়ী রস বলিয়া থাকেন। হাস্যাদি আগন্তুক রস ইতর জন্তুরাও আস্বাদন করিয়া থাকে। দাস্যাদি স্থায়ী রস কেবল মানুষেই আস্বাদন করিতে পারে। আর স্থায়ী এবং অস্থায়ী—এই উভয়বিধ রসের মধ্যে মাধুর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। মাধুর্য্যে দাস্যাদির ভাব তো আছেই; কিন্তু তার উপরে এই মাধুর্য্যকে আশ্রয় করিয়া হাস্যাদি আগন্তুক রস সকলও অতি অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠে। সচরাচর হাস্যাদি আগন্তুক রসের পরস্পরের মধ্যে একটা স্থিতি-বিরোধ জাগিয়া রহে। [illegible] আধারে যে সময়ে ইহার কোনও একটা রস ফুটিয়া উঠে, সেই সময়ে সেই আধারে অপর কোনও আগন্তুক রস ফুটিবার স্থান অবসর পায় না। রুদ্ররসের আবির্ভাবে হাস্যের তিরোভাব অনিবার্য্য। ক্রোধের সঙ্গে কারুণ্যের সমাবেশ ও সম্ভব [illegible]

আধ্য। কিন্তু মাধুর্য্যেতে সর্ব্বদাই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। মাধুর্য্যরস-নিমগ্ন ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ক্রোধ ও কারুণ্য, ভয় ও অভয়, কোমল ও রুদ্র প্রভৃতি বিপরীতভাব সকল জাগিয়া উঠিয়া পরস্পরের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া দেয়। এই কারণে মাধুর্য্য এত জটিলতা প্রাপ্ত হয়। আর এইজন্যই মাধুর্য্যের রূপ বা মূর্ত্তিও এক-দিকে যেমন নিরতিশয় মনোহর, অন্যদিকে সেইরূপ অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে।

রসের যাবতীয় রূপই জীবদেহে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু দাস্য-সখ্যাদি স্থায়ী রসের মধ্যে মাধুর্য্য রস যেমন করিয়া মানুষের দেহকে অধিকার ও অভিভূত করে, এমন আর কোনও রসে করিতে পারে না। অন্যদিকে অপর কোনও রসে মানুষের শরীরকে অধি-কার ও অভিভূত করিয়াই, আবার পলে পলে তাহাকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য এতটা প্রলয়ঙ্কর সংগ্রামও উপস্থিত করে না। এ রস মানুষের এই দেহে, তার ইন্দ্রিয়গ্রামকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়, সত্য; কিন্তু আবার এই দেহের দেহত্ব অর্থাৎ তার জড়ত্বকে এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব অর্থাৎ তাহাদের আপনার বিশিষ্ট বিষয় ভোগ করিবার যে প্রবল লোভ আছে, সেই লোভকে নষ্ট না করিয়া, এ রস কিছুতেই আপনার চরম চরিতার্থতাও লাভ করিতে পারে না। এই রস সত্যসত্যই "দগ্ধেন্ধন-মিবানলম্"—দগ্ধকাষ্ঠনিঃসৃত অনলের ন্যায়। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়াই প্রাচীনকালে আগুন জ্বালাইতে হইত। কিন্তু যে কাষ্ঠ-খণ্ডের ঘর্ষণে এই অগ্নির প্রথম উৎপত্তি হইত, সেই অগ্নি আপনার প্রথম আশ্রয় সেই কাষ্ঠফলককে বা অরণীকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়াই ক্রমে আপনার পূর্ণতম ও উজ্জ্বলতম রূপ এবং স্বরূপকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিত। মাধুর্য্যরসেরও এই ধর্ম্ম। মাধুর্য্যও মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া, তার ইন্দ্রিয়-গ্রামের মন্থন হইতেই প্রথমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ক্রমে সেই দেহের জড়ধর্ম্মের ও তার ইন্দ্রিয়কুলের স্বাভাবিক বিষয়লিপ্সার একান্ত নিরসন না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাতে এই অপূর্ব্ব রসের স্বকীয় রূপ ও স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

রসমাত্রেই প্রবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তির পথই রসের পথ। নিবৃত্তিমার্গে এ বস্তু মিলে না। আর মানুষের যাবতীয় প্রবৃত্তির মধ্যে কাম-প্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। জীব এ জগতে দুইটা প্রবৃত্তির তাড়নায় এত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। এক তার ক্ষুৎপ্রবৃত্তি, আর অপর—এই কামপ্রবৃত্তি। জীবের ক্ষুধার প্রেরণা অতিশয় বলবতী। তার কামের সন্ধুক্ষণ এই ক্ষুধার তাড়না অপেক্ষা কোনও অংশে দুর্ব্বল নহে। ফলতঃ মূলে একই প্রয়োজন হইতে জীবের ক্ষুৎপ্রবৃত্তি ও কামপ্রবৃত্তি,—এ দু'য়েরই উৎপত্তি হইয়াছে। জীবস্থিতিরক্ষাই সেই মূল প্রয়োজন। জীব আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবে, এইজন্য ভগবান্ তাহাকে এই বল-বতী ক্ষুধা দিয়াছেন। সে আপনার বংশরক্ষা করিবে, এইজন্য তাহাকে এই দুর্দ্দান্ত কাম-প্রবৃত্তি দিয়াছেন। জীবস্থিতিভঙ্গনিবারণই জীবের ক্ষুধার তাড়না ও কামের সন্ধুক্ষণের মূল প্রয়োজন। দুইটাই জীবের আদিপ্রবৃত্তি। কিন্তু ক্ষুধাটা কদাপি রসনিষ্যন্দ হয় না।

ক্ষুধাটা একান্তই একটা শারীর ক্রিয়া। অন্নময় কোষেই তার উৎপত্তি, অন্নময় কোষেই তার বিলয়। ক্ষুধা আপনি জীবকে কোনও আনন্দ দান করে না। ক্ষুধার তৃপ্তিতে একটু আরাম ও আনন্দ লাভ হয় বটে ; কিন্তু অতৃপ্ত ক্ষুধায় কেবল যন্ত্রণাই আছে, কোনও আনন্দ নাই। এই বিষয়ে কামের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কামের সঞ্চারেই আনন্দ জাগিয়া উঠে। ক্ষুধার বৃদ্ধির সঙ্গে জীবের বেদনাই কেবল বাড়িয়া যায় ; সে যাতনার ভিতরে কোনও সুখ, কোনও উল্লাস, কোনও আনন্দ কখনও থাকে না। কিন্তু কাম যত বাড়ে, তার পিপাসা যত প্রবল হয়, সে পিপাসার যাতনা যত গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে, ততই সে ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গেই, আবার অক্লান্ত উৎসাহ, অনুপম উল্লাস এবং পরমানন্দও জাগিয়া উঠে। এ অদ্ভুত প্রবৃত্তিকে বিধাতা বিষামৃতে একত্র করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। এই কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে মাধুর্য্য রসের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এইজন্যই "কামগায়ত্রী" মাধুর্য্য সাধনের বীজমন্ত্র। কিন্তু পঙ্ক আর পঙ্কজ যেমন এক বস্তু নয়, সেইরূপ কাম আর মাধুর্য্যও ঠিক একই বস্তু নহে। দু'য়েতে স্বর্গনরক প্রভেদ রহিয়াছে। হীন ও হেয় পঙ্কেই যেমন পঙ্কজের জন্ম হয় ; সেইরূপ লোকে সচরাচর যাহাকে হীন ও হেয় কামপ্রবৃত্তি বলে, তাহা হইতে মাধুর্য্যেরও উৎপত্তি হয়। কয়লা হইতে হীরক জন্মে, তাই বলিয়া কয়লা আর হীরক এক হয় না। সেইরূপ কাম হইতে জন্মে বলিয়া, কাম আর প্রেমও এক হয় না। ফলতঃ সচরাচর, বিশেষতঃ আজিকালিকার কাম-প্রধান সভ্যতা ও সাধনা কামকে যেরূপ হীন এবং হেয় মনে করে, তাহাও ঠিক সঙ্গত নহে। প্রজননই কামের কর্ম্ম। এইজন্য কামের অভিমানী দেবতা কন্দর্পও শ্রীভগবানেরই বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ"— প্রজননের জন্য আমিই কন্দর্প। সৃষ্টিলীলায় এই কন্দর্প বা কামই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ সহায়। এই কাম্যদেবতা বা কন্দর্পই বিশ্বের বিশাল প্রাণস্রোতকে পুষ্ট করিয়া, জীবস্থিতি রক্ষা করিতেছেন। ভগবদ্বিভূতি বলিয়া কন্দর্পও নমস্য। কামও হীন বা হেয় নহে। প্রজনন-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে, ইউজিনিকের (Eugenics) প্রতিষ্ঠার করে, আধুনিক সভ্যতা এবং সাধনাতেও কামের মর্য্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রজননসম্পর্কবিহীন হইয়া, কাম যখন কেবলমাত্র ভোগপরম হইয়া উঠে, তখনই তাহা হেয় ও হীন হইয়া পড়ে। জীবস্থিতি-রক্ষার জন্য যে প্রবৃত্তির সৃষ্টি, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া, তখন সেই প্রবৃত্তিই জীবস্থিতিভঙ্গের সহায় হইয়া উঠে। আর ভোগপরম লোকে পবিত্র কামপ্রবৃত্তিকে তার স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া তার বর্ত্তমান অধোগতি ঘটাইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনেরা প্রজননের জন্যই কামের সেবা করিতেন। তাঁহাদের কাম ভোগপরম ছিল না। ইজন্যই সেকালে লোকে কামের নাম করিতে একটুও সঙ্কুচিত হইতেন না। তাঁরা "কামায় কামপতয়ে"—বলিয়া সর্ব্বলোক-সমক্ষে, নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে কন্যা সম্প্রদান করিতেন। আর কামের মর্য্যাদা তাঁরা জানিতেন বলিয়াই, সকল রসের সেরা,

সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক-সম্পদ-সম্পন্ন যে মাধুর্য্য-রস, তাহাকেও শৃঙ্গার বা আদিরসের সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

ফলতঃ শৃঙ্গার আর মাধুর্য্য একই বস্তু। সাহিত্যে যাহাকে শৃঙ্গার-রস বা আদিরস বলে, রসতত্ত্বে তাহাকেই মাধুর্য্য বলিয়াছেন। সাহিত্যের রস আর ভক্তির রস একান্ত বিভিন্ন জাতীয় বস্তু নহে। ভক্তির সঙ্গে রসতত্ত্বের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভক্তি শ্রীভগবান্‌কে নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তিরূপেই ভজনা করে। আর শ্রীভগবানেতে যে সকল রস নিত্য ফুটিয়া থাকিয়া, তাঁর এই নিখিল রসামৃতমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই সকল রসই সাহিত্যেরও উপজীব্য। মানবের যাবতীয় রস-পিপাসা ও রসসৃষ্টি সেই ভগবল্লীলারসকে আশ্রয় করিয়া, তারই উদ্দেশে অবিরাম ছুটিতেছে। সত্য বটে যে শ্রীভগবানের রসমূর্ত্তি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত; আর সাহিত্যের সাধারণ রসস্ফূর্ত্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং প্রাকৃত। কিন্তু প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত গুণবাচক শব্দমাত্র, বস্তুবাচক শব্দ নহে। ইহারা বস্তুর গুণমাত্রই প্রকাশ করে, সে বস্তুর বস্তুত্বকে নির্দ্দেশ করে না। ইহাতে বস্তুর গুণেরই বৈষম্য বুঝায়; কিন্তু কোনও মৌলিক পার্থক্য বুঝায় না। রস-বস্তু এক, দুই বা বহু নহে। যাহাকে প্রাকৃত বলি, তাহাও সেই রস, যাহাকে অপ্রাকৃত বলি তাহাও সেই একই রস। আকারের বৈষম্য, প্রকাশের ইতর-বিশেষ, গুণের তারতম্য আছে, কিন্তু বস্তু এক। কেবলমাত্র গুণভেদে প্রাকৃতাপ্রাকৃতের বিভিন্নতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত রস রাজসিক বা তামসিক, তাহা মলিন। প্রাকৃত দেহের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দিগকে আশ্রয় করিয়া, প্রাকৃত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও প্রেরণায় যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা প্রাকৃত রস বলিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রাকৃত রসই যখন আবার নির্ম্মল হইয়া সাত্ত্বিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই অপ্রাকৃত পদবাচ্য হইয়া থাকে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রামাবতী

(৪)

পাল-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেও আত্মরক্ষার জন্য বিপুল উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। রামাবতী-নির্ম্মাণ তাহার প্রমাণ-রূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। রামাবতী নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে রাজধানী কোন্ স্থানে বর্ত্তমান ছিল, তাহার পরিচয় অদ্যাপি উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সে রাজধানী পরিত্যক্ত ও নূতন স্থানে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল কেন, তাহার কিছু কিছু পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

রামাবতী-নির্ম্মাতা রামপালদেবের পিতা তৃতীয় বিগ্রহপাল ইতিহাস-পাঠকের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার একখানি তাম্রশাসন বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার আমগাছী গ্রামে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এক কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইবার পর, তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত কোল্‌ব্রুক্ তাহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণমাত্র প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হর্‌নালি একবার সম্পূর্ণ পাঠের উদ্ধার-চেষ্টার পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পদ্যাংশের সম্পূর্ণ পাঠ অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। গদ্যাংশের পাঠ এখনও বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এই তাম্রশাসনে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহার দীর্ঘকাল পরে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক পরিচয়-বিজ্ঞাপক প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে, মদনপালদেবের মনহলী গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে, এবং গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দি-বিরচিত রামচরিতম্ কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ উল্লিখিত থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেব প্রথম মহীপালদেবের পৌত্র এবং নয়পালদেবের পুত্র। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পরিচয় সকল তাম্রশাসনেই একরূপ,—তাহাতে কোনরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই। তাঁহার নিজের তাম্রশাসনে এবং তাঁহার পৌত্র মদনপালদেবের তাম্রশাসনে আছে,—তিনি "শত্রুকুল-কালরুদ্র" ছিলেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে আছে—তিনি "সর্ব্বাকারদ্ধি-সংসিদ্ধ" ছিলেন। এরূপ সাধারণ ভাবের পরিচয়ে ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

রামচরিতম্ কাব্য এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া, একটি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। তাহার সহিত তাম্রশাসনোক্ত প্রশংসা বাক্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সত্য সত্যই "শত্রুকুল" ছিল। তাঁহার শত্রু প্রবলপরাক্রমশালী ছিলেন। অবশেষে সেই শত্রু তৃতীয় বিগ্রহপালের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া, "কপাল-সন্ধি" সংস্থাপিত করিয়া, আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কর্ণ,—তিনি ডাহলাধিপতি ছিলেন। রামচরিতম্-কাব্যের (১৯) শ্লোকটি এই,—

সহসা-বিতরণ-জিতকর্ণঃ কৌণীং
যৌবনশ্রিয়োদূহে।
অশ্রান্ত-দানবারাতি-শয়ো যো হভূদ্ যামুচরঃ॥

এক অর্থে এই শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের জনক দশরথের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; অন্য অর্থে এই শ্লোকেই আবার রামপালদেবের জনক তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দশরথ-পক্ষে যে ভাবে পাঠ করিতে হইবে, শ্লোকটি সেইভাবে উপরে লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপাল-পক্ষে যে ভাবে পাঠ করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

সহসাবিত-রণজিত্ত-কর্ণঃ ক্ষৌণীং
যৌবনশ্রিয়োদূহে।
অশ্রান্ত-দানবারা-তিশয়ো যোহভূদ্বৃষানুচরঃ॥

রামচরিতম্-কাব্যের টীকায় উভয়পক্ষের অর্থ উদ্ঘাটিত হইয়াছে ; এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল-পক্ষের অর্থোদ্ঘাটন-সময়ে টীকাকার বলিয়া দিয়াছেন,—দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়া, তৃতীয় বিগ্রহপালদেব রণপরাজিত কর্ণকে উন্মূলিত না করিয়া, তাঁহাকে "রক্ষিত" করিয়াছিলেন। মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য টীকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

[দশরথ-পক্ষে]

"সহসেত্যাদি। যো দশরথো যৌবনশ্রিয়া তরুণিমসংপত্ত্যা সহ ক্ষৌণী মুদূহে। সহসা বিতরণেন অবলম্বিত-দানেন জিতঃ কর্ণঃ কানীনো যেন। অশ্রান্ত অপ্রাপ্তশ্রমো দানবারাতীনাং দেবানাং শয়ঃ করো যস্মাৎ। অতএব হি অসুর-পরাজয়-সিদ্ধেঃ বিবুধৈঃ করেণ প্রহরণ-গ্রহণ-শ্রমোহপি নাসাদিতঃ। তথাহি বৃষানুচরঃ শচীসহচরানুচরোহভূৎ।"

[বিগ্রহপাল-পক্ষে]

"অন্যত্র। যো বিগ্রহপালো যৌবনশ্রিয়া কর্ণস্য রাজ্ঞঃ সুতয়া সহ ক্ষৌণীমুদূঢ়বান্। সহসা বলেন অবিতো রক্ষিতো রণজিতঃ সংগ্রামজিতঃ কর্ণো দাহলাধিপতি র্যেন। রণজিত এব পরন্তু রক্ষিতো, ন উন্মূলিতঃ। কপালসন্ধি-ঘটনাৎ। দানবারো দান-সমুচ্চয়ো ভূমি-কাঞ্চন-করি-তুরগাদিভির্নানাপ্রকারং দানং তস্য অতিশয়ঃ প্রাচুর্য্যং স চ অশ্রান্তোহবিচ্ছিন্নো যস্য অত এব বৃষানুচরো ধর্ম্মানুগন্তঃ।"

টীকাকার এইরূপে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার সন্ধান প্রদান না করিলে, মূল শ্লোক হইতে সম্যক্ অর্থ সহসা প্রতিভাত হইত না। শ্লেষের অনুরোধে কবি ইচ্ছামত শব্দ চয়ন করিতে পারেন নাই ;—যেরূপ শব্দ চয়ন করিলে, উভয়পক্ষের অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে, সেইরূপ শব্দ চয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সকল শ্লিষ্ট কাব্যের অবস্থাই এইরূপ। তজ্জন্য সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নিকট যে অর্থ অনায়াসলভ্য থাকে, উত্তর কালে টীকার অভাবে তাহা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। রামচরিতম্-কাব্যের যে অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই, সেই অংশের শ্লোকাবলীর অর্থবোধে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। কর্ণপরাজয়-কাহিনী রামচরিতের ভূমিকায় এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা,—

"Within a short time of the accession of Vigrahapala, he came in conflict with Karna, who was very severely beaten. His kingdom lay at the mercy of Vigrahapala. But Vigrahapala spared both the king and his kingdom. Karna entered into a treaty with him, acknowledging his supremacy ; and Karna's daughter Yauvanasri was married to Vigrahapala."

এই বিবাহোৎসব বিজয়োৎসব। কাব্যের

উপাদানরূপে গৃহীত হইলে, ইহা একখানি সরস কাব্যের আখ্যানবস্তুকে রসসিক্ত করিতে পারে। বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই আখ্যান-বস্তু এখনও সেরূপ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। বেলাবো-লিপি আবিষ্কৃত হইবার পর, আরও একটু অধিক সমাচার প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,—কর্ণের বীরশ্রীনাম্নী কন্যার সহিত বিক্রম-পুরাধিপতি জাতবর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপে দাহলাধিপতি সকল বঙ্গভূমির সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনকালে আর কোনও ঘটনা সংঘটিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেব কতকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই। তাঁহার আমগাছী-লিপিতে তদীয় বিজয়রাজ্যের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরে ভূমিদানের কথা উল্লিখিত থাকায়, কেহ কেহ তাঁহার শাসনকালকে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র মনে করিয়া কালগণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অনু-কূল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই; বরং কিছু কিঞ্চিৎ প্রতিকূল প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় মহীপাল, মধ্যম শূরপাল ও কনিষ্ঠ রামপাল। রামপাল-পুত্র মদনপালদেবের মনহালি-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাম-পাল তাঁহার জনকের "দীর্ঘ শাসন-সময়ে" শৈশব হইতেই বাহুবিক্রমের পরিচয় প্রদানে শত্রুরাজ্যকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের এই পুত্রত্রয় যৌবন-শ্রীর গর্ভোৎপন্ন ছিলেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বরং প্রসঙ্গাধীন বর্ণনায় মনে হইতে পারে,—তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সহিত দাহলাধিপতি কর্ণের সংগ্রাম-সংঘর্ষ-সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও বাহুবল প্রকাশিত করিয়াছিলেন; যাহা হউক, তৃতীয় বিগ্রহপাল-দেব যে [চিরং] দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া-ছিলেন, এই স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে, তাঁহার শাসনকালকে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র বলিয়া কালগণনা না করাই যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনকাল গৌরবমণ্ডিত বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তাঁহার বাহুবল অল্প ছিল না। তাঁহার বাহুবলে দাহলাধিপতিও পরাভূত হইয়া, কন্যাদানে সন্ধি সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন-সময়েই আর একটী অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপ্লবের বীজ ধীরে ধীরে লোকলোচনের অগোচরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল। সে বিপ্লব এখন ইতিহাসে "কৈবর্ত্ত-বিপ্লব" নামে কথিত হইতেছে। তাহার কথাই রামচরিতম্-কাব্যের প্রধান কথা,—তাহার কথাই রামা-বতী নির্ম্মাণের প্রধান কথা। সুতরাং তাহার আলোচনা অপরিহার্য্য। (ক্রমশ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নারী

পূর্ণ-প্রস্ফুটিত শ্বেত-শতদল-সম
মাধুরী বিকাশি'
প্রথম যে দিন, নারি, মানবের গৃহে
দেখা দিলে আসি'—
নিশীথ-সমুদ্র পারে—সহসা যেমন
রবির উদয়—
সে দিন জাগিল বিশ্বে কি মহাপুলক,
অসীম বিস্ময় !

অনন্ত-বিস্তৃত এই গ্রহ-তারান্বিত
নিখিল ভুবনে,
কে জানিত এত শোভা—রহস্য অপার—
আছিল গোপনে !
হে নারি, তোমার দিব্য মূরতির মাঝে
লভিয়া উপমা—
সে দিন সার্থক হ'ল জগতের যত
বিচিত্র সুষমা !

উষার অরুণ রাগ বিম্বিত—তোমার
তরুণ অধরে,
নিবিড় কজ্জল-মেঘ—তরঙ্গিত ওই
কৃষ্ণ কেশস্তরে !
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ আকাশের নীলিমা তোমার
প্রশান্ত নয়নে,
মুগ্ধ পূর্ণিমার শশী হেরে প্রতিরূপ
তোমার আননে !
সেই হ'তে, নারি, তোমা' কত ছন্দে গীতে
বন্দিয়াছে কবি,
কল্পনার শত বর্ণে চিত্রকর তব
আঁকিয়াছে ছবি।
শিল্পীর সাধনা নিত্য গড়িতে তোমার
অনিন্দ্য প্রতিমা,
কবিতা-সঙ্গীত-শিল্পে বিভাসিত, নারি,
তোমার মহিমা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সমালোচনা

উজানি—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত। রাঢ়ের ক্ষুদ্র পল্লী উজানিতে বসিয়া কবি পল্লীজীবনের প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের রেখা-চিত্র আঁকিয়াছেন। সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে কবির উৎসর্গ-পত্র হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। —"মা, মহাকবি কবিকঙ্কণ তোমার উজানির গুণগৌরবগাথা, তোমার খুল্লনা, ধনপতি, শ্রীমন্তের অপূর্ব্ব কাহিনী—অমর সঙ্গীত তোমায় শুনাইয়াছেন। আজ তোমার ক্ষুদ্র কবি তোমার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথা তোমায় শুনাইবে।" আমাদের মনে হয়, কবির এই উৎসর্গ-পত্রই সমস্ত গ্রন্থখানির key-note. বাস্তবিক, বাংলার এই ছায়াশীতল, শান্তি-সৌন্দর্য্যপূর্ণ গ্রামের ও গ্রামবাসীর যে চিত্র কবি আমাদের আজ শুনাইয়াছেন, তাহা, আধুনিক কৃত্রিমতাপূর্ণ কবিতার দিনে একান্ত দুর্ল্লভ। পল্লীগ্রামবাসী আমরা, এ কবিতাগুলি

পড়িতে পড়িতে, মনে হয় আমরা যে দিন হারাইয়াছি—তাহা আবার যেন ফিরিয়া পাই—আবার সেই বাল্যকালের স্নেহময়ী পল্লী মাতার মুখখানি যেন আমাদের চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্রের পরে—আমাদের খাঁটি বাংলার নিখুঁত চিত্র বঙ্গভাষায় আর কেহ আঁকিয়াছেন কি না, জানি না। আজ 'উজানি'র কবি—সেই বাংলার রেখা-চিত্র লইয়া উপস্থিত—ইহাতে রংয়ের বাহুল্য, বৃহৎ উদ্দেশ্যের জটিলতা নাই বটে, কিন্তু তিনি যে সামান্য রেখাপাতে খাঁটি বাংলার এবং খাঁটি বাঙ্গালীর প্রতিদিনের সুখ দুঃখের চিত্র আঁকিয়াছেন—তাহা আমাদের হৃদয়ে এমন একটা স্থান স্পর্শ করিয়াছে, যাহা বহুদিনের হারান পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রিয়জনের জন্য গোপনে রক্ষিত ছিল। 'উজান' পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হইতেছিল—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বম্
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

দধীচি (নাটক)—শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বি, এস্ সি প্রণীত। মূল্য (কাগজের মলাট) ১৲ টাকা। দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণের কল্যাণার্থ মহর্ষি দধীচির আত্মদানের ঘটনা লইয়া এই নাটক রচিত। গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন—"ভক্তি ভিন্ন দেবজয় সম্ভব নয়; ভক্তি-যুক্ত ভক্ত ভগবান্‌কেও ভয় করে না। বৃত্র যে কেবল শৌর্য্যবলেই স্বর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না, তাই ধর্ম্মের, ভক্তির ভিত্তির উপরে বৃত্র-চরিত্র স্থাপন করিয়াছি।" গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয়—অধর্ম্মাশ্রিত অহঙ্কৃত দেবগণের পতন ও দুর্দ্দশা এবং ধর্ম্মাশ্রয়ে পুনরায় তাঁহাদের উত্থান; বৃত্র 'মাত্র উপলক্ষ বিশ্বের বিধানে।' দেবাসুর-যুদ্ধের নামে যে বিভীষিকার চিত্র, ভীমকান্তি কঠোর দানবরাজের যে ছবি, স্বতঃই আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে—এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না। তাণ্ডবলীলারত রুদ্রের পশ্চাতে শিবের শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, বজ্রপীড়িত গুরুগম্ভীর বরষার বর্ষণের পর ধরিত্রীর শান্তশ্রী—সে ছবি তেমন ভাল ফুটে নাই। তেজোহীন নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত বৃত্র যেন অনাসক্ত মুমুক্ষু যোগীর ন্যায়। কোথাও তাহার চরিত্রের একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। বৃত্র ভক্ত বটে, কিন্তু ভক্তির তেজ তাহাতে নাই, তেজের গৌরবও নাই। বৃত্র-চরিত্রে সামান্য মানবের মত এতটা পরাধীনতার ভাব—এতটা আত্মশক্তির অভাব আমরা দেখিতে চাই না। আত্ম-শক্তির বিকাশের সহিত যে ধর্ম্মের ও ভক্তির সমন্বয়, তাহাই যথার্থ স্পৃহণীয়। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে নিষ্ক্রিয়তা—অনাসক্তির কথা অনেক শুনিয়াছি,—সকল চরিত্রকেই এক-তুলিকায় আঁকিলে চলিবে না। নাটকটি মূলতঃ ভক্তি-মূলক। নন্দী, দধীচি, বৃত্র, জয়া, শান্তি—সবই এক ছাঁচে ঢালা;—ইন্দ্রের চরিত্র চলিত কিংবদন্তীর (tradition) অনুরূপই হইয়াছে। তবে, ভক্তি মূলক নাটক হিসাবে ইহা ভাল হইয়াছে। ইহাতে ভাব আছে, ভাষা হৃদয়গ্রাহী, লিখনভঙ্গীও ভাল, ছাপা কাগজও পরিষ্কার।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী ... প্রেস ... হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গদর্শন।

নিমাই-চরিত্র

একবিংশ অধ্যায়

রামানন্দ রায় মিলন

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে গৌর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং ফাল্গুন মাসে পুরুষোত্তমে উপনীত হন। ফাল্গুন ও চৈত্র গত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে গৌর বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া কহিলেন "অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ধানে আমি দক্ষিণে যাইব মনস্থ করিয়াছি। তোমাদের অনুমতি হইলে আমি একাকী গমন করিতে চাই। যতদিন আমি নীলাচলে প্রত্যাগত না হই, ততদিন তোমরা এখানে আমার প্রতীক্ষা করিও।" প্রত্যাসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভক্তগণ বিষণ্ণ হইলেন। নিত্যানন্দ কহিলেন 'একাকী যাওয়া ভাল নহে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" গৌর উত্তর করিলেন "তুমি ত অনবরত আমাকে নাচাইতেছ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম, তুমি আমাকে ভুলাইয়া লইয়া গেলে অদ্বৈতের বাড়ী। নীলাচলে আসিবার পথে তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। তোমাদিগের স্নেহে আমার কর্ত্তব্য-হানি ঘটিতেছে। জগদানন্দ ত আমাকে বিষয় ভোগ না করাইয়া ছাড়িবে না। যদি কখনও তাহার বাক্যের অন্যথা করি, তিন দিন সে আমার সহিত বাক্যালাপ করে না। আমার সন্ন্যাসদুঃখ মুকুন্দের অসহ্য। দামোদর অনবরত আমার উপর শিক্ষাদণ্ড উদ্যত করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার লোকাপেক্ষা নাই, কিন্তু আমি ত লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারি না। আমার জন্য তোমাদিগকে দুঃখিত দেখিলে, তোমাদের দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া আমাকে পীড়া দেয়। তাই আমার ইচ্ছা, কিছুদিন একাকী ভ্রমণ করিয়া আসি।" অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল, কৃষ্ণদাস নামক এক সরলমতি ব্রাহ্মণ জলপাত্র ও বহির্বাস বহিবার জন্য সঙ্গে যাইবে। চারি দিন পরে গৌর বিদায়গ্রহণ করিলেন। যাত্রাকালে সার্ব্বভৌম কহিলেন "গোদাবরী-তটে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দ নামক এক ভক্ত আছেন। শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে এতদিন আমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। তোমার কৃপায় তাঁহার মহত্ত্ব এখন বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি তোমার সঙ্গী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার সহিত অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ করিও।" অঙ্গীকার করিয়া গৌর যাত্রা করিলেন। রোদন করিতে করিতে তাঁহার ভক্তগণ আলালনাথ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। আলালনাথে দেববিগ্রহের সম্মুখে বহু নৃত্যগীত হইল। দলে দলে লোক গৌরকে দেখিতে আসিয়া ভক্তি লাভ করিল।

আলালনাথ হইতে 'হরি' 'হরি' বলিয়া গৌর যাত্রা করিলেন। মুখে কেবল—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, পাহি মাং॥
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাং॥

তিনি যে গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিলেন, তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়া ও প্রেম-সঙ্গীত শুনিয়া তথাকার যাবতীয় লোক হরি-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এ সমস্ত লোক কর্ত্তৃক হরিনাম গ্রামান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তন ধ্বনি উত্থিত হইল। কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া গৌর কূর্ম্মমূর্ত্তির সম্মুখে প্রেমবিহ্বল অবস্থায় নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া দলে দলে লোক দেবালয়ে সমাগত হইল। কূর্ম্মনামক এক ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং সপরিবারে তাঁহার পাদোদক পান করত পরম যত্নে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। গৌর তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার কিয়ৎ-কাল পরেই বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ তথায় তাঁহার দর্শনোদ্দেশে সমাগত হইল। গৌর প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া, ব্রাহ্মণ নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ গৌর তথায় প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার স্পর্শে সেই গলিতকুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। নিরাময় ব্রাহ্মণ আনন্দভরে গৌরগুণ গান করিতে লাগিল।

বাসুদেবকে অনুগ্রহ করিয়া গৌর গোদাবরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গোদাবরী দর্শনে গৌরের যমুনার কথা মনে হইল। তত্তীরস্থ বনানি দর্শনে বৃন্দাবন স্মৃতিপথে উদিত হইল। গৌর গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তাহার তটে উপবেশন করত হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে বিবিধ আড়ম্বরের সহিত চতুর্দ্দোলারূঢ় রামানন্দ রায় স্নানার্থ নিকটস্থ ঘাটে উপস্থিত হইলেন, সন্ন্যাসী দর্শনে রামানন্দ সসম্ভ্রমে আসিয়া প্রণাম করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া গৌর কহিলেন 'তুমিই কি রায় রামানন্দ ?''

রামানন্দ উত্তর করিলেন "হাঁ, আমিই সেই শূদ্রবংশোদ্ভব দাস।" উভয়ের দর্শনে উভয়ের শরীরে স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য, প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ আবির্ভূত হইল। উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেন। আত্মসংবরণপূর্ব্বক গৌর কহিলেন "সার্ব্বভৌমের নিকট আমি তোমার গুণাবলি সমস্তই শ্রুত হইয়াছি, আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।" রামানন্দ কহিলেন "আমার সহচর সহস্র ব্রাহ্মণ তোমার দর্শন মাত্রেই—'কৃষ্ণ' নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে, অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে কি এতাদৃশ ক্ষমতা সম্ভবপর ?" গৌর কহিলেন "পরম ভাগবত তুমি, তোমার দর্শনেই তোমার ব্রাহ্মণগণের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। আমার মত মায়াবাদী সন্ন্যাসীও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হইয়াছে।" এমন সময়ে রামানন্দ-সঙ্গী ব্রাহ্মণগণ গৌরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিয়া গৌর রামানন্দকে কহিলেন "আবার যেন দর্শন পাই।" রামানন্দ কয়েকদিন তথায় থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া প্রণামান্তর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দের জন্ত গৌর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন, এমন সময়ে রামানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দুইজনে তত্ত্বালাপ আরম্ভ হইল। গৌর কহিলেন "সাধ্য কি, তাহা নির্ণয় কর।"

রামানন্দ—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

বিষ্ণুপুরাণ—৩।৮।৮

পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হন. বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন তাঁহার প্রীতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

গৌর—ইহা বাহ্য; ইহার পরে কি বল।

রামা—

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতা—৯।২৭

হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

গৌর—ইহা বাহিরের কথা; ইহার পরে কি বল।

রামা—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ভাগবত—১১।১১।৩২

মৎকর্তৃক যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্বক তৎসমস্ত পরিত্যাগ করত যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতা—১৮।৬৬

সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।

গৌর—এ ত বাহ্য; ইহার পরে কি বল।

রামা—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

গীতা।১৮।৫৪।

"যিনি (জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক) ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তিনি কিছুতেই শোক করেন না। তিনি সর্বভূতে সমভাবযুক্ত হইয়া, আমার প্রতি পরম ভক্তি লাভ করেন।" জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্যসার।

গৌর—ইহাও বাহিরে কথা; ইহার পরের কথা বল।

রামা—জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সাধ্যসার।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১৪।৩

জ্ঞানলাভে প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তোমাকেই কেবল প্রণাম করেন, এবং সাধুমুখনিঃসৃত ভবদীয় কথা শ্রবণ করত কায়মনোবাক্যে সৎপথস্থ হইয়া জীবন ধারণ করেন, তুমি ত্রিভুবনদুষ্প্রাপ্য হইলেও তাঁহাদিগের নিকট সুলভ্য।

গৌর—ইহাও বাহ্য ; ইহার পরে কি বল।

রামা—প্রেমভক্তিই সর্ব্বধর্ম্মের সার।

গৌর—ইহাও হয় ; কিন্তু ইহার পরে কি বল।

রামা—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৫।১১

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল হয়, তাঁহার দাসগণের আবার কি প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকে ?

গৌর—ইহাও হয়, কিন্তু ইহারও পরে কি আছে বল।

রামা সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১২।১১

যিনি এইরূপ ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে সাধুগণের নিকট, পরদেবতারূপে দাস্যরসের ভক্তগণের নিকট এবং নরশিশুরূপে মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশিত হন, সেই ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত কৃতপুণ্য ব্রজরাখালগণ বিহার করিয়াছিলেন।

গৌর—উত্তম, কিন্তু ইহার পরে কি বল।

রামা—বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

নেমং বিরিঞ্চির্ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।

ভাগবত—৯।১৫

গোপী যশোদা মুক্তিদাতা শ্রীহরির নিকট যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ব্রহ্মা, মহাদেব ও তাঁহার বক্ষস্থিতা লক্ষ্মীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

গৌর—ইহাও উত্তম, ইহার পর কি আছে বল।

রামা—কান্তভাব সর্ব্বসাধ্যসার।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্।

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ বাহুদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-ব্রজসুন্দরীগণের যে প্রসাদ সমুদিত হইয়াছিল, অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিতান্তানুরাগিণী লক্ষ্মী ও নলিনগন্ধবতী স্বর্গকামিনীগণেরও তাহা প্রাপ্য হয় নাই।

কৃষ্ণ প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে ; তাহার তারতম্যও আছে। কিন্তু যাহার যে ভাব, তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে তারতম্য বোধ করা যায়।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—রস পাঁচটী। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে যেমন আকাশের গুণ বায়ুতে, বায়ুর গুণ তেজে, তেজের গুণ জলে ও জলের গুণ ক্ষিতিতে আছে, তেমনি পঞ্চরসের প্রত্যেকের গুণ তাহার পরবর্ত্তী রসের মধ্যে নিহিত আছে। শান্ত, সখ্য ও বাৎসল্য সকলের গুণই মধুর রসে আছে। এই মধুর রসেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাং ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

ভাগবত—১০।৩২।২২

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—সুন্দরীগণ; তোমাদিগের সহিত আমার প্রেমসংযোগ নিরবদ্য; বহু ব্রহ্মপাত কাল জীবন ধারণ করিয়াও তোমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইব না। কেননা, তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। তোমাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সমর্থ নহি। অতএব নিজ নিজ সাধু ব্যবহার দ্বারাই তোমাদিগের কৃত সাধু ব্যবহারের বিনিময় হইল।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—তাঁহাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন। মধুর ভাবে যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবে ভজনা করিতে সক্ষম হয়েন না বলিয়া সেই ভক্তগণের নিকট ঋণী থাকেন।

গৌর—সাধ্যের ইহাই সীমা বটে, তবে ইহারও পরে যাহা আছে কৃপা করিয়া বল।

রামা—ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক আছে—তাহা জানিতাম না। মধুর রসের মধ্যে রাধার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গোপীগণ বলিয়াছিলেন—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।
ভাগবত—১০।৩০।২৪

রাধিকা নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছেন; যেহেতু কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে ইঁহাকেই বিজন প্রদেশে লইয়া গেলেন।

পদ্মপুরাণে আছে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ। গোপীগণের মধ্যে রাধিকাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

গৌর—তোমার মুখে অমৃতনদী বহিতেছে। আচ্ছা, অন্যের অপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রস্ফুরিত হয় না। গোপীগণের ভয়ে কৃষ্ণ রাধিকাকে চুরী করিয়াছিলেন। যদি রাধিকার জন্য গোপীগণকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেই রাধিকার জন্য তাঁহার গাঢ় অনুরাগ প্রকাশিত হইত।

রামানন্দ—কৃষ্ণ গোপীগণের রাসনৃত্য ত্যাগ করিয়া রাধার অন্বেষণ করিতে করিতে বিলাপ করত বনে বনে ফিরিয়াছিলেন। শত কোটি গোপীসঙ্গে রাস-বিলাস কালে একমূর্ত্তি রাধাপার্শ্বে সদা-সর্ব্বদা বিরাজ করিয়াছিল। রাধা অভিমান ভরে রাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ তাঁহার অন্বেষণে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কোথাও তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শতকোটি গোপীতেও কৃষ্ণের কাম নির্ব্বাপিত হয় নাই,—এক রাধিকাতেই তাঁহার তৃপ্তি। ইহাতেই রাধিকার গুণ অনুমিত হইতে পারে।

গৌর—তোমার নিকট আমার আগমন সার্থক হইয়াছে। এখন কৃষ্ণ-রাধিকার স্বরূপ এবং রস ও প্রেমতত্ত্ব কিছু বল।

রাম—আমি ইহার কিছুই জানি না। তুমি যাহা বলাইতেছ—তাহাই বলিতেছি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং।

কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তিনিই সকলের আদি, তিনি স্বয়ং অনাদি। কৃষ্ণই গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

প্রফুল্ল কমলানন, পীতাম্বর বনমালী মন্মথেরও মন মুগ্ধ করেন। নানাভাবাশ্রিত ভক্তগণের রসামৃতের তিনিই বিষয়স্বরূপ। তিনি শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তিধর, এবং অন্য যাবতীয় অবতারের মনোহারী। তিনি আপন মাধুর্য্যে আপনারই মন হরণ করেন এবং আপনাকে আপনি আলিঙ্গন করিতে চাহেন।

কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। এখন রাধাতত্ত্ব কিছু বর্ণনা করি। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান—চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। এই তিন শক্তি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি এবং ইহাই সর্ব্বপ্রধান। কৃষ্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিও তদনুযায়ী ত্রিবিধ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। হ্লাদিনী শক্তি হেতু কৃষ্ণ সদা সুখসাগরে মগ্ন থাকেন। সুখস্বরূপ নিজ সুখ আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করান। হ্লাদিনী শক্তিই ভক্তগণের সুখের কারণ। হ্লাদিনীর সারভূত অংশের নাম প্রেম, অথবা আনন্দচিন্ময় রস। এই প্রেমের সারতম অংশ মহাভাব বলিয়া খ্যাত। এই মহাভাবে কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীমতী রাধিকা মহাভাবস্বরূপা এবং একমাত্র তিনিই কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তি করিতে সক্ষম।

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা,
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচে-
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা।

কৃষ্ণের প্রেমের জন্মভূমি কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণের অনুপম-গুণবতী প্রেয়সী কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। কেশে কুটিলতা, নেত্রে তরলতা, স্তনে নিষ্ঠুরতা, এক রাধিকারই আছে; একমাত্র রাধিকাই হরির বাসনা পূর্ত্তি করিতে সক্ষম, অন্য কেহ নহে।

নিরন্তর কামক্রীড় বলিয়া কৃষ্ণের নাম "ধীরললিত।" যে পুরুষ বিদগ্ধ (চতুর), নবতরুণ, পরিহাসদক্ষ, নিশ্চিন্ত ও প্রেয়সীবশ, তাহারই নাম ধীরললিত। কৈশোরে কৃষ্ণ রাত্রি-দিন রাধার সহিত কুঞ্জক্রীড়া করিয়াছিলেন।

গৌর—বেশ! আর কি আছে বল।

রামা—আর আমি জানি না। তবে আমার স্বীকৃত একটী গান শোন।

রামানন্দ গাহিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহু কেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥
অব সেই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥

গৌর—সাধ্যবস্তু কি তাহা বুঝিলাম। কিন্তু সাধন বিনা কেহ সাধ্য লাভ করিতে পারে না। এখন এই সাধ্যবস্তুর উপায়স্বরূপ সাধন-তত্ত্ব কিছু বল।

রামানন্দ—তুমি যাহা বলাইতেছ, তাহাই বলিতেছি; শোন। সাধনের কথা অতি নিগূঢ়। সখী ভিন্ন কেহ রাধাকৃষ্ণ-লীলা বুঝিবার অধিকারী নহে। সখী হইতে এই লীলার বিস্তার। সখীভাবে ভিন্ন রাধাকৃষ্ণকুঞ্জ-সেবারূপ সাধ্যবস্তু কেহই পাইতে পারে না।

সখীর স্বভাব বর্ণনা করা কঠিন। কৃষ্ণের সহিত নিজে ক্রীড়া করিতে সখীর মন নাই। সখী চায় কৃষ্ণের সহিত রাধিকার লীলা সংঘটন করিতে। কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পলতা রাধিকার স্বরূপ; সখীগণ সেই কল্পলতার পল্লব, পুষ্প ও পত্র। কৃষ্ণলীলামৃতে লতা সিঞ্চিত হইলে, পল্লব, পুষ্প ও পত্র অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। এদিকে সখীগণ কৃষ্ণসঙ্গমসুখ কামনা না করিলেও, রাধিকা যত্ন করিয়া তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম সংঘটন করেন। সখীগণ স্বকীয় ইন্দ্রিয়সুখ বাঞ্ছা করেন না—কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম। যে ভক্ত সেই গোপীভাবামৃতে অভিলাষী, বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন। যে রাগানুগ মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজনা করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রজলোকের যে ভাবে ভক্ত তাঁহাকে ভজনা করেন—তিনি তদনুরূপ গতি লাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিধিমার্গে কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ।

গোপানন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ দেহিবৃন্দের সম্বন্ধে যেরূপ সুখলভ্য, আত্মভূত জ্ঞানিবৃন্দের পক্ষে তদ্রূপ নহেন। এই জন্যই ভক্ত গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া রাত্রি-দিন রাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করেন। গোপীভাব বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিলে, ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুর ভজন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হন নাই।

ইহা শুনিয়া গৌর প্রেমভরে রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ-কথালাপে অতিবাহিত হইল। রামানন্দের অনুরোধে দশ দিন গৌর তথায় অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন কৃষ্ণকথা চলিতে লাগিল। একদিন গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "বিদ্যার মধ্যে সার কি ?"

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তি বিনা আর বিদ্যা নাই।

গৌর—জীবের কোন্ কীর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত-খ্যাতি।

গৌর—কোন্ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণপ্রেম।

গৌর—দুঃখমধ্যে গুরুতর কি ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত-বিরহ।

গৌর—মুক্তমধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

রামানন্দ—যে কৃষ্ণপ্রেম সাধনা করে।

গৌর—গানমধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ গান ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যাহার মর্ম্ম।

গৌর—শ্রেয়োমধ্যে সারতম কি ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তসঙ্গ।

গৌর—অনুক্ষণ জীব কি স্মরণ করিবে ?

রামানন্দ—কৃষ্ণগুণ-লীলা।

গৌর—ধ্যেয়-মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণ-পাদাম্বুজ।

গৌর—সর্ব্বত্যাগ করিয়া কোথায় বাস করা জীবের উচিত?

রামানন্দ—শ্রীবৃন্দাবনে।

গৌর—উপাস্যের মধ্যে প্রধান কে?

রামানন্দ—যুগল-মূর্ত্তি।

গৌর—মুক্তি ও ভুক্তিকামীর স্থিতি কোথায়?

রামানন্দ—স্থাবর-দেহ ও দেব-দেহ। অরসজ্ঞ জ্ঞানী কাকের মত জ্ঞানরূপ নিম্ব-ফল চোষণ করে। রসজ্ঞ ভক্ত কোকিল-প্রেমরূপ আম্রমুকুল ভক্ষণ করে।

আর এক দিন রামানন্দ কহিলেন "কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, তুমি সমস্তই আমার চিত্তে প্রকাশিত করিয়াছ। বাহিরে উপদেশ না দিয়া তুমি ভিতর হইতে এই সমস্ত তত্ত্ব আমার অন্তঃকরণে প্রকাশিত করিয়াছ। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য জ্ঞান আমার বিদুরিত হইতেছে না। প্রথমে আমি তোমার সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এখন শ্যামবর্ণ গোপরূপে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তোমার সম্মুখে যেন এক কাঞ্চনময়ী পঞ্চালিকা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার গৌর কান্তির আভায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। আর দেখিতেছি—তুমি বংশীবাদন শ্যামসুন্দর রূপে ভাবময় চঞ্চল দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ। ইহার কারণ আমাকে বল।

গৌর কহিলেন—"রাধাকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ তুমি এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান।"

রামানন্দ কহিলেন "আমাকে ছলনা করিতে পারিবে না। তোমার নিজরূপ আমাকে দেখাইতেই হইবে। স্বীয় রস আস্বাদনার্থ তুমি রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। আপনি আপনার প্রেম আস্বাদন করিতে করিতে তুমি আনুষঙ্গিক ভাবে ত্রিভুবন প্রেমময় করিয়াছ। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই এখানে তুমি আসিয়াছ,—তবে আবার কপটতা কেন?"

তখন রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত মূর্ত্তি গৌর রামানন্দকে দেখাইলেন। রামানন্দ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দশ দিন অতিবাহিত হইল। খনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে যেমন তামা, কাঁসা, রূপা, সোণা, রত্ন, চিন্তামণি,—উত্তরোত্তর উত্তমবস্তু লাভ হয়, তেমনি উভয়ের কথোপকথনে ক্রমেই অধিকতর মূল্যবান্ তত্ত্ব-কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অবশেষে গৌর বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রামানন্দ পরম দুঃখিত চিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বিদায় কালে গৌর কহিলেন "তুমি বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন কর। আমি সত্বরই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইব। তখন উভয়ে একত্র অবস্থান করিব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপলা

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুষ্ক লতায় মঞ্জরী

প্রথম বয়সে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতি রাজাধিরাজ অশোকদেবের ব্যবহার বিশেষ উদার ছিল না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধবাদী সমাজবিপ্লবকারী ক্রমবর্দ্ধমান এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত তখনও জন-সাধারণ মধ্যে তত প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু ভিক্ষুমণ্ডলীর বৈরাগ্য, অহিংসা, জীবে দয়া, নিরহঙ্কার, বিপদে নির্ব্বিকার সহিষ্ণুতা, সার্ব্বজনীন প্রীতি লোকসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। অনেকে এই নবীন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। রাষ্ট্রনীতি-কৌশল-পরিচালিত রাজসভায় ব্রাহ্মণ, শ্রমণ উভয়েই প্রায় তুল্য সমাদর পাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত ছিদ্র পাইলে অশোকদেব এই নবীন সম্প্রদায়ের লোককে দণ্ডিত করিতে ত্রুটী করিতেন না।

রাজাধিরাজ অশোক অপরাহ্নে মৃগয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভিক্ষু উপগুপ্ত সম্বন্ধে কি বিধান হয়, জানিবার জন্য নগরবাসিগণ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ রাত্রি প্রভাতেই ভিক্ষুর বিচার হইবে।

সেকালেও যে রাজরাজন্যবর্গ সান্ত্রী প্রহরী অথবা পার্শ্বরক্ষক দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকিতেন, তাহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। নন্দবংশের উচ্ছেদসাধনের পর হইতে রাজরাজড়ার রাত্রিবাস-গৃহও অনেক সময় অতি বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত থাকিত। কোন্ রাত্রিতে কোন্ রাজ্ঞীর গৃহে, অথবা কোথায় বহুবল্লভ রাজার নিদ্রার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা সকলে জানিতে পারিত না। রাজা ও হয় ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন না করিয়া গৃহস্বামিনীর অভিমান ক্ষুণ্ণ করিতেন এবং অন্য গৃহে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া অতর্কিত অনুগ্রহে অপরাকে অতি সম্মানিত করিতেন। এইরূপ ক্ষুণ্ণ অভিমান অথবা অতর্কিত সম্মান যে রাজার অনুরাগ-বৈষম্যে সংঘটিত হইত, তাহা নহে। দেশকালপাত্র বিবেচনায় শত্রু-সমাকুল রাজরাজড়ার পক্ষে এইরূপ অজ্ঞাত গৃহবাস সেকালে নিতান্ত বিধেয় বলিয়াই পরিগণিত হইত।

পরিচারিকা লীলা সন্ধ্যার পর হাসিতে হাসিতে আসিয়া রাজ্ঞী কারুবকীকে জানাইল, রাজাধিরাজ দেবী অসন্ধিমিত্রার গৃহে রাত্রিযাপন করিবেন।

"তুই কেমন করিয়া জানিলি?"

"সৌবিক মহাশয় প্রতিহারীদিগকে বলিয়া দিয়াছেন; অন্তঃপুরে অনেকেই তাহা শুনিয়াছে।"

"তাহা শুনিয়া তোর আনন্দ কেন?"

"আমি মালিনীকে ফুল-মালার জন্য সংবাদ

দিয়া আসিলাম। অগুরু, চন্দন, গন্ধচূর্ণ—আর সময় নাই।—সৌবিক মহাশয় আমাকেও কিছু বলিয়াছেন!"

"মর্ হতভাগী! শেষে লোক হাসাবি না কি?"

"আমরা হাসিব, অন্যের কান্না পায়, কাঁদিবে।"

রাজ্ঞী তখন স্মিতমুখে বলিলেন,—

"যাহা যাহা করিতে হয়, কর্ গিয়া; কাহাকেও কিছু বলিস্ না।"

দেবী কারুবকী প্রমীতসেনকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়াছেন, কিন্তু মৃগয়া হইতে ফিরিয়া রাজাধিরাজ যখন অবস্থা শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া দেবী চিন্তাযুক্ত ছিলেন। ভিক্ষু উপগুপ্তের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য রাজাধিরাজকে অনুরোধ করিবেন, মঞ্জুলার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ রাজাধিরাজের কার্য্যে অনধিকারচর্চ্চা যে দুঃসাহসের কর্ম্ম, দেবী তাহা জানিতেন। দেবীর একমাত্র ভরসা, যদি রাজাধিরাজ অন্যের নিকট অবস্থা শুনিবার পূর্ব্বে একবার নিজে তাঁহাকে বলিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার অনেকটা সম্ভাবনা। সে সুযোগ কি ঘটিবে? সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত নির্জ্জন সাক্ষাৎ নহে। রাজাধিরাজ অন্তঃপুরে পৌঁছিলে সপত্নী, ভোগিনী, আত্মীয়া, পরিচারিকা সকলে মিলিয়া মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা, অভিবাদন করিয়াছিলেন। তখন কোন কথা বলিবার, প্রার্থনা জানাইবার সুযোগ ত ঘটে নাই।

দেবী কারুবকীর শয়নগৃহ সুসজ্জিত; স্নিগ্ধ গন্ধদীপ-মালায় আলোকিত; পুষ্পস্তবক মালো অগুরু-চন্দন প্রক্ষেপে, গুগ্গুল গন্ধে সুরভিত হইল। লীলা অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্ঞীর বেশভূষার শোভন পরিবর্ত্তন এবং তাঁহার কেশকলাপে অপূর্ব্ব শ্রীমতী কবরী রচনা করিতে ভুলিল না। বহু সপত্নীপরিবৃতা বিগতোন্মুখযৌবনা রাজরাণীরা অঙ্গপ্রসাধন ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন না, রাজ্ঞী কারুবকীর ত আজ বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। বাসকসজ্জা রাজ্ঞী উৎকণ্ঠিতা হইলেন, এবং অলিন্দে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকার কথায় বিশ্বাস করিয়া শেষে, কি বিপ্রলব্ধার বিষম মনোব্যথা ভোগ করিতে হইবে?

এমন সময় লীলা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রাজাধিরাজ আসিতেছেন। রাজ্ঞী সেই অলিন্দেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজাধিরাজ উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী অগ্রসর হইলেন, হস্তস্থিত শ্বেতপুষ্পমালা তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া প্রণাম ও তাঁহার পূজা করিলেন। অশোকদেব হাতে ধরিয়া রাজ্ঞীকে তুলিলেন। ফুলমালা পত্রপল্লবে সজ্জিত সুরভিত গৃহের শোভা এবং রাজ্ঞীর বেশভূষা ও অঙ্গরাগের পারিপাট্য দেখিয়া রাজাধিরাজ স্মিতমুখে বলিলেন,—

"এ গৃহে যে চিরবসন্ত বিরাজ করে!"

"এখানে দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাই শুষ্ক লতায়ও মঞ্জরী দেখা যায়।"

দীপরশ্মি প্রভাসিত রাজ্ঞীর প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন;—

"শৃঙ্খলতা ?—শৃঙ্খলতার সঞ্জীবনী শক্তিতে কঙ্ক দেবতার দেহও যে উৎফুল্ল হইয়া উঠে !"

হাসিতে হাসিতে উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজাধিরাজ পালঙ্কে উপবেশন করিলে রাজ্ঞী বলিলেন ;—

"সৌবিক আজ রাজ্ঞী অসন্ধিমিত্রার নাম করিয়াছিল।"

"সৌবিক অসন্ধিমিত্রার নাম করিলে যে কাহাকে বুঝায়, তুমি তাহা জান।"

"কয় কয়দিন পরে আজ রাজধানীতে আগমন, আমি এতটা সৌভাগ্যের আশা করিতে সাহস পাই নাই !"

"আত্মশক্তিতে তোমার বিশ্বাস কম।"

"স্ত্রীজাতির আবার আত্মশক্তি !"

"নয় কেন ?"

"তা'র উপর কি নির্ভর করা যায় ?"

"চিত্তের সাহস পৃথিবী জয় করিতে পারে।"

"পৃথিবী জয়ে আমার প্রয়োজন নাই।—আমার একটী প্রার্থনা আছে।"

"অশোকের প্রিয়তমা মহিষীর আদেশ প্রচার হউক।"

রাজ্ঞী একটুকু হাসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের উৎফুল্লতা যেন একটুকু কমিয়া গেল। ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া রাজ্ঞী বলিলেন ;—

"এই মাত্র স্ত্রীজাতির সাহসের কথা বলিতেছিলেন, আমি এক অসম সাহসের কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।"

"অসম সাহস আছে বলিয়াই ত রাজ্ঞী চক্রবর্ত্তী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অশোকদেবের উপযুক্ত মহিষী! ব্যাপারটা কি ?" রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন, "কোন শ্রমণের উপদেশে ভিক্ষুণী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছ ?"

"রাজাধিরাজ যেদিন রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইবেন, দাসীও তাঁহার পদানুসরণ করিবে।"

"তাহার অনেক বিলম্ব আছে।"

রাজ্ঞী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন, রাজাধিরাজ তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসাইলেন, বলিলেন ;—

"কি অসম সাহসের কাজ করিয়াছ ?—ধর্ম্মপালের কারাবাসের আদেশ দিয়াছ, না কলিঙ্গ-জয়ের জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছ ?"

"অতদূর সাহস হয় নাই।"

"তবে কি ?"

রাজ্ঞী ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন ;—

"মঞ্জুলা আসিয়াছিল—"

"মঞ্জুলা ?—কেমন আছে ? অনেক দিন তাহাকে দেখি নাই।"

"আমার অপরাধ ক্ষমা হইবে ?"

"কি অপরাধ ?"

"মৃগয়া-যাত্রার দিন সচিবপুত্র প্রমীতসেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল—"

রাজাধিরাজ হাসিয়া উঠিলেন।

"প্রমীতসেন ত কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই।"

"রাজবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে সেদিন এক জন ভিক্ষু এবং প্রমীতসেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল।"

"সেই কথা ? এখন মনে পড়িতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, ভিক্ষু আমাকে সম্বোধন করিয়া কি যেন বলিবার সময় লোকের ঠেলাঠেলিতে প্রহরিণীদিগের রজ্জু-

সীমার উপর হেলিয়া পড়ে। একজন প্রহরিণী তাহাকে শূলবিদ্ধ করিতে উদ্যত হয়। প্রমীত-সেন ভিক্ষুকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হয়। প্রমীত কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই। রাত্রি প্রভাতে তাহার মুক্তির আদেশ দিব।— এখন কোন্ অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, বল।"

রাজ্ঞী পরিপক্ক ব্যবহারজীবী ছিলেন না. পুনরায় ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা আসিয়াছিল—"

"হাঁ, তাই কি ?"

"আমি প্রমীতসেনের মুক্তির জন্য ধর্ম্মপাল মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাকে কারা হইতে মুক্তি দিয়াছেন।— দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।"

"এই অপরাধ ?"

রাজ্ঞী মুখ নত করিয়া রহিলেন।

রাজাধিরাজ তখন সেই প্রবীণা রাজ্ঞীর চিবুক ধরিয়া মুখ উঁচু করিলেন এবং নিজের গলদেশ হইতে পূজা-উপহার পুষ্পমাল্য খুলিয়া লইয়া তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। রাজ্ঞীর মুখ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজাধিরাজের পরাজয়

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কত লোক ত বিচারে অবিচারে দণ্ডিত হয়, কোন দিন ত তুমি কাহারও জন্য অনুরোধ কর নাই। প্রমীতসেনের জন্য তোমার এত ব্যস্ততা কেন ?"

"প্রমীতসেনকে চিনি না, কোন দিন তাহাকে দেখি নাই। তবে সচিবপুত্র যে নগরে একজন ভাল লোক—ধনী, দাতা, দরিদ্রের বন্ধু এবং আপনার বিশ্বাসভাজন, তাহা ত আপনার মুখেই কতদিন শুনিয়াছি।—আমিও এক অনুরোধে পড়িয়াছিলাম।"

রাজাধিরাজের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কে তোমাকে অনুরোধ করিল !"

"মঞ্জুলা! তাই বলিতেছিলে, মঞ্জুলা আসিয়াছিল ?"

"হাঁ।"

"সে কেন প্রমীতের জন্য অনুরোধ করিল? প্রমীত তাহার কে ?"

"কেহই নহে। মঞ্জুলা একদিন মাত্র প্রমীতসেনকে দেখিয়াছিল।"

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। রাজ্ঞী তখন সেই দুর্য্যোগময় সন্ধ্যায় নগরোপকণ্ঠে মঞ্জুলার সঙ্গে প্রমীতের সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা ত এখন আর ছোট্ট বালিকা নহে।"

"তাহার বয়স আঠার বৎসর পার হইয়াছে।"

"নগরের পথে দৈব-দুর্য্যোগমধ্যে ক্ষণ-কালের পরিচয়, তাহার জন্য অনুরোধ!"

"ক্ষণকালের পরিচয়ে আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হইতে পারে

"হইতে পারে বটে, এখানেও কি তাহাই হইয়াছে ?"

"অসম্ভব কি ?"

রাজাধিরাজ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা বড় হইয়াছে, মাতার কাছে থাকে। শেষে কি সে সেই অভাগিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে ?"

"অসম্ভব। আমি ত তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছি। মঞ্জুলার চরিত্র পবিত্র। আর, সে অভাগিনীর স্বভাবও ত অনেক দিন সংশোধন হইয়াছে।"

"সে যাহাই হউক, এ ভাবে আর দিন যাওয়া উচিত নহে। মঞ্জুলার বিবাহের কি হইল ?"

"কিছুই হয় নাই। নানা কারণে তাহার উপযুক্ত বর যে সহজে মিলিবার নহে, তাহা রাজাধিরাজের অজ্ঞাত নহে।"

"মঞ্জুলা কেন প্রমীতের জন্য অনুরোধ করিল ?"

"আমি যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।"

"বটে ? প্রমীতের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইলে কেমন হয় ?"

"হইলে ত অতি উত্তম হয়, কিন্তু প্রমীতসেন যে বিবাহিত, তাহার পত্নী বর্ত্তমান !"

রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন ;—

"মহারাজা অশোকের ত একের অধিক রাজ্ঞী বর্ত্তমান !"

রাজ্ঞীও হাসিয়া উত্তর দিলেন ;—

"রাজা মহারাজার পক্ষে যাহা সম্ভব বা শোভন, অপরের পক্ষেও কি তাই ?"

"নয় কেন ?—প্রমীতের অতুল সম্পত্তি। সে সম্মত হইবে ?"

"কাহার কথা বলিতেছেন ?"

"প্রমীতের কথা।"

"প্রমীত আর একদিন মঞ্জুলার গৃহে যাইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছে।"

"ও হোঃ! তাহার পর ?"

"প্রমীত মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছে।"

"আর মঞ্জুলা ?"

"চিত্ত হারাইয়াছে।"

"তবে আর কি চাই ?"

"রাজাধিরাজের অনুগ্রহ।"

"ঘটকতাটা কি আমাকেই করিতে হইবে ?"

"না ; আমিও করিব না। কিন্তু প্রমীত যে মঞ্জুলার অনুরোধে কারামুক্ত হইয়াছে, সে কথা কোনরূপে তাহাকে জানাইতে হইবে।"

"কেন ?"

"উভয়ে উভয়ের নিকট ঋণী থাকা ভাল। একপক্ষ ঋণী থাকিলে অপর পক্ষের মনে অভিমান থাকিয়া যায়। সে স্থলে চিত্তের বিনিময় হয় না, ঋণী চিত্তদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করে।"

নীরব হাস্যে রাজাধিরাজের মুখ প্রভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন ;—

"শুনিয়াছি, পিতামহ ঠাকুরের এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম চাণক্য পণ্ডিত। রাজনীতি এবং অর্থনীতি-শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ পণ্ডিত ঠাকুর আজ জীবিত থাকিলে, চিত্তবিনিময় শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে তোমার নিকট হার মানিতেন।"

রাজ্ঞীর মুখ হাসিময় হইল, তিনি বলিলেন ;—

"চিত্ত বলিয়া যে একটা কিছু পণ্ডিত ঠাকুরের ছিল, তাহা শুনি নাই; সুতরাং তাহার দানবিনিময় হয় ত তিনি বুঝিতেন না।—অনেক স্ত্রীলোক চিত্তবিনিময় চায় না, অতদূর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে স্থান পায় না, নিজের চিত্ত দান করিয়াই তাহারা সুখী !"

রাজাধিরাজ হাসিলেন, আদরে রাজ্ঞীর কবরী স্পর্শ করিয়া বলিলেন ;—

"সেরূপ দুর্লভ চিত্তের বিনিময়ে দান করিবার উপযুক্ত কিছু রাজরাজড়ার ভাণ্ডারে নাই !"

লজ্জায় রাজ্ঞীর স্মিত-প্রফুল্ল মুখ নত, আরক্ত হইল।

রাজাধিরাজ বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা যদি চিত্ত হারাইয়াই থাকে—প্রমীতকেই দিয়া থাকে, তবে আর তাহার জন্য ব্যস্ততা কেন ?"

"আত্মীয় সুহৃদেরা তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। ঘর সংসার করিতে হইবে, আদান প্রদান দুই-ই চাই।—আর পুরুষেরাই কি অত স্বার্থপর ?"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!—তা মঞ্জুলার অনুরোধেই যে তাহার মুক্তি হইয়াছে, প্রমীতসেন যাহাতে তাহা জানিতে পারে, তাহা করা যাইবে।—প্রমীতসেনকে মুক্ত করিয়াছ, ভিক্ষুর জন্য কোন চেষ্টা কর নাই!—, ভিক্ষু কে ?"

"ভিক্ষু পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর।"

"উপগুপ্ত ?"

রাজাধিরাজ রাজ্ঞীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, রাজ্ঞী বলিলেন ;—

"হাঁ ; আমার পিতৃদেবের উপদেষ্টা দেশ-পূজ্য পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর !"

রাজাধিরাজ কোন উত্তর দিলেন না। রাজ্ঞী পালঙ্ক হইতে নামিয়া দুই হাতে রাজাধিরাজের পদধারণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন ;—

"ভিক্ষুদেবকে মুক্তি দিবার আদেশ হউক !"

অশোকদেব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শেষে রাজ্ঞীর হাত ধরিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইলেন, বলিলেন ;—

"এই সকল ভিক্ষু শ্রমণেরা দেশের শত অমঙ্গল ঘটাইতেছে।"

"শ্রমণ ভিক্ষুরা অমঙ্গল ঘটাইতেছে ?"

"হাঁ।"

"ইঁহারা ত অতি নিরীহ !"

"ইহারা চোর দস্যু অথবা দ্যূতকারী ব্যভিচারী নহে, কিন্তু ইহাদের আচারব্যবহার-দৃষ্টান্তে দেশের নিয়ত অমঙ্গল ঘটিতেছে ; লোকে যাগযজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ড, পূজাবলি পরিত্যাগ করিতেছে ; সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িতেছে।—ইহাদের শাসন আবশ্যক।"

"রাজাধিরাজের সভায় ত ব্রাহ্মণ শ্রমণের তুল্য সম্মান।"

"সে ত রাজনীতির কূটকৌশল।"

"অখণ্ডপ্রতাপ রাজরাজেশ্বরের রাজ্য-শাসনে ন্যায়ের স্থলে কূটকৌশল !"

স্ত্রী-হৃদয়ের মহিমময়ী সরলতায় মুগ্ধ রাজ-চক্রবর্ত্তী বলিলেন ;—

"মন্ত্রণাসভায় এ প্রশ্ন উঠিলে উত্তর দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু রাজ্ঞী কারুবকীর পবিত্র শয্যায় বসিয়া উত্তর দিতে আমার সাহস হয় না।—আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি !"

স্ফুরদুজ্জ্বল নেত্রে রাজ্ঞী কহিলেন ;—

"তবে আমার প্রার্থনা সিদ্ধ হউক !"

"অবশ্যই হইবে। নীলকে বলিয়া রাখ, প্রভাতে সৌবিক যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়।" (ক্রমশঃ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

নক্ষত্র-পূজা

দুর্গোৎসব

শরৎকালে আমরা দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী দেবীর পূজা করি। এই পূজার চলিত নাম শারদীয়া পূজা।

দেবীর বাহন অনমীলিত-লোচন মৃগরাজ সিংহ। সিংহপৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ পদ এবং মহিষাসুর-স্কন্ধে দেবীর বাম পদ। সিংহ মহিষাসুর-শীকারে প্রমত্ত। দেবী দশভুজা এক দক্ষিণ হস্তে সর্পলাঙ্গুল এবং এক বামকরে মহিষাসুরের কেশ-পাশ ধারণ করিয়াছেন। সর্প মহিষাসুরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

দশভুজার দক্ষিণ করপঞ্চকে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি এবং বাম করপঞ্চকে খেটকপূর্ণ চাপ, পাশ, অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা বা পরশু চকমক্ করিতেছে।

দেবী দশভুজার শিরোদেশে স্থিত চালে ভূতেশ ভবানী-পতি রুদ্রদেব চিত্রিত থাকে এবং দেবী দশভুজার পদতলে অমৃতপূর্ণ ঘট স্থাপিত থাকে।

দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে হুতুমবাহিনী লক্ষ্মী দেবী ও মূষিকবাহন গজানন গণপতি দেব এবং নবপত্রিকাশোভিত "কলাবউ" অবস্থিত আছেন। এবং দেবীর বাম পার্শ্বে হংসারূঢ়া বীণাপাণি সরস্বতী দেবী ও শিখিবাহন শক্তিধর কুমার দেব অধিষ্ঠিত আছেন।

মহামায়ার এই প্রতিমার গূঢ়মর্ম্মভেদে সাত্ত্বিক উপাসকমাত্রের চিত্তে কৌতূহল জন্মিবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই আধিভৌতিক প্রতিমার মূল আদর্শ (আধিদৈবিক চিত্র) আমরা উপাসকের চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে সযত্ন হইব। এই আধিভৌতিক প্রতিমার আদি আধ্যাত্মিক চিত্র উপাসক স্বয়ং সাধনা-বলে স্বহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়া লইতে যত্নশীল হইবেন। সাধনাক্ষেত্রে উত্তর-সাধকের স্থান নাই।

ইদানীন্তন কালে হিন্দু আপনাকে নক্ষত্র-উপাসক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু হিন্দু জানেন যে, বৈদিক ঋষির নক্ষত্র-উপাসনা হইতে তাঁহার পৌত্তলিকতা উদ্ভূত হইয়াছে।

রাশিচক্রে সিংহরাশি সূর্য্যের গৃহ, রাশির, এবং নাক্ষত্রিক প্রতিমা, এবং সিংহরাশির পরেই কন্যারাশি প্রতিষ্ঠিত আছে।

তারা-কন্যা—"জলে নৌকাস্থা শস্য-অগ্নি-ধারিণী স্ত্রী" এবং কন্যারাশিস্থ চিত্রা-নক্ষত্র তারা-কন্যার উত্তমাঙ্গ গঠন করে এবং দশভুজা-মূর্ত্তি ধারণ করে। পঞ্জিকার মলাটে—নক্ষত্রগণের যে মূর্ত্তি চিত্রিত থাকে, তাহাতে চিত্রার দশভুজা-মূর্ত্তি চিত্রিত থাকিত। "গোলোকে সর্ব্বদেবদর্শন" প্রকাশিত হইবার পর হইতে বাংলার পঞ্জিকার পুরঃপৃষ্ঠায় আর নক্ষত্রমূর্ত্তি দেখা যায় না। ভরসা করি, বারাণসী-ধামের পঞ্জিকার পুরঃপৃষ্ঠা হইতে নক্ষত্রমূর্ত্তি অন্তর্হিত হয় নাই।

প্রাচীন কালে যখন উত্তর-সৌরস্থিতি (North Solstice) চিত্রানক্ষত্রে ছিল। তৎকালে তারা-কন্যার শিরোভাগ রাশি-চক্রের শীর্ষস্থানে ছিল এবং দশভুজা তারা-কন্যা তারা-সিংহের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন।

তারা-কন্যার উর্দ্ধে ও উত্তরে ভূতেশ-মণ্ডল (Bootes) (*) অবস্থিত আছে। এই ভূতেশ-মণ্ডল বায়ু-দৈবত স্বাতি নক্ষত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। বায়ু রুদ্র-দেবের অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম মূর্ত্তি। এবং তারা-কন্যার পদতলে কাংস্যমণ্ডলে (Creator) স্থিত তারা-কাংস্য অমৃতের ভাণ্ড।

হিন্দু আরও জানেন যে, সুদীর্ঘ কৃষ্ণসর্প (Hydra) কন্যারাশিস্থ হস্ত-নক্ষত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং আকাশের দক্ষিণ প্রান্তে তারা-কন্যার এক ধ্রুবকে যাম্য ধ্রুব-তারার অদূরে মহিষাসুর (Centaur) বিদ্যমান আছে।

এই প্রকাণ্ড আধিদৈবিক তারাচিত্র দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমার অবিকল আদর্শ।

এই আধিদৈবিক তারাচিত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে পারিলেই উপাসক তাঁহার উপাস্য দেবীর প্রতিমার মূল তাৎপর্য্য গ্রহণে সক্ষম হইবেন। নতুবা নহে।

হিন্দু সতত মনে ধারণা করিবেন—নক্ষত্র-উপাসক হইলেও তিনি জড়োপাসক নহেন। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরম-ব্রহ্মের উপাসক। তবে উপাসকের হিতার্থে তাঁহার পরমব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়াছে। তাই পরমব্রহ্ম প্রকৃতি-পুরুষ, শ্রী-হরি, হর-গৌরী, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ রূপে—ভারতে উপাসিত। কেবল "বিচার-দিনে" ঈশ্বরের সহিত হিন্দুর সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর হিন্দুর আজীবন সখা। সুতরাং তাঁহার রূপ চাই। তাঁহার এক এক মূর্ত্তি এক এক নক্ষত্রে স্থাপিত হইয়াছে। তাই বেদে প্রকাশ যে—দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি।

তাই হিন্দু "শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং অগ্নি-প্রত্যধিদৈবতম্" দেবের পূজা করেন।

তাই হিন্দু "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনারায়ণম্" দেবের পূজা করেন।

এক নক্ষত্রে হরি-হর স্থাপিত। যা শ্রী সা গিরিজা প্রোক্তা। যঃ হরিঃ সঃ হরঃ স্মৃতঃ॥" (বরাহ পুরাণ)

তারা-কন্যা "জগৎ-প্রসবিতা সবিতা"-দেবের নারী-মূর্ত্তি বা পত্নী অর্থাৎ সূর্য্য-প্রভা সূর্য্যা-দেবীর নাক্ষত্রিক প্রতিমা। তাই তারা-কন্যা সূর্য্যের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অগ্নি এক হস্তে ধারণ করেন। সূর্য্য-পত্নী তারা-কন্যা সূর্য্যাধিষ্ঠিত নারায়ণের পত্নী শ্রী ও লক্ষ্মী। এবং তিনি সূর্য্যাধিষ্ঠিত রুদ্রদেবের পত্নী ভগবতী রুদ্রাণী। ঐ দেখ রুদ্রাণী "কন্যারূপেণ দেবানাম্ অগ্রতঃ-দর্শনং দদৌ" (বৃঃ দেঃ সুঃ) এবং ঐ শুন ভগবতীকে—"সূর্য্যমন্ত্রেণ পূজয়েৎ" (ইতি পাদ্মে)।

উপাসক দেখিতেছেন যে—ভগবতী নারায়ণের চক্র, রুদ্রদেবের ত্রিশূল খড়্গ, ইন্দ্রের পরশু (বজ্র), বরুণের পাশ এবং কুমারের শক্তি ধারণ করিয়া আছেন।

তারা-কন্যা চিরকুমারী এবং চির সতী,

(*) গ্রীকজ্যোতির্বিদ্‌গণ বলেন যে "Bootes গ্রীক শব্দ নহে"। বোধ হয় ভূতেশ হেলেস্‌পণ্ট পার হইয়া Bootes নাম গ্রহণ করিয়াছেন—(লেখক)।

দক্ষসুতা তারা-কন্যা সর্ব্বত্র ✱ "সতী" নাম পাইয়াছেন।

সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যা দেবী উদয়গিরিতে জাত বলিয়া "গৌরী" নাম পাইতে পারেন। অথবা তাঁহার প্রতিমা হৈমবর্ণা। ঋষিগণ সোম-যুক্তা বেদে হৈমবতী নাম ধারণ করেন। এই কারণে পুরাণে দেবী হিমবান্-দুহিতা হইয়াছেন। অভিধানে দেবীর এক নাম চিত্রা। চিত্রা নামের সার্থকতা উপাসকের বিশেষ বিবেচ্য। দেবীর সাবিত্রী নাম উপাসকের মনে বেদের সূর্য্যা দেবীর ছায়া আনিয়া দেয়। সিংহপৃষ্ঠে তারা-কন্যা সূর্য্যের বর্ণমূর্ত্তি এবং "প্রকৃতি-পুরুষের" আদি আদর্শ।

• মহিষ ও সর্প অন্ধকারের সহচর বলিয়া তাহারা অন্ধকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মহিষাসুর মণ্ডল এবং জলসর্প-মণ্ডল (কালীয়) অন্ধকারের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। সর্পবেষ্টিত মহিষ অন্ধকারের বর্ণ-মূর্ত্তি। সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যা অন্ধকার বিনাশে সতত উদ্যত। আলোক ও অন্ধকারের অবিরাম সংগ্রাম জগতে নিয়ত চলিতেছে। এ সংগ্রামের আদি বা অন্ত নাই। কখন (দিনে) আলোক উচ্চে, কখন (রাত্রে) অন্ধকার উচ্চে। এ সংগ্রামে জয়-পরাজয় নাই। সিংহবাহিনী তারা-কন্যার হস্তে সর্পবেষ্টিত মহিষ-অসুরের মরণ নাই। তাই দেবী "মহিষ-মর্দ্দিনী" নাম ধারণ করেন। দেবী মহিষ-বিনাশিনী নহেন † পাছে দেবী সূর্য্যার এই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দুর্দ্দমনীয় করিতে কোন উপাসকের মনে দ্বিধা জন্মে সেই সংশয় বিমোচনার্থে তারা-সিংহ দেবীর বাহন এবং ভূতেশ দেবীর শিরোদেশে এবং অমৃতভাণ্ড দেবীর পদতলে স্থাপিত হইয়াছে।

এই তারা-চিত্র মহর্ষি কাত্যায়নের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। মহর্ষির উদ্ভাবিত তারামূর্ত্তি কাত্যায়নী নাম ধারণ করে।

উমা কাত্যায়নী গৌরী

ইন্দ্রের শচী, আদিত্যের শ্রী ও লক্ষ্মী, রুদ্রের রুদ্রাণী, বরুণের সুদেষ্ণা, যমের ধূমোনী, চন্দ্রের 'চিত্রা', কুমার কামদেবের 'দেবসেনা', সতী সাবিত্রী সকলেই তারাকন্যার মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। এই মূর্ত্তির উপাসনায় বিশাল-হৃদয় উপাসকের মনে আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি এক আধারে সকল দেবদেবীর উপাসনায় চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতে পারেন।

অদূরদর্শী বৈষ্ণবগণ বেশ পড়েন—

(ক) যঃ হরিঃ সঃ হরঃ স্মৃতঃ

• (খ) শংকরঃ ভগবান্ গৌরীঃ (বিষ্ণুপুরাণ)

(গ) রুদ্রদেবের প্রার্থনামতে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীকে অর্পণ করেন।

তথাপি তাঁহার ভেদজ্ঞান দূর হয় না। তিনি বেদোক্ত রুদ্রদেবকে যোগিন্ বানাইতে চাহেন।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তড়িৎময়ী প্রভাদেবী বেদে কুমারী সূর্য্যা নামে গীত ও অর্চ্চিত হইয়াছেন। সেই সূর্য্যাদেবী আধ্যাত্মিকের আধিদৈবিক প্রতিমা।

নববর্ষের আদি দিনে রাশিচক্রে সূর্য্যের নব যাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়। বাক্যান্তরে জগৎ-প্রসবিত্রী সবিতৃদেবের নারীমূর্ত্তি কুমারী ভগ-

---

✱ দ্রঃ। Semitic Ariadne (the very chaste one).

† মহর্ষি বেদব্যাস মহিষাসুর বধের এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রদ্যুম্ন কামদেবত কুমার মঙ্গল গ্রহের উদয়ে নিশাকালে মহিষাসুরের বধ কল্পিত হইয়াছে। (বনপর্ব্ব)

বতী সাবিত্রী সতীর নব যাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়। ভগবতী সাবিত্রী দেবীর যাত্রা হইতে নববর্ষের প্রথম দিন "ভগবতীযাত্রা" উপাধি ধারণ করে।

খৃঃ পূঃ ১১৮১ সালের ১লা আশ্বিন হইতে আশ্বিন-আদিবর্ষ পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিনে কৃষ্ণ নবমী তিথি ছিল, তাই কৃষ্ণ নবমী তিথিতে কল্প আরম্ভ করিয়া ভগবতীর পূজা আরম্ভ হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভগবতী সাবিত্রী দেবীর আধি-দৈবিক বা নাক্ষত্রিক প্রতিমা সিংহবাহিনী তারা-কন্যাতে সবিতাদেবের প্রবেশ দিনে নব-বর্ষের অবতারণা উপলক্ষে হিন্দুর এই শারদীয় মহোৎসব হয়। হিন্দু কালক্রমে শারদীয়া পূজার মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। এখন তিনি ভাবেন তিনি নক্ষত্র-উপাসক নহেন। তিনি পুরাণে পড়েন—যোগ ভঙ্গ হেতু মহর্ষি কাত্যায়ন মহিষাসুরকে অভিসম্পাত করেন যে "আদ্যাশক্তি দশভুজামূর্ত্তি য়া তাঁহাকে সংহার করিবেন।"

পারিপার্শ্বিক দেবদেবী

গণপতি

মূষিকবাহন গজানন গণপতি দেব সিদ্ধি-দাতা গণেশ নামে সকল দেবের অগ্রে পূজা লইতেছেন। ইনি কে?

বৃহস্পতি সূক্তে আমরা ঋক্ মন্ত্রে (২।২৩।১) পড়ি—

"গণানাম্ ত্বা গণপতিম্ হবামহে" হে বৃহস্পতি তুমি মরুৎগণের অধিপতি তোমায় আহ্বান করি।

তাই কালিকা-পুরাণে নির্দ্দেশ হইল "গণেশবীজং তত্ত্ব ইদম্ গুরোঃ মন্ত্রংপ্রকীর্ত্তিতম্" গণেশ দেব ও দেবগুরু বৃহস্পতি উভয়ের বীজমন্ত্র এক।

অর্থাৎ

ইহারা একে অন্যের প্রকৃতি। সুতরাং গণপতি বৃহৎ-পতির প্রতিমা তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ঋক্‌মন্ত্রে পড়ি (২।২৩।১৮) বজ্রধর বৃহস্পতি মেঘ অধোমুখ করেন।

তন্ত্রমতেও "বারিপূর্ণাং মহীং কৃত্বা। পশ্চাৎ সঞ্চরতে গুরুঃ।"

জলবর্ষী দিগ্‌গজের কথা সকলেই জানেন। জলবর্ষী গজ জলদেবতা বৃহস্পতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বজ্রদংষ্ট্র গজমুণ্ড "এক-দন্ত গজানন" হইল।

মূষিক ভাবী ঝটিকা গণনা করিতে পরম দৈবজ্ঞ। আপতন্ত ঝড়ের পূর্ব্বে জাহাজের নৌ-নিগড় তুলিলে মূষিকদল ঝাঁকে ঝাঁকে ঝম্প দিয়া জাহাজ হইতে সমুদ্র-জলে পড়ে ও কিনারা লয়।

বিলাতী কাণ্ডারী ঠেকিয়া শিখিয়াছেন এই জ্যোতিষীদল চম্পট দিলে জাহাজ ভাসাইতে নাই। তাই মূষিক মরুৎগণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মূষিক "গণানাম্ গণ-পতি"র বাহন হইল।

দেবগুরু বৃহস্পতি দেবগণের পিতা। "দেবানাম্ যঃ পিতরম্"... (ঋ ২।২৬।৩) তিনি বেদমন্ত্রের জনিতা......জনিতা ব্রাহ্মণঃ অসি (ঋ ২।২৩।২)। গতিকে তিনি সিদ্ধি-দাতা গণেশ। তিনি আর্য্যজাতির আদি উপাস্য বৃহৎ-পতি। তাঁহার পূজা না করিয়া হিন্দু অন্য দেবের পূজা কিরূপে করিবেন। তাই গণপতি বৃহস্পতির পূজা সর্ব্বাগ্রে করিতে

হয়। নতুবা অন্য দেবগণ পূজা লইবেন না। কাহার সাধ্য দেবগণের পিতা বেদমন্ত্রের জনিতা গুরু বৃহস্পতিকে ছাড়িয়া পূজা করে বা পূজা লয়?

মূল-তত্ত্ব জানিলে পৌরাণিক উপন্যাস পড়িতে বড়ই আনন্দ অনুভব হয়। মূলতত্ত্ব জানা না থাকিলে বড়ই বিপদ।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে সুতীক্ষ্ণ তারাদর্শক পদ্মপুরাণকার গণপতির মূল উদ্‌ঘাটনে মহাভ্রমে পতিত হইয়া মূষিকবাহনে কামদেবকে চড়াইয়াছেন।

তবে সাহিত্যিক নিষ্ঠাবশে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে "সিদ্ধিপ্রদং কামদং" ধ্যানে মনটা যে বিচলিত না হয় এমন নহে।

বেদমতে* বৃহস্পতি গীর্ব্বাণ তাই গণেশের হাতে বাদ্যভাণ্ড। জ্যোতিষমতে বৃহস্পতি গ্রহে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র উভয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্য্যাস্য ইন্দ্র প্রত্যভিদৈবতম্।

তাই ব্রহ্মার (বিধির) কলম গণপতির হস্তে।

কার্ত্তিকেয়

কুক্কুটশোভিত কুমার শিখিবাহন কার্ত্তিকেয় কে? মহাভারতমতে কুমার স্কন্দদেব অগ্নির পুত্র। অগ্নিদেব কুমারকে চিত্রশিখণ্ডী এবং শিখণ্ডী (কুক্কুট) উপহার দেন। কুমার দেবসেনার পতি।

মার-গ্রহ (মঙ্গল) সর্ব্বদেশে দেবসেনাপতি। জ্যোতিষ মতে ভৌম ভূমিনন্দন মারগ্রহের অধিদেবতা স্কন্দদেব।

"স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং"

কালিকাপুরাণে নির্দ্দেশ আছে যে "কামদেবস্য বীজং তু মন্ত্রং ভৌমস্য কীর্ত্তিতং।" কামদেব ও ভৌমগ্রহ উভয়ে একই বীজমন্ত্রে অৰ্চ্চিত হইবে। অর্থাৎ ভৌমগ্রহের অধিদেবতা কামদেব।

ভৌমগ্রহের জ্যোতিষোক্ত অধিদেবতা কুমার স্কন্দদেব এবং কামদেব একই ব্যক্তি।

অথর্ব্ব-বেদোক্ত কামসূক্ত (৯।২) পাঠে আমরা পাই যে কামদেব ত্রিমূর্ত্তিতে মানবের হিত সাধন করেন। সমরদেব, মৃত্যুদেব এবং প্রণয়দেব। "যং তে কাম শর্ম্ম ত্রিবরূথম্।" কুমার কার্ত্তিকেয় দেবকে আমরা এই ত্রিমূর্ত্তিতে উপাসনা করি।

পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে এসিয়া য়ুরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় শরৎকাল জীবের মরণের সময়। তাই কার্ত্তিক মাসে মৃত্যুদেব কার্ত্তিকেয় উপাসিত হইয়া থাকেন।

কামরিপুপ্রবণ রণদুর্ম্মদ চিত্র-শিখণ্ডী (ময়ূর) কামদেব—কার্ত্তিকেয় দেবের বাহন। কামরিপুপ্রবণ রণদুর্ম্মদ শিখণ্ডী (কুক্কুট) কুমার কাম—কার্ত্তিকেয় দেবের ভূষণ। এবং কামরিপুপ্রবণ ছাগের মুণ্ড কুমার কার্ত্তিকেয় দেবের সপ্তম মুণ্ড। মহাভারত-উক্ত এই "ছাগবক্ত্র সপ্তম মুণ্ড" প্রতিমায় প্রকাশ থাকে না।

কালপুরুষমণ্ডল (Orion) কামদৈবত ভৌমগ্রহের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। কৃত্তিকা-নক্ষত্র সন্নিহিত এই তারামণ্ডলে ময়ূর কুমারদেব আসীন আছেন। এবং তারা-কুক্কুট কুমারের শিরোদেশ সুশোভিত করিতেছে। এই তারা-কুক্কুট চাক্ষুষ দৃষ্টির গোচর নহে। ফীল্ড গ্লাস সাহায্যে ইহাকে দেখিতে হয়। চণ্ডীতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ময়ূর-

কুক্কুটবৃত কুমারমূর্ত্তিকে নারীবেশ দিয়াছেন। যথা :—ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরে অনঘে। কৌমারীরূপসংস্থে চ নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ অহি-সর্প অহি-অন্ধকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। অহি সর্প ভক্ষণে শিখণ্ডী ময়ূর এবং শিখণ্ডী কুক্কুট উভয়েই পটু। অহি-সর্পনাশী সুন্দরকায় ময়ূর কুক্কুট উভয়ে অহি অন্ধকারনাশী অপরূপ কুমারদেবের ভূষণ বাহন হইলেন।

কুমার যে শক্তির আঘাতে মহিষ-অসুর বধ করিয়াছিলেন ঐ শক্তি কুমার-করে বিরাজমান আছে।

এই শক্তি ভৌমগ্রহের হস্তে দিয়া স্কন্দ-পুরাণকার মঙ্গল গ্রহের স্তবে বলিয়াছেন,—

ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তং চ লোহিতাঙ্গম্ নমাম্যহম্॥

চিন্তাশীল পাঠক বিচার করিবেন যে, স্তবটী গুহদেবে প্রয়োগ করিলে খাটে কি না।

লক্ষ্মী

বেদমতে—শ্রীঃ চ তে লক্ষ্মীঃ চ পত্ন্যৌ। শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যদেবের পত্নীদ্বয়।

পদ্মপুরাণে পড়ি—"লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মি" লক্ষ্ম-(কলঙ্ক)-ময়ী লক্ষ্মীদেবীর ভ্রাতা কলঙ্কী চাঁদ। পূর্ণিমা তিথির স্ত্রীগ্রহ রাকাচন্দ্র ভিন্ন শীতরশ্মির ভগিনী আর কে হইবে ?

চন্দ্র ওষধিপতি। বেদমতে (ঋ ২।৩২।৫) রাকা ধন ও সহস্র পোষ (সাহায্য) দাত্রী।

যাঃ তে রাকে সুমতয়ঃ
যাভিঃ দদাসি বসুনি।
তাভিঃ নঃ অদ্য
সহস্র পোষং সুভগে রণাণা॥

সকলেই জানেন যে পূর্ণিমাচন্দ্রে লক্ষ্ম সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। অহি রাকাদেবী লক্ষ্মী নাম গ্রহণ করিয়া ধনধান্যপ্রদায়িনী হইয়াছেন। লক্ষ্মী শস্যের অধিপত্নী। হুতুম চন্দ্রের সহচর। সে দিবাভাগে অদৃশ্য থাকে। শস্যভক্ষক মূষিক বিনাশে হুতুম সিদ্ধহস্ত। এই গুণে সে লক্ষ্মীর বাহন হইল।

দ্বাদশ পূর্ণিমার মধ্যে শারদীয় পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্নারূপে অতুলনীয় এবং জগতের অপার আনন্দপ্রদ বলিয়া কৌমুদী (কু+মুদ) আখ্যা পাইয়াছে।

শরৎশস্য আহরণ সমাপ্ত হইলে উল্লাসে ভাবাবেশ কৃষককুল কৌমুদীর নিশা আনন্দে জাগরণ করিত। শাস্ত্র এই পূর্ণিমা কে-জাগরী নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই কে-জাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে রাকার উদয় ক্ষণে হিন্দুকৃষকের ঘরে ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়। কিন্তু খাজানা, শেষার ও চৌকিদারী টেক্‌সের দায়ে কৃষককুল ব্যাকুল হইয়াছে। রাত্রি জাগরণ কে করে ?

লক্ষ্মীদেবী অন্ধকার-মহিষ নাশে ভগবতী দুর্গার দক্ষিণ হস্ত। তাই দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইয়াছেন।

সরস্বতী

বীণামণ্ডলের (Lyra) পার্শ্বে আকাশ সরস্বতী সোমধারার (The Milky way) মধ্যে প্রবাহিত আছেন।

ঋক্‌মন্ত্রে (১।৩।১২) পড়ি—বারিধিক সরস্বতী কিরণে আলোকিত করিতেছেন যথা—

"মহঃ অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা" টীকায় সায়ন বলিলেন "দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবৎ দেবতা নদীরূপা চ।" আকাশ সরস্বতী বলিতে সাহসে কুলাইল না।

বেদমতে সরস্বতী বাক্‌দেবী। এবং সরস্বতীর কৃপায় বেদমন্ত্র রচিত হয়। সরস্বতী পাচণ্ড, নক্ষত্রপথগামিনী এবং অন্ধকার-বিনাশিনী। যথা—ঋ ৬।৬১।৭

"ঘোরা হিরণ্যবর্ত্তনীঃ বৃত্রঘ্নী" তাই মহিষাসুর বধে সরস্বতী ভগবতী দুর্গার সহায় হইয়াছেন। তাঁহার ভূষণ তারা-বীণা এবং তাহার বাহন তারা-হংস (Cyghus)।

তারাদর্শক।

শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী

বঙ্গদেশের পবিত্র সারস্বতধাম নবদ্বীপের বিবন্ধজননী অথবা পোড়ামা তলা হইতে একটী সরল রাজপথ পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ৺বুড়াশিবের কোঠা, ওলাদেবীর মন্দির ও পাড়ার বারতলা অতিক্রম করিয়া নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলার সীমারক্ষক পলতা বা আদিগঙ্গার খাত পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের বাম পার্শ্বে ওলাদেবী তলার সম্মুখে শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী ছিল। দক্ষিণ-দ্বারী ও উত্তরদ্বারী দুইটী মৃন্ময়-ভিত্তিবিশিষ্ট চণ্ডীমণ্ডপ। উহার মেঝে, বারান্দা, সিঁড় প্রভৃতি পাকা সিমেণ্ট করা। পূর্ব্বদ্বারী সুদীর্ঘ গৃহশ্রেণী, উহাতে প্রায় সাত আটটী ঘর। প্রত্যেক ঘরের অর্দ্ধাংশ উচ্চ, উহাতে বিদ্যার্থিগণ শয়ন ও উপবেশন করিতেন এবং অপর নিম্নার্দ্ধে পাকের উনোন ও আহারের স্থান। প্রত্যেক ঘরে একটী করিয়া দরজা ও উহার সম্মুখভাগে ক্ষুদ্র আকারের একটী করিয়া জানালা। পূর্ব্বদিকে বাগান; উহাতে পেঁপে, কদলী, নিম, বেগুন, মেটে আলু, লঙ্কা, নটেশাক, পেয়ারা, ফজলি আম প্রভৃতির গাছ। উঠানের চতুর্দ্দিকে দোপাটী, গাঁদা, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প-তরু-শ্রেণী। তদ্ভিন্ন চতুষ্পাঠী গৃহ শ্রেণীর উত্তর ভাগে দক্ষিণদ্বারী চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিম পার্শ্বে সমতলভূমিতে একটী বড় বিল্বতরু ও একটী চম্পক বৃক্ষ শোভা পাইত। চতুষ্পাঠী গৃহশ্রেণীর দক্ষিণাংশে বৃহৎ কূপ বিদ্যমান।

এই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয় নবদ্বীপের বিশ্রুতনামা পণ্ডিতগণের অন্যতম। তিনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ৺হরমোহন চূড়ামণি ও প্রধান স্মার্ত্ত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয়ের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী এবং মহামহোপাধ্যায় ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, ৺প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন, ৺হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মহামহোপাধ্যায় ৺রাজকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপক মহোদয়গণের সমসাময়িক। মহামহোপাধ্যায় ৺যদুনাথ সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও ৺শ্রীনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অধ্যাপক মহোদয়গণ তাঁহার পরবর্ত্তী। শিরোরত্ন মহাশয় রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের ভঙ্গ-কুলীন-বংশসম্ভূত। তাঁহার বংশোপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার

ও ন্যায়দর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শিরোরত্ন মহাশয় পাঠ শেষ করিয়া যদি মিশনরী কলেজে কিছুদিন চাকরি স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত অধ্যাপকগণ অপেক্ষা অনেক অধিক প্রখ্যাত ও যশস্বী হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা রক্ষা করিতে গিয়া মিশনরী কলেজের কার্য্য পরিত্যাগ করেন।* তাহার পরে, তিনি সুন্দর চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করিয়া পবিত্র অধ্যাপনা-ব্রতে ব্রতী হন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের দুই পক্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই ব্রত অক্ষুণ্ণ ছিল। এখনও সেই সারস্বতনিকেতন চতুষ্পাঠীর শেষ চিহ্ন মৃত্তিকা-স্তূপ রহিয়াছে, কিন্তু সেখান হইতে বাগ্‌দেবীর পবিত্র বীণাঝঙ্কার চিরকালের জন্য নীরব হইয়াছে। সে মধুর ঝঙ্কার আর কখনও সেখানে শ্রুত হইবে না।

পূজ্যপাদ গুরুদেব শিরোরত্ন মহাশয়ের প্রথম জীবনে ও মধ্যজীবনে কত শত বিদ্যার্থী তাঁহার উপদেশামৃত পান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা গণনা করা অসম্ভব এবং আমি তাঁহাদের সকলের নামও অবগত নহি; আমি গুরুদেবের শেষ জীবনের ছাত্র, আমাদের সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। আমি একাদশবর্ষ বয়সে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়নের নিমিত্ত এই চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করি, তখন আগমেশ্বরীতলার ৺মথুরানাথ তর্কবাগীশ (মথুর পুরুত) পাঠ শেষ করিয়াছেন, তবে মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের পাঠ চাওয়াইতে আসিতেন। বুড়াশিবতলার তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি মহাশয় তখনও চতুষ্পাঠীর মেরুদণ্ডস্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন। কুমারখালীর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসন্ন গোস্বামী কিছুকাল পরে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করেন। শিবচন্দ্র দাদা কাশী ঘুরিয়া পুনরায় এই চতুষ্পাঠীতে আসিয়াছিলেন। অপর ছয়জন সংসারে প্রবিষ্ট হন। আমি প্রতিদিন স্বহস্তে লিখিয়া ব্যাকরণ পাঠ করিতাম, গুরুদেব আমার হাতের লেখা দেখিয়া আমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ কাব্যতীর্থ ভায়ার * এবং আমার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য ও অমরকোষ অভিধান পাঠ শেষ হইলেই গুরুদেব ব্যাকরণ পড়ান ছাড়িয়া দেন। তিনি ব্যাকরণপাঠার্থী ছাত্রদিগের শুভদিনে ব্যাকরণের একটী পাঠ পড়াইয়াই আমার এবং হরগোবিন্দ ভায়ার হস্তে পড়াইবার জন্য অর্পণ করিতেন। যদিও পাঠার্থীদিগের কতক সংখ্যক আমার হস্তে ও কতক হরগোবিন্দ ভায়ার হস্তে দিতেন। কিন্তু একের অনুপস্থিতিতে অপরকে

(*) তদানীন্তন পণ্ডিতগণের মধ্যে শিরোরত্ন মহাশয়কে সমধিক ব্যুৎপন্ন শুনিয়া মিশনরী কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রথমে শিরোরত্ন মহাশয় অস্বীকার করেন, শেষে এইরূপ নিয়ম হয়, শিরোরত্ন মহাশয় মাসিক বেতন গ্রহণ করিবেন না, তবে 'মিশনরী' সাহেব ছয়মাস কিম্বা এক বৎসর অন্তর ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুত্রদিগকে কিছু টাকা উপহার দিতে পারেন। শিরোরত্ন মহাশয় ছয়মাসের অধিক কর্ম্ম করেন নাই, তাঁহার পুত্রদিগকে কোন উপহারও গ্রহণ করিতে হয় নাই।

(*) বর্ত্তমান নড়াল ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক।

সকল ছাত্রকেই পড়াইতে হইত। আবার ছাত্রেরা কোন মাসে আমার নিকট কোন মাসে বা হরগোবিন্দ ভায়ার নিকট পড়িতেন। বৈদেশিক ছাত্রদের মধ্যে দুইজন আমাদের অপেক্ষা পাঠে অধিক অগ্রসর ছিলেন। একজন বিদ্যারত্ন আখ্যায় অভিহিত, ইঁহার নাম আমরা কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিতীর্থ, তারকেশ্বরের মোহান্তের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক)। আমরা যাঁহাদের পাঠ চাওয়াইতাম, যতদূর স্মরণ আছে, নিম্নে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিভূষণ, বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক), শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (ইদানীং বিদ্যাভূষণ, নদীয়ার রাজ-পুরোহিত), ৺প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (৺হরমোহন চূড়ামণি মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র), শ্রীযুক্ত সিতি-কণ্ঠ ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিভূষণ, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পৌত্র এবং হরিসভার অধ্যক্ষ), ৺কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, ৺যোগীন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য (নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত্ত ৺শ্রীনাথ শিরোমণি মহাশয়ের সহোদরদ্বয়), ৺দুর্গাদাস আচার্য্য (পরে বিদ্যারত্ন, নদীয়ার রাজার তদানীন্তন পঞ্জিকাকার ৺তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশের পুত্র), শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ গোস্বামী ভাগবতরত্ন (চৈতন্য-চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ), ৺মাধবচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতভূষণ, ৺গোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গোস্বামী (ইদানীং সন্ন্যাসী), শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা), ৺দীননাথ রায় (দাদু শেয়াল), শ্রীযুক্ত মতিলাল সান্ন্যাল (মতি চোর), ৺বেণী ভট্টাচার্য্য (নদীয়ার রাজার দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুরোহিত যাদু ভট্টাচার্য্যের পুত্র)। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোস্বামী (শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র, ইদানীং প্রসিদ্ধ কথক), শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ ঘটক (ইদানীং বৃন্দাবননিবাসী পুরাণপাঠক), শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন (মুগ্ধবোধের বাঙ্গালা অনুবাদক), শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ শর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা (যশোর-জেলা-নিবাসী), শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী (লটাখোলা-নিবাসী), শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ মিশ্র (উৎকল যাজ-পুর নিবাসী), ৺আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ মিশ্র শাস্ত্রীন্দ্র (গঞ্জাম জেলার অধিবাসী), এতদ্ভিন্ন তৈলিঙ্গ দেশ হইতে অনেক ছাত্র অনেক সময় আসিতেন যাইতেন, তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রীষ্মকালে প্রাতঃকালে ৭টার সময় ও শীতকালে ৮টার সময় চতু-ষ্পাঠীতে আসিতেন। তাঁহার টীকি ছিল না, প্রশস্ত টাক টীকির স্থান অধিকার করিয়া-ছিল। বর্ণ শ্যাম, শুভ্র উপবীত বক্ষঃস্থলে শোভা পাইত। একখানি সাদাপেড়ে ধুতি পরিতেন। বেশ দামী তালতলার চটি পায়ে দিতেন। তাঁহাকে কখনও জামা গায়ে দিতে দেখি নাই, শীতকালে একখানি পাতলা চাদরের উপর বনাত কিম্বা শাল গায়ে দিতেন। একটু বেঁটে ছিলেন, গুড় গুড় করিয়া যখন রাস্তা দিয়া আসিতেন, তখন চতুষ্পাঠীতে সকলে উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিত। তিনি আসার সময় একটী কাগজের ঠোঙ্গায় বড় বড় কতকগুলি টাকা ও উৎকৃষ্ট তামাক

লইয়া আসিতেন। ছাত্রবৎসল গুরুদেব জানিতেন, অন্তেবাসিগণ তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং ঐ দুই দ্রব্য এরূপ পরিমাণে আনিতেন যে, তাহাদ্বারা সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত সমস্ত দিন রাত্রি চলিত। তিনি আসিয়াই দীনুদাদা বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র দীনুদাদা ঈষৎ হাসিমুখে গিয়া দুই হাত বাড়াইয়া টীকা-তামাক গ্রহণ করিতেন এবং তামাক সাজিয়া টিকা ধরানোর ছলে খুব মকুখম দুই টান দিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হুঁকার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতেন। দীনুদাদার অনুপস্থিতিতে বেণীদাদার হস্তে তাম্রকূট-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাক্ষাতে কোন ছাত্র তামাক খাইত না, কিন্তু তিনি যেন কিরূপ অভাবনীয় উপায়ে জানিতেন কে তামাক খায়, কে খায় না। যাহারা তামাক খায় না, তাহাদিগকে তিনি তামাক সাজিতে বলিতেন না। হরগোবিন্দ ভায়ার এবং আমার ও বালাই ছিল না, সুতরাং কখন তিনি, আমাদের দু'জনকে তামাক সাজিতে বলিতেন না। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা কোন দিন বা ১১টা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা চলিত। তাহার পর পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র চয়ন করিয়া গৃহে যাইতেন। একদিন কিংবা দুইদিন অন্তর বাগান হইতে থোড়, মোচা, কলাপাতা, মেটে আলু, কাঁচা কলা, নিমের পাতা, লঙ্কা, কাঁচা পেঁপে, পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা হইত। যে দিন ঐ সকল গৃহে যাইত, সে দিন পূর্ব্বেই পরিচারিকা ঝুড়ি লইয়া বসিয়া থাকিত।

চতুষ্পাঠী হইতে বাটী গিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বস্ত্র ও কোশা লইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইতেন। সেখানে স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা শেষ করিয়া গৃহে আসিতেন। বাটী হইতে পূজোপকরণ সহ পুনরায় বুড়াশিবের কোঠায় আসিয়া শিবপূজা করিতেন। তাহার পর বাটীতে গিয়া নারায়ণ পূজা করিয়া আহার শেষ করিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া যাইত। আধঘণ্টা বিশ্রামের পর, পুনরায় চতুষ্পাঠীতে আসিতেন। বিকালে নিজের চতুষ্পাঠীর ছাত্র পড়াইতেন না, নবদ্বীপের অন্যান্য চতুষ্পাঠী হইতে প্রতিদিন বহু বিদ্যার্থী ন্যায়ের শব্দখণ্ড, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কুসুমাঞ্জলি পড়িবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিতেন। যদিও ভট্টাচার্য্য মহাশয় অল্পসংখ্যক ছাত্রকে ন্যায়ের অনুমান-খণ্ড পড়াইতেন, কিন্তু ন্যায়ের শব্দখণ্ডে তাঁহার ন্যায় ব্যুৎপন্ন অধ্যাপক সে সময়ে নবদ্বীপে আর কেহই ছিলেন না। সুতরাং নবদ্বীপের সকল ছাত্রই পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট শব্দখণ্ড ও কুসুমাঞ্জলি (যাহাতে ন্যায়-মতে ঈশ্বর নিরূপণ করা হইয়াছে) পাঠ করিতে আসিতেন। আগন্তুক ছাত্রদের মধ্যে পাকা লক্ষ্মণ আচারী ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী এই দুইজন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। লক্ষ্মণ আচারী গোঁপের জন্য ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী ছাতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্মণ আচারীর গোঁপ নৈমিষারণ্যের সেই বড় হনুমানের গোঁপের মত বেটাগো ছিল। সদানন্দ ব্রহ্মচারীর ছাতার আকার অতি বৃহৎ, উহাতে বারোটা ডাল ছিল, শাদা ডবল কাপড় এবং শাদা ঝালর চতুর্দ্দিকে শোভা পাইত। ঐ ছত্রটীর মধ্যে চারি পাঁচটী লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারিত, কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় একাকীই উহার ছায়া উপ-

ভোগ করিতেন। বর্ণটী গৌর, মাংসল দেহ, মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকবসন, দাঁত সাদা ধবধবে, হাসিলেই দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িত। নামেও সদানন্দ, কার্য্যেও সদানন্দ, সকলের সঙ্গেই সর্ব্বদা হাসিমুখে কথা কহিতেন। ব্রহ্মচারী পাকাটোলে লক্ষ্মণ আচারীর ঘরের পাশের ঘরে বাস করিতেন। আচারী কৃষ্ণবর্ণ শাস্ত্রোক্ত গোষ্পদপরিমিত দীর্ঘশিখা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইত। পেচকের ন্যায় আরক্ত নয়ন ও অত্যন্ত ক্রোধান্ধ। আচারী কথায় কথায় সরলপ্রকৃতি ব্রহ্মচারীর নামে অভিযোগ করিতেন, আমাদের চতুষ্পাঠীতে উহার বিচার হইত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। আবার দুইজনে কোলাকুলি করিয়া হাসিতে হাসিতে টোলে ফিরিয়া যাইতেন। পাকাটোলের আর একটী প্রবীণ বিদ্যার্থী গুরুদেবের নিকট "বাদার্থ" পড়িতে আসিতেন। ইঁহার জন্মভূমি পঞ্জাবের জলন্ধর নগর। ইনি একচক্ষু, ছাত্রমণ্ডলীতে কাণাভট্টের (রঘুনাথ শিরোমণির) দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাকাটোলের অধ্যাপক ৺প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের তিরোভাবের পর ইনি কয়েক বৎসর পাকাটোলে অধ্যাপনা করেন। অকৃতদার, এখন হরিদ্বারে বাস করিতেছেন। ইঁহার নাম রামকৃষ্ণ তর্কশাস্ত্রী। পাকাটোলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিদ্যার্থীই বাস করিতেন। আমাদের টোলের সীমানার পরই পাকাটোলের সীমানা, সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চাদ্দিকে থাকিয়াও আমরা ঐ টোলের বিদ্যার্থীদের সর্ব্বপ্রকার আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতাম। পাকাটোলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুইটী পেঠেনী ছিল (নবদ্বীপে ঝীকে পেঠেনী বলে)। ঐ দুই পেঠেনী মহাপ্রভাবা এবং ছাত্রগণের একপ্রকার পরিচালিকা। ইহাদের দু'জনের নামই শশিমুখী। একটী বৃদ্ধা ও একটী প্রৌঢ়া। বয়স্থা ছোট শশী ও প্রৌঢ়া বড় শশী নামে প্রসিদ্ধা ছিল। ইহারা দু'জনেই সৎস্বভাবা, চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, উহারা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ছাত্রদের পরিচর্য্যা করিত। ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থগুলির নাম জানিত, ছাত্রেরা চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপকের নিকট পড়িতেছে, এমন সময় কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হইলে ছাত্রের গৃহ হইতে তাহা আনিয়া দিত। ত্রৈলঙ্গী, তামিল, মহারাষ্ট্র ছাত্র আসিলে ঐ দেশীয় অন্য ছাত্রের অনুপস্থিতিতে উহারাই তাহাদের ভাষা বুঝিয়া সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিত। আমাদের চতুষ্পাঠীর বৃদ্ধা পেঠেনীর সে কৃতিত্ব ছিল না। একবার আমাদের চতুষ্পাঠীতে দক্ষিণভারতের সুদূর প্রদেশ হইতে একটী বিদ্যার্থী ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত আগমন করেন। প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সংস্কৃতভাষায় সকল কথা হইল। গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াই ছাত্রটি ঝিকে বলেন "পবি যাড়ঝি আড়া" পেঠেনী কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা বলিলাম "কিং প্রার্থয়তে ভবান্? ইয়ং বরাকী তব উপজল্পং শক্নোতি।" তাহার পর, তিনি হাসিয়া বলিলেন—বস্ত্রম্ অন্বারং দেহি।" শেষে পেঠেনী বুঝিতে পারিয়া উত্তর বুঝাইয়া দিল। পাকাটোলের পেঠেনীরা হইলে ঐ ছাত্রটীর জন্য আমাদিগকে কিছুই বলিতে হইত না। দূরদেশ হইতে যে সকল বিদ্যার্থী নবদ্বীপে আসিতেন, তাঁহারা এক

প্রকার জ্ঞানযোগী, অনেক সময় তাঁহারা শাস্ত্র-চর্চায় নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। একদিন পাকাটোলের ছাত্রেরা হাত মুখ ধুইতে পল্‌তায় (আদি গঙ্গার খাতে) গিয়াছে, দুইজন জিগীষু ছাত্রের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছে। দুইজনে দুই নিশিন্দ্যার ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া বাঁধের উপরে দাঁতন করিতে করিতে ন্যায়শাস্ত্রের কোন পূর্ব্বপক্ষ সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে বসিয়া গিয়াছেন। এ'দিকে বেলা দশটা বাজে অধ্যাপক 'গৃহগমনোন্মুখ,' বড় শশী (পেঠেলী) খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া ধমক দিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। আবার অন্য-দিন গঙ্গাস্নান করিয়া একদল পাকাটোলের মৈথিল বিদ্যার্থী টোলে ফিরিতেছেন, ৺ভুবন-মোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলের একদল মৈথিল ছাত্র স্নানে যাইতেছে। পোড়ামা-তলায় উভয়দলের যেই সাক্ষাৎ হওয়া অমনি তর্ক আরম্ভ, পূর্ব্বোক্ত দলের পশ্চাৎ একটী মুটে ছিল, তাহার মাথায় একধামা আম ও তাল। ছাত্রগণ তর্ক করিতেছেন, তাঁহাদের মাথা ঘুরিতেছে, টিকী দুলিতেছে, মুটে হাঁ করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া আছে। এদিকে পোড়ামাতলার বটের গাছের ডাল হইতে একটী ছোট বানর একটী একটী করিয়া আম ও তাল তুলিয়া লইতেছে, হাতে হাতে আম ও তাল বৃক্ষময় বানর-সম্প্রদায়ের মধ্যে চালান হইতেছে। ছোট শশী গঙ্গাজল লইয়া যখন সেখানে উপস্থিত, তখন শেষ আম্রটী বানর শিশু কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। সে চেঁচিয়ে বলিল "তোমরা এখানে ঘটাকাশ, পটাকাশ করছো, এদিকে তোমাদের পিণ্ডী যে বানরে গেলছে।" তখন সকলে ধামার মধ্যে ফলের অত্যন্তাভাব লক্ষ্য করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আবার ছোটশশী পোড়ামা-কোঠায় গঙ্গাজলের কলসী রাখিয়া মুটে সঙ্গে করিয়া আম ও তাল কিনিতে গেল। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই হইত।

আমাদের চতুষ্পাঠী বুড়া শিবতলা সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে, উহার ঠিক উত্তর পার্শ্বেই স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের টোল। ঐ টোলে বাঙ্গালী ছাত্র ছিল না, অধিকাংশ মৈথিল, দুই একটী উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছাত্র ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটী তরুণবয়স্ক দণ্ডী ঐ টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সম্পন্ন লোকের সন্তান, উপনয়নের পর স্বেচ্ছায় দণ্ড ত্যাগ করেন। যেমন সুন্দর সুগঠিত দেহ, তেমনি প্রতিভাবান্। তিনি আমাদের টোলে ভট্টা-চার্য্য মহাশয়ের নিকট বিকালে কুসুমাঞ্জলি পড়িতে আসিতেন। তাঁহার প্রতিমাসেই বাটী হইতে মণি-অর্ডার আসিত, গরদের কাপড় গিরিমাটী দিয়া ছুপাইয়া পরিতেন। দণ্ডীদের অগ্নিস্পর্শ করা নিষেধ, সুতরাং রাম-সীতার বাটীতে মাসিক আট টাকা দিয়া হিন্দুস্থানী পাচকের হস্তে এক বেলা চব্বচুষ্য আহার করিতেন এবং ফলমূল মিষ্টান্ন দুগ্ধে রাত্রের ব্যাপার সমাপ্ত হইত। দণ্ডী প্রাতঃ-কালে মুখ ধুইয়াই সেই সময়ের দোয়া উগগুণ্ড একসের দুগ্ধের মধ্যে এক ছটাক ঘৃত মিশাইয়া পান করিতেন। তাঁহার শরীরে হস্তীর ন্যায় বল ছিল। ঐ দণ্ডীর নাম সোমেশ্বরানন্দ সোমেশ্বরানন্দ গৃহত্যাগী দণ্ডী অথচ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ়মাসে বিকালবেলা আকাশে মেঘ উদিত হইলেই আকাশের দিকে তাকাইয়া

আঁত মধুর স্বরে মেঘদূতের নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিতেন।

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥"

আমরা তাঁহার জীবনের রহস্য কিছু বুঝিতে পারিতাম না। তখনও নবদ্বীপে টোলের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় প্রায়ই দল বাঁধিয়া যাইতে হইত, প্রায়ই পথের মধ্যে কি গঙ্গার ঘাটে তর্ক-বিতর্ক হইত। সায়ংকালে গঙ্গাতীরে যাইবার সময়ও ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হইত।

প্রতিপদ, চতুর্থীর রাত্রি, অষ্টমী, ত্রয়োদশীর রাত্রি প্রভৃতি অনধ্যায় কালে আমরা বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃতানুবাদ ও সংস্কৃত কবিতা রচনার চেষ্টা করিতাম। কোন কোন দিন অন্য টোল হইতেও অধিকবয়স্ক ছাত্রেরা আসিয়া আমাদিগকে উদ্ভট কবিতা শুনাইতেন। আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে সময়ে নবদ্বীপের প্রধান কবি। আমরা তাঁহার রচিত কবিতারও আলোচনা করিতাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত উদারচরিত ছিলেন, তিনি যেমন দয়ালু তেমনি নির্লোভ, লোকে তাঁহাকে একটু ক্রোধী বলিত, কিন্তু অতটুকু ক্রোধ না থাকিলে লোকে গ্রাহ্য করিবে কেন? তাঁহার যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য ছিল, তিনি চতুষ্পাঠীতে পদার্পণ করিলেই সেই ছাত্র-কলরবে মুখরিত চতুষ্পাঠী যেন "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" হইত। নবদ্বীপের সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইতেন। এতদ্ভিন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গরিব ছাত্রদিগকে বৃত্তি ব্যতীত মাসিক দুইএক টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। তাঁহার ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু সে ক্রোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। আমরা দেখিয়াছি তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইলেও, তিনবার কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেই তাঁহার সমস্ত ক্রোধ অন্তর্হিত হইত। একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় পড়াইয়া কেবল বাটী যাইবেন এমন সময় চাউল বোঝাই গরুর গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া টোলের কঞ্চির বেড়ার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। সংবাদ পাইবা মাত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়াই গাড়োয়ানের প্রাণ উড়িয়া গেল সে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে একবার হাত উঁচু করিয়া মারিতে যান, আবার পিছাইয়া আসেন, এইরূপ বার তিনেক করিয়া তাহার পর ফুলের সাজি বেলতলায় রাখিয়া আবার কি মনে হইল, হাত উঁচু করিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহার পর একবার কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেন। আবার বকিতে বকিতে কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেন। তখন ছাত্রেরা চুপে চুপে বলিতে লাগিল, আর একটীবার কাছা ঝারিলেই বেচারা নিস্তার পায়। সত্য সত্যই আর একবার কাছা ঝারিয়া যখন কাছা দিলেন, তখন তাঁহার পুনরায় পূর্ব্ববৎ সৌম্যভাব লক্ষিত হইল, বলিলেন "যা বেটা যা আর কখনও বেড়া ভাঙ্গিস না, সকালে কিছু খেয়েছিস্?" গাড়োয়ান বলিল "ঠাকুর মশাই খাব কি? শেষরেতে গাড়ী ছেড়েছি, নদের বাজারে যাব, চাউল বেচব তবে তো পয়সা পাব।" ঐ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় টেঁক থেকে তিনটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "যা মুড়ি মুড়্কী কিনে খাগে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, তাঁহার পু· মথুরাম আঃ সার্জ্জন ডাক্তার ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাঁহার প্রেরিত অর্থও না কি গ্রহণ করিতেন না। গুরুদেবের উপদেশ ও শাসনগুণে ছাত্রগণের মানসিক ও নৈতিক পবিত্রতার তিলমাত্র হানি নাই। আমরা জীবনের প্রথম অংশ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম সকলেই সুস্থ দেহে অতি আনন্দে ছিলাম। ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর হিংসাদ্বেষ তিলমাত্র ছিল না, সকলেই পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন। 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।'

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

বৈদিক সাধনার আভাস

এইরূপে ঋষি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে প্রথমে অব্যক্ত সৃষ্টির পরে ভোক্তৃ-ভোগ্যসৃষ্টির স্থূলবিবরণ দিয়া সর্ব্ববিশ্বের অধ্যক্ষ সর্ব্বজ্ঞ এক ঈশ্বরের অঙ্গীকার করিলেন। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তথাপি প্রলয়কালে তাঁহার যে নির্গুণ অবস্থা যে অবস্থায় গুণময়ী প্রকৃতি অভিন্নরূপে তাঁহাতে অবস্থিতা ও নিক্রিয়া, সেই অবস্থা হইতে একেবারে গুণময় জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। এই জন্যই সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম স্তরে বিশ্বজননী তাঁহার গুণের লীলা প্রকটিত করিবার জন্য ব্রহ্ম হইতে যেন একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। "যেন" বলিবার কারণ এই যে এই সরিয়া দাঁড়ান যথার্থ সরিয়া দাঁড়ান নহে। দ্বৈতদৃষ্টি অজ্ঞানের দৃষ্টিমাত্র, অনির্ব্বচনীয় অথচ মিথ্যা কর্ম্মসংস্কারের মিথ্যা ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরন্তু দ্বৈতজগতে এই সত্তা। কর্ম্মসংস্কারবদ্ধ জীবের পক্ষে দ্বৈতভাবের অস্বীকার করিতে যাওয়া আর মাত্রাস্পর্শের অধীন ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকে জগদ্ব্যাপী তেজঃপদার্থমাত্র বলিয়া তাহাতে হস্তপ্রবেশ করান সমান কথা। সৃষ্টিলীলা দ্বৈতলীলা, সুতরাং সৃষ্টির কথা বলিতে গেলে দ্বৈতভাবেরই ব্যাখ্যান করিতে হয়। এই জন্য ঋষি সৃষ্টিসূক্তি অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলিয়াও, জগতের অধ্যক্ষের অর্থাৎ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের অবতারণা করিয়াছেন। গুণ অবচ্ছেদক, সুতরাং সগুণ ঈশ্বর অবচ্ছিন্ন, শরীরী। সাধারণ জীব যেমন স্থূলদেহে অধিষ্ঠিত, তিনি তেমনি ব্যোমদেহে অধিষ্ঠিত।

৪র্থ ঋকে যে মূলপ্রকৃতিকে অসৎ বলা হইয়াছে, সেই মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্তকেই ৭ম ঋকে ব্যোম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "অব্যক্তং অব্যাকৃতাকাশাদি-নামবাচ্যং" (শঙ্করভাষ্য—কঠ ৩।১১); অর্থাৎ অব্যক্তকে অব্যাকৃত, আকাশ প্রভৃতি নামে

অনুহিত করা হয়। পুরুষসূক্তে (ঋ-স ১০।৯০) ইহাকে বিরাট্ বলা হইয়াছে। এই বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডদেহকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ, অর্থাৎ পরমাত্মা, সগুণ ঈশ্বররূপে জাত হন (ঋ-স ১০।৯০।৫)। প্রজাপতিসূক্তে আবার (১০।১২১) এই বিরাড্‌দেহাভিমানী পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে। বিরাট্ পুরুষের অণ্ডস্বরূপ, কারণ যেরূপ অণ্ডের মধ্যে জীবের উৎপত্তি হয়, তেমনি বিরাটের মধ্যে নিখিল জগতের উৎপত্তি হয় বিরাট্ হিরণ্ময়, কারণ উহা প্রকাশস্বভাব। অতএব বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। এই বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভই জগতের স্রষ্টা এবং তিনিই প্রজাপতি অর্থাৎ জগতের অধ্যক্ষ; মায়াবেষ্টিত হইলেও তিনি মায়ার অধীন নহেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। প্রজাপতিসূক্তে বৈদিক ঋষি ইঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন। প্রজাপতি সূক্ত বা ক-সূক্ত:—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ
পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে
প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা
জগতো বভূব ॥
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ
স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ
দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং
মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥
আপো হ যদ্‌ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্‌গর্ভং দধানা
জনয়ন্তীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৭
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা
জনয়ন্তীর্যজ্ঞং।
যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা
দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি
পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম
পতয়ো রয়ীণাং ॥ ১০ ॥"

ঋ—স ১০।১২১

ইহার অনুবাদ ও তাৎপর্য্য—

১। অগ্রে হিরণ্যগর্ভ জাত হন। জাত হইয়া তিনি ভৌতিক জগতের এক (অদ্বিতীয়) পতি অর্থাৎ ঈশ্বর হন। তিনি এই পৃথিবী

ও দ্যুলোক ধারণ করেন। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—সৃষ্টির প্রারম্ভে অব্যক্তরূপ হিরণ্ময় অণ্ডের গর্ভে দেব প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হন, সুতরাং হিরণ্যগর্ভের জন্ম হয় এ কথা নিরর্থক। ফলতঃ বিয়দাদি উপাধি সকলের উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহারা যাঁহার উপাধি তাঁহাতে এই উৎপত্তির অধ্যাস হইয়াছে।

প্রলয়ান্তে পরব্রহ্মের তপঃ হইতে বিয়দাদি ভূত সকলের সৃষ্টির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব হয়। এই কথাই কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত" (কঠ ২।১।৬)।

কঃ, কিম্ শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার এক-বচন। নিখিল জগতের ঈশ্বরের স্বরূপ মায়া-বদ্ধ জীবের পক্ষে অনির্দ্দেশ্য বলিয়া তাঁহাকে ঋষি কঃ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ঋকে উক্ত হইল যে হিরণ্যগর্ভ জগতের অদ্বিতীয় পতি বা ঈশ্বর ও ধারক।

২। যিনি আত্মা দান করেন ও বল দান করেন; যাঁহার প্রকৃষ্ট শাসন সকলে ভজনা করে, এমন কি দেবগণও ভজনা করেন; অমৃতত্ব যাঁহার ছায়া ও মৃত্যুও যাঁহার ছায়া সেই ক-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই দেব প্রজাপতি হইতে আত্মা সকল আবির্ভূত হয় যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল আবির্ভূত হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই জন্য ইঁহাকে সূত্রাত্মা বলা হইয়াছেন। ইঁহার শাসন অনুসারে সমগ্র বিশ্ব শাসিত হয়। "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" (কঠ—২।২।১২)—এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর নিখিল জগতের শাসক ও সর্ব্বভূতের অন্তঃস্থিত আত্মা; তিনি এক হইয়াও আপনাকে বহু করেন। মৃত্যু ও অমৃতত্ব তাঁহার ছায়া, অর্থাৎ তিনি জীবের কর্ম্মফলদাতা। এই ঋকে উক্ত হইল যে হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মা নিখিল বিশ্বের শাসক ও কর্ম্মফলদাতা।

৩। যিনি মাহাত্ম্যহেতু প্রাণনক্রিয়াশীল ও নিমেষবিশিষ্ট জগতের এক অদ্বিতীয় রাজা; যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদবিশিষ্ট এই প্রাণি-জগতের শাসক সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভদেবের শাসকত্ব বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। তিনি নিখিল প্রাণিজগতের রাজা।

৪। এই সকল হিমবান্ (পর্ব্বত) যাঁহার এবং নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মাহাত্ম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং এই দিক্‌সকল যাঁহার বাহু সেই কঃ—দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—হিমবান্ পর্ব্বত ও নদী সহিত সমুদ্র দ্বারা সমগ্র জড়জগৎ উপলক্ষিত হইতেছে। ৩য় ঋকে প্রাণিজগতের কথা বলা হইয়াছে। এই ঋকে জড়জগতের কথা হইতেছে। কি প্রাণিজগৎ কি জড়জগৎ সকলেই তাঁহার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিতেছে, কারণ তিনি তাহাদিগের স্রষ্টা এবং তাহারা তদ্রূপে অবস্থিত। শুধু তাহাই নহে, এমন কি শূন্যরূপী দিক্‌সকল তাঁহার বাহুস্বরূপ। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের বিরাটত্ব উক্ত হইল।

৫। যাঁহার দ্বারা দ্যুলোক,

পৃথিবী দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা সূর্য্য (স্বস্থানে, স্থানভ্রষ্ট না হয় এরূপভাবে) স্তব্ধীকৃত হইয়াছে; যিনি অন্তরীক্ষে রজের অর্থাৎ উদকের নির্মাতা, সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—হিরণ্যগর্ভ যে শুধু জগৎকে সৃষ্টি, ধারণ ও শাসন করেন তাহা নহে। যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জগৎ রক্ষিত হয়, তিনি সেই সকল নিয়মেরও বিধান করেন। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভকে জগতের রক্ষক বলা হইল।

৬। দীপ্তিশালিনী দ্যাবাপৃথিবী লোকরক্ষার্থ লব্ধৈশ্বর্য্য হইয়া যাঁহাকে মনদ্বারা (আমাদের মহত্বের ইনিই কারণ এইরূপ চিন্তা করিয়া) দর্শন করে; যাঁহাকে আধাররূপে প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য উদিত হন ও আলোক বিস্তার করেন সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভকে ভূলোক ও দ্যুলোকের উপাস্য ও সূর্য্য প্রভৃতির আধার বলা হইয়াছে।

৭। মহতী, অগ্নির জনয়ন্তী অপ্ সকল যে গর্ভকে ধারণ করিয়া বিশ্ব ব্যাপিয়াছেন সেই গর্ভ হইতে দেবগণের এক প্রাণ আবির্ভূত হয়। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—অপ্ শব্দে এখানে অব্যক্ত বা বিরাট বুঝিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রে ইহাকেই কারণ-বারি বলা হইয়াছে। এই অপ্ হইতে অগ্নি প্রভৃতি ভূতসকল উৎপন্ন হয়। ইহা প্রজাপতির শরীর। "বিশ্ব ব্যাপিয়াছেন" এই কথা দ্বারা অপের বিরাটত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। পুরুষ প্রজাপতিরূপে ইঁহার গর্ভে অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি হইতে দেবগণের এক প্রাণের উৎপত্তি হয়। এক প্রাণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জগতে প্রাণপদার্থ এক। বিরাড্দেহী প্রজাপতির দেহে এক বিরাট্ প্রাণের আবির্ভাব হইল। এই প্রাণকে অবলম্বন করিয়া দেবগণের উৎপত্তি হইল। কঠোপনিষদে এই কথাই উক্ত হইয়াছে।—

"যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী" (কঠ ২।১।৭) অর্থাৎ যে সর্ব্বদেবাত্মিকা অদিতি বা মূলপ্রকৃতি প্রাণরূপে আবির্ভূতা হন। পুনশ্চ, 'যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন" (কঠ ২।১।৯), অর্থাৎ যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হন ও যাহাতে অস্ত যান সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ অবস্থিত ইত্যাদি। এই ঋকে, হিরণ্যগর্ভের বিরাডধিষ্ঠাতৃত্ব ও তাঁহা হইতে প্রাণের উৎপত্তি ও প্রাণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।

৮। যজ্ঞের জনয়ন্তী, দক্ষের ধারয়িত্রী অপ্ সকলকে যিনি মহিমাদ্বারা সম্যক্ দর্শন করেন, যিনি দেবগণের উপরে এক অদ্বিতীয় দেব, সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—বেদে জগৎ বা বিকারোৎপন্ন বিশ্ব যজ্ঞরূপে কল্পিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে পুরুষসূক্ত (১০।৯০) ও সৃষ্টিসূক্ত (১০।১৩০) দ্রষ্টব্য। এই জগদ্রূপী যজ্ঞ অপ্ অর্থাৎ অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। দক্ষ প্রজাপতি। অপ্ তাঁহার ধারয়িত্রী অর্থাৎ

তাঁহার শরীর। প্রজাপতির শরীরভূত যে অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি। প্রজাপতি এই শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত দর্শন করেন। তিনি জগতের দ্রষ্টা, সাক্ষী, সর্ব্বজ্ঞ। তিনি দেবগণেরও ঈশ্বর ও অদ্বিতীয়। এই ঋকে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব ও হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব উক্ত হইয়াছে।

৯। যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, সত্যধর্ম্মা যিনি দ্যুলোকের স্রষ্টা, এবং যিনি মহতী উদক সকলের স্রষ্টা, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের সর্ব্ব-স্রষ্টৃত্ব ও হিংসকত্ব বা বিনাশকত্ব উক্ত হইয়াছে।

১০। হে প্রজাপতি, তোমা ভিন্ন কেহ বর্ত্তমান সমস্ত বিশ্ব জানে না কিংবা তোমা ভিন্ন কেহ সর্ববিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে না। আমরা যে সকল কামনা করিয়া তোমাকে হবির্দান করিতেছি, আমাদিগের সেই সকল কামনা পূর্ণ হউক। আমরা যেন ধন সকলের পতি হইতে পারি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বাভীষ্টদাতৃত্ব উক্ত হইয়াছে।

সগুণ ঈশ্বরের যতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, ঋষি তাহা এক এক করিয়া প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভে স্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহার বিরাট্ দেহে বিশ্বকে ধারণ করেন এবং সর্ব্বঘটে আত্মারূপে প্রকাশিত হন। তিনি জগতের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা। নিখিল বিশ্বের তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি মায়াশরীরী হইলেও মায়ার অধীন নহেন,—তাঁহার দৃষ্টি অবিতথ, অপ্রতিহত। তিনি সত্যধর্ম্মা ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব কেহ জানে না, সুতরাং পূর্ব্বসূক্তে (১০।১২০।৭) যে জ্ঞাতা অধ্যক্ষের কথা ঋষি বলিয়াছেন এই প্রজাপতিই সেই অধ্যক্ষ। তাঁহা হইতেই প্রাণের উৎপত্তি, যে প্রাণকে অবলম্বন করিয়া দেবগণ অবস্থান করেন। তিনি জীবের কর্ম্মফলদাতা। মৃত্যু ও অমৃত্যু উভয়েই ছায়ারূপে তাঁহার অনুগমন করে—উৎপত্তি ও বিনাশ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বের তিনি অতীত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরের যে নির্ণয় আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে বেদের অনুগামী। যোগিগণ যে "ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ" (পাতঞ্জল দর্শন ১।২৪) ঈশ্বরের ধ্যান করেন বৈদিক ঋষিও সেই ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। এই ঈশ্বর বেদান্তের প্রত্যগাত্মা, সূত্রাত্মা, আনন্দময়। প্রকৃতিবিকার সুখ দুঃখ মোহের অতীত এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের নাম আনন্দ। প্রজাপতি ঈশ্বর প্রকৃতির অধীন নহেন, সুতরাং আনন্দময়। "আত্মানন্দময়ঃ" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৫)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল মজুমদার।

বাঙ্গালা মাসিকপত্র

বোধ হয় লেখক ও পাঠকের তুলনায় বাঙ্গালা মাসিকপত্র অধিক হইয়াছে। ইহাতে দেশের শুভাশুভ বিচার না করিয়া পাঠকের পক্ষ হইতে দুই চারি কথা লিখিতেছি।

নির্ম্মাতা, বিক্রেতা ও ক্রেতা এই তিনের যোগে যেমন হাট; লেখক, সম্পাদক ও পাঠক এই তিনের সহকারিতায় তেমন মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা। ক্রেতা দেখিলে বিক্রেতা উপস্থিত হয়, বিক্রেতা নানা স্থানের নির্ম্মাতার উৎপন্ন দ্রব্যাদি একত্র করে। তবে আগে ক্রেতা, পরে অন্য দুই। কদাচিৎ নির্ম্মাতার উদয় আগে হয়, কদাচিৎ নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা একযোগে ক্রেতার উৎপত্তি করে।

জ্ঞানদান ও আনন্দদান মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য। জ্ঞানের সহিত আনন্দ জড়িত। জ্ঞানার্জ্জনের ফল আনন্দ,—যদি আবশ্যক জ্ঞান পাই, যদি অর্জ্জনে কষ্ট না হয়। সকলের অর্জ্জনের শক্তি এক নহে, সকলের জ্ঞানের প্রয়োজনও এক নহে। সে যখন দু'য়ের নানা ভেদ আছে, তখন মাসিকপত্রেরও নানা ভেদ থাকিতে পারে। যদি বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞান নামে জ্ঞানের দুই ভাগ করি, তবে মাসিকপত্রেরও দুই ভাগ করিতে পারি। কেহ ধর্ম্মের, দর্শনের, বিজ্ঞানের, এমন কি বাঙ্গালা ভাষার, দুরূহ তত্ত্ব জানিতে প্রয়াসী; তিনি সেই সেই বিষয়ের বিশেষ মাসিকপত্র পড়িতে ইচ্ছা করিবেন। কেহ অনায়াসে অথবা বিনা আয়াসে নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ ইচ্ছা করেন, তিনি সাধারণ মাসিকপত্রের গ্রাহক হইবেন। এইরূপ, পাঠকভেদে মাসিকপত্রের ভেদ অবশ্য ঘটিবে।

বিলাতে এইরূপ নানাশ্রেণীর মাসিকপত্র আছে। এদেশে দুই চারিটা ছাড়া আর সব এক শ্রেণীর। বোধ হয় পাঠকের অভাবে বিশেষ মাসিকপত্রের অভাব। আরও বোধ হয় লেখকের অভাবে অথবা লেখার দোষে পাঠক হয় না। সমব্যবসায়ীর মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান নিমিত্ত ব্যবসায়সম্বন্ধীয় পত্রের জন্ম হয়; ইহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রদানের গুণে অন্যে সে ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয়। বাণিজ্যের মূলসূত্র একটা এই যে, পণ্য যাহা হউক, যেমন হউক, গ্রাহক আছে। বুদ্ধিমান বণিক গ্রাহক অন্বেষণ করে, পণ্যবিক্রয় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে।

আমি হাটে বাজারে ব্যাপার করার সহিত মাসিকপত্র-চালনায় তুলনা করিতেছি, ইহাতে হয় ত কোন কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক রুষ্ট হইবেন। তিনি হয় ত মনে করেন তিনি সাহিত্যসেবা করিতেছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কামনা করিয়া ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতেছেন। এক এক মাসিকপত্রের জন্মকালে প্রথমপত্রে এই ভাবের সূচনা থাকে। পড়িলে মনে হয়, দেশের কেবল কল্যাণ-কামনায় সম্পাদক মহাশয় অসম সাহসে দারুণ বোঝা ঘাড়ে লইতেছেন। দুষ্টলোকে বলে সম্পাদক সাজিবার সাধও একটা আছে, সাহিত্যসেবী নামে পরিচিত হইবার বাসনাও অল্প নহে।

অনেক দিনের একটা কথা বলি। এক পণ্ডিত দেখিলেন, সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে তেমন সমাদর পাওয়া যায় না, কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রচার হইতে পারে। তিনি সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে চমৎকার বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। বোধ হয় কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, দেশেরও হিত হইতে পারিত। কিন্তু জানি না, তাঁহাকে কি কারণে দেশে বিজ্ঞানর্চ্চার অভাব-রূপ 'ভূতে' পাইয়া বসিল। তিনি বিজ্ঞানের 'বি' জানিতেন না, কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পাদক হইলেন। লেখক জোটাইলেন কলেজের পড়ুয়া। ইংরেজী বহির তর্জমা করিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রবন্ধ যোগাইতে লাগিলেন। আজিকালি কলেজের ছাত্র বাঙ্গালা ভাষা কিছু কিছু শিখিতেছেন। সে-কালে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষণীয় ছিল না। দুইএক জনমাত্র সহজ শুদ্ধ ভাষা লিখিতে পারিতেন। অধিকাংশ যাহা লিখিতেন তাহা অপাঠ্য হইত। সম্পাদক মহাশয় সে ভাষা যথাসাধ্য শোধিত করিয়া লইতেন, কিন্তু সব দোষ সারিতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিলে এবং বাঙ্গালা ভাষায় চিন্তা করিবার সুযোগ পাইলে যে সহজ ভাব বাহির হয়, আঁধারে হাতড়াইলে সে ভাষা আসে না। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যোগাইতে লেখক ও সম্পাদক ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। এই হেতু ইংরেজী অক্ষরে ছাপা ইংরেজী শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের সন্ধি সমাস চালাইতে হইল। যেন সে বিষয়টা জানিবার জন্য দেশের পাঠক উদ্গ্রীব হইয়া ছিলেন, না জানিলে দেশের সর্ব্বনাশ হইত। এমন কিম্ভূত-কিমাকার পত্রেরও গ্রাহক জুটিল, দেশে নূতন উদ্যম বলিয়া বিজ্ঞজন ক্ষমাগুণে পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তথাপি পত্রের আয়ু ফুরাইয়া আসিল, লেখক জুটিল না।

এখনও এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক জনেরও হিত হইলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করেন। এ স্থলে তাঁহার দেশহিতৈষণার প্রশংসা করি, কিন্তু পরিশ্রম, সময় ও অর্থের অপব্যয়ে দুঃখও হয়।

বস্তুতঃ বিনা উদ্দেশ্যে কাজ হয় না। জানি না, কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ মাসিকপত্রের জন্ম হইয়াছে। যদি স্পষ্টাস্পষ্টি জানিতে পারি যে অপর সহস্র পণ্যের ন্যায় মাসিকপত্রকেও পণ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে লেখক ও পাঠকের এবং সে সঙ্গে সম্পাদকের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। নূতন মাসিকপত্রের গৌরচন্দ্রিকায় আসল কথাটা প্রায়ই চাপা থাকে, সাহিত্য-সেবার এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির যথাসাধ্য প্রয়াসী দেখিলে প্রথমে জানিতে ইচ্ছা হয় তুমি কে, তোমার কি যোগ্যতা আছে। কেহ কেহ যোগ্যতা বলিতে চান না, ক্রমে ফল দেখিয়া পরিচয় লইতে বলেন। কেহ কবি ছিলেন, অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎকালের মাসিকপত্রের সম্পাদক সে কবিতা অগ্রাহ্য করিতেন, প্রকাশের অযোগ্য মনে করিতেন। রোষে ও ক্ষোভে কবি স্বয়ং এক মাসিকপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন, সম্পাদক হইয়া মনের সুখে নিজের ও বন্ধুজনের কবিতা একটা দুইটা তিনটা

করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল পদ্য ছাপাইলে মাসিকপত্র চলে না, গদ্যও প্রকাশিত হইতে লাগিল। গল্প যখন গদ্যে রচিত হয়, এবং গল্পের দৈর্ঘ্য যখন নির্দ্দিষ্ট নাই, তখন সুকুমার সাহিত্যের সেবা দিন কতক বেশ চলিয়াছিল।

গল্পলিখন-প্রবৃত্তির তাড়নাতেও দুই এক মাসিকপত্রের জন্ম হইয়াছে। যে-সে গল্প যখন মাসিক পত্রের সম্পাদক ছাপাইলেন না, গল্প-লেখক প্রতিজ্ঞা করিলেন স্বয়ং মাসিকপত্র সম্পাদন করিবেন। জল্পক বন্ধুবর্গ একত্র হইলেন, নূতন মাসিকপত্রের জন্ম হইল। পূর্ব্বে বাঙ্গালী শুধুই বকে বলিয়া একটা দুর্ণাম ছিল; এখন বাঙ্গালী কিন্তু লিখিয়া বকিতে শিখিয়াছে। সব মাসিকপত্র দেখার ভাগ্য হয় নাই; কিন্তু যত দেখিয়াছি, গল্প নাই এমন সাধারণ মাসিক পত্র দেখি নাই। পত্রাঙ্ক অল্প হউক, পত্রের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, গল্প চাই। দেশে এত গল্পও ছিল!

গল্পের মতন গল্প পাইলে পাঠকের অসন্তোষের কারণ থাকিত না; নিজ-ব্যবসায়-কর্ম্মে ক্লান্ত মন গল্প পড়িয়া শ্রান্তি বোধ করিত। কিন্তু যে দেশে কথা ও গল্প, কথা ও কাহিনী, কথা ও উপন্যাস, কথা ও বাক্য, কথা ও বার্ত্তা একার্থবাচী হইয়াছে, সেদেশে মাসিকপত্রের গল্পের প্রকৃতি নিরূপণ করা দুরূহ। গল্প শব্দের বৃথা আড়ম্বরে নহে, কাহিনীর দৈর্ঘ্যেও নহে। অথচ ভাষার শব্দের গুণেও গল্প মনোহারী হইতে পারে। বস্তুতঃ আমরা যেমন মল্লকে তাহার যষ্টি সঞ্চালন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হই, লেখককে শব্দ লইয়া লীলা করিতে দেখিলেও বিস্মিত হই। আখ্যায়িকা গল্প নহে, অথচ আখ্যায়িকা থাকিলেও গল্প হইতে পারে। বিসদৃশ ঘটনার সমাবেশও গল্প নহে, কিন্তু তেমন স্থানে সমাবেশই গল্পের প্রাণ হইতে পারে। কিসে গল্প সার্থক হয়, সরস হয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু জানি, যুবক-যুবতীর প্রেমাভিনয়, মানাভিমান ঈর্ষাদ্বেষ, অতৃপ্ত বাসনা প্রভৃতি না থাকিলেও চমৎকার গল্প হইতে পারে। এরূপ গল্প বাঙ্গালা ভাষায় রচিতও হইয়াছে। অবশ্য দুর্ল্লভ হইয়া আছে। কারণ কবিত্বকলার ন্যায় গল্পরচনাও কলা বিশেষ। অল্প কথায় গল্পের নায়ক-নায়িকার মনের একটা ভাব যিনি প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার আদর হইবেই।

ক্রেতার রুচি অনুসারে বিক্রেয় পণ্য উৎপন্ন হয়। গল্পের বাজারেও যদি এই নিয়ম থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালী পাঠকের কলা-জ্ঞান মার্জ্জিত হয় নাই। লব্ধ পণ্য অনুসারেও ক্রেতার রুচি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে! যদি সম্পাদক মহাশয় কলার আদর্শ উচ্চে ধরিয়া রাখেন, তাঁহার পত্রের পাঠকেরও আদর্শ উচ্চ হইতে থাকিবে। আমি যে যাবতীয় মাসিকপত্রের গল্প সবই পড়িয়াছি এমন নহে। কিন্তু নূতন মাসিকপত্র পাইবামাত্র তাহার সূচীপত্রে চোখ বুলাইয়া দেখি, গল্প কবিতার দুই এক ছত্র পড়ি। ছেলে মেয়ে লইয়া কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, বিলাসবিভ্রমে 'চটুল' চাপল্যে দিনপাত হয় না। গল্প পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছে, মাসিকপত্রে কবিতা পড়িয়া সে পত্র-প্রেরণ নিষেধ করিতে হইয়াছে। কেবল বর্ত্তমান লেখকের নহে, শুনিয়াছি আরও অনেক পাঠকের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। গল্প ও

কাব্যের নামে চিত্ত-বিক্ষেপের মদিরায় হাব-ভাব-বিলাসের আলঙ্কারিক বর্ণনায় জীবন-যাত্রায় বিঘ্ন জন্মে।

আরও ভয়ানক হইয়াছে, বিজ্ঞাপন। ঔষধের বিজ্ঞাপনে অশ্লীলতার প্রয়োজন থাকিতে পারেনা। কারণ রোগী রোগচিকিৎসা চায়, কুৎসিৎ রোগ লুকাইতে চায়। রোগী ঔষধ-বিক্রেতার নিকট রোগের নিদান বর্ণনা, চিত্রযোগে নিদান ও পরিণাম প্রদর্শন চায় কি? ভয় দেখাইয়া ঔষধবিক্রয় অসাধুতা। যাহা চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য, তাহা চিকিৎসাবিষয়ক মাসিকপত্রে, গ্রন্থে, স্বচ্ছন্দে প্রকাশ কর। কেহ নিদান জানিতে চাহিলে, তাহার নিকট বিজ্ঞাপন পাঠাইও। কিন্তু যে জানিতে চায় না, তাহার নিকট নির্লজ্জতার বিজ্ঞাপন প্রেরণ কেন? সুগন্ধি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনেও হত-ভাগ্য নির্লজ্জ বিক্রেতা বর্ণনার চটকে, পয়ারের জোরে, কুৎসিৎ নামকরণে গ্রাহক অন্বেষণ করিতেছে। যাহা বার-নারীর দ্বারেও উপস্থিত করিবার অযোগ্য, তাহা সরকারী ডাকের সাহায্যে ভদ্রপল্লীতে প্রেরণ করিতেছে।

মাসিকপত্রেও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বুঝি না, বিজ্ঞ সম্পাদক দোষ গুণ বিচার না করিয়া নিজের পত্রে যে-স বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন কেন। যিনি পত্রের পৃষ্ঠা সুন্দর করিতে প্রয়াসী, যিনি প্রবন্ধ-গৌরবে নিজের পত্রের গুরুতাসম্পাদনে মনোযোগী, তিনি কেমন করিয়া পত্রের সঙ্গে কদাকার চিত্র এবং আকাশভেদী অতিশয়োক্তির বিজ্ঞাপনে শোভা কল্পনা করেন! চিত্রকলার নামে কাঠের পুতুলের কর্কশতা শোভা পায় কি? যিনি বিজ্ঞাপন দেন, তিনি কাঠের পুতুলও দেন; কিন্তু দেন বলিয়া নিজের কাগজে ছাপিতে হইবে কি?

পূর্ব্বে মাসিকপত্রে চিত্র থাকিত না। এখন প্রায় সকল পত্রে অন্ততঃ একটা দুইটা থাকে। কোন কোন সম্পাদক 'হাফটোন' চিত্র দিয়া, 'হাফটোন' চিত্রকে অপূর্ব্ব পদার্থ জ্ঞান করাইয়া পাঠক ভুলাইতে চান। কিন্তু এই ভারতবর্ষেও 'হাফটোন' চিত্র দুর্লভ কি? 'হাফটোন' নামের গুণ কিছুই নাই, চিত্রই আসল; তাহাও ব্লকের দোষে ছাপার দোষে শেষে কাঠের পুতুলে দাঁড়াইতে পারে। শিশু কাগজে কালী, লাল নীল রং মাথাইয়া মনে করে সুন্দর 'ছবি' করিয়াছে।

এদেশের চিত্রের রসগ্রহণ করিতে না কি আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি আবশ্যক! মানব-স্বভাবের উপরে উঠিয়া ছেলে-ভুলানো হাত-পা-শূন্য কাঠের পুতুলে সৌন্দর্য্য দেখিতে হইবে। ঢাকের নাদে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তবে কি না যখন-তখন যে-সে মানুষের কর্ণে সেটা হয় না। হয় না সত্য কথা। কেন হয় না, হওয়া উচিত, বলিলে পাঠক না-চার। তাই বলি, যদি রস গ্রহণই না হইল, তবে কষ্ট ও অর্থব্যয় কেন? ইহাতে শিল্পীর দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু জগতে দুঃখের কারণ অনেক আছে।

প্রবন্ধ নির্ব্বাচনেও অনেক সম্পাদক গুরু-লঘু জ্ঞানের অভাব দেখান। এই, দর্শনের কূটতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিভীষিকা, পাশেই তরল-মতির চাপল্য, পরে 'ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' (বস্তুতঃ বহু পৃষ্ঠা), সঙ্গে সঙ্গে বিল্বপুষ্করিণীর জলের অপচয়সংবাদ। প্রত্যেক পাঠক যে সব প্রবন্ধ পড়িবেন এমন কথা নাই। পাঠক

বিভিন্ন, প্রবন্ধও বিভিন্ন; তথাপি সাধারণ মাসিকপত্রে যাহাতে নানা বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, তাহাতে অধিকাংশ পাঠকের উপযোগী প্রবন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। লেখকবর্গ একটা কথা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়,—পুস্তকে যাহা চলে সাধারণ পাঠকের উপযোগী মাসিক-পত্রে তাহা প্রায়ই চলে না। গোড়া হইতে পড়িয়া গেলে হয় ত যাহা বোধগম্য হইবে, তাহার মাঝখান হইতে কিয়দংশ পৃথক্ করিয়া লইয়া পড়িলে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। এমন লিখিতে হইবে, যে, পাঠক সে বিষয় কিছু না জানিলেও তাহা মোটামুটি বুঝিতে পারিবেন, আর যিনি জানেন, তিনিও সে বিষয়টা নূতন ধরণে দেখিতে পাইবেন। বিষয়বিশেষের পত্রে যাহা চলে, নানা বিষয়ের পত্রে তাহা না চলিবার কথা। প্রত্যেক প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইলে ভাল হয়; যদি এক প্রবন্ধে সম্পূর্ণ না হয়, দ্বিতীয় প্রবন্ধ এমন লিখিতে হইবে যেন তাহাই সম্পূর্ণ। অর্থাৎ একটা পড়িবার সময় অপরটাতে কি ছিল তাহা মনে রাখিতে না হয়। মাসিক-পত্রের প্রবন্ধের ইহাই বিশেষত্ব। একটা ভাব, একটা তত্ত্ব, একটা যা-কিছু, তাহা ধরিয়া রাখিতে হয়, ছাড়াইয়া গেলে পাঠকের ধৈর্য্য থাকে না। যদি উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি দীর্ঘ বিষয় মাসে মাসে প্রকাশ করিতে হয়, তবে প্রথমে কতদূর কি বলা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্তসার প্রবন্ধের আদ্যে দেওয়া কর্ত্তব্য।

শুনিয়াছি, কলিকাতায় ভোজনের নিমন্ত্রণে ভোজন না করিলেও চলে, অন্নব্যঞ্জন পরিপূর্ণ পাত্র দৃষ্টি করিয়া আয়োজন উত্তম হইয়াছে বলিলে নিমন্ত্রণরক্ষা হয়, নিমন্ত্রণকর্ত্তাও কৃতার্থ হন। কিন্তু "উচ্চশ্রেণী"র এই সামাজিক ব্যবহার মধ্য ও নিম্নশ্রেণীতে পোষায় না। এই শ্রেণীর লোক ভোজনের নিমন্ত্রণে ভোজন করিতে চায়, দর্শনে কিংবা আঘ্রাণে তৃপ্ত হয় না। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পত্র বহুবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ করিয়া পাঠকের সমীপে প্রেরণ করিলেন, শাক হইতে মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত সবই উপস্থিত করিলেন, পাঠক উচ্চশ্রেণীর হইলে উত্তম হইয়াছে বলিয়া গাত্রোত্থান করেন, মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর হইলে আসনে বসিয়া রীতিমত ভোজনে প্রবৃত্ত হন। সামাজিক ব্যবহারে অজ্ঞ বলিয়া কখন কখন মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলেন, এটা কাঁচা ওটা আলোনা। যেটায় দন্তস্ফুট না হয়, সেটায় কিন্তু নিজের দন্তের শিথিলতা কিংবা স্থূলতা অনুমান করেন। মানবচরিত্রের এ এক আশ্চর্য্য রহস্য! এই হেতু উৎকট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কঠিন শঙ্করভাষ্য মাসিকপত্রে সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত প্রেরিত হইতেছে। জানি না, সম্পাদক মহাশয় পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন কি না,—আর কি চাই, ব্যঞ্জন উত্তম হইয়াছে ত? পাঠক নিমন্ত্রিত বটেন, কিন্তু মূল্য দিয়া ভোজ্য ক্রয় করেন, সম্পাদক মূল্য লইয়া ভোজ্য বিক্রয় করেন। কেহ কিছু দান করেন না, কেহ কিছু দান গ্রহণ করেন না। সুতরাং সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার সহানুভব থাকা স্বাভাবিক বোধ হয়। বিলাতে সাধারণ মাসিকপত্রের সম্পাদক পাঠককে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করেন, আর কি চাই, কেমন হইয়াছে। জিজ্ঞাসার নানা কৌশল

অবলম্বন করেন, কথনও উন্নতির প্রস্তাব করিয়া অভিমত জানিতে চান, কথনও প্রস্তাব পাইবার নিমিত্ত পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি বুঝেন, পুরাতন পাঠককে তুষ্ট রাখিলে ব্যবসায় স্থায়ী হয়, পুরাতনের সাহায্যে নূতন পাঠক সংগৃহীত হয়। এদেশে নিঃসম্বলে মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে পারা যায়; সেদেশে মাসিকপত্র চালাইতে মূলধনের প্রয়োজন হয়। সে দিন দেখিতেছিলাম, বিলাতে মাসিকপত্রের এক একটা গল্প,—দুই হাজার শব্দের গল্প—৫০৲ টাকার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না। তাহাও প্রসিদ্ধ লেখকের নহে। চলন সই গল্প, যাহাতে প্রশংসা করিবার বড় একটা কিছু থাকে না।

বিলাত ধনীর দেশ, কলা ও বিদ্যার দেশ। সে দেশের সহিত এদেশের তুলনা করা সাজে না। কিন্তু তুলনা হয় না বলিয়াই দেশের গণ্যমান্য পাঠক এদেশের মাসিকপত্রে পরিতোষ পান না। এমন পাঠকও আছেন যিনি ইংরেজী অক্ষরের মহিমায় মুগ্ধ হন, এবং এমন ইংরেজী গল্পও আছে যাহা পড়িতে আমাদের ভাল লাগে না। সে সব বিষয় ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালাতে অনেক ভাল ভাল মাসিকপত্র ও ভাল ভাল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, ইহা বলিতেই হইবে। প্রবন্ধ দেখাইয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব করিতে পারেন। সময়ে সময়ে যে ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা প্রবীণ সম্পাদকের অর্ব্বাচীন সহকারীর দোষে, কিম্বা অব্যবস্থার দোষে বলিয়া মনে হয়। কারণ অনেক মাসিকপত্র অনেককাল চলিতেছে, সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকি কাজে পাকিয়াছেন। তবে, যেমন টক আম পাকিলেও টক থাকে, তেমন যিনি গোড়ায় কাঁচা ছিলেন, তাঁহার ভূয়োদর্শনে কাঁচার রং পাকার মতন হয়, অন্য গুণ আসে না। পাঁচফুলে সাজি ভরানো সহজ, কিন্তু ফুল বাছা সহজ নহে।*

---

* বোধ হয়, এখন মাসিকপত্রের শ্রেণী-বিভাগের সময় হইয়াছে। ইংরেজীতে Journal, Review, Magazine, বস্তুতঃ তিন শ্রেণীর মাসিক বা সাময়িক পত্র আছে। বাঙ্গালায় এইরূপ জাতিবাচক নামও হয় নাই, সব মাসিকপত্র, কোনটা বা মাসিক-পত্র ও সমালোচন। সাহিত্য-পরিষদের পত্রের নাম সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ইংরেজী Journal শব্দের অনুবাদ করিলে দিনিকা হয়। ইংরেজী Review শব্দের অনুবাদে সমালোচন অপেক্ষা সমীক্ষণা চলিতে পারে। ইংরেজী Magazine শব্দের মূলে আর্বী; সে শব্দ আমাদের পরিচিত খাজনায় আছে। ইহার ধাত্বর্থ সঞ্চয়। বিশেষার্থে সঞ্চয়না বলা চলে। যে নামই হউক, প্রথম প্রথম নূতন ঠেকিবে। জাতি-বাচক নাম থাকিলে পাঠক নিজের আবশ্যক মাসিক-পত্র নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন, সম্পাদকও নামের বাহিরে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। এখন কোন্ খানা কি, তাহা সমস্ত পত্র না পড়িলে এবং দুই চারি মাসের না পড়িলে বুঝিতে পারা যায় না। গল্প ও লঘু বিষয় না থাকিলে দুই একখানা সমীক্ষণা হইতে পারিত। ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক দুই একখানা সমীক্ষণা আছে। অধিকাংশ সঞ্চয়না। পত্রের সম্পাদক, এই নামও কি ভাল হইয়াছে? Secretary—সম্পাদক, Editor—সম্পাদক, Manager—কার্য্যাধ্যক্ষ। এই নামগুলা হইতে বুঝা যায়, ইহাদের কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্ট হয় নাই। এদেশের অন্যান্য প্রদেশে Editor সংশোধক নাম পাইয়াছেন। কমিটির Secretary আর আফিসের Manager কাজে প্রায় এক; সুতরাং ইঁহাদের নাম অধিকর্ম্মী থাকিলে মন্দ হইত না। আরও শব্দ আছে। মাসিকপত্রের ভাষায় দশম সংখ্যা

এখন অন্য দুই একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বোধ হয় চিত্রের স্থান করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন মাসিকপত্রকে প্রস্থে বড় করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রস্থে বড় হইলে ছয় মাসের কি বার মাসের অঙ্কগুলা একত্র একত্র বাঁধিলে পাটা হইতে পাতাগুলা ঝুলিয়া পড়ে, ফলে ক্রমশঃ আল্গা হইয়া খসিতে থাকে। বোধ হয়, ছাপার সুবিধা দেখিয়াও আকার বৃহৎ হইয়া থাকিবে. কিন্তু অধিকাংশ মাসিকপত্রে দেখিতে পাই চারি পাতে এক ফর্ম্মা হয়। বাঁধিবার সময় ফলে দুই পাতা দুই পাতা করিয়া গাঁথিয়া যাইতে হয়। যদি প্রতি অঙ্কে দশ ফর্ম্মা থাকে, বৎসরে একশত কুড়ি ফর্ম্মা। গাঁথিতে কম সময় লাগে না। বিশেষ দোষ—দুই পাতার জোর কম, সহজে ছিঁড়িয়া যায়। অন্ততঃ চারি পাতা লইয়া গাঁথিতে পারিলে এই দোষ থাকিত না, গাঁথার পরিশ্রমও অল্প হইত। সুবিধা থাকিতে অসুবিধায় পড়া মূর্খতা। মাসিকপত্র ধার-কাটা হইয়া পাঠকের নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে সুবিধা এই, পড়িবার সময় ছুরী খুঁজিতে হয় না; অসুবিধা এই, দফ্‌তরী নিজের পরিশ্রম বাঁচাইতে গিয়া নির্দ্দয় ভাবে ধার কাটে, পাশে শাদা কাগজ কম রাখে। আরও অসুবিধা, সব অঙ্ক সমান প্রমাণে কাটা হইয়া আসে না। কোন খানার উপরে কিংবা নীচে বেশী কাটা, কোনখানার পাশে বেশী কাটা। ফলে সব অঙ্ক বাঁধিতে গেলে ধার অসমান হয়। ধার কাটিয়া পাঠাইতে হইলে সব অঙ্ক এক প্রমাণে কাটিয়া পাঠান কর্ত্তব্য। যে কাজ একেবারে শেষ করিতে পারা যায়, সে কাজের জন্য পুনঃ পুনঃ সময় ব্যয় করিতে হইলে দীর্ঘ জীবন আবশ্যক হয়।

ব্যবসায়-হিসাবে বাঙ্গালা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের অধ্যক্ষের একটা ত্রুটি আছে। গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর নিমিত্ত তিনি ডাক-টিকিট কিংবা 'রিপ্লাই পোষ্টকার্ড' চাহিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে ইনি ব্যবসায়-বুদ্ধি বুঝেন না, গ্রাহককে তুচ্ছ কারণে দূরে রাখিতে চান। ব্যবসায়-রীতি শিখিলে গ্রাহক ও অন্য সাধারণের জিজ্ঞাসা আকাঙ্ক্ষা করিবেন। ইঁহার আলস্যে গ্রাহকের আর এক অসুবিধার উৎপত্তি হইয়াছে। একবার এক মাসিকপত্র যথাসময়ে না পাওয়াতে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে সে পত্র পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। উত্তর আসিল, "আপনার গ্রাহক নং কত জানালে আমরা সহজে বুঝিতে পারি আপনাকে কাগজ পাঠান হইয়াছে কি না।" আমার গ্রাহক নং কত তাহা আমি কেমনে জানিব? কাগজের মোড়কে নং লেখা থাকে বটে, কিন্তু সেটা কি আমাকে মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইবে? হিসাবের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার খাতায় নম্বর দিতে পারেন, ছাপ মারিতে পারেন, লাল নীল সবুজ কালীর দাগ দিতে পারেন; কিন্তু সে সব আমার জানার প্রয়োজন কি? পঁচিশ খানা কাগজের গ্রাহক হইলে আমার পঁচিশটা নং মুখস্থ করিতে হইবে কি? অধ্যক্ষ মহাশয় আমার নাম

অর্থে দশ সংখ্যক পত্র। এখানে দশম অঙ্ক ঠিক হইত। কেহ কেহ ছবি শব্দটার অর্থবিকার ঘটাইতেছেন। ছবি শোভা দীপ্তি, এবং সাম্যজনও এই অর্থ মানে। বোধ হয় তসবির শব্দের সহিত গোল হইয়া চিত্র অর্থে ছবি হইয়াছে।

ও ধাম—ছুইটা নং পাঠাইলেন; নামেও নাম ও সংজ্ঞা বা পদবী পাইলেন। অতএব আমার এই তিন নম্বরেই তাঁহার হিসাব দুরস্ত থাকিতে পারে। ফল কথা তাঁহার আলস্যের ও অজ্ঞতার মূল্য গ্রাহকের নিকট প্রার্থনা করা গর্হিত কাজ। ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্বন্ধ যাহাতে মধুর হয়, তাহা ইউরোপীয় ব্যবসায়ী বুঝেন। উল্লিখিত অধ্যক্ষ মহাশয়ের এক সদাশয়তার প্রশংসা করি। আমি 'রিপ্লাই পোষ্টকার্ড' পাঠাই নাই; তিনি নিজের পোষ্টকার্ডে উত্তর পাঠাইয়াছিলেন। এটা কম উন্নতি নয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

'এষা"

করুণরসের অভিব্যক্তিতে "এষা"খানি, এক প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের বিরহগাথা ছাড়া বাংলার আর সকল কবিতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। সচরাচর শোকের কবিতায় 'হা হতোহস্মি'রই বাহুল্য দেখিতে পাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার একটীবারও এরূপ হা হতোহস্মি করিয়া আপনার আর্ত্তনাদের ধ্বনি দিয়া তাঁর কবি-কল্পনার দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁর শোক সত্য, তাই সংযত; গভীর কিন্তু একান্ত বস্তুতন্ত্র। এইজন্য যে সকল সত্যকার ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া এ সংসারে লোকের শোক ক্রমে তীব্র ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহারই যেন এক একটী অপূর্ব্ব প্রতিকৃতি আঁকিয়া এই কারুণ্যকে এমন অদ্ভুতভাবে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শোক যতই কঠোর হউক না কেন, বস্তুতঃ নিতান্ত নির্ম্মম নহে। নির্ম্মম হইলে মানুষ তার আঘাত সহিতে পারিত না। গম্ভীর শোকের শেল সর্ব্বদাই যেন একটু প্রবল অহিফেন-সারসিক্ত হইয়া মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। এই জন্যই তার বেদনা যে কতটা ইহা মানুষ প্রথম বুঝিতেই পারে না। আমাদের শূন্যতা যখন অপরের দৈন্য-রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখনই শোকের স্বার্থপর আর্ত্তনাদের মধ্যে কোমল কারুণ্য জাগিয়া উঠে। আর এই ভাবেই অক্ষয়কুমারের 'এষা'তে এই অপূর্ব্ব কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ নিপুণতাটুকু টেনিসনের "ইন্ মেমোরিয়ামে" নাই; কালিদাসের "রতি-বিলাপে" নাই; বেহুলার গানে নাই; রবীন্দ্রনাথের "স্মরণে" নাই; আছে কেবল, কোথাও কোথাও বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদিগের দূর-বিরহ-বর্ণনে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে শ্রীবৃন্দাবনের কেবল ব্রজগোপ-গোপিনীগণের নহে, কিন্তু পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতা-গুল্মাদিরও যে দীনতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে শ্রীমতীর দূর-বিরহব্যাধিকে মিলাইয়া দিয়া, বৈষ্ণবকবিকুলগুরুগণ এই নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। রসের যে একটা আলম্বন ও উদ্দীপন আছে, বৈষ্ণব

রসতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। রসকে তাঁরা কেবল আস্বাদন করিতেন না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধন করিতেন। এই জন্য প্রত্যেক রসের প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির নিয়ম তাঁহাদের নিকটে প্রত্যক্ষবৎ হইয়াছিল। জগতের আর কোনও কবিসম্প্রদায় এমন করিয়া প্রত্যেক রসের রূপের ও স্বরূপের সাধনা করিয়া এগুলির সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। সুতরাং বৈষ্ণবকবিগণের কাব্যে এ নিপুণতা আছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এই যুগে, এই দেশে জন্মিয়া অক্ষয়-কুমার যে এ নিপুণতাটুকু এমন করিয়া লাভ করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

এইজন্য অক্ষয়কুমারের এই কবিতা-গ্রন্থকে কেবল কাব্য বলিলেই তার যথাযথ বর্ণনা হয় না। কারুণ্যরসের দ্বারা এই কবিতা-গুলি গঠিত হইয়াছে বলিয়া, ইহারা রসাত্মক হইয়া প্রকৃত কাব্যত্ব লাভ করিয়াছে। কাব্য-হিসাবে এগুলি অতি উৎকৃষ্ট তো হইয়াছেই; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বা Psychologyর অভিব্যক্তিরূপেও এই কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব অল্প নহে। এই বইখানি মানুষের শোকের, বিশেষতঃ পত্নীবিয়োগবিধুর পতির মর্ম্মের স্তরে স্তরে যে বিরহের ব্যথা জাগিয়া উঠে, তার একখানি পরিষ্কার, প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাস রূপেও অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধটা কেবল দুইটী মাত্র প্রাণকে জড়াইয়া গড়িয়া উঠে না। যতক্ষণ এই সম্বন্ধ কেবল দ্বিপাদ মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণ পতি-পত্নী কেবল রমণ ও রমণী রূপেই পরস্পরকে প্রত্যক্ষ ও সম্ভোগ করেন। ততক্ষণ দাম্পত্য-সম্বন্ধ যতই গভীর হউক না কেন, কখনও প্রকৃতপক্ষে উদার হইতে পারে না। পতি যখন পত্নীর মাতৃত্বকে ও পত্নী যখন পতির পিতৃত্বকে ফুটাইয়া তোলেন, তখনই কেবল অভিনব বাৎসল্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মাধুর্য্যের মোহিনী চিরকল্যাণী হইয়া উঠে। দাম্পত্য-প্রেম তখন ছড়াইয়া পড়ে; দ্বিপাদ-প্রেম ত্রিপাদে পূর্ণ হইয়া উঠে; * মাধুর্য্য তখন স্নেহসারে পরিণত হইয়া, বাৎসল্যকেও আপনার আলম্বন ও উদ্দীপনারূপে গ্রহণ করে। স্নেহসারস্থিত এই দাম্পত্য-প্রেম যখন মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তার শোক ও স্নেহ আশ্রয়হীন বাৎসল্যের দৈন্য দেখিয়াই প্রকৃত-পক্ষে আপনার তীব্রতা অনুভব করিতে থাকে। বাৎসল্যের সঙ্গে মাধুর্য্য তখন একই আঘাতে আহত হইয়া, অপূর্ব্ব ও গভীর কারুণ্যের সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত ও জটিল কারুণ্যের ছবিটী এষাতে যেমন করিয়া ফুটিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ফলতঃ কবি এই গ্রন্থে কেবল তাঁর নিজের শোকদগ্ধ অন্তরের ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁর সমস্ত পরিবার পরি-জনের মর্ম্মবেদনাটা তাঁর শোকাহত হৃদয়ের ছিন্নতন্তুগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া যেন এই কবিতাগুলিতে বারম্বার মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কেবল তাহাই নহে, এই কবিতা-গুলি যেন বিশ্বের সার্ব্বজনীন দাম্পত্য-বিরহের সাধারণ শোক-ছবিগুলিকে একে একে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই জন্য এগুলি প্রত্যেক বিরহী জনের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ

* Faust.

করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ বিরহব্যাথাটাকে জাগাইয়া তোলে। এগুলি কবিতা নয়, এক একটী উজ্জল চিত্রের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যু-শীর্ষক প্রথম স্তবকের ১ম, ২য় ও ৬ষ্ঠ; অশৌচ-শীর্ষক দ্বিতীয় স্তবকের ১১শ এবং শোক-শীর্ষক তৃতীয় স্তবকের ৬ষ্ঠ ও ১০ম কবিতাগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায়। এগুলি কেবল কবিতা নয়; কেবল এক একটী ভাবের উচ্ছ্বাস নয়; কিন্তু যেন এক একটী উজ্জ্বল তৈল-চিত্র। এক একটী জীবন্ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মতন চক্ষের উপরে ভাসিয়া উঠে। এগুলি এক একটী অপূর্ব্ব কারুণ্য মূর্ত্তি লইয়া আমাদের চিত্তপটে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। এ ছবিগুলির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক বর্ণবৈচিত্র্য, প্রত্যেক অণুপরমাণু আমাদের অতি পুরাতন-পরিচিত বস্তু। চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এ শব্দ-চিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রাণে যাহা ভুগিয়াছি তাহাই এখানে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে—পড়িতে পড়িতে সেই পুরাতন বিস্মৃত ভাবগুলি প্রাণের অন্তস্তলে নড়িয়া চড়িয়া উঠে। বাংলার বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রসচিত্র ছাড়া, আর কোথাও এমন বস্তুতন্ত্র কবিতা বেশি দেখি নাই।

তাহার উপর, কি আশ্চর্য্য নিপুণতা সহকারে কবি এ চিত্রগুলির সমাবেশ করিয়াছেন! কিন্তু এ নিপুণতা কৃত্রিম নহে, কষ্টসাধ্য নহে; নিতান্ত সহজসিদ্ধ। সাজাবার জন্য তিনি এগুলিকে এ ভাবে সাজান নাই। শোকার্ত্ত প্রাণের অভিজ্ঞতাগুলি যেমন একটার পর আর একটা ভাসিয়া আসিয়াছিল, সেই ধাঁরাকে অনুকরণ করিয়াই কবির শোকাহত কল্পনা যেন ভাসিয়া চলিয়াছে, আর যখন যেরূপ বাহিরের আশ্রয় জুটিয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়াই, মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই জন্য এই সব চিত্রগুলিই এমন অদ্ভুত স্বাভাবিকতায় ও সারল্যে পূর্ণ হইয়া আছে। মৃত্যু-শীর্ষক প্রথম স্তবকের ১ম ও ২য় কবিতাতে বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের একটা অপূর্ব্ব সংগ্রাম শোকভারে সংযত হইয়া, অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"বাবা,
মা কেন এত জপে কর আজ,
করে এত ঠাকুর প্রণাম ?"

এই কয়টী কথাতেই মুমূর্ষুর চরিত্রটী কেমন ফুটিয়াছে! সতী রোগযাতনার মধ্যেও ইষ্টনাম ছাড়েন নাই; কি জানি বিদায়কালে সে নাম ভুলিয়া যান, তারই জন্য ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরের পায়ে বারবার আপনাকে অর্পণ করিতেছেন, মনে মনে বলিতেছেন—দেখো যেন ভুলি না গো! কেবল তাহাই নহে, এই মৃত্যুর ছায়া আসিয়া কি পবিত্র জীবন ও সাধ্বী-চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাও এই কর-জপা ও প্রণামের ভিতর দিয়া ফুটিয়াছে। যে যেমন লোক সে তেমনি মরে। পরে, অন্যত্র অপর প্রসঙ্গে কবি যে সতীচরিত্রের পূত-চিত্র আঁকিয়াছেন, এই প্রথম কবিতার এই প্রথম চরণ দু'টীতে তাহারই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

জানু পাতি'—কৌষেয়-বসনা,
স্থির-নেত্রে যুক্তকরে, ঝর ঝর অশ্রুঝরে
তোমা-পানে চাহি' একমনা!
পড়ে কি না পড়ে শ্বাস, সিক্তমুক্ত কেশরাশ
শিথিল-অঞ্চলা, স্মিতাননা!

আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি'
দীপ দিয়া, ধুপ দিয়া, প্রণমিয়া, প্রণমিয়া
ফুরাত না তার ভক্তিরাশি।
প্রহর বহিয়া যায় ধ্যান তার না ফুরায়,—

"তবে মা আমার—" ইচ্ছা বিধাতার,
এখনো ত রয়েছে জীবন।
যতক্ষণ শ্বাস— ততক্ষণ আশ,
ভক্তি ভরে ডাক নারায়ণ।
"ডাকি বার বার—" কাঁদিও না আর,
যাও, তার পদধূলি লও।
বাছা, প্রাণ ভরি' আশীর্ব্বাদ করি,—
তারি মত সতীলক্ষ্মী হও!

এমনভাবে যিনি দৈনন্দিন জীবন কাটাইয়াছেন, তিনিই কেবল মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও এত কর-জপ ও এত ঠাকুর-প্রণাম করিতে পারেন। তারপর কেবল মুমূর্ষুর চরিত্রের ছবিই যে এই কবিতাটীতে ফুটিয়াছে, তাহা নহে। এখানে বাৎসল্যে ও মাধুর্য্যে এই দুই প্রবল রসের মধ্যে একটা নীরব নিষ্পন্দ দ্বন্দ্বও বাঁধিয়াছে। আর এই দ্বন্দ্বে বাৎসল্যই জয়লাভ করিতেছে। ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। আসন্নমাতৃবিয়োগ-ভয়বিহ্বলা কন্যার মুখ চাহিয়া আসন্নপত্নীবিয়োগ-ভীতিবিধুর পতির আপনার মর্ম্মন্তুদ শোকের সঙ্গে কি যে সংগ্রাম চলিয়াছে, প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু সন্তানের মুখ চাহিয়া সে শোকভয়ঝঞ্ঝাকে যে প্রাণপণে চাপিয়া রাখিতে হইতেছে, এই ক্ষুদ্র কবিতাটীতে তাহাও বিশদভাবে ফুটিয়াছে। কাব্য এবং চিত্র এবং সঙ্গীত ও ভাস্কর্য্যাদি সর্ব্ববিধ ললিতকলারই উৎকর্ষের একটা অতি প্রধান লক্ষণ এই যে, এগুলি বাহিরে কথায় বা সুরে, প্রস্তরে বা চিত্রপটে কোনও রসবিশেষের যতটুকু ফুটাইয়া থাকে, কেবল ইঙ্গিতমাত্রে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের মর্ম্মস্থলে, নিগূঢ় আন্তরিক অনুভূতিতে তার শতগুণ বেশী জাগাইয়া তোলে। এবার প্রত্যেক কবিতাতে এই লক্ষণটা খুবই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবি একটী দুটী কথায় একটা বিশাল রস-রাজ্য পাঠকের মানসচক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন। এই মৃত্যুশীর্ষক স্তবকের ২য় কবিতাটীতেও

(২) "বাবা,
মা—কেন এত জপে কর আজ,
করে এত ঠাকুর-প্রণাম?"
কাছে যা, বাছারে, শুনা গে তাহারে
জনমের মত হরি-নাম।
"বড় ভয় করে, তুমি এস ঘরে
এলোমেলো কি বলে কেবল!"
গঙ্গা-মৃত্তিকায় লেপে দাও গায়,
দাও গিয়া মুখে গঙ্গাজল।
"চোখ বড় রাঙা, গলা ভাঙা-ভাঙা,
দিদিমা ঠাকু'মা বড় কাঁদে।"
করগে বারণ, ঘুমাবে এখন
বাঁধিও না আর মায়া-ফাঁদে।

পত্রবাহী ডাকে,— "চিঠি আছে।"
দেখি পত্র খুলি'—
কর্ম্মস্থল হ'তে আসিয়াছে
শুষ্ক তিক্ত বুলি।
অমরের চিঠি?— ভাল আছে?"
মুমূর্ষু জিজ্ঞাসে।
(সংবাদ দেইনি পুত্র কাছে—)
কি ভুল হতাশে!
অশ্রু ভরা কাতর নয়ন
এক দৃষ্টে চায়;
নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন,
উত্তর আশায়।

হে দেবতা, লই তব নাম
এই মিথ্যা শেষ,—
'ভাল আছে, করেছে প্রণাম,
পড়িতেছে বেশ।'
বক্ষ হ'তে নেমে গেল ভার
গভীর নিশ্বাস ;
ম্লান মুখে ফুটিল আবার
ধীর স্থির হাস।
শান্ত—তৃপ্ত, কৃতজ্ঞতা-নীরে
উজ্জ্বল নয়ন ;
শান্ত—তৃপ্ত ধীরে পার্শ্ব ফিরে'
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন !

তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতৃস্নেহের কি অপূর্ব্ব ছবিই এখানে কবি কি অসাধারণ নিপুণতা সহকারে ফুট'ইয়া তুলিয়াছেন ! সন্তানের মঙ্গল কামনা মা'র সংসারবন্ধনের চরম তন্তুটী হইয়া, এ সংসারে তাঁর প্রাণটাকে বাঁধিয়া রাখে। এ সংসারে মৃত্যু সর্ব্বজয়ী হইয়াও কেবল এই অকৈতব বাৎসল্যের নিকটে পরাজয় মানে—কবি এই ক্ষুদ্র কবিতায় এই বিশ্বজনীন তত্ত্বটীকে ফুটাইয়া দিয়াছেন।

তারপর এই প্রথম স্তবকের ষষ্ঠ কবিতায়

ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জ্বালা না জুড়ায়।
নহে দূর - নহে দূর
ওই মরণের পুর !
আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায়।
উথলি' উছলি' দুলি' চলে জলরাশ
হৃদয়-শ্মশান খুলে'
ধরণী পড়িয়া কূলে ;
নিকটে এসেছে নেমে বিষণ্ণ আকাশ।
নাহি তারা, নাহি তরী, জলদ ঘনায় ;
ঘুরে ঢেউ আশে পাশে,
কত কল কল ভাষে,
আপনে পড়িয়া বুকে ডুলাইতে চায়।

হৃদয় উদাস অতি, নয়ন উদাস ;
সম্মুখে গভীর বারি
ডাকে দীর্ঘ বাহু নাড়ি',
মনে পড়ে দূর গৃহ—পড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
এই ত জগতে সুখ, এই ত জীবন !
সহে না নিমেষ-ভর,
মরণেরি নামান্তর !
দেখি না—দেখি না তবে মরণ কেমন।
নাহি আশা, নাহি তৃষা জীবন যন্ত্রণা ;
মরিয়া জুড়াতে চাই,
মরিতে সাহস নাই !
শিথিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।

অশৌচ-শীর্ষক দ্বিতীয় স্তবকের একাদশ

সদ্যঃস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,
বসি কুশাসনে ;
গলে উত্তরীয় বাস, পড়ে ঘন দীর্ঘ শ্বাস,
পড়ে মন্ত্র গাঢ়-স্বরে' স্খলিত-বচনে।
কনিষ্ঠে লইয়া কোলে জ্যেষ্ঠা কন্যা বসি',
গলে বস্ত্র দিয়া,
শুনে মন্ত্র এক মনে, মুছে অশ্রু ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে শূন্যপানে দেখিছে চাহিয়া।
গায়ে গায়ে আছে বসি' ক্ষুদ্র কন্যা দু'টি,
মলিন বদনে ;
কভু ধীরে অশ্রু ঝরে, কভু চায় পরস্পরে,
কভু দু'জনার চক্ষু মুছায় দু'জনে।
চঞ্চল অবোধ শিশু হতেছে চঞ্চল,
চারিদিকে চায় ;
সবাই কাঁদিছে কেন ? ভয়ে সে আড়ষ্ট যেন,
বারেক উঠিতে পেলে ছুটিয়া পলায় !
উজাড়ি সমস্ত গৃহ আনিছেন মাতা,
কিসে স্বর্গ পায় !
কভু কাঁদি উচ্চরোলে, করেন আমারে কোলে,
বলেন কাঁদিয়া কভু,—তীর্থ রেখে আয় !
'যে জীবা অনলদগ্ধা' পড়ে পুরোহিত
কণ্ঠ শোকাকুল।

তাহারি তৃপ্তির তরে দিতেছি যতন ভরে
তৈজস, তণ্ডুল, শয্যা, বস্ত্র, ফল, ফুল।
কি অন্যের তারে আজ? তেমনি হাসিয়া
সে কি লবে আর?
সমস্ত জগৎ দিলে যদি তার দেখা মিলে
সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার!
পিতা নাই, মাতা নাই, পতি পুত্র নাই,
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে'
অনলে, অনিলে, শূন্যে কোথায়—কোথায়!
কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,
কোথা প্রেতপুরী!
আমি আজ ধরাতলে, সভক্তি নয়ন-জলে
মাগিতেছি মুক্তি তার, দুই কর জুড়ি।

এবং তৃতীয় স্তবকের ষষ্ঠ ও দশম কবিতাতে,

অজয়ে জিজ্ঞাসে দাসী—"কোথা মা তোমার?"
মুখ পানে চেয়ে রয়,
মনে যেন হয়—হয়
"মা—মা—আমা(র) মা"—বলে বার বার।
যেন ক্রমে ক্রমে বোঝে,
আঁখি চারিদিকে খোঁজে,
ক্রমে ফুলে' ওঠে ঠোঁট, আঁখি ছল ছল।
'গিয়াছে মামার বাড়ী?"
সায় দেয় মাথা নাড়'
আঁচল ধরিয়া বলে,—চ(ল্)—চ(ল্)—চ(ল্)!
'কোথা যাবে? অন্ধকার—"
মানা নাহি মানে আর,
লুটায়ে—লুটায়ে ভূমে কাঁদে অবিরল।

প্রভাত প্রশান্ত স্থির;
সম্মুখে বিহগ নীড়
বিহগী পড়িয়া তরুমূলে,
খোলা চোখ, কাদামাথা পাখা দু'টা তুলে'।

অঙ্গক শাবকগুলি,
জিহ্বা মেলি' মুখ তুলি';
নড়ে, চড়ে, চীৎকারে কাতরে—
প্রভাতবায়ুর স্পর্শে, তরুর মর্ম্মরে।
হৃদয় কেমন করে—
শিশুগুলি মনে পড়ে!
আশঙ্কায় ঘরে ছুটে যাই,
চাপিয়া—চাপিয়া বুকে মুখে চুমো খাই।
মরেছে তাহার দেহ,
মরেনি ত প্রেম-স্নেহ—
রেখে যেন গেছে সমুদয়!
সেই ক্ষুদ্র সুখ দুখ আশা তৃষা ভয়।
তারি হৃদি হৃদে ধরি'
তারি গৃহকার্য্য করি;
প্রতি কার্য্যে স্মরি অনুক্ষণ,
মরমে মরমে কাঁদি, মুছি দু'নয়ন।
সদা কাছে কাছে রই
কত হাসি, কত কই,
রাখি চোখে চোখে, কোলে কোলে;
কি করিলে তার কথা, তার শোক ভোলে!
তেমনি পাতিয়া কোল
দিতেছি আদর-দোল—
কত সুরে করি গুণ্ গুণ্!
দিন দিন আমি কত স্নেহে সুনিপুণ!
ভালবাসি বুকে পুরে,
তবু—তারা দূরে দূরে!
প্রাণ ভরে' তেমন না হাসে,
ঘুমায়ে—ঘুমায়ে তারে খোঁজে আশে-পাশে!
বকাবকি ঘুষাঘুষি—
আমি যদি কভু রুষি,
এক জোটে সবে ওঠে কাঁদি!
আমি শেষে অপরাধী—জনে জনে সাধি!

যে কারুণ্যছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী, একই সঙ্গে অতি সুন্দর ও বস্তুতন্ত্র হইয়াছে। বস্তুগুলি আপাততঃ অতি ছোট বলিয়া মনে হইতে বা পারে।

দৃশ্যগুলি অতি সাধারণ—যেথানে শোক সেইখানেই এগুলি অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপকরণ সামান্য হইলেও এই কবিতাকয়টীর উপজীব্য যে কারুণ্য ইহাদের মধ্যে ফুটিয়াছে তাহা অলোকসামান্য। এই সামান্য উপকরণ লইয়া কবি যে এক গভীর, উজ্জ্বল রসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন ইহাতেই তাঁর কবিকল্পনার অলোকসামান্য কুশলতার পরিচয় দান করিতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

"ন চ দৈবাৎ—"

১

দেবেন্দ্রনাথের মাথা ধরিয়াছিল। কথাটা এমন কিছু নয়; রমণীমহলে এবং নারীভাব-সুলভ যুবকদলে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবে, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এটা নূতন,—এ পর্য্যন্ত তাহাকে মাথা ব্যথা বা অন্য কোন ব্যথা অনুভব করিতে হয় নাই। তাই একটু ব্যস্ত হইয়াই অপরাহ্নে সে তাহাদের গৃহ-চিকিৎসক হরেন্দ্র ডাক্তারের শরণাপন্ন হইল।

ডাক্তার সাহেব তখন বাড়ীতে ছিলেন না। দেবেন্দ্র নিজের গাড়ীতেই আসিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাঁর আফিস বা consulting roomsএর দিকে ছুটিল। ডাক্তার তখন কাগজপত্র গুছাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বলিলেন—"খুব এসে পড়েছেন,—আমি এখনই একটা ডাকে শ্রীরামপুর যাচ্ছিলাম। মাথা ধরেছে? তা ধরবেই ত!—গুরু-ভোজন, মাদক-সেবন, রাত্রিজাগরণ—এ সব ত আপনারা ছাড়বেন না,—কাজেই তার ফল ভোগ করতে হয়।—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বলিল —"গতস্য শোচনা নাস্তি।' কিন্তু এখন যে আমি মরি। একটা ওষুধ দিন।"

"নেহাতই ছাড়বেন না ত এই নিন—" বলিয়া ডাক্তার একবার ঘড়ির দিকে চাহিলেন; তরপর তাড়াতাড়ি একটা প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন লিখিয়া দিয়া রোগীর নাম-তালিকায় তার নামটা টুকিয়া, আফিস বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রও প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনটা হাতে করিয়া প্রথম যে ডাক্তারখানা পাইল তাহাতেই ঢুকিয়া পড়িল। সে-টা সেনগুপ্ত কোম্পানীর ডাক্তারখানা। দেবেন্দ্রের নিতান্ত গ্রহের ফের, তাই সে সময় সেখানে ঢুকিল কেন, তাই বলিতেছি।

২

সেনগুপ্ত কোম্পানীর দুইজন অংশীদার—এক রতন সেন, অপর ললিত গুপ্ত। দুইজনে সহতীর্থ। উভয়ে কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া সমান অংশে এই ডাক্তারখানা খোলে। স্কুলে এবং কলেজে কতকটা 'ডানপিটে' এব

একটু বেশীমাত্রায় স্ফূর্ত্তিবাজ বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। ব্যবসায়ে বসিয়াও কলেজের সে আমোদ-প্রবণতা তাহাদের বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। প্রমাণ—পূর্ব্বরজনীর অভিনয় দর্শন সম্ভোগ।

থিয়েটারওয়ালাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা এবং মিউনিসিপাল-আইন-প্রহসনে যতদিন না যবনিকা পড়িতেছে, ততদিন বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনয়-দর্শকবৃন্দের এ দুর্ভাগ্য ঘুচিবার উপায় নাই। তাই প্রতি রবিবার এবং সোমবার প্রাতঃকালে বিবর্ণমুখ কোঠরগতাক্ষি, সুদীর্ঘ রজনীর ঘর্ম্মসিক্তবেশা থিয়েটার যাত্রীর দলকে, সুদীর্ঘকালের আসামীর ন্যায়, অভিনয়-কারা হইতে একে একে বাহির হইয়া আসতে দেখি। স্বাস্থ্যের বিনিময়ে অভিনয়-সম্ভোগ এ একমাত্র আমাদের মত হতভাগ্য দেশেই সম্ভবপর। কথাটা নেহাৎ 'ধান ভানিতে শিবের গীত' নয়; আমার এ গল্পের সহিত ইহার একটু বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, এটা একটু বেশী করিয়া বলিতে হইল।

সে দিন প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া দুই বন্ধু যখন আসিয়া ডাক্তারখানা খুলিল তখন তাহাদের উভয়েরই অবস্থা সমান,—শরীর অবসন্ন, চক্ষু নিদ্রাতুর। তার উপর, কম্পাউণ্ডারও সেদিন দিন বুঝিয়া, অসুস্থ বলিয়া রিপোর্ট করিয়া কাজে আসে নাই। কাজেই সেদিনের দোকানের সব ভার রতনের স্কন্ধে পড়িল; ললিত থাকিতে পারিল না,—ভবানীপুর ডাক্তারখানাসংক্রান্ত একটা জরুরী কাজে কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে ছুটিতে হইল।

একা রতন মুস্কিলে পড়িল। আফিসের ছোঁড়া কালীচরণটাকে ডাকিয়া লইয়া কাজের একটু সুসার করিবার চেষ্টা করিল।—কিন্তু সে একটা অজ যব-চূর্ণ; ঔষধ-চূর্ণাদি লইয়া আহার্য্য বিশেষে রূপান্তরিত করিবার উপক্রম করিল; কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া রতন নিজেই সব কাজ করিতে লাগিল। বেলা যখন চারিটা, তখনও কাজের ভীড়ে তার জলযোগ করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই,—এদিকে ঘুমের ঘোরও তখন তাহাকে বেশ চাপিয়া ধরিতেছিল। তারপরও একঘণ্টা কাটিয়া গেল—রতন শিব নেত্রে তন্দ্রাবিষ্টের মত কোন রকমে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। ৫॥ টার সময় আর সে চক্ষু মেলিতে পারিল না,—রক্তমাংসের শরীরে আর কত সয়?—হাত পা ছড়াইয়া অবসন্নভাবে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িবে—এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ তার প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—"ওষুধটা আমি নিয়েই যাব। একটু না হয় বসছি" বলিয়া, একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া, কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

রতনের তখনকার মনের ভাব সহজেই অনুমেয়। তবু সে প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনখানা ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইয়া, ল্যাবোরেটারীতে ঢুকিয়া ঘুম-বিজড়িত নেত্রে বহুকষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করিল। ঔষধের রকমারী বেশী ছিল না—এক সোডিয়ম ছাড়া হাতের কাছেই সবগুলা ছিল। সোডিয়মটা দেয়ালে আঁটা লম্বা তক্তার উপর, অন্যান্য ঔষধের বোতলের সঙ্গে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো ছিল; তার এক-পার্শ্বে সিলিসিয়ম (Silicium) এবং অপর পার্শ্বে ষ্ট্রীক্‌নিনের (Strychnine) বোতল ছিল।

সে রকম ভাবে পাশাপাশি ঔষধ দু'টা রাখা অবশ্য ঠিক হয় নাই। তবু ষ্ট্রীকনিনের বোতলের গায়ে লাল কালির মোটা অক্ষরে "বিষ" "সাবধান" বলিয়া যে লেখা ছিল তাহা আমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছি। রতন দুই-বার হাই তুলিয়া, তিনবার আলস্য ভাঙ্গিয়া, চারিবার চক্ষু রগড়াইয়া অনেকক্ষণ পরে সোডিয়মের বোতলটার আবিষ্কার করিল; তারপর টুলের উপর দাঁড়াইয়া, তাহার দিকে হস্তপ্রসারণ করিল;—নামাইয়া আনিল কিন্তু ষ্ট্রীকনিনের বোতলটা।

দেবেন্দ্র তখন চেয়ারে বসিয়া মাথার যন্ত্রণায় ঝিমাইতেছিল।

বোতলটা নামাইয়া রতন তাহা হইতে ওজন করিয়া ১৫ গ্রেণ ঔষধ বাহির করিল, তারপর বাকী ঔষধগুলার সহিত মিশাইয়া একে একে ছয়টা পুরিয়া করিল, তারপর একটা রঙ্গীণ ছোট কাগজের বাক্সে পুরিয়া-গুলি রাখিয়া, ঘুমের ঘোরে ডবল দাম চার্জ্জ করিয়া বসিল।—দেবেন্দ্র তখন যন্ত্রণায় অস্থির, সে তৎক্ষণাৎ দাম চুকাইয়া দিয়া, ঔষধ লইয়া, গাড়ীতে গিয়া চড়িয়া বসিল। কোচম্যানকে হাঁ কয়া বলিল—"চলো—বাড়ী।"

৩

ঔষধের দামটা বাক্সে তুলিয়া রতন, বোতল খুলিয়া, আউন্স খানেক কি একটা রঙ্গীণ পানীয় গলাধঃকরণ করিল। ফলে, তাহার হস্তপদের শিথিলভাব কতকটা অপসৃত হইল, এবং তাহার শিব-নেত্র কতকটা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তখন সে একবার কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—টেবিলের উপর কতকগুলা ছিন্ন কাগজ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ৮।১০ টা শিশি, আর ঢাকা খোলা একটা বোতল—গায়ে মোটা মোটা লাল অক্ষরে—ও কি?—"ষ্ট্রীক—!" রতন চক্ষু রগড়াইয়া দুইবার তিনবার অক্ষরগুলা পড়িল, তারপর দেওয়ালে আঁটা তক্তাটার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল—সোডিয়মের বোতলটা ত নড়চড় হয়নি, তবে!—

সদ্যঃ সর্পদষ্টের ন্যায় রতন একলম্ফে টেবিল টপ্‌কাইয়া ছুটিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল। কোথায় তখন রোগী, আর কোথায় সে ঔষধ! বিশাল জনস্রোত বহুক্ষণ উভয়কেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে!

রতন কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। একটা গভীর বিপদাশঙ্কায় তাহার হস্তপদ অসাড় হইয়া গেল। ক্ষণপরে কি ভাবিয়া, ফিরিয়া, প্রেস্‌ক্রপ্‌সনখানা একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। নামের স্থানে দেখিল, শুধু—"রায়" লেখা রহিয়াছে। রায়! কোন্ রায়? ডিরেক্টারী খুলিয়া দেখিল—তিন কলম "রায়"! তবে একটা কথা, প্রেস্‌ক্রপ্‌সনখানা ত হরেন্দ্র ডাক্তারের, তিনি হয় ত তাকে জানিতে পারেন। ডাক্তারখানায় টেলিফোন ছিল—রতন প্রাণপণে হাতল ঘুরাইতে লাগিল।

"কোন্ নম্বর?"

"বলছি মশাই,—বলছি"—বলিতে বলিতে সে ক্রমাগত নম্বর কেতাবের পাতা উল্টাইতে লাগিল। ডাক্তারের 'ফোন'-নম্বর তার জানা ছিল না। টেলিফোনওয়ালারা ৪।৫ বার প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, অবশেষে সে হাঁকিল—"৫১৬"

"ডাক্তার হুরেন্দ্র ঘোষ? আমি ডাক্তার বোসকে চাই, এখনই—"

অপরদিক্ হইতে বামাকণ্ঠে উত্তর হইল— "আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। মুখটা বুঝি যন্ত্রের খুব কাছে নিয়ে এসেছেন? একটু সরিয়ে নেবেন।"

রতন যন্ত্রটা ঠিক করিয়া ধরিল, বলিল —"ডাক্তার সাহেব বাড়ী আছেন?"

"তিনি কতক্ষণ হ'ল একটা 'কল' পেয়ে মফঃস্বল গেছেন। কি চান আপনি?—

রতন হতাশভাবে অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

"আমি তাঁর স্ত্রী। আমার দ্বারা যদি আপনার কিছু—"

"দোহাই আপনার,'রায়' বলে তাঁর কোন লোককে আপনি জানেন?"

"রায়! রায়!—তাই ত, শুধু 'রায়' বলে কি করে বুঝব? কত রায় আছে!—"

* * *

তখন দেবেন্দ্রের গাড়ী রাস্তার ভীড় ঠেলিয়া বাড়ীর দিকে মোড় ফিরিতেছিল।

৪

রতনের সমস্ত রক্ত তখন মাথায় উঠিতেছিল। তীব্র কণ্ঠে সে বলিল—"ভাবুন, মনে করে দেখুন—ছোকরা কোন রায়কে আজ আপনার স্বামীর কাছে আসতে দেখেছেন কি না!—আমি তাকে বিষ খাইয়েছি!—"

"বিষ?—"

"হাঁ—ভুলক্রমে। আমি ডাক্তারখানার লোক, তাকে ভুল ওষুধ দিয়ে ফেলেছি। তার ঠিকানা চাই,—তাকে বাঁচাতে চাই,—তাকে—"

"সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক কথা!—আপনি এখনি ডাক্তার সাহেবের আফিসে যান—তাঁর খাতাপত্র সেখানেই থাকে—সেখানে গেলে হয়ত সন্ধান পেতে পারেন।"

"তাঁর ঘরের চাবি?—"

"তাই ত, আমি ত চাবি রাখি না। তবে, দরোয়ানের কাছে হয় ত চাবি থাকতে পারে,—আপনি যান,—আমিও—"

রতনের আর শেষ কথা শোনা হইল না। তিন লাফে সদর রাস্তায় পড়িয়া, ডাক্তারের আফিসের দিকে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল—টেলিফোনের রিসিভারটা হুকের গায়ে সবেগে দুলিতে লাগিল।

ছুটিতে ছুটিতে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় যখন রতন ডাক্তার বোসের আফিসে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দ্বারবান লছমন সিং, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়া আপনার ক্ষুদ্র কুঠারীতে বসিয়া, মৃৎপ্রদীপালোকে, সুর করিয়া করিয়া, ভাবের আতিশয্যে গাঢ়কণ্ঠস্বরে "হো রামা—আ-আ" পড়িতেছিল। সদর দরজার উপর প্রচণ্ড করাঘাতে তাহার ভাবস্রোতে বাধা পড়িল। বিরক্ত হইয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া সে উত্তর করিল—"আতে হেঁ।"

সে স্বর রতনের কর্ণে প্রবেশ করিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু সে প্রচণ্ড করাঘাতের বিরাম ঘটিল না। লছমন দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—"আরে শশুরাণ, ইয়ে ডাকু না কোন্ হায়! ঠারিয়ে জী ঠারিয়ে, —আতে হেঁ। আরে কে'য়াবি তোড়োগে মৎ—" বলিতে বলিতে দ্বার খুলিয়া, সম্মুখে সম্পূর্ণ অপরিচিত ধূলিধূসরিত স্বেদসিক্ত এক

মূর্ত্তি দেখিয়াই তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল; ভাবটা তখনই তাহাকে দূর করিয়া দেয়। রতন, তাহা বুঝিয়াই, তাহাকে ঠেলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"হাম ডাক্তার সাহেবকো আফিস ঘরকা ভিতর যানে মাঙ্‌তা। আভি উস্‌কা কেওয়ারি খোল দেও।"

"কাহে জী? সাব আভি নেহি হ্যায়।"

"আরে সে ত হামি জানে। একঠো আদমী বিষ খায়া হ্যায়—মরণে বৈঠা হুয়া. উস্‌কা ঠিকানা হাম মাঙ্‌তা।"

"কিস্‌কো ঠিকানা?"—লছমন আগন্তুকের প্রতি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

* * *

এদিকে দেবেন্দ্র তখন ঔষধ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া, আপন শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

* * *

"কিস্‌কো ঠিকানা, জী?"

"আরে, ওই আদমীকো—"

"শুনিয়ে বাবু সাহেব। ডাঙ্‌তার সা'ব বাহির গয়ে হেঁ, আপকো ভি হম নেহি পছনতে হেঁ। তব্ উন্‌কা কামরা হম ক্যায়সে খোল দেঁ?"

"আরে জাহান্নামকে দাও তোমার ক্যায়সে। আরে ভাই তোম্ খুন্ করোগে? তোমকো ভি হামারা সাথ যে লটক্ যানে হোগা।—আরে খোল দেও, খোলো,—খোলো—" রতন উন্মত্তের ন্যায় আফিস কক্ষের দরজায় প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল।—"আরে খোল দেও, মেমসাহেব ভি হাম্‌কো বোল্ দিয়া।—"

লছমনের মেজাজ ক্রমশই চড়িয়া উঠিতে ছিল। সে বলিল—"উস্‌কা কোন্ ঠিকানা হ্যায়? খালি আপকো জবানীমে হাম কভি ইস্ কামরা খোল্‌নে নেহি শকতে হেঁ। বিশ বরষ হিঁয়া হাম নকরীমে হ্যায়, বিশ—"

সহসা সে রঙ্গমঞ্চে এক মহিলার আবির্ভাব হইল। উভয়ের বচসার কথা বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে কতকটা তাঁর কর্ণগোচর হইয়াছিল।—

"সে কি?—আপনি এখনও ঘর খোলেন নি?—আপনিই ত আমাকে—"

"এই হতভাগাটা—" রতনের সর্ব্বশরীর তখন ক্রোধে উৎকণ্ঠায় কাঁপিতেছিল,—"এই—"

"লছমন, এখনি ডাক্তার সাহেবের ঘর খুলে দাও।"

লছমন প্রভুপত্নীর সে আদেশ অন্যথা করিতে সাহস করিল না। তবু তালা খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিল—"বিশ বরষ হিঁয়া হাম—"

* *

দেবেন্দ্র তখন জুতাজামা ছাড়িয়া, সেনগুপ্ত কোংর সে সুদৃশ্য পুরিয়ার বাক্সটা খুলিয়া তাহা হইতে সযত্নে একটা পুরিয়া বাহির করিয়া গলাধঃকরণ করিবার অভিপ্রায়ে সুরাই হইতে এক গ্লাস জল গড়াইতেছিল।

তাড়াতাড়িতে দরজা খুলিতে গিয়া, লছমন চাবিটা তালার সহিত বেকায়দায় আটকাইয়া ফেলিল; রতন ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া তার গলা চাপিয়া ধরিল. মিসেস বসু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এমন সময় হঠাৎ সে রঙ্গমঞ্চে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব

হইল,—ইনি ডাঃ সেন—ডাক্তার বসুর সহকারী বা আসিষ্টাণ্ট। মিসেস বসু বলিলেন—"দোহাই ডাঃ সেন। আগে দরজাটা খুলুন, সব বলছি পরে।"

অল্প চেষ্টাতেই তালা খুলিল। রোগীদের লিষ্টটা টেবিলের উপরই ছিল, রতন তাড়াতাড়ি যাইয়া দেখিল, সব শেষে পেন্সিলে লেখা একটা নাম—"দেবেন্দ্র রায়, কলুটোলা—নং।"

*   *

দেবেন্দ্র ততক্ষণে ঔষধের গ্লাসে জল মাপিয়া তাহাতে এক পুরিয়া ঔষধ ঢালিয়াছিল, তারপর আরাম কেদারায় শুইয়া, গ্লাসটা-

মিসেস বসু চীৎকার করিয়া বলিলেন—"বাইরে আমার গাড়ী রয়েছে, আপনারা দুজনে শীঘ্র গাড়ীখানা ছুটিয়ে নিয়ে যান। আমিও দেখি টেলিফোনে তাঁকে পাই কি না।"

অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর মিসেস বসু একটা নম্বর পাইলেন—'যদুনাথ রায়—কলুটোলা।'

"দেবেন্দ্র বাবু এ বাড়ীতে থাকেন?"

"আজ্ঞে হাঁ। আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন?"

"আমি ডাক্তার হরেন্দ্র বসুর স্ত্রী। দেবেন্দ্র বাবু বাড়ী আছেন ত? এখনই একবার ডেকে দিন, বিশেষ জরুরী।"

মিনিট খানেক পর অপর দিক্ হইতে শব্দ হইল—"আপনি দেবেন্দ্র রায়কে খুঁজছেন? আমিই দেবেন্দ্র। কি চান আপনি?—"

"দোহাই দেবেন্দ্র বাবু, সেটা খাবেন না।"

"আজ্ঞে?—"

"সেটা খাবেন না, খাবেন না—এখনও খান্‌নি ত?"

"কি বলছেন বুঝতে পারছি না। আপনি টেলিফোনের নম্বর উলটাপালটা করে ফেলেন নি ত?"

"সেই পুরিয়াটা—মাথাধরার ঔষধটা খাননি ত এখনো?—"

"কেন, কি হয়েছে? এইমাত্র যে আমি একটা পুরিয়া খেলাম।—ব্যাপার কি?"

কিন্তু দেবেন্দ্র আর তার উত্তর পাইল না। যন্ত্রটাকে কোনমতে হুকে আটকাইয়া ভীতচকিত নেত্রে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে মিসেস বসু ততক্ষণ সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া রিসিভারটা তুলিয়া রাখিল। আপন মনে বলিল—'কে এ? পাগল না কি?"

দেবেন্দ্রের বাড়ীর দরজায় গাড়ি লাগিতে না লাগিতে রতন এবং ডাক্তার সেন লাফাইয়া পড়িয়া ঝড়ের মত একেবারে বাড়ির মধ্যে গিয়া পড়িলেন। চাকরটা আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় ছুটিয়া আসিতেছিল—তাহার উপর উভয়ের যুগপৎ প্রশ্ন বর্ষিত হইল—"বাবু বেঁচে আছেন ত?"

হল-ঘরে কিসের একটা গোলমাল শুনিয়া দেবেন্দ্র আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতেই রতন ছুটিয়া যাইয়া তার হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনি বেঁচে আছেন!—রাখে কৃষ্ণ মারে কে?—"

"কেন,—কি হয়েছে ?"

সহসা কক্ষমধ্যস্থ টেবিলের উপর ঔষধের খালি গ্লাসটার উপর ডাক্তার সেনের দৃষ্টি পড়িল। তিনি সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।—"আপনি ওষুধ খেয়েছেন ?"

"কোন্ ওষুধ ? পুরিয়াটা ? হাঁ খেয়েছি, কেন ? এইমাত্র খেয়ে শুয়ে ছিলাম।"

"হা ভগবান্!"—বলিয়া রতন মাথায় করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।—"এত করেও আটকাতে পারলাম না!" তার পর উন্মত্তের ন্যায় কক্ষমধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বলিতে লাগিল "মাষ্টার্ড—পাম্প—জিঙ্ক সালফেট,—কে কোথায় আছ, শীঘ্র আন, শীঘ্র নিয়ে এস।"

দেবেন্দ্র কতকটা দমিয়া গেল।—"মাষ্টার্ড—পাম্প—জিঙ্ক সালফেট!—কেন, কিসের জন্য ?"

রতন পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"না না,—বলুন আপনি সত্যি সেটা খাননি!—বলুন আপনি ভুল বলেছেন।"

"বিলক্ষণ, ভুল হবে কেন?—ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না? দোহাই আপনাদের—"

এমন সময় মিসেস বসু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"ওঃ হো! ষ্ট্রীকনিন—আপনাকে আমি ষ্ট্রীকনিন খাইয়েছি!—" বলিয়া রতন আপন মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিল।

অ্যাঁ!—ষ্ট্রীক—নিন!—দেবেন্দ্রের মুখমণ্ডল সহসা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু কপালে উঠিল, নিমিষের মধ্যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সে কক্ষতলে পড়িয়া গেল। সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া চোখে মুখে নাকে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। ডাক্তার সেন উত্তেজিত হইয়া রতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আর হাঁ করে ভাবছেন কি?—এখনি ছুটে আপনার ডাক্তারখানায় যান, পাম্প ক্যাম্প যা পান নিয়ে আসুন,—মুহূর্ত্তের বিলম্বে সব নষ্ট হবে। এখনও উপায় আছে—যান চলে যান।"

রতনের মাথায় তখন রক্ত চন্ চন্ করিতেছিল। নক্ষত্রবেগে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিয়া সে হাঁকিল—"দশ টাকা—বিশ টাকা—যা চাও বক্‌সিস দেবো, যত জোর আছে চালাও।"

জনসংঘ ভেদ করিয়া, কত লোককে চাপা দিতে দিতে সামলাইয়া গিয়া, মোটরখানা ডিস্পেন্সারীতে আসিয়া পৌঁছিল। একটা ছোকরা অনেকক্ষণ হইতে রতনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সে আসিতেই তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—"ললিত বাবু দিয়েছেন,—বলেছেন—খুব জরুরী; এখনই খুলে দেখতে!" "নিপাত যাও!" বলিয়া রতন তাহার হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া পকেটে পুরিল। তার পর তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া, মাষ্টার্ড পাম্প প্রভৃতি যা পাইল একটা ব্যাগে পুরিয়া তালা বন্ধ করিয়া গাড়িতে আসিয়া উঠিল। সফারকে বলিল—"ছোটো ছোটো,—এক মুহূর্ত্তের দেরিতে একটা জীবন যাবে, প্রাণপণে চালাও—"

হঠাৎ ললিতের চিঠির কথা রতনের মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়িয়া দু'চার ছত্র পড়িতেই, তার সব উত্তেজনা

নামিয়া গেল। আরও দুইবার ভাল করিয়া সে পত্রখানা পড়িল। তার পর অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—ষ্টুপিড্—ছোঁড়াটা,—রাস্কেল! কি ভোগানটাই না মিছামিছি ভোগালে!

পত্রখানা এই :—

“ভাই রতন,

সোডিয়মের বোতলটা নেড়ো না —সেটা ষ্ট্রীকনিনে ভরা। ষ্ট্রীকনিনটারও বোতলের সবটাতেই সোডিয়ম পোরা আছে। আজ সকালবেলা তন্দ্রার ঝোঁকে ওলটপালট করে ফেলেছি, ভেবেছিলাম পরে লেবেল দুটো বদ্‌লে দেবো, আস্‌বার সময় ভুলে এসেছি; এখানে এসে এই কতক্ষণ মনে হল। এটা হচ্ছে—‘বিভ্রমতন্দ্রাকালে চূর্ণস্থানবিপর্য্যয়ঃ।’ যাই হোক কাল ঠিক করে নেয়া যাবে এখন। এটা একটা গভীর মনস্তত্ত্বের কথা, —পরে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

দিনটা চালালে কেমন?

তোমার
“ললিত।”

*　　*

“হতভাগাটা!”—বলিয়া রতন শুধু হাতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র তখন শয্যায় পড়িয়া গোঙাইতেছিল। ডাক্তার সেন পার্শ্বে বসিয়া তাহার হাতের নাড়ি টিপিয়া ধরিয়া পকেট ঘড়িটার কাঁটার দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিলেন। মিসেস বসু তার নাকে মুখে জল দিতেছিলেন। রতনকে শুধু হাতে আসিতে দেখিয়া ডাক্তার সেন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। রতন হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষে এবং ঈষৎ অপ্রস্তুতের ভাবে বলিল—“আঃ বাঁচা গেছে। সব ভুল! ভগবান্ বাঁচিয়েছেন!”

“কি রকম?”—উভয়ে সোৎকণ্ঠে যুগপৎ প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন।

“এই দেখুন, আমার বন্ধু ও সহকারী ললিত গুপ্তের চিঠি—” বলিয়া সে চিঠিখানা পড়িয়া সকলকে শুনাইল।

“অ্যাঁ?” দেবেন্দ্র এতক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। “তবে আমি বিষ খাইনি?”

“আজ্ঞে না।”

“সত্যি?”

“সত্যি বই কি এই চিঠিই তাহার প্রমাণ।”

“তাই ত! তবে আর আমার কোন ভয়ের কারণ নেই?—আপনারা ঠিক বলছেন? আমি ত তাই ভাবছিলাম—” বলিয়া দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিল।

মিসেস্ বসু ধীরে ধীরে জলের পাত্রটা ঠেলিয়া রাখিলেন; ডাঃ সেন চশমা মুছিতে মুছিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িলেন; দাস-দাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। তারপর সকলে একে একে নীরবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

যাই হউক, দেবেন্দ্রের মাথা-ব্যাথাটা কিন্তু ছাড়িয়া গিয়াছিল। *

---

* কোন ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

রাডিয়ার্ড কিপলিং ও রবীন্দ্রনাথ

বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ ডারুইন যখন তাঁহার অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন বলিতে গেলে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের কেবল একটা দিকই বেশী দেখিয়াছিলেন। জীবজগতের বিকাশে, "জীবন-সংগ্রাম" ও "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন"—এই দুইটীই তিনি প্রধান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। সৃষ্টি-পর্য্যায়ে যে আরও একটী নিয়ম কার্য্য করিতেছে ('জীবন-সংগ্রাম'' অপেক্ষা প্রবলতর ভাবেই কার্য্য করিতেছে), তাহার দিকে তিনি তেমন মন দেন নাই।

ডারুইনের এই মতবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু চিন্তারাজ্যে সুফলের সঙ্গে সঙ্গে এমন সকল কুফলও ইহা উৎপন্ন করিয়াছে, যাহা ডারুইন স্বয়ং কল্পনাও হয়ত করেন নাই। তাঁহার শিষ্য ও সতীর্থেরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বজ্রগম্ভীর রবে প্রচার করিলেন যে, সংগ্রামই জীবজগতের একমাত্র নীতি; দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, প্রবল প্রতিযোগিতা, ইহা ছাড়া সেখানে অন্য কোন নিয়ম খাটিতে পারে না। এই কঠোর যুদ্ধে, যে বলী সেই জয়ী হইবে; —দুর্ব্বল, অযোগ্য এই নিয়মের চক্রে পিষিয়া মরিবে। আধুনিক একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদের কথায়—

"They made modern literature resound with the war-cry of "woe to the vanquished", as if it were the last word of modern biology. They raised the "pitiless" struggle for personal advantages to the height of a biological principle which man must submit to as well, under the menace of otherwise succumbing in a world based upon mutual extermination". (Prince Kropotkin's "Mutual aid").

শীঘ্রই এই নিষ্ঠুর নীতি রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্য—সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সংগ্রাম-নীতির রক্ত-রেখাঙ্কিত ভিত্তির উপরেই ইউরোপীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। রাষ্ট্র ব্যাপারে এই নীতি Imperialism মূর্ত্তি ধারণ করিল। অক্টোপসের মত এই ভীষণ Imperialism তাহার সর্ব্বতঃ প্রসারিত বাহুদ্বারা, দুর্ব্বলকে, অসহায়কে, ক্ষুদ্রকে টানিয়া তাহার মরণের জালে ফেলিতে লাগিল। সমাজে ইহা সহানুভূতির বীজ নষ্ট করিয়া প্রতিযোগিতাকে বাড়াইয়া তুলিল। স্বার্থপরতা ও বিলাসিতাকে ডাকিয়া আনিল। সাহিত্যে ইহা অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও বর্ণ-বিদ্বেষের বহ্নি জ্বালাইয়া দিল। ইহারই পরোক্ষ ফল স্বরূপ নিহিলিষ্ট ও "প্রগল্‌ভা রমণীদলের" সৃষ্টি হইল। এই যে আজও চক্ষের সম্মুখে বল্কান-সমরে নিষ্ঠুর পৈশাচিক লীলা, নরশোণিতের হোলি-উৎসব দেখিতেছি; এই যে লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণ ও কোটী কোটী দরিদ্রের অর্থ উড়িয়া যাইতেছে;—ইহা সেই জীবন-সংগ্রাম-নীতিমূলক সভ্যতারই পরিণাম!

কিন্তু জীবজগতে সৃষ্টির বিকাশে আরও একটা নিয়ম কার্য্য করিতেছে। তাহার প্রভাব এই সংগ্রাম-নীতি অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে;—বরং অনেকস্থলে তাহার কার্য্যই প্রবলতর বোধ হয়। তাহাকে বলা যাইতে পারে—সহানুভূতি ও প্রেম; পরস্পরের সাহায্য ও মৈত্রী। অতি নিম্নতম কীট-পতঙ্গজাতীয় জীব হইতে সভ্যতম মনুষ্য-সমাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই সহানুভূতি ও মৈত্রীর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, মানুষের ধর্ম্ম ও নীতি সকলই এই নিয়মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে * প্রিন্স ক্রপটকিন এই তত্ত্বটী অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা প্রধানতঃ এই সহানুভূতি, প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মানুষে মানুষে এই যে বিরোধ এই যে সংগ্রাম তাহা অল্পবিস্তর অপরিত্যাজ্য হইলেও, এই নীতিকে সে যথাসম্ভব দূরেই রাখিতে পারিয়াছিল। প্রকৃতির মধ্যে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের যে প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, তাহা সে অতি পূর্ব্বকালেই অনুভব করিয়াছিল। তাহার শান্ত নির্জ্জন তপোবন হইতে উপনিষদের যে উদাত্ত সঙ্গীত উঠিয়াছিল, তাহাতে এই ত্যাগ ও প্রেমের সুরই ধ্বনিত হইয়াছিল। এই খানেই "হিমাচল পাদমূলে, শৈলজা রোহিণীকূলে" যে 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী বিঘোষিত হইয়াছিল, "আজিও অর্দ্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চিত্তে" তাহা শুনিতেছে। এই পরম সাম্যের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।
(গীতা—৬।৩২)

এই মহা মিলন-মন্দিরেই আর্য্য ও অনার্য্য, শক ও হূণ, তাতার ও তুর্কী সকলেই সমভাবে আলিঙ্গিত হইয়াছিল। কেবল এইখানেই রাষ্ট্র-নীতিতে অসির পরিবর্ত্তে প্রেমের ব্যবহার প্রথম দেখা গিয়াছিল; সম্রাট্ অশোক প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে, মৈত্রীর দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। এই ভারতীয় সাহিত্যেই স্বার্থ ও বিলাসিতার পরিবর্ত্তে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আনন্দ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের (পরবর্ত্তী কালের জাতিভেদ নয়!) প্রতিষ্ঠা দ্বারা উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অধিকার-সাম্যের চেষ্টা করা হইয়াছিল। আজ—কেবল আজ কেন বহুদিন হইতেই—সে আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই;—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় কেবল প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই যে "সংগ্রামনীতি": —"যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে"র আদর্শ, তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, ইংলণ্ডের আধুনিক প্রধান কবি রাডিয়ার্ড কিপলিংএ, কিপলিং Imperialismএর মুখপাত্র—সর্ব্বপ্রধান প্রবক্তা বলিলেই হয়। তাঁহার গান ও কবিতায় তিনি মানুষের এই সংগ্রামবৃত্তি—প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছাই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। রাষ্ট্রের জিগীষা ও ক্ষমতা-বিস্তারকেই রমণীয় আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন। যে সাম্যের আদর্শ সর্ব্ববিধ সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির মূল-

* P. Kropotkin's "Mutual aid—a factor of Evolution."

সুর—তিনি তাহার উত্তরসাধক নহেন; যে আত্মম্ভরিতা ও স্বাজাত্যের অহঙ্কার জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, পরজাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তাঁহার গানে তাহারই সুর বাজিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আজ যে এই ছাড়াছাড়ি ভাব —কৃষ্ণের প্রতি শ্বেতের এই যে ঘৃণা—যাহার প্রভাব অষ্ট্রেলিয়া, কালিফোর্ণিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাইতেছি,—কিপলিং তাহার পরিপুষ্টির জন্য কম সাহায্য করেন নাই। তিনিই প্রথমে গাহিয়াছিলেন,—

"The East is East, and West is West
Never the twain shall meet."

তাঁহার এই বাণী যে মানব-সভ্যতার কত অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা হয়ত তিনি জানেন না। তাঁহারই গল্পে কাহিনীতে তিনি ভারত-বর্ষীয়দিগকে এমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহারা পাশ্চাত্যজাতির চক্ষে অত্যন্ত হীন ও বর্ব্বর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "Plain Tales from the Hills"-এর উল্লেখ করিতে পারি। বৈজ্ঞানিক তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত বিকাশ হয় সাহিত্যে ও কবিতায়। জন-সাধারণ বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা কবির বাণীতেই বেশী অনুপ্রাণিত হয়। তাই ডারুইন ও হাক্সলি অপেক্ষা, তাঁহাদের গায়ক কিপলিংই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

অপরপক্ষে ভারতবর্ষের সেই বিস্মৃতপ্রায় সত্যটির—সহানুভূতির ও প্রেমের—বিশ্ব-মৈত্রীর ও ভালবাসার সেই পুরাতন আদর্শের, বিশেষ বিকাশ হইয়াছে আমাদের রবীন্দ্রনাথে। ভারতমাতার মন্দিরে হোম-ভস্মের মধ্যে যে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত ছিল, তিনিই আজ তাহাকে ভাল করিয়া জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রাণে বাজিয়াছে; তাই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে সংগ্রামের ও বিরোধের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও সংঘর্ষের কোলাহল উঠিতেছে, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া, সেই সকল সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যেই যে প্রেম ও মৈত্রীর মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ আপনার বীণা সেই সুরেই বাঁধিয়াছেন। কিপলিংএর গান শুনিয়াছেন; এইবার রবীন্দ্র-নাথ কি গাহিতেছেন শুনুন—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে;
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে
নমি নর দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।

রণ-ধারা বাহি, জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে,
ভেদি মরুপথ, গিরিপর্ব্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।

* * * *

এসহে আর্য্য, এস অনার্য্য হিন্দু মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ এস এস খৃষ্টান,
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত কর অপনীত
সব অপমান ভার।"

কোন্ সাহসে কবি এই গান গাহিতেছেন?

"তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই!
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

যাঁহাকে জানিলে সকলকেই জানা হয়—সকলকেই আপনার বোধ হয়, ভারতীয় সাধনার পুণ্যফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাই এই গান গাহিতে পারিয়াছেন। এ গান শুধু ভারতের গান নহে; এ জগতের গান—বিশ্বমানবের গান।

সংগ্রাম ও সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় হইলেও সৃষ্টির একমাত্র নিয়ম নহে। মৈত্রী ও প্রেমই সৃষ্টি-চক্রের উচ্চতর নীতি। প্রবলের জয়, "যোগ্যতমের উদ্বর্তনে" স্বার্থের পরিপুষ্টি হইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি প্রেম অসহায়ের প্রতি প্রীতিতেই মানবত্বের পরিতৃপ্তি হয়। তাই সংগ্রাম ও সংঘর্ষে—স্বার্থের প্রতিযোগিতাতে মানব-সমাজ কখন তৃপ্ত হইতে পারে না। তাহাতে সুরাপানের উত্তেজনা আনিতে পারে, অস্বাভাবিক উন্মাদনার উৎসাহ জন্মাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ে শান্তি দিতে পারে না। সুরা-পানান্তে অবসাদের ন্যায় কালে এমন একটা অবসাদ উপস্থিত হয় যে সেই সব আর ভাল লাগে না। তখন প্রাণ মহত্তর, উন্নততর, পবিত্রতর কিছু চায়। ইউরোপের আজ প্রায় সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপ তাহার সভ্যতার কর্কশ কোলাহল, জীবন-সংগ্রামের ভীষণ সঙ্গীত, বিলাস-লালসার সেই তীব্র হলাহল আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। তাহার অন্তরের অন্তরতল প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর, ত্যাগ ও আনন্দের গান শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ আজ সেই গান লইয়া ইউরোপের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। এই জন্যই বুঝি বিধাতা তাঁহাকে স্বাজাত্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বমানবের রাজ্যের মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন; বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই রবীন্দ্রনাথকে দিয়া বীণার তারে নূতন সুরে বাঁধাইয়াছেন। পরিশ্রান্ত ইউরোপ তাঁহার গান বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে। যেটা সে চায়, তাঁহার মধ্যে সেইটারই যেন সে আভাস পাইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া পাশ্চাত্যের এত আনন্দ—রবীন্দ্রনাথের সেখানে এত সম্বর্দ্ধনা।

বিশ্বরাজ্যে কিছুই নষ্ট হয় না—কিছুরই অপব্যয় নাই। একদিন যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার যুগে যে সকল মহাসত্য প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত প্রায়, বিস্মৃতপ্রায় হইলেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিধাতা তাহাকে গড়িয়া উঠিতে দিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সাধন সে করিবেই। মানব-সভ্যতার তাহার নূতন দান যাহা দিবার আছে, তাহা না দিয়া তাহার ফিরিবার উপায় নাই। সেই নূতন দান—সংগ্রামের স্থানে প্রেম, প্রতিযোগিতার স্থানে সহানুভূতি, ভোগ ও বিলাসের স্থানে ত্যাগ ও বৈরাগ্য, জাতি-সংঘর্ষের স্থানে বিশ্বমৈত্রী। ভারতের রবীন্দ্র-নাথ আজ পাশ্চাত্য মানব-সভায় সেই গানই শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব, ইহাতেই ভারতের গৌরব। আর ইহার জন্য শুধু ভারত-বাসী কেন সমগ্র মানব-সমাজের তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(ভাদ্রের বঙ্গদর্শনের ৩৬৪ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

আযৌবন ব্রাহ্ম-সমাজে থাকিয়া, আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, আমার পূর্ব্বকার তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্ম সাধনকে ভ্রান্তিবোধে পরিত্যাগ করিতেছি, এমন নহে। আমি যদি খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান্ হইতাম, তাহা হইলে, আমার খৃষ্টীয়ানী বা মুসলমানী বিশ্বাসকে পরিত্যাগ না করিয়া, কোনও মতেই বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বা বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিতে পারিতাম না। কারণ খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্ম্মের সঙ্গে কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মের নহে, কিন্তু জগতের অপর সকল ধর্ম্মেরই একটা আত্যন্তিক বিরোধ আছে। বাইবেলের অতিরিক্ত কোনও সত্য শাস্ত্র আছে, কিম্বা খৃষ্টীয়পন্থা ব্যতীত জীবের মুক্তির আর কোনও পন্থা আছে, খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম ইহা স্বীকার করে না। মুসলমান্ ধর্ম্ম ও কোরাণ শরীফ এবং হজরত মোহম্মদকে জগতের এক মাত্র তত্ত্বগ্রন্থ ও আখেরী নবী বা প্রবক্তা বলিয়া মনে করে, এগুলিকে ছাড়িয়া এখন আর কেহ সত্যলাভ বা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যিশুখৃষ্ট ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বা পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলে, খৃষ্টীয়ানের ধর্ম্মহানি হয়। কোরাণ ও হজরতের সিদ্ধান্তের বা সাধনের বাহিরে কোনও সিদ্ধান্ত বা সাধন অবলম্বন করিলে, মুসলমান্ কাফের হইয়া যান। খৃষ্টীয়ানের চক্ষে বাইবেল ও যিশুখৃষ্ট, মুসলমানের চক্ষে কোরাণ শরীফ এবং হজরত মোহম্মদ—এ জগতে সত্যের এক মাত্র প্রামাণ্য ও মুক্তির অনন্য পন্থা। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এরূপ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র বা অতিমানুষ অবতার কি পয়গম্বর নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবের সহজ জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মগণ কোনও ঐশ্বরিক শাস্ত্র মানেন না, কোনও ঐশ্বরিক অবতারে বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধন সকলই একমাত্র স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর এই স্বানুভূতি সকলের সমান নয়। এই স্বানুভূতি সত্যের একদিক্ মাত্র দেখে, একাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। স্বানুভূতিগ্রাহ্য সত্যের বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সর্ব্বদাই অসত্য ও ভ্রান্তি মিশিয়া থাকিবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই ব্রাহ্মগণ কোনও শাস্ত্র বা গুরুকে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আর ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে সর্ব্বপ্রকারের প্রামাণ্যমর্য্যাদাচ্যুত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ, ব্যষ্টিভাবে বা সমষ্টিভাবে আপনাদের স্বাভিমতকে কখনই অভ্রান্ত সত্য ও আখেরী পন্থা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। ব্রাহ্মগণ আজ সত্যের ও সাধনের যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন, তার বাহিরে বা

উপরে আর সত্য বা সাধন নাই, এ কথা বলিলে ব্রাহ্মসমাজের মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ এ কথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন; তাঁদের ধর্ম্ম শুদ্ধ-স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠ নহে। এই জন্য খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্বের একটা স্বাভাবিক ও আত্যন্তিক বিরোধ আছে; ব্রহ্মসিদ্ধান্তের বা ব্রাহ্মসাধনের সঙ্গে সেরূপ কোনও বিরোধ নাই। খৃষ্টীয়ান্ খৃষ্টীয়সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ না করিয়া, কদাপি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। মুসলমানও স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতে পারেন না। কিন্তু ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকে তাহা পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মের ধর্ম্মহানি হয় না। ব্রাহ্ম-সমাজের জনসাধারণে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে আপনাদের দলের বাহির করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া, গোস্বামী মহাশয় আপনি কোনও দিন আপনার সিদ্ধান্ত বা সাধনকে ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত ও সাধনের বিরোধী বা বহির্ভূত মনে করেন নাই।

অতএব শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকেই পরমতত্ত্ব মনে করিতেছি বলিয়া আমি যে আজ আমার পূর্ব্বকার সিদ্ধান্ত বা সাধনকে ভুল বলিয়া পরিহার করিতেছি, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। সেগুলিকে একটু ছাড়াইয়া উঠিতেছি, ইহা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনও পুরাতন অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া, আর অসত্য বলিয়া কোনও সাধন সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করা, এক কথা নহে। একদিন শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতাম না। দেশ-প্রচলিত কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত গতানুগতিক বৈষ্ণবধর্ম্মে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। এই কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-বস্তুই যে তত্ত্ববস্তু, এখনও ইহা বুঝি নাই। দুনিয়ায় খৃষ্টীয়ান্ অসংখ্য, কিন্তু খৃষ্টতত্ত্বের সন্ধান কয়জনেই বা পাইয়াছে? সেইরূপ এদেশে কৃষ্ণপন্থীও অসংখ্য, কিন্তু ইঁহাদের কয়জনেই বা তত্ত্বরূপে যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবস্তু সে কথা বোঝেন বা বুঝিতে চান,—সে জিজ্ঞাসারই উদয় হইয়াছে কৈ? জগতের কোথাও গতানুগতিক পন্থায় অনুসরণ করিয়া কেহ তত্ত্ববস্তু লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত, মুমুক্ষু সাধকই কেবল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভে অধিকারী হন। এরূপ সাধক সকল সম্প্রদায়েই—লাখে না মিলয়ে এক। সুতরাং গতানুগতিক বৈষ্ণবসমাজে প্রাকৃতজনে যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন, এবং আজিও করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকৃত তত্ত্ববস্তুরূপে প্রকাশিত হন নাই ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই কিম্বদন্তি-মাত্র-প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া আসা, আর শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে বর্জ্জন করাও, এক কথা নহে। যাহাকে জানি নাই, যাহাকে পরখ করিয়া দেখি নাই, দেখিবার প্রেরণা বা অবসরও পাই নাই, তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। সুতরাং যে কৃষ্ণতত্ত্বকে বা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকে অসত্য ও ভ্রান্ত বলিয়া বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহাকেই আবার সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, এমন বলা যায় না। তবে প্রথম যৌবনে যে ব্রহ্মসিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়াছিলাম, ক্রমে ক্রমে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতেছি, এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত

নাই। কিন্তু সে সিদ্ধান্তের কোনও বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি এমনটা মনে করি না। আমি আজ যাহা বিশ্বাস করিতেছি, ব্রাহ্ম-সমাজের অনেক লোকে তাহা বিশ্বাস করেন না, ইহা জানি। কিন্তু আর দশজনে কোনও মত বা সিদ্ধান্তকে সত্য মনে করে বলিয়া, তাহাদের কথায় আমি কোনও দিনই তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। লোকমতের মুখা-পেক্ষী হইয়া, প্রচলিত সংস্কারের আনুগত্য স্বীকার করিবার শক্তি বিধাতা আমায় দেন নাই। সে সাধন আমার নাই। এ শক্তি ও এ সাধন থাকিলে, পিতৃদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হইয়া, প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, সারাজীবন স্রোতের শেয়ালার মতন ভাসিয়া বেড়াইতাম না। যৌবনাবধি আপনার স্বাভি-মতের উপরে নির্ভর করিয়াই নিজের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার স্বাভিমত যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তখনকার ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মতামত ও মতিগতির সঙ্গে তার ঐক্য দেখিয়াই, ব্রাহ্ম-সমাজে আসি; দেবেন্দ্রনাথ বা কেশবচন্দ্র, শিবনাথ বা অপর কাহারো আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের মুখ চাহিয়া, পিতৃদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হই নাই। যে স্বানুভূতির স্বাধীনতার খাতিরে পিতার কথা মানি নাই, স্বজনগণের অনুরোধ শুনি নাই, ব্রাহ্মসমাজের নানাদিগ্‌দেশাগত সত্যঃপরিচিত সভ্য-গণের বা আচার্য্যগণের অনুমত বা অনুগত হইয়া চলিবার সুবুদ্ধি সাধন করিয়া, সে স্বানুভূতিকে বিসর্জ্জন দিতে কোনও দিনই পারি নাই। এই জন্য আমার ব্রাহ্মমতটা চিরদিনই আমার নিজস্ব বস্তু ছিল, আজিও তাহা আমারই নিজের অন্তরঙ্গ বস্তু হইয়া আছে।

আর ইহাই তো খাঁটি স্বানুভূতির পথ। ব্রাহ্মধর্ম্মে আগম-নিগমের প্রতিষ্ঠা নাই, শাস্ত্র-গুরুর প্রামাণ্য নাই; আছে কেবল এক আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি। কেবলমাত্র স্বানু-ভূতির উপরে সত্যের প্রামাণ্য বা সাধনের নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রের উপরেও এই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর শুদ্ধ-শাস্ত্রমাত্র-প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠা বালির বাঁধের মতন, অতিশয় দুর্ব্বল; সামান্য সন্দেহের বাত্যামুখে উড়িয়া ঝুড়িয়া যায়। ইহাতেও প্রকৃত ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠে না। হদ্দমুদ্দ এই কোমল শ্রদ্ধাতে লোককে আচারবান্ করিতে পারে মাত্র, কিন্তু সাধক করিতে পারে না। শাস্ত্র যখন তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশের দ্বারা সার্থক হইয়া, স্বানুভূতির দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনই তাহা প্রামাণ্য-মর্য্যাদা লাভ করে। এই জন্যই শাস্ত্র, গুরু ও স্বানুভূতি—এই তিনের একবাক্যতাকেই সত্যের প্রকৃত প্রামাণ্য বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত এই প্রামাণ্যের উপরে আপনার ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। রাজা রাম-মোহন এ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রকৃতপক্ষে কেবল স্বানুভূতির উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত আমিও কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছিলাম—এখনও সে আশ্রয় পরিত্যাগ করি নাই। ব্যক্তিমতের হাত ধরিয়া বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধানেই প্রথমে ব্রাহ্ম-

সমাজে আসিয়াছিলাম। কোনও দিনই ব্রাহ্ম-সমাজের লোকমতকে সেই সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করি নাই। দেবেন্দ্রনাথের মতকে সংকীর্ণ ও কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও সাক্ষ্যকে কল্পিত বলিয়া ছাড়িয়া আসিয়া, বিদ্যা-বয়স-সাধন-ও-চরিত্র-গত উৎকর্ষাপকর্ষ-নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্যের মতামতকে সত্যের প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করাতে, আর কারো ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা পাইতে যদি পারে, পারুক: আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা পায় বলিয়া বিশ্বাস করি না। প্রথম যৌবনে স্বানুভূতির খাতিরে সনাতন শ্রুতি ও প্রাচীন স্মৃতির প্রামাণ্যকে বর্জ্জন করিয়াছিলাম। আজ শ্রুতি ও স্বানুভূতি উভয়কে ভাসাইয়া দিয়া, পঞ্চাশ ষাট-বৎসরের স্মৃতিকে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রামাণ্য-রূপে গ্রহণ করিতে পারি না। যাঁরা এ পথে, এই ভাবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের শুদ্ধতা রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদেরই হাতে রাম-মোহন-প্রবর্ত্তিত সমাজের অপঘাতমৃত্যু ঘটিতেছে। এ মরণকে যে আলিঙ্গন করিতে চাহে না, সেই যে ব্রাহ্মসিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিতেছে, এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। যেখানে জীবন, সেইখানেই গতি ও বৃদ্ধি। যেখানে বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি, সেইখানেই পরি-বর্ত্তন। সুতরাং পরিবর্ত্তনকে ভয় করিলে, মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে হয়, অমৃতের পথে চলা যায় না। স্বাভিমতের হাত ধরিয়া, স্বাধীনতার ও সত্যের সন্ধানে, প্রথমযৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম। ক্রমে শুদ্ধ স্বানু-ভূতির উপরে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না দেখিয়া, সদ্গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া, তাঁরই কৃপায়, ধীরে ধীরে সার্থক শাস্ত্রেরও আশ্রয়লাভ করিতেছি। একদিন ভাবিয়াছিলাম কেবল আমি যাহাকে সত্য ভাবি, তাহাই বুঝি সত্য। এখন দেখিতেছি, আমার স্বাভিমত সত্যের একদিক্ মাত্র প্রকাশিত করে। আমার স্বাভিমতের সত্যাসত্যের কষ্টিপাথর বিশ্বজনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতারই নামা-ন্তর শাস্ত্র। আর এই শাস্ত্রেরও সত্যাসত্যের কষ্টিপাথর আছে। সে কষ্টিপাথর সাধনা-ভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তত্ত্বদর্শী সদ্গুরু। এই তিনের কেহই স্বতন্ত্র ও স্বপর্য্যাপ্ত নহেন। শাস্ত্র গুরুবাক্যকে সপ্রমাণ করে। গুরু শাস্ত্র-বাক্যকে সার্থক করেন। আর স্বাভিমত শাস্ত্র ও গুরু উভয়কে সপ্রমাণ করে। গুরু গ্রহণ করিয়া স্বাভিমতকে বর্জ্জন করি নাই, তাহাকে সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। শাস্ত্রকে মর্য্যাদা দিয়া গুরু এবং স্বানুভূতির প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করি নাই, বরং দৃঢ় করিয়াছি। যে পথ ধরিয়া প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া-ছিলাম, সেই পথেই গুরু পাইয়াছি, শাস্ত্র পাইতেছি। কুলগুরু ছাড়িয়া সদ্গুরু পাইয়াছি। কুশাস্ত্র ছাড়িয়া সুশাস্ত্র পাইয়াছি। মানস-কল্পনাকে ছাড়িয়া বিশুদ্ধ স্বানুভূতির সন্ধান পাইতেছি। কিম্বদন্তিপ্রতিষ্ঠিত, প্রাণহীন কৃষ্ণোপাসনা ছাড়িয়া, গুরুকৃপায়, অতি অকিঞ্চন এবং অকৃতি হইয়াও, ধীরে ধীরে পরমতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্বের আভাস পাইতেছি। জীবন মাত্রেই গতিশীল। গতিমাত্রেই পরি-বর্ত্তন আনে। বাঁচিয়া থাকিলেই চলিতে হয়। চলিতে গেলেই ঘাটীর পর ঘাটী পার হইয়া যাইতে হয়। নিতান্ত জড়ত্ব প্রাপ্তি না হইলে, জীবনের প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তন-স্রোতের বাহিরে পড়িয়া থাকা সম্ভব হয় না। জীবনে কত

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আরো কত পরিবর্ত্তন ঘটিবে। জন্মে জন্মে কতভাবে এমনি করিয়া বিবর্ত্তিত হইয়া ফুটিয়া উঠিব। ইহাতে ভয় করি না। ইহাতে লজ্জার বা দুঃখের কথাও কিছুই নাই। তবে যেন খেই হারাইয়া না যাই, কেবল একটুমাত্র চাই।

আর, এক সময়ে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করিতাম, আজ কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধানে ফিরিতেছি বলিয়া যে খেই হারাইয়াছি এমনও বলা যায় না। কি করিয়া এই নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই, তাহারও একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের মূলসূত্রটী ধরিয়া বিচার করিলেই, ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে যে এই কৃষ্ণতত্ত্বের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। দেশ-প্রচলিত পূজা-পদ্ধতিতে বহুবিধ সাকার দেবমূর্ত্তির বহুল প্রতিষ্ঠা দেখিয়াই, আমাদের বিচারবুদ্ধি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, মানুষ আপনার হাতে তাঁহার কোনও প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এই সাকারোপাসনার বিরুদ্ধেই নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা হয়। তত্ত্ববস্তুর সন্ধানে যাইয়া, ব্রাহ্মসাধারণে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন নাই; সাকারোপাসনার প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই, ইহাকে অবলম্বন করেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের মূল নিরাকারবাদ, প্রকৃতপক্ষে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। দেশপ্রচলিত উপাসনার দেবমূর্ত্তি সকল ঈশ্বর-মূর্ত্তি নহে, কেবল ইষ্ট-মূর্ত্তি মাত্র, এ কথাটা আমরা তখন বুঝি নাই। এখনও অনেকে ইহা জানেন না। ঈশ্বর-তত্ত্ব যে নিরাকার তত্ত্ব, জগতের স্রষ্টা পাতা যিনি, তাঁর যে কোনও হাত পা নাই, হিন্দু এ কথা চিরদিনই জানেন ও বুঝেন। তিনি কখনও ঈশ্বরমূর্ত্তি রচনা করেন নাই। যে মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া হিন্দু পূজা অর্চ্চনাদি করেন, তাহা তাঁর ইষ্ট মূর্ত্তি মাত্র, বিশ্বনিয়ন্তার প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিচ্ছবি নহে। রোমান্ ক্যাথলিক্ খৃষ্টীয়ানের যিশুমূর্ত্তি বাস্তবিকই ঈশ্বরমূর্ত্তিজ্ঞানে পূজিত হন। এইজন্য এই সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ানেরা নিজেরা মূর্ত্তিপূজা করিয়াও, অপর সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিপূজাতে ঈশ্বরের অবমাননা হয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসকেরা ঈশ্বরের অবমাননা করেন, হিন্দু শিবোপাসক কদাপি এরূপ বলেন না। তাঁরা নিজেরাই শিবলিঙ্গের পূজা করেন, কিন্তু তাই বলিয়া যাঁরা অন্য মূর্ত্তির ভজনা করেন, তাঁরা অধর্ম্ম করিতেছেন এমন কখনও ভাবেন না। হিন্দুর উপাসনার বিভিন্ন মূর্ত্তিসকল, ঈশ্বরমূর্ত্তি নহে; ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অন্তরে প্রকাশিত, তাঁর বিশিষ্ট সাধনার সিদ্ধমূর্ত্তি মাত্র। এ সকল ইষ্টমূর্ত্তি মূলে ও আদিতে সাধকবিশেষের সমাধির অবস্থায় তাঁহাদের অপরোক্ষানুভূতিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মূর্ত্তি অতিন্দ্রীয়, চিন্ময়, তার বাহিরে কোনও রূপ-রসাদি থাকে না। সাধক এই অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে, সাধনসৌকর্য্যার্থে, আপনার মানসপটে ধরিয়া রাখিবার জন্য, প্রথমে তার অনুরূপ শব্দাত্মিকা ধ্যানমূর্ত্তি রচনা করেন, এবং ক্রমে তাহাকে আপনার সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিবার জন্য, সাকার দেবমূর্ত্তিরূপে তোলেন। ইহাই আমাদের দেশের

প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার ভিতরকার কথা। ইহারই মর্ম—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।" এই "রূপ" একজন আর একজনের জন্য গড়িয়া দিতে পারে না। সাধকেরা নিজে আপনাদের সাধনসৌকর্য্যার্থে আপন আপন ইষ্টদেবতার এ সকল মানস-মূর্ত্তি রচনা করেন। এ সকল ঈশ্বরমূর্ত্তি নহে—ইষ্টমূর্ত্তি মাত্র। কিন্তু গতানুগতিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া যাঁরা এই সকল মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাঁরা এ তত্ত্ব জানেন না। আমরাও ইহা জানিতাম না। এই জন্যই এই সকল বাহ্য-পূজার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, এই সাকারোপাসনার প্রতিকূলে নিরাকারোপাসনা প্রবর্ত্তিত করি। অর্থাৎ দেশপ্রচলিত সাকা-রোপাসনার বিরুদ্ধে আমরা একটা নিরাকার-বাদেরই প্রতিষ্ঠা করি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কোনও নিরাকারতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করি নাই।

ফলতঃ শঙ্করবেদান্ত-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতত্ত্বই একমাত্র সত্য নিরাকার তত্ত্ব। সে তত্ত্ব নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ। কেবলমাত্র ব্রহ্মা-ত্মৈকত্বানুভূতির দ্বারা সে নিরাকার তত্ত্বকে ধরিতে পারা যায়। কোষপঞ্চক যতক্ষণ না ভেদ হইয়াছে, ততক্ষণ এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এই জন্য ব্রহ্মের স্বরূপো-পাসনাকেই শঙ্করসিদ্ধান্ত একমাত্র সত্য উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল ইন্দ্রিয়-চেষ্টা একান্ত নিরস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, এ উপাসনা সম্ভব হয় না। সমাধির অবস্থা লাভ করিলে পরেই কেবল সাধক স্বরূপো-পাসনার অধিকারী হন। এ অবস্থা অতি দুর্লভ। যতদিন না এ অবস্থালাভ হইয়াছে, ততদিন জীব নিম্ন অধিকারের সাধন ভজন করিবে। নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে শঙ্করসিদ্ধান্ত প্রতীকোপাসনার এবং মধ্যম অধিকারীর জন্য সম্পদুপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতীকোপাসনাকে অধ্যাস-জনিত উপাসনা বলে। 'অন্যত্র দৃষ্ট পরত্রাব-ভাসঃ—'কে অধ্যাস বলে। অন্য দেশে ও অন্যকালে যে বস্তু-বিশেষ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, যে দেশে ও যে সময়ে সেই বস্তু উপস্থিত নাই, সেখানে ও সেকালে অন্য বস্তুতে তার আরোপ করার নাম অধ্যাস। একদিন বনে সর্প দেখা গিয়াছিল। গৃহপ্রাঙ্গণে যে রজ্জু পড়িয়া আছে, তাহাতে সেই সর্পের জ্ঞান আরোপ করিয়া, এই রজ্জুকে সেই সর্প মনে করার নাম অধ্যাস। অন্তরে কোনও দিন ইষ্টদেবতার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে যে কাষ্ঠলোষ্ট্রে তাহা বস্তুতঃ নাই, তাহাতে আরোপ করাই এই প্রতীকোপা-সনার লক্ষণ। শঙ্করবেদান্ত মতে দেশ-প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা এই প্রতীকোপাসনারই অন্তর্গত। নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে ইহাই বিহিত। মধ্যমাধিকারীর পক্ষে বেদান্ত সম্পদুপাসনার বিধান দিয়াছেন। সম্পদুপাসনা সম্পদ-জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। দুই বস্তুর মধ্যে কোনও সামান্য ধর্ম্ম দেখিয়া, ক্ষুদ্রতর ও আয়ত্তাধীন বস্তুর সাহায্যে বৃহত্তর ও অনায়ত্ত বস্তুর যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকেই সম্পদ্‌জ্ঞান কহে। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতন গোল —এই ভৌগোলিক জ্ঞানকে সম্পদ্‌জ্ঞান বলা যাইতে পারে। যেমন পৃথিবীর ও কমলালেবুর মধ্যে একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুরও একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ—আর কিছুর দ্বারা সূর্য্যকে

দেখা যায় না। আর সূর্য্য জগৎপ্রকাশক— আপনি প্রকাশিত হইতে যাইয়াই জগৎকে প্রকাশিত করেন, জগৎকে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই আপনিও প্রকাশিত হয়েন। স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব সূর্য্যের ধর্ম্ম। ইহা ব্রহ্মেরও ধর্ম্ম। চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মও স্বপ্রকাশ ও জগৎপ্রকাশক। সুতরাং সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মের এই সামান্যধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, প্রত্যক্ষ সূর্য্য গ্রহের ধ্যানযোগে ব্রহ্মোপাসনা করা সম্পদুপাসনা। মধ্যম অধিকারীর জন্য বেদান্ত এই জাতীয় উপাসনারই বিধান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকে স্বরূপ-উপাসনা বলা যায় না। স্বরূপ-উপাসনায় সকল ইন্দ্রিয়-চেষ্টা একান্তভাবে নিরস্ত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় তাহা হয় না। বাক্য এই উপাসনার বাহন। উপমান ও অনুমান এই উপাসনার প্রাণ। উপমান ও অনুমান সম্পদ্-জ্ঞানেরই আশ্রয়, স্বরূপজ্ঞানের ভিত্তি নহে। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত উপাসনাকে সম্পদুপাসনাই বলা যায়। এই উপাসনায় ইষ্টদেবতার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রচিত হয় না বটে, কিন্তু বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বদাই রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব অবাঙ্মনসোগোচর। সে তত্ত্বকে বাক্যমনের গোচরীভূত করিতে গেলেই আর তার নিরাকারত্ব থাকে না। ব্রাহ্মসমাজের বাঙ্ময়ী উপাসনা ও নিরাকার ব্রহ্মেতে মানসধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে অধ্যাসও আছে। এ-ও সত্য-উপাসনা নহে। প্রচলিত তথাকথিত সাকারোপাসনার আশ্রয় ইষ্টদেবতার চক্ষুগ্রাহ্যরূপ; প্রচলিত তথাকথিত নিরাকারোপাসনার উপজীব্য রূপ নহে, কিন্তু রূপক। রূপ আর রূপকে দুয়ে পার্থক্য, হিন্দুসমাজের মূর্ত্তিপূজাতে আর ব্রাহ্মসমাজের মামুলী নিরাকার উপাসনায় সেই পার্থক্য মাত্র রহিয়াছে। মূলে দু'এর মধ্যেই অধ্যাস অর্থাৎ যাহা উপস্থিত নাই, তার আরোপ আছে।

প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব আর নির্গুণতত্ত্ব একই কথা। যাহা নিরাকার, তাহাই নির্গুণ, তাহাই নির্ব্বিশেষ। ভেদপ্রতিষ্ঠা করাই, আকারের মুখ্য ধর্ম্ম। আকাশবস্তু ত নিরাকার। কিন্তু যখনই এই আকাশ ভিন্ন ভিন্ন আধারে আবদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করে, তখনই তাহা ঘটাকাশ, পটাকাশরূপে সাকার হইয়া পড়ে। এইরূপ ব্রহ্মবস্তু যখনই জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন, তখনই বিশিষ্ট হইয়া, নিরাকারধর্ম্ম হারাইয়া ফেলেন। ব্রহ্ম যদি আমা হইতে একান্ত ভিন্ন হন, তাহা হইলে, আমার আমিত্বের সীমাই তাহাকে সীমাবদ্ধ ও সাকার করিয়া তোলে। কোনও বিশিষ্ট গুণ আরোপ করিলেও অপর বিরুদ্ধগুণ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া, সেই সকল বিরুদ্ধগুণের দ্বারাই তিনি পরিচ্ছিন্ন ও সাকার হইয়া পড়েন। এই জন্যই, এ সকল অসঙ্গতি নিরাকৃত করিতে যাইয়া, বেদান্ত ব্রহ্মবস্তুর নিরাকারত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নির্গুণত্ব, নির্বিশেষত্ব এবং অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শঙ্করসিদ্ধান্তের এই অদ্বৈততত্ত্বই একমাত্র সাচ্চা নিরাকারতত্ত্ব। অপর যাবতীয় নিরাকারবাদ আছে, তাহা সত্য নয়, সত্যাভাস মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদও তাহাই। বিশুদ্ধ নিরাকারতত্ত্বের অনুশীলন করিলে ব্রাহ্মসাধককে পরিণামে শঙ্করবেদান্তের শুদ্ধা-

ষ্ণব সিদ্ধান্তে যাইয়া পৌঁছিতে হয়। আর আপনার সম্প্রদায়ের এই নিরাকারতত্ত্বের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়া, ভক্তি-পন্থার অনুসরণ করিলে, তাঁহাকে পরিণামে বৈষ্ণববেদান্তের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে যাইয়া সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া ব্রাহ্ম সাধকের সম্মুখে আর তৃতীয় গতি নাই। ব্রাহ্মসমাজের মূল সিদ্ধান্ত ও সাধনার সঙ্গে একদিকে শঙ্করসিদ্ধান্তের অন্য দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের উভয়েরই কোনও ঐকান্তিক বিরোধ বা প্রকৃত অসঙ্গতি নাই। জ্ঞানপ্রধান ব্রাহ্ম সাধককে শঙ্কর-বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। ভাবপ্রধান ও ভক্তিপ্রবণ ব্রাহ্ম সাধককে সেইরূপ বৈষ্ণব-বেদান্তের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। আযৌবন যে ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের ও ব্রাহ্মসাধনের অনুসরণ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে প্রকৃত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধনার কোনও ঐকান্তিক বিরোধ আছে বলিয়া বুঝি না। বরং ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া, লোকমতের মুখাপেক্ষী না হইয়া, যে ব্রাহ্মই আপনার সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসাধন করিবেন, তাঁহাকেই ইহ জনমে না হউক আর জনমে, কৃষ্ণতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাইয়া, কৃষ্ণভজনা করিতেই হইবে, এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে যতটুকু খাঁটি সত্য আছে, তার সঙ্গে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই ও থাকিতেই পারে না।

ফলতঃ এ জগতে সত্যে সত্যে কোথাও কোনও বিরোধ নাই। কখনও কোনও বিরোধ সম্ভবে না। যাহা আছে তাহাই সত্য, এ সত্যের দুই পথ, এক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, আর এক অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষানুভূতি। এ ছাড়া সত্যলাভের আর তৃতীয় পন্থা নাই। ব্যবহারিক সত্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের, আর পারমার্থিক সত্য আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দুই জাতীয় সত্যই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। আমাদের এই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাধীনে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু কদাপি অসত্য হইতে পারে না। অসত্যটা সর্ব্বত্রই কল্পনার সৃষ্টি; যেখানে যে বস্তু বা যে ভাব নাই, কেবল কল্পনাই সেখানে তাহার আরোপ করিয়া অসত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই কল্পনা আমাদের মনোবৃত্তিকে নিয়তই আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই জন্যই আমরা যাহা দেখি, সর্ব্বদাই তার চাইতে ঢের বেশী ভাবিয়া লই। যতটুকু সত্য বা বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বা আত্মসাক্ষাৎ-কারের বিষয়ীভূত হয়; আমরা সর্ব্বদাই আমাদের এই কল্পনাবলে তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া আপন আপন মনগড়া সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। আর আমাদের এইরূপ মনগড়া সিদ্ধান্ত সকলই দুনিয়ায় যত গোল বাধাইয়া তোলে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের "অন্ধের হস্তি-দর্শন ন্যায়''—এই কথাটাকেই অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। হাতী জন্তুটা কেমন, এই কথাটা জানিবার জন্য অন্ধেরা হাতীর নিকট যাইয়া প্রত্যেকে তার একটা একটা অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া আসিল। একজন হাতীর কান ধরিয়া আসিল, আর একজন তার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া আসিল, আর একজন তার পায়ে ধরিয়া আসিল। হাতীর

কানটা যে কুলার মতন, শুঁড়টা যে অজগর সাপের মতন, পা' টা যে থামের মতন, ইহা মিথ্যা নয়। কিন্তু কান, শুঁড়, পা তো আর গোটা হাতী নয়। অন্ধেরা সে গোটা হাতীকে তো জানিতেও পারে নাই। তারা তার কেবল একটা একটা অঙ্গের জ্ঞানই লাভ করিয়াছিল; অথচ আপন আপন কল্পনা-বলে সেই অঙ্গকেই অঙ্গী ভাবিয়া লইয়া পরস্পরের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা বাধাইয়া দিল। যতটুকু ইহারা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। 'কিন্তু যতটুকু কল্পনা করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহারা যদি কেবল আপন আপন প্রত্যক্ষ সত্যটুকুরই প্রতিষ্ঠা করিতে যাইত, কোনও গোলই বাধিত না। হাতীর কানটা কুলার মতন বলিয়া তার শুঁড়টা যে অজগরের মতন বা তার পা'টা যে থামের মতন নয় বা হইতে পারে না, —এমন কোনও কথা নাই। ইহারা যতটুকু নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তার মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না; বিরোধ বাধিয়া উঠিল, তাদের কল্পিত মনগড়া হাতীগুলোকে লইয়া। আপন আপন কল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই ইহারা পরস্পরের সঙ্গে এই মারামারিটা বাধাইয়াছিল।

মানুষ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসাধন লইয়া এ জগতে যে মারামারি কাটাকাটি করে, তাহাও এই অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায়েরই মতন। ধর্ম্মবস্তু বিরাট, ভূমা অনন্ত। এ বস্তু সার্ব্বভৌমিক, বহুমুখী। বহুভাগ্যবলে মানুষ এই বিরাট তত্ত্বের কণামাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ কণামাত্র ধর্ম্মকেই সে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া অপর সকলের উপরে জাহির করিতে যায়। ইহাতেই যত গোল বাধে। আর বস্তু-বিশেষের অংশ বা অঙ্গ মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অংশ বা অঙ্গকেই সম্পূর্ণ অংশী বা অঙ্গিরূপে গ্রহণ করা মানস-কল্পনারই ধর্ম্ম। ধর্ম্মজগতে এই সকল মনগড়া সিদ্ধান্ত ও মানস-কল্পনা লইয়াই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে এত বাক্‌বিতণ্ডা ও মারামারি কাটাকাটি করিয়া থাকে। ফলতঃ কি ব্যবহারিক জগতে কি পারমার্থিক রাজ্যে কোথাও প্রকৃত সত্যে সত্যে কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই—থাকিতেই পারে না।

অতএব আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্তে যতটুকু খাঁটি সত্য আছে, অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তের যেটুকু ব্রাহ্মগণের নিজেদের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধন-অভিজ্ঞতা হইতে জন্মিয়াছে,—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের খাঁটি সত্যের ও বৈষ্ণব-সাধনার প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা[illegible] ভেদ থাকা সম্ভব, বিরোধ হওয়া অসাধ্য কিন্তু ভেদ আর বিরোধ যে একই কথা নয় এ কথাটাও আমরা সকল সময় মনে করি[illegible] রাখি না।

ব্রাহ্মসমাজের মতের কতকগুলি ভাবাত্ম[illegible] আর কতকগুলি অভাবাত্মক। ব্রহ্মতত্ত্ব[illegible] ধর্ম্মসাধনের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিত লক্ষ[illegible] আছে; আর কতকগুলি লক্ষণ, অপরা[illegible] ধর্ম্মের সিদ্ধান্তে ও সাধনে যার উল্লেখ দেখি[illegible] পাওয়া যায়, তাহা নাই ও থাকিতে পা[illegible] না;—ব্রাহ্মগণ ইহাই বিশ্বাস করে[illegible] পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলিকে ভাবাত্মক বা "হাঁ[illegible] বাচক বলা যাইতে পারে; শেষোক্ত লক্ষ[illegible] গুলি অভাবাত্মক বা "না"-বাচক। ব্রা[illegible] সিদ্ধান্তের "হাঁ" বাচক কথাগুলি এই :—

(১) ঈশ্বর আছেন। এই ঈশ্বর [illegible]

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্ম; তিনি অমৃতনিকেতন, শান্তস্বভাব, মঙ্গলসংকল্প, নিষ্কাম, অপাপবিদ্ধ, এবং একমেবাদ্বিতীয়।

(২) এই ঈশ্বর জীবের অন্তরে বাস করেন; তিনি অন্তর্য্যামী পুরুষ এবং জীবের নিত্য-উপাস্য।

(৩) মৃত্যুতে মানুষের দেহই নষ্ট হয়, কিন্তু তার আত্মবস্তু অবিনশ্বর ও অমর।

(৪) এই ঈশ্বরতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব উভয় তত্ত্বই মানবের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ অর্থাৎ তাহার সহজজ্ঞান বা ইনটুইষণের দ্বারাই মানুষ এ সকল তত্ত্বকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারে।

এই গুলিই ব্রাহ্মসমাজের ভাবাত্মক বা হাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মসাধক ও আচার্য্যগণ এগুলিকে আপনাদের আন্তরিক অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা সাধনবলে পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে এ সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাক্ষ্যকে আপন আপন বুদ্ধি-বিচার সম্মত দেখিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল মত জগতের উন্নত ধর্ম্মমাত্রেই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, শাক্ত, বৈষ্ণব, ইহুদী, প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ই এ সকল মতে বিশ্বাস করেন। এমন কি এগুলিকে ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট মতও বলা যায় না। এগুলির দ্বারা অপরাপর ধর্ম্মসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলতঃ ব্রাহ্ম-সমাজের "হাঁ"-বাচক বা ভাবাত্মক কোনও বিশিষ্ট মত নাই। ঈশ্বর-বিশ্বাস খৃষ্টীয়ানের বিশেষত্ব নহে; যিশুখৃষ্টে বিশ্বাসই খৃষ্টীয়ান্‌কে বিশিষ্ট করিয়াছে। ঈশ্বর-বিশ্বাস মুসলমানেরও বিশেষত্ব নহে; হজরত মোহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত প্রবক্তারূপে গ্রহণ করিয়াই, মুসলমান্ আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ কোনও "হাঁ"-বাচক বা ভাবাত্মক সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া, জগতের ধর্ম্মসমাজে কোনও প্রকারের বিশিষ্টতা লাভ করেন নাই। অভাবাত্মক প্রত্যয়ে, "না"-বাচক সিদ্ধান্তেই ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মসমাজের "না"-বাচক মত ও বিশ্বাসগুলি এই:—

(১) ঈশ্বরের কোনও অবতার নাই।

(২) কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র ভ্রান্তিশূন্য কিম্বা সত্যের একমাত্র ও অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য নহে।

(৩) কোনও ধর্ম্মোপদেষ্টা বা গুরু ঈশ্বরের শক্তি ও স্বভাবসম্পন্ন এবং ভ্রান্তিশূন্য হইতে পারেন না।

(৪) দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি হইতে পারে না।

(৫) কোনও মানুষকে বা অপর কোন স্বষ্টপদার্থকে, কিম্বা মানবহস্তরচিত কোনও পট বা মূর্ত্তি প্রভৃতিকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভজনা করা কর্ত্তব্য নহে।

এই অভাবাত্মক মতগুলিতেই, বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব। এইগুলির দ্বারাই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে ব্রাহ্মসম্প্রদায় বিশিষ্ট হইয়াছেন। আর অভাবাত্মক সিদ্ধান্ত মাত্রেই দ্বিবিধ ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিতে পারে; কতকগুলি "না"-বাচক সিদ্ধান্ত মানব-জ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই প্রকাশিত হয়। মানবজ্ঞানের এই মূল প্রকৃতিকে ইংরেজিতে necessity of thought বলে। এই neces-

sity of thought হইতে যে সকল অভাবাত্মক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। যেমন যাহা সান্ত তাহা অনন্ত হইতেই পারে না। যাহা দেশে আবদ্ধ তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদিধর্ম্ম বা extension থাকিবেই থাকিবে। যাহা কালেতে প্রকাশিত তার পৌর্ব্বাপর্য্য বা succession না থাকিয়াই পারে না। এই "না"-বাচক সিদ্ধান্তগুলি মানব-জ্ঞানের মূল প্রকৃতির বা necessity of thought-এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব হইলেও, এ সকলের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষবৎই প্রবল। এ ছাড়া আর যত কিছু অভাবাত্মক বা "না"-বাচক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় তৎসমুদায়ই অনুমানের উপরে গড়িয়া উঠে। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা হইতে যুক্তিপরম্পরা আশ্রয় করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ হয় নাই, তার সম্বন্ধে কোনও সত্য মিথ্যা ধারণা করিয়া লওয়াই অনুমানের কার্য অনুমান সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষের বাহিরে চলিয়া যায়। অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায় এই অনুমানের প্রভাবই প্রচার করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক বা "না"-বাচক মতামতগুলি হয় necessity of thoughtএর উপরে প্রতিষ্ঠিত, না হয় কেবল অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। Necessity of thoughtএর উপরে প্রতিষ্ঠিত, অপ্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তও প্রত্যক্ষবৎই প্রবল হয়। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধেরই মতন। এগুলিকে বর্জ্জন করা অসাধ্য।

ব্রাহ্মসমাজের "না"-বাচক সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌গুলি necessity of thought এর উপরে প্রতিষ্ঠিত আর কোন্‌গুলি কেবল অনুমান-প্রতিষ্ঠ; ইহার বিচার করিলেই, শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের বিরোধী কি না, আর বিরোধী হইলে, কোন্ স্থানে, কি বিষয়ে বাস্তবিক এ বিরোধ বাধে, এ সকল কথা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

বারান্তরে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(৭)

গভীর রাত্রে জীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এইখানে জীন ভ্যালজীনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। জীন ব্রাই গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে; বাল্যে লেখাপড়া কিছুই শিখে নাই, বড় হইয়া সে কাঠুরিয়ার ব্যবসা অবলম্বন করে। স্নেহপ্রবণচিত্ত ব্যক্তির ন্যায় সে কতকটা ভাবুক গোছের ছিল। তবে তাহার মুখভাবে অসাধারণত্ব কিছু প্রকাশ পাইত না। শৈশবেই তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়—মাতা চিকিৎসাবিভ্রাটে সূতিকাগারে মারা যান, পিতা কাঠুরিয়া ছিলেন—বৃক্ষ হইতে পতনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সংসারে থাকিবার মধ্যে তার একমাত্র ভগ্নী ছিল। স্বামীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত সে তাহাকে 'মানুষ' করে;

স্বামীর মৃত্যুর পর কিন্তু সাতটি পুত্র-কন্যা লইয়া সে ভ্রাতার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। ছেলে-মেয়েরা সবাই ছোট বড়টি আট বৎসরের, সর্ব্ব-কনিষ্ঠটি একবৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু। জীনের বয়স তখন পঁচিশ। কর্ত্তব্যের খাতিরে সে নিরাশ্রয়া বিধবা ভগ্নীর ভার গ্রহণ করিল। এপর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই,—যৌবনকাল তাহার কঠোর পরিশ্রমে অতি কষ্টে কাটিতেছিল, তাহার মধ্যে প্রেমের অবকাশ ছিল না, প্রণয়িনীও তাহার কেহ ছিল না।

সমস্তদিন প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর অবসন্নভাবে গৃহে ফিরিয়া কাহারও সহিত কথা না কহিয়া সে সকলের সহিত একত্রে আহারে বসিত। ভগ্নী প্রায়ই তাহার খাবারের উৎকৃষ্টতম অংশ আপন পুত্রকন্যাদের বণ্টন করিয়া দিতেন,—ঝোলের আলু, মাছের মুড়া প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে তাহার থালি হইতে অন্তর্হিত হইত—জীন দেখিয়াও দেখিত না, থালির সহিত মুখ গুঁজিয়া একমনে আহার করিয়া যাইত। কিন্তু তবুও সে বুভুক্ষু শিশুদের ক্ষুধা মিটিত না; খাবারের জন্য সর্ব্বদাই তাহারা চীৎকার করিত।—জীনের বাড়ী হইতে কতকদূরে এক গোয়ালাবাড়ী ছিল—সেইখানে যাইয়া তাহারা জননীর নাম করিয়া দুগ্ধ চাহিয়া লইত, তারপর পথিমধ্যে আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া সে দুগ্ধ কতক পান করিত,—কতক ফেলিয়া দিত। ভগ্নী এ কথা জানিলে বিপর্য্যয়-কাণ্ড বাধাইবে ভাবিয়া জীন তাহার অজ্ঞাতসারে গোয়ালিনীকে সে দুগ্ধের দাম দিয়া দিত, —ছেলেমেয়েরাও জননীর ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাইত। এইরূপে বৎসর দুই চলিল।

কাজ যখন ভাল চলিত তখন সে প্রতিদিন ১৮ স্যুস করিয়া উপার্জ্জন করিত, অন্য সময়ে মোটঘাট বহিয়া, কৃষাণদের সহিত মাঠে খাটিয়া কোনরূপে চালাইত। কিন্তু তাহাতে আর কত আসে?—তার সে সামান্য উপার্জ্জনে একা সে নয়জনের ক্ষুন্নিবৃত্তি কি করিয়া করে? দিনে দিনে দুর্দ্দশার চরমসীমায় তাহারা উপনীত হইতে লাগিল। তার উপর প্রচণ্ড শীত আসিয়া পড়িল;—কাজ আর মেলে না। ঘটিবাটি যাহা ছিল একে একে বিক্রয় করিয়া কয়দিন চলিল,—শেষে একদিন একেবারে অচল হইয়া পড়িল; তৈজসপত্রও কিছুই নাই, ঘরে একটুকরা খাবার নাই, প্রাতঃকাল হইতে সাতটি শিশু অনাহারে চীৎকার করিতে লাগিল। সমস্তদিন ধরিয়া জীন সে বুভুক্ষুর কাতর আর্ত্তনাদ শুনিল, শেষে সন্ধ্যার সময় উন্মত্তের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

রুটিওয়ালা মাবার্ট ইসাবু সমস্তদিনের খরিদ-বিক্রয়ের হিসাবপত্র মিলাইয়া ভিতর হইতে দোকান বন্ধ করিয়া শুইতে যাইবে—এমন সময় হঠাৎ বাহিরের জানালার কাঁচখানা ঝন্-ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল; তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দোকানঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল ভাঙ্গা কাঁচের মধ্য দিয়া একখানা হাত টেবিলের উপরে সাজানো রুটীর স্তূপ হইতে একখানা রুটি লইয়া অন্তর্হিত হইতেছে। চোর চোর বলিয়া সে পশ্চাদ্ধাবিত হইল; চোরও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, কিন্তু অবশেষে ধরা পড়িল; রুটিখানা আসিতে আসিতে পথে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেও, তাহার হাত হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। সে চোর—জীন ভ্যালজিন!

সে ঘটনা ১৭৯৫ খৃঃ ঘটে। 'বসন্ত'-বাটীতে রাত্রে ডাকাতি করার অভিযোগে অভি-

যুক্ত হইয়া জীন দায়রাসোপর্দ্দ হইল। বিচারে, পাঁচ বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমের সহিত তাহার কারাদণ্ডাজ্ঞা হইল।

নির্ম্মম শাসন-পাশ,—সভ্যতার পরিহাস!—কি যে ভয়ানক ক্ষণ, যখন দণ্ডবিধি আইন বৈতরণীর অতল জলে মানবতরণীখানি ডুবাইয়া দেয়! কি সে শোচনীয় মুহূর্ত্ত, যখন সমাজ, ভাবচিন্তাপূর্ণ মানববিশেষকে চিরদিনের মত আপনার ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়!

১৭৯৬ খৃঃ ২২ শে এপ্রিল তারিখে যেদিন সমগ্র প্যারিসবাসী নেপোলিয়নের মনটেণ্ট নামক যুদ্ধজয়ের সম্বাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল,—সেই দিন বহুসংখ্যক আসামী পরস্পর সংযুক্ত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া গ্যালি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। জীনও তাহার মধ্যে ছিল। কামার যখন তাহার লৌহ গলাবন্ধটা পশ্চাদিকে প্রেক দিয়া আঁটিতেছিল, তখন হতভাগ্য দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকারিয়া উঠিল—"ওরে আমি ত চোর নই, আমি যে কাঠুরে জীন রে!"— তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে দক্ষিণ হাতখানি তুলিয়া ধীরে ধীরে সাতবার নামাইয়া, যেন সাতটি অসম মস্তক স্পর্শ করিল। লোকে বুঝিল,—সাতটি শিশুর পোষণের জন্যই তার যা কিছু অপরাধ!

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল। ভবিষ্যতের ভীষণ ছবি তাহার মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে কাতর করিয়া তুলিতে লাগিল। নিরক্ষর অশিক্ষিত সে, অপরাধের অনুপাতে দণ্ড গুরুতর হইয়াছে বলিয়াই যদি সে ভাবে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে দোষ দিতে পারি না।

সাতাইশ দিন গো-যানে শৃঙ্খলের ভার বহন করিয়া অবশেষে জীন তুলঁতে আনীত হইল। সেখানে বন্দীদের লাল কোর্ত্তা পরিয়া সংসারের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার পরিচয়জ্ঞাপক নাম পর্য্যন্ত রহিল না;—এখন হইতে তার নূতন পরিচয়—নং ২৪৬০১ মাত্র। তাহার ভগ্নী কোথায় রহিল? সে সাতটি শিশুর কি হইল? কে তাহার সন্ধান রাখে? তরুর মূল যখন কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়, তখন তাহার মুষ্টিমেয় পত্রগুলির পরিণাম সন্ধান কে করিয়া থাকে?

সেই পুরাতন কাহিনী!—'ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু' ভগবানের সে জীব কয়টি একে একে আপনাপন অদৃষ্ট-তমসার মাঝে ডুবিয়া গেল। একমাত্র কোলের শিশুটি লইয়া জননী এক দপ্তরীর বাড়ীতে সামান্য কাজ জুটাইয়া অতিকষ্টে উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন করিতে লাগিল। শেষরাত্রি হইতেই তাহাকে কার্য্যে যোগ দিতে হইত, পুত্র বাহিরে পড়িয়া থাকিত; অধ্যক্ষ বলিতেন—"ছেলে নিয়ে কি কাজ হয় বাছা! তা হলে অন্য জায়গা দেখ।" তীব্র হিমে বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিশু কাঁপিতে থাকিত, তারপর বেলা সাতটার সময় পাঠশালা খুলিলে সেখানে যাইয়া বসিত।—নূতন এক কয়েদীর মুখে জীন একদিন এ সব শুনিল। তাহার প্রিয়ধনগুলিকে অন্তর্হিত করিয়া যে যবনিকা পতিত ছিল, সহসা মুহূর্ত্তের জন্য তাহা অপসৃত করিয়া তাহাদের ভাগ্যলেখা-চিত্র কে যেন তাহাকে দেখাইয়া দিল। তারপর পুনরায় সব অন্ধকারে আবৃত হইল;—ইহজীবনে জীন আর সে যবনিকার অন্তরাল দেখিতে পায় নাই। কারা-

বাসের চতুর্থ বৎসরের শেষে একদিন তাহার পলায়ন সুযোগ ঘটিল। কয়েদীদের মধ্যে এ বিষয়ে পরস্পর সহানুভূতি খুব বেশী থাকে; অন্য কয়েদীদের সাহায্যে পলাইয়া, জীন দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া স্বাধীনভাবে বনে বনে ঘুরিল। কিন্তু সে কি স্বাধীনতা!—বন্যপশুর ন্যায় বন হইতে বনান্তরে বিতাড়িত হওয়া; পত্রতিপতত্রে বিচলিতপত্রে' নিত্য সশঙ্কিত হইয়া ওঠা; পথিকের পদশব্দে, কুকুরের ডাকে, প্রতি বনে কণ্টকগুল্মে অনুসরণকারীর কথা ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠা—ইহাকে যদি স্বাধীনতা বল তবে সে দুইদিনের জন্য সে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত, ক্লান্ত, অবসন্নশরীর জীন পরদিন ধৃত হইল,—তখনও তার উদরে বিন্দুপরিমাণ জলও যায় নাই। বিচারে তাহার আরও তিন বৎসর কারাদণ্ড হইল। ষষ্ঠবর্ষের শেষে পুনরায় সে পলাইল,—প্রহরীরা একটা জাহাজের তক্তার তলদেশ হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিল,—প্রাণপণ শক্তিতে তাহাদের সহিত যুঝিয়াও সে উদ্ধার পাইল না। এবার অপরাধ গুরুতর—পলায়ন ও প্রহরীদের বাধাপ্রদান।—দণ্ডের কাল আরও পাঁচবৎসর বৃদ্ধি পাইল,—তন্মধ্যে ডবল শৃঙ্খলবদ্ধাবস্থায় দুই বৎসর। দশ বৎসরের শেষে, পুনরায় পলায়ন চেষ্টার ফলে আরও তিন বৎসর। এই ১৬ বৎসর। আরও একবার সে পলাইয়া ঘণ্টা চারেক পরে ধৃত হয়; সেই চারি ঘণ্টার জন্য পুনরায় তিন বৎসর। একুনে ১৯ বৎসর। ১৮১৫ খৃঃঅব্দে সে কারামুক্তি পায়, ১৭৯৬ খৃঃ একখানি রুটী চুরির অপরাধে সে প্রথম কারাপ্রবেশ করে।

এইখানে বলিয়া রাখি, এ ঘটনা কাল্পনিক নহে,—ইহা বাস্তব; জীবন্ত সত্য। অহরহই ইহা ঘটিতেছে। দণ্ডবিধি আইন সম্বন্ধে আলোচনার ফলে গ্রন্থকার আরও একস্থলে আর এক হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঠিক ইহারই প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছিলেন। ইংরাজী অপরাধীদিগের সম্বন্ধে আলোচনার ফলে জানা যায় যে ইংলণ্ডে শতকরা আশিটা চুরি খাদ্যাভাবেই ঘটিয়া থাকে।

দারুণ নিরাশায় অশ্রুসিক্ত চক্ষে জীন গ্যালিতে প্রবেশ করিয়াছিল; ১৯ বৎসর পরে যখন সে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার অন্তঃকরণ—নীরস, কঠোর, দয়ামায়ার লেশমাত্র বর্জ্জিত।

৮

জীনের প্রকৃতি যথার্থ কি ছিল?

দুর্ভাগ্যের বিষয় সমাজ এদিকে চাহিয়া দেখে না, অথচ এ সবই তাহারই কীর্ত্তি।

জীন লেখাপড়া কিছুই শিখে নাই সত্য, কিন্তু তা বলিয়া তাহাকে গণ্ডমূর্খ বলা যায় না;—যে সহজাত বুদ্ধি মানবের সাধারণ সম্পত্তি, তাহা তাহারও ছিল। দুর্দিনের শিক্ষায় তাহা বরং ক্রমশই ফুটিয়া উঠিতেছিল। বেত্রাঘাতে, শৃঙ্খলের বন্ধনে, নির্জ্জন কারাবাসে, প্রখর সূর্য্যোত্তাপে, শান্তিবহনে, পরিশ্রান্তিতে, কাষ্ঠ শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া,—সব সময়েই সে আপন অন্তরের প্রতি চাহিত,—আর ভাবিত।

সে যেন বিচারক—আপনার অপরাধের পুনর্ব্বিচার করিতেছে। সে যে দোষী, বিনাপরাধে যে তার শাস্তি হয় নাই—সে কথা সে মানিত। চাহিলে হয়ত রুটিখানা সে পাইতে পারিত; অন্ততঃ অপর কোন কাজকর্ম্মের বা কাহারও দয়ার প্রতীক্ষা সে করিতে

প্ৰায়শ্চিত।—অনাহারে মরিবার সময় ত তথনও তাহাদের হয় নাই; বিশেষতঃ, বহুদিন ধরিয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিলেও সহজে মানুষের মৃত্যু হয় না;—সুতরাং সব দিক দেখিয়া তাহার ধৈর্য্যধারণ করা উচিত ছিল,—সকল পক্ষেই তাহা হইলে ভাল হইত; তাহার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সমাজের উপর টেক্কা দিতে যাওয়া ভাল হয় নাই। চুরি করিয়া দুঃখ ঘোচে না; অন্ততঃ, অন্নের অভাব অতিক্রম করিতে গিয়া যেখানে কলঙ্কের পঙ্কিল খাদে পড়িতে হয়, সে পথ অবলম্বন না করাই ভাল;—ইত্যাদি।—মোটের উপর জীন আপনার দোষ প্রমাণ করিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল—এই দুর্দ্দশার জন্য কি একাই সে দায়ী?—কে সে? একজন মজুর মাত্র; পরিশ্রমে ত সে পরাঙ্মুখ নয়, তবে সে কাজ পায় না কেন? আহার্য্য পায় না কেন?—সেটা কার অপরাধ? তার উপর,—না হয় সে-ই দোষী, কিন্তু অপরাধের অনুপাতে তার দণ্ড কি গুরুতর হয় নাই? বিচারের তুলাদণ্ডে দণ্ডের দিকটাই কি ঝুঁকিয়া পড়ে নাই? এ কঠোর দণ্ড না দিলেও কি তার অপরাধ ক্ষালন হইত না? দণ্ডের অত্যাচার কি তার স্বেচ্ছাচারের মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায় নাই? অপরাধীকে বন্যপশুর ন্যায় বাঁধিয়া পিষিয়া, প্রতিহিংসা সাধন করিয়া, দণ্ডের মর্য্যাদা কি খর্ব্ব হয় নাই? তার উপর কয়বার তার পলায়নচেষ্টার জন্য এই যে অবশিষ্ট চতুর্দ্দশবৎসরের কারাদণ্ড—এটা কি দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার নয়? ব্যষ্টির উপর সমষ্টির অন্যায় প্রভুত্ব নয়?—এমন কি তার পাপ যে ১৯ বৎসর ধরিয়া তাহাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়?

সমাজ?—সমাজের কি অধিকার যে, সে একই ঘটনার জন্য একজনকে নির্ম্মমভাবে দলিয়া পিষিয়া মারিবে, অথচ জনবিশেষের অপরাধ দেখিয়াও দেখিতে চাহিবে না?—কি তার অধিকার যে অন্নসংস্থানের কোন উপায় না করিয়া দিয়া, নির্ম্মম শাসনপাশে সে মানুষকে বাঁধিতে আসে? অদৃষ্টের বশে যাহারা দীনদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা করুণার পাত্র; কিন্তু তাহাদের জন্যই কি যত আইনের কঠোরতা?—জীন অনেক বিচার বিতর্ক করিয়া অবশেষে সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করিল, এবং প্রতিহিংসাসাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল; সে বুঝিল তাহার দণ্ড—অবিচার না হোক্, অত্যাচার বটে। ক্রোধটা অনেক সময়ে 'বোকামি' মাত্র,—দোষী লোকেও ধরা পড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে; তবুও এটা ঠিক যে, অন্যায় বিচারের ভাবটা মনে মনে না থাকিলে কেহ কখন নিজেকে নির্য্যাতিত ভাবে না। জীন ভ্যালজিন আপনাকে নির্য্যাতিত বলিয়াই মনে করিতেছিল।

সমাজ তাহার জন্য কি করিয়াছে?—কিছুই নয়। অন্যান্য হতভাগ্যের ন্যায়, শুধু তার তথা-কথিত ন্যায় বিচারের প্রচণ্ড মূর্ত্তিটাই সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যথার্থ করুণা লইয়া কেহ তাহার কাছে আসে নাই, যে কেহ কাছে আসিয়াছে সেই তাহাকে আঘাতই করিয়াছে। শৈশবের পর হইতে, এক ভগ্নীর নিকট ব্যতীত কোন যত্ন বা স্নেহ কাহারও নিকট হইতে সে পায় নাই। দুর্দ্দশার পর দুর্দ্দশায়, তাহার মনে অবশেষে এই ধারণা

দাঁড়াইয়াছিল যে জীবনটা সংগ্রামমাত্র, আর সে সংগ্রামে সে-ই নিত্য পরাজিত। ঘৃণাই শেষে তাহার একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ হইল; সেই অস্ত্র গ্যালির নির্য্যাতন-শাণযন্ত্রে ক্ষুরধার করিয়া লইয়া কারামুক্তির দিন হইতে সংসারের সহিত যুঝিতে সে কৃতসংকল্প হইল। তুলঁতে কয়েদীদের জন্য বিদ্যালয় ছিল, ইচ্ছা করিলে যে-কোন কয়েদী সেখানে মোটামুটি ধরণে শিক্ষালাভ করিতে পারিত; জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা তাহার প্রতিহিংসাসাধনের পথ প্রশস্ত হইবে ভাবিয়া, চল্লিশ বর্ষ বয়সে জীন সেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। সময়ে সময়ে শিক্ষা ও সভ্যতাই যত পাপের আকর হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজের বিচার শেষ করিয়া জীন সমাজ-কর্ত্তা ভগবানের বিচার করিতে বসিল, এবং অবশেষে তাঁহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিল।

এইরূপে ১৯ বৎসর কারাবাসের মধ্যে তাহার জীবন আলো-অন্ধকারের বিচিত্র মিশ্রণে কাটিতেছিল।

আসলে তাহাকে পাপস্বভাব বলা যায় না। গ্যালিতে প্রথম প্রবেশ কালে তাহার প্রকৃতি তোমার আমার মতই ছিল। সেখানে, নির্য্যাতনের ফলে, সে যখন সমাজের উপর খড়্গাহস্ত হইল, তখন তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিল; ভগবানের ন্যায় বিচারে যখন সে সন্দিহান হইল, তখনি তাহার মন পাপপঙ্কিল হইল।

কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত।

মানব-প্রকৃতি কি সম্পূর্ণভাবে এতই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে? ভগবানের সৃষ্ট মানুষকে কি মানুষে এত দীন করিতে পারে? আত্মা কি কর্ম্মফলাধীন হইয়া, মন্দ গ্রহের ফেরে, আপনি কলঙ্কিত হইতে পারে? বিশাল মস্তিষ্কের ভারে মেরুদণ্ডের ন্যায়, মানুষের চিত্ত কি স্তূপীকৃত দুঃখযন্ত্রণার ভারে প্রপীড়িত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে? প্রত্যেক মানবের আত্মায়, জীন ভ্যালজীনের আত্মায়, —এমন কি কোন সহজাত অপাপ অনন্তের দিব্য বিভা নাই বা ছিল না, সৎকার্য্যের প্রতিফলিতালোকে যাহা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে এবং পাপে যাহাকে কখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না?

গ্যালির কর্ম্মের অবসরকালে এই সব কথাই তাহার মনে হইত। নীরব ভাবুকতার ছায়াপাত সে সব সময়ে তাহার মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

অবশ্য আমরা যে ভাবে ক্রমপর্য্যায়ে তাহার চিন্তার বিকাশ দেখাইয়াছি, সে ভাবে হয়ত জীন আপনার চিত্তকে দেখে নাই,—সে ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার ক্ষমতাও হয়ত তাহার ছিল না। কিন্তু এটা সত্য যে যেখানে সংশোধন অপেক্ষা শাস্তি-প্রদানের আগ্রহই অধিক পরিস্ফুট, সে বিচার মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিকে একে একে পদদলিত করিয়া মানুষকে পশুবৎ করিয়াই তোলে। জীনের উপর্য্যুপরি পলায়ন-চেষ্টাই তাহার প্রমাণ।—সে ব্যর্থ চেষ্টা মূর্খতা বই আর কিছু নয় তাহা ত সে জানিত; তত্রাচ সুযোগ পাইলেই, উন্মুক্ত পিঞ্জর হইতে ব্যাঘ্রের ন্যায়, সে ছুটিয়া পলাইয়াছে।—পরিণাম বা শাস্তির কথা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই।—কেন? তাহার সহজাতবুদ্ধি যেন তাহাকে বলিয়া দিত—'পালাও'; তাহার বুদ্ধি-বিচার তাহাকে বলিত—"থাক।" কিন্তু এমন একটা প্রলোভনের কাছে তাহার

সহজাত ভাবেরই প্রশ্রয় হইত, তাহার পশুভাবই প্রবল হইত। তার পর, ধৃত হওয়ার পর নূতন শাস্তির ভার তাহার চিত্তের অন্ধকার গাঢ়তর করিয়াই তুলিত।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। শারীরিক সামর্থ্যে জীনের সমতুল্য লোক গ্যালিতে তখন কেহ ছিল না। কঠোর-শ্রমসাধ্য কার্য্যে একা সে চারিজনের সমতুল্য ছিল; পৃষ্ঠের উপর অনায়াসে সে বিশাল ভার বহন করিতে পারিত। কিন্তু শারীরিক শক্তি অপেক্ষা তাহার কৌশল অনেক বেশী ছিল। সুদীর্ঘকালের জন্য দণ্ডিত অপরাধীরা পলায়নোদ্দেশে প্রায়ই প্রতিদিন, সুযোগমত, নিয়মিতভাবে শক্তি ও কৌশলের সাধনা করে। জীন সে বিষয়ে একজন পাকা ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছিল। যে-কোন প্রাচীর উল্লম্ফন করা, ক্ষুদ্রতম কার্ণিশের উপর স্বচ্ছন্দে দণ্ডায়মান থাকা, তাহার পক্ষে কৌতুকমাত্র ছিল। পৃষ্ঠদেশ ও হাঁটু দিয়া, কনুই এবং হস্তের সাহায্যে দেওয়ালের কোণ বাহিয়া অনায়াসে সে ত্রিতল পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইত;—এইরূপে কতবার গ্যালির ছাদ পর্য্যন্ত সে উঠিয়াছে।

কথা সে কহিত কম; গ্যালিতে কখনও কেহ তাহাকে হাসিতে দেখে নাই। সে যেন সর্ব্বদাই কি একটা গুরুতর চিন্তার মাঝে মগ্ন হইয়া থাকিত।

তাহার অসম্পূর্ণ প্রকৃতির ভ্রান্ত অনুভব-শক্তির বশে সে বুঝিত কি যেন একটা বিশাল ভার তাহার স্কন্ধে চাপিয়া আছে। জীবনের অস্পষ্ট অন্ধকারে যেদিকে সে চাহিত সেই দিকেই দেখিত,—আইনের বন্ধন, মানবের পক্ষপাতিত্ব, এবং সভ্যতার বিশাল স্তূপ যেন চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিতেছে। তাহার মধ্যে,—কখনো সম্মুখে, কখনো দূরে, কখনো বহু উর্দ্ধে—এখানে অনুচর সহ কারাধ্যক্ষ, ওখানে তরবারি হস্তে যমদূতসম প্রহরী, দূরে করধৃতদণ্ড প্রধান পুরোহিত, আর উর্দ্ধে আলোকের মাঝে হেমমুকুটধারী নৃপতি—আরও কত কি সে যেন দেখিত। কি এক দুর্জ্ঞেয় গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহারা যেন সব তাহাকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইত,—তাহাদের সে নির্ব্বেদ নিষ্ঠুরতা এবং চির উপেক্ষার ভারে প্রতিদিন সে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিত!—সম্ভাবিত দুর্দ্দশার অতলজলে মগ্ন শাসন-কশাহত হতভাগ্যের শিরেই, মানব-সমাজের যত দুঃসহ বিশাল ভার আসিয়া চাপিয়া বসে; জীনেরও তখন সেই অবস্থা। সে কি ভাবিত?—পেষণযন্ত্র-মধ্যগত যবখণ্ডকে প্রশ্ন কর। তাহার যে চিন্তা, জীনেরও তাই।

এই কায়া ও ছায়া, সত্য ও কুহকের অদ্ভুত মিশ্রণের মধ্যে পড়িয়া মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত,—অতীত, বর্ত্তমান সবই বুঝি বা ভ্রান্তি, সবই বুঝি একটা স্বপ্নের ঘোর মাত্র! কাজ করিতে করিতে, থামিয়া, কারা-প্রহরীর প্রতি চাহিয়া সে ভাবিত—কে এ, ছায়ামূর্ত্তি! কিন্তু মুহূর্ত্তে সে ছায়ামূর্ত্তি হইতে তাহার পৃষ্ঠে সজোরে বেত্রাঘাত বর্ষিত হইত; চমকিত হইয়া, জীনের চিত্ত পুনরায় বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিত; জীন আবার কার্য্যে মন দিত।

বহির্জগতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না—সূর্য্যের কিরণ, বসন্তের প্রভাত, বিচিত্রবর্ণাভ আকাশের ছবি, সবই যেন

তাহা হইতে দূরে দূরে ছিল। শুধু একটা অতি ক্ষীণ আলো চিত্তের অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া আসিয়া, যেন তাহার অন্তর্জীবনে প্রবেশ লাভ করিত মাত্র।

মোট কথা,—ফ্যাবেরোল পল্লীর সে নিরীহ কাঠুরিয়া তুলঁতে আসিয়া ভীষণ কয়েদীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। গ্যালির শিক্ষার ফলে দুইটি জিনিসে সে খুব অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল;—প্রথমতঃ, তাহার নির্য্যাতনের প্রতিহিংসাস্বরূপ একটা প্রকৃতিসিদ্ধ তীব্র আকস্মিক উত্তেজনায়; দ্বিতীয়তঃ, তাহার আপন বিবেক-বিচারানুমোদিত ভ্রান্ত চিন্তাপ্রসূত পূর্ব্বচিন্ত্য কার্য্যানুষ্ঠানে। জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও একগুঁয়েমি, এই তিন লইয়া তাহার পূর্ব্বচিন্তা গঠিত হইত; এবং স্বাভাবিক বিদ্বেষ, আত্মার অন্ধকার, নির্য্যাতনের স্মৃতি ও প্রতিহিংসার ভাব (তাহাতে সাধু অসাধুর বিচার ছিল না)—এই কয়টি ভাবই তাহার কার্য্যের একমাত্র কারণস্বরূপ ছিল। কিন্তু মানবের রচিত আইনকানুনের প্রতি একটা বিজাতীয় বিদ্বেষই তাহার সকল চিন্তার মূলে অহরহঃ জাগিতে থাকিত। এই বিদ্বেষ-ভাব, সময়ে দৈবঘটনায় নিয়ন্ত্রিত না হইলে, কালে, স্বাভাবিক নিয়মের বশে, সমাজের প্রতি, পরে সমগ্র মানব-জাতির প্রতি, তার পর সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের প্রতি, বিস্তৃত হইয়া পড়ে; মানুষ তখন কেবলি পরের অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে।—ছাড়-পত্রে, জীনকে যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়।

দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে তাহার প্রাণ-ধারা শুষ্ক হইতেছিল। ১৯ বৎসর পরে, বিশুষ্ক হৃদয়ে শুষ্ক নেত্রে জীন পুনরায় সংসারক্ষেত্রে পদার্পণ করিল।

(৮)

অন্ধকার লবণাম্বুরাশি ভেদ করিয়া নক্ষত্র-বেগে পোত ছুটিতেছিল। সহসা এক যাত্রী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল।

একবার উঠিয়া, একবার ডুবিয়া, চীৎকার করিয়া সকলকে সে ডাকিতে লাগিল।—কে সে চীৎকার শুনিবে? সমুদ্রবক্ষে তখন ঝটিকা উঠিয়াছে; নাবিকেরা এবং সহযাত্রিবৃন্দ পালের রসারসি লইয়াই ব্যস্ত—তাহার আর্ত্তনাদ তাহাদের কাণে পৌঁছিল না। উত্তাল তরঙ্গমালার উপর হতভাগ্যের দেহ বিন্দুবৎ ভাসিতে লাগিল।

নিমিষে নিমিষে সে পোত দূর হইতে দূরান্তর্গত হইতেছিল। উহারই মধ্যে সে ত এই কতক্ষণ ছিল; আর সবারই মত সেও ত উহারই একজন যাত্রী ছিল; আর সবারই মত সেও ত একদিন উহারই ক্রোড়ে সকলের সহিত একত্রে বসিয়া, সূর্য্যের আলো এবং সমীরণ-সঞ্চার উপভোগ করিয়াছে। কিন্তু এখন?—মুহূর্ত্তের পদস্খলন, মুহূর্ত্তের ভুল—তাহারই ফলে চিরদিনের মত পতন,—সেইখানেই তার জীবন নাট্যের পরিসমাপ্তি!

চারিদিকে বীচি-বিক্ষোভ, পদতলে তরল বারিরাশির প্রাণসংহারিণী লীলা; বাত্যাসংক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিরাশি আছাড়িয়া আছাড়িয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া অন্ধকার সমুদ্রতলের দিকে তাহাকে দূর করিয়া দিতে চাহিতেছে! তরঙ্গের পর তরঙ্গ, জনসংঘের ন্যায়, তাহার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছে; এক একবার

তরঙ্গের তাড়নে নিমজ্জিত হইয়া সে দেখিতেছে,—চারিদিক্ হইতে হাঙ্গর কুম্ভীর সরীসৃপ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, সমুদ্রগর্ভস্থ লতাগুল্ম যেন তাহাকে মৃত্যু-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবার জন্য প্রসারিত হস্তে ছুটিয়া আসিতেছে!—ভয়ে শিহরিয়া, চক্ষু মুদিয়া, অভাগা প্রাণপণে জীবনের মায়ায় যুঝিতে লাগিল।

কোথায় সে পোত? দূরে—বহুদূরে—অন্ধকার দিক্‌চক্রবালের সীমারেখায়!—আর স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না!

দেখিতে দেখিতে তুফান উঠিল। চতুর্দ্দিকে—পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ; উর্দ্ধে—পাটলান্ধকার আকাশের নির্ম্মম ভ্রূকুটি। সর্ব্বত্র যেন উন্মত্ত দানবের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা!—সে ভীষণ শব্দ, যেন নরকের প্রতিধ্বনিত নির্ঘোষ!—কি সে যন্ত্রণা!—অভাগা উন্মাদগ্রস্ত হইল।

আকাশে বিহঙ্গম আছে, মানবের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করিতে দেবতারাও আছেন।—কই, তাহাকে ত কেহ উদ্ধার করে না! পাখীরা ঝড়ের মুখে উড়িতে উড়িতে গান করিতে লাগিল; নীচে সে অভাগা মৃত্যুর সহিত যুঝিতে লাগিল।—সে অনন্ত সমুদ্র এবং অনন্ত আকাশ—যেন তাহারই কবরের অনুরূপ; একটি তাহার কবর,—অপরটি তাহার আচ্ছাদনী।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুঝিতে যুঝিতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে;—পোতও আর দৃষ্টিগোচর হয় না।—গভীর অন্ধকারে সে একা! ডুবিতে ডুবিতে চারিদিক হইতে প্রেতচ্ছবি তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল—অভাগা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মানুষ ত তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। ভগবান্, তুমি কোথায়?

"—কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর!—"

দিক্‌চক্রবালে, আকাশে,—কোথাও কিছু নাই, কেহ নাই!

আকাশ, তরঙ্গ, পর্ব্বতশৃঙ্গ—সবই বধির! বাত্যাও অনন্তের আদেশই পালন করিতেছিল।

চারিদিকে—ঘনীভূত অন্ধকার, বাত্যা, নির্জ্জনতা, দানবী-ভ্রূকুটি, উন্মত্ত তরঙ্গের মুহুর্ম্মুহু উত্থান-পতন; পদতলে—তারল্যের রসাতল; অন্তরে—শ্রান্তি, বিভীষিকা! কোথায় আশ্রয়?—আশ্রয় নাই! তীব্র হিমে দেখিতে দেখিতে তাহার হস্তপদ অসাড় হইয়া আসিল; উন্মত্তের ন্যায় আকাশ বাতাস নক্ষত্র তরঙ্গ ঘূর্ণাবর্ত্ত সবই যেন সে অন্তিম আবেগে ধরিতে লাগিল!—হায়,—শূন্য মুষ্টি,—বিফল প্রয়াস!

দারুণ নিরাশাভারপ্রপীড়িত হইয়া তখন সে সব চেষ্টা ত্যাগ করিল।—পরাজিত নির্য্যাতিত হতভাগ্য গভীরতম অন্ধকারের অতল গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল!

হায় রে গতিশীল সমাজ! মানবের এবং মানবাত্মার অধোগতি চিহ্ন এমনি ভাবে তুমি অঙ্কিত করিয়া যাও! তোমার শাসন-নীতি এমনই ভাবে মানুষকে অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তার উদ্ধারের শেষ আশাটুকুও এমনি ভাবেই কাড়িয়া লয়,—চির দুর্দ্দশার মাঝে তাকে এমনি ভাবেই দূর করিয়া দেয়! হায়, এ নৈতিক মৃত্যুর হস্ত হইতে কে হতভাগ্য মানবকে উদ্ধার করিবে?

(৯)

সে দিন প্রাতঃকালে কারাধ্যক্ষ যখন আসিয়া তাহাকে জানাইল—"আজ তুমি মুক্ত," তখন জীন প্রথমতঃ সে কথা বিশ্বাসই করিতে পারিল না;—সেটা যেন এমনই অসম্ভব,—এতই অপ্রাকৃত! তারপর, সহসা একটা তীব্র জ্যোতিঃ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? মুক্তির কথায় তাহার মনে একটা নব জীবনের ছবি জাগিয়া উঠিত। কিন্তু দু'দিন যাইতে না যাইতেই সে বুঝিল, হরিদ্রাভ ছাড়-পত্র সহ মুক্তি অর্থে কি?

তারপর আরও কথা ছিল। জীন হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল, এই ১৯ বৎসরের পারিশ্রমিক হিসাবে কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে তাহার ১৭১ ফ্রাঙ্ক মোট পাওনা হইয়াছিল; অবশ্য রবিবার, ছুটিছাটা, ও অন্যান্য বাবদে তাহা হইতে কিছু বাদ যাইবার কথা,—কিন্তু জীন তাহা বুঝিল না; তাই কর্ত্তৃপক্ষ যখন তাহাকে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৯ ফ্রাঙ্ক ১৫ স্যুস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন সে সেটা অপহরণের নামান্তর বলিয়াই মনে করিল।

মুক্তির পর দিন, চলিতে চলিতে পথে একটা আঙ্গুরের কারখানায় তার দিন মজুরি জুটিল; সে অসাধারণ পরিশ্রমী,—খুব উৎসাহে কাজ করিতে লাগিল। একটা চৌকিদার সেখান দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়া সন্দিগ্ধভাবে তাহার ছাড়পত্র চাহিল,—কাজেই তখন সে হরিদ্রাভ ছাড়পত্র তাহাকে বাহির করিতে হইল। চৌকীদার চলিয়া গেল, লোকেরা পরস্পর মুখ চা'য়াচায়ি করিতে লাগিল, জীন পুনরায় আপন কাজে মন দিল। সন্ধ্যার সময় সে যখন তাহার প্রাপ্য আনিতে গেল, মেট তাহাকে মাত্র ১৫ স্যুস দিল।

সেখানে দৈনিক মজুরের রোজ ৩০ স্যুস; জীন অপর এক মজুরকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিল। তাই সে বিস্মিত হইয়া বলিল—

"কি রকম?"

"কি রকম আবার কি?—তুই আবার এর বেশী কি চাস্?"

"কেন, ৩০ স্যুস? সবাই যা পেয়ে থাকে।"

মেট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"সাবধান; ফের যদি কথা বল্‌বি ত পুলিশে দেবো।"

জীন নিরুত্তর হইয়া ফিরিল। ভাবিল—এ-ও দিনে ডাকাতি!

সমাজ—কর্ত্তৃপক্ষ—তাহার উদ্বৃত্ত অর্থের হ্রাস করিয়া 'পাইকারি' ডাকাতি করিয়াছে; মানুষ এখন জনে জনে 'খুচরা' ডাকাতি আরম্ভ করিতেছে। ভাল!

জীন বুঝিল—মুক্তি অর্থেই উদ্ধার নয়; কয়েদী কারাগার ত্যাগ করিয়া আসে বটে, কিন্তু ঘৃণা ও দণ্ডের হাত হইতে কথনো পরিত্রাণ পায় না—ডি-তেও সে কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

(১০)

জীনের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিতেছে! প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিছানায় সে শোয় নাই; আজ এ কোমল শয্যায় নিদ্রা হওয়াই যে তাহার পক্ষে বিচিত্র!

চারি ঘণ্টা নিদ্রা তাহার ক্লান্তি অপনোদনের পক্ষে যথেষ্ট—বেশীক্ষণ নিদ্রা যাওয়া

তাহার অভ্যাস ছিল না—তবু একবার চক্ষু মেলিয়া অন্ধকারে সে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু দিবাভাগে নানাঘটনা-সংঘাতে যার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহার পক্ষে রাত্রে, দ্বিতীয়বার নিদ্রাদেবীর আবির্ভাব সহজে ঘটে না। জীনেরও তাহাই হইল। ঘুমাইতে না পারিয়া সে ভাবিতে বসিল। সে চিন্তাও নানা ভাব-সংঘাতের অদ্ভুত মিশ্রণ!—অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের কথা একত্রে মিলিয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলিতে লাগিল; কত অদ্ভুত আকৃতি ধরিয়া, কত সম্ভবকে অসম্ভব, অসম্ভবকে সম্ভবে রূপান্তরিত করিয়া আবার নিমেষে যেন কোন পঙ্কিল স্রোতে মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সব চিন্তা সব ভাবের মধ্যে একটি মাত্র চিন্তা তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। কি তাহা, বলিতেছি—

সেই ছয় খানা রূপার থাল—ম্যাগলোয়ার যে গুলিকে আলমারির উপর তুলিয়া রাখিতেছিল—তাহারা যেন সজীব হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতেছিল। যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের মূল্য ২০০ ফ্রাঙ্কের কম নয়—উনিশ বৎসর ধরিয়া খাটিয়া সে যাহা পাইয়াছে প্রায় তার ডবল দাম! অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ অবিচার না করিলে সে আরও কিছু বেশী পাইত? তা' যাউক সে কথা।

পূর্ণ এক ঘণ্টা ধরিয়া নানা বিরোধী ভাবের মধ্যে পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল।

ঢং—ঢং—ঢং—। তিনটা!

জীন চকিতে উঠিয়া বসিল, হাত বাড়াইয়া দেখিল বিছানার পাশে তার গাঁঠরিটা ঠিক আছে কি না?—তারপর, জুতা খুলিয়া রাখিয়া, পুনরায় শয্যার উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল।

কি সে ভাবনা?—কেমন করিয়া বলিব? সে ভাবনার কোন সামঞ্জস্য নাই, স্থিরতা নাই; তাহা একবার আসে আবার মিলায়, আবার আসে আবার যায়।—কি যেন তাহার উপর চাপিয়া বসিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে কয়েদী ব্রেভেটের কথা তার মনে পড়িল,—তার ছক্‌কাঠা সূতার গার্টারটা যেন তাহার চক্ষের উপর জাগিতে লাগিল। এই ভাবে হয় ত তার সমস্ত রাত্রি কাটিত, কিন্তু অকস্মাৎ গির্জ্জার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল—ঢং! আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা!—সে শব্দ যেন তাহাকে বলিয়া দিল—"উঠ, ভাবছ কি?"

জীন চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্পষ্ট চন্দ্রালোক জানালার খড়খড়ির মধ্য দিয়া কক্ষে আসিয়া পড়িতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য একবার ইতস্ততঃ করিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালার গরাদে ছিল না,—নীচেই বাগান; তাহাতে অনতি-উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনী; বাগানের পরই নাতিহ্রস্ব বৃক্ষের সারি—সম্ভবতঃ সেটা একটা রাজপথ। চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকে জীন ভাল করিয়া একবার সব দেখিয়া লইল; তারপর, জানালা বন্ধ করিয়া, স্থির পাদক্ষেপে ফিরিয়া আসিয়া, গাঁঠরি হইতে শিকের মত কি একটা বাহির করিল। তারপর, জুতা জোড়া পকেটে পুরিয়া, থলিটা পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া, চোখের

উপর টুপিটা টানিয়া আনিয়া, সেই জানালার পার্শ্বে লাঠি রাখিয়া, লৌহশিকহস্তে ধীরে ধীরে পার্শ্বের কক্ষের প্রতি অগ্রসর হইল। মিরিয়েল আপন কক্ষ অর্গলাবদ্ধ করেন নাই, দ্বার উন্মুক্তই ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(৫)

(ভাদ্রের বঙ্গদর্শনের ৩৩১ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ফলতঃ সাধারণ লোক প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের মধ্যে যে বিরোধ ও ব্যবধান আছে বলিয়া মনে করে, তাহা সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ধরিতে পারা যায়, তাহাই প্রাকৃত। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ধারণা হয় না, তাহাই অপ্রাকৃত। কিন্তু লোকে ইহা বিচার করিয়া দেখে না যে, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে জানি না ও জানিতে পারি না, তাহাকেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া ধরিতে হয়, তার আর অন্য পথ নাই। ইন্দ্রিয়ের অতীত যে একটা বিশাল জ্ঞানরাজ্য পড়িয়া আছে, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য হইতেই আমরা তাহা জানিতে পারি, আমাদের অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া যায় মাত্র, বর্জ্জন করিয়া জন্মে না, জন্মিতে পারে না। যাহা দেখি ও শুনি তারই মধ্যে যাহা দেখা যায় না ও শোনা যায় না, তাহার সঙ্কেত ও সন্ধান পাওয়া যায়। আর এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে ইন্দ্রিয়ের ভিতরকার অতীন্দ্রিয় সঙ্কেতটী সকলে ধরিতে পারে না। সে জন্য সাধন আবশ্যক। সে সাধনের নাম ভূতশুদ্ধি বা দেহশুদ্ধি। আমাদের ভূতশুদ্ধি নাই বলিয়া, ইন্দ্রিয় সকল কখনও আপনার স্বরূপে অবস্থান করে না। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষও সত্য হয় না; ইন্দ্রিয়গ্রামের শক্তি-সাধ্য যে কি, ইহাও আমরা জানিতে পারি না। আমরা সত্যভাবে ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন বা বিষয়ের সেবাও করিতে পারি না; অতীন্দ্রিয়েরও প্রত্যক্ষলাভ করি না। আমরা কতকগুলি পৈত্রিক ও বৈজিক সংস্কার লইয়া জন্মিয়া, বহুবিধ সামাজিক সংস্কারের মধ্যে গড়িয়া উঠি। এই সকল সংস্কার আমাদের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে বহুবিধ কল্পনার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই জন্য আমরা সত্যভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে কি ও তাহাদের সাক্ষ্যই বা কি, ইহাও ধরিতে পারি না, আর অতীন্দ্রিয় বস্তু যে কি তাহাও প্রত্যক্ষ করিতে পাই না। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া রহে বলিয়া, অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাসও কেবল অনুমানের ও

কল্পনার উপরেই গড়িয়া উঠে। ধাতু-প্রসাদেই অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়কুলের প্রসন্নতা লাভ হইলেই, জীব অতীন্দ্রিয়ের মহিমা জানিতে পারে। আমাদের ধাতু প্রসন্ন নয় বলিয়াই আমরা একটা বিকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের মধ্যে বাস করিয়া প্রকৃত অতীন্দ্রিয়ানুভূতিলাভে অসমর্থ হই। আর এই জন্যই প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের মধ্যে এমন একটা কল্পিত ব্যবধানেরও সৃষ্টি করি।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইন্দ্রিয় সকলকে ভাল করিয়া জানিলেই তাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে যারা ভাল করিয়া জানিয়াছে, তারাই জানে যে ইহারা কেহই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে। কেবল চক্ষু দিয়া মানুষ দেখে না। চক্ষুর পশ্চাতে যতক্ষণ না মন আসিয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয়ে যতক্ষণ না মনঃ-সংযোগ হয়, ততক্ষণ চক্ষুর গোলকের উপরে সে বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে তার রূপের জ্ঞান জন্মায় না। চক্ষুর পশ্চাতে যেমন মন, মনের পশ্চাতে সেইরূপ বুদ্ধি; বুদ্ধির পশ্চাতে সেইরূপ সাক্ষীস্বরূপ আত্মচৈতন্য যতক্ষণ না আসিয়া দাঁড়ায়, ততক্ষণ চক্ষু দেখে না। এইরূপে মন, বুদ্ধি ও চৈতন্য যুক্ত না হইলে, কাণও শোনে না, ত্বক্‌ও স্পর্শ করে না, নাসিকাও ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, রসনাও রসাস্বাদ করে না, কোনও ইন্দ্রিয়ই আপনার বিষয়কে গ্রহণ করিয়া সে বিষয়ের শব্দস্পর্শরূপ-রসাদির জ্ঞান দান করিতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ?
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ?
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি?
ক উ দেবো চক্ষুশ্রোত্রে যুনক্তি?

কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই যে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় মন, তাহা আপনার বিষয়েতে পতিত হয়? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া শরীরের মধ্যে যে প্রধান প্রাণবায়ু তাহা আপনার বিষয়ে যুক্ত থাকে? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকল বাক্য অভিব্যক্ত হয়? সেই দেবতা কে? যিনি চক্ষু এবং কর্ণকে আপন আপন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতেছেন?

সর্ব্বপ্রকার সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া, সহজ ও শুদ্ধভাবে আপনার ইন্দ্রিয় সকলের অনুসরণ ও অনুশীলন করিতে করিতেই এরা যে স্বতন্ত্র ও স্বপর্য্যাপ্ত নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আর তখনই আমরা যিনি "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং তৎ" ও "প্রাণস্য প্রাণং" তাঁহাকে এই সকল চক্ষুরাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্যেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারলাভ করিতে হয়—ছাড়াইয়া বটে, কিন্তু ছাড়িয়া নহে। অতিক্রম করিয়া বটে, কিন্তু বর্জ্জন করিয়া নহে।

মনের মধ্যেই চিন্তামণি বিরাজ করিতেছেন। মনকে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু মনকে ধরিয়াই সে চিন্তামণিকে পাইতে হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রামের বা হৃষীকসমাজের মাঝখানেই হৃষীকেশ বাস করেন। তিনি ইন্দ্রিয়কুলের অধীশ্বর, রাজা। রাজাকে তাঁর স্বরাজ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, পররাষ্ট্রে নহে। চিন্তামণিকে চিন্তা হইতে, হৃষীকেশকে হৃষীকসমাজ হইতে

পৃথক্ করা যায় না। করিলে, তাহা কৃষ্ণত্ব, শুক্লত্ব প্রভৃতির ন্যায় একটা ভাববাচ্য শব্দ মাত্রে পরিণত হয়, তার বস্তুত্ব আর থাকে না। ইংরেজিতে ইহাকে abstraction বলে। এই সকল abstraction এর উপরেই আমাদের যাবতীয় মানসকল্পনা গড়িয়া উঠে। এগুলি সত্য নহে, সত্যাভাস মাত্র। চিন্তামণি আমাদের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে, নিত্যকাল আমাদের প্রত্যেক চিন্তাকে ধরিয়া, জড়াইয়া, ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন। হৃষীকেশ আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রতি চেষ্টার সঙ্গে, তাহাদের আশ্রয় ও প্রেরয়িতা হইয়া নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। আর মন প্রাকৃত বস্তু; কিন্তু সেই মনবিহারী মনোময় চিন্তামণি যিনি, তিনি অপ্রাকৃত। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় সকলও প্রাকৃত; কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ও অধীশ্বর হইয়া যিনি আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-চেষ্টাকে সম্ভব ও সফল করিতেছেন, সেই হৃষীকেশ অপ্রাকৃত। মন প্রাকৃত হইলেও এই মনকে ছাড়িয়া অপ্রাকৃত বস্তু যে চিন্তামণি তিনি তিলার্দ্ধকাল তিষ্ঠিতে পারেন না। নিমেষের জন্যও অপ্রাকৃত বস্তু যে হৃষীকেশ তিনি কদাপি এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না প্রাকৃতের ভিতরেই অপ্রাকৃতের; অপ্রাকৃতের আশ্রয়েই প্রাকৃতের প্রতিষ্ঠা। এ দুইকে পৃথক্ করা যায় না। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত ছায়াতপের ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া আছে।

অতএব শৃঙ্গাররসকে প্রাকৃত আর মাধুর্য্যকে অপ্রাকৃত বলিলে উভয়ের মধ্যে কোনও আত্যন্তিক ব্যবধান বা স্বাভাবিক বিরোধের প্রতিষ্ঠা হয় না। চিন্তামণি যেমন মনের মধ্যে, মনকে ধরিয়া ও জড়াইয়া, ওতপ্রোতভাবে তাহার সঙ্গে মিশিয়া ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন, সেইরূপ শৃঙ্গাররস বা আদিরসের মধ্যেই, আমাদের কামপ্রবৃত্তিকে ধরিয়া ও জড়াইয়া, তাহারই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াই মাধুর্য্যরসও ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ কেবল প্রজনন-ক্রিয়ামাত্রকে শৃঙ্গারপদবাচ্য করিলে, তাহাকে মাধুর্য্য বলা যায় না। কিন্তু যখনই এই প্রজনন-ক্রিয়ার মধ্যে আনন্দ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহা রসপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া, প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিতে থাকে। শৃঙ্গার ও মাধুর্য্য দুইটী ভিন্ন বস্তু নহে। একই অভিজ্ঞতার বা একই সত্যের দুইটা দিক্ মাত্র। ছায়াকে ছাড়িয়া যেমন আতপ থাকে না ও থাকিতেই পারে না, আর আতপের আশ্রয় ব্যতীত যেমন ছায়ার প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য, সেইরূপ শৃঙ্গার বা আদিরসকে বর্জ্জন করিয়া মাধুর্য্যরস জন্মিতে ও থাকিতে পারে না; আর মাধুর্য্যের আশ্রয় ব্যতীত শৃঙ্গার বা আদিরসেরও জন্ম বা স্থিতি আদৌ সম্ভব হয় না।

শৃঙ্গার-রস আমাদের দেহকে আশ্রয় করিয়াই জন্মে, সত্য; কিন্তু আবার জন্মিয়াই এই রস যে সেই শরীরকেই আপনার যথাযোগ্য স্ফূর্ত্তির অন্তরায় বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করে, ইহাও সত্য। শরীরও এ রসসঞ্চারে আপনাকে সার্থক ভাবিয়া, তাহাকে আপনার মধ্যে রাখিতে চাহে। এই জন্য উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়। এই সংগ্রাম হইতেই স্বেদ-কম্পাদি মাধুর্য্য-চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আসঙ্গলিপ্সা এই রসের একটা অতি প্রধান লক্ষণ। স্বল্প-বিস্তর সকল স্থায়ী রসেতেই আপনার উপজীব্য যে বস্তু তার সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে। দাস প্রভুর নিকটে নিত্যকাল থাকিতে চাহে। সখা সখার সঙ্গে গলাগলি করিয়া চিরদিন কাটাইতে চাহে। পিতামাতাও আপনার বাৎসল্যকে তৃপ্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা সন্তানের মুখ দেখিবার ও তাহাকে কোলে লইয়া, বুকে করিয়া রাখিবার জন্য লালায়িত হন। এ সকলই সত্য। কিন্তু দাস্যে বা সখ্যে বা বাৎসল্যে যে আসঙ্গলিপ্সা দেখা যায়, মাধুর্য্যের আসঙ্গলিপ্সার সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না। এমন কি এই দুই আসক্তি যে একজাতীয় ইহাও মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে। আপনার দেহ-মন-প্রাণ সমুদায় প্রিয়জনের দেহ-মন-প্রাণের মধ্যে একেবারে মিশাইয়া, একেবারে তাঁহাকে আত্মসাৎ ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার বাসনা এ রসে নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। তার দেহটাকে এই দেহের অণুতে অণুতে টানিয়া আনিতে চাহে। এই দেহটাকে তার দেহের অণুতে অণুতে মিশাইয়া দিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই যে প্রবল পিয়াসা, ইহাই শৃঙ্গারের আসঙ্গলিপ্সা। এই অদ্ভুত আসঙ্গলিপ্সা আর কোনও রসেতে নাই। আর এই লিপ্সা যত বলবতী হয়, ততই এ স্থূল শরীরটাকে রসস্ফূর্ত্তির অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়। তখন বাস্তবিকই মনে হয় এ অস্থিমাংসময় দেহ যদি গলিয়া জল হইয়া যায়, তবে সেই জলে প্রিয়-অঙ্গের অভিষেক করিয়া প্রণয়িজন আপনার দেহকে সার্থক ও জীবন সফল করিতে পারিত।

অগুরু চন্দন হতাম, তুয়া অঙ্গে মাখাইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায় হে।

এ কেবল একটা কথার কথা নহে। ইহাতে কেবল কবিকল্পনাসুলভ অতিশয়োক্তিই আছে বলিয়া মনে করা ঠিক নয়। ইহা মাধুর্য্যের সার্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতা। এ রস-শরীরটাকে ধরিয়া, শরীরটাকে নিঙাড়িয়া শরীরের শরীরত্বকে নষ্ট করিয়া, শরীরকেই আপনার ইন্দ্রজাল-প্রভাবে আত্মময় ও আত্মাকেই আবার যুগপৎ শরীরময় করিয়া তবে আপনার পরিণতি পাইবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে, কিন্তু পায় না। কারণ এ রস আনন্দস্বরূপ। যিনি রসস্বরূপ, শ্রুতি যাহাকে রসোহ বৈ সঃ বলিয়াছেন, এ রস তাঁহারই রসধারাকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহারই নিখিল রসমূর্ত্তিকে পাইবার জন্য ফুটিয়া উঠে। এই জন্যই সাধক কবিকুল-চূড়ামণি চণ্ডীদাস এই শৃঙ্গার-রসের এমন মর্য্যাদা প্রচার করিয়াছেন :—

শৃঙ্গার বুঝিবে কে ?
সব রসসার শৃঙ্গার এ।
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গারে মজে॥
সকল রসের শৃঙ্গার সেরা।
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা॥
কিশোর কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন॥
চণ্ডীদাসে কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥

প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের মধ্যেই অপ্রাকৃত মাধুর্য্য জন্মে সত্য; কিন্তু এই শৃঙ্গার-রস-সম্ভোগের অধিকারীও জগতে সকলে হয় না।

ল্লাস এ রসের প্রাণ; সম্ভোগে যেখানে স্বাভাবিক অবসাদ আনিয়া দেয়, সে ক্ষেত্রে কই শৃঙ্গাররস ফুটিতে পায় না। নির্ব্বীর্য্য লোকের কামক্রীড়াতে শৃঙ্গাররস জন্মিতে পারে না। প্রকৃত শৃঙ্গাররস যেখানে ফুটিয়া উঠে, সেখানে সম্ভোগে অবসাদ আসা তো দূরের কথা, কেবল উল্লাসই আরো উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়। এই জন্যই প্রকৃত মাধুর্য্যে সম্ভোগের পরে "রসোদ্গার" বর্ণিত হয়। এ রসোদ্গার অপূর্ব্ব বস্তু। ইহাতে প্রেমের অনন্ত পিয়াসা ও অনন্ত পরিতৃপ্তি বর্ণে বর্ণে স্ফুরিয়া উঠে।

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম, রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল;
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

ইহা প্রেমিকের কথা, কামুকের নহে। আর কাম ও প্রেম এক হইয়াও এক নহে।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

এই প্রেমই মাধুর্য্যের সার। ইহা কাম হইয়াও কাম নহে; শারীর হইয়াও অশরীরী; প্রাকৃত হইয়াও অপ্রাকৃত। এ রস রূপের মধ্যেই নিয়ত অরূপের শোভা ফুটায়; অরূপের মধ্যেই নিয়ত রূপ জাগাইয়া তোলে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রামাবতী

(৫

সেকালের বাঙ্গালীর পক্ষে বাহুবলের প্রয়োজন ছিল। বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে হইত,—আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলেই আত্ম-প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে হইত। কারণ, বাঙ্গালাদেশের উপর অনেকেই লোলুপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন,—অবসর পাইবামাত্র অনেকেই বাঙ্গালাদেশের উপর আপতিত হইতেন।

রাজেন্দ্র চোড় এইরূপে একবার বঙ্গভূমির কিয়দংশ লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে সাহসী হইয়া, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবার জন্য অনেকে অনেক চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেকালের বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই বাহুবলের অনুশীলন করিতে হইত। জনসমাজে তাহার প্রশংসা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল;—কাব্যে ও কথোপকথনে তাহার জয়ধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের ন্যায় রাজকুমারগণকেও বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইত।

তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের তিন পুত্রের

মধ্যে রামপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পিতার শাসনকালেই বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া, সমগ্র অরাতিচক্রকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহা তৎকালে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিল বলিয়া ইহার কথা মদনপাল দেবের [মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত] তাম্র-শাসনে উল্লিখিত হইয়াছিল। যথা,—

"শাসত্যেব চিরং জগন্তি
জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ।
তেজোভিঃ পরচক্র-চেতসি
চমৎকারং চকার স্থিরম্॥"

সে যুগে বাহুবলের প্রয়োজন ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল, প্রাধান্য ছিল। সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া বালক বীর রামপাল যে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া, লোকসমাজে "সর্ব্বসম্মত" হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারিত। এরূপ অনুমান ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালীতে অবলম্বিত হইবার অযোগ্য বলিয়া কথিত হইতে পারিত না। কিন্তু রামপাল যে সত্য সত্যই এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, গৌড়-কবি সন্ধ্যাকরনন্দী [রামচরিতম্ কাব্যে] স্পষ্টাক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পুত্রত্রয়ের মধ্যে বয়ঃক্রমে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও, গুণগৌরবে রামপাল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদানের জন্য সন্ধ্যাকর লিখিয়া গিয়াছেন,—

"জ্যেষ্ঠস্তেষু বিরেজে রামঃ।"

এখানে "জ্যেষ্ঠ" বলিতে যে বয়োজ্যেষ্ঠ বুঝিতে হইবে না, তাহা বুঝাইবার জন্য রাম-চরিতম্ কাব্যের টীকাকার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"প্রশস্ততমঃ।"

রামপাল শ্রেষ্ঠ বলিয়াই "সর্ব্বসম্মত" হইয়াছিলেন। পালসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়-কাহিনী স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়—প্রকৃতি-পুঞ্জের নির্ব্বাচনক্রমেই পালবংশীয় প্রথম নরপাল গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে সাম্রাজ্যে প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ-বিরাগের মূল্য ছিল। তাহাদের বাহুবল ছিল; প্রয়োজন উপস্থিত হইলে একত্র মিলিত হইয়া রাজশক্তিকে সুসংযত করিবার সামর্থ্য ছিল; রাজার পক্ষে প্রজা-পুঞ্জের ইচ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহা-দিগকে লোকপ্রিয় হইতে হইত। লোকপ্রিয় হইবার জন্য যত্ন করিতে হইত। যাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতেন, তাঁহাদের নাম ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পথে ঘাটে ভক্তিভরে গীত হইত। তাহাই তাঁহাদের সিংহাসনকে অটল করিয়া রাখিত,—শাসনকে শক্তিদান করিত,—সমৃদ্ধিকে স্ফীত করিয়া তুলিত।

রামপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও, "সর্ব্বসম্মত" হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়ে নানা আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছিল। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়াই সে সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন কি না, তদ্বিষয়েও সংশয় আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল। অন্ততঃ রামচরিতম্ কাব্যে এইরূপ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোনও কালেই খলের অভাব ঘটে না। সেকালেও খলের অসদ্ভাব ছিল না। তাহারা মহীপাল দেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিল,—

রামপাল যখন "সর্ব্বসম্মত," তখন পিতার দেহাবসানের পর, তিনিই রাজ্যলাভ করিবেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব দেহত্যাগ করিবামাত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, এই আশঙ্কার মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে শূরপাল ও রামপাল সহোদরদ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামচরিতম্ কাব্যে এই আখ্যায়িকা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে কবি-কল্পনা বলিবার উপায় নাই। কারণ, সমসাময়িক কবির পক্ষে এতদ্বিষয়ে অমূলক কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করিবার সাহস ও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। সুতরাং রামচরিতম্ কাব্যের এই আখ্যায়িকার উপর নির্ভর করিয়া বুঝিতে পারা যায়,—দ্বিতীয় মহীপাল-দেবের কর্ম্মদোষে গৃহকলহে তাঁহার শাসন-শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল তাহাই নয়,—তাঁহার এই ভ্রাতৃদ্রোহ তাঁহার বিরুদ্ধে লোকচিত্ত প্রধূমিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অটল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার [অনীতিকারম্ভরত] নীতিবিগর্হিত অশিষ্ট আচরণে সিংহাসন টলিয়া উঠিল। পাল-সাম্রাজ্যের পক্ষে তাহার ফল বড় শোচনীয় হইল,—বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষেও হয় ত তাহারই ফল অধঃপতনের প্রবল বেগ প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিল। দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইল।

এই সময়ে পালসাম্রাজ্যের রাজধানী যেখানেই থাকুক না কেন, তাহা যে বরেন্দ্র-মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, সন্ধ্যাকর তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বরেন্দ্র-ভূমি বহুসংখ্যক কৃষিক্ষেত্রে ও আবাসগৃহে অলঙ্কৃতা ছিল বলিয়া সন্ধ্যাকর তাহাকে "সীতাবাসালঙ্কৃতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাল-নরপালগণের জন্মভূমি ছিল বলিয়া সন্ধ্যাকর তাহাকে "জনকভূ" বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। সেই জনকভূ বরেন্দ্রী [কান্তা] কমনীয়া ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহীপাল দেবের নীতিবিগর্হিত আচরণে সেই জনকভূমি হইতে পালরাজগণের শাসন-ক্ষমতা উৎখাত হইয়া গেল। দ্বিতীয় মহীপাল দেব নিহত হইলেন। বিপ্লবের নায়ক কৈবর্ত্ত-নায়ক দিব্য বা দিব্বোক উচ্চরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসনদণ্ড তাঁহারই করতলগত হইল। এই বিপ্লব-কাহিনী কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর স্মৃতিপট হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যকথা তাহাকে আবার বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছে, এই বিপ্লবকাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ইহা এখন "কৈবর্ত্তবিপ্লব" নামে কথিত হইতেছে। ইহার বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্ভিক্ষকমিশনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্রকে ভারতের নানাস্থানে কমিশনের বৈঠকে যোগদান করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য নাগপুরে অবস্থান কালে ১৯০১ সালের ১৬ই জানুয়ারী তিনি স্বর্গারোহণ করেন। যে কর্ম্মক্ষেত্রে এই সুযোগ্য বঙ্গসন্তান বহুবর্ষ ধরিয়া অসাধারণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন—সেখানে তাঁহার অভাব সম্যক্ অনুভূত হইতে লাগিল। এই বৎসর এপ্রেল মাসে মহারাজ সংসারচন্দ্রকে মন্ত্রি-সভার বৈদেশিক বিভাগের অন্যতম সদস্যপদে মনোনীত করিলেন। কৌন্সিলের বৈদেশিক বিভাগের (Foreign Department) কার্য্য বিশেষভাবে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের সহিত সংস্পৃষ্ট এবং রাজ্যের সাধারণ ব্যবস্থার ভারও এই বিভাগের উপর অর্পিত। কাজেই প্রথম হইতেই রাজ্যশাসন-কার্য্যের প্রধান ভার সংসারচন্দ্রের উপর পড়িল।

সংসারচন্দ্র যখন কর্ম্মভার গ্রহণ করেন, তখন জয়পুররাজ্যের বড় দুঃসময় চলিতেছিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রজাবৃন্দ তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রজাবৎসল মহারাজ মুক্তহস্তে প্রজাদিগকে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। ইহার উপর আবার রাজ্যে মহামারী প্লেগ দেখা দিয়াছে। গঙ্গোত্রী হইতে ফিরিয়া অবধি সংসারচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। এই সকল নানা কারণে সংসারচন্দ্রকে প্রথম বৎসরে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংসারচন্দ্র কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া রাজ্যে ও রাজকার্য্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া লইলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বজনপ্রিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতসাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডবার্ডের সিংহাসনারোহণ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ১৯০২ সালে জয়পুরাধিপতি ইংলণ্ডে যাইবার নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু-নরপতির বিলাত-গমন এক অভিনব ঘটনা—শুধু জয়পুরের কেন সমগ্র ভারতের ইতিহাসে ইহা নূতন। হিন্দুর চির-ক্ষুণ্ণ পথে চালিত জয়পুররাজ্যের জনসাধারণ এ প্রস্তাবের বিপক্ষে, কেবলমাত্র সংসারচন্দ্রই একা এ বিষয়ে মহারাজের সহায়। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে একত্র করিয়া যে যে কারণে বর্ত্তমানকালে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ, সে সমুদায় নিরাকরণ করিলে এ যাত্রার কোন শাস্ত্রসঙ্গত বাধা আছে কি না জানিতে চাহিলেন। তারপর, বহু আলোচনার পর পণ্ডিত-বর্গের মত গ্রহণ করিয়া সংসারচন্দ্র মহারাজের বিলাত-গমনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নব নির্ম্মিত একটি সমগ্র জাহাজ ভাড়া লওয়া হইল—

কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত রহিল যে কোন কর্ম্মচারীই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মাংসাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তারপর অর্ণবপোত-শুদ্ধি এবং সমুদ্র-পূজার ব্যবস্থা হইল। সঙ্গের সমগ্র লোকের ছয়মাসের আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। মহারাজ স্বয়ং গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য জল পান করেন না—তাঁহার জন্য পানীয় গঙ্গাজল যথারীতি হরিদ্বার হইতে লওয়ার ব্যবস্থা হইল। মহারাজের ইষ্টদেবতা গোপালজী সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহার নিয়মিত পূজাদির দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দাঁতনকাটিটি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যই পরিত্যক্ত হইল না। এই সময়ে সংসারচন্দ্রকে দৈনিক ১৮।২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যবস্থা স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া করা তাঁহার অভ্যাস। এ সকলের মধ্যেও রাজ্যের নিয়মমত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত—কোনও কর্ত্তব্যই তাঁহার দৃষ্টিপথের বাহিরে যায় নাই। রাজ্যশাসনের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজে মহারাজের সহিত বিলাত গমন করিলেন। এই কার্য্যে সংসারচন্দ্র একক সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়পুর এবং মহারাজ মাধোসিংহের নাম জগতের নিকট সুপরিচিত করিয়াছিলেন। পরমহিন্দু জয়পুরাধিপের বিলাতগমন ইংলণ্ডে হিন্দুনরপতিগণের কি প্রকার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা এখন ইতিহাসের সামগ্রী। হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার নিষিদ্ধতার মূলে যে কোন শাস্ত্রসঙ্গত বাধা নাই তাহাও মহারাজের এই বিলাতযাত্রা হিন্দুর নিকট প্রমাণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা জগতের কাছে হিন্দুর স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রমাণ করিয়াছে। ইংলণ্ডে ভারত-সম্রাটের নিকট হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়া মহারাজ সমগ্র হিন্দুস্থানের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

মহারাজের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর বৎসরই (১৯০৩) সপ্তম এডবার্ডের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে ভারতের পুরাতন রাজধানী দিল্লীতে লর্ড কর্জ্জন দরবার করিলেন। এই দরবারের পর রাজভ্রাতা ডিউক অফ্ কনট জয়পুরে শুভাগমন করেন। জয়পুরাধিপতিকে G. C. V. O. উপাধি প্রদান করিবার জন্য ভারত-সম্রাটের বিশেষ আদেশই তাঁহার জয়পুর আগমনের কারণ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট্—তৎকালে যুবরাজ (Prince of Wales)—পঞ্চম জর্জ্জ জয়পুরে আগমন করেন। যুবরাজের অভ্যর্থনায় সংসারচন্দ্র যে প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার রাজকার্য্যে দূরদর্শিতা, কর্ম্মনিষ্ঠা এবং রাজভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া স্বয়ং যুবরাজ এবং ভারতগভর্ণমেণ্ট বারংবার তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব-কালের কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আমরা তাঁহার শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ছোটবড় সকল কাজেই একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের প্রবর্ত্তন করা সংসারচন্দ্রের চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ ছিল—এ কথা আমরা বার বার দেখাইয়াছি; শিক্ষকতারই হউক আর মন্ত্রিত্বের কার্য্যই হউক—তিনি কখনও কোন কাজ এলোমেলো রকমের করিতে পারিতেন

না। তাই এত কার্য্যবাহুল্যের মধ্যেও তিনি সকল দিক্ দেখিবার সময় ও অবসর পাইতেন। মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির পর তিনি নিয়ম করেন যে সপ্তাহে তিনদিন তিনি সাধারণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবেন। তন্মধ্যে একদিন রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দারদিগের সহিত তাঁহাদের বৈষয়িক বিষয়ে ও অন্যান্য আলোচনা করিতেন। এক দিন রাজ্যের নানাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের যাঁহার যে বিষয়ে জিজ্ঞাস্য বা পরামর্শ ও উপদেশ লওয়ার থাকিত, তাঁহারা দেখা করিয়া মীমাংসা করিয়া লইতেন। তৃতীয় দিনে প্রজাসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন—সে দিন ছোট-বড়, দীন-দরিদ্র সকলেরই অবারিত দ্বার; সকলেই তাহাদের অভাব অভিযোগ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি অবহিতভাবে সকলের কথা শুনিতেন এবং সর্ব্ববিধ অত্যাচারের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন। প্রজাসাধারণের সহিত ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব এবং প্রজার প্রতি সহানুভূতি সবিশেষ প্রকাশ পাইত—দরিদ্র বা সহায়হীন বলিয়া কোন অত্যাচারিত বা দুঃস্থ তাঁহার কাছে বিমুখ হয় নাই। কেহ অন্যায় বা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে তিনি ধীরভাবে তাহাকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দিতেন—কখনও বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন না। তাই বিফলমনোরথ হইলে প্রত্যর্থী কেহ অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিত না।

রাজকর্ম্মচারিগণ যখন যে বিষয় লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতেন—তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সৎ মীমাংসা করিয়া দিতেন—সে সময় তাঁহার দূরদর্শিতা এবং রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত এবং রাজকার্য্য-পরিচালনে বিশেষ শৃঙ্খলা ও সুবিধা হইত।

সুপণ্ডিত, উদারচেতা বিজ্ঞ লর্ড মর্লির মন্ত্রিত্বকালে ভারতবাসী যে সকল সুবিধা ও ক্ষমতা পাইবার জন্য উৎসুক—সংসারচন্দ্র জয়পুররাজ্যে সেই উদারনীতির প্রবর্ত্তনা করিয়া তাঁহার উচ্চ আদর্শের এবং দূরদর্শিতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যের শাসনবিভাগে যখনই কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন বা নিয়োগের আবশ্যক হইত, তখনই তিনি স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ যাঁহারা জয়পুর কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তাহার ফলে আজি স্থানীয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত-যুবক রাজকার্য্যের নানা বিভাগে প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বহুসংখ্যক যুবক সেটেলমেণ্ট, পুলিশ এবং কৃষিকার্য্যে বিশেষ ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া রাজকার্য্যে ও রাজ্যের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজ্যের উন্নতি এবং পরোক্ষ ভাবে শিক্ষালাভের জন্য জনসাধারণের আগ্রহ জন্মিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এই উদারনীতির উপস্থিত ফল সম্বন্ধে এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন কথা বলা যায় না। কেননা জয়পুরের শিক্ষার অবস্থা দেখিলে মনে হয় সংসারচন্দ্র "fifty years ahead of his times" ছিলেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তিনি যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, জয়পুরের ভবিষ্যবংশীয়েরা তাহার ফলে লাভবান্ হইবে এবং এমন দিন আসিবে

যখন সংসারচন্দ্রের এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে।

সংসারচন্দ্র জীবনের প্রথম অংশ শিক্ষা-বিভাগে কাটাইয়াছিলেন। মন্ত্রিত্বকালে তিনি শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক দুই শতাব্দী পূর্ব্বে সুবিখ্যাত মহারাজ সবাই জয়সিংহ যে জ্যোতিষ-যন্ত্রালয় নির্ম্মাণ করিয়া জগতের কাছে হিন্দুজ্যোতিষ-শাস্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন—আজও যাহা পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময়ের বিষয়—সেই যন্ত্রালয়সমূহ এতদিন অব্যবহারে ও অপ-ব্যবহারে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া পড়িতেছিল। সংসারচন্দ্র জয়পুর, দিল্লী, কাশী প্রভৃতি স্থানের সেই সকল 'যন্ত্রমন্দিরের" সংস্কারের জন্য বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তা গ্রহণ ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া শুধু জয়পুর-রাজ্যের কেন হিন্দুর এক প্রধান পুরাকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

সংসারচন্দ্রের চেষ্টাতেই জয়পুর "মহারাজ কলেজের" বিজ্ঞান-বিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হয় এবং আজ উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান-বিভাগে উপযুক্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে D. S. C. (ডি, এস্, সি) পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইতেছে; তিনি এইখানেই ক্ষান্ত ছিলেন না। মহারাজের এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্ এল্ ডি (L. L. D.) উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে যে সভা হয়, তিনি সেই সভায় প্রতি বৎসর দশটি ছাত্রকে নানাপ্রকার কার্য্যকরী শিক্ষা দিবার জন্য বৎসরে দশ হাজার টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করাইয়াছিলেন। এই সকল ছাত্র বিদেশে গিয়া যাহাতে পূর্ত্ত, ব্যবহার-শাস্ত্র এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া জয়পুররাজ্যের উন্নতিকল্পে প্রস্তুত হইতে পারে, তিনি তাহার বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।

জয়পুররাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ সর্দ্দারদিগের সহিত সংসারচন্দ্র নানাপ্রকারে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকেই সংসারচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন এবং অধিকাংশের বংশের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল,—তাই তিনি তাঁহাদের পুত্র বা তৎবংশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারই উপদেশে ও যত্নে এখন অনেকেই আজমীর মেয়ো কলেজে (Mayo College) শিক্ষালাভ করিতেছেন। সংসারচন্দ্র সর্দ্দারপুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। নাবালক সর্দ্দারগণের বিষয় রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভার তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিনি এই সকল "ঠিকানা"-পরিচালনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার একান্ত যত্নে যে কত নাবালকের সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং কত ঋণভারগ্রস্ত "ঠিকানা" এই 'মুনসরিমীর" কালে ঋণমুক্ত হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে—তাহার বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নহে।

রাজকার্য্য এবং বিচারাদি যাহাতে সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়, সেজন্য সংসারচন্দ্র মন্ত্রিসভার কার্য্যপ্রণালীর বিবিধ পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করেন। মন্ত্রিসভার চারিটি বিভাগ; প্রথম,—বৈদেশিক বিভাগ (Foreign Department), এই বিভাগের উপর রাজ্যের

আভ্যন্তরীণ শাসন এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত রাজনৈতিক পত্র ব্যবহারের ভার ন্যস্ত। দ্বিতীয়,—রাজস্ব। তৃতীয়,—দেওয়ানী আপিল এবং চতুর্থ,—ফৌজদারী আপিল বিভাগ। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে সদস্যগণ প্রতিদিন প্রথমে নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য শেষ করিয়া শেষে একত্র হইয়া "সমবেত মন্ত্রিসভার" নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেন। এই শেষোক্ত সভার নাম—"ইজ্‌লাস্ জুম্‌লা মেম্বারান্"—ইঁহাদের কার্য্য কতকটা হাইকোর্টের Full Bench এর মত—ইহাতে বড় বড় মোকদ্দমার আপিল এবং রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আলোচনা হয়। পূর্ব্ব নিয়মে সদস্যগণ প্রথমে নিজ নিজ "সিগা" বা বিভাগের কার্য্য করিয়া—শেষে—"ইজ্‌লাসের" গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিতেন। তাহার ফলে এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্যে সর্ব্বদা নানা গোলযোগ, অব্যবস্থা এবং ত্রুটি লক্ষিত হইত। ইহাতে রাজ্যের এবং প্রজার—উভয় পক্ষেরই বিবিধ অসুবিধা ঘটিত। সংসারচন্দ্র এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য 'সিগার' এবং ইজ্‌লাসের কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। এই সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তনে কার্য্যের যে শৃঙ্খলা ও সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে মন্ত্রিসভায় উকিলদিগের বিশেষ কোন সম্মানই ছিল না। সংসারচন্দ্রের আমলে তিনি ইজ্‌লাসের কার্য্যে রাজ্যের এবং প্রজার পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্য পাওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহারাজীবদিগের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেখানে অল্পশিক্ষিত মুন্সিগণ আদালতে নিজ নিজ মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিত—আজ সেখানে এল্, এল্ বি পাশ করা আইনজ্ঞ উকিল মন্ত্রিসভায় ওকালতি করিতেছেন।

বর্ত্তমান কালে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়—রেলওয়ে। রাজপুতানার মত প্রায়শ দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের পক্ষে রেলওয়ের মত দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে আবশ্যক মত শস্যাদি প্রেরণের কোন উপায় ছিল না—রেললাইন সে সকল স্থান সর্ব্বপ্রকারে সুগম করিয়া দিয়াছে। ইহা রাজা-প্রজা সকলেরই লাভের কারণ। সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব কালে "জয়পুর—সবাই মাধোপুর ষ্টেট রেলওয়ে" খোলা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শে মহারাজ নবনির্ম্মিত "নগ্‌দা—মথুরা" রেলওয়ের যে ৮৫ মাইল জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে, তাহার নির্ম্মাণ খরচ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এই দুই রেলওয়ে লাইন রাজ্যের বাণিজ্য ও রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। সংসারচন্দ্রই প্রস্তাবিত "জয়পুর—শিখাবতী" রেল লাইনের সূত্রপাত করিয়া যান—কিন্তু নানা কারণে তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে কাজ আরম্ভ হইতে পারে নাই—কেবল সর্ভে ও এষ্টিমেট হইয়াছিল মাত্র। এই লাইন সম্পূর্ণ হইলে—জয়পুর রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম প্রদেশ সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিবে।

সংসারচন্দ্র জয়পুরের ডাকবিভাগের

কার্য্যপ্রণালীর আমূল সংশোধন করিয়া উহাকে এক প্রকার নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। তিনিই জয়পুররাজ্যের ডাক টিকেট প্রথমতঃ প্রচলন করেন। পূর্ব্বে চিঠী প্রভৃতি ডাকঘরে দিবার সময় মাশুল আদায় করা হইত অথবা চিঠী বা পার্শেল প্রভৃতি বেয়ারিং হইয়া মাশুল আদায় হইত। সংসারচন্দ্র ইংরাজী ডাকবিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এবং ডাকের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া এই বিভাগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি করেন। ডাকের সুব্যবস্থা হওয়ায় প্রজারা রাজ্যের ডাক-বিভাগের উপর অধিকতর আস্থাবান্ হওয়ায় রাজ্যে ডাকঘরের এবং পত্র-পার্শেলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল। তিনি রাজ্যমধ্যে ডাক-বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না—তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া লর্ড মিণ্টোর দরবারে জয়পুরের সহিত গভর্ণমেণ্টের Postal Convention-এর প্রতিশ্রুতি আনাইয়াছিলেন, কিন্তু করাল কাল তাঁহাকে ইহা সম্পূর্ণ করিতে দিল না।

রাজকার্য্যের প্রতি বিভাগেই সংসারচন্দ্র ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আমরা তাহার সবিস্তার বর্ণনা হইতে বিরত থাকিলাম। তিনি নিজের অসাধারণ চরিত্রবলে সমগ্র রাজকর্ম্মচারী ও রাজস্বের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসুলভ। যে দেশে উৎকোচ গ্রহণ কখনই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত না—সেখানে তিনি সদ্বংশজাত শিক্ষিত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া, দোষীকে দণ্ড দিয়া এবং উপদেশ ও আদর্শের দ্বারা দেশীয় রাজ্যের এ কলঙ্ক মোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সর্দ্দার ও সাধারণ প্রজার কোন ভেদ ছিল না। তিনি অত্যাচারিতের বন্ধু এবং দরিদ্রের সহায় ছিলেন। তিনি জ্ঞানতঃ কখন ন্যায় ও সত্যের পথ হইতে রেখামাত্রও ভ্রষ্ট হ'ন নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষমাত্রেরই ভ্রম হইতে পারে—সংসারচন্দ্রও মানুষ—তিনিও অভ্রান্ত ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার পরম শত্রুও কখন তাঁহার ন্যায়পরতা ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র করিতে পারে নাই।

সংসারচন্দ্র মহারাজ মাধো সিংহের একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে আমার দ্বারা যদি রাজকার্য্যের কোন সুবিধা বা উন্নতি হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ আমার নিজের ক্ষমতা নহে—মহারাজার গুণে। বাস্তবিক তাঁহার প্রতি মহারাজের এত গভীর বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল যে তিনি সংসারচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত সর্ব্বপ্রকার সংস্কার বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতেন এবং যাহাতে সে সকল নিয়ম কার্য্যে পরিণত হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে মন্ত্রী সংসারচন্দ্র দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন এবং রাজ্যশাসনে অনেক সময় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। যে দেশে ন্যায়-অন্যায়-নির্ব্বিচারে স্বার্থসিদ্ধিই রাজনীতির মূল মন্ত্র, যেখানে পরপীড়নেই ক্ষমতার সার্থকতা এবং বাহাড়ম্বরেই পদগৌরবের প্রকাশ, সেখানে ধর্ম্মভীরু ন্যায়নিষ্ঠ এবং স্বভাবতঃ ভদ্র ও বিনয়ী সংসারচন্দ্র যে শাসনকর্ত্তার সে আদর্শে পৌঁছিতে পারেন নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সেখানকার তুলাদণ্ডের পরিমাপে

ভদ্রতা ও বিনয়—দুর্ব্বলতা, ন্যায়পরতা—দুর্ব্বলতা, ধর্ম্মজ্ঞান—বিষয়বুদ্ধির অভাবের পরিচায়ক। সৌভাগ্যের বিষয় সংসারচন্দ্র সে আদর্শকে কখনও সম্মান করিতে পারেন নাই। তিনি শান্ত, সংযত, আড়ম্বর-শূন্য হইয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বার্থকে ধর্ম্মের ন্যায়ের আসনে বসান নাই। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং প্রভুপরায়ণতা তাঁহার জীবনের সর্ব্বকর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম্মকে বজায় রাখিয়া যাঁহারা রাজ্যশাসনকার্য্যে ব্রতী হয়েন, তাঁহাদের পক্ষে এ পথ যে কত কঠিন এবং বিপদসঙ্কুল, তাহা বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব নহে। সংসারচন্দ্র ধর্ম্মের এবং ন্যায়ের সহস্র সংযমের মধ্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন—তাহা তাঁহার মত যাঁহারা ধর্ম্মকে একমাত্র মানদণ্ড এবং ভয় করিবার বস্তু বলিয়া জানেন—যাঁহারা ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভীত হ'ন না—তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব।

রাজপুত এবং রাজপুতানার বিশেষতঃ জয়পুরের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে সংসারচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাহা মহারাজ এবং মন্ত্রিসভার সদস্যমণ্ডলীর নিকট রাজ্যের নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসার পক্ষে অমূল্য ছিল। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবেই জয়পুর রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত-সর্দ্দারগণ সসম্মানে এই ন্যায়নিষ্ঠ বাঙ্গালীর নিকট অবনত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং পর পর অনেক রেসিডেণ্ট এবং রাজপুতানাস্থিত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ সংসারচন্দ্রকে একান্ত বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহারা একবাক্যে তাঁহার রাজভক্তি, কর্ম্মনিষ্ঠা এবং উদার শাসনপ্রণালীর সুখ্যাতি করিয়াছেন।

মহারাজ এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট কেহই সাধুপ্রকৃতি প্রভুপরায়ণ সংসারচন্দ্রের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। অভিষেক-দরবারে মহারাজের সহিত বিলাত-প্রবাস কালে সম্রাট্ সপ্তম এডবার্ড তাঁহাকে "করোনেশন মেডেল" এবং তাহার পর বৎসর দিল্লী-দরবারে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ (তৎকালে যুবরাজ) জয়পুরে আসিয়া সংসারচন্দ্রকে M. V. O. (Member of the Royal Victorian Order) খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং এই বৎসরেই জয়পুরাধিপতি তাঁহাকে রাজ্যের "তাজিমী" বা প্রধান সর্দ্দারশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। দুই বৎসর পরে, (১৯০৭) মহারাজ প্রকাশ্য দরবারে সংসারচন্দ্রকে "প্রধান মন্ত্রী" পদে বরণ করিয়া তাঁহার কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ জায়গির প্রদান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নববর্ষারম্ভে ভারত গবর্ণমেণ্টের সংসারচন্দ্রকে C. I. E. উপাধি প্রদান করেন। সেই বৎসর মার্চ্চ মাসে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, মৃত্যুশয্যায় শায়িত এই প্রবীণ, প্রভুভক্ত রাজকর্ম্মচারীকে তাঁহার গৃহে আসিয়া উক্ত উপাধি পদক প্রদান করিয়া যোগ্যতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিদ্যানগর ত্যাগ করিয়া—গৌর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া চলিলেন। দাক্ষিণাত্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ, শ্রীবৈষ্ণব, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ সম্প্রদায়াবলম্বী লোক ছিল। গৌর সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোককেই স্বীয়-মতাবলম্বী করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া গৌর মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে মহেশ দর্শন করিলেন। তথা হইতে আহোবলমনগরে নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সিদ্ধিবটে গমন করতঃ সীতাপতি-মূর্ত্তিকে নমস্কার করিলেন। সিদ্ধিবটে এক রামোপাসক ব্রাহ্মণ গৌরের আতিথ্য সৎকার করেন। ব্রাহ্মণ একমাত্র রামনাম ভিন্ন অন্য কোনও নাম গ্রহণ করিতেন না। সিদ্ধিবট হইতে গৌর স্কন্দক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তথায় স্কন্দ দর্শন করিয়া ত্রিমঠে গমন করতঃ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমঠ হইতে গৌর সিদ্ধিবটে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত রামোপাসক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ গৌরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "তোমাকে দর্শন করা অবধি কৃষ্ণনাম আমার রসনায় বসিয়া গিয়াছে। আমি রামনাম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছি।" সিদ্ধিবট হইতে গৌর বৃদ্ধকাশী গমন করিয়া শিবদর্শন করিলেন এবং বৃদ্ধ-কাশীর সন্নিহিত একগ্রামে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া তার্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক প্রভৃতি বহুবিধ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া এক বৌদ্ধাচার্য্য গৌরের সহিত তর্ক করিবার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তর্কে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বহু বৌদ্ধ মিলিয়া গৌরকে অপদস্থ করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা এক পাত্রে অপবিত্র অন্ন স্থাপন করিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া তাহা গৌরকে দিতে আসিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক মহাকায় পক্ষী অন্তরীক্ষ হইতে আপতিত হইয়া সেই অন্নসহ পাত্র লইয়া আকাশমার্গে পুনরুত্থিত হইল। অনতিবিলম্বেই সমস্ত অন্ন বৌদ্ধ-গণের শিরে এবং সেই ধাতুপাত্র বৌদ্ধা-চার্য্যের মস্তকে পতিত হইল। আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মূর্চ্ছা-

ভঙ্গে স্বীয় অপচার হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচার্য্য সশিষ্যে গৌরের শরণ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট কৃষ্ণনাম লইয়া কৃতার্থ হইলেন।

ত্রিপদী ত্রিমল্লে যাইয়া গৌর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলেন এবং বেঙ্কটগিরি হইয়া ত্রিপদীনগরে যাইয়া রামসীতাকে নমস্কার করিলেন। অতঃপর পানা নরসিংহ দর্শন পূর্ব্বক শিবকাঞ্চী, ত্রিমল্ল, ত্রিকালহস্তী, পঞ্চতীর্থ, বৃদ্ধকেরল, পীতাম্বর শিয়ারী ভৈরবী, প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কাবেরী গমনপূর্ব্বক বহুসংখ্যক শৈবকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। দেবস্থান, কুম্ভকর্ণ শিবক্ষেত্র, পাপনাশন ভ্রমণ করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করতঃ গৌর রঙ্গনাথের সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গৌর বেঙ্কট ভট্টনামক এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে চারিমাস অবস্থিতি করিলেন। বহুসংখ্যক লোক তথায় তাঁহার নিকট কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিল। তথায় এক ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বসিয়া প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতেন। তাঁহার অশুদ্ধ উচ্চারিত গীতাপাঠ শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গৌর দেখিলেন গীতাপাঠের সময় ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, তাঁহার শরীরে অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হইত, এক দিন গৌর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গীতার কি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনি এত আনন্দলাভ করেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "আমি মূর্খ; শব্দার্থ আমি কিছুই জানি না। শুদ্ধ অশুদ্ধ কিছুই বুঝি না। কিন্তু যতক্ষণ গীতা পাঠ করি, দেখিতে পাই শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে সারথিবেশে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। তাই আমার এত আনন্দ।" "তোমারই গীতাপাঠ সার্থক।" বলিয়া গৌর ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। গৌর যতদিন রঙ্গক্ষেত্রে ছিলেন ব্রাহ্মণ তদবধি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই।

বেঙ্কট ভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। গৌর একদিন হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ত পতিব্রতার শিরোমণি; কিন্তু তিনি গোপবালক কৃষ্ণের সঙ্গম লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন বলিতে পার?" ভট্ট কহিলেন—"কৃষ্ণ ও নারায়ণ ত একই, সুতরাং লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গমকামনায় কোনও দোষ হইতে পারে না।"

গৌর বলিলেন—"শাস্ত্রে আছে, লক্ষ্মী কৃষ্ণের সহিত রাসকেলি করিতে অধিকার পান নাই। কিন্তু শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া সে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি?"

ভট্ট কহিলেন—"এ সমস্ত আমার বুদ্ধির অগম্য। তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও।"

গৌর কহিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিত না। কেহ তাঁহাকে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বাঁধিয়াছে; কেহ সখাজ্ঞানে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে, ব্রজবাসী তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জানিত, তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাহাদিগের ছিল না। এই ব্রজবাসীর ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন

প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিগণ গোপীদেহ গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজনা করিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণসঙ্গে রাসলীলার অধিকারী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ গোপ, তাঁহার প্রেয়সীও গোপী। দেবী অথবা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ স্বীকার করেন না। শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী-দেহে রাসবিলাস কামনা করিয়াছিলেন; তাই সফলকামা হইতে পারেন নাই। ভট্ট সন্দেহ করিও না—কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।

ভাগবত ১৷৩৷২৮

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপীকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥

ভট্টের বিশ্বাস ছিল—নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, এবং শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৌরের বচনে তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইল। তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া গৌর কহিলেন "ভট্ট, দুঃখিত হইও না। শাস্ত্রের যাহা সিদ্ধান্ত তাহাই তোমাকে বলিলাম। কৃষ্ণ-নারায়ণে ভেদ নাই। গোপী ও লক্ষ্মী অভিন্ন। ঈশ্বরত্বে ভেদ স্বীকার করিলে অপরাধ হয়। একই বিগ্রহ নানারূপ ধারণ করেন।"

"তোমার কৃপায় ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিলাম" বলিয়া ভট্ট গৌরের চরণে প্রণত হইলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গৌর ঋষভ-পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় পরম ভাগবত পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তথা হইতে শ্রীশৈল ও কামকোষ্ঠী হইয়া দক্ষিণ মথুরায় গমন করিলেন। এই শেষোক্ত স্থলে গৌর এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণ রন্ধনের কোনও আয়োজন করিলেন না। গৌর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন—"প্রভু, আমি অরণ্যবাসী, সম্প্রতি অরণ্যে ভক্ষ্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। লক্ষ্মণ ফলমূল আহরণার্থ গমন করিয়াছেন; তিনি ফিরিয়া আসিলে সীতা রন্ধনের আয়োজন করিবেন।" রামোপসক ব্রাহ্মণের রামৈকচিত্ততা দেখিয়া গৌর প্রীত হইলেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে রন্ধন করিয়া গৌরকে ভোজন করাইলেন, কিন্তু নিজে কিছুই গ্রহণ করিলেন না। গৌর পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন—"রাক্ষস রাবণ জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাদেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে, এই দুঃখে আমার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিব।" তাহাকে প্রবোধ দিয়া গৌর কহিলেন—"রাবণের সাধ্য কি লক্ষ্মীস্বরূপিণী ঈশ্বরপ্রেয়সী চিদানন্দমূর্ত্তি সীতাকে স্পর্শ করে? তাঁহাকে দেখিবার শক্তিই তাহার নাই, স্পর্শ ত দূরের কথা। রাবণ আসিবার পূর্ব্বেই সীতা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; রাবণ মায়া-সীতাকে হরণ করিয়াছিল। বেদপুরাণের ইহাই অভিমত। বিশ্বাস কর এবং দুর্ভাবনা ত্যাগ করিয়া ভোজন কর।" ব্রাহ্মণ ভোজন করিলেন। গৌর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুর্ব্বেশন গমন করিলেন ও তথা হইতে মহেন্দ্র শৈলে পরশুরাম দর্শন করিয়া সেতুবন্ধে আসিয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। তদনন্তর রামেশ্বর-তীর্থে গমন করতঃ তথায় কয়েক দিন বিশ্রাম

করিলেন। রামেশ্বরে এক ব্রাহ্মণ-সভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ শুনিতে গিয়া গৌর পতিব্রতার উপাখ্যান মধ্যে রাবণ-কর্ত্তৃক মায়াসীতা-হরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া নিজের পূর্ব্বকৃত ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণ মথুরায় গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রামোপাসককে দান করিলেন। বিপ্র পরম সন্তুষ্ট হইয়া গৌরের নানা -স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তথা হইতে গৌর পাণ্ড্যদেশান্তর্গত তাম্রপর্ণী গমন করিলেন। তৎপরে তিনি যে সমস্ত স্থানে গমন করিলেন তাহার নাম—নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তালা, তিল কাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়ি, কামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বত, কন্যাকুমারী এবং আমলকীতলা। শেষোক্ত স্থান হইতে গৌর মল্লারদেশে গমন করিলেন। তথায় ভট্টমারী নামে এক ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল। গৌরের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে যে ব্রাহ্মণ ছিল, ভট্টমারিগণ স্ত্রী ও ধনের লোভ দেখাইয়া, তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গেল। গৌর ভট্টমারিগণের নিকট যাইয়া কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করিতে কহিলেন। প্রত্যর্পণ করা দূরের কথা—ভট্টমারিগণ তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র-সহ আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হাত হইতে পড়িয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ভট্টমারিগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। গৌর কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং সেই দিনই পয়স্বিনী নদীর তীরস্থ এক গ্রামে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইস্থানে আদিদেব কেশব-মন্দিরে তাঁহার নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিয়া বহুলোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এইখানে "ব্রহ্মসংহিতা" নামক এক ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ পাইয়া গৌর অতি যত্নের সহিত তাহা লেখাইয়া লইলেন। অনন্তর অনন্ত পদ্মনাভ, শ্রীজনার্দ্দন, পয়োষ্ণী, শৃঙ্গগিরি ভ্রমণ করিয়া গৌর উদিপী আসিয়া উড়ুপকৃষ্ণ দর্শন করিলেন। মধ্বাচার্য্য এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং তদীয় শিষ্য তত্ত্ববাদিগণ এই মূর্ত্তির সেবক। সেই নৃত্যপর গোপালমূর্ত্তি দেখিয়া গৌর প্রেমোন্মত্ত হইয়া বিস্তর নৃত্য-গীত করিলেন। তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদী সন্ন্যাসী মনে করিয়া, প্রথমে তাঁহার সহিত আলাপ করেন নাই। অবশেষে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া পরম যত্নে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা গৌরের সহিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথা হইতে গৌর অনন্ততীর্থ, ত্রিতকূপ, বিশালা, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ দ্বৈপায়নী, সূর্পারক, কোলাপুর ও পাণ্ডুপুর গমন করিয়া তত্রত্য দেবমূর্ত্তি সমুদয় দর্শন করিলেন। পাণ্ডুপুরে মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গৌর পরম প্রীত হইলেন। গৌর যখন তাঁহাকে প্রেমাবেশে প্রণাম করিলেন, তখন শ্রীরঙ্গপুরী কহিলেন "শ্রীপাদ, নিশ্চয় আমার গুরুর সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে, অন্যত্র এরূপ প্রেম দুর্ল্লভ।" গৌর ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করিলেন। মাধবপুরীর সহিত শ্রীরঙ্গপুরী একবার নবদ্বীপে গমন করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। গৌরের জন্মস্থানের পরিচয় পাইয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে শচীদেবীর প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনের প্রশংসাবাদ করিয়া কহিলেন-

"তাঁহার এক পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীশঙ্করারণ্য নাম পরিগ্রহ করিয়া পাণ্ডুপুরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" শুনিয়া গৌর কহিলেন, "পূর্ব্বাশ্রমে শঙ্করারণ্য আমার ভ্রাতা ছিলেন।" শ্রীরঙ্গপুরী তথা হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন—গৌর পাণ্ডুপুরে কিছু দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় বহির্গত হইলেন—এবং কৃষ্ণ-বেণা নদীতীরে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তথায় "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক সুন্দর গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। মাহিষ্মতী, ধনুতীর্থ, ঋষ্যমূখ, পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, নাসিত্র্যম্বক, ব্রহ্মগিরি, কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গৌর বিদ্যানগরে প্রত্যাগত হইয়া রামানন্দের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। গৌর রামানন্দকে ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থদ্বয় প্রদান করিলেন। রামানন্দ কহিলেন "তোমার নিদেশমত আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম। রাজা আমাকে নীলাচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি যাইবার আয়োজন করিতেছি। তুমি আগমন কর, দিন দশ মধ্যে আমি নীলাচলে উপস্থিত হইব।" গৌর অচিরে নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নীলাচলে প্রত্যাগমন, উৎকলীয় ভক্তগণের সহিত মিলন, গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন, রথযাত্রা-মহোৎসব

গৌর দাক্ষিণাত্যভ্রমণে বহির্গত হইলে সার্ব্বভৌম রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিয়া জগন্নাথমন্দিরের সন্নিধানে একটী গৃহ গৌরের বাসের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহটী কাশীমিশ্রের। গৌর অবস্থান করিবেন শুনিয়া কাশীমিশ্র সানন্দে গৃহ দান করিয়াছিলেন। গৌর প্রত্যাগত হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নীলাচলের বহু ভক্ত উৎকণ্ঠিতভাবে গৌরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সার্ব্বভৌম একে একে সকলের সহিত গৌরের পরিচয় করাইয়া দিলেন। জগন্নাথের সেবক জনার্দ্দন, জগন্নাথের স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লেখক শিখি মাইতি, তাহার ভ্রাতা মুরারি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, সিংহেশ্বর মুরারি, প্রহররাজ মহাপাত্র, পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি সকলেই আসিয়া একে একে গৌরের চরণে প্রণত হইলেন। রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ চারি পুত্র সহ আসিয়া গৌরকে প্রণাম করিলেন এবং পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে তাঁহার সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর গৌর কৃষ্ণদাসকে আহ্বান করিয়া তাহার ভট্টমারিগণের সহিত প্রস্থান ও উদ্ধারবৃত্তান্ত বর্ণনা পূর্ব্বক কহিলেন "এখন তোমাকে আমি বিদায় দিতেছি। যথা ইচ্ছা তথায় যাইতে পার।" অনুতপ্ত হইয়া কৃষ্ণদাস রোদন করিতে লাগিল। তখন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ গৌরের প্রত্যাগমন সংবাদ প্রদান করিবার জন্য গৌরের অনুমতি লইয়া তাহাকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন।

যথাকালে কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে পৌছিয়া শচীমাতা ও অন্যান্য সকলকে গৌরের নীলাচল প্রত্যাগমনসংবাদ প্রদান করিল। ভক্তগণ নীলাচলে গমনের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন। পরমানন্দ পুরী তখন নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের

াগমনবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। গৌর ায় ভবনের একটী ঘর পরমানন্দের জন্য র্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ বদ্বীপে গৌরের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ৗরের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তিনিও সন্ন্যাস াহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তনি স্বরূপ দামোদর নাম গ্রহণ করেন। গৌর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে পত্যাগত ইলে স্বরূপ প্রেমবিহ্বল অবস্থায় তথায় াসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর পরম সমাদরে াহাকে গ্রহণ করিয়া, আপনার সহিত বাস করিবার অনুমতি দিলেন। স্বরূপ অনতি-কালমধ্যেই গৌরের প্রধান সেবক রূপে পরি-চিত হইলেন। কেহ কোনও সঙ্গীত অথবা কবিতা রচনা করিয়া গৌরকে দেখাইতে আসিলে স্বরূপ তাহা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। তাঁহার অভিমত হইলে তবে তাহা গৌরসকাশে পঠিত ও গীত হইতে পারিত।

কতিপয় দিবসান্তে গোবিন্দ নামক শূদ্র-বংশীয় এক ব্যক্তি গৌরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল "আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ছিলাম। পুরী মৃত্যুকালে আমাকে তোমার সেবা করিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমাকে গ্রহণ কর।" গুরুর সেবকের সেবা গ্রহণ করিতে গৌর প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া-ছিলেন; পরিশেষে গুরুর আদেশ পালনার্থ গোবিন্দকে সেবকরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

একদিন মুকুন্দ দত্ত আসিয়া সংবাদ দিল ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামক একজন বিশিষ্ট ভক্ত গৌরের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌর অনতিবিলম্বে ভারতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিয়া দেখিলেন, ভারতী মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন। বৈষ্ণবের চর্ম্মাম্বর দেখিয়া গৌর বিরক্ত হইলেন এবং মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভারতী গোসাঞি কোথায়?" মুকুন্দ ভারতীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন। গৌর কহিলেন "তোমার কথা অসম্ভব! ভারতী কেন চর্ম্ম পরিধান করিবেন?" ভারতীর অনুতাপ উদ্রিক্ত হইল এবং তিনি চর্ম্মাম্বর বর্জ্জন করিয়া বহির্বাস গ্রহণ করিলেন। তদবধি ব্রহ্মানন্দ ভারতী গৌরের সহিত একত্রাবস্থান করিতে লাগিলেন।

দুইশত ভক্ত নবদ্বীপ হইতে গৌরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া গৌর স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দকে তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিতে প্রেরণ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিত, আচার্য্যরত্ন, পুরন্দর আচার্য্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, হরি ভট্ট, শ্রীনৃসিংহানন্দ, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীকান্ত, শ্রীধর, বল্লভ সেন, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু, মুকুন্দ দাস, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন প্রভৃতি ভক্তগণ পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ যাইয়া প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যে

গলদেশে মাল্য দান করিলেন। পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র ভক্তগণের দর্শনলালসায় রাজ-প্রাসাদের উপরিভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন—গোপীনাথ আচার্য্য একে একে সকলের পরিচয় দিতে লাগিলেন। গৌর নিজগণ সহ বহির্গত হইয়া পথি মধ্যে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন, এবং প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়া একে একে সকলকেই আলিঙ্গন করিলেন। অবশেষে সকলকে লইয়া স্বীয় আবাসে উপনীত হইলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে গৌর কিছু ক্ষণ সকলেরই সহিত নানাবিধ ভাবালাপ করিলেন। অনন্তর দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত "ব্রহ্ম-সংহিতা" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থদ্বয় বাসুদেব ঘোষকে প্রদান করিয়া কহিলেন "তোমার জন্যই আমি গ্রন্থ দুই খানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।" সকলের সহিত কুশল প্রশ্ন শেষ হইলে গৌর হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূর হইতে গৌরকে দেখিয়া হরিদাস কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গৃহে প্রবেশ করেন নাই, গৃহসমীপে রাজপথে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৌরের আদেশে কয়েক জন ভক্ত তাঁহাকে লইতে আসিলেন। কিন্তু হরিদাস কহিলেন—"আমি পাপিষ্ঠ যবন, আমার মন্দিরের নিকট যাইবার অধিকার নাই।" গৌর এই কথা শুনিয়া তাঁহার গৃহসন্নিহিত উদ্যানস্থ একটী ঘর কাশীমিশ্রের নিকট হইতে হরিদাসের জন্য চাহিয়া লইলেন এবং স্বয়ং হরিদাসের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করতঃ সেই গৃহে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। এখানে প্রত্যহ হরিদাসের জন্য গৌর খাদ্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত নৃত্যগীত-কীর্ত্তনে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। এ দিকে রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে গৌর সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র ও উড়িষ্যাপাত্রকে ডাকাইয়া তাঁহাদের নিকট স্বয়ং গুণ্ডিচামন্দির * মার্জনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। সার্ব্বভৌমাদি গৌরের ইচ্ছায় সম্মতি দান করিয়া মন্দিরমার্জনার্থ পর্য্যাপ্ত কলসী ও সম্মার্জনীর আয়োজন করিয়া দিলেন। প্রচুর উল্লাসে ভক্তগণের সহিত গৌর গুণ্ডিচামন্দির মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন এবং মার্জন শেষ হইলে সকলের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জলকেলি করিলেন।

রথযাত্রার দিন সমাগত হইল। প্রাতঃস্নানান্তে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া গৌর জগন্নাথের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন। বলিষ্ঠ দয়িতগণ জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে মন্দিরবহির্ভাগে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের কটিদেশে পট্টডোরী বন্ধন করিল এবং সেই পট্টডোরী সহযোগে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া সুসজ্জিত রথে স্থাপন করিল। অমনি চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে "জয় জগন্নাথ, জয় মহাপ্রভু" ধ্বনিত হইল। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র সপারিষদ স্বর্ণমার্জনী হস্তে রথাগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া

---

* রথযাত্রার সময় যে মন্দিরে জগন্নাথমূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তাহার নাম গুণ্ডিচামন্দির। শ্রীমন্দির হইতে ইহা প্রায় এক মাইল দূরে—ইন্দ্রদ্যুম্নদীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত।

তদুপরি চন্দন-জল সেচন করিলেন, গৌড়ীয়গণ রথাকর্ষণ করিতে লাগিল। রথ গুণ্ডিচাভিমুখে অগ্রসর হইল। স্বীয় ভক্তগণকে চারিদলে বিভক্ত করিয়া গৌর চারিটী কীর্ত্তনসম্প্রদায় গঠন করিলেন। ইহারা রথের অগ্রে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। এতদ্ব্যতীত আরও তিন সম্প্রদায় রথের দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। গৌর সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ নৃত্য করিয়া শ্রীবাস, রামাই, স্বরূপ প্রভৃতি দশজন প্রধান গায়ককে লইয়া গৌর স্বয়ং কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে যুক্ত করে জগন্নাথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গৌর ভক্তিব্যাকুল কণ্ঠে স্তব পাঠ করিলেন।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ।
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ॥"
"জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো।
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥"
"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো।
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।"
"স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন।
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥"
"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্ন বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ॥"

স্তব পাঠ শেষ হইলে গৌর হুঙ্কার পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিলেন। হরিদাস কেবল "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র পলকহীন দৃষ্টিতে নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন। গৌরকে প্রথম দর্শনাবধিই তাঁহার মন শ্রীগৌরের প্রতি নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল, অধুনা ভক্তসহ গৌরের নৃত্য দর্শন করিয়া তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িলেন। বয়স্য হরিচন্দনের স্কন্ধদেশে হস্ত ন্যস্ত করিয়া তিনি নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাতে পশ্চাৎস্থিত শ্রীবাস পণ্ডিতের নৃত্যদর্শনের ব্যাঘাত হইতেছিল। শ্রীবাস হরিচন্দনের গাত্রস্পর্শ করিয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে কহিলেন—কিন্তু গৌরের নৃত্য দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়ায় শ্রীবাসের কথা হরিচন্দনের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। শ্রীবাস নৃত্যদর্শনের বিঘ্ন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া হরিচন্দনকে চপেটাঘাত করিলেন। তখন হরিচন্দন প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসের অসমসাহসিকতায় প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু প্রতাপরুদ্র তাহাকে নিষেধ করিলেন।

দর্শক সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গৌরের অমানুষিক ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। দামোদর গাহিয়া উঠিলেন—

"সেই ত পরাণনাথে পাইনু,
যার লাগি মদন দাহনে ঝুরি গেনু॥"

গৌরের তদানীন্তন মানসিক অবস্থার সহিত গান মিলিল। গৌর বিরহাকুল হইয়া রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথের বিরাট রথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। গৌর নাচিতে নাচিতে পড়িতে লাগিলেন—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি
বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতী-
সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র
সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী-
তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"
"আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ র্হৃদি বিচিন্ত্যমাগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"
"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥",
রবাতটে বেতসী-তরুতলে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহারের
ন্য রাধাভাবাবিষ্ট গৌরের চিত্ত উৎকণ্ঠিত
ইয়া পড়িল। বিরহবিধুর হইয়া তিনি
মিতলে উপবেশন করতঃ তর্জ্জনী দ্বারা
ত্তিকায় লিখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল
রেই দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে করিতে
াজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে গিয়া পতিত
ইলেন।

গৌর যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া
বড়াইতেছিলেন—তখন অবধিই প্রতাপরুদ্র
াঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল
ইয়াছিলেন। কিন্তু গৌর সন্ন্যাসী, তিনি
াজদর্শন করিবেন না বলিয়া সার্ব্বভৌম
াঁহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌর
ীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে, একদিন সার্ব্ব-
ভৌম তাঁহাকে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন
করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরক্ত হইয়া গৌর
বলিয়াছিলেন পুনরায় তাঁহাকে কেহ রাজ-
দর্শনের কথা বলিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ
করিয়া যাইবেন। রামানন্দ রায় পুরীতে
উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার নিকট নানারূপ
বিলাপ করিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার
ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তখন রামানন্দ
ও সার্ব্বভৌম গৌরের প্রতি রাজার প্রগাঢ়
ভক্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "ভক্তাধীন
গৌর কখনও ভক্তের আকুল ইচ্ছা অপূর্ণ
রাখিবেন না। রথযাত্রার দিন যখন তিনি
রথাগ্রে নৃত্য করিবেন, তখন দীনবেশে তাঁহার
চরণ ধারণ করিলে, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে
আলিঙ্গন দান করিবেন।" আজ নৃত্য
করিতে করিতে গৌর যখন প্রতাপরুদ্রের
সম্মুখে পতিত হইলেন, তখন রাজা সসম্ভ্রমে
তাঁহাকে ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্পর্শ-
মাত্র বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া গৌর "হায় হায়"
করিয়া উঠিলেন। দেখিয়া রাজা ভীত হইয়া
পড়িলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে অভয় দিয়া
কহিলেন "আপনার ভক্তি প্রভুর অবিদিত
নাই, তিনি আপনার প্রতি প্রসন্নই আছেন।
তবে ভক্তগণের শিক্ষাবিধানার্থ তিনি রাজ-
সংস্পর্শে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অবসর
পাইলেই আমি আপনার কথা পুনরায় প্রভুকে
বলিব। তখন যাইয়া আপনি প্রভুর সহিত
মিলিত হইবেন।"

রাজসংস্পর্শ জন্য ক্ষণিক ক্ষোভ প্রকাশ
করিয়া গৌর রথের পশ্চাতে গমন করিলেন
এবং মাথা দিয়া রথ ঠেলিতে লাগিলেন।
তাঁহার স্পর্শমাত্র রথ দ্রুতবেগে চলিতে
লাগিল এবং অচিরে বলগণ্ডি নামক স্থানে
গিয়া উপনীত হইল। তথায় লোকের
অত্যাধিক জনতা হওয়ায় নিকটস্থ এক উদ্যানে

প্রবেশ করিয়া গৌর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

গৌর বিশ্রাম করিতেছেন—এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের উপদেশে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন—এবং যাবতীয় ভক্তগণের অনুমতি লইয়া গৌরসমীপে গমন করতঃ তাঁহার পদমূলে পতিত হইলেন। গৌর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন—রাজা তাঁহার পাদ সংবাহন করিতে লাগিলেন এবং রাসলীলার শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শুনিয়া গৌর প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং "বোল" "বোল" বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। রাজা পড়িলেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

হে প্রভু, তোমার কথামৃত সন্তপ্তজনের জীবন, ব্রহ্মজ্ঞদিগের ভোগ্য শ্রবণমঙ্গল, শান্তিপ্রদ এবং পাপনাশক। যাঁহারা উহা পান করাইতে পারেন—তাঁহারাই প্রকৃত দাতা।

শুনিয়া গৌর দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমভরে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং "তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দান করিয়াছ, তোমাকে দিতে পারি আমার এমন কিছুই নাই, তাই আলিঙ্গন দান করিলাম।" বলিয়া রাজার পঠিত শ্লোকটী বারংবার পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। অল্পকাল পরে জ্ঞান লাভ করিয়া গৌর কহিলেন "আমার পরম বান্ধবকে তুমি কোথা হইতে আনিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইতেছ?" রাজা কহিলেন "আমি তোমার দাসানুদাস, আমাকে তোমার ভৃত্য করিয়া লও।" গৌর প্রীত হইয়া রাজাকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইলেন এবং অন্যত্র প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। রাজা কৃতার্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নভোজনান্তে গৌর দরিদ্রদিগকে অন্নব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি বিতরণ করিয়া রথ টানিতে গমন করিলেন। রথ অচল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল—গৌড়ীয়গণ রথ নাড়াইতে অপারগ হওয়ায় রাজাদেশে রথ টানিবার জন্য হস্তী যোজিত হইয়াছিল। হস্তিগণ অঙ্কুশাঘাতে বিচলিত হইয়া উন্মত্তভাবে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল—কিন্তু রথ নড়িল না। তখন সমস্ত হস্তী খুলিয়া দিয়া গৌর নিজে মাথা দিয়া রথ ঠেলিতে লাগিলেন—রথ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং কোটি কণ্ঠের হরিধ্বনির মধ্যে অচিরে গুণ্ডিচা মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইল। তখন জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামমূর্ত্তি রথ হইতে নামাইয়া মন্দিরস্থ সিংহাসনে স্থাপন করা হইল।

জগন্নাথ নীলাচলের অধীশ্বর। তিনি বৎসরান্তে একবার বনবিহারার্থ রথে চড়িয়া গুণ্ডিচামন্দিরে আগমন করেন। ইহাই রথোৎসব। জগন্নাথ নয় দিন গুণ্ডিচায় অবস্থান করেন। গৌর ভক্তগণসহ নয় দিন তথায় নৃত্যগীতে অতিবাহিত করিলেন। জগন্নাথের বনবিহার দেখিয়া তিনি বৃন্দাবন ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং গুণ্ডিচামন্দির সম্মুখস্থ উদ্যান ও ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে ভক্ত সহ নয় দিন যাবত বৃন্দাবনলীলা অভি

করিলেন। একদিন অদ্বৈতাচার্য্যকে সরোবরের জলে শয়ান করিয়া তিনি শেষশায়ী বিষ্ণুর স্থায় তদুপরি শুইয়া থাকিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আচার্য্যের বক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া গৌর দেখিতে পাইলেন সার্ব্বভৌম ও রামানন্দে জলযুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে। উভয়ে অবিরাম উভয়ের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাদের চপলতা লক্ষ্য করিয়া গোপীনাথ আচার্য্যকে গৌর কহিলেন "সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ উভয়েই পরম পণ্ডিত। উঁহারা বালকের মত চপলতা করিতেছেন, তুমি নিষেধ করিতেছ না কেন?" তখন—

গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু,
উছলিত কর যবে তার এক বিন্দু।
মেরু মন্দার পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা,
দুই এক গণ্ড শৈল ইহার কি কথা!
শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার
তারে কৃপামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার।

পঞ্চমী তিথিতে হোরাপঞ্চমী মহোৎসব। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাসমারোহে উৎসবের আয়োজন করিলেন। জগন্নাথ তখন সুন্দরাচলে গুণ্ডিচামন্দিরে, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী নীলাচলের শ্রীমন্দিরে। নীলাচলে লক্ষ্মীর সম্মুখে হোরাপঞ্চমী অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। কাশীমিশ্র গৌরকে উৎসব দেখিবার জন্য নীলাচলে লইয়া আসিলেন। নানা আড়ম্বরের সহিত লক্ষ্মী-বিগ্রহ মন্দিরবহির্ভাগে আনীত হইলেন। তাঁহার সেবকগণ জগন্নাথের সেবকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া তাঁহার চরণে নিক্ষেপ করিল। সুন্দরাচলে পুষ্পোত্থান বহারের জন্য সেবকগণ জগন্নাথকে লইয়া গিয়াছিল, এই অপরাধে বিরহকাতরা লক্ষ্মীর আদেশে তাহারা বন্ধন প্রাপ্ত হইল। লক্ষ্মীভয়াভিভূত ভৃত্যগণ যুক্তকরে নিবেদন করিল,—"আজি আমরা জগন্নাথকে আনিয়া দিব।" তখন লক্ষ্মী শান্ত হইয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। গৌর স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুন্দরাচলে লক্ষ্মীকে জগন্নাথ সঙ্গে লয়েন না কেন, বল দেখি?" স্বরূপ কহিলেন "সুন্দরাচলে বৃন্দাবনলীলা করাই জগন্নাথের অভিপ্রায়। বৃন্দাবনলীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই, তাহাতে গোপীগণের অধিকার। তাই লক্ষ্মী সঙ্গে যাইতে পান না।" গৌর কহিলেন "বৃন্দাবনলীলা ত তাঁর ভ্রাতা বলদেব ও ভগিনী সুভদ্রার সম্মুখে প্রকট হইতে পারে না—তবে লক্ষ্মীর রাগ কেন?" স্বরূপ কহিলেন "প্রেমময়ী লক্ষ্মী স্বামীর ঔদাস্যেই বিচলিত হইয়া উঠেন।"

আটদিন পরে জগন্নাথ গুণ্ডিচা হইতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গৌর ভক্তগণ সহ আসিলেন। পথিমধ্যে রথের পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। তখন কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাজ খাঁকে (বসু) গৌর প্রতিবৎসর ঠাকুরের পট্টডোরী সরবরাহ করিবার ভার দিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর রামানন্দ জগন্নাথের জন্য পট্টডোরী লইয়া রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল *

আজ আমরা বঙ্গের প্রথিতযশা লেখক, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতির তর্পণের জন্য সম্মিলিত হইয়াছি। এতদিন যাঁহার অনুপম রচনাবলী বঙ্গীয় পাঠকবর্গের চিত্ত মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, যাঁহার নব নব গ্রন্থের আবির্ভাব দর্শনার্থ সাগ্রহে সকলে প্রতীক্ষা করিতেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই। যাঁহার মানস-উৎস হইতে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সলিল অবিরাম উৎক্ষিপ্ত হইত, যাঁহার আনন-ক্ষিতি হইতে সরস কৌতুক-সরিৎ প্রবাহিত হইয়া পাঠকের মনঃক্ষেত্র সুখশস্যে উর্ব্বরা করিত, যাঁহার মনোবীণা হইতে প্রশংসন ও জাতিকে, জাতীয় জীবনের উদ্বোধনকল্পে, কখনও মৃদু ঝঙ্কার বা গম্ভীর সঙ্গীতঝঙ্কার উত্থিত হইত, সে দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই। বিদেশী সঙ্গীতের সুর ও ভাব যিনি নিজ অসাধারণ শক্তিতে বাঙ্গালা ভাষার সুকোমল আবরণে ঢাকিয়া বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রসাধনকল্পে যিনি সাগরের মত বিরাট্ বিচিত্র ভঙ্গিমাময় নাটকাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের সমালোচনায় যাঁহার গদ্যের বিচিত্র ভঙ্গী ও রসগ্রাহিতা প্রকাশিত, কবিতারচনায় বিশেষত্ব যাঁহাকে বঙ্গীয় কবিমণ্ডলীতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে, সেই দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী আজ নিশ্চল। বীণাপাণির শ্রেষ্ঠ সেবক-মণ্ডলীর মধ্যে একজন প্রধান ভক্তের জীবন আজি অবসান। পূজার সম্ভার লইয়া, অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিয়া তিনি আজ 'পরপারে' উপস্থিত। তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন অতুলনীয় গ্রন্থাবলীর কিছু পরিচয় ও তাঁহার সাহিত্য-সাধনার চিত্র আজ মদীয় অক্ষম তুলিকায় অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইব।

১২৭০ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র নিজে সাহিত্য-চর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের বিবরণ পাঠে আমরা তৎকালীন বাঙ্গালাসমাজের কল্পনা করিতে পারি। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র 'আত্মচরিত' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার নিকট হইতে সাহিত্যের প্রতি অসীম অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রাজসরকারে দেওয়ানী করিয়া সাহিত্য-সাধনা করা বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রে দেওয়ানের সদা ব্যস্ত জীবন যাপন করিতে করিতেও যে গ্রন্থ রচনা

রিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ঐকান্তিক সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালও পিতার ন্যায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অবসরক্রমে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সাহিত্য-সেবক সাহিত্য-সাধনায় রত হইয়া নিজ রচিত গ্রন্থাদির আয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত খুব অল্প। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের অবসরে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও ঐ পথের পথিক।

সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলাল আর একটি গুণ পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—সেটি তাঁহার গীতপ্রিয়তা। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র অতি সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত বহু গীত দেওয়ানজীর গান নামে প্রসিদ্ধ ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। দীনবন্ধু মিত্র নিজ 'সুরধুনী কাব্যে' বিভিন্ন নদীর মুখে, বিভিন্ন দেশ ও সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বর্ণনা করিয়াছেন। এই সুরধুনী কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের পিতার বিষয়ে দীনবন্ধু বলিতেছেন;—

> কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান।
> সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য বিদ্বান্॥
> সুললিত স্বরে গীত কিবা গান তিনি।
> ইচ্ছা হয় শুনি হয়ে উজানবাহিনী॥

জলাঙ্গী নদীর মুখে উক্ত বাণী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতেই কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সঙ্গীতপটুতা অনুমিত হইবে। দ্বিজেন্দ্রলালও পিতার নিকট হইতে এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম খ্যাতি—হাসির গানে। যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে "আমরা ইরাণ দেশের কাজী" প্রভৃতি সঙ্গীত শুনিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গীত নৈপুণ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। হাসির গানে বিবিধ সুর ও ভঙ্গী, নাটকের গানেও অপরূপ মাধুর্য্য দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যকাল হইতে একাগ্রচিত্তে সঙ্গীত-শিক্ষার ফল। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিলাতে অবস্থান করিতেন, তখন বিদেশীয় সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষভাবে চর্চ্চা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক সঙ্গীতানুরাগ এইরূপে শিক্ষা ও সাধনায় কমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগর কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। বাল্যকালেই তিনি বায়রণের ম্যানফ্রেড, চাইল্ডি হারল্ড, মেঘদূত ও উত্তর চরিতের অধিকাংশ মুখস্থ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে তিনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই বৃত্তির সাহায্যে তিনি কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। সেখানকার বিখ্যাত সাইরেনসেষ্টার কলেজে তাঁহার কৃষিবিষয়ক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। কিন্তু কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া তিনি যখন বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার কৃষিচর্চ্চা আর হইল না। বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর সার চার্লস্ ইলিয়ট্ দ্বিজেন্দ্রলালকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। জনৈক সাহিত্যসেবী তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "সাইরেনসেষ্টারে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়া শেষে দ্বিজেন্দ্রলালকে 'কলা মূলা চুরি'র বিচার করিতে হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষিকার্য্যসম্বন্ধীয় একখানি ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার নাম Crops of Bengal. তাঁহার কৃষিশিক্ষার একমাত্র ফল এই পুস্তকখানি।

বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'আর্য্যগাথা'। ইহা কতকগুলি গীতের সমষ্টি। ইহা বিলাতযাত্রার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ১২ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি যে সকল গান লেখেন তাহাই ইহাতে ছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'আর্য্যগাথা'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত করেন।

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঙ্গালা ভাষার কবি বলিয়াই জানি। কিন্তু তিনি ইংরাজীতেও কবিতা ও হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন। Lyrics of Ind নামক ইংরাজী পুস্তক তাঁহার ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিবার শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। Light of Asia প্রণেতা সার্ এড্‌উইন্ আর্ণল্ডকে তিনি এই পুস্তক উৎসর্গ করেন। আর্ণল্ড এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরাজী হাসির গান ইংরাজমহলে গীত হইত। তাহাদের সুর-ভাষা প্রভৃতি ইংরাজী ধরণের। ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি ইংরাজী সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও ইংরাজী গানের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। কাজেই তাঁহার রচিত সঙ্গীত যে ইংরাজ-সমাজে আদৃত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি ?

দ্বিজেন্দ্রলাল ত বিলাত হইতে ফিরিলেন। সমাজে এ দিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তিনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার জাতি গিয়াছে বলিয়া হিন্দুসমাজ তাঁহাকে পৃথক করিবার উদ্যোগ করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ক্রোধে রচনা করিলেন—'একঘরে'। এই 'একঘরে' পুস্তিকায় হিন্দুসমাজের উপর অতি তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালের শ্লেষ ও ব্যঙ্গপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হইল। হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের উপর 'একঘরে' পুস্তকখানিতে বিদ্রূপের বাণ বর্ষিত হইল। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সম্প্রদায়বিশেষের ভণ্ডামি প্রচার করিয়াছিলেন। 'কল্কি অবতার' নামক প্রহসনে এইরূপ ভণ্ডামির উপর কশাঘাত হইয়াছে। 'শ্রীহরি গোস্বামী' নামক কবিতায় পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রবিরুদ্ধ খাদ্যভক্ষণ বর্ণিত—

"একদা শ্রীহরি প্যাণ্টটা কোটটা পরি'
খাচ্ছিলেন ত টেবিলেতে কাট্‌লেট্ রোষ্ট কারি;
চতুর্দ্দিকে বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, শিরোমণি,
ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন, হিন্দুধর্ম্মধ্বনি।"
এই অতি গম্ভীর সভা ; সবাই ধ্যানে মগ্ন ;
ছুরি এবং ফর্কে, ধারাল সব তর্কে
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন কচ্ছেন বসে ভগ্ন ;
সবার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ, সবার বাক্য শুদ্ধ,
ঠুংঠুক ঠিনিক টঙাস্ ভিন্ন নাইক কোনই শব্দ;
কেবল টিকি নেড়ে, 'মধুর বাহা বেড়ে'
একবার বল্লেন চূড়ামণি পুনঃ সবাই স্তব্ধ।
হোল একটু ভুল ভাবী তর্কের মূল
সে 'মধুর'টা হরির নাম কি পক্ষীমাংসের ঝোল
শ্রোতৃবর্গ মধ্যে কিঞ্চিৎ রয়ে গেল গোল।"

সমাজে থাকিয়া গোপনে নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিলে জাত যায় না, কিন্তু বিলাত অখাদ্য ভক্ষণ করিয়াছে বলিয়া বিলাত-প্রত্যাগতকে একঘরে করা হয়। তাই উপরে উদ্ধৃত অখাদ্যভোজী পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল অঙ্কিত করিলেন। তাঁহার Reformed

Hindoos নামক হাসির গানেও এইরূপ ভণ্ডদের কশাঘাত করা হইয়াছে—

"It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food
কারণ, চলে মাঝে এ'টা ও'টা সে'টা
যখন we choose ;
কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি if you think
তা হ'লে you are an awful goose."

বিলাত-প্রত্যাগতকে হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে না, ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ কর্ম্মবীরগণকে একে একে আচারগত বৈষম্যের জন্য সমাজ-চ্যুত করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই কথাই দ্বিজেন্দ্রলাল 'নুরজাহান' নাটকে (৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে) প্রকটিত করিয়াছেন—"যখন মনে হয় যে—ধর্ম্মভীরু, কর্ম্মবীর ব্যক্তিকে গুটিকতক আচারগত বৈষম্যের জন্য আপনার ব'লে জাতির মধ্যে আলিঙ্গন ক'রে নিতে পারি না, তখন বুঝি—কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে। যেখানে জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিষ টেনে নিজের ক'রে নেয়, আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হ'য়ে নিজেই গ'লে খ'সে পড়ে।"

কবির জীবন কাব্যের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে। মানসিক অবস্থানুযায়ী বিবিধ গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন ভাবের ছাপ পড়ে। সমাজবহির্ভূত হইবার আশঙ্কা যখন বিদ্যমান, তখন 'একঘরে' রচিত হয়। আবার প্রফুল্ল যৌবনের সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল 'হাসির গান' রচনা করেন। যখন তাঁহার গার্হস্থ্যজীবন সুখময়, প্রচুর অর্থাগম হইতেছে, অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লইয়া তখন দ্বিজেন্দ্রলাল হাসি-মুখে 'হাসির গান' লিখিয়াছিলেন। এই 'হাসির গান' বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন জিনিষ। বিদেশীয় সাহিত্যে Comic Songsএর অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে হাসির গানের বিশেষ অভাব ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সে অভাব পূর্ণ করেন। বঙ্গভাষায় তিনিই প্রথম এই শ্রেণীর গীত রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে লিখিয়াছেন যে, ইংরাজী Ingoldsley Legendsএর অনুকরণে তিনি 'আষাঢ়ে' লিখিয়াছিলেন, এই গানগুলির অধিকাংশের সুর ইংরাজী। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এমনি সুকৌশলে সেই সুরগুলি বাঙ্গালা গানে মিলাইয়াছেন যে, আমাদের কর্ণে তাহা শ্রুতিকটু বলিয়া আদৌ মনে হয় না। কতক-গুলি গান একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গেয়। ইংরাজীর Chorusএর মত মধ্যে মধ্যে সমবেতকণ্ঠে কতকগুলি পংক্তিগান দ্বিজেন্দ্র-লাল অতি সুন্দর ভাবে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কবি দুইপ্রকারে হাসিতে পারেন। এক প্রকার হাসি তীব্র ব্যঙ্গশ্লেষের আবরণে ঢাকা, লেখক যে সকল দোষ দেখাইতেছেন, সে সকল হইতে তিনি নিজে যেন মুক্ত। নিজে উচ্চগিরিশিখরে বসিয়া নিম্নে সমতলভূমিতে বিচরণকারী মানবদের যেন তুচ্ছ করিতেছেন, ইহাতে সহৃদয়তা নাই, আছে কেবল নির্ম্মম কশাঘাত। ভলটেয়ার এইরূপ হাসিয়া-ছিলেন। সুইফট্ও এইরূপ হাসিয়া-ছিলেন।

আর একপ্রকার হাসি আছে, যাহাতে লেখক নিজেকেও হাসির পাত্র বলিয়া মনে করেন। অপরের দোষ দেখাইতেছেন বটে,

কিন্তু নিজেও যে যে দলের মধ্যে আছেন, তাহা গোপন করিবার কোনও চেষ্টা নাই। এই হাসি সমবেদনা ও সহানুভূতিপূর্ণ। দ্বিজেন্দ্রলাল এই শেষোক্ত হাসি হাসিয়াছেন। Reformed Hindoos গানে হিন্দুসমাজস্থ ভণ্ডদের বিদ্রূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু "বিলাতফের্ত্তা" নামক গানে নিজের দলের প্রতি উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

"আমরা বিলাতফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।"

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে যে বিলাতফের্ত্তার দলে এককালে বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, এ কথা স্মরণ রাখিলে, উপরোক্ত পংক্তিগুলির সার্থকতা বুঝা যাইবে।

সামাজিক দোষ দূর করিতে অনেক প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে। তীব্র আক্রমণ, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, সংবাদপত্রে লেখা প্রভৃতি তুমুল আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে ফল না হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে তাহা হইয়াছে। হুজুকপ্রিয় ব্যক্তিগণ "নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো" গানে উপহাসিত হইয়াছেন, ভণ্ড স্বদেশহিতৈষী 'নন্দলালের' চিত্রে অনেক কর্ম্মবীরের গাত্রদাহ হইয়াছে। ধর্ম্মে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি অনবরত ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতেছে। তাহার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক বাক্য—

"ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা
এমন অবস্থায় প'ড়্লে সবারই মত বদলায়।"

কতকগুলি গানের মধ্যে করুণ রসের অন্তঃসলিলা বহিতেছে। বাহিরে শুনিয়া হাসি বটে, কিন্তু মনের মধ্যে গভীর শোকপ্রকাশ প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে থাকে।

কবি "ইরাণ দেশের কাজী"তে বলিয়াছেন—

"ইমাম সবাই সত্যপ্রিয়, পার্শী মিথ্যাবাদী,
পার্শী ইমামে বিবাদ বাধিলে,
পার্শীই অপরাধী।
পার্শী ঠেকিলে ইমাম গায়,
মাথাটি বাঁচান হইবে দায়,
পার্শীর শির কাটিয়া লইলে,
হইতে হইবে রাজী।"

এই ইরাণ দেশের কাজীদের নূতন আইন। খুস্‌রোজ উৎসবে স্বার্থসাধকের চিত্র আছে—

"আজি এই শুভ রাত্রি আল্‌বো বাতি,
ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে
নইলে যে চাকরি যাবে,
নইলে যে চাকরি যাবে;
আমাদের ভক্তি যা এ,
সে যে গো পেটের দায়ে;
নিয়ে আয় চেরাক বাতি,
নিয়ে আয় দিয়েসলাই;
সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

এই সকল হাসির গানের সাহায্যে ভণ্ডামিকে সাধারণের চক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া উচ্চ আদর্শের পথে চালিত করা দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তিতেই সম্ভব। তাঁর হাসির গানে আমরা শুধু হাসি না, নিজেদের সমাজের দোষ দেখিয়া ও নিজেদের কপটতার চিত্র দেখিয়া, অন্তরে অন্তরে কাঁদিয়াও থাকি। হাসির গানে যে সংশোধন হয়, শত গালিতেও তাহা অসম্ভব।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময় "সাধনা", "সাহিত্য" "প্রদীপ" "ভারতী" প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। "অদল বদল" "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা" সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। "কেরাণী" কবিতা সাধনায় প্রথম মুদ্রিত হয়। এই কবিতাগুলি ছন্দের বিষয়ে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে। অক্ষর হিসাবে ইহার ছন্দ নির্ণীত হয় না। মাত্রা হিসাবে ও উচ্চারণ হিসাবে ইহার ছন্দ দেখিতে হইবে। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল; ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু যেরূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভি-নিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?" বাস্তবিক কৌতুকজনক কাহিনী এইরূপ তরল ভাষায় বঙ্গসাহিত্যে প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালই প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল দুইটি বাঙ্গলা কবিতা লিখিয়াছেন। অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত "কল্কিযজ্ঞ" এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে—

ব্যারিষ্টার উকীলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য্য মহতী সভা॥
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মান্দ্রাজী উড়িয়া শিক বঙ্গালী চ দলে দলে॥
কাহারো পরণে ধুতি,
কাহারো উড়ুনী উড়ে।
কাহারো বা ঝুলে চাপকান,
কাহারো সাহেবী ধরা।
কাহারো সম্মুখে টেড়ী
কাহারো পিছনে টিকী।
কাহারো উপরে ঝুঁটি—কা কস্য
পরিবেদনা॥"

'কর্ণ-বিমর্দ্দন-কাহিনী' নামক কবিতা পজ্ঝটিকাছন্দে লিখিত—

জানো না কি কদাচন মূঢ়
কর্ণ-বিমর্দ্দন-মর্ম্ম কি গূঢ়?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
যদি না তা আকর্ষণ জন্য?

এই সকল কবিতায় বাঙ্গালীর ঘরের কথা, ঘরের ছবি বেশ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর অনেক বাঙ্গালীই ঘরে গিয়া নিম্নলিখিত দৃশ্য দেখিয়া থাকেন।

"খেটে খেটে খেটে
আপিস ছেড়ে এলাম যদি আপনারই 'ষ্টেটে'।
কোণেতে জড়ান দেখি তক্তপোষের পাটি,
ফরাসের সতরঞ্চে এক কোমর মাটি;
পুত্ররত্ন গিয়ে হুঁকোগাছটি নিয়ে
ভেঙ্গে সেটি, কালি মেখে, কল্কে ফেলে দিয়ে,
ঘুনসি পরে তাকিয়াতে কচ্ছেন বসে নৃত্য;—
ঘুমোচ্ছেন তাঁর পার্শ্বে প্রিয় রামকান্ত ভৃত্য।"

এইরূপ অনেক ছবি দ্বিজেন্দ্রলাল নিখুঁতভাবে আঁকিয়াছেন। ভাষা সরল, তাহার অবিরাম প্রবাহ। রহস্যের আলোকে এক একবার দীপ্ত হইয়া উঠে। বাঙ্গালীর ঘর, সুখ, দুঃখ, দোষ, গুণ হাসির মধ্য দিয়া উঁকি দিতেছে এ সকল কবিতার সহিত কল্পনামূলক কবিতার পরিমাণ হইতে পারে না। শেলি বা কীট্সের কবিতার মাপকাঠিতে এ সকল কবিতার পরিমাণ হইতে পারে না। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মানদণ্ড আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের অবস্থা কি? ইউরোপে দেখিতে পাই,—গল্প, উপন্যাস, রঙ্গ-রহস্য প্রভৃতিরই বেশী আদর। আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে অতি অল্প লোকেই গভীর গবেষণা-পূর্ণ রচনা পাঠ করিতে সমর্থ। ইউরোপে জনসাধারণ সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করে। কৃষক সমস্ত দিন হলচালনায়, মজুর কারখানায় কেরাণী আফিসে, বণিক্ এক্স্‌চেঞ্জে, উকীল আদালতে, সকলেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছে। বিংশ শতাব্দীর মূল লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে—অর্থোপার্জ্জন। সারাদিন পরিশ্রমের পর অবসর যাপন করিবার জন্য যাহারা পুস্তক পাঠ করে, তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্ত-বিনোদন। দার্শনিক জটিল তত্ত্বের মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিতে চায় না, প্রত্নতত্ত্বের গোলকধাঁধায় তাহারা দিশাহারা হইতে চায় না। তাহারা চায়—দুই একটা গল্প বা উপন্যাস, একটু রসিকতা বা হাসির গান। আমাদের দেশেও সে অবস্থা আসিয়াছে। প্রতি বৎসর গল্প ও উপন্যাস যত প্রকাশিত হয়, অন্য কোন শ্রেণীর গ্রন্থ সংখ্যায় তত অধিক নয়। মাসিক-পত্রের পাঠকেরা আগে গল্প ও উপন্যাসের অনুসন্ধান করেন। যতদিন না সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তন হইবে, ততদিন অন্য কিছু আশা করাও সম্ভবপর নহে।

আরও একটা কারণ—গভীর-পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর মর্ম্মগ্রহণ করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব। একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে গেলে, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে হয়। মনকে সেই সকল পথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অভ্যাস আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র একবার এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকে গল্প বা উপন্যাস পাঠ করে, কিন্তু অন্যান্য-বিষয়ক রচনা তাহাদের ভাল লাগে না। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই ও কোনও গভীর বিষয় ভাবিতে অভ্যস্ত হয় নাই। জনকতক শিক্ষিত ব্যক্তি অবশ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকসংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলীপর্ব্বে গণনা করা যাইতে পারে বলিলেও চলে।"

দেখা গেল, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থায় সাধারণ পাঠক কি চায়? দ্বিজেন্দ্রলাল এই শ্রেণীর পাঠকদের উপযুক্ত জিনিষই দিয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গান, তাঁহার কৌতুকজনক কবিতা ও তাঁহার প্রহসন সকলেই সাগ্রহে পাঠ করিয়াছেন। মজ্‌লিসে তাঁহার হাসির গান গীত হইয়াছে, নাট্যশালায় তাঁহার প্রহসন অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণের রুচিকর পদার্থ দিয়াছেন বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল যে সাহিত্য-সেবকের উচ্চ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার বরাবর চেষ্টা ছিল—কবিতায় গানে প্রহসনে, হাস্য ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া। রোগীকে চিনি-মাখান কুইনাইনের বড়ি খাওয়ানর মত রুগ্ন সমাজকে তিনি হাসি মুড়িয়া তিক্ত শিক্ষা-বড়ি খাওয়াই য়াছেন।

এই হাসির গান শুনিতে শুনিতে সহসা দ্বিজেন্দ্রলালের "বজ্র" যখন ধ্বনিত হইয়া

উঠে, তখন আমরা স্তব্ধ হইয়া যাই। দৈনিক চা-পান সরপুরিয়া, রসগোল্লার গান হইতে যখন বায়রণের উদ্দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্ছ্বাস পড়ি, তখন মনে করি, এ কি সেই কবি? যে কবি বায়রণকে বলেন,—

"উঠনি জ্যোৎস্নার মত তুমি;
উঠেছিলে তীব্র বিদ্যুতের ছটা
প্রাবৃট্‌ আকাশে; চতুর্দ্দিকে তব,
ঘোর কুৎসা-কৃষ্ণ ঘনঘটা
তোমারে ঘেরিয়াছিল;
তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ
তাহার উপর দিয়া, করিয়া
চকিত স্তব্ধ বিস্মিত জগৎ।
তুমি গাহ নাই গীত,
বসন্তের পিক-সম ললিত উচ্ছ্বাসে
কুঞ্জবনে; গেয়েছিলে তুমি কবি,
পাপিয়ার মত নীলাকাশে,
প্রবল মধুর স্বনে।
তোমার সঙ্গীত একাকী ইংলণ্ড নহে,
আয়র্লণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, ফরাস,
জর্ম্মণী, রোম, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
শুনেছিল তাহা; আর যে
যেথানে ছিল, করি তব কাব্য পাঠ
তোমারে মানিয়াছিল,
একবাক্যে সবে, কাব্যজগতে সম্রাট্‌।"

সেই কবিই কি হাসির গান-রচয়িতা? যে কবি তাজমহলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবোন্মত্ত, যাঁহার কণ্ঠে এই বাণী—

"সুন্দর অতুল হর্ম্ম্য! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু! হে বিয়োগের পাষাণ-প্রতিমা!
মর্ম্মরে রচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস! আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে যৌন-মহিমা!
এত শুভ্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ স্থির,
এত নিষ্কলঙ্ক, এত করুণা সুন্দর
তুমি হে কবর! আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত কর এ বিশ্ব ভিতর,
কিন্তু যবে ধূলি-লীন হইবে তুমিও,
কে রাখিবে তব স্মৃতি? হে সমাধি!
চিরস্মরণীয়।"

তিনিই কি "আষাঢ়ে" লিখিয়াছেন? "হিমালয়", "নবদ্বীপ" "সমুদ্রের প্রতি" প্রভৃতি কবিতায় কবি এক বস্তুকে বহু দিক্‌ হইতে দেখিয়াছেন। এই সকল কবিতার মধ্যেও আমাদের দেশের উচ্চ আদর্শের কথা জলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীর ও আগ্রার মোগল-বিলাসের পার্শ্বে আর্য্যদের জীবনের চরিত্র বড় সুন্দর। কবি বলিতেছেন,—

"বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে
মোগল। গুলাব স্নান মর্ম্মর-আগারে;
উজ্জ্বল বসন, পূর্ণ আতর সৌরভে
পোলাও কালিয়া খাদ্য; মখমল ঝাড়ে
মণ্ডিত ভূষিত কক্ষ। ময়ূর আসন;
উদ্যান, নির্ঝর, প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে
মধুর ন'বৎ বাদ্য; নূপুর-নিক্কণ,
সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে,
মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ,
মরণের পর স্বর্গ, তাও সেই রূপসীর বক্ষ।
আর আর্য্যজাতি? ঠিক্‌ তার বিপরীত
রূপ—প্রকৃতির শোভা; রস—পৃথিবীর;
স্পর্শ—স্নিগ্ধ বায়ু; শব্দ—নিকুঞ্জ-সঙ্গীত;
গন্ধ—যা বহিয়া আনে উদ্যান-সমীর।
পুণ্য-নদীজলে স্নান—অঙ্গে শুভ্রবাস;
আহার—তণ্ডুল ঘৃত; শয্যা—ব্যাঘ্রচর্ম্ম;
আবাস—কুটীর-কক্ষ; চরম বিলাস

জীবনের—তীর্থযাত্রা ; বিবাহও—ধর্ম্ম ;
এ সংসার—মায়া ; মৃত্যু—মোক্ষ, দুঃখহীন,
শ্মশানে নদীর তটে ; স্বর্গ—হওয়া
পরব্রহ্মে লীন।

এইরূপ কবিতা ও হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বঙ্গসাহিত্যে নূতন সুর আনিতেছিলেন, তখন তাঁহার গার্হস্থ্যজীবন সুখময়। তিনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। পত্নীর নামেই তাঁহার গৃহের নামকরণ হইয়াছিল—সুরধাম। কিন্তু প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী স্বর্গারোহণ করেন। একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুর্ব্বহ শোকভার বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির গান ফুরাইয়া গেল। গভীর শোকের ধারায় তাঁহার চিত্ত ধৌত হইয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহার প্রতিভা এবার নূতন দিকে ধাবিত হইল। সেই চেষ্টার ফল তাঁহার সর্ব্বজন-প্রশংসিত নাটকাবলী।

বাঙ্গলার রঙ্গালয় দীনবন্ধু ও মাইকেলের নাটক ও প্রহসন লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরে রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল ও গিরিশচন্দ্র ইহাকে বহু নাট্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিভা পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটকে চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্বের অপরূপ ব্যাখ্যায় বাঙ্গালীর চক্ষে নূতন আদর্শ ধরিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের নাটকাবলীতে যে বিশ্বপ্রেম ও উদারতার আদর্শ অবতারণা করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রও বহু পূর্ব্বে তাহা নিজ নাটকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলীর তুলনায় সমালোচনার অবসর ইহা নহে ; তবে ইহা নিশ্চয়, গিরিশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রসাধকগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে প্রহসনরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার "বিরহ" "ত্র্যহস্পর্শ" "প্রায়শ্চিত্ত" বা "বহুৎ আচ্ছা" রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছে। রামায়ণের অহল্যা-চরিত্র লইয়া তিনি "পাষাণী" নামক একখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে ঋষি গৌতম আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কতিপয় ঐতিহাসিক নাটকেরই ভিত্তি রাজস্থান। তাঁহার "তারাবাই", "দুর্গাদাস", "রাণা প্রতাপ," "মেবার-পতন" রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মোগলসাম্রাজ্যের একাংশের চিত্র "নুরজাহান" ও "সাজাহান" নাটকে প্রকটিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল মেবার-পতনের ভূমিকায় নিজেই নিজের নাটকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন,—"পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র, রাণা প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয়-চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ-চরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারীচরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম।" এইরূপ আদর্শ চরিত্র চিত্র করিবার পর দ্বিজেন্দ্রলালের জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "তোমার গৌতম, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস সব দেবতা ; দেখিতেছি তুমি কল্পনার সুবর্ণরাজ্যে উড়িতেছ ; একবার বাস্তব জগতে নামো, দেখি ; মনুষ্য-চরিত্র

দেখাও, যাহা দেখাইয়া সেক্সপীয়র অমর হইয়াছেন।" [নুরজাহান—ভূমিকা] বন্ধুর এই উপদেশ দ্বিজেন্দ্রলাল পালন করিয়াছিলেন। মেবার-পতনের ভূমিকায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে "তারাবাই ও নুরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম।" মেবার-পতন নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি উদ্দেশ্য লইয়া বসিয়াছিলেন। একটি মহানীতি নাটকখানির মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে। "সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী।" [মেবারপতন ভূমিকা] দ্বিজেন্দ্রলাল "চন্দ্রগুপ্ত নামক নাটকে সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস নাটক হইতে বহু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সামাজিক নাটক লিখিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। "পরপারে" নামক সামাজিক নাটকে বর্ত্তমান সমাজের নীতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। 'ভীষ্ম' নামক একখানি পৌরাণিক নাটক ও 'সিংহলবিজয়' নামক একখানি নাটক লিখিয়া তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল নাটকের রচনা ও অভিনয়ে বাঙ্গলা নাটকের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের কথাতে প্রকাশ যে, তিনি বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চসম্বন্ধে প্রহসনের স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন, নাটকের স্বাভাবিকতা ও আখ্যান-বস্তু গঠনে নৈপুণ্য দেখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহসনে কুরুচি ও নাটকে কাব্যশক্তির অভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। নাটকে কাব্যসৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে তাই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই কাব্যসৌন্দর্য্যের দুই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন "সেদিন গবাক্ষপথে দেখলাম—কি সে মূর্ত্তি! যেন তুষারের উপর উষার উদয়; যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার; যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত! সে একটা নিঃসঙ্গ সুখের মত নয়, একটা মধুর রাগিণীর মত নয়, একটা প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত নয়। সে যেন একটা আনন্দের উদ্যান, একটা সৌন্দর্য্যের তরঙ্গকল্লোল, একটা মহিমার সমারোহ। সে যেন ভারতের নয়, ইরাণের নয়, আরবের নয়; ভূত, ভবিষ্যং কি বর্ত্তমানের নয়, স্বর্গের নয়, মর্ত্ত্যের নয়! সে যেন সব দেশের, সব কালের; স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের উভয়েরই দেখবার জন্য উভয়ের মধ্যে সংরক্ষিত একটা পৃথক্ সৃষ্টি। যেন দেবতার প্রেরণা, কবির সফল স্বপ্ন, ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়! কি সে মূর্ত্তি!" [নুরজাহান, ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য] আমাদের মনে পড়ে সাজাহানের জাহানারার প্রতি অনুরোধ "কি জাহানারা! তবু নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ, এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে, দেখ, সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ, ঐ আকাশের দিকে, দেখ, সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ, ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ, সে কি সুন্দর! আর চেয়ে দেখ—ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপে আপ্লুত বিয়োগের অমরকাহিনী ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ,—সে কি করুণ—

তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর্।” [সাজাহান শেষ দৃশ্য] মনে পড়ে রাণা প্রতাপে ইরার সন্ধ্যা-আবাহন “কি গরিমাময় দৃশ্য! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে! সমস্ত আকাশে আর কেউ নাই, একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের মরুভূমি বিচরণ করে এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্বজগৎ প্লাবিত করে অস্ত যাচ্ছে। যেমন গরিমায় উঠেছিল তেমনি গরিমায় নেমে যাচ্ছে। ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভা ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে! আর যেন দেবারতির জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে ধীরপদবিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে। কম্র সন্ধ্যা! প্রিয়সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে? কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন? এত নীরব এত কাতর?” [প্রথম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য] দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষা এইরূপ কবিত্বময়। তিনি কদাচিৎ সমাস-বহুল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ছোট্ট ছোট কথাগুলিতে তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত মানবের সমস্ত ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ভাষার এই তেজ বঙ্গসাহিত্যে এক বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের এই ভাষার উপর অসীম অধিকার তাঁহার বৈচিত্র্য।” হাসির গানে ও হাসির কবিতায় তিনি যদৃচ্ছাক্রমে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। কত অপরূপ মিল করিয়াছেন, কিন্তু কোনও খানে ভাষার জন্য ভাবকে আড়ষ্ট হইতে হয় নাই। তাঁহার নাটকগুলিতেও অনাড়ম্বর ওজস্বিনী ভাষার প্রবাহ। রাজপুতসৈন্যগণের যুদ্ধোৎসাহবাণী, সাজাহানের উন্মত্ত প্রলাপ, নুরজাহানের কুটিল বাক্য, সব এই ভাষার বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকটিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল উপমার উপর উপমা পুঞ্জীভূত করেন—“তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন—একটা দৈবশক্তির মত, একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস [মেবার-পতন, ১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য] “ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নৈশ সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্য্যের মত, ঘনকৃষ্ণমেঘান্তরিত স্থির নীল আকাশের মত, দুঃখের উপর করুণার মত—এ কি মূর্ত্তি! একটা সৌন্দর্য্য! একটা গরিমা! একটা বিস্ময়! [মেবার-পতন—১ম অঙ্ক ৭ম দৃশ্য]

দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার শক্তি তাঁহার “কালিদাস ও ভবভূতি” নামক প্রবন্ধে প্রকটিত। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি ধারাবাহিকরূপে ‘সাহিত্যে’ প্রকাশিত হয়। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সকলে সর্ব্বাংশে সায় না দিলেও, তিনি যে নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জীবনের শেষভাগে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি কর্ম্ম হইতে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্য-সাধনায় রত ছিলেন। ‘ভারতবর্ষ’ নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদনভার তিনি গ্রহণ করেন। তাঁহাকে বহু পরিশ্রমও করিতে হইয়াছিল! মৃত্যুর দিন লিখিতে লিখিতে সহসা ক্লান্ত। তাহার পরই তাঁহার সংজ্ঞালোপ হয়। রোগযন্ত্রণা সহ্য না করিয়া সাহিত্যালোচনা করিতে করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে গমন করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য ও নাটকের বিস্তৃত সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। আমাদের এই অবসরও অল্প। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার বিবিধ ভঙ্গীর কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কিন্তু দুই চারিটি তরঙ্গ দেখিয়া যেরূপ সমুদ্রের কল্পনা করা অসম্ভব, সেইরূপ এই উদাহরণ হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার সম্যক্ ধারণা করা দুরূহ। আমরা দেখিব—দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গলা ভাষাকে, বাঙ্গলা দেশকে, বাঙ্গালীকে কি দিয়া গিয়াছেন? বাঙ্গলা ভাষাকে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান দিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় হাস্যরস অবতারণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে। আগেকার হাসি ব্যক্তিগত আক্রমণপূর্ণ, কখনও বা কুরুচিমূলক। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ব্যক্তিগত আক্রমণবর্জ্জিত, শুভ্র সংযত হাস্যরসে অভিষিক্ত। হাসির কবিতার মাত্রা ছন্দ ও কৌতুককর কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গলাভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আর দিয়াছেন—নাটকগুলি। বিবিধ বিচিত্র চরিত্র অঙ্কনে ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের সৌন্দর্য্যবিধান দ্বিজেন্দ্রলালের কার্য্য। সেই নাটকের জ্বলন্ত ওজস্বিনী ভাষা বাঙ্গলা গদ্যের সুপ্ত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করিয়াছে। বাঙ্গলাভাষায় তেজ আনিয়াছে। আরও দিয়াছেন—সঙ্গীতগুলি। "আমার দেশ" প্রভৃতি সঙ্গীত শত শত কণ্ঠে গীত হইয়াছে। যতদিন বাঙ্গলাভাষার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এ সঙ্গীত-ঝঙ্কার নীরব হইবে না।

বাঙ্গলাভাষাকে ত পূর্ব্বোক্ত সম্পদ্‌শালিনী করিয়াছেন। বাঙ্গলা সমাজের তিনি কি করিয়াছেন? বাঙ্গলার সমাজের দোষ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। কখনও তীব্র তিরস্কার, কখনও মৃদু বাণী দ্বারা সমাজের ভণ্ডামি প্রকটিত করিয়াছেন। হাসির গানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, এই সমাজের দোষ প্রদর্শন, প্রহসনগুলিতেও এই সামাজিক দোষের ব্যঙ্গচিত্র, নাটকে গম্ভীর উপদেশবাণী সমাজকে যথার্থপথে চলিতে বলিতেছে।

আর বাঙ্গালীকে দ্বিজেন্দ্রলাল দিয়া গিয়াছেন—এক মহান্ আদর্শ। যে আদর্শ টেনিসন্ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, সেই চিরশান্তিময় বিশ্বপ্রেমের আদর্শ। যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ নাই, মানবজাতি একত্র ভ্রাতৃভাবে মিলিত, মনুষ্যত্বের যেখানে চরম বিকাশ, সেই মহিমাময় ভবিষ্যতের চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। মেবারন্ত্রে বলিয়াছেন "আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌তে হবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের মধ্য দিয়া নয়—জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া।" [মেবারপতন ৫ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য]।

কবিবর! মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্যসাধনা করিয়া আজ তুমি চিরশান্তিলাভ করিয়াছ। সত্য ও সাহসে অদ্বিতীয়, জন্মভূমিবৎসল নির্ম্মলচরিত্র, উদারহৃদয় তুমি বঙ্গসাহিত্য-মন্দিরে শ্রেষ্ঠ পূজকদিগের অন্যতম। তোমার ভাষায় তোমাকে বলি—

"তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের মত।
তুমি কভু উপহাস

করিয়াছ ; কভু ব্যঙ্গ ; কভু ঘৃণা ;
ফেলিয়াছ বিষাদ নিশ্বাস
কভু ; কভু অনুতাপ ; গম্ভীর গর্জ্জন
কভু ; কভু তিরস্কার ;
আগ্নেয়গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা
কভু করেছ উদ্‌গার,
কভু প্রকৃতির উপাসনা, যোড়করে,
ক্ষুদ্র বালকের প্রায়
"আপন" দেশের জন্য
জ্বলিয়াছ কভু তীব্র মর্ম্মবেদনায়।"
[বাইরণের উদ্দেশে]।

বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, তাই আজ তোমার অসমাপ্ত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অশ্রু মোচন করিতেছি। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত—বাঙ্গালীর স্মৃতি-কিঞ্জল্কে তোমার নাম সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবে। কালিদাসের নরদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি মরেন নাই, ভবভূতি, ভারবি, শ্রীহর্ষ, তাঁহারাও অমর। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মত তুমিও বাঙ্গালীর কাছে অমর। তোমার প্রভাব, তোমার আশ্বাসবাণী, তোমার উচ্চ আদর্শ, নাটকে, কবিতায়, সঙ্গীতে চিরদিন বাঙ্গালীকে মহান্ পথে পরিচালিত করিবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

উৎপলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্দেহের নিরসন—তথাপি সন্দেহ।

এক দিন ধর্ম্মপাল অর্জ্জুনদেবের সহিত অসঙ্গসেনের দেখা। অসঙ্গ তাঁহাকে নমস্কার অভিবাদন করিয়া বিদায় হইতেছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মপাল মহাশয় তাঁহাকে নিজের গৃহে বিশ্রামকক্ষে লইয়া গেলেন। সেখানে উভয়ে অনেক কথা হইল। অর্জ্জুনদেব কহিলেন ;—

"অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

"রাজাধিরাজের মৃগয়াযাত্রার দিন হইতে আমরা কতক দিন নানা বিপদে নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম।"

"ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং প্রমীতসেনের কারাবাসের কথা বলিতেছ ?"

"হাঁ, আমরা মহা আশঙ্কায় পড়িয়াছিলাম। শুধু কয়েক দিন কারাবাসের ভয় নহে। বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষুদের প্রতি যে কঠোর শাসন, তাহাতে ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং তাঁহার অপরাধের সহকারী প্রমীতসেনের জীবন সম্বন্ধেই আমরা মহা ভীত হইয়াছিলাম। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আর আপনার অনুগ্রহে সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

"প্রমীতসেন ভাল আছেন ? এক কথা, মঞ্জুলা—গায়িকা মঞ্জুলার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ?"

অসঙ্গ বিস্মিত হইলেন, ধর্ম্মপাল মহাশয় এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?—বলিলেন ;—

"হাঁ, আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।"

"প্রমীতও তাহাকে চিনেন ?"

"প্রমীত যে তাহাকে চিনেন, অথবা তাহার গৃহে কোন দিন গিয়াছেন, তাহা আমি শুনি নাই।"

"সেখানে ত অনেকেই যাইয়া থাকে ?"

'তাহা সত্য, কিন্তু প্রমীত ত কোন দিন যায় নাই।"

"মঞ্জুলা বিদুষী, মঞ্জুলা রূপসী, মধুর-গায়িকা; তাহার গীত শুনিবার জন্য কি প্রমীত কোন দিন যাইয়া থাকেন না ?"

"না; তবে সেদিন বসন্তোৎসবে প্রমীত মঞ্জুলাকে দেখিয়াছেন।"

"সেই কি প্রথম দেখা ?"

অসঙ্গ আরও বিস্মিত হইলেন, বলিলেন ;—

"আমি যতদূর জানি, সেই প্রথম দেখা।"

ধর্ম্মপাল কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—

"সেদিন তোমাদের অত অনুরোধেও আমি প্রমীতকে ছাড়িয়া দি নাই, কিন্তু শেষে তৃতীয় দিনে হঠাৎ তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছি। কেন দিয়াছি, জান ?"

"না। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। রাজাধিরাজ রাজধানীতে ছিলেন না, তিনি ফিরিয়া আসিয়া বিচার করিবেন, ইতিমধ্যে প্রমীত মুক্তি পাইলেন।"

"অবশ্যই ইহার মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য আছে।"

"নিশ্চয়ই আছে।"

"প্রমীতের নিষ্কৃতির জন্য মঞ্জুলা অনুরোধ করিয়াছিল !"

"মঞ্জুলা! আপনি মঞ্জুলার অনুরোধে প্রমীতসেনকে বিনা বিচারে ছাড়িয়া দিয়াছেন !"

"পাগল তুমি!—মঞ্জুলা মহারাজ্ঞী দেবী কারুবকীকে ধরিয়াছিল. দেবীর আদেশে আমি প্রমীতকে ছাড়িয়া দিয়াছি।'

ক্ষণকালের জন্য পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধর্ম্মপাল তখন বলিলেন,—

"তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, প্রমীতের সঙ্গে কি মঞ্জুলার পরিচয় আছে ? প্রমীত মঞ্জুলার কে ?"

'আমি ত জানি কেহ নহে, কোন দিন আলাপ-পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎও নাই।"

"এমন গুরু অপরাধে রাজবিচার-প্রতীক্ষার কারারুদ্ধ সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির নিষ্কৃতির জন্য মহারাজ্ঞী দেবীকে অনুরোধ! তুমি জান, প্রমীতের পিতার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ও বন্ধুতা ছিল, প্রমীত আমার স্নেহের পাত্র; এত সহজে প্রমীত মুক্তি পাওয়াতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বৃহৎ রহস্য আছে। তুমি প্রমীতের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তুমি সহজে এ রহস্য উদ্ধার করিতে পারিবে।"

ধর্ম্মপালকে নমস্কার করিয়া অসঙ্গ বিদায় হইলেন। কুমুদনিবাস অভিমুখে যাইতে যাইতে অসঙ্গ অনেক ভাবিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পরেই ত বসন্তোৎসবে প্রমীত মঞ্জুলাকে প্রথম দেখিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বেই ত

মঞ্জুলা দেবী কারুবকীকে অনুরোধ করিয়াছিল। আর, বসন্তোৎসবের দিনও ত তাহাদের মধ্যে কোন আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই গায়িকাই যে মঞ্জুলা, প্রমীত তাহা অসঙ্গের নিকটই জানিয়াছিলেন! কতদিন ত অসঙ্গ প্রমীতকে মঞ্জুলার কথা বলিয়াছেন, মঞ্জুলার গৃহে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন, প্রমীত সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তবে কেন এই অপরিচিতের জন্ত মঞ্জুলার অতটা আগ্রহ? প্রমীত কি মঞ্জুলাকে পূর্ব্বেই জানিতেন, পূর্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে পরিচয় ছিল, প্রমীত সে পরিচয় গোপন করিয়া চলিয়াছেন?—না। তবে ব্যাপারটা কি?

প্রমীত যেন কোথায় যাইতেছিলেন, অসঙ্গকে দেখিয়া বলিলেন;—

"সে কি! আজ ক'দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন?"

"নগরে ছিলাম না। তুমি কোথায় যাইতেছ? বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি?"

"না।"

"যাইয়া কাজ নাই, বিশেষ কথা আছে, ঘরে চল।"

উভয় বন্ধু তখন প্রমীতের এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কি কথা?"

উভয়ে শয্যায় বসিলে অসঙ্গ বলিলেন;—

"কি যুক্তিবলে, কাহার অনুরোধে সেদিন কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছিলে, জানিতে পারিয়াছ কি?"

"না। কেমন করিয়া জানিব?"

"আমি জানিতে পারিয়াছি।"

"তুমি জানিতে পারিয়াছ! কেমন করিয়া জানিলে? কি জানিলে?"

"ধর্ম্মপাল মহাশয় স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন।"

"কবে?"

"এই এখনই বলিলেন, তাঁহার নিকট হইতে এই আসিতেছি।"

প্রমীতের মুখ কৌতূহলময়, কিন্তু অসঙ্গ কেমন যেন স্থিরগম্ভীর!

"মঞ্জুলা—বিদুষী, রূপসী, কলকণ্ঠী মঞ্জুলা তোমার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিল!"

"মঞ্জুলা!"

"হাঁ, মঞ্জুলা। মঞ্জুলা মহারাজ্ঞী কারুবকীকে ধরিয়াছিল, তাঁহার আদেশে ধর্ম্মপাল তোমাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।"

বিস্মিত প্রমীত জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

"এ নগরে শত সহস্র লোকের বাস, মঞ্জুলা কেন তোমার জন্ত এত ব্যস্ত? সে কেন রাজ্ঞীকে ধরিল?—মঞ্জুলাকে কি তুমি চিনিতে, তাহার সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?"

"কোন দিন ত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ নাই!" প্রমীতের মুখ যেন হঠাৎ হর্ষবিকশিত হইয়া উঠিল।—"ও হো:। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, মঞ্জুলা কেন আমার জন্ত এত করিয়াছে!"

"কেন করিল?—সে তোমার কে? আমার কাছে কিছু গোপন করিয়াছ?"

অসঙ্গের কথায় স্বর কিঞ্চিৎ শ্লেষযুক্ত, কথার ভঙ্গিতে যেন আহত সৌহার্দ্দের ঈষৎ

ঝঙ্কার, কেমন যেন ক্ষুণ্ণ অভিমানের আভাস। প্রমীত হাসিয়া বলিলেন ;—

"আমার কেহই নহে। তোমার কাছে কিছুই গোপন করি নাই, কিন্তু একটা বিষয় গোপন রহিয়া গিয়াছে।"

"বটে ?"

"আগে শুন।"

তখন প্রমীত সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিতে নগরোপকণ্ঠে সেই বিপন্না রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং উদ্ধারবৃত্তান্ত সমস্ত অসঙ্গকে বলিলেন। ঘটনা শুনিয়া অসঙ্গ চমৎকৃত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে সে রমণী ?"

"শুন, তাহার কোন পরিচয় সেদিন পাই নাই। তাহার পর রাজার মৃগয়া-যাত্রার পর আমার কারাবাস। তথা হইতে মুক্তির পর সেদিন বসন্তোৎসবে, তুমি জান,সেই গায়িকাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। তুমি আমার বিস্ময় এবং কৌতূহল দেখিয়া পরিহাসও করিয়াছিলে। রাত্রিকালে অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্ট সেই বিপন্নার সঙ্গে গায়িকার যেন কেমন একটুকু সাদৃশ্যের আভাস পাই। কিন্তু গায়িকা যে নগরপ্রসিদ্ধা মঞ্জুলা, তাহা তোমার মুখে শুনি। তাহার পর সেই বিপন্নার এক আমন্ত্রণপত্র পাইয়া একদিন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য তাহার গৃহে যাই, সেদিন সকল সন্দেহ দূর হয়। বিপন্নাই যে মঞ্জুলা সেই দিন তাহা জানিতে পারি। আজ দুই দিন হইল, তোমার সঙ্গে দেখা নাই, তোমাকে এ সকল কিছুই জানাইতে পারি নাই

জটিল ঘটনার এই অকপট বিবৃতিতে অসঙ্গের আশঙ্কা, সন্দেহ চলিয়া গেল। স্মিতমুখে অসঙ্গ বলিলেন,—

"আমার কাছে তোমার কথা মঞ্জুলা অনেক দিন শুনিয়াছে, কিন্তু তুমিই যে প্রমীতসেন, মঞ্জুলা তাহা সে রাত্রিতে কেমন করিয়া জানিল ?"

"সেদিন ঝড়-বৃষ্টির পরে তাহাকে গৃহে পাঠাইবার সময় মঞ্জুলা মিনতি করিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি আমার পরিচয় তাহাকে দিয়াছিলাম। কিন্তু মঞ্জুলা নিজ-পরিচয় আমাকে দেয় নাই, আমিও বিপদগ্রস্তা অপরিচিতা সম্ভ্রান্তমহিলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই। আমি তাহাকে তাহার নিজ-গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মঞ্জুলা তাহাতে স্বীকার হয় নাই ; সৌভাগ্য থাকিলে সময়ে একদিন পরিচিত হইয়া জীবন সার্থক করিবে, এরূপ বলিয়াছিল।"

"মঞ্জুলা তাহার পর কবে নিজগৃহে তোমাকে আহ্বান করিয়াছিল ?"

"বসন্তোৎসবের পর দিন।"

"সে ত তোমার কারাবাসের পরে। দেখিতেছি তার পূর্ব্বেই তোমার মুক্তির জন্য মঞ্জুলা রাজ্ঞীকে ধরিয়াছিল ?"

"হাঁ, সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিতে তাহার যে সামান্য কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ করিয়া মঞ্জুলা অযাচিতভাবে আমার এই মহদুপকার করিয়াছে।"

তখন দুই বন্ধু মঞ্জুলার চরিত্র-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইলেন, অসঙ্গ বলিলেন ;—

"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সন্দেহ, ইহার মধ্যে একটা বৃহৎ রহস্য আছে। তোমাদের মধ্যে

জানাশুনা, আলাপ-পরিচয়, আরও কিছু"—অসঙ্গ হাসিয়া বলিলেন,—"অবশ্যই কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে; সামান্য কারণে মঞ্জুলা মহারাজ্ঞীকে অনুরোধ করিবার সাহস পাইত না।"

"এখন তোমার সন্দেহ দূর হইল? নিগূঢ় সম্বন্ধ কিছুই নাই। দূর হইতে এক দিন দেখা, নিকটে যাইয়া এক দিন সাক্ষাৎ, তাহাও আমার মুক্তিলাভের পরে। তুমি বস, আমি উৎপলাকে এই সংবাদ দিয়া আসি।"

"আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। পাটলীগ্রামে যাইতেছিলাম, ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট সংবাদ শুনিয়া তোমাকে জানাইতে এবং গূঢ় রহস্য ভেদজন্য আসিয়াছি। আমার ভাগিনেয় অরুণ অত্যন্ত অসুস্থ, এখনি আমাকে সেখানে যাইতে হইবে।"

"আমি সঙ্গে আসিব?"

"আজ আবশ্যক নাই; পীড়া যদি বাড়ে, তোমাকে সংবাদ দিব।"

অসঙ্গ উঠিলেন, প্রমীতও উঠিলেন। যাত্রাকালে অসঙ্গ বলিলেন;—

"মঞ্জুলা অতি গুণবতী।"

"তোমার মুখে তাহা বহুদিন শুনিয়াছি।"

"মঞ্জুলা রাজ্ঞী কারুবকীর স্নেহ পালিতা কন্যা, মহাধনশালিনী।"

"তাহার গৃহ, গৃহের সাজ-সজ্জা রাজরাণীর উপযুক্ত।"

"মঞ্জুলা অপূর্ব্বরূপসী।"

"দুর্লভ রূপ! নিজচক্ষে দেখিয়াছি।"

"মঞ্জুলা হৃদয়শালিনী, উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে জানে।"

"আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, আমাকে চিরঋণী করিয়াছে!"

"দেখিও—ধনমান, রূপযৌবন, বাক্-চাতুর্য্য, ললিত-কলা আর কোমল কৃতজ্ঞ হৃদয়—ইহাদের অজেয় রক্তমাংসগঠিত মানুষ সংসারে বড় দুর্লভ।"

প্রমীত হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন;—

"তুমি পাগল!—আমার কিসের অভাব?"

রক্ষা-কবচের স্নিগ্ধপবিত্রপ্রভাবে ত প্রমীতের চিত্ত নিত্য সুরক্ষিত! কিসে ভয়?

অসঙ্গ চলিয়া গেলেন, অন্তঃপুরে স্ত্রীর কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করিয়া প্রমীত ব্যস্ত-সমস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কৈ গো, কোথায়?"

গৃহকোণে উৎপলা যেন কি করিতেছিলেন, অগ্রসর হইয়া বলিলেন;—

"এই ত এখানে,—এত ব্যস্ত কেন?"

"শুনিয়াছ, কাহার অনুরোধে, কেমন করিয়া আমি কারামুক্ত হইয়াছিলাম?"

"না, তুমিই ত তাহা কিছুই জানিতে পার নাই, আমি আর কেমন করিয়া জানিব?"

"আমি জানিতে পারিয়াছি।"

স্মিতসকৌতুকমুখে উৎপলা আরও অগ্রসর হইয়া স্বামীর সম্মুখে অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"কি জানিলে? কে তোমাকে বাচাইল?"

"মঞ্জুলা!"

"মঞ্জুলা?"

উৎপলার গা শিহরিয়া উঠিল. তাঁহার হৃদয়ে যেন সহসা নিমেষস্থায়ী শূচীবেধ-যন্ত্রণা অনুভূত হইল। সেই "চির-উপকৃতা" রূপসী যুবতী মঞ্জুলা!

"হাঁ, মঞ্জুলা। মঞ্জুলা আমার কারামুক্তির জন্য মহারাজ্ঞী কারুবকীকে ধরিয়াছিল, দেবীর আদেশে আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছি।"

"তুমি ব'স। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সব কথা বল। মঞ্জুলা কেন এত করিল?"

প্রমীত পালঙ্কে বসিলেন, হাত ধরিয়া উৎপলাকেও বসাইলেন। তখন অসঙ্গের নিকট শ্রুত সকল কথা স্ত্রীর কাছে বিবৃত করিলেন। উৎপলা বলিলেন;—

"তুমি সেদিন তাহার গৃহে যাইবার পূর্ব্বে—বসন্তোৎসবের পূর্ব্বেই তবে মঞ্জুলা মহারাজ্ঞীকে ধরিয়াছিল। তখন ত তোমার সঙ্গে তাহার আলাপ-পরিচয় সাক্ষাৎও হয় নাই।"

"সেই বৃষ্টি-দুর্য্যোগময় রাত্রিতে মঞ্জুলা আমার পরিচয় পাইয়াছিল।"

"সেদিন তুমি যে তাহার সামান্য উপকার করিয়াছিলে, তাই মনে করিয়াই কি মঞ্জুলা তোমার এই মহদুপকার—তোমার মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছে?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই তাই।"

"তারপর সে দিন তাহার আমন্ত্রণে তুমি তাহার গৃহে গিয়াছিলে, সে দিনও কি তাহার কথাবার্ত্তা আলাপপ্রসঙ্গে, সে যে তোমার জন্য এত করিয়াছে তাহা কিছুই বুঝিতে পার নাই?"

"কিছুই না। মঞ্জুলা যে আমার এই মহাপ্রত্যুপকার করিয়াছে, আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, তাহা আমরা কোন মতে জানিতে না পারি, তাহাই তাহার ইচ্ছা।"

উৎপলার চিত্ত বিগলিত হইল। অমূলক সন্দেহ অনুদার ঈর্ষার ম্লান-ছায়া তাহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইল। এমন গুপ্ত পরমোপকারিণী রমণীকে সন্দেহ? স্নেহ, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, অকৃত্রিম, সৌহার্দ্যে উৎপলার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবেগময় হৃদয়ে উৎপলা বলিলেন;—

"আমি মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিব।"

"আমি তোমার অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছি, আমি এখনি যাইব।"

"অনুমতি? এখন হিতকারিণী পরম সুহৃদের কাছে যাইবে, তাহার জন্য আমার অনুমতি? আমরা যে চিরদিনের জন্য মঞ্জুলার নিকট বিক্রীত। যখন তোমার ইচ্ছা, তখনই যাইবে। তবে, আজ এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

"তুমি আজ না-ই গেলে, কখনো যাও নাই। পরে আর এক দিন যাইও, আজ আমি যাই।"

"যাও, আমার কথা বলিও। আমি যে চিরকাল তাহার নিকট বাঁধা রহিলাম, তাহা বলিও। একটুকু বিলম্ব কর, আমি মঞ্জুলার জন্য কি পাঠাইব? কিছু ফুলমালা পাঠাইব, কে লইয়া যাইবে? তোমার সঙ্গে কে যাইবে?"

"বাদল যাইবে, আরও যেন কেহ যায়, তুমি সব ঠিকঠাক কর।"

উৎপলা মাধবীকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি

শুভ্রসুগন্ধি সুশোভন পুষ্প, পুষ্পগুচ্ছ এবং মাল্য সংগ্রহ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্র ও বামন

রাজধানীতে সোমদত্ত একজন বিখ্যাত পরিচিত লোক। পিতা প্রচুর ধনসম্পত্তি-শালী ছিলেন, কিন্তু সোমদত্ত প্রথম বয়স হইতেই বড় উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি। পিতার মৃত্যুর পর সেই ধনের অধিকারী হইয়া নানাপ্রকার অযথাব্যয়ে সোমদত্ত তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি ব্যয়ের শমতা নাই। বড় হাত ছোট করা সহজ নহে। দাসদাসী, আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। আমোদপ্রমোদ, নৃত্যগীত, পান-প্রসঙ্গে ব্যয়ের মাত্রা বরং বৃদ্ধি পাইতেছিল। লোকে মনে করিত, অগাধ সম্পত্তি, অক্ষয় ভাণ্ডার। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানিতেন, তাঁহারা ভাবিতেন, আর কয় দিন? দ্যূতগৃহে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে লোকে দেখিয়াছে, গ্রামে সভিকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা থাকায় লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল।

বেলা অপরাহ্নে সোমদত্ত মঞ্জুলার গৃহে আসিয়াছিল। বাহকগণ ভারে ভারে ফল-ফুল মাল্যসম্ভার আনিয়াছে। মাতা অলোকার সঙ্গে সোমদত্তের কথা হইতেছিল। চঞ্চলা আসিয়া জানাইয়াছে, মঞ্জুলার অসুখ, দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। অলোকা বলিলেন,—

"আজ কতদিন যাবৎ মঞ্জুর শরীর যেন কেমন হইয়াছে। একটী দিনও ভাল যাইতেছে না।"

"কত দিন তাহাকে দেখি নাই। কি হইয়াছে?—আর একবার সংবাদ দিবেন?"

অলোকা আর একবার পরিচারিকাকে পাঠাইলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ভারি অসুখ। পরিচারিকা চলিয়া গেল। কিছু কাল নীরব থাকিয়া সোমদত্ত বলিলেন,—

"আমার সৌভাগ্যোদয় কবে হইবে!"

"আমার মনের ভাব আপনি জানেন।"

"তাহা ত জানি, কিন্তু মঞ্জুর মনের ভাব আজও বুঝিতে পারিলাম না। সে দিন কেয়ূর ফিরাইয়া দিয়াছিল, বন্ধুবান্ধবের সাদর উপহার গ্রহণে কি দোষ?"

"দোষ কিছুই নহে। মঞ্জুর দুই তিন প্রস্থ কেয়ূর আছে, কেন আপনি অর্থব্যয় করিয়া অত মণি মুক্তা খচিত মূল্যবান উপহার পাঠাইলেন?"

"যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও যেখানে তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই, সামান্য মূল্যের কেয়ূর সেখানে উল্লেখযোগ্যও নহে।"

"মঞ্জুলার বালিকা-বুদ্ধি আজও যায় নাই। ধনসম্পদ, মানসম্ভ্রম, যশগৌরবে আপনার মত আর কোথায় মিলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

"অনেক দিনের আশা!"

শুধু আমার হাত হইলে এতদিন আপনার আশা এবং আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু রাজ্ঞী কারুবকী মঞ্জুর অভি-ভাবিকা।"

সোমদত্তের মনে পড়িল, প্রমীতের কারা-মুক্তির পূর্ব্বদিন ত মঞ্জুলা রাজ্ঞীর নিকট গিয়াছিল। মঞ্জুলা কি প্রমীতের জন্য রাজ্ঞীকে অনুরোধ করিয়াছিল? মঞ্জুলা ত প্রমীতকে চিনে না। তখন আর এক দিনের কথা সোমদত্তের মনে পড়িল; সে দিন সন্ধ্যা

ময়ে প্রমীতসেন এই দিকেই আসিতেছিলেন ঞ্জুলার ভৃত্য বাহুক তাঁহার সঙ্গে ছিল! তনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"শুনিতে পাই, রাজ্ঞী কারুবকীর পিতা ভক্ষু উপগুপ্তের শিষ্য ছিলেন ?"

"আমিও তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু বৌদ্ধমত অবলম্বনের পূর্ব্বেই তাঁহার অভাব হয়। রাজ্ঞী কারুবকী কিন্তু ভিক্ষুকে পিতৃগুরু বলিয়া চিরদিন শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।"

"তাই বুঝি রাজাধিরাজের মৃগয়াযাত্রার দিন অতিগুরু অপরাধ করিয়াও শেষে রাজ্ঞীর অনুরোধে ভিক্ষু নিষ্কৃতি লাভ করেন ?

"অতি সম্ভব।"

"প্রমীতসেনও অপরাধী ছিলেন ; তাঁহার মুক্তি কেমন করিয়া হইল, কিছু শুনিয়াছেন কি ?"

প্রকৃত অপরাধী ভিক্ষুই যখন মুক্তি পাইলেন, তখন তাঁহার সহকারী বলিয়া ধৃত প্রমীতসেন আর কেমন করিয়া দণ্ডিত হইবেন ?"

"ভিক্ষুর মুক্তির পূর্ব্বেই ত প্রমীতসেন নিষ্কৃতি পাইয়াছে।"

"হাঁ, তাঁহার অতি সৌভাগ্য!"

সোমদত্ত আর কথা বাড়াইলেন না। তাঁহার মনের সন্দেহ মিটিল না ; কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা করা তিনি সমীচিন বোধ করিলেন না। বলিলেন ;—

"অমন বিপদ হইতে অত সহজে রক্ষা পাওয়া অতি সৌভাগ্যের ফল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মুক্তিতে সমস্ত রাজধানী আনন্দিত।—মঞ্জুর সঙ্গে আজ আর দেখা হইল না, আপনি আমার কথা তাহাকে বলিবেন। আপনি ভরসা দিয়াছেন, তাই আশায় বুক বাঁধিয়া আছি।"

"আমি ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।"

বিনীত নমস্কার করিয়া সোমদত্ত তখন বিদায় হইলেন।

কন্যা বয়স্থা হইয়াছে, মাতা অনেক দিন হইতে তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। মঞ্জুর রূপগুণ-ধন-মুগ্ধ প্রার্থীর অভাব ছিল না। কিন্তু তাহার সম্যক্ উপযুক্ত বর সংঘটন পক্ষে যে সকল অন্তরায় ছিল, অলোকা তাহা জানিতেন। বিশেষতঃ রাজ্ঞী কারুবকীর অভিমত না হইলে, অনুমতি না পাইলে মাতা কিছুই করিতে পারেন না।

মঞ্জুলার অসামান্য রূপগুণবিদ্যা-গৌরবের কথা শুনিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত প্রবীণ লোক তাহার গৃহে সময় সময় আসিয়া আপ্যায়িত হইয়া যাইতেন। কৌতূহল-পরবশ হইয়া সোমদত্তও একদিন মঞ্জুলার পরিচিত এক জনের সঙ্গে আসিয়াছিলেন ; আসিয়া, দেখিয়া শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। সেই হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন। শেষে একদিন নিজের মনের ভাব প্রকারান্তরে মাতা অলোকাকে জানাইলেন। সোমদত্তের প্রস্তাবে মাতার মন বিচলিত হইল। এমন লোকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে মাতা অমত করিতে পারিলেন না। সোমদত্ত বিপত্নীক। সমাজে, নগরে সোমদত্ত সুপরিচিত, মানসম্ভ্রমে সোমদত্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু মঞ্জুলা বয়স্থা হইয়াছে। অবস্থা, শিক্ষা এবং সংসর্গগুণে আশৈশব স্বাধীনচিত্তা কন্যার অভিমত অথবা মনের গতি না জানা পর্য্যন্ত মাতা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

কন্যার মন জানিতে পারিলেই রাজ্ঞীর নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন।

এদিকে সোমদত্তের মনে আশার সঞ্চার হইল। আশা ক্রমে ঔৎসুক্যে পরিণত হইল। রূপগুণে মঞ্জুলা আকাঙ্ক্ষনীয়া, কিন্তু সোমদত্তের পক্ষে তদপেক্ষাও গুরুতর আর এক হেতু ছিল। সোমদত্তের অবস্থা ভাল নহে, বরং তাহা ক্রমে অতিমন্দই হইয়া আসিতেছিল, অর্থাভাবে সমাজে মানমর্য্যাদা প্রভৃতি রক্ষা তাঁহার পক্ষে ক্রমে কঠিন হইতেছিল। মঞ্জুলার বিপুল সম্পত্তি; মঞ্জুলা হস্তগত হইলে, সেই অর্থাভাব দূর হয়। সোমদত্ত ক্রমে অতি ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

সোমদত্ত চলিয়া গেলে অলোকা অনেক ভাবিলেন; কেয়ূর গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করার পর হইতে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল; শেষে বয়স্থা কন্যার অভিমত প্রতীক্ষায় বিলম্ব করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। কন্যাকে তিনি কিছু ভয় করিয়াই চলিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্ষুণ্ণ গৌরব

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঞ্জুলা নিজের কক্ষে শয্যায় বসিয়া বীণার স্বরলয়ে গীত গাহিতেছিল;—

ক্যায়সে কহো শ্যাম ভিখারী।
তোঁহারি দরশ বিনু, নিঠুর কাঁহাইয়া,
আঁখিসে লোর ঝরে সো পেয়ারী।
বরিখয়ে সুধা গগনে চন্দ্রমা,
বিখে জরে অঙ্গ গোপনারী।
দহতি অঙ্গ মল্লিকা মালতী,
তুঁহু পরদেশে চিত চোরি!

মঞ্জুলার সুন্দর সুগোল গৌর মুখমণ্ডলে শারীরিক কোনপ্রকার অসুখের কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই। বিদ্যুৎগর্ভ নবীন মেঘবৎ নিবিড়কৃষ্ণ তারকাযুক্ত তাহার আয়ত চক্ষু, দীর্ঘ সূক্ষ্ম ঘোরকৃষ্ণ কোমল পক্ষ্মশ্রেণী আর চিত্রলিখিতবৎ মিলনোন্মুখ বঙ্কিম ভ্রূযুগের মৃদু আকুঞ্চন এবং স্পন্দনে গীতকথার গুপ্ত ভাব এবং বীণার স্বরসঙ্গতির অভিব্যক্তি হইতেছিল সাজসজ্জা অলঙ্কার সমাবেশের কোন আড়ম্বর নাই, তথাপি তাহার স্ফুরদুজ্জ্বলশ্রী ক্ষীণ দেহ বসন্তে নবকুসুমিতা মাধবীলতার মনোহর স্বাভাবিক লাবণ্যময়।

মঞ্জুলা গাহিল ;—

বরিখয়ে সুধা গগনে চন্দ্রমা,
বিখে জরে অঙ্গ গোপনারী।
দহতি অঙ্গ মল্লিকা মালতী,
তুঁহু পরদেশে চিত চোরি!

চঞ্চলা বলিল ;—

"চাঁদের কিরণে শরীর জ্বালা করে, মল্লিকা মালতী অঙ্গ দগ্ধ করে, তুমি তাহা কেমন করিয়া জানিলে ?"

"জানিব আবার কি ? লোকে চিরকাল ওরূপ বলিয়া আসিতেছে; তুই শুনিস্ নাই ?"

"অমন অনাসৃষ্টি কথা আমরা শুনি নাই।"

"তুই শুনিস্ নাই বলিয়াই কি তা মিছা হইবে ?"

"প্রতিদিনই ত চাঁদের কিরণে কত হাঁটি, বসিয়া থাকি, কাজকর্ম্ম করি; মল্লিকা মালতী যুঁই জাতি তুলিয়া কত মালা গাঁথি; কোনদিনও শরীর জ্বালা করে না!"

"তোর ত পাথরের শরীর, তার আর ।লা-যন্ত্রণা কি ?—শোন্ ;"—

তুঁহু পরদেশে চিত চোরি !

চঞ্চলা হাসিয়া উঠিল, বলিল ;—

"ওহো ! এখন বুঝিলাম, কেন জ্বালা !"

"তুই কি ও ভাবের জ্বালা কখনো হিয়াছিস্ ?"

"আমার ত পাথরের শরীর। তবে ।নিয়াছি, আমার এক বড় ভগ্নী ছিল, তার নদ না কি ঐরূপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া রিয়াছিল।"

"কি হইয়াছিল রে ?"

"তার স্বামী না কি বিদেশে চলিয়া যায়, মার ফিরিয়া আসে না। ঘরে আর কেহ ছল না, অনাহারে জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষে সে না কি মরিয়া যায়।"

"দূর অভাগী ! অনাহারে মরা হইল এক, আর আশাভঙ্গে—প্রিয়জনের অদর্শনে— লিয়া মরা হইল আর এক কথা।"

"তা হ'লে এই যে সোমদত্ত মহাশয় কত আশা করিয়া কতদিন এখানে আসেন, আজও আসিয়াছিলেন, তিনিও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেন ।"

"কে কোথায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, আমি তাহা কেমন করিয়া জানিব ? আর তাহাতে আমার কি ?"

"সোমদত্ত মহাশয়ের কথা তুমি জান। আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, ঠাকুরাণীর যেন সেই ইচ্ছা !"

মঞ্জুলার হাসিমুখ গম্ভীর হইল। ক্রোড় হইতে বীণা সরাইয়া রাখিয়া মঞ্জুলা বলিল ;—

"তুইও কি সেই দিকে ?"

চঞ্চলা একটুকু অপ্রতিভ হইল। সোমদত্তের সঙ্গে একদিন তাহার কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। শুধু গৃহস্থের মন বুঝিবার জন্য আজ এ ঢিল মারিয়াছে। চঞ্চলা অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল ;—

"আমি ! কেন তোমার এ সন্দেহ হইল ? আমার কোন দিক্-বিদিক নাই ; তোমার যে দিক্, আমারও সেই দিক্।"

মঞ্জুলার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। মঞ্জুলা বলিল ;—

"শোন্, চাঁদের কিরণে যে গা জ্বলে, তাহা আমি জানি না ; আমার গা ত কোন দিন জ্বলে নাই। সে কথা যাক্। তুই না এক দিন বলিয়াছিলি, দ্যূতগৃহ হইতে সোমদত্ত মহাশয়কে বাহির হইতে দেখিয়াছিস্ ?"

"একদিন দেখিয়াছিলাম বটে।"

"মা'র মনের ভাব আমি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। আমার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিয়াছিস্ ?"

"আজ বুঝিলাম।"

"তবে আর সে কথায় কাজ নাই। সন্ধ্যা হইল, চিত্রাকে আলো জ্বালিতে বল্।"

চঞ্চলা উঠিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুলা বীণা তুলিয়া লইয়া পুনরায় মৃদুমৃদু ঝঙ্কার দিতে লাগিল। এমন সময় চিত্রা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল ;—

"প্রমোদসেন মহাশয় আসিয়াছেন।"

মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বীণা রাখিয়া দিল।

"কোথায় তিনি ?"

"ঠাকুরাণীর ঘরে।"

"তুই আলো জ্বাল। চঞ্চলা, চল আমরা বারান্দায় যাই।"

বিস্রস্ত কেশে, বিপর্য্যস্ত বেশেই মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আয়তচক্ষে অতর্কিতে চলৎবিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, অধরে স্মিতরেখা দেখা দিল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। চতুরা চঞ্চলা সকলই লক্ষ্য করিল। সে মনে মনে ভাবিল, বটে? এখন হইতে চাঁদের কিরণে গা জ্বালা করিবে!

দাসী পরিচারিকারা আলো জ্বালিতে লাগিল। চঞ্চলা দ্রুতহস্তে মঞ্জুলার কেশপাশ এবং বেশভূষার একটুকু শৃঙ্খলা করিল। একখানি ঈষদলক্তকরক্ত ওড়নি আনিয়া তাহার অঙ্গে পরাইয়া দিল।

বারান্দায় ছোট ছোট বেত্রাসন, পাল‌ং, তাহাতে পুরু শয্যা। নিম্নে কত লতা— মুক্তা, মাধবী, লবঙ্গ—দক্ষ মালীর যত্নকৌশলে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বারান্দার স্তম্ভগুলি ঘিরিয়া ঘিরিয়া উপরে ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। লতায় কত ফুল! অস্তোন্মুখ রক্তরবি-কিরণে পশ্চিমাকাশ তখন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে সে অপূর্ব্ব শোভা পরিলক্ষিত হয় সেখানে পৌঁছিয়া মঞ্জুলা বলিল;—

"মালী নিত্যকার ফুলমালা দিয়াছে?"

"হাঁ, এখানে আনিব কি?"

"এখন না, সময় হইলে আনিবি। চঞ্চলা, এখানে থাক্; চিত্রা, তাঁহাকেএখানে লইয়া আয়।"

প্রমীতসেন বারান্দায় পৌঁছিলে মঞ্জুলা সলজ্জ মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল। স্মিতমুখে বলিল;—

"কি সৌভাগ্য আমার! এ সামান্য স্ত্রীলোককে আপনি বিস্মৃত হন নাই!"

"বিস্মৃত হইব? আপনি—তুমি এ অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে চিরজীবনের জন্য ঋণী করিয়াছ। আগে জানিতে পারি নাই, জানিতে পারিলে কোন্ দিন আসিয়া এমন হিতকারিণীকে ধন্যবাদ—ধন্যবাদে কি কখনো চিত্তের তৃপ্তি হইতে পারে?—"

"কি জানিতে পারিয়াছেন?—আপনি বসুন।" প্রমীতসেন একখানি আসনে বসিলেন, বলিলেন,—

"জানিতে পারিয়াছি—তোমার অনুগ্রহে কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছি, তোমার অনুগ্রহে আমার মান, সম্ভ্রম, জীবন রক্ষা পাইয়াছে। সেদিন তোমারগৃহে আসিয়া অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট যে আমি এত ঋণী, তাহা ত জানিতাম না।"

"আপনার কারামুক্তিতে আমাদের যে কত আনন্দ হইয়াছে, তাহা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব?"

"আমার এমন মহোপকার তুমি করিয়াছ; কিন্তু সে কথা অপ্রকাশ রাখিয়াছ! আজ আমি সকলই শুনিয়াছি।"

প্রমীত তখন অসঙ্গের নিকট শ্রুত নিজের কারামুক্তির ইতিবৃত্ত মঞ্জুলাকে জানাইলেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের নাম প্রকাশ করিলেন না, অসঙ্গ তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন। মঞ্জুলা বলিল;—

"আমি সেদিন দেবীকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় নিরপরাধে আপনার কারাবন্ধের কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম মাত্র। দেবী দয়াময়ী, তিনি আপনার নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিয়া আপনার

মুক্তির জন্য ধর্ম্মপাল মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দেবীর দয়ায় আপনার মুক্তি হইয়াছে। আমি কিছুই করি নাই।"

"তুমি কিছুই কর নাই?—তোমার অনুরোধেই যে রাজ্ঞীর চিত্ত আর্দ্র হইয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি।"

"এই সামান্য কার্য্যের পুনরুল্লেখ করিয়া আমাকে আর লজ্জিত না করেন, আমার এই প্রার্থনা।"

"কার্য্য সামান্য নহে, আমার জীবনরক্ষা। আমরা যে তোমার কাছে চিরদিনের জন্য বাঁধা রহিলাম, তাহা তোমাকে জানাইবার জন্য আমার স্ত্রী আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। পরম-সুহৃদের নিকট পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি আমার সঙ্গেই আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রাত্রি হইবে বলিয়া আজ তাঁহাকে বিরত করিয়াছি।"

"তিনি আমার এখানে আসিবেন?—সে কি! আমার সহস্র মিনতি"—মঞ্জুলা নতজানু হইয়া ভূমিতে প্রণাম করিল।—"আমার সহস্র প্রণাম তাঁহাকে জানাইবেন। তিনি আমার এখানে আসিবেন! তাঁহার অনুমতি পাইলে আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইব।"

"তুমি যাইবে?"

"রাজাধিরাজের জন্মদিনের উৎসব আসিতেছে। দেবীর আদেশ, আমাকে দেবীর নিকট উপস্থিত থাকিতে হইবে। আপনি অনুমতি করুন, তাহার পরে শীঘ্র একদিন কুমুদনিবাসে যাইয়া জীবন সার্থক করিব।"

"তুমি যাইবে! গেলে আমার স্ত্রীর আনন্দের অবধি থাকিবে না। তিনি কিছু ফুল ও মাল্য উপহার পাঠাইয়াছেন, অনুমতি পাইলে ভৃত্যেরা এখানে উপস্থিত করিবে।"

"মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চিত্রা বারান্দার অপর পার্শ্ব হইতে ফুলমাল্যের ভার সেখানে লইয়া আসিল। মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। চিত্রার হাত হইতে সেই পুষ্পভার গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিজ মস্তক স্পর্শ করিল।

"এখানে আঁধার হইয়া আসিল, আপনি ভিতরে চলুন।"

প্রমীত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গন্ধদীপাবলীতে কক্ষ আলোকিত হইয়াছে। প্রমীত উপবেশন করিলে মঞ্জুলা সেই পুষ্পভারের আচ্ছাদন খুলিয়া একটী সুরভি মাল্য বাহির করিল, অতিযত্নে তাহা নিজ কণ্ঠে পরিল; তখন নতমস্তকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া বলিল;—

"আজ আমার দেহ পবিত্র হইল।"

স্নিগ্ধদীপরশ্মিপাতে ওড়নির অলক্তকরাগ মঞ্জুলীর হর্ষপ্রফুল্ল গৌরমুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

উৎপলা পরমসুন্দরী। বয়স্যসম্প্রদায়ে প্রমীতসেনের গৌরব—অমন সুন্দরী স্ত্রী আর কাহারও নাই। প্রেমিকের চক্ষে ত কত কুরূপাও সুন্দরী, কিন্তু উৎপলা স্বভাব-সুন্দরী। প্রমীতের বিশ্বাস এবং অহঙ্কার অমন রূপবতী রমণী আর কোথায়ও নাই। কিন্তু প্রমীতের সে বিশ্বাস, সে গর্ব্ব আজ বা ক্ষুণ্ণ হইল! নগরোপকণ্ঠে অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্টা আকুল-কুন্তলা অপরিচিতা মঞ্জুলা পরম-রূপসী, বসন্তোৎসবে মণিমুক্তালঙ্কারে মণ্ডিতা গায়িকা মঞ্জুলা আরও সুন্দরী, নিজগৃহে

প্রথমসম্ভাষণে আমন্ত্রণকারিণী উপকৃতা মঞ্জুলা তদপেক্ষাও সুন্দরী, আর আজ সম্পূর্ণ নিরাভরণা শুধু উৎপলার উপহারমাল্যধারিণী পরমহিতকারিণী মঞ্জুলার রূপ প্রমীতের চক্ষে অতুলনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইল।

কি রূপ! মুগ্ধ প্রমীত নিস্পন্দ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলার মধুর উক্তির উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। মঞ্জুলার আরক্ত মুখ নত, রক্তাভ হইয়া উঠিল।

চঞ্চলা অপর কক্ষ হইতে ফুলমাল্যচন্দন-গন্ধচূর্ণ-পরিপূর্ণ একখানি থালা লইয়া আসিল। কম্পিত হস্তে সেই থালা প্রমীতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মঞ্জুলা বলিল;—

"আমার এই সামান্য পূজা—"

তখন প্রমীতের চমক ভাঙ্গিল, তাঁহার মুখও আরক্ত হইয়া উঠিল।

"পূজা! তোমার নিকট যে আমরা চির-বিক্রীত!"

প্রমীত থালা হইতে একটি মালা তুলিয়া গলায় পরিলেন, চন্দনগন্ধচূর্ণ গাত্রে প্রক্ষিপ্ত করিলেন; বলিলেন;—

"রাজাধিরাজের জন্মোৎসবে আমারও উপস্থিত হইতে হইবে। রাত্রি হইয়াছে, আমি বিদায় প্রার্থনা করি। আমার স্ত্রী তোমার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইবেন।

"আমি শীঘ্রই তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব।"

মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রণত হইয়া বিদায়সূচক অভিবন্দনা জানাইল। তারপর চঞ্চলা, চিত্রা এবং অন্যান্য পরিচারিকাসহ বহির্দ্বার পর্য্যন্ত প্রমীতের অনুগমন করিল।

পথে চলিতে চলিতে বার বার প্রমীতের মনে হইল, কেন আজ এই আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। মঞ্জুলা কি মনে করিবে? মঞ্জুলা পরমরূপবতী? ভাল, তাহাতে আমার কি?

মানুষের চিত্ত যখন প্রথম বিচলিত হয়, কারণ জানিতে পারিলেও তাহা সহজে স্বীকার করিতে চাহে না।

রক্ষাকবচ, জাগ্রত হও! আপাতমধুর অমোঘ বিষের গুপ্ত প্রভাব প্রথমে কে বুঝিতে পারে?

(ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

বৈদিক সাধনার আভাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অব্যক্তশরীর আনন্দময় ঈশ্বর হইতে ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি। প্রজাপতিদেহরূপিণী অব্যাকৃতপ্রকৃতি হইতে নিখিল প্রকৃতি-বিকারের উৎপত্তি। প্রকৃতির এই বিকৃতিকে সাধারণভাবে জড়-সৃষ্টি বলা হইয়া থাকে। পরন্তু একান্ত জড় বা চৈতন্যবিহীন কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভবে না। ব্যাখ্যার সৌকর্য্যার্থই শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ জড় ও চৈতন্যের

বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন মূলতঃ প্রকৃতিকে জড় বা অচেতন বলা আর চৈতন্যকে অচেতন বলা সমান কথা। পূর্ব্বোদ্ধৃত সৃষ্টিসূক্তে বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন যে প্রলয়-কালে স্বধা বা প্রকৃতি এক অভিন্নভাবে ব্রহ্মে লীন থাকে। সুতরাং প্রকৃতি জড় হইলে ব্রহ্মও জড় হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই লৌকিক চেতন ও অচেতন পদার্থরূপে লোক-চক্ষে প্রতীয়মান হন। কর্ম্মসংস্কারবশে অজ্ঞান জীব যখন তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হয়, তখনই সে তাঁহাকে কোথাও চেতন ও কোথাও অচেতনরূপে দেখে। জীবের কর্ম্মসংস্কারদ্বারা প্রণোদিত হইয়া সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্টিশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিকাশ করিয়া বিশ্বময় ভেদ উৎপন্ন করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানচক্ষু সম্যক্ উন্মীলিত না হয়, ততক্ষণ জীব এইরূপে বিশ্বময় ভেদ দর্শন করে, বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মপদার্থকে দর্শন করে না। জ্ঞানসূক্তে (ঋঃ সঃ ১০।৭১) ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী
সুবাসাঃ॥" ১০।৭১।৪

"একজন বাক্‌কে দেখিয়াও দেখে না, একজন তাঁহাকে শুনিয়াও শুনে না ; আবার একজনের নিকট তিনি তাঁহার নিজেকে প্রকাশ করেন যেমন সঙ্গমাভিলাষিণী শোভন-বসনা কামিনী ভর্ত্তৃসকাশে নিজেকে প্রকাশ করে।" অর্থাৎ, অজ্ঞান ব্যক্তি বেদার্থের পর্য্যালোচনা করিলেও অথবা বেদবাক্য শ্রবণ করিলেও তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না, পরন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে বেদার্থ স্বতঃই প্রতিভাত হয়।

ভৌতিক প্রপঞ্চের মোহ কাটাইয়া, অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, বহির্মুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে নিরোধ করিয়া যে জীব শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানজ্যোতিতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহারই নিকট বেদার্থ সম্যক্ প্রতি-ভাত হয়। তাই উক্ত জ্ঞানসূক্তে ঋষি আবার বলিতেছেন :—

"ইমে যে নার্বাঙ্ন পরশ্চরন্তি ন
ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ন এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তংত্রং
তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ॥" ১০।৭১।৯

"এই সকল ব্যক্তি যাহারা অধোবর্ত্তী এই পৃথিবীতে বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের সহিত আচরণ না করে ও যাহারা পরবর্ত্তী স্বর্গলোকস্থ দেবগণের সহিত আচরণ না করে সেই সকল ব্রাহ্মণ বেদার্থ জানিতে সমর্থ হয় না, মাত্র সোমের অভিষব যাহারা করে তাহারাও জানিতে সমর্থ হয় না। অজ্ঞানী এই সকল ব্যক্তি বাক্যমাত্র প্রাপ্ত হইয়াও পাপকারিণী বাকের সহিত মিলিত হইয়া কেবল হল-চালকরূপে ভূমিকর্ষণ করিতে থাকে।"

কেবল ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মন্ত্রবিৎ যাজ্ঞিক হইলেই বেদার্থ জানা যায় না, কেবল সোম অভিষুত করিলেই বেদার্থ জানা যায় না। বেদের বাক্যমাত্র অধিগত করিলে সেই বাক্য-গত পশুহননাদি পাপদ্বারাই কেবল বিদ্ধ হইতে হয়। বেদার্থ জানিতে হইলে বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া যথার্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সাহচর্য্য করিতে হয় এবং এমন কি ইহলোকের

অতীত দেবলোকের সহিত যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়।

এই যে বেদার্থ-জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান ইহা যে একেবারে সম্যক্‌রূপে সকলের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় তাহা নহে। বহু আয়াসে, বহু তপস্যার ফলে এই জ্ঞানকে শনৈঃ শনৈঃ লাভ করিতে হয়। সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে চিত্ত যত উত্তরোত্তর নির্ম্মল হইতে থাকে, জ্ঞানের আলোক ততই তাহার ভিতরে ফুটিতে থাকে। এইরূপে যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল ও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে তাঁহারাই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ হয়েন। তাঁহারাই বাক্যের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, সুতরাং তাঁহারাই যথার্থ কর্ণবান্ হয়েন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব পদার্থে সমদর্শী হয়েন, অদ্বৈত জ্ঞান ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের আয়ত্ত হয়। বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর তত্ত্ব সকল তাঁহারা তখন অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে থাকেন। স্বল্প আয়ত্ত হইলেও এই জ্ঞান মানুষকে অতুলনীয় করে। যিনি কিঞ্চিন্মাত্রও এই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি সংসারের পঙ্ক হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। এই কথাই ঋষি জ্ঞানসূক্তে পুনরায় বলিতেছেন :—

অক্ষণ্বংতঃ কর্ণবংতঃ সখায়ো
মনোজবেষসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব
স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে॥ (১০।৭১।৭)

"চক্ষুষ্মান্ কর্ণবান্ সমজ্ঞানিগণ মনদ্বারা গন্তব্য বিষয় সকলে অতুলনীয় হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হ্রদে মুখ পর্য্যন্ত নিমজ্জমান হন, কেহ কেহ কক্ষ পর্য্যন্ত নিমজ্জমান হন, কেহ কেহ সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়া স্নান করেন দেখা যায় (অর্থাৎ, কেহ কেহ মধ্যমজ্ঞানী, কেহ কেহ স্বল্পজ্ঞানী, কেহ কেহ মহাজ্ঞানী হন)।"

দেখা যাইতেছে যে, ঋষি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম অজ্ঞানী ও দ্বিতীয় জ্ঞানী। যাহারা অজ্ঞানী তাহারা ষড়ঙ্গবেদ সহস্র অধ্যয়ন, শ্রবণ ও আলোচনা করিলেও তাহাদের পরি-শ্রম নিষ্ফল হয় এমন কি তাহারা যে সকল সোমযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে তদ্দ্বারা পুণ্য-লোক লাভ করে না। যাহারা যথার্থ জ্ঞান দ্বারা দেবগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারে ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের সহবাসে চিত্ত মার্জ্জিত করিতে না পারে তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয়। পক্ষান্তরে যাহারা যথার্থ জ্ঞানসহকারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা উহা দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হয়। সূক্তান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

অবনো বৃজিনা শিশীহ্যৃচা বনেমানৃচঃ।
নাব্রহ্মা যজ্ঞ ঋধগ্‌জোষতি ত্বে॥
ঊর্ধ্বা যত্তে ত্রেতিনী ভূদ্যজ্ঞস্য ধূর্ষু সদ্মন্।
সজূর্নাবং স্বযশসং সচায়োঃ॥
১৭-১০৫-৮, ৯

"হে ইন্দ্র, আমাদিগের বর্জনীয় (পাপ) সকল বিনাশ কর। আমরা ঋক্ দ্বারা, অর্থাৎ স্তুতি দ্বারা, অঋক্‌দিগকে, অর্থাৎ অস্তুতিক-দিগকে, হিংসা করিব। অব্রহ্মা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিরহিত বা উৎকৃষ্ট স্তুতিবিরহিত, ঋধক্, অর্থাৎ সস্তুতিক যজ্ঞ হইতে পৃথক্, যজ্ঞ তোমাকে প্রীত করে না।

হে ইন্দ্র, কর্ম্মিদিগের মধ্যে যজ্ঞগৃহে যখন তোমার ত্রেতিনী, অর্থাৎ অগ্নিত্রয়বিশিষ্ট

ক্রিয়া, উর্দ্ধে উঠে তখন তুমি প্রীত হইয়া আয়ুর, অর্থাৎ যজমান মনুষ্যের, সহিত তরণীতে আরোহণ কর।"

অশ্বক্, অব্রহ্মা, ঋধক্ এই সকল শব্দ দ্বারা দেবতাজ্ঞান বিবর্জ্জিত কেবলকর্ম্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ অজ্ঞ পরমার্থ-জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা উৎকৃষ্ট লোক লাভ করে না, ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাহাদিগকে স্বরথে আরোহণ করাইয়া লইয়া যান না। পক্ষান্তরে যাহারা সধ্বক্, অর্থাৎ দেবতাজ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে তিনি প্রীত হইয়া সুগতি প্রদান করেন।

যজ্ঞের দ্বারা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে হইলে যে, সাধককে পার্থিবসম্বন্ধ ছেদন করিয়া দেবলোকে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত অতীন্দ্রিয় বস্তুর উপলব্ধি করিতে হয়, বহির্জগৎ ত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা বৈদিক ঋষি বশিষ্ঠ ভরদ্বাজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। যথা,—

প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নামানুষ্টুভস্য
হবিষো হবির্যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণো রথান্তরমা
জভারা বশিষ্ঠঃ॥ ১

অবিংদন্তে অতিহিতং যদাসীদ্যজ্ঞস্য
ধাম পরমং গুহা যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোর্ভরদ্বাজো
বৃহদাচক্রে অগ্নেঃ॥ ২

তেঽবিংদন্মনসা দীধ্যানা যজুঃ স্কন্নং
প্রথমং দেবযানং।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোরা সূর্যাদভরন্
ঘর্মমেতে॥ ৩॥ ১০।১৮১

"প্রথ নামক (পুত্র) যাহার ও সপ্রথ নামক (পুত্র) যাহার তাহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ অনুষ্টুপ্ ছন্দযুক্ত হবির, অর্থাৎ ঘর্মের, যে হবি তৎসম্পাদক রথন্তর (সামবিশেষ) ধাতা, দ্যোতমান সবিতা ও বিষ্ণুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১।

যাহা তিরোহিত ছিল, যজ্ঞের যে পরম ধাম, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ধারক, গুহায় নিহিত ছিল তাহা তাঁহারা (ধাতা প্রভৃতি) লাভ করিয়াছিলেন। ধাতা, দ্যোতমান সবিতা ও বিষ্ণুর নিকট হইতে ও অগ্নির নিকট হইতে ভরদ্বাজ সেই বৃহৎ (সামবিশেষ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ২।

তাঁহারা দীপ্যমান হইয়া মন দ্বারা সেচনীয় প্রথম (অর্থাৎ মুখ্য), দেবযান (অর্থাৎ যদ্দ্বারা দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়), যজুঃ (অর্থাৎ যাগসাধন) ঘর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল (ঋত্বিক্) ধাতা, দ্যোতমান সবিতা ও বিষ্ণুর নিকট হইতে ও সূর্য্যের নিকট হইতে সেই ঘর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছেন। ৩।"

বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি জ্ঞানী বৈদিক ঋষিগণ ধাতা, সবিতা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের নিকট হইতে রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি সাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল সাম যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করা যায়, দেবযান পথের অধিকারী হওয়া যায়। ইহাদের তত্ত্ব অতি গূঢ়, সাধারণের নিকট এই তত্ত্ব অজ্ঞেয়, তিরোহিত, লুক্কায়িত। দেবগণের নিকটেই এই তত্ত্ব ব্যক্ত হয়, এবং যে সকল মহাপুরুষ দেবগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত

হন। দেবগণ দীপ্যমান হইয়া মন দ্বারা এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে প্রকারে বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিলে দেবলোকের অধিকারী হওয়া যায় তাহা জানিয়াছিলেন ; অর্থাৎ, তাঁহারা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত মনের দ্বারা সাধনা করিয়া, রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি সাম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নৃচক্ষসো অনিমিষংতো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো
অমৃতত্বমানশুঃ।
জ্যোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো
বর্ষ্মাণং বসতে স্বস্তয়ে॥ ১০।৬৩।৪

"মনুষ্যদিগের দ্রষ্টা, নির্নিমেষ অর্থাৎ সর্ব্বদা জাগরুক, দেবগণ যোগ্যতা দ্বারা মহৎ অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। দীপ্যমান রথযুক্ত, অহন্তব্যপ্রজ্ঞ, পাপরহিত দেবগণ দ্যুলোকের উর্দ্ধস্থানে লোকহিতার্থ বাস করেন।"

রথন্তর সাম ঋগ্বেদের ৭ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ২২ ও ২৩ ঋক্ ও বৃহৎ সাম উহার ৬ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তের ১ ও ২ ঋক্। রথন্তর সাম অগ্নিষ্টোম যাগের স্তোত্র ও বৃহৎ সাম জ্যোতিষ্টোম যাগের স্তোত্র। ঋগ্বেদের গেয় অংশ সামবেদ। উক্ত ১০।১৮১ সূক্তে সামকে ঋকের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ছান্দগ্যোপনিষদে যে উক্ত হইয়াছে, "বাচ ঋগ্‌রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ" (ছা-উ ১।১।২) (বাক্যের সার ঋক্ বেদ, ঋকের সার সামবেদ, সামবেদের সার উদ্‌গীথ অর্থাৎ ওঙ্কার) তাহা সম্পূর্ণ বেদের অনুগামী। সে যাহা হউক রথন্তর ও বৃহৎ সামে কর্ম্মীর ঈশ্বরজ্ঞান ও সর্ব্বকর্ম্মে ঈশ্বরে নির্ভরতা স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। রথন্তর সাম—

"অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিংদ্র তস্থুষঃ
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো
ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ংতো মঘবন্নিংদ্র বাজিনো গব্যংতস্ত্বা
হবামহে॥" (৭।৩২।২২,২৩)

"হে শূর ইন্দ্র, এই জঙ্গমের ঈশ্বর ও স্থাবরের ঈশ্বর সর্ব্বদৃক্ তোমাকে আমরা অদুগ্ধা ধেনুর ন্যায় নিরন্তর ইচ্ছা করিতেছি (অর্থাৎ অদুগ্ধা ধেনু যেমন দুগ্ধদানার্থ বৎসকে ইচ্ছা করে আমরা তেমনি হবির্দানার্থ তোমাকে ইচ্ছা করিতেছি)।

দ্যুলোকে বা পৃথিবীতে তোমার ন্যায় কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না। অশ্ব-ইচ্ছাকারী, হবি-ইচ্ছাকারী ও গাভী ইচ্ছাকারী তোমাকে আমরা আহ্বান করিতেছি।"

বৃহৎ সাম—

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিংদ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং
কাষ্ঠাস্বর্বতঃ॥
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো
অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিংদ্র সং কির সত্রা বাজং
ন জিগ্যুষে॥
(৬।৪৬।১,২)

"হে ইন্দ্র, স্তোতা আমরা অন্ন দিবার জন্য তোমাকেই আহ্বান করিতেছি। লোকে সৎব্যক্তির পালক তোমাকে বৃত্রগণ, অর্থাৎ আবরক শত্রুগণ, দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আহ্বান

করে, তোমাকে অশ্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধকাম হইয়াও আহ্বান করে।

হে সুন্দর, বজ্রবাহু, বজ্রবন্ ইন্দ্র, শক্রধর্ষক মহান্ তুমি আমাদিগের দ্বারা স্তুত হইয়া গাভি, অশ্ব সম্যক্ প্রদান কর যেমন জয়ী পুরুষকে বহু অন্ন প্রদান করিয়া থাক।"

এই দুই সামে ঋষির দেবতাজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়াছে, স্থাবর জঙ্গম নিখিল জগতের ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সূচিত হইয়াছে। বৎসকামী গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া ঋষি ঈশ্বরকে হবিঃসম্প্রদান করিতে ব্যগ্র। ঈশ্বরের মহিমা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। হবিঃ অশ্ব, গাভী প্রভৃতি সমস্ত কাম্য পদার্থই যে তাঁহার তাহারই ধারণা হইয়াছে। অনন্য-নির্ভর হইয়া ঋষি তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছেন, প্রার্থয়িতব্য পদার্থ তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

এইরূপ দেবতাজ্ঞানের সহিত যজ্ঞ করিলেই দেবযান পথের অধিকারী হওয়া যায়—এই কথাই পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০৷১৮১ সূক্তে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞান ও অজ্ঞান ভেদে বৈদিক কর্ম্মের ভিন্ন ফল হয়, জ্ঞানীর দ্বারা নিষ্পন্ন যাগাদি শ্রেষ্ঠলোকপ্রাপ্তির হেতু হয় ও অজ্ঞানীর দ্বারা নিষ্পন্ন যাগাদি নিকৃষ্ট-লোক-প্রাপ্তির হেতু হয়, বেদের এই সিদ্ধান্ত ও উপদেশ উপনিষদাদি শাস্ত্রে গৃহীত ও বিশদী-কৃত হইয়াছে। যথা, মুণ্ডকোপনিষৎ-

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং
লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে,
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি
যত্রামৃতং স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥

মুণ্ডক ১৷২৷১০, ১১।

"অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্ট (অর্থাৎ যাগাদি শ্রৌত কর্ম্ম) ও পূর্ত্ত (অর্থাৎ বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্ত্ত কর্ম্ম) কর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে না। তাহারা কর্ম্মলব্ধ ভোগায়তন স্বর্গপৃষ্ঠে ভোগসম্পন্ন করিয়া পুনরায় এই লোক অথবা এতদপেক্ষাও নিকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে।

পক্ষান্তরে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিয়া যে সকলে শান্ত (অর্থাৎ, জিতেন্দ্রিয়) ব্যক্তি (বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমী) ও বিদ্বান্ (অর্থাৎ, জ্ঞানসম্পন্ন) যে সকল ব্যক্তি (গৃহস্থ) তপঃ (অর্থাৎ স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্ম) ও শ্রদ্ধার (অর্থাৎ, হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যার) সেবা করেন, তাঁহারা বিরজস্ক (অর্থাৎ, পাপ-পুণ্যরহিত) হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া (অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণ পথে) যেখানে সেই অব্যয়াত্মা (অর্থাৎ, অব্যয় স্বভাব) অমৃত পুরুষ (অর্থাৎ, প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ) বাস করেন সেখানে গমন করেন।"

এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই বলিয়াছি যে, অবিদ্যাবশেই জীব বিশ্বময় ভেদ দর্শন করে। পরন্তু জ্ঞানচক্ষু যে পরিমাণে উন্মীলিত হইতে থাকে ভেদজ্ঞানও সেই পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যায়। জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ অনুসারে জীব উত্তরোত্তর অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে থাকে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০৷৭১৷৭ ঋকে

জ্ঞানের এই ক্রমিক বিকাশের কথা বলা হইয়াছে। মাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীব যে জ্ঞান লাভ করে তাহা বস্তুতঃ অজ্ঞান, জ্ঞান-পদবাচ্য নহে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহাদের দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাহা সত্যের জ্ঞান নহে, মিথ্যার জ্ঞান—জগতের চৈতন্যাংশের জ্ঞান নহে, জড়াংশের জ্ঞান—সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান নহে, স্থূল বিকৃতির জ্ঞান—আত্মার জ্ঞান নহে, অনাত্মার জ্ঞান—মৌলিক পদার্থের জ্ঞান নহে, তাহার উপাধি নামরূপের জ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা জীব সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না। ইহা দ্বারা সংসারে উন্নত হইতে পারে, কিন্তু ইহা জীবকে সংসারের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না; কারণ, এ জ্ঞান যে সংসারেরই জ্ঞান, সংসারবহির্ভূত বিষয়ের সহিত ইহার যে পরিচয় নাই, প্রপঞ্চ ভিন্ন ইহা যে কিছু জানে না। এই মিথ্যাজ্ঞান সহকারে মনুষ্য যে সকল সৎকর্ম্ম করে তদ্দ্বারা তাহার ঊর্দ্ধগতি হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০। ১০৫।৮ ঋকে ও মুণ্ডকোপনিষদের ১।২।১০ সূত্রে বৈদিক ও ঔপনিষদিক ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অন্নময় কোষের সাধককে পুনঃ পুনঃ স্থূলদেহ ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়। অতঃপর যথার্থ জ্ঞানের কথা, যে জ্ঞান উদিত হইতে থাকিলে জীবের চক্ষে জগতে মহা বিপ্লব ঘটিয়া যায়, ক্ষিত্যপ্-তেজোমরুদ্ব্যোম আর তাহার নিকটে ভোগ্য-বস্তুমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয় না, জড়ের পশ্চাতে চৈতন্য আসিয়া দাঁড়ায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়ে অতীন্দ্রিয়ের আবির্ভাব অনুভূত হয়, বিশ্বজননী প্রকৃতিদেবী ত্রিগুণের সূত্র দ্বারা যে বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়াছিলেন তাহা দূরে নিক্ষেপকরতঃ নগ্নবেশে সাধকের সমক্ষে আবির্ভূতা হন, সাধক প্রপঞ্চ ভুলিয়া প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধ-শুভ্র পরম পুরুষকে দর্শন করে। বিশ্বময় ভেদের মধ্যে সাধক তখন অভেদ দেখিতে থাকে। জ্ঞানের জ্যোতি যতই বিকশিত হইতে থাকে ততই সাধকের চক্ষে তমোময় জড় আর দৃষ্ট হয় না, সত্ত্বপ্রধান দেবগণের অস্তিত্ব ও স্বরূপের উপলব্ধি হইতে থাকে। বেদের উদ্দেশ্য এই সকল দেবতাকে জ্ঞান সহকারে পূজা করা, কর্ম্মকে অধোমুখী হইতে না দিয়া ঊর্দ্ধমুখী করা, জীবকে স্থূল জগতের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ক্রমমুক্তির পথে স্থাপন করা। বেদে দেবগণের যে সকল স্তুতি প্রভৃতি আছে দেবতাজ্ঞান প্রস্ফুটিত না হইলে তাহাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, সুতরাং বেদের বাক্যার্থ জানিয়া কর্ম্ম করিলেই যে জীবের সদগতি হয় তাহা নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত জ্ঞানসূক্তে বৈদিক ঋষি এ কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। পরন্তু দেবতাজ্ঞান সহকারে বেদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ম্ম করিলে সাধকের দেবলোক প্রাপ্তি হয়। এ কথাও ঋষি উক্ত জ্ঞানসূক্তে, ১০।১৮১ সূক্তে ও ১০।১৩৫।৭ ঋকে নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সাধকের হৃদয়ে দেবতাজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে আর তাঁহাকে মরজগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অমরত্বলাভ করিয়া তিনি দেবলোকে স্থান প্রাপ্ত হন। অন্নময় স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি প্রাণময় সূক্ষ্ম-দেহে বিরাজ করেন। জ্ঞানের আলোক সাধকের হৃদয় উদ্ভাসিত করিতে আরম্ভ করিলে সাধক প্রথমেই স্থূলবিষয়ের অসারত্ব

উপলব্ধি করিয়া তাহাতে বিগতস্পৃহ হয়েন, সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসানে তাঁহার স্থূলদেহের পতন হইলে তিনি আর স্থূলদেহ পরিগ্রহ করেন না। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০।৫৬ সূক্তের ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্য স্থূলবিষয়ে বীতরাগ হইলেই যে সাধক পূর্ণজ্ঞানী হইলেন তাহা নহে, স্থূলদেহের নাশ হইয়া সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করিলেই যে জীব পরমপদ লাভ করিল তাহাও নহে। বাহ্য স্থূলবিষয়ই অবিদ্যার একমাত্র সৃষ্টি নহে, যাহাতে জীবকে বন্ধন করে। স্থূলপ্রপঞ্চের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও জীব মন ও বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ থাকে। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহাকে মন ও বুদ্ধিক্ষেত্রে সাধনা করিতে হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই দুই ক্ষেত্রকে মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ বলে। উত্তরোত্তর জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে জীব বিজ্ঞানময় কোষের সাধনায় পক্ক হয়। অবিদ্যার যত নাশ হইতে থাকে, তত সে স্বর্গসুখে বীতস্পৃহ হয়, আত্মোপলব্ধি ততই তাহার বৃদ্ধি হইতে থাকে, হিরণ্যগর্ভের জ্ঞান ততই তাহার অন্তরে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, এক ঈশ্বর যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন এই উপলব্ধি তাহার অন্তরে জাগরিত হয়, অব্যাকৃত প্রকৃতির বিকারেই যে তাহার সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি সে তাহা যথার্থ অনুভব করে। বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা সম্পূর্ণ হইলে সে বিশ্বময় সূত্রাত্মা প্রজাপতি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই দেখে না, ভগবানের বিরাট মূর্ত্তিতে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, সে তাহার নিজের খণ্ড চৈতন্যকে ভগবানের পূর্ণ-চৈতন্যে মিলাইয়া দেয়, সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা সে যে স্বর্গভোগ করিতেছিল তাহাতে তাহার আন্তরিক বিরাগ জন্মে। এই বৈরাগ্যের ফলে তাহার আর সূক্ষ্ম শরীরের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সে তখন সূক্ষ্ম দেহ হইতে মুক্ত হইয়া কারণদেহ মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাপতিত্ব লাভ করে। সে তখন যথার্থ সোঽহং হইয়া যায়। ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া সে তখন বিশ্বভুবন শাসন, পালন, সৃজন ও ধারণ করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ১০।৫৬ সূক্তে বৈদিক সাধনার ক্রমোন্নতির যে নির্দ্দেশ আছে, এই ঈশ্বরত্ব লাভ সেই উন্নতির চরম সীমা। জ্ঞানসহকারে সাধনা করিলে বেদ জীবকে এই পরমপদে পৌঁছাইয়া দেয়।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা
অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত
ইমে সমাসতে॥ ১-১৬৪-৩৯

"ঋগাদি বেদের প্রতিপাদ্য অক্ষর পুরুষ পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত, যাঁহাতে বিশ্বদেবগণ বাস করেন। যে ইহা না জানে ঋগাদি বেদ তাহার কি করিবে? যাহারা ইহা জানে তাহারা স্বরূপে অবস্থান করে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

জীন ভ্যালজিন কবাটের গায়ে কাণ দিয়া শুনিতে লাগিল। নিস্তব্ধ সে কক্ষ।

তখন মার্জ্জারের সাবধানে ধীরে ধীরে, সে দ্বার ঠেলিল, দ্বার ঈষন্মুক্ত হইল।

সাহসে ভর করিয়া সে আবার ঠেলিল; কবাট আরও একটু সরিয়া গেল। কিন্তু প্রবেশপথে বিঘ্ন ছিল,—পার্শ্বেই একখানা চেয়ার; দ্বার আরও কতকটা উন্মুক্ত না করিলে চলে না।

এবার অপেক্ষাকৃত জোরে সে কবাট ঠেলিল। অকস্মাৎ মরিচাধরা কব্জা হইতে একটা তীব্র কর্কশ ধ্বনি উঠিল। শিহরিয়া সচকিতে জীন দুই পদ পিছাইয়া আসিল,—তাহার শিরোদেশ হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে ধ্বনি, মৃত্যুর পরপারে অন্তিম-বিচার-দিনের তূর্য্যধ্বনিবৎ স্পষ্ট নির্ঘোষে তাহার কর্ণে নিনাদিত হইয়া উঠিল।

আকস্মিক বিভীষিকায় তাহার প্রথমতঃ মনে হইল যেন সে কব্জা জীবন্ত হইয়া উঠিয়া লোলজিহ্ব সারমেয়ের ন্যায় সকলকে সতর্ক করিবার জন্য প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে!

তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত, অন্তরাত্মা কম্পিত হইয়া উঠিল; কপালের শিরা যেন হাতুড়ির মত ঘা দিতে লাগিল; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন গুহাভ্যন্তর্গত ঝটিকার ন্যায় বহিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন সে শব্দ ভূমিকম্পের ন্যায় সমগ্র বাড়ীখানাকে টলাইয়া দিয়াছে;—কবাটখানা চীৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া দিয়াছে;—ওই বুঝি বৃদ্ধ ওঠে!—এখনি ত প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিবে,—কয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত সহর জাগিয়া উঠিবে, পুলিশ হাতকড়ি লইয়া আসিবে!—আর বুঝি তাহার উদ্ধার নাই!

নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় জীন দাঁড়াইয়া রহিল। এক দুই—তিন,—কয় মুহূর্ত্ত গভীর উৎকণ্ঠায় কাটিয়া গেল। তখন কক্ষের মধ্যে সে একবার উকি দিয়া দেখিল,—কই কিছুই ত নড়ে না! কতক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল,—কই কোন শব্দই ত নাই! তাহা হইলে কেহ উঠে নাই? জীন নিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রথম ধাক্কা ত কাটিল, কিন্তু তাহার মনের চাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপে গেল না। তত্রাচ সে ফিরিল না। যত শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হয় তাহাই তাহার লক্ষ্য। স্থির পদে সে কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

কক্ষের মধ্যে যেন গভীর শান্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইতস্ততঃ রক্ষিত কাগজপত্র ও পুস্তকাদি অতিক্রম করিয়া অতি সন্তর্পণে সে অগ্রসর হইল। কক্ষের অপর প্রান্ত

হইতে মিরিয়েলের ধীর সম নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আসিতেছিল।

সহসা জীন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে কি, সে যে একেবারে মিরিয়েলের শয্যার উপর আসিয়া পড়িয়াছে!

মানুষের অনুষ্ঠিত প্রায় কার্য্যের উপর প্রকৃতিদেবী সময়ে সময়ে এমন সহজ-সুন্দর-ভাবে আপনার ছায়াপাত করেন যে, মানুষ সেসব সময়ে আপন কার্য্যের পর্য্যালোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না, কিছুতেই সে তাহাকার স্পর্শ অতিক্রম করিতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে যে মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন স্বেচ্ছায় তাহা এখন সরিয়া গেল,—উন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া চন্দ্ররশ্মি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত ধর্ম্মযাজকের মুখমণ্ডল সহসা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। মিরিয়েল প্রশান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন; —নিদ্রালস শির উপাধানে ন্যস্ত, ধর্ম্মযাজকীয় অঙ্গুরীয়যুক্ত দক্ষিণ হস্তখানি শয্যাতলে লুষ্ঠিত, তৃপ্তি, আশা এবং আনন্দে সে আনন প্রদীপ্ত; মুখের সে অমিয় হাসি যেন কোন্ প্রতিফলিত দিব্যালোকসম্পাত; ললাটে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। সাধুর আত্মা যেন অমরের ঐশ্বর্য্য-মহিমার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ছিল। সে অমরতা, সে স্বর্গ তাঁহার আপন অন্তরেই ছিল; অন্তরের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়াই তাহার স্বরূপ সে আননে ফুটিয়া উঠিত।

নির্ব্বাক নিশ্চল সন্ত্রস্ত জীন লৌহ-শিক হস্তে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। সেই চন্দ্রালোকে সুষুপ্ত ধরণী, তন্দ্রাতুর প্রকৃতি, নির্জ্জনপ্রায় গৃহ, নিশীথ রাত্রি, স্তব্ধ সে মুহূর্ত্ত,—সবই যেন কি এক গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যে বৃদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া জাগিতেছিল।—সেই নিদ্রাবদ্ধ চক্ষুদ্বয়, শ্বেত অলকগুচ্ছ, বিশ্বাসনির্ভরতাপূর্ণ আনন, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দেহে নিদ্রিত শিশুচ্ছবি—সে যেন কি এক অপূর্ব্ব দৈবী লীলা! এমনটি ত জীন ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও দেখে নাই! তাহার ন্যায় পিশাচের এত নিকটে, এমন অরক্ষিত ভাবে অথচ পূর্ণ বিশ্বাসে নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন মধুর সে মূর্ত্তি তাহার অন্তরতম অন্তরের এমন একটা স্থান স্পর্শ করিল যে, তুলনার সমালোচনায় সে না শিহরিয়া থাকিতে পারিল না। এক দিকে সুষুপ্তিমগ্ন আত্মস্থ সাধু, অপর দিকে পাপানুষ্ঠানী জীবের অন্তরের তীব্র চাঞ্চল্য;—নৈতিক জগতে ইহা অপেক্ষা দর্শনীয় মহত্তর কিছু আছে বলিয়া ত আমি জানি না।

জগতে এমন কোন দার্শনিক নাই যিনি জীনের সে সময়ের অন্তর-ভাবের যথার্থ বিশ্লেষণ করিতে পারেন। অতি প্রচণ্ড ভাবের সহিত শান্ততম মাধুর্য্যরসের মিশ্রণ যদি অনুভব করিতে পার, তবেই তাহার আভাষ কতকটা পাইতে পার। জীনের সে মুখভাব একটা স্তব্ধ বিস্ময়ের ছবি, তাহাতে কোন একটা ভাবের নিশ্চয়তা ছিল না। সে দেখিতে লাগিল,—মন্ত্রমুগ্ধবৎ মিরিয়েলের সে অপূর্ব্ব ছবির প্রতি চাহিয়া রহিল,—এই পর্য্যন্ত! কি সে ভাবিতেছিল,—কে বলিবে? তাহার মুখভাবে কিসের চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইতেছিল,—কে জানিবে?

বৃদ্ধের মুখ হইতে সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। ত্রিশঙ্কুর মত, স্বর্গের ও রসা-

ভূলের—পুণ্যের ও পাপের—সন্ধিস্থলে সে হতবুদ্ধি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিতে বা তাঁহার চরণে লুটাইতে,—দু'য়ের জন্য সমভাবেই বুঝি সে প্রস্তুত ছিল।

দেয়ালের গায়ে একটা পিত্তলক্রুশ অস্পষ্টনক্ষত্রালোকে দীপ্তি পাইতেছিল;—প্রসারিত দুই হস্তে যেন সে তাহাদের একের শিরে আশীর্ব্বাদ, এবং অপরের শিরে ক্ষমা বর্ষণ করিতেছিল!

সহসা জীন সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, শয্যা অতিক্রম করিয়া, একেবারে আলমারির কাছে গিয়া পড়িল; লৌহশিকলের প্রয়োজন হইল না, চাবিটা আলমারির গায়েই ছিল;—চকিতে বাসনের ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া, লাঠিটা তুলিয়া লইয়া, জানালা খুলিয়া একেবারে বাগানের উপর আসিয়া পড়িল; তার পর বাসনগুলা থলিতে পুরিয়া, ঝুড়িটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রাস্তায় পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিয়া পলাইল।

(১২)

পরদিন প্রত্যূষে মিরিয়েল বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধা ম্যাগলোয়ার আসিয়া সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কর্ত্তা মশায়, রূপোর বাসনের ঝুড়িটা কোথায় জানেন?"

"জানি।"

"কি জ্বালা, আমিও জানি; শুধু জানার কথা বল্‌ছিনে; বল্‌ছিলাম কি, ঝুড়টা যে—"

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটা ফুলগাছের নীচে মিরিয়েল ঝুড়িটা দেখিয়াছিলেন। সেটাকে কুড়াইয়া আনিয়া ম্যাগলোয়ারের হাতে দিয়া বলিলেন—"এই যে তোমার ঝুড়ি।"

"ও দেখেছি আমি। ঝুড়ি ত খালি বাসন কই?"

"ওঃ, তাই বল। বাসনের খোঁজ করছ? বাসন কোথায় আছে তা ত বাছা আমি জানি নে।"

"সর্ব্বনাশ! তবে ত যা ভাবছিলাম তাই। সেই মিন্সেটাই—" বলিয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অতিথির ঘরটা দেখিতে সে ছুটিয়া গেল; মিরিয়েল করুণার্দ্র চক্ষে লতিকাটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন—ঝুড়ির চাপে সেটা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

"কই সে ত নেই কর্ত্তামশাই!—" ম্যাগলোয়ার চীৎকার করিয়া উঠিল।—"সে-ই তবে নিশ্চয় চুরি করে পালিয়েছে।"

অকস্মাৎ পাচার-গাত্রে তাহার দৃষ্টি পড়িল।—"ওই দেখুন, কর্ত্তামশায়!—বালি চূণ খসে পড়েছে, ওইখান দিয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়েছে। ওমা কি সর্ব্বনেশে মিন্সে গো!—ডাকাত!—ডাকাত!—"

মিরিয়েল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তামগ্ন থাকিয়া, আপন গভীর দৃষ্টি ম্যাগলোয়ারের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন—

"সে বাসনগুলো কি আমাদের বল্‌তে পার?"

ম্যাগলোয়ার উত্তর দিল না, শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"দেখ ম্যাগলোয়ার,—এতদিন আমি অন্যায় করে সে গুলো নিজের কাছে আটকে

রেখেছিলাম, দরিদ্রের জিনিস নিজে ভোগ করছিলাম। গরীবের জিনিষ গরীবে নিয়েছে—এ ত অন্যায় কিছু হয় নি।"

"কর্ত্তা, আমার বা মাঠাকরুণের জন্য বলছি নে। আপনি আজ থেকে কিসে খাবেন?"

মিরিয়েল যেন বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "কেন ঘরে কি টিনের থালা নাই?"

"টিনের থালা? মা গো, গন্ধ কর্‌বে যে!—"

"তবে লোহার থালা?"

"তাতে খাবার যে কষে যাবে?"

"ভাল কাঠের রেকাবি ত আছে?"

প্রাতরাশের সময় ব্যাপ্তিস্তাইন এ বিষয়ে ভ্রাতাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। কাষ্ঠপাত্রে আহার করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে মিরিয়েল বলিলেন—"এক টুকরা রুটি আর এক বাটি দুধ, এই তো? এর জন্য আবার কাঁটা চামচের কি দরকার?"

ম্যাগলোয়ার কিন্তু গজরাইতেছিল-"ওমা কি সর্ব্বনেশে মিন্সে গো! এখনো ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে" ইত্যাদি।

প্রাতরাশ শেষ হয় হয়—এমন সময় বহির্দ্দেশে করাঘাত পড়িল।

"কে মশায়? আসুন।"

দরজা খুলিতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহাদের চক্ষে পড়িল। তিন জন লোকে আর একটী লোকের গলা ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে; সে তিন জন—পুলিশ কর্ম্মচারী; সে লোকটা—জীন ভ্যালজিন।

পুলিশ কর্ম্মচারী যথারীতি অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল—"প্রভু?"

"প্রভু"!

জীন নিরাশাভাবে এতক্ষণ অবসন্ন হইয়া ছিল, স্তম্ভিত হইয়া সে বলিল—

"প্রভু?—তবে ইনি কুরে নন, আরও বড়?"—

"চুপ' হারামজাদ, ইনি এখনাকার প্রধান ধর্ম্মযাজক তুই জানিস্ নে?"

মিরিয়েল ততক্ষণে কেদারা ছাড়িয়া যথাসম্ভব দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিলেন, জীনের দিকে চাহিয়াই বলিলেন—"এই যে আপনি ফিরে এসেছেন! আমি তাই ভাবছিলাম যে রূপার বাতিদান দু'টো আপনি ফেলে গেলেন কেন? সে দুটোও ত আপনাকে দিয়েছিলাম, তাদেরও দাম প্রায় ২০০ দু'শ' ফ্রাঙ্ক হবে যে!"

বিস্ফারিত নেত্রে জীন মিরিয়েলের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার মুখভাবের বর্ণনা করি আমার সে সাধ্য নাই, মানুষের ভাষা এখানে মূক।

"প্রভু! তা হলে লোকটা যা বলছিল তা সত্য? লোকটা চোরের মত পালাচ্ছিল দেখে সন্দেহ হওয়ায় তাকে ধরে দেখি তার থলির মধ্যে এই সব রূপার জিনিষ।"

মিরিয়েল স্মিতহাস্যে বলিলেন—"আর উনি বল্‌লেন যে এক বুড়ো ধর্ম্মযাজক যার কাছে রাত্রিটা উনি ছিলেন, সেই ওঁকে এ সব দিয়েছে? তাই ধরে এনেছ? না, না, ধরে আন্‌বার মত ত উনি কিছু করেন নি। আমি নিজে হ'তেই ওগুলো ওঁকে দিয়েছি।"

"তা হলে একে ছেড়ে দিতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

প্রহরী জীনের শৃঙ্খল মোচন করিল।

ক্ষীণ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে জীন বলিল—"সত্যই আমি ছাড়া পেলাম ?"

প্রহরী। হাঁ, ছাড়া পেয়েছ। এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

"দাঁড়াও ভাই। বাতিদান দু'টো এনে দিই" বলিয়া বৃদ্ধ আলমারী হইতে রূপার বাতিদান দুইটি আনিয়া জীনের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্যাপ্তিস্তাইন ও ম্যাগলোয়ার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে সে অভিনয় দেখিতে লাগিল।

জীনের আপাদমস্তক কম্পিত হইতেছিল। কলের পুতুলের স্থায় সে বাতিদান দুইটি গ্রহণ করিল।

"তবে এস ভাই। একটা কথা বলে রাখি, এবার থেকে যখন আসবে বাগানের পথে এসো না; সদর দরজা দিয়ে ত যখন ইচ্ছে তুমি যাতায়াত করতে পার? শুধু একটা ছিটকিনি তাতে লাগানো থাকে, তালা তো আমি কখনো দিই না।" তার পর পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রতি চাহিয়া মিরিয়েল্ বলিলেন—"তা হলে আপনারা এখন যেতে পারেন।"

পুলিশের দল কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

জীনের সর্ব্বশরীর তখন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। মিরিয়েল ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া ধীর শান্তস্বরে বলিলেন—"এই টাকায় উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে তুমি যে সাধু হবে বলে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ, দেখো ভাই সে কথা জীবনে কোন দিন ভুলো না।"

জীন কি সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল? কই তাহার তো কিছু মনে পড়ে না! মিরিয়েল কিন্তু কথাগুলির উপর যেন একটু জোর দিয়াই বলিলেন; আরও বলিলেন—"ভাই, আজ থেকে তুমি আর পাপী নও। আজ যে আমি তোমার আত্মাকে কিনে নিয়েছি; যা কিছু তোমার পাপচিন্তা যা কিছু তোমার কলঙ্ক সে-সব থেকে তোমাকে মুক্ত করে আজ যে আমি ভগবানের চরণে তোমার আত্মাকে নিবেদন করলাম, ভাই!"

(১৩)

অলিগলি খিড়কী সড়ক যা সম্মুখে পড়িল, তাহারই মধ্য দিয়া জীন পলাইতে লাগিল। সহর হইতে বাহির হইয়া সারা সকালবেলা সে এইরূপে ঘুরিল। অনাহারে থাকলেও তাহার ক্ষুধা বোধ ছিল না। শত শত অননুভূত-পূর্ব্ব চিন্তায় তাহার চিত্ত ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। অন্তরে তার কোন্ সুরের—কোমলতার না দৈন্যের—কিসের ঝঙ্কার উঠিতেছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। ক্ষণিকে যেন কাহার উপর একটা ক্রোধ, ক্ষণিকে আবার চিত্তের দ্রবীভূত ভাব; একদিকে, সুদীর্ঘ বিংশবর্ষব্যাপী চিত্তের কঠোরতা,—অপর দিকে কোন্ মায়াস্পর্শে চিত্তের এ নব আর্দ্রতা, এত বর্ষের সাধনার ফলে চিত্তের যে ভীষণ স্তব্ধতা সে লাভ করিয়াছিল—আজ কোন্ প্রলয় ঝটিকায় তাহা বুঝি লুপ্ত হইয়া যায়! এ কি অস্থিরতা, এ কি অশান্তি! কারাবাস যে ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। কোন্ গ্রহে তাহার এ দুর্দ্দশা ঘটাইল?—অস্থিরচিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে জীন তাহাই

ভাবিতে লাগিল। বন্যকণ্টকগুল্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বহুযুগবিস্মৃত অতীত বাল্যের কথা তাহার মনে জাগিতে লাগিল। হায়, কোথায় সে দিন!

সমস্ত দিন এইরূপে কাটিল। অপরাহ্ণে, তরু লতা এবং উপলখণ্ডের ছায়া ক্রমবর্দ্ধিত করিতে করিতে যখন সূর্য্য অস্তাচলগত হইতেছিলেন, তখন অবসন্ন জীন, নির্জ্জন প্রান্তরে, এক ঝোপের অন্তরালে বসিয়া ছিল। যতদূর দৃষ্টি চলে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না; ঝোপের অপর পার্শ্ব দিয়া একটা পথ সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে মাত্র। বহুদূরে গাঢ় নীল আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের তরঙ্গায়িত অনন্ত বিস্তার।

সহসা, দূর হইতে একটা আনন্দকলধ্বনি তাহার কর্ণে আসিয়া পশিল। মুখ ফিরাইয়া জীন দেখিল, আনুমানিক দ্বাদশবর্ষীয় এক বালক, পৃষ্ঠে একটা খেলনার বাক্স বাঁধিয়া গান গাহিতে গাহিতে পার্শ্বের পথ দিয়া তাহারই দিকে আসিতেছে, আনন্দে তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কয়টি রৌপ্য মুদ্রা লইয়া লোফালুফি করিতে করিতে সে আসিতেছিল। ঝোপের পার্শ্বে আসিয়া দৈবক্রমে সেবার তাহার হাত হইতে সমস্ত মুদ্রাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া গেল;—তাহার মধ্যে ৪০ ফ্র্যাঙ্কের একটি বড় মুদ্রা ছিল;—সেটা গড়াইতে গড়াইতে জীনের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল; অমনি জীন সেটাকে জুতা দিয়া চাপিয়া ধরিল। বালক কিন্তু সেই মুদ্রাটির উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল, সুতরাং সেটা তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

সেই নির্জ্জন স্থানে, সন্ধ্যার সময় সেরূপ বেশ এবং আকৃতির লোকের সম্মুখীন হইতে অনেকেই প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া থাকে; কিন্তু বালকের মনে কোন শঙ্কাই ছিল না। ক্ষিপ্রভাবে জীনের সম্মুখে আসিয়া সে বলিল—"মশাই, আমার টাকাটা?"—প্রবঞ্চনাবোধহীন অজ্ঞান শিশুর সরল প্রশ্ন!

জীন মুখ তুলিয়া চাহিল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগ তাহার মুখের উপর পতিত হইয়া সে আকৃতিকে ভীষণতর করিয়া তুলিল। তবু বালক ভীত হইল না; ধীর স্বরে বলিল—

"মশাই, আমার টাকাটা?"

"কে তুই?"

"আমি ছোকরা জারভিস্, মশাই।"

"দূর হ—"

"আমার টাকাটা দিন।"

জীন উত্তর দিল না, মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমার টাকাটা দিন্।"

জীন নিরুত্তর, ভূমিসংলগ্নদৃষ্টি।

"দিন্ না মশাই টাকাটা। বাঃ রে, বেশ মজার লোক ত!—"

তথাপি জীন নিরুত্তর।

জারভিস্ তখন অধৈর্য্য হইয়া জীনের জামার কলারটা ধরিয়া খুব একটা ঝাঁকুনি দিল। তবুও জীন নির্ব্বাক্।

তখন সে প্রাণপণ শক্তিতে দুই হাত দিয়া জীনের পা'টা সরাইতে চেষ্টা করিল। হায়, বৃথা চেষ্টা, গাঁথুনির মত পৃথিবীর সহিত যেন তাঁহা আঁটিয়া গিয়াছে!—বালক কাঁদিয়া ফেলিল।

অবশেষে জীন, মাথা তুলিয়া, শূন্য দৃষ্টিতে একবার সম্মুখের দিকে চাহিল; বালকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে, সে যেন বিস্মিত হইয়া উঠিল; তার পর যষ্টির দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—

"কে তুই? কি চাস্?"

"আমি জারভিস্, মশাই। আমার টাকাটা কেন পা দিয়ে চেপে রেখেছেন, মশাই? দিন্ না,—আমি চলে যাই।"

কিছুতেই যখন জীন সে মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিল না, তখন বালক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল—"টাকাটা দেবেন কি না, শুনি?—সরান্ বল্‌ছি এখনো পা'—"

"এখনো রয়েছিস ছোঁড়া এখানে?"—বলিয়া জীন মুহূর্ত্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া উঠিল,—রৌপ্যমুদ্রাটা তখনো তার বুটের নীচে। গর্জ্জন করিয়া বলিল—"বেরো হতভাগা, দূর হ,—নইলে মর্‌বি বল্‌ছি।"

ভয়ে বালকের মুখ শুকাইয়া গেল; তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল; কয়েক মুহূর্ত্ত চলৎশক্তিরহিত হইয়া স্তব্ধভাবে সে দণ্ডায়মান রহিল; তার পর, পশ্চাতে আর না চাহিয়াই, ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিল।

কিছুদূর গিয়া সে একবার থামিল, তার পর আবার ছুটিতে লাগিল।

চিন্তামগ্ন জীনের কর্ণে একবার যেন তাহার ক্রন্দনধ্বনি আসিয়া পশিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; চারিদিকে অন্ধকার ক্রমশ জমাট হইয়া উঠিতেছে।

কখন্ বালক চলিয়া গিয়াছে,—তবু এখনো জীন সেই একই ভাবে দাঁড়াইয়া! তাহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সমতা নাই; সমস্ত দিন সে উপবাসী; শরীর ক্লান্ত, অসুস্থ। অনতিদূরে ঘাসের উপর একটা কাঁচের খেলানা পড়িয়াছিল,—তাহারই প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সহসা তাহার প্রবল শীতানুভূতি হইতে লাগিল; টুপিটা মাথার উপর টানিয়া দিয়া, আনমনে জামার বোতামগুলা আঁটিয়া, ঈষৎ অগ্রসর হইয়া, অবনতভাবে লাঠিটা সে তুলিয়া লইল।

অকস্মাৎ সেই রৌপ্যমুদ্রার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল।—বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় তাহার সর্ব্ব দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল।—সভয়ে সে কয়েক পদ পিছাইয়া আসিল। কালনাগের চক্ষুর ন্যায়, অন্ধকারে সে রজতমুদ্রা যেন জ্বলিতেছিল। মন্ত্রাবিষ্ট মৃগের ন্যায় অপহৃত-শক্তি জীন সে দিক হইতে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

সহসা ছুটিয়া গিয়া, সেটাকে তুলিয়া লইয়া, চারিদিকে সে চাহিতে লাগিল;—দিগন্তে দিক্‌চক্রবালে যদি কিছু তাহার দৃষ্টিতে পড়ে! আশ্রয়ভিক্ষু সন্ত্রস্ত মৃগের ন্যায় উদ্বেগাশঙ্কায় সে কাঁপিতে লাগিল।

নির্জ্জন প্রান্তর! দিগন্তের কোল হইতে ধীরে ধীরে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া সন্ধ্যাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে!

একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া, বালক যে পথে গিয়াছে সেই পথ ধরিয়া জীন দ্রুত চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই! চীৎকার করিয়া সে ডাকিল—

"জারভিস্!—ছোকরা জারভিস্!—"

কয়েক মুহূর্ত্ত সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

কেহ সে আহ্বানের প্রত্যুত্তর দিল না। চারি দিকে অন্ধকার,—দৃষ্টি চলে না; দিগন্তে, স্তব্ধতার মাঝে তাহার সে কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল!

প্রবল হিম বায়ু উত্তর দিক হইতে বহিতেছিল। নাতিদীর্ঘ কণ্টকগুল্ম যেন প্রচণ্ড রোষে কাহার উপর আস্ফালন করিতেছিল।

জীন পুনরায় অগ্রসর হইল; ক্রমে ক্রমে গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া অবশেষে ছুটিতে আরম্ভ করিল।—মাঝে মাঝে সে গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, তাহার সে ব্যাকুল বিহ্বল বিকৃত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল—

"জারভিস্!—ছোকরা জারভিস্!—

জারভিস তখন অনের দূরে। নিকটে থাকিলেও, সে আর কখনও তাহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না।

কতক্ষণ পরে অশ্বারূঢ় এক ধর্ম্মযাজকের সহিত জীনের সাক্ষাৎ হইল।

"মশাই, একটা ছেলেকে এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছেন?"

"কই, না।"

"তার নাম ছোকরা জারভিস্। তাকে দেখেছেন কি?

"কই, কাউকে ত এ পথ দিয়ে যেতে দেখিনি, বাপু।"

জীন, জেবের মধ্য হইতে পাচ ফ্রাঙ্কের দুইটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া ধর্ম্মযাজকের হাতে দিয়া বলিল—"গরীবদের দেবেন।" তারপর তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—

"তার নাম ছোকরা জারভিস্। বছর দশ বারো আন্দাজ তার বয়েস হবে। পিঠে তার খেলনার একটা বাক্স আছে, হয়ত সে তাই ফেরি করে বেড়ায়। এইদিক দিয়েই সে গেছে।

"হবে; আমার চোখে কিন্তু পড়ে নি।"

"ছোকরা জারভিস্ তার নাম। এই কাছেই বুঝি কোন্ গাঁয়ে সে থাকে! জানেন আপনি কোথায় সে থাকে?"

"কি করে বলব? তবে সে যদি হা ঘরেদের ছেলে হয় তা হলে তার সন্ধান পাওয়া মুস্কিল। তারা আজ এ গাঁয়ে কাল সে গাঁয়ে এমনি করে ঘুরে ঘুরে বেরায়।"

জীন আরও দুইটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—"এও গরীবদের দেবেন।" তারপর সহসা উন্মত্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—"ঠাকুর মশাই, আমায় ধরুন, আমায় বেঁধে নিয়ে চলুন।—আমি চোর, আমি ডাকাত—"

সন্ত্রস্ত ধর্ম্মযাজক, অশ্বপৃষ্ঠে সবেগে কশাঘাত করিয়া, নক্ষত্রগতি সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

জীন পুনরায় ছুটিতে লাগিল। পথিপার্শ্বে ঝোপগুলা মাঝে মাঝে মানুষের মত দেখাইতেছিল; সেগুলা আতিপাতি করিয়া দেখিয়া আবার উর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিয়া চলিল। শেষে, তিনটি পথের সংযোগস্থলে আসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল।—কোন্ পথে সে বালক গিয়াছে?

"জারভিস্!—ছোকরা জারভিস্!—" অন্ধকার সে শব্দকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল, তাহার প্রতিধ্বনি পর্য্যন্ত উঠিল না।

পুনরায় সে ডাকিল—"জারভিস্!"—এবার কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ।—সেই তাহার শেষ আহ্বান! সে তখন টলিতেছিল।—কি

যেন এক অদৃশ্য শক্তি তাহার সমস্ত পাপের বোঝা লইয়া একই আঘাতে তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল।—অবসন্নভাবে একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর পতিত হইয়া জানুতে মুখ লুকাইয়া তীব্রকণ্ঠে সে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল—"ওঃ, আমি এমনই পশু!"

অকস্মাৎ তাহার অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; অভাগা ক্রন্দন করিয়া উঠিল! তাহার শুষ্ক নয়ন হইতে, উনিশ বৎসর পরে, আজ সর্ব্বপ্রথম অশ্রুধারা ছুটিল।

কিসে জীনের এ পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহাই আমরা এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রাতঃকালের সে ঘটনার পর হইতে, চিত্তের চাঞ্চল্যে তাহার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল; কি যে ঘটিতেছে, কি যে ঘটিয়াছে—কিছুই যেন সে বুঝিতে পারিতেছিল না। মিরিয়েলের সেই গম্ভীর স্বর—"তুমি সাধু হবে ব'লে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছ। সব পাপ থেকে তোমায় মুক্ত ক'রে আজ আমি ভগবানের চরণে তোমার আত্মাকে নিবেদন করলাম"—সেই কথা, সেই কণ্ঠস্বর অনুক্ষণ তাহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছিল।

গর্ব্ব, আত্মাভিমানই, পাপীর আশ্রয়—পাপের দুর্গস্বরূপ। সেই দুর্গের মধ্যে থাকিয়া, সাধুর করুণার আক্রমণ হইতে সে আপনাকে দূরে রাখিতেছিল। সে দুর্গে এমন প্রচণ্ড আঘাত এ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই! সে বুঝিল,—যদি এ করুণার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তবেই তাহার চিত্তের কঠোরতা সম্পূর্ণ হইবে; যদি না পারে, তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া যে হিংস্র আনন্দে সে তিলে তিলে আপনার চারিদিকে পাষাণ-প্রাচীর তুলিয়াছে, তাহা চূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহাকে হয় জয়ী নয় বিজিত হইতে হইবে; তাহার পাপ এবং মিরিয়েলের পুণ্য—এ দু'য়ের সংগ্রামে এক পক্ষকে পরাজিত হইতেই হইবে; এ যুদ্ধে সন্ধির কোন কথা নাই।

মানুষের জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন কি এক রহস্যময় অর্দ্ধস্ফুট ঝঙ্কার, তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতে থাকে—তাহার অনুষ্ঠিতপ্রায় কার্য্যের বিষয়ে তাহাকে অনুনয় বা বাধা প্রদান করিতে চায়। সে ঝঙ্কার কি সে আজ শুনিয়াছিল? এমন কোন অশরীরী বাণী কি তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতেছিল যে, জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত আজ তাহার সম্মুখে উপস্থিত, এখন হইতে তাহাকে খুব সাধু হইতে হইবে, নয় ত পাপের চরম-সীমায় পৌঁছাইতে হইবে; যে, তাহার পক্ষে, আজ হইতে হয় মিরিয়েলের অপেক্ষাও উচ্চ আসন, নয় গ্যালির কয়েদীর অপেক্ষাও নিম্নগতি,—দু'য়ের মাঝামাঝি অন্য কোন স্থান নাই; যে, আজ হইতে, যদি সে ভাল হইতে চায় তবে দেবতা-স্বরূপ, যদি মন্দ হইতে চায়, তবে দানবের অপেক্ষাও ভীষণ হইবে?

দুর্দ্দিনে মানুষের বুদ্ধি উৎকর্ষ লাভ করে, লোকে বলিয়া থাকে বটে। তত্রাচ আমাদের বোধ হয়, সব কথা তেমন ভাল করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা জীন ভ্যালজিনের ছিল না। সবই আব্‌ছায়ার মত তাহার চিত্রপটে ভাসিতেছিল; কি যেন একটা যন্ত্রণাকর চিত্ত-বিক্ষিপ্ততায় সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। গ্যালির সে পৈশাচিক অন্ধকার হইতে সদ্যঃ নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাহিরে আসিতেই, প্রখর সূর্য্যকিরণে অন্ধকারাভ্যস্ত চক্ষুর ন্যায়,

মিরিয়েলের অপূর্ব্ব করুণায় তাহার অন্তঃস্থল আহত হইয়া উঠিল। পবিত্রোজ্জ্বল সম্ভাবিত ভবিষ্য-জীবনের যে ছবি তিনি তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন,—তাহার কথা ভাবিয়া সে চকিত কম্পিত হইয়া উঠিল। সে যে কোথায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সে ভালমত বুঝিতে পারিতেছিল না! অকস্মাদুদিত সূর্য্যকিরণে পেচকের ন্যায়, অভাগা আজ পুণ্যের কিরণ-সম্পাতে অন্ধপ্রায় হইয়াছিল। তবে একটা কথা সে বুঝিল; এই কয় ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃতির একটা মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে,—মিরিয়েলকে একেবারে দূরে রাখা আর তাহার সাধ্যায়ত্ত নয়।

মনের যখন এই অবস্থা, তখন ছোকরা জারভিসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে, এবং তাহার স্বর্ণমুদ্রাটি সে চুরি করে। কেন করে? তার উত্তর সে জানিত না। তবে আমরা বলিতে পারি, বোধ হয় সেটা তাহার সংস্কারের ফল, তাহার এত বর্ষব্যাপী অন্যায় চিন্তারূপ পাপের সর্ব্বশেষ চেষ্টা; নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখার শেষ দীপ্তি। বুঝি তাহাও নহে। সে চুরি সে করে নাই; মন যখন তাহার শত শত অজ্ঞাত চিন্তার মধ্যে পড়িয়া সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, তখন তাহার পশুভাবই, স্বভাব এবং সংস্কারের বশবর্ত্তিতায়, নির্ব্বোধের ন্যায় সে মুদ্রা পদদলিত করিয়া রাখিয়াছিল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার সে পাশবিক কার্য্য বুঝিতে পারিল তখনই সে ব্যথিত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার মন প্রকৃতিস্থ থাকিলে সে কার্য্য তাহার দ্বারা কখনই সম্ভবপর হইত না। এইটুকু যদি আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে জীন ভালজিনের এ পরিবর্ত্তন-চিত্র আমরা সবটাই বুঝিয়াছি।

যাহা হউক, এই শেষ ঘটনাই তাহার জীবন-সংগ্রামের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল; তাহার এতক্ষণের সমস্ত কুহেলিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, আলো এবং অন্ধকারকে দুইভাগে পৃথক করিয়া দিল। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় যেমন কোন দ্রবীভূত মিশ্রণে অংশবিশেষ পাত্রতলে, এবং অংশবিশেষ স্বচ্ছতারল্যে উপরাংশে পৃথকীকৃত হইয়া পড়ে,—তাহারও চিন্তার সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল। যখন সে "ওঃ, আমি এমনই পশু" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তখনই আপনার যথার্থ মূর্ত্তি তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। নিজেকে তখন তাহার একটা ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে,—অপহৃত বাসনাদি স্কন্ধে লইয়া যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান, রক্তমাংসদেহধারী, ভীষণ-কঠোর-মুখচ্ছবি গ্যালির কয়েদী জীনের মূর্ত্তিখানা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুর্দ্দশায় পড়িয়া জীন কতকটা কাল্পনিক হইয়া পড়িয়াছিল। কল্পনার চক্ষে তাই সে আপনার প্রতিমূর্ত্তিখানা দেখিতে দেখিতে এক একবার ভাবিতে লাগিল,—'কে এ'? পরক্ষণেই শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

ধীরে, অতি ধীরে, সে অন্ধকারের মধ্যে যেন একটি ক্ষীণ আলোক ফুটিয়া উঠিল। ধীরে, অতি ধীরে, সে আলোক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। জীন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল,—সে ত আলোক নয়, সে যে কোন্ দিব্যমূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি যে বিশপ মিরিয়েলের!

বিবেকের তুলাদণ্ডে সে দু'জনকে তৌল করিতে বসিল। মিরিয়েল ব্যতীত আর কেহ বুঝি তাহাকে এত অবনত করিতে পারিত না! তখন তন্ময়চিত্ত জীন দেখিতে লাগিল যেন মিরিয়েলের মূর্ত্তি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; আর তাহার নিজের মূর্ত্তিখানা ক্রমশঃ ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া পড়িতেছে; তাহার রক্তমাংসময় দেহটা যেন ছায়ামূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সে ছায়ামূর্ত্তিও যেন মিলাইয়া গেল; তাহার চক্ষের সম্মুখে শুধু একটি মূর্ত্তি—মিরিয়েলের মূর্ত্তিখানি স্থির নিষ্কম্প ভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। অভাগার জীবনখানিকে যেন তাহা নবীন মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিল!

* * *

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরিয়া অভাগা কাঁদিল; তাহার গণ্ডদেশ বহিয়া তপ্ত ধারাস্রোত ছুটিতে লাগিল। রমণী—চিত্ত দৌর্ব্বল্যে, শিশু, ভীতি ব্যাকুলতায়—যেভাবে ক্রন্দন করে তাহার অপেক্ষাও অধিক আবেগে সে কাঁদিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চিত্তের অন্ধকার কাটিতে লাগিল; সে আলোকমূর্ত্তি প্রখর তেজে, তীব্র উন্মাদনায় তাহার অন্তঃস্তলকে ওতপ্রোত ভাবে অধিকার করিয়া বসিল। তাহার অতীত জীবন, প্রথম পাপানুষ্ঠান, সুদীর্ঘ কারাবাস, তাহার ভীষণ বহিরাকৃতি, কঠোর অন্তঃপ্রকৃতি, প্রতিহিংসা-সুখ-সম্ভাবনা-মধুর কারামুক্তির কথা, মিরিয়েলের আবাসে ঘটনাপরম্পরা, তাঁহার তেমন ক্ষমার পরও জারভিসের মুদ্রাপহরণ, এ সমস্তই একে একে তাহার মনে জাগিতে লাগিল; কি এক অচিন্ত্য অননুভূতপূর্ব্বক ভাবে নিজের জীবনটাকে পূতিগন্ধময়, আত্মাকে ভয়াবহ বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। তবুও যেন সে জীবনে সে আত্মায় একটা প্রশান্ত আলোকের প্রতিবিম্ব পড়িতেছিল! যেন স্বর্গের আলোকে শয়তানের মূর্ত্তিখানা সে দেখিতেছিল।

কতক্ষণ সে কাঁদিল? তার পর সে কি করিল? কোথায় সে গেল? কেহ তাহা জানে না। এইমাত্র শুধু আমরা জানি যে, শেষরাত্রে যখন ডি-সহরের মধ্য দিয়া রাত্রের ডাকগাড়ীখানা যায় তখন শকট-চালক একজন লোককে, বিয়েভুঁ মিরিয়েলের বাটীর বহির্দ্বারে সাষ্টাঙ্গপ্রণত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। (ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—অবতারবাদ

(আশ্বিনের বঙ্গদর্শনের ৫৪৪ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক বা 'না'-বাচক মতের সঙ্গে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের কোনও কোনও স্থলে অতিশয় গুরুতর বিরোধ আছে। ব্রাহ্মগণ বলেন—"ঈশ্বরের অবতার হয় নাই ও হইতে পারে না।" ব্রাহ্মসমাজ অবতার মানেন না। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধনা অবতারবাদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। ঈশ্বরের অবতার স্বীকার না করিলে, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিশেষত্ব ও বৈষ্ণব-সাধনার অনুপম বিচিত্রতা, এই সকলই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মমত ও ব্রাহ্মসাধন বর্জ্জন করিতেই হয়।

আপাততঃ এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্জ্জন করিতে হয় না, অতিক্রম করিতে হয় মাত্র। "ঈশ্বরের অবতার হয় নাই ও হয় না"—এটা একটা অভাবাত্মক বা 'না'-বাচক কথা। যাঁহারা কোনও অতি-প্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের অভাবাত্মক বা 'না'-বাচক মতের একটা প্রবল ভিত্তি আছে। খৃষ্টীয়ান্ বলেন,—"যিশুখৃষ্টের আশ্রয়লাভ ব্যতীত জীবের মুক্তির আর অন্য পথ নাই।" এটী একটী 'না'-বাচক খৃষ্টীয়ানী মত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে খৃষ্টীয়ান্ সাধক এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে—"আমি খৃষ্টাশ্রয় পাইয়া মুক্ত হইয়াছি।" ইহার বেশি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা নাই ও থাকিতেই পারে না। অথচ তিনি যখন বলেন যে, এ পথ কেবল আমার পথ নয়, সকলেরই, এই এক পথ; মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই; তখন তিনি একটা সর্ব্বজ্ঞতার দাবী করেন। এই দাবী তাঁর নিজের নাই, কিন্তু বাইবেলের আছে। কারণ বাইবেল ঈশ্বরের বাণী। আর ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া, তাঁর বাণীও সর্ব্বজ্ঞতার দাবী করিতে পারে। ঈশ্বর সকল জানেন বলিয়াই, মুক্তির যে আর পথ নাই, ইহাও জানেন। বাইবেল এই জ্ঞানই প্রচার করিতেছে। এইরূপে মুসলমান ধর্ম্মের 'না'-বাচক মত বা উপদেশেরও একটা অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য আছে। সে শাস্ত্রপ্রামাণ্য সত্য কি মিথ্যা, এ বিচার এখানে উঠে না। এখানকার কথা কেবল এই যে যাঁরা অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানেন, তাঁদের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞতার দাবী না করিয়াও, সেই সর্ব্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের বলে, যাহা নিজেরা জানেন না, তার সম্বন্ধেও দৃঢ় ভাবে একটা অস্তি-নাস্তি মত ব্যক্ত করিতে পারেন। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ প্রভৃতি ধর্ম্মের 'না'-বাচক মতের এইজন্য একটা জোর আছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র মানেন না। আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিই ইঁহাদের নিকটে সত্যের একমাত্র মুখ্য

প্রমাণ। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমানের মতন, ইঁহারা তেমন জোর করিয়া কোনও 'না'-বাচক মতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না।

মানুষ সাক্ষাৎভাবে না জানিয়াও অনেক বিষয়ে হাঁ, না বলিয়া থাকে। না জানিয়া যখন সে 'হাঁ' বলে, তখন অপরের সাক্ষ্যের উপরে সে নির্ভর করিয়া থাকে। আর না জানিয়াও যখন সে 'না' বলে, তখন তার এই উক্তি হয় মানবজ্ঞানের মূল প্রকৃতির উপরে, না হয় শুদ্ধ অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ ও কালের জ্ঞান মানুষের স্বতঃসিদ্ধ। আর ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকারে বস্তুর যে একটা আয়তন-বা-দৈর্ঘ্যপ্রস্থাদি-বোধ জন্মে, আমাদের এই স্বতঃসিদ্ধ দেশের জ্ঞান তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকারে জাগতিক সর্ব্ববিধ ঘটনার যে একটা পারম্পর্য্যের বোধ জন্মে, তাহারই উপরে আমাদের সহজসিদ্ধ কালের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। দেশের সঙ্গে আয়তনের বা extensionএর, আর কালের সঙ্গে ঘটনাপারম্পর্য্যের বা successionএর যে একটা নিত্যযোগ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা আমাদের জ্ঞানের মূল প্রকৃতির সাক্ষ্য। ইংরাজিতে এই সাক্ষ্যকে necessity of thought বলে। চিন্তা করিতে গেলেই, জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই, যে সকল সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিতে হয়, তাহাকেই necessity of thought বলে। সর্ব্বজ্ঞতার দাবী না করিয়াও জ্ঞানের মূল প্রকৃতি যে সকল সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে কর্ম্ম করে, সেই সকল স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীত কোনও কিছু যে কোনও দিন হয় নাই, কোনও দিন হইবে না, ও কোনও দিন হইতেই পারে না,—ইহা সকলেই বলিতে পারেন আয়তন বা extensionশূন্য দেশ, পারম্পর্য্য বা successionবিহীন কাল, কোথাও কখনও হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না,—এ কথা 'না'-বাচক হইলেও, যে ব্যক্তি জ্ঞানবস্তু যে কি, দেশজ্ঞান ও কালজ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, ইহা জানেন, তিনিই নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই কথা বলিতে পারেন। এই জাতীয় 'না'-বাচক কথা, অজ্ঞাত হইলেও জ্ঞাতেরই মতন সত্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বজ্ঞত্বের দাবী করা আবশ্যক হয় না। এইরূপ 'না'-বাচক বা অভাবাত্মক সিদ্ধান্তকে ভ্রান্তিবশতঃ বর্জ্জন করা যাইতে পারে; কিন্তু কোনও নূতন অভিজ্ঞতালাভে বা অভিনব জ্ঞানের উন্মেষে ইহাকে অতিক্রম করা যায় না। কারণ এই জাতীয় 'না'-বাচক বা অভাবাত্মক প্রতিজ্ঞা মাত্রেই এক একটা সনাতন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে।

"ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না"—ব্রাহ্মসমাজ এই যে 'না'-বাচক বা অভাবাত্মক মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা কোনও অভ্রান্ত ও সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রের কথা নহে। কারণ ব্রাহ্মসমাজে এরূপ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। ব্রাহ্মসমাজে আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিই সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। অথচ—"ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না ও হইতে পারে না" ইহা আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতির কথাও নহে। কারণ আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি-লব্ধ সত্য

মাত্রেই হাঁ-বাচক। যাহা নাই তার প্রত্যয়ও হয় না, অনুভূতিও অসম্ভব। ঈশ্বর আছেন আত্মপ্রত্যয় এই কথা বলিতে পারে। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ,—এ সকলের সাক্ষ্য স্বানুভূতি দিতে পারে। কিন্তু তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন কি না পারেন, ইহা আত্মপ্রত্যয় বলিতে পারে না। স্বানুভূতি ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও সাক্ষ্য দিতে পারে না। এ সকল কথা আত্মপ্রত্যয় ও স্বানুভূতির অধিকারের বহির্ভূত। অতএব যে মূল প্রামাণ্যের উপরে ব্রাহ্মমতের প্রতিষ্ঠা, তাহার দ্বারা অবতারবাদ সপ্রমাণও হয় না, অপ্রমাণও হয় না।

যাহা আছে বলিয়া জানি, তার বিপরীত কিছু নাই ও থাকিতেই পারে না—এইভাবেও না-বাচক প্রতিজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলি ভাবাত্মক মত আছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে এগুলির উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল ভাবাত্মক মতের বিরোধী কোনও মত বা সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মসমাজে কখনোই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, ও হইলে, সে ভাবাত্মক মত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সে অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ আর ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম আর ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিবে না—তাহার বিপরীত কোনও একটা সমাজ ও ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি মতে 'হাঁ' দিয়াছেন বলিয়াই, তার বিপরীত মত সম্বন্ধে 'না' বলিতে বাধ্য। এইভাবেও 'না-বাচক মতের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের 'হাঁ'-বাচক মতগুলির সকলই অপরাপর ধর্ম্মেতেও সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। ব্রাহ্মসমাজের 'হাঁ'-বাচক মতের প্রথমটীতে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন; তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা; তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ -ইত্যাদি সত্যে খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, বৈষ্ণব, শাক্ত সকলেই বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বসাক্ষী, তাঁর হস্ত-পদাদি কোনও ইন্দ্রিয় নাই, এ সকল কথাও খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেই স্বীকার করেন। অথচ এই সকল মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াও খৃষ্টীয়ান্, বৈষ্ণব ও শাক্ত ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মুসলমান্ পয়গম্বর ও নবীতে বিশ্বাস করেন। অবতারবাদের বা নবীবাদের দ্বারা ঈশ্বরের সত্যং জ্ঞানং অনন্তং স্বরূপের, কিম্বা তাঁর অদ্বৈতত্ত্বের কোনও ব্যাঘাত হয়, খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভৃতি সাধকেরা এরূপ আশঙ্কা কোনও দিন করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই সাধারণ ঈশ্বর-তত্ত্বের সঙ্গে অবতারবাদের বা নবীবাদের একটা নিগূঢ় বিরোধ থাকিতে পারে না, এমনও বলা যায় না, কারণ মানুষ অনেক সময় পরস্পরবিরোধী মতকেও অজ্ঞতা বা অসাবধানতানিবন্ধন সত্য বলিয়া গ্রহণও করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও যে তাহাই হয় নাই—এ প্রশ্নটা উঠিতে পারে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর-তত্ত্বের সঙ্গে সত্যই কি অবতারতত্ত্বের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ আছে? ব্রাহ্মসাধারণে এরূপ বিরোধ আছে বলিয়া মনে করেন। তারই জন্য তাঁহারা অবতার অস্বীকার করেন। কিন্তু এই না-বাচক সিদ্ধান্ত কি চিন্তার মূলসূত্রের বা necess-

sity of thoughtএর উপরে প্রতিষ্ঠিত, না কেবলমাত্র লৌকিক ন্যায়ের বা formal logicএর একটা অসঙ্গত অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—ইহাও তাকাইয়া দেখা আবশ্যক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানবজ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই জানা যায়। যেমন দেশ ও কালকে, সেইরূপ কার্য্যকারণসম্বন্ধকেও আশ্রয় করিয়াই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বিশেষ দেশেতে, বিশেষ কালেতে, কোনও কার্য্যবিশেষের কারণ বা কারণ-বিশেষের কার্য্যরূপেই আমরা যাবতীয় বিষয়ের বা বস্তুর জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলকে ধরিয়াই আমাদের বুদ্ধি পরিণামে অনাদি আদিকারণরূপ ঈশ্বরতত্ত্বে যাইয়া উপনীত হয়। লৌকিক ন্যায় বা formal logic এই কারণ-ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করে। এই কারণ-ব্রহ্মের যে অবতার হয় না বা হইতে পারে না, জ্ঞানের মূলসূত্র হইতে এমন কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় না। অপিচ কারণ মাত্রকেই যখন কার্য্যরূপে পরিণত হইতে দেখা যায়, কারণের আত্মপরিণামকেই যখন আমরা সর্ব্বত্র কার্য্য বলিয়া দেখি ও জানি, তখন কারণ-ব্রহ্মই যে জগৎ ও জীবের মধ্যে জগৎ ও জীবরূপে পরিণত হইতেছেন ইহা মানিতেই হয়। লৌকিক ন্যায় বা formal logic এই পরিণামবাদেরই প্রতিষ্ঠা করে। এই পরিণামবাদ সত্য হউক, মিথ্যা হউক, জ্ঞানের মূলপ্রকৃতির সঙ্গে ইহার কোনও ঐকান্তিক বিরোধ নাই। আর এই পরিণামবাদের সঙ্গে অবতার-বাদের কোনও অসঙ্গতি নাই।

যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সেইরূপ তাঁর স্বরূপও মানবজ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই জানা যায়। যাহা বীজে নাই তাহা বৃক্ষেতে ফোটে না। যাহা কারণেতে নাই, কার্য্যেতে তার প্রকাশ হয় না ও হইতেই পারে না। জগতে যখন জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি তখন জগৎ-কারণে অবশ্যই জ্ঞানক্রিয়া বিদ্যমান আছে। জীবের চেতনাই ঈশ্বরের নিত্য-চৈতন্যের সাক্ষী দেয়। মানবের জ্ঞানই ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপের পরিচয় প্রদান করে। ঈশ্বর যে জ্ঞানস্বরূপ, অনাদ্যনন্ত, সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী, আনন্দময়, শিবস্বরূপ,—এ সকলই মানবজ্ঞানের ও মানবপ্রকৃতির সাক্ষ্য হইতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ নিজের প্রকৃতিকে জানিতে গিয়াই এই সকল ঈশ্বরস্বরূপেরও জ্ঞানলাভ করে। ঈশ্বর যে অন্তর্য্যামী, সাক্ষী-চৈতন্য, ইহা আমাদের জ্ঞানেরই সাক্ষ্য। এই অন্তর্য্যামী পুরুষ আমাদের ভিতরেই বাস করিতেছেন, তিনিই পরমচৈতন্যরূপে দিবা-নিশি আমাদের সঙ্গে বিরাজ করিয়া, আমাদের ইন্দ্রিয়-চেষ্টা ও রসসম্ভোগ সকলই সম্ভব করিতেছেন। অথচ দেহপুরে থাকিয়াও দেহের বিকারের দ্বারা তিনি কদাপি বিকৃত হন না। আমাদের ভুলভ্রান্তির সঙ্গে ওত-প্রোত ভাবে মিশিয়া আছেন, অথচ এ সকল পাপ-তাপ-মোহ ও অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করে না। আর আমাদের দেহপুরে পুর-স্বামী হইয়া আছেন বলিয়া যদি তাঁর স্বরূপের কোনও হানি না হয়, তাহা হইলে অবতার অঙ্গীকার করিলেই যে সেই স্বরূপের হানি হইবে, জ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতে এরূপ কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় না।

ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ—ইহা সমাজের একটা হাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত। আর মামুলী ব্রাহ্মমতে এই জন্যই অবতারবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মাও ত নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ; অথচ এই জীবাত্মা যখন দেহ ধারণ করে, তখন তার নিরাকারত্ব ও চৈতন্যস্বরূপ দু'এর কোনটাই নষ্ট হইয়া যায় না। অবতীর্ণ ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন বলিয়া, তাঁরই নিরাকারত্বের ও চৈতন্যস্বরূপের ব্যাঘাত জন্মিবে কেন? জীবাত্মা যখন দেহবদ্ধ হইয়াও আপনার স্বরূপভ্রষ্ট হন না, তবে পরমাত্মাই বা অবতার স্বীকার করিলে স্বরূপভ্রষ্ট হইবেন কেন?

যদি বল জীবাত্মা দেহধারণ করিয়া, এই দেহের ও এই সকল ইন্দ্রিয়ের অধীন এবং এই ইন্দ্রিয়ের অধীনতা নিবন্ধন জড়ের নিয়মের অধীন হইয়া পড়ে, অবতার স্বীকার করিলে পরমাত্মাকেও এই সকল অধীনতা গ্রহণ করিতে হয়, আর তাহা হইলে তাঁর সর্ব্বাতীতত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ঈশিত্ব ও স্বতন্ত্রত্ব রক্ষা পায় না। তাহাই বা কল্পনা করিব কেন? কারণ এই জীবাত্মাই তো সাধনপ্রভাবে, জীবন্মুক্ত অবস্থায়, এই জড়জগতের সর্ব্বপ্রকারের অধীনতা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। জীবাত্মার পক্ষেই যখন এই দেহেতে থাকিয়াও দেহের অতীত হওয়া সম্ভব, পরমাত্মার পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবে কেন?

আর এই সকল যোগসিদ্ধিতে যদি অবিশ্বাসই বা কর, তথাপি ব্রাহ্মমতেও তো জীবাত্মাকে স্বাধীন বলিয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থই এই যে জীব ইচ্ছা করিলে আপনার রক্তমাংসের প্রেরণা ও প্রবৃত্তি সকলকে পদানত করিয়া তাহাদের অতীত হইতে পারে। জীবাত্মাকে জড়ের নিয়মাধীন করিলে, তাহার আর কোনও সত্য-স্বাধীনতা থাকে না। এই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই শরীরের সহজ ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি সকল তাহাকে যে দিকে টানে, জীব তার বিপরীত দিকেও চলিতে পারে। আর দেহধারী হইয়াও যখন দেহের অধীন থাকা বা না থাকা জীবাত্মার স্বেচ্ছাধীন, তখন ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা দেহ স্বীকার করিয়া সেই দেহের অতীত থাকিতে পারেন না, এমন বলা যায় কি?

অতএব অবতারবাদে ঈশ্বরতত্ত্বের নিরাকারত্ব বা চৈতন্যস্বরূপের কোনও ব্যাঘাত করে, এমন বলা যায় না।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে অবতারতত্ত্বের যে কেবল কোনও সাংঘতিক বিরোধ নাই, তাহাই নহে। প্রত্যুত এই ঈশ্বরতত্ত্ব গ্রহণ করিলে, এক আকারে না এক আকারে, অবতারতত্ত্বও মানিতেই হয়।

ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরতত্ত্ব অদ্বৈত-তত্ত্ব। ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর—"শান্তং শিবং অদ্বৈতং"। প্রাকৃত জনে এই অদ্বৈতের একটা অসদর্থ করিতে পারে, কখনও কখনও করিয়াও থাকে, ইহা জানি। ঈশ্বর একজন,—দুইজন বা তিনজন বা তেত্রিশ কোটিজন নহেন, কেহ এরূপও মনে করেন বটে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ কোনও দিন অদ্বৈত শব্দের এই কদর্থ করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় বিশুদ্ধ বৈদান্তিক অর্থেই ব্রহ্মোপাসনায় অদ্বৈত শব্দের প্রয়োগ করিতেন। রাজার সিদ্ধান্তে ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র সত্য ও

নিত্য তত্ত্ব। পরমার্থতঃ বিশ্বে তত্ত্ববস্তু এক, দুই নাই, তাহাই ব্রহ্মবস্তু। এই ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র কারণ। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ, ব্রহ্মই ইহার উপাদান-কারণ। সুতরাং—সদেব ইদং অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। রাজা শঙ্কর-বেদান্তমতা-বলম্বী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। রাজার ব্রাহ্মধর্ম্মের চরম সাধ্য ছিল—কৈবল্য। মহর্ষি জীবব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়া, নিত্যকাল জীব ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন হইয়া, জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্ম-যোগে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত থাকিবে, ইহাকেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের চরম সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। ব্রহ্ম জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন। কিন্তু ইহা স্বগতভেদমাত্র, স্বতন্ত্রভেদ নহে। সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মেতেই স্থিতি করে, এবং ব্রহ্মের প্রতিই নিত্যকাল গমন করে। অতএব, অদ্বৈতবাদী না হইয়াও, ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, মহর্ষিও কোনও দিন এ কথা অস্বীকার করেন নাই। "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ"—"সদেব, সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং"—মহর্ষিও এই সকল শ্রুতি উদ্ধার করিয়া তাঁর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থে, ব্রহ্মকেই একমাত্র পরমতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীতেও ইহার প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি,
ঘোর দিগন্তপ্রসারী।
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।

কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জড়ের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াও, কখনও ইহাদের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন নাই, কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্তেও তত্ত্ববস্তু এক, দুই বা তিন নহে। সেই এক হইতেই এই বহুর সৃষ্টি হইয়াছে। জীব ও জগৎ সেই এক অদ্বৈত ব্রহ্মেরই প্রকাশ। জীব তাঁহারই চিৎকণা। জড় তাঁহারই চিন্তাঘন। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মূল সিদ্ধান্ত। আর এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সঙ্গে অবতারবাদের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ যে কেবল নাই, তাহা নহে; ফলতঃ এই অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, কোনও না কোনও আকারে, অবতারবাদও মানিতেই হয়; না মানিলে, জীব ও জগতের সত্তার কোনও ভিত্তি ও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মই যদি জগতের একমাত্র পরমতত্ত্ব ও চরমবস্তু হন, বিশ্বের অনাদি আদিতে ব্রহ্মাতি-রিক্ত কোনও কিছু ছিল না, ইহাই যদি সত্য হয়; সেই ব্রহ্মবস্তু হইতেই সমুদায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া, তাঁহারই মধ্যে স্থিতি করিতেছে এবং অন্তিমে তাঁহাতেই প্রবেশ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে উদ্ধৃত এই শ্রুতিবাক্য যদি মিথ্যা না হয়; তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মেরই প্রকাশ; তাঁহারই রূপান্তর বলিতে হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন,—এই কথা অস্বীকার করা অসম্ভব হয়। আর ইহাও তো এক প্রকারের অবতার। জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াও জীব ও জগতের ধর্ম্ম ব্রহ্মকে সসীম বা সাকার করিতে পারে না। সেইরূপ ঈশ্বর দেহ ধারণ করিয়া অবতার স্বীকার করিলেও, দেহের ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করে

না। তাঁর অনির্ব্বচনীয় অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই জগৎকারণ এই জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন। সেই মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি অবতারও গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা বিশ্বাস করিলে, ব্রাহ্মমতের কোনও ব্যাঘাত হইবে কেন? গীতার অবতারবাদ এই মায়ার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছেন — ভগবান্ আপনার মায়াপ্রভাবে যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন—"সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" অন্তত: গীতার অবতারবাদের সঙ্গে ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের কোনোই অনঙ্গতি নাই। ব্রাহ্ম-মতের সঙ্গেই বা তার বিরোধ থাকিবে কেন?

রাজা রামমোহন রায় গোস্বামীমতের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। শঙ্কর-বেদান্তা-বলম্বী তান্ত্রিক-সাধক রাজা যে বাংলার বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু রাজা রামমোহনও গীতার অবতারবাদ একে-বারে অস্বীকার করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি যে বিশ্বরূপের উপাসনা করিতেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তিনিই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্রকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি পরে এই স্তোত্রটীকে কতকটা কাটিয়া ছাটিয়া নিজের মনোমত করিয়া লইয়াছিলেন, রাজা তার একটী অক্ষরও পরিবর্ত্তন করেন নাই। রাজা ব্রহ্মতত্ত্বকে নির্গুণ ও বিশ্ব-রূপাত্মক দুই-ই মনে করিতেন। তাই তিনি—

"নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়"

বলিয়া ব্রহ্মের স্তুতি করিতেন। মহর্ষি বিশ্ব-রূপাত্মকায় কাটিয়া "সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়" করিয়া-ছেন। আর পরবর্ত্তী পদে নির্গুণায় কাটিয়া শাশ্বতায় করিয়াছেন। মহর্ষি অদ্বৈতবাদের ভয়ে সর্ব্বদা জড়সড় হইতেন। অদ্বৈতবাদের গন্ধ পর্য্যন্ত তাঁর সহ্য হইত না। রাজার এ ভয় ছিল না। অদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়াই রাজা বিশ্বরূপের ভজনাও করিতেন, আর গীতায় যতটুকু অবতারবাদ ফুটিয়াছে, ততটুকু অবতারবাদ স্বীকার করিতে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে অবতার-বাদ স্বীকার না করিলেও, মহাপুরুষবাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিবিশেষে সময়ে সময়ে এই মতের প্রতি-বাদ করিলেও, কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষবাদ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ইহা প্রতিপন্ন হয় নাই। এই মহাপুরুষবাদের সঙ্গে অবতারবাদের পার্থক্য অতি সামান্য। ফলতঃ কেশবচন্দ্রের এই মহাপুরুষবাদ কিয়ৎপরিমাণে মুসলমান্-ধর্ম্মের পয়গম্বরবাদ বা নবীবাদেরই মতন। মহাপুরুষেরা ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মোপদেষ্টা। অধর্ম্মের ক্ষয় এবং ধর্ম্মের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা-সাধনের জন্য, তাঁহারা যুগে যুগে মানবসমাজে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন ও ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিয়া চলিয়া যান। ইঁহারা যখন বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া সংসারে আসেন, তখন দেহধারণের পূর্ব্বে তাঁহারা অবশ্য ঈশ্বরের নিকটে তাঁরই দরবারে বাস করেন। নতুবা প্রেরিতবাদের সার্থকতা থাকে না। কেবল তাঁরা নিজেরাই যে আসেন, তাহাও নহে; তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়াই তাঁরা যুগধর্ম্ম-

প্রতিষ্ঠার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এবদিক্ দিয়া এই মহাপুরুষবাদের সঙ্গে গীতার অবতারবাদের যথেষ্ট ঐক্য আছে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনই গীতার অবতারের মুখ্য প্রয়োজন। এই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনই কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষদের জন্মেরও মুখ্য হেতু। তবে গীতায় ভগবান সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে অবতীর্ণ হন, এ কথাও কোথাও বলেন নাই; বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। অতএব কেশবচন্দ্রের প্রেরিত মহাপুরুষবাদ গীতার অবতারবাদের অপেক্ষাও বৈষ্ণবীয় অবতার-বাদের বেশী নিকটে গিয়াছে।

কিন্তু কেশবচন্দ্র কেবল প্রেরিত মহাপুরুষ-বাদের প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। খৃষ্টীয়ান্‌দের লগস (Logos) বা শব্দব্রহ্মবাদ পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মানুষের চিন্তা বা ভাবের সঙ্গে তার ভাষার যে সম্বন্ধ, পরমতত্ত্বের সঙ্গে লগসেরও সেই সম্বন্ধ। আমাদের ভাব ও চিন্তা ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, আমাদের ভাষা আবার আমাদের মনের ভাব ও চিন্তা হইতে, সেই ভাব ও চিন্তার আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া, সেই ভাব ও চিন্তাকে ধরিয়াই আপনার স্থিতি ও সার্থকতা সম্ভব করে। সেইরূপ পরমতত্ত্বও লগসের (Logos) ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করেন। আর লগসও (Logos) সেই তত্ত্ব হইতে প্রসূত হইয়া, তাহারই আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা লাভ করে। "বাগর্থমিব" নিত্যযুক্ত হইয়া লগস এবং পরমতত্ত্ব অনাদিকাল হইতে পরস্পরের সঙ্গে বাস করেন। আর এই লগসই সৃষ্টিমূল। লগসই বিশ্বের ছাঁচ। এই লগসই সাকার হইয়া জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশিত হন। এই লগসই অবতীর্ণ ঈশ্বর বা যিশুখৃষ্ট। এই লগস-বাদের উপরেই খৃষ্টীয় অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই লগসকেই ইংরেজি বাইবেলে the Word বলা হইয়াছে।

In the beginning Was the Word.
The Word was with God.
The Word was God.

ইংরেজি বাইবেল এখানে এই লগস-তত্ত্বই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই খৃষ্টীয় লগস-তত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। সে কথা যথাসময়ে ও যথাস্থানে বলিব। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই লগস-বাদ স্বীকার করিয়াছিলেন। যিশুখৃষ্টকে তিনি লগস বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি তাঁহাকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। দার্শনিক অর্থে কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয় অবতারতত্ত্বকে সত্য বলিয়া মনে করিতেন, এ কথা বলিলেও বোধ হয়, কোনও অপরাধ হইবে না। এমন অনেক খৃষ্টীয়ান আছেন, যাঁরা খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের মামুলী ত্রিত্ববাদ বা Trinity অস্বীকার করিয়াও লগস-বাদ স্বীকার করেন এবং যিশু খৃষ্টকে ঈশ্বরের প্রেমের ও তাঁর [illegible]নের প্রতিচ্ছবি, প্রতিমূর্ত্তি ও সাকার বাহ্যপ্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাও একপ্রকারের অবতারবাদ বই আর কি? আর কেশবচন্দ্র, বিশেষতঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, যিশু খৃষ্টকে অনেকটা

এই চক্ষেই দেখিতেন। অতটুকু অবতারবাদ স্বীকার করাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই।

অতএব ব্রাহ্মমতের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবীয় অবতারবাদেরও যে একটা ঐকান্তিক ও সাংঘাতিক বিরোধ আছে, এ কথা বলা যায় না। ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না,—ব্রাহ্মগণ যে এ কথা বলেন, ইহা তাঁহাদের আত্মপ্রত্যয়ের বা স্বানুভূতির উপরেও প্রতিষ্ঠিত নহে ; মানবজ্ঞানের মৌলিক প্রকৃতি হইতেও এই মত প্রসূত হয় না। ইহা স্বতঃপ্রামাণ্য সত্য নহে। অনুমান-প্রতিষ্ঠ সত্যাভাস মাত্র। আর অনুমানের উপরে যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে বর্জ্জন করিতে হয় না, অতিক্রমই করিতে পারা যায়।

ফলতঃ নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে অবতারবাদের কোনওই বিরোধ নাই। এই বিরোধ কল্পনা করিতে যাইয়া, আমরা আমাদের ঈশ্বরতত্ত্বকেই স্বল্পবিস্তর সাকার ও বিশিষ্ট করিয়া তুলি। ঈশ্বরতত্ত্ব যে দেশ-কালের অতীত,—এবং অতীত বলিয়াই যুগপৎ সমভাবে সর্ব্বকালে ও সকল দেশে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং একই সঙ্গে প্রকট ও অপ্রকট, তটস্থ ও তুরীয় অবস্থায় বাস করেন, একই সময়ে ব্যক্ত হইতে এবং অব্যক্ত রহিতে পারেন,—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াই, ঈশ্বরের অবতার হয় শুনিলে আমরা শিহরিয়া উঠি। ফলতঃ আমরা ঈশ্বরাবতারের কথা শুনিলে এমনই ভাবি যে ঈশ্বর যদি জুদিয়ায় বা নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন, তবে সে সময়ে যতক্ষণ যিশুদেহে বা চৈতন্যদেহে তিনি আবদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি অনাথ হইয়া থাকে ? আর এইজন্যই একেবারে অবতার-তত্ত্বটাকে উড়াইয়া দেই। কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের অর্থ বুঝিলে আর এ খট্‌কা বাঁধে না। ঈশ্বর তো বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কিন্তু এ ব্যাপ্তি জড়বস্তুর কিম্বা এমন কি আকাশবস্তুর ব্যাপ্তির মতনও নহে। তড়াগগর্ভে যেমন জলরাশি পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপভাবে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপিয়া আছেন, তাহা নয়। সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্রই তিনি যুগপৎ পরিপূর্ণরূপে, আত্ম-স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ঈশ্বরতত্ত্বে ভাগবাটোয়ারা করা যায় না। এ তত্ত্ব অখণ্ড, অবিভাজ্য, অদ্বৈত। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই সমভাবে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। বিন্দুতে যেমন পূর্ণ সিন্ধুতেও সেইরূপ পূর্ণ। এমার্সনের কথায় বলিতে গেলে—He is as perfect in the atom as in the universe. এই ঈশ্বর-তত্ত্ব আমাদের আত্মতত্ত্বেরই মতন। এই যে অস্মদ্‌প্রত্যয়বাচক আত্মবস্তু তাহা এই দেহের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের এই আমি বস্তু, এই প্রাণবস্তু, এই চৈতন্যবস্তু, যে নামেই ইহাকে ব্যক্ত করি না কেন, এই দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সমভাবে অধিকার করিয়া, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। কোন একটা অঙ্গ নষ্ট হইয়া গেলে এই বস্তুর হ্রাস হয় না। এ বস্তু যেমনটী ছিল তেমনটীই থাকে। পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যেমন কেশমূলে, সেইরূপ হৃৎপিণ্ডে, দেহের সর্ব্বত্র এ বস্তু যুগপৎ পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করে। এক অঙ্গ হইতে ইহাকে টানিয়া আনিয়া অপর অঙ্গে ইহাকে ফুটাইতে হয় না।

যেখানে অস্ফুট থাকে, সেখানেও ইহা পরিপূর্ণভাবে আত্মস্বরূপেই থাকে। যেখানে পরিস্ফুট হয়, সেখানেও পরিপূর্ণভাবে সেই আত্মস্বরূপেই বিদ্যমান থাকে। প্রকাশের ইতরবিশেষে তাঁর স্বরূপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ইহাই আত্মার লক্ষণ। ইহাই জীবাত্মার লক্ষণ। ইহাই পরমাত্মারও লক্ষণ। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে এই আত্মবস্তু—

"আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বত্র।"

এই শক্তিকেই ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের যোগমায়া বলিয়াছেন। এই শক্তিপ্রভাবেই কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ আধারে, বিশেষভাবে আবির্ভূত হইলেও, অন্য ক্ষেত্রে, অন্য আধারে ঈশ্বরতত্ত্বের তিরোভাব হয় না; সুতরাং অবতার অঙ্গীকার করিলে ঈশ্বরের নিরাকারত্বের বা সর্ব্বব্যাপিত্বের কোনও ব্যাঘাত হয় বলিয়া যে আশঙ্কা হয়, ইহা নিতান্তই অজ্ঞান কল্পনা মাত্র।

ফলতঃ যতদিন নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্ব কি ইহা বুঝি নাই, ততদিন অবতার অসম্ভব ও অসাধ্য বলিয়া ভাবিতাম। যে পরিমাণে প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব কাহাকে বলে ইহা বুঝিতে পারিতেছি, সেই পরিমাণে অবতারবাদের ভয়টাও কমিয়া যাইতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংসারচন্দ্র বহুদিন হইতে সাংঘাতিক বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মবীর, কিন্তু সেজন্য রাজ্যের গুরু কর্ম্মভার বহন করিতে একদিনের জন্যও বিরত হ'ন নাই। এমন সময় গিয়াছে, যখন এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তাঁহাকে দৈনিক ১৬।১৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আফগানিস্থানের অধিপতি আমীরের ভারতাগমন-উপলক্ষে আগ্রায় যে দরবার হয়—তখন আগ্রায় অবস্থানকালে অত্যধিক পরিশ্রমে ও অনিয়মে সংসারচন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসার পর চিকিৎসকগণের বিশেষ আদেশে এবং মহারাজের আগ্রহে তিনি কিছুদিন জয়পুরের নিকটবর্ত্তী 'রোড়পুরা'য় গিয়া বাস করেন। সেখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে এবং বিশ্রামলাভে শীঘ্রই তিনি অনেকটা আরোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার আরোগ্যলাভসংবাদে রাজকর্ম্মচারিগণ ও প্রজাবৃন্দ সকলেই আনন্দিত হইল। এই পুরাতন বিশ্বস্ত সচিবের আরোগ্যলাভে আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্য মহারাজ স্বয়ং

প্রধানা মহিষী সমভিব্যাহারে রোড়পুরা গমন করিয়া দিবসব্যাপী উৎসব করিলেন। মহারাজ সংসারচন্দ্রকে যে প্রকার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন—এ আনন্দোৎসব তাহারই ফল। এমনি করিয়া মহারাজ সাধারণের নিকট সংসারচন্দ্রের সুদীর্ঘ চল্লিশ-বর্ষব্যাপী একান্ত প্রভুভক্তি ও আত্মত্যাগের সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সংসারচন্দ্রের স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে মহারাজ মহিষী সহ তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসার জন্য সংসারচন্দ্রের গৃহে আগমন করেন। জয়পুরাধীশ্বরীর পক্ষে রাজমন্ত্রীকে এরূপ সম্মানপ্রদর্শন এ রাজ্যে বোধ হয় অনন্যপূর্ব্ব।

১৯০৯ সালের নববর্ষারম্ভে ভারত-গভর্ণমেণ্ট সংসারচন্দ্রকে C. I. E. উপাধি প্রদান করিলেন। লোকপ্রিয় সচিবের এই সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। এই সভায় তাঁহার পুরাতন ছাত্রবর্গ, সমগ্র রাজকর্ম্মচারী, কৌন্সলের ব্যবহারাজীবগণ মিলিত হইয়া সংসারচন্দ্রকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই সকল অভিনন্দনপত্র * এবং তৎকালীন রেসিডেণ্ট কর্ণেল হার্বার্ট জয়পুরের ইংরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইয়া যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সংসার-চন্দ্রের দেবতুল্য চরিত্র, তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—সর্ব্বোপরি রাজ্যের হিতের জন্য তাঁহার নিঃস্বার্থ চেষ্টা—তাঁহাকে জয়পুর-অধিবাসীদের নিকট কতদূর সম্মানভাজন ও লোকপ্রিয় করিয়াছিল। সংসারচন্দ্র ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় এই সকল অভিনন্দনপত্রের যে উত্তর দেন তাহা তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিরই উপযুক্ত।

রেসিডেণ্ট কর্ণেল হার্বার্ট তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"I have never heard other than good spoken of you by all sorts and conditions of men—indeed every one has spoken of you with affection and regard and I have ever found you courteous, upright, with a fine sense of justice and the highest integrity—* * *" বাস্তবিক তিনি দেশীয় রাজ্যসুলভ বিবিধ দলের সকলেরই প্রীতি ও ভক্তির পাত্র ছিলেন—রাজকার্য্যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক সময় অনেককেই তাঁহাকে শাসন করিতে বা নিরাশ করিতে হইয়াছিল—হয়ত অনেক সময় তাঁহার কার্য্যে অনেকের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল—কিন্তু তাহাতে তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে ব্যতীত কমে নাই। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে একস্থানে সংসারচন্দ্র যে মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—'Be just and fear not, let all the ends, thou aimest at, be thy country's, thy God's and Truth's—' ইহাই তাঁহার জীবনে সর্ব্বকার্য্যে মূলমন্ত্র ছিল।

কিন্তু হায়! কালের করাল হস্ত সংসার-

* অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য নানা ভাষায় লিখিত এই সকল অভিনন্দনপত্র ও সংসারচন্দ্রের উত্তর, যদি কখন এই জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তবে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে। মাসিকপত্রে সে সকল প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে।

চন্দ্রকে এই স্বতঃ-উৎসারিত ভক্তি, এই অযাচিত সম্মান, এই বিপুল গৌরব, বেশীদিন ভোগ করিতে দিল না। অভিনন্দন-সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি আবার যে রোগশয্যায় শায়িত হইলেন, তাহার পর আর তাঁহার পূর্ব্ববৎ নিয়মিত রাজকার্য্য পরিচালনের সামর্থ্য রহিল না।

১৯০৯ সালের ১১ই মে সর্ব্বজনপ্রিয় সচিব, সংসারচন্দ্র অম্বররাজ্যের রাজা প্রজা সকলকে গভীরতম শোকে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন—রাজ্যে হাহাকার উত্থিত হইল। মহারাজের আজ্ঞায় রাজ্যের সমস্ত আফিস-আদালত, 'ছত্রিশ কারখানা' এবং সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্য দুইদিনের জন্য বন্ধ হইল। প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দারদিগের মৃতদেহ যে প্রকার সম্মানের সহিত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, সেই প্রকার 'লওয়াজীমা'র সহিত সংসারচন্দ্রের মৃতদেহ দাহ-স্থানে লইয়া যাওয়ার হুকুম প্রচারিত হইল। প্রথমে দুইটি হস্তীর উপর জয়পুররাজের 'পাঁচরঙ্গা' পতাকা, তাহার পর 'নগ্নী-নাকাড়া'-বাহী উষ্ট্র ও ঘোটকশ্রেণী, তৎপশ্চাতে এক রেজিমেণ্ট রাজসৈন্য, তাহার পর সুসজ্জিত 'বিমানে' মৃত সর্দ্দারের দেহ, সঙ্গে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও সমগ্র রাজকর্ম্মচারী ও সর্ব্বশেষে সহস্রাধিক শোকসন্তপ্ত প্রজা-বৃন্দ। এমনি করিয়া যে সংসারচন্দ্র সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর জয়পুররাজ্যের হিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যিনি মহারাজ সবাই মাধোসিংহের একাধারে সৎপরামর্শ-দাতা সচিব, সর্ব্ব সময়ে একান্ত বিশ্বাসভাজন বন্ধু ও সর্ব্বসৎকার্য্যের সহায় ছিলেন—সেই মহাপ্রাণ বঙ্গসন্তানের নশ্বরদেহ শ্মশানভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। যেখানে এই ধার্ম্মিক, কর্ম্মী, সত্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত বাঙ্গালীর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, সেস্থান আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। জানি না, আমরা সেই অমায়িক, আড়ম্বরহীন কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার, সেই নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি ও ন্যায়-পরায়ণতার, সেই উদার হৃদয়ের প্রকৃত সম্মান করিব কি না। কীর্ত্তিমান স্বদেশীর সম্মান করিতে পরাঙ্মুখ বলিয়া বাঙ্গালীর যে কলঙ্ক আছে,—তাহা কি কখনও মোচন হইবে না? আর, অম্বররাজ্য আজ যে নিঃস্বার্থ প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হারাইল—কে জানে কবে তাহা পূরণ হইবে? যদি কখনও অম্বরবাসী তাহাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস লেখে, তবে, বাঙ্গালী গৌরব বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য, হরিমোহন সেন, কান্তি-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সংসারচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই সকল মহাপ্রাণ বঙ্গসন্তান জয়পুররাজ্যের যে উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, যে সকল প্রবল বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান ভারতের প্রধান হিন্দুরাজ্যের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া জগতের নিকট জয়পুরের নাম সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন—সে সকল কীর্ত্তি জয়পুর ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরদিন উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে।

দানশৌণ্ড মহারাজ তাঁহার পরম হিতকারী সচিবের শ্রাদ্ধাদি যথাযোগ্য সমারোহে সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। বৃষোৎসর্গ, দানসাগর, কাশী-নবদ্বীপ-মিথিলা প্রভৃতি স্থানের মহা-

মহোপাধ্যায় অধ্যাপক-বিদায় এবং ব্রাহ্মণাদি-ভোজন ও কাঙ্গালীবিদায়ের বিপুল আয়োজন হইল। সংসারচন্দ্রের পিতৃভক্ত পুত্র অবিনাশচন্দ্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে এই বৃহৎ-ব্যাপারের যে প্রকার নিখুঁত বন্দোবস্ত করিলেন—তাহা তাঁহার পিতৃভক্তিরই পরিচায়ক। সমাগত সশিষ্য অধ্যাপকদিগের এবং অতিথি অভ্যাগত ও আত্মীয়স্বজনদিগের বাসস্থান ও আহারাদির বিশেষ ব্যবস্থা হইল। বিরাট মণ্ডপতলে আঠারটি রৌপ্য ও পিত্তলের ষোড়শ, ও শ্রাদ্ধোপকরণ এবং শ্রাদ্ধসভা সজ্জিত। সভা-মণ্ডপের একস্থানে রাজগুরু, মন্দিরের মহান্ত-বর্গ এবং নানাস্থানের সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণের স্থান, অন্যত্র রাজ্যের সর্দ্দার ও প্রধান-অপ্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ সমবেত। একধারে বঙ্গ-দেশীয় কীর্ত্তনীয়া 'মাথুরে'র করুণ-সঙ্গীতে শ্রোতৃবৃন্দকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিতেছে। সেদিন সকলের অবারিতদ্বার। পরদিবস প্রায় ষষ্টিসহস্রাধিক ব্রাহ্মণাদি নানা জাতিকে পরি-তোষে ভোজন করান হইল। এক দিন জয়-পুরস্থিত কাঙ্গালিগণ, একদিন রাজ্যের সর্দ্দার-গণ ও রাজকর্ম্মচারিগণকে ভোজন করান হইল। আহারাদির এই বিরাট ব্যবস্থা, অধ্যাপক ও সমাগত ব্যক্তিদিগের জন্য সর্ব্ব-প্রকার সুবন্দোবস্ত এবং দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যাপার, সর্ব্বোপরি সংসারচন্দ্রের পুত্রগণের বিনীত আপ্যায়নে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বিভিন্ন দেশীয় অধ্যাপকগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে এরূপ বিরাট অথচ সুনিয়মিত সমারোহব্যাপার তাঁহাদের জীবনে কেহ দেখেন নাই,- ইহা কেবল দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের বিখ্যাত মাতৃশ্রাদ্ধের সহিত উপমিত হইতে পারে। মহারাজ এমনি করিয়া সংসারচন্দ্রের জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ প্রভুভক্তির যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

এ দিকে জয়পুররাজমন্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদে পায়োনিয়র, * সিভিল-মিলিটারী গেজেট প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্র এবং উত্তরভারতের অধিকাংশ হিন্দী ও উর্দ্দু পত্র সংসারচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া তাঁহার নানা সদ্‌গুণের ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। মহা-মান্য ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও রাজপুতানার প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ সংসার-চন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া মৃত মহাত্মার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ড ও ভারতের নানাস্থানের প্রধান, অপ্রধান, ধনী, গৃহস্থ, দরিদ্র, বিদ্বান ও কর্ম্মিগণের এই সকল সমবেদনা-সূচক পত্রাদি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা এই বঙ্গসন্তানকে কতদূর সম্মান করিতেন এবং আশ্চর্য্য হইতে হয় যে কেমন করিয়া বন্ধুবৎসল সংসারচন্দ্র এতপ্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি ব্যক্তির বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার সংসারচন্দ্র নিজ চরিত্রবলে, নিজের কঠোর সাধনায় যে প্রবল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিষ্কলঙ্ক যশের উচ্চশিখরে আরোহণ

* স্বর্গগত সংসারচন্দ্র সম্বন্ধে সুবিখ্যাত 'পায়োনিয়রে' যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা গ্রন্থপরিশিষ্টে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। দেশের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির পত্রও সেই সঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, সংসারচক্রের জীবন নিম্নলিখিত সত্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল—

"The heights of great men reached and kept
Were not attained by sudden flight;
But, they, while their companions slept
Were toiling upward in the night.

(ক্রমশ)

অমৃতসর

(কাপিতেন ক্লড-লাকন্টেনের ফরাসী গ্রন্থ * হইতে)

এইখানে একটি অতি সুন্দর, অতি মনোরম, ও পবিত্র নগর অধিষ্ঠিত; অমৃতসর শিখদিগের 'রোম,' খাল্‌সাদিগের,—ঈশ্বর-নির্ব্বাচিতদিগের—মেক্কা। এইখানেই আমি শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে শিখদিগের অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মমতগুলি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

উজ্জল প্রভাত। চারিদিকেই জীবন-চাঞ্চল্যের একশেষ। স্বর্ণমন্দির দর্শনোদ্দেশে জনতার মধ্য দিয়া অতিকষ্টে সহর অতিক্রম করিলাম। সুন্দর সুন্দর উদ্যানের মধ্যস্থিত দীর্ঘ বীথিগুলি অনুসরণ করিয়া, মক্ষিকা-গুঞ্জিত অসংখ্য বিপণির মধ্য দিয়া, পুরাতন অমৃতসর অতিক্রমপূর্ব্বক, অবশেষে পুণ্য-সরোবরের তীরে উপনীত হইলাম। এইরূপে বিবিধ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, এই পথটি কেন্দ্রস্থলে আসিয়া—২০ লক্ষ শিখ যে গ্রন্থ মানিয়া চলে, সেই গ্রন্থের অধিষ্ঠানভূমিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রথমেই উদ্যানের একটি বহির্বেষ্টন; পরে, ইংরাজি কেতা-অনুযায়ী ফুলের কেয়ারী-সমূহ, তাহার পর পুরাতন দেশী সহর, তাহার পর পুণ্য-নগরী,—এই নগরী অমৃত-সরোবরকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সরোবরের মধ্যস্থলে, স্বর্ণমন্দির; মন্দিরের ভিতর "গ্রন্থ সাহেব"।

সাদা কালো মার্ব্বেল-প্রস্তরে নির্ম্মিত সমচতুষ্কোণ সুশীতল ঘাট সরোবরটিকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। জনতার নগ্নপদঘর্ষণে মসৃণ ঘাটের সানগুলা সূর্য্যালোকে ঝিক্ মিক্ করিতেছে! চারিদিকে বড় বড় বাড়ী ও দেবালয়ের প্রাচীর হইতে সূর্য্যকিরণ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে, এবং মন্দির-

* "A Travers L' Inde"—খৃঃ ১৯১৩ অব্দে প্রকাশিত।

গাত্র হইতে বিশুদ্ধ কাঞ্চনদীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়া পরীদৃশ্যের ন্যায় আলোক-উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

মন্দিরটি চমৎকার; মনে মনে কল্পনা কর,—একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ইমারৎ, তল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত, বেশ অক্ষুণ্ণ অক্ষত, মধ্যস্থানে একটি ছোট গম্বুজ চূড়াদেশে স্থাপিত, চারি পার্শ্বে চারিটি ক্ষুদ্র ফাঁক্-বিশিষ্ট সুন্দর অট্টচূড়া, তাহাতে আবদ্ধ ধাতব ঘণ্টিকা-গুলি- অনন্ত আকাশতলে তীব্ররূপে ধ্বনিত হইতেছে। একটা প্রশস্ত বাঁধের উপর দিয়া তথায় উপনীত হইলাম—ইহা একপ্রকার সেতু, তীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত—'মোজেয়িক্'-কাজ করা এই সেতু-পথের দুই ধারে খোদিত বারাণ্ডা; ইহা বিচিত্র বর্ণের গঠনে বিভূষিত; সেতুর যে প্রান্তটি ঘাটে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে হস্তিদন্তখচিত একটি জমকালো রৌপ্যময় দ্বার।

যে সোনার কথা বলিয়াছি, উহা মোটা সোনার পাত, এবং যে রূপার কথা বলিয়াছি ঐ রূপা তাঁবার মত ঢালাই করা। শিল্প-অলঙ্কারগুলি, দশপুরুষ-পরম্পরাগত শিল্প-কলার ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া আমি এইরূপ কথা কচিৎ কখন বলিতে সমর্থ হইয়াছি।

সর্ব্বজনপ্রশংসিত প্রাসাদ, প্রসিদ্ধ সমাধি-মন্দির, মস্‌জিদাদি, রাশি রাশি দেবমন্দির অনেক সময়ে আমাকে প্রতারিত করিয়াছে! কোন পরমাশ্চর্য্য ইমারৎ, যাহা কল্পনায় অতুলনীয় বলিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, আসল জিনিসটা যখন দেখিলাম, তখন স্থূল বলিয়া মনে হইল:—(প্রাচীরগুলা পুরাতন ইঁটের), কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তবৎ (চূণের পোঁচ দেওয়া, অল্পবিস্তর রং করা, সর্ব্বত্রই চটা-উঠানো) বিশেষতঃ নির্দ্দয় কালপ্রভাবে বিষম ভগ্ন-দশাগ্রস্ত।

কিন্তু এখানকার এই পরমাশ্চর্য্য মন্দিরটি একটি রত্ন বিশেষ; সুন্দররূপে খোদিত, সুন্দর রূপে সন্নিবেশিত এবং যারপরনাই সমুজ্জল।

অভ্যন্তরে,—জরির কাজ-করা লাল মখ-মলের একটি চন্দ্রাতপ-তলে, কতকগুলি পুরোহিত একখানি গ্রন্থের চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া আছে। আমাদের 'ফোলিও' (Folio) আকারের গ্রন্থের অপেক্ষা চতুর্গুণ বড় এবং সেই অনুপাতে স্থূল। গ্রন্থখানি মেজের গালিচার উপর খোলা রহিয়াছে; একটা জরির কাপড়ে উহার কিয়দংশ ঢাকা। মধ্যে মধ্যে, একজন পুরোহিত খাড়া হইয়া, কতক-গুলি শব্দ পাঠ করিবার জন্য ঐ কাপড়ের একটি কোণ উঠাইয়া ধরিতেছে, তাহার পর আবার ভক্তিভাবে স্বস্থানে পুনঃ স্থাপন করিতেছে। তিনজন বাদক,—দুইজন পাখোয়াজিয়া ও একজন সারেঙ্গী; উহারা বেশ একটি মনোরম ছন্দে অবিরাম বাজাইয়া যাইতেছে। ভক্তেরা দলে দলে আসিয়া ঐ বৃহৎ গ্রন্থের সম্মুখে যোড়হস্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিতেছে এবং সম্মুখে বিস্তৃত গালিচার উপর এক একটি মুদ্রাখণ্ড নিঃক্ষেপ করিতেছে। পাওনার অঙ্কটা মন্দ নহে। পয়সা, আনা, টাকা অজস্র বর্ষিত হইতেছে। ইহার জন্যই কি, পুরোহিতেরা, বাদকেরা, ভক্তেরা, এরূপ সহাস্যবদন ও হর্ষোৎফুল্ল? আমি ঘরের যে কোণটিতে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে ঘরের দৃশ্যটি অতি রমণীয়—ঘরটি স্বর্ণভূষণে ও

চিত্রাদিতে বিভূষিত। একটি সূর্য্যরশ্মি তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হইয়া, ধূপ-ধূনার তরঙ্গায়িত লঘু ধূমরাশিকে উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। যেন নিজ গৃহের মধ্যেই অধিষ্ঠিত, এইরূপভাবে কপোতেরা পক্ষসঞ্চালন পূর্ব্বক গৃহ-আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ভক্তেরা যেরূপভাবে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতেছে, সেই ভঙ্গিটিতে বেশ একটু শ্রী আছে।

যাহারা গ্রন্থকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে একটি পুরোহিত গাত্রোত্থান করিয়া গম্ভীর ভাবে সাদা ফুলের একটি মালা আমাকে দিবার জন্য আসিল। তাহার সযত্ন-বিন্যস্ত দীর্ঘ কেশকলাপ স্কন্ধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি তাহার বক্ষকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ঐ মালা আমার গলায় পরাইয়া দিল—আমি নিবারণ করিতে পারিলাম না। আর আমি নিবারণ করিবই বা কেন? তাহার ভঙ্গিটি অতি সুন্দর এবং আমি যে একটি টাকা গালিচার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, আমার বিশ্বাস, উহাই এই শিষ্টাচারের একমাত্র কারণ নহে। আবার, প্রধান পুরোহিতের তরফ হইতে সে আমাকে একখণ্ড মিছরিও দিল, তাহাও আমি আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম।

তাহার পর আমাদের মধ্যে বাক্যালাপ চলিতে লাগিল। তাহাদের মন্দিরটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছে,—ইহা একজন দোভাষীর মুখ দিয়া তাহাকে জানাইলাম। এই কথায় প্রীত হইয়া, সে ঔৎসুক্য ও ভদ্রতার সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি যুরোপীয় কোন্ জাতিভুক্ত, আমার কি ব্যবসায়। সে আমার ধর্ম্মের কথা পাড়িল এবং স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। "সাহেব, তুমি আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ—আমাদের "আদিগ্রন্থ"—দেখিতে আসিয়াছ? তুমি এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ; কেননা এই সকল গ্রন্থের ভাষাপ্রয়োগ-পদ্ধতি বুঝিতে পারে এরূপ লোক আমাদের মধ্যেও অতি অল্প আছে। কিন্তু ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়; কেননা, ঐ গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর অনেক কথা লেখা আছে—সমস্তই ধ্রুব সত্য;—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; তাঁহাকেই আরাধনা করিতে হইবে, কোন প্রতিমাকে নহে। আত্মা অমর, ঈশ্বর পর্য্যন্ত উত্থিত হইবার জন্য, এই আত্মা বহু জন্মের মধ্য দিয়া, যুঝাযুঝি করিতেছে। কেবল চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই তাঁহার নিকট উপনীত হওয়া যায়। হৃদয় বিশোধিত হইলে, ঈর্ষ্যাকে জয় করা যায়। রসনা বিশোধিত হইলে, মিথ্যাবাদকে জয় করা যায়। চক্ষু বিশোধিত হইলে, কামকে জয় করা যায়। কর্ণ বিশোধিত হইলে, নিন্দাবাদকে জয় করা যায়।

এক্ষণে সূর্য্য যথেষ্ট উচ্চে উঠিয়াছে। বাহিরে, এই সূর্য্যের প্রখর কিরণে, সরোবরটি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। এইবার একটু ত্বরা করিতে হইবে; অটলের ধ্বজমন্দিরটি দেখিতে যাইতে হইবে। এখান হইতে খুব নিকটে। ঐ ধ্বজমন্দির হইতে এক দৃষ্টিতে সমস্ত সহরের দৃশ্যটি দেখা যায়। এই ধ্বজমন্দিরটি দুই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয়। ইহা নানকের সমাধি-মন্দির এবং অটলের স্মৃতিমন্দির। এই অটল, এক শিশুর বিনিময়ে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

উহার উপর হইতে—প্রায় ১২৫ হস্ত পরিমাণ উচ্চ—দৃশ্যটি পরীদৃশ্যের ন্যায়। প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি স্বর্ণচূড়ার উপর আসিয়া নিপতিত হয়। শুভ্রবর্ণ সরসী-তলের মধ্যস্থলে উহা ম্লান-পীতবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয়; এবং ঐখান হইতে বীথিগুলি, সরোবর-অভিমুখী পথগুলি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পথগুলি,—চিত্রের পশ্চাদ্‌ভূমির ন্যায় ঘন-ঘোর উদ্ভিজ্জরাশি হইতে বাহির হইয়া এই পুণ্যনগরীর প্রাচীরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

কোথাও কোথাও, ধনবান্ শিখদিগের বাগান বাড়ী দেখা যাইতেছে; উহারা উৎ-সবাদির সময় ঐখানে কয়েক দিবস অতি-বাহিত করে। কোথাও বা গৃহের সমতল ছাড়াইয়া মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে; কোথাও বা একটি মস্‌জিদ্; আর একটি সরোবর; আরও দূরে একটি অসমান-আকৃতি চত্বর; কিন্তু এই ক্ষুদ্র স্বর্ণমন্দিরটির উপরেই দর্শকের ঔৎসুক্য সতত কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে;—রত্নাধারের মধ্যে যেন একটি সুকুমার বহুমূল্য রত্ন নিহিত।

২

অমৃতসর হইতে ছাড়িবার পূর্ব্বে, এখান-কার কোন সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন, বা কৌতুক-সামগ্রী বা কোন টুকি-টাকি দ্রব্য সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার পরিচারক (boy) গালিচা ও পুরাতন জিনিসের দোকান্‌দার চম্বা-মলের নাম করিল।

আমরা তখনই সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম; আমার 'বয়' একটা দরজা ঠেলিয়া খুলিল; আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

চূণ-কাম করা দুটি ছোট ঘর,—প্রায় খালি। আমাদের দোকানের টুকি-টাকি দ্রব্য স্মরণ করাইয়া দেয়,—এখানে এমন কিছুই নাই; দেয়ালের ধারে লম্বালম্বি, গোটানো গালিচাগুলা সাজান রহিয়াছে। একটা খোলা আলমারীতে কতকগুলি "কৌতুক-সামগ্রী" (curiosities); একটা কোণে, টেবিলের উপর, একটা বড় বুদ্ধমূর্ত্তি গূঢ়অর্থ সূচক পদ্মের উপর উপবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করত ঈষৎ হাস্য করিতেছে।

আমাকে দেখিয়া, তিনটি বালক অগ্রসর হইল; ইহারা চম্বামলের মুহুরী;—নতনেত্রে, যোড়হস্তে, শোভনভঙ্গিতে একটু নতকায় হইয়া, আমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতে লাগিল; এবং সাদর সঙ্কেতে আমাকে দ্বিতীয় ঘরটিতে আসিবার জন্য আহ্বান করিল। চম্বামল ঐ ঘরে থাকেন।

লোকটি স্থূলকায়; একটা আরাম-কেদারায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে এবং গড়্‌গড়ার দীর্ঘ নল মুখে দিয়া তামাকু সেবন করিতেছে। এক ক্ষুদ্রকায় মুসলমান তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছে; এবং আর দুইজন তাহাকে আমোদ দিবার জন্য বাদ্য বাজাইতেছে।

অবশ্য এই নাট্যদৃশ্যটি পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া রাখা হয় নাই। কাজ-কর্ম্ম করিবার কি মধুর রীতি! আমাদের য়ুরোপের বণিকেরা তাহাদের অমৃতসরের সহযোগীকে দেখিয়া কত না ঈর্ষ্যা করিবে!

স্থূলকায় লোকটি আমাকে দেখিতে পাইয়া, একটু হাসিমুখে আমার দিকে মুখ

ফিরাইল। এ কি! লোকটা, ওর বুদ্ধমূর্ত্তিরই মত যে কুৎসিৎ।—সে ইংরাজিতে বলিল :—

—Step in, Sir ··you will see my shop ? I feel quite honoured. This way...please to follow me...

অপ্রত্যাশিত লঘুগতি-সহকারে চন্দামল, তাহার গালিচা-কারখানার মধ্য দিয়া, আমার আগে আগে চলিতে লাগিল। আহা! কি সুন্দর দৃশ্য! ··একটি সরু গলি-পথ, ১০০ হাতের কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ; বামদিকে একটি দেয়াল, দক্ষিণে অসংখ্য খোপের মত ঘর, সেইখানে গালিচার তাঁতগুলা খাড়া রহিয়াছে; প্রত্যেক তাঁতের সম্মুখে ৪।৫ জন অল্পবয়স্ক লোক—বালক ও বালিকা—বসিয়া আছে। এক প্রকার নিস্তব্ধ কর্ম্মতৎপরতা ঐ সকল মানব-যন্ত্রদিগকে যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছে। কার্য্যপ্রকরণটি বড়ই কৌতুকাবহ; প্রত্যেক খোপে, প্রধান কারিগর অনুচ্চস্বরে একটা আদেশবাক্য উচ্চারণ করিতেছে; তাহার অর্থ,—"একটা লাল পংক্তি", "একটা নীল পংক্তি", এবং তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ কারিগরদিগের কর্তৃক পালিত হইয়া নুন-নক্সাটা অল্পে অল্পে গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের প্রণালী স্বতন্ত্র; আমাদের কারিগরেরা একটা স্থূল ধরণের নমুনা চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তাহারই অনুসরণ করে।

উহাদের কার্য্যপ্রকরণ দেখিবার সময়, দর্শক আর কোন দিকে মন দিতে পারে না; উহাই দর্শকের মনকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলে। এই তাম্রবর্ণ সরু-সরু আঙ্গুলগুলির ক্ষিপ্রকারিতা দর্শককে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে। উহাদের মধ্যে খুব ছোট-ছোট ছেলেও আছে, তাহারা ভারী গম্ভীর ও কার্য্য-গৌরবে গর্ব্বিত।

—— ... কিন্তু চন্দামল্, এই গালিচাগুলা দেখিতে কদাকার···

—তা'সত্ত্বেও আমি ত সাহেব খুব উচ্চমূল্যে—বিশেষত বিলাতে—এইগুলা বিক্রয় করি; এই দেখ, আজই রাত্রে এই তিন বাক্স প্যারিসের জন্য চালান হইবে। প্রতি সপ্তাহে অতগুলা করিয়া বাক্স প্যারিসের বড় বড় দোকানে পাঠাইয়া থাকি...

...একই কথা! তার চেয়ে, পারস্যের পুরাতন গালিচার নকল কর না কেন তোমরা? পারসীক গালিচার রং-এর কেমন সামঞ্জস্য, কেমন মাধুর্য্য; দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, ও তাহার উপর বসিয়া ঈশ্বর-আরাধনা করিতেও বেশ। এই রকম মূঢ় ধরণের গালিচায় বসিয়া তুমি কি ধ্যানধারণা করিতে পার?

——না সাহেব, তা পারি না!···কিন্তু ও জিনিস নকল করিতে অনেক খরচ পড়ে। আচ্ছা যদি পছন্দ না হয়, আমার ও-গুলি রেখে, এইগুলি লও। এই গালিচাগুলি সার্থবাহেরা কাবুল ও পেশোয়ার পর্য্যন্ত আনিয়াছিল;—খুব পুরাতন; অনেক লোকের হাঁটু উহাতে পড়িয়াছে...এই দেখ। এই ছোট হল্‌দে গালিচা, আর এই লাল গালিচা,—মূল্য ত্রিশ টাকা মাত্র··· ···

··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

অনেক কথার পর, অবশেষে আমি ত্রিশ টাকা মূল্যেই ঐ দুইটি গালিচা লইলাম। ত্রিশ টাকার বিনিময়ে এমন চমৎকার বেমালুম-মিশ্রিত রং-এর পুরাতন জিনিস—সে হিসাবে মূল্য বাস্তবিকই খুব কম! তাহার বুদ্ধেরই মত দেখিতে সেই চন্দামল্, আর আমি—আমরা দু'জনেই প্রীত হইলাম···

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

গৌড়ীয় ভক্তগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন, গৌরের বৃন্দাবনযাত্রা, শান্তিপুর-গমন, রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ, রঘুনাথ দাসের সহিত সাক্ষাৎ

একদিন অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের আবাসে উপস্থিত হইলে, গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা হইতে আসিলেন?"

অদ্বৈত—জগন্নাথ দেখিয়া আসিতেছি।

গৌর—আপনি জগন্নাথ দর্শন করেন কিরূপে বলুন দেখি।

আচার্য্য—কেন, দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করি।

গৌর—আমি ওরূপভাবে ঠাকুর দেখি না। প্রদক্ষিণ করিলে কিছুক্ষণ ঠাকুরের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ক্ষণেকের অদর্শনও সহ্য করিতে পারি না। তাই প্রদক্ষিণ না করিয়া অপলক নয়নে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।

এইরূপ নানা আলাপে গৌর গৌড়ীয় ভক্তগণের সহবাসে চারিমাস কাটাইলেন। এ চারিমাস ভক্তগণের বড় সুখেই অতিবাহিত হইল। তাঁহারা একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলেই গৌরকে খাওয়াইলেন। গৌর তাঁহাদিগের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার করিতেন। চারি মাস তিনি তাঁহাদিগের সহিত নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিলেন; জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহাদিগের সহিত গোপীবেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিলেন; বিজয়া দশমীর দিন তাঁহাদিগকে বানর সাজাইয়া ও নিজে হনুমান্ সাজিয়া রামলীলা অভিনয় করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সহবাসে গৃহের কথা ভুলিয়া রহিলেন।

অবশেষে বিদায়ের দিন সমাগত হইল। ভক্তগণ শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। গৌর সুমিষ্ট বচনে সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় আসিয়া চারিমাস আমার সহিত নীলাচলে অবস্থান করিবে; এখন দেশে ফিরিয়া যাও।" অদ্বৈতাচার্য্যকে কহিলেন, "আচার্য্য, দেশে তোমার জন্য প্রচুর কর্ম্ম পড়িয়া আছে; তুমি দেশে ফিরিয়া গিয়া আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ কর।" নিত্যা-

নন্দকে কহিলেন, "নিতাই, তোমাকে গৌড়-দেশে যাইতে হইবে। রামদাস, গঙ্গাধর প্রভৃতি ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তুমি তথায় প্রেমভক্তি--প্রচারের ভার গ্রহণ কর।" অতঃপর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমার প্রাঙ্গণ আমার নিত্য-বিহারভূমি। আমি প্রত্যহ তথায় নৃত্য করিব; কিন্তু তুমি ভিন্ন কেহ আমায় দেখিতে পাইবে না।" একখানা বস্ত্র, শ্রীবাসের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমার মাতাকে এই বস্ত্র দিয়া বলিবে, তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া যে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, ইহাতে আমার ধর্ম্মনাশ হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে আছি। মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ-দর্শনাভিলাষে আমি তাঁহার নিকট যাই। কিন্তু তিনি দেখিতে পান না। একদিন নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করত ইষ্টদেবতাকে নিবেদন কালে আমাকে স্মরণ করিয়া তিনি কাঁদিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতে পারিয়া, সেই আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বালগোপাল তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল; তাঁহাকে বলিও আমিই গিয়া খাইয়া আসিয়াছিলাম।" শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, নরহরি ও মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ভক্তগণের মধ্যে ছিলেন। মুকুন্দ ও নরহরি দুই সহোদর। গৌর হাসিতে হাসিতে মুকুন্দকে কহিলেন, "মুকুন্দ, তুমি রঘুনন্দনের পুত্র না রঘুনন্দন তোমার পুত্র?" মুকুন্দ কহিলেন, "রঘুনন্দন হইতেই আমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছি। সুতরাং রঘুনন্দন পিতা, আমরা তাহার পুত্র।" তখন গৌর কহিলেন, "মুকুন্দ ছিলেন ম্লেচ্ছরাজার বৈদ্য। একদিন এক ভৃত্য ম্লেচ্ছরাজার মাথার উপর এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী ধরিয়াছিল। মুকুন্দ সেই শিখিপুচ্ছ দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। মুকুন্দের মত ভক্ত বিরল।" কিন্তু মুকুন্দ ও রঘুনন্দনকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে গৌর আদেশ করিলেন। নরহরি তাঁহার নিকট থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া গৌর ভক্তগণকে কহিলেন, "মুরারির ভক্তি অনন্য-সুলভ। ইনি রঘুনাথমন্ত্রের উপাসক। একদিন আমি তাঁহাকে বারবার বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজনা করিতে মত লওয়াইলাম। কিন্তু গৃহে গিয়া কিরূপে তিনি রঘুনাথের সেবা ত্যাগ করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত হইলেন। সমস্ত রাত্রি কাঁদিতে কাঁদিতে গেল,—পরদিন প্রত্যূষে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "আমি রঘুনাথের চরণে মাথা বেচিয়াছি। তাহা আর ফিরিয়া লইতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার ও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব কিরূপে? তুমি দয়া করিয়া এইরূপ কর—যেন আমি এখন তোমার সম্মুখে মরিয়া এই দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই।" এই ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলাম, "গুপ্ত, তোমার ভজনই সার্থক। প্রভুচরণে তোমারই মত দৃঢ়প্রীতি প্রভুর গ্রাহ্য। প্রভু যদি পদ ছাড়াইয়া নিতে যান, তবু সে পদ ছাড়িয়া দিতে সেবক পারে না। আমি পরীক্ষা করিবার জন্যই তোমাকে রঘুনাথমন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম। তুমি সাক্ষাৎ হনুমান্—তুমি

কেন শ্রীরামের চরণ ত্যাগ করিবে।” তখন বাসুদেবকে আলিঙ্গন দিয়া গৌর তাহার গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—

“জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার,
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার।
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে,
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লইয়া মুঞি করোঁ নরকভোগ,
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥”

গৌর কহিলেন, “ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কখনও ভক্তবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। তুমি যখন ব্রহ্মাণ্ডের জীবের উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছ, তখন সকলেই উদ্ধার লাভ করিবে।”

কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরচরণে প্রণাম করিয়া ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেবল গদাধর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর গৌরের সহিত নীলাচলে রহিলেন।

ভক্তগণ প্রস্থান করিলে সার্ব্বভৌম একদিন গৌরকে মিনতি করিয়া কহিলেন, “আমার গৃহে মাসাবধি ভিক্ষা করিতে হইবে।” গৌর কিছুতেই রাজী হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিনের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী পরম যত্নে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া গৌরকে পরিবেশন করিলেন। অত্যধিক প্রীতিবশতঃ অত্যধিক দ্রব্য গৌরের পাত্রে পরিবেশিত হইল। গৌর তাঁহাদের ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া ভোজনে বসিলেন। এমন সময় সার্ব্বভৌমের জামাতা, তাঁহার কন্যা ষাঠীর স্বামী অমোঘ ভট্টাচার্য্য ভোজনগৃহের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “বাপরে খাওয়া দেখ, ১০।১২ জনের ভাত সন্ন্যাসীটা একা খাচ্ছে।” সার্ব্বভৌম এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন এবং একলাঠি হস্তে লইয়া তাহাকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। অমোঘ পলাইয়া গেল। সার্ব্বভৌম-গৃহিণীও জামাতার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন “অমন পাষণ্ডের স্ত্রী হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, ষাঠী বিধবা হউক।” গৌর হাসিতে হাসিতে তাহাদের ক্রোধ শান্তির জন্য নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বজনকর্ত্তৃক প্রভুর অপমান হইল ইহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌম মহা দুঃখিত হইলেন। ভোজনান্তে সার্ব্বভৌম গৌরকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন জামাতার আর মুখদর্শন করিব না। এদিকে অমোঘ পলায়ন করিয়া দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই রাত্রিতেই তাহার বিসূচিকা রোগ হইল। গৌর সেই সংবাদ শুনিয়া ত্বরিতে তাহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাহাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া অবশেষে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। অমোঘ নিরাময় হইয়া পরম কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরে গৌর রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমের নিকট বৃন্দাবন গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা বিচ্ছেদাশঙ্কায় কহিলেন—“সম্মুখে রথযাত্রা, রথযাত্রার পরে গমন করিও।” রথযাত্রা অতিক্রান্ত হইলে গৌর স্বীয় অভিপ্রায় পুনরায় ব্যক্ত করিলেন।

তখন তাঁহারা কহিলেন—"কার্ত্তিক মাসে যাইও।" কার্ত্তিক মাসে দুরন্ত শীত বলিয়া আপত্তি হইল। এইরূপে চারি বৎসর গেল। পঞ্চমবৎসরে গৌর দৃঢ়ভাবে স্বীয় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিলেন। এবার আর ওরূপ আপত্তির কোনও ফল হইল না। বিজয়া দশমীর পর দিন গৌর বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে পুরী ত্যাগ করিলেন। কটকে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার গমনের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। রামানন্দ, স্বরূপ-গদাধর ও অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত কটক পর্য্যন্ত গৌরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কটক ত্যাগ কালে গৌর গদাধরকে পুরুষোত্তমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া কহিলেন—"তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। তাহা ত্যাগ করিয়া আমার সহিত আসা তোমার অকর্ত্তব্য।"

পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে, ইহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে, কোটিসেবা ত্বৎপাদদর্শন॥
প্রভু কহে,সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ।
ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥
পণ্ডিত কহে, সব দোষ আমার উপর॥
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর।

গদাধর গৌরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী চলিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাকে ডাকিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৌর কহিলেন—

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ,
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥

বলিয়া গৌর নৌকায় আরোহণ করিলেন। গদাধর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া পুরী লইয়া গেলেন। রামানন্দ যমুনা পর্য্যন্ত গৌরের সঙ্গে গিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৌর উড়িষ্যা দেশের সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে, বঙ্গদেশীয় এক যবন-রাজা তাঁহার অলৌকিক ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হরিনাম প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। যবনরাজ পিছলদা পর্য্যন্ত গৌরের সহিত গমন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আসিলেন। গৌর অবশেষে পাণিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একদিন অবস্থান করিলেন। তথা হইতে কুমারহট্টে শ্রীনিবাসের গৃহ হইয়া শিবানন্দ সেনের গৃহে ও তৎপরে বাসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্তি অপনোদন করিলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক তাঁহার দর্শনাভিলাষে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৌর গৃহমধ্যে ছিলেন। সকলে তাঁহাকে দেখাইবার জন্য বিদ্যাবাচস্পতির চরণ ধরিয়া কাকুতি করিতে লাগিল। গৌর বাহিরে আসিলেন—তখন তাঁহার দুই নয়নে অবিরল জলধারা, মুখে হরিধ্বনি, দুই হস্ত উত্তোলিত। ভক্তগণ সে মূর্ত্তি দেখিয়া পাগল হইল। সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং লক্ষ কণ্ঠ হইতে "পাপিষ্ঠ আমাকে উদ্ধার কর" যুগপৎ এই প্রার্থনা সমুত্থিত হইল।

"শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক" বলিয়া গৌর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল এবং গৌরকে দেখিবার জন্য উন্মত্তের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। অবশেষে এই জনতার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে গৌর এক রাত্রিতে পলায়ন করিয়া কুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন। পরদিন অগণিত লোক আসিয়া যখন শুনিল গৌর পলায়ন করিয়াছেন—তখন প্রথমে তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিল না; অবশেষে সকলে বিদ্যাবাচস্পতিকে তিরস্কার করিতে লাগিল। বাচস্পতি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে গৌর কুলিয়া গমন করিয়াছিল। তিনি সেই কথা বলিয়া সকলের সমভিব্যাহারে কুলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর কুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সকলে তথায় তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। কুলিয়ায় কয়েক দিন অবস্থানপূর্ব্বক গৌর বহুলোককে হরিনাম দান করিলেন। এইখানে দেবানন্দ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ব্ব অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। গৌর তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিয়া ভাগবত অধ্যাপনা করিবার আদেশ করত বিদায় দিলেন।

কুলিয়া হইতে গৌর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। পুত্রবিধুরা শচীদেবী আসিয়া তথায় পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কতিপয় দিবসান্তে গৌর গৌড়নগরের সন্নিহিত রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনাশায় তথায় উপনীত হইল।

হোসেন সাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। গৌরের রামকেলি আগমন বাদশাহের কর্ণগত হইল। বাদশাহ তাঁহার হিন্দু অমাত্যদিগকে গৌরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হিন্দুসভাসদ্‌গণ প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। হিন্দু-বিদ্বেষী যবনরাজ পাছে সন্ন্যাসীর কোনও অনিষ্ট সংকল্প করেন এই ভয়ে তাঁহারা কহিলেন, "কোথাকার এক ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থে চলিয়াছে, তাহার সহিত দুই চারি জন লোক আসিয়াছে। বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন গুণ তাহার নাই।" কিন্তু গৌরের কথা শ্রবণ করিয়া বাদশাহের মনে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তিনি কাজী ও কোটালগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন—যেন তাঁহার প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত না হয়। এই হোসেন শাহই উড়িষ্যায় বাসুদেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

বাদশাহের ব্যবহারে হিন্দুসভাসদ্‌গণ প্রীত হইলেন, কিন্তু অস্থিরমতি রাজা কখন স্বীয় আদেশের প্রত্যাহার করে, এই ভয়ে তাঁহারা গৌরের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ত্বরায় রামকেলি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। গৌর তাঁহাদের উপদেশ অবহেলা করিয়া তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিলেন।

বাদশাহের হিন্দুপারিষদ্‌গণের মধ্যে রূপ ও সাকর মল্লিক নামক দুই সহোদর ছিলেন। সাকর মল্লিক দবীর-খাস পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই গৌরের নবদ্বীপলীলা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাকর কয়েক বার কয়েকখানা চিঠিও গৌরকে

লিখিয়াছিলেন। গৌরের রামকেলি অবস্থান-কালে একদিন দুই ভ্রাতায় আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, এবং নানা প্রকার দৈন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। সাকর নানাবিধ স্তব করিয়া কহিলেন—

ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বাঁধিয়া,
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া।
আমা উদ্ধারিতে যদি দেখাও নিজ বল,
পতিতপাবন নাম তবে সে সকল।

তথন—

শুনি মহাপ্রভু কহেন, শুন দবীরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্র দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রীদ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহি বারে বারে॥
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

পরপুরুষে আসক্ত নারী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও মনে মনে জারসঙ্গ-জনিত সুখেরই আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনন্তর গৌর কহিলেন "আমি তোমাদিগকে দেখিবার জন্যই এথানে আসিয়াছি—নহিলে গৌড়ে আমার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তোমরা বহু জন্ম যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই তোমাদিগের উদ্ধার সাধন করিবেন; এখন গৃহে গমন কর।" গৌর উভয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর উভয়কে আলিঙ্গন দান করত ভক্তগণকে কহিলেন "তোমরা ইহাদিগকে অনুগ্রহ কর।" রূপ ও সনাতন তথন সকল ভক্তের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে সনাতন বিনীত ভাবে কহিলেন "প্রভু! গৌড়াধিপতি যবন, যদিও বর্ত্তমানে সে তোমার প্রতি ভক্তিমান্ আছে, তথাপি তাহার মনের ভাব যে পরিবর্ত্তিত হইবে না তাহার নিশ্চয় নাই। আর তীর্থযাত্রায় এত লোকসংঘট্টও ভাল নহে। যদিও তোমার নিজের ভয়ের কোনই কারণ নাই, তথাপি লৌকিক লীলা লৌকিক ভাবেই হয়। তাই নিবেদন করিতেছি—এরূপভাবে বৃন্দাবনে না গিয়া, এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

পরদিন রামকেলি ত্যাগ করিয়া গৌর কানাইর নাটশালা গ্রামে গমন করিলেন। তথায় সনাতনের উপদেশ মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন "এত লোকজন সহ বৃন্দাবন যাওয়া বাস্তবিকই বিধেয় নহে।" এই ভাবিয়া গৌর বৃন্দাবনগমনের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন এবং সত্বরই শান্তিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শান্তিপুরে গৌর দশদিন অবস্থান করিলেন। এখানে সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। গোবর্দ্ধন মহা ধনী। তিনিও তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্য সৎকুলসম্ভূত, সদাচার-পরায়ণ ও পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। নদীয়ায় এমন কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না যিনি হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের বৃত্তি ভোগ করিতেন না। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্রকে উভয়

ভ্রাতা বিশেষ ভক্তি করিতেন। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র। শৈশব হইতেই রঘুনাথ সংসারে উদাসীন ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গৌর প্রথম যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, রঘুনাথ তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে নানারূপ বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া রঘুনাথ পাগলের মত হইলেন। গৃহ তাঁহার নিকট কারাগারের মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি এই কারাগার হইতে উদ্ধার লাভের জন্ম কয়েকবার পলায়ন করিলেন— কিন্তু কয়েকবারই পিতৃ-প্রেরিত লোক কর্তৃক ধৃত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে গৌর শান্তিপুরে আগমন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ পিতার নিকট তদ্দর্শনে গমন করিবার জন্ম অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং অনেক অনুনয়ের পর অনুমতি লাভ করিলেন। শান্তিপুরে আগমন করিয়া রঘুনাথ গৌরের নিকট নীলাচলে বাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং পিতার শৃঙ্খল ছেদন করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু গৌর তাঁহার সংসারত্যাগের সংকল্পের অনুমোদন করিলেন না ; তিনি কহিলেন—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধু কুল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর, লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

রঘুনাথের সংসারে প্রত্যাগমন করিবার নিতান্ত অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া গৌর অবশেষে কহিলেন "এখন গৃহে যাও, আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইব, তখন তথায় গিয়া আমার সহিত মিলিত হইও।" রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং প্রভুর আদেশে পূর্ব্ব চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

গৌর বন্ধুবান্ধবগণের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপলা

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্মোৎসবে

গঙ্গা ও হিরণ্যবতীর সঙ্গমস্থলে বিশাল পাটলীপুত্র নগর। উপকণ্ঠভাগ পরিত্যাগ করিলেও দীর্ঘে বিংশতি এবং প্রস্থে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত এই মহানগরের চারিদিকে চারিশত হস্ত পরিসর, বিংশতি হস্ত গভীর, জলপরিপূর্ণ পরিখা। পরিখার প্রান্তে প্রান্তে সমস্ত নগর-বেষ্টিত ইষ্টক, প্রস্তর এবং বিশাল কাষ্ঠদণ্ড-নির্ম্মিত দৃঢ়গঠিত প্রাচীর। প্রাচীর ভেদ করিয়া নগরপ্রবেশের চতুঃষষ্টি দ্বার। প্রাচীর-

শিরে পরস্পর সমদূর ব্যবধানে নির্ম্মিত সু-উচ্চ শত শত প্রহরিকক্ষ। প্রতিকক্ষে পর্য্যায়-ক্রমে নিত্যজাগ্রত বর্ম্মধারী ধনুর্ধর প্রহরী। প্রহরীর তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া লোকের নগরপ্রবেশ অথবা নগর হইতে বহির্গমন অসম্ভব।

আজ রাজাধিরাজ অশোকদেবের জন্মদিন। নগরে মহা উৎসবঘটা। প্রতি প্রহরিকক্ষশিরে পতাকা। নগরপ্রবেশের প্রতিদ্বারের উভয় পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ, তাহাতে আম্র, অশোক অথবা অশ্বত্থপল্লব। ফুলমালা পত্রপল্লবে দ্বারের অপূর্ব্ব শোভা। প্রতি প্রহরিকক্ষে, প্রতি দ্বারপার্শ্বে বাদিত্র। মৃদঙ্গ, ভেরি, পটহ, খরতাল, ঝঝর, মর্দ্দলের উচ্চরবে সমস্ত নগর কোলাহলময়।

সমস্ত নগর সজ্জিত। প্রতিগৃহচূড়ে চীনাংশুক-পতাকা, গৃহদ্বারে ফুলপাতার মালা, মঙ্গলঘট। সমস্ত পথে লোকের সমাবেশ। ধৌত উদ্গমনীয়, ক্ষৌম, কৌশেয় নানাবর্ণের বস্ত্রপরিহিত উদ্‌গ্রীব উল্লসিত লোকসঙ্ঘ রাজপুরী অভিমুখে চলিয়াছে

রাজপুরীর সম্মুখে অতি প্রশস্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ। প্রাঙ্গণের প্রান্তে নানা ভাগে বিভক্ত রঙ্গভূমি। ভীমকায় মল্ল, যষ্টিক, খড়্গাধারী, কুঠারী, মুদ্গরী, প্রাসিক যোদ্ধারা অমানুষিক বল, অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রকৌশল দেখাইয়া সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। ষণ্ডে ষণ্ডে, গণ্ডারে গণ্ডারে, মহিষে মহিষে, গজে গজে, মেষে মেষে ভয়ানক যুদ্ধ। মল্লগণের আস্ফালন, হুহুঙ্কার, বাহুর আস্ফোটন, দর্শক-বৃন্দের উৎসাহধ্বনি অথবা টিটকারী, বিজয়ী দ্বন্দ্বীর বন্ধুবান্ধবের উল্লাস-কোলাহল, বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর শুভাকাঙ্ক্ষিগণের আপত্তি ও প্রতিবাদ; যুযুৎসু পশুগণের উচ্চ গর্জ্জন, ভয়াবহ সংঘর্ষ; পলায়মান পশুর বিকট আর্ত্তনাদ, বিজয়ীর হুহুকার শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত; ধরাতল কম্পিত।

অঙ্গনের স্থানে স্থানে সুবৃহৎ সুশোভন পট্টাবাস। তাহাতে নট-নটী, গায়ক-গায়িকা, বৈণিক, বৈণবিক, মৌরজিকগণ নৃত্যগীতবাদ্য-শত শত শ্রোতা দর্শকের চিত্ত উৎফুল্ল করিতেছে। স্থানে স্থানে বিচিত্রবেশ ভণ্ডের কৌতুক অথবা বাক্‌চাতুর্য্যে শ্রোতার অট্টহাস্য, করতালি; কোন স্থানে মায়াবী ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত কর্ম্মে মুগ্ধ দর্শকের স্তম্ভিতদৃষ্টি। শত সহস্র নাগরিক, গ্রামিক—আবালবৃদ্ধ—আজিকার মহোৎসবঘটায় উন্মত্ত, উল্লসিত।

যাগ, যজ্ঞ, পূজা, বলি, হোম, বেদপাঠ, অভিষেক-ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। রাজাধিরাজ স্বর্ণরৌপ্য, মণিরত্নে তুলিত হইয়াছেন। তুলিত স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিরত্ন—সহস্র সহস্র মুদ্রা, রাশি রাশি বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে। রাজাধিরাজের মঙ্গলকামনায় অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, হোতা, ঋত্বিক্, স্নাতক, শ্রোত্রিয়, সাগ্নিক, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, সদস্য, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, ভট্ট, ভিক্ষু, অন্ধ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, দুঃস্থ, দরিদ্রের জয়োচ্চারণ-শব্দে সমস্ত ভূভাগ কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যভাগে রাজসভা। ইষ্টক প্রস্তর কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি বৃহৎ সভাগৃহের স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চ চূড়া হইতে বিশাল রাজপতাকা বায়ুস্রোতে তরঙ্গায়িত হইতেছে। চারিদিকে

সভাগৃহ প্রবেশের চারি-দ্বার, ফুল-মালা লতা-পল্লব মঙ্গলকুম্ভে সুসজ্জিত। দ্বারমুখে বীণা-বংশী, মুরজ-মন্দিরা সংযোগে অনতি উচ্চ মধুর গম্ভীর বাদ্যধ্বনি। গৃহমধ্যে স্বর্ণবিমণ্ডিত সারি সারি উচ্চ স্তম্ভশিরে কৌশেয় চন্দ্রাতপ। তাহাতে স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মণিরত্নখচিত লতা পত্র পুষ্প-পল্লবের ছবি। প্রতিস্তম্ভগাত্রে নিপুণ শিল্পী-নির্ম্মিত স্বর্ণলতা, তাহাতে স্তবকে স্তবকে মণিমুক্তা-রত্নের ফল, আর সেই ফল ভক্ষণ-প্রয়াসী রজতপক্ষ, স্বর্ণচঞ্চু, রত্নচক্ষু বিহঙ্গ। স্থানে স্থানে ত্রিপদীর উপর রক্ষিত কৃত্রিম যুঁই জাতি কুন্দ মালতীর গাছ, কোনটীতে রৌপ্য পল্লব, সোণার ফুল; কোনটীতে স্বর্ণপল্লব, রূপার ফুল। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত, কালক হইতে কালক পর্য্যন্ত শ্লথবিলম্বিত ফুলের মালা। চন্দ্রাতপ হইতে স্বর্ণশৃঙ্খলে বিলম্বিত কত স্বর্ণ-প্রদীপ পাত্র, সন্ধ্যাসমাগমে তাহাতে গন্ধতৈল-বর্ত্তি জ্বালিত হইয়া সেই বিশাল গৃহ আলোকিত করিবে।

সভাগৃহের মধ্যভাগে স্বর্ণবিমণ্ডিত উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনে আসীন মণিরত্নখচিত মুকুট এবং মহার্ঘপরিচ্ছদ-পরিহিত রাজা-ধিরাজ মৌর্য্যকুলচূড়া অশোক দেব। কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, ললাটে হরিচন্দন-লেপ। মহারাজ অশোক কমনীয় কান্তিমান সুন্দর পুরুষ ছিলেন না; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সূচক তাঁহার তেজোময় আরক্ত আয়ত চক্ষু, দৃঢ়গঠিত বলশালী বিশাল বাহু, আর সেই উচ্চ সিংহাসনে তাঁহার স্থিরস্বচ্ছন্দ উপবেশনচ্ছন্দ রাজপ্রতিভা সূচিত করিতেছিল, জনমণ্ডলীর ভয় বিস্ময় ও অতর্কিত পূজা আকর্ষণ করিতেছিল।

মস্তকে সেবকধৃত মণিমুক্তাখচিত দীপ্তিমান রাজছত্র। রাজাধিরাজের পশ্চাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে দণ্ডায়মান চামরদণ্ডব্যজনধারিগণ, তাম্বূল করঙ্ক গন্ধমাল্যধারিগণ, মর্দ্দনদণ্ডহস্ত সংবাহক, আর অসি-ভল্লকুঠারধারী পার্শ্বরক্ষী-বর্গ।

সিংহাসন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সম্মুখে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে যথোপযুক্ত বিচিত্র মূল্যবান্ আসনে আসীন মিত্র ও করদ রাজগণ, রাজুক, রাজ-প্রতিনিধি, ধর্ম্মপাত্র, মহাপাত্র সামন্ত, মহা-সামন্ত, দণ্ডনায়ক, সচিব, সেনানী প্রভৃতি সভা-সদ্গণ; সুদূর সাগরান্তর হইতে মিশর, সিরিয়া, ইপিরাস, মাসিডোনিয়ার শ্মশ্রুমান্ বিশাল-দেহ রাজপ্রতিনিধিগণ; চেল, পাণ্ড্য, কেরল হইতে স্বাধীন ভারতীয় নৃপতিগণের প্রতিনিধি; তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ; কাশী, কোশল, চেদী, অঙ্গ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, গান্ধার, কাম্বোজ, বাহ্লিক প্রভৃতি দেশের রাজা রাজ-প্রতিনিধিগণ; বৃজি, মল্ল, লিচ্ছবিগণের প্রতি-নিধি। ভট্ট,বন্দী আপ্ত, চর,দৈবজ্ঞ, দূত,লেখক, প্রতিবেদক শ্রেষ্ঠী,সাংযাত্রিক প্রভৃতিরা পদভেদে আসীন অথবা দণ্ডায়মান। একপার্শ্বে গুরু-পুরোহিত, স্নাতক-অধ্যাপক, যতী-ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ; অপর পার্শ্বে উচ্চমঞ্চে যবনিকার অন্তরালে শুদ্ধান্তঃবাসিনী মহিলাগণের সমাবেশ; মঞ্চের নিম্নভাগে অসি-ভল্লধারিণী প্রহরিণীগণ।

রাজাধিরাজের জন্মদিন-মহোৎসবে কোন রাজা, রাজ-প্রতিনিধি অথবা সভাসদ্ শূন্য-হস্তে রাজদর্শনে আগমন করেন নাই। সিংহা-সনের সম্মুখে ধান্য যব তিল ফল ফুল

প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য, তৎপর বহুবিধ বহুমূল্য রাজভেট, উপায়ন-সামগ্রী। মণিমুক্তা হীরক বৈদূর্য্য প্রবাল কাঞ্চন; ক্ষৌম কৌশেয় রাঙ্কব নানাবিধ বস্ত্র, অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী হরিচন্দন প্রভৃতি গন্ধ; হার বলয় কেয়ূর কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার; মণিমুক্তারত্ন-খচিত কোষমুষ্টিযুক্ত দীপ্তিমান অসি, ছুরিকা; হস্তিদন্ত নির্ম্মিত, মর্ম্মর প্রস্তর-চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত দেশবিদেশ হইতে আগত বহুবিধ সুদৃশ্য মূল্যবান দ্রব্য। আর, হয় হস্তী, শকট শিবির প্রভৃতি সভাভঙ্গে রাজদর্শন জন্য সভাগৃহের বাহির চত্বরে রক্ষিত হইয়াছে।

মহাপাত্র উপস্থিত রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, সম্ভ্রান্ত সভাসদ্গণকে ক্রমে রাজাধিরাজের নিকট পরিচিত করিয়াছেন, তাঁহাদের আনীত উপায়ন-সামগ্রী সকল রাজগোচর করিয়াছেন। অশোকদেব তাঁহাদের যথাযোগ্য অভিবাদন, আপ্যায়ন করিয়াছেন। সভাভঙ্গের আর অধিক বিলম্ব নাই।

এমন সময় প্রহরীপরিরক্ষিত একটী যুবক সেখানে আনীত হইল। তাহার দৃঢ়গঠিত বলিষ্ঠ শরীর, বিশাল বক্ষ, আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাট; কিন্তু পরিধানে অতি সামান্য গ্রাম্যবেশ। যুবক সিংহাসনের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া মস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল।

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি নাম তোমার?"

"দাসের নাম মাণিক্যদেব।"

"কোন্ দেশে বাড়ী?"

"মহারাজ্য কলিঙ্গে।"

"কি প্রয়োজনে আমার রাজধানীতে আসিয়াছিলে?"

যুবক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল;—

"মহানগর পাটলীপুত্র দেখিবার সাধ কাহার না হয়? রাজাধিরাজের রাজধানী দর্শন করিতে আসা যে অপরাধের কার্য্য, তাহা জানিতাম না।"

যুবকের পরুষ বাক্যে সভাসদ্গণ বিস্মিত হইলেন। রাজাধিরাজ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন;—

"ছদ্মবেশে চোরের ন্যায় প্রবেশ, পররাজ্যের সৈন্যসংখ্যা-নিরূপণ-চেষ্টা, চিত্রে দুর্গসংস্থান অঙ্কন—সাধু অভিপ্রায়ের পরিচায়ক নহে।"

পাত্র অগ্রসর হইয়া রাজাধিরাজের হস্তে একখণ্ড চতুষ্কোণ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাহাতে বিকীর্ণ রশ্মিজাল চিহ্নযুক্ত গোলাকার সূর্য্যমূর্ত্তি, নিম্নভাগে সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন। রাজাধিরাজ সেই মুদ্রাঙ্কিত স্বর্ণখণ্ড দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"এখানি কি?"

যুবক সসম্ভ্রমে মস্তক নমিত করিয়া সেই মুদ্রাঙ্কিত সূর্য্যধ্বজ স্বর্ণখণ্ডে নমস্কার জানাইয়া বলিল;—

"রাজাধিরাজের নিকট আমার পরিচয় বিদিত হইয়াছে; যে দণ্ডবিধান অভিপ্রায় হয়, আদেশ প্রচার হউক।"

"এখানি কি?"

"রাজাধিরাজ ত্রিকলিঙ্গেশ্বরের গুপ্তচরের পরিচয় চিহ্ন।"

"সূর্য্য-মুদ্রাই তোমার প্রভুর রাজধ্বজ, সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন কেন?"

"আমার প্রভু যাহাকে আপ্তপদ প্রদান করেন, তাহার পরিচয়ের জন্য সূর্য্যমুদ্রার নিম্নে ত্রিশূল-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন। এই ক্ষুদ্র অধম প্রভুর প্রধান চর, সেই জন্য এই সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন।"

"তুমি ভিন্নদেশের গুপ্তচর, আমার রাজ্যের গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে আসিয়া ধরা পড়িয়াছ; তোমার প্রাণদণ্ড কেন হইবে না?"

যুবক নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল;—

"গুপ্তচর রাজসেবক। রাজাধিরাজ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর, পাটলীপুত্রের চর কোন রাজ্যে না যায়?"

রাজাধিরাজ বলিলেন;—

"যায় বটে, তাহাদেরও চিরদিন এরূপ বিপদ সম্ভব।"

"তাঁহারা সাহসী এবং প্রভুভক্ত, ভয় করেন না। এই ক্ষুদ্র অধমও আজ দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপদে পড়িয়াছে। যে মুদ্রাঙ্কিত ধ্বজ দেখাইলে গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে গোদাবরী-তীর পর্য্যন্ত ত্রিকলিঙ্গে এমন মানুষ নাই যে মস্তক নত না করে; যাহার সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ দাস শত রক্ষী সাহায্যকারী সংগ্রহ করিতে পারিত; আজ তাহার কোন শক্তি নাই।—কিন্তু এ অধমও অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয় মনে করে। রাজাধিরাজের অখণ্ড রুদ্র প্রতাপ;—দণ্ডাদেশ প্রচার হউক!"

সেই মহাসভা-সমাসীন সকলের চিত্ত শিহরিয়া উঠিল। এই দৃঢ়চিত্ত নবীন যুবকের প্রতি নিশ্চয়ই শূলদণ্ডের আদেশ হইবে! কিন্তু রাজাধিরাজ বলিলেন;—"মহারাজ কলিঙ্গপতির শৌর্য্য-প্রতাপের কথা আমার অবিদিত নাই। তাঁহার বিশ্বাসী চরেরও যে অতুল সাহস, তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তোমার মৃত্যুভয় নাই। সংসারে মৃত্যুভীতের মৃত্যুসংঘটনে বিলম্ব হয় না। শুন, অশোক-দেব প্রকৃত সাহসীর অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। তুমি সাহসী এবং বিশ্বাসী প্রভুভক্ত, তোমার অপরাধ ক্ষমা করা গেল।"

রাজাধিরাজের মহামহিমময় আদেশে সভাসমাসীন সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল। যুবক পুনরায় ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল এবং উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল;—

"রাজাধিরাজের জয় হউক!"

"তোমার প্রভু আমার সীমান্ত-প্রদেশে অহেতুক গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আমার প্রজাগণ অত্যাচারিত হইতেছে, বণিক-ব্যবসায়ীর বহু ক্ষতি হইতেছে। আমার প্রেরিত দূত সমুচিত সম্বর্দ্ধিত হয় নাই। তিনি গুপ্তচর পাঠাইয়া আমার সৈন্য এবং দুর্গ-সন্নিবেশের তত্ত্ব করিতেছেন।—যুদ্ধ করাই কি তাঁহার অভিপ্রায়?"

যুবক যুক্তকরে নিবেদন করিল;—

"দাস ক্ষুদ্র সেবক, ত্রিকলিঙ্গেশ্বরের গুপ্ত অভিপ্রায় আমার জ্ঞাত থাকার কি সম্ভাবনা?"

"ভাল, অচিরেই তাহা জানা যাইবে। তুমি এখন পরিচিত, ছদ্মবেশে আর তোমার প্রয়োজন নাই। পাত্র তোমার বেশ, যান, বাহন, আহার, বাসস্থানের উপযুক্ত বিধান করিয়া দিবে। সপ্তাহ কাল আমার রাজ-ধানীতে থাকিয়া যাহা যাহা দেখিবার ইচ্ছা হয়, দেখ। পরে আমার লোকেরা তোমাকে

তোমার প্রভুর রাজ্যসীমায় রাখিয়া আসিবে।”

যুবক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল; দুই বাহু উর্দ্ধ করিয়া, উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল;—

“রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী অশোকদেবের জয় হউক!”

রাজাধিরাজ সভাভঙ্গের ইঙ্গিত করিলেন। মাগধগণ স্তুতিগীত আরম্ভ করিল। বাহির্দ্বার চত্বর রাজপ্রাসাদ—সমস্ত নগর মৃদঙ্গ ভেরি পটহ ঝর্ঝর মর্দ্দল বেণু বংশী রবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখরার মূকত্ব

এক দিন অপরাহ্নে মঞ্জুলা কুমুদ-নিবাসে উপস্থিত হইল। সঙ্গে পরিচারিকা চঞ্চলা ও চিত্রা, ভৃত্য বাহক এবং উপায়ন-গন্ধ-পুষ্প-মাল্যবাহী ভারিক। প্রমীতসেন এবং উৎপলা প্রস্তুত ছিলেন। শিবিকা অন্তঃপুর-দ্বারে পৌঁছিতেই মাধবী তাহার দ্বার খুলিয়া দিল। মঞ্জুলা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া প্রমীতকে নমস্কার অভিবাদন করিল এবং সহজ অনুমানে গৃহকর্ত্রী উৎপলাকে চিনিতে পারিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। উৎপলা অতি আদরে হাতে ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রমীত বলিলেন;—

“আজ আমাদের কত আনন্দ!”

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া হাসিমুখে পুনরায় প্রমীতকে অভিবাদন করিল।

“তোমরা উপরে যাইয়া বিশ্রাম কর।”

প্রমীত বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া দ্বিতলে নিজ কক্ষে গেলেন। সেখানে নিজের শয়ন-পর্য্যঙ্কের নিকট দ্বিতীয় পালঙ্কে কোমল শয্যায় নিজের পার্শ্বে মঞ্জুলাকে বসাইলেন।

উৎপলা বলিলেন;—

“আমার কত সৌভাগ্য, তুমি আমাদের গৃহে আসিয়াছ!”

মঞ্জুলা বলিল;—“আপনার গৃহে আসিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।”

রাজকোপ হইতে স্বামী যে মঞ্জুলার অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া উৎপলা কত কথা বলিলেন। মঞ্জুলা তৎসম্বন্ধে নিজের কৃতিত্ব অস্বীকার করিয়া সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিকালে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা এবং নিরাপদে নিজগৃহে পৌঁছার জন্য প্রমীতসেনের মহত্ব এবং অনুগ্রহের কথা তুলিয়া কত কৃতজ্ঞতা জানাইল।

অনেক কথা হইল। শেষে উৎপলা বলিলেন;—“সে দিন কোথা হইতে আসিতে এই বৃষ্টিদুর্য্যোগের মধ্যে পড়িয়াছিলে?”

“পাটলীগ্রামে আমার এক আত্মীয়া আছেন, তাঁহার আমন্ত্রণে ভিক্ষুদেব উপগুপ্ত ঠাকুর সে দিন তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। ভিক্ষুদেবের চরণ দর্শন জন্য আমি পাটলীগ্রামে গিয়াছিলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা হয়, ঝড়-বৃষ্টির সময় দস্যু-হস্তে পড়িয়াছিলাম। বহু পুণ্যফলে সে সময় আমার উদ্ধার-কর্ত্তার সমাগম হইয়াছিল।”

“দেবতার অনুগ্রহে আমরাও সেদিন তোমার মত সুহৃদের নিকট পরিচিত হইয়া ভয়ঙ্কর রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।”

মঞ্জুলা হাসিল, বলিল ;—

"তিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ”

"তুমি আমাদের প্রাণ-মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চিরদিনের জন্য আমাদিগকে কিনিয়া ফেলিয়াছ।"

"শ্রীচরণের দাসীকে ও কথা বলিবেন না।"

"তুমি আমার পরম সুহৃদ, প্রাণপ্রিয় ভগিনী!"

মঞ্জুলা পালঙ্ক হইতে নামিয়া উৎপলার পদে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল। উৎপলাও নামিলেন এবং দুই হাতে মঞ্জুলাকে ধরিয়া তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

উৎপলা তখন হাতে ধরিয়া মঞ্জুলাকে লইয়া অন্তঃপুরস্থ গৃহকক্ষ পুকুর উদ্যান ইত্যাদি দেখাইতে লাগিলেন।

উৎপলার কক্ষগুলি সুন্দর ও সুসজ্জিত। মঞ্জুলা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, কমলপুরে তাহার নিজের কক্ষগুলি কারুকার্য্যে অথবা মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারে উৎপলার কক্ষগুলি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু নির্ব্বাচন ও সন্নিবেশ-পারিপাট্যে, প্রিয়জনের প্রীতি এবং প্রয়োজন সম্পাদনে এই গৃহিণী গৃহের নিকট কমলপুরের সেই প্রয়োজনহীন মহার্ঘ সাজসজ্জাপূর্ণ অতি-অলঙ্কৃত কক্ষগুলি সজ্জিত বিপণী বা দ্রব্যভাণ্ডার মাত্র।

উৎপলার শয়নকক্ষে বিস্তৃত পালঙ্কে দুগ্ধশুভ্র আস্তরণযুক্ত প্রশস্ত শয্যা, তাহাতে [illegible] উপাধান। শয্যাপার্শ্বে অযত্নরক্ষিত সপ্ত-আবলী স্বর্ণমেখলা, তাহারই পার্শ্বে মনোহর স্বর্ণ-শৃঙ্খল। এক কোণে শুভ্র পাদুকা, মণিখচিত সিংহমুখ যষ্টি ; অন্য কোণে ত্রিপদীর উপর মুকুর, কঙ্কতি, গন্ধচূর্ণ, কবরীবন্ধন সূত্র, বিবিধ অঙ্গরাগ-সামগ্রী। কক্ষের এক পার্শ্বে মসৃণ কাষ্ঠদণ্ডের উপর রক্ষিত পুরুষ-পরিধেয় ধৌত কৌশেয় ধুতি, উত্তরীয় ; নিকটেই রমণী-পরিধান-যোগ্য সাটী, প্রাবৃত ওড়নি, কঞ্চুলিকা।

মঞ্জুলা বিস্মিতনেত্রে সাগ্রহচিত্তে দেখিতে লাগিল, কক্ষের সর্ব্বত্র এক নবীন ভাব, অদৃষ্টপূর্ব্ব এক কমনীয় চিত্র। শৌর্য্য-মাধুর্য্যের এরূপ মিলন, সুন্দর আর সুন্দরীর এরূপ সামঞ্জস্য, যুগ্মের এরূপ অবিচ্ছিন্ন একত্ব আর কোথায়ও তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই। তাহার নিজগৃহে ত সে ভাবের লেশ মাত্র নাই। মহারাজ্ঞী কারুবকীর কক্ষ ত রাজকক্ষ, সেখানেও মঞ্জুলা এ ভাব লক্ষ্য করে নাই। অন্য গৃহস্থ লোকের ঘর সংসার মঞ্জুলা কমই দেখিয়াছে।

দেখিয়া দেখিয়া মঞ্জুলা মুগ্ধ হইল। তাহার জীবনে সে কখনো এ সৌন্দর্য্যের লীলা দেখে নাই, সুতরাং তাহার মহিমা কি অভাব কোন দিন অনুভব করে নাই। স্বাধীনার জীবন যে চির অভাবময়, আর পরাধীনা যে ঐশ্বর্য্য-শালিনী—এক যে কিছুই নয়, দু'য়ের একত্বই যে পূর্ণ জীবন, মঞ্জুলার মনে ত কোন দিন সে কথা উদয় হয় নাই। অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই লোকে নিজের অভাব বুঝিতে পারে, অনাসক্ত সংযমীর চিত্ত তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু সংসারে তেমন মহাত্যাগী সংযতবৃত্তি কয় জন? মঞ্জুলা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলদেশে

কি যেন এক অজ্ঞাতপ্রকৃতি ক্ষীণ অথচ মৃদু-উন্মাদক নবীন ভাব জাগিয়া উঠিল। মঞ্জুলার উৎফুল্ল মুখ ঈষৎ উন্মনা হইল।

চঞ্চলা বলিয়াছিল, উৎপলা পরমসুন্দরী। মঞ্জুলা দেখিল উৎপলার তুলভরূপ। উৎপলার দেহে বেশভূষা বা অলঙ্কারের কোন পারিপাট্য নাই, প্রায় সম্পূর্ণনিরাভরণা উৎপলার রূপ-বৈভব অতুল। সীমন্তশোভী একমাত্র সিন্দূর-বিন্দু যেন সেই অতুল রূপরাশি উদ্ভাসিত, অপূর্ব্ব লাবণ্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তখন তাহার নিজদেহে মণিরত্ন-অলঙ্কারের ছটা তাহার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর এবং দৈন্যৈ-শ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র বোধ হইল। মঞ্জুলার চক্ষু লজ্জায় নত হইল।

অবশেষে উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া আর এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে প্রশস্ত বৃহৎ শয্যা, শয্যার উপর এবং প্রাচীরের গায়ে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র—বেণু, বীণা, বংশী, মন্দিরা, মৃদঙ্গ। দেখিয়া মঞ্জুলার চক্ষু স্মিত বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা বলিল—

"আপনার গৃহে এত যন্ত্র, গীতবাদ্যে আপনার অভ্যাস নাই?"

উৎপলা হাসিলেন, বলিলেন -

"আমার অভ্যাস! তোমার 'পরম সুহৃদ' কোন কোন দিন গান করিয়া থাকেন, এবং আমোদ করিয়া আমাকে শিখাইতে চাহেন।"

"তবে আপনিও গাহিতে পারেন?"

"কিছু না।"

"অভ্যাস করিতেছেন?"

"তুমিই আমার সে বিপদের মূল!"

"আমি!"

"এবার বসন্তোৎসব হইতে ফিরিয়া অবধি গীতের চর্চা অধিক হইতেছে। আমাকে না শিখাইয়া ছাড়িবেন না! এই কাককণ্ঠ হইতে পঞ্চম বাহির হইবে! সে কথা থাকুক, শুনিয়াছিলাম, তুমি অপূর্ব্ব রূপবতী—"

মঞ্জুলা লজ্জায় মুখ নত করিল। উৎপলা অতি আদরে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আজ স্বচক্ষে দেখিলাম, তোমার রূপের তুলনা নাই, চক্ষু সার্থক হইল। শুনিয়াছি, গীতবাদ্যেও তোমার অসীম ক্ষমতা—"

"আপনি কাহার নিকট এত অলীক কথা শুনিয়াছেন?"

"অতি বিশ্বস্ত লোকের মুখেই শুনিয়াছি!"—সহাস্যে—"সেই দুর্য্যোগ দিনে সাক্ষাৎ হইতে তোমার অপূর্ব্ব রূপের, আর বসন্তো-সবের দিন হইতে তোমার গীতের কথা প্রতি দিন শুনি! অমন মিষ্ট স্বর, অমন সুন্দর গীত না কি তিনি আর কখনো শুনেন নাই।"

"আপনি আমার অতি-প্রশংসা শুনিয়া-ছেন আমি তাহার উপযুক্ত নই।"

"অতি প্রশংসা-যে নয়, তোমার রূপ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার গীত যে অতি মধুর হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।—একটা গান শুনাইতেই হইবে।"

মঞ্জুলা মহা বিপদে পড়িল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। উৎপলার সঙ্গে আজই প্রথম দেখা। প্রথম দিনেই গীতবাদ্য, আমোদ প্রমোদ প্রকৃতি-প্রগল্‌ভা মঞ্জুলার নিকটও চঞ্চলতা বলিয়া বোধ হইল। দেশ-কাল পাত্র-ভেদে মুখরাও মূক হইয়া পড়ে। উৎপলা

বীণাটী তুলিয়া লইয়া মঞ্জুলার হাতে দিলেন। শেষে মঞ্জুলা বলিল ;—

"আজ ক্ষমা করিবেন, আমার মুখে আজ গীত আসিবে না। আরও ত কতদিন আসিব, আর একদিন শুনাইব।"

"তোমার মুখের গীত শুনিবার বড়ই সাধ ছিল। ভাল, শুধু একটুকু বাজাও!"

বাধ্য হইয়া মঞ্জুলা বীণা লইয়া তাহার তার চড়াইয়া নামাইয়া সুর বাঁধিতে লাগিল এবং দ্বারের দিকে বারবার চাহিতে লাগিল। বুঝিতে পারিয়া উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—

"কোন ভয় নাই এখানে কেহ আসিবে না।"

কম্পিত হস্তে মঞ্জুলা বীণাতে ঝঙ্কার দিয়া স্বর তুলিতে লাগিল। এমন সময় মাধবী আসিয়া জানাইল, প্রমীতসেন আসিতেছেন। প্রমীত কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বীণা রাখিয়া দিয়া জড়সড় হইয়া একটুকু সরিয়া বসিল।

প্রমীত বলিলেন ;—"আমি বাধা দিলাম! আমি যাই।"

মঞ্জুলা বলিল,—'না, আপনি যাইবেন না। বেলা গিয়াছে, আপনি অনুমতি করুন, আমি এখন বিদায় হইব।"

"এখনি যাইবে?"

"হাঁ, আপনি অনুমতি করুন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

উৎপলা বলিলেন ;—"তবে আজ আর হইল না। আর এক দিন আসিয়া গীত শুনাইবে?"

মঞ্জুলা মৃদু মৃদু বলিল ;—"শুনাইব।"

প্রমীত বলিলেন ;—"আমার প্রার্থনা, সেদিন আমিও উপস্থিত থাকিব।"

মঞ্জুলার লজ্জা-বিজড়িত সুন্দর মুখ স্মিত-বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা প্রমীতসেনকে নমস্কার করিয়া উৎপলাকে প্রণাম করিল।

গন্ধপুষ্প-মাল্যভারে বরিতা মঞ্জুলা বিদায় হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

মঞ্জুলাকে বিদায় করিয়া দিয়া প্রমীত পুনরায় উৎপলার কক্ষে ফিরিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কেমন দেখিলে?—মঞ্জুলা রূপসী নয়?"

"অপূর্ব্ব রূপসী, অমন রূপবতী আমি আর দেখি নাই।"

"আমিও—" বলিতে বলিতে প্রমীত থামিয়া গেলেন।

"কি বলিতেছিলে?"

"না,—আবার কবে তাহাকে আনাইবে?"

"লজ্জায় মঞ্জুলা আজ গীত শুনাইতে পারে নাই—"

"শীঘ্রই আর একবার তাহাকে আনাইও ; দেখিবে, সে কেমন সুকণ্ঠ!"

"শীঘ্রই আনাইব।—একটা কথা, মঞ্জুলা বসন্তোৎসবে প্রকাশ্যে এত লোকের সম্মুখে গীত গাহিল, আর আজ এই নিরিবিলী অন্তঃপুরে আমার কাছে গাহিতে অত লজ্জা বোধ করিল?"

"তোমার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, ক্রমে লজ্জা যাইবে। মঞ্জুলা প্রায় তোমার সমবয়সী, অল্প দিনেই তোমাদের মনের মিল হইবে।"

"মঞ্জুলা আজও অবিবাহিতা কেন? অমন শিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনশালিনীর বর জুটে না?"

"বর জুটে না!—অভাব কি! কতলোক ত তাহার বিবাহপ্রার্থী। বোধ হয়, মঞ্জুলার

মনোমত কেহ এতক জুটে নাই! দেবী কারুবকী স্বয়ংমঞ্জুলার অভিভাবিকা; যে সৌভাগ্যবান মঞ্জুলাকে লাভ করিবে, সে ত রূপ গুণ ধন সম্পদ—আকাঙ্ক্ষার সমস্ত বস্তু একাধারে লাভ করিবে!"

স্মিতমুখে উৎপলা বলিলেন:—

"লোভ হয় কি?—দোষও উপকৃতাহ বা শেষে বাঞ্ছিতা হয়!"

প্রমীত হাসিয়া উঠিলেন; উৎপলার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন;—"রূপ গুণ ধন সম্পদ কি কবচ ভেদ করিতে পারে!"

প্রমীত হাসিলেন; কিন্তু সে হাসি যেন ফুল্ল হৃদয়ের স্বচ্ছন্দজাত ললিত হৃষ্ট হাসি নহে, কিছু যেন উদ্বেগজড়িত, সঙ্কুচিত হাসি! মুগ্ধা উৎপলা কিন্তু উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে স্বামীদত্ত ঋণ সত্ত পরিশোধ করিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ

বেহার-চিত্র

রেলপথে

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে; জামালপুর হইতে গয়ার গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই। "পুরি—মিঠাই," "পান—বিড়ি—দেয়াসলাই," "ক্ষীরা—কাঁকড়ি—তরমুজা" —ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র সুর ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে; গার্ডসাহেব হরিৎ নিশান হস্তে ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেছেন। এমন সময় একজন বিশালদেহ মাড়োয়ারি গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মধ্য-শ্রেণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন কুলি এক বিশাল মোট এবং বাক্স লইয়া উপস্থিত হইল।

শেঠজি মোট নামাইয়া লইয়া কুলিকে দিয়া 'বেঞ্চের' উপর আপনার শয্যা রচনা করাইয়া লইলেন, তাহার পর অত্যন্ত উদার ভাবে জটিল বস্ত্রগ্রন্থি উন্মোচন করিয়া তাহার হস্তে দুইটি পয়সা দিয়া বলিলেন, "লেও বক্‌সিস্।"

কুলী চীৎকার করিয়া উঠিল "ওপার হইতে এপারে মোট আনিবার সাধারণ মজুরিই এক আনা; তাহার উপর সে দুই জনের মোট—একাকী বহন করিয়া আনিয়াছে। তাহার এই মজুরি!"

উভয়ে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক লাগিয়া গেল। বহুতর্কের পরে শেঠজি হতাশ হইয়া বলিলেন যে এ সকল বড়ই "জুলুমের" কথা। একটা মোট বহিবার মজুরি এক আনা! এরূপ অবস্থায় ভদ্রলোকের পক্ষে অন্য কাজ না করিয়া মজুরি করাই ত ভাল! জটিলতর গ্রন্থি বহুকষ্টে উন্মোচন করিয়া শেঠজি কাতর ভাবে আর একটি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন "লেও ভাই মিন্‌সে তুম্ খুসী হোও।"

কুলি আর তর্ক করা বৃথা বুঝিয়া অস্ফুটস্বরে শেঠজির সম্বন্ধে নানা অযথা বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

কুলিকে বিদায় দিয়া শেঠজি চরণ হইতে পাদুকাযুগল উন্মোচন করিয়া উত্তরীয় সাহায্যে সযত্নে তাহাদের সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। পাদুকাযুগল একে বিলাতি, তাহাতে নূতন।

যথোচিত সংস্কারান্তে দ্বারের সম্মুখে সে দু'টিকে রক্ষা করিয়া শেঠজি সগর্ব্বে একবার সহযাত্রিগণের প্রতি অপাঙ্গে চাহিয়া লইলেন। একজন যাত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "ইংরেজ লোগ্ বড়া বঢ়িয়া জুতি বানাতা হায়। লেকিন দামভি বহুত লেতা হায়। ইস্ জুতিকে দাম সাঢ়ে সাত রোপেয়া লিয়া।" মুগ্ধ সহযাত্রী বলিল "ওঃ সাঢ়ে সা—ত রোপেয়া!"

শেঠজি একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া আপনার পরিপুষ্ট গুম্ফরাজিকে যত্নপূর্ব্বক সুবিন্যস্ত করিয়া লইলেন।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। ষ্টেশনের খালাসীরা গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময়ে কোট-প্যাণ্টপরিহিত এক বেহারবাসী দ্রুতবেগে দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন।

শেঠজি "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিয়া বলিলেন "ইয়ে গাড্ডী মে জাগা নেহি হায়। দোস্‌রি গাড্ডীমে যাও।" উত্তেজিত বেহারবাসী বলিল "চোপ্‌রও শালা, তুম্‌হারা বাপ্‌কি গাড়ী হায়?"

শেঠজি তাঁহার বিশাল উদর কম্পিত করিয়া বলিলেন "খবরদার মুহ্ সামাল্‌কে বাত বোলো।" এঞ্জিনের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বেহারবাসী সবেগে দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; শেঠজি ধাক্কা মারিয়া তাহাকে বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন। ফলে বেহারীর পায়ে লাগিয়া শেঠজির সযত্নরক্ষিত একপাটি জুতা লাইনের মধ্যে পড়িয়া গেল। শেঠজি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "গার্ড সাহেব! গার্ড সাহেব! হুজুর, ষ্টেশনমাষ্টার, পুলিস্ পুলিস্—হামারা জুতি গিরা দিয়া—!"

গার্ডসাহেব নিকটেই দাঁড়াইয়া ড্রাইভারকে হরিৎ পতাকা দেখাইতেছিলেন। শেঠজির মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিয়া সম্মুখে আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন "কেয়া হুয়া? কাহে হাল্লা করতা?" চীৎকার করিয়া শেঠজি বেহারবাসীর হাত ধরিয়া বলিলেন "হুজুর, ইয়ে বদ্‌মাস্‌নে হামারা সাঢ়ে সাত রোপেয়াকা জুতি গিরা দিয়া!" বিহারী বলিল "Sir, the fellow push me. I about to be thrown on the line! the rascal!"

গার্ড শেঠজিকে বলিলেন "কাহে ধাক্কা মারা শূয়ারকে বাচ্চা?" শেঠজি করজোড়ে বলিতে চেষ্টা করিলেন "হুজুর!"—সাহেব বলিল "চোপরও।" বলিয়াই বাঁশী বাজাইয়া দিল। শেঠজি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন।

শেঠজির মোটবাহী কুলিটী সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। শেঠজি করুণ অনুনয়ের স্বরে বলিলেন "এ ভাই,জারা জুতিকো তো উঠাও। নগদ চার পয়সা বখসিস্ দেঙ্গে।" কুলি বিরক্তির স্বরে বলিল "ওঃ বড়া দেনে-বালা! গাড়ী খুল রহা হায়, চার পয়সেকা ওয়াস্তে আদ্‌মি জান দেগা!'

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শেঠজি মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "গাড়ী যানেকো বাদ জুতি উঠাকে রাখিও। হাম্ ঘুরকে আ'কে চার আনা বখসিস্ দেঙ্গে।" পার্শ্বের গাড়ীতে এক বাঙ্গালী যুবক বসিয়া ছিল। সে হাসিয়া বলিল

"শেঠজি, একপাটি জুতো নিয়ে আর কি করবে? ও পাটিটাও ফেলে দাও। যে পাবে সে পায়ে দিয়ে তোমায় আশীর্ব্বাদ করবে!" শেঠজি অবোধ্য ভাষায় তাহাকে গালি দিয়া "বাঞ্চের" উপর হতাশভাবে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

শেঠজি শুইয়া পড়িলে বেহারী ভদ্রলোকটী মাথার টুপি খুলিয়া বেঞ্চের উপর রাখিলেন। "নেক্‌টাই"-শোভিত সাহেবী পোষাকের উপর তাঁহার দোদুল্যমান স্থূল শিখা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর ভারতীয় ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। টুপি রাখিয়া আরামে বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া বাবুসাহেব কহিলেন, "সাত রোপেয়াকে জুতি দেখ্‌লাতা। লছ্‌মি চৌধুরী সাতলাখ রোপেয়া পুছ্‌তা নেহি তো সাত রোপেয়া! এই কিউল ব্রিজমে হামারা দেড় লাথ রোপেয়া একরাত্‌মে ডুব গিয়া। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কহা 'আপ্‌কো বহুৎ রোপেয়া লোক্‌সান হো গেয়া। হাম্ Agentকো লিখ্‌কে আপ্‌কো কুছ্‌ রোপেয়া Advance দেলা দেঙ্গে।' হাম কহা,'হামারা ওয়াস্তে কোই পরোয়া মত্‌ কিজিয়ে সাহেব। দো চার লাথ রোপেয়া কোন্ পুছ্‌তা হায়?' উস্‌রোজ সে সাহেব হামারা নাম রাখা 'King contractor!' সম্‌ঝিয়ে, হাবড়া সে দিল্লী তক যেতনা লাইন হায় সব হামারা এলাকা হায়। বিশ পঁচিশ লাখ রোপেয়া হামারা হামেশা লাইন পর পড়া রহতা হায়। Agentসে লে করকে ষ্টেশনমাষ্টার তক্ ভর লাইনমে এইসা কোই নেহি হায় যো লছমি চৌধুরীকে একঠো বাত উঠাবে। Company দশ বিশ হাজার লোক্‌সান করেগা সো কবুল। তব্‌ভি লছ্‌মি চৌধুরীকো বাত নেহি উঠাবেগা।" মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল "ওঃ কেয়া খাতির!" সুযোগ পাইয়া একজন সহযাত্রী বাবু ঘমণ্ডিলাল বলিলেন "হামারা নোকরনে তো একঠো বড়া ভারি গল্‌তি (ভুল) কিয়া। উস্‌কো দানে দিয়া "ইন্‌টর"কে "টিকস্" উয়ো বেওকুফ্‌নে "থার্ড কিলাসকে টিকস্" লান দিয়া। ইস্‌মে কুছ্‌ হরজ (ক্ষতি) তো নেহি?"

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন "কোই পরোয়া নেহি। হামারা নাম লেকে আপ্‌ ফার্ষ্ট ক্লাস মে যাইয়ে তব্‌ ভি কোই কুছ্‌ নেহি কহে গা; ইণ্টর কোন পুছ্‌তা হায়।" ভক্তিগদ্‌গদ ঘমণ্ডিলাল চৌধুরীজিকে দীর্ঘ সেলাম করিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী ধায়ারায় আসিয়া পৌছিল, তিনজন মুসলমান আরোহী—"বদ্‌না" "গড়গড়া" "পানদান" "ওগল্‌দান" "খানা" প্রভৃতি লইয়া মহাসমারোহে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হাজি সাহেব জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "তোবা, হামরা খানা কাঁহা!"

হায় হায়, কমবক্‌ত্‌ খানসামা হাজি সাহেবকে কি বিপদেই ফেলিয়াছে! উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ভিন্ন হাজিসাহেবের অন্য কোন স্নেহ-পদার্থ আদৌ সহ্য হয় না! তাহার উপর অপরের রন্ধন হাজি সাহেবের মোটেই রুচিকর হয় না। সেইজন্য হাজিসাহেবের বিবি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একটী মোরগ মারিয়া তাহাকে চালে ঝুলাইয়া রাখেন। পরদিন সেইটীকে ছাড়াইয়া কেবল একসের ঘৃতসহযোগে রন্ধন করেন। তাহাতে বিন্দুমাত্র জল পড়িবার যো নাই; কেবল কিছু মেওয়া,

জাফ্‌রান্‌, এলাচি, আর পেঁয়াজ। এই মোরগটী, একডজন "খাস্তা" পরেটা, কিছু উৎকৃষ্ট ফল, আধসের রাবড়ি আর আধসের উৎকৃষ্ট সিরনি (মিষ্টান্ন)—ইহাই হাজি সাহেবের রাত্রের নাশ্‌তা (জলযোগ)। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ। "কমবখ্‌ত" এই আসল জিনিষটাই দিতে ভুল করিয়াছে! এখন সারা-রাত্রি উপবাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। লছ্‌মি চৌধুরী বলিলেন যে, কিউলে উৎকৃষ্ট ফলমূল যথেষ্ট পাওয়া যায়। সেখানকার "রাবড়ি" এবং "মালাই"ও উত্তম। সেইখানে, কিছু ফলমূল আর রাবড়ি খরিদ করিয়া লইলে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। "খয়ের" বলিয়া হাজিসাহেব মনকে প্রবোধ দিয়া তামাকু সাজিতে মনোনিবেশ করিলেন।

হাজি সাহেবের সহযাত্রী খাঁ সাহেব এতক্ষণ তাম্রকূট-ধূমাকর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। এতক্ষণ পরে তিনি উদাসীন ভাবে হাজি সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,"চাকর বাকরদের উপর বিশ্বাস করিলেই বিপদ্‌। এই দেখুন না কেন, খারাপ তামাক আমার সহ্য হয় না বলিয়া ৫০ টাকা খরচ করিয়া লক্ষ্নৌ হইতে একেবারে একমণ তামাক আনাইয়া রাখিয়াছি। তথাপি আসিবার সময় সে তামাক না দিয়া তাহাদের নিজেদের খাইবার "কড়ুয়া" তামাক একসের ইহার মধ্যে দিয়া দিয়াছে। এখন সমস্ত রাত্রিই "নেহাইৎ তক্‌লিফ্‌"। পথে ভাল তামাক পাইবার কোনই উপায় নাই।" দুঃখিতচিত্ত খাঁসাহেব মুদিতচক্ষে তাম্রকূটধূমাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্নৌএর মূল্যবান্‌ তামাকের অভাবে তাঁহার যে বিশেষ কষ্ট হইতেছে মুখ দেখিয়া এমন কোন লক্ষণ বুঝা গেল না।

পার্শ্বের গাড়ী হইতে সান্ধ্য বাতাস কম্পিত করিয়া মাঝে মাঝে সুর আসিতে লাগিল—

"পিছে চলত ভাই লছমন
আগে চলত রঘুবীর।"

গাড়ী কাজরা পোঁছিবা মাত্র ১০।১২ জন স্ত্রী-পুরুষ, লাঠি, বস্তা, ঝুড়ি, কোদাল প্রভৃতি লইয়া কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। চৌধুরী সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন; "ইয়ে গাড়ী নেহি। ইয়ে ডেঢ়া মাশুলকে গাড়ী হায়। আগে যাও।" কিন্তু তাহাদের অগ্রণী ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল "ও ডেঢ়া আর আঢ়াইয়া, আরে চলরে শুক্‌রা।" বলিতে বলিতে হুড়মুড় করিয়া সমস্ত দলবল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

খাঁ সাহেবেরা "ওঃ! ওঃ!! আরে ই কেয়া, ই কেয়া" বলিয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। চৌধুরী সাহেব গার্ড সাহেবের উদ্দেশে ধাবমান হইলেন। গার্ড আসিয়া বহুকষ্টে নিশানের দণ্ড প্রয়োগে তাহাদের গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল।

হাজি সাহেবের যুবা সঙ্গীটী এখনো কোন কথা কহেন নাই। এক্ষণে তিনি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলেন যে মৌলভি মহম্মদ মির্জ্জা সাহেব একজন "আমীর" লোক। সেখপুরা অঞ্চলে যত সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার আছেন, মৌলভি সাহেবের পরিবার তাঁহাদের মধ্যে বংশ-মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইংরাজের সঙ্গে নবাব মিরকাশিমের যুদ্ধ বাধিলে, বলিতে গেলে একরকম তাঁহার "পরদাদার" (প্রপিতামহের) সাহায্যেই

ইংরাজের জয়লাভ হয়। মিরকাশিম তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার "পরদাদা" গবর্ণর সাহেবকে একবার "জবান" (কথা) দিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া কিছুতেই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইতে স্বীকৃত হন নাই। কৃতজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মৌলভি সাহেবের প্রপিতামহকে একখানি তিন হাজার টাকা মূল্যের তরবারি আর একলক্ষ টাকা আয়ের একটী "জাগীর" দান করেন।

তাঁহার পিতামহ এক ফকিরকে সেই জাগীর "ইনাম" দিয়া ফেলেন। তদবধি মৌলভি-পরিবারের কিছু অর্থকষ্ট ঘটিয়াছে।

চৌধুরী সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন "একলক্ষ টাকা আয়ের জাগীর একেবারে ফকিরকে দান করিয়া ফেলিলেন!"

ঈষৎ হাসিয়া মৌলভি কহিলেন যে "বাল্য কালে তাঁহার পিতার একবার কঠিন পীড়া হয়। কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে যত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন, সকলকে দেখাইয়াও কিছুতেই রোগের শান্তি হইল না। অবশেষে এক ফকির দৈবক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ফকিরের চিকিৎসায় পিতা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হন। রোগ-মুক্তির পর ফকির তাঁহার পিতামহের নিকটে "ইনাম" চাহিতে গেলে, তিনি তাঁহার লক্ষ টাকা আয়ের সমস্ত জমিদারী ফকিরকে লিখিয়া দেন! তাঁহার দুই চারিজন বন্ধু সে সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিল "একেবারে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি! ইনামটা বড় বেশী হইয়া গেল!" কিন্তু পিতামহ হাসিয়া বলিয়াছিলেন "কুছ্ ভি নেহি। প্রাণের দাম লাখ টাকার অনেক বেশী! আমি ফকিরকে কিছুই দিতে পারিলাম না!"

শুনিয়া পুলকিত চিত্তে খাঁ সাহেব ও হাজি সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন "ওঃ হোঃ হোঃ! উন্ হোনে বহুত ঠিক তজ্‌বিজ্ (বিচার) কিয়া, জান্ কি কিম্মত (মূল্য) হাজার লাখ!!"

পিতামহের গৌরব-কাহিনী স্মরণে উদ্বেলিত-হৃদয় মৌলভি সাহেব সহাস্যমুখে দুই খিলি পান নিজ বদন-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, "মোচে" একটু "ইত্তর" (আতর) লাগাইয়া গড়গড়ায় ঝুলাইবার জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত পুষ্প-কলিকার সাহায্যে মালা-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গাড়ী কিউলে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্লাটফর্ম্ম প্রতিধ্বনিত করিয়া "রাবড়ি-মালাই," "পুরী-মিঠাই," "পান-বিড়ি-দিয়াশালাই," "রোটি-কাবাব," "হিন্দু-চা," "কেলা-আম-কাঁকড়ি-নাশপাতি"—ইত্যাকার শব্দ নানা বিচিত্র সুরে সমুত্থিত হইতে লাগিল।

"নাশ্‌তা" (জলযোগ) বঞ্চিত হাজি সাহেব "কেলাবালা" "কেলাবালা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

কলাওয়ালা নিকটে আসিলে হাজি সাহেব বলিলেন "কুছ মেওয়া হায়?" কলাওয়ালা আপেল, নাশপাতি, আম্র, কদলী প্রভৃতি দেখাইল। কিন্তু তাহাদের মূল্যের কথা শুনিয়া হাজিজি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একান্ত হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা কাঁকড়ি কেয়া ভাউ?" ফলওয়ালা বলিল "পয়সা পয়সা।" "তব্ তুম্-হারা সওদা বেচ্‌নেকে মতলব নাহি হায়!"—

বলিয়া হাজি সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে একটী অতিক্ষুদ্র কাঁকড়ি তাঁহার নেত্রগোচর হইল। সেইটী উঠাইয়া হাজি সাহেব বলিলেন "আচ্ছা ইস্‌কো কেত্তা লেওগে ?" ফলওয়ালা বিরক্ত হইয়া বলিল "এক আধেলা। আব্ লেনা হোয় তো লিজিয়ে; এত্তা দের মে হাম্ এক রোপেয়াকে সওদা বেচতেঁ।" "খয়ের"—বলিয়া হাজি সাহেব আধেলা দিয়া কাঁকড়ি গ্রহণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে ছুরিকা সাহায্যে তাহাকে ছাড়াইতে ছাড়াইতে সহযাত্রিগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "আরে ভাই জারা নাশ্‌তাই না করনা ? নাশ্‌তাকে লিয়ে এহি কাফি (যথেষ্ট) হায়।" একজন হিন্দু ভদ্রলোক বলিলেন "হিঁয়াকা মালাই ভি বহুত আচ্ছা হায়।" চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাজিসাহেব কহিলেন "কুছ্ কামকা নেহি, বিল্‌কুল আটা মিলায়া হুয়া। সাদিমে কাম পড়নেসে হিঁয়াকে রাব্‌ড়ি মালাই হামেশে দু দশ মণ হামারা মকাম্‌মে যাতাই হায়!" অগত্যা নিরুপায় হাজিসাহেব কাঁকড়ি খাইয়াই এক বদ্‌না জলপান করিলেন। "মেওয়া" এবং "মোরগ মোসল্লম"-ভোজী হাজি সাহেবের ভীষণ ত্যাগস্বীকার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল!

ইতিমধ্যে প্লাটফর্ম্মে এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল লক্ষপতি চৌধুরী সাহেবের সহিত টিকিট-কলেক্টারের মহা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে! টিকিট কলেক্টর বলিতেছিল "তুমি without ticket travel করিতেছ; যদি তুমি এখনি টিকিটের মূল্য ও penalty না দাও তাহা হইলে আমি তোমাকে পুলিশে hand over করিয়া দিব।" চৌধুরী বলিতেছিলেন "I am a pass-holder. I forgot to bring my pass. Your Traffic Manager and Agent know me. I report against you." টিকিট-কলেক্টর বলিল "Do what you like. I won't let you go." চৌধুরী সাহেব হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল না। রেলওয়ে পুলিশের জমাদার আসিয়া তাঁহার ভার গ্রহণ করিল।

বাবু ঘমণ্ডিলাল তাঁহার মুরব্বির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কাণে পৈতা জড়াইয়া দ্রুতপদে লোটা হস্তে গাড়ীর পাইখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোলমালে শেঠজির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। চৌধুরীর দুরবস্থা দেখিয়া পাদুকা-শোক-বিহ্বল শেঠজির মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। শেঠজি হাসিয়া বলিলেন "শালা চোট্টা। টিকট্ খরিদ্ নে কো আওকাত (ক্ষমতা) নেহি, শালা বিশ লাখ্‌কে গপ্ উড়াতা থা! হামারা সাড়ে সাত রোপেয়াকা জুতি নাশ্ কর দিয়া, শালা, বদমাস্!"

কাঁকড়ি-ভোজন-পরিতৃপ্ত হাজিসাহেব ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন "দো চার রোপেয়াকে ওয়াস্তে ইজ্জত বরবাদ করনা বহুত খারাব হায়।"

এক পয়সার বরফ বদনার জলে ফেলিয়া দিয়া খাঁ সাহেব বলিলেন "সেরেফ্ এই ইজ্জত কে খেয়াল্‌সে মেরা ওয়ালিদ (পিতা) হামেশা গাড়ী reserve করকে travel করতেঁ থে।"

গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময়ে দুইজন "বাভন" গল্প করিতে করিতে দ্রুতবেগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েরই পরিধানে জীর্ণ মলিন বস্ত্র ও মিরজাই, কেবল মস্তকে একটী শুভ্র টুপি।

উভয়ে কিছুক্ষণ উপবেশনের পর কোমর হইতে "খইনি" (দোক্তা) এবং চূণের ডিবা বাহির করিয়া "খইনি" প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। খইনি প্রস্তুত হইলে নিজ নিজ বদনে খইনি নিক্ষেপ করিয়া একজন অপরকে কহিল "রামসিং তোমার সে মোকেদ্দমার কি হইল ?" রামসিং কহিল "মোকদ্দমায় আমারি জিত হইয়াছে। কোন সাক্ষী সাবুদ ছিল না। শেষে একটা জাল তমসুক বাহির করিয়া মোকদ্দমাটা "দুরস্ত" করি। হাকিম তমসুক দেখিয়া আর কোন কথা শুনিল না।"

হরি সিং বলিল "তমসুক রেজিষ্টারি হইল কি করিয়া ?"

রাম। আরে সেজন্য ভাবনা কি ? আমার চাকরটা গিয়া বলিল "আমি ভিখন সিং, আমিই তমসুক লিখিয়া দিয়াছি।"

হরি। সনাক্ত করিল কে ?

রাম। তুমিও যেমন, সনাক্তের আবার ভাবনা ? এক টাকা খরচ করিলে কত মোক্তার খুসী হইয়া সনাক্ত করিয়া দেয়! আজকাল আমাদের কুটুম্বেরা উকীল হইয়াছে, এখন উকীলেরও ভাবনা নাই !

কিন্তু তোমার খুনী মোকদ্দমাটা খুব বাঁচাইয়াছ যাহোক, হরি সিং !

হরি। কি করি ভাই; কিছু খরচ হইয়া গেল। রাস্তায় "লাস্" বদ্‌লাইয়া দিলাম। কনষ্টেবলকে ঘুস দিয়া ওদের "মুর্দ্দার" (মরার) বদলে আমার চাচার লাস চালাইয়া দিলাম। সমস্ত মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

রাম। অ্যাঁ! তোমার চাচা কি মারা গিয়াছেন ?

হরি সিং কণ্ঠস্বর খুব নীচু করিয়া বলিল "আর ও কথা কেন বল ? চাচা বুড়ো হইয়া ত একরকম "বেকার"ই হইয়াছিলেন, একটা কাজে লাগিয়া গেলেন।"

রাম। হাঁ সে কথা যথার্থ, আগে "জায়-দাদ" (সম্পত্তি), পরে "জান"। "জান" দিতে পারি, কিন্তু এক "ধূল" জমি ছাড়িতে পারি না।

গাড়ী সেখপুরা আসিয়া পৌঁছিল। রামসিং ও হরি সিং গল্প করিতে করিতে নামিয়া গেল। তাহাদের পরিবর্ত্তে "মেহ্‌দি"-রঞ্জিত শ্মশ্রু এবং স্থূল যষ্টি লইয়া আর একজন মুসলমান তাড়া-তাড়ি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া খাঁ সাহেব তাঁহার তাম্বুল-রঞ্জিত দন্তরাজি আমূল প্রকাশিত করিয়া কহিলেন "আঃ হা! হাকিম সাহেব! আইয়ে, আইয়ে।" হাকিম সাহেব আপনার জিনিস-পত্র গুছাইয়া খাঁ সাহেবের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদির পর খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "নবাব সাহেব— কি হালত্ (অবস্থা) কেইসা ?"

হাকিম সাহেব দুঃখের সহিত বলিলেন "কুচিকিৎসায় তিনি শেষটা মারা গেলেন! আমি রোগীকে প্রায় আরাম করিয়াই আনিয়া-ছিলাম, কেবল একটু শ্বাসের জোর আর "ছাতির ধড়্‌ফড়ি" ছিল। গয়া হইতে বাঙ্গালী ডাক্তার আসিয়াই সর্ব্বনাশ করিল! হাত ফুঁড়িয়া পিচকারি করিয়া কি দিল, আর দুই

ঘণ্টার মধ্যেই নবাবসাহেব "কজা" করিলেন! আসল কথা, ইংরাজিতে "প্লেগের" কোন ঔষধই নাই। ইহার প্রকৃত ঔষধ হইতেছে মিছ্‌রির সরবৎ আর আফিং। পর্য্যায়ক্রমে মিছরির সরবৎ আর আফিমের সরবৎ ২৪ ঘণ্টা দিতে পারিলে যেমনই রোগ হউক আরাম হইবেই। আমি এমনি করিয়া "হাজারো" রোগী আরাম করিয়াছি। খাঁ সাহেব সোচ্ছ্বাসে বলিলেন "আলবৎ। দাবাই তো ইউনানী। উহার কাছে অন্য চিকিৎসা কিছুই নয়।"

এই বিষয়ের আলোচনা শেষ হইতে না হইতে গাড়ী ওয়ার্‌সেলিগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিল। খাঁ সাহেব সপরিবারে বাটী যাইতেছিলেন। এইখানে তাঁহার নামিবার কথা। খাঁ সাহেব "পাল্কী" "পাল্কী" বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাল্কীর কোন লক্ষণই দেখা গেল না। খাঁ সাহেব একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"আবরু" রক্ষা করিয়া কিরূপে বিবিসাহেবাকে গাড়ী হইতে নামান যায়, ইহা বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল

তাড়াতাড়ি দুইজন কুলিকে ডাকিয়া খাঁ সাহেব যবনিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট একখানির অধিক চাদর ছিল না। বিপন্ন খাঁ সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন "চাদর" "চাদর"! সকলেই আগ্রহাতিশয়ে বলিয়া উঠিলেন "হাঁ হাঁ, জরুর, জরুর!" কিন্তু কাহারও নিকট "তোয়ালিয়া" ভিন্ন আর কিছুর সন্ধান পাওয়া গেল না!

এই সময়ে ক্ষুণ্ণচিত্ত শেঠজি একখানি স্থূল চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ঘৃতের দর মণকরা কত করিয়া চড়াইয়া দিলে সাড়েসাত টাকা জুতার মূল্য উঠিয়া যাইতে পারে, মুদিত চক্ষে সম্ভবতঃ এই কঠিন সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন সময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। নিরুপায় খাঁ সাহেব তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া সবেগে শেঠজির গাত্রবস্ত্রখানি টানিয়া লইয়া পত্নীর "আবরু" রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। চৈতন্যপ্রাপ্ত শেঠজি সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ দিয়া প্লাটফর্ম্মে পড়িলেন। খাঁ সাহেব ছুটিয়া গিয়া কুলির হস্তে চাদর দিয়া বলিলেন "জল্‌দি করো। চাদর পাক্‌ড়ো।" কিন্তু কুলি চাদর ধরিবার পূর্ব্বেই শেঠজি ব্যাঘ্রবিক্রমে খাঁ সাহেবের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "শালা চোট্টা! চাদর লেকে ভাগ্‌তা?" শেঠজির বিশাল উদরের গুরুভারে খাঁ সাহেব মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হইলেন। বিপন্ন খাঁ সাহেব করুণস্বরে বলিলেন "আরে ছোড়ে ছোড়ে, গাড়ী খুলেগী।" শেঠজি গর্জ্জিয়া উঠিলেন? "কেয়া? ছোড়েগা শালা চোট্টা? তুমকো পুলিশমে দেউঙ্গা।" খাঁ সাহেব শেঠজির বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই শেঠজির "জগদ্দল" দেহ-ভার হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না।

হাজি সাহেব এবং হাকিম সাহেব উভয়েই গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন "ওঃ ওঃ কেয়া বদ্‌বখ্‌ত!" কিন্তু কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণে শেঠজির চৈতন্য হইল। তিনি খাঁ সাহেবকে ছাড়িয়া চাদর লইয়া দ্রুতবেগে চলিষ্ণু গাড়ীর

পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিবামাত্র ষ্টেশন-মাষ্টার চীৎকার করিয়া উঠিলেন "হাঁ, হাঁ, খবরদার চল্‌তি গাড়ী মে মত্‌ চঢ়ো!" ষ্টেশনমাষ্টারের ইঙ্গিতে একজন কুলি শেঠজির কোমর ধরিয়া সজোরে ঝুলিয়া পড়িল। শেঠজি সশব্দে প্লাটফর্ম্মের উপর পড়িয়া গেলেন। খাঁ সাহেব বিশুদ্ধ পারস্য ভাষায় আপনার দুরদৃষ্ট, "কাহার" গণের নির্বুদ্ধিতা, এবং শেঠজির "সয়তানি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে টেলিগ্রাম করিবার জন্য ক্ষুণ্ণমনে "তার ঘরে" প্রবেশ করিলেন।

হাকিম সাহেব ও হাজি সাহেব নিজ নিজ আসনে পুনরাসীন হইয়া উভয়েই দুঃখের সহিত বলিলেন যে গাড়ীতে ভদ্রমহিলার "আবরু" রক্ষা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। মৌলভি মহম্মদ মির্জ্জা সাহেব কহিলেন "ইহার একমাত্র উপায় আছে। আমার "ওয়ালিদ্" (পিতা) বরাবর সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন এবং আমিও এ বিষয়ে সেই পন্থারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হইলে আমরা একখানি করিয়া খোলা কয়লার গাড়ী (coal truck) আনাইয়া লই। তাহারই উপর বেহারারা "ঘেরা টোপ" দেওয়া পাল্কী সমেত স্ত্রীলোকদের উঠাইয়া দেয়। যেখানে নামাইবার প্রয়োজন হয়, সেখানে পাল্কীসমেত নামাইয়া লয়। ইহাতে ২০০।১০০ খরচ হয় বটে, কিন্তু এরূপ না করিলে কিছুতেই ইজ্জত থাকে না।"

মির্জ্জা সাহেবের অদ্ভুত আবিষ্কার-কাহিনী শ্রবণে মুগ্ধ হাকিম ও হাজি সাহেব কহিলেন "বাহবা! ইয়ে আপ্‌নে বহুত্‌ হি উম্‌দা তরিকা (কৌশল) নিকালা। সাবাস!"

মির্জ্জা সাহেব বলিলেন আমাদের "খান্‌দানে" (পরিবারে) ইজ্জতের খেয়ালটা বরাবরই খুব বেশী। একবার আমার "চাচী" প্রসবকালে কিছুতেই প্রসব হইতে পারেন না। প্রতিবেশীরা সকলেই আসিয়া ধরিল একবার ডাক্তার সাহেবকে আনান হউক, নহিলে জীবন-সঙ্কট। কিন্তু আমার চাচা কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "জান্‌সে ভি ইজ্জত বড়া; জান যায় সো কবুল, কিন্তু আমি "বে-ইজ্জতি" হইতে দিব না! চাচী মারা গেলেন, তথাপি চাচা নিজের ইজ্জত নষ্ট হইতে দিলেন না।

দীর্ঘশ্মশ্রু অঙ্গুলিসাহায্যে আলোড়িত করিয়া হাজি সাহেব বলিলেন "আলবৎ। ইজ্জতকে খেয়াল এইসাই হোনা চাহিয়ে।"

গাড়ী নওয়াদা পৌঁছিল। টেলিগ্রাম পাইয়া টিকিট কলেক্টর আসিয়া শেঠজির মোট এবং খাঁ সাহেবের রোদনরতা বিবি সাহেবাকে নামাইয়া লইল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় স্তর

(১)

মণ্টফারমিল, ফ্রান্সের একটি গণ্ডগ্রাম। সহর হইতে অনেকটা দূর, তবে ডাকগাড়ীর পথে বলিয়া কতকটা সহর-ঘেঁসা; একটিমাত্র সরাই; যাত্রীরা সেইখানেই আসিয়া উঠিত। থেনেডিয়ার-পরিবার তাহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং একাধারে পাচক, ভৃত্য এবং পরিবেশক। অনর্থক ব্যয়বাহুল্য বলিয়া তাহারা পরিচারক বা পরিচারিকা রাখিত না; সরাইয়ের আয় হইতে কষ্টে-সৃষ্টে একরূপে তাহাদের কাটিত

সে দিন প্রাতঃকালে, থেনেডিয়ারের স্ত্রী, সদর দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া, রাস্তার অপরপার্শ্বে ক্রীড়ারতা তাহার কন্যাদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিয়াছিল। কন্যা দুইটিই শিশু, একটির বয়স আড়াই, অপরটির বয়স দেড় বৎসর মাত্র; দু'জনে একটা ভাঙ্গা গাড়ীর শিকলের দোলনা করিয়া খুব দোল খাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। সে নিষ্কলঙ্ক সরল মুখ দুইটি আনন্দে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বাতাসে তাহাদের কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ উড়িয়া উড়িয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল; পার্শ্বস্থ উদ্যান হইতে বেলিমল্লিকার গন্ধটুকু যেন তাহাদের গাত্রসৌরভ লইয়াই ভাসিয়া আসিতেছিল। সতর্ক এবং স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া জননী গাহিতেছিল—

এমন সময় পশ্চাদ্দিক্ হইতে মধুর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"বেশ সুন্দর মেয়ে দুটি ত' আপনার!"

প্রশ্নকর্ত্রী এক যুবতী; তাহার কোলে শিশু কন্যা, দক্ষিণ হস্তে একটা ভারি ব্যাগ।

অপূর্ব্ব শ্রী সে শিশুকন্যার! বিধাতা যেন আপন ছাঁচে তাহার মুখখানি গড়িয়া, তুলিকা দিয়া তাহার আঁখিপক্ষ্ম এবং যুগ্ম ভ্রূ চিত্রিত করিয়াছিলেন। রাজকন্যার ন্যায় তাহার আভরণ ও বেশভূষা। জননীর স্নেহশীতল বক্ষে বালিকা ঘুমাইতেছিল। জননীর কিন্তু বেশভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না; দীনদরিদ্রার ন্যায় তাহার আকৃতি, অঙ্গুলিগুলি সূচিবিদ্ধ,—তাহাকে যে খাটিয়া খাইতে হয় তাহাতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। তথাপি লুকাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহার মুক্তাধবল দন্তপাতি অশ্রুসজল চক্ষু, অযত্নরক্ষিত আজানুলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, এবং মুখের সে বিষন্ন মাধুরীতে তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। জননী ক্রোড়স্থ শিশুর

প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন,—সে দৃষ্টি কেমন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; স্তন্যদাননিরতা জননী ধাত্রীকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিবেন।

কে সে জননী?—সে ফ্যান্‌টাইন।

এইখানে আমরা একটা পূর্ব্বকথা বলিব। কে এ ফ্যানটাইন?

ফ্যান্‌টাইন দরিদ্রা শ্রমজীবিকন্যা। যৌবনের প্রারম্ভে প্রতারকের কুহকে ভুলিয়া সে আজন্মের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসে।—থলোমিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াই সরলাকে ভুলাইয়া আনে। কিন্তু, একদিন, দু' দিন, সপ্তাহ, মাস, করিয়া ক্রমে ক্রমে দুই বৎসর কাটিল, তবু থলোমিয়ে তাহার সে প্রতিজ্ঞা পালন করিল না। নানা ছলে, নানা কৌশলে সে সে কথা চাপা দিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সহসা সে যখন অন্তর্দ্ধান করিল, তখন বালিকা সত্যই অকূল পাথারে পড়িল। হায়, সে যে থলোমিয়েকে তাহার সর্ব্বস্বই দিয়াছিল,—পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া সে ত কিছুরই বিচার করে নাই,—বিবাহিতা স্ত্রীর মতই সে যে আপনাকে উৎসর্গিতা করিয়াছিল। বালিকা চারিদিক্ শূন্য দেখিল,—সে তখন অন্তর্বত্নী!

তাহার নিজের অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, একে একে বিক্রয় করিয়া সে কয়েক মাস চালাইল। তারপর, অনেক অনুসন্ধানে থলোমিয়ের ঠিকানা জানিয়া, একদিন এক সাধারণ মুহুরীকে দিয়া তাহাকে একখানি পত্র লিখিল—নিজে সে লেখাপড়া জানিত না। থলোমিয়ে তখন 'মথুরার রাজা'; 'ব্রজের কথা' আর তখন তার মনে থাকিবে কেন? তাই সে ফ্যান্‌টাইনের পত্রের কোন উত্তর দিল না। ফ্যানটাইন তার পর উপর্য্যুপরি আরও দুইখানি পত্র লেখাইল,—তাহাতেও কোন ফল হইল না। তার নিজের প্রতি না থাকুক, তাঁর আপন সন্তান—নিষ্কলঙ্ক স্বর্গের ছবি—তার প্রতিও তাঁর দয়া নাই?—অভাগিনীর শূন্য দেউলের ক্ষীণ দীপশিখা ক্রমশঃ নির্ব্বাণোন্মুখী হইতে লাগিল।—স্বেচ্ছায় সে ইহজীবনের সব সুখ নষ্ট করিয়াছে, ক্ষণিক সুখের মন্থনে যে হলাহল উঠিয়াছে আজীবন সে বিষ তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে বালিকা তাহা বুঝিল। তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ হইলে তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না; যাহার সে অনুপম রূপসম্পত্তি, তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব কি? কিন্তু আমরা জানি তাহার প্রকৃতি অন্য ধাতুতে গঠিত ছিল; সংসারানভিজ্ঞা বালিকা একবার মাত্র পদস্খলিতা হইলেও, রমণীসুলভ সঙ্কোচ এবং পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্টা হইবার সে প্রবৃত্তি তখনও তাহার হয় নাই।

ভালবাসা জীবনের ভ্রান্তি; হয় হউক, কিন্তু ফ্যানটাইনের সারল্যের ছবিখানি সে ভ্রান্তির সলিলের উপর ভাসিতেছিল—এ কথা আমরা শতবার বলিব। যে দেবতার চরণে সে তাহার যৌবনের প্রথম আবেগ, জীবনের প্রথম প্রণয়, অন্তরের প্রথম অর্ঘ্য উৎসর্গিত করিয়াছিল,—প্রতারিতা হইয়াও, কার্য্যে বা চিন্তায় তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইতে সে চাহে নাই; তাঁহার প্রসাদী ফুল অন্য কোন দেবতার চরণে অর্পণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। প্রথম যৌবনে সর্ব্বপ্রথম যে মূর্ত্তিকে স্ত্রীলোকে একবার বরণ করিয়া লয়, যাহার

মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সে একবার আত্মবিসর্জ্জন করে, সে দেবতার আসন তাহার হৃদয়ে চির প্রতিষ্ঠিতই থাকে ; উপেক্ষায়, বিচ্ছেদে, ঘটনা-চক্রের ঘাতপ্রতিঘাতে, সে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, প্রথম প্রেমের স্মৃতি, দুঃখে মধুর আশায় উজ্জ্বল হইয়া, চিরদিন তাহার জীবনে এক অনুপম মাধুরী সৃজন করিয়া রাখে। 'দুঃখের বেশে আসিলে'ও চিরদিবসের সে রাজার জন্য চিরদিন তাহার হৃদয় উন্মুখী হইয়া থাকে।—ফ্যানটাইন তখনও পর্য্যন্ত সেই একনিষ্ঠা সাধিকা ছিল। তাই সংসারের নির্ম্মায়িকতায় এবং ঘটনাচক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও তখনো সে তলাইয়া যায় নাই। কিন্তু অর্থহীনা নিঃসহায়া তাহার অবস্থা প্রতিদিনই শোচনীয়তর হইয়া উঠিতে-ছিল ; তাহা বুঝিয়াই, 'শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়' ভাবিয়াই, প্রাণপণে আপনাকে প্রলোভনের হাত হইতে সে দূরে দূরে রাখিতে লাগিল। অবশেষে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করাই সে স্থির করিল। বহুদিন হইতে তাহারা প্রবাসী হইলেও, সেখানে কেহ না কেহ তাহাকে চিনিয়া দয়া করিতে পারে, কাজকর্ম্মেরও তাহার সুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহার কোলের শিশু ? তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যে অসম্ভব ; তার অস্তিত্বের কথা তাহাকে গোপন করিতে হইবে। ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তায় চিত্ত অধীর হইয়া উঠিলেও, সে অধৈর্য্য তাহাকে দমন করিতেই হইবে। কিন্তু কোথায় সে তাকে রাখিয়া যায় ? সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে অগ্রসর হইতে-ছিল, এমন সময় অকস্মাৎ থেনেডিয়ারের কন্যা দুইটির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল ; তাহাদের সে শিশুসুলভ আনন্দোচ্ছ্বাস, অকলঙ্ক সরল মুখচ্ছবি তাহাকে আকৃষ্ট করিল। তারা যেন দেবদূতের ন্যায় তাহাকে বলিতেছিল—"এই ই স্বর্গ, এইখানে আয়।" অভাগিনী মুগ্ধা হইল, তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থেনেডিয়ার-পত্নীর কাছে যাইয়া তাই সে মৃদুস্বরে বলিল—"সুন্দর মেয়ে দু'টি ত আপনার !"

অতি হিংস্র পশুও অপরকে তাহার সন্তানদের আদর করিতে দেখিলে, শান্ত হইয়া আসে ; থেনেডিয়ার-পত্নী ত দূরের কথা। তাই মুখ তুলিয়া, ধন্যবাদ দিয়া, আগন্তুকাকে সে বসিতে বলিল। পরিচয়ে বলিল—"আমি থেনেডিয়ারের স্ত্রী ; এটা আমাদেরই সরাই।" তারপর গুণ্ গুণ্ করিয়া পুনরায় গাহিতে লাগিল ;—

থেনেডিয়ার—অন্ততঃ সে নিজে এইরূপ প্রচার করিত—বহুপূর্ব্বে সৈন্যদলভুক্ত ছিল ; এবং বিখ্যাত ওয়াটর্লু যুদ্ধের সময় সে না কি কোন এক আহত সেনাপতিকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করে। সেই ঘটনার উপলক্ষ্য করিয়াই সে "ওয়াটার্লুর সার্জ্জেণ্ট" বলিয়া তাহার সরাইখানার নামকরণ করিয়া-ছিল। তার পত্নীও সৈনিকের যোগ্যা স্ত্রী ; তাহার পাটল কেশ, তাম্রাভ গাত্রবর্ণ, এবং অসম কর্কশ দেহযষ্টি দেখিয়া সকলেই বলিত—"যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যং।" তবে স্ত্রীর জীবনে একটু বৈচিত্র্য ছিল,—বটতলার এবং বাজে নাটক নভেল পড়িয়া কতকটা নায়িকাসুলভ নভেলী ভাব তাহার মধ্যে কঠোরে কোমলে মিশিয়া ছিল। তত্রাচ, সে বসিয়া ছিল তাই, নতুবা তাহার পূর্ণ অবয়ব এবং সম্পূর্ণ মুখখানা

দেখিলে ফ্যানটাইন হয় ত সন্ত্রস্তা এবং সন্দিগ্ধা হইত ; কি করিত বলা যায় না, হয় ত কন্যাকে সেখানে রাখিবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিত। —কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ অন্যরূপ। এমনি সামান্য সূত্রের উপর কত সময় মানবের অদৃষ্ট দুলিতে থাকে।

আগন্তুকা আপন জীবন-বৃত্তান্ত, সময়োপযোগী কতক পরিবর্ত্তিত করিয়া, বর্ণনা করিল। বলিল—"তাহার স্বামী প্যারীতে দিনমজুরের কাজ করিতেন, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় অনাথা, শিশুকন্যাকে লইয়া সে কাজের সন্ধানে অন্যত্র যাইতেছে, দরিদ্রা সে, তাই সে প্রায় সব পথটা হাঁটিয়াই আসিয়াছে, মেয়েকেও কতক হাঁটাইয়াছে,—তাই তার চাঁদের কণা ক্লান্ত হইয়া তার বুকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ইত্যাদি" বলিয়া কন্যাকে দৃঢ়তরালিঙ্গনবদ্ধা করিয়া সাগ্রহে তাহার মুখচুম্বন করিল।

সে স্পর্শে শিশু জাগিয়া উঠিয়া, আয়ত সুনীল নেত্রে জননীর প্রতি চাহিল।—কি দেখিল?—কিছুই নয়; অথচ সবই যেন সে দেখিল। তারা যে দেব-দূত তা বুঝি শিশুরা বোঝে, আমরা যে দুর্ব্বল মানব তাও বুঝি তারা জানে; তাই আমাদের সন্দিগ্ধ পুণ্যের পার্শ্বে তাদের উজ্জ্বল পবিত্রতার ছবি এমন সারল্যে কোমল, গাম্ভীর্য্যে মধুর!

কন্যাকে ফ্যানটাইন ধরিয়া রাখিতে পারিল না; ক্রোড় হইতে স্খলিতা হইয়া ক্রীড়ারতা বালিকা দুইটির প্রতি সে ছুটিল। থেনেডিয়ার-পত্নী তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে বলিল,—"বেশ হয়েছে। তিনটিতে খেলা কর।"

সে বয়সে ভাব হইতে বিলম্ব হয় না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিন জনে পূর্ণ উৎসাহে 'গর্ত্ত কাটাকাটি খেলা' খেলিতে আরম্ভ করিল। নবাগতার উৎসাহই খুব বেশী; শিশুর আনন্দোচ্ছ্বাসে জননীর অন্তর-ছবিখানি প্রতিফলিত হয়, এ কথা খুবই সত্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে থেনেডিয়ার-পত্নী প্রশ্ন করিল—"তোমার মেয়ের নাম কি বাছা?"

"কসেট্।"

"ক' বছরের হল?"

"এই তিন চল্‌ছে।"

'তা হ'লে ত আমার বড়টির বয়েসী।"

শিশু তিনটি তখন বিস্ময়চকিত ভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তার বিশেষ কারণও ছিল। একটা বৃহৎ কীট মাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তা দেখিয়া তাহাদের কত ভয়, অথচ কি আনন্দ! তাহাদের ক্ষুদ্র ললাট তিনটি পরস্পর সংলগ্ন, তিনটি ক্ষুদ্র মস্তকের উপর একটি দিব্যালোকসম্পাত!

"ছেলেরা কেমন এক দণ্ডে ভাব করে নেয় দেখেছ? তিনটিই যেন এক মায়ের পেটের!"

ফ্যানটাইন বুঝি এতক্ষণে ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। থেনেডিয়ার-স্ত্রীর হাত দু'টি ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল—"আমার মেয়েটিকে, আপনার কাছে রাখ্‌বেন?"

প্রবীণা বিস্ময়ে নবীনার প্রতি চাহিল। সে চাহনিতে 'হাঁ' কি 'না' কিছুই বুঝা গেল না। ফ্যানটাইন পুনরায় বলিল—'মেয়েকে নিয়ে ত আর আমি সেখানে যেতে পারি নে। সঙ্গে নেজুড় থাক্‌লে কোথাও কাজ পাব না। তাই ভগবানই বুঝি দয়া করে আমাকে এ দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার মেয়ে

দু'টিকে যখন দেখ্‌লাম, তখন মনে হল,—এদের মা নিশ্চয়ই খুব ভাল, আর কসেটও এদের সঙ্গে হেসে খেলে আপনার বোনের মত বেশ সুখে থাক্‌বে।—ক' দিনই ত! তার পর আবার আমি এসে নিয়ে যাবো। কসেটকে আপনি রাখ্‌বেন ?"

"তাই ত, আচ্ছা ভেবে দেখি।"

"আমি মাসে মাসে তার খরচ বলে ছ' ফ্রাঙ্ক করে দেবো।"

এমন সময় বাটীর অভ্যন্তর হইতে পুরুষ-কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—

"সাত ফ্রাঙ্কের কমে হবে না—আর, ছ' মাসের টাকা আগাম চাই।"

প্রবীণা বলিল—"ছ' মাসের হিসাবে তা হলে ত ৪২ ফ্রাঙ্ক হয়।"

নবীনা।—"বেশ, তা দিচ্ছি।"

পুনরায় নেপথ্য হইতে থেনেডিয়ার বলিল—"আর, প্রথম প্রথম বার্‌তি খরচের জন্য তা ছাড়া ১৫ ফ্রাঙ্ক বেশী চাই—।"

প্রবীণা।—৪২ আর ১৫,—সবশুদ্ধ তা হলে ৫৭ হয়।

নবীনা।—"তাও দেবো- আমার কাছে এখন ৮০ ফ্রাঙ্ক আছে; তা থেকে ৫৭ গেলেও যা থাক্‌বে তাতে এখন কিছুদিন আমার চলে যাবে। না হয় হাঁটাপথেই যাবো, তাতে খরচেরও কিছু সাশ্রয় হবে। তার পর, কাজ কর্ম্ম জুটলে, হাতে কিছু টাকা করে, ফিরে এসে আমার সোণাকে নিয়ে যাবো।"

নেপথ্য হইতে—"মেয়ের জামা কাপড় আছে ত ?" এইবার প্রবীণা মৃদুস্বরে নবীনাকে জানাইল—"উনি আমার স্বামী।"

নবীনা।—আমি তা বুঝেছিলাম। জামা কাপড় আছে বই কি, যথেষ্টই আছে; ভাল ভাল রেশমী পোষাক,—সব একডজন করে আছে। আমার হাতের এ কার্পেটের ব্যাগটা ওরই জিনিষপত্রে ভরা।

পুনরায় নেপথ্য হইতে—"সে গুলা সব রেখে যাবে ত ?"

"নইলে কোথায় নিয়ে যাবো—এত পোষাক থাকতে কি মেয়ে আমার ন্যাংটো হয়ে থাক্‌বে ?"

এতক্ষণে থেনাডিয়ার বাহিরে আসিল। বলিল "তা হলে আর আমাদের আপত্তি নেই।"

সেইভাবেই বন্দোবস্ত হইল। ফ্যানটাইন, রাত্রিটা সেই সরাইখানাতে থাকিয়া, প্রাতঃ-কালে, থেনেডিয়ারদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া, কন্যাকে সেখানে রাখিয়া রওনা হইল। খুব শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে আপনার কাছে লইয়া যাইবে, তাহার মনে তখন সেই আশা। তত্রাচ সহজভাবে কন্যার কাছে বিদায় লইলেও এক একবার সে দারুণ নিরাশাভারে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

ফ্যানটাইন চলিয়া গেলে, থেনেডিয়ার তাহার স্ত্রীকে বলিল—"আঃ, বাঁচা গেল। সেই ১১০ ফ্রাঙ্কের দেনাটা কাল শোধ দেবার দিন, গোটা ৫০ ফ্রাঙ্ক কম পড়্‌ছিল—কি করব, তাই আকাশ পাতাল ভাব্‌ছিলাম; হয় ত কাল সকালে দোকানে 'সিলই' বা পড়ত! ভাগ্যি তুমি তোমার বাচ্ছাগুলোকে নিয়ে এমন ইঁদুর-কল পেতে ছিলে!"

"হাঁ,— তবে অজান্তিতে, এই যা!" বলিয়া প্রবীণা মৃদু হাস্য করিল।

কলে ইন্দুর ধরা পড়িয়াছিল।—সে ইন্দুর-শিশু কসেট। শিকার ক্ষুদ্র হউক, তাহা

দেখিয়াই মার্জ্জারী সানন্দে লাঙ্গুলাস্ফালন করিতেছিল।

কাহারা এই থেনেডিয়ার-পরিবার? বংশ হিসাবে ধরিতে গেলে, তাহাদিগকে মিশ্র-বংশজ বলিতে হয়। নিম্নতম বংশ হইতে ক্রমোন্নত সম্প্রদায়, এবং অবস্থাবিপর্য্যয়ে অধঃপতিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী—উভয়ের মিশ্রণে যে শ্রেণী উৎপন্ন হয়, থেনেডিয়ারেরা তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে, থেনেডিয়ারদের রীতিনীতি সেইরূপ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহজাত ভদ্রতা বা শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের চিত্তের উদারতা কিছুই তাহারা পায় নাই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অতি সঙ্কীর্ণ মনা ছিল;—সামান্য কারণেই তাহারা পিশাচসদৃশ হইয়া উঠিত,—তাহাদের অননুষ্ঠেয় কোন পাপ-কার্য্যই ছিল না। এমন মানব অনেক আছে যাহারা প্রতিদিনই 'আপনা রচিত জালে আপনি জড়িত' হইয়া, জীবনে ক্রমশঃ গাঢ়তর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া থাকে;—পশ্চাদ্দিকেই তাহাদের জীবনের গতি, পুরোভাগে নহে; তাহাদের জীবন চিররহস্যাচ্ছন্ন, সর্ব্বদাই যেন কি এক আশঙ্কায় তাহারা সন্ত্রস্ত; তাহাদের পাপপূর্ণ-চরিত্রের ছায়া সর্ব্বদাই তাহাদের মুখে ঘনীভূত হইয়া থাকে, সামান্য দু'একটি কথায়, মুখ ভাবে, তাহাদের অতীতের গুপ্ত পাপকাহিনী এবং ভবিষ্যতের অন্ধকারময় ঘটনার ইঙ্গিত যেন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। থেনেডিয়ার ও তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে এ কথা খুবই খাটে।

পাপ যতই আপাতঃ বলবান্ হউক্ না কেন, সকল সময় তাহা হইতে সম্পদ্ আসে না; থেনেডিয়ারদের ব্যবসায়ই তাহার প্রমাণ—কোনও রূপে তাহাদের চলিতেছিল মাত্র। দেনার দায়ে সরাইখানা প্রায়ই বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। ফ্যানটাইনের প্রদত্ত ৫৭ ফ্রাঙ্ক এ যাত্রা তাহাদিগকে উত্তমর্ণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু পরমাসে পুনরায় সেইরূপ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল; তখন থেনেডিয়ারের স্ত্রী কসেটের মূল্যবান্ পরিচ্ছদাদি প্যারীতে লইয়া যাইয়া ৬০ ফ্রাঙ্কে বন্ধক দিয়া আসিল। সে অর্থও যখন নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন হইতে তাহারা কসেটের সহিত অনুগ্রহজীবীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। মূল্যবান্ পোষাকের যাহার অভাব ছিল না, থেনেডিয়ার-কন্যাদের পরিত্যক্ত—অর্থাৎ শতচ্ছিন্ন, অব্যবহার্য্য—বস্ত্রাদিতে তাহার দেহতাপ রক্ষা হইতে লাগিল; তাহাদের উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জনে কোনোরূপে তাহার উদরপূর্ত্তি ঘটিতে লাগিল। অথচ এদিকে ফ্যানটাইন, প্রতিমাসেই পত্রোত্তরে জানিতে লাগিল—"কসেট্ ভাল আছে, বেশ মনের স্ফূর্ত্তিতেই আছে।"—নির্দ্দিষ্ট ছয়মাস অতীত হইয়া গেলে, ফ্যানটাইন চুক্তিমত, তাহার মাসিক দেয় ৭ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিল। উত্তরে থেনেডিয়ার লিখিল—"৭ ফ্রাঙ্কে কি হবে? এখন থেকে ১২ ফ্রাঙ্ক করে চাই।" পরমাসে ফ্যানটাইন ১২ ফ্রাঙ্কই পাঠাইল;—মেয়ে ভাল আছে,—কাজেই সে কোন আপত্তি করিল না।

লোকচরিত্র চিরদিনই দুর্জ্ঞেয়। অনেক চরিত্রে ভালবাসা এবং হিংসা পাশাপাশি গ্রথিত থাকে। থেনেডিয়ারের স্ত্রী আপন কন্যা দু'টিকে যে পরিমাণ ভালবাসিত, কসেটের প্রতি তার

সেই পরিমাণ ঘৃণা ছিল। অবশ্য সেটা সঙ্কীর্ণ-মনের লক্ষণ; জননীর ভালবাসা এতটা সঙ্কীর্ণ হওয়া পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমরা কি করিব? আমরা যেমনটি দেখিয়াছি তেমনই লিখিতেছি;—তবে সংসারে এমন জননীও অনেক থাকে। কসেট শিশু কসেট তাহার গৃহে তাহার কন্যা দুইটির সহিত আলো-বাতাসের ভাগ বসাইতে আসিতেছে—তাই সে ভাবিত, আর জ্বলিয়া মরিত। আদর, যত্ন, হাতটান—তিনটাই তার পুর্ণমাত্রায় ছিল,—কসেটের অভাবে, এতটা স্নেহ থাকিলেও, হয় ত তিনটাই সমভাবে কন্যাদের উপর বর্ষিত হইত; কিন্তু কসেট আসিয়া অবধি কিল চাপড়ের ভারটা সবই আপনার উপর লইল, আদর যত্ন যা কিছু সবই তাহাদের জন্য রাখিয়া দিল। তত্রাচ তাহার নিস্তার ছিল না।—অসহায়া, কোমলা, সংসারানভিজ্ঞা, বালিকা দণ্ডে দণ্ডে নির্যাতিত হইত, আর তাহারই পার্শ্বে অপর দুইটি বালিকা স্নেহের শীতল ছায়ায় বসিয়া থাকিত।—এমনই সংসার!

শুধু জননী বলিয়া নয়, কন্যাদ্বয়ের—ইপোনাইন ও এজেলমায়েরও—ব্যবহার বড় নির্ম্মম ছিল। তাহাদের কি দোষ? সে বয়সে বালিকারা ত জননীরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র: সে ছায়া আয়তনে ক্ষুদ্র—এই যা!

এই ভাবে বৎসর দুই কাটিল। প্রতিবেশিনীরা সব কথা জানিত না; তাহারা ভাবিত, জননী বুঝি আর কসেটের কোন উদ্দেশ লয় না। তাই তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত—"যা হোক্, থেনেডিয়ারদের খুব ভাল বল্‌তে হবে কিন্তু বাছা। পরের মেয়েকে ঘরের কড়ি দিয়ে কে পোষে বল ত?"

ক্রমে ক্রমে কসেটের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে থেনেডিয়ারের মনে সন্দেহ জন্মিল; তাই সে জো পাইয়া তখন হইতে মাসিক ১৫ ফ্রাঙ্কের দাবী করিয়া বসিল, লিখিল—"মেয়ে এখন বড় হচ্ছে, বেশী খাচ্ছে, এর কমে হবে না।" পরমাস হইতে ১৫ ফ্রাঙ্ক করিয়াই তাহার নিকট আসিতে লাগিল।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল, কসেটের দুর্দ্দশাও ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। যতদিন সে নিতান্ত শিশু ছিল, ততদিন ইপোনাইনদের কৃত অপরাধের সমস্ত শাস্তি তাহাকে বহন করিতে হইত; পাঁচ বৎসরে পড়িতেই বাটীর পরিচারিকারূপে সে গণ্যা হইল। পাঠক, কথাটা আশ্চর্য্য ভাবিবেন না; এমনই ঘটিয়া থাকে! বিখ্যাত দস্যু দুমলার্দ্দের বিচারে কর্ত্তৃপক্ষের নথিপত্র হইতে জানা যায় যে, পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক, উদরান্ন-সংস্থানের উপায়ান্তর না দেখিতে পাইয়া, পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালে দস্যুদলপতি হয়। অতএব কসেট যে সে অল্প বয়সে অবস্থাবিপর্য্যয়ে দাসীগিরি করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

চিঠিপত্রাদি লইয়া যাওয়া, ঘরদ্বার উঠান প্রভৃতি ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, ছোট খাট মোট-ঘাট বহা;—এ সকলই এখন হইতে তাহাকে করিতে হইত। বিশেষতঃ কয়েক মাস হইতে ফ্যানটাইন টাকা পাঠাইতে পারে নাই, কাজেই থেনেডিয়ারেরা বরং জোর করিয়াই তাহাকে বেশী বেশী খাটাইতে লাগিল। আজ হঠাৎ ফ্যানটাইন ফিরিয়া

আসিলে, কসেটকে দেখিয়া কখনই আপনার কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিত না,—তিন বৎসর পূর্ব্বের সেই নধরদেহা বালিকা এতই শীর্ণা হইয়া গিয়াছে; অত্যাচার এবং দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়া সে ক্ষুদ্র বালিকা এই বয়সেই এতই গম্ভীরপ্রকৃতি এবং এমনই লুপ্ত-শ্রী হইয়া পড়িয়াছে! থাকিবার মধ্যে চক্ষু দুইটি তার আজিও তেমনি আয়ত ছিল,—তাহাতে বুঝি তাহার দীনভাবটুকু আরও পরিস্ফুট হইয়া থাকিত। থেনেডিয়ারেরা তা দেখিয়া বলিত—"পাজি ছুঁড়ি! হাড়ে হাড়ে সয়তানি!"

দারুণ শীতের সময়েও, প্রত্যূষে উঠিয়া, শতছিন্ন গাত্রবস্ত্রে, কাঁপিতে কাঁপিতে, ছোট ছোট হাত দু'খানিতে প্রকাণ্ড সম্মার্জ্জনী লইয়া তাহাকে ঘরদ্বার ঝাঁট দিতে হইত। গ্রামের লোকেরা তাই তাহার নাম দিয়াছিল—"চাতক পাখী।" চাতক পাখীটার মতই, দেখিতে সে ক্ষুদ্র ছিল, তাহারই মত প্রত্যূষে সকলের আগে উঠিতও বটে; তবে উভয়ের মধ্যে একটু মাত্র প্রভেদ ছিল;—এ চাতকে গান গাহিত না, বুঝি গান সে জানিত না!

ফ্যানটাইনের কি হইল, এখন তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

যথাসময়ে সে তাহার পিতৃগ্রাম ম—তে আসিয়া পৌছিল। বহুদিন পূর্ব্বে সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলেও, আব্ছায়া মত কতকটা তাহার মনে ছিল; কিন্তু সেখানে পৌছিয়া সেটাকে স্বগ্রাম বলিয়া প্রথমতঃ সে চিনিতেই পারিল না,—এখন তাহার এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যেখানে সামান্য কয়েক ঘর গৃহস্থ পরিবার লইয়াই গ্রামের সমগ্র জন-সংখ্যা ছিল এখন সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল-কারখানা, অজস্র দোকান-পাট, কত নূতন নূতন অট্টালিকা,—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিসে সে গ্রামের এখন এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল তাই বলিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ম—গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র ছিল, কয়েক ঘর শ্রমজীবী মাত্রই সেখানে বসতি করিত—পুরুষানুক্রমে তাহারা কালো বনাত ও কালো কাঁচের চুড়ির ব্যবসায় করিত।—কিন্তু কাঁচা মাল (Raw materials) দুর্ম্মূল্য হওয়ায়, বাধ্য হইয়া তৈয়ারী জিনিসের দাম তাহাদের চড়াইতে হইত—কাজেই দামী বলিয়া বাজারে তত কাটতি ছিল না। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কিন্তু একজন বিদেশী লোক আসিয়া দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-প্রণালীতে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংসাধিত করে। পরিবর্ত্তন যৎসামান্য, কিন্তু তাহাতেই সে ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইল। দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় এবং তজ্জন্য মূল্য সুলভ হওয়ায়, এখন হইতে সে সব জিনিসের বিক্রয় অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি পাইল। ফলে, ক্রেতা বিক্রেতা, এবং শ্রমজীবিসম্প্রদায় প্রত্যেকেই লাভবান্ হইতে লাগিল অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিক্রয় করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণ লাভ থাকিতে লাগিল; এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির উন্নতি এবং শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধিও সম্ভবপর হইল। দেখিতে দেখিতে নবাগত লোকটি আপনি সমৃদ্ধ হইয়া সে পল্লীকেও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল।—কিন্তু সাধারণে এ পর্য্যন্ত তাহার বংশপরিচয় বা পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিত না।—লোকে বলিত কয়েক শত ফ্রাঙ্ক মাত্র লইয়া সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় সে সে গ্রামে প্রবেশ করে; তারপর পরিশ্রম এবং কার্য্য-

কুশলতার গুণে এবং সে নূতন আবিষ্কারের ফলে তাহার এ সমৃদ্ধি; প্রথম যখন সে আসে তখন সাধারণ একজন শ্রমজীবীর ন্যায়ই তাহার আচার-ব্যবহার পরিচ্ছদ ছিল। লোকে আরও বলে যে, সে দিন তাহার আগমনের অব্যবহিত পরেই সন্ধ্যার সময় সে গ্রামে আগুন লাগে, এবং নবাগত লোকটি তাহা দেখিয়া আপন জীবন তুচ্ছ করিয়া জ্বলন্ত গৃহ হইতে দুইটি শিশুকে উদ্ধার করিয়া আনে,-- সে শিশু দুইটি পুলিশের দারোগার। সেই আকস্মিক বিপদে কৃতজ্ঞ কর্ত্তৃপক্ষ আর তাহার ছাড়পত্র দেখিতে চায় নাই। লোকটি সেই দিন হইতে 'ফাদার ম্যাডেলিন' নামে পরিচিত হইয়া সে গ্রামে বাস করিতে লাগিল। তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ।

লোকটি উদারপ্রকৃতির, সর্ব্বদাই সে চিন্তামগ্ন থাকিত। সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন স্বহস্তে তাহার ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই দুই বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার কার্য্যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিল,—প্রত্যহ সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ তাহার কারবারে খাটিতে লাগিল; কার্য্যের সুবিধার জন্য তখন ম্যাডেলিন স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রমজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র দুইটি কারখানা করিল,—প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ তত্ত্বাবধায়ক এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। তবে অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক বা বালিকার সেখানে স্থান ছিল না, ম্যাডেলিন এই একটি মাত্র বিষয়ে কঠোর ছিল। তাহার আগমনে সে মুমূর্ষু প্রদেশ কর্ম্মের দীক্ষা লাভ করিয়া যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল; চারিদিকে উৎসাহ-উন্মাদনা পরিস্ফুট হইতে লাগিল; শ্রম-বিমুখতা এবং দারিদ্র্য অন্তর্হিত হইল; অতি দুঃখীরও অন্নের সংস্থান হইল; দীন-দরিদ্রের আবাসও আনন্দরেখায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কার্য্যের জন্য কেহ আসিলে ম্যাডেলিন কখনও তাহাকে ফিরাইত না, শুধু বলিত,—"স্ত্রী হও, আর পুরুষ হও,—সৎপথে থাক।"

ল্যাফিটের ব্যাঙ্কে ইতিমধ্যেই তাহার প্রায় ৬॥০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক জমিয়াছিল; অথচ সে কখনও অর্থগৃধ্নু ছিল না। হাঁসপাতাল, বালক এবং বালিকাদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয়, আতুরাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি শত শত অনুষ্ঠানে তাহার উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে লাগিল।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই পরান্নচিকীর্ষু থাকে; ম—তেও ছিল। প্রথম প্রথম তাহারা বলাবলি করিত—"লোকটা টাকা চায়।" তার পর তাহার দানব্যয় দেখিয়া বলিল—"লোকটার মনে একটা উচ্চাশা আছে।" কথাটা অনেকের মনে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল; কারণ, ম্যাডেলিনের ধর্ম্মের দিকেও বেশ একটু টান ছিল,—সাধারণের সহানুভূতিও তজ্জন্য তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অবশেষে যখন একদিন তাৎকালিক "মনিটর" পত্রে প্রকাশিত হইল যে, তাঁহার সাধারণ সৎকার্য্যের জন্য এবং পুলিশের অধ্যক্ষের অনুরোধে স্বয়ং সম্রাট্ ম্যাডেলিনকে ম—র নগরাধ্যক্ষের পদ প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহারা যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"দেখেছ ত, ঠিকই বলেছিলাম। লোকটার মনে মনে বরাবরই এমনই একটা মতলব ছিল। যা কিছু ওর দান-ধ্যান, সবই এর জন্য।"

ম্যাডেলিন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে পদ প্রত্যাখ্যান

করিল। সেই বৎসরের শেষে তাহার নূতন আবিষ্কারের ফলে, সম্রাট্ তাহাকে সি, এল্, এচ্ (Cross of the Legion of Honour) উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলেন। তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল—"ওঃ বুঝেছি, ও এই রকম একটা বড় উপাধি চায়।"

ম্যাডেলিন সে সম্মানও প্রত্যাখ্যান করিল। তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া, ম্যাডেলিনের এরূপ ব্যবহারের কোন কারণ না বুঝিতে পারিয়া, শেষে বলিল—"লোকটা একটা Adventurer (হুজুকে)।" অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবার-সমূহ হইতে ম্যাডেলিনের নামে অজস্র নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল। সাধারণ শ্রমজীবিভাবে যেখানে তাহার কোন স্থান ছিল না, আজ অবস্থার উন্নতিতে সে সব দ্বার তাহার জন্য সাদরে উন্মুক্ত হইল। তত্রাচ ম্যাডেলিন আপনাকে দূরে দূরেই রাখিতে লাগিল। তাহাতে অনেকে বিরক্ত হইল;—কেহ বলিল—"ও একটা কোথাকার গেঁয়ো ভূত, মূর্খ,— ভদ্রপরিবারে ও মিশবে কি করে।" কেহ বলিত "পশু ও, ভদ্রতার কি জানে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। ম্যাডেলিন কিন্তু তাহাতে টলিল না—অবশেষে, একদিন কর্তৃপক্ষ না-ছোড়বান্দা হইয়া তাহাকে ধরিলেন, গ্রামস্থ সকলে পথে ঘাটে তাহাকে অনুনয় করিতে লাগিল; শেষে এক বৃদ্ধা ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে বলিল—"ভাল, নগরাধ্যক্ষ হলে দেশের ও দশের উন্নতি হয়। ভাল কাজ করতে হবে বলেই কি তোমার যত ভয়?" অগত্যা ম্যাডেলিনকে স্বীকৃত হইতে হইল, এবং তাহার অনতিকাল পরেই ম—র অধ্যক্ষরূপে তাহার নিয়োগপত্র আসিল।

নগরাধ্যক্ষ হইয়াও তাঁহার সেই সহজ অনাড়ম্বরতা বিনষ্ট হইল না। শ্রমজীবীর ন্যায় তাম্রাভ-বর্ণ, এবং দার্শনিকের ন্যায় সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন তাঁহার মুখভাবে সর্ব্বদাই একটা শান্ত শ্রী ফুটিয়া থাকিত। একটা চওড়া টুপি এবং গলা পর্য্যন্ত আঁটা কোর্ত্তাই সাধারণতঃ তিনি পরিধান করিতেন। কথা তিনি কহিতেন কম; এবং লোকের তোষামোদ হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। পথে কাহারও সহিত দেখা হইলে, মৃদু হাসিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেন—কাহাকেও কথা কহিবার বড় একটা অবকাশ দিতেন না; সুযোগ পাইলেই নির্জ্জন প্রান্তরে যাইয়া একাকী পদচারণ করিতেন। প্রায়ই তিনি পাঠগৃহে থাকিতেন; পুস্তক তাঁহার বেশী ছিল না; যাহা ছিল সবগুলিই উচ্চ ভাবপূর্ণ, সুনির্ব্বাচিত। যথার্থ বলিতে গেলে কিন্তু পুস্তকের মত নীরব অথচ যথার্থ বন্ধু আর নাই। সেই নীরব বন্ধুর নিত্যসহবাসে ম্যাডেলিনের কথাবার্ত্তা, ভাষা, ভাব ক্রমশঃই সংশোধিত হইতেছিল। একটা কথা, নির্জ্জনে বেড়াইবার সময় সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে কোন না কোন একটা বন্দুক থাকিত; প্রায়ই তাহার ব্যবহার হইত না, কিন্তু আবশ্যক কালে তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ-সন্ধান ছিল। নিরীহ জীবকে কখনও তিনি শিকার করিতেন না। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিলেও, শরীরে তখনও তাঁহার অমানুষিক শক্তি ছিল। পথে চলিতে চলিতে কতবার তিনি কতলোকের বহুপরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য একাই করিয়া দিতেন। লোকেরা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত।

কৃষকদিগকে কতদিন তিনি কৃষিসম্বন্ধে কত উপদেশ দিতেন,—কিরূপে ধানের গোলায়, মরাইয়ের নীচে, কেবল মাত্র লবণের জল দিলে ঘুণ ধরে না, কিরূপে ধানের খেতে, গোলাবাড়ীতে, orviotএর ফুল রাখিয়া দিলে চেলোপোকা নষ্ট হয়; কিরূপে ধানের জমি ভাল থাকে, ইত্যাদি অনেক কথা তিনি তাহাদের বলিতেন। একবার কোন মজুরকে কতকগুলি nettle (কাঁটাগাছ) তুলিয়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়া তিনি বলেন "দেখ, ভগবানের জগতে সব জিনিসেরই মূল্য আছে। এর জমিও পাট করতে হয় না, চাষেরও পরিশ্রম নেই, অথচ সামান্য যত্নেই এ থেকে কত উপকার পাওয়া যায়, কতকাজে একে লাগান যেতে পারে; আমরা সে যত্নটুকুও করি না বলেই, সময়ে এর ফলগুলা কুড়িয়ে নিই না বলেই, শেষে এ গুলা জমির ক্ষতি করে, কাজেই তথন তাকে উপড়ে ফেলে দূর করে দিই। মানুষও এই কাঁটাগাছের মতনই।" তারপর থামিয়া,—"ভাই সব, এটা ঠিক জেনো, সংসারে নিতান্ত মন্দ লোক বলে, বা একবারে অপদার্থ উদ্ভিদ্ বলে কিছু নেই, আবাদের দোষেই সব মন্দ হয়, যা কিছু ক্রটী—সবই চাষার।" ম্যাডেলিন সব কাজই জানিতেন,— সামান্য খড়কুটা দিয়া ছেলেদের এমন সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈয়ার করিয়া দিতেন যে, তাহারা তাঁহাকে পাইলে আর সহজে ছাড়িতে চাহিত না।

যখনি কোন মৃতদেহ গির্জ্জায় লইয়া যাওয়া হইত, ম্যাডেলিন, কাছে থাকিলে, অমনি তাহার অনুসরণ করিতেন। অপরের দুঃখ কষ্ট মৃত্যু তাঁহাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিত; শোকার্ত্ত পরিবারে তাহাদেরই একটি হইয়া তিনি মিশিয়া যাইতেন। মৃতের উদ্দেশে পঠিত মন্ত্রের ধ্বনি অপর এক জগতের দ্বার যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিত। মৃত্যুর গাঢ় অন্ধকারে সে করুণ স্বর যেন ডুবিয়া যাইত, আর উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, অনন্তের গূঢ়-রহস্যাচ্ছন্ন কোন দৈবি-ঝঙ্কার যেন তিনি শুনিতে থাকিতেন। তাঁহার অধিকাংশ সৎকার্য্য দানাদি অতি গোপনেই নিষ্পন্ন হইত। কত দরিদ্র, কত সময় সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিয়া তার সদর দরজার পুরাতন তালা ভাঙা দেখিয়া "চোর" "চোর" করিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিত তাহার শয্যার উপর কতকগুলা টাকা কে রাখিয়া গিয়াছে। সে চোর কে, পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। —লোকে তাঁহার টাকাকড়ি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিত; তবে এটা সত্য যে লাফেট ব্যাঙ্কে তাঁহার প্রভূত পরিমাণ অর্থ জমা ছিল; এবং ব্যাঙ্কওয়ালার সহিত এই সর্ত্ত ছিল যে, আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সব টাকা তিনি এককালীন উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

ম্যাডেলিন ম—নগরের অধ্যক্ষ হওয়ার পর ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সহসা একদিন ডি—র প্রধান ধর্ম্মযাজকের ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইল; পরদিন ম্যাডেলিন শোক-চিহ্ন ধারণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল, কারণ ডি—র ধর্ম্ম-যাজক তথনকার কালে একরূপ মহর্ষি-পদ-বাচ্য ছিলেন। লোকে ভাবিল, হয়ত

ম্যাডেলিন তাঁহার কোন আত্মীয়ই বা হইবেন; তত্রাচ তাহারা উভয়ের মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য কৌতূহলী হইল। অবশেষে একদিন এক সম্ভ্রান্তা বৃদ্ধা ম্যাডেলিনকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন—

"আপনি কি তাঁহার কোন আত্মীয়?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে তাঁর জন্য আপনি শোকচিহ্ন নিয়েছেন কেন?"

ম্যাডেলিন ধীরভাবে উত্তর করিলেন--"ছেলে বয়সে তাঁর বাড়ীতে আমি চাকর ছিলাম, তাই।"

আরও একটা কথা। যখনি কোন 'হা-ঘরে' বালক সে গ্রামে আসিত, ম্যাডেলিন তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া অর্থ ভিক্ষা দিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। তাহারা যাইয়া সঙ্গীদের কাছে সে গল্প করিত; ফলে হা-ঘরে বালকদের প্রায়ই সে পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখা যাইত।

ক্রমে ক্রমে ম্যাডেলিনের নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দশ পনের ক্রোশের মধ্যে যত গ্রামবাসী ছিল সকলেরই তিনি উপদেষ্টা স্বরূপ হইলেন; মামলা-মোকদ্দমার সালিশনিষ্পত্তি, পরস্পর বন্ধুত্ব সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিলেন। লোকের মুখে মুখে তাঁহার গুণ-গাথা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল

একজনমাত্র লোক তাঁহার উপর বরাবর সন্দিগ্ধ ছিল। সাধারণের সুখ্যাতি, ম্যাডে-লিনের অসংখ্য সৎকার্য্যাদি কিছুতেই তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। এক একজন লোকের মনে এমন এক একটা পাশবিক সংস্কার থাকে—যাহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, যাহা আপনা আপনিই স্নেহের আকর্ষণের বা ঘৃণার বিকর্ষণের সৃষ্টি করে, যাহা কখনও ইতস্ততঃ করে না, কখনও চঞ্চল হয় না; কখনও আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না; জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিতর্ক যাহাকে কখনও টলাইতে পারে না; স্থির গম্ভীর অদম্য অনম্যভাবে আপনার সম্পূর্ণতার মাঝে যাহা স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকে। এ লোকটারও প্রকৃতি সেইরূপ। প্রায়ই, যখন ম্যাডেলিনের ধীর স্নেহ-মধুর সাধারণের মঙ্গলাশীষপূত মূর্ত্তিখানি পথে দেখা যাইত, তখন সে অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, স্থির দৃষ্টিতে, যতক্ষণ দৃষ্টি চলে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত; আর নিম্নাধ-রোষ্ঠ দিয়া উর্দ্ধাধরোষ্ঠকে নাসিকার সহিত সংযুক্ত করিয়া, ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিত; ভাবটা—"কে এ? কোথায় না দেখিছি যেন? যাই হোক্ তোমার ভেকে আমি ভুলছিনে, ঠাকুর!"

সে জাভার্ট। পুলিশের দারোগা। ম—তে যখন সে আসে, তখন ম্যাডেলিনের ব্যবসায় জমিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

বাঙ্গালীর স্বাধীন বৃত্তির পরিচয় দানের সুযোগ বড়ই অল্প ঘটে। এরূপ স্থলে, দেশের শিক্ষিত সমাজে স্বাধীন ভাবের উপযোগী স্পষ্ট-বাদিতার সাহস দেখিলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না, তাই আজ দেশের চারিটি প্রথিতনামা মহাশয় ব্যক্তির অনুষ্ঠিত চারিটি ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহোদয় বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ রাজকার্য্যে যখন নিযুক্ত হন, তখন স্যার আস্‌লি ইডেন্ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ। রাজকার্য্যোপলক্ষে ভূদেব বাবু বেলভিডিয়ারে ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, প্রসঙ্গক্রমে ইডেন সাহেব সম্মান ও সমাদরের ভাবব্যঞ্জক স্বরে ভূদেব বাবুকে বলিয়াছিলেন, "দেখুন আমাদের রাজ্য-পালন-পদ্ধতি কত উদার! আমরা আপনাকে যোগ্য ব্যক্তি বলিয়াই জাতি ও বর্ণ বিচার না করিয়া, একেবারে একটা ডিপার্টমেণ্টের সর্ব্বোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছি।" ভূদেব বাবু চিরদিনই স্পষ্টবক্তা, এ স্থানেও উচিত বলিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। বলিলেন,—"এই রাজ্যপালনপদ্ধতি অত্যন্ত অনুদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে আমাকে যেরূপ ভাবে শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে স্থান দেওয়া হইয়াছে, কখনই ঐরূপ হইত না। আপনি মুখে যাহাই বলুন না কেন, ভিতরে ভিতরে প্রভেদ বজায় রাখার জন্য আপনারা দৃঢ়ব্রত, তবে এদেশে অবশ্য আপনাদের এই নীতি শোভা পাইতেছে, আর এতেই দেশের লোক সন্তুষ্ট।" ছোটলাট বলিলেন, "আপনার এরূপ বলিবার কারণ কি?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "দেখুন, ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌সট্রক্‌সনের পদে আমাকে কয়েক মাসের জন্য নিযুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু ঐ নিয়োগটা একজন ইংরাজের হইলে, গেজেটে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, আমার বেলা সে ভাষা ব্যবহার করিতে আপনাদের আপত্তি জন্মিল। Officiating Director এই দুটি শব্দ ব্যবহার ত্যাগ করিয়া 'Placed in charge of the Directorate' ব্যবহার করা আবশ্যক হইল; একজন ইংরাজের নিয়োগে কি ঐরূপ কিম্ভূতকিমাকার হইত?" ইডেন সাহেব সত্যই উদারপ্রকৃতির রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাই ভূদেব বাবুর কথায় প্রতিবাদ না করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ভূদেব বাবু পুনরপি বলিলেন "দেখুন, মোগল-রাজত্বে আমার ন্যায় ব্যক্তি মোগল-কোর্টের প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিতে বোধ হয় অক্ষম হইত না।" এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ইডেন সাহেবের আনন্দানুভূতি সে দিন বিষাদে পরিণত করিয়া ভূদেব বাবু গৃহে ফিরিয়াছিলেন।*

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় যখন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ, সে সময়ে পুণ্যশ্লোকা মহারাণী স্বর্ণময়ীর নির্দ্দেশ

---

* অধুনা লোকান্তরিত অম্বিকাচরণ বসু মহাশয় ভূদেব-প্রসঙ্গে আমাকে ঐ ঘটনাটি বলিয়াছিলেন। ইনি ডাইরেক্টারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

মত উক্ত কলেজের কার্য্যপরিচালন জন্য এক কমিটী গঠিত হয়। সেই কমিটীর সম্পাদক ছিলেন—রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, আর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কমিটির সভাপতি। সুতরাং যখন যিনি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন, তিনিই কলেজ-কমিটীর সভাপতির কার্য্য করিতেন।

একদা প্রেসিডেন্সীবিভাগের শিক্ষাবিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক মাসের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহার তদানীন্তন সহকারী চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় অস্থায়িভাবে ঐ কার্য্যে ব্রতী থাকা কালে একবার মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয় সকল পরিদর্শনে বাহির হইয়া বহরমপুরে উপস্থিত হন। তথায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেলার বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা বিষয়ে নানা কথা-বার্ত্তার মাঝখানে জেলার কর্ত্তা সহসা কলেজ পরিদর্শনের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। "কলেজ পরিদর্শন ত করা হয় না।" সাহেব বলিলেন "এবার হবে। আগামী কল্য আপনি কলেজে যাইবেন, আমি কলেজের কমিটীকে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়া এখনই পত্র লিখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিটির সম্পাদক রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরকে এক পত্র লিখিয়া পরদিনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং এ কথাও লিখিয়া দিলেন যে, তিনি স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়কে পরদিন কলেজ-পরিদর্শনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

যে দিন এই ব্যাপার ঘটে, সেই দিন সন্ধ্যার সময় কাশিমবাজার রাজবাটীতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠাননিবন্ধন বহু পদস্থ লোকের ছিল। রায় বাহাদুর সম্পাদক, কলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্র বাবুকে পত্রের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় জানাইয়া পর দিনের পরিদর্শন ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু রায় বাহাদুরের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উক্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাই রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবার সময়ে একখানি পদত্যাগপত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবা মাত্র ব্রজেন্দ্র বাবু নিজের পদত্যাগপত্রখানি হাতে দিয়া বলিলেন "আগে কল্যকার ব্যবস্থা করুন। আমি কলেজের অধ্যক্ষ থাকিয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ভিন্ন অন্য কোন নিম্নপদবির কর্ম্মচারী দ্বারা কলেজ পরিদর্শনে সাহায্য করিতে পারিব না। সে কাজ আমার দ্বারা হইবে না।" শ্রীনাথ বাবু পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন "এখন উপায়? এ ব্যাপার এতদূর গড়াইবে, আমি তাহা আদৌ বুঝিতে পারি নাই। তাহা হইলে আপনাকে সংবাদ দিবার পূর্ব্বে উপায় অবলম্বন করিতাম, এখন উপায় কি?"

ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এ ক্ষেত্রে আমার দ্বারা কোন সাহায্য হইবে না।" এই সময়ে বৈকুণ্ঠ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র শ্রীনাথ বাবু বৈকুণ্ঠ বাবুকে গিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া ত্বরায় উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে একজন বিষয়জ্ঞানবিহীন নিরীহ দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই

মনে করিতেন, কিন্তু সেই দিন ঐ পদত্যাগ পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা উচ্চগ্রামে উঠিয়া গেল। বৈকুণ্ঠ বাবু বুঝিলেন যে, অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ কেবল পণ্ডিত নহেন, তাঁহার পদমর্য্যাদাজ্ঞান পূর্ণরূপে পরিস্ফুট ও স্বপদের সম্মান রক্ষায় বেশ পটু; উক্ত পদত্যাগপত্রে উচ্চাঙ্গের কর্ম্মপটুতার পরিচয় পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং ত্বরায় ইহার প্রতীকার সাধনে অগ্রসর হইলেন। শ্রীনাথ বাবু ও বৈকুণ্ঠ বাবু উভয়ে পরামর্শ করিয়া তখনই সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় উপস্থিত হইয়া সাহেবকে সকল কথা খুলিয়া বলিবামাত্র, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর—সান্ধ্যসমীরণ-সেবিত স্নিগ্ধ ইংরাজ-মূর্ত্তি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব—সহসা বৈশাখের প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডে পরিণত হইয়া বলিলেন, "How can it be ? I can't cancel my order. The Inspector must inspect the college to-morrow. I have asked him to do so as President of the College Comittee. It is impossible for me now to ask hin. not to go there". বৈকুণ্ঠ বাবু ও শ্রীনাথ বাবু সাহেবকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে "এটা নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে, আর এই হুকুম তামিল করিতে হইলে, আমাদিগকে বর্ত্তমান অধ্যক্ষকে হারাইতে হয়। এ কার্য্যে আমরাই বা কেমন করিয়া সম্মত হইব ?" সাহেব বলিলেন, "I don't know that. It is my order, and the order must stand". এই বলিয়া সাহেব ক্রোধ ও অভিমানভরে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

তখন বৈকুণ্ঠ বাবু সাহেবকে বলিলেন, কলেজের একটা কমিটি আছে, এরূপ গুরুতর বিষয়ে কলেজ-কমিটির অভিপ্রায় জানিয়া কার্য্য করা উচিত. তাই আমার অনুরোধ এই যে আজ রাত্রিতেই সম্পাদক সকল সভ্যকে সংবাদ দিবেন। আগামী কল্য প্রাতঃকালে ছয়টার সময় আপনার এখানেই আমরা মিলিত হইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিব, আপনি সে বিষয়ে অনুমতি দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।" সাহেব বলিলেন "All right Babu."

পরদিন প্রাতঃকালে ছয়টার সময় সভ্যেরা সাহেবের বাঙ্গালায় মিলিত হইলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, বিষয়টা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে এবিষয়ে কমিটি কিছু না করিয়া শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান রাজপুরুষের উপর ভার দেওয়া হউক, কমিটি ডাইরেক্টর বাহাদুরের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতে প্রস্তুত রহিলেন। অধিকাংশের মতে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া তাঁহার বক্তব্যসহ বিষয়টা শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তার নিকট প্রেরণের অনুরোধ করিয়া বলিলেন "আমরা আপনাদের প্রদর্শিত বিধিসঙ্গত পন্থারই অনুসরণ করিলাম। এতে ক্ষুণ্ণ হইলে চলিবে কেন ? শেষ মীমাংসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, তাহা না করিলে, আপনাদের প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার অবমাননা করা হয়, আপনার ত সেরূপ করা উদ্দেশ্য নহে।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুনরায় বলিলেন "All right Babu."

অধ্যক্ষের পদত্যাগপত্রসহ কমিটির মন্তব্য, সভাপতির মন্তব্য স্বাক্ষরে তদানীন্তন ডাই-রেক্টর স্যার আল্‌ফ্রেড্ কয়াট্‌ বাহাদুরের দরবারে প্রেরিত হইল। জেলার কর্ত্তা চন্দ্রমোহন বাবুকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, "আপনি কলেজ পরিদর্শন জন্য এই জেলায় কয়েক দিনের জন্য অপেক্ষা করুন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যালয়ের পরিদর্শনকার্য্য চলিতে থাকুক।" সপ্তাহ অতীত হয় দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাহার তাগিদ্ দিলেন। নবম কি দশম দিবসে শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ আসিল। সে আদেশ বড়ই চমৎকার।

ডাইরেক্টর বাহাদুর লিখিলেন, "শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টরই কেবল প্রথম শ্রেণীর কলেজ-পরিদর্শনের অধিকারী, তন্নিম্নস্থ কোন কর্ম্মচারী নিয়মানুসারে ঐরূপ পরিদর্শনের অধিকারী নহেন। এক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভ্রমবশতঃ ইন্‌স্‌পেক্টরকে কলেজ পরিদর্শনে অনুরোধ করায় কলেজের অধ্যক্ষ যদি শীলতা ও শিষ্টাচারের খাতিরে সভাপতির অনুরোধ রক্ষা করিতেন, বা এখনও করেন, ভালই; কিন্তু তাঁহার আপত্তি থাকিলে, নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ইনস্‌পেক্টর দ্বারা কলেজ পরিদর্শনে তাঁহাকে বাধ্য করিবার কাহারও অধিকার নাই। আর এক কথা এই যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যত দিন কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষতা করিবেন, সে সময়ে কলেজ-কমিটি কলেজের শিক্ষাবিষয়ক আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।"

এই আদেশ আসিবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন, তাঁহার স্থলে জেলার জজ বাহাদুরকে সভাপতি-পদে বরণ করা হইল। বোধ হয় সেই ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। অস্থায়ী ইন্‌স্‌পেক্টর চন্দ্রমোহন বাবুর আর কলেজ পরিদর্শন করা হইল না।

মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দুই জন ইংরাজ জজের সঙ্গে মিলিত বিচার-আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঢাকার ষড়যন্ত্রবিষয়ক মোকদ্দমার আপিল শুনিতে ও বিচার করিতে আরম্ভ করেন। আপিলের সময়ে রাজপক্ষ-সমর্থনের ভার ছিল কাউন্সেল গার্থ সাহেবের উপর। গার্থ সাহেব আপিলের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান-কালে প্রাথমিক বক্তৃতায় কয়েকটা অবান্তর কথার উত্থাপন করিবামাত্র স্যার আশুতোষ বলিয়াছিলেন "মিষ্টার গার্থ, আপনি যাঁহার নামে গুরুতর অভিযোগ আরোপ করিতেছেন, তিনি কি এই আসামী দলভুক্ত?" উত্তরে গার্থ সাহেব বলিলেন "No, my lord." স্যার আশুতোষ তৎক্ষণাৎ বলিলেন "তবে তাঁহার নাম করিবার আপনার কি অধিকার আছে?" পুনরায় গার্থ সাহেব বলিলেন "আর, সি, দত্তের ভারতীয় ইতিহাস পাঠে এদেশের ছাত্রবৃন্দের মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া যাইতেছে।" স্যার আশুতোষ প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "মিষ্টার গার্থ, কোন্ ইতিহাস? যেখানি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত, সেই বইখানিকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিতে সাবধান হওয়া উচিত।" গার্থ সাহেব পুনরায় বলিলেন "শিবাজি দস্যুদলের নায়ক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।" স্যার আশুতোষ

উত্তরে বলিয়াছিলেন—"Was the Marhatta leader a greater robber than your Alexander the Great ?" এইরূপ শিষ্ট বিশেষণে ভারতীয় জাতি সকলের মর্য্যাদাশালী লোকদিগকে ভারত-প্রবাসী বিদেশীগণ কালাকালবিচারশূন্য হইয়া আক্রমণ করিয়া থাকেন। নিরীহ ভারতসন্তান এ সব তিরস্কার নীরবে সহ্য করে।

ভাগ্যগুণে বিচারাসনে স্যার আশুতোষের ন্যায় আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন, উদারহৃদয়, তেজস্বী বিচারপতি উপবিষ্ট ছিলেন, তাই সমগ্র জাতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গার্থ সাহেবের বাক্যগঞ্জনার উপযুক্ত প্রতিবাদ হইয়াছিল এবং সাহেবও নীরব হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

•স্যার আস্‌লি•ইডেন যখন বঙ্গের ছোটলাট নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে আলিপুরের রাজভবনে পদার্পণ করেন, সে সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের সকলেই এক এক করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বেলভিডিয়ারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যান নাই কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়। প্রসঙ্গক্রমে ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেন রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই আমার সংবাদ লইলেন, পণ্ডিত কেবল আমার কোন খোঁজ লইলেন না।" স্বর্গীয় পাল মহাশয় এই বহু সম্মানজনক আক্ষেপোক্তিতে আনন্দিত হইয়া আলিপুর হইতে প্রত্যাগমন কালে কাঁসারিপাড়ার মোড় হইতে গৃহে না গিয়া সেই দরবারের পোষাকেই বাদুরবাগানে বিদ্যাসাগরসদনে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাল মহাশয়কে বলিলেন, "এ রাজবেশে আমার এখানে কেন ?" রায় বাহাদুর বলিলেন "আমি বেলভিডিয়ারে গিয়াছিলাম। ইডেন সাহেব আপনার কথা বলায় আপনাকে কথাটা বলিতে আসিয়াছি। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন 'আমি বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসায় আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই সংবাদ লইলেন, কেবল পণ্ডিত কোন সংবাদ লইলেন না।' আপনি কি একবার সাক্ষাৎ করিবেন না ?" বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়া "না রাম না গঙ্গা" একটি কথাও বলিলেন না। ক্রমশঃ অন্যান্য কথা পাড়িয়া রায় বাহাদুরের আদর আপ্যায়ন করিয়া বিদায় দিতেছেন, এমন সময়ে উৎকণ্ঠান্বিত রায় বাহাদুর পুনরায় বলিলেন "আপনি কথাটা গায় মাখলেন না, ব্যাপার কি ?" "ব্যাপার কি শুনিতে চাও তবে একটু বসো" বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি শান্ত ও গম্ভীরস্বরে বলিলেন "তোমাদের দরকার আছে, তোমরা যাইতেছ, আমার কোন দরকার নাই, আমি কেন যাইব ? ছোটলাটের কোন প্রয়োজন হইলে তিনি আমাকে সংবাদ দিতে পারেন। আমি অকারণ কেন দৌড়াদৌড়ি করিব ?" রায় বাহাদুর বলিলেন "তিনি পুরাতন আত্মীয়তার অভিমান করিয়াই ঐ কয়টি কথা বলিয়াছেন।" উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "তিনি কি ঐ কথাগুলি আমাকে বলিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিয়াছেন ?" রায় বাহাদুর বলিলেন "আজ্ঞে না, তা তিনি বলেন নাই।" এইবার বিদ্যাসাগর একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর ইডেন্ সাহেবের পাঁচিলে আমার একচালা ? যেমন তোমার মুখে শুনা, অমনি আলিপুরে দৌড়িব ?

তোমায় তিনি অনুরোধ করেন নাই, আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমার নাম করিয়া ইডেন সাহেবকে বল পণ্ডিত এই কথা বলিয়াছেন।" রায় বাহাদুর বলিলেন "আজ্ঞে আমার দ্বারা ও কাজ হইবে না, আমি আপনাকে এ কথা বলিতে আসিয়া অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তাঁকে এ বিষয়ে কোন কথাই বলিব না।"

এই ঘটনার কিছুকাল পরে কার্য্যবিশেষে উত্তর-পশ্চিমের ছোটলাট ও বঙ্গের ছোটলাট একদা বক্সারে দেখা সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে বঙ্গের ছোটলাট ইডেন্ সাহেব মোগলসরাই ষ্টেশনের দীর্ঘ প্লাটফর্ম্মে পাইচারি করিতেছেন, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশী হইতে আসিয়া মোগলসরাই ষ্টেশনে কলিকাতার গাড়ীতে চড়িয়া বসিতেছেন, ইডেন সাহেব তাহা দেখিয়াছেন। দেখিয়া ধীরে ধীরে পণ্ডিতের গাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। চারি চক্ষের মিলন হইবামাত্র ইডেন সাহেব সুন্দর বাঙ্গালায় বলিলেন "আপনি আমাকে চিনিতে পারেন?" বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "না, চিনিতে পারিতেছি না ত।" সাহেব বলিলেন "আমি ইডেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন "কেমন করিয়া চিনিব? দেখাসাক্ষাৎ কতকালের কথা হইল, তখন তুমি লিক্‌লিকে ছোকরা ছিলে, এখন তুমি যেমন বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, তেমনি তোমার চেহারাখানাও জাঁদরেল গোছের হয়েছে, সে চেহারাই নাই, আমি কেমন করে চিন্‌বো?" ইহার পরই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "তুমি কৃষ্ণদাস পালকে আমার বিষয়ে কিছু বলেছিলে?" সাহেব বলিলেন "হাঁ বলিয়াছিলাম।" "আমি যে উত্তর বলিয়াছিলাম তিনি বোধ হয় তোমাকে সে কথা বলেন নাই। আমি সর্ব্বাগ্রে সেটা তোমাকে বলি," বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাগুলি ইডেন সাহেবকে বলিলেন। সাহেব "পাঁচিলে এক চালার" কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বেশ উত্তর হয়েছে, এখন বেলভিডিয়ারে পায়ের ধূলা পড়িবে কবে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "তোমার যে দিন ইচ্ছা সংবাদ দিলেই যাইব।" এরূপ ভাবের মর্য্যাদাবোধই এদেশের লোকসমাজে ফুটিয়া উঠিতে বিলম্ব আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যাঁহারা কর্ম্মী, জীবনী-লেখক তাঁহাদিগের জীবনের ঘটনা-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু যে সাধনার বলে তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—তাহা দেখান এক প্রকার সাধ্যাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিপুণ ব্যবচ্ছেদকের ছুরিকা দ্বারা মনুষ্যদেহের শিরা, পেশী প্রভৃতির যথাযথ

সংস্থান প্রকাশ করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যদেহে জীবনী-শক্তির স্থান কোথায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সমালোচক কবিতার সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু সহস্র বিশ্লেষণেও কবিতার প্রাণ কোথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না—তেমনি মনুষ্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা কেবল তাহার প্রধান প্রধান উপাদান নির্দ্দেশ করিতে পারি—কিন্তু যে জীবনব্যাপী নিগূঢ় সাধনায় এই চরিত্র আপনাকে সম্পূর্ণ সফল করিয়াছিল,—তাহা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সংসারচন্দ্র সামান্য শিক্ষকতা হইতে ক্রমে ক্রমে জয়পুরের মত একটা বিশাল রাজ্যের মন্ত্রিত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন,—আমরা ঘটনাবলি গ্রথিত করিয়া তাহা দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু কেমন করিয়া যে তাঁহার প্রতিভা চারিদিক হইতে রস গ্রহণ করিয়া, ক্ষুদ্র বীজ যেমন বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়, তেমনি আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া বিকশিত হইয়াছিল—জানি না কি প্রকার বিশ্লেষণে তাহা প্রকাশ করিব। সংসারচন্দ্রের জীবনী লিখিতে যে সহস্র ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে—সে সকল ত্রুটির ইহাই একমাত্র ওজুহাত।

এত দূর যাঁহারা ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিয়াছেন—সংসারচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা ধারণা জন্মিয়াছে, আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। তথাপি আমরা তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার জন্য এই পরিচ্ছেদের অবতারণা করিয়াছি।

রাজনীতি ব্যাপারটি এমন যে, ধর্ম্ম-নীতির সহিত ইহার অহি-নকুল-সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মভীরু তাঁহারা যদি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহার সামঞ্জস্য করা যে কতদূর কঠিন তাহা তাঁহারাই বুঝেন। সংসারচন্দ্র সম্বন্ধে কি রাজা, কি প্রজা, কি ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী সকলেরই মুখে এই একটা কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যাইত—"Oh! he is a God-fearing man!"—এই ধর্ম্মভীরুতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান। তিনি অল্প বয়স হইতেই নানা দুঃখ-কষ্টের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া "সাবধানে জ্বালায়ে অন্তর-প্রদীপখানি" সংসারের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্তা বিধাতা তাঁহাকে এই বিচিত্র কর্ম্মের মধ্যে বিবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতেছিলেন, তিনি সর্ব্বদা তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই দুর্গম পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নানা প্রলোভন, নানা চক্রান্ত, "প্রতিদিনের কুশাঙ্কুর" প্রতি পদে তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তরস্থিত দেবতার আদেশ-বাণী কখন অগ্রাহ্য করেন নাই—তিনি সেই "ভয়ানাং ভয়ম্ ভীষণং ভীষণানাম্"এর আদেশ প্রতিকার্য্যে অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন—জগদীশ্বর শুধু প্রেমময় নহেন—তিনি ভীষণং ভীষণানাম্। ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান; ধর্ম্মভীরুতা এবং জগদীশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরতাই

তাঁহার চরিত্রকে অসামান্যতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব দৈন্য, সকল প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া অসাধারণ চরিত্রবলে বলীয়ান্ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের যাহা কিছু মহত্ব, এই ধর্ম্মভীরুতাই তাহার মূল প্রস্রবণ।

সংসারচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবনের মূল—তাঁহার স্বর্গীয় পিতার আদর্শ এবং উপদেশ। বাল্যকালে তিনি প্রতিদিন প্রাতে পিতার সহিত মন্দিরে গিয়া প্রণামাদি করিয়া আসিতেন এবং গৃহে নিজে পিতার অনুকরণে পূজাদি করিতেন। বালকের নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী হয়েন। তখন বঙ্গদেশে এই নবধর্ম্মের যুগ—রাজা রামমোহন রায় যাহার ব্যাখ্যাতা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাহার সাধক এবং কেশবচন্দ্র সেন যাহার প্রচারক—সেই নবধর্ম্মের স্রোত বঙ্গদেশ হইতে সুদূর আগ্রা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, তাহার ফলে তথনকার অনেক শিক্ষিত যুবকই আগ্রার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতেন, সংসারচন্দ্রও তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ লইয়া নিয়মিতরূপে এথানে আসিয়া উপাসনাদি করিতেন। তারপর যথন স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া গেলেন, তথন সংসারচন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে উৎসাহে যোগ দিলেন। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। জয়পুর ব্রাহ্ম-সমাজ লোপ পাওয়ার পর সংসারচন্দ্র নিজে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত উপাসনাদি করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে সংসারচন্দ্রের জীবনে এক মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় ডাক্তার হেমচন্দ্রের শিক্ষাদাতা এক জন বৈদান্তিক পাঞ্জাবী সাধুর সহিত সংসারচন্দ্রের ধর্ম্মালোচনা হইল—বহুক্ষণব্যাপী আলোচনার ফলে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান হয়েন। এই সময় হইতে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হিন্দুগৃহীর আদর্শ গ্রহণ করিয়া আপন জীবনে সেই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং জীবনের প্রতিকার্য্যে তিনি হিন্দুর সেই আদর্শ অনুসারে চলিতেন

এই ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে ঈশ্বরের উপর যে একান্ত নির্ভরতা, যে সাহস, বিপদে যে অটল ধৈর্য্য, এবং প্রলোভনে আত্মরক্ষার যে অসীম ক্ষমতা দান করিয়াছিল—তাহা গৃহীর পক্ষে বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিতান্ত সুলভ নহে।

তাঁহার সাহস সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গীদিগের মুখে আজও নানা প্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজ মাধোসিংহ অত্যন্ত শিকার প্রিয়। তিনি পূর্ব্বে প্রায়ই রাত্রে ব্যাঘ্র শিকার-করিতে যাইতেন। গভীর বনের ভিতর বৃক্ষের উপর শিকারীদিগের জন্য কয়েকটি 'মাচান' বাঁধা হইত। সংসারচন্দ্র শিকার করিতেন না; কিন্তু তাঁহাকে সঙ্গে না লইলে মহারাজের চলিত না। মাঝে মাঝে শিকার সম্বন্ধে অন্য শিকারীদের মহারাজের আদেশ দিবার প্রয়োজন হইত। সংসারচন্দ্রের উপরই সে সকল আদেশ বহন করিবার ভার পড়িত। তাঁহার সঙ্গীরা বলেন সেই ঘোর অন্ধকারে, গভীর বনের ভিতর যথন প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যাঘ্র আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা, সে সময় সংসারচন্দ্র সামান্য এক গাছি ছড়ি মাত্র হস্তে করিয়া

এক মাচান হইতে নামিয়া অন্য মাচানে যাইতেন, নির্ভীক সংসারচন্দ্রকে তাহারা কখন একটুও বিচলিত বা ত্রস্ত হইতে দেখে নাই। মহারাজ তাঁহাকে বন্দুক হাতে করিয়া যাইবার জন্য বলিলে তিনি একটু হাসিয়া বলিতেন "কি দরকার ?"

বাল্যকাল হইতে সংসারচন্দ্র নানা দুঃখ-কষ্ট, নানা শোকের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শোকে দুঃখে কেহ কখন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি দেখে নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের একটা ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া ইন্দুমতী তাঁহার একান্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। ইন্দুমতীর স্বামী মেদিনীপুর জেলায় কাঁথিতে ওকালতী করেন। কয় দিন হইতে ইন্দুমতীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একদিন প্রাতে ইন্দুমতীর পরলোক-গমনের সংবাদ আসিল, সংসারচন্দ্র তখন মহারাজের নিকট। এই নিদারুণ সংবাদ যে সংসারচন্দ্রকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু বাহিরে তাহার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তিনি ধীর ভাবে আফিসের নিয়মিত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন। বাড়ী যাওয়া মাত্র তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্যাকুল হইয়া ইন্দুমতীর সংবাদ লইতে আসিলেন, সংসারচন্দ্র কোন কথা না কহিয়া নিজে স্নান আহার করিয়া বাড়ীর সকলকে স্নানাহার করাইলেন, তারপর সকলকে নিজের ঘরে ডাকিয়া ধীর ভাবে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ দিলেন এবং নানা প্রকার উপদেশ দিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া আর আর সকলে শান্ত হইল—তিনি আপন বলে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে বলীয়ান্ করিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মভীরুতা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রের কত প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছিল—নানা কারণে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নহে। একটা উদাহরণ দেই—মহারাজ মাধোসিংহের গদি প্রাপ্তির পর ১৮৮১ সালে তাঁহার সহিত গুজরাট প্রদেশের ধ্রাংধাড়া রাজকুমারীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় সে জন্য ব্যারিষ্টার মিঃ কৃষ্ণরাও পাণ্ডুরাং ধ্রাংধাড়া রাজ-দরবার হইতে জয়পুর আগমন করেন। মিঃ কৃষ্ণরাও জয়পুরে আসিয়া তদানীন্তন রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাতাদি করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং রাজবাটীর কর্ম্মচারীদিগকে নানা কৌশলে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হয়েন। সংসারচন্দ্র মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং মহারাজের উপর তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট—এই সকল কারণে মিঃ কৃষ্ণরাও তাঁহাকেও স্বপক্ষে আনিবার বিধিমত চেষ্টা করেন এবং যাহাতে এই শুভ-বিবাহ ঘটে তাহা করিতে পারিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিবেন এমন প্রস্তাবও করেন। পুরস্কারের পরিমাণ দরিদ্র সংসারচন্দ্রকে প্রলোভিত করিতে পারিল না—তিনি সহাস্য বদনে এই বিপুল অর্থ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—"যে পরিশ্রমে এবং মহারাজের অনুগ্রহে তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন—তাঁহার সামান্য অভাবের পক্ষে তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। এরূপ পুরস্কারে তাঁহার প্রয়োজন নাই। তবে তিনি এই

শুভ-বিবাহ যাহাতে ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। বিবাহ হইয়া গেল। এই ঘটনার বহুদিন পরে বোম্বায়ে কোন বন্ধুগৃহে সংসারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ-চন্দ্রকে দেখিয়া মিঃ কৃষ্ণরাও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি জান না, তুমি কত বড় লোকের পুত্র; তোমার পিতা মানুষ নহেন, তিনি দেবতা।" (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুন্‌ব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি।
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য্য,
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য্য।

নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান।
যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিণ হস্ত,
লড়ব তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র।
জাগ্‌ব তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান,
ছাড়্‌ব সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূর্ব্বরাগ

শৃঙ্গার আর মাধুর্য্য মূলে একই বস্তু বলিয়াই, শরীরের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ। আর মাধুর্য্যের কোনও অবস্থাতেই এই শারীর সম্বন্ধের একান্ত বিলোপ হয় না। নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সম্বন্ধের উপরেই মাধুর্য্যরস ফুটিয়া উঠে। এই সম্বন্ধের প্রথম সূচনাকেই পূর্ব্বরাগ বলে। এই পূর্ব্বরাগ যে ভাবে নায়ক-নায়িকার স্নায়ুমণ্ডলকে অধিকার করিয়া, তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাকেই পূর্ব্বরাগের রূপ বলা যাইতে পারে।

রসশাস্ত্রে সচরাচর কেবল নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধেই পূর্ব্বরাগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর পরস্পরের প্রতি প্রথম অনুরাগের সঞ্চার অবধি, প্রথম মিলন বা সম্ভোগ পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের যে সকল অবস্থা ঘটে, এ ক্ষেত্রে তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলে। কিন্তু রসশাস্ত্রে এই পূর্ব্বরাগ-শব্দ বিশেষভাবে মাধুর্য্যের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইলেও, বাৎসল্যে বা সখ্যেতেও যে ইহার অনুরূপ একটা অবস্থা নাই, তাহা নহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই, আপনার গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি সন্তানসম্ভাবিতার অন্তরে একটা অপূর্ব্ব আসক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহাই বাৎসল্যের পূর্ব্বরাগ। আর বাল্য-বন্ধুত্বের আস্বাদলাভ যার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সে-ই সখ্যের পূর্ব্বরাগ-বস্তুটা যে কি, ইহাও জানে। মাধুর্য্যের মতন, বাল্য-বন্ধুত্বের ভিতরেও একটা রূপ-লালসা ও আসঙ্গ-লিপ্সা লুকাইয়া থাকে। পাঠশালায় শতাধিক বালক এক সঙ্গে পড়ে। ইহাদের মধ্যে হঠাৎ একদিন একটী বালকের মুখ দেখিয়া আর একটী বালকের প্রাণে একটা অভিনব অনুরাগের সঞ্চার হইল। ঐ মুখখানি ধ্যান করিতে তার আনন্দ হয়। এই বালকের সঙ্গ-লাভের জন্য তার অন্তরে একটা পিপাসা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তখনও উভয়ের মধ্যে তেমন পরিচয় হয় নাই। পূর্ব্ব পরিচয় থাকিলেও তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। তখনও ইহারা পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি জড়াজড়ি করিতে আরম্ভ করে নাই; অথচ তাহা করিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। এই যে অবস্থা ইহাই সখ্যের পূর্ব্বরাগ। এ অবস্থায় লালসা ও ভয়, সাহস ও লজ্জা, আস্থা ও সন্দেহ, এই সকল পরস্পর-বিরোধী ভাব প্রাণটাকে তোলপাড় করিতে থাকে। এই লোভ ও ভীতি, আশ্বাস ও সন্দেহ মিলিয়া তার শরীর-মনে একটা চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এই উদ্বেগ তার মুখে, এই চাঞ্চল্য তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়া, সখ্যরতির পূর্ব্বরাগের বিশিষ্ট রূপটাকে গড়িয়া তোলে। আর এই সখ্যরতি যখন খুব বলবতী হইয়া উঠে, তখন তাহাতেও মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের মতন, স্বেদকম্পপুলকাদি সাত্ত্বিকীভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। প্রণয়ী

* রসের রূপ শীর্ষক প্রবন্ধাবলী বঙ্গদর্শনে ১৩১৯ সালের পৌষ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে—(১) বাৎসল্য—পৌষ, (২) দাস্য ও (৩) সখ্য—মাঘ; (৪) (৫) (৬) মাধুর্য্য—১৩২০—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন।

জনের রূপ দেখিয়া, আর কখনও বা না দেখিয়াও, তাঁর রূপগুণের কথামাত্র শুনিয়াই, সখ্যের এবং মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। কিন্তু বাৎসল্যের পূর্ব্বরাগের এরূপ কোনও প্রত্যক্ষ উদ্দীপনা থাকে না, থাকা অসম্ভব। তবে সন্তান ধারণ করিয়াই, সন্তান-সম্ভাবিতার শরীরের, বিশেষতঃ তাঁর স্নায়ুমণ্ডলের, এমন সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করে, যাহাতে অজাত সন্তানের প্রতিও গর্ভধারিণীর অন্তরে একটা স্বাভাবিকী আসক্তি জন্মিতে থাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধির ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তিও বাড়িয়া চলে, এবং সন্তানসম্ভাবিতা জননীর প্রাণে গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি একটা প্রবল মমতা জাগিয়া উঠে। এই মমতা হইতেই এই সন্তানের মুখ দেখিবার জন্য লালসার উদয় হয়। এই লালসায় তখন আসন্ন-প্রসবা জননীর সমুদায় শরীরকে যেন এক অভূতপূর্ব্ব রসে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। আর, যেখানে আশা সেইখানেই আশঙ্কা, যেখানে লোভ সেইখানেই ভয়, যেখানে ঔৎসুক্য সেইখানেই উদ্বেগ ও ভাবনা জাগিয়া উঠে। অজাত সন্তান সম্বন্ধে শত আশা, শত আশঙ্কা, শত সুখ-কল্পনা, শত দুঃখভীতি, এ সকলে মাতার মনকে অধিকার করিয়া, তাঁহাকে অধীর করিয়া তোলে। সন্তান বালক হইবে, না বালিকা হইবে; সুন্দর, সুস্থ, সুঠাম ও পূর্ণাঙ্গ হইবে, না কুৎসিত, রুগ্ন, অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইবে; সে দীর্ঘায়ু হইবে, না স্বল্পায়ু হইবে, এই সকল চিন্তায় মাতার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপে কখনও কখনও সন্তানসম্ভাবিতাকে গর্ভস্থ শিশুর ধ্যানে তন্ময় করিয়া ফেলে। এই তন্ময়ত্বহেতু গর্ভবতী রমণীগণ কখনও বা অমনস্ক, কখনও বা সমনস্ক; কখনও বা চঞ্চল, কখনও বা ধীর; কখনও বা উৎফুল্ল, কখনও বা অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। আর এই ধ্যান খুব গভীর হইলে, অজাত সন্তানের ভাবনায় জননীর অঙ্গে হর্ষদৈন্যপুলকবিবর্ণাদি সাত্ত্বিকী ভাবেরও প্রকাশ হইতে পারে। সন্তানের জন্মের পূর্ব্বে, জননীর অন্তরে বাৎসল্যের এই সকল প্রকাশই, এই রসের পূর্ব্বরাগ। অতএব কেবল মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার-রসেরই একটা পূর্ব্বরাগের অবস্থা আছে, সখ্যের বা বাৎসল্যের কোনও পূর্ব্বরাগ নাই, এমন বলা যায় না। তবে মাধুর্য্য সকল রসের সেরা ও সর্ব্বাপেক্ষা জটিল বলিয়া, প্রত্যেক অবস্থাতেই এই রসের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তি, আনন্দ এবং বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, সখ্য বা বাৎসল্যে যে তাহা হয় না, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব।

রসতত্ত্ববিদেরা শ্রেষ্ঠনিকৃষ্টভেদে রসের পর্য্যায় নিরূপণ করিতে যাইয়া, প্রথমে সখ্য, তারপর বাৎসল্য, এবং সর্ব্বশেষেই মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা সত্য। ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এ সকল রসকে পৃথক্ করিয়া, সকল রসের একটা সমীকরণ ও নিজস্ব-পর্য্যায়-নিরূপণ করিতে হইলে, যেটী অপেক্ষাকৃত সরল, তাহাকেই সকলের নিম্নে, আর যেটী সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, তাহাকেই সকলের মাথায় বসাইতে হয়; ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এবং—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে বৈসে"—এই সূত্র ধরিয়াই আমাদের রসতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-ভক্তেরাও বাৎসল্যকে মাধুর্য্যের পূর্ব্বে

এবং সখ্যের পরে বসাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিজ নিজ জীবনের বিবর্ত্তনধারাতে এই সকল রস, এই ক্রমের অনুসরণ করিয়া ফুটিয়া উঠে না। আমরা সকলের প্রথমে, যত সামান্য পরিমাণে হউক না কেন, দাস্যরসেরই আস্বাদন করিয়া থাকি। কারণ, আমাদের প্রথম আসক্তি পিতামাতার উপরে, কিম্বা পিতৃমাতৃস্থানীয় পরিচারক ও পরিচারিকার উপরেই জন্মিয়া থাকে এবং এই আসক্তির মধ্যে দাস্যরতির প্রাণ যে দুইটী বস্তু—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও আনুগত্য—সেই দুইটীই স্বল্পাধিক বিদ্যমান থাকে। আশ্রয়-আশ্রিত ভাবটা, অতি অলক্ষিতে হইলেও, শৈশবের পিতৃমাতৃভক্তির মধ্যে সর্ব্বদাই লুকাইয়া থাকে। তার পরে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে, নবযৌবনের প্রথম মলয়নিঃস্বনে যখন শরীর-মনের কুঞ্জে কুঞ্জে নূতন প্রাণতা ও নূতন উল্লাস স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং যখন আমরা, বাসন্তী বনস্থলীর ন্যায়, নিজেদেরে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠি; তখন ইচ্ছা হয়—

ঘর করি বাহির, বাহির করি ঘর,
পর করি আপন, আপন করি পর।

আর এই যে পরকে আপন করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহা হইতেই সখ্যরতির জন্ম হয়। বাসন্তী বনস্থলী যেমন আপনি আপনার অভিনব উল্লাস ও কর্ম্মচেষ্টার ভাব নিজে বুঝে না, কেন যে তার শুষ্ক তরু মুঞ্জরিয়া উঠে, নীরব আকাশ বিহগের কলকণ্ঠে ও ভ্রমরগুঞ্জনে সঙ্গীত-মুখরিত হইয়া উঠে, কেন যে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে, চারিদিকে সৌরভ ছুটে, এ সকল কিছুই জানে না; আমরাও অনেক সময় প্রকৃতি দেবীর এই অপূর্ব্ব বসন্তোৎসবের বরণকিরণগন্ধে ও সঙ্গীত-চ্ছন্দেই কেবল মুগ্ধ হইয়া থাকি, কিন্তু তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম যে কি, ইহার অনুসন্ধান করি না। সেইরূপ প্রথম-যৌবন-সঞ্চারে আমাদের শরীর-মনে যে অভিনব ভাবের উদয় হয়, তাহার আনন্দ এবং উল্লাসটুকুই কেবল আমরা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তাহার ভিতরে যে নিগূঢ় কলাকৌশলটী লুকাইয়া আছে, তাহা ধরিতে চাহিও না, পারিও না। ফলতঃ প্রকৃত মর্ম্ম কিন্তু দু'এরই এক। ঐ বাহিরের নৈসর্গিকী বাসন্তী লীলার যে অর্থ, জীবের শরীর-মনের এই যৌবনলীলারও সেই অর্থ। দুই-ই এককে বহু করিবার, সঙ্কীর্ণকে বিস্তীর্ণ করিবার জন্য প্রকৃতির অদ্ভুত কলাকৌশল মাত্র ভৃঙ্গের পায়ে জড়াইয়া, প্রজাপতির পালকে চড়াইয়া, উদ্ভিদেরা আপনার প্রাণ-কেশরগুলিকে বনময় ছড়াইবার জন্যই, রূপের হাট খুলিয়া, মধুগন্ধ বিলাইয়া, বাসন্তীলীলাতে নিযুক্ত হয়। আর আমরাও সখ্য ও মাধুর্য্য-রতিকে জাগাইয়া, তার সাহায্যে আপনাদিগকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাতেই, সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে, নবযৌবনের রূপরসের পসরা খুলিয়া বসি।

যৌবনের সূচনাতেই সখ্যরতির সঞ্চার হয়। তার পরে, যৌবনের প্রস্ফুট পূর্ণতায়, যাহা মাধুর্য্য-রসের ভিতর দিয়া পরিণতি লাভ করিবে,—সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যারও এই সখ্যরতিতেই "হাতে খড়ি" আরম্ভ হয়। এই জন্য মাধুর্য্যের অনেকগুলি ভাববিভব এবং কলাকৌশল সখ্যেতেও ফুটিয়া উঠে। রূপ-লালসা এবং

আসঙ্গলিপ্সা মাধুর্য্যের প্রাণ। এই রূপ-লালসা এবং আসঙ্গলিপ্সা সখ্যেরও প্রধান প্রেরণা এবং উপজীব্য। দেহাশ্রয় ও রূপজ-মোহ ব্যতীত সখ্যরতির সঞ্চার হয়, এ কল্পনা অসত্য। যৌবনান্তে বা যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি হইলেও বহুলোকের সঙ্গে আমরা অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হই বটে, এবং প্রচলিত ভাষায় অনেক সময় এই সকল আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সখ্য নামও দিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহা সখ্যরতি নহে। সেবা, কল্যাণ-কামনা, চিন্তা ও ভাবের বিনিময়, সংসারের কর্ম্মে ও অবসরের আমোদ-প্রমোদে পরস্পরের সাহায্য —এ সকলই এই আত্মীয়তার সম্বন্ধের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তথাপি ইহা প্রকৃত সখ্য নহে। আর, এই সম্বন্ধের মধ্যে রূপের, ভোগ ও একান্ত আসঙ্গলিপ্সা থাকে না বলিয়াই ইহাকে সখ্য বলা সঙ্গত নহে। প্রকৃত সখ্য কৈশোর-ধর্ম্ম। দেহের তারুণ্য ও লাবণ্য ইহার প্রধান উদ্দীপনা। বিগত-কৈশোরের প্রণয়ের সম্বন্ধেতে প্রণয়ী জনের দেহের প্রতি কোনও প্রকারের লোভ থাকে না। তাঁর হাতখানি ধরিয়া, সে স্পর্শসুখে নীরবে ডুবিয়া যাইবার কোনও সাধ, তাঁর অনাবৃত দেহের সুদৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার কোনও লালসা—হয় না। তাঁর অবিরল সান্নিধ্য লাভ না করিলে, কাছে থাকা ব্যর্থ হইয়া গেল, এমনটা মনে হয় না। অথচ এইগুলি সখ্যরতির নিত্যধর্ম্ম। এই ঘনিষ্ঠ দেহ-সম্বন্ধ-নিবন্ধনই সখ্যরতির মধ্যে আমরা মাধুর্য্যরসের পূর্ব্বাস্বাদ লাভ করিয়া থাকি। এই জন্যই সখ্যরতিরও ঠিক মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের মতন একটা পূর্ব্বরাগের অবস্থা আছে।

আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাহিত্যে সখ্য-বাৎসল্যাদি রসের যেমন অদ্ভুত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইয়াছে, জগতের আর কোনও সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত সেরূপ হইয়াছে বলিয়া জানি না ও শুনি নাই। আর আমাদের বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণ এ সকল রসের রূপ যেমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, অন্য কোনও কবি-সমাজ সেরূপ ফুটাইতে পারেন নাই। পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, মান, বিরহ, প্রভৃতির বর্ণনা যেমন বৈষ্ণব কবিতায় আছে, তেমন আর কোনও কবিতায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণও সখ্যের পূর্ব্বরাগের কোনও চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। গোষ্ঠলীলায় সখ্যের সম্ভোগের এবং শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইলে শ্রীদামাদির বিরহের বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ রসের মধ্যেও যে পূর্ব্বরাগ এবং মানাদির প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার কোনও চিত্র অন্ততঃ এপর্য্যন্ত আমার চক্ষে পড়ে নাই। অথচ এই রসের যে একটা পূর্ব্বরাগের অবস্থা আছে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। আর এই পূর্ব্বরাগের সঙ্গে মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের সাদৃশ্য অতিশয় ঘনিষ্ঠ।

দর্শন বা শ্রবণ এই দুই সূত্র অবলম্বনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। রূপ-দর্শন বা গুণ-শ্রবণ, এই দুই কারণেই,—যাঁর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, কিম্বা গুণের কথা শুনিয়া যাঁর প্রতি প্রাণে একটা আসক্তির সঞ্চার হইল—তাঁর সঙ্গলাভের জন্য লোভ জন্মে। এই লোভেরই নাম পূর্ব্বরাগ। শ্রীকৃষ্ণের নাম গু

শ্রবণে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে—

সই ! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো !
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো !
কেমনে পাইব সই, তারে ?

অন্যদিকে বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎদর্শন হইতেই সঞ্জাত হয়—

নাহি উঠল তীরে, রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে, লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরয় বয়ান।
সখিহে, অপরূপ চাতুরী গোরী !
সব জন তেজিয়া, আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি।
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল,
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল।
নয়ন চকোর, কানুমুখ শশিবর
করল অমিয়া রসপান।
দুহু দোহাঁ দরশনে, রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভাল জান॥

প্রথমে তাঁর নামগুণ শুনিয়া চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়াছেন, তারপর চিত্রপটে কৃষ্ণ-প্রতিকৃতি দেখিয়া, সে অনুরাগ বাড়িয়া যায় ; এবং সর্ব্বশেষে সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়া, সে রূপসায়রে কুলশীলমান ধরম-করম সকল বিসর্জ্জন দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ফলতঃ দর্শন ও শ্রবণ দু'ই পূর্ব্বরাগের সমান বাহন। তবে উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদও আছে। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা ঐ প্রথম দর্শন-লাভের পরেই সখীকে কহিতেছেন :—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ
কো পতিয়ায়ব স্বপন-স্বরূপ।

কিন্তু চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণরূপে যেমন পাগল করিয়া তুলিয়াছে, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকাকে তেমন করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, সাক্ষাৎদর্শনের পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মতন, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা সে রূপকে এমন করিয়া আপনার ধ্যানের বিষয় করেন নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীমতী প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নামগুণ শুনিয়া মুগ্ধ হন। এই নাম-গুণই তাঁর অনুরাগের প্রথম আশ্রয় ও উপজীব্য হয়। কিন্তু নাম শুনিয়া তিনি কেবল নাম লইয়াই পড়িয়া রহেন নাই—কেহই পড়িয়া রহে না। তিনি সেই নামকে আপনার জপমালা করিলেও, আপনার অন্তরে যে সহজ শ্রেষ্ঠতম রূপের আদর্শ ঘুমাইয়া ছিল, তাহাকে জাগাইয়া, সেই নামের উপরে আপনার নবীন অনুরাগের তুলিকা লইয়া সে নবীন রূপকে আঁকিয়া নামের সঙ্গে তারও ধ্যান আরম্ভ করিলেন। মানুষের প্রাণ, জগতের সকল রূপের সার ছানিয়া, আপনার মনের মাঝে তার নিজের সৌন্দর্য্যের আদর্শকে ফুটাইয়া তোলে ও জাগাইয়া রাখে। তার চক্ষে এ রূপের তুলনা জগতে মিলে না। আর আপনার অন্তরের এই অতুলনীয় রূপ

দিয়াই চণ্ডীদাসের শ্রীমতী শ্যামনামের উপরে শ্যামরূপের প্রতিষ্ঠা করিলেন তারপর চিত্রপট-দর্শন। পটের ধর্ম্মই এই যে, তাহা কোনও বস্তুর সমগ্রকে কিছুতেই প্রকাশ করে না ও করিতে পারে না। যে রূপ পটে ফুটিয়া উঠে, তার পশ্চাতে তার শতগুণ, সহস্রগুণ রূপ অস্ফুট থাকিয়া, কেবল যেন চারিদিকে উকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে। প্রথমে যেমন নাম শুনিয়া সেই নামের উপরে শ্রীমতী আপনার অন্তরের সৌন্দর্য্যের ছবিটী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ চিত্রপট দেখিয়াও সেই পটের অস্ফুট রূপের উপরে আপনার অন্তরের রূপের চিরন্তন আদর্শের রসান মাখাইয়া দিলেন। ইহার পরে যখন তাঁর সাক্ষাৎদর্শনলাভ হইল, তখন সে প্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের ধ্যানের রূপটী মিলিয়া মিশিয়া, ভিতরবাহির, চাক্ষুষ ও অচাক্ষুষ উভয়কে এক করিয়া দিল। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া

কি কহব রে সখি কানুক রূপ !
কো পতিয়ায়ব স্বপনস্বরূপ !

ইহার চাইতে কোনও বড় কথা আর কহিতে পারিলেন না। তার পরে যাহা কিছু রূপবর্ণনা করিলেন, সকলই যেন ভাসা-ভাসা, কেবল কবিত্বের চাতুরী, উপমার ছলাকলা মাত্র। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা পূর্ব্ব হইতেই গভীর ধ্যানযোগে ও মানস-সম্ভোগের দ্বারা সে স্বপ্নকেই প্রত্যক্ষ ও সত্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুতরাং সাক্ষাৎদর্শনে তাঁর স্বপ্নাবেশ হইল না ; বরং তন্দ্রা টুটিয়া গিয়া সজাগ দৃষ্টিতে সে সত্যরূপ দেখিয়া, তিনি সজ্ঞানে তাহার পদে আপনার তনু-মন-প্রাণ সকলি সমর্পণ করিলেন। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার পরিষ্কার, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আর ছায়ার মতন দেখেন নাই !

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু জিনিয়া শ্যামের তনু
উদইছে যেন শশী রবি।
সই কিবা সে শ্যামের রূপ
নয়ান জুড়ায় চেঞা।
হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা।

অন্যত্র—

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।

দুইটী মোহন নয়নের বাণ
দেখিতে পরাণ হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়া ধরমে
পরাণ সহিত টানে।

দর্শন ও শ্রবণ—রূপদর্শন এবং নামগুণ-শ্রবণ—ইহা হইতেই পূর্ব্বরাগের জন্ম হয়। সখ্যের পূর্ব্বরাগ প্রায় সর্ব্বদাই রূপদর্শনে জাগ্রত হয়। মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগ দর্শন ও শ্রবণে—আর আমাদের দেশে বিশেষতঃ প্রিয়জনের নামগুণ শুনিয়াই জাগিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই পূর্ব্বরাগেরও একটা পূর্ব্বাবস্থা আছে। যৌবন ফুটিতেছে অথচ বাল্যও একেবারে চলিয়া যায় নাই, এই বয়ঃসন্ধিকালেই সখ্যের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। এই সময়ে বাল্য-বন্ধু ও বাল্যসহচরীগণই আমাদের

প্রেমের প্রধান আলম্বন ও উপজীব্য হইয়া কেন। তখনও মাধুর্য্যের ভূমি প্রস্তুত হয় নাই। প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ—প্রজনন-হেতুই কাম বা কন্দর্প ভগবানের বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হয়। আর এই প্রজনন-চেষ্টা হইতেই শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য-রসের উৎপত্তি হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের শরীর-মনের অবস্থা প্রজনন-ক্রিয়ার উপযোগী হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে মাধুর্য্যের ভূমিও প্রস্তুত হয় না। অতএব স্ফুটনোন্মুখ যৌবন যেমন সখ্যরতির আশ্রয়, সেইরূপ প্রস্ফুট যৌবনই কেবল মাধুর্য্যের আশ্রয় হইয়া থাকে। যৌবন ফুটিবার পূর্ব্বে সখ্য-রতিই জন্মিতে পারে, কিন্তু মাধুর্য্য জন্মিতে পারে না। সেইরূপ আবার যৌবন একেবারে নিঃশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে আর প্রকৃত মাধুর্য্য ফুটিবার অবসর পায় না। যে সকল সমাজে অতীত-যৌবন-বিবাহ প্রচলিত, সেখানে আমাদের রস-শাস্ত্রে যাহাকে পূর্ব্বরাগ বলিয়াছেন, তার সত্য স্বরূপটী ভাল করিয়া ফুটিতে পারে না। একদিকে একটা বলবতী লালসা, অন্যদিকে একটা অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা,—এই দুই ভাব মিলিয়া যে গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে, তাহাই পূর্ব্বরাগের প্রাণ। জীবনের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভবিষ্যতের আশা ও আশঙ্কা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা স্বল্পবিস্তর স্থিরবুদ্ধি জন্মিতে আরম্ভ করে। আর পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল অবস্থার যেরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে, এবারেও তাহার অনুরূপ অবস্থার সেইরূপ পরিণতিই ঘটিবে, এই যে ধারণা, ইহা হইতেই অনাগত বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ কমিয়া আইসে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদের সংসারের ভাবনা ও কর্ম্মচেষ্টা যতই প্রবল হউক না কেন, প্রথম বয়সের অসহ্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা যে ক্রমে কমিয়া আইসে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। এবং এই জন্যই পরিণত যৌবনে বা যৌবনান্তে আমাদের জীবনে মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগ ফুটিয়া উঠিবার উপযোগী ভূমি ও অবসর প্রাপ্ত হয় না।

প্রথম যৌবনের সূচনায় আমরা একটা অনন্ত অজ্ঞাত রাজ্যের সীমাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াই। আমাদের শরীরের মধ্যে তখন একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করে—এই অভিনব উল্লাস ও বিবর্ত্তন-স্রোতে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে, ইহা আমরা তখনও জানি না। জানি কেবল একটা নূতন শক্তির জাগরণ, একটা নূতন আনন্দের সঞ্চার, একটা নূতন রূপের বিকাশ, একটা নূতন ভোগের পিপাসা। এই যৌবন যখন আপনার নিঃশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, এই বিকাশ যখন বন্ধ হইয়া যায়,—ইন্দ্রিয়ের লালসা মাত্র তখন থাকে, কিন্তু পূর্ব্বকার সে রস বা রোম্যান্স-টুকু আর থাকে না। ফলতঃ অজ্ঞাতের আশ্রয় ব্যতীত কোথাও সত্য রস বা রোম্যান্স (Romance) ফুটিতে পায় না। অজ্ঞাতই রসের বা রোম্যান্সের নিত্যভূমি। যে দম্পতি পরস্পরকে একান্তভাবে জানিয়া ফেলিয়াছেন, যাহাদের পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের রূপের, গুণের, চিন্তার, ভাবের, আচার-আচরণের মধ্যে অজানা কোনও কিছু থাকে না,—যাঁরা পরস্পরের সম্বন্ধে সত্যভাবে সর্ব্বদা ইহা অনুভব করেন না যে—"জানি

জানি মনে জানি, কিন্তু আমি জানিনে"
চিনি চিনি মনে চিনি, কিন্তু আমি চিনিনে"—
তাঁদের দাম্পত্য সম্বন্ধের রস বা রোম্যান্স (Romance) আর থাকে না। যতদিন ঐ অজানা জগৎটা পরস্পরের রূপের, গুণের, আচার-আচরণের মধ্যে একে অন্যের চক্ষে নিয়ত জাগিয়া থাকে, ততদিনই প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের দাম্পত্য-প্রেমে মাধুর্য্য-রস বিদ্যমান থাকে। সব জানা হইয়া গেলে, কামের সন্ধুক্ষণ-নিবৃত্তি না হইলেও, প্রেমের সন্ধান আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন নিতান্ত সাধুলোকের মধ্যেও, প্রেমের ডোর ছিঁড়িয়া গিয়া, কেবল সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য-বন্ধন মাত্র অবশিষ্ট রহে। কেবলমাত্র কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য, কিম্বা শুদ্ধ প্রজননক্রিয়া-সম্পাদনার্থে যৌবন একান্ত আবশ্যক নহে। কিন্তু মাধুর্য্যের জন্য তাহা নিতান্তই প্রয়োজন। এই জন্যই চণ্ডীদাস কিশোরা-কিশোরীর যুগল-মূর্ত্তিকে মাধুর্য্যের আধার ও আশ্রয় বলিয়াছেন।

কিশোরা কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন।

কিন্তু এখানে কিশোরা-কিশোরী বলিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকা বুঝিলে চলিবে না। প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানে একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তই কৈশোরকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবপদ্র-কর্ত্তাগণের, বিশেষতঃ বিদ্যাপতি ঠাকুরের, পরিভাষায় ইহাকে কৈশোর না বলিয়া বয়ঃ-সন্ধি বলাই সমধিক সঙ্গত। আর বয়ঃসন্ধি-কালে সখ্যরতিরই সঞ্চার ও বিকাশ সম্ভব, মাধুর্য্যরসের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। ফলতঃ চণ্ডী-দাসের পদাবলীতেও শ্রীমতীর যে রূপবর্ণনা আছে, তাহা হইতে তাঁহাকে কোনও মতেই অপ্রাপ্তবয়স্কা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার ছবি নহে, কিন্তু প্রস্ফুট-যৌবনা রমণীরই ছবি।

তড়িত বরণী, হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন বা রাজে॥
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি
কনক মন্দির লাগে।
তাহার উপরে চূড়াটি বসালে
সে আর অধিক ভাগে॥

অন্যত্র—

সজনি ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী, নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহ পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, কৈরাছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ-কুচ মূলে, হেমহার দোলে,
সুমেরু শিখর জানি॥

আবার অন্যত্র আছে—

থির বিজুরী বদন গৌরী
পেখনু ঘাটের কূলে।

কামড়া ছাঁদে, কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া, লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচ কুচ যুগ, বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন :—

শ্রীফল যুগল, জিনি কুচ যুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপরে, মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥

শ্রীকৃষ্ণমুখে শ্রীমতীর রূপ-বর্ণনার সকলের শেষ পদটী এই—

কনক বরণ কিবে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর।
সই, কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহল পশি॥
গলার উপর, মণিময় হার
গগন মণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি, কনক গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু উরুতে, লম্বিত কেশ—
ইত্যাদি।

নায়কের পূর্ব্বরাগের বর্ণনায়, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধিকার যে রূপের বর্ণনা এখানে করিয়াছেন, প্রচলিত অর্থে তাহা কৈশোর রূপ হইতেই পারে না। একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তও অঙ্গ-গঠনের এতটা বিকাশ প্রায় হয় না। গুরুনিতম্ব, পীনপয়োধর প্রভৃতি প্রস্ফুটযৌবনেরই লক্ষণ, বিকাশোন্মুখ যৌবনে ইহা পাওয়া যায় না। অতএব চণ্ডীদাসের কৈশোর-কাল কিছুতেই একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা যায় না। কদাচিৎ কোনও স্থলে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার মধ্যে এতটা অসাধারণ অঙ্গবিকাশ দেখা গেলেও, সচরাচর আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ এবং শীতপ্রধান য়ুরোপে অষ্টাদশ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্তই চণ্ডীদাস কৈশোর-নামে যে প্রস্ফুট যৌবনের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্ণয় করিতে হয়। চণ্ডীদাসের কিশোরী অঙ্কুরিতযৌবনা বা সদ্যোভিন্নযৌবনা নহেন, কিন্তু প্রস্ফুট বা বিকশিতযৌবনা।

কিশোরাও, সেইরূপ বালক নহেন, কিন্তু যুবক। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেই ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। সাক্ষাদ্দর্শনের পরে শ্রীমতী সখী সম্বোধনে বলিতেছেন—

সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥
এ বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম, ধৈর্য্য ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥

অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে, লোমলতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী, কামধনু জিনি
ইন্দ্রধনুকের আভা॥

আর একবার শ্রীমতী কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

অতি সে শোভিত, বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিয়ে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল, শোভি আছে ভাল
উপজে মদন বিকার॥
নাভির উপরে জনু, তমাল জিনিয়া তনু
দলিত অঞ্জন জিনি আভা।
বড় কারিকর, কুন্দিয়াছে ভাল
থাম কদলী শোভা॥

অন্যত্র—

বিম্বফল জিনি কে বা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড।
কম্বু জিনিয়া কে বা, কণ্ঠ বনাইল রে,
বিস্তারি পাষাণে কে বা, রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কে বা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আচলি উপরে কে বা, কদলি রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কে বা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥

যেমন শ্রীমতীর গুরুনিতম্ব পীনপয়োধর প্রভৃতি, প্রচলিত অভিধানে যাহাকে কৈশোর বলে, তাহার লক্ষণ নহে; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তারিত বক্ষ, নাভি, লোমলতাবলী, কদলি-সম উরুযুগ, এই সকলও কৈশোরের ছবি নহে। চণ্ডীদাসের শ্রীমতীর রূপবর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা উভয়ই তাঁর নায়ক-নায়িকার কোমল কৈশোরের নহে, কিন্তু প্রস্ফুট যৌবনেরই প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যেমন, বিদ্যাপতির পদাবলীতেও সেইরূপই, প্রথম দর্শনের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা পরস্পরের যে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কৈশোরাবস্থার নহে, কিন্তু প্রস্ফুটযৌবনেরই পরিষ্কার প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দর্শনের পরে বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

উরহি অঞ্চল, কাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে, শারদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু॥

অন্যত্র বলিতেছেন—

গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমতি-হারা।
কামকম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী-ধারা॥

আবার—

অপরূপ-রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজ-গমনি ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি,
তনু অতি কোমলিনী
কুচ-ছিরি-ফল ভরে ভাজিয়া পড়য়ে জনি॥

পীনপয়োধর, গুরুনিতম্ব, সমভাঙ্গ,—এ

সকলের কোনটাই কৈশোর-লক্ষণ নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি পূর্ব্বরাগ বর্ণনার পূর্ব্বেই বয়ঃসন্ধির বর্ণনা করিয়া, পূর্ণ ও প্রস্ফুট যৌবনের পূর্ব্বে যে মাধুর্য্যের সঞ্চার অসম্ভব ইহা স্পষ্টতঃই বলিয়া গিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণের কিশোরা-কিশোরীকে আধুনিক বাঙ্গালা অভিধানের অর্থে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বা অস্ফুটযৌবনা মনে করা কোনও মতেই সঙ্গত নহে। তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনার সঙ্গে এই অর্থের কোনও প্রকারের সঙ্গতি হয় না।

ফলতঃ প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানে যাহাকে কৈশোর বলে, বিদ্যাপতি তাহাকেই বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। এই কৈশোরে বা বয়ঃসন্ধিকালে সখ্যরতিরই জন্ম হয়, মাধুর্য্য জন্মে না। এই কৈশোরে মানুষ জানা ও অজানার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের গোধূলী লগ্নে আসিয়া দাঁড়ায়। অজ্ঞাতের ছটা আসিয়া তখন যাবতীয় জ্ঞাতকে উদ্ভাসিত করিতে আরম্ভ করে। উন্মেষোন্মুখ যৌবনের প্রথম মলয়-নিশ্বাসে তখন একটা অভিনব রূপ-লালসা ও আসঙ্গলিপ্সা শরীর-মনকে চঞ্চল করিতে আরম্ভ করে। তখনও কিন্তু জননে-ন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি হয় নাই। প্রজনন-প্রয়োজনে প্রস্ফুট যৌবনে জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে পূর্ণতাপ্রাপ্তি অত্যাবশ্যক, সে পূর্ণতা তখনও ফুটিয়া উঠে নাই; তার অঙ্কুর মাত্র সবে জাত হইতেছে। ভিতরে ভিতরে তখন সবে এই নবযৌবনের সাড়া পড়িয়াছে, কিন্তু এই সাড়ার মর্ম্ম সম্যক উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এই বয়ঃকালকেই আমাদের দেশের রসতত্ত্ব-বিদেরা বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। তখন মানুষ না পুরুষ না স্ত্রী; না রমণ, না রমণী। এই বয়ঃসন্ধিকালই সখ্যরতির উপযোগী যুগ। এই বয়ঃসন্ধিকালেই ইংরেজিতে যাহাকে school-boy কিম্বা school-girl love বা friendship বলিয়া থাকে, তার জন্ম হয়। তখনও মাধুর্য্যের আশ্রয় যে শৃঙ্গাররতি তার প্রেরণা জাগে নাই, অথচ উষার প্রথমতম আভাসের মতন, এই অপূর্ব্ব, অজ্ঞাত রসের একটা ঈষৎ-আভা শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমরা নিজেরাই নিজেদেরে চিনি নাই ও বুঝি না; কেবল প্রতিদিন নূতন নূতন রূপরসের বিকাশ অনুভব করিয়া কেমন একটা অজানাভাবে বিভোর হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেদের দেহেতে এই উন্মেষোন্মুখ যৌবনের নিত্য নবরূপের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া নিজেরাই বিস্মিত হইয়া, চকিত হইয়া, মুগ্ধ হইয়া, বারম্বার তাহারই ধ্যান করিতে থাকি। এই ধ্যান হইতে এই শরীরের প্রতি একটা অভিনব মমতা, এই দেহের স্ফূর্ত্তি ও কান্তি-সাধনের জন্য একটা অভিনব প্রসাধন-প্রয়াস প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ে দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমরা নিজেরা নিজেদের রূপেরই সম্ভোগ করিতে থাকি। এই রূপে তখনও অপর কাহারও অধিকার হয় নাই। ইহাই বয়ঃসন্ধির অবস্থা। এই অবস্থাতেই আমাদের শরীর-মনেতে ক্রমে ক্রমে মাধুর্য্যের ভূমি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে।

বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বয়ঃসন্ধির কোনও বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। অথচ রসের সকল রূপকে ভাল করিয়া ফুটাইতে হইলে, যেমন নায়িকার সেইরূপ

নায়কেরও বয়ঃসন্ধির প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করা আবশ্যক হয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই এই বয়ঃসন্ধির সঙ্গে পরবর্ত্তী প্রস্ফুটযৌবনে মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের যে সকল রূপ ফুটিয়া উঠে, তার অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধির কোনও ছবি বৈষ্ণব-পদাবলীতে না থাকিলেও, বিদ্যাপতি ঠাকুর শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধির অতি অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জগতের আর কোনও সাহিত্যে ইহার অনুরূপ কোনও কিছু পাওয়া যায় বলিয়া এখনও জানি নাই। আর পূর্ব্বরাগের সত্য রূপটী যে কি, ইহা ভাল করিয়া ধরিতে হইলে, প্রথমে এই বয়ঃসন্ধিকালে নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এই সকল ভাবই প্রস্ফুট-যৌবনের তাড়িতসঞ্চারের দ্বারা রূপান্তরিত ও অর্থান্তরিত হইয়া, পূর্ব্বরাগের স্বরূপকে ফুটাইয়া তোলে। শৈশব ও যৌবনের মিলন-কালকেই এই বয়ঃসন্ধি বলা হয়।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরি, লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত, হাসত, পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরীসম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ॥

অন্যত্র—

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চমকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মন্মথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই, ক্ষণে হোয় ভোর॥

আবার—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥
থির নয়ন অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয় থল লালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥

তার পরে যখন যৌবন আর একটু ফুটিয়া উঠিল, তখন এ সকল ভাবেরও একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল, উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহ নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥

তার পরে, যৌবন যখন আরো প্রস্ফুট হইল তখন—

দিনে দিনে পয়োধর ভৈল গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীট।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥

কেমন করিয়া ধীরে ধীরে শৈশব সরিয়া যায় ও যৌবন আসিয়া তার স্থান অধিকার করে, বিদ্যাপতি ঠাকুরের শ্রীরাধিকার এই বয়ঃসন্ধির চিত্রেতে তাহা অতিশয় বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর

"জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান"

এই পদেতে বিদ্যাপতি ঠাকুর এই বয়ঃসন্ধির সঙ্গে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গারের সম্বন্ধ কি ও কতটুকু ইহা অদ্ভুত কলাকুশলতা সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। শৈশবে আমাদের দেহমনে মদনের কোনও সাড়া পড়ে না। শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য কাকে বলে তখন আমরা তার কোনও কিছুই জানি না। কিন্তু এই বয়ঃসন্ধিকালে, আসন্ন যৌবনের পূর্ব্বভাগে শরীর-মনের যখন একটা নূতন বিকাশ আরম্ভ হয়, তখনই প্রথমে মনসিজ জাগিতে আরম্ভ করে—কিন্তু চক্ষু খোলে না। ভিতরে ভিতরে তার জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বহিশ্চৈতন্যের প্রকাশ হয় নাই। ফলতঃ কোনও বিশিষ্ট মানুষী রূপের প্রেরণা ব্যতীত মনসিজ কখনও এই বহিশ্চৈতন্য লাভ করে না। এইরূপ চাক্ষুষই হউক বা কেবল কল্পিতই হউক,—ইহার প্রেরণা মনসিজের নয়নোন্মীলনের জন্য অত্যাবশ্যক। আর কল্পিতরূপও প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত ফুটে না। কারণ স্থানবিশেষে, কালবিশেষে, আধারবিশেষে যে রূপ প্রত্যক্ষ হয়, অন্যস্থানে, অন্যকালে, অপর আধারে, যেখানে তাহা প্রত্যক্ষ নাই, সেখানে তার আরোপ বা অধ্যাস করিয়াই আমরা সর্ব্ববিধ কল্পিত রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকি। এইরূপে বিশেষ রূপের প্রত্যক্ষ বা কল্পনা ব্যতীত মনসিজের মুদিত-নয়ান খোলে না। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার জাগ্রত কিন্তু নিমীলিতনেত্র মনসিজ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শনে চক্ষু মেলিয়াছে। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মনসিজের এই নিমীলিত নেত্র প্রথমে শ্রীমতীর অন্তরের ধ্যানমূর্ত্তি ভাবিয়া, ও পরে চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শনলাভে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হইয়া খুলিয়া যায়। কিন্তু উভয়-ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকালে ইহা জাগ্রত অথচ নিমীলিতনেত্র হইয়া ছিল।

বিদ্যাপতি ঠাকুর পূর্ব্বরাগের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধির এই অনুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়া, মাধুর্য্যের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়, শরীরের ও স্নায়ুমণ্ডলের কোন্ অবস্থাকে কিরূপে কোন্ দিক দিয়া অবলম্বন করিয়া এই উন্নত উজ্জ্বল রসশ্রী তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, ইহার বিবর্ত্তন-ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্বটীও অতি পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এইখানেই আমরা পূর্ব্বরাগের মনস্তত্ত্বের বা psychology'র সন্ধান প্রাপ্ত হই। আর এইখানেই আমরা অতি পরিষ্কাররূপে এটী দেখি যে, প্রস্ফুট যৌবনে ভিন্ন মাধুর্য্যের সত্য আশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। শ্রীরাধিকার যখন—

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥

আর এইরূপে শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্বেতে যখন যৌবন সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল এবং শৈশব সদলবলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল,—অর্থাৎ যৌবনের পূর্ণ ও অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব যখন তাঁর দেহ-মনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল,—তার পরেই যমুনা-স্নানে যাইয়া কানু-দরশনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

বুড়া বয়সে কলম ধরিতে যাওয়াই এক প্রকার বিড়ম্বনা। লিখিতে বসিলে সব কথা সকল সময়ে ঠিক মনে আসে না,—আর যদিই বা আসে, ভাল করিয়া গুছাইয়া লেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু তা' বলিয়া জগদীশ বাবুর জীবনবৃত্তান্ত বাদ দেওয়া চলে না। সুতরাং যেখানে যেখানে ত্রুটি ঘটিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

জগদীশ বাবু যখন নোয়াখালিতে, তখন সেই বিভাগে ডরান্ট বলিয়া একজন সিভিল-সার্জ্জন ছিলেন, পানাধিক্যের জন্ম সাহেবেরা কেহই তাঁহাকে সুচক্ষে দেখিতেন না, ইনি জগদীশ বাবুর শরণাপন্ন হন, জগদীশ বাবুও ইঁহাকে সহায়তা করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর জগদীশ বাবুর নিকটে আসিয়া কি চাহেন, জগদীশ বাবু তাহা দিতে স্বীকৃত হন নাই, তাহাতে রাগান্ধ হইয়া হস্তস্থিত একটা 'ছুপ্‌টি'র দ্বারা জগদীশ বাবুকে আঘাত করিতে যান, ছুপ্‌টির অগ্রভাগ জগদীশ বাবুর মুখে লাগে, তিনি ইঁহার মত্ততার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, অন্ত কোনও প্রতিবিধান না করিয়া, আর্দ্দালিদের কেবল উঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হুকুম দেন, আর্দ্দালিরা বাহিরে লইয়া গিয়া কিছু শাস্তি দেয়, সাহেব প্রাণভয়ে পলায়ন করে।

লেফ্‌টেনান্ট গবরণর গ্রে সাহেব এ কথা জানিতে পারিয়া, একেবারে ডরান্টকে ডিস্‌মিস্ করেন, নোয়াখালি হইতে আসে, তাহার এমন সংস্থান ছিল না, সুতরাং জগদীশ বাবুর নিকট সহায়তা প্রার্থনা করে, জগদীশ বাবু তাহার পূর্ব্ব ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন, এ রকম উদারতা আজকাল বিরল।

একবার জগদীশ বাবু ময়নাগড়ের রাজা ও তাঁহার দল-বল লইয়া কাঁচড়াপাড়ায় যাইতে-ছিলেন, শিয়ালদহ ষ্টেশনে পুলিশ-বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনেরাল কর্ণেল ভিউ, ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনেরাল কর্ণেল গর্ডন, পারসনাল আসিষ্টান্ট মেজার উইলকিন্‌সন্ এবং অপরাপর সাহেব পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা জগদীশ বাবুকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি অম্লান বদনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটগুলি দেখাইয়া উত্তর করিলেন "আমার বন্ধুদের লইয়া কাঁচড়াপাড়ায় যাইতেছি এবং তৃতীয় শ্রেণীর এই টিকিটগুলি ক্রয় করিয়াছি।" কয়জন এ অবস্থায় পড়িলে সত্যকথা বলিতে সাহসী হইতেন?

যখন জগদীশ বাবু নোয়াখালিতে, তখন হুইনফিল্‌ড্‌ বলিয়া একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান কলেক্টর ছিলেন, নিমকসংক্রান্ত কোন বিষয় তাঁহার জানিবার আবশ্যক ছিল, সুতরাং রেভেনিউ বোর্ডে সেই তথ্য জানিবার জন্ম লেখেন, আলানুজোমনি তখন বোর্ডে নিমক বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি উত্তর পাঠাইলেন 'নিমকের সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার আবশ্যক হইলে বোর্ডকে লিখিতে হইবে না, ওখানে তোমার যে

পুলিশের কর্ত্তা আছেন, তিনি নিমকসম্বন্ধীয় বিষয়ে এত দক্ষ ও বিজ্ঞ যে, তিনি যাহা বলিবেন সেই মতে যেন কার্য্য করা হয়, বোর্ডকে লিখিবার আবশ্যক নাই, বোর্ড ও গবর্ণমেণ্ট নিমক সম্বন্ধে জগদীশ বাবুর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন।”

ছইন্‌ফিল্‌ড সাহেবের জগদীশ বাবুর উপর এত শ্রদ্ধাভক্তি বৰ্দ্ধিত হইল যে, তাঁহার স্ত্রীকে জগদীশ বাবুর সঙ্গে এক বোটে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন, আজকাল এমত সৌহার্দ্দ্য বাঙ্গালী-ইংরাজের ভিতর দুর্ল্ভ।

বালেশ্বরে থাকিবার সময় ইনি উড়িয়াদিগের উচ্চ শিক্ষা দিবার এবং সরকারী কার্য্যে ভর্ত্তি করিবার সুব্যবস্থা করেন; বাঙ্গালীরা তখন উড়িয়াদের সুচক্ষে দেখিতেন না, এমন কি উড়িয়া ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা ছিল না, জগদীশ বাবু উড়িয়াদের নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন,তাহাতে বাঙ্গালীরা মনে মনে বিরক্ত হইলেন, যদিও প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে কেহ সাহসী হন নাই। এই সম্বন্ধে বাবু ফকিরমোহন সেনাপতি, বাবু গোবিন্দ দাস এবং মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর অনেক কথা বলিতে পারেন। জগদীশ বাবুর উত্তেজনায় ডিভিসনাল্ কমিশনার রেভেনসা সাহেব স্থানীয় সাহেবদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, উড়িয়াদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার পরেই রেভেনসা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জগদীশ বাবুর পরামর্শ মত চাঁদবালী বন্দর খোলা হয়, উড়িষ্যার পথে তখন চোর-ডাকাতের বড় ভয় ছিল, যাত্রীদের কাপড়-চোপড় কাড়িয়া কুড়িয়া লইয়া শুধু বদমায়েসেরা যে ক্ষান্ত হইত তাহা নহে, সময়ে সময়ে খুন জখম অবধি করিয়া ফেলিত। অধিকন্তু পথে পীড়া হইলে একেবারে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, জগদীশ বাবু প্রাগুক্ত রোডে এমন সুব্যবস্থা করিলেন যে, প্রত্যেক এক ক্রোশ অন্তর একজন কনষ্টবল ও চারিজন পাইক এবং প্রত্যেক তিন ক্রোশ অন্তর একজন হেড্ কনষ্টবল, চারিজন কনষ্টবল এবং আটজন পাইক, তাহাদের এলাকার ভিতর চৌকি পাহারা করিত,ইহাদের উপর একজন ইন্‌স্পেক্টর ও দুইজন সব্‌ইন্‌স্পেক্টার খালি জেদগস্ত করিত, স্বয়ং জগদীশ বাবু নিজে ঝুপ ঝাপ করিয়া আজ এখানে কাল ওখানে দেখিয়া বেড়াইতেন, সুতরাং চুরি ডাকাতী তাঁহার এলাকার ভিতর একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সব পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের নিকট জ্বর, কলেরা, রক্ত আমাশয়ের ঔষধ থাকিত এবং পানীয় জলের ইন্দারা অথবা পুষ্করিণী তাহারা একেবারে ময়লা করিতে দিত না। এই প্রকার সুচারু বন্দোবস্তে যাত্রীদিগের বড়ই উপকার হইয়াছিল। ক্রমে কটক এবং পুরীর পুলিশ সাহেবেরা ঠিক ঐ রকম আপন আপন এলাকায় করিয়াছিলেন। এই সময় দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, স্যার রিচার্ড টেম্পল জগদীশ বাবুকে মনোনীত করিয়া দুর্ভিক্ষকার্য্যে ব্রতী করিলেন। তিনি প্রথমতঃ দুইলক্ষ মণ চাউল সংগ্রহ করিবার ভার পান, মালদহ এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে চাউল সংগ্রহ করিয়া, উহা দিনাজপুরে গোলাজাত করা হয়, দিনাজ-

পুরে চারিমাস ধরিয়া তিনি পুলিস ও দুর্ভিক্ষ উভয় বিভাগেরই কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার পর রামগঞ্জে গিয়া একেবারে দুর্ভিক্ষের কর্ম্মে ব্রতী হয়েন। এই রামগঞ্জ মাঠের উপর একটা ক্ষুদ্র স্থান, কিন্তু দুর্ভিক্ষের জন্য ইহা আধা সহরে পরিণত হইল। 'ফেমিন'কর্ম্মচারীর সুবৃহৎ বাঙ্গালা সম্মুখে সুবৃহৎ তাম্বু খাটান, এই তাম্বুটি অফিসারদিগের জন্য এবেসিনিয়ান এক্স্পিডিসনে গিয়াছিল, বড় বড় প্রকাণ্ড চালের গোলা, কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার বাসা, খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য দোকান-ঘর প্রভৃতি নানাবিধ আটখানা চালা বাঙ্গালা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর প্রভৃতিতে রামগঞ্জ একটা জনাকীর্ণ স্থান হইয়া পড়িল। গ্রামটির নীচে টাঙ্গন বলিয়া একটি নদী হিমালয় হইতে পড়িতেছে, তাহার বক্ষে পারাপারের সুবিধার জন্য একটি বাঁশের পুল নির্ম্মিত হইল।

(ক্রমশঃ)

জিজ্ঞাসা।

—:*:—

হে ধ্রুব, হে অন্তর্য্যামী, হৃদি-অন্তঃপুর
তব রূপ-রস-স্পর্শে সদা ভরপুর—
এ কথা কে কবে নাথ, করে অস্বীকার ?
তবে কেন প্রাণারাম, হেন ব্যভিচার,—
তব সহ পরিচয় করিবার তরে,—
অক্ষয় করুণা-স্নেহ লভিতে অন্তরে,—
পুরোহিত—প্রতিনিধি—পথ-প্রদর্শক,
অনিল-সলিল-সম হবে আবশ্যক ?
যে সম্বন্ধে বাঁধিয়াছ হৃদয় আমার—
তা'র মাঝে কোথা স্থান অন্যে দাঁড়াবার ?
আমার প্রাণের কথা—সে গুপ্ত কাহিনী—
মিলন-মঙ্গল তব, দিবসযামিনী,
অপরে বলিবে মোরে,—তা' কি হয় কভু ?
চির-প্রিয়তম মম, হে নিখিল প্রভু !

শ্রী[illegible]চন্দ্র দেববর্ম্মা।

প্রথম পাঁচ ফর্ম্মা মেট্‌কাফ্‌ প্রিন্টিংওয়ার্কসে ও শেষ দুই ফর্ম্মা মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৌর অচিরেই পুনরায় বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু বর্ষা তখন সমাগতপ্রায়; সুতরাং বর্ষাপগম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। শরতের প্রারম্ভে গৌর যাত্রা করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণকে ভক্তগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সঙ্গে লইলেন।

প্রশস্ত রাজপথ ত্যাগ করিয়া গৌর অরণ্য-পথে চলিলেন। কটক নগর দক্ষিণে রাখিয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হস্তিব্যাঘ্রমৃগ সমাকুল অরণ্যমধ্যে বলভদ্র ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গৌরের কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ অন্তঃকরণে ভয়ের স্থান ছিল না। বন্য জন্তুগণ তাঁহার প্রেমপুলকিত মূর্ত্তি দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। এক দিন পথের উপরি শায়িত এক ব্যাঘ্রের গাত্রে গৌরের চরণ পতিত হইল। ব্যাঘ্রের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে গৌর কহিলেন "কৃষ্ণ বল।" শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্র অমনি গাত্রোত্থান করিয়া "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া নাচিতে লাগিল। এক দিন স্নানকালে গৌর দেখিতে পাইলেন, এক মত্ত হস্তিযূথ নদীতে জলপান করিতে আসিল। "কৃষ্ণ বল" বলিয়া গৌর সেই হস্তিদলের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিলেন। হস্তিগণ "কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিয়া নাচিতে লাগিল। কেহ কেহ ভূমিষ্ঠ হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল, কেহ কেহ উচ্চ হুঙ্কারে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

মুক্ত আকাশতলে গৌর প্রাণ ভরিয়া মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুধাবর্ষী স্বরে আকৃষ্ট হইয়া, দলে দলে মৃগীগণ সমাগত হইল এবং তাহার উভয় পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া গমন করিতে লাগিল। গৌর সস্নেহে তাহাদের গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কতিপয় ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। ব্যাঘ্রভয়ে মৃগীগণ পলায়ন করিল না। ব্যাঘ্রগণ মৃগীদিগকে আক্রমণ করিল না। ব্যাঘ্র ও মৃগী একত্রিত হইয়া গৌরের সঙ্গে নাচিতে লাগিল। গৌর বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে

বলিতে ব্যাঘ্র ও মৃগীগণ নাচিতে লাগিল। ব্যাঘ্র ও মৃগ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের মুখচুম্বন করিল। শাখারূঢ় ময়ূরগণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল এবং আকাশমার্গে গৌরের সহিত গমন করিতে লাগিল

ঝারিখণ্ডের অরণ্যের মধ্যে গৌর চলিতেছিলেন। অসভ্য ঝারিখণ্ডবাসিগণ গৌরের নিকট কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আবিষ্টভাবে গৌর চলিতে লাগিলেন। বনানীদর্শনে তাহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল। শৈল দেখিয়া গোবর্দ্ধন মনে হইল। নদী-দর্শনে কালিন্দী-প্রতীতি হইল। এইভাবে বহুপথ অতিক্রম করিয়া, গৌর অবশেষে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। মণিকর্ণিকায় স্নান কালে তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিদায়কালে এই তপন মিশ্রকেই গৌর কাশী যাইতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তপন কাশী আসিয়া গৌরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আজ দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং পরম যত্নে স্বীয় আবাসে লইয়া গেলেন। তথায় বৈদ্যবংশোদ্ভব চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য বহুলোক তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন।

প্রকাশানন্দ নামক এক প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত তখন কাশীধামে বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেন। এক দিন এক ব্রাহ্মণ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে গমন করিয়া গৌরের মনোমোহকর মূর্ত্তি ও প্রেমবিহ্বল কীর্ত্তনের কাহিনী বর্ণনা করিল। প্রকাশানন্দ তাহা শুনিয়া অবজ্ঞাভরে হাস্য করতঃ কহিলেন, "হাঁ, গৌরবেশে কেশবভারতীর শিষ্য এক প্রতারক-সাধু 'চৈতন্য' নাম গ্রহণ করতঃ দেশে দেশে লোক ভুলাইয়া বেড়াইতেছে, শুনিয়াছি। সার্ব্বভৌমের মত তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতও না কি তাহার মোহিনী শক্তি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু কাশীধামে তাহার ইন্দ্রজাল-বিদ্যা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না—তজ্জন্য চিন্তা নাই।" ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া গৌর হাস্য করিয়া উঠিলেন।

কয়েক দিন বারাণসীধামে অবস্থান করিয়া গৌর মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে যমুনাদর্শনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বলভদ্র শশব্যস্ত হইয়া ধরিয়া তুলিলেন। প্রয়াগে তিন দিন অবস্থান করতঃ অসংখ্য নরনারীকে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া পুনরায় মথুরার পথে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে কয়েক স্থানে পুনরায় যমুনাদর্শন হইল। প্রতি বারই গৌর প্রেমপুলকিত ভাবে তাহাতে অবগাহন করিলেন। অবশেষে মথুরা দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। গৌরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি বিহ্বলভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মথুরায় প্রবেশ করতঃ বিশ্রামতীর্থে স্নান করিয়া কৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করিলেন। মথুরার আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার নৃত্য ও সংকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সানোড়িয়া-বংশোদ্ভব এক ব্রাহ্মণে তাঁহার প্রেম সংক্রমিত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি বাহু তুলিয়া গৌরের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গৌর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া, উভয়ে হরিনাম করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া গৌর অবগত হইলেন, ব্রাহ্মণ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পরিচয়ে তুষ্ট হইয়া গৌর তাহার গৃহে ভোজন করিতে চাহিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে সানোড়িয়ার অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণ আপত্তি করিলেন। কিন্তু গৌর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সানন্দে তাঁহার গৃহে ভোজন করিলেন। তথায় অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত হইল। গৌর তাহাদিগকে দর্শন দিয়া প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিলেন। অনন্তর যমুনার চব্বিশঘাটে স্নান করিয়া মথুরার যাবতীয় তীর্থ দর্শন করিলেন এবং বনভ্রমণে বহির্গত হইলেন। মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলবন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গাভীগণ তাঁহাকে দেখিয়া হাম্বারবে হুঙ্কার করিয়া উঠিল এবং বাৎসল্য ভরে তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। গৌর তাহাদিগের অঙ্গ কণ্ডুয়ন করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দলে দলে মৃগ ও মৃগীগণ ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। পিক ও ভৃঙ্গগণ পঞ্চমস্বরে গাহিয়া উঠিল। শিখিগণ নাচিতে নাচিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে ছুটিল। গৌর প্রতি বৃক্ষ, প্রতি লতাকে আলিঙ্গন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু বিগলিত, শরীর পুলকিত, মুখে উচ্চ হরিবোল। বৃক্ষ-লতাগণ তাহার মস্তকোপরি সুগন্ধি পুষ্প ও মধু বর্ষণ করিতে লাগিল। মৃগের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া গৌর রোদন করিলেন। মৃগের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল—অঙ্গ পুলকিত হইল, শুক-সারীগণ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া রাধাকৃষ্ণ বলিয়া গান করিতে লাগিল। গৌরের হৃদয়ে প্রেমপ্রবাহ উথলিত হইয়া উঠিল। নৃত্যপর ময়ূর দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। বলভদ্র কষ্টে মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন।

গৌর আরিটগ্রামে গমন করিয়া রাধা-কুণ্ডের অবস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু উত্তর দিবে কে? কালবশে যাবতীয় তীর্থ তখন লুপ্ত। রাধাকুণ্ডের সংবাদ কেহই রাখিত না। সর্ব্বজ্ঞ গৌর ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে কুণ্ডের আবিষ্কার করিয়া তাহাতে স্নান করিলেন। রাধাকুণ্ড প্রচারিত হইল। অনন্তর সুমনসরোবরে গমন করিয়া গৌর অদূরস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে প্রণাম করিলেন এবং গোবর্দ্ধন গ্রামে গমন করত তথায় হরিদেব-বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে শ্রীগোপাল-বিগ্রহ স্থাপিত। গৌর পবিত্র গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কিরূপে গোপালের দর্শনলাভ করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিস্থ অন্নকুট গ্রামের অধিবাসিগণ সংবাদ পাইলেন, তুর্কগণ গ্রাম আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সংবাদে গ্রামবাসিগণ গোপাল-বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া গাঠুলিয়া গ্রামে পলাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে গাঠুলিয়া গমন করত গৌর তথায় বিগ্রহ দর্শন করিলেন। অনন্তর কাম্যবন দর্শন করিয়া নান্দীশ্বর গমন করিলেন। তথায় পাবন প্রভৃতি যাবতীয় কুণ্ডে স্নান করিয়া সমীপস্থ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক এক গুহামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

খদির বন হইতে শেষশায়ী ও তথা হইতে খেলাতীর্থ ও ভাণ্ডীর বনে গমন করিয়া গৌর অবশেষে যমুনা পারে ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন ও মহাবন দর্শন করিলেন। গোকুল নগরে ভগ্নমূল যমলার্জুন দেখিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। গোকুল হইতে গৌর মথুরায় সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তথায় এত লোকের সমাগম হইতে লাগিল যে তাহাদের হস্ত হইতে মধ্যাহ্নতি লাভের জন্য গৌর অক্রূর তীর্থে যাইয়া বসতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানেও লোক-সমাগম অত্যধিক হওয়ায় গৌর প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে গুপ্তভাবে বৃন্দাবনের বনমধ্যে গমন করিয়া তথায় সাধন ভজন করিতে লাগিলেন এবং তৃতীয় প্রহরে প্রত্যাগত হইয়া সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক কাহিনী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে জনরব উঠিল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রকট হইয়াছেন। এই সময়ে একদিন গৌর দেখিতে পাইলেন, বহু লোক কোলাহল করিতে করিতে বৃন্দাবন যাইতেছে। তাহারা গৌরকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল "আমরা শুনিলাম কালীদহের জলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়া রাত্রিকালে কালীয়-শিরে নৃত্য করিতেছেন এবং কালীয়ের শিরোমণি দীপ্তি পাইতেছে। আমরা দেখিতে যাইতেছি এ কথা সত্য কি না।" তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই কালীদহে প্রকট হইয়াছেন।" বলভদ্র এই কথা শুনিয়া দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। গৌর তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন "তুমি পণ্ডিত হইয়া মূর্খের মত কথা কহিতেছ। কলিকালে কেন কৃষ্ণ আবির্ভূত হইবেন?" পরদিন প্রাতঃকালে একজন পরিচিত ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে গৌর পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কালীয়দহে কৃষ্ণ দেখিলে কেমন বল দেখি?" ভদ্রলোকটি কহিলেন "এক ধীবর কালীদহে নৌকার উপর মশাল জ্বালিয়া মাছ ধরিতেছিল। মূর্খ লোক না বুঝিয়া সেই নৌকাকে সর্প, মশালকে মণি ও ধীবরকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়াছে।" গৌর তখন বলভদ্রকে কহিলেন "কৃষ্ণ কেমন প্রকট হইয়াছেন এখন শুনলে ত।" তখন ভদ্রলোকটী কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে প্রকট হয়েছেন—সে কথা মিথ্যা নহে। আপনি জঙ্গম নারায়ণ। আপনাকে দেখিয়া লোকে উদ্ধার হইতেছে।" তখন গৌর বিষ্ণু নাম স্মরণ করিয়া কহিলেন "এমন কথা কি মুখে আনিতে আছে? জীবে কখনও কৃষ্ণ জ্ঞান করিও না। আমি সন্ন্যাসী সামান্য চিৎকণ মাত্র, জীব কিরণকণার মত। আর শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যোপম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। জীব ও ঈশ্বর কি কখনও এক হইতে পারে? জ্বলন্ত অগ্নি ও তজ্জাত স্ফুলিঙ্গে যে প্রভেদ—ঈশ্বরে ও জীবে তদ্রূপ প্রভেদ। যে মূঢ় জীব ও ঈশ্বরকে তুল্য মনে করে ও নারায়ণকে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতার সম জ্ঞান করে সে পাষণ্ডী।"

মথুরাবাসিগণ মাধবপুরীর শিষ্য সেই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা গৌরকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। একদিনে একজনের অধিক নিমন্ত্রণ গ্রহণ চলে না। কিন্তু অসংখ

লোক নিমন্ত্রণ করিয়া বসে। বলভদ্র বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ইহার পরে গৌরের মানসিক অবস্থাও ক্রমশঃ বিকল হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন অক্রূর-ঘাটে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া গৌর অজ্ঞানভাবে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্য অনেক কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। এই সমস্ত কারণে বলভদ্র অনেক বলিয়া কহিয়া গৌরকে সম্মত করত একদিন তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস নামক এক রাজপুত ও সেই সানোড়িয় ব্রাহ্মণও সঙ্গে চলিলেন। পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া সকলে শ্রান্তি দূর করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ এক বংশীধ্বনি শুনিয়া গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দিয়া ফেণ নির্গত হইতে লাগিল। শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল। দৈবক্রমে সেই সময় দশজন অশ্বারোহী যবন সৈনিক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মনে করিল, সঙ্গের তিনজন লোক ধুতুরা প্রয়োগ করিয়া সন্ন্যাসীকে অজ্ঞান করতঃ তাহার ধন-সম্পদ হরণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। তাহারা সঙ্গীদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু অনতি-বিলম্বে গৌর হরি হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ তখন সঙ্গীদিগকে ত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে গৌরের চরণে প্রণত হইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন জ্ঞানী "পীর" ছিলেন। তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহুক্ষণ গৌরের সহিত আলোচনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। গৌর তাঁহাকে কৃষ্ণ নাম প্রদান করিয়া তাঁহার রামদাস নাম রাখিলেন। যবনসৈনিকগণের মধ্যে আর একজন ছিলেন। তাঁহার নাম বিজুলী খাঁ। তিনিও অন্যান্য সমস্ত সৈনিকই গৌরের নিকট কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিলেন। বিজুলী খাঁ পরম ভাগবত বলিয়া কালে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সৈনিকদিগকে বিদায় দিয়া গৌর সঙ্গিগণ-সহ যাত্রা করিলেন। কতিপয় দিবসান্তে তাঁহারা প্রয়াগে উপনীত হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

উৎপলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাটলীর পথে

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার প্রায় এক মাস পরে একদিন মধ্যাহ্নের পর প্রমীতসেন পাটলী গ্রামে যাইতেছিলেন। সঙ্গে ভৃত্য বাদল।

রুগ্নদেহ লইয়া বাদল একদিন প্রমীতের আশ্রয় লইয়াছিল, প্রভুর উদার অনুগ্রহে এখন আর তাহার সে দুরবস্থা নাই। তাহার শরীর সুস্থ সবল হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। বাদল প্রভুর অতি

বিশ্বস্ত, কায়মনোবাক্যে আজ্ঞাবহ ভৃত্য, পরিবারের একজন হইয়া উঠিয়াছে।

তথনও রৌদ্রতেজ বড় প্রথর। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া প্রমীত অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এই পথে গন্তব্য স্থানে যাইতে অল্প সময় লাগে পল্লী-বসতির পথ ধূলি-বালুতে ততটা আচ্ছন্ন নহে। অথচ গাছের ছায়াতে অনেকটা শীতল। পাটলীপুত্রে অনেক বসতি-বিভাগ ছিল। গো-পালক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, রজক, নিষাদ, শৌণ্ডিক, চণ্ডাল প্রভৃতির পৃথক পৃথক বসতি ছিল। ব্যবসা-ভেদে প্রায়শঃই বসতি-বিভেদ হইত। বারবনিতারাও ইচ্ছামত নগরের যে সে স্থানে বাস করিতে পারিত না, তাহাদের জন্য নগরের প্রান্তে পৃথক্ বসতি নির্দ্দিষ্ট ছিল। দ্যূতগৃহের স্থানও নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেখানে দ্যূতকারীরা মিলিত হইত এবং দিন রাত্রি পণ রাখিয়া খেলা চলিত। দ্যূত-সভাধ্যক্ষের নাম সভিক। দ্যূতকারিগণের মধ্যে তর্ক-কলহ, পণ-আদায় ইত্যাদি কার্য্য সভিকের দ্বারা মীমাংসা হইত। গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা বা গুরু অপরাধের বিচার রাজদ্বারে হইত। সেদিন প্রমীত এই দ্যূতগৃহের নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন। কদাচিৎ তিনি এ পথ দিয়া চলিতেন, আজ সুবিধা বিবেচনা করিয়া এই পথ ধরিয়াছিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রমীত একটা গোলযোগের শব্দ শুনিতে পাইলেন। সঙ্কীর্ণ পথ। পথের মধ্যভাগেই কয়েকটী লোক একজনকে টানাটানি করিতেছে। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রমীত দেখিতে পাইলেন, সভিকের লোকেরা শোমদত্তের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। অনেকে এই ব্যাপার দেখিতেছে; কেহ কেহ শোম-দত্তের পক্ষে তর্ক করিতেছে, অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে বলিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া প্রমীত-সেন থামিলেন। সে পথ পরিত্যাগ করিবেন কি পাশ দিয়া চলিয়া যাইবেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শোমদত্ত তাঁহাকে দেখিয়া মস্তক নত করিলেন। সঙ্কীর্ণ পথ, পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবার সুবিধা নাই; বিশেষতঃ শোমদত্ত তাঁহার পরিচিত; সেই শোমদত্তের এই বিপদ! কি বিপদ?

প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"এ কি তোমরা ইঁহাকে ধরিয়াছ কেন?"

প্রমীত নগর-বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোক, অনেকেই তাঁহাকে চিনিত। একজন নমস্কার করিয়া বলিল:—

"ইনি পণ হারিয়া অনেক দিন যাবৎ শোধ করিতেছেন না। আজ সভিক মহাশয়ের আদেশে ইঁহাকে ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইতেছি।"

"সভিক মহাশয় এখানে আছেন?"

"আছেন। তাঁহাকে ডাকিব?"

"ডাক।"

দুই তিন জন লোক সভিককে ডাকিতে গেল। প্রমীত শোমদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"কি হইয়াছে, মহাশয়?"

শোমদত্ত প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিলেন:—

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ঋণী। শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করিব, কিন্তু ইহারা তাহা

মানিতেছে না, আমাকে ধর্ম্মপালের নিকট লইয়া যাইবে !—আমাকে রক্ষা করুন।"

"অবশ্য করিব।—ইঁহার হাত ছাড়। সভিক আসিতেছেন, আমি মিটাইয়া দিতেছি।"

লোকেরা শোমদত্তের হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সভিকও সেথানে উপস্থিত হইলেন। প্রমীতসেনকে দেখিয়া সভিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, নমস্কার করিয়া বলিলেন :—

"আপনি এখানে !—কেন ?"

"শোমদত্ত মহাশয় সম্মানী লোক, আপনার লোকেরা তাঁহার এরূপ অসম্মান করিতেছে !"

সভিক বলিলেন—

"অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি কোন রূপেই পণের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন না, আজ কাল করিয়া অনেক বিলম্ব করিয়াছেন। বাধ্য হইয়া ইঁহাকে ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছিলাম।"

"কত ঋণ ?"

সভিক ঋণের পরিমাণ জানাইলেন।

প্রমীত বলিলেন ;—

"আমার সঙ্গে এখন কিছু নাই ;—আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন ?"

সভিক পুনরায় নমস্কার করিয়া বলিলেন :—

"প্রমীতসেন মহাশয়ের কথায় অবিশ্বাস করিতে পারে, নগরে এমন লোক নাই। আপনি আদেশ করুন।"

"শোমদত্ত মহাশয়ের যে ঋণ আছে, তাহা সমস্ত আমি পরিশোধ করিব। আমার এই ভৃত্য বাদলকে দিয়া আগামী কল্যই আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। আপনি ইঁহাকে ছাড়িয়া দিন।"

"এখনি।" শোমদত্তকে নমস্কার করিয়া—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে গমন করুন।"

সভিক তখন নতমস্তকে প্রমীতসেনকে নমস্কার করিয়া লোকজনসহ সেথান হইতে প্রস্থান করিলেন।

শোমদত্ত তথন অতিনমিত মস্তকে প্রমীত-সেনকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন :—

"আপনি উপস্থিত না হইলে আজ আমার রক্ষা ছিল না। এ উপকারের কথা চিরকাল আমার মনে থাকিবে।—আমি শীঘ্রই আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।"

"আপনার যথন সুবিধা হইবে, করিবেন ; অত ব্যস্ত হইবেন না। উপকারের কথা বলিতেছেন ?—এ আর কি উপকার ? পরস্পরের সাময়িক সাহায্য করা ত মানুষের কর্ত্তব্য কাজ। আমি অনেকটা দূরে যাইতেছি, এখন বিদায় হই।"

তখন উভয়ে পরস্পরের সম্বর্দ্ধনা করিয়া যে যাঁহার গম্য পথে চলিলেন। বাদল প্রমীতের পাছে পাছে চলিতেছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে একবার অগ্রসর হইয়া প্রায় প্রমীতের পাশাপাশি আসিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রমীত অত্যন্ত অন্যমনস্কে চলিয়াছিলেন, বাদলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। আবার কতক দূর চলিয়া বাদল পুনর্ব্বার ঐরূপ করিল। এবার প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কিরে বাদল, কিছু বল্বি ?"

"আজ্ঞা—"

"কি রে ?"

"আজ্ঞা, এই যাঁহাকে আপনি মুক্ত করিয়া দিলেন, তাঁহাকে আমি—আমি সেদিন—সকালে ঠাকুরাণীর বাড়িতে দেখিয়াছিলাম !"

প্রমীত চমকিত হইলেন, বলিলেন :—

"ইহাকে দেখিয়াছিস্! কবে ?"

"এই যে ফল ফুল মালার ভেট লইয়া আমরা যে দিন সে বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সেই দিন।"

"বটে ?—সে বাড়ীতে কোন্ ঘরে ?"

"কোন ঘরে নয়। আমরা যখন প্রবেশ করি, তখন ইনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। সেদিন ইঁহার বেশভূষা এরূপ ছিল না, সেদিন ইহার গায়ে মূল্যবান পরিচ্ছদ ছিল।"

প্রমীতের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া প্রমীত বলিলেন ;—

"ইনি বোধ হয় সে বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিলেন ; নগরের মধ্যে ইনি এক জন সম্ভ্রান্ত লোক।"

বাদল নীরবে পশ্চাতে সরিয়া প্রভুর অনুসরণ করিতে লাগিল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূচীবেধ-যন্ত্রণা

মঞ্জুলার গৃহে সোমদত্ত !

প্রমীত ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। সোমদত্তের চরিত্র, ব্যবহার, সংসর্গ ত দেখিলাম। দ্যূতগৃহে তাহার যাতায়াত, ঋণ-পরিশোধে অক্ষমতা, সুরাসেবিগণের সংসর্গ, আরও বা কি!—এমন লোক মঞ্জুলার গৃহে! মঞ্জুলার সঙ্গে এ সব লোকের বাক্যালাপ, আমোদ-রহস্য! মঞ্জুলা এমন লোককে গীত শুনায় ?—ক্ষতিই বা কি! মঞ্জুলা আমার কে ? কিন্তু—

প্রমীত পাটলী গ্রামে অসঙ্গ সেনের ভগ্নীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অসঙ্গ সেখানেই ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়ের পীড়া সম্পূর্ণ আরাম হয় নাই, সে অনেক দিন ভুগিতেছে। প্রমীতকে দেখিয়া অসঙ্গ বলিলেন :—

"এস, এস, আজ ক'দিন তোমাকে দেখি নাই !"

"অরুণ আজ কেমন আছে ?"

"অনেকটা ভাল, তবে এখনো বড় দুর্ব্বল।"

তখন উভয়ে শয্যায় বসিলেন। অসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"রাজসভার সংবাদ কি ? যুদ্ধযাত্রা কবে ?"

"আর বিলম্ব নাই ; বর্ষা অতীতপ্রায়। সীমান্তদেশে বহু সেনা প্রেরিত হইয়াছে, আয়োজন-উদ্যোগ প্রায় শেষ হইয়াছে।"

"কলিঙ্গ জয় সহজে হইবে না। শুনিয়াছি, কলিঙ্গরাজের সৈন্যসামন্তের অভাব নাই।"

"রাজাধিরাজ স্বয়ং যাইতেছেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা, সে দেশ জয় করিয়া ফিরিবেন।"

"তা যাক্।—মঞ্জুলা আর তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিল ?"

"আজ তিন চারি দিন হইল আসিয়াছিল। উৎপলা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।"

"তোমার আগ্রহে ?"

"আমার আগ্রহে কেন ?—উৎপলা এবং মঞ্জুলার যে ভারি ভাব !"

"তিনি মঞ্জুলার গীত শুনিয়াছেন ?"

"গীত শুনিয়া উৎপলা মুগ্ধ হইয়াছেন। মঞ্জুলা যদি শিখায়, তবে তিনি গীত-বাদ্য শিখিতে প্রস্তুত !"

অসঙ্গ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন :—

"যে মঞ্জুলার সঙ্গে তোমাদের কোনদিন পরিচয় ছিল না, যাহাকে দেখিবার জন্য কোন দিন আগ্রহ ছিল না, তাহার সঙ্গে তোমাদের এত ঘনিষ্ঠতা, এত যাতায়াত !—ব্যাপারটা কি ?"

"তুমি সকলই জান মঞ্জুলা আমার কত উপকার করিয়াছে।"

"তুমিও ত তার উপকার করিয়াছিলে।" (হাসিয়া বলিলেন)।

"মঞ্জুলা অতি রূপবতীও বটে ?"

"তুমিও ত তাহাকে দেখিয়াছ।"

"দেখিয়াছি।—আর এক কথা, শুনিয়াছ, শোমদত্ত না কি মঞ্জুলার পাণিগ্রহণার্থী ?"

প্রণীতের দৃঢ়চিত্ত হঠাৎ বিচলিত হইবার নহে ; তথাপি এ সংবাদে তাঁহার হৃদয়ে হঠাৎ সূচীবেধ-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল ; মুখ শুষ্ক, চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অসঙ্গ বলিলেন :—

"চাহিয়া রহিলে যে !"

"এ কথা কোথায় শুনিলে ?"

"এইরূপ একটা জনরব উঠিয়াছে।"

"জনরব ! মিথ্যাও হইতে পারে ?"

"অসম্ভব নহে। কিন্তু শোমদত্ত অনেক দিন হইতেই মঞ্জুলার গৃহে যাতায়াত করে।"

"শুনিয়াছি, অনেকেই ত সেখানে যাইয়া থাকে।"

"যায়ই ত ; কিন্তু আজকাল কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মঞ্জুলার সঙ্গে কাহারও বড় দেখা হয় না। তাহার শরীর না কি বড় সুস্থ নয় !"

"মঞ্জুলা অসুস্থ ! সেদিনও ত মঞ্জুলা কুমুদনিবাসে আসিয়াছিল, কোন পীড়া, অসুখের কোন লক্ষণ ত দেখি নাই।"

"তবে তাহার মনেরই বা একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে !"

"কিসে তাহা বুঝিলে ?"

"কোন পরিচিত সম্ভ্রান্ত ঘরে আমন্ত্রিত হইলে মঞ্জুলা যাইত, গীত গাহিত, বাক্যালাপে লোকের চিত্ত মুগ্ধ করিত। এখন আর মঞ্জুলা কোথায়ও যায় না। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের ভগ্নী উষাদেবী না কি তাহাকে সেদিন সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, উষাদেবীর অনেক আত্মীয়া বয়স্যার সেদিন মঞ্জুলার গীত শুনিবার জন্য একত্রিত হইবার কথা ছিল। নানা আপত্তি করিয়া, শরীর অসুস্থ বলিয়া মঞ্জুলা সেখানে যায় নাই। অথচ ইতিপূর্ব্বে উষা-দেবীর আহ্বানে মঞ্জুলা সে বাড়ীতে যাইত ! শুনিয়াছি, আরও কোন কোন পরিচিত গৃহে মঞ্জুলা আজকাল যায় নাই।"

প্রণীত কিছুকাল নীরব রহিলেন। কেন যায় না ? কুমুদনিবাসে ত আসিয়াছিল ! প্রণীত বলিলেন—

"সন্দেহের বিষয়ই বটে।—ভাল, শোম-দত্তের অবস্থা ও চরিত্রের কথা কিছু জান ?"

"অবস্থা ত ভালই ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। রাজপ্রাসাদ তুল্য ঘর-বাড়ী, পুকুর-উদ্যান আছে ; দাসদাসীর অভাব নাই, ব্যয়বিধান যথেষ্ট, কিন্তু ঋণ না কি অতি বেশী !"

"সুরা ?"

"অনেক দিন হইতেই চলে।"

"দ্যূতগৃহে"—

"বেশী যাতায়াত। সেখানেও না কি অনেক ঋণ।"

"ঋণ-পরিশোধের উপায় ?"

"উপায়ই বোধ হয় শোমদত্ত খুঁজিতেছে। মঞ্জুলা ধনশালিনী, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে শোমদত্তের ঋণ পরিশোধ হয়, পূর্ব্ববৎ অমিত ব্যয়ের সুবিধা হয়!"

প্রমীত শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন, অন্যমনস্কে কক্ষমধ্যে ক্ষণকাল পরিক্রমণ করিয়া বলিলেন :—

"মঞ্জুলার মাতা স্বীকার হইবেন ?"

"জানি না। তবে শোমদত্ত নগরের মধ্যে এক বিখ্যাত ঘরের লোক। ঘর বাড়ী, পুকুর-উদ্যান, দাসদাসী, মানসম্ভ্রম তাহার সকলই আছে। অলোকা ঠাকুরাণী কি এ সমস্ত উপেক্ষা করিবেন ?"

"মঞ্জুলার অভিমত হইবে ?"

"স্ত্রীলোকের রুচি আর মন!—চিরকাল দুর্জ্ঞেয়।"

"রাজ্ঞী কারুবকী"—

"রাজ্ঞী ত রাজ্ঞী। নগরস্থ গৃহস্থ-ঘরের কথা তাঁহার অত জানা কি সম্ভব ?"

"আর কি কেহ নাই ?"

অসঙ্গ বড়ই বিস্মিত হইলেন, এত প্রশ্ন কেন ? প্রমীতের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া অসঙ্গ বলিলেন :—

"মঞ্জুলার আর কে থাকিবে ?"

"তা—তা বটে। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় নাই ?"

"রক্ষা করা! কেন, তাহার কি বিপদ ? আর, আমাদের সে ভাবনা কেন ?— ত তোমার আমার কেহ নহে।"

"কেহ নয়, ঠিক। যখন তাহার সঙ্গে দেখাশুনা ছিল না, তোমার মুখে তাহার অত প্রশংসা শুনিয়াও তাহাকে দেখার সাধ কোন দিন হয় নাই। এখন তাহাকে দেখিয়াছি, পরস্পর পরস্পরের নিকট এত উপকৃত, তাহার ভালমন্দের দিকে চাহিতে নাই ?"

"মঞ্জুলা কচি বালিকা নয়, যুবতী ; কুরূপা কুৎসিতা নয়, রূপলাবণ্যবতী ; অবোধ মূর্খ নয়, চতুরা ও শিক্ষিতা ; দরিদ্রা নয়, ধন-শালিনী ; অসহায়া নয়, রাজ্ঞী তাহার অভিভাবিকা ; অনভিজ্ঞা গ্রাম্যবালিকা নয়, নগরে প্রসিদ্ধা রমণী। নিজের ভালমন্দ সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। যেখানে তাহার অমত, সেখানে কে তাহার বিবাহ দিবে ? অযোগ্য পাত্রে সে কেন আত্মসমর্পণ করিবে ?"

"এইমাত্র তুমি বলিলে, নারীর ।রিত্র বুঝা কঠিন!"

"মঞ্জুলা পরাধীনা নয়, স্বাধীনা। সে যদি অপাত্রেই চিত্ত সমর্পণ করে, তুমি আমি বাধা দিবার কে ?"

প্রমীত সে কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, তথাপি বলিলেন ;—

"ভাল, মঞ্জুলাকে একটুকু সাবধান করিয়া দিলে হয় না ?—শোমদত্তের স্বভাবচরিত্রের একটুকু পরিচয় তাহাকে দিলে হয় না ?"

"তুমি কেন এত অধীর হইতেছ ? মঞ্জুলা বুদ্ধিমতী, সে সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়াই মন স্থির করিবে। শোমদত্ত যে ইচ্ছা করিতেছে, মঞ্জুলা কি তাহা জানে ?—আগে থাকিতেই অত বড় একটা

কথা বলা নিঃসম্পর্কীয় আমাদিগের পক্ষে ভাল দেখায় কি ?—তবে, তোমার—তোমার নিজের যদি কোন অভিপ্রায় ——”

“তুমি পাগল !”

অসঙ্গ অন্ধকারে ঢিল মারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমীতের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অসঙ্গের মনে সন্দেহটা প্রবল হইল। তিনি ভাবিলেন—তাই কি ? প্রকাশ্যে বলিলেন—

“শোমদত্ত যে প্রকৃতই মঞ্জুলাকে চায়, তাহা ত আমরা ঠিক জানি না। একটা ক্ষুদ্র জনরব মাত্র, সম্পূর্ণ মিথ্যাও হইতে পারে।”

“তা ঠিক। তথাপি মঞ্জুলাকে বলিতে না চাও, তাহার মাতার সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়া দেখ না।”

অসঙ্গ হাসিয়া বলিলেন ;—“তুমি বলিতেছ, ভাল, একদিন যাইব।”

“অরুণ ত এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে, তুমি নগরে ফিরিবে কবে ?”

“আর গৌণ করিব না, কালই ফিরিব।”

“যাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিও।”

অসঙ্গ হাসিলেন। আরও কিছু কথা-বার্ত্তার পর প্রমীত বিদায় হইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অসঙ্গ সেই ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অত উদ্বিগ্ন কেন ? প্রমীতের চিত্ত বিচলিত হইয়াছে ? অতি প্রলোভনের বস্তু, সন্দেহ নাই। আমি ত আগেই সাবধান করিয়াছিলাম !—প্রমীত প্রলুব্ধ হইয়াছে ! তাহার ত কোন অভাব নাই। মানসম্ভ্রম ধনসম্পদ ? তাহার ত সে সকলের অবধি নাই। আর, সংসারে যাহা অতি দুর্লভ—অতুল্য, অমূল্য—রূপসী গুণবতী সাধ্বী স্ত্রী, পুণ্যফলে তাহাও ত তাহার গৃহে আছে ; দেবী উৎপলা যে রমণীরত্ন !—আমারই ভ্রম ! আমি যাহা চিত্তের বিকার বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা, হয় ত, পরম হিতকারিণী মঞ্জুলার মঙ্গলকামনায় প্রমীতের অকপট নিঃস্বার্থ চেষ্টামাত্র ! অসঙ্গের মন অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

এদিকে পথে চলিতে চলিতে প্রমীতের চিত্তে চিন্তাতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। উদ্যানে ফুল ফুটিয়া সৌরভে সৌন্দর্য্যে দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করে। ফুলটী বৃন্তচ্যুত করিবার লোভ হয় ত কাহারও মনে উদয় হয় নাই ; শুধু দূর হইতে দেখিয়া সৌরভ উপভোগ করিয়াই সুখ। কিন্তু যেইমাত্র অন্য কোন ক্ষিপ্রকারী দর্শক সেটীকে আত্মসাৎ করিবার জন্য হাত বাড়ায়, বৃন্ত হইতে ছিঁড়িয়া লইবার উদ্যোগ করে, অমনি তুমি চমকিয়া উঠিবে—অহো ! ও লোকটা হাত বাড়াইল ! ও-ই লইয়া যাইবে ? উহার অপেক্ষা ত আমি ফুলটী লইবার অধিক উপযুক্ত ! ও ত কালো কুৎসিত। সৌরভ-সৌন্দর্য্যের আদর জানে না ! আমি লইব না কেন ? আমি ত উহার অপেক্ষা গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ ! প্রমীত ভাবিলেন, মঞ্জুলাকে বিবাহ করিবে শোমদত্ত ?—মনে করিতে প্রমীতের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। দ্যূতকারী, সুরাপায়ী, স্বার্থপর, ঋণভারগ্রস্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য শোমদত্ত, আর শিক্ষিতা চতুরা কলকণ্ঠা ধনৈশ্বর্য্যশালিনী রূপলাবণ্যবতী যুবতী মঞ্জুলা !

জনরব অসত্য নহে ! শোমদত্তের অনেক ঋণ, ঋণের দায়ে সে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতেছিল। ধনলোভে শোমদত্ত মঞ্জুলার

পাণিগ্রহণার্থী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। র রূপগুণ কলকণ্ঠের মর্য্যাদা সে কি করিয়া জানিবে?—এমন বিপদ হইতে মঞ্জুলাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

আমার এত ভাবনা কেন? মঞ্জুলা ত আমার—আমার কেহ নয়! কিন্তু- তখন প্রমীতের উদ্‌ভ্রান্ত মনের কল্পিত নানা চিত্র—অসম্পূর্ণ, অমূলক, ক্ষীণ, উজ্জ্বল, বিশৃঙ্খল—নানা চিত্র তাহার মুগ্ধ হৃদয়পটে উদিত হইতে লাগিল। মঞ্জুলার সেই আয়ত চক্ষের মধুর চঞ্চল দৃষ্টিক্ষেপ! মঞ্জুলা আমার দিকে অমন করিয়া চায় কেন? চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে চমকিতের ন্যায় চক্ষু অবনত করে কেন? মধুর মন্থর তাহার চলনভঙ্গি! চলিতে চলিতে মঞ্জুলা থামিয়া যায় কেন? মঞ্জুলা কাহারও আমন্ত্রণে কোথাও আর যায় না, আমার গৃহে ত আসিয়া থাকে! মঞ্জুলার মধুর কণ্ঠ! আমি ত উপকারী সুহৃদ, আমার কাছে একটী গীত গাহিতে চাহে না—পারে না কেন? প্রথম সাক্ষাতে সেই ঝড়বৃষ্টির দিন অত কথা বলিয়াছিল, এখন তাহার মুখে বাক্য সরে না কেন? স্বাধীনা, স্বচ্ছন্দচিত্তার অন্তরে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে?—কবে হইতে? আর আমি, আমারও কি কোন পরিবর্ত্তন——?

চিন্তার আবেগময় উচ্ছ্বাস এবং মন্দ-মধুরত্বভেদে প্রমীতের পদক্ষেপও সময় সময় দ্রুত, সময় সময় বিলম্বিত হইতে লাগিল। ভৃত্য বাদল তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, প্রভুর ভাব দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, ভাবিল—আজ এ কিরূপ!

সন্ধ্যার পর প্রমীত গৃহে ফিরিলেন। বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে উৎপলার শয়নকক্ষে পালঙ্কে যাইয়া বসিলেন। গৃহ আলোকিত। উৎপলা যেন কি করিতে-ছিলেন, স্বামীকে দেখিয়া শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কখন বাড়ীতে আসিলে?"

"এই যে এই মাত্র।"

"অরুণ কেমন আছে?"

"অনেকটা ভাল।"

"তোমাকে ওরূপ দেখাইতেছে কেন?-শুষ্ক মুখ, কোন অসুখ করিয়াছে?"

"পথ হাঁটিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছি।"

"বল কি?"---স্বামীর ললাটে গণ্ডে হাত বুলাইয়া—"তুমি শোও, আমি তোমার পা টিপিয়া দি।"

"তুমি কেন?"

"আমি কেন!"—হাসিয়া—"তবে কে?"

প্রমীত উৎপলার স্কন্ধে হাত রাখিয়া আবেগের সহিত বলিলেন—

"আর কেহই না, উৎপল, তুমি! একমাত্র তুমি?"

উৎপলা মনে করিলেন, স্বামী একটা রহস্য করিলেন;—

"তবে তুমি শোও।"

ক্লান্তদেহে উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়ে প্রমীত শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। পথের ধূলিতে প্রমীতের পা জানু পর্য্যন্ত ধূসর হইয়াছিল, উৎপলা সাটীর অঞ্চলে তাহা ঝাড়িয়া মুছিয়া দিলেন। শয্যার পাশে বসিয়া স্বামীর পদযুগল অঙ্কে তুলিয়া লইয়া আপনার নবনীত কোমল হস্তে তাহা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। দাস আর দাসী!—নিজের শয়নকক্ষে স্বামীর পরি-

চর্য্যায় উৎপলা কোন দিন দাসদাসী ডাকিতেন না।

পথ হাঁটিয়া প্রণীত প্রকৃতই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। উৎপলার স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে তাঁহার শ্রান্তি দূর হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় উত্তপ্ত উদ্বেগময়, চক্ষু জলভরপরিনম্র হইয়া উঠিল। উৎপলা তাহা দেখিতে পাইলেন না। হাত বাড়াইয়া স্ত্রীর পবিত্র অঞ্চল স্পর্শ করিয়া মুদ্রিত চক্ষে মনে মনে প্রণীত কাতর প্রার্থনা করিলেন ;—

"ভগবান্, আমাকে রক্ষা কর!"

সে রাত্রিতে প্রণীতসেনের সুনিদ্রা হইল না। (ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

ধর্ম্মমঙ্গল

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য, একখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কাব্য। ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত শুনা যায়। দীনেশবাবুর মতে ইহাতে উত্তেজনার একান্ত অভাব। আবার কোনও কোনও সমালোচকের মতে "হোমর, ভার্জ্জিল, মিল্টন ও বাল্মীকি পাঠে যে ফল ঘনরাম পাঠেও সেই ফল।" এবম্বিধ মতের পার্থক্য থাকিলেও ১লা অগ্রহায়ণের (১২৮৬) "সাধারণী"র সহিত সমস্বরে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বাঙ্গালী যুবক! শুধু যুবক কেন, বাঙ্গালী বৃদ্ধ! তুমি ঘনরাম পড়িবে না কেন? ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে পড়িবার অনেক জিনিষ আছে—তাহা অস্বীকার করা যায় না—শুধু পড়িবার নয় ইহাতে শিখিবারও অনেক জিনিষ আছে।

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য মনসার ভাসানের মত একখানি চরিত-কাব্য; ইহাতে মনুষ্যচরিত্রের বহুবিধ বিকাশ লক্ষিত হয়, কিন্তু এই কাব্যেও অলঙ্কার বড় বিরল। অলঙ্কারের কিছু অভাব থাকিলেও ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যকে মনসার ভাসানের মত গ্রাম্য কাব্য বলা যায় না। মনসার ভাসানে কবির কাব্যের পারিপাট্যের দিকে একেবারে দৃষ্টিই ছিল না, ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে কিন্তু কবির সেদিকে বেশ দৃষ্টি আছে; ভাবালঙ্কারের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও ধর্ম্মমঙ্গলে শব্দালঙ্কারের অভাব নাই, এবং কবি এই বাহ্যালঙ্কার বেশ নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গলে অনুপ্রাস খেলিয়াছে ভাল; ইহার শব্দের ললিতগতি ললিতকুমারের লোভনীয়। নামের গুণে আমরাও আনুপ্রাসিক হইয়া পড়িলাম! শব্দযোজনার বেশ চাতুর্য্য আছে বলিয়া ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য গ্রাম্য কাব্যের একটু উপরে উঠিয়াছে।

(   )

চকোর চকোরী নাচে চাহিয়ে চপলা।
মনে হইল নিকটে আইল মেঘমালা॥
কুহু কুহু কোকিল ছাড়িছে যেন রা।
শিখী পুচ্ছ করি উচ্চ পেয়ে মেঘ রা॥

(২)

বিষ্ণু মায়া ছায়া নিদ্রা তুমি সর্ব্বভূতে।
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে দেবি নমোস্তুতে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা জাতি লজ্জা শান্তি তুষ্টি দয়া।
সর্ব্বগাই শক্তিরূপা তুমি মা অভয়া ॥
শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষান্তি তুমি ভ্রান্তি সর্ব্বভূতে
ভগবতি ভকতবৎসলা নমোস্তুতে ॥
নমঃ নারায়ণি! নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনি।
মহামায়া মহাদেবি মহিষমর্দ্দিনি ॥
নমঃ জয়া যশোদানন্দিনি জয়যুতে।
জগন্ময়ি জগতজননি নমোস্তুতে ॥

প্রেমে অঙ্গ গদগদ প্রমাদ প্রভুর পদ
পঙ্কজ পরম পরিসর।
সেবিয়া সোনার কায় ধ্যান করি ধর্ম্মরায়
ধরাতলে ধূলায় ধূসর ॥
প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম
বিশ্ববীজ অখিল আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান ॥

(৪)

ইছাই আনন্দ মনে, নানাবিধ আয়োজনে,
সঙ্গোপনে পূজে ভগবতী।
আবাহন তন্ত্রে মন্ত্রে, আরাধিতে হেমযন্ত্রে,
মন্ত্র-বশে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী ॥
তুমি ত্রিলোকের মাতা, শক্তি ভক্তি মুক্তি দাতা
বিশ্বগতি ব্রহ্মার জননী।
প্রলয় পালন সৃষ্টি প্রসবে তোমার দৃষ্টি
তুমি মতি গতি সবাকার ॥
তারিণী ত্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর
তো বিনা স্মরণ লবে কার ॥

ভকতবৎসলা মাতা চতুর্ব্বর্গ-ফলদাতা
মোর নহে ভকতের দশা।
শুনি দীন দয়াময়ী পতিতপাবনী অই
নাম মাত্র আমার ভরসা ॥

যে কাব্যে ভাষার এমন ধারা বাঁধুনি, পদ-যোজনার এমন কারদানি, সে কাব্যকে নিতান্ত গ্রাম্যকাব্য বলা চলে না। বরঞ্চ এ কাব্যখানিকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে কতটুকু সত্য, কতটুকুই বা কল্পনা স্থান পাইয়াছে, সে বিষয়ের বিচারভার ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করিবেন, আমাদের তাহাতে বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে ইহাতে যতটুকুই ঐতিহাসিক সত্য থাকুক, কবি যে লাউসেনের জীবন-চরিত লিখিবার উদ্দেশ্যেই এই কাব্যখানির প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা কাব্যখানি ঐতিহাসিকই হোক, অথবা কল্পনামূলকই হৌক, যখন আমরা ইহার কাব্যাংশ বিচার করিতে বসিয়াছি, তখন তাহাতে আমাদের বড় ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কাব্যকলার কতটুকু বিকাশ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জানিতে পারিলেই আমরা সফলকাম হইব।

কবির ভাষার উপর বেশ প্রতিপত্তি আছে, এ কথা বলাতে এমন বুঝায় না যে, কবি গ্রাম্যশব্দ একেবারে ব্যবহার করেন নাই; বরঞ্চ প্রাদেশিক শব্দ তিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং বোধ হয় তিনিই প্রথম যাবনিক শব্দ কাব্য মধ্যে মিশাইয়া দিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রাচীন কবিগণ সর্ব্বত্রই বিষয়োপযোগী ভাষা ব্যবহারের

পক্ষপাতী ; তাই তাঁহাদের ভাষা কোথাও বেশ সংস্কৃত, কোথাও বা অত্যন্ত সহজ, এমন কি কোথাও কোথাও তাহা রীতিমত গ্রাম্য। "নাপাল" নিবিড়, নিছুটী, নাবড় পাতি (পত্র) বাও জুঁথিয়া প্রভৃতি শব্দ প্রাদেশিক। আবার সূর্য্যার্থক পতঙ্গ, জলার্থক জীবন, অহি প্রভৃতি শব্দ খাঁটি সংস্কৃত ; তারপর চলিত কথা তো ছত্রে ছত্রেই আছে। কথিত শব্দের সুন্দর ব্যবহারে কবির কাব্যের শোভার কিছু হানি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বরঞ্চ কথিত শব্দের সাহায্যে কবি অনেক স্থলে এমন মুখরোচক অনুপ্রাসের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা ভারতচন্দ্রেরও বোধ হয় অনুকরণীয় হইয়াছিল।

ক্ষীরখণ্ড ছেনা ননি চিনি চাঁপাকলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা॥
মজা মত্তমান মিছরি মিশাইয়া দই।
কাছে বসি হরিষে খাওয়ায় কোনও সই॥

ফারসী কথার মিশ্রণ ; যথা—

(১) পৌরুষ বাড়ালে কেহ পান করি পোস্ত।
খেয়ে বলে ঘোযালে খানিক খাও দোস্ত॥
(২) গা আছাড়ী কান্দে রাজা ঠেকি মায়াফান্দে।
ফকীর হইনু বলি ফুকারিয়া কান্দে॥
(৩) গাথিয়া জুতার মালা দিলেক গলায়।
মতির মাফিক গতি লিখিল ফলায়॥
(৪) রাজকর খরচা খয়রাৎ হেন জানি।
পরাধীন পরাণ বিফল হেন গাণি॥
(৫) আনন্দে অবনীপতি জল্লাদ শিখর।
শিকার করিতে রাজা সাজিল লস্কর

এই প্রকার দোমিশালি ভাষা ক্রমে যে আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা ভারতচন্দ্র পাঠ করিলেই জানা যায়। শুধু ভাষা নহে, বিজেতৃ যবনগণকে লইয়া হাস্য-পরিহাস করার প্রথাও ঘনরাম চক্রবর্ত্তীই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বোধ হয় অনেকটা গায়ের জ্বালা মিটাইবার প্রয়াস হইতেই এই প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছিল। ঘনরামের সময়ে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের পদানত হইয়া পড়িয়াছিল, মির মিঞাদের প্রভাব বাড়িতেছিল, তাহা কথায় কথায় এই কাব্য মধ্যে উহাদের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়।

মীর মিয়া মোগল মহলে দিল দাগা।
বাঁদী বলে ফতমা বিবি ফুপায় খেলে বাঘা॥
আই উই খরাপে পাছে আসে অন্তঃপুরে।
দেখত ভায়া গাজি মিঞা বাঘটা কতদূরে॥
বলিতে বলিতে বাঘ দাগা দিল গিয়া।
ল্যাজটা নাবায়ে লম্ফে নাক্সাট দিয়া॥
ভয়ে মিয়াগণ কত ছটারে হুতাশে।
বোবা হোলো তোবা তোবা কেহ কহে ত্রাসে॥
হাম্মান আদম বা খোদার কদম।
হুতাসে একিদা হারা হইল বেদম॥

তবে প্রবল শত্রুকে পাকচক্রে একটু নাকালে ফেলিয়া হাসিবার ইচ্ছা কার না হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ঘনরাম চক্রবর্ত্তী মুসলমান-দের বলবীর্য্যের অপলাপ করেন নাই, তাহা-দের সম্বন্ধে যাহা যথার্থ সত্য তাহাও বলিয়া গিয়াছেন—

সমর কুশল বলি মোগল
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক রুটী সবে খায় বাঁটী
রণে পাসরে আপনা॥

এই কয়টী ছত্রে মুসলমানগণের প্রভুত্বের সূত্র প্রকটিত হইয়াছে, আমরা যাহা হারাইয়া-ছিলাম তাহা উহাদের ছিল তাই তাহাদের

অভ্যুদয়, আমাদের পতন। তবে সুখের মধ্যে এইটুকু যে, সে পতন যতই গভীর হউক সত্যের অপলাপ করিয়া বা নিজেদের বড়াই করিয়া শত্রুর কুৎসা করিয়া পসার বৃদ্ধি করার প্রবৃত্তিটা তখনও আসে নাই।

যাক্ সে কথা—আমরা কবির ভাষার কথা বলিতেছিলাম, তাহাই আর একটু বিস্তৃতভাবে বলিতে ইচ্ছা করি। কবি ঘনরামের সময়ে কাব্যাদি সাহিত্য লিখিত হইত বটে, কিন্তু তখন ছাপার ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণের অধিগম্য করিতে হইলে কবিতাগ্রন্থ গান করিয়া শুনান হইত। ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যও এইরূপে গীত হইত, এইজন্য কবি ইহাকে "সঙ্গীত" আখ্যা দিয়াছেন। "সঙ্গীত" জিনিষটা সকলেরই ভাল লাগে, সেজন্য ছোট, বড়, পণ্ডিত, অপণ্ডিত, স্ত্রী, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই উহা শুনিতে আসিত। "ধর্ম্মের গান" অনেক দিন হইতেই প্রচলিত ছিল এবং তাহার শ্রোতৃবর্গ বাছাই করিয়া লওয়া হইত না। এরূপ স্থলে কবি যদি সর্ব্বদা সপ্তমে চড়িয়া থাকেন এবং কাব্যটীকে খুব জাঁকালো করিবার অভিপ্রায়ে বাছিয়া বাছিয়া সংস্কৃত কথা ছাড়িতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার "সঙ্গীতের" উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যায়। এই কারণে প্রাচীন কবিগণ অধিকাংশ স্থলেই সহজ ও কথিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহা করিয়াছেন বলিয়াই আজও বঙ্গের আপামর সাধারণ রামায়ণ মহাভারতের অমৃতময়ী কথার সহিত পরিচিত থাকিয়া চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতি কাব্যের রসাস্বাদ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেছে। রামায়ণাদি গান এখন দেশ হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কিন্তু এখনও যে দুই অক্ষর যোজনা করিতে শিখিয়াছে, সে-ই রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া হৃদয় সরস করিতে পারিতেছে। কাব্যের উদ্দেশ্য মূলতঃ আনন্দ-দান, গৌণতঃ মনুষ্যহৃদয়কে ঊর্দ্ধে উত্থাপন। অতএব উহা যত অধিক লোকের অধিগম্য হয় ততই ভাল।

প্রাচীন কবিরা এইজন্য তাঁহাদের কাব্য মধ্যে কথিত ভাষার প্রসার করিয়া দুইটী উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন—প্রথম, জন-সাধারণকে কাব্যরসের আস্বাদপ্রদান এবং দ্বিতীয়, ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুর পথ পরিষ্কৃত করা। তাঁহারা ঐ কথাগুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাদেশিকভাষা-সংগ্রাহকগণের অশেষ সুবিধা হইতেছে। এই হিসাবেও প্রাচীন কাব্যগুলির চর্চ্চা হওয়া অত্যাবশ্যক। এখনকার একটা মত এই যে, ভাষাকে সজীব রাখিতে হইলে কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষার ভিতর ব্যবধান যত কম থাকে ততই মঙ্গল এবং এই মতাবলম্বী অনেক সুধী সহজ কথিত ভাষায় গদ্যও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এখন আবার প্রাচীন কবিগণের অবলম্বিত পথই প্রশস্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে এবং অনুসৃতও হইতেছে। তবে এ পথের একটা বিষম বিপদ—গ্রাম্যতা এবং অশ্লীলতা। আমরা অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা এই দুই শব্দ আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার করিলাম। প্রাচীন কাব্যের অনেক স্থলে এই দুই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, সহজ কথায় কাব্য গ্রথিত করিয়া

তাঁহারা জনসাধারণের যে উপকার করিয়াছিলেন তাহা এই দোষগুলি দ্বারা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। কবি ঘনরাম তাঁহার ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্য এই সহজ ভাষার উপকরণেই গঠিত করিয়াছেন এবং সেই ভাষা লইয়া বেশ কৌশলবিন্যাস করিয়াছেন। অবশ্য কেহই এরূপ আশা রাখেন না বা রাখিতে পারেন না যে, ঘনরামের ভাষা ভারতচন্দ্রের ভাষার মত সুসজ্জিত বা চমৎকার, কিন্তু তাঁহার ভাষার ভিতরও এমন একটা অনায়াসভঙ্গি, সহজ-সারল্য ও আন্তরিকতা আছে যাহাতে অনুপ্রাসবহুল হইলেও তাহা কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট নহে এবং সেই সেই স্থলে কবির সরসতা ও সহৃদয়তা যেন আরও অধিক মাত্রায় উছলিত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। কাব্যের যেখানে সেখানে এই কথার নিদর্শন পাওয়া যাইবে, অতএব আমরা উদাহরণ বাহুল্যে সময়ক্ষেপ করিতে চাহি না। ফলতঃ তাঁহার ভাষার মধ্যে যে রসিকতার প্রবাহ আছে তাহা পুনর্ব্বার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আবির্ভূত হইয়াছে। লিখিত ও কথিত ভাষার সুন্দর সম্মিলন— ইহাই ঘনরামের ভাষার বিশেষত্ব। বিশেষত্ব বলিলাম এইজন্য যে, যদিও সকল প্রাচীন কবিই এইরূপ ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি ঘনরামেই উহার কলানৈপুণ্যের প্রথম বিকাশ। আমরা একটীমাত্র চিত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিব—সে চিত্র রঞ্জার বাসরচিত্র ;—

হাসিয়া হরষে দাসী আসি লঘুগতি।
বাসরে যতনে জ্বালে রতনের বাতী॥
কিবা শোভা করে সেই শয়নের শালা
মাঝে যার কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা॥
চারুচিত্র চৌপলচামরে গেছে ছেয়ে।
অনিমিখ রহে চক্ষু যদি দেখে চেয়ে॥
যতনে ছাউনি চারু চামরের চাল।
বিচিত্র বসন কত রতনামিশাল॥
চারি ভিতে বিরাজে বিনোদ্ বনমালা।
পুরই পালঙ্কে তথি পড়িল প্রবলা॥
মেঝে জুড়ে ফেলে সপ দিয়া ফুলঝাঁটী।
ফেলিল পালঙ্গ তায় পাতাইল পাটী॥
গুজরাটী ছিট ভোট যেই তার খাসা।
দু'দিকে বালিশ রাখে আলিসবিনাশা॥
মণিত অসিত হেম রচিত শিয়র।
শোভিত তড়িতযুত যথা জলধর॥
দু'পাশে পরটপথ পাটের থোপনা।
পালঙ্গ চৌদিকে চিত্র দোখরি দোলনা॥
রচিত মল্লিকা তায় চাঁপা চন্দ্রমালি।
সৌরভগৌরবে কত গুঞ্জরিছে অলি॥
রচিল সুখদশয্যা যেন পয়ঃফেন।
শয়ন করিবে তায় রায় কর্ণসেন॥

ইহাতে ছন্দের যে চঞ্চলগতি ও নৃত্য আছে তাহা আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে দেখিতে পাই নাই ; ইহার মধ্যে যে অনুপ্রাসের সহজ লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আবার ঈশ্বর গুপ্তের ;—

বিবিজান চলে যান লবেজান্ করে।

ইত্যাদি কবিতায় দেখা দিয়াছে। নিতান্ত নিত্যব্যবহৃত চলিত কথার সাহায্যে ঘনরাম এইরূপ অনুপ্রাসের ছটা প্রকাশ করিয়াছেন—বোধ হয় বঙ্গসাহিত্যে প্রথম—

(১) "লুট করি মোট বান্ধে চিঁড়া লাড়ু মুড়ি।"
(২) ফকীর হইনু বলি ফুকারিয়া কান্দে।
(৩) কালসাঁজি হ'তে কাল, কাল হ'লো নিন্দ।

(৪) মীনমুখে মাছরাঙ্গা মানায় মহত।
প্রিয়া মুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত॥

(৫) ঘোর রবে ঘুরুণি উঠিছে ঘন ঘন।
প্রমাদ পাড়িল পুরে প্রলয় পবন॥

বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশকল্পে ঘনরামের ভাষা অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বঙ্গভাষাকে গ্রাম্যভাষা হইতে অনেকটা ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাকে রাজভাষায় উন্নীত করিতে পারেন নাই। সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন ভারতচন্দ্র। ভাষা সজ্জিত করিবার অনেক উপাদান ভারতচন্দ্র ঘনরামের কাছে পাইয়াছিলেন; তবে ভারতচন্দ্র আরও অনেক স্থল হইতে তাঁহার কাব্য সু-সজ্জিত করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বিশেষতঃ ছন্দ সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব-কবিদিগকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করায় তাঁহার কাব্যে ছন্দের যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, ঘনরামে সে বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি পয়ার, ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী এই তিনটী প্রচলিত ছন্দ লইয়াই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঘনরাম চক্রবর্ত্তীই প্রথমে ঐ প্রচলিত ছন্দগুলির মধ্যে একটা চঞ্চল হিল্লোল একটা তালের তরল নৃত্য প্রদান করিয়া ঐগুলিকে সচরাচর প্রচলিত পয়ারাদি অপেক্ষা একটু স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিয়াছেন। এক আধটা নূতন ছন্দ যে তিনি আবিষ্কৃত করেন নাই তাহা নহে, অথবা বোধ হয় এ কথা বলিলেই ঠিক হয় যে এক আধটা নূতন রকমের ছন্দ তিনি বৈষ্ণব-কবিদের কাছ হইতে লইয়াছিলেন, কিন্তু সে ছন্দের সদ্ব্যবহার তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অর্থাৎ ছন্দটাকে শ্রুতিমধুর করিতে পারেন নাই, তাহা না হইলেও ঐটা পরে যে একটা সুশ্রাব্য ছন্দে পরিণত হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিতে পাইব। ছন্দটী ত্রিপদীরই প্রকার বিশেষ; যথা—

রঞ্জার বিবাহ উল্লাসে
সবিতা সম ছটা সম্মুখে দ্বিজ ঘটা
রাজা বসিল অধিবাসে॥
আরোপি হেমঘটে প্রথমে পাণি পুটে
পূজা প্রণামে কৈল তুষ্টি।
হেরম্ব দিনপতি হরিহর হৈমবতী
প্রজাপত্যাদি গ্রহ ষষ্ঠী।
ইত্যাদি।

ইহার বীজ বৈষ্ণবকবিতায়

মুখমণ্ডল কিয়ে, শরদ সরোরুহ
ভালহি অইমিক চাঁদ।
মধুরিপু মরম ভরম যাহা ঐ ছন
তাহে কি গণিয়ে মতিমন্দ॥

ইত্যাদি ছন্দে।

এবং ইহার পরিণতি রবিবাবুর—

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধিহে।
পূজার তরে হিয়া, উঠে গো ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে।

এই ছন্দে।

এই ছন্দেরই অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া ঘনরাম আর একটী ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন; যথা—

রঙ্গিণী রণজই দুন্দুভি বাজই
ঘনঘোর বাজাইয়া দামা।
রাজপুত মজপুত যৈছন যমদূত
সমযুত যুঝে খানসামা

দাদালিয়া দলবল মহীমাঝে মাতল
মানব মহিমে দানা দম্ভে।
ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দানাগণ,
ধমকে ধরাধর কম্পে॥

এ ছন্দও সুসজ্জিত বেশে ভারতচন্দ্রে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু বিষয়ের দোষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার উপায় নাই। এই দুইটী ভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলে নূতন ও বৈচিত্র্যময় ছন্দ আরও পাই। ঘনরাম সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের প্রয়াস পান নাই।

মিত্রাক্ষর রচনায় ছন্দের পারিপাট্যের উপর কাব্যের অনেকটা সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণীশক্তি নির্ভর করে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। মিত্রাক্ষরের যেমন অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে, আবার তেমনি অনেক বিষয়ে অসুবিধাও আছে। আমাদের মনে হয় যে কতকগুলি রস—যেমন বীর রস প্রভৃতি—অমিত্রাক্ষরের সাহায্যে তেমন সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত হয় না। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে অনেকগুলি যুদ্ধের বর্ণনা আছে, কিন্তু কোনটীতেই যেন উত্তেজক শক্তি নাই—বর্ণনার দোষে ততটা নয় যতটা ছন্দের দোষে, মিত্রাক্ষরের স্বাভাবিক লঘুত্ব ও চপলতার দোষে। নচেৎ ঘনরামের সময়ও বাঙ্গালী "ভেতো" বাঙ্গালীতে পরিণত হয় নাই, তখনও কবির কল্পনায় কেবল বাঙ্গালী পুরুষের নহে, বাঙ্গালী রমণীরও অদ্ভুত বীরত্বের কথা উদিত হওয়া সম্ভবপর ছিল। কলিঙ্গা ও কানাড়ার যে বীরত্ব-কাহিনী কবি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কেবল কথার বীরত্ব নহে, কাজের বীরত্ব। মাইকেলের প্রমীলা নির্ভীক-হৃদয়া বটে, কিন্তু তাহার যথার্থ বীরত্ব ছিল কি না তাহা আমরা জানিতে পারি না, কারণ তাহার বীরত্ব ও অসমসাহসিকতা কেবল কথায় পর্য্যবসিত থাকিয়া গিয়াছে, কাজে প্রকাশিত হইবার অবসর পায় নাই। কলিঙ্গা ও কানাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং একজন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে ও অন্যজন যুদ্ধ জয় করিয়া আততায়ীর দর্প চূর্ণ করিয়াছে। অথচ কলিঙ্গা ও কানাড়াকে—বাঙ্গালী আমরা—একেবারে ভুলিয়া গিয়া প্রমীলার

"রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে।"

ইত্যাদি দর্পোক্তি* লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম—মাইকেলের সময় হইতেই আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রাচীন বিষয়ের প্রতি আস্থাহীন ও দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছি, এবং দ্বিতীয়—মাইকেলের ছন্দের প্রবল আকর্ষণ। মাইকেলের তেজোব্যঞ্জক কথায় কলিঙ্গা ও কানাড়ার তেজোব্যঞ্জক কার্য্যকেও যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আর একটা অদ্ভুত বীর-রমণীর চরিত্র ঘনরামের কাব্যে আছে, কিন্তু সে বিষয় এখন উত্থাপন না করিয়া তাঁহার চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ-প্রতিভার কথা বলিবার কালে বলা যাইবে। আমরা এতক্ষণ এই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মিত্রামিত্র-ছন্দ-ভেদে রস-প্রকটনে অনেক তারতম্য হয়। মিল গুছাইতে গিয়া তেজের কথা যেন তেমন জোরের সহিত বলা হইয়া উঠে না; ওজস্বিতার দিকে দৃষ্টি না গিয়া মিলের দিকে দৃষ্টি যাওয়াতে ভাষার ও ছন্দের সবলতা রক্ষা করা যায় না। বীররসের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে অমিত্রাক্ষরই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়।

কিন্তু ঘনরামের সময়ে অমিত্রাক্ষর ছিল না, তাই তাঁহার বীররসের চিত্রগুলি অনেক পরিমাণে নিষ্প্রভ ও আকর্ষণীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এতৎসত্ত্বেও বাঙ্গালী রমণীর শৌর্য্য ও বীরত্ব আঁকিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে ধরিবার প্রশংসা একমাত্র ঘনরামেরই প্রাপ্য।

আমরা এতক্ষণ ঘনরামের ভাষা ও ছন্দের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, এবার ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের বাহ্যোপকরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা বলিয়াছি যে ঘনরাম ভাবালঙ্কার বড় একটা ব্যবহার করেন নাই; তাঁহার উপমাদি অলঙ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। তবে কয়েক স্থলে অলঙ্কারের সুব্যবহারও দেখা যায়। যথা—

(১) চকোর চকোরী নাচে চাহিয়ে চপলা।
চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥

(২) নিশিনাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রামায়া।
উপনীত গোবিন্দ-তনয়-সুত-জায়া॥
রাতুল বরণরুচি অরুণ উদিত।
নিরখিয়া নিশাপতি হইল লজ্জিত।
উড়ুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গ॥

(৩) কবরী রচিয়া দিল চন্দনের রেখ।
মেঘমালা-তড়িত জড়িত পরতেক॥
কপালে সিন্দূর ফোঁটা প্রভাতের রবি।
চন্দন চন্দ্রিমা কোলে কজ্জলের ছবি॥

(৪) নূতন যৌবন শোভা শরীর সুঠাম।
কলেবর কান্তি কিবা কসধোত দাম॥

(৫) বাণিজ্যে ভারতভূমে এসেছি সবাই।
ফুরাল বাজার হাট নিজঘরে যাই॥

(৬) বায়স কেমনে হবে বিনতার সুত।
শৃগাল হইবে হরি এ বড় অদ্ভুত॥
খদ্যোত কেমনে হবে সবিতা সমান।

(৭) শাল্মলির সমূহে যেন সামান্য সাপিনী।
কুঞ্জর নিকরে যেন গুঞ্জরে সিংহিনী॥

কিন্তু প্রকাণ্ড ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের মধ্যে এইগুলি যেন একপ্রকার অদৃশ্যই হইয়া আছে। এই জন্য এ কথা বলিলে কোনও দোষ হয় না যে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে অলঙ্কার নাই বলিলেও চলে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান দোষ ইহার বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাব। এই দোষ আমরা কবিকঙ্কণেও দেখিয়াছি; ধর্ম্মমঙ্গলে ইহার অত্যন্ত প্রাচুর্ভাব। একই কথা ইহাতে বারবার দেখা যায়। বহুবার এক বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে, কবি একই ভাষার সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করেন। বরং ভাবের পুনরাবৃত্তি সহ্য যায়, কিন্তু তাহার সহিত যদি কথারও পুনরাবৃত্তি আসিয়া জোটে, তাহা হইলে অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া পড়ে। এইরূপ পুনরাবৃত্তি এই কাব্যে এক আধবার নহে, রাশি রাশি আছে, এই জন্য কাব্যের যথেষ্ট সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। যদি কেবল এই দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে দীনেশ বাবুর নিম্নোদ্ধৃত সমালোচনা ন্যায্য বটে:—"পাঠক এই কাব্যের আগাগোড়া ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে পড়িয়া যাইবেন, কোন স্থলে তাঁহার চক্ষুকোণে অশ্রুবিন্দু নির্গত হওয়ার সম্ভব নাই। বর্ষাকালে জানালা খুলিয়া অলসচক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ সুখ আছে; অবিরত জলের টুবটাব শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ুবেগে তরুরাজির শির-আন্দোলন লক্ষ্য করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিষ্ক্রিয় মনে পুরাতন ছবির স্মৃতি অনাহূত জাগিয়া উঠে;

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের একঘেঁয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির টুব্‌টাব শব্দের ন্যায়, তানপুরার মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে।" এবং—"উপসংহারে বক্তব্য ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল এত বিরাট ও এত একঘেঁয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহার ধৈর্য্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।"

কিন্তু এ সমালোচনা সমগ্র ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের যথাযথ সমালোচনা নহে, তবে ইহা যে আংশিক সত্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দীনেশ বাবু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার ভাল অংশগুলিই তিনি বাদ দিয়াছেন, এবং সেই সকল অংশগুলি বাদ দিয়া নিজের একটা মত খাড়া করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই আমরা আভাস দিয়াছি যে ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যে ভাল জিনিষ আছে, এবং এমন উৎকৃষ্ট বস্তু আছে যাহার জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব, এবং এখন এইটুকু বলিয়া রাখিব যে, কবি ঘনরামকে হোমর, ভার্জিল, বাল্মীকি বা মিল্টনের সহিত তুলনা করা অতিবাদ হইলেও; তাঁহার কাব্যে এমন বস্তু আছে যাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই আদরের ও শিক্ষার আধার হওয়া উচিত। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী খুব ক্ষমতাপন্ন কবি, এ কথা আমরা বলিতে চাহি না; মুকুন্দরামের কবিত্ব ইঁহার কবিত্ব অপেক্ষা অনেক পরিপুষ্ট, এমন কি কোনও কোনও বিষয়ে ভারতচন্দ্রের কবিত্বও ইঁহার কবিত্ব অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, সে কথা বলিতে বাধা নাই। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর অদ্ভুত নাট্যকৌশল ঘনরামে নাই, ভারতচন্দ্রের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরিচয়ও আমরা ঘনরামে দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি ছিল না, এ কথা আমরা বলি না, বরং যে দু'এক স্থলে তিনি প্রকৃতির সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছেন, সেই সকল স্থানে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সরলতার নিদর্শন দেখিতে পাই; ভাষাও উপভোগ্য, তবে গ্রাম্যতা-বর্জ্জিত নহে।

ইহাতে যেমন—

কুসুম কাঞ্চন কুন্দ করবী টগর।
জাতী যূঁথি ওড় জবা অতি শোভাকর॥
মনোহর মল্লিকা মালতী সুমাধবী।
বিকশিত চন্দ্রমালা চাঁপা হেমছবি॥
সুরঙ্গ তুলসী কত মনোহর ফুল।

আছে, তেমনি আবার

বন-বেত বৈঁচি বাবলা বাজি বেলা।
ঝোপ ঝাপ ঝাউঝাঁটি ঝিটি সরসলা॥

আছে। যেমন

চারিভিতে তরুলতা পশুপক্ষিগণ।
সমাকুল শতদলে খঞ্জনী খঞ্জন॥
চকোরী চকোর নাচে চাহিয়া চপলা।
চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥

এবং

প্রিয়া মুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত।

ইত্যাদি সুন্দর বর্ণনা আছে, তেমনি

টেটারি টোটক টিয়া চটকা চটকী।
ধানসাধি ধানফুলি ধাতক ধাতকী॥

ইত্যাদি গ্রাম্যবর্ণনাও আছে।

আবার কেবল প্রকৃতির বর্ণনাও আছে—

(১) দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত মন॥

প্রফুল্ল কুসুমাকীর্ণ গন্ধে আমোদিত।
মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরী গায় গীত॥
নূতন পল্লবে ফলে সুশোভিত বন।
পাক্ষিগণ সুরব সংগীতে হরে মন॥
মন্দ মন্দ বহে তায় বসন্তের বা।
(২) কোকিল উগারে মধু ভ্রমর গুঞ্জরে।
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য মহোৎসব করে॥
ডালে বসে ডাকে শুক প্রেমে পুলকিত।
ভ্রমর ভ্রমরীগণে গানে বিমোহিত॥
(৩) গত ঋতু বরষা, শরত উপনীত।
আদরে অমল ইন্দু আকাশে উদিত॥
বিকশিত কমল প্রকাশে পতি পূষা।
শরৎ কুসুমে কত কাননের ভূষা॥
(৪) প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে।
তরল তরঙ্গ তেজে দুকূল উথলে॥
কুল কুল কুরব কমল কাণে কাণ।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ॥
ঘোর রবে ঘুরুলী উঠিছে ঘন ঘন।
প্রমাদ পাড়িল পুরে প্রলয় পবন॥
দুড়্ দুড়্ দুড়ুম দুদিকে ভাঙ্গে কূল।
তটিনী তটের তরু সংহারে সমূল॥
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেণ।

তা অধিক প্রশংসার যোগ্য না হউক, এই চিত্রগুলি যে উপভোগের সামগ্রী নহে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যখানি যে সর্ব্বত্র সর্ব্বান্তঃকরণে উপভোগ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। ইহাতে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা কাব্যের অঙ্গ না হওয়াই উচিত ছিল; ইহার রুচি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় তাহাও বলা যায় না; ইহার ভাষা অনেক স্থলে ভদ্রোচিত নহে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি নিতান্ত একঘেয়ে, এবং ইহাতে অনুকরণ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত পরিস্ফুট। এত দোষ সত্ত্বেও কিন্তু আমরা দীনেশ বাবুর সহিত একমত হইয়া বলিতে পারি না যে, এই কাব্যে ঘুমের ঘোর ভিন্ন আর কিছুই নাই। বরঞ্চ বলিতে হয় যে, এই কাব্যখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা অনেক কথা শিখিতে পারি, অনেক কথা জানিতে পারি এবং ইহা হইতে ভাবিবার বিষয়ও অনেক পাইতে পারি। ঘনরামের শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল কাব্যখানি একটা বিরাট গ্রন্থ এবং আমরা দুর্গা বলিয়া ইহা আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছি। দীনেশ বাবুর কাছে ধৈর্য্যের জন্য প্রশংসার্হও বোধ করি, হইয়াছি। কথিত আছে শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত লিখিয়া নিজ মাতুল মন্মথ ভট্টের কাছে সমালোচনার্থ দিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে বাপু তোমার কাব্যখানি যদি আগে দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে কাব্য দোষাধ্যায় লিখিবার জন্য আমাকে চারিদিকে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইত না। ইচ্ছা করিলে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত সকল দোষ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে ভূরি ভূরি বাহির করিতে পারা যায় সন্দেহ নাই। আধুনিক সমালোচন-পদ্ধতি অবলম্বনেও ইহাতে রাশি রাশি দোষ বাহির হইতে পারে। তাহা হৌক,—তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য বাঙ্গালী মাত্রেরই আদ্যোপান্ত পাঠ করা উচিত, পাঠ করিলে সময়ের অপব্যয় হইবে না। কেন হইবে না তাহা অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

গ্রহদিগের কক্ষা

কি প্রকারে অনন্ত মহাকাশে সহস্র সূর্য্যের সমান অসংখ্য জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হইল এবং এক একটি জ্যোতিষ্ককে ঘেরিয়া যে-সকল গ্রহ-উপগ্রহ ধূমকেতু অবিরাম ছুটাছুটি করিতেছে তাহারাই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, এই মহাপ্রশ্ন প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সহিত মানবের মনে উদিত হইয়াছিল। অনৈতিহাসিক যুগ হইতে যে, কত কিম্বদন্তী কত অনুমান এই ব্যাপারের সহিত জড়িত হইয়া আছে, সত্যই তাহার ইয়ত্তা হয় না। জড়ের নব নব ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া এবং জড়কে নব নব মূর্ত্তিতে দেখিয়া যে বিজ্ঞান এখন উন্নতির পথে প্রতিদিনই অগ্রসর হইতেছে, তাহাও প্রাচীন মানবের মনের সেই প্রাচীন প্রশ্নটির উত্তর দিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে। এই চেষ্টা কতদিনে সার্থকতা লাভ করিবে জানি না। যুগে যুগেই সৃষ্টিতত্ত্বের নূতন নূতন কথা শুনা যাইতেছে; আমাদের পিতামহগণ, যে সিদ্ধান্তের পরিচয় পাইয়া সৃষ্টিতত্ত্বের একটা কিনারা হইল ভাবিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে আমরা তাহাকে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি এবং কোনো নূতন সিদ্ধান্ত দ্বারা সৃষ্টি-রহস্যের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এই প্রকারে অবিরাম পুরাতনের বর্জ্জন এবং নূতনের প্রতিষ্ঠা চলিতেছে বলিয়া আমাদের খেদ করিবার কিছুই নাই; প্রত্যেক সিদ্ধান্তই আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে নূতন নূতন সম্পদ প্রদান করিতেছে, এবং সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবিক ঘটনার সহিত মিলাইতে গিয়া আমরা নব নব প্রাকৃতিক তত্ত্বের সন্ধান পাইতেছি। প্রকৃতির কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমরা এই প্রকারে যাহা লাভ করিতেছি তাহা বাস্তবিক অতুলনীয়।

জর্ম্মান্ পণ্ডিত কাণ্ট্ সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসঙ্গে আভাস দিয়াছিলেন, এই যে বুধ বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ পরিবৃত হইয়া সূর্য্য মহাকাশে বিরাজ করিতেছে তাহা কোন জ্বলন্ত বাষ্পাকার নিহারিকা-রাশি হইতেই উৎপন্ন। ফরাসী গণিতবিদ্ লাপ্‌লস্ (Laplace) সাহেব কাণ্টের ঐ কথারই সমর্থন করিয়া তাঁহার নিহারিকাবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত জর্জ্জ ডারুইন্ প্রভৃতি মনীষিগণ নিহারিকাবাদের সত্যতায় সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। নিহারিকাবাদের মূল অবলম্বন করিয়া যে সকল জ্যোতিষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যান পাওয়া যায় না, এখন সেগুলিই তাঁহাদের নজরে পড়িতেছে এবং অব্যাখ্যাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়া কোন নূতন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে নূতন সিদ্ধান্তের আভাস দিতেছেন, তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাপক জর্জ্জ ডারুইন্ তাঁহার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া যে এক অব্যাখ্যাত জ্যোতিষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহারই আভাস দিব।

পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ছোট-বড় গ্রহগুলি যে পথে সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সহস্র সহস্র বৎসরের পর্য্যবেক্ষণে গ্রহগণকে সেই সকল পথ হইতে একটুও বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। এই ব্যাপারটি আমাদের খুব সুপরিচিত হইলেও বড়ই বিস্ময়কর। কেবল ইহাই নয়, —সূর্য্য হইতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের দূরত্ব পরিমাপ করিলে, দূরত্ব-গুলির মধ্যে যে এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা দেখা যায়, তাহা আরো বিস্ময়কর। ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬ এই সংখ্যাগুলির মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। ছয় তিনের দ্বিগুণ, বারো আবার ছয়ের দ্বিগুণ ইত্যাদি। কাজেই শূন্যকে ছাড়িয়া দিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক রাশিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রাশির দ্বিগুণ হইতে দেখা যায়। এখন যদি প্রত্যেকের সহিত চারি যোগ করা যায়, তবে সংখ্যাগুলি—৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২ এবং ১০০ হইয়া দাঁড়ায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্য হইতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের দূরত্বের অনুপাত প্রায় ৪, ৭, ১০ ইত্যাদিরই অনুরূপ।

গ্রহগণের দূরত্বের এই অদ্ভুত নিয়মটি জর্ম্মান্ জ্যোতিষী বোড (Bode) সাহেব হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন জ্যোতিষীই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সৌর-জগতের সীমান্তবর্ত্তী নেপ্‌চুন্ গ্রহটিকে ও তাহার উপগ্রহগণকে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে দেখা যায় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া গ্রহ-বিন্যাসের নিয়মটি যে, প্রকৃতির একটা খেয়াল এ কথা কখনই বলা যায় না। গ্রহগণের কক্ষার (অর্থাৎ পরিভ্রমণ-পথের) স্থিরতা এবং সূর্য্য হইতে তাহাদের দূরত্বের শৃঙ্খলা যে, সৃষ্টির সময়কার কোন বিশেষ অবস্থার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

জর্জ্জ ডারুইন্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নিহারিকাবাদে অবিশ্বাসী হইয়া বলেন, এই যে নানা গ্রহ-উপগ্রহাকীর্ণ সৌরজগৎ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে এক সূর্য্যই বর্ত্তমান ছিল। সূর্য্য হয় ত কোন নিহারিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, কিন্তু পৃথিবী, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ প্রথমে সেই নিহারিকার অঙ্গীভূত ছিল না। বৃহদাকার সূর্য্যই মহাশূন্য হইতে উল্কাপিণ্ডাকার বহু জ্যোতিষ্ক টানিয়া লইয়া নানা গ্রহাদির উৎপত্তি করিয়াছে। জর্জ্জ ডারুইন্ তাঁহার নব সিদ্ধান্তের এই মূল কথাটিকে ধরিয়াই গ্রহ-উপগ্রহাদির কক্ষার স্থিরতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ডারুইন্ যে গবেষণা করিয়াছেন তাহার আমূল উচ্চ অঙ্গের গণিতে পূর্ণ, আমরা গণিতের কথা যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া বিষয়টি মোটামুটি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

জ্যোতির্ব্বিদ্যার যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জ্যোতিষ্ক-লোকের অতীত জীবন আলোচনার ফলেই সুলভ হইয়াছে। দূর ভবিষ্যতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির ব্যবস্থা কি প্রকার দাঁড়াইবে তাহার আভাস বর্ত্তমান অবস্থায় পাওয়া যায় না; ইহারা অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইবার সময়ে যে সকল পদচিহ্ন রাখিয়া যায়, তাহাই জীবনের ধারা দেখাইয়া দেয়। এই কারণে

কোন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে গ্রহ-নক্ষত্রের জটিলতা-বর্জ্জিত প্রথম অবস্থার কথা স্মরণ করিতে হয় এবং সেই অবস্থাটাই ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে কি প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া বর্ত্তমানকালে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিতে হয়। জর্জ্জ ডারুইন্ এই প্রকারেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

মনে করা যাউক যেন সৌরজগতে সূর্য্য এবং আর একটি জ্যোতিষ্ক ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই জ্যোতিষ্কটিকে বৃহস্পতিই বলা যাউক; ইহা যেন কোন চক্রাকার পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তা'র পরে মনে করা যাউক, একটি উল্কাপিণ্ড বা ক্ষুদ্র গ্রহ সৌরজগতে প্রবেশ করিল এবং যে সমতলে বৃহস্পতি সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, নূতন জ্যোতিষ্কটি সেই তল অবলম্বন করিয়া কোনো নির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটিয়া চলিল। এই প্রকার অবস্থায় এই তৃতীয় জ্যোতিষ্কটির গতিবিধি কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সহজ বুদ্ধিতে হয় ত একটা উত্তর দিয়া ফেলি। কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া এত সহজ নয়। নিপুণ গণিতবিদ্গণকেও পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন তিনটি জ্যোতিষ্কের গতিবিধি নির্দ্ধারণে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। গণিতের চুলচেরা গণনার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া আমরা ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, সূর্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় দুইটা বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্র গ্রহটির গতি অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িবে। নিজের গন্তব্যপথে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য বা বৃহস্পতির নিকটবর্ত্তী হইলে তাহা অতি দ্রুত-বেগে উক্ত গ্রহদের নিকটে ছুটিয়া যাইবে এবং কোনো গতিকে যদি উহাদের কবল হইতে রক্ষা পায়, তবে সে অতি মন্থর গতিতে দূরে চলিয়া যাইবে। কিন্তু সূর্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় দুইটা প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ককে ফাঁকি দেওয়া অধিক দিন কখনই চলিবে না; সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে গিয়া এমন একটি সময় নিশ্চয়ই আসিবে, যখন তাহা ভীম গতিতে সূর্য্য বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কাজেই সূর্য্য ও বৃহস্পতির রাজ্যের নবাগত ক্ষুদ্র অতিথিটির আর অস্তিত্বই থাকিবে না।

এখন মনে করা যাউক, যেন সূর্য্য ও বৃহস্পতির রাজ্যে একটি গ্রহাকার অতিথির পরিবর্ত্তে শত শত ছোট উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করিয়া বিচিত্র পথে বিচিত্র গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ছোট হওয়া বড় বিপদ্; বড় ছোটকে নিজের অধীনে রাখে; তার পরে ছোটরা যে দল পাকাইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে, তাহারও উপায় থাকে না, কারণ ছোটদের শক্তি অল্প। কাজেই এই শত শত অতিথির দশা পূর্ব্ব উদাহরণের একক অতিথির অনুরূপই হইবে। রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবা-মাত্র কতকগুলিকে সূর্য্য এবং আর কতক-গুলিকে বৃহস্পতি গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অবশিষ্ট অতিথিরা হয়ত দুই চারবার সূর্য্য বা বৃহস্পতির অতি নিকটে আসিয়া পলাইতে পারিবে, কিন্তু একেবারে মুক্তিলাভ কাহারও অদৃষ্টে ঘটিবে না। ইহাদের অধিকাংশই সূর্য্য গ্রাস করিয়া ফেলিবে, এবং অবশিষ্টগুলি বৃহস্পতির ভাগে পড়িবে। কোন্ উল্কাপিণ্ড সৌররাজ্যে প্রবেশ করিয়া কতদিন পরে সূর্য্য বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে নির্ব্বাণ লাভ করিবে

তাহা বলা কঠিন। যে দিক্ ধরিয়া এবং যে গতিতে উল্কাপিণ্ডগুলি সৌরজগতে প্রবেশ করে, তাহাদের প্রত্যেকের নির্ব্বাণ লাভের কাল সেই দিক্ ও গতির উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যেটি খুব অনুকূল গতি ও দিক্ লইয়া বৃহস্পতি ও সূর্য্যের অধিকারে প্রবেশ করিবে, তাহার জীবনও দীর্ঘ হইবে। সহস্র সহস্র উল্কাপিণ্ড বা ক্ষুদ্র-গ্রহের মধ্যে অন্ততঃ দু'চারিটির এইপ্রকার অনুকূল পথে অনুকূল গতি লইয়া প্রবেশ করা একটুও আশ্চর্য্য নয়। কাজেই সূর্য্য বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আমাদের সুপরিচিত গ্রহদের ন্যায় ইহাদের নিরাপদে পরিভ্রমণ করাই স্বাভাবিক। জর্জ ডারুইন্ বলিতে চাহিতেছেন, সৌরজগতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি যে সকল গ্রহ নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারা সকলেই অনুকূল গতি ও দিক্ লইয়া সৌর অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিল, এই কারণেই তাহাদের কক্ষা স্থির রহিয়াছে; যাহারা প্রতিকূল অবস্থায় আসিয়াছিল, তাহারা সূর্য্য বা অপর কোন প্রতাপশালী গ্রহের টানে ঐ সকল জ্যোতিষ্কে পড়িয়া নিজেদের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছে, ইহারা এখন সূর্য্য বা অপর কোন বৃহৎ গ্রহের অঙ্গীভূত।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, মানুষ যেমন স্বাস্থ্য-হিসাবে অল্পায়ু বা দীর্ঘজীবী হয়, নক্ষত্র-জগতের গ্রহ-উপগ্রহগণও ঠিক সেই প্রকারে তাহাদের গৃহ-প্রবেশকালের গতিবিধির অবস্থা অনুসারে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, মানুষের জীবন এক দুই দশ বা শত বৎসর ব্যাপী, জ্যোতিষ্কের জীবন দুই চারি দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি বৎসর ব্যাপী। কোন গতিকে সূর্য্যের আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করিবার মত অবস্থা লইয়া যে গ্রহটি সৌর জগতে প্রবেশ করিয়াছে সেটি হয় ত দু'চার লক্ষ বৎসর বাঁচিবে, এবং যাহারা আরও অনুকূল অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের জীবন সম্ভবতঃ কোটি কোটি বৎসরেও অবসান হইবে না। কিন্তু মৃত্যুমুখ হইতে কাহারও নিস্তার নাই, চিরস্থির কক্ষায় ঘুরিতে পারে এ প্রকার হিসাব-পত্র করিয়া এবং তদনুসারে গতিসম্পন্ন হইয়া হয় ত কোন গ্রহ গৃহ প্রবেশ করে নাই।

মানুষের জীবনটা যেমন ক্ষুদ্র, তাহাদের অভিজ্ঞতাও তেমনি অল্প। অধিক কি, আমরা দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকারও খবর লিপিবদ্ধ রাখি নাই। সুতরাং যে জ্যোতিষ্ক দশ কোটি বৎসর ধরিয়া নিরাপদে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যের কবলিত হইবে, আমরা যদি তাহাকে স্থির-কক্ষা গ্রহ বলি, ইহাতে বোধ হয় ভুল হয় না। জর্জ ডারুইন্ ও তাঁহার শিষ্যগণ এই শ্রেণীর দীর্ঘজীবী গ্রহগণকেই স্থিরকক্ষা-সম্পন্ন বলিতে চাহিতেছেন।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সৌরজগৎ বা অপর কোন নক্ষত্র-জগতের অতিথি গ্রহগুলির মধ্যে কতকগুলি যেন মোটামুটি স্থিরকক্ষা হইল; কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের সুদীর্ঘ বা অনন্ত জীবনের মধ্যে আর কোন বিপদ্ নাই? জর্জ ডারুইন্ এই প্রশ্নের একটা বড় অশুভ উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, এই যে আমাদের পৃথিবী একটা নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্টকালে সূর্য্য

প্রদক্ষিণ করিতেছে, কোন কারণে যদি সে তাহার কক্ষা হইতে একটু বিচলিত হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! এই যে, একটু অকল্যাণ হইল, তাহা কালে কালে বৃদ্ধি পাইয়া এক সময়ে এমন হইয়া দাঁড়াইবে যে, তখন আর পৃথিবীর নিস্তার থাকিবে না; অল্পায়ুঃ ভ্রাতৃগণের ন্যায় তাহাকেও সূর্য্যের গ্রাসে পড়িতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগণের ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে কি না জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পণ্ডিতগণ এই প্রসঙ্গের যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে ধ্বংসের সম্ভাবনাই দেখা যায়। জর্জ ডারুইন্ যখন সূর্য্য এবং বৃহস্পতি বা অপর কোন জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গণনা করিয়াছিলেন, তখন নবাগত উল্কাপিণ্ডদের গুরুত্বহীন বলিয়াই ধরিয়াছিলেন এবং আরও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মহাকাশে পরিভ্রমণকালীন তাহারা বাহির হইতে কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য হিসাবের জটিলতা-বর্জ্জনের জন্যই তিনি এই প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারের কথা মনে করিলে বুঝা যায়, উল্কাপিণ্ডগুলি আকারে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহাদের ভার আছে এবং ভ্রমণপথেও তাহারা বাধা প্রাপ্ত হয়। কাজেই আমাদের গ্রহ-উপগ্রহগণ এখন যে কক্ষায় সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা হইতে কালক্রমে উহাদিগকে অত্যল্প বিচলিত হইতেই হইবে এবং বিচলিত হইলে নিশ্চয়ই ধ্বংসমুখে পড়িতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, গ্রহ-উপগ্রহের মৃত্যুবীজ তাহাদের সঙ্গেই আছে। কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে মানবজাতির বিচলিত হইবার কারণ নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহগণের মৃত্যুর আরও শত শত বীজ প্রোথিত হইয়াছে এবং সেগুলি অঙ্কুরিত হইতেও আরম্ভ করিয়াছে, স্বাভাবিক মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে এগুলির কুফলেই সৃষ্টিলোপের সম্ভাবনা আছে।

পূর্ব্বের কথাগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে কতকগুলির মোটামুটি হিসাবে স্থির-কক্ষা আছে, এবং কতকগুলির নাই। যাহাদের নাই, তাহারা জীবন-সংগ্রামে কিছুদিন যুঝিয়া বৈরিহস্তে আত্মসমর্পণ করে। যাহাদের আছে, তাহারা বাহিরের প্রবল শত্রুর সহিত আপোস করিয়া এবং বাহিরের সহিত নিজের চালচলন মিলাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এখানেও সেই বৃদ্ধ ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সূত্র তলায় তলায় কাজ করিতেছে!

কি প্রকারে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলাদি গ্রহযুক্ত এই বিশাল সৌরজগতের সৃষ্টি হইল এখন বোধ হয় বুঝা কঠিন হইবে না। প্রথমে সূর্য্য এবং বৃহস্পতিই সৌরজগতে রাজত্ব করিত; তারপর দলে দলে উল্কাপিণ্ড বা ক্ষুদ্র গ্রহাকার নূতন অতিথির আগমন হইল। এগুলি যথেচ্ছ প্রকারে যথেচ্ছ পথে ছুটিয়া চলিত। সূর্য্য এবং বৃহস্পতি সুবিধা বুঝিয়া অধিকাংশকে গ্রাস করিয়া পুষ্টাঙ্গ হইল; সৌরজগতে ছোটখাট উল্কাপিণ্ড বা ধূলিকণাও রহিল না; যাহারা সৌরাধিকারে প্রবেশকালে অনুকূল গতিবিধি লইয়া আসিয়াছিল, কেবল তাহারাই টিকিয়া থাকিল।

এই টিকিয়া-থাকা অতিথিগণই এখন এক এক নির্দ্দিষ্ট পথে, নির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদিগকে লইয়াই সৌরজগৎ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলে গিয়া পৌঁছিয়াছেন, প্রায়ই তাহাদের গোড়ার একটি নিয়মের সন্ধান পাইয়াছেন। জর্জ ডারুইন্ সৃষ্টিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যান দিতেছেন, তাহাতে তিনি এখনো কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সন্ধান পান নাই। ঠিক কোন্ অবস্থায় সৌরজগতে প্রবেশ করিলে নবাগত গ্রহগণ চির নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ করিতে পারে, তাহার সূত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নাই; তা'ছাড়া কোন্ গ্রহের কক্ষা স্থির এবং কোন্‌টির কক্ষা বিচলনশীল তাহা নির্ণয় করিবার নিয়ম আজও ধরা পড়ে নাই। কিন্তু এই সকল মূল সূত্রগুলি যে শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে;—বোড্ সাহেব গ্রহগণের দূরত্বের মধ্যে যে সুশৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করা যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

সমগ্র বিশ্ব যে গোড়ায় এক মহানিয়মের অধীন হইয়া মূর্ত্তিমান্ হইয়া পড়িয়াছে, আজকালকার নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর গঠনের সহিত বিরাট্ সৌরজগতের সংগঠনের তুলনা করিলেও ইহার লক্ষণ দেখা যায়। জর্জ ডারুইন্ যেমন একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্কের চারিদিকে শত শত ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব মানিয়া জগতের অভিব্যক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, অতি-সূক্ষ্ম পরমাণুর গর্ভে অপর বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক্ সেইপ্রকার অতি-পরমাণুকে (Corpuscles) নিয়ত ভ্রাম্যমান্ দেখিতে পাইয়াছেন। জ্যোতিষ্কদিগের ন্যায় অতি-পরমাণুদিগের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, সংযোগ-বিয়োগ এবং এক এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ নাই, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না, বরং তাহারই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সুতরাং যদি বলা যায়, কোনও এক শুভদিনে বিরাট্ জ্যোতিষ্ক-জগতের অভিব্যক্তির সূত্র আবিষ্কৃত হইলে, অতি-সূক্ষ্ম পরমাণুর মধ্যে যে সূক্ষ্মতম ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডগুলি রহিয়াছে, তাহারও মূল তত্ত্ব জানা যাইবে, তাহা হইলে বোধ হয় অধিক কিছুই বলা হয় না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

কেন?

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে!
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে!

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে!
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—অবতারবাদ

(কার্ত্তিকের বঙ্গদর্শনের ৫৬৩ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় ব্রাহ্মসমাজের আলোচনা কেন করি

কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের মতামত লইয়া এতটা নাড়াচাড়া করিতেছি কেন, কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিতে পারেন। কাহারও কাহারও নিকটে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রীতিকরও মনে হইতে পারে। অতএব কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া রাখা ভাল।

আমি যে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি, এমন অনুচিত স্পর্দ্ধা করি না। এই তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আমি যে কোনও গভীর গবেষণা করিয়াছি বা করিতেছি এমনও নহে। পণ্ডিতেরা যেভাবে এসকল নিগূঢ় তত্ত্বের বিচার-আলোচনা করেন, সে ভাবে আমি এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। সে পাণ্ডিত্যের দাবি আমার নাই। আমার নিজের জীবনের অন্তরঙ্গ-ইতিহাসের বিবর্ত্তন-ক্রমকে অবলম্বন করিয়াই,—শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই যে পরমতত্ত্ব, এই সত্য আমার চিত্তে স্ফূরিত হইতেছে। অপরে কোন্ পথ দিয়া এই সত্যলাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা আমি জানি না। আমার নিজের পথটাই কেবল আমি চিনি। এই পথটাই কেবল আমি দেখাইতে পারি। এ পথের কথা বলিবারই অধিকার আমার আছে। আর আমি ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া আসিয়াই ক্রমে এই পথে পৌঁছিয়াছি। অতএব আমার নিকটে যে ভাবে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মতামতের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। আমার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমার পক্ষে এই নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করা সম্ভব; ইহার আর অন্য উপায় নাই। এই কারণে কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া আমাকে বাধ্য হইয়াই ব্রাহ্মমতেরও আলোচনা করিতে হইতেছে। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে এই অন্তরঙ্গ প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

আধুনিক সাধনার তত্ত্বালোচনার প্রণালী

আর সম্ভব হইলেও ইহা কখনই সঙ্গত হইত না। আধুনিক যুগের উদার সাধনা তত্ত্বালোচনার দুইটী প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ যুগে এই পথ ধরিয়াই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। এই পথ দু'টীর একটীকে তুলনার পদ্ধতি এবং অপরটীকে ইতিহাসের পদ্ধতি বলা হয়। ইংরেজীতে প্রথমটীকে Comparative method এবং দ্বিতীয়টীকে Historic method বলে। বিভিন্ন বিষয়ের পরস্পরের

তুলনায় তাহাদের মধ্যে যে সকল ঐক্য এবং অনৈক্য প্রকাশিত হয়, তাহাকে ধরিয়া কোন সাধারণ নিয়ম, সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসকে তুলনার পদ্ধতি কিংবা Comparative method বলা যায়। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতেরা, ভারতবর্ষের হিন্দু-আর্য্যেরা, ইরাণের মুসলমানেরা, ইউরোপের খৃষ্টীয়ানেরা আদিতে যে একই মানব-শাখার অন্তর্গত ছিলেন, সম্ভবতঃ একই ভূভাগে বাস করিতেন, এবং নিশ্চয়ই এক আদিম ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক্ ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষার তুলনা করিয়া, তাহাদের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যে বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আধুনিক পণ্ডিত-সমাজ এই সকল সিদ্ধান্তের এবং অনুমানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাকেই তুলনার পদ্ধতি কিংবা Comparative method বলে।

কোনও বস্তু বা তত্ত্ব কোন্ মূল বীজ বা সূত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া, কোন্ পথ ধরিয়া, কি কি বিশেষ অবস্থা এবং ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়া, তাহার বর্ত্তমান আকার বা অর্থলাভ করিয়াছে, এই সমগ্র বিবর্ত্তন-ক্রমটীর অভিব্যক্তিই সেই বস্তুর বা তত্ত্বের প্রকৃত ইতিহাস। আর কোনও বস্তুর এই বিবর্ত্তন-ইতিহাসটীর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া তাহার প্রকৃতি এবং গতি নির্ণয় করাই ঐতিহাসিক পদ্ধতির কিংবা Historic method এর উদ্দেশ্য। আধুনিক সাধনা এই ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের এবং তত্ত্বের ক্রমবিকাশের বিবরণটী ধরিয়াই তাহার প্রকৃত ধর্ম্ম এবং সত্য মর্ম্ম নিদ্ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এই পথেই আমিও কৃষ্ণ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও আমার অন্তরঙ্গ-জীবন

শাস্ত্র-দর্শনাদি পড়িয়া আমি এ তত্ত্বের সন্ধান পাই নাই। শ্রীগুরুর কৃপায় আমার অন্তরঙ্গ-জীবনের বিবর্ত্তন ধারাকে অবলম্বন করিয়াই এই তত্ত্ব আমার চিত্তে আপনি স্ফূরিত হইতেছে। শাস্ত্র-বাক্য আমার অন্তরে এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই; বরঞ্চ বহু স্বতঃস্ফূরিত তত্ত্বই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ আমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। দর্শনের আলোচনা করিয়া আমি এ তত্ত্বের সন্ধান পাই নাই। বরঞ্চ গুরুদেবের অযোচিত-কৃপাগুণে যখন এই তত্ত্বের সামান্য সাক্ষাৎকার পাইলাম, তখনই ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্তের আশ্চর্য্য সমন্বয় প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমি যে কৃষ্ণ-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি তাহা আমার ভিতরের বস্তু বাহিরের নহে। ইহা অন্তরঙ্গ-অভিজ্ঞতার কথা, শাস্ত্রের বা দর্শনের কথা নহে। তবে তাহা শাস্ত্রবিরোধীও নহে, দর্শনেরও বহির্ভূত নহে। শাস্ত্র-বিরোধী হইলে, ইহাকে নিজের মনের খেয়াল মনে করিতে পারিতাম্। দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে ইহার সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য না থাকিলে, এতটা নিঃসন্দিগ্ধভাবে ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়ত কঠিন হইত। সে বিরোধ যখন নাই, এই সামঞ্জস্য

যখন আছে, তখন এই তত্ত্বকে কোন মতেই মানস-কল্পনা কিংবা সত্যাভাস বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না।

এই তত্ত্ব আমার অন্তরে একটা বিশেষ পথ অবলম্বন করিয়া ফুটিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গ জীবনে ইহার প্রকাশের একটা বিশেষ ক্রম দেখিতে পাই। এই বিবর্ত্তন-ক্রমটী লক্ষ্য করিয়া কোন্ মূল হইতে, কোন্ সূত্র ধরিয়া, কি কি অবস্থার ভিতর দিয়া, এই তত্ত্ব আমার চিত্তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস রচনা করিতে পারা যায়। এই ইতিহাস আমার মানসিক জীবনের ইতিহাসের একটা বিস্তৃত ও বিশেষ অধ্যায়। এই ইতিহাসের ধারাকে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের অন্তরঙ্গ-অভিজ্ঞতার এবং মানসিক ক্রমবিকাশের কাহিনীটীরও স্বল্পবিস্তর আলোচনা এবং বিবৃতি করিতে হয়। এরূপ না করিলে আমাকে কেবল পড়া-কথা বা শোনা-কথাই কহিতে হইবে। সে কথা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই, বলিলেও তার কোন বিশেষ মূল্য হইবে না। আর আমার নিজের অন্তরঙ্গ-জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াই এই কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতেছি বলিয়া, ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাকে ব্রাহ্ম-সমাজের মতামতের আলোচনাও করিতে হইবে। কারণ এই পথে ভ্রমিতে ভ্রমিতেই আমি পরমতত্ত্ব যে কৃষ্ণতত্ত্ব তাহার সন্ধান পাইয়াছি।

কালধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম

কিন্তু এই যে আমার অন্তরঙ্গ-জীবনের কথা বলিলাম, তাহাও ত কেবল আমার নিজের কথা নহে। এখন এই বাঙ্গালাদেশে আমার মতন লক্ষ লক্ষ লোক আছেন, যাঁহাদের অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে আমার জীবনেতিহাসের অদ্ভুত মিল রহিয়াছে। তাঁরা যা ভাবেন আমিও তাহাই ভাবি। আমি যে ভাবে চিন্তা করি তাঁরাও মোটের উপরে সেই ভাবেই চিন্তা করেন। আমার চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থা যাহা, তাঁহাদিগের চারিদিকের অবস্থা এবং ব্যবস্থাও তাহাই। আমি যে সকল সংস্কারের মধ্যে জন্মিয়াছি ও বাড়িয়া উঠিয়াছি, তাঁহারাও সেই সকল সংস্কারের মধ্যেই জন্মিয়াছেন ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন। আমি যে নূতন শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাঁহারাও সেই শিক্ষাই পাইয়াছেন। যে সকল আগন্তুক চিন্তা, আদর্শ এবং ভাব আমার চিত্তকে বিচলিত করিয়াছে তাঁহাদের চিত্তও সে সকলের দ্বারা স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়াছে। আমরা সকলে, এই যুগে জন্মিয়া, এই নূতন শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া, একই প্রকারের সন্দেহেতে স্বল্পবিস্তর আন্দোলিত এবং একইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া, তটস্থ হইয়া আছি। আমরা সকলেই এক সাধারণ কালধর্ম্মের অধীনে বাস করিতেছি। এই কালধর্ম্মকে আধুনিক ইংরেজীতে Time spirit বলে। এই কালশক্তি অতিশয় বলবতী। যিনি যতই বড়াই করুন না কেন, এই কাল-শক্তির প্রভাব প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আর এই কালধর্ম্ম-গুণেই আমাদের নিজ নিজ অন্তরঙ্গ-জীবনের সঙ্গে আমাদের সম-সাময়িক সমাজের জন-সাধারণের অন্তরঙ্গ-জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ ঐক্য

রহিয়াছে। এই জন্যই আমার কথা কেবল আমারই কথা নহে, কিন্তু আমার মতন এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের কথাও তাহাই। এই জন্যই তাঁহাদের নিকটে আমার অন্তরঙ্গ কথারও একটা দাম আছে, আমার নিকটে তাঁদের নিজের কথারও একটা বিশেষ মূল্য আছে।

এই কালধর্ম্ম প্রভাবেই আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ইঁহাদের কেহই এই কালধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই। পরন্তু এই কাল-ধর্ম্মই তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপীয় খৃষ্টীয়ান্-সমাজের সংসর্গে আসিয়া, ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া এবং ইংরেজের আইন-কানুনের অধীন হইয়া, দেশের লোকের মনে যে সকল নূতন চিন্তা, ভাব এবং আদর্শ জাগিয়া উঠে, তাহারই প্রেরণায় ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি হয়। এই সকল নূতন চিন্তা, ভাব এবং আদর্শের সম্মুখীন হইয়া প্রাচীন হিন্দু-সমাজে যে সকল অভিনব সমস্যার উদয় হয়, ব্রাহ্মসমাজ তাহারই একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই। বিদেশীয় আদর্শের প্রকাশে স্বদেশের সমাজে নীতি ও আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল সন্দেহ জাগাইয়াছিল, তাহার নিবৃত্তি করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হয়। সে সকল সন্দেহ এখনও নিঃশেষ নিরস্ত হয় নাই। যে সকল চিন্তা, ভাব এবং আদর্শকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, সে সকল চিন্তা, ভাব এবং আদর্শ এখনও স্বল্পাধিক পরিমাণে আমাদিগের শিক্ষিত-সমাজের চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায়, ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভূত না হইয়াও, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, দেশের অনেক লোক যে ব্রাহ্মভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজ তো একটা আকস্মিক উল্কাপাতের মতন শূন্যগর্ভ হইতে এদেশের উপর আসিয়া উড়িয়া পড়ে নাই। যে সকল অবস্থায় পড়িয়া, যে প্রয়োজনের প্রেরণায়, ব্রাহ্মসমাজের মত ও ভাব বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, সমগ্র দেশ সেই সকল অবস্থায় পড়িয়া সেই প্রয়োজনের তাড়না অনুভব করিয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজের একান্ত বিরোধী যাঁহারা তাঁহারাও ইহা হইতে অব্যাহতি পান নাই। যে সন্দেহের তাড়নায় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রাচীন ও প্রচলিত পন্থা পরিহার করিয়া নূতন পথের সন্ধানে চলিয়াছেন, দেশের ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং আধুনিক-ভাবাপন্ন প্রায় সকল লোককেই সেই সকল সন্দেহে স্বল্পাধিক বিচলিত করিয়াছে। কেহ বা এই সন্দেহকে চাপিয়া রাখিয়া যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মতন প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানাদির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কেহ বা নূতন এবং পুরাতনের মধ্যে একটা গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ বা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা দ্বারা গতানুগতিক সমাজধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কেহ বা প্রচলিত ধর্ম্মের ও সমাজের বাহিরের কাঠামটাকে ঠিক রাখিয়া তাহারই মধ্যে আধুনিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। ইঁহারা

সকলেই বর্ত্তমান কাল ধর্ম্মের অধীন হইয়া চলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হইয়াও, এমন কি প্রকাশ্যতঃ ব্রাহ্ম-সমাজের অত্যন্ত প্রতিবাদী হইয়াও, ইঁহারা সকলেই এই কালধর্ম্মবশে, স্বল্পবিস্তর ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছেন। এই কারণে ব্রাহ্মমত এবং ব্রাহ্মভাব কেবল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যেই আবদ্ধ রহে নাই, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্ম-সমাজ, খৃষ্টীয় সংস্কার ও হিন্দুর পুনরুত্থান

ইংরাজী শিখিয়া প্রথমে এদেশের লোক খৃষ্টীয় মতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের উপরে যে কঠোর আঘাত করিতে আরম্ভ করে, তাহার ফলে দেশের ইংরেজীনবিশেরা খৃষ্টীয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, এই আশঙ্কা এককালে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ সেই আশঙ্কা নিবারণ করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রভাবকে প্রতিহত করিতে যাইয়াই, ব্রাহ্মসমাজকে বহুল পরিমাণে একদিকে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের এবং অন্যদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, না করিলে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এ কাজটী কখনই হইতে পারিত না। ভাষ্যকার শঙ্করকে যে অর্থে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন; সেই অর্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়ান্ বলা যাইতে পারে। যে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ এদেশে খৃষ্টীয় মতের প্রভাব প্রতিহত করেন, সেই যুক্তিবাদের ও ধর্ম্মনীতির আঘাতেই তাঁহারা আবার প্রাচীন এবং প্রচলিত হিন্দুসিদ্ধান্ত এবং হিন্দুসংস্কারকেও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন। যে যুক্তিতে বাইবেলের প্রামাণ্য নষ্ট হইল, সেই যুক্তির সম্মুখে বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রের প্রামাণ্যও টিকিতে পারিল না। যে যুক্তিবলে ঈশ্বরত্ব নষ্ট হইল, সেই যুক্তির সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বও রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষাতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবও নষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে ব্রাহ্মচিন্তা এবং ব্রাহ্মভাব দেশময় ছাইয়া পড়িল। কালক্রমে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের এই প্রভাব প্রতিহত করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আর যে পথে যাইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ খৃষ্টীয় প্রভাব প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, সেই পথে যাইয়াই এই নব্য হিন্দুত্বও ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। যে অর্থে ভগবান্ ভাষ্যকারকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়ান্ বলা যাইতে পারে, সেই অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এবং শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নব্য-হিন্দু-সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাতৃগণকে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম বলা অসঙ্গত হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্বে" যে অনুশীলন-ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। আর যে ভিত্তির উপরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সনাতন বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের অপেক্ষা আধুনিক যুক্তিবাদের সম্বন্ধই বেশী ঘনিষ্ঠ। যে প্রণালীতে মেথু আর্নল্ড এবং রেনাঁ প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদিগণ যীশুখৃষ্টের

জীবন ও চরিত্রকে খৃষ্টীয়ান্ কিম্বদন্তীর জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও মোটের উপরে সেই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াই, তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র" রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্ব" এবং "কৃষ্ণচরিত্র" যতটা পরিমাণে যুক্তিবাদী ব্রাহ্মগণের মনোমত হইয়াছে, সেই পরিমাণে কিছুতেই ভক্তিবাদী বৈষ্ণবদিগের মনঃপূত হয় নাই; ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। ব্রাহ্মমতের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্বের" এবং "কৃষ্ণচরিত্রের" যতটা মিল আছে, হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে ততটা মিল নাই। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের "ধর্ম্মব্যাখ্যা" সম্বন্ধেও মোটের উপর এই কথাই বলিতে পারা যায়। তর্কচূড়ামণি মহাশয় আধুনিক ইংরেজী শিক্ষালাভ না করিয়াও কতটা পরিমাণে যে ইংরেজীভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন, তাঁর "ধর্ম্মব্যাখ্যাই" ইহার প্রমাণ। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন শিক্ষা ও সাধনার আলোকে প্রাচীন শাস্ত্র ও সংস্কারকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। আর তিনি কতটা পরিমাণ যে, আধুনিক যুক্তিবাদের এবং নব্য ব্রাহ্মভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন, এ সকলে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কারণেই হিন্দু পুনরুত্থানের প্রতিষ্ঠাতৃগণকে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম বলা কিছুতেই অসঙ্গত নহে। ইহাতে তাঁহাদের কোনও নিন্দার কথাও নাই। ব্রাহ্ম-সমাজ যে অস্ত্রের দ্বারা প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের শরীররক্ষকদিগকে সেই অস্ত্র সাধন করিয়াই এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। অন্য অস্ত্র এক্ষেত্রে নিতান্তই অনুপযোগী হইয়া পড়িত। ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারও যে বহুলপরিমাণে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ ও সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিলে ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় কেবল ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যেরাই যে ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন কিছুতেই আর এ কথা বলা চলে না।

ফলতঃ যে ইংরেজী-শিক্ষার প্রভাবে আদিতে ব্রাহ্মমতের উৎপত্তি হয়, সেই ইংরাজী শিক্ষা এখনও এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। আগে যত লোকে এই শিক্ষা পাইতেন এখন তদপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক লোক তাহা পাইতেছেন। অন্য দিকে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় সাধনা যে সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া যে একটা অভিনব সমন্বয়ের ভূমিতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে, আমাদের দেশের প্রচলিত উচ্চশিক্ষা তাহারও বড় সন্ধান রাখে না। অতএব যে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদ ইউরোপীয় সাধনাকে বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে একান্ত অভিভূত করিয়াছিল তাহা এখনও আমাদিগকে অভিভূত করিয়া আছে। এই যুক্তিবাদকে ইউরোপ নানা দিক্ দিয়া দ্রুতবেগে ছাড়াইয়া উঠিতেছে, কিন্তু আমাদিগের ইংরেজীশিক্ষিত সমাজ এখনও সেই যুক্তিবাদের মধ্যেই দিশাহারা হইয়া পড়িয়া রহিয়া-

ছেন। এই যুক্তিবাদের উপরেই মামুলী ব্রাহ্মমতের প্রতিষ্ঠা। আর এই যুক্তিবাদের প্রভাবেই যাঁহারা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, এমন কি যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের ঘোরতর বিরোধী, তাঁহারাও প্রচ্ছন্নভাবে ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তকেই আশ্রয় করিয়া পড়িয়া আছেন। তত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহাদের অনেকেই নিতান্ত নিরাকার-বাদী এবং

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃষ্টমেতৎ বিনশ্যতি—

যাহা দেখা যায় না তাহার ভাবনা অসম্ভব, অথচ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা সকলেই বিনাশ-শীল বলিয়া, ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া, প্রতিমাদির পূজা সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের পিতৃ-পিতামহেরা কালী দুর্গা প্রভৃতিকে যে চক্ষে দেখিতেন, নব্য হিন্দুগণ সে চক্ষে দেখিতে পারেন না। কেহ বা লোক-সংগ্রহার্থে তামসভাবে এ সকল অনুষ্ঠান করেন, কেহবা মনঃ-সংযমের সহজ উপায়রূপে এ সকল প্রতিমার আশ্রয় করেন; আর কেহ বা আধ্যাত্মিক রূপক জ্ঞানে এ সকলের পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই প্রকৃতপক্ষে এই সকল প্রতিমা-পূজায় আভ্যন্তরীণ সত্যটুকুকে প্রকাশ করিয়া আধুনিক সাধনার সঙ্গে তাহার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেন নাই। এমন কি, এ সকল দেবমূর্ত্তি যে হিন্দুর চক্ষে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর-মূর্ত্তি নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সাধকের সমাধি-লব্ধ ইষ্টমূর্ত্তি মাত্র, এ কথাটাও অল্প লোকেই জানেন এবং বোঝেন। দেশপ্রচলিত প্রতীকোপাসনার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত একদিকে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের এবং অন্যদিকে আধুনিক ইউ-রোপীয় যুক্তিবাদ এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির একটা সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য হয় নাই। আর যতদিন না এ সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য হইয়াছে, ততদিন বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কিছুতেই আধুনিক ব্রাহ্মমতের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

যেমন এই প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে সেইরূপ অন্য সকল বিষয়েও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিবাদি-গণের বহুবিধ তত্ত্ব-সিদ্ধান্তকে একটু ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেই তাহার মধ্য হইতে মামুলী ব্রাহ্মমতগুলি বাহির হইয়া পড়ে। কিছুদিন হইতে আমাদের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবভাবের প্রতি যে একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যেও কতটা পরিমাণে যে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব লুকাইয়া আছে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কেহ বা কাব্যরসলোলুপ হইয়া রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আর কেহ বা ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মের আসনে শ্রীকৃষ্ণকে এবং জীবের পদে শ্রীরাধিকাকে বসাইয়া আপনি শ্রীমতী হইয়া ভগবানের ভজনা করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। প্রকৃত বৈষ্ণবসাধনায় ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে ভক্তের রাধাভিমান গুরুতর অপরাধ মধ্যে পরিগণিত। আর আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত বৈষ্ণবেরা যে এ অভিমান সাধন করিতে চান, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের বৈষ্ণবত্ব নহে কিন্তু মামুলী ব্রাহ্মত্বই প্রতিপন্ন হয়। সখী-ভাবে যুগলমূর্ত্তির সেবাই বৈষ্ণব-ভজনার চরম আকাঙ্ক্ষা। শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে শ্রীরাধার পদসেবা করিতে হইবে। শ্রীরাধার চরণাশ্রয় করিলেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ হয়। অন্যথা

হয় না। ইহাই বৈষ্ণবের কথা। ইহাই অন্ততঃ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। অথচ আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব জীব ও ভগবানের মধ্যে শ্রীরাধিকার ব্যবধান-টুকু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না। ইহাতেই তাঁহারা কতটা পরিমাণে যে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতএব কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় ব্রাহ্ম-মতের আলোচনা করিতেছি বলিয়া কেবল যে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক সংস্কারের বিচারই করিতেছি তাহা নহে। যে সকল অসত্য বা সত্যাভাস আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে প্রকাশ্য-ভাবে কিম্বা প্রচ্ছন্নভাবে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, এই প্রসঙ্গে তাহারও আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই অসত্য এবং সত্যাভাস ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতরে এবং বাহিরে দেশের সর্ব্বত্রই কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই এ সকলের সবিস্তর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে, প্রত্যুত এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়াই মনে হয়।

শাস্ত্র ও স্বানুভূতি

ব্রাহ্মেরা কোনও শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যে কেবল ব্রাহ্মসমাজেরই মত তাহা নহে। ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ লোকেই বাস্তবিক কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। অতএব শাস্ত্র-প্রামাণ্য আছে কি না দেশের শিক্ষিত সাধারণের জন্যও এই প্রশ্নের যথাযথ বিচার হওয়া আবশ্যক। যতদিন না এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষে অবিচলিত বিশ্বাস সহকারে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কারণ, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শাস্ত্রের প্রামাণ্য হয়। অন্য পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের কোনও শাস্ত্র নাই। কোনও শাস্ত্র অভ্রান্ত ও সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য নহে,—ইহাও ব্রাহ্মসমাজের একটী না-বাচক কিম্বা অভাবাত্মক মত। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে এই ব্রাহ্ম-মতকে বর্জ্জন করিতে হয়।

ব্রাহ্মসমাজ একেবারে যে কোনও শাস্ত্র মানেন না, তাহাও নহে। তাঁরা কেবল অভ্রান্ত শাস্ত্রই অস্বীকার করেন। অর্থাৎ যে শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে এমন শাস্ত্র স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন হানি হয় না। লৌকিক ন্যায়ের বিচার, শুদ্ধ শব্দার্থের হিসাবে, কথাটা আপাততঃ অত্যন্ত অদ্ভুত শোনায়। কারণ, যাহা অভ্রান্ত নহে তাহাই শাস্ত্র, লৌকিক ন্যায় এই কথাই বলে। সুতরাং কেহ যদি বলেন আমি শাস্ত্র মানি, কিন্তু অভ্রান্ত শাস্ত্র মানি না;—তার প্রতিপক্ষ এমনই বলিতে পারেন, তবে তুমি ভ্রান্ত শাস্ত্র মান। এরূপ প্রতিবাদের উত্তরে ব্রাহ্মকে এই কথাই বলিতে হইবে যে আমার কথার ঐ অর্থ নয়। আমি যে শাস্ত্র মানি তাহাও অভ্রান্তই। কিন্তু যে শাস্ত্র কোনও পুস্তক বিশেষে আবদ্ধ নহে, যাহা সত্য, তাহাই আমার শাস্ত্র। "সত্যং শাস্ত্র-মনশ্বরম্" ব্রাহ্মধর্ম্ম এই কথাই বলেন।

কোনও শাস্ত্রবাদী এ কথা অস্বীকার করিবেন না। যিনি যে শাস্ত্র মানেন, তিনিই তাহাকে অনশ্বর অর্থাৎ নিত্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। খৃষ্টীয়ান বাইবেলকে নিত্য সত্যের প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। মুসলমান কোরাণ সরীফকে এই চক্ষেই দেখেন। হিন্দুও তাঁর বেদকে নিত্য বলিয়াই

গ্রহণ করেন। সুতরাং "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্" বলিয়া ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী তাঁর শাস্ত্র-প্রামাণ্যকে অপরাপর ধর্ম্মের শাস্ত্র-প্রামাণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। ইহা দ্বারা বেদ, বাইবেল, কোরাণাদিতে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের শাস্ত্র-প্রামাণ্যের অসারতা এবং ব্রাহ্ম-সমাজের শাস্ত্র-প্রামাণ্যের সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই কথার দ্বারা ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের সঙ্গে শাস্ত্রবাদী সিদ্ধান্তের পার্থক্য ও বিরোধ কোথায়, তাহাও ধরা পড়ে না।

সত্যের প্রামাণ্য কি? এই প্রশ্নের আলোচনাতেই কেবল ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের সঙ্গে শাস্ত্রবাদীদিগের সিদ্ধান্তের পার্থক্য এবং বিরোধ কোথায় ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মমতে আত্মপ্রত্যয়ই সত্যের শেষ প্রামাণ্য। ইংরেজীতে এই আত্মপ্রত্যয়কে Intuition বলে, আমাদের শাস্ত্রে ইহাকে স্বানুভূতি বলে। মামুলী ব্রাহ্মমত এই আত্মপ্রত্যয়, Intuition বা স্বানুভূতিকেই সত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করে। শাস্ত্র যেখানে এই স্বাভিমতের সমর্থন করে সেইখানেই তাহা সত্য। যেখানে স্বাভিমতের সঙ্গে শাস্ত্রের বিরোধ দাঁড়ায়, সেখানে শাস্ত্র অসত্য এবং অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। অতএব ব্রাহ্মগণ সত্য-নির্ণয়ে শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেও তাহাদের নিজ নিজ স্বানুভূতিকেই সত্যের একমাত্র চূড়ান্ত প্রামাণ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রে প্রকৃত ভাবে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে স্বানুভূতির যে স্থান নাই তাহা নহে, তবে সত্যের প্রামাণ্য কেবল স্বানুভূতি নহে, কিন্তু শাস্ত্রও। গতানুগতিক ধর্ম্মে স্বানুভূতিকে কার্য্যতঃ উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্রকেই সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করে। ব্রাহ্মগণ যেমন নিজ নিজ স্বাভিমতকে জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের কষ্টিপাথররূপে ব্যবহার করেন এই স্বানুভূতির উপর কষিয়াই যাবতীয় শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয় করেন, একান্ত শাস্ত্রবাদী হিন্দু, খৃষ্টীয়ান ও মুসলমানও সেইরূপ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকেই সর্ব্ব প্রকারের ব্যক্তিগত স্বাভিমতের কষ্টিপাথর-রূপে ব্যবহার করেন। এবং এই শাস্ত্রের পাথরে কষিয়াই নিজেদের এবং অপরের স্বানুভূতির বা আত্মপ্রত্যয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করেন। ব্রাহ্মের সত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য স্বানুভূতি। আর যাবতীয় প্রামাণ্য আছে তাহা এই স্বানুভূতির মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। শাস্ত্রবাদী সম্প্রদায়ের সত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য শাস্ত্র, ইহার আর যাবতীয় প্রামাণ্য আছে, তৎ-সমুদয় সেই শাস্ত্রমুখাপেক্ষী হইয়া শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলিতে হয়। ব্রাহ্মমতে স্বানুভূতি এবং শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ হইলে স্বানুভূতির সাক্ষ্যই নিঃসন্দিগ্ধরূপে গৃহীত হয়। শাস্ত্রানুগত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকলের শাস্ত্রের সঙ্গে স্বানুভূতির বিরোধ হইলে শাস্ত্রই গৃহীত এবং স্বানুভূতিই বর্জ্জিত হয়। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুগত বলিয়া এইখানেই মামুলী ব্রাহ্মমতের সঙ্গে তাহার পার্থক্য এবং বিরোধ রহিয়াছে।

কিন্তু কেবলমাত্র স্বানুভূতিকেই কি সত্যের চূড়ান্ত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়? তলাইয়া দেখিলে ব্রাহ্মগণও এ কথা বলিবেন না। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি যাহা বলে, তাহাই যদি পূর্ণ সত্য হয়, তাহা হইলে যে মতেতে আর সত্যেতে,

কল্পনাতে আর বস্তুতে কোনই প্রভেদ থাকে না। আমার স্বানুভূতি আমার নিকটে যতই বলবতী হউক না কেন, অপরের নিকটে ত তার সে মূল্য নাই। বিশেষতঃ আমার কোনও বিশেষ অনুভূতির সঙ্গে যখন অপরের অনুরূপ অনুভূতির বিরোধ উপস্থিত হয়, আমি যাহাকে স্থাণু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অপরে যখন তাহাকেই মানব বলিয়া দেখে, তখন আমার প্রত্যক্ষের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষের যে বিরোধ উপস্থিত হয়, স্বানুভূতি সে বিরোধের মীমাংসা কিছুতেই করিতে পারে না। কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে সত্যের চূড়ান্ত প্রামাণ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলে কি বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া যায়, "অন্ধের হস্তি-দর্শন-ন্যায়" তাহারই প্রমাণ প্রদান করে। ফলতঃ আত্মপ্রত্যয় বা Intuitionবস্তুটা যে কি ইহার সত্য জ্ঞান লাভ হইলে, কোন মতেই আর কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে সত্যের অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না।

সত্য কথা এই যে আত্মপ্রত্যয় বা Intuition বা স্বানুভূতির সঙ্গে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের কোনও প্রকৃত বিরোধ নাই। আত্মপ্রত্যয় বা Intuition সত্যের অন্তরঙ্গ প্রামাণ্য মাত্র। শাস্ত্র তার বহিরঙ্গ প্রামাণ্য। আর এই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুই অঙ্গেতেই যখন যাবতীয় বস্তু বা সত্য নিজ স্বরূপে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন কেবল অন্তরঙ্গের দ্বারাও তাহার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, কেবল বহিরঙ্গের দ্বারাও হয় না। বস্তু বা সত্য বিশেষের প্রামাণ্য একদিকে আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি এবং অন্য দিকে শাস্ত্র। এই দ্বিবিধ প্রামাণ্যের সম্মিলিত সাক্ষ্যের উপরেই সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বানুভূতিকে ছাড়িয়া শাস্ত্রপ্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। শাস্ত্রকে ছাড়িয়াও স্বানুভূতির প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। শাস্ত্র এবং স্বানুভূতি যখন পরস্পরের সমর্থন করে তখনই কেবল সত্যের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা হয়।

এই আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি বস্তুটা কি? মামুলী ব্রাহ্মমত যে ভাবেই এই আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিকে গ্রহণ করুক না কেন; ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ এই আত্মপ্রত্যয়ের সার্ব্বজনীনতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত জনে মনে করে যে, সে যা' ভাবে তাহাই বুঝি তার আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি। কিন্তু স্বানুভূতি আর খেয়াল বা কল্পনা এক বস্তু নহে। ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ যাহাকে এই প্রত্যয় বা স্বানুভূতি নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহা মানব-বুদ্ধির নিত্য-ধর্ম্ম। যাবতীয় মানবের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়া এই আত্মপ্রত্যয় কিম্বা স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই সম্পাদিত হয়। মানব-বুদ্ধির একটা ছাঁচ আছে, এই ছাঁচে ফেলিয়াই সভ্য অসভ্য সকল মানুষ জগতের যাবতীয় বস্তু, বিষয় এবং রসের জ্ঞান লাভ করে। এই ছাঁচটা কেবল আমার বুদ্ধিরই ছাঁচ নহে, কেবল তোমার বুদ্ধিরও ছাঁচ নহে, এই ছাঁচ সকল মানববুদ্ধির সাধারণ এবং সার্ব্বজনীন ছাঁচ। আর আমাদের বুদ্ধির ছাঁচটা সকলেরই এক বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিবিধ বিষয়ের যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহার মধ্যেও একটা নিগূঢ় ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মানব-বুদ্ধির সার্ব্বজনীন ছাঁচটাকেই প্রকৃত পক্ষে আত্মপ্রত্যয় বলে।

কোন বস্তু বা বিষয় জানিতে গেলেই আমাদের বুদ্ধি এই সার্ব্বজনীন ছাঁচটীর উপর তাহাকে ফেলিয়া তাহার জ্ঞান লাভ করে। এই ছাঁচটী মানব-বুদ্ধির মূল প্রকৃতির অন্তর্গত। এইজন্য ইহা সার্ব্বজনীন বস্তু। কিন্তু যতক্ষণ না বাহিরের বস্তু বা বিষয় আমাদের বুদ্ধির এই ছাঁচের উপর পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধির এই ছাঁচটী যে কি তাহা আমরা জানি না। এই ছাঁচের উপরে বাহিরের বিষয় আসিয়া পড়িলেই এই ছাঁচটীকে আমরা ধরিতে পারি, এবং তাহার সাহায্যে এই বাহিরের বিষয়েরও জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

আমাদের বুদ্ধির ভিতরেই দেশ, কাল, কার্য্যকারণসম্বন্ধ, প্রভৃতির ছাঁচ নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ দেশের, কালের, কার্য্য-কারণসম্বন্ধের জ্ঞানের মূল সূত্রটী আমাদের বুদ্ধির ভিতরেই আছে। এই মূল সূত্রটী আমরা বাহির হইতে আহরণ করি না। কিন্তু অন্যদিকে আকাশে বিস্তৃত কোনও পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ যতক্ষণ না করিয়াছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধির অন্তর্নিহিত দেশজ্ঞানের যে ছাঁচটী বা সূত্রটী বা আত্মপ্রত্যয়টী রহিয়াছে তাহাও ফুটিয়া উঠে না। দেশের জ্ঞান আর দূরত্বের জ্ঞান একই কথা। আকাশে প্রতিষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা এই জ্ঞান লাভ করি। দর্শন এবং শ্রবণ এই দুই উপায়েই আমরা দূরত্বের জ্ঞান লাভ করি। আর আমাদের চক্ষু কিম্বা কর্ণ কোনও দৃশ্য-বিশেষ বা শব্দবিশেষকে গ্রহণ করিতে যে শক্তি ক্ষয় করে, তাহারই ওজনে কোন বস্তু বা শব্দ কত নিকটে বা কত দূরে রহিয়াছে ইহা আমরা বুঝিয়া থাকি। যাহাদের চক্ষু এবং কর্ণ দুই ই নাই তাহারা বস্তুবিশেষকে স্পর্শ করিবার জন্য হস্তপদাদির সঞ্চালন করিতে যাইয়া যে শক্তি ক্ষয় করে, তাহারই দ্বারা দূরত্বের ওজন করিয়া থাকে। আর এই দূরত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া, তার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের জ্ঞানও লাভ করে। যে শক্তির দ্বারা প্রকৃত পক্ষে আমরা নৈকট্য এবং দূরত্ব বুঝি তাহার কোন বিস্তৃতি নাই, অথচ আমরা এই শক্তি ব্যয় করিয়াই বিস্তৃতি বা extention এর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। ইহার অর্থ এই যে আমাদের বুদ্ধির অভ্যন্তরে আকাশ প্রত্যয় বলিয়া একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় আছে। কিন্তু যতক্ষণ না আকাশে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার হইয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রত্যয় জাগ্রত হয় না। বহির্বিষয়ের সংস্পর্শেই এই আত্ম-প্রত্যয় জাগিয়া উঠে। এবং একদিকে বহির্বিষয়ের জ্ঞান এবং অন্যদিকে এই আত্ম প্রত্যয়ের স্ফূর্ত্তি এই দুই মিলিয়াই আমাদের আকাশের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। যেমন আকাশের জ্ঞান সম্বন্ধে, সেইরূপ কালের জ্ঞান সম্বন্ধেও, বাহিরের ঘটনার পারম্পর্য্যের সাক্ষাৎকারে অন্তরের বুদ্ধিনিহিত কাল-প্রত্যয় জাগ্রত হইয়া, পরস্পরে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। দূরত্ব যেমন আকাশ-জ্ঞানের প্রাণ, ঘটনার পারম্পর্য্য সেইরূপ কাল-জ্ঞানের প্রাণ। বাহিরের ঘটনা যতক্ষণ একটার পর আর একটা ঘটিয়া একটা পারম্পর্য্যের প্রতিষ্ঠা না করে, ততক্ষণ আমাদের কালজ্ঞান জন্মায় না। কালের

জ্ঞানের একটা অন্তরঙ্গ প্রত্যয় বা ছাঁচ আমাদের বুদ্ধির মধ্যে আছে। কিন্তু বাহিরের ঘটনাবলী পরম্পরের অনুসরণ করিয়া যতক্ষণ না আমাদের ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার বা মনোগোচর হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের এই কালপ্রত্যয় জাগ্রত হয় না। গভীর নিদ্রাকালে কখন ঘটনা-পারম্পর্য্য আমাদের মনোগোচর হয় না, তখন আমাদের কাল-প্রত্যয় জাগ্রত হয় না এবং কালের জ্ঞানও জন্মায় না। স্বপ্ন দেখিলে তাহার সাহায্যে নিদ্রিত সময়েও কতকটা কালের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে স্বপ্নে যে সকল ঘটনাপরম্পরা আমাদের মানসগোচর হয়, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তখন আমাদের কালপ্রত্যয় জাগ্রত হইয়া রহে। যেমন দেশ-জ্ঞানের এক বাহিরে আকাশে বিস্তৃত পদার্থের অনুভূতি ও ভিতরে দেশসম্বন্ধিনী আত্মপ্রত্যয় এই দ্বিবিধ প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছি, সেইরূপ কালজ্ঞানেরও এক বাহিরে প্রকাশিত ঘটনা-পরম্পরা ও অন্তরে নিহিত কাল-প্রত্যয় এই দ্বিবিধ প্রতিষ্ঠা আছে। ইহার একটীকে ছাড়িয়া অপরটীকে লইয়া কালের জ্ঞান জন্মে না ও জন্মিতে পারে না। কার্য্য-কারণসম্বন্ধের যে জ্ঞান আমরা লাভ করি, তাহারও এইরূপ দ্বিবিধ প্রতিষ্ঠা আছে। এক বাহিরের ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং অপর ভিতরে বুদ্ধিনিহিত কার্য্যকারণ প্রত্যয়। এইরূপ আমাদের বুদ্ধিনিহিত স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি প্রত্যয়কে বা intuitionকে আশ্রয় করিয়াই আমাদিগের সর্ব্ববিধ জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু ভিতরের এই স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়গুলি বাহিরের বস্তুসাক্ষাৎকারের উপরে সর্ব্বদাই নির্ভর করে। যতক্ষণ না এই বস্তুসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, ততক্ষণ এ সকল অন্তঃপ্রত্যয় বা আত্মপ্রত্যয় সজাগ ও কর্ম্মক্ষম হয় না। আর এই সকল স্বতঃসিদ্ধ অন্তঃপ্রত্যয় বা আত্মপ্রত্যয়কে আশ্রয় না করিয়া বাহিরের বস্তুরও কোনও জ্ঞানের বা সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আর এই জন্যই এই আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি সত্যের আংশিক প্রামাণ্যমাত্র, পূর্ণপ্রামাণ্য নহে।

জড়বিজ্ঞানের সত্য

জড়বিজ্ঞানের সত্য সম্বন্ধে সকলেই এ কথাটা স্বীকার করেন। এখানে কেহ কেবল আত্মপ্রত্যয় বা ব্যক্তিগত স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া কোনও তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যান না। ইহার প্রধান কারণ এই যে একটা মনোজগৎ আর একটা জড়জগৎ, এই বিবিধ অভিজ্ঞতার উপরে জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমরা যে জড়ের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বুঝি ইহার অর্থ এই যে আমাদের মনে যে ছাঁচ আছে, আমাদের বুদ্ধির ভিতরে, আমাদের আত্মপ্রত্যয়রূপে যে সকল সম্বন্ধের ঠাঁট প্রতিষ্ঠিত আছে, তারই অনুরূপ করিয়া এই জড়জগতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে একটা mental order আছে। বাহিরে জড়জগতে একটা natural order আছে। এই বাহিরের natural order আমাদের ভিতরের mental order'এরই অনুরূপ, তারই প্রতিকৃতি। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে আমরা কখনই জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান অর্থই প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান। কোনও বস্তু বা বিষয়কে প্রণালীবদ্ধ করিতে হইলেই

একটা কোনও বিশেষ নিয়মের দ্বারা তাহাকে বাঁধিতে হয়, একটা বিশেষ শৃঙ্খলায় তাহাকে আনিতে হয়, একটা বিশেষ ছাঁচে তাকে ঢালিতে হয়। যে নিয়মের, যে শৃঙ্খলার, যে ছাঁচের সাহায্যে আমরা জড়ের জ্ঞানকে অর্থাৎ জড়জগৎ সম্বন্ধে আমাদের বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সকলকে শ্রেণীবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ করি, তাহা জড়ের ভিতরে নাই, আমাদের মনের ভিতরেই সে নিয়ম, সে শৃঙ্খলা ও সে ছাঁচ পাইয়া থাকি। ইহাই আমাদের mental order, এই mental orderএর ছাঁচে ফেলিয়াই আমরা জড়রাজ্যে order বা শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করি। এখন প্রশ্ন এই—এইরূপে আমরা যে জড়-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতেছি, তাহা সত্য না কল্পনা? জড়ের ভিতরে বাস্তবিক এ সকল সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলা আছে না নাই? যদি থাকে তার প্রামাণ্য কি? এই প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াই এই কথা বলিতে হয় যে, আমাদের যে mental orderএর ছাঁচে ফেলিয়া আমরা জড়ের মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করিয়া, জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতেছি, সেই mental order বস্তুর বা সত্যের একদিকমাত্র ব্যক্ত করে। বাহিরের, জড়ের নিজস্ব যে natural order, তাহা বস্তুর বা সত্যের অন্যদিক্ ধরিয়া আছে। এই অন্তরঙ্গ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঐ বহিরঙ্গ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, অতিশয় অঙ্গাঙ্গী। এরা পরস্পরের অংশ ও অঙ্গ। এরা পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণ করে, প্রমাণ করে, প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ mental orderএর সাক্ষ্য যখন natural orderএর প্রত্যক্ষের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তখনই জড়-বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই mental orderকেই আত্মপ্রত্যয় বলা যাইতে পারে। ইহা সত্যের অন্তরঙ্গ প্রামাণ্য মাত্র। এই natural order তার বহিরঙ্গ প্রামাণ্য। দুই যখন মিলিয়া একই কথা বলে, তখনই প্রকৃত সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। Mental order ভিতরের বস্তু, ব্যক্তিগত কথা, স্বাভিমত বা স্বানুভূতি-পর্য্যায়ভুক্ত। Natural order বাহিরের বস্তু, ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতির কথা নহে, সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতার কথা। শাস্ত্র-পর্য্যায়ভুক্ত। আর এই দু'য়ের একবাক্যতার উপরেই জড়জ্ঞানের সত্যের ও প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

অতএব, একদিকে আমাদের মনোরাজ্য কিম্বা mental order, আর অপরদিকে জড়রাজ্য বা natural order, এই দুইটী বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দ্বিবিধ ভিত্তির উপরেই যাবতীয় জড়-বস্তুর এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের প্রামাণ্য (verified and verifiable) ও প্রণালীবদ্ধ (classified) জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রামাণ্য ও প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানকে science, এবং আধুনিক বাংলায় বিজ্ঞান বলে। জড়-বস্তুর প্রকৃতির ও সম্বন্ধের এই প্রামাণ্য এবং প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানই জড়বিজ্ঞান। এই জড়বিজ্ঞান যে সকল সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত। এই সত্য কেবল ভিতরের আত্মপ্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কেবল বাহিরের বিষয়-প্রত্যক্ষের উপরেও প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু উভয়ের সম্মিলিত সাক্ষ্যের উপরেও প্রতিষ্ঠিত। আর এই জন্যই

জড়বিজ্ঞানের সত্যসমূহ সম্বন্ধে, লোকে বড় বেশী সন্দিহান হয় না।

ধর্ম্মের সিদ্ধান্তকে যদি বিজ্ঞানের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করিতে হয়, তাহা হইলে এ ক্ষেত্রেও কেবল আত্মপ্রত্যয়ের বা স্বানুভূতির উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিলে চলিবে না। জড় জগতের আলোচনা করিয়া আমরা দেখি যে আমাদের ভিতরে যেমন একটা অন্তরঙ্গ মনোরাজ্য আছে, সেইরূপ আমাদের বাহিরে, আমাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ানুভূতিনিরপেক্ষ একটা বিশাল জড়রাজ্যও পড়িয়া আছে। আমাদের সহজ ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সকলই আত্মপ্রত্যয় বা ইনটুইষণ-পদবাচ্য। জড়ের সম্বন্ধ সকল দেশেতে প্রতিষ্ঠিত। এই দেশের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়-পর্য্যায়ভুক্ত। এই দেশ-জ্ঞান সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-চেষ্টার সঙ্গে এই জ্ঞান জড়িত। আর এ জড়াজড়িটা অতি অদ্ভুত রকমের। দেশজ্ঞান ও দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-চেষ্টা, ইহারা ছায়াতাপের মত পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া আছে। যেখানে দর্শন বা শ্রবণাদি সেই খানেই, তার মূলে, তার সঙ্গে সঙ্গে, দেশের জ্ঞান বা দেশ-সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয়ও জাগিয়া রহে। এই আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত কেবল দর্শনাদির দ্বারা কোন জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। আবার শ্রবণদর্শনাদি ইন্দ্রিয়-চেষ্টা যতক্ষণ না হইয়াছে ততক্ষণ এই যে আত্মপ্রত্যয় তাহাও জাগ্রত হয় না। এখানে আগে দেখা বা শোনা আর তার পরে আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম, কিম্বা আগে আত্মপ্রত্যয়ের প্রকাশ, তার পরে দেখা বা শোনা —এরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। আতপ এবং ছায়ার মধ্যেও এরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। চিন্তা করিবার সময়, জ্ঞানের দ্বারা ছায়াতাপের বিচার করিতে যাইয়া, আমরা আতপকেই আগে এবং ছায়াকে তার পরেই ধরি, ইহা সত্য বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে আতপের সঙ্গে সঙ্গেই ছায়ার প্রকাশ হয়, দুই-ই যুগপৎ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়, কাল নির্ণয়ে আতপ পূর্ব্বে এবং ছায়া তার পরে প্রকাশিত হয় না। ইংরেজী-দর্শনের ভাষায় যেমন এ ক্ষেত্রে ছায়ার সম্পর্কে আতপকে কেবল logical prius মাত্র বলিবে, কিন্তু chronologically prior বলিবে না, সেইরূপ দেশজ্ঞানরূপ আত্মপ্রত্যয়কে দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-চেষ্টার logical prius মাত্র বলা যায়, chronologically prior বলা যায় না। চিন্তার প্রণালীতে দেশজ্ঞান আগে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ পরে। কিন্তু বাস্তব জীবনের নিত্য ও সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতাতে এই দুই ছায়াতপের মতন একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আতপ ব্যতীত ছায়ার অস্তিত্ব অসম্ভব ও অসাধ্য। আবার ছায়ার সঙ্গ ছাড়িয়া কদাপি আতপেরও প্রত্যক্ষ এবং প্রতিষ্ঠা হয় না। জ্ঞানের অন্তরঙ্গ আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি বা ইনটুইষণ, এবং তার বহিরঙ্গ ইন্দ্রিয় চেষ্টা ও বিষয়সাক্ষাৎকার, এতদুভয়ের সম্বন্ধ সকল বিষয়েই এই ছায়াতাপের মতন নিত্য ও অঙ্গাঙ্গী। এককে ছাড়িয়া অপরের জ্ঞান বা ক্রিয়া সম্ভব হয় না। আমার স্বানুভূতি বাহিরের বস্তুর সৃষ্টি করে না, সে বস্তুর জ্ঞানই কেবল সম্ভব করে। আবার বাহিরের বস্তুও আমার জ্ঞানের বা যে প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার সৃষ্টি

করে না; তাহার প্রকাশ করে মাত্র। আর ইহারা পরস্পরের সাহায্যে, একে অন্যকে জাগ্রত ও প্রকাশ করিয়াই আমাকে যাবতীয় বিষয়জ্ঞান-লাভে সমর্থ করে। এই জন্যই আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি বা ইনটুইষণ এবং ইন্দ্রিয়-চেষ্টা ও বিষয়সাক্ষাৎকার এই দুই অঙ্গেতে জগতের যাবতীয় জড়বস্তুর বস্তুত্বজ্ঞান কিম্বা reality পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এতদুভয়ের সম্মিলিত সাক্ষ্যের উপরেই জড়-বিজ্ঞানের যাবতীয় সত্যের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব আত্মপ্রত্যয়ের যথার্থ অর্থ বুঝিলে, কি প্রকারে এই আত্মপ্রত্যয় আমাদের জ্ঞানসাধনের সহায়তা করে, ইহা ভাল করিয়া একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আত্ম-প্রত্যয়বাদীকেও তাঁর আত্মপ্রত্যয় বা ইনটুইষণ বা স্বানুভূতি যে স্ব-তন্ত্র এবং স্ব-পর্য্যাপ্ত নহে, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু এই আত্ম-প্রত্যয়ও বহির্বিষয়ের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জাগ্রত এবং কার্য্যকরী হয় না, ইহাও অতি সত্য কথা। কিন্তু এই আত্মপ্রত্যয় এবং বিষয়সাক্ষাৎকার এই দুই মিলিয়া আমাদের যে বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন করে, সে জ্ঞানও সম্পূর্ণ প্রামাণ্য নহে। আমি যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহা স্বতঃপ্রামাণ্য সত্য, সন্দেহ নাই। কারণ এ সকল আমার প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর প্রত্যক্ষ আপনি আপনার প্রামাণ্য; প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যের বা সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই, তাহা সকলটাই আমার প্রত্যক্ষের কথাও নহে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বদাই আমার বহুবিধ অনুমান মিশিয়া থাকে। এই অনুমান মিশিয়া থাকে বলিয়াই, আমার রজ্জুতে কখনও কখনও সর্পবোধ এবং স্থাণুতে মানব-বোধ জন্মে। গৃহপ্রাঙ্গণের রজ্জুখণ্ডকে যে আমি সর্প জ্ঞান করি, ইহার কারণ কি? বস্তুতঃ চক্ষু এখানে সর্প দেখে না। সর্পের একটা বা দুইটা ধর্ম্মসম্পন্ন একটা বস্তুবিশেষই দেখে মাত্র। রজ্জুর সঙ্গে সর্পের আকার এক; রজ্জুটা যদি একটু তির্য্যগভাবে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সর্পের তির্য্যক্‌গতির সঙ্গেও তার একটা সাদৃশ্য জন্মে। আর আমার চক্ষু প্রকৃতপক্ষে এইটুকু মাত্রই প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু আমার মন এই চাক্ষুষ-অভিজ্ঞতার উপরেই এই সম্মুখের বস্তুটা যে সর্প এই অনুমান করিয়া লয়। চক্ষু যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা সত্য, স্বতঃপ্রামাণ্য। চক্ষু স্বয়ংই তার স্ব-পর্য্যাপ্ত সাক্ষী। কিন্তু চক্ষু বর্ত্তমানে যে বস্তু দেখিতেছে, মন তারই সঙ্গে অতীতে, অন্য ক্ষেত্রে যে সর্প দেখিয়াছিল, তার স্মৃতি জড়াইয়া এই বস্তুই যে সেইরূপ একটা সর্প, এই অনুমান করিয়া লয়। আর এই অনুমানের ভূমিতেই এই ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়; সত্য প্রত্যক্ষের ভূমিতে কোনওরূপ ভ্রান্তি জন্মে না ও জন্মিতে পারে না। এখানে রজ্জুর সঙ্গে সর্পের আকারগত ঐক্য দেখিয়াই আমি ইহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আমি যাহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা এই আকার মাত্র। এইটুকু পর্য্যন্তই আমার সত্য স্বানুভূতি। কিন্তু এই

আকার যে সর্পের, ইহা প্রত্যক্ষের কথা নহে; অনুমানের কথা। অথচ আমি এই অনুমানকেও আমার প্রকৃত স্বানুভূতির অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া, এই রজ্জুই যে সর্প এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আর আমার এই সিদ্ধান্ত সত্য কি মিথ্যা, তাহা আমার এই স্বানুভূতি নিজে কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারে না। এখানে আমার মতন আর দশজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই আমার স্বানুভূতিকে হয় সপ্রমাণ না হয় অপ্রমাণ করিতে পারে। প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞান যতটুকু তার সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোনও মত-বিরোধ হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। অনুমানের ভূমিতেই কেবল তারা একরূপ অনুমান করিতে পারে, আমি অন্যরূপ অনুমান করিতে পারি এবং এইরূপে আমাদের পরস্পরের অনুমানের মধ্যে বিরোধ-বৈষম্য ঘটিতে পারে, এইজন্য আমার প্রকৃত প্রত্যক্ষ এ ক্ষেত্রে কতটুকু, আর ইহার সঙ্গে আমার অনুমানই বা কতটা মিশিয়া আছে, আর দশজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়াই কেবল ইহা ধরিতে হয়। লোকে নানা ক্ষেত্রে নানা সময়ে সর্পের সাক্ষাৎকারে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাই সর্পের সত্য লক্ষণ। মানবের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই এই লক্ষণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর আমাকে এক্ষেত্রে এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমার নিজের অনুভূতির মধ্যে সত্য কতটুকু ও অনুমান কতটুকু ইহার বিচার ও পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহার আর অন্য উপায় নাই। মানবমণ্ডলীর এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে কষিয়াই আমার নিজের প্রত্যক্ষের বা স্বাভিমতের সত্যাসত্যের পরীক্ষা করিতে হয়। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা যখন আমার স্বানুভূতিকে সমর্থন করে, তখনই কেবল ইহার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মানবজ্ঞানের সকল বিভাগেই এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা শাস্ত্রের আসন প্রাপ্ত হয়। জড়বিজ্ঞানের শাস্ত্রে মানব-সমাজের জড়বস্তু সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত রহিয়াছে। জীব-বিজ্ঞানের বা Biologyর কিম্বা মনোবিজ্ঞানের বা Psychologyর শাস্ত্রও জীবের ও মনের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহারই দ্বারা রচিত হইয়াছে। এইরূপে আদিকাল হইতে মানুষ ধর্ম্মজীবনের যে বিবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকলে লিপিবদ্ধ হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র আপন আপন তথাকথিত স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া চলিলে, সত্য-লাভ কখনওই সম্ভব নহে। কারণ এই অভিজ্ঞতার সাহায্য ও সাক্ষ্য ব্যতীত, আমরা যাহাকে স্বানুভূতি বা আত্মপ্রত্যয় বলিয়া মনে করিতেছি, তার মধ্যে প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের কতটুকু আর অনুমানই বা কতটুকু ইহা কিছুতেই ধরা পড়িতে পারে না।

আমাদের জ্ঞানেতেই যে কেবল প্রত্যক্ষ সত্য এবং অপ্রত্যক্ষ অনুমান বা কল্পনা মিশিয়া আছে, আর শাস্ত্রেতে যে সকল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে কি এরূপ অনুমান বা কল্পনা মিশিয়া নাই? এ কথাটা এখানে উঠিতে পারে। গতানুগতিক পন্থাকে আশ্রয় করিয়া যাঁরা শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানিয়া চলেন,

তাঁরা যাহাই বলুন না কেন, কোন ধর্ম্মেরই তত্ত্বদর্শী মীমাংসকগণ তাঁহাদের শাস্ত্র-বাক্যের এইরূপ স্ব-তন্ত্র ও স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্যের দাবী করেন না। ফলতঃ শাস্ত্রের এরূপ স্ব-তন্ত্র ও স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য নাই বলিয়াই মীমাংসার প্রয়োজন হয়। শাস্ত্র-বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি, এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই মীমাংসার আবশ্যক হয়।

শাস্ত্র
|
সন্দেহ
|
বিচার
|
সমন্বয়
|
সঙ্গতি

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জৈমিনী-দর্শনে এই পঞ্চাঙ্গ প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে। আর যেখানে কোনও শাস্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর রহিয়া যায়, সেখানে সে শাস্ত্রকে নিঃসঙ্গ ও স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করা আদৌ সম্ভব হয় না। কারণ শাস্ত্র-বাক্যের একাধিক অর্থ করা যায় বলিয়াই শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে। আর সন্দেহের উদয় হইলে বিচার অবলম্বন করিয়াই তার নিরসন করিতে হয়, ইহার আর অন্য উপায় নাই। ইংরেজী-দর্শনে যাহাকে criticism বলে, আমাদের মীমাংসা-শাস্ত্রের এই বিচারও তাহাই। যুক্তি-প্রয়োগে কোনও বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার পদ্ধতিকেই বিচার বলে। আর স্বানুভূতিকে বর্জ্জন করিয়া কোনও বিষয়ে যুক্তিপ্রয়োগ সম্ভব হয় না। কারণ আমাদের যুক্তির মূল সূত্রগুলি আমাদের এই স্বানুভূতির কিম্বা আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেই নিহিত আছে। শাস্ত্রবাক্য এ সকল সূত্রের প্রতিষ্ঠা করে না, আত্মপ্রত্যয়ই ইহাদিগকে প্রকাশিত করে শাস্ত্র সর্ব্বদাই স্বানুভূতি বা আত্মপ্রত্যয়ের এই সকল মূল সূত্রকে ধরিয়া আপনার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই জন্যই একদিকে যেমন স্বানুভূতি বা আত্ম-প্রত্যয় সত্যের স্ব-তন্ত্র ও স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য নহে, সেইরূপ অন্যদিকে শাস্ত্রেরও এই প্রকারের কোনও স্ব-তন্ত্র ও স্ব পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য নাই। ইহারা পরস্পরে পরস্পরের সাহায্যে, পরস্পরকে সংশোধিত ও সপ্রমাণ করিয়াই আপন আপন প্রামাণ্য-মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে, শাস্ত্রকে ছাড়িয়া অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে মানব-জাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিয়া স্বানুভূতি আপনার মধ্যে সত্য কতটুকু ও অনুমান কতটুকু ইহার মীমাংসা কিছুতেই করিতে পারে না। আবার স্বানুভূতিকে ছাড়িয়া শাস্ত্রও আপনার সত্য অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ অর্থ মাত্রেই বস্তুগত, শব্দগত নহে। কোনও বস্তুর প্রত্যক্ষ যার হয় নাই, সে বস্তুর কেবল নাম-রূপের বর্ণনা শুনিয়া বা পড়িয়া তাহার পক্ষে কখনওই সে বস্তুর সত্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। এইজন্য সর্ব্বদা জ্ঞাত বস্তুর উপমাদির সাহায্যেই মানুষ অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও পরিজ্ঞাত কমলালেবুর আকারের উপমার দ্বারাই ভৌগোলিকেরা বালক-বালিকাদিগকে এই পৃথিবীর অজ্ঞাত আকারের জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। সেইরূপ প্রত্যেক সাধকের স্বানুভূতিকে অবলম্বন করিয়া তাহার নিজস্ব প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বারাই

ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারের অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকে। এইরূপে স্বানুভূতিকে ছাড়িয়া শাস্ত্রের সার্থকতা সম্পাদিত হয় না; শাস্ত্রকে বর্জ্জন করিয়াও স্বানুভূতির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয়ানমণ্ডলী একদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও, অন্যদিকে স্বানুভূতির প্রামাণ্য-মর্য্যাদাও রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক খৃষ্টীয়ান্ সাধককে তাঁর বিচার-বুদ্ধির অনুযায়ী শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিবার অধিকার দিয়াছেন। এই অধিকারকেই ইংরেজীতে right of private judgment (রাইট্ অব্ প্রাইভেট্ জজ্‌মেণ্ট) বলে।

কিন্তু এই অধিকারে কার্য্যতঃ স্বানুভূতিতেই শাস্ত্রের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করে এবং শাস্ত্রপ্রামাণ্যকে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির অধীন করিয়া প্রকৃতপক্ষে সত্য-নির্ণয়ে স্বানুভূতির সঙ্গে শাস্ত্রের যে একটা সমকক্ষতা আছে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে। মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য অপেক্ষা হীনতর নহে। কিন্তু অন্ততঃ তারই সমান। ইংরেজীতে এই দ্বিবিধ প্রামাণ্যকে পরস্পরের সঙ্গে Co-ordinate মাত্র বলা যায়, ইহার একটীকে অপরের subordinate বলা যায় না। কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট মণ্ডলী যে ভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহাতে স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের এই Co-ordinate সম্বন্ধ বা সমকক্ষতা রক্ষা পায় না। এইজন্যই এই বিষয়ে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয়ান্ সিদ্ধান্ত আধুনিক যুগের যুক্তিবাদের সমক্ষে বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারিল না। প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের right of private judgment যুক্তিবাদীদিগের ব্যক্তিগত স্বানুভূতিরই নামান্তর মাত্র। আর শাস্ত্র বা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যকে আপনার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য যদি ব্যক্তিগত অনুভূতির সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে এই স্বানুভূতিই সত্যের অনন্যপ্রতিযোগী প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, শাস্ত্রের মর্য্যাদা বার্দ্ধক্যের মর্য্যাদার মতন কেবলমাত্র একটা লোকাচারে বা দেশাচারে মাত্র পরিণত হয়। প্রকৃত অধিকার তার কিছুই থাকে না।

আর এই ভাবেই আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজেও এক প্রকারের শাস্ত্র-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা আছে। ব্রাহ্মগণ শাস্ত্র মানেন না যে, তাহা নহে। কিন্তু যে শাস্ত্র বা যে শাস্ত্রের যতটুকু তাঁহাদের স্বাভিমতের সঙ্গে মিলিয়া যায়, বা তাঁহাদের নিজেদের যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমর্থিত হয়, সেই শাস্ত্র বা সেই শাস্ত্রের ততটুই ব্রাহ্মগণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। যেটা বা যেটুকু তাঁহাদের স্বাভিমতের বা যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমর্থিত হয় না, সেটা বা সেটুকু তাঁরা অসত্য ও অপ্রামাণ্য বলিয়া নিঃশঙ্কোচে বর্জ্জন করেন। ইহাকে শাস্ত্র মানা বলা যায় না।

ফলতঃ যেমন য়ুরোপীয় প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয়ান্ মণ্ডলীমধ্যে সেইরূপ আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সমাজেও এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের সত্য প্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অন্য পক্ষে গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্মেও শাস্ত্র-প্রমাণ যে স্ব-তন্ত্র ও স্ব-পর্য্যাপ্ত নহে, এ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মগণ যে ভাবে শাস্ত্রবর্জ্জিত স্বানুভূতিকেই সত্যের একমাত্র প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন, গতানুগতিক হিন্দু সমাজও সেইরূপ স্বানুভূতিবর্জ্জিত শাস্ত্রকে সত্যের অনন্তপ্রতিযোগী প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দিয়া আসিয়াছেন। স্বানুভূতি এবং শাস্ত্র আপন আপন প্রামাণ্যের জন্য যে পরস্পরের অপেক্ষা রাখে, হিন্দুর মীমাংসায় ও সাধন-তত্ত্বে ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু গতানুগতিক হিন্দুর চিন্তাতে এই কথাটা ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হইলে, হিন্দু-সমাজের অসঙ্গত শাস্ত্রানুগত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ ভাবে স্বানুভূতিকে সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা পাইতে হইত না। ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা প্রতিবাদের মুখেই জন্মগ্রহণ করে। ইহা একটা প্রতিবাদী বা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম। আর প্রতিবাদ সর্ব্বদাই সত্যের একদেশ মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। হিন্দুর ঐকান্তিক ও অসঙ্গত শাস্ত্রানুগত্যের প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই ব্রাহ্মগণ স্বানুভূতিকে আশ্রয় করেন। কেবল স্বানুভূতি-আশ্রয়েই এই অসঙ্গত শাস্ত্রানুগত্যকে নষ্ট করিতে পারা যায়। ইহার আর অন্য অস্ত্র নাই। কিন্তু এইভাবে স্বানুভূতিকে সত্যের শ্রেষ্ঠকে প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, ব্রাহ্ম-সমাজ স্বানুভূতির অধিকারের ও প্রামাণ্যের যে একটা সীমা আছে, এ কথা ভুলিয়া গেলেন। গতানুগতিক হিন্দু যেমন শাস্ত্র-প্রামাণ্যের স্বাভাবিক সীমাকে ছাড়াইয়া গিয়া ধর্ম্মকে যুক্তি-বিচার-বর্জ্জিত প্রাণহীন ও অর্থহীন ক্রিয়াকলাপে পরিণত করিয়াছিলেন, প্রতিবাদী ব্রাহ্মও সেইরূপ স্বানুভূতি-প্রামাণ্যের স্বাভাবিক সীমাকে ছাড়াইয়া গিয়া, সত্যকে ও সাধনাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করিলেন। আর উভয় পক্ষের এই এক-দর্শিতার জন্যই এ পর্য্যন্ত হিন্দু-ব্রাহ্মের বিবাদের কোনও একটা প্রশস্ত মীমাংসার পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। একদিকে গতানুগতিক হিন্দু, আর অন্যদিকে মামুলী ব্রাহ্ম, ইহাদের কেহই এ পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকৃত প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা যে কোথায় তার সন্ধান করিতে পারেন নাই।

নব্য ব্রাহ্মের এই অক্ষমতা মামুলীয় হইলেও, প্রাচীন হিন্দুর ইহা কিছুতেই মার্জ্জনীয় নহে। কারণ হিন্দুর সাধনা ও সিদ্ধান্ত অতি পুরাতন কালেই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকৃত প্রামাণ্যের পথ আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দুর প্রমাণ-শাস্ত্রই ইহার সাক্ষী। আধুনিক য়ুরোপীয় প্রমাণ-শাস্ত্র বা লজিক্ সত্যের দ্বিবিধ প্রমাণ-মাত্র স্বীকার করে :—এক প্রত্যক্ষ এবং অপর অনুমান ও উপমান। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকেই আধুনিক য়ুরোপীয় প্রমাণ-শাস্ত্র সত্যের মূল প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করে। অনুমান ও উপমান—deduction এবং induction—এই প্রত্যক্ষের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষের আশ্রয়েই কার্য্য করে। য়ুরোপীয় প্রমাণ-শাস্ত্রের সঙ্গে হিন্দুর প্রমাণ-শাস্ত্রের এ পর্য্যন্ত কোনও বিরোধ নাই। হিন্দুর প্রমাণ-শাস্ত্রও প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমানকে প্রমাণ-মধ্যে গণনা করে। আর হিন্দুও এখানে প্রত্যক্ষ বলিতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বোঝেন এবং এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরেই যে, অনুমান-উপমানাদির প্রতিষ্ঠা হয়, ইহাও স্বীকার করেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর একটা প্রমাণও আছে—হিন্দু তাহাকে

আগম বলে। পুরাতন য়ুরোপীয় প্রমাণ-শাস্ত্রও আগমের বা Revelationএর প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনায় কার্য্যতঃ সে প্রামাণ্য লোপ পাইয়াছে। আর যে সকল লোকে Revelation এর প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁরাও এই প্রামাণ্যের সত্য মর্ম্ম গ্রহণ করেন বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টীয়ান যাকে Revelation বলেন, হিন্দু তাকেই আগম বলেন। তবে আগম কি ভাবে ও কোন্ যুক্তিতে প্রত্যক্ষের সমকক্ষ প্রামাণ্য লাভ করিয়াছে, হিন্দু-মীমাংসা যেরূপে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, খৃষ্টীয়ান্-দর্শনে সেরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে কি না সন্দেহ।

হিন্দুর প্রমাণ-শাস্ত্র বলে, প্রত্যক্ষ যেমন স্বতঃপ্রামাণ্য, আগমও সেইরূপই স্বতঃ-প্রামাণ্য। প্রত্যক্ষের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণান্তরের কোনও অপেক্ষা থাকে না, থাকিতে পারে না। চক্ষে আমি যে রূপ দেখি, কর্ণদ্বারা যে শব্দ শ্রবণ করি, রসনায় যে রস আস্বাদন করি ও ত্বকের দ্বারা যে স্পর্শ লাভ করি, আমার দৃষ্টি, শ্রুতি প্রভৃতিই তার চূড়ান্ত প্রামাণ্য, আমি যা দেখিতেছি বা শুনিতেছি, অপরে তার সাক্ষ্য দিতে পারে না। অপরে যদি তাহা নাও দেখে তথাপি আমার দৃষ্টি অসিদ্ধ হইবে না। আমি এই প্রত্যক্ষ্যের উপরে যে সকল অনুমানের প্রতিষ্ঠা করিয়া সে অনুমান-জড়িত অনুভূতিকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাই, তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নাই; কিন্তু মূল প্রত্যক্ষ আপনি আপনার প্রামাণ্য। আর এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ যেমন আপনি আপনার প্রমাণ, সেইরূপ আগমও আপনি আপনার প্রমাণ—প্রমাণান্তরের দ্বারা আগমের সাক্ষ্য কদাপি সমর্থিত হয় না ও হইতেই পারে না। প্রত্যক্ষ এবং আগম দুই একজাতীয় সমকক্ষ প্রমাণ।

আর হিন্দু যে এই কথা বলেন, ইহার অর্থ এই যে, তার চক্ষে আগমও প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তাহাও এক জাতীয় প্রত্যক্ষই বটে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আর আগম অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ এইমাত্র। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে, অর্থাৎ জগতের রূপরসাদির সাক্ষাৎকারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষের যে অপরোক্ষ অনুভূতি জন্মে, তাহাকেই প্রমাণ-শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ বলে। এই অপরোক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া অনুমান-উপমানাদির সাহায্যে যে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত বটে, কিন্তু তাহা গৌণ প্রমাণ, মুখ্য-প্রমাণ নহে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-রাজ্যে এই অপরোক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই প্রত্যক্ষ একমাত্র স্ব-তন্ত্র ও এখানে স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। সেইরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের বিবিধ সত্যের ও সম্বন্ধের অপরোক্ষ অনুভূতির উপরেই আগমের প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মতন এই অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বা আগমেরও একটা স্ব-তন্ত্র ও স্ব-পর্য্যাপ্ত প্রামাণ্য আছে। এই ভাবেই হিন্দুর প্রমাণ-শাস্ত্র আগমের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, মানবের যাবতীয় অভিজ্ঞতা কি কেবল এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-রাজ্যেই আবদ্ধ, না তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয়াতীত

চিৎরাজ্যের যথাযথ জ্ঞানলাভ করাও সম্ভব? যারা অতীন্দ্রিয়-বিষয়ের অস্তিত্ব বা সত্য স্বীকার করে না, তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ এবং এই প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত অনুমান-উপমানাদির অতিরিক্ত কোনও প্রমাণান্তরের প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের চার্ব্বাকেরা ইন্দ্রিয়াতীত কোনও কিছুতে বিশ্বাস করিতেন না, সুতরাং তাঁহারা নিঃসাধ্যকারেই আগমের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় জড়বাদও অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সুতরাং আধুনিক জড়বাদীও নিঃশঙ্কোচেই আগমের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু যাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত চিৎরাজ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; মানুষের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্ভব ও সত্য বলিয়া মনে করেন, তাঁদের পক্ষে আগমে বিশ্বাস করা একান্তই অপরিহার্য্য। আগমে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে অবিশ্বাস করিলে তাঁহাদের আস্তিক্যের আর কোনও ভিত্তি থাকে না।

এই আস্তিক্য-কথা আমাদের শাস্ত্রের ও সাধনার একটা বিশেষ কথা। অন্য দেশের শাস্ত্র-সাধনায় ইহার অনুরূপ কোনও কিছু আছে বলিয়া জানি না। অতীন্দ্রিয় সত্তা বা সত্য আছে এই প্রতীতিকেই আমাদের শাস্ত্রে আস্তিক্য বলে। সচরাচর যাহাকে ঈশ্বর-বিশ্বাস বলে, তাহা আর আস্তিক্য এই জন্য ঠিক একই কথা নহে। কপিল ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ বলিয়াও কখনই নাস্তিক পদবী প্রাপ্ত হন নাই। পাতঞ্জলির যোগ-সূত্র ঈশ্বর স্বীকার করে বলিয়া সে-শ্বর সাংখ্য নাম পাইয়াছে। কপিল ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়াছেন বলিয়া, সাংখ্য-দর্শনানিরীক্ষ্য আখ্যা পাইয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য-দর্শন ও পাতঞ্জল-দর্শন এই সূত্রের কোনটাই নাস্তিক্য অপবাদ প্রাপ্ত হন নাই। আমাদের দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল চার্ব্বাকেরাই নাস্তিক্য নাম পাইয়াছেন। আর ইহার অর্থ এই যে, সাংখ্য নিরীশ্বর হইয়াও অতীন্দ্রিয়-সত্তা বা সত্য যে আছে ইহা অস্বীকার করেন নাই। সাংখ্য ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ, বলিয়াও আগমের প্রামাণ্য মানিয়াছেন। আর এই জন্যই সাংখ্য-দর্শন চার্ব্বাক-দর্শনের মতন নাস্তিক্য-বিশেষণে বিশিষ্ট হয় নাই। আমাদের শাস্ত্র-সাধনায় যাঁরা কেবল ঈশ্বর মানেন না, তাঁদের নাস্তিক বলে না। আস্তিকও ঈশ্বর না মানিতে পারেন। এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের এবং এই প্রত্যক্ষপ্রচলিত অনুমান-উপমানাদির দ্বারা যতটুকু আপাত ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তার অতীত ও তাহা হইতে ভিন্ন একটা বিশাল অতীন্দ্রিয় রাজ্য আছে, যাঁরা ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁরাই আস্তিক। অর্থাৎ নাস্তিক আর নিরীশ্বর আমাদের ভাষায় এক কথা নহে। জড়বাদীই কেবল আমাদের দেশে নাস্তিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফলতঃ আধুনিক কালে সচরাচর যাহাদিগকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন বলিয়া লোকে আস্তিক বলিয়া গ্রহণ করে, আমাদের শাস্ত্রীয় অর্থে তারা সকলে আস্তিক্য-মর্য্যাদার অধিকারী কি না, ইহা সন্দেহেরই কথা। ইহাদের অনেকেই যে ভাবে, যে যুক্তি ও বিচার অবলম্বনে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে তাঁহাদের আস্তিক্য প্রমাণিত হয় না। ইহারা আগমে বিশ্বাস করেন না।

প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমানাদি প্রমাণের উপরেই উহাদের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হইলেও এই সাকার ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি জগতের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়াই তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ যে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা ঠিক অতর্কপ্রতিষ্ঠ তত্ত্ব নহে। মানবের অন্তর্নিহিত আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞান যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করে, এবং মানব-বুদ্ধি বিশ্বরচনায় যে অদ্ভুত উপায়-উদ্দেশ্যের যোগাযোগ দেখিতে পায়, আর মানব-অন্তরে যে স্বাভাবিক শ্রেয় ও প্রেয়ের বোধ আছে বলিয়া সে ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ হয়। মানব-প্রকৃতির এই ত্রিবিধ অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়াই উনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ গুরুশাস্ত্রবর্জ্জিত এই আধুনিক ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইংরেজিতে ইহার প্রথমটীকে argument from causation, দ্বিতীয়টীকে argument from design, এবং তৃতীয়টীকে argument from moral intuitions of mankind and the moral government of the world বলে। আর এই ত্রিবিধ যুক্তিই ঠিক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক তারই সঙ্গে যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এই ঈশ্বর-তত্ত্বে বিশ্বাস করিবার জন্য আমাদের প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধিই যথেষ্ট। ইহার জন্য কোনও প্রকারের সত্য অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হয় না। আমার মনে হয় সাংখ্যকার এই ঈশ্বর-তত্ত্বকেই অসিদ্ধ বলিয়াছেন। এ তত্ত্ব যে অতর্ক-প্রতিষ্ঠ নহে, ইহাই বা অস্বীকার করা যায় কি? এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমানাদিই যথেষ্ট, ইহার জন্য আগমের শরণাপন্ন হইতে হয় না। এই কারণেই এই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করাও অপরিহার্য্য নহে। যুক্তিতর্কের দ্বারাই যথাসম্ভব ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। জড়-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানাদির আলোচ্য বিষয়ে এই সকল বিজ্ঞানের শাস্ত্র বা মানব-জ্ঞানের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার লিপিবদ্ধ বিবরণ যতটা প্রামাণ্য-মর্য্যাদার দাবী করিতে পারে, ধর্ম্মজীবনের সত্যাসত্য নির্ণয়ে ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল তদপেক্ষা বেশী প্রামাণ্য-মর্য্যাদার দাবী করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের একান্ত বহির্ভূত কোনও চিৎরাজ্য যদি থাকে, তাহা হইলে এই প্রত্যক্ষের এবং এই প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত অনুমান-উপমানাদির প্রমাণ ত সে ক্ষেত্রে কিছুতেই প্রযুক্ত হইবে না। এবং সে রাজ্য সম্বন্ধে অস্তি নাস্তি কোনও কথাই বলিতে পারিবে না। সেই রাজ্যের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, অন্যবিধ সাধন অবলম্বন ও তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেই অন্যবিধ প্রামাণ্যের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। হয় এই সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত—আর মন পর্য্যন্ত যে এখানে ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহার স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে—কোনও কিছু নাই, ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং সে অবস্থায় আগম অস্বীকার করাতে কোনও ক্ষতি নাই। আর না হয় ইন্দ্রিয়াতীত সত্য আছে, আমাদের

বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় উভয়বিধ ইন্দ্রিয় যে বস্তুর সাক্ষ্যলাভ করে না ও করিতে পারে না, এমন সদ্বস্তু আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। এবং সে অবস্থায় এই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিকারের বহির্ভূত কোনও প্রামাণ্যও স্বীকার করা একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আমাদের প্রমাণ-শাস্ত্র এই ইন্দ্রিয়াতীত সত্যে বিশ্বাস করে বলিয়াই প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমানের অতিরিক্ত আগম বলিয়া আর একটা প্রমাণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর যে যুক্তিবলে এই আগমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আস্তিক্য-বুদ্ধিকে একান্তভাবে পরিহার না করিয়া সে যুক্তিকে অগ্রাহ্য বা বর্জ্জন করা সম্ভব নহে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মেঘনা-দর্শনে

যেই কালে ধান্য ভরা পুণ্য বাঙ্গালায়
নীলকর বিষধর বিষপোড়া মুখ
বুনেছিল নীলক্ষেত্র-বাণিজ্য আশায়
অনল শিখায় ফেলি কৃষকের সুখ ;
সেই কালে, একদিন, পড়ে কি গো মনে
ভীষণ-তরঙ্গ নদ ! উদরে তোমার
গ্রাসিতে আসিয়াছিলে বিকট-বদনে,*
দীনের বন্ধুত্ব হেতু জনম যাহার।
যেই শিশু-করে হবে দুষ্টের দমন,
তাহারে বক্ষেতে ধরে যেই ভাগ্যবান্,
কেমনে নাশিবে তারে আসন্ন শমন,
উপেক্ষিয়া নিয়তির আদিষ্ট বিধান।
তাই তব জল হ'তে হইল উদ্ধার,
নীলদর্পণের জ্যোতি নাশিতে আঁধার।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

---

* "দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন, হঠাৎ নৌকা জলমগ্ন হইতে লাগিল, দীনবন্ধু নীলদর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন।"—বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধুজীবনী।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

এখন দেশীয়েরা সর্ব্বদাই বলেন যে ইংরাজেরা তাঁহাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন না, অন্ততঃ সমভাবে দেখেন না, একটু দূরে রাখেন, কথাটা কতদূর সত্য আমি জানি না ; কিন্তু উপযুক্ত লোককে তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, এমন কি আপনাদের ভিতরের লোক বলিয়া টানিয়া লন। জগদীশ বাবু, যে কোন কর্ম্মচারীই হউন (ডিভিসনাল কমিশনার, কিম্বা ইন্‌স্পেক্‌টার জেনারেল, পুলিস, কিম্বা অপর উচ্চপদস্থ সাহেব) তাঁহাকে রিটারন্ ভিজিট না দিলে, তিনি তাহার সহিত আর মিলিতেন না।

ত্রিপুরায় জগদীশ বাবু কিছু দিন ছিলেন, সেথানকার কলেক্‌টার জোনস্ সাহেব, জজ গেভিদ সাহেব এবং অপরাপর সাহেবেরা উঁহাকেই নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু কথন মিষ্টার রমেশচন্দ্র দত্তকে করিতেন না ; রমেশচন্দ্র ওথানে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং বাসাবাড়ী না পাওয়াতে, জগদীশবাবুর বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন। একদিন জোন্‌স সাহেবকে জগদীশবাবু বলিলেন "দেখুন, আপনারা আমাকে নিমন্ত্রণ করেন. রমেশচন্দ্রকে করেন না, এ বড় অন্যায় কথা, রমেশ আপনাদের সিভিল-সার্ভিসভুক্ত, আর আমার বাসায় থাকেন, এমত স্থলে তাঁহাকে বাদ দেওয়া নিতান্ত গর্হিত।" জোন্‌স সাহেব উত্তরে বলিলেন, "রমেশ ছেলে মানুষ, সে বুড়ার দলে আসিয়া সুখ পাবে না, তাই তাঁহাকে আমরা আহ্বান করি না।" জগদীশবাবু বলিলেন, "সে যাই হোক, এখন তাহাকে আহ্বান করিতে হইবে।" সেই দিন হইতে রমেশবাবু ইংরাজ-দলে মিশিতে সক্ষম হইলেন। একদিন সাহেবেরা আমোদ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের দেশীয় বস্ত্র পরিয়া আসিতে হইবে।" জগদীশবাবু বলিলেন, "আমাদের কোন আপত্তি নাই, মহিলারা (লেডিস্) না বিরক্ত হয়েন। তাঁহাদের মত লওয়া হইয়াছে জানিয়া, ইঁহারা ধুতি, চাদর, সার্ট পরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন, মিষ্টার দত্তের ধুতি কিম্বা চাদর সঙ্গে ছিল না। জগদীশবাবু সে সব তাঁহাকে দিলেন। রমেশবাবুর তখন বয়স অল্প, ধুতি চাদর পরিয়া কার্ত্তিকটি সাজিয়া যেন কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া, তিনি যখন সাহেবদের দলে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার সেই লজ্জা-লোহিত তরুণ-মূর্ত্তি দৃষ্টে সাহেবমেম-মহলে বেশ একটু স্ফূর্ত্তির স্ফুরণ অনুভূত হইয়াছিল। রমেশ বাবুকেও সে দিন বাঙ্গালী পোষাকে, সেই দলে বেশ মানাইয়াছিল। বাঙ্গালীকে হ্যাটকোট বা চোকা-চাপকান অপেক্ষা যে ধুতি চাদরে অধিক মানায়,সে দিন তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় তুলনায় সমালোচনা করিবার জন্যই সে দিন এ অনুরোধ করা হইয়াছিল।

অলৌকিক কথার উল্লেখ আমরা সহজে করিতে চাহি না, কিন্তু নিম্নে যে ঘটনাটি বিবৃত হইতেছে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক ভদ্রলোকে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এক দিন খুব গরমের সময়, দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া

গিয়াছে, জনপ্রাণীও ঘরের বাহিরে নাই, রৌদ্রতাপ যেন যথার্থ গ্রাস করিতে আসিতেছে, এমন সময়ে একটা নগ্না স্ত্রীলোক, একটা বালকের ছোট হাত একখানি কামড়াইতে কামড়াইতে তমলুক সহরের সমস্ত রাস্তা পর্য্যটন করিতেছিল, যারা তাকে হঠাৎ দেখিয়াছে, তাহারা ভয়ে গৃহের ভিতর পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে, মূর্ত্তি যেমন ভীষণ, তেমনি বিকটাকার। যেদিন এই ঘটনা হইল, তাহার পরদিন হইতে ভয়ানক ওলাউঠা রোগ তমলুকে দেখা দিল, যথেষ্ট মানুষ মরিতে লাগিল, হাহাকার উঠিল, তখন সকল ভদ্র-লোক একত্রিত হইয়া জগদীশবাবুর নিকট যাইলেন, এবং ঘোর বিপদের সময়, কি করা আবশ্যক, তাহার পরামর্শ করিলেন। জগদীশ বাবু বলিলেন, "এ ঘোর দুর্দ্দিনে—মহামারীর সময়, সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদন ব্যতীত আর কে আছেন, সকলে সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে, তাঁহার পবিত্র নাম লও, সকল বিপদ আপদ চলিয়া যাইবে। সঙ্কীর্ত্তনের সুরে একটি গান বাঁধিয়া দিলেন, ইতর-ভদ্র সকল লোক, নগ্ন পদে, সেই গান গাহিতে লাগিল। সুর সেই হরিম চরণে গিয়া মিশিল, তিন দিন কীর্ত্তনের পর, ব্যাধি একেবারে জল হইয়া গেল; লোকে আনন্দে আপ্লুত হইল, এবং জগদীশ বাবুর যশোকীর্ত্তন করিতে লাগিল। তমলুক মহকুমার লোকেরা জগদীশবাবুকে এত শ্রদ্ধা করিত যে, ট্যাঙ্গরাখালি হাটের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "জগদীশগঞ্জ" রাখিলেন, এখনও জগদীশগঞ্জ রহিয়াছে, এটি টাউনের একটি বড় হাট।

বালেশ্বরের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় এইখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। জগদীশবাবু বালেশ্বর জেলার কার্য্য লইয়াছেন মাত্র, এমন সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া কাছারিতে যাইতে পারেন নাই। বাটীতেই আফিস হইতেছিল, সেরেস্তাদার একটি রিপোর্ট পাঠ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, জগদীশ বাবুর জেলায় যাইবার পর ছয় মাস পূর্ব্বে বালেশ্বর থানার একজন কনেষ্টবল রোঁদ দিয়া থানায় ফিরিবার সময় দেখিল, একটা লোক পাকা দেওয়ালে সিঁদ দিয়া একটা গর্ত্ত ফুটাইয়াছে, এবং ঐ গর্ত্তের ভিতর পা গলাইয়া দেখিতেছে যে, প্রবেশ করিবার কোন প্রতিবন্ধক আছে কি না; জ্যোৎস্নার সামান্য আলোক ছিল, কিন্তু কনেষ্টবল সকলই দেখিতে পাইল, দেখিয়া সে দৌড়াইয়া গিয়া সে লোককে ধরে এবং চীৎকার করিয়া বলে "বাটীতে কে কোথায় আছ, ছুটিয়া আইস, তোমাদের দেয়ালে চোর সিঁদ দিয়াছে এবং তাহাকে আমি ধরিয়াছি, শীঘ্র আইস বিলম্ব করিও না।" কোন লোক উপস্থিত হইবার আগে চোর নিজ হস্তস্থ সিঁদকাঠি দিয়া কনেষ্ট-বলের বক্ষে জোরে আঘাত করিল, কনেষ্টবল চোর ছাড়িয়া দিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল, এই অবকাশে চোর পলায়ন করিল, কনেষ্টবল পড়িয়া রহিল। বাটীর লোকজনেরা যখন অকুস্থানে পৌছিল, তখন দেখিল, কনেষ্টবল সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে, ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত তীব্রবেগে ছুটিতেছে, কনেষ্টবলের জ্ঞান ছিল, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি ছিল না; তাহাকে ধরাধরি করিয়া নিকটবর্ত্তী থানাতে লইয়া যাওয়া হইল, রক্তস্রাব বন্ধ হইল না, কনেষ্টবল মরিয়া গেল, তাহার মৃতদেহ সিভিল

সার্জ্জনের পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইল, সাহেব রিপোর্টে লিখিলেন যে সিঁদকাঠির মত অস্ত্র দ্বারাই এ লোকটা সম্ভবতঃ আহত হইয়াছে, ক্ষতস্থান দেখিলে বোধ হয়, লোকটা ধস্তাধস্তি করিয়াছে, আর মৃত্যুর কারণ—অযথা রক্তপাত। এই ঘটনার পর কোথায় সে চোর এবং খুনে, তাহার সন্ধান হইতে লাগিল, স্থানীয় সব্‌ইন্‌স্পেক্‌টার, ডিভিসনাল ইন্‌স্পেকটার অণ্ডার উড সাহেব, টম্‌সন পুলিস সাহেব, অবশেষে স্বয়ং কলেক্টার বীম্‌স সাহেব ইহার তদন্ত করিয়াছেন, কিন্তু কিছু করিতে পারেন নাই। জগদীশ বাবুর নিকট যখন এই নথি পঠিত হইল, তখন সেরেস্তাদার ইহাতে মামুলি হুকুম লিখিয়া আনিয়াছে, "সেরেস্তাবাসদ্" অর্থাৎ ফাইল কর। জগদীশ বাবু কাহাকে সঙ্গে না লইয়া একাকী বালেশ্বরে গেলেন, মাঠে রাখাল বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন রে, তোদের দেশে, এমন একটা খুন হইয়া গেল আর তোরা দেশের লোক সব নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছিস্।" তাহারা উত্তর করিল "আমরা কি করিব, দারোগা বাবু ইহার মধ্যে আছেন, কার সাধ্য কেহ কথা কয়।" জগদীশ বাবু উত্তর করিলেন "তাহা আমি জানি" এবং অনুসন্ধানে জানিলেন যে বাটীতে সিঁদ হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়, উহা একজন ধনাঢ্য হিন্দু বিধবার সম্পত্তি, বিধবার অল্প বয়স এবং পুরুষ অভিভাবক কেহ ছিল না, স্ত্রীলোকটীর চরিত্রও ভাল ছিল না, তাহার নিকট দারোগা এবং মৃত কনেষ্টবল যাইত; এই জন্য দুইজনের মধ্যে মনোবিবাদ হয়, দারোগার উত্তেজনায়, বাটীর চাকর-চাকরাণীর সহায়তায় তাহাকে মারা হয়, দারোগা নাথি মারিয়া কনেষ্টবলকে ভূমে পাতিত করিলে, কাপড় চাপিয়া তাহার মুখ বন্ধ করা হয় এবং একটা সরু যন্ত্রের দ্বারা বক্ষে আঘাত করা হয়। যখন রক্তস্রাবে তাহার বাকরোধ হইল, তখন উহাকে বাহিরে ফেলিয়া, দেয়ালে একটা সিঁদ কাটা হয় এবং আপনারা চেঁচাচেঁচি করে "চোর ধরেছি, তোমরা এস।" দারোগা এমন ছাপাইয়াছিল যে, সহজে এ কথা প্রকাশ হইত না, কিন্তু ভগবানের প্রসাদে, সব প্রকাশ হইয়া গেল, এবং সমস্ত দোষী ব্যক্তিরা, মায় দারোগা পর্য্যন্ত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে, শাস্তি ভোগ করিতে লাগিল। জগদীশ বাবুর খুব সুখ্যাতি হইল এবং সাধারণে আশ্চর্য্য হইয়া, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এক দিন বালেশ্বর জেলার সকল ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ, সব্‌রেজিষ্ট্রার, পোষ্ট-মাষ্টার, বিদ্যালয় এবং পুলিসের ইন্‌স্পেকটার প্রভৃতি একত্রিত হইয়া জগদীশ বাবুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এ ঘটনা সম্বন্ধে আমরা সব জানি, আমাদের কাহার এ খুন বলিয়া ধারণা হয় নাই, আপনার সন্দেহ কিসে হইল?" জগদীশ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "দেখ, ৩০ বৎসর সরকারী কর্ম্ম করিতেছি, পুলিসেও আসিয়াছি বিশ বৎসরের অধিক, এমন থয়ের খাঁ কনেষ্টবল দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই। যে রাত্রে রোঁদ দিতে বাহির হয়, সকলেই একটা আড্ডায় গিয়া ঘুমায়। ধর, কনেষ্টবলটার ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, সে কর্ত্তব্যপরায়ণ তা রোঁদে না হয় বাহির হইল, কিন্তু চোর ধরিতে কোন মতেই সাহসী হইবে না, তফাৎ হইতে চেঁচাচেঁচি করিতে পারে, সাহসের পরাকাষ্ঠা

দেখাইয়া চোর ধরা নিতান্ত অসঙ্গত ও কল্পিত বলিয়া বোধ হইল, আর যখন জানিলাম বাটীর কর্ত্রীটি বিধবা, ধনশালিনী ও মন্দচরিত্রের, তখন সন্দেহ ঘনীভূত হইল, তার পর যখন দারোগার এবং কনেষ্টবলের ওখানে গতিবিধি আছে জানিলাম, তখন তমসাচ্ছন্ন আকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল, সকল কথাই বুঝিতে পারিলাম।" সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া এক বাক্যে বাবুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বালেশ্বর হইতে জগদীশবাবু দিনাজপুরে বদলী হন, সেখানে পুলিসের ও দুর্ভিক্ষের— উভয় কর্ম্মই কিছুদিন করিয়াছিলেন। তৎপরে কেবল দুর্ভিক্ষের কার্য্য করেন। রামগঞ্জ বলিয়া একটি সামান্য গ্রাম, দুর্ভিক্ষের প্রসাদে ছোট সহরে পরিণত হইল, বড় বাঙ্গালা, তাঁবু, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চা'লের গোলা এবং শত শত কর্ম্মচারীদের বাসাবাটী লক্ষিত হইল, ইহা একটি সবডিভিসন হইল এবং সবডিভিসনের অধীনে ৬।৭টি সারকেল হইল, জগদীশবাবু সবডিভিসনের কার্য্য পাইলেন এবং সারকেল অফিসার হইলেন' বিখ্যাত স্যার কে, জি, গুপ্ত, খ্যাতনামা বম্বে সিভিলিয়ান পল্যান সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ-কর্ম্মচারী। সারকেল অফিসারেরা, অবকাশ পাইলেই, জগদীশ বাবুর নিকট থাকিতেন এবং এক বৃহৎ তাম্বুতে আসিয়া বসবাস করিতেন। রিলিফ কমিশনার ছিলেন সিভিলিয়ান মর্লনি সাহেব, তৎপরে রবিনসন্ সাহেব, ডিষ্ট্রীক্ট অফিসার ছিলেন লাউস সাহেব—যাঁহার নামে দার্জ্জিলিং লাউস স্যানিটেরিয়ম্ হইয়াছে। সাহেবদের জগদীশবাবুর উপর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, একটা উদাহরণ দিই। পল্যান সাহেব বাঙ্গালী কেরাণীদিগের উপর বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে গালি দিয়াছিলেন, তাহাকে একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সাহস করিয়া বলিয়াছিল— "বাঙ্গালী জাতিকে গালি দিতেছেন, কিন্তু জগদীশবাবু ত ঐ বাঙ্গালী জাতিভুক্ত।" তাহাতে সাহেব উত্তর করিলেন, "Dont mention Juggodish Babu. He is heaven-born." আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, ওয়েষ্টমেকট নামক একজন সিভিলিয়ান সাহেব রিলিফ-কমিশনারের পারসন্যাল এসিষ্টাণ্ট ছিলেন, ইনি জগদীশ বাবুর চারি মাসের ২০০ টাকা করিয়া মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন, বলিলেন যে, "আপনি চারিমাস পুলিসের কার্য্য করিয়াছেন, আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং ঐ চারি মাসের ভাতা আপনি পাইতে পারেন না।" জগদীশবাবু উত্তর করিলেন, "যে তারিখ হইতে গবর্ণমণ্ট তাঁহাকে ডিপিয়ুট করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তিনি যে কোন কর্ম্মই করুন না, দুইশত টাকা মাসিক ভাতা পাইবার দাবী তাঁহার আছে। সাহেব টাকা দিলেন না, সুতরাং জগদীশবাবু কলিকাতায় আসিয়া এ কথা চিফ সেক্রেটারী বারনার্ড সাহেবকে জানান. বারনার্ড সাহেব টাকা পাঠাইবার জন্য ওয়েষ্টমেকটকে লিখিলেন, তিনি টাকা না পাঠাইয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তর্ক করিতে গেলেন, তাহাতে বারনার্ড সাহেব বিরক্ত হইয়া লিখিলেন, "তুমি পত্র পাঠ, নিজের খরচে এই টাকা পাঠাইবে, যদি না পাঠাও, তবে তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য যে জগদীশবাবু

কলিকাতায় বসিয়া টাকাটি সত্বর পাইলেন। দিনাজপুর দুর্ভিক্ষে সুচারুরূপে কার্য্য করার জন্য, জগদীশবাবু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সুখ্যাতি ও ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। কলিকাতায় ড্যাম্‌পিয়ার সাহেব ইঁহাকে বলিয়াছিলেন "You are a Famine hero." দিনাজপুর-দুর্ভিক্ষে অনেক সুবাদার মেজর, সুবাদার, রেসালদার, হাওলদার পল্‌টন হইতে আসিয়া ইঁহার অধীনে কার্য্য করেন, দেশীয় নেটিভ সিভিল-সার্ব্বিস পাশ-করা লোকও তাঁহার অধীনস্থ ছিল, দুই দলকেই তিনি সমভাবে ব্যবহার করিতেন এবং সকলেই তাঁহার সদ্ব্যবহারে তুষ্ট ছিলেন। দিনাজপুর হইতে জগদীশবাবু ত্রিপুরায় যান, এখানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ঢাকা হইতে পর্য্যন্ত নদীতে ডাকাতি আরম্ভ হইল, জেলার পুলিস সাহেবেরা স্থানীয় বদ্‌মায়েসদের চক্ষে চক্ষে রাখিলেন, কিন্তু কোন ফল ফলিল না, ডাকাতি সমভাবে চলিতে লাগিল। ছোটলাট ইডেন সাহেব অত্যন্ত তম্বি-তাগাদা আরম্ভ করিলেন, জেলার সাহেবেরা নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। জগদীশ বাবু অনেক বিবেচনা করিয়া, স্থির করিলেন যে, এ ডাকাতি সরকারী লোকের কৃত এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য কি না জানিবার জন্য তিনি একজন ইন্‌স্পেকটারকে নিযুক্ত করিলেন, আর তাহাকে বলিয়া দিলেন ঢাকা হইতে সিলেটে নদী দিয়া যে ডাক-বোট যায়, সেই বোট-ওয়ালাদের এই কার্য্য, ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিলে হাতেনাতে ধরা পড়িবে। যে রকম আজ্ঞা দিলেন, সেই রকমই করা হইল, হাতে হাতে সুফল পাইলেন, ডাক বোটওয়ালারা ডাকাতি করিতেছে, এমত অবস্থায় ধরা পড়িল, বিচারে শাস্তি পাইল, ছোট লাট জগদীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন তিনি ত্রিপুরা হইতে দুই বৎসরের ফার্‌লো ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। (ক্রমশ)

আশা

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার অনেক দিনের আকাশ চাওয়া,
আসবে ছুটে দখিন হাওয়া,
হৃদয় আমার আকুল করে
সুগন্ধ ধন লুটবে॥

আমার লজ্জা যাবে, যখন পাব
দেবার মত ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন॥
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তারে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তার টুটবে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Printed by K. C. Chakravarty, Girish Printing Works, 52 Sukea Street, Calcutta.

বঙ্গদর্শন

সম্পাদকের বৈঠক *

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসী

উপস্থিত—বিজয় ও সম্পাদক

বিজয়—দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যাপারটা কি, একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন্ তো। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এমন কি প্রয়াগ ও আগ্রা পর্য্যন্ত এতটা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, ইহার হদিস্ কি, বুঝতে পাচ্ছি না। এদের হঠাৎ এতটা সাহস গজা'ল কিসে? স্বদেশীর সময় তো এরা কিছুই করে নাই, বরং আমাদের আন্দোলনটাকে চাপিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিয়াছিল।

সম্পাদক—কথাটা তো এত কঠিন নয়। তোমাদের স্বদেশী আন্দোলন এদেশের ইংরেজ-রাজপুরুষদের সঙ্গে একটা বিবাদ বাধাইয়াছিল; রাজপুরুষেরা ইহার প্রতিবাদী ছিলেন। কাজেই দূরদর্শী রাজনীতিকেরা এই ভয়াবহ ব্যাপারে লিপ্ত হন নাই।

বিজয়—কিন্তু গান্ধি আফ্রিকায় Passive Resistanceএরই ধ্বজা তুলিয়াছেন তো। আফ্রিকার Passive Resistance আর বাংলার Passive Resistanceএ কোনও বেশ-কম আছে কি?

সম্পাদক—বেশ-কম যে আছে, তা তো চক্ষের উপরেই দেখিতেছ। বাংলার Passive Resistanceএর যাঁরা ঘোরতর প্রতিবাদী ছিলেন, প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ বলিয়া যাঁরা ইহার নিন্দা করিয়াছেন, তাঁরাই যখন দক্ষিণ আফ্রিকার এই Passive Resistanceএর এতটা সমর্থন করিতেছেন, তখন দুই যে এক বস্তু নয়, ইহার প্রমাণ তো হাতে হাতেই পাওয়া যায়।

বিজয়—কথাটা ধর্ত্তে পাচ্ছি না।

সম্পাদক—আচ্ছা, প্রথমে একটা অতি মোটা কথা বলি। দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট আর এদেশের গভর্ণমেণ্ট তো এক নয়। এদেশের গভর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদে সিদিশন হয়, দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদে আইনতঃ কোনও অপরাধ তো

* আশা করি, এ বৈঠক বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বৈঠক বলিয়া কেহই মনে করিবেন না—বঃ সঃ।

হয় না ও হইতে পারে না। সুতরাং ভারতবর্ষে বসিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করাতে কোনও দোষ হয় না, কোনও আপদ-বালাইও নাই।

বিজয়—কিন্তু রিজলী সাহেব নূতন প্রেস্‌-আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিতে যাইয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তা তো আপনার মনে আছে। তাহাতে তো স্পষ্টাক্ষরেই দক্ষিণ-আফ্রিকার হিন্দু-মুসলমান প্রবাসীদিগের অভাব-অভিযোগ লইয়া এদেশে আন্দোলন করিলেও রাজদ্রোহিতা ও পরজাতিবিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। সে সময় তো আমরা সকলেই ভাবিয়াছিলাম এ বিষয়ে আন্দোলন আলোচনা করাও দূষণীয় ও ভয়াবহ। সে দোষটা কাটিয়াছে কিসে?

সম্পাদক—লাট হার্ডিঞ্জের উদার ও দূরদর্শিনী রাষ্ট্রনীতিতে। লাট মিণ্টোর রাজত্বকালে এইভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কিছুতেই সম্ভব হইত না। দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের অপযশে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে স্পর্শ করে না তাও নয়। এই আন্দোলনের দ্বারা দেশে শ্বেতাঙ্গবিদ্বেষ জাগিবার ও বাড়িবার আশঙ্কা যে নাই, এমনও বলা যায় না। কিন্তু তথাপি লাট হার্ডিঞ্জ এ আন্দোলনটাকে চাপিয়া রাখিতে বা পিষিয়া মারিতে চান না। তিনি জানেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, এই সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে যদি ঘননিবিষ্ট করিতে হয়, তবে বুয়র গভর্ণমেণ্টের এই অর্ব্বাচীনতার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। আর বুয়র গভর্ণমেণ্টের এই আত্মঘাতী নীতির সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ও ইংরেজজাতির চেতনাকে ভাল করিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই চেতনাকে ভাল করিয়া জাগাইতে হইলে দক্ষিণ-আফ্রিকার এই অত্যাচারের ফলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ও সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা প্রবল অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে, এটীও প্রমাণ করা আবশ্যক। এইজন্যই লাট হার্ডিঞ্জ এই আন্দোলনকে চাপিয়া রাখিতে চান না, বরং আপনি ইহাতে প্রকাশ্যভাবে ইন্ধন সংযোগ করিয়াছেন।

বিজয়—এটীই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় যারা গভর্ণমেণ্টের আইন ভাঙ্গিয়া আপনাদের স্বত্ব ও অধিকার-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, বড়লাট বাহাদুর মান্দ্রাজের জননায়কদিগের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, কেমন করিয়া যে প্রকাশ্যভাবে তাদের এই বে-আইনী কাজের পোষকতা করিলেন, বুঝিতে পারি না।

সম্পাদক—তুমিই যে কেবল বুঝতে পার নাই তা নয়, বড় বড় রাজনীতিকেরাও ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। যাঁরা নিজেরা বুয়র গভর্ণমেণ্টের এই সংকীর্ণ নীতির প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁরাও লাট হার্ডিঞ্জের এই কাজটা সমর্থন করিতে পারেন নাই। এমন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নীতিজ্ঞ হইয়াও লাট বাহাদুর এমন অদূরদর্শিতার পরিচয় কেন দিলেন, টাইমসের এমন কি ডেইলিনিউজ প্রভৃতি লিবারেল সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণও ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁরা লাট হার্ডিঞ্জের এ কাজটায় প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বিজয়—আমরাও তো এ রহস্যভেদ কর্ত্তে পাচ্ছি না।

সম্পাদক—এটী ভেদ করিতে হইলে লাট হার্ডিঞ্জের সমগ্র সাম্রাজ্যনীতিটীর মর্ম্ম গ্রহণ করা আবশ্যক। যে নীতির দ্বারা বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইয়াছে, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বা Provincial Autonomyর আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীকে কলিকাতা হইতে তুলিয়া দিল্লীতে বসাইবার আয়োজন হইয়াছে এবং লাট মিণ্টো যে দুর্দ্ধর্ষ শাসননীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের অসন্তোষ-বহ্নিকে নিঃশেষ নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, নানা দিকে অলক্ষিতে তার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, যে নীতির ফলে এ সকল হইয়াছে ও হইতেছে—দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ত্তমান বিরোধ সম্বন্ধে লাট হার্ডিঞ্জ মান্দ্রাজে যে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা সেই সাম্রাজ্য-নীতিরই অনুসরণ করিয়াছে। চুটকী রাজনীতি লইয়া যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের পক্ষে এই সূক্ষ্ম, উদার ও সুদূরদর্শিনী-নীতির মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব ও সাধ্যায়ত্ত নহে। যত দেখিতেছি ততই লাট হার্ডিঞ্জ যে আজিকালিকার ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ এই প্রতীতি দৃঢ় হইতেছে

বিজয়—লাট হার্ডিঞ্জ আমাদের অনেকেরই চক্ষে একটা জটিল ও দুর্ভেদ্য সমস্যার মতন হইয়া পড়িতেছেন। আমরা তাঁর কাজকর্ম্মের রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না

সম্পাদক—লাট হার্ডিঞ্জকে বুঝিতে হইলে, প্রথমে, আজকালকার সাম্রাজ্যের আদর্শটাকে ভাল করিয়া বোঝা আবশ্যক। ফলতঃ য়ুরোপের লোকেরা সাম্রাজ্যনীতির জন্য যতই ব্যাগ্র হউক না কেন, সাম্রাজ্যের সত্য তত্ত্বটী এখনও ধরিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যের প্রকৃত মর্য্যাদা ও মূল্যই বা কি, ইহাও য়ুরোপ এ পর্য্যন্ত বোঝে নাই। কেবল পররাষ্ট্রাপহরণের দ্বারা সত্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। বহুবিধ দুর্ব্বলতর জাতিকে প্রবলতর ক্ষাত্র-শক্তির বা পশুবলের দ্বারা আপনার পদানত করিয়া রাখিলেও সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে না। প্রথমে এই ভাবেই অনেকগুলি দেশ ও অনেকগুলি জাতি একটা রাষ্ট্রশক্তির অধীনে আসিয়া পড়িতে পারে; কিন্তু এ সকল দেশ ও জাতিকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে হইলে, ইহাদের পরস্পরের স্বত্ব ও স্বার্থের মধ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করিয়া ইহাদিগকে এক করিতে হয়। এরূপ না করিতে পারিলে, কালক্রমে যে প্রবলশক্তির তাড়নায় তাহারা এক-রাষ্ট্রভুক্ত হইয়াছিল, সেই শক্তি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন যে যেমন পারে সে সেইভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া এই বন্ধনহীন সাম্রাজ্যকে ছারখার করিয়া ফেলে। পুরাকালে মেসিদনীয় সাম্রাজ্য এবং তার পরে রোমের বিশাল সাম্রাজ্য, এই কারণে এবং এই ভাবেই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়ে। রোম অতিবড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও, আপনার অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে কোনওরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহারা সকলে রোমের অধীনতা মাত্রই স্বীকার করিয়া চলিত; কিয়ৎপরিমাণে রোমক রাষ্ট্রীয়-নীতির স্বত্ব-স্বাধীনতাও সম্ভোগ করিত; মোটামুটি রোমের উদার আইন-কানুনের দ্বারা ইহাদের শাসন-সংরক্ষণও পরিচালিত

হইত; কিন্তু তথাপি রোমক-সাম্রাজ্য যে তাহাদের নিজের বস্তু, রোম অঙ্গীরূপে তাহাদিগকে আপনার জীবন্ত অঙ্গ করিয়া যে নিজের সঙ্গে গাঁথিয়াছে এবং এই রোমক-সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপেও এ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যেও যে একটা ঘনিষ্ঠ, জীবন্ত, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, রোমের অধীনস্থ দেশসমূহ এমনটা কখনওই অনুভব করিতে পারে নাই। ইহাদের শাসনশক্তিরই ঐক্য সাধিত হইয়াছিল, স্বার্থের একতা সাধিত হয় নাই। রোমকে ছাড়িয়া ইহাদের আত্মচরিতার্থতালাভ অসম্ভব ও অসাধ্য, রোমক-সাম্রাজ্যাধীন বিভিন্ন ভূভাগ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে অতিশয় হীনবল ও আত্মস্বার্থ-সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়িবে,—আর এইজন্যই যে রোমের স্বার্থের ও শক্তির সঙ্গে ও পরস্পরের শক্তি-স্বার্থের সঙ্গে এ সকল অধীনস্থ রাষ্ট্রের স্বত্ব-স্বার্থ জীবন্তরূপে জড়িত রহিয়াছে, একের অভাবে অপর সকলের ক্ষতি, একের অভ্যুদয়ে অপর সকলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী,—এ ভাবটা রোমক-সাম্রাজ্যের মধ্যে ফুটবার অবসর পায় নাই। চূণ-শুরকীর গাঁথুনী না বাঁধিয়া, কেবল কতকগুলি ইঁট ও কাঠ একটা বিশাল এমারতের আকারে সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইয়া রাখিলে যেমন চক্ষে তাহা একটা প্রাসাদের মতন দেখা গেলেও, সত্য সত্যই তাহার কোনও একত্ব ও স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না;—এই সকল ইঁট-কাঠের মধ্যে যেমন কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, কোনও অটুট গাঁথুনী গড়িয়া উঠে না;—সেইরূপ পরস্পরের স্বত্ব-স্বার্থের মধ্যে কোনও সত্য ও সজীব বন্ধনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়া, রোমের শাসনাধীন বিশাল ভূভাগে প্রকৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর রোমের সেই শাসন-কেন্দ্র যখন আপনার ভারে আপনি অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন এই অপূর্ব্ব সাম্রাজ্যও ঐ গাঁথুনীহীন ইঁট-কাঠের এমারতের মতন খসিয়া ধসিয়া পড়িল। যে যেরূপভাবে পারে, আপনার স্বার্থ ও শক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্ব-তন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। এই কারণে এবং এইরূপেই যেমন রোমক-সাম্রাজ্যের সেইরূপ মেসিদনীয় সাম্রাজ্যেরও ধ্বংস হইয়াছে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে, আধুনিককালে, এই কারণে এবং এই ভাবেই মোগল-সাম্রাজ্যও ছারখার হইয়া গিয়াছে। মোগলেরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে আপনাদের অধিকারভুক্ত মাত্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সকলের সঙ্গে দিল্লীর মস্‌নদের কোনও প্রকারের জীবন্ত ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। দিল্লীর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের কোনও প্রকারের সত্য মমত্বাভিমান জন্মে নাই। এই সাম্রাজ্য আমাদের, আমরা এই সাম্রাজ্যের, ইহার গৌরবে আমাদের গৌরব, ইহার পরাভবে আমাদের পরাভব; ইহার শক্তির দ্বারা আমরা শক্তিশালী, আমাদের শক্তি দ্বারা এই সাম্রাজ্য আপনিও শক্তিমান হইয়াছে; আমাদের ক্ষুদ্রতর স্বার্থ এই সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত; চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি যেমন এই দেহেতে অধিষ্ঠিত, ইহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট শক্তি ও সুখ-সাধনের দ্বারা দেহ যেমন সুখী ও শক্তিসম্পন্ন হয়, দেহের দৌর্ব্বল্যে ও হীনপ্রাণতায় এ

সকল ইন্দ্রিয় যেরূপ আপনা হইতেই দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে,—সেইরূপ দিল্লীর শাসন-কেন্দ্রের সঙ্গে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের একটা ঘনিষ্ঠ, জীবন্ত, পরস্পরাপেক্ষী অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে—এই জ্ঞান ও উপলব্ধি হইতেই কেবল দিল্লীর সম্বন্ধে মোগলাধিকৃত বিভিন্ন প্রদেশের একটা মমত্ব-বোধ জন্মিতে পারিত। দিল্লীর মোগল-রাজশক্তি আপনার অধীনস্থ প্রদেশ সকলের স্বার্থকে ও প্রাদেশিক জীবনকে এইভাবে আপনার স্বার্থের ও জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া ও মিশাইয়া লইতে পারে নাই। সুতরাং দিল্লীর শাসন যতই দুর্ব্বল হইতে লাগিল, ততই মোগল-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সকল আপন আপন বিশিষ্ট স্বার্থ-সাধনে নিযুক্ত হইয়া, একদিকে মোগল শাসন-শক্তি ও অন্যদিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গাঁথুনীবিহীন ইঁট-কাঠের সাজান এমারতের মতন দিল্লীর বিশাল সাম্রাজ্যও খসিয়া ধসিয়া পড়িয়া গেল। কেবলমাত্র ক্ষাত্রশক্তির উপরে যে সত্য ও স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা একান্ত অসাধ্য মেসিদন, রোম, দিল্লী সকলেই ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে।

বিজয়—আপনার কথাগুলি কেমন নূতন-তর ঠেকছে। রোমের লোকেরা বড় বি হয়ে পড়ল, আত্মভোগে রত হয়ে রাজ্যের কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ ও অসমর্থ হইয়াছিল বলিয়াই রোমের সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গেল; আমরা চিরদিন তো এই কথাই শিখিয়াছি। আর মোগল বাদশাহেরাও যখন হীনবীর্য্য ও হতবল হইয়া পড়িলেন, তখনই তাঁদের বাদশাহীও লোপ পাইল, ইতিহাস এই কথাই তো বলে আর ইহাই তো সত্য বলিয়াও মনে হয়।

সম্পাদক—সত্য বটে, কিন্তু আধখানা সত্য। কোনও বিরাট সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে যে শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়, যতদিন তাহা প্রবল ও কার্য্যক্ষম থাকে, ততদিন সে সাম্রাজ্য নষ্ট হয় না, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহা exciting cause মাত্র, real cause নহে। ইহা একটা উপলক্ষ্য মাত্র; মূল হেতু নয়। আচ্ছা, প্রথমে রোমের কথাটাই আর একটু তলাইয়া দেখা যাউক। রোমের সাম্রাজ্য ছারেখারে দিলে কারা? তারা তো সেই সাম্রাজ্যেরই ভিতরকার লোক। রোমের মতন আর একটা প্রতাপশালী সাম্রাজ্য যদি তখন থাক্‌তো; আর সেই সাম্রাজ্য আসিয়া যদি রোমের উপরে চড়াও করিয়া তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত; তাহা হইলে এই বিনাশের বীজ রোমের নিজের ভিতরেই ছিল, এমনটা নাও বা বলিতে পারিতাম। কিন্তু তা তো হয় নাই। রোম যাদের পদানত করিয়া রাখিয়াছিল, রোম দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, তারাই বিদ্রোহী হইয়া তার বিশাল সাম্রাজ্যকে ছারখার করে। রোম যদি এ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোককে কেবল আপনার অধিকারভুক্ত না করিয়া, অঙ্গীভূত করিতে পারিত, তা হ'লে এটা হতো কি? রোমের নিজের শক্তি কমিলেও তখন রোমের সাম্রাজ্য এই সকল প্রদেশের সমবেত শক্তিতে শক্তিমান হইয়া থাকিত।

বিজয়—তবে কি আপনি বলেন এ সংসারে একটা অমর সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারা যায়? কাল সংসারের সকলকেই ক্ষয়

করে, আর মানুষের গড়া একটা বিরাট রাষ্ট্র-তন্ত্র কালের প্রভাব অতিক্রম ক’রে অক্ষয়, অমর হইয়া থাকিবে ?

সম্পাদক—বিশেষ বিশেষ মানুষেরই জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু ঘটে; সমষ্টিভূত যে এই মনুষ্য-সমাজ কবে তার উৎপত্তি হইয়াছিল তাও জানি না; কত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে এ সমাজ আছে তাও জানি না; আর কখন যে এ সমাজ একেবারে লোপ পাইবে, তাও বুঝি না। প্রত্যক্ষতঃ ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর অধীন হইলেও, কার্য্যতঃ এই সমষ্টিভূত মনুষ্য-সমাজটা কি অমর নহে? যেমন ব্যক্তি-বিশেষের সেইরূপ সমাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্র-বিশেষের কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থান্তর ঘটিতে পারে, ঘটিয়াছে জানি। বেবিলনীয়, আসিরীয়, মিদীয়, প্রাচীন মিশর, মেসিদনীয়, গ্রীক বা রোমক সমাজ কেহ বা নিঃশেষে ধ্বংস পাইয়াছে, কেহ বা নামশেষ মাত্র আছে। এ সকলই সত্য। কিন্তু সমষ্টিভূত যে বিরাট বিশ্ব-মানব-সমাজ তা তো ‘যথা পূর্ব্বং তথা পরং’ চিরদিনই আছে। যে সকল ব্যষ্টিভূত সমাজ এই বিশ্বমানব-সমাজের সঙ্গে আপনার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে, তাদের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ সম্ভব, কিন্তু বিনাশ কি অসম্ভব নয়? সর্ব্বত্রই যে বিরাটকে আশ্রয় ক’রে সেই অমৃতত্বায় কল্প্যতে।

বিজয়—কথাটা বড় উঁচু হইয়া পড়িতেছে।

সম্পাদক—তা ঠিক বলছ বটে। পরম-তত্ত্বের আলোচনা ছেড়ে, নিম্নতর সমাজতত্ত্বের দিক্ দিয়াই এ প্রশ্নটার আলোচনা করা যা’ক। আমরা সকলেই কৌমার, যৌবন, জরাদি অবস্থা প্রাপ্ত হই; আর যৌবনের কর্ম্মঠতা জরার্ত্তে থাকে না। কিন্তু যখন আমরা পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করি, তখন আমাদের নিজেদের বার্দ্ধক্য ও জড়তায় সে পরিবারের তো সকল সময় প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয় না। হয় না কেন? এইজন্য যে, পরি-বারটা একটা বিপুল অঙ্গী। পরিবারস্থ সকলে এই অঙ্গীর অঙ্গ। সুতরাং কালবশে এক অঙ্গ যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অপর অঙ্গ তখন তাহাকে আপনার বল দিয়া যথাসাধ্য রক্ষা করিতে যায় এবং তার কর্ম্মভার আপনি মাথায় লইয়া আপনার শক্তি ও ত্যাগের দ্বারা অঙ্গীর-দুর্ব্বলতা দূর করিয়া থাকে। আদর্শ পরিবারে বয়ঃজ্যেষ্ঠেরা ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে, বয়ঃকনিষ্ঠেরা আসিয়া তখন সে কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া, পরিবারের শক্তি ও সম্পদ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। আর আপন আপন পরিবার সম্বন্ধে ইহাদের একটা গভীর ও অকৃত্রিম মমতাবোধ হইতেই এটী সম্ভব হয়। এই পরিবার আমাদের, আমরা এই পরিবারের,—এই পরিবারের শক্তিতেই আমাদের শক্তি, ইহার মর্য্যাদায়ই আমাদের মর্য্যাদা, ইহার প্রতিষ্ঠায়ই আমাদের প্রতিষ্ঠা; আর ইহার দুর্ব্বলতায় আমরা দুর্ব্বল, ইহার অপ্রতিষ্ঠায় আমরা অপ্রতিষ্ঠ, ইহার অমর্য্যাদায় আমরা অসম্মানিত হই—এই যে একটা জ্ঞান, বা ভাব, বা ধারণা, বা সংস্কার, ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের স্থায়িত্ব ও একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবটা যতদিন থাকে, ততদিন পরিবারবিশেষের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা অক্ষম, কেহ বা সক্ষম, কেহ বা সবল, কেহ বা দুর্ব্বল, কেহ বা জ্ঞানী

কেহ বা অজ্ঞ, এরূপ ভেদাভেদ থাকে বলিয়া তার সমষ্টিভূত শক্তি, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা কখনও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। আর-একটা প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের প্রবলতর শক্তি-সামর্থ্যের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়া এই পরিবারটী হতমান ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতে পারে, কিন্তু পরিবারের ভিতরকার কেহ দুর্ব্বল হইলে ও অপরের শক্তি-সাধ্য থাকিলে, এই দুর্ব্বলতার জন্য সবলের হাতে এ পরিবারের বন্ধন নষ্ট হয় না।

বিজয়—কিন্তু সর্ব্বদাই তো এরূপ হইতেছে! "স্বর্ণলতা" যে বাঙ্গালী জীবনের একখানা অতি খাঁটি ছবি, এ কথা তো আজিও কেহ অস্বীকার করেন নি।

সম্পাদক—আমিও করি না। চারিদিকে যে এরূপ হচ্ছে, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু হচ্ছে কেন, ভেবে দেখেছ কি? একদিন যে ঠিক এরূপ হতো না,—সেও খুব বেশী দিনের কথা নয়,—ইহাও তো অস্বীকার করা যায় না। তবে আজই এতটা পরিমাণে আমাদের পরিবারগুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে কেন? আমাদের নিজ নিজ পরিবার সম্বন্ধে এই মমত্ববোধটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই কি এরূপ হচ্ছে না?

বিজয়—নষ্টই বা হয় কেন?

সম্পাদক—তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষাতে আমাদের মধ্যে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান বা Sense of individuality জাগিয়ে দিয়েছে;—আমাদের প্রাচীন পারিবারিক বন্ধন যে শিথিল হইয়াছে, ইহা তার একটা প্রধান কারণ। তারপর খৃষ্টীয়ানী ঝাঁঝের ব্যক্তিত্বাভিমানী ধর্ম্মনীতি বা individualistic ethics, আমাদের স্বাভাবিক স্বার্থ-প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মের আবরণে ঢাকিয়া দিয়াছে। এই ধর্ম্মনীতির প্রভাবে আমরা যাদের জন্ম দিয়াছি তাদের লালন-পালনের ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। পরিবারের অপর কাহারও সম্বন্ধে ছোট ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয় প্রভৃতির প্রতি সেরূপ কর্ত্তব্য দায়িত্ব নাই—এই ভাবটা জন্মিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রবল করিয়া পারিবারিক সম্বন্ধকে শিথিল করিয়াছে। ইউরোপের অর্থনীতির বা Political Economyর শিক্ষাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। আগে আমাদের দেশে পরিবারের সকলে মিলিয়া কোন ব্যবসা-বিশেষে নিযুক্ত থাকিত, এইজন্য একটা অতি সুন্দর Co-operative labour system প্রচলিত ছিল। এখনও একান্নবর্ত্তী কৃষক ও কারিকরদের মধ্যে এ প্রথাটী প্রবর্ত্তিত আছে। আর এইজন্যই এ সকল স্থলে আমাদের পুরাতন আদর্শের পরিবার-গঠনটা এখনও বজায় আছে। কিন্তু যে পরিমাণে আমরা চাকুরীজীবী হইতেছি, সেই পরিমাণে এই পারিবারিক শ্রম-সমবায়-প্রথা বা Co-operative labour systemটা উঠিয়া যাইয়া, একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিত্তিটাকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে। কিন্তু এই প্রশ্নের সম্যক্ বিচার আলোচনা করিতে হইলে, সমগ্র অর্থনীতি, বিশেষতঃ আধুনিক য়ুরোপীয় পলিটিক্যাল ইকনমির (Political Economy) আলোচনা করিতে হয়। সে অতি বিস্তৃত কথা। তার মধ্যে একবার ঢুকিয়া পড়িলে, যে মূল কথাটা তুলিয়াছ, তার থেই হারাইয়া ফেলিব।

বিজয়—একান্নবর্ত্তী পরিবার-গঠনের সঙ্গে সাম্রাজ্য-গঠনের বা Empire-constitution-এর কোন তুলনা হয় কি ?

সম্পাদক—তুলনা খুবই হয়। প্রথমতঃ একটা পরিবার যেমন কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি, সেইরূপ একটা সাম্রাজ্য কতকগুলি রাষ্ট্রের সমষ্টি নয় কি ? এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা কি, তাই একবার তাকাইয়া দেখ। গ্রেট ব্রিটেন্ এবং আয়র্লণ্ডের যুক্তরাজ্য + ভারতবর্ষ + অষ্ট্রেলিয়ার জনতন্ত্র + ক্যানাডা + নিউ-জিলেণ্ড + দক্ষিণ-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র—এই সমষ্টিই কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নহে ? অতএব এই দিক দিয়া দেখিলেও একটা পরিবারে, একটা রাজ্যে এবং একটা সাম্রাজ্যেতে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর প্রশ্ন হয়,—এই সমষ্টিটা কোন্ জাতীয় ? সমষ্টি দ্বিবিধ—ইংরেজিতে একজাতীয় সমষ্টিকে mechanical, আর অপরটিকে organic বলা যায়। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ইঁটকে এক জায়গায় স্তূপাকার করিয়া রাখিলে, সে সমষ্টিকে mechanical বলা যায়। আবার এই ইঁটগুলিকে চূণ-শুরকী দিয়া একটা এমারতের আকারে গাঁথিয়া তুলিলে যে সমষ্টির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা ঠিক এই জাতীয় নহে। তাকে ঠিক organicও বলা যায় না বটে ; তবে বস্তুর দিক দিয়া তাহা organic না হইলেও, ভাবের দিক্ দিয়া এক-রূপ organicই বটে। ইংরেজিতে যাকে organic relation বলে, আমাদের প্রাচীন দর্শনের পরিভাষায় তাকেই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। আর এমারতের ইঁট-কাঠের সম্বন্ধটা এভাবে organic বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ যে নয়, ইহা বলা যায় না। সমগ্র এমারতটা এখানে অঙ্গী ; দেয়াল, দরজা, জানালা, ছাদ, ভিত, কার্ণিশ, থাম,—এগুলি এই অঙ্গীর অঙ্গ। আবার প্রত্যেক দেয়ালও নিজে অঙ্গী, তার ভিন্ন ভিন্ন ইঁট তার অঙ্গ। এমারতের একখানা ইঁট যদি খসিয়া পড়ে, বা তার একটা কোণ যদি ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে সমগ্র এমারতটীর অঙ্গহানি বা প্রকৃতি-বিপর্য্যয় ঘটে। ইহাই organic relation এর বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের মূল লক্ষণ।

বিজয়—পারিবারিক সম্বন্ধটাকে আপনি কি organic বা অঙ্গাঙ্গী বল্‌তে চান ?

সম্পাদক—তা নয় কি ? কেবল কতক-গুলি লোকের সমষ্টিকেই তো পরিবার বলা যায় না। গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখিবার জন্য যে সকল লোক একত্রিত হয়, তারা একটা জনসংঘ মাত্র ; একটা পরিবার তো নয়। একটা জাহাজে সমুদ্রপারে যাইবার সময় অনেকদিন ধরিয়া অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বাস করে, একত্রে খায় দায় ; কিন্তু তাই বলিয়া তারাও একটা পরিবার হয় না। হয় না এই জন্য যে, ইহাদের পরস্পরের সুখ ও স্বার্থের মধ্যে এমন কোনও সম্বন্ধ থাকে না যাহাতে একের লাভে সকলের লাভ ও একের ক্ষতিতে সকলের ক্ষতি অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। গড়ের মাঠের ঐ জনতার মধ্যে কোনও এক ব্যক্তির পকেট হইতে যদি হাজার টাকার এক কেতা নোট চুরী যায়, তাহাতে তাঁর আশে পাশে যাঁরা দাঁড়াইয়াছিল, তাদের একজনারও এক পয়সার ক্ষতি হয় না। অথবা তিনি যদি হঠাৎ সেখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া মারা যান,

তাহা হইলে তাতেও তাঁর চারিধারের অপর কারও সংসারের কোনও ক্ষতি বা পরিবর্ত্তন হওয়া অনিবার্য্য নহে। কিন্তু এ সকল দুর্ঘটনায় তাঁর পরিবারের লোকের সমূহ ক্ষতি হয়। তাঁর অর্থনাশে তারা দরিদ্র, তাঁর প্রাণনাশে তারা অসহায়, হইয়া পড়ে। আর এই জন্যই তাঁর সঙ্গে তাদের ও তাঁদের সঙ্গে যে তাঁর একটা গাঁথুনী আছে, ইহা বোঝা যায়। এ গাঁথুনী কেবল প্রেমের নয়, কিন্তু স্বার্থের; কেবল পরমার্থের নয়, কিন্তু সংসারের। প্রেমের গাঁথুনী পরিবারের বাহিরের বহুলোকের সঙ্গে বাঁধিতে ও থাকিতে পারে। পরমার্থের সম্বন্ধ দুনিয়ার সকলের মানুষের সঙ্গেই আছে। কিন্তু তাহাতে পরিবার গড়ে না। যে গাঁথুনীতে পরিবার, সমাজ, রাজ্য, সাম্রাজ্য প্রভৃতি গড়িয়া উঠে, তাহা নিরাকার প্রেম-বন্ধন নহে, নিতান্ত সাকার স্বার্থের বন্ধন। এই স্বার্থের বন্ধন আছে বলিয়াই—পরিবারের একের স্বার্থসাধন তাহার অন্তর্গত অপর সকলের স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং পরিবারের লোকেদের পরস্পরের আত্ম-চরিতার্থতালাভ পরস্পরের অপেক্ষা রাখে বলিয়াই পারিবারিক সম্বন্ধকে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বলা যায়। আর ইহাতেই পরিবারের একত্ব যে mechanical unity নহে, কিন্তু organic unity,—ইহা প্রতিপন্ন হয়। এই পারিবারিক সম্বন্ধটা যেমন অঙ্গাঙ্গী, সাম্রাজ্য সম্বন্ধটাও ঠিক সেইরূপই হওয়া চাই।

বিজয়—এ পর্য্যন্ত তো দুনিয়ায় এমন সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে নাই।

সম্পাদক—উঠে নাই বলিয়াই সর্ব্বত্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূ্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশ বা জাতির মধ্যে এতটা বিরোধও জাগিয়া আছে। যত দিন না কোনও সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা সত্য ও জীবন্ত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তত দিন সে সাম্রাজ্য একটা কৃত্রিম ঐক্য বা mechanical unity মাত্র লাভ করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত জীবন্ত একত্ব বা organic unity লাভ করে না ও করিতে পারে না। ততদিন দুর্ব্বল যে সে প্রবলের পদানত থাকিয়া তার সম্রাট-অভিমানকে পরিপুষ্ট করিতে পারে, কিন্তু যখনই সে দিন পায় তখনই এর প্রতিশোধ তুলিবার জন্য অগ্রসর হয়। রোমের ইতিহাস ও দিল্লীর ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়। আর রোমক-সাম্রাজ্য এবং মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মূল কারণ এই যে, এরা একটা কৃত্রিম ঐক্য মাত্র স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু আপনার মধ্যে একটা সত্য ও সজীব একত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

বিজয়—এই একত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই কি স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করিয়া মোগল-সম্রাটেরা চিরদিন বুদ্ধিমন্ত ও শক্তিশালী থাকিতে পারিতেন? আর তাঁদের বুদ্ধিহানি ও শক্তিক্ষয় হইলে, সাম্রাজ্য থাকিত কিরূপে, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

সম্পাদক—বেশ প্রশ্নটী তুলেছ কথাটা এখন আরো পরিষ্কার হইয়া যাইবে। সত্য বটে স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করা কারোই সাধ্য নয়। মোগল-সম্রাটেরা দু'দিন আগেই হউক, আর দু'দিন পরেই হউক, দুর্ব্বল ও অদূরদর্শী হইয়া পড়িতেন ইহা একরূপ স্থির নিশ্চিত। কিন্তু পরিবারের কর্ত্তা যখন জরা-গ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য ও অশক্ত হইয়া পড়েন,

তখন কি সর্ব্বদাই সে পরিবারও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় ? না, বয়ঃজ্যেষ্ঠেরা দুর্ব্বল ও অকর্ম্মঠ হইয়া পড়িলে ক্রমে বয়ঃকনিষ্ঠেরা আসিয়া তাঁদের কর্ম্মভার নিজেদের মাথায় লইয়া পরিবারের সমষ্টিগত জীবনের শক্তি ও সম্মান রক্ষা করেন ? একটা সুগঠিত রাষ্ট্রেও তাহাই হয়। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ইঁহারা ব্যক্তিগতভাবে জরাগ্রস্ত, বা অন্যকারণে অক্ষম হইয়া পড়িলে, যাঁরা সক্ষম তাঁরাই আসিয়া তাদের স্থান গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের জীবন ও শক্তি ও প্রতিষ্ঠা যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন। এটী হয় না কেবল স্বেচ্ছাতন্ত্র-রাজ্যে। আর স্বেচ্ছাতন্ত্র অর্থই এই যে, যাহা প্রকৃতপক্ষে দশজনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব, তাহা একজন লোকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী সে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতে চেষ্টা করে। সে অবস্থায় দশজনের শক্তি সমবেত হইয়া রাষ্ট্রের কর্ম্মে নিয়োজিত হইবার যথাযোগ্য অবসর পায় না। আর সেখানে যার হাতে রাজ্যের সকল শক্তি ও সকল কর্ম্ম কেন্দ্রীভূত হয়, সে যখন দুর্ব্বল ও অপটু বা অদূরদর্শী হইয়া পড়ে, তখন কাজে কাজেই রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা এবং শক্তিও আর থাকে না। এই কারণেই স্বেচ্ছাতন্ত্র রাষ্ট্র সকল একদিকে যেমন কোনও অসাধারণ বুদ্ধিবীর্য্যসম্পন্ন রাজার সাধনবলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রতাপ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, সেইরূপ আবার দু'চার পুরুষের মধ্যেই একেবারে নষ্ট হইয়াও যায়। কিন্তু এতটা দ্রুতগতিতে নিয়মতন্ত্র-রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধিত হয় না। আর যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের উপরে আমাদের পরিবার-গুলি গড়িয়াছে, সেই অঙ্গাঙ্গী আদর্শের অনুযায়ী যদি কোনও বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে সে সাম্রাজ্য চিরকাল না হউক, অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিজয়—এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়াই কি মোগলের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে ?

সম্পাদক—তাই নয় কি ? যারা মোগল-সাম্রাজ্যের বিনাশ সাধন করেছে, তাদের কথাটা একবার একটু ভাবিয়া দেখ তো! পশ্চিমে শিখ-খালসার ও দক্ষিণে মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুদয়, এই দুই কারণেই কি প্রধানতঃ মোগল-সাম্রাজ্য নষ্ট হয় নাই ? প্রথমে শিখেদের কথাটা ভাবিয়া দেখ। এঁরা একটা ধর্ম্মসঙ্ঘই গড়িতেছিলেন, রাষ্ট্র-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। মোগল-রাষ্ট্রশক্তি যখন তাঁদের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল, তখনই শিখেদের ধর্ম্মসঙ্ঘ, অসাধারণ ক্ষাত্রবীর্য্যসম্পন্ন খালসার আকার ধারণ করিতে লাগিল। মোগলের রাষ্ট্রতন্ত্রাধীনে এই নবীন ধর্ম্মসমাজের আত্ম-চরিতার্থতা-লাভ যদি অসম্ভব না হইত, তাঁহা হইলে শিখ-খালসার অভ্যুদয়ও হইত না, ইহা স্থির নিশ্চিত। মোগলের শাসনশক্তি ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করিতে যাইয়াই, শিখসঙ্ঘের সঙ্গে এই বিরোধ বাধাইয়া দেয়। আর এরূপভাবে অঙ্গবিশেষের সঙ্গে আপনাকে একান্তভাবে একাত্ম বা identify

করিতে যাইয়াই, মোগল-প্রভুশক্তি আপনার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গী-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। অঙ্গীর মধ্যে তার প্রত্যেক অঙ্গই নিজ নিজ স্থানে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। সকল অঙ্গেরই যে সে অঙ্গী। সকলের সেবা দ্বারাই তার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। দেহী যদি চক্ষুকে বাড়াইবার জন্য কর্ণ বা রসনা বা ত্বক্‌কে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করে, হাতকে আদর করিতে যাইয়া পায়ের যথেচ্ছা বিচরণের ক্ষমতা রোধ করে,—তাহা হইলে শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষা পায় না। অঙ্গীতে সকল অঙ্গই প্রতিষ্ঠিত, সকল অঙ্গের মধ্যে অঙ্গীই তাদের প্রাণ ও প্রেরণারূপে অদৃশ্যে ও অলক্ষিতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু সকলেতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই অঙ্গী, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে, কোনও অঙ্গেতেই নাই, কারণ সে প্রত্যেক অঙ্গেরই অতীত হইয়া আছে। ইহাই অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধের প্রাণ। গীতার এই দুটি শ্লোক মনে পড়ে কি?

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি, পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

"এই সমুদয় জগৎ আমার অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। যাবতীয় ভূত সকল আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি স্বয়ং তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নই। আমার এই ঐশ্বরীয় যোগ দর্শন কর—আর এক দিক দিয়া দেখিলে এ ভূত সকলও আমার মধ্যে স্থিত নহে। অর্থাৎ তাহাদের বিশিষ্ট গুণাদি আমার অঙ্গীভূত হইয়া নাই। আমার আত্মাই ভূত সকলকে ধারণ করিয়া আছে এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, অথচ আমি তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ নহি।" ভগবানের সঙ্গে এই জগতের যে অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ রহিয়াছে, এখানে তিনি তারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ। পরিবার বাস্তবিক কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ এবং বালক-বালিকা নহে। পরিবার একটী তত্ত্ববিশেষ। তাহা পরিবারান্তর্গত সকলের মধ্যে আছে, এঁরা সকলে তাহার মধ্যে আছেন। এই পরিবারের কোনও নিজস্ব মূর্ত্তি নাই, থাকিলে পরিবারের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে ইহা থাকিতে পারিত না। যার নিজের কোনও বিশিষ্ট মূর্ত্তি নাই, সে-ই কেবল একই কালে, সমভাবে বহুবিধ বিশিষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে থাকিতে পারে। এই পরিবার-তত্ত্ব-বস্তু পরিবারের সকলকে ধারণ করিয়া আছে, সকলকে প্রতিপালন করিতেছে, অথচ সকলের অতীত হইয়াও আছে। এইভাবে পরিবার-বন্ধনকে যখন দেখি, তখনই তার প্রকৃত অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধটা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কিন্তু অমূর্ত্ত হইলেও এই পরিবার-তত্ত্বকে বা পরিবার-শক্তিকে কোনও একটা না একটা বিশেষ বিগ্রহ বা আধারকে আশ্রয় করিয়াই আপনার লক্ষ্য সাধন করিতে হয়। এই বিগ্রহ বা আধারই পরিবারের কর্ত্তা। এই কর্ত্তাকে পরিবারের জীবনে, পরিবারের অন্তর্গত সর্ব্ববিধ বিশিষ্ট সম্বন্ধের অতীত হইয়া থাকিতে হয়। পরিবারের যিনি কর্ত্তা, তিনি তাঁর নিজের স্ত্রী বা পুত্র বা কন্যা বা অপর কাহারও সঙ্গে, পরিবারের কর্ত্তা বা প্রতিভূরূপে, কোন বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পারেন না। তিনি যে চক্ষে পরিবারের অন্তর্গত অপর সকলকে দেখিবেন, সেই চক্ষে

আপনার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিকেও দেখিবেন। এদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধের স্বাভাবিক বিশেষত্ব থাকিবে, কিন্তু সমষ্টিগত পারিবারিক জীবনের ও শক্তির আধার ও বিগ্রহরূপে কারো সঙ্গে কোনও বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইবে না। যতদিন এইটী হয়, ততদিনই কেবল পরিবারের সত্য অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধটী বিদ্যমান থাকে। আর ততদিনই পরিবারের মধ্যে সত্য একত্বও বিরাজ করে। আর ততদিন পরিবারের ভিতরকার লোকের ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বার্থের প্রতিযোগিতায় বা বাদ-বিসম্বাদে, সমষ্টিগত পারিবারিক জীবনের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয় না।

বিজয়—মোগলেরা যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের সঙ্গে ও এই সকল অংশের সমষ্টিগত যে সাম্রাজ্য তার সঙ্গে একটা সত্য ও ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ গড়িয়া তোলেন নাই,—আপনি এই কথাই তবে বল্‌তে চান্। আর এই জন্যই মোগলের সাম্রাজ্য স্থায়ী হলো না।

সম্পাদক—তাই কি সত্য নয়? এই শিখেদের কথাই আর একটু ভাবিয়া দেখ মোগল-সম্রাট সমগ্রভারতরাষ্ট্রের প্রতিভূরূপেই বাস্তবিক তার প্রভু হইয়াছিলেন। এখানে পরিবার-গঠনের বা Family-constitutionএর সঙ্গে সাম্রাজ্যগঠন বা Empire-constitutionএর সাদৃশ্যটা একবার মনে কর। পরিবারের কর্ত্তা পরিবারান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতিভূরূপেই কি প্রকৃতপক্ষে পরিবারের প্রভু হন না? সেইরূপ সম্রাটও সাম্রাজ্যান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশ, জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিভূরূপেই বাস্তবিক সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। প্রজাতন্ত্ররাজ্যে যে ভাবে প্রজাসাধারণে মিলিয়া, বিচার-আলোচনা করিয়া, প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করে, সে ভাবে নির্ব্বাচিত না হইলেও, প্রত্যেক রাজাই প্রকৃত পক্ষে তাঁর রাজ্যের ও প্রত্যেক সম্রাটই তাঁর কর্ত্তৃত্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রতিভূস্বরূপেই তাহাদের শাসন-সংরক্ষণ করেন। পরিবারের কর্ত্তাকেও কোথাও পরিবারভুক্ত লোকেরা হাত তুলিয়া বা ভোট দিয়া কর্ত্তা করে না। তিনি স্বাভাবিক প্রণালীতেই এ পদ পাইয়া থাকেন। কিন্তু নির্ব্বাচিত হন নাই বলিয়া তিনি যে ইহাদের প্রতিভূ, এ কথাটা অপ্রমাণ হয় না। রাজা বা সম্রাট সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। অতএব মোগল-সম্রাট সমগ্র ও সমষ্টিভূত যে বিশাল ভারতসাম্রাজ্য তার শক্তি ও শাসন-অধিকারের প্রতিনিধি ও বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন, এ কথা বলা অসঙ্গত নহে। এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যে বা ভারতসমাজে হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম-সমাজ ছিল। এ সকল এই বিরাট সমাজ-দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও অঙ্গ। অথচ শিখেরা যখন আপনাদের নূতন ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল, তখন মোগল সম্রাট তদানীন্তন মুসলমান-সমাজের সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করিয়া, শিখ-মুসলমানের পরস্পরের প্রতিযোগিতায়, স্বয়ং অঙ্গীর ও অংশীর প্রতিনিধি হইয়াও, একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ও অংশের সঙ্গে মিলিয়া অপর অঙ্গ বা অংশকে নিপীড়িত করিতে গেলেন। এরূপ করিয়া কি মোগলেরা সাম্রাজ্যের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা না হইলে তাহার স্থায়িত্ব

সম্ভব হয় না, সেই অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধের সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়া দেন নাই? ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা মোগল ছিলেন, মুসলমান ছিলেন, তাতে কিছু আসিয়া যায় নাই। মানুষমাত্রেই কোনও না কোনও সমাজ ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাস করে। ব্যক্তিগত ভাবে সকল মানুষকেই কতকগুলি বিশিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্ব আর রাজপদ এক হইতে পারে না। মানুষ জন্মে ও মরে। রাজাও তো মানুষ, সুতরাং তারও জন্ম-মৃত্যু আছে। কিন্তু রাজ-পদের লোপ হয় না; রাজসিংহাসন নিমেষকালও শূন্য থাকে না। সমাজের সমষ্টিগত শক্তি ও অধিকার যে কেন্দ্রে যখন প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হয়, তাহাই রাজ-পদ, সিংহাসন সেই প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশেরই চিহ্ন। সুতরাং সমাজ যেখানে রাজপদও সেখানে। শাসন যেখানে সিংহাসনও সেখানে থাকিবেই থাকিবে। তাহাকে Throne না বলিয়া Presidential Chair বলিতে পার; কিন্তু বিভিন্ন নামেতে বস্তুর বস্তুত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয় না। আর সিংহাসন সমাজের একটা নিত্য তত্ত্ব বলিয়া, এক ব্যক্তি যায়, আর এক ব্যক্তি সে সিংহাসনে আসিয়া বসে, কিন্তু মুহূর্ত্তকালও সে আসন শূন্য থাকে না। জলোকা যেমন এক আশ্রয় ছাড়িবার পূর্ব্বে আশ্রয়ান্তর অবলম্বন করে, সেইরূপ রাজপদ বা রাজশক্তিও এক ব্যক্তিকে ছাড়িতে না ছাড়িতে আর এক ব্যক্তিতে যাইয়া অব্যবহিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই অর্থ—The king is dead, long live the king! আর রাজপদ বা রাজশক্তি সময়ে সময়ে যে সকল ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, তাদের অপেক্ষা বড় ও সর্ব্বদাই তাদের ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত থাকে বলিয়া, রাজারূপে, রাজপদসম্পর্কে, কোনও রাজার নিজের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সকলের প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না। ব্যক্তিরূপে, ব্যক্তিগতভাবে, দিল্লীশ্বর মোগল বা মুসলমান হইলেও, সম্রাটরূপে প্রকৃতপক্ষে মোগলও ছিলেন না, মুসলমানও ছিলেন না। সে চক্ষে তাঁহাকে দেখিলে হিন্দু কখনও "দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা" বলিয়া অভিবাদন করিত না। কিন্তু শিখেরা যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন মোগল-সম্রাট এ কথাটা ভুলিয়া গেলেন। তাই অঙ্গে অঙ্গে বিরোধ বাধিলে, অঙ্গীর প্রতিভূ হইয়াও তিনি অঙ্গবিশেষের সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করিয়া, সাম্রাজ্যের অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিলেন। এইখানেই তাঁর সম্রাটত্ব, অঙ্গিত্ব নষ্ট হইয়া গেল। আর এই কারণেই দিল্লীর সম্রাটশক্তির সঙ্গে শিখের খালসা-শক্তি একাত্মতা অনুভব করিতে পারিল না, প্রত্যুত ইহাকে আপনার প্রতিবাদী বলিয়াই গ্রহণ করিল। আর ক্রমে যখন দিল্লীর শাসনশক্তি শিথিল হইয়া পড়িল, তখন শিখ-খালসা আপনার ক্ষাত্রবীর্য্যের দ্বারা তাহাকে প্রতিহত ও বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণে মহারাষ্ট্র-সমাজও দিল্লীর সঙ্গে আপনার একাত্মতা-সাধনের কোনও অবসর পায় নাই। সুতরাং সময় পাইয়া তারাও দক্ষিণভারতে দিল্লীর অধিকার লোপ করিতে লাগিল। মোগলেরা পররাষ্ট্র দখল করিয়াই আপনাদের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল পররাষ্ট্রবাসীকে কোনও ঘনিষ্ঠ, সজীব ও স্থায়ী অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধের ভিতর

দিয়া পরস্পরের সঙ্গে ও আপনার সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধিয়া তুলিতে পারেন নাই। সুতরাং দিল্লীর শাসন-কেন্দ্র যখন শক্তিহীন হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন এই গাঁথুনিহীন সাম্রাজ্যও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কথাটা পরিষ্কার করিতে পারিলাম কি?

বিজয়—একটা কথা এখনও খুব পরিষ্কার হয়নি। পরিবার-গঠন ও সাম্রাজ্য-গঠন যে একই আদর্শের হতে পারে, এটী ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। পরিবারের বন্ধন স্নেহ-প্রীতির বন্ধন, পরিবারের পরস্পরের মধ্যে একটা সহজ রক্তের টান আছে। সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তো এটী নাই; এর সৃষ্টি করাও তো সম্ভব নয়।

সম্পাদক—কিন্তু রক্তের টানের চাইতে স্বার্থের টান কি বেশী নয়?. হামেযাই তো স্বার্থের আঘাতে অতি ঘনিষ্ঠ রক্তের টান ছিঁড়িয়া যায়। এক ভাই চাকুরীয়া ও আর এক ভাই বেকার হইলে, রক্তের টানে তো তাদেরে অনেক সময় এক করে রাখতে পারে না। রক্তের জোর যখন স্বার্থের শক্তির সঙ্গে এক হয়, সেইখানেই কেবল পরিবারের বাঁধন টিঁকিয়া থাকে। আমাদের পুরাতন একান্ন-বর্ত্তী পরিবারে রক্তের একতার সঙ্গে অন্নের একতা, স্নেহের বাঁধনের সঙ্গে সাংসারিক স্বার্থের ও সুখ-সুবিধার বাঁধন জুড়িয়া গিয়াছিল, তাতেই বহুগোষ্ঠি মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিতাম। ফলতঃ co-operative labour-system বা পারিবারিক শ্রমসমবায়-প্রথাই একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিত্তি—পারিবারিক রক্তের ও স্নেহের সম্বন্ধ নয়। যেখানে জীবিকা-উপার্জ্জনের জন্য এই শ্রমসমবায় বা co-operative labour নিষ্প্রয়োজন বা অসম্ভব হইয়া যায়, সেইখানেই দেখ একান্নবর্ত্তী পরিবারও আর থাকে না। আমাদের দেশের শিক্ষিত চাকুরীয়া-সমাজে এ প্রথা একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। আর সমাজের নিম্নতর স্তরেও যেখানে পূর্ব্বে কৃষক বা তন্তুবায় প্রভৃতি পরিবারের সকলে মিলিয়া চাষবাস করিত বা তাঁত বুনিত, সেখানেও এখন যে কেহই একটু সামান্য অক্ষরজ্ঞান লাভ করিয়া আদালতে বা ডাকঘরে চাকুরী পাইতেছে, সে-ই আপনার স্ত্রীপুত্রকে লইয়া পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে যে পরিবার-গঠনের মূলে কেবল রক্তের টান বা সহজ স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতিই যে আছে, তা নয়—সাংসারিক স্বার্থই এখানে প্রধান বন্ধন।

বিজয়—স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, ভক্তি প্রভৃতি দেবভাবগুলি যদি এইরূপে স্বার্থ-প্রণোদিতই হয়, তাহা হইলে, এ সকলের দেবত্ব ও মহত্ত্ব থাকে কৈ?

সম্পাদক—স্বার্থ টাকেই এমন হীন চক্ষে দেখিতেছ কেন; সংকীর্ণ স্বার্থপরতা আর উদার স্বার্থ এক বস্তু নয়। ফলতঃ এই স্বার্থ-বস্তুটাই বা কি? 'স্ব'এর অর্থই স্বার্থ। আর স্ব-বস্তুকে অতি ছোট বলিয়াও ভাবিতে পার, অতি বড়, বিশাল এবং বিশ্বব্যাপক ভাবেও দেখিতে পার না কি? এই 'স্ব'কে যখন কেবল নিজের দেহেতে ও দেহের সুখস্বচ্ছন্দতাতেই আবদ্ধ করিয়া রাখ, তখন স্বার্থ-বস্তুটা অতি ছোট, অতি সংকীর্ণ, অতি হীন ও হেয় হয়। আপনার 'স্ব'কে যদি এইভাবে দেখ, তাহা হইলে নিজের সুখটাই দুনিয়ার আর সকলের

সুখ অপেক্ষা বড় হয়। তখন স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলেই 'স্ব'এর বাহিরে পড়িয়া পর হইয়া যায়। কিন্তু আবার যখন এই 'স্ব'এর ভিতরে স্ত্রীপুত্রাদিকে টানিয়া আন, তখন তোমার 'স্ব'টা তাদের 'স্ব'কে আশ্রয় করিয়া, তোমার সুখ তাদের সুখের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কত বড় হয়, আবার তোমার দুঃখটাও তাদের দুঃখের সঙ্গে মিলিয়া একদিকে কত গুরু ও অন্যদিকে কত মহৎ ও পুণ্যময় হইয়া উঠে; ভেবে দেখ তো। এইরূপে এই 'স্ব'কে তুমি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পার। ক্রমে ক্রমে তখন তোমার এমন অবস্থা হইতে পারে যে, সমগ্র বিশ্ব তোমার এই 'স্ব'তে মিশিয়া গিয়া, তোমার এই অতি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ 'স্ব'টাকেই বিশ্বের 'স্ব' করিয়া তুলিবে। তোমার নিজের স্বার্থ আর বিশ্বের স্বার্থ তখন এক হইয়া যাইবে। বিশ্বের সুখ তখন তোমার সুখ, বিশ্বের দুঃখ তখন তোমার দুঃখ; তোমার অনুভূতি তখন বিশ্বানুভূতিতে, তোমার বাসনা তখন বিশ্ব-বাসনায় পরিণত হইবে। তখন স্বার্থই পরার্থ হইয়া পড়িবে, পরার্থই স্বার্থ হইয়া যাইবে। ইহাই প্রকৃত নির্ব্বাণ-মুক্তি। জগতের মহাজনেরা আপন আপন 'স্ব'কে বিনাশ করিয়া নহে, বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত করিয়াই কঠোর সাধন-বলে আপন আপন সুখদুঃখানুভূতিকে জগতের সুখদুঃখানুভূতির সঙ্গে একান্ত-ভাবে মিশাইয়া, আপনাদিগকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়াই এই মহা-পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।

বিজয়—আপনি নির্ব্বাণের একটা নূতন অর্থ কচ্ছেন না কি?

সম্পাদক—না। সাধুমুখে এই সনাতন অর্থই শুনিয়াছি। আর বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতির জীবনে এই বস্তুই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মানব-সমাজ যে এই পথেই বিকশিত হইয়া চলিয়াছে, তাই কি অস্বীকার করিতে পার? পরিবার-বন্ধন আমাদের ক্ষুদ্র 'স্ব'কে পরিবারের আর দশজনের 'স্ব'এর সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া, নিজের ভোগ-বিলাস ও সুখদুঃখ অপেক্ষা তাদের সেবা ও পরিচর্য্যা ও তাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা-সাধনকে অধিকতর প্রার্থনীয় করিয়া তোলে না কি? আর এই পরিবার-গঠন একের স্বার্থকে দশের স্বার্থের সঙ্গে মিলাইয়া, একটা বৃহত্তর স্বার্থের সৃষ্টি করিতেছে। তার পর, সমাজের কথা। সমাজ পরিবার অপেক্ষা বড়। আর সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের স্বার্থকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াই কি আত্মপ্রতিষ্ঠা করে না? সমাজের পরে রাজ্য বা রাষ্ট্র। এখানেও এই বিকাশটাই আরো স্ফুটতর হইয়া উঠে। রাজ্যের বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সমাজের স্বার্থের সমীকরণের দ্বারাই রাজ্যের একত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজ্যের আশ্রয় ব্যতীত সমাজ থাকে না, সমাজের আশ্রয় ব্যতীত পরিবার থাকে না, পরিবারের আশ্রয় ব্যতীত ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা পায় না। এইজন্যই এ সকলের মধ্যে একটা নিগূঢ়, ঘনিষ্ঠ, পরস্পরা-পেক্ষী অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে। এ যোগ কতকটা সংস্কারের আর অনেকটা কেবল স্বার্থের। স্বার্থের বন্ধন সংস্কারের বন্ধনকে দৃঢ় করে। সংস্কার-বন্ধন স্বার্থের বন্ধনকে সরস ও পবিত্র করে। স্বার্থের প্রেরণা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। সংস্কারের শক্তি-সঞ্চারে সে কর্ম্ম ধর্ম্ম হইয়া উঠে।

বিজয়—এখানে আপনি কাকে সংস্কার বলিতেছেন ভাল করে ধর্ত্তে পাচ্ছি না।

সম্পাদক—আমরা এক রক্তে জন্মিয়াছি, একই পূর্ব্বপুরুষের বংশধর, এই যে অভিমান, ইহা একটা সংস্কার নয় কি? তার পর, আমরা এক গোত্রের, এক জাতের বা শাসনের লোক এও একটা সংস্কার। আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ও পুরাতন ইতিহাস এক, আমরা একই সভ্যতা ও সাধনার অধিকারী, সুতরাং জগতের অন্য সভ্যতা ও সাধনার লোক হইতে পৃথক্, এটাও একটা সংস্কার। এই সকল সংস্কারই আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকে সনাতন সমাজধারার সঙ্গে মিলাইয়া, একটা বিশ্বসমাজের প্রতিষ্ঠা করে। এই সকল সংস্কারই আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে। এই সকল সংস্কারের আশ্রয়েই আমাদের idealism ফুটিয়া উঠে, আর প্রত্যক্ষ স্বার্থের প্রেরণায় আমাদের activityর প্রতিষ্ঠা হয়। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, স্বার্থের প্রেরণা হইতে কর্ম্মের, আর সংস্কারের প্রভাব হইতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। তার সাংসারিক সম্বন্ধের বেষ্টনীটাকে বাড়াইয়া দিয়া, মানুষের স্বার্থটাকে যত বড় করিবে অর্থাৎ যত বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত করিবে, সেই পরিমাণে তার ধর্ম্মও উদার এবং উন্নত হইয়া উঠিবে। মানুষের এই স্বার্থ টাকে এরূপভাবে নূতন নূতন সম্বন্ধের ভিতর দিয়া বাড়াইয়া তোলাই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের বা historic evolutionএর নিত্য লক্ষ্য। এইভাবেই মানব-সমাজ ফুটিয়া উঠিতেছে। এইভাবে পরিবার, গোষ্ঠি, গোত্র, সমাজ, রাজ্য বা রাষ্ট্র, এবং সাম্রাজ্য—এই সূত্র ধরিয়া মানব-সমাজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই রাষ্ট্র-সম্বন্ধ অপেক্ষা সাম্রাজ্য-সম্বন্ধ, nationalism অপেক্ষা imperialism শ্রেষ্ঠতর আদর্শ।

বিজয়—আপনি দেখ্‌ছি সব উলট্‌পালট্‌ করিয়া দিতেছেন। Nationalismকেই আমরা এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় জীবনের চরম ও চূড়ান্ত আদর্শ ও প্রতিষ্ঠা বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি। এই ন্যাশন্যালিজমের চাইতে যে বড় কোনও কিছু আছে, ইহা তো মনে হয় না।

সম্পাদক—মানবেতিহাসের বিবর্ত্তনধারাকে ধরিয়া একবার চল দেখি, সকল কথা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। মানুষ কোনও দিন যে, কোনও জাতীয় পশুর মতন একান্ত একাকী হইয়া বাস করিত, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। হাতী প্রভৃতি কতকগুলি পশু আছে, যারা যূথবদ্ধ হইয়া বাস করে। মানুষের খবর যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাতে মানুষ সর্ব্বদাই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত, ইহা সপ্রমাণ হয়। সমাজ ছাড়া মানুষ, সৃষ্টি-ছাড়া কথা। আর সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে যাইয়াই মানুষ সে সমাজের ভিতরে আপন আপন পরিবারবদ্ধ হইয়াই বাস করিত। অতএব মানব-সমাজের বিবর্ত্তনের মূলে পরিবারগঠনটাকে দেখিতে পাই। ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থকে পরিবারের সমষ্টিগত বৃহত্তর সুখ ও স্বার্থের মধ্যে মিলাইয়াই পারিবারিক জীবনের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

অনেকগুলি ব্যক্তিকে লইয়া পরিবার।
|
অনেকগুলি পরিবারকে লইয়া সমাজ।
|
অনেকগুলি সমাজকে লইয়া জাতি।
|
অনেক জাতিকে লইয়া নেশন বা রাষ্ট্র।
|
অনেক নেশন বা রাষ্ট্রকে লইয়া সাম্রাজ্য।

এক ধাপের পর যেমন আর এক ধাপ, এমনি করিয়া জন-সমাজ আদিম পারিবারিক সম্বন্ধকে বাড়াইয়াই ক্রমশঃ নেশন বা রাষ্ট্রের বিশালতর ও জটিলতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখানেই এই বিবর্ত্তনগতি বন্ধ হইয়া যায় নাই। নেশন-সম্বন্ধকে বাড়াইয়া বহু নেশনের সমাবেশে সাম্রাজ্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ব্যক্তিগত জীবনের শিক্ষা ও সাধনা অপেক্ষা যদি পারিবারিক জীবনের শিক্ষা ও সাধনাকে মহত্তর ও উন্নততর বল, পারিবারিক জীবনের শিক্ষা ও সাধনা অপেক্ষা সামাজিক জীবনের শিক্ষা ও সাধনা যদি বৃহত্তর ও উচ্চতর হয়, আর সামাজিক জীবনের শিক্ষা ও সাধনা অপেক্ষা বিশালতর ও জটিলতর নেশনাল-সম্বন্ধের শিক্ষা ও সাধনা যদি মনুষ্যত্ববিকাশের সমধিক উপযোগী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে, এই নেশনাল সম্বন্ধ অপেক্ষা সাম্রাজ্য-সম্বন্ধ যে এই মনুষ্যত্বকে আরো বাড়াইয়া তুলিবে, ইহা অস্বীকার করিতে পার কি? এইরূপে এই বিবর্ত্তন-ধারাকে আশ্রয় করিয়াই কি আমাদের ক্ষুদ্র সুখস্বার্থ উত্তরোত্তর ব্যাপকতর ও বিশুদ্ধতর হইয়া উঠে নাই? এই ভাবেই কি আমরা আমাদের বিশ্বমানবতা উপলব্ধি করিতেছি না? "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" —ইহাই যদি আমাদের সকল কর্ম্মের চরম প্রেরণা হয়, তাহা হইলে নেশনের জীবনে যে কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, সাম্রাজ্যের জীবনে তদপেক্ষা বিশালতর ও ব্যাপকতর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া, আমাদিগকে এই বিশ্বজনীন সাধনার পথে আরো অগ্রসর করিয়া দেয় না কি? নেশনকেই যদি চূড়ান্ত লক্ষ্য বলিয়া ধর, তবে আর একজন তার সমাজ বা communityকেই চূড়ান্ত বলিয়া ধরিবে না কেন, আর এইভাবে শেষে ব্যক্তিগত স্বার্থটাই চূড়ান্ত ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায় না কি?

বিজয়—কিন্তু সেটা যে আত্মঘাতী কথা। আমার পরিবারের আশ্রয় ব্যতীত আমার নিজের সুখস্বার্থ-সাধনও ঠিক সম্ভব হয় না।

সম্পাদক—ঠিক সেইরূপ সমাজের আশ্রয় ব্যতীত পারিবারিক জীবনের, নেশনের আশ্রয় ব্যতীত সামাজিক বা communal জীবনেরও সত্য স্বার্থসাধন অসম্ভব নয় কি? আর এই ভাবেই যদি দেখ, তাহা হইলে সাম্রাজ্য-সম্বন্ধকে উপেক্ষা বা নষ্ট করিয়া নেশনাল (national) স্বার্থই কি সম্যকরূপে সাধন করা সম্ভব হয়? এ জগতে যে যে পরিমাণে আপনাকে বৃহত্তর স্বার্থ-সম্বন্ধেতে আবদ্ধ করিতে পারে, সে-ই তত বড় তত শক্তিশালী হয় ও সেই পরিমাণে আপনার প্রকৃত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। আর যে যত ছোট হইয়া পড়িয়া থাকে, সে-ই তত হীনবল হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে নিষ্ফলতা আহরণ করিতে থাকে। আমাদের আধুনিক জাতীয়তা বা নেশনালিজম্ অতি উচ্চ, অতি মহৎ, অতি মহার্ঘ বস্তু। কিন্তু ইহাও চরম বস্তু নহে। জাতীয়তাতে বা নেশনালিজমেই

সামাজিক বিবর্ত্তন চরম-সোপানে যাইয়া দাঁড়ায় না। এখানেও "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" এই মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ হয় না। ইহার উপরে সাম্রাজ্যতা বা Imperialism অথবা Internationalism বা অন্তর্জাতীয়তা, এই ভাবেই মানুষ ক্রমে বিশ্বাত্মৈকত্ব সাধন করিবে

বিজয়—কিন্তু বিশ্বকে পাবার আগে তো আমায় আমার নিজেকে পাইতে হবে

সম্পাদক—তা তো বটেই। কিন্তু এই বিশ্বের সঙ্গে তোমার 'স্ব'এর বা নিজের এরূপ একটা বিরোধই কল্পনা ক'র কেন? মোহ-বশে মানুষ এরূপ বিরোধের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু এ বিরোধ যতক্ষণ না নষ্ট হয়, ততক্ষণ সে তার নিজেকেও তো পায় না। আর এই বিরোধ নষ্ট করাই সমাজ-বিবর্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিবারের বৃহত্তর জীবনেই ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থের বিরোধ ভঞ্জন হইয়া থাকে। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ক্ষুদ্র ও বিশিষ্ট সুখস্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামঞ্জস্য করিয়াই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বা communityর স্বত্বস্বার্থের প্রতিযোগিতা ও বিরোধের মীমাংসা করিতে যাইয়াই, জাতির বা নেশনের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যক্তিগত সুখস্বার্থের বিরোধ ভঞ্জন না করিতে পারিলে, পারিবারিক বন্ধন টিঁকে না। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের পারিবারিক স্বত্বস্বার্থের বিরোধ ভঞ্জন না করিতে পারিলে, সমাজ টিঁকে না। আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বা communityর পরস্পরের স্বত্বস্বার্থের বিরোধ না মিটাইতে পারিলে, জাতি বা নেশন গড়ে না, গড়িতে আরম্ভ করিলেও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ বিরোধ ভঞ্জন ও প্রতিযোগী স্বত্বস্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াই সামাজিক উন্নতি ও বিবর্ত্তন সাধিত হয়। এ বিরোধটা আমাদের কল্পিত—মায়ার সৃষ্টি,—আমরা যে স্বতন্ত্র ও পরিচ্ছিন্ন এই ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হয়। আর এই মায়িক পরিচ্ছিন্নতা-বোধ নষ্ট করিবার জন্যই সমাজ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পরিবারের ভিতরে আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিয়া থাকি। সমাজের বৃহত্তর জীবনে সেইরূপ পারিবারিক জীবনের পরিচ্ছিন্নতা-বোধ নষ্ট করিতে থাকি। জাতীয় জীবনের বা national lifeএর বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে সামাজিক বা communal জীবনের ক্ষুদ্রতা ও পরিচ্ছিন্নতা নষ্ট হইয়া থাকে। এই ভাবেই ক্ষুদ্র স্বার্থ ও শক্তি বৃহত্তর স্বার্থ ও শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আপনাকে বাড়াইয়া তোলে। একাকিত্বের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ক্ষুদ্রতা কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আর যে কারণে পরিবার ব্যক্তি অপেক্ষা বড়, সমাজ পরিবার অপেক্ষা বড়, জাতি বা নেশন সমাজ বা community অপেক্ষা বড়, সেইরূপ বহু জাতির সম্মিলনে ও সমবায়ে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাও জাতি বা নেশন অপেক্ষা বড়। ব্যক্তিকে পরিবারের আশ্রয়ে, পরিবারকে সমাজের আশ্রয়ে, সমাজকে জাতির বা নেশনের আশ্রয়ে, সেইরূপ নেশন বা জাতিকেও সাম্রাজ্যের বা Empireএর আশ্রয়েই আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে হয়। ইহার আর অন্য পথ নাই। এই নিগূঢ় সমাজ-তত্ত্বটী লাট হার্ডিঞ্জ খুবই আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই তিনি ভারতের নূতন জাতীয় জীবনের স্ফূর্ত্তির

সঙ্গে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা স্থায়ী ও সমীচিন সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এতটা চেষ্টা করিতেছেন। এই কথাটা না বুঝিলে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছেন তার প্রকৃত মর্ম্ম ও মূল্য বোঝা অসম্ভব হইবে। এটা না বুঝিলে আমাদেরও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কঠিন হইবে। কিন্তু কথাটা অতি বড় ও জটিল। অবকাশ মত আর একদিন এর আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীঃ—

বৈদিক সাধনার আভাস

জ্ঞানক্ষেত্রে সাধনার কথা বলিতে গিয়া ঋষি মনের কথা বলিয়াছেন। "চক্ষুষ্মান্ কর্ণবান্ সমজ্ঞানিগণ মনদ্বারা গন্তব্য বিষয় সকলে অতুলনীয় হন।" (পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০।৭১।৭)। অর্থাৎ মহদ্‌ব্যক্তিগণ দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সকল মনদ্বারা বিচার করিয়া তাহাতে সমজ্ঞান লাভ করেন। দর্শনশাস্ত্র এই কথাই বলিয়াছেন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়। আচার্য্য শঙ্কর সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

শ্রবণান্মননাদ্ধ্যানাৎ তাৎপর্য্যেণ নিরন্তরম্।
বুদ্ধেঃ সূক্ষ্মত্বমায়াতি ততোবস্তূপলভ্যতে॥

"নিরন্তর তৎপর হইয়া শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিলে বুদ্ধির সূক্ষ্মত্ব আসে ও তাহা হইতে সদ্‌বস্তুর উপলব্ধি হয়।" মানসক্ষেত্রে সাধনা দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয় ও জ্ঞানক্ষেত্রে জীব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। সাধক মনোময় কোষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তবে বিজ্ঞানময় কোষে জাগরিত হইতে পারেন। মনই জীবকে বিশ্বময় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। মনই তাহাকে প্রপঞ্চের মোহে ফেলিয়া, সংসারে আবদ্ধ করে, আবার মনই তাহাকে এই বন্ধন কাটিয়া, শ্রেষ্ঠগতি লাভ করাইতে পারে। বস্তুতঃ এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি অথবা মন হইতেই সৃষ্ট। মানসিক সংস্কারই জগতের কারণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সৃষ্টি-সূক্তের ব্যাখ্যায় এ কথা বিশদ্‌ভাবে বলা হইয়াছে। এই সূক্তে ঋষি বলিয়াছেন, প্রলয়কালে জগৎ মনের সম্বন্ধী বীজরূপে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লীন ছিল। সৃষ্টিকালে এই বীজই বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া পত্র, পুষ্প, শাখা, কাণ্ড প্রভৃতিতে বিস্তৃত হয়। মন কামনা দ্বারা জীবকে এই বৃক্ষে বাস করায় ও ইহার কটু দুঃখময় ফলসকলকে তাহার সম্মুখে সুমিষ্ট উপাদেয় বলিয়া স্থাপন করে। এইরূপে বিভ্রান্ত হইয়া জীব কিছুকাল অন্ধের ন্যায় সংসারবৃক্ষে ঘুরিতে থাকে। কিন্তু তাহার ভিতর যে ব্রহ্ম-চৈতন্য সৎপদার্থ বিদ্যমান, তাহা তাহাকে চিরকাল এরূপ ভাবে থাকিতে দেয় না। অসৎ কখনও নিত্য হয় না, সুতরাং জীবের জগদ্‌ভ্রমও স্থায়ী হয় না। সংসারবৃক্ষের বিষময় ফলভোগে তাহার বিষম ভবরোগ কাটিতে থাকে। বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া সে যখন

সংসারকে দুঃখময় বলিয়া উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, তখন সে এই জ্বালা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সংসার-বৃক্ষের উর্দ্ধে অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তখন যে মন তাহাকে পাপকর্ম্ম-বশে সংসার-বৃক্ষে আবদ্ধ করিয়াছে সেই মনই আবার তাহাকে পুণ্যকর্ম্ম-বশে এই বৃক্ষ হইতে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়। মুক্তির জন্য জীবের মানস-ক্ষেত্রে এই সাধনাকে মনোময়কোষের সাধনা বলে। এই সাধনা দ্বারা জীবের নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক জন্মে, সংসারবিরক্তি পূর্ণতা লাভ করে, সত্ত্বগুণ সম্যক্ বিকশিত হয়, বিজ্ঞানময়-ক্ষেত্রে প্রবেশ সাধিত হয় ও ক্রমে সমগ্র মায়াপাশ ছেদন করিবার শক্তি উন্মেষিত হয়। মনই যে সংসার-বন্ধনের হেতু এবং মন দ্বারাই যে সংসার-বন্ধন সাধিত হয় তাহা বৈদিক ঋষি উপাখ্যানছলে অতি সুন্দররূপে বলিয়াছেন। পুরাকালে অসমাতি নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন এবং এই রাজার বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু নামে চারি ভ্রাতা পুরোহিত ছিলেন। একদা রাজা ইঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া মায়াবী দুই ঋষিকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। ইহাতে বন্ধু প্রভৃতি চারি ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার বিরুদ্ধে অভিচার-ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করেন। মায়াবী পুরোহিত-দ্বয় ইহা জানিতে পারিয়া সুবন্ধুকে বধ করেন। তখন সুবন্ধুর ভ্রাতা বন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু তাঁহার পুনর্জীবনলাভের জন্য নিম্নলিখিত সূক্ত বা স্তোত্র পাঠ করেন। এই সূক্তে ঋষিত্রয় মনকে সুবন্ধুর মৃতদেহে পুনরায় আগমন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন যাহাতে তিনি পুনরায় জীবিত হইতে পারেন। সূক্ত, যথা :—

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১॥
যত্তে দিবং যৎ পৃথিবীং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥২॥
যত্তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৩॥
যত্তে চতস্রঃ প্রদিশো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৪॥
যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৫॥
যত্তে মরীচিঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৬॥
যত্তে অপো যদোষধীর্মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৭॥
যত্তে সূর্য্যং যদুষসং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৮॥
যত্তে পর্ব্বতান্বৃহতো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৯॥
যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১০॥
যত্তে পরাঃ পরাবতো মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১১॥
যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১২॥

ঋঃ সঃ—১০।৫৮

অনুবাদ ও তাৎপর্য্য :—

১। (হে মৃত সুবন্ধু) তোমার যে মন বৈবস্বত যমের নিকট দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘ জীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

২। তোমার যে মন দ্যুলোকে এবং যাহা পৃথিবীতে দূরে গমন করিয়াছে আমরা

তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৩। তোমার যে মন চতুর্দ্দিকে সীমাবিশিষ্ট ভূমিতে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৪। তোমার যে মন চারি মহাদিকে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৫। তোমার যে মন জলপূর্ণ সমুদ্রে বা মেঘে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৬। তোমার যে মন গতিশীল দীপ্তি-সকলে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৭। তোমার যে মন আপে ও যাহা ওষধি সকলে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৮। তোমার যে মন সূর্য্যে ও যাহা উষার নিকটে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

৯। তোমার যে মন বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

১০। তোমার যে মন এই বিশ্বজগতে দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

১১। তোমার যে মন পরস্থ পরাবৎসকলে, অর্থাৎ অত্যন্ত দূরদেশসকলে, দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘ-জীবনের জন্য ইহলোকে ফিরাইয়া আনি।

১২। তোমার যে মন ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ সকলেও দূরে গমন করিয়াছে আমরা তাহাকে নিবাস ও দীর্ঘজীবনের জন্য ইহ-লোকে ফিরাইয়া আনি। (বর্ত্তমান পদার্থ সকলের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী ঋক্‌সকলে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং "ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ সকলেও" এই বাক্য দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমগ্র প্রপঞ্চ বুঝাইতেছে।)

এই সূক্ত দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্থূলদেহের অবসানেই জীবের মনের সহিত সম্বন্ধ ঘুচে না। জীব স্থূলদেহ-নাশের পর মনকে সঙ্গে লইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। মন জীবের সহিত "বৈবস্বত যমের নিকটে দূরে, অর্থাৎ স্থূলদেহ ছাড়িয়া, গমন করে"—১ম ঋকে এইরূপ স্পষ্ট করিয়া মনের পারলৌকিকত্ব বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, প্রত্যেক ঋকেই মনকে "ইহলোকে ফিরাইয়া আনি" এই বাক্য দ্বারা মৃত্যুর পর মনের অস্তিত্ব ও পরলোকে অবস্থান বারংবার অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন যে স্থূলদেহের অন্তর্গত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের স্পন্দনই মানসিক ক্রিয়া, সুতরাং স্থূলদেহ নষ্ট হইলেই মানসিক ক্রিয়া বা মন নামে পরিচিত পদার্থ লোপ পায়, অর্থাৎ যাঁহারা স্থূলদেহাবসানের পর অন্য দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, বেদ তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে পুনঃপুনঃ বলিতেছেন, তোমরা ভ্রান্ত, স্থূলদেহাবসানের পর মন যমালয়ে পরলোকে

গমন করে ও প্রয়োজন হইলে পুনরায় ইহলোকে ফিরিয়া আইসে। অতঃপর বিবেচ্য, মন স্থূলদেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া কি করে। "মনঃ সংকল্পকঃ" (সাংখ্যকারিকা—২৭), অর্থাৎ মন সংকল্পক, মনের ধর্ম্ম সংকল্প করা। বাচস্পতি মিশ্র ইহার স্ফুটতর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আলোকিতমিন্দ্রিয়েণ বস্তিদমিতি সম্মুগ্ধমিদমেবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়ন্তি, বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবেন বিবেচয়তি," অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রথমে বস্তুর অস্তিত্বমাত্র 'ইহা আছে', এইরূপে সম্মুগ্ধভাবে আলোচিত বা প্রত্যক্ষিত হয়, পরে মন 'ইহা এইরূপ, ইহা এইরূপ নহে' এই ভাবে সম্যক্‌রূপে উহার কল্পনা করে, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে বিবেচনা করে। দৃষ্টিপথে যদি একটি ঘট পড়ে, চক্ষু তাহার রূপটি মাত্র গ্রহণ করিয়া মনের নিকট পঁহুছিয়া দেয়; মন তখন পূর্ব্ব-দৃষ্ট ঘটের সহিত ঐ রূপের সাদৃশ্য ও ঘট-ব্যতিরিক্ত পদার্থের সহিত উহার অসাদৃশ্য বিচার করিয়া উহাতে ঘটত্বরূপ বিশেষণ ও ঘটরূপ বিশেষ্য আরোপ করিয়া ঘট বলিয়া উহাকে গ্রহণ করে। সুতরাং বস্তুতঃ মনই ঘট দেখে, চক্ষু মাত্র ঘটের আকৃতিটা মনের সম্মুখে পঁহুছিয়া দিয়া তাহার সাহায্য করে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে ইন্দ্রিয়-পদার্থটি কি। যে সকল করণের সাহায্যে আত্মার বা জীবের বিষয়ভোগ হয় তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে বিষয় বলে। সুতরাং যে সকল করণের সাহায্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অনুভূতি হয় তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বায়ু ও আকাশের ধর্ম্ম। সুতরাং যে সকল করণ আত্মার বা জীবের সহিত অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বায়ু ও আকাশের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয় তাহারা ইন্দ্রিয়। মন সংকল্প দ্বারা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের দর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ, স্পর্শন ও শ্রবণরূপ আলোচনা দ্বারা ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বচন, গ্রহণ, ভ্রমণ, পুরীষত্যাগ ও শৃঙ্গার দ্বারা আত্মার সহিত অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বায়ু ও আকাশের সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়া দেয়। এইজন্য মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় নামে আখ্যাত। মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ—জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করে মন তাহার বিচার করে এবং মনের যাহার বিচার করিবার প্রয়োজন হয় জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মনের নিকটে আনিয়া দেয়। যে ক্ষেত্রে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এই ক্রিয়া হয় ইহাকেই দর্শন-শাস্ত্র মনোময় কোষ বলিয়াছেন। এখন দেখা যাক জ্ঞানেন্দ্রিয় কাহারা। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্, ইহাদিগকেই সাধারণতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা যায়। বাস্তবিক কিন্তু ইহারা দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বার মাত্র। স্থূলদেহে জাগ্রদবস্থায় জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল এই সকল দ্বার দিয়া স্থূলপ্রপঞ্চের সহিত সঙ্গত হয়। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল ইহাদের বিনা সাহায্যেই বিষয় প্রত্যক্ষ করে ও সেই প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ জীবের সুখ-দুঃখ সম্পাদন করে। একরূপ ব্যাধি আছে যাহাতে লোকে নিদ্রাবস্থায় জাগ্রতের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করে—ভ্রমণ করে, অধ্যয়ন করে, গৃহকর্ম্ম করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতির বিনা সাহায্যেই

এই সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। যোগিগণ দূরদেশস্থ পদার্থ দর্শন করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বার সকলই যদি ইন্দ্রিয় হইত তাহা হইলে চসমাও দর্শনেন্দ্রিয় হইত। ফলতঃ ইন্দ্রিয় সকল স্থূল ভৌতিক পদার্থ নহে, শক্তি। দর্শনেন্দ্রিয় রূপগ্রহণের শক্তি, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দগ্রহণের শক্তি, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধগ্রহণের শক্তি, রসনেন্দ্রিয় রসগ্রহণের শক্তি, স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শ করিবার শক্তি। কর্ম্মসংস্কার-রূপ প্রকৃতি বা মহাশক্তির অভিব্যক্তিক্রমে মন হইল কল্পনাশক্তি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বিষয় প্রত্যক্ষীকরণের শক্তি। এই দুই শক্তি একত্র অবস্থান করে, কারণ কল্পনাশক্তি অনুপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষীকরণের শক্তির আবশ্যকতা থাকে না ও প্রত্যক্ষীকরণের শক্তি না থাকিলে কল্পনা করিবার বিষয় থাকে না। মন ও ইন্দ্রিয় একত্র অবস্থান করিয়া আত্মাকে বিষয়-ভোগ করায়। এই উদ্দেশ্য না থাকিলে মন ও ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা ও অস্তিত্ব থাকিত না। সুতরাং মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের অকাট্য সম্বন্ধ। মন ও ইন্দ্রিয় যতক্ষণ জাগরূক বা সক্রিয় থাকিবে ততক্ষণ বিষয়ের অনুধ্যান ও অন্বেষণ করিবেই করিবে। তবে, সকল জীবের পক্ষে মন ও ইন্দ্রিয় সকল সময়ে জাগরূক থাকে না। যে জীবের প্রকৃতি যত অধিক সাত্ত্বিক তাহার মন ও ইন্দ্রিয় তত অধিক পরিমাণে জাগ্রদাদি অবস্থায় জাগরূক থাকে, আর যে জীবের প্রকৃতি যত অধিক তামসিক তাহার মন ও ইন্দ্রিয় ঐ সকল অবস্থায় তত অল্প পরিমাণে জাগরূক থাকে। অতি তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয় কেবল স্থূলদেহে জাগ্রদবস্থায় জাগরূক থাকে। তাহাও যে সকলের পক্ষে সমান পরিমাণে তাহা নহে। ইহা নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয় যে, একই বস্তু কেহ শীঘ্র ধারণা ও উপলব্ধি করিতে পারে, কেহ বিলম্বে ধারণা ও উপলব্ধি করিতে পারে, বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিভা বিভিন্ন প্রকারের হয়। যে সকল জীব স্থূলবিষয়ের স্থূলদৈহিক ভোগ ভিন্ন অন্য প্রকার ভোগে অক্ষম, তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল স্থূলদেহান্তর্গত ইন্দ্রিয়-দ্বার চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতির সাহায্য ভিন্ন ক্রিয়া করে না, কারণ ইহারাই স্থূলদৈহিক ভোগের করণ। নিদ্রা বা মৃত্যুর দ্বারা এই সকল দ্বার রুদ্ধ হইলে এই সকল জীবের মন ও ইন্দ্রিয় প্রয়োজনাভাবে নিষ্ক্রিয় হয়। এই সকল জীব মৃত্যুর পর নিদ্রিত হইয়া পড়ে ও পরলোকে কোনরূপ ভোগ করে না, পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করিলে তবে জাগরিত হয় ও বিষয় ভোগ করিতে পারে। স্বপ্নও ইহাদের বিরল এবং যদি কখনও স্বপ্ন হয় তাহা অর্দ্ধনিদ্রিত ব্যক্তির কার্য্যের ন্যায় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হয়। যে সকল জীব সত্ত্ববৃদ্ধির হেতু স্থূলদেহের অতিরিক্ত সূক্ষ্মদেহে বিষয় গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল স্থূলদেহান্তর্গত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকেও ক্রিয়া করে, কারণ সূক্ষ্মদৈহিক ভোগে ইহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। নিদ্রা বা মৃত্যুর দ্বারা এই সকল বাহেন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হইলেও এই সকল জীবের মন ও ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে। নিদ্রিত হইলে এই সকল জীব সুন্দর শৃঙ্খলা-পূর্ণ স্বপ্ন দেখে। মৃত্যুর পর ইহারা জাগরূক থাকে ও পরলোকে বিষয় ভোগ করে। ইহাই জীবের মনোময় কোষে অবস্থান ও

জাগরণ। ক্রমে জীবের যত সত্ত্ববৃদ্ধি হইতে থাকে; সতত মনন বা সংকল্পদ্বারা যত তাহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, জগতের বা জাগতিক পদার্থের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে যতই সে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে থাকে, তত সে বিজ্ঞানময় কোষে জাগরিত হইতে থাকে। সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, জ্ঞানময়। এই জ্ঞানক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে জীবকে আর পদার্থের স্বরূপনিশ্চয়ের জন্য প্রথমতঃ সংকল্পাত্মক মনের সাহায্য লইতে হয় না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই সর্ব্ব-নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তখন জীবকে সর্ব্ব সংশয় হইতে মুক্ত করে। ইন্দ্রিয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করিলেই ইহা ব্রহ্ম এই সিদ্ধান্ত বিনা বিচারেই উপস্থিত হয়। ইহাকেই বলে জীবের বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান। বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই কোষ গঠিত, অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে জীব মাত্র বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কার্য্য করে তাহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। এই কোষে জীবের অবস্থান পূর্ণ হইলে অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিলে জীবের সমস্ত বিষয়ভোগে আত্যন্তিক বিরাগ জন্মে—বিষয়-জনিত দুঃখ যেমন অবাঞ্ছনীয় বিষয়জনিত সুখও তেমনি অবাঞ্ছনীয় হয়। তখন তাহার পক্ষে মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি সকলই নিষ্প্রয়োজন হয়। এই নিষ্প্রয়োজনীয়তা স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহসম্বন্ধেই বর্ত্তে। ইহা তমের জন্য হয় না, অধিক পরিমাণে সত্ত্ববৃদ্ধির জন্য হয়। এই নিষ্প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইলে মন বা ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি নিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয় হয় না, পরন্তু শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব মায়া বা প্রকৃতিতে সমাহিত বা লীন হইয়া যায়। জীব তখন স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ হইতে মুক্ত হইয়া কারণ-দেহে আনন্দময় কোষে বিরাজ করে। প্রকৃতিরূপিণী মহাশক্তি-সমুদ্রে উত্থিত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ক্ষুদ্র শক্তিসকল পুনরায় সেই মহাশক্তিতে বিলীন হইয়া যায়।

মৃত্যু বা স্থূলদেহের অবসানের পর মনের অস্তিত্বের কথা বলিতে গিয়া আমরা অতি সংক্ষেপে মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিলাম। এই কথাগুলি বলা প্রয়োজন হইয়াছিল, কারণ আলোচ্য মনঃসূক্তে মনের ক্রিয়ার সম্বন্ধে ঋষি এই সকল কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। ২য় হইতে ১১শ পর্য্যন্ত ঋকে ঋষি বলিয়াছেন যে, সুবন্ধুর মন মৃত্যুর পর দ্যুলোক, পৃথিবী, চতুঃসীমাবিশিষ্ট ভূমি, চারি মহাদিক, সমুদ্র, দীপ্তি, আপ ও ওষধি সকল, সূর্য্য ও ঊষা, পর্ব্বত এমন কি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মনের এই বিশ্বময় ব্যাপ্তি আত্মার ভোগের জন্য, কারণ বেদে মৃত্যুর পর পরলোকে জীবের স্বর্গাদিভোগ সর্ব্বত্রই অঙ্গীকৃত হইয়াছে —বস্তুতঃ সমগ্র বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড পরলোকে ফলভোগের নিমিত্ত। ভোগের অর্থ—ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশের গুণ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন হইয়া তাহার সুখ বা দুঃখের অনুভূতি। তাই ঋষি বলিয়াছেন যে, সুবন্ধুর মন সর্ব্বত্র বিশ্বময় গমন করিয়াছিল। সুবন্ধু ঋষি ছিলেন, তাঁহার চিত্তে বহুল পরিমাণে সত্ত্বের উদ্রেক হইয়াছিল, স্থূলদেহের অবসানের

পর সূক্ষ্মদেহেও বিষয় ভোগ করিবার শক্তি তাঁহার জন্মিয়াছিল, সুতরাং মৃত্যুর পর মনের সহকারী ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার মনের সম্মুখে সমস্ত বিষয় স্থাপন করিয়াছিল। ইহাই তাঁহার মনের বিশ্বময়-গমন, অর্থাৎ বিশ্বময় বিষয়ের অনুভূতি। এখানে পুনরায় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ঋষি প্রত্যেক ঋকে "দূরে" এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। স্থূলদেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি দ্বারের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সকলকে যতক্ষণ কার্য্য করিতে হয়, ততক্ষণ তাহারা দূরস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না, দর্শনেন্দ্রিয় দূরস্থিত পদার্থ দেখিতে পায় না, শ্রবণেন্দ্রিয় দূরস্থিত শব্দ শুনিতে পায় না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দূরস্থিত গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে না রসনেন্দ্রিয় দূরস্থিত রস আস্বাদন করিতে পারে না, স্পর্শেন্দ্রিয় দূরস্থিত দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারে না। চক্ষু প্রভৃতি দ্বারের প্রসর অতি সংকীর্ণ, সুতরাং তাহাদের অধীনে কার্য্য করিতে গেলে ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি অতীব সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যখন ইহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পায়, চক্ষু প্রভৃতি দ্বার যখন ইহাদের স্বচ্ছন্দগতির অন্তরায় না হয়, তখন ইহাদের গতি অপ্রতিহত হয়, দূরত্ব বলিয়া কোন পদার্থ ইহাদের নিকট থাকে না। যুগপৎ একই কালে ইহারা সমগ্র বিশ্বে বিচরণ করিতে পারে। এই জন্য সূক্ষ্মদেহধারী দেবাদি জীবসকল এককালে সর্ব্বস্থানের সর্ব্ববিষয় ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারেন। এই জন্য দেবগণ বিশ্ব শাসন করিতে পারেন, বিশ্বময় জীবের প্রার্থনা শুনিতে পান। পুনশ্চ, ঋষি যখন বলিয়াছেন যে, সুবন্ধুর মন সর্ব্ববিশ্বে সর্ব্বত্র গমন করিয়াছিল তখন বুঝিতে হইবে যে, স্বচ্ছন্দবিহারী ইন্দ্রিয়ের গতি স্থূলত্বও রোধ করিতে পারে না, অর্থাৎ প্রাচীর বা তদ্রূপ স্থূলপদার্থের অন্তরাল-হেতু তাহাদের গতি প্রতিহত হয় না। স্থূলপদার্থ যদি তাহাদের গতি রোধ করিতে পারিত, তাহা হইলে জগতের সর্ব্বত্রই স্থূলপদার্থের বিদ্যমানতা থাকায় তাহাদের দূরে গমন অসম্ভব হইত।

১২শ ঋকে ঋষি বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর মন ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ; গত, আগত ও অনাগত সমস্ত বিষয়ে গমন করে। স্মৃতি ও অনুমান দ্বারা মন সাধারণতঃই ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে গমন করিয়া থাকে। শরীরে বিশেষরূপে অস্ত্রাঘাত দেখিলে ঐ স্থানে যে স্ফোটক হইয়াছিল তাহার অনুমান হয় এবং মেঘের বিশেষরূপ অবস্থা দেখিলে বৃষ্টিপাত হইবে কি না তাহার অনুমান হয়। এব স্মৃতির দ্বারাও লোকে অতীত বিষয়ের অনুভব করে—পুত্রের মৃত্যু স্মরণ হইলে লোকে শোকে বিহ্বল হয়। এই জন্য দর্শনশাস্ত্র বলিয়াছেন, "সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকাল-মাভ্যন্তরং করণম্" (সাংখ্যকারিকা ৩৩) অর্থাৎ বাহ্যকরণ বর্ত্তমানকালের ও আভ্যন্তরকরণ ত্রিকালের বিষয় গ্রহণ করে। মনের এই ত্রিকালজ্ঞত্ব-ধর্ম্ম ঋষি পরলোকেও অঙ্গীকার করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, ইহলোকে স্থূলশরীরের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ মনের ভূত ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বহুদূর গমন করে না, কিন্তু স্থূলশরীর হইতে মুক্ত হইলে মনের এই দৃষ্টি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—সে দূর অতীত ও ভবিষ্যৎকালের বিষয় সকলও দেখিতে পায়। ১২শ ঋকে ঋষি এই কথাই

বলিয়াছেন। যোগের দ্বারা স্থূলশরীর হইতে মনকে বিযুক্ত করিতে পারিলেও মনের এই
ভূত হয়।

এই আলোচনার দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, বৈদিক ঋষি মনঃসূক্তে (ঋঃ সঃ ১০।৫৮) মনোময় কোষের যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম তাহা স্পষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন। (ক্রমশ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

নক্ষত্র-পূজা

জিউস্‌দেব (Zeus)

গ্রীক দেবচরিত মতে জিউস্ দেব দেবশ্রেষ্ঠ। তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর এবং তিনি তরঙ্গিত-শ্মশ্রুধারী, স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট, এক হস্তে বজ্র ও অপর হস্তে দণ্ড এবং তাঁহার পদতলে পাখা-মেলা ঈগল পক্ষী দণ্ডায়মান। ওলিম্পিয়াতে তাঁহার মূর্ত্তি মুকুটধারী এবং তাঁহার দণ্ডাগ্রে পাখা-মেলা ঈগল পক্ষী উপবিষ্ট।

য়ুরোপীয় সুধীগণ সমগ্র আর্য্যজাতির ধর্ম্ম-ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া তুলনা পূর্ব্বক তাহাদের উপাস্য দেবগণের প্রতিবিম্বতা নিরাকরণ করিয়া সুগভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহারা বিজ্ঞান-জগতে অতুল ও অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সমগ্র আর্য্যজাতির উপাস্য দেবগণের আধিদৈবিক মূর্ত্তির উদ্ধার সাধন করা আমাদিগের চিরব্রত। আমাদিগের এই চিরশ্রম শিক্ষিতমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিলে আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার উপাস্য দেবগণের একতা পুনঃ প্রকাশ পাইবে। ভিন্ন ভিন্ন শাখার ধর্ম্ম-ইতিহাসের আপাত-বিরোধ-মূলে দেশগত ও বৃত্তিগত কারুকার্য্য পরিদৃশ্যমান হইবে। প্রতিবিম্বে অসদৃশ বিন্দুগত পার্থক্য দর্শনে সন্দেহের চমকে আর কেহ চমকিত হইবেন না।

সুধীর পাঠক! যদি ঈগলযুগলরত দণ্ড-বজ্রধারী জিউস্‌দেবের পরিচয় গ্রহণে তোমার বাসনা থাকে, তবে নীতিবিশারদ প্লুটার্কের উপদেশ গ্রহণ কর। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে জিউস্‌দেব মূলে সূর্য্য। যদি হেঁটে ঈগল উপরে ঈগল এই দুই ঈগল পক্ষীর কথা শুনিতে চাহ, তবে গরুড়ের অমৃত-হরণের ইতিহ পুনঃ পাঠ কর। এবং অমৃত-হরণ কালে নারায়ণ-গরুড়-সংবাদের প্রতি বিশেষ অনুধাবন কর।

"ঐ সময়ে নারায়ণ তাঁহার (গরুড়ের) অলৌকিক কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলে আগমন করত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'খগপতে! আমি তোমাকে বর দিতে আসিলাম।' কশ্যপ-নন্দন কহিলেন 'দেব! আজ্ঞা করুন, যেন আমি আপনার উপরে বাস করি। ....।' গরুড় বর লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন 'আপনিও কোন বর প্রার্থনা করুন।' অচ্যুত কহিলেন, 'তুমি আমার

বাহন হও।' গরুড় স্বীকার করিলেন। কেশব তাহাকে ধ্বজের উপর রাখিয়া প্রথম বরের সার্থকতা রাখিলেন।"

আমরা পাইলাম যে,—গ্রীসদেশে সূর্য্য-জিউস্‌দেবের দণ্ডাগ্রে ও পদতলে পাখা-মেলা দুইটী ঈগল শোভা পায়। ভারতে সূর্য্য-নারায়ণদেবের ধ্বজাগ্রে ও তলদেশে গরুড়-পক্ষী বিরাজমান।

গ্রীসদেশের সূর্য্য-জিউস্‌দেবের এই ঈগল-দ্বয়যুত চিত্র ভারতের সূর্য্য-নারায়ণের এই গরুড়দ্বয়যুত চিত্র এই উভয় চিত্রের আধিদৈবিক প্রতিচিত্র নক্ষত্র-মণ্ডলে অবশ্যই আছে। কিন্তু এই জাজ্জ্বল্যমান আধিদৈবিক প্রতিচিত্র হিন্দু ও গ্রীক উভয় ভ্রাতার চিত্তপট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রিয় পাঠক! যদি সেই দিব্য প্রতিচিত্র-দর্শনে তোমার কুতূহল থাকে, তবে কল্পনা-বলে তের হাজার বর্ষ পূর্ব্বে দেবরাত্রে পৃথিবীর মেরুদণ্ডের (Axis of the Earth) চূড়াস্থিত সুমেরুশৃঙ্গে আরোহণ কর! ভূ-স্বর্গের অমৃতময় প্রাচীন শোভা সন্দর্শনে আত্মহারা হইও না।

তোমার ঠিক মাথার উপর বিমানে মনোরম ইস্পাত-নীল নীলমণি (Vega) তারা অচল অটল ভাবে মহামেরুর (Axis of the world) উত্তর প্রান্তে ধ্রুব সিংহাসনে বসিয়া আছে। নীলমণি তারা বীণামণ্ডলে (Lyra) অবস্থিত।

ভারতীয় ইতিহ-মতে বীণামণ্ডলে অভিজিৎ (বজ্র) "কশ্যপঃ (কচ্ছপঃ)"—গজকচ্ছপ এবং গরুত্মান্ (গরুড়) নিহিত আছে।

অভিজিৎ (বজ্রাগ্নি) ঐন্দ্রী শক্তির উচ্চতম বিকাশ। তাই অভিজিৎ (সর্ব্বতঃ জয়ী) বিশ্বজগতের শীর্ষ স্থানে অর্থাৎ ত্রিভুবনের নাভিভূত ইলস্পদে (১৷১৪৩৷৪ ঋ) ব্রহ্মাণ্ডের মহামেরুদণ্ড উপরে (Axis of the world) অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ শুন বেদধ্বনিঃ—"মূর্দ্ধা ভুবঃ ভবতি নক্তম্ অগ্নিঃ" * তারা কচ্ছপ কচ্ছপাকৃতি দ্যৌস্ (বিবস্বান্) দেবের বা গগনমণ্ডলের সঙ্কুচিত প্রতিমা এবং কশ্যপ নামে মহামেরুদণ্ড উপরে অধিষ্ঠিত। নীলমণি এই তারা-কচ্ছপের মুণ্ড গঠন করে।

তাই বেদে পড়িঃ—"কশ্যপঃ অষ্টমঃ। স মহামেরুম্ ন জহাতি" (তৈঃ ব্রাঃ ১৷৭৷১)। এই কশ্যপের ডিম্ব ফুটিয়া ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়াছিল। † তারা কশ্যপ পৌরাণিক মঞ্চে কশ্যপ ঋষি সাজিয়াছেন।

কশ্যপ সকল দেবের পিতা। কশ্যপ অরুণ, সূর্য্য এবং মরুৎগণের পিতা।

ভারতের আশ্রমে পুরাণ পাঠ করিয়া তুমি ভাবিতে এ সব আজগুবী কথা। সুমেরু-শৃঙ্গে বসিয়া তুমি দেখিতেছ যে সায়ংসন্ধ্যার পরে একে একে ৩৩ কোটী তারা উদিত হইতেছে। এক এক তারায় এক এক দেবতা আছে। "দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি" (তৈঃ ব্রাঃ ১)।

প্রভাতে দেখিতেছ যে, অরুণোদয়ের পর সূর্য্য উঠিতেছে। এবং দেব-রাত্রের

---

* (১০।৮৮।৬ ঋক) এই বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে য়ুরোপীয় ভাষ্যকারগণ অগ্নি অর্থে হিমাংশু চন্দ্রমা বলিতেছেন। অগ্নি অর্থে শীতরশ্মি হইলে বিষ অর্থে অমৃত হইবার বাধা কি?

† কশ্যপঃ কচ্ছপঃ। সঃ যৎ কূর্ম্মঃ নাম। তস্মাৎ অণ্ডঃ। সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ (শতপথ ব্রাঃ)।

অবসানে ক্রান্তিপাতিক দুর্য্যোগে ঘন ঘন বজ্রাঘাতে মরুৎগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। তাই এক বায়ু ৪৯ হইল।

আবার ঐ দেখ সূর্য্যোদয়ে কিরণজাল গরুড় অর্থাৎ ঈগল পক্ষীর ন্যায় আকাশে ...ীন হইল। দেখিতে দেখিতে মহামেরু-স্থিত গজকচ্ছপ উদরসাৎ করিল এবং ইলস্পদে স্থিত সোম অপহৃত হইল।

এ সব সুমধুর কবিত্ব-রস আস্বাদনে যিনি বঞ্চিত তাঁহার পুরাণ-পাঠে অধিকার নাই।

তাতার তৈমুর দিল্লীর রত্ন হরণ করেন। পুত্র আমীর উলুক বেগ হিন্দুর গণিতে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুর গৌরব হরণ করেন। মনীষি-প্রবর আমীরের তারা-তালিকায় নীলমণি গরুড় Waki (ঈগল) নামে বীণামণ্ডলে বসিল। হেলেস্পণ্ট পারে রাজা আল্‌ফন্‌সোর তারা-তালিকায় আমীরের 'Waki' 'Vega' নাম পাইল, তদবধি য়ুরোপীয় তারাচিত্রে বীণামণ্ডলে ঈগলের গলায় বীণা ঝুলিতেছে।

ডাক্তার Weber প্রমুখ য়ুরোপীয় সুধীগণ কোন্ মুখে বলেন যে তারামণ্ডল গঠনে গ্রীক জাতি হিন্দুর গুরু।

য়ুরোপে হিন্দুর হরিকেশ-মণ্ডল "Heraklis" (Hercules) নাম পাইয়াছে।

তারা হরিকেশ মার্ত্তণ্ড দেবের নাক্ষত্রিক প্রতিমা।

দ্যৌস্ (বিবস্বান্) মার্ত্তণ্ড দেবের নামান্তর। এবং য়ুরোপীয় সুধীগণ বলিয়াছেন যে দ্যৌস্ = Zeus।

বেদে (১০।৭২।৮ ঋ) পড়ি :—অষ্ট পুত্রের (অষ্ট বসুর) মধ্যে সপ্ত পুত্র লইয়া অদিতি স্বর্গে প্রস্থান করিলেন এবং অষ্টম পুত্র মার্ত্তণ্ড-দেবকে ফেলিয়া গেলেন।

দ্বৈপায়নের রসায়নে এই সরল ও সহজ ইতিহে মানবতার সঞ্চার হইল।

ভরণের চাকচিক্যে জগৎ বিমোহিত হইতেছে।

মহাভারত-মতে (১।৯৯) অষ্ট বসু বন-ভ্রমণে মিত্রাবরুণি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন।

কনিষ্ঠ দ্যৌ দেব মহামেরুবাসী বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীকে অপহরণ করিয়া পাপে পতিত হইলেন। আকাশ-গঙ্গার তীরবাসী আপ-বশিষ্ঠের অভিসম্পাতে অষ্ট বসু আকাশগঙ্গারূপিণী মাতা অদিতির গর্ভে মর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিলেন। সপ্ত বসু জন্ম মাত্রে মুক্তি লাভ করিলেন। কনিষ্ঠ দ্যৌ মার্ত্তণ্ড দেবব্রত ভীষ্ম নামে মর্ত্তে রহিয়া গেলেন। তারা হরিকেশ মার্ত্তণ্ডদেবের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। দেবব্রত গাঙ্গেয় ভীষ্ম তথায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ঐ দেখ নভঃ সরিৎবাসী পরশুরামের (Perseus) প্রিয় শিষ্য দিব্যবাণ (Sagitta) দ্বারা আকাশ-গঙ্গার গতি রোধ করিতেছে আবার হংসরূপী (Cygmes) সপ্তর্ষি শরশয্যায় শয়ান গাঙ্গেয়ের সমীপে মাতৃসন্দেশ প্রদান করিতেছে। সেই হংসে আরোহণ করিয়া আকাশ-সরস্বতী বীণামণ্ডলস্থিত কাচ্ছপী বীণা ধারণে বীণাপাণি হইয়াছেন।

হরিকেশের (Hercules) তলে দ্বিতীয় গরুড় (Aquila) বা ঈগল বিদ্যমান আছে।

এখন একবার হেলেস্পণ্টের অপর পারের ইতিহ স্মরণ কর।

হার্ম্মিস্ (Hermes) অর্থাৎ বুধ কচ্ছপ বিদ্ধ করিয়া তাহার কঙ্কালে বীণা নির্ম্মাণ করেন। এই বীণা হইতে কচ্ছপমণ্ডল (Xelos) বীণা (Lyra) নাম গ্রহণ করিল। এই বীণার প্রহারে হিরাক্লিস্ বীণা গুরু লীনস্‌কে হত্যা করেন।*

উপপত্তি

গগনের এই খণ্ডের তারাচিত্রে আমরা পাই যে, মহামেরুদণ্ড উপরে অভিজিৎ বজ্র এবং ঈগল অধিষ্ঠিত আছে। হরিকেশ মণ্ডলে মার্ত্তণ্ড দেব এবং গরুড়-মণ্ডলে ঈগল অধিষ্ঠিত আছে।

এই বজ্র বৃত্রঘ্ন নামে পারসীগণের উপাস্য। এবং এই বজ্র শর্ব্বরীনাথের শিরে রাখিয়া হিন্দু "বজ্রায় ফট্" বলিতেছেন।

এই বজ্র হরিকেশ মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবতা জিউস্‌দেবের করে শোভা পাইতেছে এবং তাহার অপর করে মহামেরুদণ্ড। তারা ঈগলদ্বয়ের একটী এই মহামেরুদণ্ড-উপরে, অপরটী জিউস দেবের পদতলে। এই আধি-দৈবিক চিত্র হইতে জিউস দেবের আধি-ভৌতিক মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিবার কোন সহজ পথ নাই। ইহাই আমাদের ধ্রুব ধারণা। তবে উত্তর পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, এই তারা-চিত্র য়ুরোপীয় সুধীগণের চিত্ত আকর্ষণ কখন করে নাই।

চিন্তাশীল পাঠকের করে মীমাংসার ভার অর্পণ করিয়া আমরা অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তারা-দর্শক।

বরিশালে নবান্ন

"নবান্ন" শব্দটী শুনিলে বরিশালবাসীর হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার ও আনন্দের উদয় হয় অন্য কোন দেশবাসী তাহা ধারণাই করিতে পারে না।

যে প্রবাসী ব্যক্তি নবান্নের দিনে ঘরে আসিতে পারিল না, সে আপনাকে দুর্ভাগা বলিয়া মনে করে। তাহার পরিবারগণ নবান্নের দিনে বিষণ্ণ হৃদয়ে শতবার তাহাকে স্মরণ করে।

রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত নবান্নের উৎসবে আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; সে উৎসাহ, সে উল্লাস, সে আনন্দ, ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব; তথাপি সংক্ষেপে কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

আপনি দেখিতে পাইবেন, নবান্নের পূর্ব্ব রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে সকল গৃহের বালক-বালিকাগণ জাগ্রত হইয়াছে এবং

* তু। ইন্দ্র অশ্বিদ্বয়ের বীণা গুরু মধু বিদ্যাবিশারদ দধীচি মুনির মুণ্ড ছেদন করেন

দলে দলে ঘরের বাহির হইয়া পক্ষিগণের কলরবের সঙ্গে তাহাদের বাল-কণ্ঠ মিশাইয়া উচ্চৈঃস্বরে এক প্রকার সুর ধরিয়া দাঁড় কাকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছে; সে নিমন্ত্রণের সঙ্গীত বা ছড়া এই,—

কো কো কো, আমাগো বাড়ী শুভ নবান্ন।
শুভ নবান্ন খাবা কাক বলি লবা
পাতি কাউয়া লাথী খায়,
দাঁড় কাউয়া কলা খায়,
কো কো কো মোরগো বাড়ী শুভ নবান্ন।"

এই নিমন্ত্রণ-সঙ্গীতের ভাষাটীর বিনা টীকায় রস গ্রহণ করা পশ্চিমবঙ্গের পাঠকগণের পক্ষে কষ্ট সাধ্য, তাই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

"কো, কো, কো," একটী কাককে সম্বোধন; "আমাগো বাড়ী" অথবা "মোরগো বাড়ী" কথার অর্থ আমাদের বাড়ী। "কাক বলি" অর্থ কাককে যে খাদ্য দেওয়া হয়। "কাক বলি" অর্থাৎ কাককে "নবান্ন" না দিয়া কেহই নবান্ন গ্রহণ করিতে পারে না, আজ কাকই সর্ব্ব প্রধান অতিথি। "পাতি কাউয়া" অর্থ পাঁতি কাক, পাঁতি কাককে নিমন্ত্রণ করা হয় না, দাঁড় কাকই আজ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। প্রত্যূষ হইতে চারিদণ্ড বেলা পর্য্যন্ত এইরূপে পল্লীর সমস্ত বাগান ও রাস্তা-ঘাট বালকবালিকাদিগের নিমন্ত্রণ-সঙ্গীতে মুখরিত হইতে থাকে।

এই সঙ্গীত ক্ষান্ত হইতে না হইতে পুরঙ্গণাগণের উলুধ্বনিতে গগনমণ্ডল নিনাদিত হয়। উলুধ্বনিকে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় "জোকার" বলে, "জয়কার" শব্দ হইতে জোকার শব্দের উৎপত্তি কি না সাহিত্যাচার্য্যগণ তাহার মীমাংসা করিবেন। প্রথম বারের জোকার-ধ্বনিতে বুঝিতে হইবে যে, নবান্নের জন্য নূতন চাউল ঢেঁকিতে কোটা আরম্ভ হইয়াছে, এক এক দফায় তিনবার করিয়া জোকার দিতে হয়, ইহাকে তিন ঝাঁক জোকার বলে। কিছুক্ষণ পরে আবার জোকার ধ্বনি হইলে বুঝিতে হইবে নবান্নের জন্য নারিকেল ভাঙ্গা হইতেছে। এইরূপ নবান্নের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোকার। যখন ঘরে ঘরে এইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে উলুধ্বনি উঠিতে থাকে, তখন সমস্ত পল্লীটী সত্য সত্যই উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠে। সমারোহটা যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, এই সকল অনুষ্ঠান উহাকে বৃহৎ করিয়া তুলে। বালক-বালিকাদিগের ত কথাই নাই বয়স্ক নরনারীগণের হৃদয়ও আনন্দে আপ্লুত হয়।

বেলা প্রায় ১০টার সময় ঘরের বৃদ্ধ পুরুষ-গণ পিতৃশ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হন, সে কাজের সঙ্গে শুধু তাঁহাদের এবং পুরোহিতগণের সম্বন্ধ। বালকবালিকাগণ স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করে, আজ তাহাদের প্রভাতের আহার বন্ধ, সমস্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে কাহারও আহার করার বিধি নাই, কিন্তু এই সংযমে আজ কেহই কাতর নহে, সকলের মুখই উৎফুল্ল, কেননা আজ তাহাদের "নবান্ন"। বানরিপাড়ার গুহ ঠাকুরতা, গাভার ঘোষ দস্তিদার, চাঁদশীর বসু মজুমদার প্রভৃতি কতগুলি কুলীন বংশের একটী বিশেষ প্রথা আছে। তাহার নাম "বীর বাঁশ"। অন্দর-মহলে মধ্য উঠানে একটা প্রকাণ্ড আস্ত বাঁশ পোতা হয়, সেই বাঁশের প্রত্যেক কঞ্চিতে নূতন ধানের ছড়া বাঁধিতে হয়, ইহারই নাম

"বীর বাঁশ"। যেখানে বীর বাঁশটী পোতা হইবে তাহার চারিদিকে অনেকটা স্থান পিঠলী দিয়া আলিপন দেওয়া হইয়া থাকে, একটী জ্যান্ত কই মাছ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কিছু দুধ ঢালিয়া সেই গর্ত্তে বীর বাঁশ পুতিতে হয়, যিনি বাড়ীর বা ঘরের কর্ত্তা তিনিই এ কার্য্য সম্পাদন করেন, পুরোহিতও সাহায্য করিয়া থাকেন, ইহার জন্যও মন্ত্র আছে।

বীর বাঁশের কথায় একটী কথা মনে পড়িল, একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছি বড় দিনের সময় সুইজারল্যাণ্ডে গৃহস্থের বাড়ীতে ঠিক এইরূপ একটী আস্ত বাঁশ পোতা হইয়া থাকে, তাহারও প্রতি কঞ্চিতে যবের ছড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সুইজারল্যাণ্ডের এই রীতির সহিত বরিশালের "বীর বাঁশের" কোন সম্বন্ধ আছে কি না কে নির্ণয় করিবে?

"নবান্ন" উপলক্ষে লক্ষ্মী পূজা করিতে হয়, এবং সর্ব্বাগ্রে শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে নবান্ন দিয়া পরে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। লক্ষ্মী-পূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও বীর বাঁশ পোতা হইয়া গেলে তবে "কাক বলির" পালা আরম্ভ হইল। যেমন দেবতা ও পিতৃলোককে স্মরণ ও অর্পণ না করিয়া হিন্দুসন্তান নবান্ন গ্রহণ করে না, তেমনই আজিকার নিমন্ত্রিত কাককে অগ্রে না দিয়া কেহই নবান্ন ভোজন করিতে পারে না, তাই একটা কলার ডোঙ্গায় (ঠোঙ্গা নহে) "চাউল মাখা", কলা ও নারিকেল লাড়ু লইয়া বাড়ীর কর্ত্তা মহাশয় কাক খুঁজিতে বাহির হইলেন। যে দুষ্ট কাক ছেলের মাথায় ঠোকর মারিয়া ছেলে কাঁদাইয়া মুখের কলা কাড়িয়া লইয়া যায়, যাহাদের যন্ত্রণায় ঘরের জিনিষ সামলাইয়া রাখা যায় না, নিমন্ত্রণ পাইয়া আজ তাহাদের গুমর বাড়িয়া গিয়াছে, গ্রামময় নিমন্ত্রণ, কাজেই আজ খোসামোদ করিয়া তাহাদিগকে পাওয়া যাইতেছে না, সত্য সত্যই আজকার কাকের ব্যবহার অমার্জ্জনীয়। "কোথায় কাক কোথায় কাক" করিয়া ডোঙ্গা হাতে ক্ষুধিত-বৃদ্ধ চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোন গাছে একটা কাক দেখিলে সেই গাছ-তলায় মিষ্টান্নের ডোঙ্গাটা রাখিয়া দূরে আসিয়া লুকাইয়া দেখিতেছেন, কাক মহাশয়ের দয়া হয় কি না, কিন্তু কাকরাজ অতি বুদ্ধিমানের মতন চক্ষুটাকে এক গোলক হইতে অন্য গোলকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কোন্ ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা অধম মনুষ্য কিছুতেই বুঝিতে পারে না। এদিকে বালক-বালিকাগণের এমন কি যুবক-বৃদ্ধগণের পর্য্যন্ত পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে "কাকবলি" না হইলে, নবান্ন খাওয়া হয় না।

বড় ভাগ্যে যদি কাক মহাশয় অনেক বিবেচনার পরে আসনে আসিয়া বসিলেন এবং চঞ্চু-সংযোগে চাউল মাখার স্বাদ লইয়া কদলীটী মুখে করিয়া পলায়ন করিলেন, তখন সকলের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। "কাকবলি" হইয়া গিয়াছে শুনিয়া ছেলে-মেয়ে-গুলি আনন্দে নাচিতে লাগিল।

কলাটী মুখে করিয়া কাক কোন্ দিকে উড়িয়া গেল তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, কেননা বৎসরের শুভাশুভ অনেকটা উহার উপর নির্ভর করে। কোন্ দিকে গেলে শুভ

হয় কোন্ দিকে গেলে অশুভ হয় তাহা আমার মনে নাই।

"কাকবলি"র পরে নবান্ন-ভোজনের পালা। বিস্তৃত আঙ্গিনায় আসন পাতা হইয়াছে, এক বাড়ীতে যত ঘর গৃহস্থ আছে (কোনও প্রকারের প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে) সকলেই এক সঙ্গে আহারে বসিয়া থাকে। সমস্ত বয়স্ক পুরুষ ও বালক বালিকাগণই আজ পাশাপাশি হইয়া বসিয়াছে। চাউল মাখার জন্য সকলেরই রসনা লালায়িত, তাই "চাউল মাখা" জিনিসটা যে কি তাহার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি।

পাঠক-পাঠিকা হয়ত মনে করিয়াছেন কতকগুলি চাউল কলা ও চিনি দ্বারা চট্কান পিণ্ডির নাম "চাউল মাখা", আসল কথা তাহা নহে। চাউল মাখা অতি সুস্বাদু চমৎকার খাদ্য। পূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে উলুধ্বনি দিয়া পুরাঙ্গনাগণ চাউল কুটিয়া গুড়ো করিয়াছেন, সেই গুড়োর সঙ্গে প্রায় সমান পরিমাণ নারিকেল বাটা দিয়া জলে কিম্বা ডাবের জলে অথবা নূতন খেজুর রসে গুলিয়া সিন্নির মতন তরল করিয়া উহাতে চিনি কিম্বা নূতন খেজুরী গুড়, কর্পূর প্রভৃতি দেওয়া হয়, ইহারই নাম "চাউল মাখা"। বস্তুটী যেমনই মুখরোচক তেমনই সহজ-পাচ্য, আকণ্ঠ পুরিয়া "চাউল মাখা" খাইলেও পরিপাকের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। একটী কথা মনে রাখিতে হইবে, "চাউল মাখা"র যদি নারিকেলের ভাগ কম পড়ে, তবে উহা সহজে জীর্ণ হয় না, চাউল মাখাকে "চাউল জল" নামেও অভিহিত করা হয়।

পাথরে বা থালায় (পাথরই প্রশস্ত) চাউল মাখা ঢালিয়া তাহাতে বড় বড় নারিকেলের লাড়ু ও ফোপড় দিয়া সাজাইয়া প্রত্যেক ঘরের গৃহিণী আপনাপন ঘরের লোকদিগকে সর্ব্বাগ্রে পরিবেশন করেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে জোকার পড়িতে থাকে। প্রত্যেককেই নিজের নিজের ঘরের নবান্ন আগে খাইতে হয়। এক সঙ্গে ৪০।৫০ জন লোক যখন "চাউল জল" খাইতে আরম্ভ করে তখন হাপুস্ হুপুস্ শব্দের দিব্য একটা একতান-বাদ্য বাজিতে থাকে, এই নবান্ন সভায় খানাবাড়ীর প্রজা, চাকর বাকর এবং রামা নাপিত ও শ্যামা ররামি একই চন্দ্রাপত-তলে স্থান প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের পাতে "চাউল মাখা" দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রান্ত পুরনারীগণ উলুধ্বনি করিয়া থাকেন। পুরুষদিগের নবান্ন হইয়া গেলে মেয়েরা এক সঙ্গে নবান্ন করেন, এইরূপে দিনের পালা হইলে পরে

রাত্রির পালা।

যার যতদূর সাধ্য সেইরূপে রাত্রির ভোজের আয়োজন হইবে। তবে বহু পরিবারেই এইরূপ নিয়ম আছে যে অন্ততঃ ২০।২২ কি ২৪ রকমের রান্না করিতেই হইবে। কতকগুলি তরকারী আর কয়েক প্রকারের পিঠা একান্ত আবশ্যক। মানকচু ও মেটে আলুর একটা তরকারী করিতেই হইবে, উহাতে বড়ী ভাজা, নারিকেলের "চিলু" ভাজা এবং "চৈ" প্রভৃতি দিতে হয়। এই সুখাদ্য তরকারীর নাম "আলু কচুর শাগ"। একটা "শোল মূলা"ও অবশ্য প্রয়োজনীয়। লাউয়ের তরকারী না হইলে নরোত্তমপুরের রায় মহাশয়দিগের এবং অন্যান্য অনেক

পরিবারের নবান্ন হইতে পারে না। একটী ছোট লাউয়ের মূল্য এক টাকা হইলেও উহা কিনিতে হইবে। এইরূপ বিভিন্ন পরিবারে অনেক বস্তু অত্যাবশ্যক। "চন্দ্রকাইট" নামক এক প্রকারের পিঠা না হইলেই নয়, সকলকেই উহা প্রস্তুত করিতে হয়। রাত্রের নবান্নে মৎস্য মাংস অবাধে চলিতে পারে। রাত্রের আহার নিজ নিজ ঘরে বসিয়াই হয়, এ সময়ও পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি চলিতে থাকে। পরের দিনের পালার নাম

বাস-নবান্ন বা বাসি-নবান্ন।

কল্য যে সকল দ্রব্য রান্না হইয়াছিল সে সকলের অর্দ্ধেক অংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। সেই সমস্ত তরকারী ও পিষ্টক আজ খাইতে হইবে। শুধু ভাতটা রান্না করা হয়। গরম গরম ভাত আর বাসী তরকারী ও পিষ্টকাদি দ্বারা বাস-নবান্ন সম্পন্ন হয়।

মুসলমানের নবান্ন।

হিন্দুর অনুকরণে অনেক কৃষক-মুসলমান নবান্ন করিয়া থাকে। নবান্নের পূর্ব্বে একজন হিন্দুর সহিত আত্মীয় হিন্দুর দেখা হইলে প্রধান প্রশ্নই এই হয় যে "তোমাদের নবান্ন কবে?" সেইরূপ মুসলমানও মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করে "মিঞাভাই, নয়া খাবা কবে?" তাহারা হিন্দুর মতন যথাযথ আচরণ না করিলেও "নয়া খাওয়া"টাকে একটা পর্ব্ব বলিয়া মনে করে এবং তদুপলক্ষে আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকে।

নবান্নের হাট।

নবান্নের পূর্ব্বে যে দিন হাট কি বাজার বসে, সে দিন দু'ঘণ্টার মধ্যে হাট-বাজারের সমস্ত জিনিষ কোথায় উড়িয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। ঐ সময়ে প্রত্যুষে হাটে না গেলে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাওয়া কঠিন।

নবান্নের দিন।

সকলের নবান্ন একদিনে হয় না, কোনও বৎসর নবান্নের অনেকটা দিনও থাকে। তবে এক পাড়ার কি এক বংশের লোকেরা যথাসাধ্য এক সঙ্গে নবান্ন করার চেষ্টা করে। যাহাদের "নবান্ন" পূর্ব্বে হইয়াছে, পরবর্ত্তী নবান্নকারীরা তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে। বাড়ীতে "নবান্ন" না করিয়া কেহই পরের বাড়ীতে "নবান্ন" করে না। তবে কখন কখন সেইরূপ আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের জন্য সমস্ত খাদ্যই পুরাতন চাউল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। এরূপ ঘটনা খুব বিরল।

উপসংহার।

সংক্ষেপে নবান্নের বিবরণ বলিলাম। উপসংহারে কি বলিবার আছে। যে মহিলাগণ নবান্নের জিনিষপত্র প্রস্তুত করিবেন তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব দিন সংযম করিতে হয় অর্থাৎ এক বেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া থাকিতে হয়। নবান্নের দিন প্রাতে তাঁহারা স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করেন এবং অন্তরে বাহিরে শুচি হইয়া চাউল মাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরেই এইরূপ এক একজন সংযমী চাই। কেননা "নবান্ন"-উৎসবটী শুধু একটা আনন্দোৎসব নহে। উহা ধর্ম্ম-কার্য্য। এই প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বাল্যস্মৃতি মনে উদিত হইয়া প্রাণকে কোথা হইতে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বালকবালিকাদিগের সেই সুধামাখা কণ্ঠস্বর, কাকদিগকে নিমন্ত্রণ করার জন্য ব্যাকুলতা,

পুরমহিলাগণের "জোকার" বা জয় জয়কার ধ্বনি, দেবতা ও পিতৃ-পুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন, ব্রতীর সংযম এবং পরিজনগণ ও আশ্রিতগণের সহিত নবান্ন-ভোজন, এই সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া ইহলোক পরলোকের স্মৃতি লইয়া বরিশালবাসীর প্রাণে "নবান্ন" শব্দটী যে ভাব প্রকাশ করে অন্য দেশের লোকেরা তাহা বুঝিতে পারিবে না।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

২য় স্তর

)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি একজনমাত্র লোক কাদার ম্যাডেলিনের প্রতি সন্দিগ্ধ ছিল;—সে জাভার্ট,—পুলিশের দারোগা। পুলিশের লোকেরা প্রায়ই ক্ষমতাস্পর্দ্ধী এবং নীচপ্রকৃতিক হয়। জাভার্টের তেজ পূর্ণমাত্রাতেই ছিল, কিন্তু নীচতা সে কখনই জানিত না। মানুষের আত্মা যদি মানুষের চক্ষে প্রতিভাত হইত, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেক বিভিন্ন মানবের মধ্যে মানবেতর কোন না কোন জীবের প্রতিচ্ছবি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম। শম্বুক হইতে শ্যেন, শূকর হইতে ব্যাঘ্র—সব জন্তুরই প্রকৃতি মানব-চরিত্রে বর্ত্তমান;—কখনও তাহা একক, কখনও বা একাধিকের মিশ্রণ। আমার মনে হয়, নিকৃষ্ট জীবেরা আমাদেরই পাপ-পুণ্যের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। ভগবান তাহাদের দেখাইয়া আমাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দেন। তবে তাহাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে,—তাহারা ছায়ামাত্র; তাই তাহাদের মধ্যে পূর্ণজ্ঞানের বিকাশ হয় না; আর আমরা কায়া, সত্য, আমাদের একটা, সার্থকতা আছে,—তাই ভগবান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তির জন্য আমাদের আত্ম শিক্ষার প্রয়োজন। এ বিষয়ে সামাজিক শিক্ষাই প্রশস্ত শিক্ষা, তবে তাহা যথার্থতঃ দেওয়া চাই। অবশ্য বাহ্য জীবন লইয়াই আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি। মানবেতর জীবসমূহের চরম পরিণতি কি, বা তাহার সার্থকতা কোথায়—সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। তবে, তাহাদের এ আপাতঃ জীবনের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম কোন জীবন নাই-ই—এ কথা কেমন করিয়া বলিব?

বলিতেছিলাম জাভার্টের কথা। তাহার জন্ম হয় কারাগারে। বাপ গ্যালির কয়েদী, মা জিপসি (হা-ঘরে)—রমণী। সাধারণ সমাজে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল না। বোধ হয় সেইজন্যই জিপসি জাতির প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ছিল। সে দেখিল সমাজে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোকের কোন স্থান নাই;—এক, যাহারা সমাজদ্রোহী; অপর, যাহারা সমাজ রক্ষা করে। জাভার্ট

ভাবিল তাহাকে দু'য়ের মধ্যে একটা হইতে হইবে। তাই সে পুলিশ-বিভাগে প্রবেশ করিল; এবং সুযশ অর্জ্জন করিয়া চল্লিশ বর্ষ বয়সে ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হইল। দক্ষিণ-দেশের গ্যালিসমূহে সে প্রথম প্রথম নিযুক্ত হয়। কার্য্যতৎপরতা এবং সাধুতা তাহার জীবনের মূলসূত্র ছিল। আইনের মর্য্যাদা সংরক্ষণ এবং বিদ্রোহীর দমন তাহার জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল।

তবে, বেশী বাড়াবাড়িতে ভাল জিনিষও বিকৃত হইয়া যায়; জাভার্টেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহার চক্ষে,—একপক্ষে, চুরি হইতে খুন জখম ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ পাপ; অপরপক্ষে, প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য চৌকিদার পর্য্যন্ত;—সব এক পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। আইনলঙ্ঘী কাহাকেও সে কখন ক্ষমা করিত না। একদিকে সে যেমন বলিত—"হাকিম কখনও অন্যায় করে না, সরকারী কর্ম্মচারীর কখনও ভুল হয় না।" অপরপক্ষে তেমনই বলিত—"ও সব লোকের আত্মার কখনো মুক্তি নেই। তাদের দিয়ে কখনো জগতের কোন উপকার হতে পারে না।" যাহারা ভাবে যে মানবকৃত শাসনপদ্ধতি দানবকে মানব হইতে পৃথক করিয়া দেয় (না, মানবকে দানবে রূপান্তরিত করে?)—তাহাদের মতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল; যুক্তিবিচার তাহার কাছে বড় একটা ছিল না; গম্ভীর, কঠোর, সাদাসিধা অথচ উদ্ধত ধর্ম্মান্ধের ন্যায়ই তাহার প্রকৃতি; চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র, অনুরাগলেশবর্জ্জিত; 'সজাগ এবং সতর্ক' থাকাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সকল বন্ধুর পথের মধ্যেও সে আপনার সোজা পথ কাটিয়া লইত। কার্য্য-পটুতার মাপকাঠিই তাহার বিবেক এবং কর্ত্তব্যপালনই তাহার ধর্ম্ম ছিল,—সেখানে স্নেহ দয়া মায়া কিছুরই স্থান ছিল না; গ্যালি হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলে আপন পিতাকেও সে ক্ষমা করিত না,—সে ক্ষেত্রেও বুদ্ধি বা কর্ত্তব্যসম্পাদনের আত্মপ্রসাদ সে উপভোগ করিত। নির্জ্জনতা, আত্মত্যাগ এবং চরিত্রের পবিত্রতা—ইহা লইয়াই তাহার জীবন ছিল। ভিডক (Vidocq) এবং ব্রুটাসের (Brutus) একত্র সংযোগ যদি অনুমান করিতে পার, তবেই জাভার্টের চরিত্র বুঝিতে পারিবে।

জাভার্টের পূর্ণ মূর্ত্তিখানা সহজে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না। তাহার ক্ষুদ্র ললাট টুপিতে, চক্ষুদ্বয় ভ্রূর ঘনরোমে, চিবুকের অগ্রভাগ গলাবন্ধে সর্ব্বদাই আবৃত থাকিত; কিন্তু আবশ্যক হইলে, কোথা হইতে একটা দুঃস্বপ্নের ন্যায় সহসা তাহার সম্পূর্ণ মূর্ত্তিখানা প্রকাশিত হইয়া পড়িত। সে ক্ষুদ্র মস্তক, আস্তৃত চিবুকাস্থি, নাসিকার উভয় পার্শ্বে হরিণশৃঙ্গের ন্যায় আকুঞ্চিত রেখাদ্বয়, মাংস-বহুল দন্তপাতি, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী ভ্রুকুটির ভাব—যে-ই দেখিত সে-ই সশঙ্কিত হইত; বিশেষতঃ জিপ্‌সিরা,—তাহার নাম শুনিলেই তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইত। তবে জাভার্টও মানুষ ছিল, তার প্রধান প্রমাণ—আত্মপ্রসাদ ঘটিলে মাঝে মাঝে দু'এক টিপ নস্যগ্রহণ; তার অন্য নেশা কিছু ছিল না।

তাহার সকল কার্য্যের মধ্যে, সব সময়েই ম্যাডেলিনের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত।

বহু অনুসন্ধানের ফলে, অবশেষে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত এবং বংশ-পরিচয় পাইয়াছে বলিয়া তাহার দৃঢ় ধারণা হইল; তখন সে কথাচ্ছলে পরোক্ষভাবে দু'এক জনকে সে কথা জানাইল। কিন্তু তাহার সে অনুসন্ধান-সূত্র অকস্মাৎ একদিন ছিন্ন হইয়া গেল; 'খেই' হারাইয়া জাভার্ট কয় দিন আরও গম্ভীর হইয়া রহিল।

ম্যাডেলিন ক্রমশঃ তাহার সন্দেহ কি বুঝিলেন; কিন্তু বুঝিয়াও তাহাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা বা তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকা—দু'য়ের একটাও করিলেন না; যেন লক্ষ্যই করেন নাই এইভাবে তাহার তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি এবং বিরক্তিকর ব্যবহার সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সে সহজ আচরণে, এবং নিরুদ্বিগ্ন মুখভাব দেখিয়া জাভার্ট কতকটা দমিয়া গেল। ভাবিল—"তাই ত! তবে কি একটা মিথ্যা সন্দেহের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি?"—পাশবিক সংস্কারের ত্রুটী এইখানেই যতই আপাত বলবান হউক, সময় বিশেষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে উচ্ছিন্ন হইতেই হয়; তাহা না হইলে, জ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর আসন সে দখল করিয়া বসিত, এবং মানব অপেক্ষা সাধারণ পশুই উন্নততর জীবনের অধিকারী হইত।

পরবর্ত্তী একটা ঘটনায় কিন্তু জাভার্টের মনে পূর্ব্বসন্দেহ ফিরিয়া আসিল। ঘটনাটা এই:—

সে দিন প্রাতঃকালে বৃদ্ধ ফসিলিভান্ট মাল-বোঝাই গাড়ীখানা লইয়া যাইতে যাইতে, অকস্মাৎ গ্রহের ফেরে ঘোড়াটার পা বাধিয়া যাওয়ায়, ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া একেবারে গাড়ীর নীচে পড়িয়া যায়,—গাড়ীর সমস্ত ভার পড়িল তাহার বুকের উপর;—পড়িয়া পড়িয়া বৃদ্ধ তখন গোঙাইতে লাগিল। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল;—ফলে হিতে বিপরীত হইল; গাড়ীখানা কর্দ্দমের মধ্যে আরও বসিয়া গিয়া বৃদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিল। সকলে তখন সন্ত্রস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিল। এমন সময়, ম্যাডেলিন সে পথ দিয়া যাইতে যাইতে জনতায় আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিল। বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া ম্যাডেলিন শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; তখন গাড়ী হইতে মালপত্র নামাইবার উপায়ও নাই, সামান্য নাড়া-চাড়াতেই সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।

"বাঁচাও, কে আছ বৃদ্ধকে বাঁচাও!"—অতি ক্ষীণ আকুল যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি!

ম্যাডেলিন জনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কোন পালোয়ান কি এখানে নেই?"

"আজ্ঞে, আন্‌তে লোক গেছে।" জাভার্ট ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পালোয়ান ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছিল।

"কখন্ সে আসবে?"

"অন্ততঃ মিনিট পনের ত বটেই।"

"পনের মিনিট! সর্ব্বনাশ!" ম্যাডেলিন প্রমাদ গণিলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বরাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় মাটি নরম থাকায় শকটের ভার

প্রতিমুহূর্ত্তেই বৃদ্ধের বক্ষের উপর চাপিয়া বসিতেছিল। আর পাঁচ মিনিটেই বুঝি তার অস্থিপঞ্জর চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে! উপায়?—

ম্যাডেলিন বলিলেন—"দেখ অতক্ষণ অপেক্ষা করা চল্‌বে না। আমি বলি কি, তোমাদের মধ্যে একজন হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ীর নীচে গিয়ে পিঠের চাপ দিয়ে গাড়ীখানা নীচে থেকে তুলে ধর—আধ মিনিটে বৃদ্ধ বেঁচে যাবে। নইলে আর কোন উপায় নেই। তোমাদের মধ্যে কারও কি সে বল বা সে সাহস নেই? দেখ, যে যাবে, তার এই পাঁচ মোহর!"

কেহ নড়িল না।

"আচ্ছা, দশ মোহর।"

সকলে অবনতমুখ হইয়া রহিল।

একজন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"এমন অসম্ভব শক্তি কার তা ত জানি নে;—শেষে তাকেও না পিষে মর্‌তে হয়!"

"ভাল, বিশ মোহর!"

এই ফসিলিভাণ্টই ম্যাডেলিনের পরম শত্রু ছিল; ছিদ্র পাইলেই সে তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। তার কারণ ছিল;—তারও একদিন স্বাচ্ছন্দ্যের দিন গিয়াছে; অবস্থাবিপর্য্যয়েই আজ তাহাকে তাহার শেষ সম্পত্তি সেই শকটখানি লইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইতেছে; তাই সে ম্যাডেলিনের অচির-লব্ধ ঐশ্বর্য্যে এত ঈর্ষান্বিত হইত।

উৎকণ্ঠিত হইয়া ম্যাডেলিন হাঁকিলেন—"বিশ মোহর দেবো—কে যেতে চাও, শীঘ্র এস।"

তখন কে একজন বলিয়া উঠিল—"যেতে চাওয়ার কথা ত এ নয়, মশায়—"

ম্যাডেলিন ফিরিয়া চাহিলেন। সে উত্তরকারী—জাভার্ট।

জাভার্ট বলিল—"যেতে চাওয়ার কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে—শক্তি। এই পর্ব্বতের মত বোঝাটা পিঠে করে ঠেলে তুলতে পারে, এমন অসম্ভব শক্তিশালী লোক কোথায়?" তার পর ম্যাডেলিনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"তবে এমন একজনকে আমি এক সময় জানতাম বটে!"—ম্যাডেলিন শিহরিয়া উঠিলেন।

জাভার্ট তাঁহার মুখ হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়া অথচ যেন সহজভাবে বলিয়া চলিল—

"সে একজন কয়েদী।"

"হুঁ।"

"তুঁ্যলর গ্যালিতে সে ছিল।"

ম্যাডেলিনের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

শকটখানা ইতিমধ্যে ক্রমশঃই বসিয়া যাইতেছিল। ফসিলেভাণ্ট চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওঃ ওঃ, মলাম—মলাম!—হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে গেল। কেউ বাঁচতে পারলে না গো!"

ম্যাডেলিন জনতার দিকে ফিরিলেন। "তোমাদের মধ্যে এমন কেউই কি নেই যে এই কুড়িটা মোহর নিয়ে একে বাঁচায়!"

জনমণ্ডলী স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল। জাভার্ট বলিতে লাগিল—"একজন লোককে আমি জানি একমাত্র যার দ্বারা এ কাজ সম্ভবপর হতে পারে। সে সেই কয়েদী।"

"ওঃ মরে গেলাম, মরে গেলাম!"—বৃদ্ধ পুনরায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

ম্যাডেলিন ভূমিসংলগ্নদৃষ্টি হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন, বৃদ্ধের আর্ত্তনাদে মুখ

তুলিলেন; একবার জাভার্টের তীক্ষ্ণ শ্যেন-দৃষ্টির প্রতি একবার নিশ্চল জনমণ্ডলীর প্রতি চাহিলেন; একটা বিষাদের হাস্যলেখা তাঁহার ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল। তার পর চকিতের মধ্যে জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িয়া, কেহ তাঁহাকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই হামাগুড়ি দিয়া শকটের নীচে যাইয়া পৌছাইলেন।

জনমণ্ডলী স্তব্ধ, নির্ব্বাক! একটা গম্ভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের ছায়া সকলেরই মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

দুই দুইবার ম্যাডেলিন, তাঁহার জানু ও কনুই একত্র করিবার চেষ্টা করিলেন—দুই বারই তাঁহার সে প্রয়াস বিফল হইল। তখন সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল —"ফাদার ম্যাডেলিন,—ফিরে আসুন, ফিরে আসুন।" মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াও বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"আপনি যান, চলে যান। আমি ত মরবই, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও কেন মরবেন?"—ম্যাডেলিন কোন উত্তর দিলেন না।

সেই বিশাল জনতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে দণ্ডায়মান রহিল। ম্যাডেলিনের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ তখন রুদ্ধপ্রায়;—ইচ্ছা থাকিলেও, বুঝি আর তাঁহার তখন ফিরিবার উপায় ছিল না।

সহসা সে বিশাল স্তূপ কম্পিত হইয়া উঠিল, শকটের চক্রদ্বয় ধীরে ধীরে কর্দ্দম হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া উঠিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ম্যাডেলিন বলিয়া উঠিলেন—"এইবার—শীঘ্র নাও।"

সকলে ছুটিয়া আসিল। একজনের চেষ্টায় সকলের মনে তখন সাহস ও শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ জনে ধরাধরি করিয়া তখন সে শকটখানা তুলিয়া ধরিল। বৃদ্ধ ফসিলে-ভাণ্ট রক্ষা পাইল।

ম্যাডেলিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ তখন পাংশুবর্ণ, স্বেদসিক্ত; বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন, কর্দ্দমাক্ত। সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ ফসিলিভাণ্ট ম্যাডেলিনের পদদ্বয় চুম্বন করিয়া বলিল—"বাবা, তুমিই আমার ভগবান।" ম্যাডেলিনের মুখে তখন এক দেবদুর্লভ অপূর্ব্ব সুখ-যন্ত্রণার মাধুরীর ছায়া পরিব্যাপ্ত; ধীর প্রশান্ত দৃষ্টিতে তিনি একবার জাভার্টের প্রতি চাহিলেন,—জাভার্ট তখনও একদৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া ছিল।

বৃদ্ধ ফসিলিভাণ্ট প্রাণে রক্ষা পাইল বটে, —কিন্তু চিরজন্মের মত খঞ্জ হইয়া গেল। ম্যাডেলিন তাহার শরীর সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে আপন কারখানা-বাটীর আতুরাশ্রমে রাখিলেন। তার পর, সে আতুরা-শ্রমের স্বেচ্ছাসেবিকা মহিলাদ্বয়ের অনুরোধ করাইয়া প্যারিসের এক মহিলাশ্রমে, মালীর কার্য্য জুটাইয়া দিলেন। সংসারে আপনার বলিতে বৃদ্ধের কেহ ছিল না। সে বিপদের পর দিন ম্যাডেলিন বৃদ্ধকে ১০০০ ফ্রাঙ্কের এক চেক দিয়া বলিলেন—"তোমার গাড়ী ঘোড়া আমি নিয়ে নিয়েছি।" সে শকট চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ঘোটকও পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছিল;—ফসিলিভাণ্ট তাহা জানিত না।

ইহার কিছুদিন পরেই ম্যাডেলিন ম—র নগরাধ্যক্ষ হন। প্রথম যে দিন জাভার্ট, তাঁহার অঙ্গে, সে নগরে তাঁহার সর্ব্বময় প্রভুত্বের পরিচায়ক-চিহ্ন দেখিল, সে দিন সে শিহরিয়া উঠিল;—'নেকড়ে বাঘে'র অঙ্গে প্রভুর

পরিচ্ছদ দেখিলে শিকারী কুকুরের মনের যে অবস্থা হয়—জাভার্টেরও মনের অবস্থা তদ্রূপ দাঁড়াইল। সে দিন হইতে সে যতটা পারিত তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত। নিতান্ত কার্য্যের দায়ে তাহাকে তাঁহার সম্মুখীন হইতে হইলে, যথোচিত সম্ভ্রমের সহিত সে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিত।

(৩)

এতক্ষণ আমরা ম্যাডেলিন ও জাভার্টের প্রসঙ্গ লইয়াই ছিলাম; এইবার ফ্যানটাইনের কি হইল দেখা যাক্।

ম—তে আসিয়াই ফ্যানটাইন ম্যাডেলিনের কারখানায় কাজ পাইল। সৌভাগ্যের বিষয়, কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। প্রথম প্রথম, নূতন ধরণের কাজ বলিয়া সে তেমন বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিত না, তত্রাচ যাহা পাইত, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। স্বাধীনভাবে আপনি আপনার উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে পারার যে কত সুখ, কি আনন্দ, ফ্যানটাইন এতদিনে তাহা বুঝিল; আত্মপ্রসাদে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দু'একদিনের মধ্যেই সে ছোটখাট একটি ঘর ভাড়া করিয়া, মনের মত করিয়া সেটিকে সাজাইল। কিছু কিছু আসবাবপত্রও ভাড়া করিয়া আনিল, ভাবিয়া রাখিল—ভবিষ্যতে উপার্জ্জিত অর্থ হইতে ক্রমশঃ সে ঋণ পরিশোধ করিবে,—এইটুকুই তাহার অতীতের অমিত-ব্যয়িতার চিহ্ন। পরিণত স্বভাব একেবারে বর্জ্জন করা মানুষের পক্ষে বড় কঠিন। কারখানার কার্য্যশেষে সেই ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া বসিয়া সে কসেটের কথা ভাবিত, আর মধ্যে মধ্যে দর্পণে আপনার কুঞ্চিত ঘন কেশদাম, মুক্তাধবল দন্তপাতি এবং যৌবন-ঢলঢল মুখখানির প্রতি চাহিয়া থাকিত। আত্ম-নির্ভরতার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই তাহার নষ্ট-শ্রী ফিরিয়া আসিতেছিল।

থলোমিয়েকে সে যে চক্ষেই দেখুক,—তবু সে তার পরিণীতা ভার্য্যা নয়। তাই তাহাকে অপর দশজনের কাছে কসেটের কথা গোপন করিয়া চলিতে হইত। কিন্তু জননীর প্রাণ—কন্যার সম্বাদ না লইয়া কেমন করিয়া বাঁচে? তাই সে প্রতিমাসেই দু'খানা চারিখানা করিয়া সেখানে পত্র দিত। নিজে সে কোনরূপে নাম-সহিটুকু করিতে পারিত মাত্র, সাধারণ মুহুরীকে দিয়াই সে চিঠিপত্র লিখাইত। ক্রমে ক্রমে দু' একজন এ বিষয় লক্ষ্য করিল। "তাই ত, ফ্যানটাইন "চিঠি লেখে"!" মানুষের স্বভাবই এই যে, যে বিষয়ে যার যত সম্বন্ধ অল্প সে বিষয় জানিবার জন্য তার তত আগ্রহ অধিক। "অমুক ভদ্রলোক রাত না হ'লে বাড়ী ফেরেন না কেন?" "অমুক লোকটা খালি অলি-গলি দিয়ে চলে কেন?" "অমুক স্ত্রীলোক তার গাড়ীখানা দূরে দাঁড় করিয়ে পায়ে হেঁটে সে বাড়ীতে ঢোকে কেন?" "বাক্স ত তার চিঠির কাগজে ভরা, তবু মেয়েটা চিঠির কাগজ কিন্‌তে পাঠায় কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অনেকে এমন আছেন যে এই সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য কোন লাভের লোভে নহে, কেবলমাত্র অনুসন্ধিৎসার সফলতার জন্য স্বেচ্ছায় অকাতরে যত সময়, অর্থ এবং সামর্থ্যের অপব্যবহার করেন তাহাতে অন্ততঃ দশবিশটা সৎ কার্য্য অনায়াসে সাধিত হইতে পারে।

কতক কতক লোক আবার বাচালতা-দোষেও সে স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এক একটা উনানে যেমন দেখিতে দেখিতে জ্বালানি পুড়িয়া যায়, ইহাদেরও প্রকৃতি সেইরূপ। ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য বিষয়ান্তর না পাইয়া তাই তাহারা তখন প্রতিবেশীদিগের উপর গিয়া পড়ে। বিশেষতঃ, পরচর্চ্চাটা জমেও ভাল, তার শ্রোতৃসংখ্যা মেলেও বেশী; সুতরাং তাহাতে দিনটাও তাহাদের বেশ কাটে। অতএব, বলাই বাহুল্য যে, ফ্যানটাইনের উপর তাহাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িল। তলে তলে তথ্যসংগ্রহ চলিতে লাগিল। অবশেষে একদিন বৃদ্ধা ভিকটারনিয়ে তাহা-দের অগ্রণী হইয়া, সেই সাধারণ মুহুরীর নিকট ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, নিজ ব্যয়ে মণ্টফারমিলে গিয়া ফ্যানটাইনের কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে শাখাপল্লবিত হইয়া কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; এবং সে উদ্যত অশনি সহসা একদিন ভীষণ বেগে হতভাগিনী ফ্যানটাইনের মস্তকের উপর পতিত হইল। কারখানার কর্ত্রী, ম্যাডেলিনের নাম করিয়া তাহার হাতে ৫০ ফ্রাঙ্ক দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারখানা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। সেই মাসেই থেনেডিয়ারেরা, কসেটের ব্যয় বাবদে, ১২ ফ্রাঙ্কে সন্তুষ্ট না হইয়া ১৫ ফ্রাঙ্কের দাবী করিয়া পত্র দিয়াছিল!

তবে, তাহার কলঙ্ককাহিনী এতদিনে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে! নিরাশা অপেক্ষা লজ্জায় অভাগিনী অধিকতর অভিভূতা হইয়া নতমুখে বাসায় ফিরিল। ম্যাডেলিনের সহিত দেখা করিতে কেহ কেহ তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু স্বপক্ষে বলিবার যে তাহার কিছুই ছিল না! তিনি দয়ালু—তাই সে ৫০ ফ্রাঙ্ক দিয়াছেন; তিনি ন্যায়নিষ্ঠ,—তাই কারখানা হইতে তাহাকে বিতাড়িতা করিয়া-ছেন। ফ্যানটাইন নতমস্তকে তাঁহার সে বিচার মানিয়া লইল।

(৪)

ম্যাডেলিনের কারখানা হইতে বিতাড়িতা হইয়া ফ্যানটাইন পথে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল তদ্দ্বারা কিছুদিন চলিল; সে অর্থ যখন নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন সে অনেক চেষ্টায় এক দরজির কারখানায় দৈনিক ১২ স্যুস মজুরী হিসাবে এক কাজ জুটাইল। এই সময় হইতেই থেনে-ডিয়ারদের দেয় বাকী পড়িতে লাগিল। নিজেরই অন্নসংস্থান হয় না, সেখানে কি পাঠায়? নাম মাত্র আয়ে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করা, আর বিনা আয়ে বাঁচিয়া থাকা,—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী নাই;—যেন পাশা-পাশি দুইটি কক্ষ—একটি অস্পষ্ট-দৃষ্ট, একটি অলক্ষ্য। ফ্যানটাইন ক্রমশ আপনাকে সে দারিদ্র্যে অভ্যস্ত করিয়া লইল। প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে ঘরে আগুণ না জ্বালাইয়াও তাহার চলিতে লাগিল; সখ করিয়া পাখী পুষিয়াছিল, তাহার জন্য দৈনিক আধ পয়সা চানা লাগিত বলিয়া বাহুল্যখরচ-বোধে সেটাকে ছাড়িয়া দিল; জানালা খুলিলে পার্শ্বের কক্ষের আলো তাহার ঘরে আসিয়া পড়িত, সেই আলোতে সে যৎকিঞ্চিৎ নৈশ-ভোজ্য গ্রহণ করিয়া, আলোর খরচ বাঁচাইত। চির দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া সৎভাবে যাহারা আজন্মকাল কাটাইয়াছে, সামান্য একটি পয়সা

হইতেও তাহারা কত কাজ পায় তাহা কয়জন জানে? অভ্যাসের ফলে, সেটা অবশেষে তাহাদের প্রতিভা স্বরূপে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়ায়। ফ্যানটাইন ক্রমশ সেই প্রতিভার অধিকারিণী হইতে লাগিল।—ফলে, জীবনের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ক্রমশঃ সে একটা আশার ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইল। সে ভাবিত—"সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে যদি ৫ ঘণ্টা ঘুমিয়ে বাকী সময়টা এ কাজ করি, তা হলে নিজের খাবারটাও পূরা না হোক্, কতক ত জোগাড় হয়। আর তার পর, মনে দুঃখ কষ্ট থাকলে লোকে খায়ও কম।"

তবু এই দুর্দ্দিনে কন্যাকে কাছে রাখিতে পারিলে, তার একটা অপূর্ব্ব সুখ থাকিত। কিন্তু সে পথ যে রুদ্ধ! এই কয়মাসে থেনে-ডিয়ারদের অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছে; তার উপর যাতায়াতের খরচ—তাহাই বা কোথা হইতে আসে!

প্রথম প্রথম ফ্যানটাইন পথে বাহির হইত না; বাহির হইলেই তাহার মনে হইত যেন সকলেই তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চাহিয়া আছে। সহরে কেহ কাহাকে চেনে না,—কাজেই দুঃখী অথচ আত্মসম্মানী ব্যক্তির দিন কোনরূপে সেখানে কাটিয়া যায়; কিন্তু পল্লীগ্রামে, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনে, কাজেই পরের উপেক্ষা ছুরিকার আঘাতের ন্যায় প্রাণে বড় বাজে। প্রথমটা ফ্যানটাইন বড় কাতর হইয়া পড়িত; কিন্তু ৩।৪ মাসের পর সে সব সহিয়া গেল। সে ভাবিয়া দেখিল—"যার অর্থ নেই, তার আবার সম্মানের দাবী কি? আমার পক্ষে দুইই সমান।"

দেখিতে দেখিতে একবৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় শীত দেখা দিল। অত্যধিক পরিশ্রমে ফ্যানটাইনের শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অল্প অল্প জ্বর এবং শুষ্ক কাসি ক্রমশঃই তাহার দেহ আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইতে লাগিল।

শীতকালে দুঃখী লোকের আরও কষ্ট। কখন্ দিন আসে কখন্ চলিয়া যায় কিছুই বুঝা যায় না। কাজের সময় কমিয়া যায়; প্রবল হিমে সূর্য্যের আলো তাপ গ্রাস করিয়া বসে; স্বর্গের বারিধারা জমাট বাঁধিয়া যায়, মানুষের চিত্তও কঠিন হইয়া আসে। তাই ফ্যানটাইনের মহাজনেরা নির্ম্মমভাবে তাগাদা আরম্ভ করিয়া দিল — দেনা পরিশোধ ত দূরের কথা, প্রতিদিনই সে নূতন দেনায় জড়ীভূত হইয়া পড়িতেছিল; এদিকে থেনেডিয়ারদের পত্রের জবাব দিতে দিতে ডাক খরচে সে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছিল। তার উপর হঠাৎ একদিন তাহারা জানাইল যে কসেটের গাত্রবস্ত্র একখানিও নাই, অন্ততঃ দশ ফ্রাঙ্ক পত্রপাঠ না পাঠাইলে এই দারুণ শীতে তাহাকে নগ্নগাত্রে কাটাইতে হইবে। ফ্যানটাইন সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবিল; শেষে সন্ধ্যার সময় এক পরচুলাওয়ালার দোকানে গিয়া ১০ ফ্রাঙ্কে আপনার মাথার চুল বিক্রয় করিয়া আসিল। পরদিন সে একটা ভাল জামা খরিদ করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

সে জামা পাইয়া থেনেডিয়ারেরা চটিয়া আগুন হইয়া উঠিল। তারা টাকা চায়, জামা চায় না। সে জামা ইপোনাইনের গায়ে উঠিল; চাতক পাখী বুকে হাঁটু দিয়া কাঁপিতেই লাগিল।

কেশ হীনা হইয়া পৃথিবীর সকল লোকের উপর ফ্যানটাইনের আক্রোশ হইল।—

আত্মসম্মানের গর্ব্ব ত সে পূর্ব্বেই হারাইয়াছিল। এখন হইতে ক্রমশঃ সে নির্লজ্জভাবাপন্না হইতে লাগিল। ম্যাডেলিনই তাহার যত দুর্দ্দশার মূল—তাহাই তাহার ক্রমশঃ ধারণা হইতেছিল। তাই পথে তাঁহাকে দেখিলেই, নির্লজ্জার ন্যায় সে উচ্চৈঃস্বরে হাসি গান আরম্ভ করিত।

ইহার পরিণতি যাহা হয় অবশেষে তাহাই ঘটিল। ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, মনুষ্যত্ব, রমণীর সম্মান, স্ত্রীধর্ম্ম একে একে সকলই সে দিল। কিন্তু সেটা সুখে নয়, লালসায় পড়িয়া নহে,—সংসারের প্রতি প্রতিহিংসা লইবার জন্যই যেন তাহার সে চেষ্টা। তত্রাচ সেই পঙ্কিল পথে দাঁড়াইয়াও, কন্যার কথা সে একদিনও ভুলে নাই; জীবনের ক্রমশঃ গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে কন্যার মূর্ত্তিখানি যেন কোন্ দেবদূতের ন্যায় সর্ব্বদাই ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর আলোকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ফ্যান ভাবিত "টাকা কড়ি হলে, কসেটকে আমার কাছে নিয়ে আস্‌বো।" পরক্ষণেই আপনা আপনি সে হাসিয়া উঠিত।

কিছু দিন যায়। আবার থেনেডিয়ারেরা দুই নেপোলিয়ন (স্বর্ণমুদ্রা) চাহিয়া বসিল; লিখিল—"কসেটের মিলিয়ারী জ্বর—শীঘ্র টাকা পাঠাবে, নইলে মেয়ে বাঁচবে না।" সেই দিন অপরাহ্নে ফ্যান পথ দিয়া চলিতে চলিতে জনতা দেখিয়া উৎসুকী হইয়া অগ্রসর হইয়া দেখিল, দন্তচিকিৎসক মূল্য দিয়া স্ত্রীলোকদের দন্ত ক্রয় করিয়া লইতেছে। ফ্যানটাইনকে দেখিয়া সে বলিল—"দেখ তোমার সাম্‌নের দাঁত দু'টো দাও ত দু' নেপোলিয়ান দেবো।

"সর্ব্বনাশ! বলে কি?" বলিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া ফ্যান পলাইয়া আসিল।

এক বৃদ্ধা কাছে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল—"আ মর! কি বোকা ছুঁড়ি। এমন সুবিধেও ছাড়ে?"

ফ্যান আর সেখানে দাঁড়াইল না। বাসায় ফিরিয়া গৃহ-স্বামিনীর কাছে গিয়া সে গল্প করিল।

"কত দেবে বল্‌ছিল?"

"দু' নেপোলিয়ান।"

"তার মানে, চল্লিশ ফ্রাঙ্ক?"

"হাঁ, চল্লিশ ফ্রাঙ্ক!" বলিয়াই ফ্যানটাইন নীরব হইল। সন্ধ্যার সময় সেলাই লইয়া বসিল, কিন্তু কাজে তার মন লাগিতেছিল না। খানিকক্ষণ পর সেলাইয়ের বাক্স তুলিয়া রাখিয়া গৃহস্বামিনীর কাছে আসিয়া সে হঠাৎ বলিল—"আচ্ছা মিলিয়ারী জ্বর কাকে বলে?"

"সে বড় শক্ত ব্যারাম।"

"তা হ'লে তাতে রীতিমত চিকিৎসার দরকার?"

"নিশ্চয়ই?"

"এ রোগ কি থেকে হয়?"

"তার কোন ঠিক নেই। হঠাৎই হয়।"

"ছেলেদেরও হয়!"

"তাদেরই বেশী হয়।"

"তাতে মরে।"

"প্রায়ই।"

ফ্যানটাইন আর প্রশ্ন করিল না। সেখান হইতে সরিয়া গিয়া সিঁড়ির আলোতে থেনেডিয়ারদের পত্রখানা আর একবার পড়িল, তার পর বাটীর বাহির হইয়া গেল।

পরদিন গৃহস্বামিনী মার্গারিট যখন

ফ্যানটাইনের কক্ষে আসিল, তখন ফ্যানটাইন জড়সড় হইয়া কেদারায় বসিয়া রহিয়াছে, বাতিটা তখনও জ্বলিতেছে। ফ্যানটাইনের মুখ বিবর্ণ, একরাত্রেই যেন তার আরও দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে।

"সে কি ফ্যানটাইন? কি হয়েছে তোমার?"

"কিছু নয়।—ভালই হয়েছে। ঐ দেখ দু' নেপোলিয়ান। মেয়ে আর আমার বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না।"

"কোত্থেকে এ পেলে?"

"পেলাম"—বলিয়া সে মৃদু হাসিল। অতি দুঃখের হাসি। বাতির আলোকে সে মুখ দেখিয়া মার্গারিট শিহরিয়া উঠিল,—ফ্যানটাইনের মুখের দুই পার্শ্ব দিয়া তখনও ক্ষীণ রক্তধারা গড়াইতেছিল। সে দিনই ফ্যানটাইন সে অর্থ থেনেডিয়ারদের পাঠাইয়া দিল। কসেট সুস্থই ছিল। থেনেডিয়ারেরা টাকা আদায় করিবার জন্য একটা চাল চালিয়াছিল মাত্র।

ফ্যানটাইন জানালা গলাইয়া আয়নাখানা ফেলিয়া দিল,—আর তাহাতে এখন তাহার কি প্রয়োজন?—অনেক দিন হইতেই সে নীচের কক্ষ ত্যাগ করিয়া চিল-কোঠার এক অতি ক্ষুদ্র গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছিল। বিছানাপত্র অনেকদিনই গিয়াছিল,—এক ছিন্ন মাদুর আর এক ছিন্ন কন্থা মাত্র পড়িয়া ছিল। স্ত্রীসুলভ লজ্জা ত সে হারাইয়াছিলই,—পরিচ্ছন্নতার ভাবও এখন হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল,—ধূলিধূসরিত, কর্দ্দমলিপ্ত বা মলিন বস্ত্রে এখন সে অনায়াসে পথ দিয়া চলিয়া যাইত,—সে বিষয়ে আর তার এখন দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। তাহার উপর পাওনাদারদিগের তাগিদ, গঞ্জনা এবং ভ্রূকুটি। কত রাত্রি নিদ্রাহীন চক্ষে কাঁদিয়াই সে কাটাইত। দুর্দ্দশার সে গভীর পাথারে সে কূল দেখিতে পাইত না,—বুঝি কূল তার ছিল না! ভ্রূকুটি গঞ্জনা তিরস্কারে নির্য্যাতিত হইয়া ক্রমশঃ সে মরিয়া হইয়া উঠিতেছিল। তার উপর আবার একদিন থেনেডিয়ারেরা ১০০ ফ্রাঙ্ক চাহিয়া বসিল, লিখিল—"তোমার মেয়ে সেরে উঠ্ছে—এ সময় ভাল পথ্য ঔষধ দরকার, টাকা না পেলে তার কিছুই ব্যবস্থা হবে না। টাকা না আসে, মরে যায়, আমরা কিছু জানিনে ইত্যাদি।"

হা ভগবান! সকলে মিলিয়া তাহাকে কি করিতে চায়? "একশত ফ্রাঙ্ক? এক শ' স্যুস কোথায় পাই?—ভাল,—শেষ যা আছে, তাই বিক্রী কর্‌বো।"

—অভাগী ফ্যানটাইন পতিতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল!

ফ্যানটাইনের এই পতনের জন্য দায়ী কে? সমাজ নয় কি? ইহাই সমাজের ক্রীত-দাসদাসী-ব্যবসায়। বুঝাইয়া বলিব? সমাজ এখানে ক্রেতা; দাসদাসী—হতভাগ্য মানব; বিক্রেতা—দুঃখ, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যন্ত্রণা, উপেক্ষা; পণ—চিত্তের অশান্তি; একদিকে আত্মা, আর একদিকে একমুষ্টি অন্ন। দুঃখ-দারিদ্র্য হাট সাজাইয়া বসায়, সমাজ খরিদ করে। খৃষ্টের পবিত্র ধর্ম্মানুশাসনে আধুনিক সভ্যতা পরিচালিত; কিন্তু সে অনুশাসন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই, বাহিক আচার-অনুষ্ঠানেই মাত্র তাহা রহিয়া গিয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে ক্রীতদাস-ব্যবসায় আজিও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান,—সেটা স্ত্রীলোক-

দের সম্বন্ধে—হতভাগিনী পতিতাদের সম্বন্ধে। দুর্ব্বলতা, লালিত্য, সৌন্দর্য্য, মাতৃত্ব এই সকলেরই উপর তাহার প্রভুত্ব,—পুরুষদের শত ধিক্!

নরকের অন্ধকারে আসিয়া ফ্যানটাইন পূর্ব্বের যা কিছু ছিল সবই হারাইয়াছে। পাষাণের ন্যায় সে আজ নীরস, কঠিন; কামনার চেতনা, রাগের উন্মাদনা কিছুই তাহার নাই। অর্থের জন্যই তাহার দেহ-পণ; সেইটুকু লইয়াই তাহার সম্বন্ধ। একদিন সে অনেক সহ্য করিয়াছে, সব হারাইতে বসিয়া একদিন সে প্রাণ ফাটাইয়া কাঁদাইয়াছে। আজ সে দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ সে সুখে দুঃখে, রাগে অনুরাগে, কামনায় উপেক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন। আজ তার ভয় করিবার বা পিছাইবার মত কিছু নাই। আজ সকল ঘনান্ধকার মেঘ তাহার মাথার উপর জমাট বাঁধিয়া বসিয়া; সমুদ্রের সমস্ত বারিরাশি আজ সফেণ উত্তাল তরঙ্গে তাহার উপর দিয়া গর্জ্জিয়া চলিয়াছে। আজ আর তাহার নূতন করিয়া কি ভয়?

অন্ততঃ সে নিজে এইরূপ ভাবিত। তবে মানুষ আপনার অদৃষ্ট সম্পূর্ণভাবে কোন দিনই জানিতে পারে না,—জানিতে না পারাই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

কিন্তু এই নির্ম্মম ঘটনাবর্ত্তের শেষ কোথায়,—কোথায় এই দুরন্ত ঘাতপ্রতিঘাতের অবসান? কেন এই অদৃষ্টচক্রের এ ভীষণ আবর্ত্তন?

যিনি সকল দুঃখের পার্শ্বে সুখ, সকল অশ্রুর পার্শ্বের একটা উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পান,—তিনিই বুঝি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। তিনি অদ্বিতীয়, সনাতন; তিনিই ভগবান।

(৫)

অর্দ্ধ-সহর অর্দ্ধ-পল্লীগ্রাম মাত্রেই যেমন একদল যুবক ১৫০০ লিভরের বার্ষিক সঙ্গতি লইয়া দু'লক্ষ ফ্রাঙ্কের অধিকারী সহরের যুবকদিগের মত সমান চাল বজায় রাখিতে চায়, ম—তেও সেইরূপ একদল যুবক ছিল। তাহারা বিলাসী, পরপ্রত্যাশী, অপদার্থ ক্লীব জন্তুবিশেষ; দু'এক বিঘা জমিজমা, যৎ-সামান্য জ্ঞান, দু'একটা বুক্নি, ইহাই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব, অথচ মুখে সর্ব্বদাই 'আমার জমি', 'আমার জমা', 'আমার প্রজা' ইত্যাদি বুলি; তাহারা ভদ্রসভায় ভাঁড়, শৌণ্ডিকালয়ে বাবু; তাহারা থিয়েটারে অভিনেত্রীকে টিটকারী দেয়, কেননা তাহারা সমজ্‌দার ভদ্র; সৈনিকাবাসের লোকেদের সহিত ঝগড়া করে—যেহেতু তাহারা বীর; তাহারা শিকার করে, চুরুট ফুঁকে, বোতল টানে, নস্য নেয়, বিলিয়ার্ড খেলে, আরোহী গাড়ী হইতে নামিলে হাঁ করিয়া তাহার প্রতি চায়, হোটেলে বাস করে, সরাইখানায় ভোজন করে, কুকুর পোষে, স্ত্রীলোক রাখে; তারা এক পয়সার মা বাপ; তারা ফ্যাসনের বাড়াবাড়ি করে, বিয়োগান্ত নাটকে আত্ম-হারা হয়, স্ত্রীলোক দেখিয়া উপেক্ষার ভাব দেখায়, পুরাতন জুতা পরিয়া পরিয়া পায়ে ঘাঁটা পড়ায়, লণ্ডন প্যারিসের ফ্যাসনের অনুসরণ করে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নিরেট মূর্খ হইয়া দাঁড়ায়; কোন কাজ-কর্ম্মেই তাহারা পটু হয় না; লোকের ভালও করে না, তবে তেমন ক্ষতিও করে না।

তাহারা সর্ব্বদাই নিশ্চেষ্ট, অলস; তাহাদের কেহ কেহ অপরের চক্ষুঃশূল, কেহ বা কাল্পনিক, কেহ বা শুধু রহস্যেই কাল কাটায়। মুসিয়ে ব্যামাটাবুয়ে এই ধরণের যুবক ছিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সে. ফ্যাসনানুযায়ী লম্বা কোট গায়ে আঁটিয়া, হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতেছিল (চুরুট টানাটা তখন একটা ফ্যাসনের মধ্যে পরিগণিত হইত); আর, মধ্যে মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করিয়া "সে কি সরে সরে যাও কেন, চাঁদ" "বলিহারি রূপ তোমার!" "বাঃ এরি মধ্যে দাঁতও যে ঝরেছে দেখ ছি" ইত্যাদি কতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। স্ত্রীলোকটি অভাগী পতিতাদেরই একজন,—তাহার বেশভূষাও তদনুরূপ। ব্যামাটাবুয়ের সম্মুখ দিয়াই সে যাতায়াত করিতেছিল। কিছুতেই সে কথা কয় না, বা ক্রুদ্ধা হয় না দেখিয়া অবশেষে ব্যামাটাবুয়ে একবার নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে আসিয়া পথ হইতে একমুষ্টি বরফ তুলিয়া লইয়া, হঠাৎ তাহার জামার মধ্যে পুরিয়া দিল। অমনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় স্ত্রীলোকটি শিহরিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল; তার পর ব্যাঘ্রীর ন্যায় বামাটাবুয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অকথ্য গালাগালি দিয়া নখাঘাতে তাহার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। সে ফ্যানটাইন।

নিমিষের মধ্যেই তাহাদিগকে ঘিরিয়া জনতা জমিয়া গেল। ফ্যানটাইন তখনও ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে লোকটার উপর লাথি মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণ করিতেছিল; তার দন্তহীন লুপ্তশ্রী, রক্তবর্ণ মুখখানা দানবীর ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা এক গম্ভীরমূর্ত্তি পুরুষ ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার কোমরবন্ধটা ধরিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল—"চ মাগী আমার সঙ্গে।" ফ্যানটাইন মুখ তুলিয়া চাহিতেই, নিমেষে তাহার সে উগ্রচণ্ডাভাব লুপ্ত হইয়া গেল। পাংশুবর্ণ মুখে বাত্যাতাড়িত লতিকাবৎ সে থরথর কম্পিত হইতে লাগিল।—এক দৃষ্টিতেই সে জাভার্টকে চিনিয়াছিল।

ফ্যানটাইন কোন বাধা প্রদান করিল না; সে সাহস তাহার লুপ্ত হইয়াছিল। জাভার্ট তাহাকে টানিতে টানিতে থানায় আনিয়া হাজির করিল। তারপর পকেট হইতে একখানা ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির করিয়া চার্জ্জ লিখিতে বসিল। ফ্রান্সের আইনে, পতিতাদিগের উপর পুলিশের সর্ব্বতোময় প্রভুত্ব; এ সব ক্ষেত্রে তাহারাই তাহাদের বিচার করে,—তাহারাই দণ্ড দেয়। জাভার্ট গম্ভীরভাবে বিচার করিতে বসিল। ঘটনাটা কি?—একজন ভদ্রবেশধারী, অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত লোকের অপমান। কে করিয়াছে?—একজন সমাজচ্যুতা বারনারী। কে দেখিয়াছে? —জাভার্ট স্বয়ং।—জাভার্ট নিঃশব্দে আপনার রায় লিখিয়া যাইতে লাগিল। লেখা শেষ হইলে তাহাতে নাম সহি করিয়া, একজন সার্জ্জেনকে ডাকিয়া বলিল—"আরও দু'জনকে সঙ্গে করে একে জেলে নিয়ে যাও। এর ছ' মাস কয়েদ।"

"ছ'মাস কয়েদ।" ফ্যানটাইন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"ছ'মাস!—তা হলে কসেটের আমার কি হবে? এখনও যে থেনেডিয়ারের ১০০ ফ্রাঙ্ক পাওনা!" ফ্যানটাইন জাভার্টের

আসিয়া বর্ত্তাইয়াছে। তাই ম্যাডেলিনের সে গভীর উত্তর "আমি" শুনিয়াও সে টলিল না; অদৃশ্য এক কম্পনে তাহার সমস্ত শরীর টলিতেছিল; সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল; পাংশুবর্ণ ওষ্ঠে, অবনত মস্তকে অথচ দৃঢ়স্বরে সে উত্তর করিল—"অধ্যক্ষ মশায়, তা হতে পারে না।"

"কেন ?"

"এ মেয়েটা একজন ভদ্রলোককে অপমান করেছে।"

ম্যাডেলিন ধীর স্বরে জাভার্টকে বুঝাইয়া বলিলেন—"দেখ, তুমি ধর্ম্মভীরু আমি তা জানি, তাই বলছি যে আমি এ ঘটনার সত্যাসত্য সব জেনে এসেছি—স্ত্রীলোকটি বাস্তবিকই নির্দ্দোষী। সেই লোকটাই প্রকৃত অপরাধী; তাকেই তোমার ধরা উচিত ছিল।"

জাভার্ট দমিল না। "তার পর, মাগীটা নগরাধ্যক্ষ মহাশয়ের অপমান করেছে।"

"সে অপমান ত আমার ? আমি যদি সেটা উপেক্ষাই করি ?"

"মাপ করবেন—সে বিচারের অধিকারী আপনি নন, দেশের আইন।"

"দেখ, বিবেকই সব চেয়ে বড় বিচারক। আমি মেয়েটার সব কথা নিজের কাণে শুনেছি। আমি যা করছি, বিচার করেই করছি।"

"কিন্তু এও কি সম্ভব ? আমি যে আমার নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছি নে!—"

"ভাল, তবে শুধু হুকুমপালনই করে যাও.

"আমি আমার কর্ত্তব্যেরই হুকুম পালন করে থাকি। আমার কর্ত্তব্য বলে,—এ ছ'মাস ফাটক খাটুক।"

"ছ'মাস ছেড়ে, একদিনও না।"—ম্যাডেলিনের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক মৃদু

এইবার জাভার্ট মুখ তুলিয়া চাহিল। ধীর স্বরে অথচ গভীর সম্ভ্রমের সহিত সে বলিল—"আমি আজ এই প্রথম আপনার অবাধ্য হচ্ছি,—আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু আইন অনুসারে এ ব্যাপারটায় পুলিশেরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। আমি যতদূর দেখেছি জেনেছি, তাতে মেয়েটারই সব দোষ। তাই আমি একে ছাড়তে পারছি নে।"

"এটা মিউনিসিপাল আইনের অন্তর্গত। তার ৯।১১।১৫ এবং ৬৬ ধারার মতে আমিই এসব ক্ষেত্রে বিচারকর্ত্তা। আমার আদেশে একে মুক্তি দাও।" ম্যাডেলিনের সে গম্ভীর স্বর জাভার্ট কেন, ম-তে ঐ পর্য্যন্ত কেহই শুনে নাই। জাভার্ট তবু কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া ম্যাডেলিন পুনরায় বলিলেন—

"১৭৯৯ সালের, ১৩ই ডিসেম্বরের অন্যায়-অবরোধবিষয়ক আইন বোধ হয় তোমার জানা আছে ?"

"আজ্ঞে—"

"বাস্, আর কথা নয়।"

"আজ্ঞে, তবু—".

"চলে যাও তুমি এখান থেকে!—"

সৈনিকের ন্যায় বুক পাতিয়া জাভার্ট সে অপমানবজ্র গ্রহণ করিল; তার পর, নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল

ফ্যানটাইন বিমূঢ়ার ন্যায় দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া এতক্ষণ পরস্পরবিরোধী সে দুইটী প্রচণ্ড শক্তির সংঘাত-পরিণাম লক্ষ্য করিতেছিল। একজন তাহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করিতে চায়, একজন তাহার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিতে প্রয়াসী। মুক্তি, স্বাধীনতা, কসেটের সহিত পুনর্ম্মিলন, আবার সৎভাবে থাকিয়া জীবনযাপন, জীবনের সুখ, ভবিষ্যতের শান্তি—আবার সে সব ফিরিয়া পাইবে? এও কি সম্ভব?—কে তাঁহাকে সে ডালি দিতে চাহিতেছে? ম্যাডেলিন? তাহার দুঃখযন্ত্রণার মূল, তাহার নরকবাসের যমদূত—এই ম্যাডেলিন? এই মাত্র না সে তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়াছে? তবু তাঁর এত দয়া! ম্যাডেলিনের প্রতি তাহার মনোভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে, জাভার্ট যখন লাঞ্ছিত হইয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল, তখন আনন্দে, এবং তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ম্যাডেলিন ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"হায় অভাগিনী জননী, অনেক যন্ত্রণা তুমি পেয়েছ। কিন্তু সব কথা তুমি আমায় জানাও নি কেন?—আর তোমায় খেটে খেতে হবে না। তুমি যা বল্‌লে যদি সব সত্য হয়—তবে ভগবানের চক্ষে তুমি কলঙ্কিনী নও। আমার সঙ্গে এস। সৎপথে থেকে তোমার যা খরচপত্র হবে সব আমি দেবো কসেটকে তোমার কোলে এনে দেবো।"

—এ যে আশার অতীত! এ কি স্বপ্ন না সত্য?—এত সুখ তাহার অদৃষ্টে ছিল! কসেটকে আবার সে বুকে ধরিতে পাইবে, এ অন্ধকারময় জীবন হইতে উদ্ধার পাইবে?—এ সুখ আবেগ সে সহ্য করিতে পারিল না; তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, পা টলিতেছিল,—সহসা নতজানু হইয়া বসিয়া ম্যাডেলিনের দক্ষিণ হস্তখানি তুলিয়া লইয়া গভীর কৃতজ্ঞতা-ভরে সে তাহাতে চুম্বন করিল। পরক্ষণেই অভাগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

আফগানজাতির মাতৃভাষা

আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ পরস্পর পাশাপাশি অবস্থিত এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। দুর্দ্ধর্ষ আফগান-বিজেতার হস্তে ভারতের অদৃষ্টনেমি বহুবার আবর্ত্তিত হইয়াছে। কাল-মাহাত্ম্যে ভারত আফগানের হস্তচ্যুত হইয়াছে, তথাপি আফগান-রাজ্যের সহিত ভারতের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য, তাহা বিশেষভাবে বলা আবশ্যক। সুতরাং আফগানিস্থান সম্বন্ধে কোন কথা যে ভারতবাসীর কর্ণে একান্ত সুখোৎপাদন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই প্রবন্ধে আমরা

আফগান-জাতির ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

আফগান-জাতির মাতৃভাষার নাম পস্তু ভাষা। সমগ্র আফগানিস্থানে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে এবং বেলুচিস্থানের কতক অংশে এই ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে। প্রতীচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার উৎপত্তিকাল-বিনির্ণয়ে নিযুক্ত হইয়া নানা জনে নানারূপ কাল্পনিক সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। আফগান-ঐতিহাসিকগণের মতে ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার মধ্যে একতম। তাঁহারা সকলে একবাক্যে মহাপুরুষ সোলেমান বাদসাহের রাজত্বকালে ইহার উৎপত্তিকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, প্রাগুক্ত রাজর্ষির প্রধান উজির মনস্বী আসিফ বারখিয়ার অসাধারণ প্রতিভাবলেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কথিত আছে, মহাপুরুষ সোলেমান বাদসাহ্ এক বিপুল-বিস্তার মহাসাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য নানাজাতি, নানাধর্ম্ম ও নানাভাষার এক অত্যাশ্চর্য্য সমন্বয়-ক্ষেত্র ছিল এবং তদীয় রাজ-দরবারে বিবিধ রাজনৈতিক বিষয়-ব্যাপারের আলোচনা হইত। তাঁহার অমাত্যগণ গোপনীয় রাজকীয় বিষয়াদির আশুনির্ব্বাহ-কল্পে এক নূতন সাঙ্কেতিক ভাষা-সৃষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। তদনুসারে প্রধান সচিব আসিফের অসামান্য উদ্ভাবনী-শক্তিবলে অচিরে এক নূতন ভাষার উৎপত্তি হইল। রাজকীয় কার্য্য-পরিচালনার্থ সমস্ত হিব্রু-কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তাহা সাদরে পরিগৃহীত হইল। এই ভাষাই কালে পস্তু-ভাষা নামে পরিচিত হয়।

এই ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরো একটা মত প্রচলিত আছে। অধিকাংশ আফগান-ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, এই ভাষা পুরাকালে দানব ও দৈত্যগণের কথিত ভাষা ছিল। এ বিষয়ে আফগানিস্থানের জনসাধারণেরও এরূপই প্রতীতি। এই বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের সাক্ষ্যে তাহাদের মনে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। বক্ষ্যমান কালে হিব্রু-সামাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই বিশ্ববিশ্রুত সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তখন সুখ ও শান্তি বিরাজিত ছিল। পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ অধিকারের পর হিব্রু-সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম অশান্তির সূত্রপাত হইতে থাকে। ইহার ফলে সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় ও রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। এই অশান্তি-বীজের মূলোৎপাটনোদ্দেশ্যে হিব্রু-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি অসাধারণ সাহসী ও ভীম-পরাক্রম আফগানা (যিনি আফগানজাতির আদি-পুরুষ) এক বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া দানব ও দৈত্যগণের বিরুদ্ধে অভিযান্ করিতে আদিষ্ট হন। যাহা অধুনা আফগানিস্থান ও পশ্চিমোত্তর সীমান্ত-প্রদেশ নামে পরিচিত, তত্তৎ পার্ব্বত্যদেশবাসী দুর্দ্দান্ত নরমাংস-খাদক রাক্ষস-সদৃশ বন্য বর্ব্বরগণকেই এখানে দানব ও দৈত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সে কালের কথা দূরে থাকুক, বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতাদীপ্ত সময়েও ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালা-সঙ্কুল ভূভাগবাসিগণ অনেক স্থলে সভ্যতা ও

মনুষ্যত্বের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই সুদূর স্মরণাতীত কালে যে তাহারা দানব ও দৈত্য নামে পরিচিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সিন্ধু নদ ও সোলেমান পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী দামান-নামক প্রদেশবাসীদের আজও বিশ্বাস যে, সুদূর অতীতকালে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বোক্ত স্থানের দানব ও দৈত্যগণকে বিতাড়িত করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। সেনাপতি আফগানা অভিযানে গমন করিয়া দেশ মধ্যে স্থায়ীভাবে শান্তি-সংস্থাপনোদ্দেশ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ব্বরগণকে সমূলোৎখাত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু সেই সমস্ত আদিম অধিবাসিগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাকে সভ্য জাতির বাসোপযোগী করিতে আফগানাকে বহু বর্ষ-ব্যাপী অবিরাম ভীষণ যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। হিব্রু-বিজেতৃগণ এই সকল অসভ্য আদিমজাতীয় লোকদিগকে কতক পরিমাণে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা নিজেরা তাহাদের ভাষার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মানুষের বিনাশ-সাধনে কৃতকার্য্য হইলেও তাঁহারা তাহাদের ভাষার বিলোপ সাধন করিতে পারেন নাই। বিজেতৃগণের মধ্যে যাহারা উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিল, তাহারা সেই অসভ্যদের ব্যবহৃত ভাষাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

মাতৃভূমি সিরিয়া ও প্যালেস্তাইনের সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া হিব্রুজাতীয়গণ প্রথমে নবাধিকৃত সঙ্কট-সঙ্কুল পার্ব্বত্যদেশে বসতি স্থাপন করিতে আদৌ ইচ্ছুক হয় নাই। এজন্য সোলেমান বাদসাহের আমলে তজ্জাতীয় বেশী সংখ্যক লোক উক্ত নবার্জ্জিত প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। রাজর্ষি সোলেমান উক্ত প্রদেশের অতুল ঐশ্বর্য্য ও উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে ফিনিসিয়ান্, ইজিপ্সিয়ান্ ও আরবীয়দের মুখে নানা সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার মন তৎপ্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল। রাজনৈতিক হিসাবেও এই স্থান অত্যন্ত মূল্যবান ছিল বলিয়া তিনি তথায় হিব্রু-উপনিবেশ-স্থাপনে এত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমের আধিক্যে হিব্রুজাতীয়গণ প্রথমে তাঁহার এই নীতির অনুমোদন ও অনুসরণ করে নাই। কেবল আফগানার অধীনে যে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাই তথায় উপনিবেশ-স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। এই কারণে সোলেমানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের দিকে রাজ-বর্দ্ধন-নীতিরও অবসান হয়। ইহার অনতিদীর্ঘকাল পরে ইস্রায়েল জাতি স্বদেশে এরূপ নানা বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বদেশের বাহিরে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের দিকে মনোযোগ প্রদান করিবার তাহাদের অবসর মাত্র ছিল না। সেই বিপ্লবে তাহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে পরিণত হইল। রাজা নেবুচাড্‌নেজার এরূপ অত্যাচার-উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে, ইস্রায়েলদের পক্ষে পবিত্র ভূমি প্যালেস্তাইনে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এইরূপে আফগানার অনুচরবর্গ প্যালেস্তাইন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে

স্বল্পসংখ্যক হিব্রুজাতীয় ঔপনিবেশিক আদিম-জাতিদিগের সহিত মিশিয়া যাইতে বাধ্য হইল ; তাহাদের মাতৃভাষা স্বাতন্ত্র্যহারা হইল এবং তৎস্থলে হিব্রু ও আদিমজাতীয়দিগের ভাষার সংমিশ্রণে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। পবিত্রভূমি প্যালেস্তাইন, সিরিয়া ও ইরাক-ই-আরবে ইস্রায়েল জাতিসমূহের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ভীষণ অত্যাচার হইতেছিল, তাহাতে ফলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পূর্ব্বদেশে তাহাদের জ্ঞাতি-ভ্রাতৃগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। তাহাদের আগমনে শুধু ঔপনিবেশিকগণের দলপুষ্টি হইয়াছিল এমন নয়, তখন হইতে পূর্ব্বোক্ত দানব ও দৈত্যগণের সমূলোৎসাদনও আরম্ভ হইয়াছিল।

এই ভাষার 'পস্তু' নামেই উহার উৎপত্তি সূচিত হইতেছে। 'পস' হইতে 'পস্তু' শব্দের উৎপত্তি। সোলেমান (আফগানদিগের কায়েস-গর) পর্ব্বতে 'পস' নামক এক নগর আছে। আফগানার সুবাদারি সময়ে তিনি এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরের নাম হইতেই আফগানদের অপর নাম 'পস্তুন' ও তাহাদের ভাষার নাম 'পস্তু' হইয়াছে।

আধুনিক গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পস্তু ভাষা ইণ্ডো-ইয়োরোপীয় ভাষা-পরিবারের এক শাখাবিশেষ মাত্র। তাহা হইলেও ইহা যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জেন্দ্ ও পহ্লবী ভাষা হইতে পস্তু-ভাষা শিল্পবিস্তাসম্বন্ধীয় অনেক সংজ্ঞা ও শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। জেন্দ্, পহ্লবী ও সংস্কৃত ভাষা হইতেও অনেক শব্দ পস্তু-ভাষায় পরিগৃহীত হইয়াছে। এই কারণে পস্তু-ভাষাকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষার শাখা বলিয়া কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। সেমিতিক ভাষার সহিত ইহার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আর কোন ভাষার সহিত ইহার সেরূপ সম্পর্ক নাই। সেমিতিক ভাষার অনেক বিশেষত্ব পস্তু-ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং এই বিষয়ে পহ্লবী ভাষার সহিতও ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

পহ্লবী ও সংস্কৃত ভাষা হইতে আফগান-দিগের ভাষা অনেক সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গৃহস্থালীর দ্রব্য ও প্রতিদিনকার ব্যবহৃত বস্তুর অনেক নাম হিব্রু ভাষা হইতে পাওয়া গিয়াছে। স্থান, ব্যক্তি ও জাতির নামগুলিও সাধারণতঃ হিব্রু হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। নিম্নে তৎসম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ; যথা :—

(১) স্থানের নাম।

হিব্রু	পস্তু
মাগ্রে	মাগ্রেজ
জাব্বক	জাব্বা
গামায়েল	গোম্যাল
দাবারেহ্	দাবারাহ্
কোহাট	কোহাট

(২) ব্যক্তির নাম।

হিব্রু	পস্তু
গনি	গনি
হেত	হায়াত
আদম	আদম
সালাহ	সালেহ্
হামর	হামর

হিব্রু	পস্তু
তেমর	তেমর
লিয়াহ্‌	লেয়ো

(৩) প্রত্যেক সম্প্রদায়বাচক শব্দের শেষে 'খেল' ও জাতিবাচক শব্দের শেষে 'জাই' শব্দ থাকে; যথা:—বাহাদুরখেল, আহামদখেল, সরওয়ানখেল, সাদ্দোজাই, বারকজাই, আলিজাই, এয়াকুবজাই ও মুসাজাই ইত্যাদি।

তিনটি বিভিন্ন যুগে আফগানভাষা বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়; যথা:— ১ম যুগ—এই সময়ে উহা একটা প্রাদেশিক ভাষা মাত্র ছিল। ভিন্ন ভাষার কোন শব্দ তখন ইহাতে প্রবেশ লাভ করে নাই। আফগান-ঐতিহাসিকদের কথিত দৈত্য ও দানবেরাই উহা ব্যবহার করিত। উহার শব্দরাশি তখন একান্ত সীমাবদ্ধ অবিমিশ্র ছিল। কারণ তদ্ভাষাভাষী নরমাংস-খাদকদের প্রয়োজন ও অভাব তখন যৎসামান্য ছিল।

২য় যুগ—আফগানা কর্তৃক কায়েসগর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ২য় যুগ আরম্ভ হয়। এই সময়ে হিব্রু ভাষার শব্দসমূহ ইহাতে লব্ধপ্রবেশ হয়। স্থান, ব্যক্তি ও জাতির নামবাচক শব্দ সকল সাধারণতঃ হিব্রুভাষা হইতেই গৃহীত হয়।

৩য় যুগ—এই যুগে পারস্য, সংস্কৃত ও আরবী ভাষার শব্দাদি আফগান ভাষার সহিত মিশ্রিত হয়। বোধ হয় যে, আফগানেরা এই সময়েই কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করে। লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি এবং অধিকৃত দেশের পূর্ব্বতন অধিকারীদের বিলোপই সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে এই নূতন পরিবর্ত্তন-সাধনের কারণ ছিল। তাহাদের পবিত্র জন্মভূমি প্যালেস্তাইন হইতে বহুদিনব্যাপী বিচ্ছেদ,—সর্ব্বোপরি অধিকৃত প্রদেশে তাহাদের রাজোচিত আধিপত্য ও লুণ্ঠনস্বভাববশতঃ তাহারা এতদিন কৃষিকর্ম্ম এবং হিব্রুজাতীয় লোকদিগের ব্যবহৃত কৃষিযন্ত্র-সমূহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে যখন তাহারা নূতন ভাবে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল, তখন সংস্কৃত ভাষা হইতে তাহাদিগকে কৃষি-বিষয়ক শব্দাদিও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

পস্তু আর সেমিতিক ভাষা যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহা অবিসংবাদিত। উভয় ভাষার সাদৃশ্যমূলক কয়েকটা দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

(ক) হিব্রু, আরবী এবং সেমিতিক ভাষার অন্তর্গত অন্যান্য ভাষার মত পস্তু-ভাষায় ২টি মাত্র (পুং ও স্ত্রী) লিঙ্গ বিদ্যমান। পস্তু-ভাষায় পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে সাধারণতঃ আরবি 'হায় মুখতাফি' অক্ষর যোগে স্ত্রীলিঙ্গ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই শব্দ হিব্রু, আরবী ও চালডেইক ভাষায়ও স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়। যথা—পুংলিঙ্গ উব্‌নন্‌ (উষ্ট্র), স্ত্রীলিঙ্গ উব্‌নাহ্‌ (উষ্ট্রী); পুংলিঙ্গ চর্‌গ্‌ (কুক্কুট), স্ত্রীলিঙ্গ চরগাহ্‌ (কুক্কুটী)।

(খ) বিশুদ্ধ পস্তু-অক্ষর-সংখ্যা অতি কম এবং চালডেইক, হিব্রু, কুফী, আর্ম্মেণী ও সেমিতিক ভাষার অন্তর্গত অন্যান্য অনেক ভাষায় তাহাদের সদৃশ অক্ষর বর্ত্তমান আছে।

(গ) আফগান, ইহুদী, আরবীয় এবং ইজিপ্সিয়ানগণ জোয়াদ, হে ও ছে এই তিনটি অক্ষরের কঠিন উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পারসিকগণ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

(ঘ) পস্তু-ভাষার স্বরবর্ণগুলির সহিত হিব্রু, আরবী এবং অন্যান্য সেমিতিক ভাষার স্বরবর্ণগুলির নিকট সাদৃশ্য আছে।

(ঙ) হিব্রু, আরবী ও পারসী ভাষার মত পস্তু-ভাষায় সংযোজ্য ও বিযোজ্য সর্ব্বনাম আছে।

(চ) পস্তু-ক্রিয়াগুলির রূপ হিব্রু ও আরবী ভাষার ক্রিয়ার অনুরূপ এবং তাহাতে দুইটি মাত্র কাল (Past and Aorist) আছে

(ছ) পস্তু-ভাষা পহলবী-ভাষার একমাত্র সম্বন্ধবাচক সর্ব্বনাম (খে) এবং হিব্রু হইতে আহ্ নামক অব্যয় গ্রহণ করিয়াছে।

জেন্দ্, হিব্রু ও পহলবী ভাষা হইতে অনেক শব্দ পস্তু-ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। আধুনিক পারস্য-ভাষার নিকটও ইহা সামান্য ঋণী নহে। এই কারণেই প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ পস্তু-ভাষাকে পারস্য-ভাষার শাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। তবে শুধু বাহ্য চক্ষে দেখিতে গেলে এরূপ অনুমান করা যায় বটে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মত-ভেদ থাকিলেও আফগান ঐতিহাসিকদের মত অভ্রান্ত ও সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য।

এই ভাষার প্রাথমিক ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পস্তু ভাষার যে নিজের অক্ষর ছিল না, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। ইহার বর্ণমালাও ইহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নহে। আফগান লেখকগণ বলেন যে, মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে তাঁহাদের মাতৃভাষা একটা কথ্য প্রাদেশিক ভাষা মাত্র ছিল। লেখাপড়ার কার্য্যে আফগানেরা যে পারস্য-ভাষার অধ্যয়ন ও ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। পারস্য-ভাষার মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে আফগান শাসকগণ এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা উক্ত ভাষাকে আদালতী ভাষারূপে গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই। পারস্য-ভাষায় শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যলাভ করা তৎকালে একটা প্রশংসার কার্য্য ছিল,—'ফেসান'ও ছিল বটে। পস্তু-কবিতা-নিচয়ের মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত সরল ও সুন্দর, সেগুলি প্রাগৈস্লামিক কালের। সেই কালের যুদ্ধসম্বন্ধীয় গানগুলি অত্যন্ত উদ্দীপনামূলক ও উৎসাহবর্দ্ধক

ইতিহাসে এ কথা সুবিদিত যে, গজনীর সুলতান মাহমুদ এবং তদীয় পিতা আফগানদিগের অস্ত্রবলেই রাজত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের কৃতকার্য্যতালাভ একরূপ অসম্ভব ছিল। এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ গজনীবংশীয় রাজগণ আফগানদিগকে মুক্ত হস্তে সহায়তা করিতেন। তাহাদের কথ্য ভাষাও উক্ত সুলতানের নিকট অতি উৎসাহসূচক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, সুলতান তদীয় সুযোগ্য প্রধান উজীর হাসন মাইমন্দিকে উক্ত ভাষা বর্ণমালায় গ্রথিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কথ্য ভাষাকে লেখ্য ভাষায় কিরূপে পরিণত করা যায়, তাহাই হাসনের প্রধান চেষ্টা হইল। এই সচিব-প্রবরের তত্ত্বাবধানে কাজী নছরুল্লা নামক জনৈক কৃতী-পুরুষ নস্খ্ অক্ষরে উহা বর্ণমালাগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। বর্ণমালার প্রথম গঠন কালে উহাতে 'তে' অক্ষর ছিল না। সম্ভবতঃ সিন্ধুবাসীদের সহিত আফগানদের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়ার পরেই এই অক্ষর আফগান-ভাষার বর্ণমালায় প্রবেশ

লাভ করিয়াছে। কান্দাহারবাসী মোল্লা হাসন পস্তু-ভাষায় বাক্য রচনা করিয়া সর্ব্বপ্রথম জগদ্বাসীকে প্রদর্শন করেন।

পস্তু-ভাষার ক্রমোন্নতি-বিধানে খৃষ্টান-মিসনারীগণ প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। কাপ্তেন এইচ্, জি, র‍্যাভার্টি পস্তু-ইংরাজী অভিধান এবং পস্তু-ইংরাজী ব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া উহার নিত্যবর্দ্ধমান ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার সাধন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা পস্তু-সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার কে কেবল এঙ্গ্লো-ভারতীয় ছাত্রগণ নহেন, শিক্ষিত আফগানেরাও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন। পস্তু-ভাষা যত দিন বিদ্যমান থাকিবে, লাহোর সেণ্ট্রাল ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক সম্সুল-ওলামা কাজী মীর আহাম্মদ সাহ রেজওয়ানী সাহেবের পস্তু-ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীও ততদিন ছাত্রসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে। আবদুর রহমান নামক জনৈক কবি একজন প্রসিদ্ধ পস্তু-কবি। আফগানের ঘরে ঘরে তাঁহার রচিত 'দেওয়ান' দেখিতে পাওয়া যায় এবং আবালবৃদ্ধবনিতা তৎসমূহ পাঠে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। মোল্লা আবদুল আজিম, খোশাল খান, মোল্লা কাইয়ুম, আবদুল হামিদ, নৌরোজ, কুলাচীর হাফিজ আজিম, পির গোলাম ও আয়েন খান. প্রভৃতিও পস্তু-ভাষার প্রসিদ্ধ কবি। হাফিজ্ রহমতউল্লা 'আখওয়ান্সুস্-সফা' এবং হিরাটবাসী মোল্লা আবদুল হাসন আনওয়ার-ই-সোহেলী' পস্তু-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। পেশোয়ারের মোল্লা আবদুল মজিদ কর্ত্তৃক পস্তুভাষায় কোরাণ সরিফ অনূদিত হইয়াছে। গজনীর মোল্লা আবদুল্লার কৃত 'তফ্সির-ই-হোসাইরি'র পস্তু-অনুবাদ এবং মৌলবী মোগাম্মদ আলীর 'তকসির-ই এয়াসির' অতি প্রকাণ্ডকায় ও বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। চরসাদ্দার খান গোলাম মোহাম্মদ খাঁর কৃত 'মোসাদ্দস-ই-হালী'র পস্তু-অনুবাদ আফগান পাঠকদের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোক-প্রিয় চিফ কমিশনার মাননীয় স্যার জর্জ্জ রুজ কেপেল মহোদয়ের রচিত ব্যাকরণ আফগান-জাতির মাতৃভাষার বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। নবাব হাফিজ মহব্বত খাঁর 'রিয়াজ-উল্-মহব্বত' এবং নবাব আল্লা এয়ার খাঁর 'আজায়েব-উল্ লোগাত' পস্তু-সাহিত্যে অতি মূল্যবান গ্রন্থ। খৃষ্টীয় মিশনারী সোসাইটীর কাজি খায়েরউল্লাও পস্তু-ভাষার উন্নতিসাধনে অল্প চেষ্টা করেন নাই, তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থের সম্পাদন দ্বারা পস্তু-ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। পেশোয়ার জেলার সর্খ্ ঢেরির প্রসিদ্ধ মিঞা-পরিবার যেন কলিকাতার ঠাকুর-পরিবার। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই একান্ত সাহিত্য-গতপ্রাণ এবং অনেক মূল্যবান ও উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া পস্তু-সাহিত্য-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্যও এই পরিবার যথেষ্ট করিয়াছেন। মিঞা ইনওয়ানুদ্দিন কাকাখেল কৃত 'নাসায়ে-ই-ইন্ওয়ান' এবং মিঞা নাজির আহামদ খাঁ কাকাখেল রচিত 'নাজির-উল-আখলাক' অতি প্রয়োজনীয় ও সর্ব্বজনাদৃত গ্রন্থ। মিঞা

নোমানউদ্দিনের 'জাফরুন্ নিসা' ও তদীয় বিদুষী স্ত্রীর রচিত 'জিন্নাত-উন্-নিসা'ও অতি প্রসিদ্ধ ও বহুজন-পঠিত গ্রন্থ। মিঞা মোহাম্মদ ইউসুফ খাঁ কর্ত্তৃক 'তন্বাত-অন্-নাসুহ্' নামক গ্রন্থের উৎকৃষ্ট পদ্য-অনুবাদের স্বতন্ত্র প্রশংসা অনাবশ্যক।

আবদুল করিম।

উৎসর্গ।

জগতের যত শোভা, যত হাসি, যত গান,
সকলি তোমাতে আছে, তুমি সবে দিলে প্রাণ!
মোর হৃদয়ের শুধু ছোট ছোট গানগুলি,
তুমি কি—তুমি কি দেবী, আদরে নিবে না তুলি'?

নাহি থাক্ ভাব ভাষা, নাহি থাক্ কোন সুর,
আকুল সাধনা সাধ তবু তায় ভরপূর!
তুমি প্রিয় সুধাকর উদিয়াছ চিদাকাশে,
শত শতদল এ যে ফুটে উঠে তব আশে!

আমার মনের কথা কে আর বুঝিবে ভালো,
কে আর আঁধার ঘরে নিয়ত জালিবে আলো?
আমার ধ্যানের দেবী, আমার প্রেমের রাণী,
আমার সর্ব্বস্ব তাই তোমারে দিতেছি আনি'!

ভকতের পূজা লও হোক্ অশ্রু এক টুক্,—
তোমারই দান এ যে বিরহে মিলন-সুখ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

ষড়বিংশ অধ্যায়

রূপসনাতন উদ্ধার, কাশীবাসী বৈষ্ণবকরণ ও নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

গৌর রামকেলি হইতে প্রস্থান করিবামাত্র রূপ ও সনাতন বিষয় ত্যাগ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিধি পুরশ্চরণ করাইলেন। অনন্তর দশ সহস্র মুদ্রা সনাতনের জন্য গৌড়ের এক বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া রূপ অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি সহ স্বীয় পল্লীভবনে গমন করিলেন। এই সমস্ত ধনের অৰ্দ্ধেকাংশ তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। চতুর্থাংশ কুটুম্বদিগকে দান করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। অচিরেই সংবাদ আসিল গৌর নীলাচলে পৌঁছিয়াছেন। নীলাচল হইতে গৌর বৃন্দাবন গমন করিলে সেই সংবাদ তাঁহাকে আনিয়া দিবার জন্য রূপ দুইজন বিশ্বস্ত লোককে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। এদিকে সনাতন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "রাজার প্রীতিই আমার বন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে। কোনরূপে রাজাকে রুষ্ট করিতে পারিলেই—আমার মঙ্গল; নতুবা অব্যাহতির দ্বিতীয় উপায় নাই।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সনাতন পীড়ার ভাণ করিয়া রাজসভায় গমন বন্ধ করিলেন এবং গৃহে বসিয়া পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত-আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বাদসাহ তাঁহার পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়া স্বীয় চিকিৎসককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজবৈদ্য সনাতনের শরীরে কোনও পীড়ার লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া বাদশাহকে সবিশেষ জানাইলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে বাদশাহ স্বয়ং সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত-চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। বাদশাহ কহিলেন "সনাতন, বৈদ্যের নিকট জানিলাম তোমার কোনও ব্যাধি নাই; তবে রাজকার্য্য ছাড়িয়া রহিয়াছ কেন? আমার যাহা কিছু সব তোমাকে লইয়া, তুমি জান; তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলে, আমার সবই যে নষ্ট হইবে।" সনাতন বিনীতভাবে কহিলেন "জাঁহাপনা, আমা হইতে

আর কোনও কাজ হইবার আশা নাই; আমার স্থলে অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।" বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "তোমার জ্যেষ্ঠ রূপ, দস্যুর মত জীবপশু সমস্ত নষ্ট করিয়া আমার চাকলার সর্ব্বনাশ করিয়া গেল; আর এখানে বসিয়া থাকিয়া তুমিও আমার কার্য্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ।" সনাতন স্থিরভাবে কহিলেন "আপনি সর্ব্বশক্তিমান, সমগ্র গৌড়ের অধিপতি; দোষীর দণ্ডবিধান করুন।" গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুচরগণ সনাতনকে বাঁধিয়া লইয়া গেল

ইহার অনতিকাল পরেই উৎকলের রাজার সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। যুদ্ধ-যাত্রার প্রাক্‌কালে বাদশাহ সনাতনকে ডাকিয়া কহিলেন "সনাতন, আমার সঙ্গে চল।" সনাতন দৃঢ়স্বরে কহিলেন "আপনি যাইতেছেন দেবতা-ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিতে; আমি আপনার সহিত যাইতে অক্ষম।" বাদশাহ তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় রাখিবার অনুমতি দিয়া যুদ্ধে প্রস্থান করিলেন।

যথাকালে প্রেরিত লোকদ্বয়ের মুখে রূপ সংবাদ পাইলেন গৌর বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া কনিষ্ঠ অনুপম (ওরফে বল্লভ) সহ রূপ বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে সনাতনকে লিখিয়া গেলেন "আমরা দুইজন বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম, তুমি যেরূপে পার পলায়ন করিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও। বাণিয়ার নিকট দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া আসিয়াছি, প্রয়োজন হয় গ্রহণ করিও।" ভ্রাতার পত্র পাইয়া সনাতন বাদশাহের অনুপস্থিতিকালে কারা-রক্ষককে সাত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দান করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। কারারক্ষক তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া ছাড়িয়া দিল। ভৃত্য ঈশান তাঁহার সঙ্গে চলিল। দিবারাত্রি পথ বাহিয়া অবশেষে তাঁহারা পাতড়া পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলেন। তথায় এক ভুঁইয়ার নিকট গমন করিয়া সনাতন তাহাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভুঁইয়ার নিকট একজন গণৎকার ছিল। তাহার নিকট ভুঁইয়া অবগত হইল সনাতনের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা আছে। স্বর্ণমুদ্রার লোভে ভুঁইয়া পরম যত্নে সনাতনের রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিল। তাহার অত্যধিক আদরে ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রীর মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি ঈশানকে
করিলেন তাহার নিকট কিছু টাকাকড়ি আছে কি না? ঈশান একটী মোহরের কথা গোপন করিয়া তাঁহাকে সাতটী মোহরের কথা বলিল। সনাতন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া সাতটী মোহর লইয়া ভুঁইয়াকে তাহা প্রদানপূর্ব্বক ঘাঁটি পার করিয়া দিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিলেন। ভুঁইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল "মোহরের কথা আমি সমস্তই জানিতাম। তুমি নিজে না দিলে তোমাকে খুন করিয়া আমি মোহর লইতাম। কিন্তু সাতটী নহে—আটটী মোহর তোমার ভৃত্যের অঞ্চলে বাঁধা ছিল। যাহা হউক তোমার ব্যবহারে আমি তুষ্ট হইয়াছি। এ মোহর আমি লইব না। তোমার মত লোককে ঘাঁটি পার করিয়া দিয়া আমি পুণ্য অর্জ্জন করিব।" ভুঁইয়ার অনুগ্রহে সনাতন পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া ঈশানকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন,

সত্যসত্যই আর একটী মোহর আছে। তখন বিরক্ত হইয়া সনাতন ঈশানকে বিদায় দিলেন এবং গাত্রে ছিন্নকন্থা ও হস্তে কুরোঁয়া লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। হাজিপুরে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকান্তের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সনাতন পরদিনই বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে শ্রীকান্ত একখানা মূল্যবান্ ভুটিয়া কম্বল তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

এদিকে গৌর প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত হইল। তাঁহার উদ্বেল প্রেম সমাগত যাবতীয় নরনারীর মধ্যে সংক্রমিত হইয়া পড়িল। কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ বা ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে।

প্রয়াগে পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সহিত গৌরের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গৌর নিভৃতে বসিয়া আছেন, এমন সময় রূপ ও বল্লভ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। গৌর পরম সমাদরে উভয়কে গ্রহণ করিয়া সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সনাতনের কারাবরোধের সংবাদ অবগত হইয়া কহিলেন "সনাতন মুক্তিলাভ করিয়াছেন, অচিরেই তিনি আমার সহিত মিলিত হইবেন।"

নিকটস্থ আউলিয়া গ্রামে বল্লভ ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কালে এই বল্লভ ভট্টই বল্লভাচারী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া বল্লভ ভট্ট গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। রূপ ও বল্লভের সহিত গৌর তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় দূর হইতে ভট্টকে প্রণাম করিলে, ভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন বল্লভ ও অনুপম সরিয়া গিয়া কহিলেন "আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদিগকে স্পর্শ করিবেন না।" গৌরও কহিলেন "ইহাদিগকে স্পর্শ করিও না; তুমি মহা কুলীন ব্রাহ্মণ, ইহারা জাতিতে অতি নীচ।" বল্লভ ভট্ট প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন "যখন ইহাদের রসনায় কৃষ্ণ-নাম অবিরত নৃত্য করিতেছে, তখন জাতিতে হীন হইলেও ইহারা সর্ব্বোত্তম জন।" গৌর এই কথায় প্রীত হইলেন। বল্লভ ভট্ট গৌরের অলৌকিক রূপ ও প্রেম-বাহুল্য দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন এবং গৌরকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। নৌকাপথে গমনকালে গৌর যমুনার শ্যামল জলে প্রেমাবেশে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলে তিনি নাচিতে আরম্ভ করিলেন; নৌকা টলমল করিতে লাগিল, ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। বহু কষ্টে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সংযত করিলেন। গৃহে আনিয়া বল্লভ ভট্ট পরম যত্নে গৌরকে ভোজন করাইলেন এবং নিজে তাঁহার পাদ সংবাহন করিলেন।

ভট্ট-গৃহে রঘুপতি উপাধ্যায় নামক এক বৈষ্ণব গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। বহুক্ষণ তাঁহার সহিত কৃষ্ণ-কথালাপের পর গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? পুরীর মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ? বয়সের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ কোন্ বয়স ? রসের মধ্যে সার রস কোন্‌টী ?" উপাধ্যায় কহিলেন—

"শ্যামমেবপরং রূপং, পুরী মাধুপুরী বরা
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।"

রূপকে লইয়া গৌর নিখিল ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। রামানন্দের সহিত যে যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল সমস্তই রূপের নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; উহা পুনঃ প্রচারিত করিবার জন্যই রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে গৌর করুণামৃতে অভিষিক্ত করিয়া লইলেন।

প্রিয়স্বরূপে, দয়িতস্বরূপে ;
প্রেমস্বরূপে, সহজাতিরূপে
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে।

প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাতিরূপ, নিজানুরূপ, অভিন্নরূপ, স্ববিলাসরূপ রূপ গোস্বামীতে গৌর নিজশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। গৌর রূপকে কহিলেন "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জীব ধূলিকণা-সদৃশ, অতিক্ষুদ্র। এহেন জীব ও অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে যাঁহারা অভেদ কল্পনা করেন, ঈশ্বর কি, তাঁহারা তাহা জানেন না। এহেন ঈশ্বরের নিকট কেহ কামনা করেন মুক্তি, কেহ ভুক্তি, কেহ সিদ্ধি। কিন্তু এতাদৃশ সকাম ভক্তের পক্ষে শান্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—তাঁহার কামনা কিছুই নাই। তিনিই শান্তির অধিকারী। যদি কোনও ভাগ্যবান জীব কৃষ্ণ ও গুরুর প্রসাদে ভক্তিলতার সামান্য একটু বীজ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল দ্বারা নিয়ত সেই বীজকে সিক্ত রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, বিরজা-লোক ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে ও তৎপরে তদুপরিস্থ গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং প্রেমরূপ ফল প্রসব করে। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলের অভাবে এই বীজ অঙ্কুরিত হইতে পায় না। পরন্তু বীজ অঙ্কুরিত হইবার পরে যদি বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তীর উদ্ভব হয়, তাহা হইলে অঙ্কুরিত লতা সেই হস্তীকর্ত্তৃক সমূলে উৎপাটিত হয়। ভক্তি-লতার শত্রু অনেক। ভুক্তি, মুক্তি, প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা প্রভৃতি অসংখ্য উপশাখার উদ্গম হইয়া মূল-শাখার বৃদ্ধির প্রতিরোধ করে। এই সমস্ত উপশাখা ছেদন না করিলে মূল-শাখা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় না।

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, জ্ঞান, কর্ম্ম সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধা-ভক্তি বলে; এই শুদ্ধা-ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হয়। জাহ্নবী যেমন কামনাবিরহিত হইয়া সাগর সঙ্গমে প্রধাবিত, তেমনি নির্গুণ ভক্তিযোগের অধিকারীর চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত প্রীতিবশতঃ ফলানুসন্ধানশূন্য হইয়া অব্যবহিত ভাবে তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়। ভক্ত ভগবৎসেবা ভিন্ন আর কিছুরই কামনা করেন না। সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য বা একত্ব প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না। ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহারূপিণী পিশাচী হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিতে তথায় ভক্তি-সুখের উদয় হইতে পারে না। ভক্তির সাধন" করিতে করিতে রতির উদ্ভব হয়। রতি যখন গাঢ়

হয়, তখনই তাহা প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। একই ইক্ষুরস যেমন গুড়, খণ্ড, চিনি, মিছরী প্রভৃতি বিবিধ সুমিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়, তেমনি একই প্রেম অবস্থাভেদে উপরোক্ত ভাবসমূহে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভক্তিরসরূপ এই সকল ভাব স্থায়ী হইলেও অনেক সময় ইহাদিগের সহিত অস্থায়ী ভাবেরও মিলন ঘটে। দধি, শর্করা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ মিলিত হইয়া যেমন অপূর্ব্ব রসাল খাদ্যের উৎপত্তি করে, তেমনি স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাব মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুরভাব সৃষ্টি করে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার। এই পঞ্চ রতির অনুরূপ কৃষ্ণভক্তি-রসও পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এই পঞ্চই প্রধান। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়, এই সাতটী গৌণ রস; ভক্ত-ভেদে ইহাদের উৎপত্তি। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রস মুখ্য ও স্থায়ী; শেষোক্ত সপ্ত রস গৌণ ও আগন্তুক। সনকাদি ঋষিগণ শান্ত-ভক্ত; দাস্য-ভক্ত সর্ব্বত্র সুলভ; শ্রীদাম প্রভৃতি ও ভীমার্জ্জুন সখ্য-ভক্ত; নন্দ, যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-ভক্ত; ব্রজগোপীগণ মধুররস-ভক্ত। কৃষ্ণ রতি দ্বিবিধ,—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা। বৈকুণ্ঠেশ্বরে রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা; গোকুলে রতি কেবলা। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে প্রীতি সঙ্কুচিত হয়; কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য দেখিলেও গ্রাহ্য করে না। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে উভয়ের মনে ভয়ের উদয় হইয়াছিল; অর্জ্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন; মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে রুক্মিণীকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন, তাহাতেই রুক্মিণীর ত্রাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু শুদ্ধা-কেবলা রতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না, থাকে কেবল শুদ্ধ প্রেম। যশোদা নরদেহধারী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে পুত্রজ্ঞানে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। গোপী কৃষ্ণকে গর্ব্বিত স্বরে বলিয়াছিলেন "আমি আর চলিতে পারিতেছি না; আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল।"

ভগবানে নিষ্ঠা-বুদ্ধিই শম-নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম; দুঃখ-সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা এবং রসনা ও উপস্থের বশীকরণকে ধৃতি কহে। তৃষ্ণাত্যাগ শমের কার্য্য, কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক সকলই তুল্য চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। কৃষ্ণভক্ত যিনি তিনি শান্ত। তৃষ্ণা-ত্যাগ ও কৃষ্ণে নিষ্ঠা কৃষ্ণভক্তের এই দুই গুণ। আকাশের গুণ শব্দ যেমন তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক ভূতেই আছে, শান্তরসের এই দুই গুণও তেমনি পরবর্ত্তী সমস্ত রসেই বর্ত্তমান। কিন্তু শান্তরসে কেবল পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানই সম্ভবপর; লীলাময় রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। দাস্যরতিতে বাসনা-ত্যাগ ও একাগ্রতা আছে, তদুপরি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানজনিত সম্ভ্রম ও সেবা আছে। সখ্যরসে শান্তের দুই গুণ ও দাস্যের সেবা আছে; দাস্যের সম্ভ্রম, গৌরব ও সেবা সকলই আছে—কিন্তু তাহারা বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রেমে পরিণত হয়। সখ্য বিশ্রম্ভপ্রধান ও

গৌরব-সম্ভ্রমবিহীন। সখ্যরসে কৃষ্ণে আত্ম-সমজ্ঞান জন্মে। বাৎসল্যে শান্তরসের কৃষ্ণানুরাগ ও তৃষ্ণাত্যাগ ব্যতীত দাস্যের সেবা আছে। সে সেবা বাৎসল্যে পালন নামে অভিহিত। মধুর রসে কৃষ্ণে অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ ভিন্ন, সেবার অত্যাধিক্য বর্ত্তমান। ভক্ত ভগবানকে কান্তজ্ঞানে নিজ অঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। মধুর রসে অন্যান্য যাবতীয় রসের গুণাবলী একত্রিত হইয়াছে এই মধুর রসের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিও। ইহা ভাবিতে ভাবিতে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূরিত হইয়া উঠিবেন।" এই বলিয়া গৌর রূপকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে রূপকে বৃন্দাবন গমন করিতে ও তথা হইতে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে উপদেশ দিয়া গৌর প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া বারাণসী-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চন্দ্রশেখর স্বপ্নে গৌরের আগমন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া নগরের বহির্ভাগে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গৌর নগরোপান্তে উপনীত হইলে তাঁহাকে লইয়া চন্দ্রশেখর গৃহে গমন করিলেন।

গৌর যখন বারাণসীধামে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক দিন সনাতন আসিয়া সেই গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। গৌর গৃহমধ্যে ছিলেন; সনাতন গৃহপ্রবেশ না করিয়া নিঃশব্দে দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গৌর জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে কহিলেন "দ্বারদেশে একজন বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর দ্বারদেশে বৈষ্ণববেশধারী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়া গৌরকে বলিলেন "কই কোনও বৈষ্ণব ত দেখিতে পাইলাম না।" গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "দ্বারে কি কেহই নাই?" চন্দ্রশেখর কহিলেন "একজন দরবেশ বসিয়া আছেন।" গৌর কহিলেন "তাহাকেই আনয়ন কর।" চন্দ্রশেখর দরবেশবেশী সনাতনকে লইয়া গৌরের সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। সনাতনকে অঙ্গনে দেখিবামাত্রই গৌর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন প্রেমবিহ্বল সনাতন গদগদ কণ্ঠে কহিলেন "আমাকে স্পর্শ করিও না, প্রভু, আমাকে স্পর্শ করিও না।" গৌর তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং স্বীয় হস্তে তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। সনাতন বারংবার বলিতে লাগিলেন "আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিও না—" কিন্তু গৌর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন "তুমি ভক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিতে পার। আমি স্বয়ং পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি।" প্রেম-সম্ভাষণের পর গৌর সনাতনের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। সনাতন তাঁহার কারাগার হইতে উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। গৌর রূপ ও অনুপমের সংবাদ সনাতনকে অবগত করাইয়া চন্দ্রশেখরকে তাঁহার ক্ষৌরকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে এবং গঙ্গাস্নানান্তে তাঁহাকে নূতন বস্ত্র দিতে আদেশ করিলেন। ক্ষৌরকার্য্য ও স্নান-সমাপনান্তে সনাতন গৌরের উচ্ছিষ্ট পাত্রে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিলেন না; পরন্তু তপন মিশ্র-প্রদত্ত

একখানি পুরাতন বস্ত্র দ্বিখণ্ড করিয়া তদ্দ্বারা কৌপীন প্রস্তুত করিলেন এবং কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভোট-কম্বলখানি ত্যাগ করিলেন না। একদিন গৌর সেই কম্বলের দিকে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সনাতন বুঝিলেন মূল্যবান্ কম্বল-ব্যবহার প্রভুর অভিপ্রেত নহে। সেই দিন গঙ্গাস্নান-কালে একব্যক্তির ছিন্নকন্থার সহিত কম্বল বিনিময় করিয়া তিনি গৌরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৌর সমস্ত শুনিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন।

কতিপয় দিবস গত হইলে সনাতন বিনীতভাবে গৌরকে কহিলেন "আমি নীচসংসর্গে বিষয়মত্ত হইয়া জীবন কাটাইয়াছি। যদি কৃপা করিয়া আমাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তবে আমার কর্ত্তব্য আমাকে উপদেশ কর। সাধ্যসাধনতত্ত্ব কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয় তাহাও আমি জানি না। তুমি আপনিই আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দেও।" গৌর কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই। পরিজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছ। ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতে তুমিই যোগ্যপাত্র। আমি ক্রমে ক্রমে সমস্ত তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।" গৌর বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পরমেশ্বর। অচিন্ত্য অনন্ত বিচিত্র শক্তিমত্তাই পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ। একস্থানস্থিত বহ্নির জ্যোৎস্না যেমন বহুদূরে প্রসারিত হয়, তেমনি পরমেশ্বরের শক্তি এই নিখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। পরমেশ্বরের এই স্বরূপ-শক্তি শাস্ত্রে ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিৎশক্তিকে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তিও বলে। জীবশক্তি তটস্থা শক্তি, এবং মায়াশক্তি বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়াও অভিহিত হয়। শক্তিশব্দের মুখ্যার্থ কার্য্যক্ষমত্ব। কার্য্য ও কারণ এই দুই অবস্থায় শক্তির অবস্থান। কার্য্যাবস্থায় শক্তিকে বৃত্তি বলে। কারণরূপা ও কার্য্যরূপা শক্তির সাধারণ নাম বৈভব। স্বরূপশক্তি ও তৎকার্য্যকে সাধারণতঃ স্বরূপ-বৈভব, মায়াশক্তি ও তৎকার্য্যকে মায়া-বৈভব এবং তটস্থশক্তি ও তৎকার্য্যকে তটস্থ-বৈভব বলে। উপরোক্ত চিৎশক্তিকে শাস্ত্রকারগণ আবার ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন,—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি পরিণত হইয়াছে। সত্ত্ব, চিত্ত্ব ও আনন্দত্ব এই ত্রিবিধ শক্তির সাধারণ নাম স্বরূপ-শক্তি। সৎস্বরূপ হইয়াও পরমেশ্বর যদ্দ্বারা সত্তা ধারণ ও স্থাপন করেন তাহার নাম সত্ত্ব বা সন্ধিনী শক্তি। স্বয়ং চিৎস্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন ও করান তাহার নাম চিত্ত্ব বা সম্বিৎশক্তি এবং স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন ও করান তাহার নাম আনন্দত্ব বা হ্লাদিনী শক্তি। উক্ত শক্তিত্রয়ের সাধারণ কার্য্য বা বৃত্তির নাম শুদ্ধসত্ত্ব। পরমেশ্বর সজাতীয়াদি ত্রিবিধ-ভেদবিরহিত হইলেও, তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহার স্বরূপভূত সৎ, চিৎ ও আনন্দ সান্ত মানবের নিকট পৃথক পৃথকরূপে প্রতীত হয় এবং তাঁহার অব্যভিচারিণী শক্তি একরূপা হইয়াও অনন্তরূপে

প্রকাশ পায়। এই স্বরূপ-শক্তিকে পরা শক্তি বলে। ইহারই প্রভাবে পরমেশ্বর প্রধানাদি কারণ-তত্ত্ব সকলকে স্বয়ং সর্ব্বথা অস্পৃষ্ট থাকিয়াও স্ববশে স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে মহদাদিরূপে পরিণামিত করেন। তিনি এই শক্তির দ্বারা বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং মায়াশক্তি দ্বারা উপাদান-কারণ বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বকারণ-কারণ বলা হইয়াছে। পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থিত বলিয়া জীবশক্তি তটস্থশক্তি বলিয়া অভিহিত। শক্তি ও শক্তিমান ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই। সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণ, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি এক নহে। কিন্তু কিরণ ব্যতিরেকে সূর্য্যের সত্তা এবং দাহিকা-শক্তি ব্যতীত অগ্নির সত্তা অসম্ভব। সুতরাং বলিতে হয় সূর্য্য ও কিরণ, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি অভিন্ন। পরমেশ্বর ও তাঁহার শক্তি জীবও তেমনি ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই। অগ্নির দাহিকাশক্তি এবং সূর্য্য-কিরণ যেমন স্বীয় আশ্রয়ভূত অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, জীবও তেমনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদই বেদান্তশাস্ত্রের অভিমত। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আগন্তুক বা উপাধিক নহে, পরন্তু মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত স্থায়ী। জীব ভগবদ্বিষয়ে নিত্য বহির্ম্মুখ হইয়াই মায়ায় আবদ্ধ হয় এবং বহুকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু যদি সাধু ও শাস্ত্রকৃপায় সে আপনাকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে পারে, তবেই সে উদ্ধার পায়। মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি থাকে না। জীবের প্রতি কৃপাবশতঃই কৃষ্ণ বেদ ও পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র ও গুরুর কৃপাতেই জীব মায়ার আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হয়। গুরু দুই প্রকার—দীক্ষা-গুরু এবং শিক্ষা-গুরু। দীক্ষা-গুরু এক, শিক্ষা-গুরু দ্বিবিধ—মহান্ত-গুরু ও চৈত্য-গুরু। ভগবান অন্তর্যামীরূপে জীবের অন্তরে থাকিয়া সদসৎ প্রকাশ করেন। ভগবান্‌ই চৈত্য-গুরু। আবার ভক্তশ্রেষ্ঠগণ মহান্তস্বরূপে উপদেশ ও স্বীয় আচরণের আদর্শ দ্বারা ইষ্টপথ দেখাইয়া দেন। বেদে বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণই এই বিষয়—কেননা তিনিই বেদের প্রতিপাদ্য। তদ্বাচ্য-বাচকতারূপে তাঁহারই বিষয়, তৎপ্রাপ্তি-সাধন-রূপে অভিধেয় একমাত্র ভক্তি এবং পরম-পুরুষার্থরূপে তৎপ্রেমলাভই প্রয়োজন। কোনও দরিদ্রের গৃহে এক সর্ব্বজ্ঞ উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন "তোমার পিতৃধন থাকিতে কেন তুমি দুঃখ পাইতেছ? তুমি অমুক স্থান খনন করিলেই পিতৃধন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সাবধান যে স্থানের কথা আমি বলিতেছি, সেই স্থানই খুঁড়িবে। অন্যথা ভীমরুল, সর্প ও যক্ষ উত্থিত হইয়া তোমার ধনপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা করিবে।" এখানে সর্ব্বজ্ঞের উপদেশের বিষয় যেমন দরিদ্রের পিতৃধন, সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশের "বিষয়"ও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বজ্ঞ যেমন দরিদ্রকে তাহার পিতৃধন-প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছিল, সর্ব্বশাস্ত্রও তেমনি শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বিবৃত করিয়াছেন। এই উপায়—কর্ম্ম ও জ্ঞান বর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা। এই ভক্তিরূপ উপায়ই "অভিধেয়।" দরিদ্রের ধনলাভের প্রয়োজন যেমন তাহার দারিদ্র্যনাশ, তেমনি ভক্তির "প্রয়োজন"ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম। প্রেমের ফলের কৃষ্ণাস্বাদ

হইলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। কিন্তু দারিদ্র্যনাশ ও ভব-বন্ধন-ক্ষয় প্রেমের উদ্দেশ্য নহে, প্রেম-সুখভোগই তাহার উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম বস্তু ও উপাস্য, তিনি অনন্যসিদ্ধ মাধুর্য্যের আধার। বিশ্বসৃষ্টি-কর্ম্মে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি এবং নর-লীলা পরিপাটীতে তাঁহার মাধুর্য্যের বিকাশ। তিনি অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাতে সজাতীয় বা বিজাতীয় যে সকল তত্ত্ব দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হয় সে সমস্তই তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত—তাঁহারই শক্তিপ্রকাশ মাত্র, তিনি স্বয়ং সর্ব্ব-তত্ত্বাত্মক। অবতারগণ তাঁহার অংশমাত্র; জীবগণ তাঁহার বিভিন্নাংশ। তিনি সর্ব্বাদি ও সর্ব্বাংশী পুরুষ; তিনি সকলের আশ্রয়ভূত; তদ্ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই সত্তা থাকে না; তিনি সর্ব্বেশ্বর; বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় নরলীলাতে তাঁহার নর-বপুই একমাত্র সহায়; তিনি কিশোর বয়সে নিত্য অবস্থিত হইলেও, বাল্য ও পৌগণ্ড বয়সও তাঁহার শ্রীবিগ্রহের ধর্ম্ম। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ; ইহা চিদানন্দময়; জীবের মত দেহ-দেহী-ভেদ তাঁহাতে নাই, ভগবান নিজেই নিজের বিগ্রহ। রবি যেমন প্রকাশস্বরূপ হইয়াও ধ্যান-সৌন্দর্য্যার্থ বিগ্রহবান হয়, ভগবানও তদ্রূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ হইয়াও আত্মস্বরূপ-বিগ্রহ প্রকাশ করেন, অন্যথা জীবের ধ্যান সিদ্ধ হয় না। তিনি উপাসকের যোগ্যতানু-সারে জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগিগণের সম্বন্ধে অন্তর্য্যামিত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমাত্মারূপে এবং ভক্তগণের নিকট ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ পরমেশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়া জীবের জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-সাধনের যথাযোগ্য ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিবিশেষ, পরমাত্মা তাঁহার অংশ-বিশেষ। সর্ব্বাবতংস শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মা। তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও এবং তাঁহার বিগ্রহ এক হইলেও তিনি অনন্তস্বরূপে বিরাজমান। প্রথমতঃ তিনি স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ—এই তিন রূপে বিরাজিত। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ অর্থাৎ স্বয়ং-প্রকাশ। এই প্রকাশ প্রাভব এবং বৈভব ভেদে দ্বিবিধ। একই বপু যদি বহুরূপে প্রকট হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রাভব প্রকাশ বলে; যেমন রাসমণ্ডলীতে মহিষী বিবাহে হইয়াছিল। সেই বপু যদি আবার পৃথগাকারে প্রতীত হয়, তবে তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলে; যথা বৃন্দাবনে বলদেব এবং মথুরাদিতে দেবকীনন্দন। সেই এক বপু কিঞ্চিৎ ভিন্নাকার ধারণ করিয়া ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইলে তাঁহাকে তদেকাত্ম রূপ বলে; তাহা দ্বিবিধ, বিলাস ও স্বাংশ। বিলাসও প্রাভব ও বৈভব ভেদে দ্বিবিধ; কিন্তু বিলাসের বিলাস অনন্ত, তন্মধ্যে প্রাভব বিলাস মুখ্যতঃ চতুর্ব্বিধ,—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই চতুর্ব্যূহের দ্বারকা ও মথুরা-দিতেই নিত্যবাস এবং ইঁহারাই অনন্ত চতুর্ব্যূহের প্রাকর্ষ্যের নিদান। পরব্যোম-ধামে শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস। ইনি আবার চতুষ্পার্শ্বে আবরণরূপে অন্য চতুর্ব্যূহ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের আবার তিন তিন বিলাসমূর্ত্তি আছে। কেবলমাত্র চক্রাদি অস্ত্র-ধারণ ভেদে নাম-ভেদ হইয়াছে, যথা—বাসুদেব, কেশব, নারায়ণ, মাধব, সংকর্ষণ, গোবিন্দ,

বিষ্ণু, মধুসূদন, প্রদ্যুম্ন, ত্রিবিক্রম বামন, শ্রীধর, অনিরুদ্ধ, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর। বাসুদেবের বিলাস অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম। সংকর্ষণের উপেন্দ্র ও অচ্যুত। প্রদ্যুম্নের নৃসিংহ ও জনার্দ্দন। অনিরুদ্ধের হরি ও কৃষ্ণ। ইহার মধ্যে চতুর্ব্যূহ কৃষ্ণের বিলাস; অন্য বিংশতি জন আবার বিলাসের বিলাস। ঐ বিংশতি জনের মধ্যে যাঁহারা আকারে ও বেশে ভিন্ন তাঁহারাই বৈভব বিলাস। যথা পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, রাম, হরি ও কৃষ্ণাদি। ইঁহারা পরব্যোম-মধ্যস্থ বৈকুণ্ঠধামের অষ্টদিকে তিন তিন জন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন, তথাপি ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও ভক্ত-রক্ষার নিমিত্ত সময়ে সময়ে প্রাকৃতপ্রপঞ্চে অবস্থান করেন। যথা মথুরায় কেশব, নীলাচলে পুরুষোত্তম, প্রয়াগে মাধব ইত্যাদি। অবতারগণই স্বাংশরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতার পঞ্চবিধ—সংকর্ষণ বা পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার। শ্রীকৃষ্ণই এই সকল অবতারের একমাত্র নিদান। সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে তিনি পুরুষরূপ প্রকাশ করেন। পুরুষরূপ ত্রিবিধ—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। ইঁহারা সকলেই ক্রিয়াশক্তি-প্রধান, কিন্তু সর্ব্বাধিষ্ঠাতা বাসুদেব জ্ঞানশক্তি-প্রধান এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি-প্রধান। সর্ব্বশক্তির প্রবর্ত্তক এই ত্রিশক্তির সমন্বয়েই বস্তুসৃষ্টির সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পুরুষরূপ সংকর্ষণ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা হইয়া চিৎশক্তি দ্বারা গোলোক বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি অপ্রাকৃত এবং মায়াশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাকৃত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর-শক্তি ভিন্ন জড়প্রকৃতি কোন পদার্থের কারণ হইতে পারে না। অগ্নিশক্তির সহযোগে ভিন্ন লৌহ কখনও দাহিকাশক্তির অধিকারী হয় না। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ঈশ্বর সৃষ্টিবিষয়ে নিদ্রিত ছিলেন। এই অবস্থার নাম যোগ-নিদ্রা। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উদিত হইলে তিনি জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হন। যতক্ষণ একাকী থাকিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, ততক্ষণ তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা ও কার্য্যকারণরূপিণী মায়াশক্তিও তাঁহাতেই বিলীন ছিল। সুতরাং প্রলয়কালে জীব ও পরমাত্মা উভয়ে মিলিত ভাবে ছিলেন। সে সময়ে ঈশ্বরের দ্রষ্টা ও দৃশ্যানুসন্ধান ছিল না। দর্শনেচ্ছা উদ্বুদ্ধ হইলে প্রলয়ে প্রসুপ্ত মায়াশক্তি ঈশ্বরস্বরূপ হইতে পৃথককৃত হয়। সংসার-তাপে তাপিত যে সকল জীব বিশ্রাম-লাভের জন্য প্রলয়ে ঈশ্বরে বিলীন ছিল, তখনও তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম ও বাসনা বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়া তাহাদের মুক্তিলাভ ঘটে নাই। পুনর্ব্বার সৃষ্টিতে তাহাদিগকে মুক্তিলাভের সুযোগ প্রদান করিবার নিমিত্তই সৃষ্টির ইচ্ছা। এই সময়ে ভগবান প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে বিরজাতে শয়ন করেন, অনন্তর ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করায় গুণত্রয় বিক্ষোভিত হইলে, তাহাতে জীবশক্তিরূপ বীর্য্যাধান করেন। সেই সময়ে প্রকৃতির পরিণাম বা অবস্থান্তর আরব্ধ হয়। মহত্তত্ত্বাদি-ভেদে প্রকৃতির পরিণাম বহুবিধ। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টির পরিণামই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। উহাদের ব্যষ্টির পরিণামের নাম অহঙ্কার। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ। তামস বা ভূতাদি

অহঙ্কার হইতে আকাশবীজ শব্দ, শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ুবীজ স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজের বীজ রূপ, রূপ হইতে তেজ, তেজ হইতে জলের বীজ রস, রস হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর বীজ গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। রাজস বা তৈজস অহঙ্কার হইতে চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও রাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রমে উৎপন্ন হয়। মন যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদিগুণের উপলব্ধি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা উক্তিপ্রভৃতি কর্ম্মসকল সাধিত হয়। সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহংকার হইতে দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বি, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি ও চন্দ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের উৎপত্তি হয়। এই রূপেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই মহৎ স্রষ্টা পুরুষ কারণাব্ধিশায়ী এবং সমষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডগণের অন্তর্য্যামী। বিরজাই কারণাব্ধি, তাহা প্রধান পরব্যোমের মধ্যস্থিত এবং বেদাঙ্গ-স্বেদরূপ জলদ্বারা পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় পুরুষ সেই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়া নিজাঙ্গ-স্বেদ-জলে তাহার অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া স্বয়ং শেষ-শয্যায় শয়ন করেন। তাঁহারই নাভি-দেশে চতুর্দ্দশভুবনাত্মক একটী পদ্ম উদ্‌ভূত হয় এবং সেই পদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে সৃষ্টি বিধান করেন। এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্যষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডগণের অন্তর্য্যামী এবং হিরণ্যগর্ভ গর্ভোদক সহস্রশীর্ষাদি নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু পালন-কর্ত্তা ও বিরাট ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী। ইনিই গুণাবতার মধ্যে গণ্য হইবেন। বিরাট পুরুষ দৈবশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিভূত এবং দৈবশক্তি ও জ্ঞানশক্তি-সমন্বিত পরমাত্মার অংশভূত। যাবতীয় ভূতগণ ইঁহাতেই প্রকাশ পায়। এই বিরাট পুরুষ হইতেই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি। লীলাবতার মৎস্যকূর্ম্মাদি ভেদে অনন্ত। গুণাবতার ত্রিবিধ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মত্বলাভ পুণ্যবান জীবের আয়ত্তাধীন। এই ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও প্রতি মন্বন্তরে এক একটী অবতার নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মার পরমায়ুকাল একশত বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগে যুগাবতারও চতুর্ব্বিধ। সত্যে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলিযুগে পীতবর্ণ অবতার। শ্রীকৃষ্ণই পীতবর্ণ ধারণ করিয়া কলিযুগে নিজ নাম সংকীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া জীবকে প্রেমভক্তি দান করিয়া থাকেন।”

কলিযুগের পীতবর্ণ অবতারের কথা শুনিয়া সনাতন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিনীতভাবে কহিলেন “আমি অতি ক্ষুদ্রজীব, তাহাতে নীচাশয় ও ম্লেচ্ছসঙ্গী; কলির অবতার কে তাহা কেমন করিয়া নিশ্চয় করিব? তুমি দয়া করিয়া বলিয়া দেও।” গৌর কহিলেন “আমাদের মত জীবের শাস্ত্র-বাক্যে ও ঋষিগণের বাক্যেই জ্ঞান জন্মে। অবতার কখনই আমি অবতার এই কথা নিজমুখে বলেন না। যমলার্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন দেহিগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও যিনি দৈহিক ধর্ম্মশূন্য, দেহিগণের পক্ষে অসম্ভব, অনিবার্য্য, অদ্ভুত ও অতুল

পরাক্রম দ্বারাই ভগবানের সেই অবতারকে জানা যায়। স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বস্তু চিনিতে হয়। আকৃতি-প্রকৃতিই স্বরূপলক্ষণ; কর্ম্মদ্বারা তটস্থ লক্ষণের জ্ঞান জন্মে। শ্রীমদ্-ভাগবতে আছে—'বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করিলে যিনি নিখিল অর্থে ও ব্যাপারে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন, যিনি এই দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্, আদিকবি ব্রহ্মাকে যিনি অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণেরও যাঁহাতে পুনঃ পুনঃ মোহ জন্মে, যাঁহাতেই তেজ ও ক্ষিত্যাদি ভূত-গ্রামের বিনিময়, চিৎ-উদয়রূপ সৃষ্টি, জীব-প্রকটরূপ সৃষ্টি ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ যাঁহাতে সত্যরূপে বিদ্যমান, সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য-কুহকবর্জ্জিত পরমসত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি।' এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ উভয়েরই উল্লেখ আছে। কিন্তু ঈশ্বরকে কেহ এই লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারে না। অবতার কালে এই সমস্ত লক্ষণ জগতের গোচর হয়।"

সনাতন কহিলেন "তবে নিশ্চয় করিয়া বল, যাঁহার শরীরে ঈশ্বর-লক্ষণ আছে, যিনি পীতবর্ণ, প্রেমদান ও নাম-সংকীর্ত্তন যাঁহার কার্য্য, কলিযুগে তিনিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অবতার।" তখন গৌর কহিলেন "সনাতন, চতুরালি পরিত্যাগ করিয়া আমার কথা শুন। গৌণ ও মুখ্য ভেদে আবার অবতার দ্বিবিধ। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ তিনিই মুখ্য আবেশাবতার। যথা সনক, নারদ, পৃথু, পরশুরাম। আর যাহাতে শক্তির আভাস মাত্র দেখা যায় তাহাকে বিভূতি বলে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে সমস্ত পদার্থ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট, সম্পত্তিশীল ও বলপ্রভাবাদির আধিক্য সমন্বিত, তৎসমস্তই আমার তেজের অংশজাত বিভূতি জানিবে। এখন বাল্য ও পৌগণ্ড ধর্ম্মের বিচার শোন। ভগবানের লীলাচক্র জ্যোতিশ্চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের মধ্যে এক ব্রহ্মাণ্ডে শেষ হইতে না হইতে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে সমুদিত হয়। সুতরাং এই লীলাচক্রের প্রবাহ নিত্য। ভগবানের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর-লীলাও শাস্ত্রে নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিশোর-শেখরধ ব্রজেন্দ্রনন্দন যখন লীলা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমে মাতা পিতা ও ভক্তদিগকে প্রকট করেন; জন্মাদি পরে লীলাক্রমে হয়। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দুই প্রকার। গোলোকাখ্য নিত্যধামে রাসাদি অপ্রকট লীলা নিত্যই হইতেছে। যোগমায়া তথায় দাসীর ন্যায় সকল কার্য্য সম্পাদন করে। স্বীয় পিত্রাদি বন্ধুবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ তথায় সর্ব্বদা বিহার করিতেছেন। তাহার নিম্নদেশে পরব্যোম-ভাবে নারায়ণাদি অনন্ত ভগবৎস্বরূপ এক এক বৈকুণ্ঠে প্রতিনিয়ত বিরাজমান। তন্নিম্নে দেবীধাম, তথায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডসকল প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় নিত্য গোলোকধাম প্রপঞ্চে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা প্রকট। তথায় পুতনা-বধাদি প্রকট লীলা প্রকাশিত হয়। এতন্মধ্যে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রকাশহেতু কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণতম এবং শক্তিপ্রকাশের তারতম্যহেতু পুরীদ্বয়ে ও পরব্যোমে যথাক্রমে পূর্ণতর ও

পূর্ণরূপে বিহার করেন। এই সকল ধাম চিদানন্দময় ও নিত্য, শাস্ত্রে ত্রিপাদবিভূতি নামে প্রসিদ্ধ এবং বিরজার পারে অবস্থিত। এই ত্রিপাদ-বিভূতি বাক্যের অগোচর। ব্রহ্মা একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দ্বারবানের নিকট তাঁহার আগমন-সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ ব্রহ্মা? দ্বারবান ব্রহ্মাকে আসিয়া সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। পরে কহিলেন প্রভুকে বল সনকের পিতা চতুর্ম্মুখ আসিয়াছেন। কৃষ্ণকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে দ্বারী ব্রহ্মাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিলে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভু, আপনি দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন। আমা বই জগতে ব্রহ্মা আর কে আছে? তখন হাসিয়া কৃষ্ণ ধ্যান করিলেন। তখন অসংখ্য ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও শত, কাহারও সহস্র, কাহারও বা লক্ষ মুখ। চতুরানন দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অবর্ণনীয়। তাঁহার মনোমোহন রূপ। তাহাতে তিনি আপনিই মুগ্ধ হন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য নারায়ণে নাই। নারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মী পতিব্রতাগণের উপাস্যা। তিনিও এই মাধুর্য্যলোভে তপস্যা করিয়াছিলেন। কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান ও ধ্যান দ্বারা এই মাধুর্য্যাস্বাদ উপলব্ধ হয় না। রাগমার্গে কৃষ্ণকে ভজনা করিলেই কৃষ্ণ-মাধুর্য্য উপলব্ধ হয়।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

তাঁহার বপু মধুর, তাঁহার বদনপদ্ম মধুর, তাঁহার মৃদুহাস্য মনোহর-সুগন্ধি, তাঁহার সমস্তই মধুর। তাঁহার বংশীধ্বনি একবার কাণে প্রবিষ্ট হইলে তথায় অনবরত প্রতিধ্বনিত হয়; তথায় আর অন্য শব্দ প্রবেশ করিতে পায় না। সেই ধ্বনি শুনিলে পতির অঙ্ক হইতে তাহা সাধ্বীগণকে বিবশা ও বিবস্ত্রা করিয়া টানিয়া আনে। তাহাদের লোকধর্ম্ম, লজ্জা-ভয় বিলুপ্ত হয়। আমি উন্মাদ, আমি কৃষ্ণের মাধুর্য্য-প্রবাহে ভাসমান। সে মাধুর্য্যের কথা মনে হইলে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না।" বলিয়া গৌর নীরব হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে গৌর কহিলেন—"এখন অভিধেয় লক্ষণ শ্রবণ কর। কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। বহির্ম্মুখ জীব মায়াবশে কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া বহু কষ্ট ভোগ করে। সাধু-সংসর্গে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। কৃষ্ণভক্ত সমস্ত কর্ম্ম স্বীয় আরাধ্য দেবতায় সমর্পণ করিয়া অবশেষে আপনাকেও তাঁহার চরণে সমর্পণ করেন। "অমি তোমারই" বলিয়া যে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে, ভগবান তাহাকে অভয় প্রদান করেন। অন্য কামনা করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে, পরিণামে সে-ও শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ করে। পরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদান করিয়া বিষয় ভুলাইয়া দেন। তখন সে কামনা-বিরহিত হইয়াই তাঁহাকে ভজনা করে।

নিষ্কামভক্ত প্রার্থনা না করিলেও ভগবান তাঁহাকে সর্ব্বকামপ্রদ স্বীয় পদপল্লব দান করেন। সকামভাবে উপাসনা করিতে করিতে ভক্ত নিষ্কাম হইয়া পড়েন। ঐশ্বর্য্য-লাভেচ্ছায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্রুব যথন আরাধ্য দেবতার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসে স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাঞ্চং বিচিন্বন্নাপ দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

হে দেব স্থানাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ফলে পাইলাম মুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে। আমি কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিন্ তোমাকে পাইয়াই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাই না।

নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় ভগবান বলিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো রক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তুমি আমাতেই মন অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর, আমাকে প্রণাম কর। তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সত্য কহিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমিই তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে রক্ষা করিব। তুমি শোক করিও না।

অতএব জ্ঞান কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইবে। তাঁহার উপাসনা করিলে সমস্ত দেবতারই পূজা হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা না হইলে ভক্তি হয় না। শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে অধিকারী-ভেদ হয়। যাহার শ্রদ্ধা শাস্ত্র ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে উত্তম অধিকারী। শাস্ত্র ও যুক্তি না জানিয়াও যে দৃঢ়শ্রদ্ধার অধিকারী সে মধ্যম। শ্রদ্ধা যাহার কোমল সে কনিষ্ঠ অধিকারী। কালসহকারে কোমল শ্রদ্ধার অধিকারীও উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন তিনিই উত্তম ভক্ত। যিনি ঈশ্বরে, তদ্‌ভক্তে এবং তৎপ্রতি উদাসীন ও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করেন, তাঁহার নাম মধ্যম ভক্ত। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমাতে ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তের বা অপর কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। এখন বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। বৈষ্ণব কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যপরায়ণ, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারী, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ; মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী। বৈষ্ণবগণ সর্ব্ব প্রযত্নে অসৎ-সংসর্গ ত্যাগ করিবেন। স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণের অভক্ত অসৎসঙ্গী মধ্যে গণ্য। বৈষ্ণব কখনও কৃষ্ণভক্তিহীন, ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিবেন না। বৈষ্ণব কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিবেন। শরণাগত ও অকিঞ্চনের লক্ষণ

একই। ঈশ্বর-আরাধনের অনুকূল বিষয়-গ্রহণ, তৎপ্রতিকূলবিষয়-ত্যাগ; "তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন" এইরূপ বিশ্বাস, তদীয়রক্ষিতৃত্বে আত্মসমর্পণ, তদীয় কার্য্যে আত্মবিনিক্ষেপ, তদীয় শরণ-বিষয়ে নিষ্ঠামতি, এই ছয়টী শরণাগতের লক্ষণ।

অধুনা সাধন-ভক্তি বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যাহা দ্বারা ভাব সাধন করা যায়, তাহারই নাম সাধন-ভক্তি। স্বভাবজাত নিত্যসিদ্ধ কতকগুলি ভাব আছে, সেইগুলির হৃদয়ে উত্থাপনই সাধন। সাধনের স্বরূপ-লক্ষণ শ্রবণাদি-ক্রিয়া, তটস্থ লক্ষণ প্রেমোৎপত্তি। সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা। রাগবিহীন জন শাস্ত্রানুসারে যে ভগবানের ভজনা করেন, তাহাকে বৈধ-ভক্তি বলে। বাঞ্ছিত পদার্থে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা হয়, তাহাকে রাগ বলে। সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগানুগা বলিয়া অভিহিত। বৈধভক্তিমান্ ভক্তি সাধনার বিবিধ অঙ্গ সাধন করেন। গুরুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ, সাধু মার্গানুগমন, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ, তীর্থে বাস, একাদশী-পালন, ধাত্রী-অশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণবের সেবা, অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহু-গ্রন্থ-পাঠ ও কলাভ্যাস বর্জ্জন, সুখ-দুঃখ-জয়ীকরণ, অন্য দেবতা ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দা-বর্জ্জন, প্রাণীর উদ্বেগকারণ-পরিহার, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, স্তুতিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, পরিক্রমা, স্তব-পাঠ, জপ, প্রসাদ-ভোজন; তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও বৈষ্ণবের সেবন, দান ধ্যান, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপার উপলব্ধি, ভক্তগণসহ জন্মদিনাদি-মহোৎসব, সাধুসঙ্গ, ভাগবত-শ্রবণ এবং সর্ব্বদা শরণাগতি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া ভক্ত অপার সুখের অধিকারী হন। রাগানুগা ভক্তি ব্রজবাসী ব্যক্তিতে প্রকাশিত। আন্তর ও বাহ্যভেদে এই ভক্তির সাধন দ্বিবিধ। রাগানুগাভক্তি-মান বাহ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করেন; অন্তরে সিদ্ধস্বরূপ মানসদেহে ভগবানের আরাধনা করেন। কেহ আপনাকে ভগবানের দাস, কেহ সখা, কেহ পিতা কিম্বা মাতা, কেহ বা আপনাকে ভগবানের প্রেয়সী কল্পনা করিয়া দিবারাত্র তাঁহারই ধ্যানে অতিবাহিত করেন। এইরূপে যিনি রাগানুগা ভক্তির সাধন করেন শ্রীকৃষ্ণের চরণে তাঁহার প্রেম উৎপন্ন হয়। প্রেমের অঙ্কুর হইতে রতি ও ভাবের উৎপত্তি। পবিত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা আত্মা বিশেষীকৃত হইলে, প্রেমরূপ আদিত্যতেজ সাম্যভাব পরিগ্রহ করিলে এবং রুচি-শক্তির প্রভাবে চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহাকে ভাব কহে। যাহাতে মানস সম্যক প্রকারে বিশুদ্ধ হয়, যাহা স্নেহাতিশয্য-যুক্ত এবং যাহা ঘনীভূত স্বরূপ—তাহাকেই প্রেম অথবা প্রেমা বলে। জীবের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সে সাধুসঙ্গ করে, তাহার ফলে সে শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়; তৎকালে ভক্তি-নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়; নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদিতে রুচি; রুচি হইতে প্রচুর আসক্তির উদ্ভব এবং আসক্তি হইতে রতির আবির্ভাব হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেমনামে অভিহিত হয়। এই সর্ব্বানন্দ-ধামে প্রেমই প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবতি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

সাধু ব্যক্তির সহিত সমাগম হইলে যে সকল বীর্য্যসূচক কথা আলোচিত হয়, তৎসমস্ত হৃদয়-প্রীতিকর ও শ্রুতিসুখকর। তাহাদের সেবন দ্বারা আশু অপবর্গ মার্গ স্বরূপ হরিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম-ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহার ভাবাঙ্কুর সমুৎপন্ন হইয়াছে তিনি ক্ষমাবান; তিনি মিথ্যা সময়ক্ষেপ করেন না, বিষয়-ভোগে তাঁহার স্পৃহা ও অভিমান থাকে না; ভগবৎ লাভ বিষয়ে তাহার অন্তরে দৃঢ় আশা সংবদ্ধ হয় এবং তাহাতে সম্যক্ উৎকণ্ঠা জন্মে। নিরন্তর ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে রুচি ও গুণ-কথনে আসক্তি এবং ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতি হয়। যিনি ভক্ত তিনি অহর্নিশি বচন দ্বারা স্তুতিবাদ করিয়া, মন দ্বারা স্মরণ করিয়া এবং দেহ দ্বারা প্রণতি করিয়াও তৃপ্ত হন না। তিনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে সমস্ত পরমায়ু ভগবানের জন্যই সমর্পণ করেন। ভক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ অক্লেশে বিসর্জ্জন করেন এবং সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন মনে করেন। ভরতনৃপতি যৌবনাবস্থাতেই রাজসম্পৎ ও দারাপুত্রে পুরীষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ভগবানে রতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অরিগৃহে ভিক্ষা এবং চণ্ডালেরও বন্দনা করিতেন। ভক্তের নামগানে বিপুলাপ্রীতি জন্মে এবং তিনি কৃষ্ণ-লীলা-স্থানে বসতি করেন।"

অনন্তর গৌর কহিলেন—"কৃষ্ণে রতির লক্ষণ এই বিবৃত করিলাম; এখন কৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ শুন। প্রেমিকের চিত্তকথা ও ভজন-ব্যবহারাদি বিজ্ঞের পক্ষেও দুর্ব্বোধ্য। প্রেমের বৃদ্ধির সহিত স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবের উদ্ভব হয়। ইক্ষুরস ক্রমে গাঢ় হইতে হইতে যেমন গুড়, খণ্ড, চিনি, মিছরিতে পরিণত হইয়া ক্রমেই সুমিষ্টতর হয়, রতি ও প্রেমও ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া তাহার মিষ্টতা বৃদ্ধি করে।" অনন্তর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ব্যাখ্যা করিয়া গৌর কহিলেন "মধুর রস দ্বিবিধ—রূঢ় ও অধিরূঢ়। কৃষ্ণমহিষীগণের ভাব রূঢ়পদবাচ্য, গোপিকাগণের ভাব অধিরূঢ় বলিয়া খ্যাত। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দ্বিবিধ—সম্ভোগে 'মাদন', এবং বিরহে "মোহন।" মাদনের চুম্বনাদি অনন্ত প্রকার আছে। মোহনের দুইটী ভেদ—উৎঘূর্ণা ও চিত্রজল্প চিত্রজল্পের অঙ্গ দশটী—প্রজল্প ইত্যাদি উদঘূর্ণা বিরহ-চেষ্টার নাম দিব্যোন্মাদ, তখন বিরহীর আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গার দ্বিবিধ। সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ; বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্র্য। মধুর রসের অবলম্বন নায়ক ও নায়িকা। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি এবং শ্রীমতী রাধিকা নায়িকাগণের মধ্যে প্রধান।"

এইরূপে 'প্রেম-প্রয়োজন' ব্যাখ্যা করিয়া গৌর কহিলেন "পূর্ব্বে এ সমস্তই আমি তোমার ভাই রূপের নিকট বিবৃত করিয়াছি। তোমাকেও সমস্ত বলিলাম—কেননা তুমিই ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার করিবে। তুমি মথুরা গমন করিয়া লুপ্ত তীর্থরাজির উদ্ধার কর, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা ও বৈষ্ণব আচার প্রচারিত কর; বৈষ্ণবের

স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত কর। মনে রাখিও ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে তু যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

সর্ব্বভূতে যাঁহার অদ্বেষদৃষ্টি এবং মৈত্রীভাব, যিনি সর্ব্বভূতে দয়ালু, যিনি মমত্বভাবশূন্য ও নিরহঙ্কারী, যিনি সুখ ও দুঃখে সমান এবং ক্ষমাশীল, যিনি নিরন্তর সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি মন ও বুদ্ধি আমাকেই অর্পণ করিয়াছেন, মদ্ভক্তিপরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে কেহ সন্তাপ প্রাপ্ত হয় না, কোন লোক হইতেও যিনি সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগহীন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন ও ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি হৃষ্ট হন না, কাঁহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শুভাশুভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান পুরুষই আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে যাঁহার সমান দৃষ্টি, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার নিকট সমান, যিনি আসক্তিলেশহীন, মৌনী, যে কোনও প্রকারে সামান্য অন্ন বস্ত্র-লাভেই সন্তুষ্ট, যিনি গৃহবর্জিত, স্থিরমতি, এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। যিনি শ্রদ্ধাবান ও মৎপরায়ণ হইয়া এই ধর্ম্মামৃত যথোক্তরূপে আচরণ করেন, সেই ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়।

তুমি বিপুল ঐশ্বর্য্য ও রাজসেবা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। কেনই বা তুমি ধনীর উপাসনা করিবে?

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

সাধুগণ ধনমদান্ধ লোকের উপাসনা করিবেন কেন? জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড কি পথে প্রাপ্ত হওয়া যায় না? বৃক্ষেরা ত ফলকুসুমাদি দ্বারা পরেরই পোষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের কাছে ভিক্ষা চাহিলে কি পাওয়া যায় না? নদীসকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? পর্ব্বত-গুহা কি অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? ভগবান কৃষ্ণ কি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন না?

যাও এখন জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হও।"

তখন সনাতন অতি বিনীতভাবে কহিলেন "আমি অতি হীন, তুমি আমাকে ব্রহ্মারও অগোচরতত্ত্ব সকল শিক্ষা দিয়াছ। এখন আমার মস্তকে পদস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, তোমার শিক্ষা আমার মধ্যে স্ফুরিত

।" অনন্তর গৌর স্বীয় হস্তে সনাতনের মস্তক ধারণ করিয়া কহিলেন "এই সকল তোমার মধ্যে স্ফূরিত হউক।"

কিয়ৎকাল পরে সনাতন কহিলেন "প্রভু আমি শুনিয়াছি তুমি

আত্মারামাশ্চ মুনয়োঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।"

[আত্মারাম মুনিগণ বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়াও সেই প্রচুর পরাক্রমশালী শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির এমনই গুণ] এই শ্লোকের আঠার অর্থ সার্ব্বভৌমের নিকট বিবৃত করিয়াছিলে। সেই অর্থ শুনিবার জন্য আমার মন বড় কৌতূহলী হইয়াছে। যদি দয়া করিয়া বল, আমার কর্ণ চরিতার্থ হয়।" গৌর কহিলেন "আমি সর্ব্বভৌমের নিকট পাগলের মত কি বলিয়াছি তাহা কি আর মনে আছে? তবে তোমার সঙ্গগুণে যদি মনে হয়।" তদন্তর গৌর ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত শ্লোকের একষষ্টি অর্থ করিয়া সনাতনকে কৃতার্থ করিলেন। অনন্তর সনাতন কহিলেন "প্রভু, আমার মত হীন ব্যক্তিকে তুমি বৈষ্ণবের স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিতে আদেশ করিয়াছ। কিন্তু তুমি যদি দয়া করিয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ না কর, তবে আমা দ্বারা সে কার্য্য কিরূপে সম্ভব হইবে?" তখন গৌর সংক্ষেপে বৈষ্ণবের পালনীয় আচার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া কহিলেন "তুমি যখন এ সম্বন্ধে লিখিতে বসিবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সমস্তই স্ফূরিত করিয়া দিবেন।"

দুইমাস যাবত কাশীতে থাকিয়া গৌর সনাতনকে ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন। কাশীর সন্ন্যাসিগণ তাঁহার কথা শুনিয়া যেখানে সেখানে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইত। পূর্ব্বে যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কথা উক্ত হইয়াছে, তিনি এই সমস্ত নিন্দায় বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন "একবার যদি সন্ন্যাসীদিগকে প্রভুকে দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তাহারা আর তাঁহার নিন্দা করিতে পারিবে না।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া একদিন ব্রাহ্মণ কাশীস্থ যাবতীয় সন্ন্যাসীদিগকে স্বীয় গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং গৌরের নিকট আসিয়া অত্যন্ত দীনতা প্রকাশ করিয়া স্বীয় গৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। কাশীতে তখন সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রাহ্মণগৃহে সকল সন্ন্যাসী উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গৌর তথায় উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসিগণের হৃদয় গৌরের প্রতি বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতিমণ্ডিত কান্তি দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের কঠিন মন এক অজ্ঞাত করুণ রসে অভিষিক্ত হইয়া গেল। প্রকাশানন্দ সসম্মানে গাত্রোত্থান করিয়া গৌরকে আসন প্রদান করিলেন এবং অনুশোচনা করিয়া কহিলেন "আপনি সন্ন্যাসী, কাশীতে আসিয়াছেন, অথচ আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন না কেন? বেদান্তপাঠ সন্ন্যাসীর প্রথম কার্য্য। কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া ভাবুকের সঙ্গে সংকীর্ত্তন করেন। আপনাকে দেখিয়া নারায়ণের প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু হীনাচার বর্জ্জন করেন না কেন—তাহার কারণ বিবৃত করুন।" গৌর

বিনীতভাবে কহিলেন "আমার গুরু আমাকে মূর্খ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর, তাহা দ্বারাই তুমি ভগবান লাভ করিবে।" গুরুর আদেশে কৃষ্ণনাম লইতে লইতে আমার মন ভ্রান্ত হইয়া গেল, আমি অধীর হইয়া উন্মত্তের মত হইলাম। তখন গুরুর চরণে নিবেদন করিলাম "আপনার মন্ত্র জপ করিতে করিতে আমি পাগল হইয়া গেলাম—এ কি মন্ত্র আমাকে দিলেন, গুরু?" গুরু হাসিয়া উত্তর করিলেন 'যে মহামন্ত্র তোমাকে দিয়াছি, তাহা জপ করিলেই কৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণনামের ফলই প্রেম। তোমার সেই প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রেমের স্বভাবই এই যে, যে তাহাকে লাভ করে তাহার চিত্ত ও দেহে ক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং সে পাগলের মত হাসে, কাঁদে ও গান করে। তোমার যে প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে—তাহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি নাচিয়া গাহিয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করতঃ জগৎ উদ্ধার কর।' গুরুর এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করতঃই আমি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করি।" গৌরের সুমিষ্ট বিনীত বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদের মন সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল। মধুর বাক্যে তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার বাক্য সত্য। কিন্তু আপনি বেদান্ত শ্রবণ করেন না কেন? বেদান্তের দোষ কি?" তখন গৌর কহিলেন "আমার বাক্যে যদি মনে কষ্ট না পান তবে বলি। বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বরবাক্য। তাহাতে ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি অসম্ভব। সূত্রের মুখ্যার্থ সুস্পষ্ট। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সেই মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণবৃত্তিতে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে জীবের সর্ব্ব কার্য্য পণ্ড হয়। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ ভগবান্। তিনি "চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান।" তাঁহার বিভূতি ও দেহ চিদাকার। আচার্য্য তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ভাষ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার বিভূতি ও দেহকে প্রাকৃত বলিয়াছেন। বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত বলিয়া গণ্য করা অপেক্ষা বিষ্ণু নিন্দা আর কিছুই হইতে পারে না। ঈশ্বর জলন্ত অগ্নি সদৃশ, জীব সেই জলন্ত অগ্নির স্ফুলিঙ্গকণা। ব্যাসসূত্রে পরিণামবাদ সুস্পষ্ট। আচার্য্য ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরিণামবাদে ঈশ্বরকে বিকারী হইতে হয় এই আপত্তি। কিন্তু চিন্তামণি হইতে অসংখ্য রত্নরাশি উৎপন্ন হইলেও চিন্তামণি যেমন অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত ভগবান স্ব-ইচ্ছায় জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও নিজে অবিকৃত থাকেন। প্রাকৃত বস্তুতেও এই অবিকৃত থাকিবার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরে উহার বিদ্যমানতা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। প্রণব মহাবাক্য। তত্ত্বমসি বেদের একদেশী বাক্য মাত্র। ব্রহ্ম অর্থে বৃহদ্বস্তু। শ্রীভগবানই বৃহদ্বস্তু। তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, মায়াগন্ধ-বিবর্জিত। এই শ্রীভগবানই সমগ্র বেদে গীত হইয়াছেন। তাঁহাকে নির্বিশেষ বলিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়।" অনন্তর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া গৌর সন্ন্যাসীমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিলেন। সন্ন্যাসিগণ তখন পূর্ব্বকৃত গৌরনিন্দা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা যুক্তকরে গৌরকে কহিলেন "তুমি বেদময় মূর্ত্তি

সাক্ষাৎ নারায়ণ; আমরা তোমার যে নিন্দা করিয়াছি, উহা ক্ষমা কর।" স্বয়ং প্রকাশানন্দ তখন নানাভাবে গৌরের প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিলেন। সকল সন্ন্যাসী সেই অবধি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেন। কাশীবাসী লোক দেখিয়া ও শুনিয়া চমৎকৃত হইল। কাশীতে হরিধ্বনি গগন ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইল। সন্ন্যাসিগণ ভাগবত-বিচার আরম্ভ করিলেন। গৌরের অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া বহুদূর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দর্শনলাভেচ্ছায় কাশীতে আসিতে লাগিল। গৌর গঙ্গাস্নানগমনকালে অগণিত লোক তাঁহার উভয় পার্শ্বে সমবেত হইয়া বাহু তুলিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল। এইরূপে বারাণসী যখন হরিধ্বনিতে টলটলায়মান, তখন একদিন রাত্রিতে গৌর বারাণসী ত্যাগ করিলেন। গমনকালে সনাতনকে কহিলেন "তুমি বৃন্দাবনে গমন কর। কাঁথা ও করঙ্গসম্বল আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্দাবনে গমন করিলে তাহাদিগকে সযত্নে পালন করিও।" চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ, তপন মিশ্র, রঘুনাথ ও পূর্ব্বোক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন—কিন্তু তাহাদিগের কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া গৌর বলভদ্র সঙ্গে ঝারিখণ্ড পথে নীলাচল যাত্রা করিলেন। আঠারনালায় পৌছিয়া বলভদ্রকে পাঠাইয়া নীলাচলস্থ ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিলেন। ভক্তগণ তাঁহার বিরহে মৃতপ্রায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সংবাদে পরমাহ্লাদিত হইয়া সকলে মিলিয়া প্রভুকে প্রত্যভিবাদন করিয়া লইয়া গেলেন।

এদিকে সনাতন বারণসী হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবন পৌছিলেন। এবং তথায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

ধর্ম্মমঙ্গল

(২)

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের কবি মুকুন্দরামের মত প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও মানুষ চিনিতেন। কিন্তু মানুষের হৃদয় লইয়া মুকুন্দরাম যে পরিপক্ক রসের সৃষ্টি করিয়াছেন ধর্ম্ম-মঙ্গলে তাহার তত পরিচয় পাওয়া যায় না। ঘনরাম রসাবতারণ শক্তি-সম্বন্ধে মুকুন্দরামের অপেক্ষা অনেক নিম্নে অবস্থিত। অথচ প্রায় সকল রসই তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। করুণরসে ও হাস্যরসেই কবির কৃতিত্ব অধিক এবং বীররসেও নিতান্ত কম নহে। কৃত্তিবাস বা মুকুন্দরামের মত কাঁদাইতে না পরিলেও ঘনরাম করুণরসের চিত্রে হৃদয়ে আঘাত করিতে পারেন, মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারেন। এ কথা যিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাকে পতির মায়ামুণ্ড-দর্শনে লাউসেনের পত্নীগণের বিষাদ-বর্ণনা ও সহমরণের জন্য আয়োজন-বর্ণনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঘনরামের এই বর্ণনা হইতে মাইকেল্ মেঘনাদবধে প্রমীলার সহমরণ-যাত্রার বর্ণনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সমগ্র চিত্রখানি পাঠ

করিয়া যিনি ঘনরামের করুণরসসৃষ্টি-চাতুর্য্যের প্রশংসা না করিবেন, তিনি হয় কাব্য-রসাস্বাদনশক্তিহীন, নয় কোনও একটা মত-সমর্থনার্থে কবির শক্তির অপলাপ-প্রয়াসী। ঘনরামের শোকচিত্র প্রায় সর্ব্বত্র সংযত, উচ্ছৃঙ্খল নয়। তাঁহার চরিত্রগুলি শোকাবিষ্ট হইলেও আত্মহারা হন না, ভগবান্‌কে ভুলিয়া যান না। আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন কবিগণ প্রায়ই সংযমের পক্ষপাতী। মুকুন্দরামে আমরা এ বিষয়ের উদাহরণ পাইয়াছি, ঘনরামেও তাহার অভাব নাই; তাঁহারা জানিতেন

সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু সব কর্ম্ম ভোগ।
সংসার অসার সব সার সেই পদ ॥

তাই তাঁহাদের শোকেও এক মহা শান্তি ছিল। তখনও ভারতের আধ্যাত্মিকতা প্রবল জড়ভক্তির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয় নাই—এই জড় জগতের সুখ-দুঃখের অতীত অধ্যাত্ম-চেতনা তখনও লুপ্ত হইতে পায় নাই। লোকে জানিত যে বিপদে সম্পদে তাহাদের আশ্রয় করিবার ধন আছে—ধর্ম্ম। তাই প্রাচীন কবি দুঃখে বা সুখে অধীর না হইয়া বলিতে পরিতেন—

দুখ সুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষ ভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা ॥
কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ দুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ পথের ভিক্ষুক ॥

এইরূপ কতকগুলি সুন্দর আদর্শ প্রাচীন কবিরা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই আদর্শগুলির উপর দৃষ্টি রাখিলে আমাদের অনেক উপকার হইতে পারে, কারণ জড় ভক্তির স্রোতে পড়িয়া তাহারা ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে। আতিথেয়তার আদর্শ এইরূপ একটা আদর্শ; উহা এখন আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, কতক বিকৃত শিক্ষার ও কতক গৃহে অন্নাভাবের জন্য। যখন ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য প্রণয়ন করেন, তখন বঙ্গে অন্নকষ্ট ছিল না, লোকে পরিবার পোষণ করিয়া সর্ব্বদেবময় অতিথি-নারায়ণের সেবা করিবার সুখ ও পুণ্য ভোগ করিত। প্রাচীন কবিরা সতীত্বের আদর্শও জাগাইয়া রাখিবার প্রয়াস করিয়াছেন; ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে অনেকগুলি হিন্দু-স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা, কানাড়া প্রত্যেকেই আমাদের নিত্য-পরিচিত পবিত্র স্ত্রী-মূর্ত্তি। ইহারা সকলেই সেই চিরনূতন প্রাচীন আদর্শে, সীতাসাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। সতীত্বের আদর্শ কেবল উচ্চ সমাজেই রুদ্ধ ছিল না, নিম্নস্তরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কবির "লখে ডোম্‌নী" অপূর্ব্ব চরিত্র। ইহার বিষয় পরে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কবির সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব নাই; সমাজের দোষগুণ তাঁহার কাছে সবই ধরা পড়িয়াছে—যদিও কবিকঙ্কণের মত কলানৈপুণ্যের সাহায্যে ঐ সকল তথ্য প্রকাশিত করিবার ক্ষমতা ঘনরামের ছিল না, তথাপি আমরা বাঙ্গালী-সমাজের অনেক কথাই কবির নিকট হইতে জানিতে পারি। যেমন একদিকে হিন্দুর চিরন্তন আদর্শগুলি কবি আঁকিয়াছেন, তেমনি আবার মুসলমান-সংস্রবে আসিয়া তাহাদের যে বিকৃতি ঘটিয়াছিল তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন; যেমন একদিকে মাতৃত্বের সরল মূর্ত্তিও

আঁকিয়াছেন, তেমনি বিলাসপ্রবৃত্ত হৃদয়ে স্নেহের অযথা উপদ্রব ও কর্ত্তব্যক্ষোভকারী প্রবৃত্তিও আঁকিয়াছেন; যেমন সতীর চিত্র য়াছেন, তেমনি অসতীর চরিত্রও আঁকিয়াছেন। অসতীর চিত্র ফুটিয়াছে ভাল—কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি এ দিকেও খেলিয়াছে। সংসারের পিশাচিনী স্বরূপিনী নয়ানী শুরিক্ষা শুবিক্ষা প্রভৃতি হীন রমণীর চরিত্র—পাপের চিত্র—ধর্ম্ম-মঙ্গলকাব্যে কবি ফুটাইয়াছেন, তাঁহার নায়কের চরিত্র-বিকাশের উদ্দেশ্যে। চিত্রগুলি বোধ হয় কিছু অধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। এতটা না হইলেও চলিত, কিন্তু যতটুকু চিত্রিত হইয়াছে তাহা অসত্য নহে, এ কথা পতিতা নারীর চরিত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন। পতিতা রমণীর সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার ওয়েব্‌ষ্টার তাঁহার "ডেভিল্‌স্ ল কেস" নামক নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলেই কবির নয়ানী-চরিত্র বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন—

"Oh the violence of women !
Why they are creatures made up
and compounded
Of all monsters, poisoned minerals
And sorcerous herbs that grow.
......They have no more mercies
Than ruinous fires in great
tempests."

এই সম্পর্কে বলিয়া রাখি যে দেশের কুসংস্কার-গুলিও কবির কাব্যে পরিস্ফুট হইয়াছে; যথা—বিবাহান্তে বশীকরণ-ঔষধ-প্রয়োগ। রঞ্জাবতীর বিবাহান্তে তাহার জননী এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা নানা কারণ দেখাইয়া তাহা নিষেধ করিয়া-ছেন। অন্যান্য বশীকরণ-মন্ত্র ও উপকরণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

(১) তৈল পড়া,

(২) "গুয়া পান পড়ায় পুরুষে করে অজা,

(৩) অন্নে মাথে ঔষধ ব্যঞ্জনে পড়ে মন্ত্র।"

এইগুলি শুনিলে কবি মিডল্‌টন প্রণীত "দি উইচ" নাটকের "রিবন্ পড়া" প্রভৃতির কথা মনে আসে। অন্যান্য কুসংস্কার—মায়ামুণ্ড, নিছুটী লাগান অর্থাৎ ঘুম পাড়ান," কামিখ্যার নায়িকাদ্বারা ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করান ইত্যাদি। এ সকলেরও কতক নিদর্শন উক্ত বিলাতী নাটকে পাওয়া যায়।

যেমন কুসংস্কার, তেমনি সুসংস্কার, ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রভৃতির তথ্যও আমরা কবির লেখা হইতে জানিতে পারি। অন্যান্য প্রাচীন কবির মত ঘনরামও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। দেশ তখনও ধর্ম্মহীন হয় নাই, তখনও শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর প্রবল প্রভাব দেশের লোকের মন হইতে তিরোহিত হয় নাই! কবির হৃদয়ের উপরও তাঁহার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। ধর্ম্মের গান বুদ্ধ-ধর্ম্মপ্রসূত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্ম বিষ্ণুরূপে পরিণত হইয়াছেন, এবং ধর্ম্মের গান হরিগুণ-গানে পর্য্যবসিত হইয়াছে:—

সমাদরে শুন সবে ধর্ম্ম-সঙ্কীর্ত্তন।
সংসার সন্তাপ সিন্ধু তারণ কারণ॥
পুণ্যভূমি ভারতে মনুষ্য দেহ ল'য়ে।
মিছা মায়া মোহজালে জন্ম যায় বয়ে॥

পাপ প্রকাশিয়ে যবে পীড়িবে শমন।
কোথা রবে জায়া পুত্র পরিবার ধন॥
সেকালে সারথি সবে হবে হরিনাম।
মুখ ভরি বল হরি তর পরিণাম॥

কবির ধর্ম্ম-মঙ্গলে এই সুরই বেশী বাজিয়াছে। তাই যখন কবি ভক্তি-বিগলিত চিত্তে চৈতন্য-বন্দনা গান করিয়াছেন, তখন সে ভাব বুঝিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। ফলতঃ তাঁহার চৈতন্য-বন্দনা এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য চৈতন্যপার্শ্বদগণের বন্দনায় তাঁহার বৈষ্ণবত্ব ঘোষণা করিয়াছে; এ বন্দনায় এবং বৈষ্ণবকবির চৈতন্য-বন্দনায় কোনও প্রভেদ লক্ষিত হইবে না। ইহাতে কবির ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে।

ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ঐ হরিনাম ধন।
প্রকাশিলা মহাপাপ খণ্ডন কারণ॥
খণ্ডাতে জগতে যত জীবের যন্ত্রণা।
গোবিন্দ কীর্ত্তন নাম রচিল রসনা॥
সর্ব্বজীবে সমভাব ভেদবুদ্ধি নাই।
দীনদয়াল আমার ঐ চৈতন্য গোঁসাই॥
ভারতে মনুষ্য জন্ম করহ সফল।
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণকমল॥

দ্বিজ ঘনরামের হৃদয় চৈতন্যচন্দ্রের চরণ-মাধুরীতে অভিষিক্ত হইয়া কোমল হইয়াছিল তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্মের গান ভক্তিরসে মিশ্রিত হইয়া কঠোর বস্তুকে কোমলভাবে পরিণত করিয়াছিল। ভক্তির ইহাই মাহাত্ম্য। অতএব ঐতিহাসিক তাঁহার কাব্যে মূল বস্তুর সন্ধান না পাইলেও সাধারণ পাঠকের তাহাতে লাভ বৈ ক্ষতি হয় নাই। যদি ভগবৎপ্রাপ্তি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ভক্তির কথা যত বিস্তৃত ভাবে কথিত হয়, ততই মঙ্গল। কবি কর্ম্মকে কোথাও খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পান নাই, তবে সকল কর্ম্মে ভক্তির ভাব মিশাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার নায়কেরা ও নায়িকারা কেহই কর্ম্ম-পরাঙ্মুখ নহে, কিন্তু তাহারা সকল কর্ম্মেই ভগবান্‌কে স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হয়। হয় তো তাহাদের এই ভগবন্নির্ভরশীলতায় তাহাদের মনুষ্য-চরিত্রের কতক তেজোহানি হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কেহই কর্ত্তব্য অবহেলা করে না।

তাই বলিয়া কবি যে কেবলই কর্ত্তব্য-পরায়ণ লোকেরই চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার কাব্যে কদাচারীর চিত্র, কাপুরুষের চিত্রও যথেষ্ট আছে। এ সংসারে সৎও আছে, অসৎও আছে, সরলস্বভাব ব্যক্তিও আছে, খলও আছে, সতীও আছে অসতীও আছে, যাহা কিছু কবিকে দেখিতে হইয়াছে সবই তিনি দেখিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন। আমার এমনও মনে হয় যে তাঁহার নায়কের চরিত্র অপেক্ষা তাঁহার উপনায়কগুলির চরিত্র যেন ভাল ফুটিয়াছে। এ বিষয়ে দীনেশবাবুর সহিত আমার মত মিলিয়াছে। লাউসেনকে কবি খুব ভাল করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু লাউসেনের কোনও মহত্ত্বই যেন ফোটে নাই, তাহার কারণ লাউসেনের বিপদ দূর করিবার জন্য যখন হনুমান্ মজুত আছেনই, তখন লাউসেন একটু মহত্ত্ব দেখাইয়া লইতে পারেন বৈ কি, তাহাতে তাঁহাকে একটু আধটু বাঁধন ছাঁদন ভিন্ন আর কোনও কার্য্যই তো স্বীকার করিতে হয় না দেখিতে পাই। বাকী যেটুকু "হনুমান্"হীন, সেই মহত্ত্ব-টুকু তাহার নায়কে তিনি অর্পিয়াছেন চুরি

করিয়া অর্থাৎ তাঁহার আদর্শ মুকুন্দরামের ব্যাধবীরের চরিত্রের ছায়া হইতে লাউসেনের পরস্ত্রী-নিস্পৃহতা আসিয়াছে, এখানেও তত বাহাদুরি দেখি না। যাহা হউক এ কথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, লাউসেন মোটের উপর লোকটী ভাল; কিন্তু আমাদের মুখ হইতে কবির অত বড় নায়কের চরিত্রের প্রশংসা ইহার বেশী উঠিতে চাহে না। কবির মনে আদর্শটা যে ছোট ছিল তাহা নহে, তবে কাব্যের উপর কালের প্রভাব অলঙ্ঘনীয়, এবং কবি লাউসেনকে যতই বড় করিবার চেষ্টা করুন না, সে সময়ে দেশের লোকের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল—তাহার নিদর্শন কাব্যে বাধ্য হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তাই লাউসেনের সঙ্গে যথার্থ মহত্ত্বের বা শূরত্বের যেন ঠিক স্বাভাবিক সংযোগ ঘটে নাই। লাউসেনের কীর্ত্তিকলাপ তাহার নহে, হনুমানের; তাহার বিপদে বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ তাহাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য হনুমান হাতের কাছেই আছেন—তাঁহাকে সত্যবাদী প্রমাণ করিবার জন্য মরা ছেলে বাঁচিয়া উঠে, অপ্রাকৃত ঘটনাগুলা সময়ে অসময়ে তাহার একটু ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া কাঁদিবার পূর্ব্বেই তাহার সুবিধামত অবাধে ঘটিয়া যায়; তাহার খাতিরে পূর্ব্বের সূর্য্য চটপট গতি ফিরাইয়া পশ্চিমে গিয়া উদিত হয়। এই সকল অপ্রাকৃত ঘটনাদ্বারা কবি যে তাহার চরিত্র বিকশিত করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, অথবা ইহাদের ভিতর যে মুকুন্দ-রামের কাব্যের অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর মত একটা সহজ স্বাভাবিকতা বা কাব্যোন্মেষ-শক্তি আছে তাহাও বোধ হয় না। এগুলিকে দেখিলে মনে হয় যে কবি যখন তাঁহার নায়ককে একটা বড় কাজের সমক্ষে আনিয়াছেন, তখনই যেন তাঁহার মনে হইয়াছে যে এত বড় কাজটা কি একজন বাঙ্গালী করিতে পারিবে,—একজন রাজা-রাজড়ার ছেলে সে সৌখীনি করিবে, বুলবুলির লড়াই দেখিবে, না রাজ্য জয় করিয়া বেড়াইবে? অমনি কবি লাউসেনকে লুকাইয়া ফেলিয়া হনুমানকে আসরে নামাইয়াছেন। তবু বলিতে হয় যে বাঙ্গালীর চরিত্র তখনও নিতান্ত হীন হইয়া যায় নাই, কারণ তখনও ইন্দ্রিয়-জয়ের আদর্শ ছিল, বীরত্বও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তবে আত্ম-নির্ভরতা লুকাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। উচ্চস্তরের বাঙ্গালী "বাবু" হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, অতএব তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার চরিত্রের সার বস্তু অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই ঐতিহাসিক লাউসেন যাহা হয় তো নিজের বীরত্বে, চরিত্রবলে সাধন করিয়াছিল, ঘনরামের লাউসেন তাহাই হনুমানের সাহায্যে করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং লাউসেনের কার্য্যকলাপের হাঁক-ডাকের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে একটী খাঁটি জিনিষ, ভবিষ্যৎ—হাঁসির গানের রচয়িতার কষাঘাতের পাত্র "চম্পটপরিপাটী" পটু কর্পূর, যাহার "মালসাট" পর্ব্বতপ্রমাণ, কিন্তু কার্য্যকালে যাহা কর্পূরেরই মত উপিয়া যায়। দীনেশবাবু এই কর্পূরের নাড়ী ঠিকই বুঝিয়াছেন। কর্পূরের সার্ব্বকালীন চেষ্টা গণ্ডগোলের ভিতর হইতে সরিয়া পড়া, আর গণ্ডগোল মিটিয়া গেলে ঘটনাস্থলে আসিয়া

"সরফরাজি" করা। ইহাই দাঁড়াইয়াছে সাধারণ "বাবু" চরিত্র।

যদি এই অবনতির কারণ জানিতে চাও, তাহা হইলে ধর্ম্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী-চরিত্র দেখ। কবিকঙ্কণের খুল্লনা বার বৎসরের শ্রীমন্তকে সমুদ্র-পারে পাঠাইতে পারিয়াছিল, কিন্তু ঘনরামের "রঞ্জাবতী" পাছে লাউসেন বঙ্গেশ্বরের সভায় যায় সেই ভয়ে মল্ল ডাকিয়া তাহাকে অঙ্গহীন করিয়া তাহাকে নিজ অঞ্চলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার মন্ত্রণা করিয়াছিল। কুন্তী-গান্ধারীর দেশে মাতৃস্নেহের যখন এমন অবনতি ঘটিয়াছিল, তখন বাঙ্গালীর চরিত্রের যে বিষম ক্ষতি হইবে তাহা ত জানা কথা। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত এই অবনতির তরঙ্গ নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পঁহুছে নাই, তাহা আমরা ধর্ম্মমঙ্গল হইতেই জানিতে পারিব। বোধ হয় ধর্ম্মমঙ্গলেই প্রথম "প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে" বাঙ্গালী রমণী, অথবা বাঙ্গালী জননীর আমদানি, যেমন একদিকে ইহাতে বীরাঙ্গনার মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তেমনি ইহাতে বর্ত্তমান সময়ে সুপরিচিত বঙ্গনারীর প্রথম আবির্ভাব। কালে একটীর প্রসার ও অপরটীর সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটিয়াছে। কেবল এক বিষয়ে পুরাতন আদর্শ স্ত্রী-জাতির মধ্যে এখনও প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত আছে—তাহা সতীত্ব। কতক বিকৃত হইলেও ভারতীয় সতী আজও ভারতীয় সতী—"অতুলনা ভারত-ললনা।" সকল সময়েই ভারতীয় কবির কাব্যের সৌষ্ঠব-সাধনার্থ এই অতুল সম্পদ বিদ্যমান ছিল, এই জন্য ধর্ম্মমঙ্গলে আমরা যে কয়েকটী স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহারা আমাদের কাছে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। সতী পতির মঙ্গলের জন্য, পতির সম্পত্তি-রক্ষার জন্য অনেক অসমসাহসিক কাজও করিতে পারে, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন; তাই তাঁহার কাব্যে কতকগুলি বীররমণীর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বঙ্গ-সাহিত্যে বীররমণীর সৃষ্টি ঘনরামের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—এ কীর্ত্তি নিতান্ত অবাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উড়াইয়া দিবারও কোনও হেতু নাই, কারণ ইতিহাসেও বীরত্ব-ময়ী বঙ্গাঙ্গনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সে যাহাই হোক, এ কথা বেশ বলা যায় যে, কলিঙ্গা-কানাড়ার বীরত্ব-কাহিনী যে ভাবেই বিবৃত থাকুক ঘনরামের কাব্যে বাঙ্গালীরমণী-চরিত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-প্রিয়তা, পতিপুত্রকে আঁচলে বাঁধিয়া রাখিবার প্রবৃত্তিই ফুটিয়াছে বেশী। এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই কলিঙ্গা লাউসেনকে রঙ্গরসে মত্ত করিয়া ঢেঁকুর-যাত্রার সংকল্প হইতে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সফল হয় নাই। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিও যথাদৃষ্ট তথা-লিখিত করিয়াছেন। তাঁহার বড় বড় আদর্শে চিত্রিত চিত্রগুলিও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়া সমসাময়িক বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি কবিকে আমরা অবহেলা করিতে পারি না, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ এবং শিক্ষাও উচ্চ সুরে বাঁধা। সে কথা পরে বলিতেছি। যথাযথ চিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে কবির মহামদ-চরিত্রটী দেখা যাউক। এ চরিত্রটী কাব্যের প্রধান কুচরিত্র, ইংরাজীতে যাহাকে "রোগ" (Rogue) বলে তাহাই। সেক্ষপীয়রের ওথেলো নাটকে যেমন ইয়াগো, ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে তেমনি

মহামদ। এ ব্যক্তি রাজ্যের প্রধান অমাত্য, গৌড়েশ্বরের প্রধান সহায়, অতএব কবি ইহাকে খুব বড় গোছের পদ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কবি কখনও তো বঙ্গীয় নরপতির মহাপাত্ররূপ জীবের সহিত পরিচিত ছিলেন না, দেখিয়াছিলেন জমীদারের গোমোস্তা—অত্যাচারী গোমোস্তা। অতএব অত বড় একটা জমকাল পদ সত্বেও মহামদ জমীদারের প্রজাপীড়ক নায়েব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কাব্যে বঙ্গেশ্বর যেমন জমীদাররূপে ফুটিয়াছেন, মহাপাত্রও তেমনি সেই জমীদারের গোমোস্তারূপেই চিত্রিত। রাজা সদাশয়, কিন্তু পাত্র অত্যাচারীর শিরোমণি; তাহার পিড়নে গৌড়রাজ্য ছারখারে যাইতে বসিয়াছে, প্রজারা রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতেছে। মফঃস্বলে ইহার অত্যাচার, ইহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ প্রজাকে মৃতবৎ করিয়া রাখিয়াছে; অথচ কেহ ইহার ভয়ে রাজার কাছে নালিশ করিতেও সাহস করে না। রাজা জানিতে পারেন না যে প্রজারা এত উৎপীড়িত। সহসা একদিন রাজা মৃগয়ায় গিয়া রাজ্যের অবস্থা দেখিতে পাইয়া পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

দেশে নাই অনাবৃষ্টি বিঘা প্রতি আনা।
কোন জোর জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড় থানা॥

উত্তরে পাত্র পরের ঘাড়ে, প্রজার ঘাড়ে দোষ দিয়া নিজে সাধু সাজিতে চাহিয়াছে, কিন্তু রাজাকে দেখিয়া আজ প্রজার মুখ ফুটিয়াছে—

রাজার আসান শুনি পাত্রের নাবড়ি।
প্রধান অনেক প্রজা কহে কর যুড়ি॥
বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রিবর।
তিন সন ইজারা দিয়াছি রাজকর॥
তথাপি বন্ধন দশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে॥
কেবা কোথা করেছে এমন অবিচার।
ব্রাহ্মণে কায়স্থ বৈস্তে খাটায় বেগার॥
এত পীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজা নাহি দিলে মন॥

দেশের অবস্থা দেখিয়া ও প্রজার কথা শুনিয়া রাজার আজ চৈতন্ত হইয়াছে, তাই মহামদের কোনও ওজরই টিকিল না, তিনি তাহাকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন—

"তিন সন কাগজ বুজহ কালে কালে।"

এবং প্রজার মান রক্ষা করিয়া আদেশ করিলেন—

সহরে সকল প্রজা সুখে কর ঘর।
তিন সন অপর না লব রাজকর॥

এই সকল বর্ণনায় অনেকটা সদাশয় অথচ অলস বিলাসী জমীদার ও তাহার অত্যাচারপ্রিয় অসৎ কর্ম্মচারীর চিত্রই বিকশিত হইয়াছে। আমরা ইহাদের বেশ জানি—জানি না গৌড়েশ্বরের মহাপাত্রকে, কবিও জানিতেন না।

অতঃপর মহামদের যে মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে, তাহাও এ দুনিয়ায় বিরল নহে; আমরা এমন লোকও দেখিয়াছি যাহার পরের ভাল একেবারে সহ্য হয় না; পরের মঙ্গল দেখিলে তাহার অসহ্য গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয়, প্রাণপণে তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্ত সে নিজের সকল ক্ষমতা, সকল বুদ্ধি নিযুক্ত করে। সেক্ষপীয়র ইয়াগো, ডনজন, এড়মণ্ড প্রভৃতি চরিত্রে এই তথ্য বুঝাইয়াছেন। মহামদও এই ধাতুতে গঠিত। লাউসেন তাহার আপনার ভাগিনের, রঞ্জাবতী তাহার স্নেহের

করিয়া ভগিনী ; কিন্তু অকারণে অথবা অতি সামান্য কারণে মহামদ তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প, যত উপায়ে এই মহাকার্য্য সাধিত হইতে পারে তাহার কোনও-টাই সে বাকী রাখে নাই। অপরাধ—রাজা তাহার অমতে রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তাই প্রবলের উপর প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া, দুর্ব্বলের উপর তাহার ঝাল। এই অকারণ বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সে রঞ্জাবতীকে কত কাঁদাইয়াছে, লাউসেনকে কত কষ্ট দিয়াছে, বৃদ্ধ কর্ণসেনকে অপমানিত করিয়াছে, শেষে লাউসেনের রাজ্য ছারখারে দিবার চেষ্টাও করিয়াছে। অন্ততঃ লাউসেনের রাজ্যের সাররত্নগুলি সে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। শেষে যে কবি একটা অপ্রাকৃত ঘটনার আশ্রয় লইয়া পুনরায় তাহাদের বাঁচাইয়াছেন, তাহা হয় তো তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মন রাখিতে, না হয় বিশ্বনাথ কবিরাজের তাড়ায়। মনে মনে তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং লাউসেনের মুখে তাহা ব্যক্তও করিয়াছেন যে—

"দুর্জ্জন মাতুল মোর মজাইল সৃষ্টি।"

কবি "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই অমূল্য উপদেশটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কলির সংসারে যে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জয় হয় না, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছেন তাই ধর্ম্মের জয়-স্থাপনের জন্য প্রাকৃত ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

ভগবানের রাজ্যে কিছুই অকারণে ঘটে না, সকল ঘটনারই একটা উদ্দেশ্য আছে, ইহা কবি ঘনরাম বেশ বুঝিতেন। অন্ধকারের পর আলো যেমন দ্বিগুণ সুন্দর দেখায়, গাঢ় চিত্রপটের উপর সুন্দর ছবি যেমন ফুটিয়া উঠে, তেমনি পাপের পাশে পুণ্যের ছবির সুষমা জলিয়া উঠে। কবি সমগ্র কাব্যে এই ভাবটা ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; অসতী রমণীর সাহায্যে লাউসেনের চিত্র বিকশিত করিয়াছেন, পাত্রের অত্যাচারের দ্বারা রাজার সদাশয়তা প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং পরিশেষে মহামদের পাপের সাহায্যে কতকগুলি চরিত্রের অপূর্ব্ব কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা প্রকটিত করিয়াছেন। ঘনরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য এই খানে আসিয়া জাগ্রত হইয়াছে, এইখানে তাহার অবসাদ দূর হইয়াছে, এইখানে যেন ইহাতে মহাকাব্যের ভেবী বাজিয়া উঠিয়াছে। লাউসেন কবির নায়ক বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহার চরিত্র হইতে আমরা অনেক ভাল শিক্ষা পাইলেও, কবি সে চরিত্র জীবন্তভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই, যেখানেই লাউসেন সেই খানেই কবি একটা কল্পিত উপকরণের, একটু কৃত্রিম মহত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এমন একটা বস্তুর অন্তরালে সেই মহত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন যে উহা একেবারেই প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যে যেখানে লাউসেন নাই, সেইখানেই কবির যথার্থ কবিত্ব, যথার্থ শিক্ষা এবং কাব্যের যথার্থ মহত্ত্ব ফুটিয়াছে।

তাই বলিয়া এমন কথা বোঝায় না যে, কবি এই স্থলে স্বভাবের রাজ্য ছাড়িয়া একেবারে আদর্শের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন; তাহা নহে, যে ভাবে তিনি পূর্ব্বে লিখিতেছিলেন, সেই ভাবেই এখানেও লিখিয়াছেন, সেই সহজ কথা, সহজ ভাব

এখানেও বিদ্যমান্, কিন্তু এখানে এমন একটী উচ্চ সুর বাজিয়াছে যে, তাহাতেই এই স্থানটীকে কাব্যের শীর্ষ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে কষ্ট পাইতে হইবে না। অথচ এখানকার অর্থাৎ কাব্যের এই অংশের নায়কনায়িকা অধিক স্থলেই নিম্নস্তরান্তর্গত হীনজাতি, যাহাদের নাম করিলে এখন আমরা ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লই।

এইখানেই কবির অপূর্ব্ব শিক্ষা। এই জন্যই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যকে অবহেলা করিবার উপায় নাই—উহাকে আদর করিতেই হইবে। কবি শিখাইয়াছেন যে, যে কারণেই সঞ্জাত হউক মহত্ব কোনও শ্রেণীবিশেষের একায়ত্ত নহে, আচার-ব্যবহারে যেমনই পার্থক্য থাকুক নিম্নশ্রেণীর লোকরাও মহত্বের আদর্শ হইতে পারে। মহত্বের এমনি উজ্জ্বল আদর্শ—ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের "লখে ডোম্‌নী।" বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই হউক, অথবা সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষাতেই হউক সে বিষয় লইয়া তর্ক করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই, দেশের নিম্নস্তরের মানুষগুলিও এমন সকল সত্বে সত্ববান্ ছিল যে, আজ আমরা শিক্ষাগর্ব্বিত বাঙ্গালীর সন্তান সে মহত্বের, সে শৌর্য্যের কাছ দিয়াও ঘেঁসিতে পারি না। যদিও আজকাল আমরা অধস্তন স্তরের জন্য মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি—মন্দের সেটাও ভাল—কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি যে, ঐ নিম্নস্তরেরও হৃদয় আছে, ধর্ম্ম আছে, গর্ব্ব করিবার মত মহত্ব আছে, খুঁজিলে তাহা এখনও পাওয়া যায়। এখন যে সহানুভূতি তাহা অনেকটা দেখাইবার জন্য—অনেকটা নিজের গর্ব্ব করিবার জন্য অথবা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিবার জন্য, নয় তো patronize করিবার জন্য, মুরুব্বিয়ানা দেখাইবার জন্য। তখনকার সহানুভূতি হৃদয়োত্থ, তখন রাজপুত্র লাউসেন দলুই সরদার, কালু বীরকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে পারিতেন, তাহার বিপদে প্রাণ দিয়া সহানুভূতি করিতে পারিতেন, তাহার জন্য কাঁদিতে পারিতেন, সামান্য চাকর ভাবিয়া তাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন না। দলুই সরদারও তাঁহার জন্য ভাবিত, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারিত। শুধু সে নয়, তাহার পরিবারের যে যে ছিল সে-ই লাউসেনের জন্য প্রাণ দিতে উৎসুক ছিল। বরং এই কালুবীরকেও একদিন তাহার পত্নী "লখে ডোম্‌নী" প্রভুভক্তির মহতী শিক্ষা দিয়াছিল। কলিঙ্গা ও কানড়া লাউসেনের পত্নী, তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল পতির রাজ্য-রক্ষার জন্য, ইহাও মহৎকার্য্য, ইহাতেও আমাদের শিখিবার ও ভাবিবার অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু ইহাতে তত মহত্ব নাই যত মহত্ব এই "লখে ডোমনীর" অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে, মহতী কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এবং অলৌকিকী প্রভুহিতৈষণায় প্রকাশ পাইয়াছে। আজকালকার দিনে কলিঙ্গা-কানড়ার আদর্শও ফেলিবার বস্তু নহে, কার্য্যকালে ধৈর্য্য ও বীর্য্য আমাদের রমণীগণের শিক্ষণীয় সন্দেহ নাই,—আজিকার পত্নীগণ স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া কেবল বিলাসিতার পথে অগ্রসর হইতেছেন, অসংযমের পথ উন্মুক্ত করিয়া লইয়া শিক্ষা ও সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছেন, এ সময়ে কলিঙ্গা ও কানড়ার

আদর্শ চোখের সামনে রাখা আবশ্যক বৈ'কি?

কিন্তু উহাদের অপেক্ষাও অনেক মহান্ আদর্শ "লখে ডোম্‌নী"। বাঙ্গালাসাহিত্য এখন সৌখীন সাহিত্যে দাঁড়াইয়াছে, তাই আর আজকাল এমন সব চরিত্র দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে না—ক্বচিৎ কদাচ কোনও প্রতিভাবান্ কবি যদি এক আধবার এই চরিত্রের কথা কহেন, অমনি যেন লজ্জিত হইয়া আপনাকে সংবৃত করিবার চেষ্টা করেন, কারণ আমাদের ধারণা হইয়াছে নিম্নস্তরের মানুষ মানুষ নয়, যা কিছু মনুষ্যত্ব আছে উচ্চশ্রেণীর "বাবুদের" ভিতর। কিন্তু আমি অকাতরে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে এই হীনজাতি-সম্ভবা "লখে" যে মহত্ত্ব দেখাইতে পারিয়াছে, তাহা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা ভুলিতে বসিয়াছি। তাহার যে ত্যাগ তাহা আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি, কারণ ত্যাগকে আমরা মূর্খতা বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, সংযমকে অসভ্যতা বা প্রাচীন কুসংস্কার বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। যাহা আমাদের দেশে অতি প্রচলিত ছিল,—পুরাণাদি কথা-দ্বারা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা—তাহা এখন উঠিয়া যাইতেছে, তাই তাহাদের ভিতর যে সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব ছিল তাহাও যাইতে বসিয়াছে, সেদিকে আমরা দৃষ্টি করি না, কেবল depressed classes, depressed classes বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমরা তাহাদের চরিত্রগত মূল বস্তুগুলির প্রতি একেবারে দৃষ্টিহীন, তাই তাহাদের কোনও উন্নতিও হইতেছে না। পুরাণাদি-শ্রবণ দ্বারা যে সুফল ফলিত, তাহার উদাহরণ ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের "লখে ডোম্‌নী।" পুরাণের শিক্ষা কর্ত্তব্যবিমুখতার শিক্ষা নহে, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ফলাফল গ্রাহ্য না করিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণতার শিক্ষা, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতার শিক্ষা, তাই লখে ডোম্‌নী সেই কর্ত্তব্য সাধন করিবার উৎসাহে অকাতরে তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন, সাররত্নগুলি ধর্ম্মের মন্দিরে, কর্ত্তব্যতার দেউলে উৎসর্গ করিয়াছে, হৃদয়ের শোণিত-দানে প্রভুর মঙ্গল সাধিয়াছে, অপূর্ব্ব সুশিক্ষায় কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ স্বামী-পুত্রকে কর্ত্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। লখের মুখে যে উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার এক একটীর দাম আজকালকার অনেকগুলি সমগ্র কাব্যসমষ্টির চেয়েও অধিক। সেই অমৃতময় বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে, ডমরুধ্বনি শ্রবণ করিলে সর্পের মত আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ও নাচিয়া উঠে—সর্ব্ব কর্ত্তব্য বিষয়ে অমনোযোগী যে আমরা, আমাদেরও ক্ষণেকের জন্য কর্ত্তব্য-বোধ জাগিয়া উঠে। লখে কালুবীরের প্রতি যে উপদেশ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা বিদ্যাভিমানী আমরা যদি কর্ত্তব্য স্থলে স্মরণ রাখিতে পারি, তাহা হইলে দেশের যথার্থ উপকার হয়, যদি অসংযমের শিক্ষা না দিয়া এমনি ধর্ম্মময় শিক্ষা আমরা স্ত্রীজাতিকে দিতে পারি, তবেই আমাদের স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন ও উদ্যম সফল হইবে। তাই বলিয়াছি যে, ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক জিনিষ আছে।

লখের উৎসাহ অদম্য, সে নিজে যুদ্ধ করিতেছে, অচেতন স্বামীকে পৌরাণিক উদাহরণ শুনাইয়া চেতন করিতে চেষ্টা

করিতেছে, তাহাকে কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ দেখিয়া কত ধর্ম্মসম্মত উপদেশ দিতেছে—

কেন রণ বিক্রম বিপক্ষে হ'লে হারা।
সিংহ হ'য়ে কও কেন শৃগালের পারা॥
* * * *
চিরকাল চাকর রাজার লুন খাও,
প্রমাদে ফেলায়ে পুরী পলাইতে চাও।
কেমনে এমন বোল বেরুল বদনে।
সে সব সেনের সত্যে তরিবে কেমনে॥
নিত্য যে পুরাণ শোন চিত্ত থাকে কোথা।
কালি কি শুনিলে কুরুপাণ্ডবের কথা॥
* * * *
কোমর বান্ধিয়া নাথ যুঝ একবার।
রণে রাখ পৌরুষ রাজার শোধ ধার॥
অধর্ম্ম আচরি বল কতকাল জীবে।
সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গ নিবে॥
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।
পাছে বল এ মাগী নিষ্ঠুর কথা কয়॥
আয়ুদ্বয় না থাকিলে ঘরে বসে মরে।
সংসার স্বধর্ম্মশীল সব ঠাঁই ভরে॥
বীর হয়ে ঘরে থাকে রণে ভয়-মতি।
তবু তো মরণ আছে কিন্তু অধোগতি॥
আজি মর কিবা বা মরণ বর্ষশতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে॥
সম্মুখ সমরে মলে স্বর্গে চলে যাবে।
পরিণামে প্রভুর পরম পদ পাবে॥

এততেও স্বামীকে উত্তেজিত করিতে না পারিয়া সে পুত্রকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আজ পুরুষগণ সুখলিপ্সু, কর্ত্তব্যবিমুখ, স্ত্রীগণ তাহাদের সুমতি-স্বরূপিণী, তাই পুত্রও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, আবার পরক্ষণেই নিজ স্ত্রীর প্ররোচনায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ফিরিয়া পাইয়া মায়ের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। লখে আজ প্রভুভক্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া ধর্ম্মের উপাসনায় একে একে দুইটী পুত্র বলি দিল। কিন্তু এততেও সে ভাঙ্গিয়া পড়িল না; কাঁদিল না বলিলে মাতৃহৃদয়ের অবমাননা করা হয়; মনুষ্যহৃদয়জ্ঞ কবি সে কথা বলেন নাই, সে তখন অভিমন্যুর মৃত্যুতে শত্রুনিপাতে দৃঢ়সংকল্প অর্জ্জুনের উদাহরণ দানে আবার স্বামীকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল এবং এবার কৃতকার্য্যও হইল। ক্ষণিক উন্মত্ততায় ভ্রান্ত কালুবীর শেষে সত্যপালনার্থ নিজের মস্তক অকাতরে বিলাইয়া দিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে নিজের মহত্ত্ব বজায় রাখিয়া গেল। শেষে লখের এই স্বর্গীয় উত্তেজনা কলিঙ্গা ও কানাড়াকে গিয়া স্পর্শ করিল, এবং অসূর্য্যস্পশ্যা রাজবধূদ্বয়কে বীরাঙ্গনাবেশে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ করিল। কলিঙ্গা যুদ্ধে প্রাণ দিল, কানাড়া দেশ হইতে শত্রু তাড়াইয়া স্বামীর রাজ্য নিষ্কণ্টক করিল। এতগুলি ঘটনা ঘটাইয়াছে—মহামদের স্বার্থপরতা, তাহার অকারণ বিদ্বেষবুদ্ধি; ইহাই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে মহামদের চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতা।

আমাদের নীতিদাতা মহর্ষি মনু বলিয়াছেন যে, শিক্ষা যদি নীচ হইতেও পাওয়া যায় তাহা আদর করিয়া লইতে হইবে। আমরা সে নীতি আজকাল ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা নীচ জাতিকে ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারি না, কিন্তু তাহাদের কাছ হইতেও আমাদের শিখিবার অনেক বস্তু আছে। কবি ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে আমরা এই শিক্ষাটুকু পাইতে পারি। ইহাই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের

সৌন্দর্য্য এবং এই গুণে উহা বাঙ্গালীর স্মৃতি-মন্দিরে চিরোজ্জীবিত থাকিবার দাবী করিতে পারে। ধর্ম্মমঙ্গলের' কবি কোনও একটা বিশেষ ভাব লইয়া বিভোর হইয়া বেড়ান নাই, তিনি সংসারাভিজ্ঞ সংসারের কবি, সংসারে ভাল-মন্দ যাহা দেখিতে পাইয়াছেন তাহাই আঁকিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ভিতর যেটুকু আধ্যাত্মিকতা ছিল তাহার দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছেন যে, মানুষ হইতে হইলে দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না, সুখে উন্মত্ত হইলেও চলিবে না, ধর্ম্ম ছাড়িয়া অধর্ম্মের পথে বেড়াইলেও চলিবে না; স্বার্থ লইয়া কর্ত্তব্যকে ভুলিলে চলিবে না। তিনি দেখাইয়াছেন জগতে কেহই হীন বলিয়া উপেক্ষনীয় নহে, সকলের ভিতরেই মহত্ত্ব আছে, বাছিয়া লইতে জানিলে হয়। যদি কবিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করিয়া তাঁহাকে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা এতদিন যাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম, তাঁহাদের আবার বুকের কাছে আনিয়া নিজেদের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিতে ও যথার্থ দেশের উপকার করিতে পারিব।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

পূর্ব্বরাগ—রূপলালসা

অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনের ৬৩৩ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

যৌবন পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেই আমাদের মাধুর্য্যরস-আস্বাদনের যোগ্যতা জন্মিয়া থাকে। এই যৌবনই মানব-জীবনের বসন্তকাল। বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতি যেমন নূতন বরণকীরণগন্ধে বিভোর হইয়া, নবজীবনের পসরা লইয়া, বিশ্বময় আপনাকে ছড়াইয়া দিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে, মানুষের দেহ-মনও সেইরূপ, এই প্রস্ফুটযৌবনপ্রাপ্তিতে, অপূর্ব্ব শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া, আপনাকে বহু করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়ে। এই যে নিজেকে বহু করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহাই শারীর তত্ত্বে প্রজনন-প্রবৃত্তি নামে অভিহিত হয়। পরব্রহ্ম যেমন প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সেই ইচ্ছা হইতেই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, জীবও সেইরূপ পূর্ণযৌবন প্রাপ্তিতে, প্রজাসৃষ্টির লালসায় চঞ্চল হইয়া উঠে। এই চাঞ্চল্য তার আত্ম-বিকাশেরই চেষ্টা মাত্র। এইজন্য ইহাতে নিয়ত এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জাগিয়া উঠে। আত্মবিকাশ আর আত্মচরিতার্থতা একই কথা। আপনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াই, জীব আপনার চরিতার্থতা লাভ করে। সে আপনার অংশবিশেষকে ফুটাইতে পারিলেই পরম তৃপ্তি লাভ করে না। তার সমগ্রকে, সম্পূর্ণরূপে, সে ফুটাইয়া তুলিতে চাহে। সে নিজেকে আপনার জ্ঞানের বিষয় করিবার

জন্য লালায়িত হয়। সে নিজেকে নিজের আনন্দের আশ্রয় ও উপজীব্য করিতে চাহে। আপনাকে আপনি ভোগ করিবে,—এই বাসনা তার অন্তরে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। যৌবনের সূচনার সঙ্গেই এই আত্মরতির আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণের ভিতরে অলক্ষিতে জাগিয়া উঠে। প্রথম যৌবনের প্রসাধন-প্রয়াস, আপনাকে সুন্দর করিবার, শোভন করিবার, সাজাইবার সখ এই আত্মরতিরই লক্ষণ। বাল্যে জীব আহার্য্যাদি বাহিরের বিষয়ের মধ্যে আনন্দ অন্বেষণ করে। তখন তার খাইয়া, শুইয়া, দেখিয়াই সুখ। বাহিরের জিনিষেই তখন তার সকলের চাইতে বেশী লোভ। কিন্তু যৌবনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সে আপনাকে ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হয়। তখন সে বারংবার দর্পণোপরি আপনার প্রতিকৃতি দর্শন করিতে আরম্ভ করে। কিসে তার দেহের শোভা, মুখের লাবণ্য বাড়িবে তাহাই অন্বেষণ করে। তখনও সে অপরের আকর্ষণে পড়ে নাই। নিজেই নিজের টানে বাঁধা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু দর্পণে নিজের রূপ দেখিয়া ক্রমে আর তার তেমন তৃপ্তি হয় না। সে আপনাকে বাহিরে খুঁজিতে আরম্ভ করে। শৈশবে সে আদর কাড়িত, যৌবনে সে রূপ খুঁজিতে লাগিল। আর এই যে রূপের অন্বেষণ ইহা হইতেই ক্রমে মাধুর্য্যরস জাগিয়া উঠিয়া, উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তার জীবনকে মধুময় করিয়া তোলে।

কিন্তু রূপ কখনও স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। সে যার তার রূপে তৃপ্ত হয় না। সে বাহিরে, অপরের ভিতরে, প্রকৃত পক্ষে, তার নিজের যে স্বরূপ তাই অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। যতক্ষণ এই স্বরূপটী সে না পাইয়াছে, ততক্ষণ তার রূপান্বেষণের নিবৃত্তি হয় না। আমরা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন মানুষের রূপের আদর্শ কেন যে বিভিন্ন হয়, ইহার কারণ বুঝিয়া উঠি না। রূপের একটা সার্ব্বভৌমিক আদর্শ আজও জগতে কেন প্রতিষ্ঠিত হইল না, ইহা ভাবিয়া লোকে বিস্মিত হয়। এইজন্য অনেকে রূপ-লালসাকে একটা অলীক মৃগতৃষ্ণিকার মতন নিতান্ত কাল্পনিক ও মায়িক বলিয়াও মনে করেন। রূপ বলিয়া জগতে কোনও বস্তু নাই—রূপের জ্ঞান বা ভোগ এই জন্য কদাপি বস্তুতন্ত্র হইতেও পারে না। বস্তুই যখন নাই, তখন আর বস্তুতন্ত্রতা আসিবে কোথা হইতে? কিন্তু যে দিক্ দিয়া রূপের বস্তুত্ব উড়াইয়া দিতে পারা যায়, সেই দিক দিয়া স্বরূপেরও আর কোনও সত্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। রূপের আদর্শ যেমন সকলের এক নহে, এক হইতেই পারে না, আজি পর্য্যন্ত কোথাও এরূপ ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; সেইরূপ স্বরূপ বস্তুও তো সকলের এক নয়, এক হইতেই পারে না, আজি পর্য্যন্ত কোথাও জীবের এই স্বরূপের এরূপ কোনও নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য তো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি যাহা তাহাই তো আমার স্বরূপ। তুমি যাহা তাহাই তো তোমার স্বরূপ। আর আমি যাহা তুমি তো তাহা নহ। তুমি যাহা হাজার চেষ্টা করিলেও আমি তো ঠিক তাহা হইতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া তুমিও যে কোনও কিছু নহ, আমিও যে কোনও কিছু নহি; আমরা উভয়েই যে

একটা অহেতুক ও অজ্ঞাত স্বপ্নের ক্ষণিক খেয়াল মাত্র, এমন কথা তো বলিতে পারি না। আমি ঠিক তোমারই মতন না হইয়াও যেমন বস্তু, আমার একটা সত্য ও সত্ত্বা আছে; সেইরূপ আমার যে রূপের আদর্শ তাহা তোমার রূপের আদর্শের ঠিক অনুরূপ না হইয়াও যে সত্য ও আমি যে রূপ দেখি ও সম্ভোগ করি তাহা যে বস্তু, একটা ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি নহে, ইহাও সত্য। যদি আমার ভোগ্য ও ভাব্য এই রূপের বস্তুত্ব অস্বীকার কর, তবে আমার এই স্বরূপের অস্তিত্বও অস্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ আমার চক্ষে যে রূপ ভাসিয়া উঠে, তার সঙ্গে আমার নিজের এই স্বরূপটার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী। আমার স্বরূপের ছায়াতেই, এই স্বরূপের ছাঁচেই, এই স্বরূপের সংকেত অনুসরণ করিয়া, এই যে ভিতরের স্বরূপ তাহাকে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিবার ও প্রকট করিবার জন্যই আমার এই রূপের প্রকাশ হয়। দর্পণে যেমন আমি আমার মুখচ্ছবি দেখিতে পাই, অন্যথা তাহা দেখিবার আর কোনও উপায় আমার নাই, তেমনি আমার চক্ষু রূপ বলিয়া যাহাতে যাইয়া, মধুগন্ধমত্ত ভ্রমরের মতন, উড়িয়া গিয়া পড়ে, তারই মধ্যে আমি আমার ভিতরকার স্বরূপের প্রতিচ্ছবি দেখি। তাতেই সে আমাকে এমন করিয়া টানে। এ রূপ আমার ভিতরকে বাহিরে আনিয়া, আমাকে বাহিরে টানিয়া আনে। এ তো রূপ নয়, এ যে আমার অন্তরাত্মার দর্পণ। আমার নিজের রূপে, নিজনাভিগন্ধে মাতোয়ারা মৃগের মতন, আমি পাগল হইয়া, এই বাহিরের রূপেতে যাইয়া, অনলে পতঙ্গের মতন পুড়িয়া মরি। আর মরিতে মরিতে আপনাকেই বেশী করিয়া, ভাল করিয়া, পূর্ণতরভাবে ফিরিয়া পাই বলিয়াই এই রূপের আগুণে পুড়িয়া মরিতেও আমার এমন আনন্দ হয়। এই রূপতত্ত্বই জীবের আনন্দময় কোষের গূঢ়তম কথা। এই রূপতত্ত্বই সৃষ্টিতত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা। এই তত্ত্বেই "বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি"—এই প্রাচীন শ্রুতি-বাক্যের সত্য মর্ম্ম প্রাপ্ত হই। এই তত্ত্বেতেই, আবার, রাধাকৃষ্ণতত্ত্বেরও নিগূঢ় সংকেত ও সত্য প্রামাণ্য পাইয়া থাকি।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
এই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বস্তু, শ্রীরাধা তাঁরই রূপ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যামৃতময়ী হইয়াই, তাঁহাকে এই আনন্দাস্বাদন করাইয়া থাকেন। কারণ সজাতীয় বস্তুই একে অন্যের আনন্দোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, বিজাতীয় বস্তুর এ অধিকার নাই। নিখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ রস, অনাদ্যনন্ত ভেদাভেদের বা আত্মবিভাগের বা 'Self-differentiation'এর দ্বারা রাধাকৃষ্ণ এই যুগল মূর্ত্তিতে নিত্যকাল আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শ্রীভগবানের এই নিখিলরসামৃতের পরম আশ্রয় শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকার এই অনাদ্যনন্ত প্রেমার একমাত্র বিষয় শ্রীভগবান। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণের স্বরূপ; শ্রীরাধিকা

সেই স্বরূপেরই রূপ। এই রূপের মধ্যেই, এইজন্য শ্রীভগবান আপনার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ, তার আবার হ্রাসবৃদ্ধি কি? অথচ রূপ নিত্য নবভাবে বাড়িয়া উঠে। এইজন্যই

স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার—
"অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারা নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপ ভাসে॥
মন্মাধুর্য্য আর রাধার দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি।
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।

আর আপন মাধুর্য্যের এই নিত্য নব বিকাশ দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের তাহা আস্বাদন করিবার জন্য লোভ হয়। কিন্তু

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

এই যে স্বরূপের সঙ্গে রূপের ও রূপের সঙ্গে স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, তাহাই মাধুর্য্যের পরম তত্ত্ব ও চরম অর্থ। আমার চক্ষে যে রূপ ভাসিয়া উঠে, তাহা আমার স্বরূপেরই অংশ। এইজন্য এই রূপ আমার, তোমার বা অপরের সমান ভোগ্য হয় না। তোমার চক্ষে যে রূপ ভাসে, তাহা তোমার বিশিষ্ট যে স্বরূপ, তারই বহিঃপ্রকাশ, সুতরাং তোমার নিকটে সে রূপের প্রামাণ্য তোমার অন্তরঙ্গ আনন্দ, আমার চক্ষের বর্ণপরিচয় বা আকার-নির্ণয় নহে। এই রূপ যখন আমাদের চক্ষে ভাসিয়া উঠে, বিষয় রূপে আমাদের সম্মুখীন হয়, তখনই তাহা আমাদের অন্তরের আনন্দময় কোষকে যাইয়া আলোকিত করিয়া তোলে। তখনই আমরা আমাদের নিত্য আনন্দ-স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করি। আর এই রূপের মধ্যে আমাদের স্বরূপের ছায়া দেখিয়া, সেই স্বরূপকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই আমরা পাগলপারা হইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া যাই।

রূপ সকলকেই লুব্ধ করে, অথচ একের চক্ষে যাহা সুন্দর, অপরের চক্ষে তাহা সুন্দর হয় না কেন? এইখানেই এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রাপ্ত হই। রূপ আমাদের স্বরূপেরই প্রতিচ্ছায়া, রূপাসক্তি প্রকৃতপক্ষে আত্মরতিরই একরূপ প্রকাশ। আর আমরা পরিচ্ছিন্ন, বিশিষ্টস্বভাবসম্পন্ন জীব বলিয়া, এই জীবত্বের ভূমিতে আমাদের স্বরূপও বিশিষ্ট ও পরস্পর হইতে পরিচ্ছিন্ন। আমার আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব, ইংরেজিতে যাহাকে personality বা individuality বলে, তাহাকেই এখানে আমি আমাদের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। বেদান্ত যাহাকে আত্মা বলেন, এ স্বরূপ সেই বস্তু নয়, এ স্বরূপ অহংতত্ত্বের উপরে পৌঁছায় না। আর আমরা যাকে রূপ বলিয়া লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াই, তাহা এই স্বরূপের, এই আমিত্বের বা personalityর, এই ব্যক্তিত্বের বা individualityরই প্রতিরূপ। যার যেমন এই আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব, যে ছাঁচে যাঁর এই পরিচ্ছিন্ন অহং

তত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে, তার রূপের আদর্শও ঠিক সেইরূপই হয়। এই জন্যই আমার চক্ষে যাহা সুন্দর তোমার চক্ষে সর্ব্বদা তাহা সুন্দর নাও বা হইতে পারে। অন্যদিকে, আমার চক্ষে দশজন লোক যদি সুন্দর হয়, দশজন যদি আপন আপন রূপের টানে আমাকে আকর্ষণ করে, তাদের এই দশটী রূপের বা মূর্ত্তির তুলনা করিলে অনেক সময় দেখিয়া আশ্চর্য্য হই যে তাদের প্রত্যেকের মুখছবিতে বা দেহগঠনে একটা না একটা সাধারণ ভাব হয় প্রস্ফুট না হয় লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই দশ জন লোকের মুখাকৃতি দশ প্রকারের, তাঁদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, দেহগঠনেও মোটের উপরে আপততঃ কোনও সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে প্রায়ই দেখিতে পাই যে, ইহাদের প্রত্যেককেই কোনও না কোনও একটা অবস্থায়, আমার দৃষ্টির কোনও না কোনও একটা বিশেষ angleএ দেখিতে পারিলে, তাদের রূপের ভিতরে একটা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সামান্য ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই angleটী ঠিক করা কঠিন। ঘটনাক্রমে কখনও তাহা আপনা হইতেই হঠাৎ একদিন না একদিন ধরা পড়িয়া যায়। নতুবা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানাভাবে, নানা অবস্থায়, তাদের লক্ষ্য করিয়া এই সামান্য ধর্ম্মটী অন্বেষণ করিলে পরে, তাহা ধরিতে পারা যায়। মোট কথা এই, আমাদের অভিজ্ঞতার কোনও কিছুই অহেতুক বা অনর্থক নহে। এই যে আমার চক্ষে একটী লোককে বড় মিষ্টি লাগে, অপরের চক্ষে সে তেমন মিষ্ট বোধ হয় না, ইহারও একটা না একটা কারণ অবশ্যই আছে। আর মিষ্টি-লাগা ব্যাপারটাকে যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই যে মানবের দেহ-মনের কোনও না কোনও একটা পিপাসা বা প্রবৃত্তিকে পূর্ণ বা চরিতার্থ করিয়াই কোনও বস্তু বা বিষয় তাহাকে সন্তোষ বা আনন্দ দান করিতে পারে। মিষ্টি-লাগার বা তৃপ্তির বা আনন্দের অন্য কোনও হেতু নাই, থাকিতেই পারে না। যার ভিতরে যে বস্তু আস্বাদনের শক্তি বা ইন্দ্রিয় নাই, সে বস্তু বাহির হইতে কিছুতেই তাহাকে কোনও তৃপ্তি বা আনন্দ দান করিতে পারে না। কোনও বস্তু সম্ভোগ করাই তাহাকে আত্মসাৎ করা। যতক্ষণ কোনও বস্তুকে সম্যক্‌রূপে আত্মসাৎ করিতে না পারিলাম, ততক্ষণ তাহা হইতে কখনই পূর্ণমাত্রায় সন্তোষ বা আনন্দলাভও করিতে পারি না। আর আমার আত্মার সমধর্ম্মাপন্ন যাহা নহে, তাহাকে কদাপি আমার পক্ষে আত্মসাৎ করাও সম্ভব নহে। আত্মা এখানে অন্নময় কোষরূপেই প্রতিপন্ন হউক, কিম্বা প্রাণময় বা মনোময় বা বিজ্ঞানময় বা আনন্দময় কোষরূপেই প্রত্যক্ষ হউক, আমরা প্রকৃত যে কোষাতীত তুরীয় আত্মতত্ত্ব তাহারই সাক্ষাৎকারে এই সকল অধ্যাস বিনষ্ট হইয়া, এই আত্ম-বস্তু পরমতত্ত্বরূপেই অনুভূত হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যে ভাবেই আত্মাকে দেখ না কেন, তার অনুরূপ বিষয় দানে ও তাহাকে সেই বিষয়কে আত্মসাৎ করিবার অবসর দিয়াই কেবল তৃপ্ত ও আনন্দিত করিতে পার। অন্যথা আনন্দ সম্ভবে না। এই ব্যাপক অর্থে, জাগতিক রূপ-লালসাও আত্মরতিরই নামান্তর ও

আকারান্তর মাত্র। ইহারও মধ্যে রূপের মধ্যে স্বরূপের আত্মান্বেষণ ও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। নতুবা রূপে এত আনন্দ থাকিত না। এই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই উপনিষদ ব্রহ্মানন্দকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াও জীবের মৈথুনজনিত যে আনন্দ তাহাকেও সেই শুদ্ধচিন্ময় তুরীয়ানন্দের পরিমাণ-দণ্ডরূপে ব্যবহার করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠাও বোধ করেন নাই। কারণ আনন্দ মাত্রেতেই (অজ্ঞাতসারেও) আত্মাই কেবল আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। জীব যত কেন মোহাচ্ছন্ন হউক না, চিদংশে সে যেমন ব্রহ্মচৈতন্যেরই অনু-প্রকাশ; সেইরূপ সে যত কেন নিকৃষ্ট হউক না, আনন্দাংশে সে সেই ব্রহ্মানন্দেরই ভোক্তা। ব্রহ্মাণ্ডে যদি দুই সত্তা বা সত্য, দুই জ্ঞান বা চৈতন্য, দুই আনন্দ বা রতি থাকিত, তবে অন্য কথা বলা সম্ভব ও সঙ্গত হইত। কিন্তু যাঁরা অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাস করেন, সে অদ্বৈততত্ত্ব শুদ্ধই হউক আর বিশিষ্টই হউক, দ্বৈতাদ্বৈতই হউক, আর ভেদাভেদযুক্তই হউক,—তাঁদের পক্ষে জীবের সকল আনন্দই যে ব্রহ্মানন্দের স্বল্পাধিক কণা,—জীবসকল যে এতস্যানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি—এ কথা অস্বীকার করা অসাধ্য।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

রেখা-চিত্র

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

নবাব-সরকার বা ইংরাজ-রাজসরকার এ উভয়ের কোথাও হইতে কোন প্রকার রাজ-সম্মান লাভ না ঘটিলেও ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর বাঙ্গালাদেশের আপামর সাধারণ জনমণ্ডলীর নিকট "প্রিন্স" এই উচ্চ অভিধানে অভিহিত ও সর্ব্বসমক্ষে ঐ রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়া অমরত্ব- অর্জ্জন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার নাম জানে, সে তাঁহাকে প্রিন্স বলিয়াই জানে।

তাঁহার নামের গোড়ায় এই মহাসম্মান-জনক 'প্রিন্স' শব্দ কেমন করিয়া সংযুক্ত হইল? ইহার একটা কারণ এই যে তিনি অসামান্য রূপবান পুরুষ ছিলেন। রূপবান পুরুষও আরও অনেক ছিলেন, সকলের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান পুরুষ ছিলেন বলিলেও প্রিন্স শব্দ প্রয়োগের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় না। যদি বলা যায়, তাঁহার চাল-চলন, রকম-সকম, ভাব-ভঙ্গী, তাঁহার কায়দা-কেতা, কথা-বার্ত্তা, রীতি-নীতি প্রিন্সের মত ছিল, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ উপাধি-অর্জ্জনের দাবি-দাওয়া কতকটা প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নহে; কারণ ঐরূপ দাবিদাওয়াবিশিষ্ট লোক যে তাঁহার সময়ে আর কেহ ছিলেন না, তাহাও বলা যায় না। রূপ ও ভাব-ভঙ্গী ৺কালী-প্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের ও ছিল, স্যর রাজা রাধাকান্ত দেবেরও ছিল, আরও আশে পাশে দু'চারিজনের ছিল। তবে দ্বারকানাথ

ঠাকুরই কেন 'প্রিন্স'পদবাচ্য হইলেন? তাঁহার কারণ অবশ্যই ছিল।

প্রথম কারণ—তিনি তাঁহার সময়ে আপন বুদ্ধিবলে অসামান্য ক্ষমতা ধারণ করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধপক্ষ যখন ধর্ম্ম-সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেই ধর্ম্ম-সভার প্রতিষ্ঠার মূলে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবল পৃষ্ঠপোষকতা পরিদৃষ্ট হয়, পরে যেই তিনি আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মসভার নেতৃত্ব ত্যাগ করিলেন ও রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন, ধর্ম্মসভা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, আর ব্রাহ্মসভা শক্তি লাভ করিয়া প্রবল হইয়া উঠিল। এতেই বুঝা যায় যে, তিনি নিজে একটা বৃহৎ শক্তি-কেন্দ্র ছিলেন। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানটা যেন তাঁহার প্রভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত, এখনকার বড় লোকদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, আর তিনি যেখানে উপস্থিত হইতেন, সে স্থানটা যেন নত মস্তকে তাঁহার উপস্থিতি স্বীকার করিয়া লইত। এরূপ প্রভাববিশিষ্ট মানুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তারপর তিনি যে কাজে হাত দিতেন, সে কাজ যেন আপনা আপনি সর্ব্বসমক্ষে তাঁহারই বশ্যতা স্বীকার করিত। এই দিক দিয়া আমাদের স্যর আশুতোষ কতকটা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধাতুর পরিচয় দিতেছেন বলিয়া মনে হয়

প্রিন্স দ্বারকানাথের গুণ-গৌরবের বিবরণও নিতান্ত অল্প নহে। বহুপদস্থ ব্যক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য দীন-দরিদ্রও তাঁহার স্নেহ ভালবাসা উপভোগ করিত। একদিকে লালা বাবুর অপরিমেয় সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষ ৺গোপীনাথ রায় (টাকির মুন্সি) তাঁহার সুপরামর্শের অধীন হইয়া চলিতেন, এবং সেই কাল হইতে রায় কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ দ্বারকানাথের স্নেহভাজন সুহৃদরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। অপর দিকে তিনি তাহার বাল্য-সুহৃদদিগের আশ্রয়স্থল স্বরূপ ছিলেন। দুইটি ঘটনা ইহার সাক্ষ্যরূপে আজিও বর্ত্তমান। একবার একটি বাল্যসুহৃদকে ইংরাজ-দপ্তরে একটা বড় চাকরী করিয়া দেন। সে লোকটি বড়ই ব্যয়শীল, অর্থাৎ রেখে ঢেকে খরচ করিতে জানিত না, অর্থবিষয়ে কতকটা উচ্ছৃঙ্খল, তাই কোনও দিনই তাহার আয়ব্যয়ের মিল থাকিত না, দুঃখ-কষ্ট-অনটন সর্ব্বদাই তার সঙ্গের সঙ্গী, আর ঋণ-ভার বৃদ্ধি হইয়া তাহার জীবন ভারবহ করিয়া তুলিয়াছিল। দু'চারিটা দেনার ডিক্রী সর্ব্বদাই তাহার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিত। এমন অবস্থায় সর্ব্বদাই তাহাকে মধ্যে মধ্যে আফিসে অনুপস্থিত থাকিতে হইত। কোন কোন সময় ফরাশডাঙ্গায় পলাইয়া গা ঢাকা দিতেন। আফিসের বড়কর্ত্তা সাহেব বিরক্ত হইয়া তাহার কর্ম্মে এক যোগ্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ এই বিপৎপাত অবগত হইয়া তাহার ডিক্রীগুলির পরিশোধের ভার লইলেন, তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার আফিসে গিয়া তাহার স্থানে তাহাকে বসাইয়া দিয়া উপরওয়ালা সাহেবের হুকুম রদ করাইয়া পরে নিরস্ত হইলেন। প্রিন্স-পদবাচ্য দ্বারকানাথের এই দরিদ্রবন্ধু-সেবা আজ-কালকার দিনে আর দেখিতে পাইব না।

অপর ঘটনা। বাল্যকালে পাঠশালায়

পড়ার সময় জোড়াসাঁকো অঞ্চলের একটি গরিব ছেলে তাঁহার সঙ্গে পড়িত ও তাঁহার পাঠে সাহায্য করিত। উত্তরকালে যখন বালক দ্বারকানাথ প্রিন্স, তখন সতীর্থ বালক অধুনা বার টাকার বিল সরকার একদিন বিলের টাকা আদায় করিতে সেই সহাধ্যায়ী দ্বারকানাথের সম্মুখে উপস্থিত। কত কাল চলিয়া গিয়াছে। স্মরণ থাকিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। দ্বারকানাথ টাকা দিবার সময় পুনঃপুনঃ লোকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, আর বিল সরকারের আত্মারাম শুকাইয়া যাইতেছে; বারবার বেশ নিবিষ্ট চিত্তে তাহাকে দেখিয়া প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় কোথায় দেখেছি?" সে ব্যক্তি ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল "আজ্ঞে আপনি রাজার রাজা, আর আমি সামান্য লোক। আমাকে আপনার দেখার কোন সম্ভাবনা নাই।"

প্রিন্স ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি পরিচয়প্রার্থী হইয়া যতই পীড়াপীড়ি করিতেছেন, সে ব্যক্তি পরিচয় দিতে তাই কুণ্ঠা বোধ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিতেছে, আর বলিতেছে, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় থাকার বা পরস্পরের জানার কোনও সম্ভাবনা নাই।" দ্বারকানাথ বিল পেমেণ্ট বন্ধ করিয়া বলিলেন "তোমার ঠিক পরিচয় ও আমার সঙ্গে কখনও কোন কালে জানা-শুনা ছিল কি না, তাহা না বলিলে, টাকা দিব না।" তখন সে ব্যক্তি ভয়ে কম্পিত কলেবরে আত্মপরিচয় দিয়া বলিল "মহারাজ ছেলেবেলা এক পাঠশালে কিছুদিন পড়িয়াছিলাম, আর সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইলে আপনার পড়া বলিয়া দিতাম।" প্রিন্স, "তাই বল, তুমি অমুক?" লোকটি আরও ভয়ে ভীত হইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার মণিমুক্তাখচিত ঝালর-আঁটা সামিয়ানাতলে দুগ্ধফেণনিভ শয্যাশোভিত পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া সেই দীনদরিদ্র বাল্যসুহৃদের হাতখানি ধরিয়া টানিয়া নিজ শয্যায় বসাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, আর সে ব্যক্তি আজানু ধূলাভরা হাটা-ফাটা পায়ে সে নবাবী গালিচার উপর পদার্পণ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত, তাই কিছুতেই সেদিকে যাইবে না; কম্পিত কলেবরে নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! কেমন সুন্দর দৃশ্য! এই দ্বারকানাথই প্রিন্স ছিলেন। প্রিন্স পীড়াপীড়ি করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে নিজের নিকট বসাইলেন। সে ব্যক্তি নিতান্ত ম্রিয়মান, কুণ্ঠিত ও কাতরভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল, তখন তাহাকে সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন "বল ত ভাই ক'টাকা মাইনে পাও।" সে ব্যক্তি বলিল "আজ্ঞে, বার টাকা।" প্রিন্স বলিলেন "এতেই চলে?" বন্ধু "আজ্ঞে অতি কষ্টে এক বেলা খেয়ে কোন রকমে বাঁচিয়া আছি।" দ্বারকানাথ বলিলেন, এখন "আফিসে যাও, রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া বৌদিদির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে, কয়টি টাকা হইলে, বেশ সুবিধামত মাস মাস দিন চলিয়া যায়। তার পর সকালে সেই সংবাদ আমাকে জানাইবে।" বলিয়া বন্ধুকে আগামী কল্য পুনরায় আসিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। পরদিন সেই ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, ঘরে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, মাসে ৩০টি টাকা হইলেই আমাদের বেশ চলিয়া যাইবে।"

প্রিন্স তৎক্ষণাৎ তাহার মাসিক মাস ত্রিশ টাকা পেন্‌সনের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়া দিলেন—"প্রতি মাসে ৩০৲ টাকা আমার নিকট পাইবে। চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া প্রতিদিন আহারান্তে অপরাহ্নে আমার এখানে আসিয়া ছেলেবেলার গল্প করিবে, তোমার আর অন্ত চাকুরি করিতে হইবে না।" কেমন স্নেহ, কেমন উদারতা!

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের যশো-গৌরবে যখন কলিকাতা-সমাজ টলমল, তখনই কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত, ও এদেশীয় যুবকগণকে পাশ্চাত্যপদ্ধতি-অনুযায়ী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। তদানীন্তন সকল শিক্ষার আয়োজনের পশ্চাতে প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড্ হেয়ার বিরাজ করিতেন। মধুসূদন গুপ্ত প্রথম হিন্দুযুবক হেয়ারের উৎসাহপূর্ণ উপদেশে সাহস করিয়া-শবব্যবচ্ছেদে অগ্রসর, কিন্তু তথাপি সাহসে কুলাইতেছে না, প্রিন্স এবং অন্যান্য অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সে দিন তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই মহদনুষ্ঠানে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তথাপি মধুসূদনের হৃদয়ে পূর্ণসাহস আসিতেছিল না। কলিকাতার দুর্গপ্রাচীর হইতে মধুসূদনের সম্মানার্থে তোপধ্বনি হইবে সকলেই সে জন্য মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, বিলম্ব দেখিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় অগ্রসর হইয়া মধুসূদনকে সাহস দিবার জন্য অন্য একখানি অস্ত্র হাতে লইয়া শব-অঙ্গে বসাইয়া দিয়া ছাত্রের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবামাত্র মধুসূদন অগ্রসর হইয়া শবে অস্ত্রাঘাত করিলেন। তাই আজ ক্রমে পারদর্শী চিকিৎসকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তাহা না হইলে, হয় ত, আজিও অস্ত্রবিদ্যাবিমুখ কবিরাজগণের ন্যায় ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ অস্ত্রবিদ্যায় বঞ্চিত থাকিতেন।

একবার চিৎপুরের বাজারে আগুণ লাগিয়া অসংখ্য লোকের যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইতেছে, এমন সময়ে সেই পথ দিয়া টাকির স্বনামধন্য দানশৌণ্ড ৺বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সি মহোদয় টাকির বাবুদের কালেক্‌টরীর খাজনার টাকা আলিপুরে চালান লইয়া যাইতেছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সির নাম শুনিবামাত্র বাজারের লোক কপালে করাঘাত করিতে করিতে তাঁহার নিকট কাঁদিয়া পড়িল। বৈকুণ্ঠনাথ আত্মবিস্মৃত হইয়া কল্পতরুর ন্যায় টাকা বিতরণ আরম্ভ করিলেন; অবশ্য বাজারটা তাঁহাদের নহে। দিতে দিতে খাজনার টাকা সব ফুরাইয়া গেল। তখন বৈকুণ্ঠনাথের চৈতন্য হইল। পরদিন সেই লাখ্ লাখ্ টাকা দিতে না পারিলে, জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাইবে। নিরুপায়! তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ কালীনাথের নিকট সংবাদ পাঠাইতেও ভয় হইল। ভাবনার ভারে বিব্রত হইয়া প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বলিলেন, যত বড় বিপদ হউক না কেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর দমিয়া যাইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ইহার প্রতিকারপরায়ণ হইলেন। গভর্ণর-জেনারেল ব্যাপার অবগত হইয়া প্রথমতঃ অসম্ভব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন, প্রথমে এ ব্যাপারে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, পরে যখন ঘটনাটা যথার্থ সত্য বলিয়া প্রমাণ পাইলেন, তখন

বৈকুণ্ঠনাথের হৃদয়ের বিস্তৃতি ও গভীরতা অনুভব করিয়া, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রিন্সের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারকানাথ খাজনার টাকা দাখিল করিবার জন্য সময় চাহিলেন। গভর্ণর-জেনারেল তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় সময় মঞ্জুর করিয়া এক হুকুমনামা জারি করিয়া দিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের এমনই উচ্চ প্রতিষ্ঠা ছিল।

প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রিন্সের অনেক ঘটনা বর্ত্তমান, সে গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ সংগ্রহ ও আলোচনা একদিনে এক প্রবন্ধে হয় না। সেকালের সুপ্রিমকোর্টের জজেরা, গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সেলের মেম্বরগণ সকলেই তাঁহার বন্ধু ছিলেন, এবং তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, প্রিন্স কথাটার সৃষ্টি তাঁহারাই করিয়াছিলেন। যত বড় পদস্থ লোক হউক না কেন, তাঁহার সম্মুখে যেন হীনবুদ্ধি, হীনপ্রভ ও অবনত ভাব অনুভব করিত। তাই অনেক সময়ে বজরা-আরোহণে জলবিহারে জজেরা সখ্ করিয়া দাঁড় টানিলে তিনি আরাম-চেয়ারে বসিয়া আল্‌বোলায় ধূমপান করিতে করিতে বাহবা দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। ইহাও সামান্য কথা, ইহাপেক্ষা বৃহত্তর ও উচ্চতর স্থানে যেরূপভাবে বিচরণ করিয়াছেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। পদমর্য্যাদায় তিনি বড়র বড় ছিলেন, তাই "প্রিন্স" কথাটা তাঁহার নামের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়াছে। তিনি সত্যই প্রিন্স ছিলেন।

দ্বারকানাথের সম্বন্ধে আর একটি অতি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী সহৃদয়তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। কলিকাতায় সে কালে সরিফ্-সেলে যে সকল সম্পত্তি বিক্রয় হইত সেই সকলের অধিকাংশ স্বর্গীয় মতিলাল শীল আর দ্বারকানাথ ঠাকুর ক্রয় করিতেন। মতি শীলের ক্রয় করা সম্পত্তির অধিকার লাভের সময়ে সঙ্গে অনেক লোকজন যাইত। কিন্তু প্রিন্স অনেক সময়ে একাকী এক দ্বারবান সঙ্গে সম্পত্তি দখল করিতে যাইতেন, এ বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগত প্রভাব-শালী রাজা রামমোহনের শিষ্য ছিলেন।

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একখানি শোভনদৃশ্য অট্টালিকা দেনার দায়ে সরিফ্-সেলে বিক্রয় হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই বাটী ক্রয় করেন। এক দ্বারবান সঙ্গে লইয়া তিনি সেই বাড়ীখানি দেখিতে ও দখল করিতে যান। সদর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বাড়ীর অবস্থা, সজ্জিত পূজার দালান, বৈঠকখানা ইত্যাদি দেখিতেছেন, এমন সময়ে সেই বাড়ীর আড়াই বৎসর বয়স্ক বালকপুত্র মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া উপরের তালার ঝিলিমিলির পশ্চাৎ হইতে তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা! এরা কারা!" জননী অশ্রুসিক্ত মুখে, কাতর দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া ও সেই কোমল কমল-মুখ চুম্বন করিয়া ও তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "বাবা, আমাদের এই বাড়ী বিক্রি হইয়া গিয়াছে, যারা কিনেছে, তারা বাড়ী দখল করিতে আসিয়াছে"। বালক বলিল "মা! কোথায় থাক্‌বো?". জননী আকুল হৃদয়ে সম্ভব মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন "বাবা, ভগবান যেখানে রাখ্‌বেন সেইখানেই থাক্‌তে হবে।"

প্রিন্স মা ও ছেলের এই কথা শুনিতে পাইয়া নিকটে দণ্ডায়মান জনৈক প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যে ছেলেটি কথা কহিতেছে, ও কে?" প্রতিবেশী বলিল, "যাহার বাড়ী, তাঁহারই আড়াই বৎসর বয়সের ছেলে।" প্রিন্স পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার আর কে আছে?" প্রতিবেশী বলিল, "ওর মা আছে, উহাদের আর কেহ নাই।" দ্বারকানাথ ঠাকুর বালককে একবার আনিতে বলিলেন। বালক মায়ের কোল ছাড়িয়া কিছুতেই আসিবে না; অনেক পীড়াপীড়ির পর যদিও আসিল, প্রিন্সকে দেখিয়া, তাঁহার সুন্দর বাবরিকাটা কেশগুচ্ছ-ধৃত, অনুপম রাজসৌন্দর্য্যশোভিত মুখের দিকে, যে দিকে অনেক পদস্থ ও সম্মানিত বিরাট পুরুষও সাহস করিয়া পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করিত না, সেদিকে তাকাইতে চায় না, ভয়ে জড়সড় হইয়া যাহার কোলে ছিল তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখ লুকাইয়া রহিল। কিছুতেই মুখ তুলিবে না, চাহিয়া দেখিবেও না। দ্বারকানাথ কি আশ্চর্য্য কৌশল জানিতেন, সহজে আপনার যে বুদ্ধিবলে বড় বড় লোককে বশে রাখিতেন, সেই অজ্ঞাত কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া বালকের ভয় ভাঙ্গিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বালককে দেখিয়া তাঁহার স্নেহের উদয় হইয়াছে, উহাকে একবার ক্রোড়ে লইবার ইচ্ছার উদয় হইয়াছে। ক্ষণকাল অতি স্নেহভরে তাহার পৃষ্ঠে হাত দিতে দিতে তাহাকে একটু বশে আনিলেন, তখন বালক সভয়ে উঁকি মারিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতেছে। ক্রমে সম্পূর্ণরূপে তাহার ভয় দূর করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। তখনও সে বালক তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিতেছে না। যথেষ্ট আদর ও স্নেহ দেখাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার মাকে কি বল্‌ছিলে?" সে বলিল; উত্তরে মা কি বলিয়াছেন, তাহাও বলিল যে, তাহারা কোথায় থাকিবে জিজ্ঞাসা করায় তাহার মা বলিতেছিলেন, "বাবা, ভগবান যেখানে রাখ্‌বেন, সেইখানে থাক্‌বো।" প্রিন্স দ্বারকানাথ স্নেহবিগলিত আর্দ্রহৃদয়ে ও মধু-মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "তোমার মা'কে বলগে ভগবান তোমাদিগকে এই বাড়ীতেই রাখ্‌লেন। আমি এ বাড়ী তোমাকে দিয়ে গেলাম। এ বাড়ী থেকে তোমাদের বাহির হতে হবে না।"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারী-সমস্যা

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মনুষ্যসমাজে কন্যা অপেক্ষা পুত্র অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে—ইহা আজকাল সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের আদম-সুমারীর বিবরণ ও জন্মমৃত্যুসংখ্যার আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন। আমাদের ভারতবর্ষেও তাহাই দেখিতে পাইতেছি।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও বিখ্যাত ডারুইন সাহেব ইউরোপের বিভিন্নদেশের পুত্রকন্যা-জন্মসংখ্যার তুলনা করিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন। পশুপক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষই বেশী সংখ্যায় জন্মায়, তাহাও তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন *। কিন্তু সে বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করা বিশেষ সহজ নহে, তাহাও তিনি নিজেই বলিয়াছেন।

কিন্তু কন্যা অপেক্ষা পুত্র যেমন জন্মগ্রহণ করে বেশী, মরেও তেমনই সংখ্যায় বেশী। প্রায় সকল সভ্যদেশেই কন্যা অপেক্ষা পুত্রের মধ্যে মৃত্যুর হার এত বেশী যে, জন্মগ্রহণকালে যদিচ পুত্রের সংখ্যাই বেশী থাকে,—কিন্তু কিয়ৎকাল পরে কন্যার সংখ্যাই বেশী হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বেশী। হিন্দুসমাজেও কন্যা অপেক্ষা পুত্রই বেশী মরে—কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার মত অত বেশী মরে না। ফলে হিন্দু-সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশী না হইলেও প্রায় সমান সমান। কেন যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ তুলনায় এত বেশী মরে, তাহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা অনেক পণ্ডিতই করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মতের বিভিন্নতাও যথেষ্ট আছে। তবে মোটামুটি নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রায় অনেকেই সম্ভবপর মনে করেন বলা যায়।

(১) কন্যা অপেক্ষা পুত্রের জীবনী-শক্তি কম। সেইজন্য জন্মগ্রহণের পর প্রাকৃতিক বা সামাজিক নানা প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়া কন্যা যে পরিমাণে টিকিয়া থাকিতে পারে পুত্র তাহা পারে না। তাহার ফলে কন্যার তুলনায় পুত্রই বেশী মরে।

(২) জীবিকার জন্য স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষকেই বেশী খাটিতে হয়। প্রায় সকল দেশেই অল্পবিস্তর (যেখানে স্ত্রী স্বাধীনতা আছে সেখানেও) পুরুষদিগকেই কাজের জন্য বাহিরে থাকিতে হয়, দেশদেশান্তরে যাইতে হয়, নানা বিপদসঙ্কুল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। অধিকাংশ পরিশ্রমসাধ্য আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্যে তাহাদিগকেই ব্যাপৃত থাকিতে হয়, যুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় অকালমৃত্যুজনক ব্যাপারে তাহারাই লিপ্ত হয়। আর স্ত্রীলোকদিগকে প্রায়ই গৃহকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয়; পরিশ্রমও কম করিতে হয়, দেশান্তর-গমনেরও তেমন প্রয়োজন হয় না। আর এই সকল কারণে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরাই বেশী রোগাক্রান্ত হয়, তাহাদেরই মরিবার বেশী সম্ভাবনা হইয়া উঠে।

(৩) কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানদের শরীর ও মুণ্ডের আয়তন সাধারণতঃ বেশী। কাজেই প্রসবনির্গমনের সময় কন্যার অপেক্ষা পুত্রেরই আঘাত লাগিবার ও শারীরিক অনিষ্টের সম্ভাবনা বেশী। ইহার ফলে জন্মগ্রহণের পর পুত্রসন্তানেরা অধিক দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হয় ও অধিক মরে। যে সকল সন্তান গর্ভ হইতেই মৃত অবস্থায় পতিত হয়, তাহাদের মধ্যেও সেই কারণে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়।

এই সকল কারণে অধিকাংশ সমাজেই

* Sexual Selection—Ch. VIII.

পুত্রের অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বেশী হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপে ও আমেরিকার প্রায় সকল সভ্যদেশেই এই নিমিত্ত পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। স্কটলাণ্ড প্রভৃতি দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুবই বেশী। সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমান থাকাই বোধ হয় স্বাভাবিক নিয়ম। যেখানেই এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, স্ত্রীর সংখ্যা কি পুরুষের সংখ্যা অত্যধিক হইবে, সেখানেই তাহার ফলে সমাজের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর অবস্থার কিছু রূপান্তর হইবে। যে জাতির মধ্যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সেই জাতির মধ্যে ধ্বংসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে পণ্ডিতেরা এইরূপ বলেন। পক্ষান্তরে যে সকল সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, সেখানে এই আধিক্যের পরিণাম যে ভাল, তাহা বলা যায় না।

প্রথমতঃ, যেখানে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কম সেখানে অনেক স্ত্রীলোকের বিবাহ হইতে পারে না। যে সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে তাহার কথা অন্যরূপ। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টীয়সভ্যতা-প্রধান দেশসমূহে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই। ফলে অনেক স্ত্রীলোককেই অবিবাহিত থাকিতে হয়। আর বিবাহার্থিনী স্ত্রীলোকের সংখ্যা বিবাহার্থী পুরুষের অপেক্ষা বেশী হওয়াতে অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সেই হয়। স্কটল্যাণ্ডে ৬০।৬৫ বৎসর বয়সেও স্ত্রীলোকদের বিবাহ হইতে দেখা যায়;—আর এরূপ বিবাহের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। আমরা এখানে একটু নমুনা দেখাইতেছি। মিঃ বেন্ ভারতীয় সেন্সাস্ রিপোর্টে (১৯০১) ইউরোপের কয়েকটী দেশের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদের সংখ্যার সঙ্গে ভারতের বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের সংখ্যার তুলনা করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। ১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্কা প্রতি দশহাজার স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিবাহিতাদের হার এই সকল দেশে নিম্নলিখিতরূপ :—

	অবিবাহিতা	বিবাহিতা	বিধবা
স্কটল্যাণ্ড	৮৬২৩	১৩৬০	১৭
জার্ম্মাণী	৯১০৭	৮৭৭	১৬
হাঙ্গেরী	৫৪১৬	৪৪৬১	১২৩
ভারতবর্ষ	১৪৯	৮১৯১	১৬৬০

সমাজে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যার এত আধিক্য যে নৈতিক হিসাবে খুব ভাল, তাহা নহে। সমাজে আইনতঃ বহুবিবাহ বন্ধ করা এরূপ স্থলে সহজ নহে। আর তাহার ফল নৈতিক অবনতি, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি। কিছুদিন পূর্ব্বে পার্লামেণ্টে ইংলণ্ডে নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যে একটা দশম বাৎসরিক তালিকা দাখিল করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়, জারজসন্তানের হত্যাপরাধে অপরাধিনী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। অষ্ট্রীয়ায় ত জারজ-সন্তান সরকার হইতে প্রতিপালন করিবার জন্য ব্যবস্থাই করিতে হইয়াছে।*

দ্বিতীয়তঃ, অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদের এত আধিক্যের ফলে, সেই সকল অবিবাহিতা

* ভূপ্রদক্ষিণ—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার প্রণীত।

স্ত্রীলোকদিগকে নিজেদের জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। বিদ্যা, জ্ঞান, শিল্পপটুতা প্রভৃতি সকলবিষয়েই এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। এমন কি রাজনৈতিক স্বত্ব ও অধিকার লাভের জন্যও তাহারা পুরুষদের সঙ্গে দ্বন্দ্ববিগ্রহ করিতে ছাড়িবে না। Suffragettes বা রাজনৈতিক স্বত্বপ্রার্থিনী রমণীদের অভ্যুদয়েই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখা যাইতেছে। এই প্রতিযোগিতার সংগ্রাম ভোট-প্রার্থিনীর দল এতদূর পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে যে, তাহা সমাজের পক্ষে একপ্রকার ভয়াবহ ও অশান্তিকর ব্যাপারই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার, রমণীগণ পুরুষদের ন্যায় দর্শন-বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলে বা রাজনৈতিক কূট-চর্চ্চায় পারদর্শিতা লাভ করিলে তাহা যে গার্হস্থ্যজীবনের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে, এ বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল লোক সন্দেহ করেন। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চর্চ্চার ফলে স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়, কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইহাও বলেন। ফ্রান্সে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে বলিয়া আজ-কাল সেখানকার দেশনায়কগণ ভবিষ্যতের জন্য কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তথাকার রমণীগণের অতিরিক্ত Intellectualism বা মানসিকতাই ইহার কারণ। ইউরোপের কাইসার এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালনই স্ত্রীলোকদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। সুতরাং নারীগণের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যে সর্ব্বত্রই একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ঘাতপ্রতিঘাত প্রকৃতিরই নিয়ম। কোন কার্য্যের প্রতিক্রিয়া যে কিরূপভাবে হয়, তাহা ভাবিলে অনেক সময় বিস্মিত হইতে হয়। আমরা কতকটা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদের সংখ্যার আধিক্যের ফলে, প্রত্যক্ষে না হোক্, পরোক্ষভাবে, তাহাদের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা ও ভোটপ্রার্থিনীর দল প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এই সকলেরই প্রতিক্রিয়ার ফলে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা যে হ্রাস হইয়া যাইবে না তাহা কে বলিতে পারে? বরং এইরূপ হওয়াই যে কতকটা সম্ভব, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

(১) যে কঠোর জীবন-সংগ্রামের ফলে পুরুষদের আয়ুঃ-ক্ষয় ও অকাল-মৃত্যু হয়, এতকাল স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাহা ছিল না। কিন্তু এখন আর তাহা বলিবার উপায় নাই। স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়েই পুরুষদের প্রতি-যোগিতা করিতেছে। ভোট-প্রার্থিনী দলের উদ্ভব হইয়া এই প্রতিযোগিতা চরমে উঠিয়াছে। জীবিকার জন্য বহুল পরিমাণে দেশান্তরে গমন, যুদ্ধপ্রভৃতি কার্য্যেও যে অদূরভবিষ্যতে স্ত্রীলোকেরা প্রবৃত্ত হইবে তাহাও অসম্ভব নয়। সুতরাং এই সকল ব্যাপারে পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও আয়ুঃক্ষয় ও অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি হইবে। ফলে তাহাদের সংখ্যা কমিতে থাকিবে।

(২) পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানদের শরীর ও মুণ্ডের আয়তন বেশী। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদের দেহ ও মস্তিষ্ক উভয়ই বেশী চালনা করিতে হয় বলিয়াই বংশানুক্রমের ফলে পুরুষদের শরীর

ও মুণ্ড আয়তনে বাড়িয়া গিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরাও যেরূপ ভাবে পুরুষদের ন্যায়ই দেহ ও মস্তিষ্ক চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদেরও শরীর ও মুণ্ড যে শীঘ্রই পুরুষদের ন্যায় অধিক আয়তনবিশিষ্ট হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। ফলে প্রসবনির্গমনের সময় তাহাদেরও পুরুষদের ন্যায়ই আঘাতপ্রাপ্তির অনিষ্টাশঙ্কার সম্ভাবনা বেশী হইবে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহাতেও স্ত্রীলোকদের সংখ্যা এখনকার তুলনায় কমিতে থাকিবে।

(৩) পূর্ব্বোল্লিখিত অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফল বংশানুক্রমে সংক্রামিত হইয়া স্ত্রীলোকদেরও জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া দিবে এবং তাহার ফলে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের ন্যায় সংখ্যায় বেশী মরিতে থাকিবে।

সমাজশক্তির গতি ও ক্রিয়া অতি কঠিন। সে সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্তই অনুমান মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে স্ত্রীলোকদের সংখ্যার হ্রাস হইয়া, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে চিরন্তন বৈষম্য তাহা কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া, কালে একটা কঠিন সামাজিক সমস্যার সমাধান হইবে কি না তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

বিশ্বসৃষ্টিতে মানবের স্থান*

মানুষের মধ্যে চিরদিনই একটা অপূর্ণতার অভাব জাগিতেছে। তাই সে পশুপক্ষীর মত প্রাত্যহিক জীবনের কাজ-কর্ম্মের মধ্যেই একটা সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। যেন তার সব তৃষা পুরে নাই, সব আশা মিটে নাই, যেজন্য সে পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহার সার্থকতা-সাধন হয় নাই—এই কথাই তাহার মনে সর্ব্বদা জাগিতে থাকে। 'আমার যা হবার তা আমি হব'—এ কথা তাহাকে জোর করিয়া বলিতেই হইয়াছে, এবং সেই না-হওয়ার উপলব্ধিতেই তাহার যত বেদনা। ভগবান চান যে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এক মানুষই আপনি আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবে, তাহার ভিতরকার মনুষ্যত্বটিকে অবাধে প্রকাশিত করিবে। তাই তিনি মানুষকে আর সকল জীবের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ করিয়া, অসহায় দুর্ব্বলের বেশে পাঠাইয়াছেন। সেই দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়াই তাঁর পরমা শক্তির প্রকাশ হইবে, সেই অসম্পূর্ণতা তাঁরই পূর্ণ লীলা প্রকট করিয়া ধন্য হইবে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। তাই তিনি ময়ূরকে নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, আর মানুষের

* গত মাঘোৎসবের দিন প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজে যে বক্তৃতা দেন তাহার সারসঙ্কলন।

মধ্যে একটি রঙের বাটি দিয়া বলিয়া দিয়াছেন—"তোমাকে আপন সাজে সাজতে হবে; উপকরণ সব দিয়েছি, তা দিয়ে আপনাকে তুমি আপনি গড়ে তোল।" আমরা যদি তা না করি, তা হলে কি তাঁর লীলা ব্যর্থ হইয়া যাইবে না?

কিসের ব্যর্থ আবর্ত্তনে দিনের পর দিন আমরা ঘুরিয়া মরিতেছি! আমি মানুষ হব, ভগবানের অভিপ্রায় আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ করে তুল্‌ব—এ সংকল্প ত কই গ্রহণ করা হইল না। কয়েদীর মত ঘানিতে বদ্ধ হইয়া, জীর্ণ বোঝা লইয়া, শুধু একই চক্রনেমির পথে ঘুরিতেছি, শুধু একই হেয় জিনিসের পুনরাবৃত্তি করিতেছি। এমন কোন নূতনত্বের চেতনা পাই না যাহাতে মনে করিয়া দেয় যে, আমি মানুষ; যে, এ মোহপাশ টুটিয়া সত্যের আলোকে আমাকে মনুষ্যত্বের সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। অভ্যাসের জড়স্তূপে, মলিনতার উপর মলিনতার আবরণে, নিত্যকার কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে প্রতিদিন আমরা এ কি আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি;—বিশ্বভুবনের আশ্চর্য্য লীলা দর্শন হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতেছি! যাহা কিছু আমাদের আয়োজন সবই ত দেখি নিজের জন্য। বিশ্বের সর্ব্বত্রই তাঁহার আসন পাতা, শুধু আমাদের কলঙ্কমণ্ডিত এই অন্তর থাকিতেই তাঁর স্থান আমরা করি নাই।—অথচ আমাদের হৃদয়ে নিমন্ত্রিত না হইয়া তিনি আসিবেন না,—এইটুকুই তাঁর অভিমান। তাই তিনি চিরদিন বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমরা তাহাকে ডাকি না, সুখ-দুঃখের অংশ দিই না; অথচ, বাসনা কামনা স্বার্থ আসিয়া জোর করিয়া সে আসন দখল করিয়া বসে, যাহা পায় সবই কাড়িয়া লয়,—আমরা নিবারণ করিতে পারি না।

এইরূপেই আমরা আমাদের জীবন ব্যর্থ করিতেছি; এবং সেই সঙ্গে তাঁহারও উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতেছি। তিনি যে বলিয়াছেন আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা সংসারের সুখের মধ্যেই মগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকিব না,—সে পিতৃসত্য আমাদের পালন করিতেই হইবে, বলিতে হইবে—'হে নাথ, আমার ধন-মান, জীবন-যৌবন, সবই তোমার জন্য, কারণ তুমি আমার পিতা,—পিতা নোঽসি।'

এই সত্যকে জানিবার জন্য, এই সত্যকে স্বীকার করিবার জন্য, মানুষ এক একটা দিনকে পৃথক করিয়া রাখে। প্রতিদিনের পুঞ্জীভূত অসত্যের গ্লানি, খ্যাতি-প্রতিপত্তির চরণে হীন নতি, মলিনতার কলঙ্কের স্তূপীকৃত জঞ্জাল সব দূরে ঠেলিয়া, ঘানির ভার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া, অন্ততঃ সে দিন মানুষ বুঝিতে চায় যে, আনন্দলোকে অমৃতলোকেই তার জন্ম, কারাগারের রুদ্ধ কক্ষে নয়।

স্বর্গলাভের জন্য মানুষ একদিন কত ব্রত-অনুষ্ঠান, কত তীর্থ-পর্য্যটন, কত আত্মনিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু স্বর্গ বলিয়া-ত পৃথক কিছুই নাই। সংসারে ভগবানকে আনিলেই সংসার স্বর্গ হয়। তিনি বলিয়াছেন—'তোমায় আমায় মিলেই স্বর্গ সৃষ্টি হবে; তোমার আত্ম-নিবেদনের অপেক্ষায় এতদিন এতবড় একটা চরম সৃষ্টি সম্পূর্ণ হতে পায়নি।' এই-খানেই তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছেন; আর এইজন্যই তিনি যুগ-ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। এ

পৃথিবীও একদিনে এমন শস্যশ্যামলা সৌন্দর্য্যশালিনী হয় নাই; কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ শীতল হইয়া, তরল হইয়া, কঠিন হইয়া তবে এ রূপ সে পাইয়াছে। স্বর্গলোকও ঠিক সেইরূপ বাষ্পাকারে আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; তাহাকেও এইভাবে একটা অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতা আমাদের দিতেই হইবে; তাঁহার রচনাকার্য্যে সহায়তা করিতেই হইবে। কিছু অভাব পূরণ করিয়াছি, কিছু অজ্ঞানতা দূর করিয়াছি, কিন্তু সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছি, এ কথা মরিবার পূর্ব্বে আমাদের বলিবার অধিকার যেন থাকে। তাঁহার সে সৃষ্টির মাঝে শিল্পীর ন্যায় আমাদের কতক কারিকুরি যেন থাকে। তাঁহার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া, তাঁহার আনন্দের সহিত নিজেদের প্রেম আনন্দ মিলাইয়া আমাদের ধন্য হইতে হইবে। হোক্ সে বাণী অর্দ্ধস্ফুট, হোক্ সে সুর ক্ষীণ, তবু তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। তাঁহার মুখের তৃপ্তির ভাব অনুভব না করিলে কবি কবি নয়, শিল্পী শিল্পী নয়, গায়ক গায়ক নয়; মানুষের সভায় দাঁড়াইয়া মানুষের জয়মাল্য লইবার জন্যই যাহার আগ্রহ, সে মানুষই নয়। কিন্তু কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য্য, বা সুর, বা রস নয়,—সবই লইতে হইবে; সমস্ত জীবন দিয়া তাঁরই সব জিনিষ তাঁহারই সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে। জীবনকে তাঁহার অমৃতরসে কাণায় কাণায় পূর্ণ করিয়া নিবেদন করিতে হইবে। তাঁহার নৈবেদ্য হইতে প্রায় সব জিনিসই আমরা চুরি করিয়া সামান্যমাত্র উদ্বৃত্ত তাঁহার জন্য রাখিয়া দিই; আর সেইজন্যই, সেই নিজের নেওয়া জিনিষে অন্তর ভরে রাখি বলেই, অভাব আমাদের কখনও যায় না। সব জিনিষ যদি কোন দিন তাঁকে নিঃশেষে দান করিতে পারি, তাহা হইলে সে দিন আর আমাদের কোন অভাব থাকিবে না।

আজ এই দিনে সেই কথাটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বলিতে হইবে যে—হে স্বামি, তোমার আসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে তুমি এস; যে, তুমি না আসিলে গৌরব আমার গৌরব নয়, সব খ্যাতি সব পাওয়া আমার ব্যর্থ; যে, একলা আমার রচিত যে সৃষ্টি তাহা এক আঘাতেই চূর্ণ হইয়া যায়—আমি আর তাহা চাহি না; এস আজ তোমায় আমায় মিলে এমন এক নূতন সৃষ্টি করি যাহা কখনও লোপ পাইবার নয়। আমি ক্লান্ত, আমি অক্ষম, আমি দুর্ব্বল—সব কৃত্রিমতা আজ দূর করিয়া দিলাম। তোমার জন্য দুঃখ পাইলাম এ কথা জানাইবার সুখ আমায় দাও; সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথের দুঃখ-বোঝা আজ তোমার চরণে ফেলিয়া দিলাম,—তুমি আনন্দ তুমি অমৃত এ কথা বলিবার অধিকার আমায় দাও। বিশ্বজগতকে যেভাবে প্রকাশিত করিতেছ, আমাকে তেমনি প্রকাশিত কর; সংসারের অন্ধকারের মধ্যে তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠুক;—সত্যে, জ্ঞানের জ্যোতিতে, মৃত্যুর পরপারে অমৃতলোকে তোমার সহিত আমাকে মিলিত কর।

পূর্ব্বরাগ।

যায় যায় যায় যায় ফিরে, চায়,
চরণে নুপুর বাজে,
মরমের আশা, প্রাণের পিয়াসা
লুকাতে চায় সে লাজে।
লাজ বলে তারে চল সখি চল,
মন মানা করে তারে;
মুগুধা কিশোরী, না পারে থাকিতে
ফিরে যেতে নাহি পারে।
ধীরে ধীরে যায়, যেতে নাহি চায়
মুখে মৃদু মৃদু হাসি,—
হিয়া যেন তার চোখে এসে বলে,
"ভালবাসি—ভালবাসি!"
চোরা চাহনিতে দেখে মোহনিয়া
দাঁড়ায়ে কদম তলে;
অনুরাগ তার বনমালা হয়ে
দুলিছে বিনোদ গলে।
থমকি' চমকি' ফিরে যেতে চায়
শিহরি' বাঁশীর গানে,
নত করে আঁখি, "সে যদি গোপন
মরম কথাটি জানে।"
ভিজা নীল শাড়ী; মুকুতা ঝরিয়া
পড়িছে পথের পরে,—
তনুর পরশ হারাবে ভাবিয়া
সে বুঝি ঝুরিয়া মরে।
শিথিল দুকূল, কবরীর ফুল
মাটীতে খসিয়া পড়ে,
পায় পায় বাধা, পায় যেন রাধা,
কে যেন পা'দুটি ধরে।

শ্রীমুনীন্দ্র নাথ ঘোষ।

প্রিণ্টার—কে, সি, চক্রবর্ত্তী, গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

সপ্তবিংশ অধ্যায়

গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ও রূপ-সনাতন সাক্ষাতোৎসব

সন্ন্যাসগ্রহণ কালে গৌরের বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর ছিল। তাহার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি দাক্ষিণাত্যের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন; একবার গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন, এবং বারাণসী, প্রয়াগ ও বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি একাধিক্রমে অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে নীলাচল ত্যাগ করিয়া তিনি কুত্রাপি গমন করেন নাই। নীলাচলেই তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার অবসান হয়।

গৌরের নীলাচল-প্রত্যাগমন-সংবাদ নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে, তথাকার ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বাধীনে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। শিবানন্দের প্রিয় একটী কুকুরও তাহাদের সহিত যাত্রা করিয়াছিল। পথিমধ্যে কুকুরটী অদৃশ্য হয়। বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া শিবানন্দ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হন। কিন্তু নীলাচলে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার প্রিয় কুকুরটী গৌরের অদূরে উপনীত হইয়া তৎপ্রদত্ত নারিকেল শস্য ভক্ষণ করিতেছে, গৌর তাহাকে কৃষ্ণ নাম পড়াইতেছেন, সেও নারিকেল চর্ব্বণ করিতে করিতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছে। বিস্ময়স্তিমিত লোচনে কিয়ৎক্ষণ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া শিবানন্দ কুকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে সেই ভক্ত কুকুর কুকুর-দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থিত হয়।

গৌড়ীয় ভক্তগণ বহুদিন পরে প্রভুকে দর্শন করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। গৌরও পরম প্রীতি সহকারে সকলের অভ্যর্থনা করিয়া সকলের সহিতই যথাযোগ্য আলাপ করিলেন। ভক্তগণ চারি মাস প্রভু-সহবাসে নীলাচলে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

রূপ প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া একমাস তথায় অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত স্থান

দর্শন করিলেন। অনন্তর সনাতনের অন্বেষণে ভ্রাতা অনুপমের সহিত বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা গঙ্গাতীর দিয়া প্রয়াগ অভিমুখে আসিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই সনাতন রাজপথে বারাণসী হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভ্রাতাদিগের সাক্ষাৎ হইল না। রূপ ও অনুপম প্রয়াগ হইতে বারাণসী গমন করিলেন। তথায় তপন মিশ্রের নিকট সনাতনের প্রতি গৌরের অনুগ্রহের সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহারা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। দশদিন বারাণসীতে অবস্থিতি করিয়া উভয় ভ্রাতা গৌড় যাত্রা করিলেন। গৌড়ে আসিয়া অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল রূপ গৌরের দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনে বাসকালেই এক খানা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক রচনা করিবার জন্য রূপের ইচ্ছা হইয়াছিল। বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভও করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ ও নান্দী শ্লোক বৃন্দাবনেই তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌড় হইতে নীলাচল গমন কালে সেই প্রারব্ধ নাটকের কথাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এবং যখন যাহা মনে হইতে লাগিল তাহা লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে সত্যভামাপুরে বিশ্রাম কালে তিনি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। এক দিব্যরূপধারিনী রমণী স্বপ্নে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া আদেশ করিলেন "রূপ, আমার নাটক তোমাকে পৃথক লিখিতে হইবে।" নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া রূপ সিদ্ধান্ত করিলেন, সত্যভামা দেবীই স্বপ্নে তাঁহার সম্বন্ধে পৃথক নাটক লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। রূপ ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্রে রচনা করিতেছিলেন; স্বপ্নাদেশ পাইয়া উভয় লীলা পৃথক লিখিতে মনস্থ করিলেন।

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া রূপ প্রথমেই হরিদাসের গৃহে গমন করিলেন। হরিদাস পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। গৌর প্রত্যহ হরিদাসের গৃহে গমন করিতেন; সেদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া রূপকে দেখিতে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন। হরিদাসের আবাসেই রূপের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। একে একে নীলাচলের সকল ভক্তের সহিত রূপ পরিচিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রূপ প্রতিদিন গৌরের নিকটে গমন করিয়া নানা আলাপে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন কথায় কথায় গৌর কহিলেন "রূপ, কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিও না।" এবং রূপ উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রূপ বুঝিলেন তাঁহার আরব্ধ নাটককে লক্ষ্য করিয়াই এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তখন সত্যভামাপুরের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। সত্যভামা ও গৌরের আদেশের ঐক্য দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

গৌরের সহিত পরমসুখে রূপের সময় কাটিতে লাগিল। তাঁহার বিষয়-তাপদগ্ধ প্রাণ ভক্তির সুশীতল স্রোতে অবগাহন করিয়া শীতল হইল। রথযাত্রাকালে তিনি রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব
চৈত্রে ক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ
কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-
লীলাবিধৌ
রেবা রোধসি তরুতলে চেতঃ সমুৎ-
কণ্ঠতে।"

[যিনি আমার কৌমারকাল হরণ করিয়াছেন, তিনিই আমার বর, সেই চৈত্রমাসের রজনী; সেই বিকশিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদম্ব-কাননের মন্দ মন্দ সমীরণ, সেই সবই আছে, আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদীর তীরবর্ত্তী বেতসী তরুর তলে সুরত-লীলা-বিধানার্থই আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।]

এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে ভাবোদ্বেল হৃদয়ে গৌর যখন তাঁহার বিহ্বল চরণ ভূমিতলে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তখন এক রূপ ও স্বরূপ ভিন্ন কেহই তাঁহার তদানীন্তন মানসিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। রূপ বুঝিলেন সেই সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের অভ্যন্তরে একটী নারী-হৃদয় আছে, কোন্ অতীত যুগের এক মধুর স্মৃতি তাহার মধ্যে উদিত হইয়া তীব্র আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তাঁহাকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। প্রভুর কাতর হৃদয়ের কম্পনে প্রিয় ভৃত্যের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত লাগিল। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রূপ প্রভুর মানসিক অবস্থাপ্রকাশক এই শ্লোকটী রচনা করিলেন—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি।"

[সহচরি, আমার সেই প্রণয়াস্পদ শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল; আমিও সেই রাধিকা, উভয়ের মিলন জনিত সুখও সেই, তথাপি আমার মন সেই যমুনা-পুলিনবর্ত্তী বিপিনে—যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর মধুর পঞ্চমতানে খেলিয়া বেড়াইতেছে সেই বিপিনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।]

তালপত্রে শ্লোকটী লিখিয়া রূপ গৃহের চালে তালপত্রটী গুঁজিয়া রাখিলেন। গৌর গৃহে প্রত্যাগত হইলে তালপত্রটী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই শ্লোক পাঠ করিয়া তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন সময় রূপ সমুদ্রস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৌর সস্নেহে তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া সেই তালপত্র তাহাকে দেখাইয়া কহিলেন "আমার মনের মধ্যে যে ভাব অতি দৃঢ় ছিল, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে, রূপ?" অনন্তর স্বরূপ গোস্বামীকে সেই শ্লোক দেখাইয়া কহিলেন "দেখ দেখ স্বরূপ; রূপ আমার মনের ভাব কেমন এই শ্লোকে অবিকল ব্যক্ত করিয়াছে। সে আমার মনের ভাব জানিল কিরূপে?" স্বরূপ কহিলেন "তোমার কৃপা হইয়াছে—তাই জানিয়াছে।" তখন গৌর কহিলেন "ইঁহাকে দেখিবার পর হইতেই ইঁহার প্রতি কেমন আমার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ইঁহাকে যোগ্য পাত্র জানিয়াই প্রয়াগে ইঁহাকে ভক্তি-তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলাম। স্বরূপ তুমিও ইঁহাকে বিস্তারিত ভাবে রসতত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।"

ভক্তগণের দেশে প্রত্যাগমনের পরেও রূপ স্বীয় প্রভুর চরণে রহিয়া গেলেন। সংকল্পিত নাটক অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে লিখিতে লাগিলেন। একদিন রূপ লিখন-কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় গৌর তথায় উপস্থিত হইয়া গ্রন্থের একটী পাতা হাতে তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন রূপের মুক্তাপংক্তি বিনিন্দি অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ
স্পৃহাম্॥
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং
কৃতিং।
নো জানে জানিতা কিয়ন্তিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি

"জানিনা কৃষ্ণ এই দুইটা বর্ণ কীদৃশ অমৃত দ্বারা গঠিত। বর্ণ দুইটী যখন রসনায় নৃত্য করে, তখন রসনাপংক্তি (বহুসংখ্যক জিহ্বা) পাইতে অভিলাষ হয়; শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইলে অর্ব্বুদসংখ্য কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে এবং মনোরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই এতৎসকাশে পরাভূত হইয়া পড়ে।"

গৌর শ্লোক পাঠ করিয়াই প্রেমাবিষ্ট হইলেন। হরিদাস শুনিয়া কহিলেন "শাস্ত্রে বহু সাধুর মুখে কৃষ্ণনামের মহিমা-কীর্ত্তন শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ বর্ণনা এখন পর্য্যন্ত কর্ণগত হয় নাই।" সেদিন রূপ ও হরিদাসকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া গৌর প্রস্থান করিলেন; কিন্তু অচিরেই সার্ব্বভৌম, রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রূপের গ্রন্থ শুনিতে আগমন করিলেন। রূপ সকলকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিয়া হরিদাসের সহিত মৃত্তিকায় উপবেশন করিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের শ্লোকটী পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। রূপ লজ্জায় মৌন হইয়া রহিলেন; সার্ব্বভৌমের মত পণ্ডিত, রামানন্দ ও স্বরূপের মত ভক্তের সম্মুখে স্বীয় প্রথম রচনা পাঠ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। তখন স্বরূপ "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" ইত্যারব্ধ শ্লোকটী পাঠ করিলেন। শ্লোক শুনিয়া রামানন্দ কহিলেন "প্রভু, তোমার প্রসাদ ভিন্ন এরূপ শ্লোক রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে স্বীয় শক্তি আমাতে সঞ্চারিত করিয়া আমার মুখ দিয়া অনেক সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া লইয়াছিলে, রূপও তোমার প্রসাদেই এই শ্লোক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে।" তখন রামানন্দ গ্রন্থে ইষ্টদেবের বর্ণনা কিরূপ হইয়াছে, শুনিতে ইচ্ছুক হইলে, রূপ প্রথমতঃ লজ্জায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভুর আদেশে পাঠ করিলেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং॥
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যে মধুর রস পূর্ব্বে কখনও জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই মধুর রসরূপ নিজভক্তিসম্পৎ জগৎবাসীকে প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হউক।

শ্লোক শুনিয়া গৌর কহিলেন "রূপ, এখানে

অতিস্তুতি হইয়াছে।" কিন্তু ভক্তগণ কহিলেন "তোমার শ্লোক শুনিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।" অনন্তর রামানন্দ প্রশ্ন করিয়া একে একে রূপের গ্রন্থের অনেক অংশ শুনিয়া লইলেন। রূপ প্রভুর আদেশ লইয়া পাত্র-সন্নিবেশ, প্ররোচনা, প্রেমোৎপত্তি, পূর্ব্বানুরাগ, বিকার-চেষ্টা, প্রণয়-পত্রিকা, ভাবের স্বভাব, সহজপ্রেমের প্রকৃতি, মুরলী-নিস্বন প্রভৃতি অংশের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইলেন; রামানন্দ অশেষ প্রকারে গ্রন্থের প্রশংসা করিলেন। গৌর প্রেমভরে রূপকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রূপ সকল ভক্তকে প্রণাম করিলেন।

কতিপয় মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। দোলযাত্রার পরে গৌর রূপকে কহিলেন— "রূপ, এখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর। তথায় অবস্থিতি করিয়া রসশাস্ত্র নিরূপণ এবং লুপ্ততীর্থরাজির উদ্ধার ও প্রচার কর। কৃষ্ণ-সেবা ও রসভক্তি-প্রচার তোমার মুখ্য-ব্রত হউক। আমি একবার তোমার কৃত কর্ম্ম দেখিবার জন্য বৃন্দাবন যাইব তৎপূর্ব্বে সনাতনকে একবার এখানে পাঠাইয়া দিও।" ইহার অচিরকাল পরেই রূপ প্রভু ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া গৌড়ে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া প্রভুর আদেশ পালনে রত হইলেন।

রূপ নীলাচল ত্যাগ করিবার কিছুকাল পরে সনাতন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও প্রভুর ন্যায় ঝারিখণ্ডের পথে আসিয়াছিলেন। ঝারিখণ্ডের দূষিত জলস্পর্শে তাঁহার কণ্ডুরোগের উৎপত্তি হইয়াছিল। যখন তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্ডুতে আচ্ছন্ন এবং তাহা হইতে অনবরত রসক্ষরণ হইতে-ছিল। ইহাতে সনাতন মনে করিলেন "একে ত আমি নীচজাতি, তাহাতে এই ঘৃণ্য-রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। হতভাগ্য আমি, না পাইব জগন্নাথের দর্শন, না পাইব ইচ্ছামত আমার প্রভুকে দেখিতে। এই জঘন্য শরীর রক্ষা করিয়া আর লাভ নাই। রথযাত্রাকালে জগন্নাথের রথতলে আমি এ জীবন পরিত্যাগ করিব।" নীলাচলে সনাতন হরিদাসের আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সনাতনের চিত্ত গৌরের দর্শন-লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত। ভক্তবৎসল অচিরেই ভক্তগণ সহ হরিদাসের আবাসে উপস্থিত হইয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া সনাতন ও হরিদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। গৌর সনাতনকে প্রথমে দেখিতে পান নাই, তিনি প্রথমে হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন হরিদাস কহিলেন "প্রভু, সনাতন তোমায় প্রণাম করিতেছে।" সনাতনের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র গৌরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। বাহু প্রসারিত করিয়া তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন সনাতন পশ্চাতে সরিয়া গিয়া কহিলেন "প্রভু, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় স্পর্শ করিও না। আমি একে নীচ জাতি, তাহাতে সমস্ত গাত্র আমার কণ্ডুরসে লিপ্ত।" গৌর তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া সবলে তাঁহাকে ধারণ করতঃ প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। সনাতনের কণ্ডু-ক্লেদে তাঁহার

শরীর লিপ্ত হইল, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একে একে সমস্ত ভক্তের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন। সকলের চরণ বন্দনা করিয়া সনাতন হরিদাসের পিঁড়ার নিম্নে উপবেশন করিলেন। গৌর ভক্তগণ সহ পিঁড়ার উপর উপবেশন করিয়া সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদে প্রভু দুঃখিত হইয়া তাহার ভক্তির অশেষ সুখ্যাতি করিলেন। অনুপম রঘুনাথের উপাসক ছিলেন। রূপ ও সনাতন তাঁহাকে কৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহাতিশয্যে অনুপম প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের সেবা ত্যাগ করিবার কল্পনা যখনই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তখনই এক নিদারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার মন কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল; যখন রঘুনাথের চিন্তা কিছুতেই মন হইতে বিদূরিত করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত মিনতির সহিত তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিলেন "আমি রঘুনাথের চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি, আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পারিব না! সে চিন্তামাত্রেই আমার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হয়। তোমরা অনুমতি দাও জন্মজন্মাবধি আমি রঘুনাথের চরণ সেবা করিব।" সনাতন এই কাহিনী বর্ণনা করিলে গৌর ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

হরিদাসের গৃহেই সনাতনের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। গৌর ভৃত্য গোবিন্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন; এবং স্বয়ং প্রত্যহ হরিদাসের আবাসে আসিয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ-কথালাপে অনেক সময় কাটাইতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে গৌর কহিলেন "সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণলাভ হয় না। দেহ ত্যাগ করিলেই কৃষ্ণ যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে কোটী দেহ থাকিলেও, তাহা ত্যাগ করা বিশেষ কঠিন কার্য্য হইত না। ভক্তি ও ভজন ব্যতিরিক্ত কৃষ্ণ-প্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। দেহত্যাগ তমোধর্ম্ম। রজঃ ও তমো অবলম্বনে কৃষ্ণের মর্ম্ম বোধগম্য হয় না।" শুনিয়া সনাতন বুঝিলেন তাঁহারই আত্মহত্যার সংকল্প লক্ষ্য করিয়া প্রভু এই কথা বলিতেছেন; তিনি প্রভুর চরণ-মূলে পতিত হইয়া কহিলেন "হে সর্ব্বজ্ঞ, হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি আমাকে যেরূপ নাচাইতেছ, যন্ত্রের মত আমি তেমনি নাচিতেছি। কিন্তু আমার মত নীচ ও পামরকে জীবিত রাখিয়া তোমার কি লাভ হইবে প্রভু?" গৌর কহিলেন "সনাতন তুমি আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, তোমার দেহ এখন আমার। পরের দ্রব্য নষ্ট করিবার অধিকার তোমার নাই। তোমার শরীরে আমার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এখনও ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব সম্যক নিরূপিত হয় নাই। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-আচারপদ্ধতি এখনও সম্যক বিধিবদ্ধ হয় নাই, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণসেবা এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। লুপ্ত তীর্থরাজির এখনও উদ্ধার হয় নাই; বৈরাগ্য-শিক্ষা এখনও প্রচারিত হয় নাই। তুমি দেহত্যাগ করিলে মথুরা ও বৃন্দাবনে বসতি করিয়া এ সমস্ত কার্য্য কে করিবে? যে দেহ দ্বারা এতগুলি মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে সে দেহ তুমি ত্যাগ করিতে চাও?" অনন্তর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হরিদাস, সনাতন পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহেন, তুমি নিষেধ করিও।"

সনাতন দেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ

করিলেন। হরিদাস ও প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথালাপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রাকালে আসিয়া চারি মাস নীলাচলে অবস্থান করতঃ দেশে ফিরিয়া গেলেন। সনাতন স্বীয় চরিত্রমাধুর্য্যে নীলাচলে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। জগন্নাথের দোলযাত্রা দেখিয়া সনাতন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠমাসে গৌর যমেশ্বরটোটা গমন করিলেন। তথায় অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্নকালে তিনি সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সনাতন প্রভুর আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র পরমাহ্লাদিত মনে সমুদ্রতীরস্থিত বালুকাপথে যমেশ্বরটোটা গমন করিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। তপ্তবালুকা-সংস্পর্শে পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু বিপুল আনন্দে মন ভরপুর থাকায় সনাতন তাহা জানিতে পারিলেন না। সনাতন উপস্থিত হইলে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "সনাতন কোন্ পথে আসিয়াছ?" সনাতন কহিলেন "সমুদ্র-পথে।" গৌর কহিলেন "সিংহদ্বারের শীতল উদ্যান-পথ ত্যাগ করিয়া, তুমি উত্তপ্ত বালুর পথে আসিলে কেন? পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়াছে।" তখন সনাতন কহিলেন "আমার কষ্ট বেশী হয় নাই। পায়ে ব্রণ হইয়াছে—কই আমি তো তা জানিতে পারি নাই। আমি নীচ জাতি, ঠাকুরের সিংহদ্বারে যাইবার আমার অধিকার নাই। বিশেষতঃ সিংহদ্বারে ঠাকুরের সেবকগণ অনবরত যাতায়াত করে, তাহাদের সহিত গাত্রসংস্পর্শ হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইত।" সনাতনের বিনীত বচনে পরম তুষ্ট হইয়া গৌর কহিলেন "সনাতন, তোমার মত ভক্তের স্পর্শে মানব ত দূরের কথা, মুনি ও দেবতাগণও পবিত্র হইয়া যান। তথাপি তুমি মর্য্যাদা লঙ্ঘন কর নাই; ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদার রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি না ঐছে করিলে করে কোন্ জন॥"

এই বলিয়া গৌর সনাতনের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কণ্ডুরসাচ্ছন্ন শরীর আলিঙ্গন করিলেন; গৌরের গাত্রে স্বীয় কণ্ডুরস লাগিতে দেখিয়া সনাতন মনস্তাপ প্রাপ্ত হইলেন। গৌর তাঁহার নিষেধ গ্রাহ্য করিতেন না—মাঝে মাঝে প্রায়ই তাহাকে আলিঙ্গন দিতেন। ইহাতে সনাতন আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া মনঃপীড়া ভোগ করিতে লাগিলেন। একদিন মনোদুঃখে তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতকে কহিলেন "নীলাচলে আসিলাম প্রভুকে দর্শন করিয়া মনের দুঃখ দূর করিতে; কিন্তু এখানে আসা অবধি মনস্তাপেই দিন যাইতেছে। আমার কণ্ডুরস দ্বারা আমি প্রভুর শরীর কলঙ্কিত করিতেছি, এ অপরাধ হইতে আমার নিস্তার নাই; আমার কিসে হিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" জগদানন্দ কহিলেন "বৃন্দাবনই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান। রথযাত্রা দেখিয়াই তুমি তথায় গিয়া বাস কর।" সনাতন কহিলেন "সেই ভাল কথা। সেই খানেই আমি যাব। সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ।" ইহার কতিপয় দিবসান্তে হরিদাসের

আবাসে সনাতন দূর হইতে গৌরকে প্রণাম করিলেন। গৌর বারংবার ডাকিলেও নিকটে গমন করিলেন না। অগত্যা গৌর সনাতনের অভিমুখে গমন করিলেন। সনাতন পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন। গৌর তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন "তুমি ত আমার এই পূতিগন্ধময় শরীর আলিঙ্গন কর। কিন্তু এই অপরাধে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এখানে থাকিলে আমার কল্যাণ হইবে না। জগদানন্দ পণ্ডিতকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তিনি আমাকে বৃন্দাবন যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তুমি অনুমতি দেও, আমি প্রস্থান করি।" এই কথা শুনিয়া গৌর বিশেষ রুষ্ট হইয়া কহিলেন "কি অধিকার আছে জগদানন্দের তোমাকে উপদেশ দিতে? কালিকার জগদানন্দ কি এত বড় পণ্ডিত হইয়াছেন যে, আমার প্রাণাধিক, আমার উপদেষ্টা সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিতে অগ্রসর হন? মূর্খ জগদানন্দ নিজের মূল্য অবগত নহে।" তখন সনাতন গৌরের চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন "হায় জগদানন্দ কি সৌভাগ্যবান্। তুমি তাহাকে আপনার জন বলিয়া মনে কর, তাই তাহাকে তিরস্কার করিতেছ; আর আমার ভাগ্যে কেবল গৌরব ও স্তুতি—

জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নিসিন্দারস॥

হায়, আজিও আমার প্রতি তোমার আত্মীয়-জ্ঞান হইল না—আমার দুর্ভাগ্য!" সনাতনের আক্ষেপে গৌর লজ্জিত হইয়া কহিলেন "জগদানন্দ কখনও তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয় নহে। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমার একান্তই অসহ্য।

কাঁহা তুমি প্রাণাধিক শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন॥

তোমাকে উপদেশ করিতে গিয়াছিল বলিয়াই জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে যে বহিরঙ্গ জ্ঞানে স্তুতি করিয়াছি তাহা মনে করিও না। সন্ন্যাসী আমি; চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়ই আমার নিকট তুল্য। তোমার নিকট বীভৎস বোধ হইতে পারে; কিন্তু আমার নিকট তাহা অমৃত সমান বোধ হয়। এ বৎসর তুমি আমার সহিত বাস কর। তারপরে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব।" এই বলিয়া গৌর পুনরায় সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন চক্ষুর নিমেষে সনাতনের চর্ম্মরোগ প্রশমিত হইয়া গেল। সুবর্ণের মত তাঁহার দিব্য অঙ্গ দীপ্তি পাইতে লাগিল। সকলে চমৎকৃত হইয়া গেলেন।

এক বৎসর প্রভু-সহবাসে অতিবাহিত করিয়া সনাতন বৃন্দাবন-যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। যে পথে গৌর বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, সনাতনও সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। প্রভুর চরণরেণু-পূত পথে মনের আনন্দে হরিনাম করিতে করিতে সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পরে রূপও তথায় আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া নানা শাস্ত্র সহযোগে লুপ্ততীর্থ সকলের উদ্ধার করিলেন এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলেন। সনাতন "ভাগবতামৃত", "সিদ্ধান্ত-সার", "হরিভক্তি-বিলাস" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করিলেন। রূপ "উজ্জ্বল-

নীলমণি", "রসামৃত-সিন্ধুসার", "দান-কেলি-কৌমুদী" প্রভৃতি নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কালে বল্লভের পুত্র জীবগোস্বামী সর্ব্বত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করিলেন এবং "ভাগবতসন্দর্ভ", "গোপালচন্দ্র", "ষট্‌সন্দর্ভ" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম দিক্-দিগন্তে প্রচার করিয়া দিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জনমদুঃখিনী সীতা

বাঙ্গালী-সমাজে একটা ধারণা আছে যে, সীতা জনমদুঃখিনী; তাঁহার নামে কোনও মেয়ের নাম রাখিলে সেও জন্মদুঃখিনী হইবে। এই কারণে বঙ্গদেশের কোন বালিকার সীতা নাম পাওয়া যায় না।

কিন্তু সীতা কি সত্যসত্যই "জনমদুখিনী" ?

বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জনকের গৃহে সীতার বাল্যকাল যে খুব সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কেন সন্দেহই নাই। বনবাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্বশুরালয় দশরথ-গৃহে বাসও তাঁহার পক্ষে সুখময় ছিল। তারপর চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস। এই বনবাসও কি শুধু দুঃখেরই ছিল? এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ বর্ষ সীতা রামের সঙ্গিনী ছিলেন। কেবল বাকী এক বৎসরের অনধিক কাল তিনি রাবণের গৃহে বন্দিনী ছিলেন।

বনবাস-কালের ত্রয়োদশ বর্ষ সীতার জীবনে সুখের কি দুঃখের সময় তাহা বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙ্গালী-সমাজে সুখ ও বিলাস প্রায় একার্থক হইয়া উঠিয়াছে। সুখের মধ্যেও যে দুঃখ থাকিতে পারে এবং দুঃখের মধ্যেও যে সুখ থাকিতে পারে তাহা তাহারা বুঝে নাই। বীরত্বের মধ্যে ও ত্যাগের মধ্যেও যে যথেষ্ট সুখ আছে তাহা তাহারা ভাবিতে চেষ্টা করে নাই। বনচর জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখ যে বেশী হইতে পারে, এ কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে চেষ্টা করে নাই। তপোবনের তাপস ও তাপসীদিগের সঙ্গ; তটিনীর কলনাদ; মৃগশাবকগণের ক্রীড়া; ময়ূরের নৃত্য; বন্য কুসুমের অপূর্ব্ব শোভা ও সৌরভ নদীতটের উপলখণ্ডরাশির আকার ও বর্ণের বৈচিত্র্য; পার্ব্বত্য মৃত্তিকার বিচিত্র বর্ণসম্ভার; বিবিধ বর্ণের ও আকারের বিচিত্র বিহঙ্গশ্রেণী এবং তাহাদের বিবিধ মধুর কাকলী; বিবিধ বিচিত্র উদ্ভিদ—তাহাদের পত্র পুষ্প ও ফলের সৌন্দর্য্য; স্বচ্ছসলিল সরোবর ও তাহাতে সঞ্জাত কুমুদ, কহ্লার, রক্তকমল ও পদ্মের রাশি সীতার বন্য-জীবনকে কবিজনবাঞ্ছিত অপূর্ব্ব আনন্দে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে বিচিত্র সুখের কথা শুনিয়া আমাদেরও সরমার ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"শুনিলে তোমার কথা রাঘব-রমণি
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে। ইচ্ছা হয় ত্যজি রাজ্য,
যাই বন মাঝে।"

আর এই ত্রয়োদশ বর্ষ ধরিয়া,—সমস্ত যৌবন-কাল ব্যাপিয়া সীতা নিজ প্রিয়তমের নিত্য-সঙ্গিনী ছিলেন। অযোধ্যায় রাজপুরীতে সীতা কি রামচন্দ্রকে এমন একান্ত ভাবে পাইতে পারিতেন? সেই জনহীন অরণ্যে সীতার প্রেমের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা। কে বলিতে পারে, নবীন যৌবনে অযোধ্যার বিলাসের মধ্যে অবস্থান করিলে রামচন্দ্রের চরিত্রের অবনতি ঘটিত না? তিনিও পূর্ব্ব-পুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুবিবাহ করিতেন না? তাহা না হইলেও রাজকার্য্যই রামচন্দ্রের জীবনের অধিকাংশ সময় অপহরণ করিত; সীতা দিবসের অতি অল্পমাত্র সময়ই রামচন্দ্রকে পাইতেন। এই হিসাবে দেখিলে মনে হইবে সীতার সেই চতুর্দ্দশ বৎসরের বনবাস তাঁহাকে তাহার সমস্ত জীবনের দুঃখ অপেক্ষা শত গুণ অধিক সুখ প্রদান করিয়াছিল।

যে কয়মাস সীতা রাবণ-গৃহে বাস করিয়াছিলেন সে কয়মাস যে তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখাবহ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সে দুঃখ নিতান্তই দুঃসহ ও মর্ম্মন্তুদ। কিন্তু তাঁহার সুখ-দুঃখের জমা খরচের খাতায় সেই দুঃখ কি শোধ হইয়া যায় নাই? সেই সুখ-দুঃখের ভিতরে তিনি কি নিজ প্রণয়াস্পদের অবিচলিত প্রীতি ও প্রণয়ের নিদর্শন পান নাই? আর এই যে এখনও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নরনারী নিজের কত দুঃখের বোঝার ভারে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, কয়জন লোকে তাহাদের সে দুঃখের সংবাদ লইয়া থাকে? কিন্তু সেই যে কোন্ এক অতীত যুগে সীতা দুঃখে মুহ্যমান হইয়া কাঁদিয়াছিলেন, কতকাল পরে আজিও তাঁহার সেই দুঃখের কাহিনী অগণ্য নরনারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের অন্তস্তল হইতে অশ্রুধারা আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে;—এই যে তাঁহার দুঃখের প্রতি একটা বিশ্বজনীন সহানুভূতি—সেই সহানুভূতির কি কোনও মূল্য নাই?

রাবণগৃহ হইতে উদ্ধার পাইয়া সীতা অযোধ্যায় সম্রাজ্ঞী হইলেন। রাজার একমাত্র রাণীর যে কত সুখ তাহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক করে না।

তার পর সীতার দ্বিতীয় বনবাস। সীতা-জীবনের এই অংশ লইয়া বিবিধ বিতণ্ডা চলিয়াছে। এই বনবাসে সীতার যে দুঃখের তুলনায় সুখও বেশী হইয়া থাকিতে পারে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের আরোপ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। রামচন্দ্রের এই কার্য্যকে বর্ব্বর পিশাচের কার্য্য বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতাকে ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে রাখিয়া আসেন নাই; রাখিয়াছিলেন ঋষি বাল্মীকির শান্তিময় তপোবনে। বনবাসের কথা শুনিলেই আধুনিক বাঙ্গালীর মনে বিপুল আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যের নিকটে বনবাস বিভীষিকাময় মূর্ত্তি লইয়া উপনীত হইত না। শুধু প্রাচীন কেন, আধুনিক ভারতীয় মনেরও তপোবনের প্রতি কেমন একটা অনন্নভবনীয় আকর্ষণ আছে। তপোবন তাহার কল্পনার নিকটে বিচিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে উপনীত হয়। সেই তপোবন, যেখানকার আকাশ কোমল-কণ্ঠ ঋষিবালকগণের সামগানে মুখরিত

থাকিত; যেখানে শুভ্রবেশ, শুভ্রকেশ, ও সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি বৃক্ষতলে আসীন হইয়া শাস্ত্রালাপে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেন; যেখানে বন্য হরিণকুল ঋষিবালাগণের হাত হইতে খাদ্য পাইবার আশায় সতৃষ্ণনয়নে অপেক্ষা করিত; যেখানে সরোবর ও তটিনীর স্ফটিকজলে মাছগুলি করুণার্দ্র হস্ত হইতে খাবার কাড়িয়া লইয়া ইতস্ততঃ নাচিয়া নাচিয়া হুড়াহুড়ি ও ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; যেখানে পাপিয়া ও দয়েল, কোকিল ও কাক, ময়ূর ও ছাতার, শ্যামা ও শুকের নৃত্যে ও গানে বাধা দিতে কোন ব্যাধ আসিত না; যেখানে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, কোণহীন, চক্রাকার, বর্ত্তুলাকার ও ডিম্বাকার এবং লাল, নীল, সবুজ, পীত, গৈরিক ও পাংশুবর্ণ উপলখণ্ডসকল নদীর নির্ম্মল জলের মধ্যে আলোড়িত হইত, কিম্বা বেলাভূমিকে বিচিত্র আবরণে সাজাইয়া রাখিত; যেখানে বৈশাখের নবপত্রবাসপরিবৃত অশ্বত্থের শ্যামল স্নিগ্ধ ও বিশাল মূর্ত্তি আতপক্লিষ্ট পান্থের অন্তরে পুলক সঞ্চার করিত, এবং তাহার বায়ুভরে আন্দোলিত দীর্ঘপুচ্ছ পত্রাবলীর সর্‌সর্ শব্দ তাহার কর্ণকুহরে অপূর্ব্বসঙ্গীত বর্ষণ করিত, কৃষ্ণচূড়ার নিবিড় লোহিত পুষ্পাচ্ছাদিত তনু তাহার নয়নকে পরিতৃপ্ত করিত, এবং বিল্বপুষ্পের মধুরগন্ধবাহী পবন তাহার নাসিকাকে পুলকিত করিত; যেখানে শরৎকালে নদীতীরের বায়ু কাশকুসুমরাশির উপর দিয়া বহিয়া বড় বড় তরঙ্গ উৎপন্ন করিত; যেখানে হেমন্তের বায়ু শেফালিকার মোহন মৃদুগন্ধ বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; যেখানে শীতকালে উপবনগুলি ভাটের ফুলের দ্বারা আলোকিত হইয়া থাকিত; যেখানে ফাল্গুনের আম্রমুকুলের গন্ধ বিশ্ববাসিগণকে পুলকিত করিয়া তুলিত;—সেই তপোবনের সীতার জীবনের শেষ কয় বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল।

এই সময়ের মধ্যেই সীতা নিজ প্রিয়তমের প্রণয়ের পূর্ণ নিদর্শন পাইয়াছিলেন এবং সে নিদর্শন বিশ্ববাসীজনের নিকট স্থাপন করিবার সুযোগও তাঁহার ঘটিয়াছিল। যে সময়ে রাজাদিগের বহুপত্নী গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল সেই সময়ে সেই রাজা আপাতঃদৃষ্টিতে পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াও পুনরায় বিবাহ করেন নাই। যে সময়ে লোকে অপুত্রক অবস্থায় পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডজল লোপ পাইবে ভাবিয়া বিহ্বল হইত, সে সময়ে তিনি পুত্রের অছিলা করিয়াও পুনরায় বিবাহ করেন নাই। এবং পরিশেষে অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময়ে তিনি বিশ্ববাসীকে দেখাইলেন যে তিনি সীতা ও নিজেকে সমাজের হিতার্থ বলি দিয়াছেন মাত্র। সীতার সহিত তাঁহার শারীরিক বিচ্ছেদমাত্র সংঘটিত হইয়াছে, উভয়ের মানসিক মিলন তখনও পরিপূর্ণ।

বিধাতার এমনই বিচিত্র বিধান যে, পৃথিবীতে যে যাহা চায় তাহার জন্য তাহাকে মূল্য দিতে হয়। আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী যতই উৎকৃষ্ট হইবে তাহাকে ততই অধিকতর মূল্য দিয়া লইতে হইবে। এই কারণে সেই আদর্শ নরপতিকে নিজের মহৎ আদর্শের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হইয়াছিল; সে মূল্য—সীতা-বর্জ্জন। সমাজের যাঁহারা আদর্শ স্থানীয় তাঁহাদের দায়িত্বও গুরুতর। সাধারণ মানবের যে স্বাধীনতা আছে সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তির সে স্বাধীনতা নাই। থ্যাকারের ভাষায়

বলিতে হয় "One must not only be virtuous but must appear also virtuous." বিশেষতঃ যাঁহাকে সকলে অনুকরণ করিবে, যাঁহার সামান্য একটু ক্রটী পাইলে ভণ্ড ও দুষ্টগণ তাহার অনুকরণ করিয়া সমাজ মধ্যে বিষম বিপ্লব ঘটাইয়া তুলিবে, তাঁহাকে শুধু ধার্ম্মিক হইলেই বলিবে না, তাঁহার আচরণ এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে অতি বড় পাপিষ্ঠও যেন কোন ছল ধরিতে না পারে। যেমন কোন কোন সেনাপতি যুদ্ধকালে রাজকীয় ও সামরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পরে হয় নিজের কৃতকার্য্যতার দ্বারা কিম্বা সাধারণ অপরাধীর মত নিজ জীবনের দ্বারা নিয়ম-লঙ্ঘন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, তেমনি মহাপুরুষগণ মাঝে মাঝে সমাজ বিগর্হিত কার্য্য করিয়াও পরে সে কার্য্যের নির্দ্দোষিতার বিবরণ সুস্পষ্ট প্রমাণ করেন কিম্বা সাধারণ অপরাধীর মত দণ্ড গ্রহণ করেন। সীতা রাবণের গৃহে বাস করা সত্ত্বেও রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন; অযোধ্যায় লোকসমাজের নিকটে তাই তাঁহাকে কৃতকার্য্যের সদুদ্দেশ্যের পরীক্ষা দিতে হইল। সে পরীক্ষায় রামচন্দ্র জয়ী হইলেন; তিনি প্রমাণ করিলেন যে তিনি অলোকসামান্যা রূপবতী সীতার রূপ-মোহে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই; সীতার আন্তরিক সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। বহুবর্ষের অদর্শনও তাঁহার হৃদয়-পটে সে পবিত্র স্মৃতিকে বিন্দুমাত্রও ক্ষীণ করিতে সমর্থ হয় নাই। আর সীতা তাঁহার বনবাস এবং শেষ পরীক্ষা দ্বারা জগতের সমক্ষে নিজ বিশুদ্ধির এমন প্রমাণ দিলেন যে পৃথিবীর অতি বড় দুর্ম্মুখের পাষাণ হৃদয়ও তাহাতে বিগলিত হইয়া গেল।

সে পরীক্ষা হইয়াছিল সীতার জীবনের শেষ দিনে অযোধ্যায় রাজসভায়। কাষায় বসনধারিণী জানকীকে দেখিয়া সমবেত জনগণের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইতেছিল। কিন্তু জনসাধারণের করুণা ও রোষ নিতান্তই অকস্মাৎভাবে সঞ্জাত ও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। ঋষি বাল্মিকী সীতার বিমল চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন; তত্রাচ সীতাকে পুনরায় জনসাধারণের সমক্ষে পরীক্ষা দিতে হইবে। সে মহীয়সী মহিলার জীবনের কার্য্য তখন শেষ হইয়াছে! পতিপরিত্যক্তা হইয়া তাঁহার একদিনও জীবন ধারণ করিবার অভিলাষ ছিল না, কেবল তাঁহার সন্তাগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন; তাহাদিগের এখন ব্যবস্থা হইয়াছে। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা তাহা একান্তই পরা প্রেম বা ভক্তি; তাহাতে স্বার্থপরতার লেশমাত্রও নাই। তিনি কি অযোধ্যায় রাজসুখভোগের জন্যই রামচন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলেন? তিনি কি মূঢ় জনসাধারণকে ভেল্কি দেখাইয়া ভুলাইয়া পুনরায় অযোধ্যায় রাজ্যসুখভোগলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন? রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার সৈ ভক্তি যদি পরাভক্তি হয় তবে 'হে পৃথিবী তুমি দ্বিধা বিভক্ত হও জানকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শান্তি লাভ করুন।'

রাম চরিত্রের এই অংশের সমালোচনা বর্ত্তমান কালের লোকের পক্ষে, যে সময়ের লোকের কাছে ঈশ্বর পরকাল প্রভৃতি সকলই অত্যন্ত অস্পষ্ট—বিশ্বজগতের নিগূঢ়

কারণ মানুষের অন্যতম সুবিধাজনক কল্পনা মাত্র বলিয়া বিবেচিত, সে সময়ের লোকের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য। যে সময়ে লোকে ধর্ম্ম, পরলোক, ও ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষবৎ বিশ্বাস করিত সে সময়ের লোকের কার্য্যের অন্তস্তলে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকিত তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা এখনকার জনসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। গৌরবের জন্য ধর্ম্মের জন্য যাহারা কথায় কথায় প্রাণ দিত, "জীবন ও মৃত্যু যাহাদের পায়ের ভৃত্য" ছিল, তাহাদের কার্য্যের উদ্দেশ্য, জীবিত থাকাটাকেই যাহারা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া ভাবে, তাহারা কি প্রকারে বুঝিবে? কে বলিবে সেই রাজতপস্বীর হৃদয় সেই কর্কশ ব্যবহারের সময় দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছিল না? কে বলিবে তিনি সেই আপাতঃ কর্কশ ব্যবহার দ্বারা জানকীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার করিতেছিলেন না? জীবন দুদিনের, ঐহিক সুখও দুদিনের; কীর্ত্তি অনন্তকালব্যাপিনী। ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরনারীগণ নিজেদের কীর্ত্তিকে বিমল রাখিবার জন্য জীবন ও মৃত্যু কাহারই উপর অত্যধিক প্রীতি দেখান নাই। ইক্ষ্বাকুবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাম; ইক্ষ্বাকুবংশীয় শ্রেষ্ঠ নারী সীতা; তাঁহারা কি নিজেদের যশঃ প্রভাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন না? কে বলিবে সেই মহাপুরুষ নিজে কলঙ্কের বোঝা লইয়া নিজের প্রিয়তমার যশকে প্রদীপ্ত সূর্য্যের মত উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই? বিশ্বজগতের সীতার প্রতি সহানুভূতি এবং রামচন্দ্রের প্রতি রোষ, সীতার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয় লাভ।

সেই মহান রাজা কি নিজের সন্তানদিগের প্রতি বনবাসের দ্বারা অবিচার করিয়াছিলেন? অথবা সেই বিরাট পুরুষ—প্রকৃতি যাঁহাকে অলোকসামান্য গুণগ্রামে বিভূষিত করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিল, শ্রেষ্ঠব্রহ্মবিৎ ঋষি বশিষ্ঠ যাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, ঋষি বিশ্বামিত্র যাঁহাকে রাজনীতি ও রণনীতিবিশারদ করিয়াছিলেন, বিপুল দুঃখ যাঁহার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিয়াছিল,—তিনিই সংসারে দুঃখের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন। তিনি নিজের বহুদর্শিত্বে বুঝিয়াছিলেন মহদ্‌গুণাবলী লইয়া যাহারা জন্মিয়াছে, দুঃখ তাহাদের প্রধান শিক্ষাদাতা; দুঃখ তাহাদিগকে নিষ্পেশিত করিতে পারে না, তাহাদিগকে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মত উজ্জ্বল করিয়া তুলে। বুঝি তিনি ভাবিয়াছিলেন বাল্মীকির তপোবন ও তাপসীমাতার চরিত্র ও আশীর্ব্বাদ কুমার-যুগলের শিক্ষার প্রধান সহায় হইবে।

সেই দুঃখের ভিতরেও যে সীতার কোনও সুখ ছিল না এমন নহে। সীতার পত্নীত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল প্রথম বনবাসে। তাঁহার মাতৃত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাঁহার দ্বিতীয় বনবাসে। অযোধ্যার প্রাসাদের বিলাসিতার মধ্যে তাঁহার এ দুই মূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া উঠিতে পারিত না। তাঁহার বিশাল হৃদয়ের বিপুল ভালবাসা জগতের চারিদিক হইতে প্রতিহত হইয়া আসিয়া সন্তান যুগলের প্রতি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। সেই ভালবাসা-জনিত সুখ যে অযোধ্যায় রাজবাটীর বহুজনের কোলাহলের মধ্যে ঘটিত না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সীতার সেই বনবাসের জীবনে আর একটা সুখ ছিল; সেটা আমরা এখনকার

দিনে ভাল বুঝিতে না পারিলেও কতকটা কল্পনা করিতে পারি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শিক্ষা এমনই সুন্দর ছিল, উহা পরস্পরবিরোধি ভাবকে এখনই সুন্দরভাবে সমঞ্জস করিয়া লইত যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন নরনারীকেই জীবনের কোন অবস্থাতেই অতিমাত্রায় দুঃখী করিয়া তুলিতে পারিত না। যে গৃহহীন আশ্রয়হীন তরুতল-ভূতল-নিবাসী সেও মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া প্রতিবৃক্ষের পত্রে প্রতি বালুকণার মধ্যে প্রতি বায়ুর হিল্লোলে বিশ্বস্বরূপের সত্ত্বা অনুভব করিয়া গাহিত—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বংভুবন-
মাবিবেশ।
যো ঔষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়
নমোনমঃ

যেখানে সূর্য্যের কিরণ পৌছে না, যেখানে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পৌছে না, যেখানে মুক্ত নির্ম্মল বায়ু বহে না, এমন কারাগারের মধ্যে যে অবস্থিত সেও সেই "সর্ব্বভূতেযুগুঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট" "শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্" পুরুষকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া বিমল শান্তি লাভ করিত। ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্ম-যোগের শিক্ষায় ফলে কোন দুঃখই তাহাদিগকে অতি-মাত্রায় ব্যথিত করিতে সমর্থ হইত না। তাই সেই কুটীরের মধ্যে সেই অন্ধকারের মধ্যেও সীতা ধ্যান-যোগে নিজের প্রিয়তমকে নিজের হৃদয়ে আসীন দেখিতেন। সমাধির অবস্থায় তাঁহার মনে হইত রামচন্দ্র তাঁহার যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন, তাঁহার বাহিরে আছেন, তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া আছেন; তিনি ও রাম যেন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন; বাহিরের সর্ব্বত্রই তিনি রামরূপ দেখিতে পাইতেন; বিশ্বভুবন তাঁহার কাছে রামময় হইয়া যাইত। সুতরাং বিরহ তাঁহাকে অতিমাত্রায় ক্লেশ দিতে পারিত না। এই-রূপে সীতা-জীবনের প্রকৃত তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে সাধারণতঃ লোকে যে জন্য মানুষকে সুখী বলিয়া মনে করে জনমদুঃখিনী সীতার জীবনে তদপেক্ষা বহুতর সুখের উপকরণ বিদ্যমান ছিল।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় স্তর

(৬)

জাভার্টের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া ফ্যান-টাইন ম্যাডেলিনের আতুরাশ্রমে আনীতা হইল। তখন তাহার ভয়ানক জ্বর; সমস্ত রাত্রি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিয়া অবশেষে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল—স্বেচ্ছাসেবিকাদ্বয় তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ

হইল তখন সর্ব্বপ্রথম ম্যাডেলিনের মূর্ত্তিখানি তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। ম্যাডেলিন তন্ময়-চিত্তে কক্ষপ্রাচীর গাত্রে কিসের প্রতি চাহিয়া-ছিলেন। ফ্যানটাইন সে দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—সেটা একটা ক্রুশ চিহ্ন। মুগ্ধা ফ্যানটাইন কতক্ষণ তাঁহার সে ধ্যানরত মূর্ত্তিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল; গভীর শ্রদ্ধায় ক্রমশঃ তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল; অবশেষে সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌ছেন, আপনি?"

ম্যাডেলিন প্রায় একঘণ্টা হইতে সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে সম্বোধনে ফ্যানটাইনের কাছে সরিয়া আসিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি তুলিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"কেমন আছ এখন?" "ভাল আছি। ঘুমিয়ে শরীরটা ভাল বলে মনে হচ্ছে।" "ভাল।—কি করছিলাম জিজ্ঞাসা করছ?—যিনি একদিন আপনাকে বলি দিয়েছিলেন, স্বর্গের সেই দেবতার কাছে প্রার্থনা করছিলাম।" তার পর মনে মনে বলিলেন—"মর্ত্ত্যে যে আপনার জীবন বলি দিয়ে এখানে আজ পড়ে রয়েছে, তার জন্য।"

সন্ধ্যার সে ঘটনার পর হইতেই, ম্যাডেলিন, ফ্যানটাইনের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন; তাহার দুঃখদৈন্যময় জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতক্ষণে তিনি জানিয়াছিলেন। তাই বলিলেন—"হা, অভাগিনী জননী,—বড় যন্ত্রণাই তুমি পেয়েছ। তবে, দুঃখ কোরো না; দুঃখ যন্ত্রণা পরীক্ষাই মানুষে দেবত্বের অংশ ফুটিয়ে তোলে; তুমি আজ সেই অমরত্বের অধিকারিণী হয়েছ। যে নরককুণ্ড থেকে তুমি বেরিয়ে এসেছ,—সেই-ই স্বর্গের সোপান। সেইখান থেকেই আমাদের সবাইকে অগ্রসর হতে হয়।" বলিয়া ম্যাডেলিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। আনন্দে বিশ্বাসে ফ্যানটাইনের মুখে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল,—শ্রীভ্রষ্ট দন্তপাতির সৌন্দর্য্য-পরিহাস!

সেই রাত্রিতে জাভার্ট প্যারীর পুলিশের অধ্যক্ষকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া, পরদিন স্বহস্তে ডাকে দিয়া আসিল।

ডাকঘরের লোকেরা শিরোনামায় তাহার হস্তাক্ষর দেখিয়া ভাবিল সেটা বুঝি তাহার কর্ম্মত্যাগ পত্র,—কারণ, সে দিনের সন্ধ্যার সে ঘটনা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে, ম্যাডেলিন আর কালবিলম্ব করিলেন না।—ফ্যানটাইনের কাছে থেনে-ডিয়ারদের ১২০ ফ্রাঙ্ক পাওনা হইয়াছিল,—পরদিন তিনি তাহাদের নামে ৩০০ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন—"কসেটকে অবিলম্বে লইয়া আসিবেন; তাহার মাতা সংশয়াপন্না পীড়িতা, তাকে তিনি দেখিতে চান।"

সে পত্র পাইয়া থেনেডিয়ার বিস্মিত হইল। স্ত্রীকে বলিল—"ব্যাপার কি বুঝ্‌ছ? মেয়েটাকে ছাড়া হবে না,—যত পার একে এখন থেকে দু'য়ে নাও। মাগী বুঝি কোন কাপ্তেন পাক্‌ড়েছে।"

উত্তরে, থেনেডিয়ার ৫০০ ফ্রাঙ্কের এক বিল পাঠাইল;—তাহাতে এক ডাক্তারের বিলই ৩০০ ফ্রাঙ্কের ছিল। অবশ্য সেটা কসেটের জন্য নয়;—সে সুস্থই ছিল—সেটা যথার্থতঃ ইপোনাইন ও এজেলমার চিকিৎসা-ব্যয়। একটু নামের তফাৎ মাত্র—তাহাতে এমন কি? আবশ্যক মত সেটা ঈষৎ

পরিবর্ত্তিত করিয়া থেনেডিয়ার তাহার নীচে লিখিল—"৩০ ফ্রাঙ্ক পাইলাম।" তার পর পত্রের মধ্যে সেখানা গাঁথিয়া পাঠাইয়া দিল।

ম্যাডেলিন তৎক্ষণাৎ আরও ৩০০ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন—"পত্রপাঠ কসেটকে লইয়া আসিবেন।"

সে পত্র পাইয়া স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিতে বসিল। স্থির হইল,—কসেটকে হাতছাড়া করা হইবে না।

এদিকে ফ্যানটাইনের রোগমুক্তির কোন দ্রুতসম্ভাবনা দেখা গেল না। জ্বর প্রলাপ সমভাবেই চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম স্বেচ্ছাসেবিকাদ্বয় তাহার সেবা করিতে যেন আন্তরিক কিছু ক্ষুণ্ণই হইত। সেবা-ব্রত গ্রহণ করিলেও রমণী-চিত্তের গভীর সংস্কার তাহারা দূর করিতে পারে নাই,—তাই অন্তরের সহিত সে পতিতার সেবা তাহারা করিতে পারিত না। কিন্তু ফ্যানটাইনের বাৎসল্য রসপূর্ণ সে মাতৃহৃদয় ক্রমে ক্রমে তাহাদেরও অন্তর স্পর্শ করিল।—একদিন প্রলাপে সে বলিতেছিল—"আমি পাপী, মহাপাপী,—কিন্তু তবু ভগবান আমায় ক্ষমা করবেন, তা আমি জানি। যে দিন কসেটকে তিনি আমার বুকে ফিরিয়ে এনে দেবেন, সেইদিন জানব তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন। যতদিন আমি মন্দ ছিলাম ততদিন কসেটকে কাছে আনিনি। কেন?—তার ব্যথাভরা চোখের নীরব তিরস্কার সহ্য করতে পারব না বলে। তারই জন্য, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবার জন্যই আমি পাপে ডুবেছিলাম,—তাই ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন। যেদিন কসেট আসবে, সেদিন তাঁর আশীর্ব্বাদও সে সঙ্গে করে নিয়ে আস্বে। তার দিকে চেয়ে, তার সরল পবিত্র মুখখানি দেখে, আমার এ শরীর মন পবিত্র হয়ে যাবে। সে যে দেবদূত,—তোমরা তা জান না বুঝি, দিদি? তার মত বয়সে তাদের পাখা ত ঝরে যায় না।"—স্বেচ্ছাসেবিকাদ্বয় করুণনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

ম্যাডেলিন প্রত্যহ দুইবার করিয়া তাহার সম্বাদ লইয়া যাইতেন। প্রতিবারই ফ্যানটাইন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত—"আমার কসেট? কবে আস্বে সে? কবে তাকে দেখতে পাব?" ম্যাডেলিন উত্তর দিতেন—"শীঘ্র আস্বে, আজকালের মধ্যে এল বলে।"—অমনি ফ্যানটাইনের শীর্ণ মুখখানি আশায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

কিন্তু চিকিৎসায় ফল বড় হইতেছিল না। ফ্যানটাইনের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতেছিল। অবশেষে একদিন ডাক্তার ম্যাডেলিনকে বলিলেন—"দেখুন, এঁর মেয়েকে আর আন্তে দেরী করবেন না।"

ম্যাডেলিন শিহরিয়া উঠিলেন। তবে কি আর কোন আশা নাই?

"কি বলছিলেন ডাক্তার?"

ম্যাডেলিন অতি কষ্টে চিত্ত সংযত করিয়া, শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন——"বল্‌ছিলেন তোমার মেয়েকে শীঘ্র আন্তে। সে এলে তুমি সেরে উঠবে, তাই।"

"ঠিক কথা। দেখেছেন, ডাক্তার সাহেব ঠিক বোঝেন।—কিন্তু তাকে তারা পাঠাচ্ছে না কেন? এইবার সে আস্বে আমি ঠিক জানি।"

কিন্তু থেনেডিয়ারেরা নানা ওজর আপত্তি

তুলিতে লাগিল। কসেটের স্বাস্থ্য ভাল নয়, এ দারুণ শীতে তাহার যাওয়া অসম্ভব ; তার উপর, খুচরা খরচ হিসাবে তখনও তাহাদের অনেক পাওনা বাকী,—সে সবের হিসাবপত্র তাহারা করিতেছে, ইত্যাদি। অবশেষে ম্যাডেলিন বলিলেন—"দেখ্‌ছি, সুবিধা নয়। এখান থেকেই কাউকে পাঠাই। তেমন দেখি ত, নিজেই না হয় যাবো।" বলিয়া ফ্যানটাইনের জবানী একখানা পত্র লিখিয়া তাহাতে তাহার সহি করাইয়া লইলেন।—পত্রে শুধু এই কয়টি কথা লেখা ছিল :—"থেনেডিয়ার মহাশয়! পত্রবাহকের হাতে কসেটকে দিবেন। তিনি আপনার সমস্ত দেনাপত্র মিটাইয়া দিবেন। আমায় নমস্কার জানিবেন। ইতি—"

কিন্তু, মানুষ গড়ে দেবতায় ভাঙ্গে! সহসা কোথা হইতে অতর্কিতভাবে এক দারুণ বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। যে রহস্যাচ্ছন্ন প্রস্তরস্তূপ হইতে মানব জীবনের উদ্ভব, সে প্রস্তরখণ্ড আমরা যতই মার্জ্জিত করিনা কেন, অদৃষ্টের কাল শিরা নিয়তই তাহাতে বাহির হইতে থাকে!

(৭)

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার দু' একদিন পরে, একদিন প্রাতঃকালে ম্যাডেলিন, অফিসে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সম্বাদ দিল—"জাভার্ট সাহেব আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।"

——জাভার্ট ?—ম্যাডেলিনের মুখে একটা বিরক্তির ছায়া পড়িল,—ফ্যানটাইনের প্রতি তাহার সে ব্যবহার তিনি তখনও ভুলিতে পারেন নাই ;—বলিলেন—"আস্‌তে বল।"

ম্যাডেলিন অগ্নিকুণ্ডের দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিলেন, জাভার্ট নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে কিছু দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যাডেলিন আপনমনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

জাভার্টের তৎকালীন মুখভাবের বর্ণনা করা দুরূহ। তবে তাহার অন্তরের মধ্যে যে সম্প্রতি একটা তুমুল সংগ্রাম গিয়াছে, তাহার চিহ্ন তখনও তাহার মুখে প্রকটিত ছিল। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে মুখে তাহার অন্তরছবি সর্ব্বদাই প্রতিফলিত হইয়া থাকিত। —কি হইয়াছে তাহার ? অকৃত্রিম বিবেকী, সরল, ন্যায়নিষ্ঠ, স্পর্দ্ধী জাভার্ট, আজ দীনের ন্যায়, বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর ন্যায়, ম্যাডেলিনের নিকটে উপস্থিত কেন? একটা গভীর নৈরাশ্য, বেদনাব্যঞ্জক সঙ্কল্পের ছায়া সে মুখে পরিব্যাপ্ত কেন ?

অনেকক্ষণ পরে ম্যাডেলিন লেখনী পরিত্যাগ করিয়া তাহার দিকে ফিরিলেন।—"কি চাও, জাভার্ট ?"

জাভার্ট কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া, যেন আপনাকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইল। তারপর ব্যথিতস্বরে সবলভাবে উত্তর করিল—"হাকিম সাহেব,—একটা অন্যায় ঘটনা হয়েছে।"

"কি ঘটনা ?"

"একজন নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মানহানি করেছে।—কর্ত্তব্য ভেবে আমি তাই সে কথা আপনাকে জানাতে এসেছি।"

"কে সে কর্ম্মচারী ?"

"আমি।"

"তুমি ?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"আর, সে ম্যাজিষ্ট্রেট ?"

"আজ্ঞে, আপনি।"

ম্যাডেলিন সোজা হইয়া বসিলেন। জাভার্টের দৃষ্টি গম্ভীর; অবনতমুখে সে বলিল—"হাকিম সাহেব, আমি তাই অনুরোধ করতে এসেছি যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে আমায় কাজ থেকে বরখাস্ত করে দিন।"

ম্যাডেলিন বিস্মিত হইলেন। জাভার্ট বলিয়া চলিল—"আপনি বল্‌বেন যে আমি কর্ম্মত্যাগ পত্র ত দিতে পারি? পারি, কিন্তু সেটা আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করার যে সম্মান, আমি সে সম্মানের অধিকারী নই। আমি অপরাধী, আমার শাস্তি হওয়াই উচিত—কাজ থেকে বরখাস্ত হওয়াই আমার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি।" তারপর থামিয়া,——"সে দিন অন্যায়ভাবে আমার উপর কঠোর হয়েছিলেন, আজ ন্যায়-বিচারে সেই রকম কঠোর হোন্।"

"কি বলছ তুমি? কি অন্যায় করেছ তুমি? কি হিসাবে নিজেকে দোষী বলছ? তুমি কি কাজ থেকে অবসর দিতে চাও?"

"অবসর নিতে নয়, বরখাস্ত হতে।"

"আচ্ছা তাই না হয় হ'ল। কিন্তু, আসল ব্যাপারটা কি?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, দুঃখিত স্বরে জাভার্ট বলিল—"ঘটনা গুরুতর। মাস দেড়েক আগে সেই স্ত্রীলোকটার ঘটনার পর, আপনার উপর ভয়ানক রাগ হওয়ায় আমি আপনার নামে নালিশ করি।"

"আমার নামে?"

"আজ্ঞে হাঁ।—প্যারীর পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে।"

ম্যাডেলিন হাসিয়া বলিলেন—"কেন? ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে পুলিশের ওপর হুকুম চালিয়েছি বলে?"

"একজন পুরাণো আসামী বলে।"

ম্যাডেলিনের মুখ সহসা আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।—জাভার্ট মুখ না তুলিয়াই বলিয়া চলিল——"আমি তখন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম। অনেক দিন থেকেই আমার মনে আপনার সম্বন্ধে একটা সন্দেহ জেগেছিল। আপনার চেহারা, ফ্যাবেরোল-গ্রামে আপনার অনুসন্ধান-সম্বাদ, আপনার অসাধারণ শক্তি, বৃদ্ধ ফসিলেভান্টের ঘটনা, আপনার বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্য, আপনার অল্প খুঁড়িয়ে চলার ভাব,——এ সব দেখে আমার মনে ধারণা হয়েছিল যে আপনি নিশ্চয়ই জীন ভ্যালজিন।"

"কি বল্‌লে? কি নাম বল্‌লে?"

"জীন ভ্যালজিন। বিশ বছর আগে তুলঁতে আমি তাকে প্রথম দেখি। গ্যালি থেকে খালাস পেয়ে, শুন্‌তে পাই, সে কোন্ এক ধর্ম্মযাজকের জিনিষ পত্র চুরি করে; তারপর, হাতিয়ায় নিয়ে রাজপথে একটা ছোঁড়ার ওপর সে রাহাজানি করে। আট বৎসর ধরে তার সন্ধান চল্‌ছিল। আপনাকে আমি সেই জীন ভ্যালজিন ভেবেছিলাম।"

ম্যাডেলিন কাগজপত্রে পুনরায় মনো-নিবেশ করিতে করিতে, তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন——"কর্ত্তৃপক্ষেরা তাতে কি উত্তর দিলেন?"

"যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"তাই ?"

"আজ্ঞে তাই। ওঁদের কথাই ঠিক।"

"ভাল কথা।"

"আজ্ঞে হাঁ; কারণ আসল জীন ভ্যালজিন ধরা পড়েছে।"

সহসা কাগজপত্রগুলা ম্যাডেলিনের হস্তচ্যুত হইয়া কক্ষতলে পতিত হইল। ম্যাডেলিন স্থির দৃষ্টিতে জাভার্টের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন——"হুঁ।"

"ঘটনাটা সব শুন্‌বেন ? তবে বলি।—এইলি-লে-হট্-ক্লচার বলে, যে একটা জায়গা আছে তাঁরই কাছে ফাদার স্যাঁপম্যাথিউ বলে একটা সাদাসিদা ধরণের বুড়ো অনেকদিন থেকে বাস করত। সে বুড়ো একদিন কার এক বাগান থেকে কতকগুলা নোনা আতা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। চুরি, পাঁচিল টপ্‌কানো, গাছের ডাল ভাঙ্গা;—(হাতে একটা ডাল শুদ্ধ সে ধরা পড়ে)—কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তার ফাটকের হুকুম হয়ে গেল। দৈবের খেলা, তাই তখন সেখানকার জেলখানা সারানো হচ্ছিল বলে তাকে অ্যারাসের জেলে পাঠানো হয়। সেখানে ব্রেভেট বসে এক পুরাণো কয়েদী তাকে দেখেই বল্‌লে—'এ যে জীন ভ্যালজিন দেখ্‌ছি।' 'জীন ভ্যালজিন আবার কে ?' বলে বুড়ো তাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে। কিন্তু তা কি হয় ? পুলিশ থেকে তখন তদন্ত আরম্ভ হল। শেষে, প্রমাণ পেলে যে ত্রিশ বছর আগে সে ফ্যাবেরোলে কাঠুরিয়ার ব্যবসা করত; গ্যাল্লিতে যাবার আগে জীন ভ্যানজিনেরও সেই ব্যবসা ছিল। তার পর,—নাম। এ লোকটার দীক্ষা-নাম জীন, মায়ের বংশের নাম ম্যাথিউ; সুতরাং তার আসল নাম হল জীন ম্যাথিউ। কিন্তু কিছুদিন এ অভার্গেতে থাকে; সেখানকার লোকে 'জীন'কে 'স্যান' বলে উচ্চারণ করে;—কাজেই জীন ম্যাথিউ থেকে স্যান ম্যাথিউ সহজেই হয়; আর, তার পর তা থেকে স্যাঁপম্যাথিউ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। অবশ্য, ফ্যাবেরোলে তার বংশের কারও সন্ধান এখনো মেলে নি,—তা তাতে এমন কিছু এসে যায় না; অনেক বংশ এমন ভাবে বেমালুম লোপ পেয়ে যায়। তার পর, তুলঁ থেকে দুজন যাবজ্জীবন কয়েদী আনা হয়েছিল,—তারাও তাকে সনাক্ত করেছে। আমিও নিজে গিয়েছিলাম।"

"হুঁ"

"আমিও তাকে চিনেছি। সত্য যা, তা চিরদিনই সত্য।

ম্যাডেলিন মৃদুস্বরে বলিলেন—"ঠিক বল্‌ছ, তোমার কোন ভুল হয় নি ?"

"আজ্ঞে না।"—জাভার্ট হাসিল,—স্থির বিশ্বাসের সে হাসি।

সহসা ম্যাডেলিন বলিলেন—"আচ্ছা, সে লোকটা কি বলে ?"

"সে ? সে বড় ঝানু; সে ন্যাকা সেজে বসে আছে। অন্য কেউ হলে কত কাঁদাকাটি করত, সে যে জীনভ্যালজিন নয় তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করত; কিন্তু এ বড় ধূর্ত্ত। তাই শুধু বলে 'আমি স্যাঁপমাথিউ, আমি দোষী নই।' কারণ সে খুবই বোঝে যে তার পরিচয়-মাত্রই যা কিছু গুরু অপরাধ; পরিচয় একবার প্রমাণ হয়ে গেলে জীবনের শেষ কটা দিন গ্যালিতেই কাটবে। হুঁ' দুটো

অভিযোগ তার নামে,—এক এই চুরি; দ্বিতীয়—আট বছরের আগেকার সেই রাজপথে রাহাজানি। কিন্তু তার ন্যাকামি খাটবে না। চারজন লোকে তাকে সনাক্ত করেছে। অ্যারাসের সেসনে তার বিচার হবে,—আমারও যাবার জন্য শমন হয়েছে।"

ম্যাডেলিন পুনরায় কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; কখনও পড়িতে-ছিলেন, কখনও লিখিতেছিলেন—যেন বড় ব্যস্তসমস্ত ভাব। কিয়ৎক্ষণ পরে জাভার্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "যাক্, ও সব বিস্তারিত সম্বাদে আমার আগ্রহ নেই,—সময় নষ্ট করা মাত্র।—বলছিলাম কি, দেখ, তুমি ফলওয়ালা বুসপিয়ে বুড়ীর কাছে গিয়ে তাকে গাড়ীওয়ালা পিয়ারে চেসসেলভের নামে নালিশ করতে বলে দিয়ো। সেটা একটা পশু; বুড়ী আর তার ছেলেকে মেরে ফেলবার মত করেছিল—তার শাস্তি হওয়া দরকার।" তার পর তাহাকে অন্যান্য অনেক কার্য্যের ভার দিয়া বলিলেন—"তা এত কাজ কি তুমি এর মধ্যে করতে পারবে? ৮।১০ দিনের মধ্যেই না তুমি অ্যারাসে যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে, তারও আগে। কাল বিচার,—আমাকে আজ রাত্রের ডাকগাড়ীতেই যেতে হবে।"

ম্যাডেলিনের দেহ ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল।

"ক' দিন লাগ্‌বে?"

"বড় জোর একদিন। কাল সন্ধ্যার পরই রায় বেরুবে নিশ্চয়। তবে, আমি ততক্ষণ থাক্‌ব না। আমার সাক্ষী হয়ে গেলেই আমি চলে আস্‌বো

"আচ্ছা।" বলিয়া ম্যাডেলিন তাহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু জাভার্ট নড়িল না।

"কি চাও আর?"

"আজ্ঞে, বরখাস্তের হুকুম।"

ম্যাডেলিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলি-লেন,—"জাভার্ট, তুমি ন্যায়নিষ্ঠ আমি জানি, সেজন্য তুমি আমার সম্মানের পাত্র। অনর্থক নিজের দোষটাকে বড় বলে ভাবছ। বিশেষতঃ কথাটা ত আমাকে নিয়েই?—তুমি যে রকম কার্য্যদক্ষ, তাতে তোমার পদোন্নতি হওয়াই উচিত। আমি বল্‌ছি তুমি কাজ ছেড়ো না।"

জাভার্ট ম্যাডেলিনের প্রতি চাহিল,—তাহার অমার্জ্জিত কঠোর এবং পবিত্র অন্তরছবিখানি সে চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল। ধীর স্বরে সে বলিল "মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পার্‌লাম না।"

"দেখ, কথাটা আমার নিয়েই।—তোমার এ বিষয়ে বিচারের কোন আবশ্যকতা নেই।"

কিন্তু জাভার্টের তবু সেই এক কথা। সে বলিল—"দেখুন, আমার দোষ যে আমি অনর্থক বাড়াচ্ছি, তা নয়। সন্দেহ যে করেছিলাম সেটা কিছু নয়, আমাদের ব্যবসাই সন্দেহ করা। কিন্তু, যথার্থ প্রমাণ না পেয়ে, রাগের মুখে, শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্য, আপনাকে——একজন ভদ্রলোক হাকিম নগরাধ্যক্ষকে——একটা সামান্য তাঁবেদার মাত্র হয়ে যে একজন গ্যালীর আসামী বলে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেছি—সে অপরাধের ক্ষমা হ'তেই পারে না। আমার তাঁবেদার কেউ এ কাজ করলে তাকে কি আমি ক্ষমা

করতাম? এ ক্ষেত্রে নিজে দোষী বলেই কি আমি রেহাই পেয়ে যাব?—এ কি কথা? বিচার আমার পক্ষে একরকম, অন্যের পক্ষে আর একরকম, তা হতে পারে না! যে যত বড়ই হোক্ না কেন, অন্যায় করলেই, তাকে আর দশজনের সঙ্গে সমান ভাবে শাস্তি নিতে হবে। দয়া আমি চাইনে, সে দিনকার মত আজ আর করুণার অপব্যবহার না। আমি চাষ বাস করে খাব সেও ভাল। পুলিশ-বিভাগের মর্য্যাদারক্ষার জন্যও না হয় আমাকে তাড়িয়ে দিন——আমি সেই হুকুমেরই প্রার্থনা করছি।” জাভার্টের কণ্ঠস্বর স্থির, কতকটা নরিয়া হওয়ার মত, নম্রতাসূচক, অথচ ভিক্ষানুনয়ের ছায়ামাত্র শূন্য; তাহা যেন তাহার নিষ্ঠার জীবনে এক অদ্ভুত মহিমা আনিয়া দিতেছিল।

“আচ্ছা পরে ভেবে দেখ্‌ব।” বলিয়া ম্যাডেলিন করমর্দ্দনের জন্য তাহার দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন।

জাভার্ট চকিতে কয়েকপদ পিছাইয়া গেল।—“ক্ষমা করবেন, হাকিম হয়ে গুপ্তচরের সঙ্গে করমর্দ্দন করবেন না।” আপন মনে অস্ফুট-স্বরে বলিল—“গুপ্তচরই ত! যে মুহূর্ত্ত থেকে আমি আমার পদমর্য্যাদার অপব্যবহার করেছি সে মুহূর্ত্ত থেকেই ত আমি হীন গুপ্তচর হয়েছি।” তার পর, গভীর সম্ভ্রমের সহিত ম্যাডেলিনকে অভিবাদন করিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল। দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অবনতমুখে বলিল—“যে ক’দিন আমায় অবসর না দিচ্ছেন শুধু সেই ক’দিন আমি কাজ করব।”

জাভার্টের স্থির পদক্ষেপ শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল; ম্যাডেলিন বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

(৮)

সে দিন অপরাহ্নে ম্যাডেলিন যখন ফ্যানটাইনকে দেখিতে আসিলেন, তখন তাহার অসুখ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তবু ম্যাডেলিনকে দেখিয়া তাহার মুখে আনন্দ-লেখা ফুটিয়া উঠিল, সাগ্রহে সে সুধাইল——“কসেট?”

মৃদু হাসিয়া ম্যাডেলিন উত্তর দিলেন—“শীঘ্রই আস্‌বে।”

সেদিন অর্দ্ধঘণ্টার স্থানে পূর্ণ এক ঘণ্টাকাল তিনি সেখনে রহিলেন; এবং প্রত্যেককে ডাকিয়া, রোগিনীর যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ দিলেন। রোগিনীর অবস্থা ক্রমশই সঙ্কটাপন্ন হইতেছিল,—ডাক্তার আসিয়া একরূপ জবাবই দিয়া গেলেন। ম্যাডেলিন, স্তব্ধ গম্ভীরভাবে কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বিদায় লইলেন।

সেখান হইতে বরাবর অফিসে আসিয়া ফ্রান্সের পথ ঘাটের মানচিত্রখানা লইয়া একখানা কাগজে কি টুকিয়া লইয়া, ম্যাডেলিন একটা নির্জ্জন সোজ পথ ধরিয়া নগরের অপর-প্রান্ত অভিমুখে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। পথে, ধর্ম্মযাজকের বাটি; তাহা অতিক্রম করিয়া কতকদূর অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া তার সদর দরজার কড়াটা ধরিয়া একবার দাঁড়াইলেন; তারপর কয়েকমুহূর্ত্ত ধরিয়া কি ভাবিলেন; অবশেষে, ধীরে ধীরে সেটাকে ত্যাগ করিয়া, চিন্তান্বিত মুখে পুনরায়

আপনার গন্তব্যস্থল স্কফ্লেয়ারের বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

স্কফ্লেয়ার ঘোড়া এবং আবশ্যক হইলে যানাদিও ভাড়া দিত। সে তখন বাড়ীতেই ছিল,—একটা ঘোড়ার সাজ মেরামত করিতেছিল। ম্যাডেলিন বলিলেন——"দেখ, তোমার ভাল ঘোড়া আছে ?"

"ভাল ঘোড়া ? আমার সব ঘোড়াই ভাল। কি রকম চান আপনি ?"

"একদিনে ২০ লিগ পথ চল্‌তে পারে ?"

"গাড়ী নিয়ে ?"

"হাঁ" বলিয়া ম্যাডেলিন সেই কাগজখানা বাহির করিয়া বলিলেন "৫, ৬, ৮॥—একুনে কুড়িই ধর। আছে এমন ঘোড়া ?"

"আছে। আমার সাদা ঘোড়াটা আট ঘণ্টায় পৌঁছে দিতে পারবে। কিন্তু ভারী গাড়ী চলবে না। আমার খোলা টম্‌টম্ খানা নিতে হবে। রোজ ত্রিশ ফ্রাঙ্ক ভাড়া লাগবে কিন্তু তাতে।"

"এই নাও ছদিনের আগাম ভাড়া।" বলিয়া ছুইটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার হাতে দিয়া ম্যাডেলিন উঠিলেন।—"কিন্তু আজ রাত্রি ৪॥ টার সময় যেন আমার বাড়ীর দরজায় গাড়ী ঘোড়া হাজির থাকে।" তারপর কি ভাবিয়া বলিলেন—"তোমার গাড়ী ঘোড়ার দাম কত হবে ?"

"কেন, আপনি কিন্‌তে চান ?"

"না, তা নয় ; তবে, দামটা আমি দিয়ে রাখতে চাই। না হয় ফিরে এসে আবার টাকাটা ফিরিয়ে নেবো।"

"পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক।"

"এই নাও।" বলিয়া একখানা নোট তাহার হাতে দিয়া ম্যাডেলিন সে স্থান ত্যাগ করিলেন।—বেচারা স্কফ্লেয়ার আপশোষ করিতে লাগিল ১০০০ ফ্রাঙ্ক সে কেন বলে নাই ?

ফিরিবার সময় ম্যাডেলিন, একটু ঘুরিয়াই, বড় রাস্তা দিয়া আসিলেন ;—ধর্ম্মযাজকের আবাসে বুঝি তাঁর কিসের প্রলোভন ছিল।

খাতাঞ্চির কক্ষ ম্যাডেলিনের কক্ষের ঠিক নীচে। মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।—উপরের কক্ষে কে যেন পাদচারণা করিতেছে! ধীরভাবে কতক্ষণ ধরিয়া সে শুনিল—সে পদক্ষেপ ম্যাডেলিনের। কিয়ৎক্ষণ পরে যেন আলমারি খোলার শব্দ হইল, কি যেন একটা জিনিষ কে স্থানান্তরিত করিল,—তারপর পুনরায় সে পাদচারণা আরম্ভ হইল।—সে রাত্রে আরও ছুইবার তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় ; প্রতিবারই উপরের কক্ষে সেই ধীর স্থির পাদচারণা তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতে লাগিল।

(৯)

ম্যাডেলিনই যে জীনভ্যালজিন, সে কথা বোধ হয় আর পাঠক পাঠিকাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

পূর্ব্বে একবার তাহার অন্তর-প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়াছি, আজ এই পরিচ্ছেদে আর একবার করিব।—মানব-জীবন চিরদিনই দুর্ভেদ্য রহস্যাচ্ছন্ন। ইহা অপেক্ষা ভীষণ, জটিল, রহস্যময়, সীমাতীত বুঝি আর কিছু নাই ;—মানবের কল্পনায় আর কিছু আসিতেও পারে না। সমুদ্রের অপেক্ষা রহস্যময় একটা জিনিষ আছে—তাহা নভোমণ্ডল ; এবং তদপেক্ষাও অদ্ভূত রহস্যাচ্ছন্ন আর একটা জিনিস আছে,—তাহা মানবের আত্মা, অন্তরতম প্রকৃতি।

যে কোন মানব—হউক সে মহান্, হউক সে পিশাচতুল্য—তাহার যথার্থ অন্তরতম প্রকৃতি লইয়া যদি কখন কেহ এক সম্পূর্ণ কাব্য লিখিতে পারে,—তাহা হইলে সে কাব্যের কাছে জগতের আর সকল কাব্যকেই ম্লান হইয়া পড়িতে হইবে। মরীচিকার ছলনা, লালসা-প্রলোভনের ক্ষেত্র, কামনা-বাসনার অগ্নিকুণ্ড, দৈন্য পরাজয়ের গুহান্তরাল, অবিশ্বাসের অট্টহাস, রিপু-দানবের সংগ্রাম-ক্ষেত্র——এই না মানবের অন্তর? বাহিরের কৃত্রিম শান্তির অন্তরালে কি সে অশান্তির তীব্র কশাঘাত! হোমর-বর্ণিত রাক্ষসের সংগ্রাম; মিল্টনের পিশাচগণের মেলা, ছায়াবাজীর খেলা; দান্তের নরকচিত্র;—সবই তাহাতে একাধারে বর্ত্তমান। কি সে অন্ধকার মানবের অসীমত্বকে ছাইয়া আছে! তাই মানব, অসীমত্বের মাপকাঠি লইয়া বিচার করিতে গিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে বসে—কোথায় তাহার ইচ্ছাশক্তি, কতটুকু বা তার কার্য্যশক্তি!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছোকরা জারভিসের সহিত সে ঘটনার পর সহসা জীনের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে,—বুঝি সেটা শুধু পরিবর্ত্তন নয়—সে যেন নবজীবনের চেতনা। বিশপের আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছিল।

ডি—হইতে পলাইয়া আসিয়া, রূপার বাতিদান দুইটা বাদে অন্যান্য বাসনগুলা বিক্রয় করিয়া সে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে; তারপর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ঘুরিয়া অবশেষে ম—তে আসিয়া পৌঁছায়। তাহার পরবর্ত্তী ইতিহাস আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে জানিয়াছি।

ম—তে আসিয়া আশায় বিশ্বাসে শান্তিতে ম্যাডেলিন কাল কাটাইতেছিলেন। দুইটি মাত্র তাঁহার লক্ষ্য ছিল;—আত্মগোপন এবং পবিত্রভাবে জীবন-যাপন; মানুষ হইতে দূরে থাকা, এবং ভগবানের চরণে ফিরিয়া যাওয়া। সে দুইটি একই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, ওতঃপ্রোতভাবে তাঁহার সমস্ত জীবন, কার্য্য এবং চিন্তা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তবে, সময়ে সময়ে তাহাতে বিরোধ বাধিত।—বিশপ-প্রদত্ত বাতিদান-রক্ষণে, তাঁহার মৃত্যুতে শোকচিহ্ন-ধারণে, হা-ঘরে বালকদিগের প্রতি প্রশ্নে, ফ্যাবেরোল পল্লীতে পুরাতন বংশীয়দের অনুসন্ধানে, জাভার্টের তীব্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সত্ত্বেও বৃদ্ধ ফসিলেভাণ্টের উদ্ধার-সাধনে,—দুইদিক তাঁহার রক্ষা হয় নাই। সে সব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যই তাঁহার বলবান হইত,—সে সব সময়ে তিনি ভাবিতেন তাঁহার প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য—অপরের প্রতি, নিজের স্বার্থ-রক্ষা নয়।

কিন্তু আজিকার এ পরীক্ষার ন্যায় ভীষণ পরীক্ষায় ম্যাডেলিন ইতিপূর্ব্বে পড়েন নাই! স্বার্থ-পরার্থের জীবন মৃত্যুর এ কি ভীষণ সংগ্রাম! প্রথম যখন জাভার্টের মুখে তাঁহার বহুকাল বিস্মৃত পুরাতন নাম উচ্চারিত হইতে শুনিলেন, তখন প্রথমটা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তিনি বিকল হইয়া পড়িলেন,—অদৃষ্ট যেন পরিহাস করিয়া তাঁহার শ্রবণে পৈশাচিক অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তার পর, একটা ভীষণ আঘাতের পূর্ব্ব সূচনার ন্যায় তাঁহার দেহ একবার কম্পিত হইয়া উঠিল। ভীষণ ঝটিকার পূর্ব্বে মহীরুহ যেরূপ আনত হইয়া থাকে, তাঁহারও অবস্থা সেইরূপ ঘটিল।

তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বজ্রগর্ভ রাশি রাশি মেঘ একত্রিত হইয়া প্রলয়ের পূর্ব্বসূচনা করিতেছিল। একবার তাঁহার মনে হইল,—তখনি ছুটিয়া গিয়া, আপনার পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিয়া, নিরীহ বৃদ্ধকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া, নিজে তাহার স্থলে গিয়া দাঁড়ান। কিন্তু সে চিন্তা তীব্র সূচীবেধের ন্যায় সহসা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল; অমনি তিনি ভাবিলেন—"ভাল, দেখাই যাক না, কতদূরে গিয়ে দাঁড়ায়?" অবশ্য বিশপের সে অপূর্ব্ব করুণার পর, এত বর্ষের অনুতাপ এবং আত্মত্যাগের পর, যদি ম্যাডেলিন এ ভীষণ পরীক্ষার দিনে পশ্চাৎপদ না হইয়া, এ করালবদনবিস্তারী আকস্মিক বিপদের মুখে আপনাকে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলেই বুঝি তাঁহার জীবন সার্থক হইত। কিন্তু আমরা কাল্পনিক নহি, বাস্তবজীবনে যাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি মাত্র।

সর্ব্বপ্রথমে আত্মসংরক্ষণের ভাবটাই তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। জাভার্টের উপস্থিতি স্মরণ করিয়া, দারুণ ভীতিতে চকিতে চিত্ত স্থির করিয়া লইয়া, তিনি আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইলেন।

সমস্ত দিন তাঁহার সেই 'বাহিরে প্রশান্তি তার অন্তরে আগুণ' ভাবে কাটিল। আত্মরক্ষার জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন চলিতেছিল। একটা নিদারুণ আঘাতের অনুভূতি ব্যতীত অপর কিছু বুঝিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় দৈনিক কার্য্যাদি করিয়া গেলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, কি জানি যদি আরাসে যাইতে হয়, তাই স্কফ্লেয়ারের কাছে গিয়া ঘোটকের এবং যানের বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন।

কিন্তু কোন একটা স্থির সঙ্কল্প তখনও তাঁহার ছিল না।—যাই হউক, স্বেচ্ছাসেবিকাদ্বয়ের হস্তে ফ্যানটাইনের সমস্ত ভার দিয়া, এবং যানাদির ব্যবস্থা করিয়া, আকস্মিক যে-কোন ঘটনার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

কি অদ্ভুত এ ঘটনা! ম্যাডেলিন তাড়াতাড়ি উঠিয়া কক্ষের অর্গল দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলেন। বাহির হইতে হঠাৎ কেহ যেন তাঁহার উপর না আসিয়া পড়ে!—মুহূর্ত্ত পরে বাতিটাও নিভাইয়া দিলেন। যদি কেহ সে আলোতে তাঁহাকে দেখিতে পায়?

কে আসিবে? কে দেখিবে? হায় ম্যাডেলিন! যাহাকে বাহির করিবার জন্য অর্গল বন্ধ করিলে, যাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দীপ নির্ব্বাপিত করিলে—তাহাকে ত দূরে রাখিতে পারিলে না। সে যে অন্তরেই রহিয়া গেল! সে যে তোমার বিবেক—স্বয়ং ভগবান!

প্রথমটা কিন্তু ম্যাডেলিন আপনাকে নিশ্চিন্ত মনে করিলেন। অন্ধকারে টেবিলের উপর কনুয়ের ভর দিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"কোথায় আমি? এ কি স্বপ্ন নয়, সত্য?—জাভার্ট এ কি সম্বাদ আনিয়া দিল? কি এর পরিণাম?"—তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে কিছুরই ধারণা হইতেছিল না। চিন্তারাশি স্রোতের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—ম্যাডেলিন দুইহস্ত দিয়া

ললাট দেশ চাপিয়া ধরিয়া বিফল প্রয়াসে তাহাদের গতি রোধ করিতে চাহিতেছিলেন।—সমস্ত মস্তিষ্ক ব্যাপিয়া লেলিহ অগ্নিশিখা উঠিতেছিল। কি তীব্র তাপ তার! ম্যাডেলিন উঠিয়া বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিলেন;—আকাশে তারার চিহ্নমাত্র নাই! ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পূর্ণ একঘণ্টাকাল এইরূপে কাটিল।

তারপর ধীরে ধীরে, সে ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া দু'একটি রেখা-চিত্র ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ম্যাডেলিন আপন অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিলেন।

তাঁহার এই কয়বৎসরের কার্য্যাবলির নৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিলে, এতদিন ধরিয়া তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন—তাহা আত্ম-নাম-গোপনের উদ্দেশ্যে শুধু গহ্বর-খননের ন্যায়ই বুঝি ব্যর্থ হইয়াছে! বিনিদ্ররজনীতে আত্ম-চিন্তার মধ্যে একটিমাত্র চিন্তাতেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন—পাছে কখনো পুনরায় সে নাম তাঁহার কর্ণে পশে! সে দিন বুঝি তাঁহার সকল আশা-ভরসা, কার্য্য-চিন্তা, এবং এ নূতন জীবনের অবসান ঘটিবে!—আজ ত সে মুহূর্ত্ত আসিয়াছে,—কিন্তু চিন্তার অতীত, কল্পনারও অতীতভাবে! এ যে তাঁহার নূতন জীবনের ভিত্তি দৃঢ়তর করিতেই চায়, রহস্যকে আরও গভীর করিয়াই তোলে! দশের শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান বৃদ্ধিই করিয়া দিতে চায়!—এ কি ঘটনার রহস্যলীলা!

ম্যাডেলিনের দৃষ্টিপথ হইতে ক্রমশই কুয়াসা অপসৃত হইতেছিল। যেন এইমাত্র তিনি কোন অদ্ভুত স্বপ্নে মগ্ন ছিলেন,—যেন গভীর রজনীতে এক অতলস্পর্শী গহ্বরের কাছে তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছেন,—আর দূরে, অন্ধকারে, অপর একজন লোককে, তাঁহাকে মনে করিয়া, অদৃষ্ট, সেই গহ্বরের মুখে টানিয়া আনিতেছে।—একজনকে সে গহ্বরে আপতিত হইতেই হইবে—হয় তাঁহাকে নয় তাকে; নহিলে সে গহ্বর তৃপ্ত হইবে না! তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; অদৃষ্টের গতিরোধ করিবার শক্তি যেন তাঁহার ছিল না।

কুয়াসা-জাল এতক্ষণে সহসা অপসৃত হইয়া গেল। ম্যাডেলিন মানসচক্ষে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন গ্যালিতে তাঁহার স্থান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, ছোকরা জারভিসের উপর সে অত্যাচার যেন জীবন্ত হইয়া প্রতি-শোধ বাসনার সে শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই টানিতেছে—তাহা হইতে পরিত্রাণের আর উপায় নাই, তাঁহাকে সেখানে না লইয়া সে কিছুতেই তৃপ্ত হইবে না!—কিন্তু সে স্থান পূর্ণ করিবার জন্য আর এক হতভাগ্য ত আসিয়া জুটিয়াছে। তবে, আর কেন সে শঙ্কা? বর্ত্তমান তাঁহার কে নষ্ট করিতে পারে? থাক্ না ভবিষ্যতে সাঁপম্যাথু তাঁহার নাম লইয়া গ্যালীর কারাগারে?—কিন্তু,—নির্দ্দোষীর শিরে কলঙ্কের ছাপ একবার পড়িলে সে ত আর ঘুচিবে না! ম্যাডেলিন শিহরিয়া উঠিলেন। একটা আনন্দ, একটা গভীর আক্ষেপ, একটা পরিহাসের যন্ত্রণায় তাঁহার দেহ-মন যুগপৎ প্রবলবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল!—ত্রস্তে তিনি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

মহাভারতের কাল-নির্ণয়

শাকটায়ন যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণ তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। পাণিনি নিজ সূত্রে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন; যথা "লঙঃ শাকটায়নস্য" (৩.৪।১১১ পাঃ ২৪৬৩ সিঃ) শাকটায়নের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। শাকটায়নই যে পাণিনির আদর্শ তাহা উভয় ব্যাকরণ মিলাইলে বুঝা যায়। পাণিনি শাকটায়নের অনেক সূত্র যথাযথ লইয়াছেন, অনেক সূত্র ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্‌যথা—"উরূত্তরপদাদৌ পম্যে" "অভিনিবিশশ্চঃ" "সপ্তমী শৌণ্ডাদিভিঃ" প্রভৃতি শাকটায়ন সূত্র বিনা পরিবর্ত্তনে পাণিনি কর্ত্তৃক গৃহীত। "পথ্যতিথিবসতিস্বপতের্ঢণ্" "পাত্রাধ্মাস্থাম্নাদাণ্দৃশ্যর্ত্তি শ্রৌতিধিঘ্ কৃণ্বশদসদঃ পিবজিঘ্রধমতিষ্ঠমনযচ্ছপশ্যর্চ স্থধিক্ষশীয়সীদম্" প্রভৃতি শাকটায়নের সূত্র পাণিনি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। শাকটায়ন "যুধিগবেষ্টিরঃ" (২।২।১৫৬) দ্বারা যুধিষ্টির গবিষ্টির শব্দ সাধিয়াছেন। "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুঞ্" (৩।১।১৯৪) সূত্রে তিনি বাসুদেব এবং বাসুদেব-সখা নরঋষির অবতার উপাস্য অর্জ্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন। "দ্রোণ পর্ব্বতজীবন্তাদ্বা (২।৪।৩৭) সূত্রে দ্রোণ এবং দ্রৌণীর; "গান্ধারিশাল্বেয়াভ্যাম্" (২।৪।৯৯) সূত্রে গান্ধারী ও গান্ধারের, শাল্ব ও শাল্বেয়ের এবং "কুন্ত্যবন্তেঃ স্ত্রিয়াম্" (২।৪।১০৫) সূত্রে কুন্তী ও অবন্তির উল্লেখ করিয়াছেন। "গোত্রে বাহ্বাদিভ্যঃ" (২।৪।২২) সূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পাণিনি বাহ্বাদিগণের সঙ্কেত শাকটায়নের নিকট পান। ঐ বাহ্বাদিগণে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, প্রদ্যুম্ন, গদ, শাম্ব প্রভৃতি যদুবীর ও কুরুবীরের নাম আছে। শাকটায়ন ব্যাসদেবের নাম "সুধাতৃব্যাসবরুটনিষাদচণ্ডাল-বিম্বস্যাকঙ চ" সূত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাসের পুত্র বৈয়াসকি বলায় শুকদেবেরও নাম ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। "শিলালিপারাশর্য্যা-ন্নটভিক্ষু" (৩।১।১১৭) সূত্রে প্রকাশ যে পারাশর্য্য শাকটায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী। ঐ পারাশর্য্য কৌথুম পারাশর্য্যই হইবেন। তাহা হইলে ব্যাসদেব শাকটায়ন অপেক্ষা বহু প্রাচীন। "পৈলাদ-বিপ্রাৎ (২।৪।১২৫) সূত্রে প্রকাশ যে শাকটায়ন পৈল নামে বিপ্র বা ব্রাহ্মণের বিষয় জানিতেন। ঐ পৈল ব্যাসশিষ্য পৈল কি না এই বিষয় প্রত্ন-কাম মহাশয়দের বিচারে দিলাম। শাকটায়নও বৈশম্পায়নের নাম করিয়াছেন। "কঠাদিভ্যশ্ছ গ্ বেদে" এই সূত্রের কঠ বৈশম্পায়নের শিষ্য বলিয়া বোধ হয়। আর পল্লবিত করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে ব্যাসদেব ও তাঁহার বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদি শাকটায়ন অপেক্ষা বহু প্রাচীন। শাকটায়নের কাল নিরাকরণ করা কঠিন। তিনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পারাশর্য্যাদির পরবর্ত্তী এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। তিনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় অন্ততঃ ৩০০০ বৎসরের প্রাচীন।

বঙ্কিমচন্দ্র মতে মহাভারতের কাল।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে দেখাইয়াছেন যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ ছান্দোগ্যোপনিষদেও আছে; যথা—

"অসিতঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণশংসিতমসীতি"।

অনুবাদ—অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। তিনি পিপাসাশূন্যও হইলেন, তিনি অন্তিম কালে এই তিনটি কথা অবলম্বন করিবেন তুমি অক্ষত হইতেছ, তুমি অচ্যুত হইতেছ; তুমি প্রাণশংসিত হইতেছ।

বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক। কিন্তু ইহা হইতে কাল নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা বাহুল্যভয়ে বিচারে নিরস্ত হইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র যে ঋগ্বেদের অষ্টমমণ্ডলের ৮৫।৮৬।৮৭ সূক্তের ও দশম মণ্ডলের ৪২।৪৩।৪৪ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণের সহিত বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত কৃষ্ণের ঐক্যস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা প্রৌঢ়িবাদমাত্র।

মহাভারতের কাল ও ঐতিহাসিকতা লইয়া বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, মহাভারতের কাল সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টজন্মের ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে হয়। বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে ও উত্তরায়ণের ক্রান্তিপাত গণনা দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ২৪ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে তিনি এইরূপ পাঠ করিয়াছেন যে—

যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥

ইহার অর্থ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেচন পর্য্যন্ত এক সহস্র পঞ্চদশবর্ষ জানিবে।

নন্দগণ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল পুরাণে লেখা আছে। সুতরাং বঙ্কিম বাবু গণনা করিয়াছেন যে, পরীক্ষিতের জন্মের ১১১৫ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে রাজা হন তিনি ধরিয়াছেন। অতএব যুধিষ্ঠিরকে তিনি খৃষ্টের ৩১৫ + ১১১৫ = ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বের রাজা ধরিয়াছেন। উত্তরায়ণের ক্রান্তিপাত গণনা দ্বারাও তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ক্রান্তিপাত ৪৪ অংশে ৪ কলা হইলে খৃষ্ট জন্মের ১২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে ও ৪৮ অংশ পুরা হইলে ১৫৩০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের উত্তরায়ণ হয়। এই গণনায় তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে ভীষ্মের সময় ১লা মাঘই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ মহাভারতে নাই। সুতরাং তাঁহার গণনা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পুরাণের যে প্রমাণ তিনি দিয়াছেন তাহাও অভ্রান্ত নহে। পুরাণাদিতে ভবিষ্য মগধবংশ সবিস্তর দেওয়া আছে। ঐ বংশাবলীতে নৃপতিগণের নামের অল্পবিস্তর অনৈক্য থাকিলেও সকল পুরাণেরই মত যে বার্হদ্রথ রাজগণ ১০০০ বৎসর, প্রদ্যোতগণ ১৩৮ বৎসর ও নাগগণ ৩৬২ বৎসর মোট ১৫০০ বৎসর সোমাপি হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত লাগে। বিষ্ণুপুরাণেও এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং সেই বিষ্ণুপুরাণ আবার কখনও বলিতে পারে না যে, সোমাপি হইতে মহানন্দী

পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর যায়। সহদেব মহাভারতযুদ্ধে নিপতিত হন। পরীক্ষিৎ মহাভারতযুদ্ধকালে গর্ভস্থ। অতএব পরীক্ষিতের জন্ম ও সহদেব-পুত্র সোমাপির রাজ্যাভিষেক একই বৎসর হয়। সোমাপি হইতে নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত ১৫১০ বৎসর হইলে পরীক্ষিত জন্ম হইতে নন্দাভিষেচন ১৫০০ বৎসর হইবে। সুতরাং পরীক্ষিতের জন্ম এবং নন্দাভিষেক এতদুভয়ের ব্যবধানে বিষ্ণুপুরাণের মতে ১৫০০ বৎসর হওয়া উচিত। এজন্য বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোক বঙ্কিমবাবু তুলিয়াছেন তাহাতে নিশ্চয়ই কোন ভ্রম আছে। একটু প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে লিপিকর মহাশয় গোল বাধাইয়াছেন। "পঞ্চশতোত্তরম্" স্থলে তিনি পঞ্চদশোত্তরম্ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুও বার্হদ্রথবংশ, প্রদ্যোতবংশ ও নাগবংশের জন্মকাল সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে যাহা বলা হইয়াছে তাহা গণনা না করিয়া লিপিকর মহাশয়ের অনুসরণ করায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের মতে বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ২৪ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকের পাঠ এইরূপ হওয়া উচিত

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্॥

তাহা হইলে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেচন পর্য্যন্ত ১৫০০ বৎসর এই প্রারম্ভের উক্তির শেষের গণনার সহিত সামঞ্জস্য হয়।

মৎস্যপুরাণেও অনুরূপ-সংগ্রহ-শ্লোকে লিপিকর-প্রমাদ ঘটিয়াছে, উহাতে যে পঞ্চাশদুত্তরম্ আছে তাহা পঞ্চশতোত্তরম্ হইবে। তাহা না হইলে মৎস্যপুরাণে বার্হদ্রথ বংশেরও পরবর্ত্তী দুই বংশের যে ১৫০০ বৎসর কাল দেওয়া হইয়াছে তাহাও মিলিবে না। বঙ্কিমবাবু মৎস্যপুরাণের পঞ্চাশদুত্তরম্ ও বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চদশোত্তরম্ মিলাইতে না পারিয়াই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কাল দুই পুরাণে দেওয়া হইয়াছে বলিয়াছেন।

রাজপুতকাহিনীর মত।

রাজপুতানার অমুবংশগ্রন্থাবলীমতে যুধিষ্ঠিরাদির কাল ৫২৯০ বৎসর। রাজপুতানার রাজতরঙ্গিণীতে যুধিষ্ঠিরের প্রপৌত্র হইতে রাজপাল পর্য্যন্ত চারিটী শাখায় ৬৬ (ষট্‌ষষ্টি) জন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হন লেখা আছে। তাহাদের নামও ধারাবাহিকক্রমে দেওয়া আছে। পরীক্ষিৎ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৮ পুরুষ পুরাণেরই মতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নাম সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অনৈক্য থাকিলেও মোটের উপর সামঞ্জস্য আছে। ক্ষেমকই অর্জ্জুনের বংশের শেষ নৃপতি পরে ইন্দ্রপ্রস্থসিংহাসন বিসার্য্যের বংশে যায়। তাঁহারা ১৪ (চতুর্দ্দশ) জন। তৎপরে মহারাজের বংশ ঐ সিংহাসন পান। এই তৃতীয় বংশে ১৫ (পঞ্চদশ) জনমাত্র রাজত্ব করেন। চতুর্থ বংশের আদি পুরুষ ধুধসেন। ইহাদের ৯ (নব) জনমাত্র রাজা হন। রাজপাল ইঁহাদের শেষ রাজা। রাজতরঙ্গিণীকার পরীক্ষিৎ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত ১৮৬৪ বৎসর এবং বিসার্য্য-বংশের রাজ্যকাল ৫০০ বৎসর দিয়াছেন। পরীক্ষিৎ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত পুরাণে ১৫০০ বৎসর আছে। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীকারের কাল আমরা লইতে পারি না, যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত যে ১০০ জন রাজা ইন্দ্রপ্রস্থের

সিংহাসনে বসিয়াছিলেন সে বিষয় চৌহান প্রভৃতি বহু রাজপুত-জাতির বংশাবলি-গ্রন্থে প্রকাশ। ঐ ১০০ জনে ৪৮৪০ বৎসর গত হইয়াছিল বলিয়া রাজপুত-ইতিহাসকারগণ লিখিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের সময় সম্বন্ধে গোল নাই। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরাদি ৪১০০+১২৯০=৫২৯০ বৎসরের প্রাচীন। অবশ্য এই গণনার সহিত কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণীর বা পুরাণের গণনার ঐক্য নাই। তাহা পরে দেখান হইয়াছে।

Todd সাহেবের মত।

Todd সাহেবের মতে যুধিষ্ঠিরের কাল ২২৫০+১২০০=৩৪৫০ বর্ষ। Todd সাহেব বিশ্বাস করেন যে যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত ১০০ জন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি রাজপুত ইতিহাসকারগণের কাল অতিরঞ্জিত বিবেচনা করেন, কারণ তাহা হইলে প্রত্যেক পুরুষের রাজ্যকাল ৪০ বৎসর হিসাবে হয়, তাহা এক রূপ অসম্ভব। তিনি মিবারের ৩৪ জন রাজার, মাড়োয়ারের ২৮ জন রাজার, অম্বরের ২৯ জন রাজার, যশল্মীরের ২৮ জন রাজার রাজ্যকাল পর্য্যালোচনা করিয়া গড়ে প্রতি পুরুষে ২২ বর্ষ করিয়া রাজ্যকাল পাওয়ায় যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত ১০০ পুরুষে ২২৫০ বৎসর গড় ধরিয়াছেন। এই গণনা কাল্পনিক তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতেও যুধিষ্ঠির ৩৪৫০ বৎসরের প্রাচীন হন।

কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণীর মত।

কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণী-মতে যুধিষ্ঠিরাদির কাল ৪৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে। কহ্লন মতে যুধিষ্ঠিরাদি কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে আবির্ভূত হন। এক্ষণে কলির ৫০১৩ অব্দ চলিতেছে, সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদি কহ্লন মতে ৫০১৩−৬৫৩=৪৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মেন। কহ্লনের ঐ কালগণনা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে আছে—

শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভুবম্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥ ৫১
লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাত্যধিকং যাতং সহস্রপরিবৎসরাঃ ॥ ৫২
প্রায়স্তৃতীয় গোনর্দ্দাৎ আরভ্য শরদাং তদা।
দ্বে সহস্রে গতে ত্রিংশদধিকং চ শতত্রয়ম্ ॥ ৫৩
বর্ষাণাং দ্বাদশশতী ষষ্টিঃ ষড়্‌ভিশ্চ সংযুতা।
ভূভুজাং কালসংখ্যায়াং তদ্ দ্বাপঞ্চাশতো মতা ॥

কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ অবতীর্ণ হন। সম্প্রতি শককালের ১০৯৪ বৎসর গত হইয়াছে, তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে যে দ্বিপঞ্চাশৎ নৃপতি হইয়াছেন তাঁহাদের কাল দুই সহস্র তিনশত ত্রিংশৎ এবং দ্বাদশ শত ষট্‌ষষ্টি অর্থাৎ মোট ৩৫৯৬ বৎসর। কহ্লন নিজ বয়স যে ১০৯৪ শক দিয়াছেন তাহা সকলেই বিশ্বাস করেন। এক্ষণে ১৮৩৩ শক, সুতরাং কহ্লনের পর ১৮৩৩—১০৯৪=৭৩৯ বৎসর চলিতেছে। কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণী যখন কাশ্মীরের ইতিহাস এবং যখন কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত নিয়মিতরূপে ধারাবাহিক রূপে লিখিত হইয়াছে, তখন কাশ্মীরের রাজবংশের কাল-নির্ণয় ঐ ইতিহাসে যাহা আছে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। সুতরাং তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে কহ্লনের কাল পর্য্যন্ত যে কাশ্মীরের সিংহাসনে ৫২ জন রাজা বসিয়াছিলেন এবং

তাঁহারা যে মোট ৩৫৯৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা কথা নহে। কহ্লনের পর ৭৩৮ বৎসর গত হওয়ায় তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে ৩৫৯৬+৭৩৮=৪৩৩৪ বর্ষ গত হইয়াছে বলিতেই হইবে। কাশ্মীর-রাজতরঙ্গিণীতে দেখিতে পাই যে ঐ গোনর্দ্দের পিতা দামোদর ও পিতামহ অপর এক গোনর্দ্দ ছিলেন। সেই দ্বিতীয় গোনর্দ্দই যুধিষ্ঠিরের সমকালীন বলিয়া ঐ ইতিহাসে প্রকাশ। দ্বিতীয় গোনর্দ্দ শক নরপতির ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন ঐ ইতিহাসে বলা আছে। সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বের ২৫২৬+১৮৩৩=৪৩৫৯ বৎসর পূর্ব্বে পড়ে। ইহার সহিত তৃতীয় গোনর্দ্দের কালের কোন অনৈক্য নাই। সুতরাং প্রথম গোনর্দ্দ ৪৩৫৮ বর্ষ পূর্ব্বের লোক বলিতে পারি। যুধিষ্ঠির তাঁহার সমসাময়িক, কাশ্মীরের এই প্রবাদ সত্য হইলে যুধিষ্ঠিরও ৪৩৫৯ বৎসর পূর্ব্বের ব্যক্তি। বর্ত্তমানে কলির ৫০১২ বৎসর গত হইয়াছে বলিতেই হইবে। তাহা হইলে ৫০১২—৪৩৫৯ অর্থাৎ ৬৫৩ বৎসর কলির গত হইলে যুধিষ্ঠিরাদি হন বুঝিতে পারি। তাই কহ্লন যুধিষ্ঠিরাদি কলির ৬৫৩ বৎসর পরে হন বলিয়াছেন। এই গণনায় জ্যোতির্ব্বিদগণেরও সংবাদ আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা দেখান হইল না। মহাভারত যুধিষ্ঠিরের সময় প্রচারিত না হইলেও জনমেজয়ের সময় প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনমেজয়ের দানপত্র হইতে জানা যায় যে জনমেজয় ৮৯ যুধিষ্ঠিরাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং মহাভারত-প্রচারের কাল কাশ্মীর-তরঙ্গিণী মতে ৪৩০০ বৎসর বলিতে পারি।

পুরাণমতে যুধিষ্ঠিরাদির কাল।

এক্ষণে পুরাণমতে যুধিষ্ঠিরাদি কাল কত হয় দেখা যাউক। পরীক্ষিতের বংশাবলী বিষ্ণু-পুরাণে এইরূপ দেওয়া আছে।

২২। বৃহৎক্রম
|
২৩। বসুদান
|
২৪। শতানীক
|
২৫। উদয়ন
|
২৬। মহীনর
|
২৭। দণ্ডপাণি
|
২৮। নিরমিত্র
|
২৯। ক্ষেমক

বিষ্ণুপুরাণে মগধবংশ

বিষ্ণুপুরাণে মগধবংশ এইরূপ দেওয়া আছে।

১। জরাসন্ধ
|
২। সহদেব
|
৩। সোমাপি
|
৪। শ্রুতবান্
|
৫। অযুতায়ু
|
৬। নিরমিত্র
|
৭। সুক্ষত্র
|
৮। বৃহৎকর্ম্মা
|
৯। সেনাজিৎ
|
১০। শ্রুতঞ্জয়
|
১১। বিপ্র
|
১২। শুচি
|
১৩। ক্ষেম্য
|
১৪। সুব্রত
|
১৫। সুশ্রম
|
১৬। দৃঢ়সেন
|
১৭। সুমতি
|
১৮। সুবল
|
১৯। সুনীত
|
২০। সত্যজিৎ
|
২১। বিশ্বজিৎ
|
২২। রিপুঞ্জয়

এই বংশাবলীর নাম সম্বন্ধে পুরাণগুলির মধ্যে কিছু অনৈক্য এবং ইহাদের সংখ্যা সংগ্রহশ্লোকে ৩২ জন থাকিলেও সকল পুরাণের মত যে, সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বার্হদ্রথ নৃপগণ মোট ১০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু ও মৎস্য পুরাণে আবার উহাদের প্রত্যেকের রাজ্যকাল দেওয়া আছে। ঐ রাজ্যকাল ঠিক দিলে ৮৪২ বৎসর হয় বটে। কিন্তু সংগ্রহশ্লোকে ১০০০ বৎসর থাকায় নিশ্চয়ই ১২ জন রাজার নাম ও রাজ্যকাল লিপিকর-প্রমাদে বর্ত্তমান পুরাণাদির সংস্করণে লুপ্ত হইয়াছে। মোট বার্হদ্রথ নৃপ-গণের ১০০০ বৎসর রাজ্যকাল অবিশ্বাস করা উচিত নহে।

রিপুঞ্জয়ের পর মগধ-সিংহাসন লোভী অমাত্য বা সেনাপতির ক্রীড়ার পুত্তলি হয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত যে রিপুঞ্জয়ের সুনীক নামক অমাত্য স্বামীকে হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোৎকে সিংহাসনে বসান। প্রদ্যোতের বংশ এইরূপ দেওয়া আছে।

২৩। প্রদ্যোৎ
|
২৪। পালক
|
২৫। বিশাখযূপ

২৬। জনক
|
২৭। নন্দীবৰ্দ্ধন

মৎসপুরাণে প্রদ্যোৎ নামের পরিবর্ত্তে পুলক এবং পালক নামের পরিবর্ত্তে বালক দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বপুরাণেরই মত যে রিপুঞ্জয়ের অমাত্যের বংশ পাঁচ পুরুষ মাত্র ও তাহা ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করে। তৎপরে মগধসিংহাসন মন্ত্রী শিশুনাগের হস্তগত হয়। তাহার বংশই নাগবংশ নামে বিখ্যাত।

নাগবংশ।

২৮। শিশুনাগ
|
২৯। কাকবর্ণ
|
৩০। ক্ষেমধর্ম্মা
|
৩১। ক্ষত্রোজা
|
৩২। বিম্বিসার
|
৩৩। অজাতশত্রু
|
৩৪ দুর্ভক
|
৩৫ উদায়াশ্ব
|
৩৬। নন্দীবৰ্দ্ধন
|
৩৭ মহানন্দী

সর্ব্বপুরাণেরই মত যে নাগবংশ ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করে। ইহাদের মধ্যে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁহাদের নাম আছে, শাক্যসিংহের সহিত তাঁহাদের মিলন হয়। এই কারণ ভারতবর্ষের নব্যতম ইতিহাস লেখক Vincent Smith তাঁহাদের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন এবং থৃষ্টজন্মের ৬০০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে বিবেচ্য যে পুরাণের ভবিষ্য মগধবংশাবলীর শেষ অংশ যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাংশ উপকথা মাত্র বলা কি সঙ্গত ?

বিম্বিসারের পূর্ব্বে শাক্যসিংহ জন্মান নাই, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয় নাই, ভারতে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ছিল না; সুতরাং হিন্দুর গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন জাতির গ্রন্থে বিম্বিসারের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার উল্লেখ থাকা সম্ভব নহে। হিন্দুজাতির প্রমাণ মাত্রেই দুষ্ট ও অবিশ্বাস্য এইরূপ ধারণা লইয়া হিন্দুর ইতিহাস বিচার করা যুক্তিযুক্ত নহে। নিজের বংশাবলী নিজে যত জানিব পরে তত জানিতে পারে না। যখন আমার বংশের সহিত অপর বংশের কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখনই সেই সম্বন্ধী মহাশয় মদীয় বংশের কতক অংশ মাত্র জানিতে পারেন। যদি তাঁহার প্রমাণ ব্যতিরেকে আমার কথার উপর নির্ভর না করিয়া আমার বংশাবলী বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে মহাশয়দের বিশ্বাস ধন্য এই কথা বলিব। অতএব প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশাবলী সংস্কৃত প্রাচীন পুরাণাদি হইতেই বিশ্বাস করা উচিত। পুরাণে দেখিতে পাই যে মহানন্দীর শূদ্রাপত্নীতে মহাপদ্মানন্দ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে, তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়ান্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনিই ইক্ষাকুবংশ, পৌরব-বংশ, হৈহয়-বংশ, পাঞ্চাল-বংশ, কাশেয়-বংশ কালিঙ্গ-বংশ প্রভৃতি নিখিল ক্ষত্রিয় বংশধরগণকে পরাভূত করিয়া একচ্ছত্র রাজাধিরাজ হন। তাঁহার হস্তেই অর্জ্জুনের শেষ বংশধর ক্ষেমক নিধন প্রাপ্ত হন। মৎস্য-পুরাণে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

এতৈঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যন্তি যাবৎ কলিনৃপাঃপরে।
তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্বেহ্যেতে মহীক্ষিতঃ॥
চতুর্ব্বিংশৎ তথৈক্ষ্বাকাঃ পাঞ্চালাঃ সপ্তবিংশতি।
কাশেয়াস্ত চতুস্ত্রিংশৎ অষ্টাবিংশত্তু হৈহয়াঃ॥
কালিঙ্গাশ্চৈব দ্বাত্রিংশৎ অশ্মকাঃ পঞ্চবিংশতি।
কুরবশ্চাপি ষড়্‌বিংশৎ অষ্টাবিংশত্তু মৈথিলাঃ॥
সুরসেনাস্ত্রয়োবিংশৎ বীতহোত্রাশ্চ বিংশতি।
এতে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি এককালং মহীক্ষিতঃ॥
মহানন্দীসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ।
উৎপৎসতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ।
অতঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শুদ্রযোনয়ঃ।
একরাট্ স মহাপদ্মঃ একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি॥

মহানন্দী ও মহাপদ্ম ৮০ বৎসর রাজত্ব করেন। মহাপদ্মের অষ্টপুত্র ২০ বৎসর রাজ্য করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্যচাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্ত মহাপদ্মের মুরা নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত বলিয়া তিনি মৌর্য্য। তাঁহার বংশ মৌর্য্যবংশ নামে বিদিত।

নন্দবংশ।

৩৮। মহাপদ্ম
৩৯—৪৬। সুমাত্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র।

মৌর্য্যবংশ।

৪৭। চন্দ্রগুপ্ত
৪৮। বিন্দুসার
৪৯। অশোকবর্দ্ধন
৫০। সুযশা
৫১। দশরথ
৫২। অক্ষত
৫৩। শালিশুক
৫৪। সোমশর্ম্মা
৫৫। শতধন্বা
৫৬। অণুবৃহদ্রথ

মৌর্য্যবংশের চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক সর্ব্বজন-বিদিত। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে পুরাণ মিথ্যা লিখিয়াছেন বলিতে পারেন না। দশজন মৌর্য্য পুরাণমতে ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। গ্রীক্ ইতিহাস হইতে মৌর্য্যবংশের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। অণুবৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজমুকুট লন। ইহার বংশই পুরাণে শুঙ্গ-বংশ নামে বিখ্যাত।

শুঙ্গবংশ—

৫৭। পুষ্পমিত্র
৫৮। অগ্নিমিত্র
৫৯। সুজ্যেষ্ঠ
৬০। বসুমিত্র
৬১। আর্দ্রক
৬২। পুলিন্দক
৬৩। ক্ষেমবসু
৬৪। বজ্রমিত্র
৬৫। ভাগবত
৬৬। দেবভূতি

পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রই কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক। তাঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুষ্পমিত্রের মুদ্রাও আবিষ্কৃত, সুতরাং শুঙ্গবংশ সম্বন্ধে পুরাণ উপকথা লেখেন নাই। দেবভূতির অমাত্য বসুদেব নামক কণ্ববংশীয় ব্রাহ্মণ স্বামীকে হত্যা করিয়া মগধ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বংশ

কণ্ববংশ।

৬৭। কণ্ব
৬৮। ভূমিমিত্র

৬৯। নারায়ণ

৭০। সুশর্ম্মা

এই চারিজন কাণ্বায়ন ৪৫ বৎসর মাত্র রাজ্য করেন, ইঁহাদের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। উহাদের পর ৩০ জন অন্ধ্রবংশীয় রাজা মগধ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহাদের রাজ্যকাল ১০৪ বৎসর। সুতরাং জরাসন্ধ হইতে ১০০ জন রাজার ইতিহাস ধারারাহিক-ক্রমে পুরাণে দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬৯ জন সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ, গ্রীক ইতিহাস ও মুদ্রাদি-পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা ঐতিহাসিক হইয়াছেন। এক্ষণে বিবেচনা করুন যে, অবশিষ্ট ৩১ জন সম্বন্ধে পুরাণের মিথ্যা কথা লেখা সম্ভাবনা আছে কি না। উঁহাদের কোন পরিপোষক প্রমাণ নাই বলিয়া উঁহাদের অবিশ্বাস করা উচিত নহে। উঁহারা বিশ্বস্ত হইলে সহদেব ও জরাসন্ধ সত্য জীব হন এবং তাঁহাদের সমসাময়িক যুধিষ্ঠিরাদিও কবির কল্পনা মাত্র হন না। পুরাণমতে রাজ্যকাল গণনা করিলে সহদেব-সুত সোমাপী হইতে নন্দ পর্য্যন্ত ১৫০০ বৎসর অতীত হয়—

বার্হদ্রথ।	১০০০ বৎসর
প্রদ্যোৎ।	১৩৮ „
নাগ।	৩৬২ „
	১৫০০
নবনন্দ।	১০০ „
	১৬০০

সুতরাং সোমাপী হইতে চন্দ্রগুপ্তের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ১৬০০ বৎসর হয়, চন্দ্রগুপ্তের কাল খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে ৩২৭ বলিয়া স্থিরীকৃত, অতএব সোমাপী ১৯১২+৩২৭+১৬০০=৩৮৩৯ বৎসরের পূর্ব্বের রাজা হন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক, সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদি ৩৯০০ বৎসরের প্রাচীন বলিতে পারা যায়। মহাভারত জনমেজয়ের সময় প্রচারিত সুতরাং মহাভারত ৩৮০০ বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ বটে, আমরা পুরাণের বচনই সমীচিন মনে করি, কারণ ইহাতে বংশাবলী ও সময় বিশদরূপে দেওয়া আছে। অলমতি বিস্তারেণ—

ব্যাসদেবঃ প্রসীদতু

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎপলা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রকিরণে অগ্নি

পরদিন প্রাতে প্রমীত স্ত্রীকে বলিলেন;—"আজ বড় প্রয়োজন পড়িয়াছে, পাঁচ শত মুদ্রা চাই।"

উৎপলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন;—"তোমার চক্ষু লাল, শুষ্ক মুখ—রাত্রিতে তোমার ভাল নিদ্রাও হয় নাই, সারা রাত ছটফট্ করিয়াছ, কত কি বলিয়াছ—।"

"কি বলিয়াছি?"

"অর্থশূন্য হিজিবিজি!—'সভিক,' 'সুরা,' 'নারীচরিত্র'—আরও কত কি!"

"আমার ত কিছুই মনে নাই!"

"কোন অসুখ করে নাই ত?"

"বিশেষ অসুখ কিছুই না। পথ হাঁটিয়া শরীরটা যেন কেমন হইয়াছিল, সেই জন্য রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয় নাই; এখন ত ভালই আছি।"

"আজ আর বেশি হাঁটাহাঁটি করিও না।—কত চাই বলিলে?"

"পাঁচ শত।"

উৎপলা অন্য কক্ষে গেলেন। প্রমীত গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া মুকুরে নিজের মুখ দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইলেন। রক্ত চক্ষু, শুষ্ক রুক্ষ মুখ,—কেন? স্বপ্নে কথা! 'সুরা,' 'নারীচরিত্র,'—আর ত কিছু নয়?

উৎপলা মুদ্রাপূর্ণ একটী থলি আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন, বলিলেন;—

"এত সকালে এমন কি প্রয়োজন?"

প্রমীত তখন পূর্ব্ব দিন যে নিজে প্রতিভূ হইয়া সোমদত্তকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন;—

"সভিকের নিকট এখনি পাঠাইতে হইবে।"

উৎপলা বিহ্বলের ন্যায় ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে হঠাৎ আবেগের সহিত বলিলেন;—

"আহা! তোমাকে ত বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি! মঞ্জুলার সঙ্গে না কি সোমদত্ত মহাশয়ের বিবাহ!"

প্রমীতের হাত হইতে মুদ্রার থলি ঝনাৎ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। ব্যস্ত সমস্তে প্রমীত তাহা তুলিলেন, বলিলেন;—

"কি?"

"কাল অমন ক্লান্ত হইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়াছিলে, আমি কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। মঞ্জুলার সঙ্গে না কি সোমদত্তের বিবাহ?"

"কোথায় শুনিলে?"

"অনেকেই না কি শুনিয়াছে মাধবী আমাকে বলিয়াছে।"

"কি বলিয়াছে?"

"সোমদত্ত মঞ্জুলার মাতার কাছে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, মাতাও প্রায় স্বীকৃত।"

"এদিকে ঋণদায়ে সোমদত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতেছিল!—সে দ্যূতকারী, মদ্যপানে সারাদিন মত্ত সর্ব্বদা কুসংসর্গে তাহার বাস!"

"বল কি! এমন লোকের সঙ্গে মঞ্জুলার বিবাহ! এমন বিবাহ তুমি হইতে দিবে?"

"আমি কি করিব? আমি বারণ করিবার কে?"

"মঞ্জুলা আমাদের হিতকারিণী সুহৃৎ। যে দিন তাহাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই তাহাকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন ত সে আমাকে স্নেহপাশে বাঁধিয়াছে। সে আমার সুহৃদ, সখী, ছোট ভগ্নী!"

প্রমীত স্ত্রীর উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উৎপলা বলিলেন;—

"মঞ্জুলা শিক্ষিতা; কিন্তু আমি দেখিয়াছি, সংসারীর অভিজ্ঞতা তাহার নাই। মাতার কথায় সে স্বীকৃত হইবে, শেষে আজীবন মনস্তাপে দগ্ধ হইবে। তুমি দেখ, তাহাকে রক্ষা কর। এমন রত্ন অমন মানুষের হাতে পড়িবে?"

কম্পিত কণ্ঠে প্রমীত বলিলেন ;—

"আমার চেষ্টা করা কি ভাল ? আমি কে ? মঞ্জুলার মাতা বা মঞ্জুলা আমার কথা শুনিবে ?"

"মঞ্জুলা নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখিবে।"

"তুমি কিসে বুঝিলে ?"

"স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মন বুঝে। মঞ্জুলা তোমার কথা শুনিবে, তোমার কথায় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস। একবার দেখ।"

"তুমি বলিতেছ, দেখিব।"

স্ত্রীর নিকট বিদায় হইয়া প্রমীত বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন ; বাদলকে দিয়া টাকার থলি সভিকের নিকট পাঠাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

উৎপলা আশ্বস্ত হইয়া গৃহকার্য্যে মন দিলেন।

মানুষ নিজ হাতে নিজের পায়ের বেড়ি গড়িয়া পিটিয়া প্রস্তুত করে, দোষ দেয় পরের —বিধাতার! বন-জঙ্গল হইতে মাল্যভ্রমে সুন্দর সর্পশিশু আঁচলে করিয়া ঘরে আনে, শেষে তাহার বিষের জ্বালায় পুড়িয়া মরে! বিধাতা মানুষকে ভবিষ্যৎ জ্ঞান দেন নাই, তাই মানুষ সুখী।

এদিকে প্রমীত সেন ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিলেন। মঞ্জুলাকে বাঁচাইতে হইবে ? আমাকেই চেষ্টা করিতে হইবে! মঞ্জুলা আমার কথা শুনিবে ?—উৎপলা বলিলেন, নিশ্চয় শুনিবে, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মন বুঝে! উৎপলা কি বুঝিয়াছেন ? মঞ্জুলাকে বাঁচাইতে যাইয়া নিজে মরিব, উৎপলাকে মারিব ? মানুষ বিপদ দেখিলে সতর্ক হয়, সরিয়া পড়ে ; আমি জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হইব ? পতঙ্গ ত উড়িয়া গিয়া আগুনে পড়ে! উৎপল! উৎপল!—

প্রমীত অন্যমনস্কে চলিতেছিলেন, পথের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। অনেক দূর হাঁটিয়া দেখিতে পাইলেন, কমলপুর আসিয়াছেন, নিকটেই মঞ্জুলার গৃহ। প্রমীত থামিলেন। যাইব ? মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিব ? তাহাকে কি বলিব ?—সোমদত্ত ভাল লোক নহে, সে সুরাপায়ী ঋণগ্রস্ত স্বার্থপর ? মঞ্জুলা যদি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে ? নারী-চরিত্র ত চিরকাল দুর্জ্জেয়! প্রমীতের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাই কি ? তবে আমার প্রতিবাদে[illegible] বিরক্ত হইবে না ? আর সোমদত্তের কথা যদি তাহার মনেই স্থান না পাইয়া থাকে, তবে আমি আগে থাকিতেই বিনা কারণে কেন তাহার নিন্দা-চর্চ্চা করিতে যাই ? কি মনে করিবে ? আমার কেন এ অযাচিত অনধিকার-চর্চ্চা ? মঞ্জুলা ত আমার কেহ নহে!—কেহ নহে!

প্রমীত চলিতে চলিতে মঞ্জুলার বহির্দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুরীর মধ্য হইতে মঞ্জুলার দাসী চঞ্চলা বাহিরে আসিতেছিল, প্রমীত সেনকে দেখিয়া বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল ;—

"ভিতরে আসিবেন কি ?"

প্রমীত চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন ;—

"না ; অনেক দূর যাইতেছি, আর একদিন আসিব।"

প্রমীত অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে চলিলেন। চঞ্চলা কিছু বিস্মিত হইল এরূপ কেন হঠাৎ চমকিয়া উঠা কেন ?

চঞ্চলা আর একবার গমনশীল প্রমীতের দিকে চাহিল; দেখিল, প্রমীত সেন থামিলেন, মুখ ফিরাইয়া তাহারই দিকেই চাহিলেন, থতমত খাইয়া পুনরায় দ্রুতবেগে চলিলেন। চঞ্চলা হাসিল, ভাবিল—মল্লিকা মালতী কি ইঁহার অঙ্গও দগ্ধ করে!

চঞ্চলা তখন বাহিরে যাওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিয়া মঞ্জুলাকে বলিল;—

"ওগো, প্রমীত সেন মহাশয় বোধ হয় আমাদের এখানেই আসিতেছিলেন——"

"কে তিনি?" মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"—আসিতেছিলেন। আমি বাহিরে যাইতেছিলাম, দ্বারের সম্মুখেই দেখা হইল। বলিলাম, 'আসুন'! তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'অনেক দূর যাইতে হইবে, আর একদিন আসিব' বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

"দূর অভাগী! তোর কথায় আমিও চমকিয়া উঠিয়াছি!"

চঞ্চলা ভাবিল, চাঁদের কিরণ চারিদিকেই আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পৌত্তলিক মহোৎসব

তখন বেলা মধ্যাহ্ন। প্রমীত অসঙ্গ সেনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অসঙ্গ আহারে যাইবেন, এমন সময় শুষ্কমুখ রুক্ষকেশ অস্নাত শ্রান্ত প্রমীতকে দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত হইলেন, বলিলেন;—

"এস, এস; এমন অসময়ে কেন?"

প্রমীত কোন উত্তর না দিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। অসঙ্গ বলিলেন;—

"কি হইয়াছে? উৎপলা ভাল আছেন ত?"

"ভালই আছেন।"

"তোমার কি হইয়াছে?"

"কিছুই না।"

"তবে তোমার এমন ভাব কেন? সমস্ত শরীরে ধূলা, স্নান কর নাই। কোথায় গিয়াছিলে?"

"তোমার এখানেই ত আসিলাম।"

অসঙ্গ ভৃত্যকে ডাকিলেন, প্রমীতের স্নানের উদ্যোগ করিতে হইবে। বলিলেন;—

"ব্যাপারটা কি?"

প্রমীত ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন;

"তুমি কি মঞ্জুলার কাছে যাইবে?"

"সে কথা ভুলিতে পার নাই? একেবারে অধীর হইলে যে!"

"দেখ, কাল তোমাতে আমাতে সোমদত্ত সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছে, কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি নাই।"

"কি কথা?"

"তাহার যে বহু ঋণ, তাহার এক প্রমাণ আমি গত কল্যই পাইয়াছিলাম।"

"কি প্রকার?"

পাটলীর পথে যে ভাবে সোমদত্তের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, সভিকের হাত হইতে যেরূপে তিনি তাহাকে মুক্ত করেন, প্রমীত তাহা অসঙ্গকে বলিলেন। অসঙ্গ বলিলেন;—

"এ ত তার পণের ঋণ, এ ছাড়া তার আরও ঋণ আছে।"

"সভিকের নিকট সেই টাকা পাঠাইতে হইবে বলিয়া উৎপলার কাছে আজ প্রাতে

টাকা চাহিলাম, হেতুও বলিলাম। উৎপলা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।"

"কি বলিলেন ?"

"দেখ, জনরব মিথ্যা নয়। সোমদত্ত যে মঞ্জুলাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, উৎপলাও তাহা শুনিয়াছেন।"

"বটে ?"

"উৎপলা মাধবীর নিকট শুনিয়াছেন।"

"তোমাকে কি বলিলেন ?"

"বলিলেন, মঞ্জুলা এমন অপাত্রের হাতে পড়িবে ? উৎপলার ইচ্ছা, এ বিবাহ যেন কোন মতে না হয়- -আমি যাইয়া মঞ্জুলাকে বারণ করি !"

"তাই কি তুমি কমলপুর গিয়াছিলে ?"

"আমি !—তোমাকে যাইতে হইবে। আমি ত কালই তোমাকে বলিয়াছি।"

"তুমি গেলেই ত ভাল হয়। উপকারী সুহৃদের নিঃস্বার্থ সৎপরামর্শ, মঞ্জুলা তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে।"

অসঙ্গের সন্দেহ যায় নাই, তাই তিনি পুনরায় এ ঢিল ছুড়িলেন। প্রমীত বলিলেন ;

"উৎপলাও তাহাই বলিয়াছেন, আমার কথা মঞ্জুলা রাখিবে ; স্ত্রীলোকেই না কি স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে পারে।"

"তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। মঞ্জুলা তোমাকে অকপট সুহৃদ বলিয়া জানে, তোমাকে শ্রদ্ধা করে ; তোমার কথা অবশ্যই রাখিবে।"

"দেখ, আমি কমলপুরে গিয়াছিলাম।"

"মঞ্জুলার দেখা পাও নাই ?"

"তাহার গৃহে যাই নাই।"

"কমলপুরে গেলে, মঞ্জুলার গৃহে যাও নাই ! কেন ?"

"কেন যে যাই নাই, একদিন বলিব।"

অসঙ্গের বিস্ময় বৃদ্ধি হইল। ব্যাপারটা কি ? মঞ্জুলার গৃহে যাইতে ইচ্ছা নাই ! কেন ?—কোন অনুদার সন্দেহ উৎপলার মনে স্থান পাইয়াছে ?—না। উৎপলা নিজেই ত প্রমীতকে মঞ্জুলার নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন ! আত্মচিত্তে প্রমীতের বিশ্বাস হীনবল হইয়াছে ? তবে দূরে দূরে থাকাই ত ভাল। সোমদত্ত যদি মঞ্জুলাকে বিবাহ করে, তবে সকল আশঙ্কা দূর হয়। কিন্তু অমন রত্ন সোমদত্তের হাতে পড়িবে ?

প্রমীত বলিলেন ;—

"কি ভাবিতেছ—কেন ইতস্ততঃ করিতেছ ?"

"কেন ইতস্ততঃ করিতেছি, এক দিন বলিব।"

দুই বন্ধুই বুঝিতে পারিলেন, পরস্পর পরস্পরের নিকট মনের ভাব গোপন করিতেছেন। কেহই মুখ ফুটিয়া মনের কথা প্রকাশ করিলেন না। সাহসী অন্তঃকরণও অবস্থা-বিশেষে ভীরু হইয়া পড়ে। প্রমীত ভাবিলেন, আত্মরক্ষা করিতে পারিব, কেন আর অসঙ্গের নিকট এই ক্ষণিক চাঞ্চল্যের পরিচয় দিব ? অসঙ্গ ভাবিলেন, শুধু সন্দেহ করিয়া কেন প্রমীতকে লজ্জিত করিব ? ক্ষণকাল দুই জনেই নীরব রহিলেন। শেষে অসঙ্গ বলিলেন ;—

"দেখ, তাড়াতাড়ি কিছু করিয়া কাজ নাই। সোমদত্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে কি না ঠিক জানি না। মঞ্জুলার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, মঞ্জুলা কখনো সোমদত্তের প্রস্তাবে স্বীকৃত

হইবে না। কন্যার অমতে অলোকা ঠাকুরাণী তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে সাহস করিবেন না। বিশেষতঃ রাজ্ঞী কারুবকীর অনুমতি না পাইলে তিনি কখনো এ সম্বন্ধে অগ্রসর হইবেন না। রাজাধিরাজ অতি শীঘ্রই যুদ্ধযাত্রা করিবেন; নগরে রাজ্যে প্রতিগৃহে বিপুল উৎসাহ-উদ্যোগ, বিষম উদ্বেগ-চিন্তা; এ সময় এ কথা লইয়া আন্দোলন না করাই ভাল। রাজাধিরাজ চলিয়া গেলে এক দিন অলোকা ঠাকুরাণীকে অবস্থা জানাইব।"

"বিলম্বে চেষ্টা বৃথা হইবে না?"

"না।"

"তবে এ কয় দিন থাক্।"

"হাঁ তাহাই ভাল।—এখন স্নান কর।"

"না, আমি এখনি যাইব।"

"পাগল তুমি! এত বেলায় অস্নাত অভুক্ত তুমি চলিয়া যাইবে? বধূ কি মনে করিবেন? সেবারও তুমি তাঁহাকে নিরাশ করিয়া গিয়াছিলে!"

অগত্যা প্রমীতকে স্বীকার করিতে হইল। স্নানাহার শেষে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বেলা অপরাহ্নে প্রমীত স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন;—

"দেখিও, বেশী বিলম্ব করিও না।"

অসঙ্গ হাসিলেন, বলিলেন;—

"তুমি চিন্তা করিও না। অনেক দিন হইল মঞ্জুলার গীত শুনি নাই, দু'জনেই এক দিন যাইব।"

"আমি আর কেন?"

"আমি বলিব, তুমি সাক্ষ্য দিবে!"

প্রমীত চলিয়া গেলে অসঙ্গ অন্তঃপুরে যাইয়া পত্নী সংযুক্তাকে বলিলেন;—

"ওগো, সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়!"

সংযুক্তা পান সাজিয়া বাটায় পুরিতেছিলেন, হাসিয়া বলিলেন;—

"ব্যাপারটা কি? আমার সাত রাজার ধন, সঙ্গীহীন মাণিকের প্রতি কি প্রেত-পিশাচীর দৃষ্টি পড়িয়াছে?"

"সঙ্গীহীন নই, তুমি নিত্য সংযুক্তা!—দেবী দানবী, গন্ধর্ব্বী পিশাচী কেহ এ মণি স্পর্শও করিতে পারিবে না। শুধু দূর হইতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে!"

সংযুক্তা হর্ষকুঞ্চিত নেত্রে শুভ্র দশনপ্রান্তে রক্তাধর ঈষৎ পীড়িত করিয়া একটি সজ্জিত পান স্বামীর মুখে দিলেন, বলিলেন;—

"তবে সংসার নিপাত যাক্।—কি হইয়াছে?

"তোমার দিদির অতি যত্নের পোষাপাখী উড়ু উড়ু হইয়াছে!"

"দিদি—উৎপলার?"

"হাঁ।"

"তাঁহার অতি যত্নের পোষাপাখী ত প্রমীত সেন মহাশয়! তুমি কি বলিতেছ?"

অসঙ্গ তখন পালঙ্কে বসিয়া পড়িলেন, পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সংযুক্তার হস্ত ধারণ করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

"আমার সন্দেহ হইতেছে, প্রমীত সেন মজিয়াছে।"

"তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু দিদি যে তাঁহার চোখের মণি! দিদির অপেক্ষা—দিদির মত রূপবতী যে সংসারে আর কেহ নাই!"

"এই গর্ব্বই ত প্রমীতসেনের কাল হইয়াছে, তুমি মঞ্জুলাকে দেখিয়াছ, কেমন রূপবতী?"

"মঞ্জুলাও পরম রূপবতী।"

"প্রমীত সেনের চক্ষে বোধ হয় সে-ই অধিক রূপবতী।"

"তোমার চোখে ?"

"আমার চোখে ? আমার চোখ ত মন্ত্রবশ। আমার গৃহের বাহিরে যে কেহ—স্বর্গের অপ্সরাও যে আমার চোখে কালো কুৎসিত !"

সংযুক্তা স্বামীর বাহুমূল নখাঘাতে পীড়িত করিয়া স্মিত প্রভাসিত মুখে বলিলেন ;—

"চাটুবাক্যে তোমরা চির বিশারদ; আমরা অবোধ, তাই মুগ্ধ হইয়া থাকি !"

"নিজের প্রাপ্য কড়া-ক্রান্তির গণনায় কোন স্ত্রীলোক ভুল করে না !"

সংযুক্তা হাসিয়া স্বামীর পার্শ্বে পালঙ্কে বসিলেন, বলিলেন ;—

"প্রমীত সেন মহাশয়কে তোমরাই এতকাল স্ত্রীর অতি বশীভূত—স্ত্রৈণ বলিয়া আসিয়াছ, এখন এ কিরূপ ?"

"বন্ধনের অতি কসাকসিতে সূত্র ছিঁড়িয়া যায়।"

"এও কি তাই হইয়াছে ?"

"হইয়াছে, ঠিক বলিতে পারি না ; তবে অতি সন্দেহের বিষয় বটে।"

"তোমার ভুল। প্রমীতসেন মহাশয় অমন ভাল লোক, আর উৎপলা ত দেবী ! যাহাতে এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, মঞ্জুলা এমন অপাত্রে না পড়ে, তাহার জন্য দিদিরই ত এত আগ্রহ ! আর, প্রমীতসেন মহাশয় অতি স্নেহ-বশতঃই মঞ্জুলাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

"অসম্ভব নয়। কিন্তু স্নেহ শেষে লোভে, প্রণয়ে না গড়ায় !"

"তুমি—"

সংযুক্তা যেন কি বলিতেছিলেন, এমন সময় দাসী একবৎসরের শিশুপুত্র বিজয়কে কোলে করিয়া সে ঘরে আনিল। সংযুক্তার মাতৃহৃদয় উথলিয়া উঠিল ; হাসিময় কচিমুখ দেখিয়া সংযুক্তা সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। তখন কোথায় বা উৎপলা, প্রমীতসেন—কোথায় বা মঞ্জুলা ! সর্ব্বচিন্তাপহারী, চির আনন্দের উৎস সেই সোণার পুতুল লইয়া স্বামী-স্ত্রী মহোৎসব-ঘটায় হৃদয় ঢালিয়া দিলেন !

(ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(পৌষের বঙ্গদর্শনের ৬৮৭ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—শাস্ত্রপ্রামাণ্য

প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ বা আগম—হিন্দুর ন্যায় বা প্রমাণ-শাস্ত্র এই ত্রিবিধ প্রামাণ্যের উপরেই মানবের যাবতীয় জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ অর্থে এখানে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বোঝায়। আর আমাদের যাবতীয় অনুমান উপমানাদি এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহা আপাততঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অথচ অবস্থান্তর ঘটিলে ইন্দ্রিয়ের

দ্বারাই যার জ্ঞানলাভ হইতে পারে, কেবল তাহাই অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে যাহা বর্ত্তমানে উপস্থিত নাই, অথচ যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অনুমান কেবল এমন বিষয়েরই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে; যাহা আদৌ ইন্দ্রিয়াতীত, অনুমান বা উপমান তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। সুতরাং প্রমাণ-ত্রয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়েই, যার ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইয়াছে কিম্বা হওয়া সম্ভব বলিয়া নিজের পূর্ব্বতন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা অপরের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইতে জানি, কেবল তাহারই জ্ঞান দান করিতে পারে। যাহা একান্ত ইন্দ্রিয়াতীত, তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয় দিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কিম্বা অনুমান-উপমান প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। এইজন্যই শব্দ বা আগমের প্রয়োজন। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষে তো নাই; পত্যক্ষ-প্রতিষ্ঠিত অনুমান-উপমানেতেও নাই। তার একমাত্র প্রামাণ্য আগম বা শব্দ। অতীন্দ্রিয় কোনও কিছু আছে, ইহা স্বীকার করিলেই শব্দ-প্রমাণও মানিয়া লইতে হয়।

কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া, পাশ্চাত্য যুক্তি-বাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া, আমরা একদিন এই শব্দ-প্রমাণবস্তুটা যে কি, ইহা ধরিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া, শাস্ত্রপ্রামাণ্য একান্ত ভাবেই বর্জ্জন করিয়াছিলাম। দোষ যে কেবল নূতন শিক্ষারই ছিল, তাহাও নহে। প্রাচীন পন্থাবলম্বীদিগের নিকটও তখন আমরা এই শব্দ-প্রামাণ্যের কোনও সদর্থ প্রাপ্ত হই নাই। শব্দ বলিতে আমরা তখন বেদাদি গ্রন্থই বুঝিতাম। এই বেদ যে সেই বেদ নহে, এই শব্দ যে সেই শব্দ নহে, গতানুগতিক ধর্ম্মে সে জ্ঞান তখন একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। বেদ বলিতে ঋগ্বেদাদি শ্রুতি-চতুষ্টয়কেই লোকে বুঝিত। আর এই বেদ যে স্বতঃপ্রামাণ্য নহে, এগুলি যে বেদাঃ—বহুবচন, বেদঃ—একবচন নহে, এ কথাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। দেশে ক্রিয়া ছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল না; আচার ছিল, কিন্তু সাধন ছিল না; কিম্বদন্তী ছিল, কিন্তু অনুভূতি ছিল না; গতানুগতিক ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছিল না। ঋগ্বেদাদি যে প্রকৃত পক্ষে শব্দ নহে, বেদ স্বয়ংই এগুলিকে অপরা বিদ্যা বলিয়াছেন; যুগে যুগে লোকে ঋগ্বেদাদির প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াও প্রকৃত শব্দ বা সত্য বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে নাই; পুরাণাদিতে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এ সকল দৃষ্টান্ত লোকে জানিত, কিন্তু তার মর্ম্মগ্রহণে কেহ চেষ্টাও করিত না, সমর্থও ছিল না। কিম্বদন্তী শাস্ত্রের আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া, শাস্ত্রের মর্যাদার দাবী করিতেছিল। কাজেই অভিনব শিক্ষার প্রবল যুক্তিবাদের মুখে শাস্ত্রের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া গেল।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ এই জন্যই এতটা সহজে ও সরাসরিভাবে শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বেদচতুষ্টয়ের আলোচনা ও বিচার করিয়াই, তাহাকে বর্জ্জন করেন; প্রাচীন মীমাংসা-দর্শনে বেদের প্রামাণ্যের কি ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার সন্ধান লয়েন নাই। সমগ্র বেদকে কোনও হিন্দুসিদ্ধান্ত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কর্ম্মকাণ্ডের

পক্ষপাতী ঋষিগণ বেদ বলিতে কেবল কর্ম্মের প্রেরণা যাহাতে আছে, তাহাই বুঝিতেন। ঋগ্বেদাদিতে যেখানে বিহিত কর্ম্মের উপদেশ আছে, তাহাই মুখ্য বেদ; যাহাতে তাহা নাই তাহা স্বতঃ-প্রামাণ্য নহে; তাহা অর্থবাদ মাত্র। জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ বৈদিক দেববাদকে একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। দেবতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাঁরা স্বীকার করেন নাই। অন্যদিকে জ্ঞানপন্থিগণ বেদের যে সকল স্থলে মোক্ষপ্রতিপাদন করিয়াছে, কেবল তাহাকেই প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁদের মত—মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং—যাহাতে মোক্ষোপদেশ দান করে, ও মোক্ষবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাই কেবল বেদ বা শাস্ত্র-নামের ও প্রামাণ্য-মর্য্যাদার অধিকারী। তদেতর যাহা কিছু তৎসমুদয়ই অর্থবাদ মাত্র। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সহজেই বেদকে একান্তভাবে ও সরাসরি প্রণালীতে বর্জ্জন না করিয়াও আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি উপনিষদাদি হইতে যে সকল শ্রুতি সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মোপনিষৎ রচনা করেন, তৎসমুদয়ই মোক্ষপ্রতিপাদক; সুতরাং প্রাচীন মীমাংসার মতে, শাস্ত্রপ্রামাণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যেমন পূর্ব্ব-মীমাংসায় কর্ম্মপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, বৈদিক দেববাদ অস্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ উত্তর-মীমাংসাতেও, জ্ঞানের ঐকান্তিক প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াও, ঈশ্বরত্ব বা নিঃশেষ ব্রহ্মত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। "শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা তূপদেশ বাম দেববৎ" এই সূত্র তাহার প্রমাণ। রাজা রামমোহন এ সকল কথা জানিতেন। মীমাংসা-দর্শনে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। সুতরাং প্রাচীন ঋষি-পন্থা অনুসরণ করিয়াই তিনি বেদের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার শিক্ষাও অল্পকাল মধ্যেই লোপ প্রাপ্ত হয়। তাঁর সমসাময়িক লোকে এ শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হওয়াতেই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্কারের প্রয়োজনের সৃষ্টি ও তাহার পথ পরিষ্কার হইয়াছিল।

অতি পুরাতন কাল হইতেই আমাদিগের দেশে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন;—সত্য-লাভের এই ত্রিবিধ ক্রম প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথমে শ্রবণ। যাহা জানি নাই, যাহা পাই নাই, গুরুশাস্ত্রমুখে তার উপদেশ লাভ করার নাম শ্রবণ। শ্রবণ জ্ঞানের প্রথম সোপান। এই শ্রবণের যোগ্যতালাভের পক্ষে কেবল শ্রদ্ধাই আবশ্যক। গুরুশাস্ত্রবাক্যে আস্তিক্য-বুদ্ধিকে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বলে। গুরু যাহা বলিতেছেন, শাস্ত্রে যাহা উপদেশ দিয়াছে, তাহা আছে, অর্থাৎ তাহা সত্য,—এই যে স্থির ধারণা, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যার নাই, সে গুরুর কথা বা শাস্ত্রের কথা শুনিবে কেন? এই শ্রদ্ধা থাকিলে পরে শ্রবণের অধিকার জন্মে। কিন্তু শ্রবণের বিষয় শব্দ। আর শব্দ এবং বস্তু এক নহে। কেবল শব্দের দ্বারা বস্তুজ্ঞান জন্মে না। জ্ঞান মাত্রেই বস্তুতন্ত্র; বস্তুর অধীন; বস্তুসাক্ষাৎকারেই তার উৎপত্তি হয়। বস্তুসাক্ষাৎকার লাভ যতক্ষণ না হইয়াছে, ততক্ষণ শুদ্ধ শব্দের দ্বারা কদাপি তার জ্ঞানলাভ হয় না। শব্দের দ্বারা যেমন বস্তুজ্ঞান জন্মে না, প্রতিশব্দের দ্বারাও

সেইরূপ বস্তু-জ্ঞান জন্মে না। অভিধান প্রতিশব্দই প্রকাশ করে। কোন বস্তুকে কত ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতে পারা যায়, অভিধান কেবল সেই কথাই ব্যক্ত করে; কিন্তু সে বস্তুকে তার যথাযোগ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমক্ষে ধারণ করিতে পারে কি? যেমন অভিধানের দ্বারা বস্তুজ্ঞান লাভ হয় না, সেই রূপ ব্যাকরণের দ্বারাও পদের যত বিশদ অন্বয়াদি কর না কেন, সেই পদোক্ত বস্তু যদি আমার পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বা অধুনা-প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলে, এই সকল অন্বয়াদির দ্বারাও কোনও বাক্যের বা পদের প্রকৃত মর্ম্ম কদাপি আমার হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কেবল শ্রবণের দ্বারা বস্তুজ্ঞানলাভ হয় না। শ্রবণের পরে মনন। বিচারপূর্ব্বক শ্রুত বিষয়ের অর্থধারণাকেই মনন বলে। শ্রবণের সার্থকতার জন্য যেমন শ্রদ্ধার আবশ্যক, মননের সার্থকতার জন্য সেইরূপ বিচার আবশ্যক। এই বিচার যুক্তিমুখী, যুক্তির অপেক্ষা রাখে। কিন্তু যুক্তি-প্রয়োগে কোনও বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সে বিষয়ের প্রচলিত এবং মামুলি মত, বিশ্বাস, অর্থ বা সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। সন্দেহেই বিচারের প্রয়োজন। সন্দেহ নিরসন করিবার জন্যই বিচারের আবশ্যক। কিন্তু গতানুগতিক, সংস্কারবদ্ধ ধর্ম্মে সন্দেহেরই বা অবসর কোথায়? যন্ত্রারূঢ়ের মতন লোকে অবশে বা শুদ্ধ সংস্কারবশে যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিয়া চলিতেছিল। অর্থহীন কর্ম্ম, প্রাণহীন ধর্ম্ম,—কেবল লোকাচারের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, ঘোরতর তামসিক জনগণের উপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। দেশে জিজ্ঞাসার লোপ হইয়াছিল। স্মৃতির অর্থ লইয়াই যাহা কিছু সন্দেহ ও বিচার-আলোচনা হইত, শ্রুতির মীমাংসার প্রয়োজনও উপস্থিত হয় নাই, সে শিক্ষাও পণ্ডিতসমাজে পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ন্যায়ের সূত্র সকল, সত্য প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত না হইয়া, স্মৃতির অর্থনির্ণয়েই আপনাদের শক্তিক্ষয় করিতেছিল। মুমুক্ষু লোকেরাও শাক্ত বৈষ্ণবাদি তন্ত্রের সদগুরুর পদাশ্রয় পাইয়া, মোক্ষসাধনে তৎপর ছিলেন;—শাস্ত্রযুক্তির ধার তাঁরাও বড় ধারিতেন না। গুরুমুখী পন্থাও গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য মুমুক্ষুসাধক-সম্প্রদায়মধ্যেও জ্ঞানপিপাসা অপেক্ষা সাধন-নিষ্ঠাই বেশী দেখা যাইত। আর কেহ কেহ এই সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত বস্তু-সাক্ষাৎকারলাভে পরমজ্ঞানের অধিকারী হইলেও, সে জ্ঞান তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সীমাতেই প্রায় আবদ্ধ থাকিত; আর ক্বচিৎ সঙ্গীতে বা কাব্যে স্ফুরিত হইলেও, লোকে তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারিতও না, বুঝিবার জন্য লালায়িতও হইত না। দেশের যখন এই অবস্থা, তখন নূতন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব আমাদিগকে আসিয়া একান্তভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে; সুতরাং সে সময়ে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জ্জন করা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা ছিল না।

শাস্ত্র-প্রামাণ্য যে কি, ইহা জানি নাই ও বুঝি নাই বলিয়াই একদিন শাস্ত্রকে একান্ত-ভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলাম। আর এই শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়া যে সত্য লাভ করিলাম, তাহারই বা প্রকৃতি ও মূল্য কি,

এ প্রশ্নের আলোচনায় যতদিন প্রবৃত্ত হই নাই, তত দিনই কেবল শব্দ বলিয়া যে একটা তৃতীয় প্রমাণ আছে, তাহা বুঝি নাই, ও তার মর্ম্ম ধরিতে পারি নাই। কিন্তু যথনই এই তথাকথিত আত্মপ্রত্যয় বা ইন্‌টুইষণ-লব্ধ তত্ত্বের প্রকৃত পরিচয় পাইতে লাগিলাম, তখন হইতেই শব্দ-প্রমাণেরও প্রয়োজন উপস্থিত হইল। প্রত্যক্ষ রূপরসাদিরই প্রমাণ প্রদান করে, অরূপ-অরস, অতীন্দ্রিয় যাহা, তার সম্বন্ধে কোনও বিশেষ কথা কহিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলেই একটা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সংবাদ সতত বহন করিতেছে, সত্য। এই যে সান্ত ও সসীম জগৎ, তাহাই অনন্ত ও অসীমের ভাব নিয়ত আমাদিগের চিত্তেতে জাগাইয়া তোলে। এই মানব-বুদ্ধিই, আপনার অতীত একটা অনাদ্যনন্ত জ্ঞানরাজ্যের আভা ফুটাইয়া তোলে। পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র বিষয়-সাক্ষাৎকারই বিরাট ও ভূমা আনন্দের সুর বহন করিয়া থাকে। এ সকলই সত্য; এ সকলই প্রত্যক্ষ কথা। ভাবুক জন মাত্রেরই এ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি স্বল্প-বিস্তর আছে বা হইয়াছে। লৌকিক বিচারেও এই সান্তের মধ্যেই অনন্তকে অনুভব করা যায়। আমি আমার সম্মুখে যে দেশখণ্ডকে দেখিতেছি—তাহা সসীম, তার বিশিষ্ট একটা পরিমাণ আছে। কিন্তু এই পরিমিত দেশভাগকে প্রত্যক্ষ করিতে যাইয়াই, তার অগ্রে ও পশ্চাতে যে একটা অনির্দ্দিষ্ট অসীম দেশ আছে, ইহা বুদ্ধিগম্য করিয়া লই। এই অনির্দ্দিষ্ট ও অপরিচ্ছিন্ন দেশেতেই আমার খণ্ডীকৃত দেশের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেইরূপ আমি যে কালটুকুকে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ক্ষুদ্র, তার সীমা আছে, সত্য। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্ন কালভাগকে জানিতে গিয়াই তার পূর্ব্বে ও পরে যে একটা অপরিজ্ঞাত ও অসীম কাল পড়িয়া আছে, ইহা বুঝি ও জানি। এইরূপে ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই অতীন্দ্রিয়ের, সীমার মধ্যেই অসীমের সংকেত আমরা নিয়তই প্রাপ্ত হইতেছি। এই অতীন্দ্রিয় ও অসীমকে ছাড়িয়া, আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও সসীম বস্তুর জ্ঞানই একান্ত অসম্ভব হয়। মানববুদ্ধি, আপনার আত্মপ্রত্যয় বা necessity of thoughtএর দ্বারাই এই অতীন্দ্রিয় ও অসীম বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। ইহার জন্য শব্দ-প্রমাণের কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই পথে যে তত্ত্ববস্তু লাভ করি, তার মূল্য কতটুকু, প্রকৃতিই বা কি? এ তো অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ঈশ্বর-তত্ত্ব। সীমার মধ্যে যে অসীমের সন্ধান পাই, তার সম্বন্ধে, "আছে"—কেবল এই মাত্রই বলিতে পারি; —"অস্তীতি ব্রুবতি, কথং তদুপলভ্যতে?" শ্রুতি এই ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন :—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে।

যে স্থানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না; আমরা সে বস্তু কি ইহা জানি না। কি করিয়া তাহার উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমুদায় বস্তু হইতে ভিন্ন ও সমুদায় বস্তুকে অতিক্রম করিয়া আছেন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদিগের নিকটে এই তত্ত্বের

ব্যাখা করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে এই কথাই শুনিয়াছি। এই পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান পৌঁছিতে পারে। আধুনিক দর্শনও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে এই অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার জড় ও জীব-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া, প্রত্যক্ষ ও অনুমান-বলে, এই অজ্ঞাত—unknown, এবং অজ্ঞেয়—unknowable, সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, প্রকৃতপক্ষে এর উপরে যাইতে পারে না। এই সীমার মধ্যে যে অসীমকে দেখা যায়, কল্পনা তাহাকে নানা-ভাবে সাজাইয়া তুলিতে পারে। এই নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ, এই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তুকেই জগতের রূপরসের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এই চাক্ষুষ বিষয়ের মাধুর্য্যকে ও রসকে, ভাবাবেশে সম্ভোগও করিতে পারে। কিন্তু এ সকল স্তবস্তুতি, পূজা-অর্চ্চনা, ধ্যান-ধারণা যতই কেন তৃপ্তিপ্রদ কিম্বা চিত্তোন্মাদ-কর হউক না,—তাহা যে কল্পিত, বস্তুতন্ত্র নয়, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পরমতত্ত্বকেই ভাবাঙ্গের সাহায্যে অন্তরে ফুটাইয়া তুলিয়া, আপনার মানস-প্রতিমাতে ঈশ্বরবুদ্ধি আরোপ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুনীল আকাশে, অসীম সাগরে, পুষ্পিত বনে, সুগঠিত জীবদেহে, অথবা নরনারীর স্নিগ্ধ সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিয়া তাহার ধ্যান করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া, একটা অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করাতেও এই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত তত্ত্বকে অতিক্রম করা হয় না। এই যে মানস-ঈশ্বর, ইহাও প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ তত্ত্বকেও প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বলা যায় না। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব অসাধারণ; সাধারণ ঈশ্বরতত্ত্ব এক অর্থে ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং উপমান—এই দ্বিবিধ প্রমাণের দ্বারাই তাহার সম্যক প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এই ঈশ্বরতত্ত্বও উপেক্ষার বস্তু নহে। এই প্রাকৃত তত্ত্ব অবলম্বনেই শ্রুতি অপ্রাকৃত ও সত্য যে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব, তার উপদেশ দিয়াছেন। ভৃগুবারুণী সংবাদ তার সাক্ষী। বরুণ ভৃগুকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে যাইয়া, এই সাধারণ, এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানগ্রাহ্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রথমে তারই কথা বলেন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি শ্রুতি এই সাধারণ তত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। "যাহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাহা কর্ত্তৃক এই ভূতসকল স্থিতি করে; যাহার প্রতি এই ভূতসকল গমন করে, ও যাহাতে অন্তিমে প্রবেশ করে"—তাহাই ব্রহ্ম। এখানে দৃষ্টের বা প্রত্যক্ষের উপরেই অদৃষ্টের বা অপ্রত্যক্ষের উপদেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা অপরি-হার্য্য। জ্ঞাতের ভিতর দিয়াই, জ্ঞাতের উপমার বা জ্ঞাতের সম্বন্ধের দ্বারাই অজ্ঞাতের উপদেশ দেওয়া সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আপনার পুত্র ভৃগুকে বরুণ জগতের সর্ব্বজনবিদিত, জন্মাদি ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া,—এ সকলের কারণরূপেই সেই তত্ত্বের উপদেশ দান করিয়াছেন। ভৃগু ব্রহ্ম শব্দমাত্র শুনিয়াছিলেন। বস্তুসাক্ষাৎ-কার লাভ হয় নাই। এই শব্দ কোন্ বস্তুকে

নির্দ্দেশ করে, এই বিষয়ে উপদেশ পাইবার জন্যই পিতৃসমীপে উপনীত হইয়া—"অধীহি ভাবো ব্রহ্মেতি" বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করেন। ভৃগুর নিকটে তখন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমান, এই প্রমাণদ্বয়ের পথই উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।" তিনি যাবতীয় লৌকিক বিদ্যাই কেবল লাভ করিয়াছিলেন; প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনধিগম্য, শুদ্ধ শব্দ-প্রমাণপ্রতিষ্ঠিত সে পরা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, তাহা তখনও লাভ করেন নাই। অতএব তিনি যাহা জানিতেন, তাহারই উপরে বরুণকে তাঁর অপরিজ্ঞাত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু "যতো বা ইমানি ভূতানি" —ইত্যাদি উপদেশ দিয়াই বরুণ ক্ষান্ত হন নাই। এই সাধারণ, প্রত্যক্ষ-অনুমান-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের কথা বলিয়া, তিনি বলিলেন,— "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।"—তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর। এই বিশেষরূপে জানিতে গেলেই শব্দপ্রমাণের আশ্রয়গ্রহণ আবশ্যক। "যতো বা ইমানি ভূতানি"—ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মাত্র নির্দ্দেশ করে কিন্তু তটস্থ লক্ষণ আর স্বরূপ লক্ষণ এক নহে। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বস্তুর একটা বাহিরের জ্ঞানমাত্র লাভ সম্ভব, তার অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় এ পথে পাওয়া যায় না। বাহিরের জ্ঞান আকস্মিক, নিত্য নাও বা হইতে পারে। জগতের জন্মস্থিতিলয়-কারণরূপে ব্রহ্মকে জগতের সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ, তারই মধ্য দিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু এ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন, কি ছিলেন না? জগতের বিলোপে ব্রহ্ম থাকিবেন, কি থাকিবেন না? যদি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন না বল, তাহা হইলে তাঁহাকে জগতের জন্মের কারণ বলিতে পার না। কারণ, কারণমাত্রেই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকে, কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের স্থিতি না হইলে, তার কারণতত্ত্বই বিলোপ পাইয়া যায়। আর জগতের লয়ের হেতুও যদি এই ব্রহ্ম, এ কথা যদি বল;—শ্রুতি এখানে ইহাই বলিতেছেন, —তাহা হইলে জগতের বিলয়েও ব্রহ্মের সত্তা যেমন পূর্ব্বে, সেইরূপই থাকে, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব জগৎরূপ কার্য্যের মধ্যে, 'এই জগতের জন্মস্থিতিলয়হেতুরূপে, ব্রহ্মের যে প্রকাশ, তাহা আকস্মিক মাত্র। এই লক্ষণার দ্বারা তাঁর নিত্যস্বরূপ কোনও মতেই সূচিত বা প্রকাশিত হয় না। ফলতঃ এই তটস্থলক্ষণকে অবলম্বন করিয়া, আমাদের যুক্তি ব্রহ্মসত্তা সম্বন্ধে যে কোনও কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হউক না কেন, তাহা কদাপি বস্তুতন্ত্র হইতেই পারে না। জগৎকারণরূপে আমরা ব্রহ্মের যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা অনুমানসিদ্ধ। এই অনুমান, আবার, আমাদের এই দৃশ্যমান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য যতটুকু, এই অনুমানেরও প্রামাণ্য ততটুকুই হইবে। এই প্রমাণের দ্বারা অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধির-অতীত, পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হয় না। আর এই ভাবে, জগতের উৎপত্তিস্থিতি-লয়-কারণরূপে ব্রহ্মের যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা তাঁর স্বরূপ জ্ঞান নয় বলিয়াই, বরুণ আপনার ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্রকে এই তটস্থ লক্ষণা দ্বারা সাধারণভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ বলিয়া বলিলেন—"তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।" বিশেষভাবে

তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, বা চেষ্টা কর। "যতো বা ইমানি ভূতানি"—বলিয়া যে বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বের কথা কহিলাম, তাহা ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ-কথা নহে। সে তত্ত্বের স্বরূপের সাক্ষাৎকারের জন্য সাধন অবলম্বন কর। এই স্বরূপ-বস্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আমাদের যে মন, অন্তরালে থাকিয়া, চক্ষুরাদির দ্বারা রূপরসাদির জ্ঞানলাভ সম্ভব করিতেছে, এই স্বরূপবস্তু সেই মনেরও বিষয় হয় না। মনের অন্তরালে যে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকিয়া, এই মানসিক-জ্ঞান সম্ভব করিতেছে, সে স্বরূপবস্তু সে বুদ্ধিরও গ্রাহ্য নহে। আর প্রমাণত্রয়ের মধ্যে, প্রথম প্রমাণদ্বয় প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ও উপমান, এই বুদ্ধির অধিকারের সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তার উপরে যাইবার ইহাদের অধিকার নাই। কেবল শব্দ বা আগমের দ্বারাই পরমতত্ত্বের স্বরূপ-জ্ঞানলাভ সম্ভব। সে রাজ্যে শব্দ বা আগমই একমাত্র প্রমাণ।

ফলতঃ আমরা সচরাচর যে ঈশ্বর-জ্ঞানের বা ঈশ্বরোপাসনার অভিমান করিয়া থাকি, তাহা স্বরূপ-জ্ঞানও নহে, স্বরূপ-উপাসনাও নহে। জগতের অধিকাংশ লোকেই হয় কেবল মাত্র কিম্বদন্তীর, কিম্বা তটস্থলক্ষণা সিদ্ধ ঈশ্বরের ভজনা করিয়া থাকেন। হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান—ইঁহারা সকলেই শোনা বা মনগড়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সত্য ঈশ্বর-জ্ঞান ও সত্য ঈশ্বরের ভজনা জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন, আর যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, এ ক্ষেত্রে উভয়েই সমান। উভয়েই তটস্থ লক্ষণার দ্বারা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া, ভাবযোগে এই অনুমানসিদ্ধ দেবতারই ভজনা করেন। কারণ, শাস্ত্র মানিলেই যে সেই শাস্ত্রোপদিষ্ট বস্তুর সত্যজ্ঞানলাভ হয়, এমন নহে। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেই, জগতের যাবতীয় প্রত্যক্ষ-গোচর বস্তুর সাক্ষাৎকার কেহ লাভ করে, এমন কথনই কেহ কল্পনা করে না। মানাটা মনের কথা। দেখাটা বস্তুসাক্ষাৎকারের উপরে নির্ভর করে। মানা আর দেখা এক কথা নহে। এই ভারতরাষ্ট্রের একজন সম্রাট আছেন, এ কথা জানে ও মানে অনেকেই। কিন্তু তাই বলিয়া তারা সকলেই যে এই সম্রাটকে দেখিয়াছে, এমন নয়। সেইরূপ পরমতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, শব্দ বা আগমই তার এক মাত্র প্রামাণ্য, এ কথা মানিলেই যে সকলের সেই পরমতত্ত্বের বা ঈশ্বরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার-লাভ হয় বা হওয়া সম্ভব, এমন কেহই বলে না। অন্যদিকে সম্রাট একজন আছেন, ইহা পূর্ব্বে হইতে না জানিয়াও, কিম্বা শুনিয়া থাকিলেও, সে শোনা কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন না করিয়াও, কেহ যদি হঠাৎ লণ্ডনে যাইয়া কোনও দিন উপস্থিত হয়, তবে সে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। সেইরূপ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপরে শব্দ বলিয়া যে আর একটা প্রামাণ্য আছে, সেই প্রামাণ্যের দ্বারাই কেবল পরমতত্ত্বের বা ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, আর প্রমাণের দ্বারা হয় না,—এ কথা না মানিয়াও, কাহারো ভাগ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ ঘটিতেও বা পারে। তখন সে ভাগ্যবান ব্যক্তি দেখিয়া জানিবেন যে সে বস্তুর স্বরূপ কি। আর সেই দেখার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ বস্তুও যে কি, শব্দ-প্রমাণ যে কাহাকে বলে, তখন তিনি আপনিই

তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন। যতক্ষণ না এরূপ দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, ততক্ষণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা যে পরমতত্ত্বের স্বরূপজ্ঞানের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, ও হইতে পারে না, আমরা দৃঢ় ভাবে কেবল এই কথাই বলিতে পারি। 'আর ঈশ্বর-বস্তু বা ব্রহ্মবস্তু আছেন, তটস্থলক্ষণার দ্বারা যখন অবিসংবাদিতভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান-লাভেরও যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ অনুমান-উপমানাদির অতিরিক্ত ও এ সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কোনও না কোনও একটা পন্থা ও প্রামাণ্য আছে, এই সিদ্ধান্তমাত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। এই ভাবে ও এই অর্থে ঈশ্বর-বিশ্বাসী মাত্রকেই শব্দপ্রামাণ্য স্বীকার ও গ্রহণ করিতে হয়। না করিলে, তাঁদের ঈশ্বর-তত্ত্ব হয় একদিকে অতিসূক্ষ্ম জড়তত্ত্বের, নতুবা অতি বিরাট অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ব্রহ্ম-তত্ত্বের নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। ফলতঃ শব্দ-প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া, যাঁরাই কোনও প্রকারের ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগের ঈশ্বর হয় সূক্ষ্মতম জড়-শক্তি, না হয় এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু হইবেনই হইবেন। এ ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় সিদ্ধান্তের কিছুমাত্রও অবসর নাই।

প্রমাণ মধ্যে শব্দ-প্রমাণ বা আগমকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিলেই, সচরাচর আমা-দিগের দেশে যে ভাবে এই শব্দের বা আগমের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, তাহাকেও সত্য ও প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। অধিকাংশ লোকে, নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে, একটা অতিশয় অপ্রাকৃত অর্থে, এই শাব্দ প্রমাণ বা বেদকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহার মধ্যে অযৌক্তিক বা অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই। প্রথমতঃ শাব্দপ্রমাণ, প্রত্যক্ষেরই মত স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ যেমন আপনি আপনার প্রমাণ, প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য অন্য কোনও প্রমাণান্তরের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, ও হইতে পারে না,—আমার বিষয়-জগতের যাবতীয় জ্ঞানের প্রমাণ যেমন আমার চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়;—শব্দের প্রমাণ যেমন আমার কর্ণ, স্পর্শের প্রমাণ যেমন আমার ত্বক, রূপের প্রমাণ যেমন আমার চক্ষু, রসের প্রমাণ যেমন আমার রসনা, এবং গন্ধের প্রমাণ যেমন আমার নাসিকা; শব্দস্পর্শাদির প্রমাণ যেমন আমার এই সকল ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকারের উপরে একান্ত ও অনন্যভাবে নির্ভর করে; এ সকলের প্রমাণ যেমন আর কোনও উপায়ে হয় না; আর আমার চক্ষুরাদির প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যও যেমন অন্য কোনও প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে না;—সেইরূপ শব্দও, অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে, আপনি আপনার প্রমাণ; প্রমাণান্তরের দ্বারা তাহা সমর্থিত বা নিরস্ত হয় না ও হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ এবং শব্দ বা আগম, উভয়ই একজাতীয় প্রমাণ। প্রত্যক্ষজ্ঞানে ও শব্দজ্ঞানে, বিষয়ের বিভিন্নতা আছে, কিন্তু ক্রিয়ার পার্থক্য নাই। প্রত্যক্ষজ্ঞান, যেমন বস্তুতন্ত্র, বস্তুসাক্ষাৎকার ব্যতীত এ জ্ঞান ফোটে না; শব্দজ্ঞানও সেইরূপ বস্তুতন্ত্র, বস্তু-সাক্ষাৎকার ব্যতীত জন্মে না। প্রত্যক্ষ শব্দস্পর্শরূপরসাদির সাক্ষাৎকার হইতে উৎপন্ন হয়; শব্দ সেইরূপ অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-

অরস-অগন্ধ যে বস্তু তাহার সাক্ষাৎকার হইতে উৎপন্ন হয়। বস্তু মাত্রেই জ্ঞানগম্য। যাহা জানি না, জানা যায় না, জানা যাইতে পারে না,—তাহাকে বস্তু বলে না; তাহা অবস্তু, অসৎ, মিথ্যা। অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অরস-অগন্ধ যাকে বলি, যার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, আকার নাই, অংশ নাই,—এমন যদি কিছু থাকে, তবে তাহা অবশ্যই জ্ঞানগম্য; তাহা কোনও না কোনও উপায়ে, কেহ না কেহ জানিয়াছে, জানিতেছে, বা জানিতে পারে,—ইহা স্থির নিশ্চিত। আর এই যে অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অব্যয় বস্তু ইহা যদি জ্ঞানগম্য, জ্ঞানগ্রাহ্য হয়, তবে সে জ্ঞানেরও কোন না কোন্ একটা পন্থা বা যন্ত্র, বা বৃত্তি জ্ঞাতার থাকিবেই থাকিবে। যাহা জ্ঞানগম্য, তার জ্ঞাতা অবশ্যই আছে। যে জ্ঞাতা, তার জ্ঞানের উপকরণ বা করণও থাকিবেই থাকিবে। জ্ঞেয় অথচ জ্ঞাতা নাই, জ্ঞাতা অথচ তাঁর জ্ঞানের করণ বা যন্ত্র নাই, ইহা অসম্ভব। জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, করণ বা জ্ঞানলাভের উপযুক্ত ও উপযোগী সহায়, ইহারা পরস্পরের অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। সুতরাং অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবস্তু যদি জ্ঞানগম্য হন, তাহা হইলে তাঁর জ্ঞাতা অবশ্যই থাকিবে; আর জ্ঞাতা থাকিলেই, সেই জ্ঞাতার এমন কোনও বৃত্তি বা শক্তি বা করণ বা যন্ত্র থাকিবেই থাকিবে, যাহার দ্বারা তিনি এই জ্ঞানগম্য ব্রহ্মবস্তু বা তত্ত্ববস্তুকে জানিতে পারেন। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় কিম্বা মন-বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃবৃত্তির দ্বারা এই অতীন্দ্রিয় ও অবাঙ্‌মনসোগোচর বস্তুকে কখনই জানা যায় না, জানা সম্ভব নহে। সুতরাং এ সকলের অতীত, অতীন্দ্রিয়, এমন কোনও বৃত্তি, শক্তি, বা করণ, আমাদের অবশ্যই আছে, যাহার দ্বারা এই পরমবস্তু বা পরমতত্ত্বকে জানিতে পারা যায়। চক্ষু যেমন রূপ জানে, প্রত্যক্ষভাবে জানে; কর্ণ যেমন শব্দ শোনে; ইন্দ্রিয় সকল যেমন সাক্ষাৎভাবে আপন আপন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে এই ব্রহ্মবস্তুর বা এই পরমতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিবার শক্তি মানুষের আছে। না থাকিলে, তার ঈশ্বরবুদ্ধি, ঈশ্বরারাধনা, ঈশ্বর-জ্ঞান, ঈশ্বর-ভক্তি প্রভৃতি সকলই কল্পিত, মিথ্যা হইয়া যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেই, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভের শক্তি আছে, ইহা মানিতেই হইবে। এই শক্তির নামই প্রকৃতপক্ষে শাব্দ। শাব্দ প্রমাণ এই শক্তিকেই নির্দ্দেশ করে। এই শাব্দপ্রমাণ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রাণস্বরূপ। কেন?—বারান্তরে তাহার বিশেষ আলোচনা করিব। *

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

---

* পৌষের বঙ্গদর্শনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার শিরোনামা—"ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—অবতারবাদ" না হইয়া—"ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—শাস্ত্রপ্রামাণ্য," হওয়া উচিত ছিল। মুদ্রাকরের অনুগ্রহে প্রবন্ধের শিরোনামার সঙ্গে তার বিষয়ের কোনই সম্বন্ধ বোঝা যায় নাই।—লেখক।

৺জগদীশনাথ রায়

কুমিল্লা হইতে জগদীশবাবু দুই বৎসরের ফারলো ছুটী লইয়া কলিকাতায় নিজ বসতবাটীতে অসিয়া বসিলেন, এই সময় গবর্ণমেণ্ট ইহাকে অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলেন, সুতরাং পুলিশের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার একেবারে রহিত হইল না। সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল ইঁহাকে বড়ই মান্য করিতেন, পাল মহাশয় ইঁহাকে তজ্জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ম্যানেজিং কমিটিভুক্ত করিলেন, পুলিশ-সংক্রান্ত এবং অপরাপর বিষয়ের মন্তব্য যাহা জগদীশ বাবু লিখিতেন তাহা গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইত।

জগদীশবাবু উচ্চদরের সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা যেমন উন্নত ছিল, কণ্ঠও তেমনি সুমধুর ছিল; তিনি সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার গানের মূর্চ্ছনা, কায়দা, আলাপ শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইত; রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গীতবিদ্যালয়ের কার্য্যকরী কমিটীর সদস্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার গান শুনিয়াছেন এমন অনেকে এখন জীবিত আছেন, তাঁহারা বলেন এমন মনোমুগ্ধকর, সুললিত কণ্ঠ তাঁহারা কখন শ্রবণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে দুই একটা গল্প বলি,—মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিখ্যাত "মকরত কুঞ্জ" উদ্যানে প্রথম কলেজ রিউনিয়ান হয়। মহারাজার সঙ্গীতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞতা ছিল এবং বিখ্যাত গায়ক ও যন্ত্রবিদ্‌গণকে বাগানে আহ্বান করিয়াছিলেন, প্রায় সকল ঘরেই সঙ্গীত চলিতেছিল, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং বাবু শ্যামাচরণ লাহা, জগদীশবাবুকে একটি গান গাহিতে বিশেষ অনুরোধ করেন, জগদীশবাবু তাঁহাদের কথামত, বিনাযন্ত্রের সাহায্যে একটি গান গাহিলেন, বলা বাহুল্য যাঁহারা অপরাপর ঘরে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র শুনিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে এবং অপরাপর বহুলোক জগদীশবাবু যে ঘরে গান গাহিতেছিলেন সেইখানে আসিয়া সমবেত হইলেন এবং একবাক্যে তাঁহার সুললিত মধুর কণ্ঠের এবং কায়দার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। একবার সুপরিচিত ধরণী কথক মহাশয় জগদীশবাবুর সিমুলিয়ার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন; বৈকালে সঙ্গীত আরম্ভ হইল, একটি করিয়া গান জগদীশবাবু গাহিতে লাগিলেন, আর একটি করিয়া কথক মহাশয় গাহিতে লাগিলেন, জগদীশবাবু এত উচ্চ সুরে গান ধরিলেন যে, ধরণীবাবু আর গাহিতে সাহসী হইলেন না, বলিলেন এ উচ্চ সুরের পর তাঁহার গান একেবারে ভাল লাগিবে না।

প্রাতঃকালে প্রত্যহ জগদীশবাবু বেড়াইতে বাহির হইতেন, হেদুয়ার মোড়ে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতেন; শ্যামবাজারের দিকে প্রায় যাওয়া হইত, কতক পথ অতিক্রম করিলে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন আসিয়া মিলিত হইতেন, ক্রমে বহু গণ্য মান্য লোক এই দলভুক্ত হইয়া সরকারী পথে বিচরণ করিতেন। উচ্চদরের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট

কর্ম্মচারীরা অনেক বিষয়ে জগদীশবাবুর পরামর্শ লইতেন এবং তিনি আহ্লাদের সহিত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ে মন্তব্য পাঠাইয়া দিতেন। জগদীশবাবুর বাটীতে, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, বঙ্কিম বাবু, দীনবন্ধু বাবু, হেম বাবু, তারাপ্রসাদ বাবু প্রভৃতি অনেক মহাত্মা আসিয়া উপস্থিত হইতেন। একদিন কেশববাবুকে লক্ষ্য করিয়া, জগদীশবাবু বলিলেন "দেখ, টাউনহল ব্যতীত প্রকাশ্য সভা করিবার আমাদের কোন স্থান নাই। টাউনহল না পাইলে আমাদের গত্যন্তর নাই, অতএব এমন কি একটা স্থানের আবশ্যকতা নাই, যেখানে ইচ্ছামত আমরা সভা-সমিতি করিতে পারি?" কেশব বাবু উত্তরে বলিলেন "এ কথা আমার মনে থাকিবে।" কিছুদিন পরে যখন আলবার্ট হল হইল, তখন কেশববাবু জগদীশবাবুকে বলিলেন "আপনার ইচ্ছা আমি কার্য্যে পরিণত করিয়াছি।" জগদীশবাবু "কলেজ রিউনিয়ানের" প্রতিষ্ঠাতা; শিক্ষিত-সম্প্রদায় বৎসরের মধ্যে একদিন সমবেত হইয়া আনন্দোৎসব করেন, ইহাই রিউনিয়ানের মুখ্য উদ্দেশ্য; সভায়, যে কেহ ইচ্ছা করেন, প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে পারিতেন এবং আমোদ-প্রমোদের যথেষ্ট আয়োজন হইত, জলখাবারেরও বিশেষ বন্দোবস্ত হইত। প্রথম রিউনিয়ান মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিখ্যাত "এমারেল্ড বাউয়ার"এ হইয়াছিল এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বালক ছিলেন, তাঁহার একটি কবিতা তাঁহার পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব শর্ম্মার দ্বারা পঠিত হয়, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতা পাঠ করেন। দ্বিতীয় বৎসর রিউনিয়ান মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার উদ্যানে হইয়াছিল, স্যার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর অবৈতনিক সম্পাদক এবং বাবু খগেন্দ্রনাথ রায় অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই সময় মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে একটি কমিশন গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন; স্যার হেনরি কটন কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং জজ বিভারলি ডাক্তার নিভারডেল সদস্য ছিলেন। এই তিনজন একদিন জগদীশ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থান দেখিয়া আসেন, জগদীশ বাবুর মন্তব্য, কমিশনের বিবরণে ছাপা আছে। জগদীশ বাবু সকল খেলাতেই দক্ষ ছিলেন, স্যার হেনরি হ্যারিসন এবং স্যার হেনরি কটন একজোট হইয়া ইঁহার সঙ্গে দাবা খেলিতেন, বলা বাহুল্য প্রায় সকল বাজিতে জগদীশবাবু জয়লাভ করিতেন।

জগদীশবাবুর দৃষ্টি সকল বিষয়ে ছিল, একবার তিনি কলিকাতা হইতে স্থলপথে বালেশ্বর যাইতেছিলেন। যখন মেদিনীপুর গিয়া পৌঁছিলেন, তখন সেখানকার কালেক্টার সাহেব এবং পুলিশ সাহেব, ডাক বাঙ্গালায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; নানা কথার পর, পুলিশ সাহেব বলিলেন "দেখুন এখানে একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, মাল কিম্বা ডাকাতদের কোন অনুসন্ধানই করিতে পারিতেছি না, আপনি আমাদের সহায়তা করুন, আপনার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পূর্ণমাত্রায় আছে। অকুস্থল নিকটেই, বলেন ত, আপনাকে আমরা সেই স্থানে সঙ্গে করিয়া

লইয়া যাই।” জগদীশবাবু যাইতে স্বীকৃত হইলে তাঁহারা তিনজনে গাড়িতে গেলেন, ঘটনা স্থলে পৌঁছিয়া, জগদীশবাবু বাটীটির চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। পুলিশ সাহেব বলিলেন—“দেখুন, স্থানীয় সকল বদ্‌মাইসকে ধরিয়া চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারিলাম না।” ঐ স্থানে একটি তামাকু খাইবার কলিকা জগদীশবাবু কুড়াইয়া লইলেন এবং অদূরে একটা নূতন বাঁশের লাঠী পড়িয়াছিল, তাহাও সংগ্রহ করিলেন, দুইটি দ্রব্য সাহেবদের দেখাইয়া বলিলেন “এই দুইটি জিনিসই বাঁকুড়ার, মেদিনীপুরে এমত কল্‌কে তৈয়ারি হয় না, ছড়িটির গঠনও স্বতন্ত্র, এরকম লাঠি বাঁকুড়া অঞ্চলে তৈয়ারি হয়, সুতরাং এখানকার স্থানীয় লোক আট্‌কাইয়া রাখা বিড়ম্বনা মাত্র, সম্ভবতঃ বাঁকুড়ার লোকে এ ডাকাতি করিয়াছে, আপনারা বাঁকুড়ায় গিয়া তদারক করুন, মোকদ্দমার কিনারা হইবে।” সাহেবেরা জগদীশবাবুর কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া বাঁকুড়ায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন; তখন তিনি উঁহাদের বলিলেন “আর একটা কথা আছে, আপনারা কি জানেন বাঁকুড়ায় কেমন করিয়া বদমাইসদের লুকাইয়া রাখে?” সাহেবেরা এ সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলায়,—জগদীশবাবু বলিলেন “ঘরের মেজে খুঁড়িয়া, বেশ পরিষ্কার করিয়া, তার ভিতর তারা মানুষ গোপন রাখে, গর্ত্তটা এমন করিয়া আচ্ছাদন করে যে তাহার অস্তিত্ব সহজে উপলব্ধি হয় না এবং এমন কৌশলে বায়ু প্রবেশের ছিদ্র রাখে যে সহসা কেহ কিছু অনুভব করিতে পারে না।” সাহেবেরা জগদীশবাবুর পরামর্শমত কার্য্য করিয়া সফলকাম হন; দুইজন প্রধান ডাকাত মাটির নিম্নদেশ হইতে গ্রেপ্তার হয়।

(ক্রমশ)

রসের রূপ—পূর্ব্বরাগ

(ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনের ৭৮৪ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

পুরাতন তন্ত্রের মায়াবাদী বা নূতন তন্ত্রের নীতিবাদী রূপ-লালসাকে যত হীন বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ তাহা তত হীন নহে। রূপটাকে তাঁরা একটা শারীরিক বস্তু বলিয়া মনে করেন। রূপ চক্ষুগ্রাহ্য, রূপের টানে আমাদিগকে এই বিষয়রাজ্যে বাঁধিয়া রাখে। লোকে রূপোন্মত্ত হইয়া সমাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। এই সকল সত্য বটে। আর এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বিজ্ঞলোকে রূপ-লালসাকে হীন ও বর্জ্জনীয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও, রূপ-লালসা যে প্রকৃতপক্ষে আত্মরতিরই রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র, ইহা অস্বীকার করা যায় না। চক্ষে যাহা নিঃশেষ দেখিতে

পারা যায়, তার একটা সার্ব্বজনীন লক্ষণের বা মাপকাঠির প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। জড়-ধর্ম্ম মাত্রেরই এরূপ লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু রূপ বস্তুর তো আজি পর্য্যন্ত এরূপ কোনও সার্ব্বজনীন লক্ষণ নির্ণীত হয় নাই। একের চক্ষে যাহা কাল, আর দশজনের চক্ষেও তাহা কালই হয়, শাদা হয় না। কিন্তু একের চক্ষে যাহা অতিশয় সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, অপরের চক্ষে তো সকল সময়, তাহা সুন্দর বোধ হয় না। অথচ রূপ যদি নিতান্তই কেবল চক্ষুগ্রাহ্য বস্তু হইত, তাহা হইলে, এরূপ মতভেদের এতটা অবসর কখনই থাকিত না। আমাদের স্বরূপ বস্তু যেমন ইন্দ্রিয়াতীত, শুদ্ধ অনুভূতিগ্রাহ্য মাত্র, এই রূপ-বস্তুও প্রকৃতপক্ষে তাহাই। রূপ বাহিরে ফোটে, স্বরূপ অন্তরে জাগিয়া রহে। কিন্তু এই স্বরূপই আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিতে যাইয়া বাহিরে এই রূপের প্রকাশ করে। রূপ দৃষ্ট-বস্তুর ধর্ম্ম নহে, দ্রষ্টা আত্মারই ধর্ম্ম। এই আত্ম-বস্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি,
ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দোরূপোঽস্মি,
নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

আমি অর্থাৎ এই অহং-প্রত্যয়বাচক বস্তু যে আমার মধ্যে দ্রষ্টা-শ্রোতা-জ্ঞাতা-ভোক্তা-কর্ত্তা-রূপে রহিয়াছে, তাহা দেবতা অথবা জ্যোতিঃস্বরূপ; অন্য কিছু নহে। এই বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ—শোকমোহাদির অধীন নহে। এই আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নিত্যমুক্তস্বভাবসম্পন্ন, এ বস্তু বদ্ধ নহে।” এই আত্মবস্তুর তিন ধর্ম্ম—সৎ, চিৎ, আর আনন্দ। সৎরূপে এই আত্মাই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। চিৎরূপে এই আত্মাই বিশ্বের জ্ঞাতা। আনন্দরূপে এই আত্মাই বিশ্বের ভোক্তা। শব্দস্পর্শরূপরসাদি ধর্ম্ম লইয়াই তো বিশ্বের স্থিতি। আর শব্দস্পর্শাদি ধর্ম্ম শ্রোতা ও স্পৃষ্টা, দ্রষ্টা ও ঘ্রাতা যে আত্মা তারই অধীন হইয়া আছে। শব্দের প্রমাণ শ্রোতা, স্পর্শের প্রমাণ স্পৃষ্টা, দৃষ্টির প্রমাণ দ্রষ্টা, ঘ্রাণের প্রমাণ আঘ্রাতা। এই জন্যই দ্রষ্টৃস্বরূপ যে আত্মা, এই বিশ্ব তাহারই উপরে স্থিতি করিতেছে। এই আত্মা অদৃশ্য হইলে, এই আত্মা যখন এই বিশ্ব হইতে আপনাকে টানিয়া লয়েন, তখন বিশ্ব বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তাহারই নাম মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে আত্মা আপনাতে আপনাকে সংহৃত করেন। আত্মার সে মহা-সমাধির অবস্থা। দ্রষ্টা যখন আপনার স্বরূপে, সর্ব্বভেদাভেদ-বিরহিত হইয়া স্থিতি করেন, তখনই বিশ্ব প্রলয়-পয়োধি-জলে অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার যখন দ্রষ্টা বা আত্মা আপনাকে আপনার বিষয়রূপে প্রকাশিত করেন, আপনি বিষয় সাজিয়া, আপনি বিষয়ী হইয়া, আপনি ভোক্তা সাজিয়া আপনি ভোক্তা হইয়া, অপূর্ব্ব ভেদাভেদের সৃষ্টি করেন, যখন অচিন্ত্য-অভেদের মধ্যে অচিন্ত্যভেদ জাগিয়া উঠে, এই অচিন্ত্য ভেদের মধ্যেই অচিন্ত্য-অভেদ লুকাইয়া থাকে,—তখনই এই লীলা প্রয়োজনে বিশ্ব প্রকাশিত হয়। বিষয়ী আপনাকেই আপনার বিষয়রূপে নিয়ত প্রকট করিতেছেন বলিয়া এই বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গেই আত্মজ্ঞান এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞান ব্যতীত বিষয়জ্ঞান সম্ভব হয় না।

বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিয়া, আমরা বস্তুতঃ অজ্ঞাতসারে আত্মাকেই অন্বেষণ করিয়া বেড়াই, আর জীবের এই আত্মবস্তু অনন্ত বলিয়া, বিষয়জ্ঞানেরও নিঃশেষ হয় না, জীবের জ্ঞানপিপাসারও নিবৃত্তি হয় না। যত জানি ততই আরো জানিবার বাকি থাকে, যত আয়ত্ত করি, ততই আরো বেশী আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠে। যেমন বিষয় আপনাকেই আপনার বিষয়রূপে প্রকাশিত করিয়া, জীবের এই অনন্ত জ্ঞান-পিপাসার সৃষ্টি করিয়াছেন; সেইরূপ ভোক্তা যে আত্মা, তাহাই আপনাকে আপনার ভোগ্য-রূপে প্রকাশিত করিয়া জীবের এই জ্বলন্ত রূপ-লালসার সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল জ্ঞানই মূলে আত্ম-জ্ঞান বলিয়া, মানুষের জ্ঞানান্বেষণের শেষ হয় না। সেইরূপ সকল রূপই আত্মা-নন্দ-স্বরূপ বলিয়া, জীবের রূপতৃষ্ণারও নিবৃত্তি হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়েই যেমন কেবলই বাড়িয়া যায়; সম্ভোগের গভীরতা ও ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গেও সেইরূপ, ভোক্তার পিয়াসা, ও ভোগ্যের মাধুর্য্য কেবল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জ্ঞান মাত্রেই যেমন আত্মজ্ঞান, রূপ-লালসা মাত্রেই সেইরূপ আত্মরতি—উভয়েই অশেষ ও অনন্ত।

ফলতঃ রূপ কেবল চক্ষে দেখা যায়, যে বলে, সে রূপ কি তাহা জানে না। রূপ চক্ষু ছাড়া যে জানা যায় তাহাও নহে। শব্দ যেমন শ্রুতির বিষয়, রূপ তেমনি চক্ষুর বিষয়। এজন্ত রূপ চক্ষুগ্রাহ্য বটে, কিন্তু অন্যদিকে রূপ চক্ষুর অতীতও বটে। চক্ষে যাহা দেখি তাহা যদি চক্ষে যাহা দেখা যায় না, এমন কোনও কিছুর সঙ্কেত না দেয়, তবে সে দৃশ্য বা রূপ আমাদের লালসাকে জাগাইয়া চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে না। যে রূপে এই অজ্ঞাত জগতের সঙ্কেতটী যত বেশী থাকে, তাহাই আমাদের চিত্তকে তত লুব্ধ করে। দেখিতেছি অথচ দেখিতে পাই না;—ধরি ধরি মনে করি, কিন্তু ধরিতে পারি না;—এই যে দেখা ও না-দেখার, পাওয়া ও না-পাওয়ার অপূর্ব্ব মাখামাখি, তাহাই প্রকৃত রূপের লক্ষণ। এই আলো-আঁধারের অদ্ভুত মেশামিশি হইতেই আমাদের সকল প্রকারের রূপানুভূতির জন্ম হয়।

এই জন্য বস্তুর উপরে কল্পনার রশান চড়াইয়াই আমরা রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকি। এ কল্পনা সত্য, মিথ্যা নহে। বস্তুকে ধরিয়া যে কল্পনা জাগে তাহা বস্তুতন্ত্র সত্য; ইংরাজীতে তাহাকে ইমাজিনেসন (imagination) বলে; ফ্যান্সী (fancy) নহে। ফ্যান্সী হাওয়ার উপরে গড়ে, ইমাজিনেসন সত্যের বা বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলতঃ আত্মবস্তু বা দ্রষ্টা যখন অনাত্মবস্তুর বা দৃষ্টের বা দৃশ্যের উপরে আপনার রং প্রতিফলিত করে, তখনই প্রকৃত ইমাজিনেসনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অনাত্মকে আত্মার দ্বারা অভিভূত করা, যাহা দেখা যায় তার উপরে যাহা দেখা যায় না তার আভা ফুটাইয়া, দৃষ্টের মধ্যেই অদৃষ্টকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েতে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে, প্রত্যক্ষ ও সম্ভোগ করাই এই সত্যকল্পনার বা ইমাজিনেসনের ধর্ম্ম। বস্তুর উপরে যতক্ষণ এই ইমাজিনেসনের বা কল্পনার আভা না পড়িয়াছে, অর্থাৎ অনাত্ম-বস্তুর উপরে যতক্ষণ আত্মজ্যোতি না ফুটিয়াছে, ততক্ষণ রূপের জন্ম হয় না।

রূপ-লালসা শরীরের নহে, কিন্তু আত্মারই সৃষ্টি। বস্তু ও কল্পনার অপূর্ব্ব মাখামাখি হইতেই এই রূপ-লালসার উৎপত্তি হয়। বস্তু রূপ-লালসার জননীস্বরূপ, কল্পনা তার জনক। বস্তুর মধ্যে যখন আত্মা আপনাকে অবহিত করে, তখনই এই কল্পনা জাগিয়া উঠিয়া, রূপ-লালসাকে উৎপাদন করিয়া থাকে। এইজন্য, প্রায়ই দেখিতে পাই যে এই কল্পনার আভা নিভিয়া গেলে, রূপ-লালসাও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কল্পনা বস্তুকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এক বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য বস্তুকে যাইয়া ক্রমে অধিকার করে। যতক্ষণ বস্তুবিশেষের মধ্যে একটা অজ্ঞাত রাজ্য পড়িয়া থাকে, ততক্ষণ কল্পনা তাহাকে পরিত্যাগও করে না। যাহা নিঃশেষ জানা হইয়া গেল, বা জানা হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মিল, তাহার উপরে কল্পনার খেলার আর অবসর থাকে না। সুতরাং কল্পনা যেমন সেই আধার হইতে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে, আমাদের রূপ-লালসাও তার সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়; এবং কল্পনা যেই বিষয়ান্তরকে যাইয়া আশ্রয় করিতে থাকে, রূপ-লালসাও তার সঙ্গে সঙ্গে নূতন আধারের দিকে ছুটিয়া যায়। এই জন্যই প্রকৃত প্রেমের সম্বন্ধের ভিতরে, সর্ব্বদাই একটা অজানা-রাজ্য পড়িয়া থাকা একান্ত অনিবার্য্য। রহস্য বা mystery যেখানে নাই, প্রেমও সেখানে থাকে না। রূপ মাত্রেই বস্তুতঃ রহস্য-ঢাকা। রহস্য-ভেদে রূপের মোহও ভাঙ্গিয়া যায়।

নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন হইতে, প্রথম মিলন পর্য্যন্ত প্রেমের বা মাধুর্য্যের যে অবস্থা, তাহারই নাম পূর্ব্বরাগ। মিলনের পূর্ব্বে যে অনুরাগের জন্ম হয়, যে অনুরাগ মিলনের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া, ক্রমে নায়ক-নায়িকাকে পরস্পরের নিকট লইয়া যায়,—তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলে। এই পূর্ব্ব-রাগের অবস্থাতে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের নিকট অনেকটা অজানা থাকিয়া যান। এই যে অজ্ঞাতের আকর্ষণ ইহাই পূর্ব্বরাগের মূলশক্তি। অজ্ঞাতের উপরেই আমাদের কল্পনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলবতী হয়। এই অজ্ঞাত একান্ত অজ্ঞাত নহে। আংশিকভাবে তাহাকে জানা হইয়াছে, পূর্ণভাবে জানা হয় নাই। দূর হইতে তার রূপ দেখা গিয়াছে, ঘনিষ্ঠভাবে, কাছে যাইয়া, তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা হয় নাই। লোকমুখে তার নামগুণ শোনা হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্য কি মিথ্যা, অতিরঞ্জিত বা অনুরঞ্জিত, ইহার পরীক্ষা হয় নাই। এই যে জানা অথচ অজানা ভাব, ইহাই কল্পনার শ্রেষ্ঠতম লীলাভূমি। এই জানা ও অজানাকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ব্বরাগের কল্পনা নায়ক-নায়িকার অন্তরে, পরস্পরের মানসীমূর্ত্তি রচনা করিয়া, ঐ মূর্ত্তিকে তাঁহাদের ধ্যানের ও সম্ভোগের বিষয় করিয়া তোলে।

রুশিয়ার বালিকা-কবি মেরী বাস্‌কার্টসেফ্ (Mary Baskkertself) মায়ের সঙ্গে নেপ্‌ল্‌সে যাইয়া, প্রত্যুষে আপনার শয়ন-প্রকোষ্ঠের বাতায়নে দাঁড়াইয়া, উষার উদ্ভিন্ন আলোকে অদূরে অপার নীলাম্বুরাশি দেখিয়া বিস্ময়ে, আনন্দে, ঔৎসুক্যে উৎফুল্ল হইয়া,—"মা, এটা কি?" বলিয়া উঠিয়াছিলেন। মা বলিলেন—"এটা সাগর।" মেরী বলিলেন—"সাগর! আমার ইচ্ছা হয় এটাকে আমি এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলি।" "The Sea! I wish I could drink it up." একেই বলে প্রকৃত রূপ-লালসা। আর এখানে সাগর সম্বন্ধে মেরী বাসকার্টসেফের পূর্ব্বরাগের উদ্দাম পিপাসাই ব্যক্ত হইয়াছে। নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগের ভাবও এইরূপ। উষালোকোদ্ভিন্ন এই নীলাম্বুরাশির মতন প্রথম রূপদর্শনের মধ্যেও একটা অসীম অজ্ঞেয়তার, একটা বিরাট রহস্যের আকর্ষণ জাগিয়া উঠে। মেরী বাসকার্টসেফের মতন, কৃষ্ণরূপ দেখিয়া, শ্রীরাধারও এই ভাবই হইয়াছিল।

কি কহব রে সখি! কানুক রূপ,
কো পাতিয়ায়ব, স্বপনস্বরূপ?

যাহা একান্ত প্রত্যক্ষ তাহাকে কেউ স্বপন-

স্বরূপ বলে না। আমি যাহা দেখিলাম তাহা তো কেবল বাহিরের বস্তু নয়। যার চক্ষু আছে সেই কানুর দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদি দেখিতে পারে; সে-ই কানুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, তার বর্ণ ও ভঙ্গী এ সকল দেখিতে পারে। ব্রজমণ্ডলে সবাই তো তাহা দেখিয়াছে, দেখিতেছে। কিন্তু আমি যাহা দেখিলাম সে তো কেবল চক্ষে দেখা যায় না। সে যে চক্ষুর অতীত বস্তু, এই জন্যই সে রূপ স্বপন-স্বরূপ। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যে স্বপ্ন দেখে সেই কেবল দেখে, অপরের তাহা প্রত্যক্ষ হয় না কানুর যে রূপ শ্রীরাধিকা দেখিলেন, আর কেউ তাহা দেখে নাই। দেখে নাই যে তার প্রমাণ, এখনও গোকুল নগরমাঝে তারা যুবতী-ধরম রক্ষা করিয়া চলিতেছে। কানুর রূপ শ্রীরাধার মানস-বস্তু। বাহিরে যাহা দশজনে দেখে তাহা সে রূপের কণাদপি কণামাত্রও প্রকাশ করিতে পারে না। এই বাহিরের চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ, পরিজ্ঞাত দেহ-গঠনকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীরাধার অন্তরে এই রসমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইহা সত্য। কিন্তু তাহা এই বাহ্য, চাক্ষুষ রূপের অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে, কোটীগুণে, অনন্তগুণে আরো উজ্জ্বল, আরো মধুর। সে রূপ অনন্ত। মেরী বাসকার্টসেফ নেপ্‌লসের সাগর-বক্ষে যে রূপ দেখিয়া, তাহাকে এক নিঃশ্বাসে পান করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, তাহা যেমন জানার মধ্যেই অজানা, প্রত্যক্ষের মধ্যেই অপ্রত্যক্ষ, জড়ের মধ্যেই অজড়, সান্তের মধ্যেই অনন্ত,—মূর্ত্তের মধ্যেই অমূর্ত্ত;—তাহা যেমন স্বপ্নময়, কল্পনাময়, আত্মময় ছিল; শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ দেখিয়া তাহাকে স্বপন-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক সেইরূপ। তাহা এক-দিকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অন্যদিকে অতীন্দ্রিয়; এক-দিকে সত্য অন্যদিকে কল্পিত, অথচ শ্রীরাধার চক্ষে এই সত্যই কল্পনা এবং এই কল্পনাই সত্য। আর মেরী বাসকার্টসেফের মতন শ্রীরাধিকাও এই রূপ দেখিয়া, তাহাকে নিঃশব্দে আত্মসাৎ করিবার জন্য কাতর হইয়া উঠিলেন।

অমিয়া মধুর বোল, সুধাখনি খালি গো,
হাতের উপরে লাগি পাঁউ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো,
ভাঙিয়া ভাঙিয়া মুই খাঁউ॥

কৃষ্ণরূপ রাধার মনের বস্তু। এক দিকে এ বস্তু সত্য, আর একদিকে কল্পিত। যেথানেই আমাদের জ্ঞানেতে সত্য ও কল্পনা এমনিভাবে পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে বিশেষ রূপে মিলাইয়া মিশাইয়া দেয়, সেথানেই আমাদের চিত্তে, এই অদ্ভুত বস্তুর প্রেরণায়, যুগপৎ বিবিধ বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয়। এই জন্য পূর্ব্বরাগে সর্ব্বদাই এ সকল পরস্পর-বিরোধী ভাবের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। লালসা ও আশঙ্কা, বিশ্বাস ও সন্দেহ, আশা ও নিরাশা—যুগপৎ এ সকলই পূর্ব্বরাগেতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফলতঃ মাধুর্য্যের কোনও অবস্থাতেই এই সকল ভাব একেবারে তিরোহিত হয় না। শান্ত, দাস্য সখ্যাদি রস-পঞ্চক সম্বন্ধে রসতত্ত্ববিদেরা যেমন বলিয়াছেন

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে বৈসে;"

মাধুর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। আশা ও নিরাশা, বিশ্বাস ও সন্দেহ, লালসা ও ভয়, এই সকল বিরোধী ভাব কোনও অবস্থাতেই মাধুর্য্যকে পরিত্যাগ করে না। প্রণয়ী জনের অবিরল আলিঙ্গন-পাশবদ্ধ হইয়াও, নিরাশা, সন্দেহ, ভয়াদির একান্ত নিবৃত্তি হয় না।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি,
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা;
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা

মাধুর্য্যের অপরাপর অবস্থাতেও সকল বিরুদ্ধ-ভাব থাকে বটে; কিন্তু এ গুলি পূর্ব্বরাগেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। এই আশা ও নিরাশা, বিশ্বাস ও সন্দেহ, লালসা ও ভয়, ক্ষণে উল্লাস ক্ষণে বিষাদ, যুগপৎ হৃদয়ের সম্প্রসারণ ও সংকোচন, এই সকলে মিলিয়াই পূর্ব্বরাগের নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ বা মূর্ত্তিকে ফুটাইয়া তোলে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র